সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে কে করে এই তটিণী পারাপার
অকুল হতে এসগো আজি কূলে, দুকুল দিয়ে বাঁধগো পারাপার
লক্ষযুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে"

সম্পাদক—

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

১৬শ বর্ষ—১ম খণ্ড
(শ্রাবণ হইতে পৌষ)
১৩২৭।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০ } ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট্
১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা { বার্ষিক মূল্য ৩৲

১৩২৭ সালের—
বর্ণানুক্রমিক ষান্মাসিক সূচী

(শ্রাবণ—পৌষ)

এ

ও

ক

খ

গ

চ

ছ

জ

ড

ত

দ

ন

প

ব

চিত্র-সূচী

নবজন্ম।

শিল্পী—শ্রীমান অরবিন্দ দত্ত।

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে," তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপিন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব্য কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমার জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমার কৈশোরের মধুবন, তোমার সম্পদের দ্বারকা, তোমার ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত।"

১৬শ বর্ষ। | শ্রাবণ—১৩২৭ | ১ম সংখ্যা।

আলোচনী

সূচনা

গ্রীষ্মদাহন

এস শ্রাবণের ঘনঘোর বরষায় হিমগিরির এই সানুদেশ বাংলায়, নবজীবনের আশার সঞ্চার করিয়া, নীল-নবঘন-মেঘ-মেদুরের মত ; মৃত কল্পনার জীর্ণ জঞ্জাল, ভগ্নহৃদয়ের মলিন ধূলা উড়াইয়া দিয়া এস আষাঢ়-গগনের স্নিগ্ধ-সজল জলদ-কান্ত সুন্দর তুমি,—দারুণ গ্রীষ্মের দাহনে পীড়িত ও কাতর অন্তঃকরণ আমার আজ তাপিত তরুলতার মত তোমার রোষ কষায়িত চক্ষুতে, তোমার বুকের ভিতর বিদ্যুৎ ঝলকে ভীত হইবে না। বজ্রাগ্নিকে মাথায় করিয়া শ্যামলা ধরণীর আজ নবজীবনের সূচনা হইবে।

জাতি-সংঘের দুরাশা

বিশ্বজগৎ বলিতেছে আজ নূতনের সূচনা। আমার বাংলা দেশকে আজ দেখিতেছি শুধু ব্যর্থ আশার গলিত শব, জীর্ণ কল্পনার শুষ্ক কঙ্কালে ভরা ধূসর বালুকাস্তূপ। বিশ্বজগৎ বলিতেছে বিশ্ব-জাতির সংঘ অধীন ও শিশু-জাতি সমুদায়ের স্বাধীনতা ও মঙ্গলকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শান্তির, হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করিয়া। আমরা দেখিতেছি তাহা নহে ; শুধু একটা বিজিগীষু সাম্রাজ্য-তন্ত্র নূতন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া, অর্ব্বাচীন জাতির স্বার্থকে বলি দিয়া নাম ভাঁড়াইয়া টিকিয়া গেল, বিশ্বের মতামতের পরিবর্ত্তে কূটনীতিকে আশ্রয় করিয়া, সহজ সরল ও অবাধ আলোচনার পরিবর্ত্তে সংগোপন ও প্রতারণাকে আশ্রয় করিয়া। ফ্রান্স মিত্রশক্তির অমতকে অগ্রাহ্য করিয়া অছিলায় রাইন নদীর অপর পারে সসৈন্যে উপনিবেশ করিয়া বসিল—জিগীষু ফোকের (Foch) অধীনে ফ্রান্স এখন সাম্রাজ্য-তন্ত্রের পক্ষপাতী। প্রাচ্য জগতে জাপান আজ জয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া মিথ্যা ও অন্যায়ের জাল বুনিয়া চীন জাতিকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে তৎপর। এ যেন শান্তি ভঙ্গের উদ্যোগ-পর্ব্ব। এবার আবার বর্ণভেদ জাতিসমুদায়ের স্বার্থের বিরোধকে আরও বিপুল সংঘর্ষের দিকে টানিয়া আনিতেছে।

প্রাচ্য-শ্রমজীবীর শোষণ ব্যবস্থা

বিশ্বজগৎ বলিতেছে, আজ শ্রমজীবিগণের নবজীবনের সূচনা। ধনীর অধিকার শ্রমজীবীর জীবনের অধিকারকে আর হটাইতে পারিবে না। কারখানা অথবা খনির অভ্যন্তরীন শাসনে শ্রমজীবী ধনীর পার্শ্বে বসিয়া আপনার স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষা করিতে তৎপর। দিনে ছয় ঘণ্টার কাজ ও অধিকতর অবসর—এবার, শ্রমজীবিগণের জীবনে স্ফূর্ত্তি ও সফলতা আনিবে। আমরা এখানে দেখিতেছি এই চীন ও ভারতবর্ষ দেউলিয়া পাশ্চাত্য জাতি সমুদায়ের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হইয়া উঠিল, এখানকার অল্পব্যয়-সঙ্কুল শ্রম-জীবন একটা বিরাট শোষণ যন্ত্রের অংশ হইয়া আপনাকে আপনি ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল। ভারতীয় শ্রমজীবি-গণের কাজের ঘণ্টা কমাইবার কথা আমেরিকার সেই বিরাট শ্রম-সভায় আপাততঃ স্থগিত রহিল। আর জাপানই বা ইউরো-আমেরিকার উপদেশ শুনিবে কেন? জাপান তাহার শ্রমজীবিগণের হাড় মাস পিশিয়া, তাহার মেয়ে কুলী-গণের স্বাস্থ্য ও সতীত্বকে লাঞ্ছিত করিয়া পাশ্চাত্য জাতি-সমুদায়ের রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ের পরিসরবৃদ্ধির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষা করিতেছে।

পণ্ডিত-মূর্খ আমেরিকা

আমেরিকা ইউরোপীয়গণের স্বার্থসংঘর্ষ ও জাতি-বিরোধ, কূপমণ্ডুকত্ব ও গোড়ামিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, মনরো-মণ্ডলের আশ্রয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও ভাবুকতা রক্ষা করিতে প্রয়াসী। পণ্ডিত-মূর্খ আপনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আকাশ পথে চীৎকার করিয়া, বিশ্বের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া বসিল। এদিকে চতুর জাপান প্যাসিফিকে আর একটি মনরো-মণ্ডলের গণ্ডী সৃষ্টি করিতেছে। শাদা অষ্ট্রেলিয়ার সহিত আপাততঃ যে হলদে জাপানের শ্রম-বিস্তার ও উপনিবেশের বিরোধ তাহার মীমাংসা যে অদূরবর্ত্তী কালে প্রচণ্ড সামুদ্রিক যুদ্ধে দেখা যাইবে তাহা সকলেই বলিতেছেন। তাই আমেরিকা জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অজস্র পরিমাণে যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া চলিতেছে।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিপ্লব ও প্রজাশাসনে সংঘের দায়িত্ব

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশের ধারা নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই বলিতেছে বিশ্বজগতে প্রজাতন্ত্র এবার নূতন ভাবে গঠিত হইবে। যে রাষ্ট্র এতদিন জীবনের সব দিকেই আপনার অধিকার বিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিল, এখন সে তাহার অধিকার ত্যাগ করিতে উন্মুখ। সব দিকেই এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমূহের উৎপত্তি ও বিকাশ দেখা যাইতেছে। ইউরোপের অধিকাংশ খণ্ডে এখন এই সোভিয়েট অথবা সমূহ-তন্ত্রের প্রতিপত্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমিতি এবং শিল্পী শ্রমজীবিদিগের "পুগ" সমুদায়ের সমবায় সোভিয়েট শাসনেব ভিত্তি। রুশিয়ার এই সমূহ তন্ত্র আপাততঃ চরমপন্থী বলশেভিষ্টদিগের আয়ত্বাধীন; কিন্তু ইহা যে একপ্রকার নূতন প্রজাতন্ত্র তাহার পরিচয় শুধু রাইন নদ হইতে বৈকাল হ্রদ এবং ডানিয়ুব হইতে অল্লাস পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহা নয়। স্থান বিশেষ নহে, অধিকার ও স্বার্থ বিষয়ের দিকে প্রজাতন্ত্র যে তাহার সভ্য নির্ব্বাচন বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিতেছে তাহা এই সোভিয়েট রীতির প্রভাবের ফল। তাই পুরাতন দলবিভাগকে ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মাণী এখন বিভিন্ন রাজ নৈতিক দলের সমন্বয় বা সমবায়ের পক্ষপাতী। আর এক দিক হইতে ফ্রান্সের Syndicalism অথবা শ্রেণী তন্ত্র, এবং ইংলণ্ডের Guid-Socialism অথবা "পুগ" তন্ত্র, কেবল মাত্র যে বৈষয়িক জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমূহের সৃষ্টি করিতেছে-তাহা নহে, সর্ব্বভুক রাষ্ট্রের অধিকার খর্ব্ব করিয়া লোকসংঘের দৈনন্দিন জীবনে একটা কর্ম্মঠ ও দায়িত্ব বোধ মূলক প্রজাশাসনের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। শ্রমজীবিগণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে পার্লামেণ্ট হইতে শ্রমজীবিসংঘে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র সরিয়া যাইতেছে। এমন কি আমেরিকায় এক একটি বড় ব্যবসায় এক একটী স্বাধীন রাষ্ট্রের মত গড়িয়া উঠিতেছে। সব দিকেই সংঘগঠনের উদ্যোগ চলিতেছে। শুধু যে আয়র্লণ্ড অথবা স্কটলণ্ডের অথবা উত্তর ফ্রান্স খণ্ডের

স্বায়ত্তশাসন তাহা নহে; চার্চ্চ, ব্যবসায়, মিউনিসিপালিটি, বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার, এবং খণ্ড খণ্ড স্বাধীন জীবনের আধার হইয়া পুরাতন রাষ্ট্রের সর্ব্বতোমুখী দায়িত্বের পরিবর্ত্তে সংঘের সমূহ-দায়িত্বকে ফুটাইয়া তুলিতেছে।

ভারতের নীরবপ্রজাতন্ত্র

এই গেল বিশ্বজগতে প্রজাশাসনের অভিব্যক্তি। আমাদের ভারতবর্ষে দেখি ঠিক বিপরীত অবস্থান্তর। ভারতবর্ষ চিরকালই একটা নীরব অথচ কর্ম্মঠ প্রজাতন্ত্রকে তাহার গ্রাম্য সমাজে, তাহার জাতি পঞ্চায়েতে সজীব রাখিয়াছে। এই সে দিন তানযোর, মালাবারে বহুগ্রাম দেখিয়া আসিলাম সেখানে এখনও সেই মন্বাদি স্মৃতির সমূহ ও শ্রেণী নাম বিলুপ্ত হয় নাই, গ্রামবাসী ও শিল্পিগণ "গ্রাম সমুদায়ম" রক্ষা করিতে প্রয়াসী, গোচারণ ও পতিত ভূমির অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়াছে, বিঘা প্রতি অথবা তাঁত প্রতি টেক্স বসাইয়া "সমূহ-পণমের" পুষ্টি সাধন করিতেছে, সমবায় প্রণালীতে শ্রম জোগাইয়া পূর্ত্তবিভাগ চালাইতেছে, দরিদ্র ভাণ্ডার হইতে দীনহীনকে প্রতিপালন করিতেছে, সকলের অর্থে উৎসবের দিনে ভাগবত পাঠ ও যাত্রার আয়োজন ও সকলের জন্য নদীর ধারে "স্নান-মণ্ডপম্" নির্ম্মাণ করিতেছে, মহামারীর সময় গ্রাম মন্দিরে সহস্র নাম "জপম" অনুষ্ঠান ও পথে পথে অথর্ব্ববেদ গানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

গ্রাম্য-সভা ও জাতি-পঞ্চায়েত

অব্রাহ্মণ আন্দোলন একটা সহরের মন গড়া রাজনৈতিক আন্দোলন। গ্রাম সভায় ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্ব্বাচিত হইয়া সকল বিবাদ মীমাংসা, সকল প্রকার বিধিনিষেধ তৈয়ার করিয়া চলিয়াছে, সমূহ-পণমের ব্যয় প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছে। এমন কি শান্তি রক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের এক গ্রামে আমি যেমন লক্ষাধিক টাকা গ্রাম্য সভার ভাণ্ডারে মজুত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, তেমনি তিনেভেলি জেলায় ইংরাজের পুলিশ অপেক্ষা অপরিজ্ঞাত গ্রাম্য পুলিশের কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভারতের প্রজাতন্ত্র কেবল গ্রাম-সভা ও জাতি-পঞ্চায়েতে পর্য্যবসিত হয় নাই। এখনও বহু স্থানে বিভিন্ন গ্রামের সম্মিলিত সভার অধিবেশন দেখিয়া আসিয়াছি; বাঙ্গালী ইহা বিশ্বাস করিবে না কারণ এ সকল অনুষ্ঠান তাহার বিলুপ্ত, তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর এত অহঙ্কার হইয়াছে যে সে আপনার মুন্সীকাটিতে ভারতবর্ষ বিচার করিয়া বসে, সমগ্র ভারতবর্ষকে জানিবার মত তাহার ইচ্ছা ও অধ্যবসায় নাই।

শাসন-সংস্কার

মনটেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলের পুষ্টিসাধন করিয়া, স্থান বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া Regional representation কে আশ্রয় করিয়া প্রজাতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিতেছে। অথচ সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ স্থান বিশেষ নহে, অধিকার ও সমাজের বিচিত্র স্বার্থকে (interests এবং functions) রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রকাশ ও সমন্বয় সাধন করিতে ব্যস্ত। ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র নীরবে নির্ব্বিবাদে সমাজের বিচিত্র স্বার্থ ও অধিকারেব একটা সমন্বয় সাধন করিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার গ্রাম পঞ্চায়েতে, তাহার বিভিন্ন গ্রামের মহাসভায়, অথবা সহরের বিভিন্ন জাতি পঞ্চায়েতের সম্মিলনে। এক একটি জাতি বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান করিয়াও এক একটি জাতি পঞ্চায়েতের শাসন মানিয়া থাকে; জাতি ধর্ম্ম বিষয়ে জাতি-পঞ্চায়েৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আবার পঞ্চজাতি গ্রাম পঞ্চায়েতে বসিয়া গ্রামের সাধারণ জীবনের জন্য আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিতেও শিখে। পল্লীসমাজে এইরূপ বিভিন্ন জাতির স্বার্থ ও অধিকারের একটা সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। এই প্রজাতন্ত্রেব স্বাভাবিক বিকাশের পথ প্রতিরোধ করিয়া মণ্টেগু-চেমসফোর্ড ইহার উপর পুরাতন ইউরোপের পরিত্যক্ত দলবিভাগনীতি-সম্বলিত প্রজাতন্ত্র বসাইতেছে, তাহাতে আবার দেশের লোককে প্রজাতন্ত্রের সেই প্রাথমিক স্বত্ব টেক্স স্থাপন ও ব্যয়ের অধিকার না দিয়া। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ আমাদের সম্পূর্ণ নিরর্থক ও বিফল হইবে যদি আমরা ভারতের বিরাট পল্লীসমাজের নীরব প্রজাতন্ত্রকে

উপেক্ষা করিয়া একটা মুষ্টিমেয় অথচ আত্মম্ভরী প্রগল্ভ ও চটুল মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে থাকি।

গঠনের ভাবুকতা চাই

এই বিরোধ ও সংঘর্ষের দিন আমারা কোন পথে যাইব? "উপাসনা" এই কথা বহুবার তুলিয়াছে, বহুবার বহুদিক হইতে এক একটা বিষয়ের মীমাংসা করিতেও চেষ্টা করিয়াছে। এখন সংঘর্ষ আরও জটিল হইয়াছে। এইবার হয় আমাদের শিখিতে হইবে, না হয় মরিতে হইবে। এইবার সব যায়। বাঙ্গালী কূপমণ্ডুকত্ব ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাণের সহিত আপনার সতেজ প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করুক। এইবার গঠনের সময়। বিপ্লবের পর এক যুগ চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালী বসিয়া আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ বিপ্লববাদের পুরোহিত ছিলেন। নবযুগের নূতন সাধনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেই বিপ্লবকে এখনও জাগাইয়া তুলিতেছেন; তাই এই গঠনের সময় রবীন্দ্রনাথের সহিত শিক্ষিত বাংলার আর প্রাণের যোগ নাই। এখন সংস্কার নহে, পুনরুদ্ধারের যুগ। বাঙ্গালী আর কত কাল সেই উনবিংশশতাব্দীর সংস্কার লইয়া নাড়াচাড়া করিবে? ভারতবর্ষের বিপ্লববাদের নেতা হইয়াছিল বাংলাদেশ। কিন্তু আজ বাংলাদেশ নেতৃত্ব পদ হারাইয়া বসিতেছে। গঠন করিবার উপকরণ সেই মৃত্তিকাভিত্তি বাঙ্গালীর নাই, তাই গঠনবাদ বাংলা আর কিছু দিতে পারিতেছে না। আমার এই পলিপড়া ভূমি, এখানে যে সব ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া যায়, এখনকার দেবমন্দির ইটের, পাথরের নহে, তাই ধ্বংশোন্মুখ, মদুরার সেই পাথরের বিশাল মীনাক্ষীর মন্দিরের মত অতীতের সাক্ষী অমন আর আমাদের কি দেখাইবার আছে, আমাদিগের গ্রাম্য সমাজ আমাদিগের পঞ্চগ্রাম দশগ্রাম শাসন বিলুপ্ত; কি লইয়া আমরা গড়িব? আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ একটা দ্বীপের মত পৃথক হইয়া জনসমাজের সাগরবক্ষে ভাসমান। মারাঠা ভাষার দৈনিক পত্রের গ্রাহক সংখ্যার মত আমাদের বাংলা কাগজের গ্রাহক কোথায়? শিক্ষিত জনসমাজের আকাঙ্খা ও আদর্শের এমন প্রভেদ আর ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই লক্ষিত হয় না। তাই গঠনের শক্তি ও আমাদের কুলায় না। রক্ত সংমিশ্রণ বাঙ্গালীকে মানসিক উর্ব্বরতা ও ব্যাপকতা দান করিয়া বিপ্লববাদের উপকরণ জোগাইয়াছে; বাংলার এই পলিপাড়া সমাজভূমি যেখানে কিছুই অচল নহে, গঠনবাদের উপকরণ জোগাইতে পারিবে না।

বাঙ্গালীর ব্যর্থ আশা

তাই এই যুগ বাংলাদেশ ছাড়িয়া অন্য প্রদেশের দিকে নেতৃত্বের জন্য চাহিয়াছে। রাজনৈতিকক্ষেত্রে বাঙ্গালী নেতা অপেক্ষা অন্য প্রদেশের নেতাগণ জনসমাজের সঙ্গে নিবিড়তর সম্বন্ধে আবদ্ধ। সত্যাগ্রহ বাংলার নেতার মুখে শোভা পায় নাই। কলিকাতার কেরাণীজীবনের সঙ্কীর্ণতা বাঙ্গালীর চিন্তাকে আক্রমণ করিতেছে। বোম্বাইয়ের সে বিপুল জনহিত-সাধন-প্রয়াস বাঙ্গালীর কোথায়? বাঙ্গালী অর্থউপার্জ্জন করিতে অপটু তাই বদ্ধজীবনের কলহ ও ক্ষুদ্রতা তাহাকে সবদিক হইতে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। স্ত্রীলোকের পর্দা ও পরাধীনতা বাঙ্গালীর সব চেষ্টার অর্দ্ধেক শক্তি কাড়িয়া লইয়াছে, মান্দ্রাজের সে সহজ সুন্দর গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দ আমাদের কোথায়? স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের শিক্ষা ও আদর্শের প্রভেদ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যে প্রত্যহ দুঃখময় করুণ নাট্যের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে! হীনবল ক্ষীণদেহ বাঙ্গালী নদীর 'ব' প্রদেশে জন্ম লাভ করিয়া অতিশীঘ্রই বার্দ্ধক্যে উপনীত। অকাল পরিপক্ক বাঙ্গালীর যৌনজীবনই অতৃপ্তি ও অস্বাস্থ্যদায়ক; তাহাতে আবার সমাজের বিধিনিষেধ যৌনজীবনকেই প্রশ্রয় দিতেছে। ৩৫ বৎসর অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী যমের ডাক শুনিতে আরম্ভ করে। পঞ্জাবের শৌর্য্য, সে কর্ম্মপটুতা, শুদ্ধি আন্দোলনের সে অসীম সাহস বাঙ্গালীর কোথায়? অথচ বাঙ্গালী ভাবিতেছে চিরকালই সে নেতাপদে বরণীয়। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের নামের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী আর কত কাল চালাইবে? রসায়ণের অকেজো আবিষ্কার বাংলার কৃষি ও শিল্পের

সহায় হয় না। বাংলার যুবক সম্প্রদায় অধ্যবসায় হীন, অপরিশ্রমী ; আর কোন প্রদেশের যুবকবৃন্দ এমন না খাটিয়া সবজান্তা হয় না। বাংলার সাহিত্যে শুধু প্রেমের ছড়াছড়ি। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরচ্চন্দ্রের কল্পনার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি কুন্দনন্দিনী, বিমলা, কিরণময়ী, কই একটা ত মানুষের মত মানুষের উজ্জ্বল সৃষ্টি নহে। গোরার চরিত্র ত বস্তুতন্ত্রহীন, সন্দীপ একটা সচল বিদেশী বক্তৃতা। আর ইন্দ্র ও পণ্ডিত মশাই তাহারা ত অপরিপক্ক। বাংলার মাসিক পত্রের অস্তিত্ব স্ত্রীলোকের উৎসাহের উপর নির্ভর করে, সমালোচকের মানদণ্ড নহে, বঙ্গনারীর হাতাবেড়ি সাহিত্যের মাপকাটি হইয়াছে। তাই বাংলা সাহিত্য এত চটুল, লঘু সাহিত্য ; অথচ জীবন লঘু নহে, অত্যন্ত গভীর, বেদনাময় হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলা এখনও ইতিহাস ও পুরাতন সাহিত্য ও পুরাণ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে ; বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ ও বেদনার সহিত তাহার সংযোগ খুব কম। আর নাট্যকলা, তাহার প্রাণ শুধু বিলাসভোগ ; জীবনের বিপুল সংঘর্ষ ও বেদনা আমাদের নাট্য সাহিত্যে প্রকাশ পায় না। আমাদের উচ্চশিক্ষা দেশের অন্নসংস্থানের সুযোগ দান না করিয়া গড্ডালিকাপ্রবাহের মত অকেজো চাকুরীর কাঙ্গালী তৈয়ার করিতেছে, অথবা সত্যসন্ধানের নামে অকেজো গবেষণার প্রশ্রয় দিয়া বাঙ্গালীকে যশের কাঙ্গালী করিতেছে। বিশ্বজগতে নূতন শিক্ষার প্রধান পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার সহিত দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও জাতীয় আদর্শের সহিত নিবিড়তর সম্বন্ধ স্থাপনে। আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদের জীবনের ও আদর্শের সংঘর্ষের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আনিতে পারিতেছে না, লোকচৈতন্যের সহিত উচ্চশিক্ষার এমন চরম বিরোধ ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায়। বিলাতের স্থানীয় শিল্পের উন্নতির ও প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র নব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা স্যাড্‌লার সাহেব বাংলার আব্‌হাওয়ায় আসিয়া মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও স্থানীয় কৃষি শিল্পের উদ্ধারের জন্য চরম আবশ্যকতা বুঝিলেন না।

কত কল্পনা ভাবুকপ্রধান বাঙ্গালীর হৃদয়ে জল বুদ্বুদের মত উঠিয়াছে, মিলিয়াছে ; কত কর্ম্মের আয়োজন ব্যর্থ আশা বুকে করিয়া স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া গিয়াছে। বৈশাখের রৌদ্র পীড়িত গঙ্গাচরের মত বাঙ্গালীর হৃদয় আজ কাতর। "হান তব বাজ হৃদয় গহনে," চাতকের মত যে জল ভিক্ষা করে সে বিদ্যুতের আগুনে ভয় পায় না। ব্যর্থ আশা, বিফল মনোরথ পূরণ করিবার জন্য আমরা আবার নূতন করিয়া গড়িব। এইবার আমরা আমাদের বিধিদত্ত ও সমাজদত্ত প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া নূতনের সূচনা করিব। আর পলিপড়া ভূমির মত গলিয়া ধসিয়া যাইব না, শ্রাবণ, প্লাবনের বেগ আমরা মস্তকে বরণ করিব, চক্ষে অভিসার রজনীর নিবিড় অন্ধকারের কজ্জল এবং ভালে চির-নবীন পঙ্কতিলক ধারণ করিয়া, ব্যর্থ আশার জীর্ণকন্থার কটিমাত্র আচ্ছাদিত হইয়া। আমার শ্যামায়মান বনান্তরালে শ্যামশুভ্র প্রস্তর বেদীর উপর নব-নীরদ-শ্যাম বিদ্যুতের চূড়া পড়িয়া চির-কিশোরের লীলা দেখাইবে। বাংলার প্রাণবন্ধু শ্যাম যে "নিতুই নব", এবার এই "নিতুই নবে"র মধ্যে যে চিরপুরাতন তাহাকে বাংলার চির-কিশোর প্রাণ বরণ করিয়া লইবে।

—o—

"রতন-কুলী"

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

রতন ছিল কাঁচ্‌ড়াপাড়ার কলের কুলী,
ছেলে মেয়ে অনেকগুলি
ছিল তাহার, অন্ধ বুড়ী মা ছিল তা'র গলায় ;
আমলাগাছের তলায়
ছিল তা'দের ছোট্ট কুঁড়েখানি,
দুখের বোঝা মাথায় করে' এসেছিল তারই দোসর রাণী !
রাণী, সেতো সত্যিকারের রাণী ছিল, হৃদয় নিয়ে ছিল যে রাজ-কাজ,
ভাগ্যদেবী আপন হাতে অঙ্গে তাহার পরিয়েছিল দুখের পেশোয়াজ।

সেইত মহৎমান,
তাজা প্রাণের মুক্তা দিয়ে গড়িয়েছিল মাথার শিরস্ত্রাণ ;
দুঃখ যত দগ্ধে যেতো তারে,
অভাব যত বারে বারে
দংশে যেতো সর্পসম, জরিয়ে দিত অস্থি মাংস রাশি,
লজ্জা সর্ব্বনাশী
দৈন্যমাঝে বিবশ করে' যেত যখন চলে',
কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তো জ্বলে
হাজার শিখা বিস্তারিয়া যজ্ঞবেদীর হোমের আগুন সম
শক্তি অনুপম,
অজ্ঞানতার অন্ধকারেও বিপুল হয়ে' তুল্‌তো ভরে' বুক
এই ছিল তা'র সুখ।

রতন ছিল তার'ই বুকের রতন,
সোহাগ ছিল সাবুজা রকম, দীনের ঘরে তুচ্ছ আদর যতন !
চার্‌টে ভোরে বাজতো কলের বাঁশী
রতন ব'ল্‌তো, "এখন তবে আসি !"

"দুখীরামকে দেখো যেন পুকুর পাড়ে যায়নাকো সে ছুটে !"
রাণীর মুখে ফুট্‌তোনাকো বাণী, শুধু ওষ্ঠপুটে
একটু ছোট হাসির রেখা —
দুখের বিষে জর্জ্জরিত বিরস মুখে দিত দেখা ;
নয়ন দুটী পায়ের তলে
নিবেদনের নির্ভরতায় অর্ঘ্য হয়ে' পড়্‌তো গলে গলে।

রতন সে সব বুঝ্‌তো কিনা কিছু
সেইই জানে
সে সব কথার মানে ;
তবু সে পথ চলার মাঝে বারে বারে চাইতো আগু পিছু,
সেই যেখানে দাঁড়িয়ে রাণী
দিতরে হাতছানি।
কলের চাপে ফেল্‌তো পিষে, চিম্‌নি দিয়ে উঠ্‌তো মনের কালী,
জমাদারের গালি
প্রাণটারে তার বিষিয়ে দিত, তবু রতন কইতোনাকো কথা,
দারুণ ব্যথা
মনের মাঝেই রইত গোপন, কুলীর কি আর মান অপমান চলে ?
না খেয়ে যে মরবে সবাই, তার গোলামীর এদিক্ ওদিক্ হ'লে ;
আসল কথা, রাণীর মুখের আদল
ভুলিয়ে দিত তার জীবনের সকল ঝঞ্ঝা বাদল।

'হপ্তা' ছিল এক টাকা আট আনা,
পাঁচটী লোকের দুখের দানা
কোন মতেই কুলাতোনা হায়,
জীবন হ'ল গলগ্রহ, বেঁচে থাকা একটা বিষম দায়,
পেটের দায়ে খাট্‌তো রতন দেহের দিকে চাইতনাকো মোটে
তাতেও যদি দুটী বেলা পেটভরে' তার অন্ন দুটী জোটে।

ছেলে মেয়ে খাইয়ে দিয়ে
কলসী নিয়ে
আস্‌ত রাণী গঙ্গা পানে ;
কখন কেবা জানে

কলের ধোঁয়ায় আকাশ ভরা তাই দেখে সে দাঁড়িয়ে গেছে থির,
বুকের কাপড় ভিজিয়ে গেছে হাজার ঝোরায় কখন অশ্রুনীর ;
ছোট ঘরের মেয়ে রাণী
তবুও সে বুঝতো অনেকখানি,
সরম ছিল, ভরম ছিল, দুঃখ সহার শক্তি ছিল তার,
অসীম বেদনার
বিজয়মালা পরিয়েছিল কণ্ঠে তাহার কোন অজানা হাত ;
সারাটী দিন রাত
রক্ত-রাঙা হাজার দলে আপন গন্ধে আপনি সমাকুল,
দুঃখময়ের পূজার কুসুম, জগতে তা'র নাইক সমতুল !

রতন কিন্তু বেঁচেছিল কোনও মতে
দেহের রক্ত জল করে' সে ফির্‌তো যখন পথে,
আপন মনে ভাবত কেবল
চোখ ভরা তা'র জল,
"দুটী বেলা পেট ভরে ভাত—এও যদি না মিলে
হা ভগবান্ কেন তবে ক্ষুধার জ্বালা দিলে ?
ছেলে মেয়ে পায়না খেতে
বুড়ো মায়ের অন্ধ চোখের জল শুকোয়না দিনে রেতে,
রাণী সে তো দেয় না পেটে দানা,
জীবনটা তার ঘানির মত, কেঁদে কেঁদে চলেছে একটানা ;
আছে বটে মুখের হাসি,
সেই ত সর্ব্বনাশী,
হৃদয়ে তা'র অহর্নিশি জ্বল্‌ছে যখন ক্ষোভের দাবানল ;
এমনি দুরবল
পুরুষ মানুষ আমি
মায়ের ছেলে, ছেলের বাবা, ঐ অবলা নারীর আমি স্বামী ?"

সে দিন দুপুর বেলা,
ছেলে মেয়ে পথের ধারে ধূলা নিয়ে ক'র্‌তেছিল খেলা,
লিচু-ওলা হাঁক্‌লো "লিচু লিচু—"
খেলা ছেড়ে হেলে দুলে চ'ল্‌ল' তারা তারই পিছু পিছু,

অবশেষে বাড়ীর কাছে এসে
দুখী বল্লে হেসে হেসে,
'চল্‌না দিদি, মাকে ডেকে আনি !'
চাল বাড়ন্ত সেই কথা আজ পিঁড়েয় বসে' ভাব্‌ছে তখন রাণী—
দুখী টানে মায়ের আঁচল ধরে'
আন্নাকালী মুখখানি ভার করে'
দাঁড়িয়ে আছে দোরের গোড়ায়
তখনও সেই পাড়ায় পাড়ায়
লিচু-ওলা চল্‌ছে হেঁকে—"চাইগো লিচু ফল"—
"আমি নারী এমনি দুরবল
ওদের এতটুকু আশাও, কাঁটা হয়ে রইবে আমার বুকে ?"
এই বেদনার কাতরতা ছড়িয়ে প'লো, রাণীর সকল মুখে !

পাঁচটা বেলায় রতন যখন এলো বাড়ী,
ছেলে মেয়ে তাড়াতাড়ি
ছুটে গিয়ে বল্লে বাবার জড়িয়ে গলা—
"আজ্‌কে লিচু-ওলা
হেঁকে গেল মোদের দুয়ার দিয়ে
মায়ের কাণ্ড কি এ ?
আমরা এত বলনু ওমা, দাওনা কিনে লিচু
আমরা তো আর চাইনে অন্য কিছু,
চুপ্‌টি করে' রইল খাড়া মা
হারাণীকে বলনু দাঁড়া না,
বাবা আগে আসুক বাড়ী, কেমন মজা বলে দেবখুনি,
দেখ বাবা, এতগুলো কিন্‌লে লিচু, ওদের বাড়ীর চুণী।"

রতন এবার চাইলো রাণীর দিকে
ঘন কালো মেঘ ছেয়েছে স্নেহ শ্যামল উজল ধরণীকে,
বৃষ্টি ধারা নাম্‌ল বুঝি ওই
বুকের আগল ভেঙ্গেছে আজ সান্ত্বনাতে মিল্‌বে না আর থৈ,
বুকের দিকে নিয়ে টানি,
বললে রতন—"শোন শোন রাণী,

কাদ্‌চ কেন? তুমি যদি হাল ছেড়ে দাও এমন করে
আমরা ঘরে রইব কেমন করে?
ছেলে মেয়ের মা তুমি যে আমার সকল দুঃখের দোসর হয়ে
এতদিন ত জীবনটারে বোঝার মত আনন্দে তুমি বয়ে।"
আজকে কেন রতনের আর সরল না'ক কথা
তারো প্রাণে দারুণ ব্যথা
যেন তুঁষের আগুন
হাওয়া পেয়ে উঠ্‌ল জ্বলে ধিকি ধিকি আরো চতুর্গুণ।

কেঁদে সবার কাটল সারারাত,
আবার প্রভাত
যখন এসে দিল দেখা ভাঙা কুঁড়ের ছোট্ট আঙিনায়,
ঝিরি ঝিরি দক্ষিণা বায়
দিয়ে গেল সাড়া,
রতন সে যে কলের কুলী তার জীবনে তখন কলের তাড়া!
সে দিন সকাল থেকে
কালো মেঘের দৈত্যগুলো ঝলক দিয়ে চল্‌তেছিল হেঁকে,
মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ে
গাছপালা সব কুটছে মাথা, ঘর বাড়ী সব এই বুঝি যায় পড়ে;
ক্রমে ক্রমে শিলের বহর
এমনি লহর
লাগিয়ে দিল জল ধারার সনে,
রতন মনে মনে
ভাব্‌তে গিয়ে শিউরে গেল—"পাতার ছাওয়া আমার কুঁড়ে
এতক্ষণে কোথায় গেছে উড়ে,"
অন্ধ বুড়ো মায়ের কথা ভাব্‌তে যেয়ে চক্ষে এল জল
—"মা যে আমার অসহায়া মা যে আমার দীর্ণ দুর্বল,
সবার পথে চল্‌তে যে তার মানা
দেহ যে তার শিথিল অবশ মৃত্যু বুকে দিয়েছে রে হানা,
আমার দুখী, আমার আন্নাকালী
আমারেই ত ডাকছে খালি খালি

রাণী রাণী আমার রাণী, দিন ছুনিয়ায় সেই ত রাণী আমার
　　কি হল তার?
আমি হেথায় ভাগ্যহত এমন সময় বাঁধছি পাটের গাঁটী
ওরে কুলী ওরে দেশের দশের কালি মিথ্যে গতর মাটি।"
　　রইল পাটের গাঁটরী বাঁধা,
　　দিন গোলমীর যতেক বাধা
এক নিমেষে সরিয়ে দিয়ে একলা পথে কাঙাল ছুটে চলে,
　　প্রতি পলে পলে
মরণ যেন ঠিক্‌রে পড়ে পায়ের তলায় ইটের ঢেলার মতন
অন্ধকারে পথ হারিয়ে অনেক পরে ফিরল ঘরে রতন।

　　"ঘরের দেয়াল মাঝ উঠানে?
মটকা উড়ে কোথায় গেছে? এরা আমার গেল গো কোন খানে?
　　এই পাড়ারই কোনও ঘরে
আছে বোধ হয়; আসবে ফিরে এই ছুরযোগ থাম্‌লে পরে,
　　পাড়ায় খুঁজে আস্‌ব দেখে?
　　এই যে এ—কে?
এমন করে পড়ে আছে একি আমার আন্নাকালী?
　　দোহাই কালী
মিথ্যে করো—না না এ যে সত্যি কথা এইত আমার মেয়ে
এই জলে যে একেবারে উঠেছে গো নেয়ে।
　　কোথায় ছুখী কোথায় রাণী
　　আয় ছুটে, নেই বক্ষে টানি
তাই যদি হয়?—সত্যি তা কি?—তাও কখনও হয়?"
আঁধার তখন বাইরে মনে, চারি দিকেই ভীষণ বিপর্য্যয়।

*　　*　　*　　*　　*

　　পথে পথে ওই যে পাগল
　　দিন যামিনী ঘুরছে কেবল
পরণে ছেঁড়া নেকড়া টুকু হয় না তাতে লজ্জা নিবারণ
　　শুধুই অকারণ

আপন মনে যাচ্ছে বকে
চিন্‌তে পার ও কে ?—
ধুলোয় ভরা মাথায় জটা চোখ দুটি তার জবাফুলের মত ;
ব্যথায় হত
দেহটাতে হাড় ছাড়া আর যায় না কিছু দেখা,
এমনি ভাগ্য লেখা !
বুকের পরে হাত দু'খানি রেখে
যে যায় পথে শুধায় তারে ডেকে,
"হ্যাঁ গা তোমারা বল্‌তে পার কোথায় তারা আমায় ভুলে আছে ?
আর কতদিন ঘুরব আমি এমনি করে' ঝড়ের পাছে পাছে।
অন্ধ মায়ের পাও কি দেখা ?
পথ হারিয়ে এতক্ষণে কোথায় যে মা ঘুরচে একা একা—
রাণী—রাণী—রাণী,"
বলতে যেয়ে সরে না আর মুখের বাণী
আন্না যে আজ কান্না হয়ে বুকের মাঝে গুম্‌রে মরে শুধু,
জ্বল্‌ছে ধু ধু
দুখীর তরে শ্মশান ঘাটের একশ চুলী
ওই ত রতন-কুলী !

——০——

অমলা

[শ্রীমতী নিরুপমা দেবী]

(১)

সে গ্রামে কালীসাগর দীঘিটি সার্থক নামা হইয়াই বিরাজ করিত। তাহার দীর্ঘায়তন বদ্ধ সচ্ছসুনীল জলরাশি যে অতলস্পর্শ, ঘোরতর অনাবৃষ্টিতেও যে সে মলিন সম্ভারের কিছুমাত্র ক্ষতি করিবার সাধ্য নাই, গ্রামবাসীর ইহা অভ্রান্ত ধারনা। গ্রাম্য দেবী কালিকার বেদী পীঠ ও অধিষ্ঠান বৃক্ষটির অনতি দূরে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় দীর্ঘিকাটির নামও কালীসাগর হইয়াছিল।

কিন্তু এ হেন দীঘির ধারটি তপোবন হইয়া উঠা দূরে থাকুক প্রাণী সংহারক লোভীজীববৃন্দের একটি আড্ডাই হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্থলে জলে যেমন মাছরাঙ্গা বক হাঁস পানকোড়ির দৌড়াদৌড়ি তীরে তেমনি মৎসলোভী বালক ও যুবক বৃন্দের হুড়া হুড়ি সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিত। গ্রীষ্মের রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, কিন্তু কালীসাগরের তীরের স্বল্পবৃক্ষচ্ছায়াতে বসিয়া দু একজন যুবক জলে ছিপ্‌ ফেলিয়া প্রত্যাশাপন্ন নেত্রে বকের ন্যায় অসাধারণ ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে এ দৃশ্য সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইত। দীঘির নিকটে যাহাদের বাস সেই সব গৃহস্থের কন্যা ও বধূদের সর্ব্বক্ষণের গৃহকার্য্যও ইহারই ক্রোড়ে সম্পন্ন হইত। তাহাদের ঘষা মাজা ধোয়া জলভরা প্রভৃতি কার্য্যের টুংটাং ঘষ্‌ ঘষ্‌ কল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌ এবং মৃদু গুঞ্জন শব্দে ইহার তীর সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত।

সেদিনও যথানিয়মে সব চলিতেছিল। বধূর দল সেদিনের মাজা ঘষা শেষ করিয়া জল লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। গৃহিনীরা গা ধুইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহাদের গল্পের ছটায় বিরক্ত হইয়া কিম্বা মৎস্য লোভে সন্তুষ্ট হইয়া মৎস্যার্থী যুবকবৃন্দও প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। কেবল দুএকটি নাছোড় স্বভাবের বালক বা কিশোর যুবক তখনো শেষ খেয়ায় কি লাভ হয় তাহারই প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। বৈকাল প্রায় সায়াহ্নে পরিণত হয় হয়, বিরক্ত হইয়া একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল—

"আয়রে রমেন আর কাজ নেই ওঠ্‌।"

খানিকটা দূরে একটা ঝোপের পাশে রমেন জলে ছিপ্‌ ফেলিয়া আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়াছিল, সঙ্গীর আহ্বানে চমকিয়া উঠিয়া ছিপে হাত দিল এবং বলিল হাঁ্যা এই যে আর একটু"।

"আঃ আবার ও একটু? দেখি কি পেয়েছিস্‌?"

ঝোপ ঠেলিয়া সঙ্গী নিকটে আসিতেই সলজ্জে রমেন ছিপ্‌টা একটানে জল হইতে তুলিয়া বঁড়শীতে নূতন করিয়া টোপ পরাইতে পরাইতে বলিল "কেবলই খেয়ে পালাচ্ছে, পুঁটি গুলো আচ্ছা চালাক্‌ হয়েছে দেখছি"।

"আরে দূর্‌ একটা ও না? আমার তো গণ্ডা কতকই হয়েছে আবার দুটো বাটাও পেয়েছি। ওকি আবার টোপ্‌ ফেল্‌ছিস্‌ যে?"

"শুধু হাতে ফিরব্‌ নাকি?"

"সন্ধ্যের বাঁকটার দাঁও মারতে চাস্‌ বুঝি? আমার আর হবেনা ভাই। আয় তবে, আমি এগুচ্ছি।"

সঙ্গী চলিয়া গেলে রমেন আবার ছিপ্‌ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখের একটা ঘাটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে এতক্ষণ সেখানে তাহার দিনের শত কাজে বার বার আসা যাওয়া করিতেছিল সে আর তখন নাই। ঘাট শূন্য! রমেন যখন আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনের প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত ছিল তখন সে কখন্‌ যে তাহার শেষ কাজটিও সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা রমেন জানিতেও পারে নাই।

ধীরে ধীরে ছিপ্, টোপের থলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রমেন উঠিয়া পড়িল। অন্তজন সেই ঘাটের দিকেই চাহিয়া জলের ধারে ধারে অগ্রসর হইতে হইতে রমেন কখন্ যে সেই ঘাটেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সে জানেনা কিন্তু জলের দিকে চাহিয়া যখন কাছেই কি একটা চক্ চক্ করিতেছে দেখিতে পাইল তখন সে চমকিয়া দাঁড়াইল। বুঝিল কেহ কিছু ফেলিয়া গিয়াছে। বঁড়শী থলী একহাতে ধরিয়া অপর হাতে বস্তুটা তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া পশ্চাতে চাহিতেই তাহার মুখ অতর্কিত আনন্দের আভায় উজ্জল হইয়া উঠিল। যাহার বস্তু সে খুজিতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সে কথা কহেনা দেখিয়া অগত্যা রমেন বাটিটা আবার জলের ধারে রাখিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—

"ফেলে গিয়েছিলে?"

তথাপি সে উত্তর দিলনা, কেবল নিঃশব্দে নত হইয়া সেটাকে তুলিয়া লইল মাত্র। রমেন সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যার আলোকে তীক্ষ্ণ চক্ষে তাহার মুখের প্যানে চাহিয়া আবার বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

নিঃশব্দেই সে আবার চলিয়া যায়, রমেনের কণ্ঠ হইতে তাহার অজ্ঞাতেই যেন বাহির হইল—

"অমলা।"

স্বরটা এতই ব্যথায় ভরা যে চলিতে গিয়াও বোধ হয় অমলার পা উঠিলনা সে একটু যেন দাঁড়াইল। আবার সেই কণ্ঠে ব্যথিত প্রশ্ন উঠিল—

"অমলা?"

"কেন?"

"কি হয়েছে?"

"কিছু—হয়নিত।"

"হ্যাঁ নিশ্চয় হয়েছে। কেন অমন ভাবে কাজ করছিলে? কারও সঙ্গে কথা কওনি হাসনি কারও দিকে চোখ্ তোলোনি একবারও? কি হল অমলা?"

কেউ কি কিছু বলেছে তোমায়?"

"না।"

"তবে কেন? বল আমায় কি হয়েছে?"

বালিকার আর বুঝি আত্মসম্বরণের ক্ষমতা হইতেছিলনা। জগতে তাহার জন্য এতখানি স্নেহ এতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভরা সহানুভূতি সে বোধ হয় আর কোথাও কখনো পায় নাই। রমেনের কণ্ঠস্বরে তাহার চোখে জল ভরিয়া আসিতেছিল। তবুও সে উত্তর দিতে পারে না যে! তাহার আজিকার কথা কাহাকে সে কি বলিবে। বিচিত্র সে কাহিনী!

আবার যুবক বলিল "খুড়ো খুড়ি কিছু বলেছেন কি?"

"না।"

"তবে?"

"খুড়িমার মা এসেছেন তীর্থ করে, জাননা?"

"হ্যাঁ তাই কি হয়েছে? তিনিই কি কিছু বলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

সরোষে ওষ্ঠ দংশন করিয়া ক্রুদ্ধ যুবক বলিল "কি বলেছে সে মাগী?"

"তোমার মার কাছেই শুনতে পাবে।" বলিয়া অমলা আবার চলিয়া যায়, রমেন ব্যগ্র ভাবে প্রায় পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল—

"বল, বলে যাও আগে আমায় এখনি।"

বালিকা তর্জ্জন করিয়া উঠিল "ওকি কেউ দেখলে নিন্দে করবে—পথ ছাড়।"

রমেন তাহাতে না দমিয়া হাসিয়া বলিল, "ইস্ এই সেদিন-ও তোমরা আমাদের মাছ ধরা নিয়ে কত ঠাট্টা করেছ আর আমরা তোমাদের খেপিয়েছি। কত ফুল ফল পেড়ে দিয়েছি তোমাদের ব্রত নিয়ম "পূজো আচ্চার" জন্যে,—ক'দিনের কথা সে। সামনের এই অগ্রাণ মাসের সেই দিনটার কথা উঠেই না তোমার আমার কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেছে?"

বালিকা এইবার মুখ তুলিয়া রমনের পানে চাহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিলেও রমেন সেই আয়ত সুন্দর চক্ষে কি একটু নূতন জিনিষ দেখিয়া এবার যেন চমকিয়া উঠিল। দ্বিগুণ ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া ফেলিল "পায়ে পড়ি তোমার অমা, মাথার দিব্যি বলে যাও কি কথা।"

"যা ক'লে আমায় ঠাট্টা করলে আর কখনো ও কথা আমায় বলোনা।"

"কোন্ কথা! অভ্রাণ মাসের কথা? কেন অমলা?

তবে কি—তবে কি তোমার খুড়ো খুড়ি ঝাকে কথা দিয়ে আবার তা—"

রমেনের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়াই আসিতেছিল। মাথা হেঁট করিয়া গাঢ়স্বরে বালিকা বলিল—"ওঁদের দোষ নেই, তা আর হবার উপায় নেই।"

"কেন?"

রমেনের আর বেশী জোর করিবার শক্তিও যেন অন্তর্হিত হইতেছিল।

"কাশীতে আমার বাবার যে পিসি না কে আছেন তার কাছ থেকে খুড়িমার মা জেনে এসেছেন আমার—আমার—"

"কি তোমার অমলা? . কি বলেছেন তিনি? আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না? তোমার কি আর কারও সঙ্গে বিয়ে—"

"হয়ে গেছে খুব ছোটতে, আমি যখন চার পাঁচ বছরের।"

স্তম্ভিত রমেনকে রাখিয়া অমলা চলিয়া গেল কিন্তু সে গতি বড় ধীরে আর বারে বারে পথটাকে চাহিয়া দেখিয়া লইবার জন্য তাহাকে থামিতে হইতেছিল—

কিন্তু রমেনের আর সে স্থান হইতে নড়িবার সাধ্য হইল না। দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের কালো যবনিকায় কালীসাগরের জল ও স্থল সব একাকার করিয়া তুলিল।

(২)

সুশ্রী সুন্দর মাটির বাড়ী খানি নিকানো পোঁছানো। উঠানের একধারে কয়েকটা ধান্যের গোলা একটা ছোট ঢেঁকির ঘর, গরুর গোহাল। গ্রাম্য গৃহস্থ্য ঘরে যে কিছু অন্নের সংস্থান আছে তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। রমেনের মাতা পুত্রের আহার্য্য একপাশে ঢাকিয়া রাখিয়া একখানি আসন পাতিয়া দেয়াল ঠেস্ দিয়া বসিয়া হরিনাম জপ্ করিতে-ছিলেন অথবা সাদা কথায় পুত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পাশে একটা বিড়াল শুইয়া নাক ডাকাইতেছে, ঘরের বাহিরে পিড়ার একটা ন প্রভুর প্রতীক্ষায় আসন পাতিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মাথার উপরে চালের বাতায় টাঙ্গানো ছ'তিনটা পাখীর খাঁচা মেরাটোপ ঢাকা। তাহারাও নিশ্চুপ। মাতা হঠাৎ একবার নড়িয়া চড়িয়া হাতের উপর উপবিষ্ট মশাটাকে চাপড় মারিয়া, মারিয়া ফেলিয়া সক্ষোভে উচ্চারণ করিলেন—"এ ছেলের কি এখনো ফেরার নামটি নেই?"

নিঃশব্দ পদক্ষেপে ছিপ বঁড়শী হস্তে পুত্র আসিয়া পিড়ার উপরে উঠিল। কুকুরটা চমকিয়া উঠিয়া ডাকিবার উপক্রম করিয়াই যেন কুণ্ঠিতভাবে থামিয়া গেল। মাতা নির্ব্বাক ভাবে পুত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার চাঞ্চল্যে বিড়ালটার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হইল। সে হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল। পুত্র ছিপ সেইখানেই ফেলিয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িল দেখিয়া মাতা এইবার ধীরে ধীরে বলিলেন—"হাত মুখ ধুয়ে আয়।"

"থুব একটু পরে।"

"পুকুর পাড় থেকে সতীশের সঙ্গে তাদের বাড়ী গিয়েছিলি বুঝি? ত্যাখদেখি সে কেমন ছেলে, অয়ে বসে পড়া শোনাও করে আপনার বিষয় সম্পত্তি চাষ বাস তাও দেখতে শিখ্‌ছে, আবার খেলা ধুলোও করে। তোর মত কেউ না। পড়া তো যা হবার তা হবে—একটা পাশ্ বৈ কপালে লেখেননি মা সরস্বতী দেখ্‌ছি। না হয় ক্ষেত্ খামার গুলোই ত্যাখ, এখন বড় হয়েছিস্ এখনো যদি সেই আমাকেই পাঁচজনার খোসামোদ করতে হবে—"

"মা!—"

পুত্রের কণ্ঠস্বরে মাতার পুত্রের প্রতি উপদেশ বর্ষণের ইচ্ছা অচিরেই বিলীন হইয়া গেল। শঙ্কিতমুখে বলিলেন—"কিরে কি বল্‌ছিস্? শরীর ভাল আছে তো?"

"তা আছে। মা রতন ঘোষের বাড়ীর খবর কি? কে এসেছে তাদের বাড়ী একটা মাগী!"

মাতা একটু দম খাইলেন। পুত্রের কানে ইতিমধ্যেই যে কথাটা গিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না, ভাবিয়াছিলেন নিজেই সমস্ত ধীরে ধীরে বলিবেন। ছেলের যে এ অতর্কিত আঘাত কতখানি বাজিয়াছে তাহা ভাবিয়া তিনি একটু অস্থির লন। ক্রমে বলিলেন—

"বল্‌ছি, মাসী কিরে—রতন বোসের খাশুড়ী যে! তীর্থ টির্থ ক'রে মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছে। নে হাত পা ধুয়ে আয় আগে! জুড়িয়ে কাঠ হয়ে গেছে খাবার। একা মানুষ রাত হ'য়ে যাবে বলে সকাল সকাল করি, তা তুইতো সকালে খাবি না। পাড়ার লোক এতক্ষণ সবাই খেয়ে শুয়েছে।"

"তা শোক্—তুমি আগে বল কি খবর তবে আমি খাব।"

"সে তো বল্‌বই! আচ্ছা শুনেই না হয় খা। এমন কাণ্ড কিন্তু কেউ কখনো শোনেনি। ছ বছরের এতটুকু মা বাপ মরা মেয়েটাকে রতন বোস নিয়ে এল, সে আজ বছর আটেক হ'ল বৈকি।" আমাদের চোখের ওপর বড় হল—কত খেলা করে বেড়ালে আইবড় মেয়ে বছর বারো হতেই বিয়ে বিয়ে করতে লাগল ওরা। তা ঘরে পয়সাও নেই সাত সম্পর্কের খুড়ো খুড়িরও তেমন মায়া নেই। আমার তো বাপু মা নেই বাপ নেই পরের দয়ায় মানুষ সেরকম মেয়ে আমার একটী মাত্র ছেলের জন্য নিতে ইচ্ছে ছিল না। মেয়ে অবিশ্যি নেবার মতই কিন্তু ভাগ্য যে ভাল নয় তা গোড়াতেই বুঝেছিলাম। কি করি তোর—"

বাধা দিয়া পুত্র অধীরস্বরে বলিয়া উঠিল—"আসল কথাটা আগে বলনা মা।"

"আসল কথাই তো বল্‌ছি বাবা। ঐ মেয়ের নাকি তার বাপ চার পাঁচ বছরেই সেই পশ্চিমে বিয়ে দিয়েছিল।"

"মিথ্যে কথা! তাহ'লে রতন খুড়ো এ কথা এতদিন জান্‌ত না; কেউ জান্‌ত না?"

"কি করে জান্‌বে বাছা, খুড়ো তো আপন নয় বাপের দূর সম্পর্কের ভাই! তীর্থ করতে গিয়ে স্থাথে বাপটা মরেছে! মেয়েটাকে কাকে দিয়ে আস্‌বে নিজেরও সন্তান নেই নিয়ে এসেছে বইতো নয়! বিয়ের কথা বাপে না বল্‌লে কি করে জান্‌বে।"

"কেন বাপ তাহ'লে বলে যেত না? আর যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—যে বরাসেই বা কোথায় গেল? তাদেরও কি কেউ খোঁজ নিত না এতদিন? [illegible] কিরাসীও কেই জানত না এও কি একটা সঙ্গত কথা মা? ও মাসী কোথা থেকে একটা—"

মাতা একটু বিষাদের সহিতই পুত্রের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"সবই খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি বল্‌ছি বাছা শোন—কিন্তু খাবারটা গেল একেবারে। পাত্র নাকি কোন্ এক বড়মানুষের নাতি, দাদামশায় সাধ করে বিয়ে দেয়, কিন্তু তার পরে ওদের মধ্যে কি একটা হয় যাতে অমার বাবা সে দেশ ছেড়ে একেবারে বৃন্দাবন চলে যায় আর মেয়েকে আইবড় বলে রাখে। মিনসে রোগে মর মর হয়েছিল বলেই অতটুকু মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। রতন বোস সেইবার তীর্থ করতে গিয়ে ভাইকে বৃন্দাবন প্রাপ্তি করিয়ে মেয়েটাকে সঙ্গে আনে।"

"আচ্ছা কোথায় অমার বাবার গাঁ ছিল শুনি? সেইখানেই খোঁজ করলেই সব বোঝা যাবে।"

"তার উপায় নেই যে বাপু। ওদের গাঁ ছাড়া তো ওর বাবা বহুকাল। পশ্চিমেই থাকৃত, শেষটা পৈরাগে বাস করত নাকি সে সময়। কোথাকার কোন বড়লোকের সঙ্গে আলাপ হয় তারাও তীর্থ করতে এসেছিল, মেয়েটি দেখে পছন্দ করে বোধহয় বিয়ে দিতে নিজেদের দেশেই নিয়ে যায়। সে সব পিসি ভাল জানে না, কেবল "খুব ভাল সম্বন্ধ পাওয়া গিয়েছে পিসি, মেয়ের ভাবনায় এবার নিশ্চিন্ত হলাম" এই রকম নাকি দিদিকে লিখেছিল। পিসি তখন নিজের গাঁয়েই থাকৃত কাশী বাস করতে যায় নি। তার পরে হঠাৎ লেখে "না আমার ধাতে ওসব সইল না আমি অজ্ঞাতবাসে চল্লাম, মেয়ের ভাগ্যে যা হয় হবে জেনো তার বিয়ে দিই নি।" এই রকম লিখে আর কোন খোঁজ খবর দেয়নি পিসিকে।

"তবে? শেষটা কোন কারণে নিশ্চয় বিয়ে হয়নি। তা নৈলে বাপে ওকথা লেখে?"

"নায়ে বাপু, সে যেন রাগের কথা জেদের কথা, পিসি তা বুঝ্‌তে পেরেছিল।"

"তবে সে ছেলের দেশ কোথায় কি তার পরিচয় এসব বলুক নৈলে এ কথা মানবই না। এতদিন পরে

কোথা থেকে কেউ একটা উড়ো খবর এনে দিলেই হল আর কি।"

মাতা সবিষাদে বলিলেন "আমরা মানব না বল্লে কি হবে বাবা তারা কি আর বিয়ে হওয়া মেয়ের বিয়ে দেবে? গাঁয়ের ও কি কারু একথা জানতে বাকি থাকবে, এরই মধ্যে কত লোকে শুনে ওদের বাড়ী হাট বসিয়ে দেবার জোগাড় করেছে। পিসিটা কিন্তু আচ্ছা হাবা গোবা যা হোক। বরের কোন পরিচয় কিচ্ছুই জানে না বলেছে নাকি। ছেলে আছে না নেই, কোন্ দেশে তাদের ঘর, শ্বশুর কি দাদাশ্বশুরেরই বা কোন্ পরিচয়, কিচ্ছু না। কেবল বলেছে "ও মেয়ের বিয়ে দেয় না যেন তার খুড়ো খুড়ি, বলে দিও। ওর ছোটবেলাই বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে।"

"এই অনুগ্রহ তাকে কে করতে বলেছিল? কি গরজ ছিল তার? এ মাগীরই বা এত মাথাব্যথা কিসের ছিল যে এতকাল পরে তীর্থ করতে গিয়ে এই খবর জানতে গিয়েছিল সে বাহাত্তুরে মাগীর কাছে?"

"নিজের মেয়ে জামাইয়ের ঘাড়ে একটা তের চোদ্দ বছরের মেয়ের বিষম ভার রয়েছে, এতকাল পরে তাঁদের নিজেদের সন্তান হয়ে ওকে যে এখন ভার বলেই লাগে মেয়ে জামাইয়ের তাতো মাগী জানে। তাই বুঝি সাত সম্পর্কে বেহানকে দুকথা শোনাতে গিয়ে এই খবর আদায় করে এসেছেন। আর তাও বলি বাছা এ বিধিরই সংযোগ নৈলে ও পিসি মাসীর কথা ইনি কোন জানতেনই না শুনলাম। কেমন যে ধর্ম্মের কল, সে যে বাসায় থাকে ইনিও গিয়ে সেইখানে যাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। তারপরে পরিচয়ে পরিচয়ে এই কাণ্ডটি ঘটে উঠল।"

"ধর্ম্মের কল না কচু! বিয়ে হলে বাপে কখনো রতন কাকাকে বলে যেত না? নিশ্চয় বিয়ে হয়নি। দুই বাহাত্তুরে মাগীতে মিলে আচ্ছা কাণ্ড ঘটিয়ে তুল্লে যাহোক্।"

মাতা সনিশ্বাসে বলিলেন—"বাপ্ মিত্তিরেরও বোধহয় মতিভ্রম ঘটেছিল নৈলে এমন করে ভাইয়ের মেয়ের ভবিষ্যতে এ মেয়েকে যে বিয়ে করবে তার শুদ্ধ জাত মারার ফন্দী করে যায়? যাক্ বাছা ধর্ম্মই রক্ষা করেছেন সবাইকে। নে তুই এখন খেতে—"

"আমি এখনি যাব রতন বোসের বাড়ী, দেখি কি প্রমাণে সে—"

"যা করতে হয় কাল করো বাছা, আজ যদি তুমি এমনি করে কোলের ভাত রেখে উঠে যাও তাহলে আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব—তবু চুপ্ ক'রে বসে রইলি? খাবি কি না?"

মায়ের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া পুত্র কোনরূপে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দু'চার গ্রাস অন্ন তাহাতে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। হাত মুখ ধুইয়া আবার সে পিঁড়ার একপাশে একটা খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল দেখিয়া মাতা ধীরে ধীরে বলিলেন "আমি রতন বোসের শাশুড়ীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে কিছু বাকি রাখিনি। সে আসল কথা আর বেশী কিছু বলতে না পারলেও অমলার যে বিয়ে হয়েছিল একথা এমন জোরের সঙ্গে বলছে যে তা ঠেলতে গেলে সমাজে একঘরে হতে হবে। সবাইই তার একথা বিশ্বাস করছে দেখলাম। তুই যদি এ নিয়ে বেশী তর্ক করতে যাস্ ফল কিছুই হবে না। কেবল নিন্দেই করবে তোকে।"

পুত্র এইবার বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল—"করুক লোকে আমায় নিন্দে তাতে আমার বয়ে যাবে। সমাজ একঘরে করবে করুক তবু আমি ওর কথা মানব না।"

"না মেনে কি করবি? ওদের মেয়ে বিয়ে না দিলে আমাদের জোর কি? আর সমাজে আমার নাপিত পুরুত বন্ধ হবে, মলে কেউ ফেলবে না অছরাদে হয়ে থাকব এই কি তুই চাস্? এ তো পরের কথা, বিয়েই দেবে না আর মেয়েটার খুড়ো খুড়ি দেখে নিস্।"

রমেন আবার ধীরে ধীরে খুঁটির গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল।

—०—

দুঃখের সুখ.

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ]

সরবস্ব দিয়ে কেমন করিয়ে
পূর্ণকাম করে দাও ?
ওগো এক সাথে হাসাতে কাঁদাতে
কোথায় শিখেছ কও ?

(নিতি) কেন মোর হৃদি দ্বার রুধি ডাকা,
আঁখি চেপে মোরে কেন পরশিয়া থাকা,
(এই) সতী শব সাথ হে জীবন নাথ
কি তীর্থ রচিতে যাও ?
স্নিগ্ধ অমলে তব নীল জলে
অরুণ আমার আঁখি !
নিখিল তোমায় জুড়াইয়া যায়,
(ওগো) আমি বাকি আমি বাকি।
(এ যে) বাছু নাহি তার বুকে তুমি পিয়া,
এত সুখ দেছ এত দুখ দিয়া !
এমন কৃতার্থ জনেরে বঞ্চিয়া
দয়াল হয়েছ নাকি ?

মোরে অশ্রু করি আঁখি পাতে ধরি
সজল সৃজন তোর ;—
(বুঝি এ) দুখিনী সৃজিয়া তোর সুখে পিয়া
নাহি ওর নাহি ওর ?
যদি'গো অবুঝ অবলা না হয়
প্রেম দিয়া নাহি সুখ উপজয়,
তাই বুঝি তুমি অনন্তের স্বামী
তাই কিছু নাহি মোর।

(তুমিও)　লীলায় আপন　　কর তুলাদান
　　ওগো ও সরবত্যাগী ;
　সবার অধিক　　বঞ্চিত তুমি
　　কার লাগি কার লাগি ?

(তাই)　শ্যাম মর্ম্মর উষার শোভায়
　নিবিড়েরি গীত মুরছিয়া রয়,
　রসের ভাণ্ডার করেছ উজাড়
　　কার প্রাণ-দান মাগি ?
(তাই)　মোর দুখে কালো　　যমুনারি জল
　　তোমারি বংশীধাম
　কুল লাজ ত্যাগে　　তাই কাণে জাগে
　　ও মধুর তব নাম।
　শূন্য আমার নিজে উঠে ভরি
　ব্যথা যে পরাণ চন্দন　মরি,
　পথের কণ্টকে　　দামিনী ঝলকে
　　মিলায় ব্রজের শ্যাম।

———

২৫শে মে ১৯১৯ তারিখে আন্দামানে লিখিত।

ভাবনার কথা

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি, এ]

(আত্ম-পরীক্ষার কথা)

আমরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়াছি যে একথার আর সন্দেহ নাই। আমরা বুঝিয়াছি যে জানিতে হইবে; গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া নূতন পথে চলিতে হইবে; কথা না বলিয়া কাজ করিতে হইবে। আমাদের দোষ কোথায়, দুর্ব্বলতা কিসে তাহা ধরিতে পারিয়াছি। বুঝিয়াছি যে আমাদের অন্ন সংস্থান করিয়া দেহে বল ও স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। অর্থ-বৃদ্ধি করিয়া দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইবে; শিক্ষাবিস্তার করিয়া অজ্ঞান নাশ করিতে হইবে। বুঝিয়াছি যে কৃষি বাণিজ্যেই অর্থাগম, চাকুরীতে নয়; বুঝিয়াছি যে সমাজ সংস্কার করিয়া উর্দ্ধগতির পথের বাধা দূর করিতে হইবে; বুঝিয়াছি যে সস্তায় জনশিক্ষা চালাইতে হইবে; বুঝিয়াছি খাদ্যদ্রব্য জন্মাইয়া অন্নাভাব দূর করিতে হইবে; ইহাও বুঝিয়াছি যে পল্লীজীবন পুনরুদ্ধার করিয়া জাতীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিতে হইবে। আরও বুঝিয়াছি যে চরিত্র গঠন করিয়া, স্বার্থত্যাগ করিয়া নিষ্কাম সেবার দ্বারা স্বায়ত্ত অধিকার লাভ করিতে হইবে;— অজস্র লেখায়, বক্তৃতায়, আলোচনায় পরিচয় দিতেছি যে অভাব বুঝিয়াছি। অভাব ইচ্ছাশক্তির; অভাব কাজ করিবার শক্তির ও কৌশলের। অর্থাৎ আসলে অভাব। ঘরে আগুন লাগিয়াছে বুঝিয়াছি, কেননা দেখিতেছি। বুঝিয়াছি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইবে; পথও দেখিতে পাইতেছি। অভাব কেবল শক্তিতে। জড়তা ছাড়িয়া পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পলাইতে।

অথচ পারিতেছি না ঠিক্ ওইটা। কেন? আমরা কি তবে ভণ্ড দল? ভণ্ডামি ন্যাকামি করিতেছি? কালের গতিকে ফ্যাশান অনুসারে লিখিতেছি, বলিতেছি; চেঁচাইতেছি? মনে হয় তা নয়। ভণ্ডামি নয়। কারণ অন্য রকম কিছু। জাতের ধাত ইহার কারণ। জাতীয় সাইকলজির মূলে ইহার দোষ।

মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির তিনটা বৃত্তি; একটা বৃত্তি দিয়া সে বিষয় বোধ করে, দ্বিতীয়টা দিয়া সে ইহা উহা ভেদাভেদ করিয়া বিচার করে; তৃতীয়টা দিয়া পন্থা ঠিক করতঃ ইচ্ছা বলে কাজ করে; বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া সে নিজেকে তদুপযোগী করিয়া টেঁক্‌সই করিয়া লয় এই তিন বৃত্তির সাহায্যে। ব্যষ্টি জীব যা করে সমষ্টি-জীবও (জাতি) তাই করে। কেননা ব্যষ্টির সংঘই হইল সমষ্টি। ব্যক্তির যেমন একটা সাইকলজি আছে জাতিরও তেমনি প্রকৃতিগত সাইকলজি আছে। আমাদের এই জাতীয় সাইকলজিটা একটু বিশ্লেষণ করিলেই আমরা আমাদের অক্ষমতার হেতু খুঁজিয়া পাইব।

ব্যক্তির মধ্যেই আমরা দেখি সে নিজের কষ্ট বা অভাব বেশ বুঝিতেছে; প্রতীকারের পন্থাও ঠাহর করিতে পারিতেছে অথচ মনের অভ্যাসগত দুর্ব্বলতার জন্য পুরাণ দুষ্ট পন্থা ছাড়িতে পারিতেছে না। একটা চল্‌তি পথ ছাড়িয়া নূতন অচলা পথে চলিতে গেলে একটু অনিশ্চয়তার ভয় আছে; নূতন পথে চলাতে কষ্ট ও ক্ষতি কিছু সহ্য করিতে হইবে; এই কষ্ট ও ক্ষতিটুকু আমরা গা পাতিয়া লইতে ভয় করি। প্রত্যেকেই মনে করি, 'অমুক আগে করুক'; অমুক পথ দেখাক্'। ক্ষতি বা কষ্ট তার উপর দিয়া যাক্। আমি নিরাময় সুস্থ থাকি। কেহ যদি এই ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করিয়া নূতন পথে চলার সদ্দৃষ্টান্ত দেখায় আমরা তাহাকে সম্মান করি, প্রশংসা করি, নীতিপুস্তকে তার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি; পাঁচজনকে অনুকরণ করাইতে উদ্দীপিত করি, কিন্তু নিজে তা করি না। এটা অত্যন্ত

অপ্রিয় সত্য। বিদ্যাসাগর অপমান সহিতে না পারিয়া পাঁচশ টাকার চাকরী হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; ওলাউঠা রোগীকে বুকে করিয়া বাড়ী আনিয়া সেবা করিয়াছিলেন; এ সব দৃষ্টান্ত আমরা খুব তারিফ্ করি; ইহাতেই যে মনুষ্যত্ব দেবত্ব তা লেখায় ও কথায় প্রমাণ করি কিন্তু নিজে জুতা খাইয়াও বিশ টাকার চাকুরী ছাড়িতে পারি না, বাড়ীর পাশে অসহায় কেহ মরিলে খোঁজ করি না কেন? এ সব কাজের মাধুর্য্য মহত্ত্ব স্বীকার করি না বলিয়া নয়, এ সব করিবার মত ত্যাগশক্তি ভিতরে নাই বলিয়া। এ সব কাজ করিলে যে গৌরব বা যশঃ বা আত্মপ্রসাদ বা পুণ্য তার তুলনায় কার্য্যফলগত ক্ষতি বা কষ্টটুকু বড় করিয়া দেখি বলিয়া।

মনে জাগিতেছে 'ভয়'। ক্ষতির ভয়, কষ্টের ভয়। এই ভয়টুকু আমাদের মজ্জাগত। লেখায় ও বক্তৃতায় দেশের অভাব অভিযোগ লইয়া 'হায়' 'হায়' করা, পন্থা নির্দ্দেশ করা; সহানুভূতি জানানো; এ সবের একটা intellectual pleasure আছে, বিনা খরচায় সেই সুখটা পাওয়া যায়, সেই গৌরবের অম্লমধুর রসটার আস্বাদ পাওয়া যায়, এই নেশাটা খুব প্রবলভাবে আমাদের মধ্যে রাজ করিতেছে।

আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতাই এ রোগের মূল। শরীরের এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য সুখের অভাব হইলে আমরা কাতর হইয়া পড়ি, কাজেই যে পথে শরীরে দুঃখ পাইব সে পথে আমরা যাইতে চাহি না। আবার মজা কর, নিজে যাইব না, কিন্তু পরকে যাইতে উপদেশ দিব। আমি একজন সংস্কৃতজ্ঞ উপাধীধারী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের কথা জানি। তিনি ইংরাজী শিক্ষা সংস্কারের খুব বিরোধী, জাতির স্বধর্ম্ম ত্যাগ নিন্দা করিয়া তিনি খুব বাক্যব্যয় করিতেন; চাকুরীকে নিন্দা করিয়া কত কথা বলিতেন, কিন্তু তিনি নিজ পুত্রকে কলেজে পড়াইয়া চাকরীতে ঢোকাইয়া দেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'বাপুহে টুলো বিদ্যেতে পয়সাও নেই, মানও নেই'! এমনি অধিকাংশই! সদাগরি আফিসে এক মাহিনাজীবী চাকুরে পর-গোলামির নিন্দা করিয়া দেশের জমিজমা লইয়া চাষবাস করিতে এক উমেদারকে পরামর্শ দেন! এই পথে যে, সুখ শান্তি, অর্থ ও মান বেশী তাহাও বুঝাইয়া দেন। উমেদার কি বুঝিল জানি না। কিন্তু উক্ত চাকুরেটীর দেশে যে জমী জমা আছে তাহা লইয়া তিনি নিজে যদি স্বকথিত পন্থায় থাকিতেন তাহা হইলে মাসমাহিনার চার গুণ রোজগার করিতে পারিতে! অথচ তিনি তা করেন নাই! তিনি যে নিজের মতকে বিশ্বাস করেন না তা নয়; কেবল কষ্ট ও ক্ষতির ভয়ে। চাষবাস করিয়া পল্লীতে স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনে একটু দৈহিক শ্রম আছে; বিলাসিতা সে পথের অন্তরায়।

পাশের চেয়ে চাষের পথে আশা যে বেশী এ কথা স্কুলের ছেলেরাও প্রবন্ধে লিখিতেছে; কিন্তু, কার্য্যতঃ সে পথে নিজেরা যাব না। এখনো পাশের নেশা খুবই প্রবল।

অল্প মূলধনে ছোটোখাটো ব্যবসা ফাঁদিয়া, খাটিয়া খুটিয়া ধীর গতিতে অবস্থা ভাল করা যায়, তার কার্য্যকরী নানা পন্থা আছে; কিন্তু আমরা কজন এ পথে যাইতেছি বা ছেলেপুলেদের যাইতে দিতেছি? এ পথে অত্যন্ত পরিশ্রম; মিতব্যয়ী, কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ না হইলে এ পথে পরাজয় অনিবার্য্য! আমরা এই কষ্ট সহ্য করিতে রাজী নই।

সমাজ সংস্কারেও দেখি অনেক দূষ্য আচার অনুষ্ঠান আছে যাহা আমরা পছন্দ করি না; মন তাহাদের মানিতে অরাজী। যাহাদের কুফল পদে পদে দেখিতেছি, পরিণাম ভাবিয়া শিহরিতেছি! অথচ নিজেরা সাহস করিয়া সে পথে পা দিতেছি না, পরকে সে কাজে উৎসাহ দি, পরামর্শ দি, করিতে দেখিলে প্রশংসা করি, অথচ নিজেরা পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। নিতান্ত যেখানে কাজ বাধ্য হইয়াই করি, প্রতিকূল অবস্থা ঘাড় ধরিয়া করাইয়া লয়। লোকাপবাদের ভয়, একঘরে হবার ভয়! কেন ভয়—না এতে যে ক্ষতি আছে—কষ্ট আছে। মন বুঝিয়াছে ঠিক্ কিন্তু করিতে চায় না—ওই ক্ষতি ও কষ্টের ভয়ে।

আমাদের জাতের মনটা এখন দুনৌকায় পা দিয়াছে।

বাধাকে ভয় করা ও বাধার কাছে মাথা নত করার এই যে প্রবৃত্তিটা এটা আমাদের পুরুষানুক্রমিক বংশের ধারা ধরিয়া চলার ফল ; আর বাধার বিরুদ্ধে এই যে বুদ্ধির বিদ্রোহ এটা মনের স্বোপার্জ্জিত প্রবৃত্তি (acquired)। উন্নত শিক্ষা ও সংস্কারের ফলে আমরা বুঝিয়াছি যে এ গুলা মিথ্যা ; বুঝিয়াও ছাড়িতে পারিতেছি না এটা হইল বহু জন্মের সঞ্চিত কুসংস্কারের ভয় অর্থাৎ 'কর্ত্তার ভূতের' ভয়ে ! যাঁহারা অসাধারণ তাঁহারা এই চলনশীল নৌকাতেই দুটা পা তুলিয়া দিয়াছেন। সাধারণ জনবর্গের হাজার করা ৯৯৯ জন আমরা দুনৌকাতেই পা দিয়া রহিয়াছি। আমাদের এটা ইতস্ততঃ অবস্থা এখন। বেশীক্ষণ দুনৌকায় দুইটা পা রাখিলে যে ইতঃ ও ততঃ দুই হইতেই ভ্রষ্ট হইব তাও বুঝিতেছি ; অথচ পারিতেছি না নাড়িতে নড়িতে !

অনেকক্ষণ পা মুড়িয়া বসিয়া থাকিলে যেমন পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধরে, আমাদের জাতীয় অধমাঙ্গেও তেমনি বহু শতাব্দীর আড়ষ্ট উপবেশনে এই অসাড়তা আসিয়াছে। উত্তমাঙ্গ বুঝিতেছে আর বলিতেছে—"ওঠ, চল, নড়ে ফিরে বেড়াও পায়ে সাড় আসবে ; প্লাবনের জল উঠছে, কাছে এসেছে ছুটে পালাও প্রাণ বাঁচাও—" তবু অঙ্গ নাড়িতে পারিতেছি না ! সম্মুখে বিপদ্ দেখিয়াও নড়িতে পারিতেছি না এ ভণ্ডামি নয়—দুর্ব্বলতা ! আয়াস ভোগ করিবার স্বার্থপর-হীন ইচ্ছা !

আমাদের আত্মাদর খুবই আছে ষোলো আনা—আত্মশক্তি এক কড়ারও নাই ! কথায় ও কাজে যে আমরা সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারিতেছি না তাহা একের অতি প্রাচুর্য্য ও অপরের অত্যাভাব বশতঃই ! আমরা ভণ্ড বিটুকেল যে তা নই ! তবে এ রকম মিথ্যাচার যদি ভণ্ডামি হয় তবে অবশ্যই আমরা ভণ্ড।

এই ইচ্ছা ও চেষ্টা শক্তির অভাবের মূলে আমাদের মনের দুর্ব্বলতা ; আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অযথা বিকাশ হইয়াছে যাহাকে বলে willing বা volition অর্থাৎ কার্য্যকরী বৃত্তি সেটা তেমন পুষ্ট হয় নাই ! এর জন্য দায়ী আমাদের জ্ঞানের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, বলের অভাব। দেহে বল স্বাস্থ্য আসিলে চিত্ত মন তেজীয়ান্ হইবেই। অবশ্য এটা যে পুরা সত্য নহে তাও বলিয়া রাখি। অনেকেই আছেন দিব্য দেহ, দিব্য স্বাস্থ্য প্রচুর বল ; কিন্তু তেজের দিক দিয়া খুবই হীন। মনের তেজের মূলে এই জন্যে জ্ঞান বিস্তার দরকার। কেতাবী জ্ঞানের কথা বলিতেছি না, আত্মার স্বভাব জানিয়া যে স্বপ্রত্যয় আসে তাহারই নাম জ্ঞান। আমার এই ক্ষুদ্র সচেতন 'আমিটুকু' যে (potentially) পারগভাবে অসীম শক্তিশালী ও ইচ্ছাবলী এই জ্ঞান আসিলেই মনে তেজ আসে। তবে দেহের সঙ্গে মনের কতকটা যোগ আছে বলিয়াই শরীরে স্বাস্থ্য ও বলের দরকার। চোখেই তো নিত্য দেখিতেছি—সদ্বংশজাত গুণবান বিদ্বান অর্থাভাবে সংসার-আসরে খুব সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন ! ভোগ সর্ব্বস্ব সংসারে তাঁর মনের তেজ দেখাইতে পারেন না ; আবার হীনবংশজাত মূর্খ নির্গুণ অর্থবলে ও শক্তিবলে তেজে মট্ মট্ করিতেছে ! যা খুসী তাই করিতেছে !

ব্যক্তির পক্ষে যা সত্য জাতির পক্ষেও তাই ! কত নির্গুণ অর্দ্ধ সভ্য গুণ্ডা জাতি ঐশ্বর্য্যের ও ভোগের প্রসাদে তেজে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে ; আবার কত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে উৎকৃষ্ট, যথার্থ সভ্য, গুণী জ্ঞানী জাতির বংশধরেরা কেবল ঐশ্বর্য্য ও ভোগের অভাবে মুখটী বুজিয়া হীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে !

এই জন্যই বলিতেছি যে মনের যে পাশব বলটা সমস্ত সাংসারিক উন্নতির মূলে সেই বলের সঞ্চয় আগে দরকার। অন্নই সমস্ত শক্তির মূল ; নচিকেতাকে তার ঋষি পিতা পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়া দেন, যে আধ্যাত্মিক বলিয়া যা কিছু তাও আধিভৌতিকের উপরে ! আগে অন্ন তার পর সব।

অন্ন অনুগ্রহে দেহে বল ও স্বাস্থ্য আসিবে ; মনে ক্রমশঃ তেজের সঞ্চার হইবে। তেজ আসিলে যা ভাল বুঝিব তাই করিতে পারিব। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা অর্থাৎ জ্ঞান সঞ্চয় চাই ; পাশব বলের চেয়ে নৈতিক বল ১০গুন কার্য্যকরী। আত্ম-প্রত্যয়ের জ্ঞান (self knowledge) এই পাশব বলকে পুটপাক শোধিত করিয়া নৈতিক বলে দাঁড় করাইবে নচেৎ পাশব বল বৃথা ! পাশব বল পাহাড় ভাঙ্গিতে পারিবে, নদী

ডিঙাইতে পারিবে; কিন্তু ভয়ের বা কুসংস্কারের কুটাটী ও নাড়িয়া ফেলিতে পারিবেনা! এখানে চাই নৈতিক বল। বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বলিতেন "The moral is to the physical force as Ten to One—"! গায়ের জোর একগুন, কিন্তু মনের জোর দশগুন তেজে কাজ করে।

বহু শতাব্দীর সঞ্চিত এই ভয়, বাধা ও কুসংস্কারের শাসনকে জয় করিয়া বীরতেজে আত্মোদ্ধার পথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রয়োজন মনের তেজ-নৈতিক বল। বুঝিয়াছি ইহা ভাল, উহা ভাল, এপথে গতি, ও পথে মুক্তি এই উপায়ে আত্মরক্ষা; অথচ বুঝিয়াও কিছু করিতে পারিতেছিনা এর চেয়ে নিজেদের মাথা-হেঁটকরা লজ্জা আর কি হইতে পারে?

লোক লজ্জার ভয়ে আমরা অনেক কাজই করিতে চাই না; অথচ অন্তরে অন্তরে বুঝি ও বিশ্বাস করি এই সব কাজই আগে কর্ত্তব্য! মহাপুরুষরা লোকলজ্জা লোকনিন্দা প্রকাশ্য ভাবে অগ্রাহ্য করিয়া মহত্ব ও অসাধারণত্ব দেখান। আমরা সাধারণ রাম শ্যাম জাতীয় হইলেও যেটা ভাল বুঝিতেছি সেটা পারিনা কেন? পাঁচ জনের সহানুভূতি, সুনজর বা সু-মত হারাইব বলিয়া। এক সময় ছিল যখন এক একটা কাজ কর্ত্তব্য ও করণীয় হইলেও, একজন মাত্র লোক সেটা বুঝিয়াছিলেন ও করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। রাজা রাম মোহন রায়ের ধর্ম্মসংস্কার বা মহাত্মা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলন কাজ এই ধরনের। ইঁহারা ছিলেন একক, অসহায়, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ছিল লক্ষ কোটীর রক্ত নয়ন ও বদ্ধমুষ্টী। এখানে সংস্কারকের অনন্য সাধারণত্ব তাঁহাদের বাঁচাইয়াছিল। কিন্তু আজকাল এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে অনেকেরই একমত, এক ধারণা ও এক বিশ্বাস! দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক্ বিধবা বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ বা বরের বাপকে পণ না দিয়া কন্যাকে কুমারী রাখা এসব কাজে এখন অসংখ্য লোকের মধ্যেই একমতত্ব আছে। অথচ ইঁহারাই এককভাবে আপনা হইতে একাজ করিতে রাজী নহেন। দুর্ব্বল মন লোক নিন্দার ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়।

এরূপ ক্ষেত্রে এক উপায় আছে। একটা কথা আছে "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"; দেশের যাঁহারা শিক্ষিত ও সু-সংস্কৃত; মনে মনে যাঁহারা ইচ্ছুক liberal ভাবে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কাজ করেন অথচ এক-ঘরে হইবার ভয়ে বা পোষকতা লাভের শংকায় অগ্রসর হন না তাঁহারা যদি নিজেদের মধ্যে একটী সংঘ, বা দল বা সম্প্রদায় গড়েন এবং নিজেদের মধ্যে নিজ নিজ বিশ্বাসমতকে কাজে চালাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে কাজ ভাল হয় না কি? এই দল হিন্দু সমাজের গণ্ডি হইতে বাহির হইবেনা; এখন আর হইবার কারণও নাই। বিরাট উদার হিন্দু ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যেই অসংখ্য দল, উপদল, সম্প্রদায় রহিয়াছে সমাজও অসংখ্য, সমাজ ভেদে আচার ভেদ; নিজ নিজ মত ও বিশ্বাসানুসারে সংঘ ধর্ম্ম পালন করিয়া চলিলে কে কাহাকে একঘরে করিবে বা ভয় দেখাইবে? ধনী বা উচ্চপদস্থ শক্তিশালী লোকে নিজের পয়সা প্রতিপত্তির জোরে স্বমতানুযায়ী কাজ করেন; কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারে না, জাতে ছোট করিতে ভরসা করেনা। কেবল যা ভয় পয়সা প্রতিপত্তি হীন যাঁহারা। আমি উন্নত সংস্কারশীল হইলেও ৩০।৪০ টাকার স্কুলমাষ্টার বা একশো টাকা আয়ের মোক্তার বলিয়া কোনো কাজ করিতে সাহসী হইনা। লোকের আঙুল দেখানোর ভয়েই তো? আমি কচি বিধবা মেয়ের বিবাহ দিলে লোকে আর বাড়ীতে পাত পাতিবেনা; আমার বাড়ীতে ছেলে মেয়ের বিবাহ দিবেনা—এই ভয়ই আমার প্রধান।

বেশ কথা:—যদি দেখি আমার দলে আর পাঁচশো লোক আছেন, তাঁরা আমারই মত নব্য সংস্কার পন্থী। আমরা নিজেদের মধ্যে ছেলে মেয়ের বিবাহ দিব; খাওয়া দাওয়া, বসা, আলাপ আপ্যায়িত আমাদের মধ্যেই হইবে—তখন আর ভয় কি?

যাহারা ভয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছে অথচ ইচ্ছা, আগাইয়া আসে তাহারা আমাদের দলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভরসা করিয়া অগ্রগামী হইয়া দলে যোগ দিবে। এইরূপ কল্পনা করিয়া, এই মনের জোরেই একদল স্বাধীনচেতা নির্ভীক কর্ম্মী মহাপুরুষ হিন্দু সমাজ হইতে সংযোগ ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া গিয়া ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ও মতের স্থাপন করেন।

হিন্দু সমাজের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিয়া বৈদেশিক ভাবে নবদল ও নবমত গঠন করিয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছিলেন তাহা আজ এতকাল পরে সুবিচার করিয়া বলা কঠিন। তবে ইহা ঠিক যে বিরোধী শক্তির প্রতিকূলতাতেই নব্য মতকে স্বতন্ত্র ভাবে সরিয়া পড়িতে হয়।

আজ আর হিন্দু সমাজের সে দিন সে অবস্থা নাই। যে অনাচার স্লেচ্ছেরও অকার্য্য তাহাও করিয়া আমরা হিন্দু বলিয়া আদরে থাকিতেছি। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ধনীর বিধবাকন্যার বিবাহে মত দিয়া ও বাটীতে পংক্তি ভোজন করিয়াও ন্যায়রত্ন, বিদ্যাভূষণ, তর্কশিরোমণি ও স্মৃতিরত্নের দল বেশ নিরঙ্কুশভাবে গোঁড়ামী রক্ষা করিয়া প্রভুত্ব করিতেছেন। যেটা লোভে পড়িয়া স্বার্থের খাতিরে করিয়াছেন, সেইটা সরল বিশ্বাসের বলে সবার বেলায় মঞ্জুর করিলেই গোল চুকিয়া যায়। যাক্ সে কথা।

সমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মণের সুশিক্ষিত সুসংস্কার পূর্ণ উদার মতাবলম্বী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অধিনেতৃত্বে নব সম্প্রদায় গঠন অসম্ভব নহে। সংস্কারের এই সহজ ও সুগম পন্থা। এইরূপ ভাবে এইরূপ সমাজের আশ্রয়ে থাকিয়া কাজ করিলে জনসাধারণের মনে সাহস ও সান্ত্বনা সঞ্চারিত হইবে।

কঃ পন্থা বুঝিয়াছি, বুঝিয়া চলিতে পারিতেছি না, শক্তি ও সাহসের অভাবে। প্রবর্ত্তিত নবপথের কষ্ট সহিবার মনের তেজ ও বলের উদ্বোধন দরকার হইয়াছে! জাগিয়াছি, সব জাগিয়া উঠিয়া কাজ করিবার ইচ্ছাও হইয়াছে—সে বল নাই; ভয়। কর্ত্তার ভূতের ভয়! দেশের যাঁরা স্বভাব অধিকারে নেতৃস্থানীয় শাস্ত্রের অধিকারী ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা এই ইচ্ছাকে বাধা মুক্ত করুন, ইচ্ছাকে চেষ্টাতে পরিণত করিয়া দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধি করুন—এই আমাদের বিনতি।

— —o— —

হিমালয়

শ্রীশরদিন্দুনাথ রায় বি, এ]

হিমালয়, হিমালয়—শুনছি সে তো আজকে নয়,
সুদূর বাল্য কল্পনাতে ছিলে তুমি স্বপ্নময়!
কোনও দিনই ছিলে না ত তুমি চেতন শূন্য শীলা,
তোমার বিরাট বুকের স্নেহে বালা উমার পুণ্য লীলা,
মেনকার সে মাতৃহিয়া ঝরত তাহে যে অমিয়া,
আজ্ও হিন্দু গায় সে গীতি নয়নে তার অশ্রু বয়।

তুমিই যে গো কলুষহরা গঙ্গামায়ের জন্মদাতা,
ভারত বাসীর প্রাণে চির অমর তোমার পুণ্য গাথা,
গৌরী তোমার পুণ্য বলে কঠোর আরাধনার ফলে
করলে ভোলা মহেশ্বরের সে নির্ব্বিকার চিত্তজয়।

তোমার পায়ে দক্ষালয়ে সতীর পতি-প্রেমের ছবি,
আজ্‌ও হিন্দু নারীর বুকে জ্বল্‌ছে যেন উজল রবি,
বইছ শিরে শ্রীকৈলাসে গৌরীহরের কাম্য বাসে
কন্যারূপে জগন্মাতা ভক্তি গুণে বিকিয়ে রয়।

দম্ভ ভরা দক্ষরাজা দেখ্‌লে অজমুণ্ড তার,
যোগী হরের কোপানলে মদন হ'ল ভস্মসার,
ঋষির তপোবন সে তুমি অপ্সরাদের বিহার ভূমি
স্বর্গে মর্ত্তে মিলন যে গো এমন ভাগ্য কারবা হয় ?

পাণ্ডবেরা তোমার পথে হ'য়েছিলেন স্বর্গগামী
তাই অমরার বার্ত্তা হেথা বইছে বায়ু দিবস যামী,
রুগ্ন দেহে অবশ প্রাণে যে জন আসে তোমার স্থানে
স্বরগ সুধা বিন্দু দানে ঘুচাও শোক দুঃখ ভয়।

কান্তাহারা যক্ষ কেঁদে তোমার ধ্যানে কাটল দিন,
গাইল সে বিরহের গাথা কালিদাসের অমর বীণ,
হিন্দু যে গো প্রাণে প্রাণে তোমায় বড় আপন জানে
তোমার স্মৃতি, তোমার প্রীতি বইছে নিতি তার হৃদয়।

—•—

জাবেয়ার শাস্তি

[শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ]

যদি আমি খুব সুন্দরী হইতাম, তাহা হইলে রাজপুত্রের ...হিত আমার বিবাহ হইত। রাজপুত্র কত আদর করিত। ...তই না সোহাগে থাকিতাম, তাহার পর রাজরাণী ...তাম। যদি আমি আমার মনের মত, আমার তৃপ্তিমত ...ন্দরী হইতে পারিতাম! আমার ন্যায় অসুন্দরীর নারী-জন্মই বৃথা—জঙ্গল হইতে কাষ্ঠের এক বোঝা মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে জাবেয়া এইরূপ ভাবিতেছিল। মধ্যে মধ্যে এইরূপ চিন্তা জাবেয়াকে আক্রমণ করিত। জাবেয়া দরিদ্র পিতামাতার কন্যা। যৌবনের আগমন তাহার অঙ্গমাত্রে ঘোষণা করিতে

আপন্ন করিয়াছে। রূপের পিপাসা নরনারী মাত্রেরই স্বাভাবিক—জাবেয়ারও তাই। একদিকে জাবেয়া যেমন নিজের রূপের অভাব বিবেচনা করে, অপর দিকে রূপের জন্য প্রবল পিপাসাও তাহাকে তখনি পীড়ন করে। নিজে অসুন্দরী, নিজের ইচ্ছার মত সৌন্দর্য্য নিজের নাই এইজন্য [illegible] নিজকে কতবার ধিক্কার দিয়াছে, নিজের প্রতি [illegible] অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কতবার এই অভাবের জ্ঞান তাহাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে, কত শান্তিহীন দিন সুখহীন [illegible] আনিয়াছে।

জনহীন পথে জাবেয়া মাত্র একা যাইতেছিল। [illegible] রৌদ্রের তাপ ক্রমেই প্রখর হইতেছিল। [illegible] পথের দুইদিকে বালুকাপূর্ণ মাঠ হইতে যেন [illegible] হইতেছিল। লোক চলাচল ক্রমেই দুঃসাধ্য [illegible]। অভ্যস্ত জাবেয়া আপন চিন্তায় নিবিষ্ট [illegible] যাইতেছিল।

[illegible] একস্থানে একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের নীচে একটী ক্ষুদ্র ইঁদারা ছিল। জাবেয়ার দৃষ্টি সেদিক পানে [illegible] সে দেখিল এই বৃক্ষতলে ইঁদারার গায়ে ঠেস [illegible] এক 'মেপাসা' বসিয়া আছেন। সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ, অতিশয় দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে সে দেশে 'মেপাসা' বলা হইত। জাবেয়া যখন মেপাসার [illegible] নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন মেপাসা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কুমারী! তোমার পরিচ্ছদ [illegible] দেখিয়া তোমাকে কুমারী বলিয়াই বোধ হইতেছে—আমি পিপাসায় বড় কাতর। আমার সঙ্গে পাত্র আছে, কিন্তু জল তুলিবার কোন জিনিষ নাই। তোমার কাছে বাঁধা রজ্জুটি কি একবার দিবে?" জাবেয়া মহাপুরুষের যথাবিহিত অভিবাদন ও সম্মান করিয়া রজ্জুটি [illegible] দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেপাসা উহার সাহায্যে জল তুলিয়া পান করিয়া প্রীত হইয়া জাবেয়াকে রজ্জুটি ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার অনুগ্রহে আমি বড় [illegible] উপকৃত হইয়াছি। উপকার করিলে প্রত্যুপকার করিতে হয়। তুমি কি কিছু চাও?—তোমার কি কিছু অভীষ্ট আছে?" জাবেয়া নিরুত্তর দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, "তোমাকে স্ফূর্ত্তিহীন ও ম্রিয়মান দেখাইতেছে—যেন তোমার মনে কোন কষ্ট বা চিন্তা আছে। তোমার কি কোন অভাব বা বাসনা আছে? কোন বর চাও?"

জাবেয়া উত্তর করিল,—"যদি দয়া পরবশ হইয়া দিতে স্বীকৃত হন তবে চাই।"

মেপাসা। কি, বল।

জাবেয়া। আমি আমার মনের মত, যতদূর, যেরূপ সুন্দরী হইতে ইচ্ছা করি সেইরূপ সুন্দরীই যেন হইতে পারি।

মাপেসা ইহা শুনিয়া একটু চিন্তা করিলেন, তাহার পর করুণ ও ব্যথিত নেত্রে জাবেয়ার দিকে চাহিয়া একটু স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"এই বর ছাড়া, তোমার চাহিবার কি অন্য বর নাই?"

জাবেয়া মস্তক অবনত করিয়া বলিল,—"না।"

মেপাসা ইহা শুনিয়া বলিবেন, "তবে তাহাই হইবে।"

মেপাসা উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। জাবেয়াও রজ্জু দিয়া কাঠ বন্ধন করিয়া তুলিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। একবার ফিরিয়া দেখিল, মহাপুরুষ অদৃশ্য হইয়াছেন।

জাবেয়া বড়ই আনন্দে পথ চলিতে লাগিল। নানারূপ আনন্দ চিন্তা আসিয়া তাহার মনকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। সে ভাবিল নারীজীবনের যাহা প্রধান কাম্যধন, তাহা তাহার হস্তগত হইতে চলিল। সে ধন লাভ করিলে সংসারে নারীর পক্ষে কোন সুখ, কোন সোহাগ, কোন ঐশ্বর্য্যের অভাব থাকে না, মহাপুরুষের কৃপায় তাহাই তাহার পাইবার ক্ষমতা হইয়াছে। আনন্দের একটা প্রচণ্ড, দমকা ঝড় তাহার মস্তিষ্কে উত্থিত হইয়া যেন সমস্ত বিবেচনা, চিন্তা এবং জ্ঞানকে উড়াইয়া লইয়া গেল। জাবেয়া ভাবিল, মহাপুরুষের বরে, রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হওয়ার কোনই অন্তরায় রহিল না। সেই মহাপুরুষকে সে মনে মনে কতই ধন্যবাদ দিল। নিজের ইচ্ছার মত সুন্দরী হইতে পারিবার ক্ষমতা—ইহা কি সামান্য কথা! জাবেয়া নিজের স্বপনেই নিজে বিভোর হইয়া কয়েকদিন ধরিয়া থাকিল এবং বারবার সেই মহাপুরুষকে ধন্যবাদ দিতে থাকিল।

জাবেয়ার মনের সেই তীব্র ঝটিকা কাটিয়া গিয়া এখন এক প্রশান্ত ভাব আসিয়াছে।

জাবেয়া ভাবিল আর কালবিলম্ব করি কেন? মাপেসার সেই বরকে এখন কার্য্যে পরিণত করি।

কিন্তু জাবেয়ার প্রথম চিন্তা হইল, কিরূপ সুন্দর হইব? কেমন হইলে ঠিক সুন্দর হইতে পারি? কিরূপ সৌন্দর্য্যটা বাঞ্ছনীয়? কিপ্রকার সৌন্দর্য্যটা হইলে মনের মতনটা হয়? কি রকম সুন্দর হই?

এ চিন্তা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। চিন্তার আশার একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ক্রমেই এক বৃহৎ সমস্যায় পরিণত হইয়া জাবেয়ার মনকে তিমিরাচ্ছন্ন করিল। কিরূপ সুন্দর হইতে হইবে—কিরূপ সৌন্দর্য্যটা চাই? যদি সুন্দরী হইতে হয়, তবে যথার্থ সুন্দরী, শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, শ্রেষ্ঠ সুন্দরই হইতে হইবে। কিন্তু কি হইলে তাহা হয়?

এই চিন্তার ঘোর কুজ্ঝটিকার মধ্য হইতে জাবেয়া যেন একটু আলো দেখিল—সিদ্ধান্ত করিল, একবার আমাদের এই গ্রাম পর্য্যটন করিয়া দেখি, কে কেমন সুন্দরী, কাহার মত সুন্দর হওয়া যায়।

জাবেয়ার এই প্রথম গ্রাম পর্য্যটন। ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটি সুন্দরী দেখিল একটু পছন্দ হইল, একটু হইল না, ভাবিল আর একটি দেখি। দেখিল একটু পছন্দ হইল না, একটু হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথমটি নামঞ্জুর হইল। তাহার পর আর একটি দেখিল। একবারে সন্তুষ্ট হইল না, কিন্তু দ্বিতীয়টি পরিত্যক্ত হইল। তাহার পর আর একটি। এই প্রকারে এক একটি করিয়া গ্রামের সকল সুন্দরীকেই দেখিল, সমস্ত সৌন্দর্য্য ফুরাইল,—পরিতৃপ্ত হইল না, সন্তুষ্ট হইল না। তাহার পর ভাবিল, না এ গ্রামে হইল না। আমাদের সেই বিপুল নগরে যাই। সেখানে রাজকন্যা, উজীর কন্যা, ধনীর কন্যা প্রভৃতি অনেক আছে—তাহাদের জন্য শুনিয়াছি পুরুষেরা উন্মত্ত হয়। নগরে গিয়া তাহাদিগকে দেখি। কাহার মত হইব, নগর না হইলে স্থির করা যাইবে না।

জাবেয়া নগরে আসিল। নারীর প্রতি তাহার উন্মনা তৃষিত দৃষ্টি দেখিয়া নগরবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অনেকেই তাহাকে অনেক রকম ভাবিয়াছিল। কেহ কেহ জাবেয়াকে উন্মাদিনী বলিয়াও বিবেচনা করিয়াছিল। সৌন্দর্য্যের চিন্তা ও পিপাসা তাহাকে এতই অভিভূত করিয়াছিল, যে তাহার বাহ্যজ্ঞান বাস্তবিকই যেন একটু লোপ পাইতে লাগিয়াছিল।

কিছুদিন ধরিয়া নগরে থাকিয়া, সমস্ত সম্ভব উপায় অবলম্বন করিয়া, চাষা, গৃহস্থ, ধনী, নির্ধন, রাজা, উজীর প্রভৃতি, যাহার ঘরে, যেখানে, যে সুন্দরী ছিল, জাবেয়া সকলকেই দেখিল। ফল একই হইল—জাবেয়ার [illegible] কাহাকেও ভাল লাগিল না, সে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। বরং এক একবার ভাবিয়াছিল, ইহারা কেমন কি সুন্দরী? ইহাদেরই জন্য পুরুষেরা পাগল হয়? আমাকে [illegible] সকলের অপেক্ষা সুন্দরী হইতে হইবে—এমনই হইতে হইবে, যেমন ইহাদের মধ্যে কেহই নয়। কিন্তু কেমন হইলে তেমন হওয়া যায়?

চিন্তার বেগ ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। জাবেয়ার বুকের ভিতর যেন একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। [illegible] কার্য্যটা অগ্রেই প্রয়োজন, তাহাতেও বিলম্ব,—এ বিলম্বেরই বা শেষ কখন হইবে? আচ্ছা, অন্য নগরে যাইয়া দেখি, তাহা হইলে হইবে—জাবেয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া অন্য নগরে গমন করিল।

কিন্তু কি? ফলত একই হইল। জাবেয়া ভাবিল, যাহা দেখিলাম, তাহা আর তেমন কি? ইহাদের মত হইয়া কি হইবে? অন্য নগরে যাইয়া দেখি। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে জাবেয়ার মনের আন্দোলন এবং যন্ত্রণা বাড়িয়া চলিল। এক অব্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া সে যেন ছটফট করিতে লাগিল। এ হতাশ নয় আশা নয়, জয় নয় পরাজয় নয়, এ এক অবস্থা।

দীর্ঘকাল ব্যাপী বহু পরিশ্রমে পর্য্যটনের দ্বারা জাবেয়া মানব রাজ্যের সকল নগরই দেখিয়াছে, কিন্তু কৈ?

পছন্দ করিতে পারে এমনত কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিল না। এক একটি করিয়া সকলের কথাই ভাবিল, কিন্তু সকলেই পরিত্যজ্য মনে হইল। তবে এখন কি করে? জাবেয়ার মন বড় অস্থির হইয়া পড়িল। যদি একটা পছন্দ না করে, নিজে কিরূপ হইবে, কিরূপ হইলে তাহার মনের মত হয়, এসকল বিষয় যদি না স্থির করিতে পারে, মাপেসা প্রদত্ত বর পাওয়া না পাওয়া একই কথা। যাহাদিগকে দেখিয়াছে তাহাদের মত হইলে আর পার্থক্য, নূতনত্ব, বিশেষত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব হইল কোথায়? নূতন, তাঁহার ঠিক মনের মতন হইতে হইবে—কিন্তু সেটা কেমন? না বুঝিয়া সুঝিয়া একটা হইয়া পড়িলেত হইবে না—কারণ সে একবার ইচ্ছা করিয়া পছন্দ করিয়া যেমনটি হইবে, ঠিক তেমনটিই থাকিয়া যাইবে—আর পরিবর্ত্তন চলিবে না। তাই—তাই ভাবিয়া চিন্তিয়াই একেবারে মনের মত হইতে হইবে। কিন্তু সেটি কেমন?

জাবেয়ার মনে বড়ই অশান্তি আসিয়া পড়িল। একটা স্থির করা হইতেছে না। কি মুস্কিল! কি যন্ত্রণা! কি বিরক্তি! কি হইবে? একটা কিছুত হইতেই হইবে, কিন্তু সেটা কি, সেটা কি, সেটা কি? বড়ই বিড়ম্বনা ত! নগর যতগুলি ছিল, সবই ত দেখা হইল, কিন্তু?

জাবেয়ার মন যেমন উদ্বিগ্ন, বিরামহীন, দেহও তেমনি শ্রান্ত। কতই পর্য্যটন করিয়াছে, কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছে, কতই চিন্তা করিয়াছে। আর কত করিবে। কিন্তু তবু হইয়াও হইতে পারিল না। চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানহীন—সে এখন কোথায়, তাহাও জানিত না।

চিন্তায় উন্মাদিনী জাবেয়া এখন ভাবিল, যতদূর দেখিবার দেখিয়াছি। কাহাকেও ত তেমন মনে হইল না। দেখিবারত আর বাকি নাই, ঘোরাও নিষ্প্রয়োজন। এক কাজ করি। যাহার যাহা ভাল দেখিয়াছি, তাহার তাহাই লইয়া মনে মনে একটা একটা তৈয়ার করিয়া দেখি কেমন হয়। চুল কাহার মত? বর্ণ, চোখ, ভ্রু ইত্যাদি কোনটা কাহার মত লইব?

এক এক জনার এক একটা লইয়া দেখে, তাহার সেটা অপেক্ষা অন্তের সেটা ভাল।—এও হইল না। একটি অঙ্গের একটা কথা পর্য্যন্ত স্থির হইল না। বহু চেষ্টায়, দম বন্ধ করিয়া বসিলেও হয়—এক একটি অবয়ব লইয়া একটা তৈয়ারি করিল বটে, কিন্তু দেখিল, মিল হয় নাই, এবং তাহার মনের মত ত একেবারেই হয় নাই। হইল না—পারিল না। কি মুস্কিল! কি যন্ত্রণা! কি প্রমাদ! সে কি হইবে? কি রকম হইলে ঠিক তাহার পছন্দ মত হয়? হায়, কি করিয়া ঠিক করিবে? এ যে এক ভয়ানক অতি তীব্র যন্ত্রণা! স্থির ত কিছুই হইল না।

চিন্তায় ও উদ্বেগে জাবেয়া প্রায় উন্মাদিনী হইয়াছে। তাহার আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম কোথায় চলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্যহীন গতিতে, কোথায় কোন দিকে যাইতেছে, জানে না। কোথায় গৃহ, কোথায় কে তাহার কোন চিন্তাই নাই। সুন্দরী হইবার ইচ্ছার সুখ অপেক্ষা "কেমন হইব" এই চিন্তার অসহ্য যন্ত্রণা তাহার মনের অনিশ্চয়তা তাহাকে উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়াছে। একবার ভাবে, হায়, যদি কেহ তাহাকে সাহায্য করিত। আবার ভাবে তাহা হইলেই কি সে তার মনের মত সুন্দরী হইতে পারিত। না অন্যের মনের মত হইত? অন্যের মনের মত হইলে কি নিজের তৃপ্তি হয়? ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই চিন্তা, কি হইবে? কেমন হইবে? কেমন হইলে মনের মত হইবে? তাহার মনে আবার সেই তীব্র ঝড়, সেই নিদারুণ যন্ত্রণা। প্রত্যেকটি চিন্তা যেন এক একটি বৃশ্চিক দংশন।

একটু শান্ত হইল, চিন্তার বেগ একটু থামিল। জাবেয়া ভাবিল, দেখিবার ত অনেক দেখিয়াছি। আর দেখিয়া কি হইবে? এইবার যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্ত বাদ দিয়া নিজের মনে মনেই একটা তৈয়ার করিয়া দেখি। নিজের পছন্দ মত একটা সৃজন করিয়া দেখি—খুব ভাল, অতি সুন্দর, এত সুন্দর যে তেমন পৃথিবীতে আর কেহ দেখে নাই, কেহ শুনে নাই। এমন একটি তৈয়ার করি, যে তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গ অপূর্ব্ব, অতীব চিত্তবিমোহন, পরম সৃষ্টি হয়। এমন একটি যে সমস্ত জগত সেই দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া কামনা করিতে পারে। এমন একটি যে আমার মনের, আমার ইচ্ছার কানায় কানায় মিল হয়—এমন একটি যে সেইরূপ হইলে আমার কামনা

সম্পূর্ণরূপ সফল ও পরিতৃপ্ত হয়, এবং তাহার পর আর কিছু হইবার ইচ্ছা না হয়। অনন্ত তৃপ্তি পাই—এমন একটি। কিন্তু যেমন এযাবৎ দেখিয়াছি, কোন অংশেই, কোন বিষয়েই তেমন নয়।

লক্ষ্যহীন গতিতে এইরূপ সৌন্দর্য্য কল্পনায় এক বিপুল প্রয়াস বহন করিয়া জাবেয়া চলিতে লাগিল। দিশাহারা, চৈতন্যহারা, লক্ষ্যহারা জাবেয়া মনে মনে একটা গড়িল—ঠিক হইল না,—ভাঙ্গিল। আবার গড়িল—আবার ভাঙ্গিল।—আবার, আবার, আবার গড়িতেই লাগিল, ভাঙ্গিতেই লাগিল। বারের পর বার—গড়া থামিল না, ভাঙ্গা থামিল না কি প্রমাদ! একটিও যে তেমন হয় না। তবে সে কেমন হইবে?

জাবেয়া অস্থির হইয়া পড়িল। কি করে? এ যে এক দারুণ যন্ত্রণা? দিন গিয়াছে, মাস গিয়াছে, বৎসর গিয়াছে। তাহার পর্য্যটন, ক্লেশ, দুঃশ্চিন্তার অবধি নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হইল না যে, সে কেমন হইবে। এবং স্থির করিবার উপায়ই বা কি? সে কোন উপায়ই ত অনবলম্বিত রাখে নাই। কিন্তু এখনও যে কিছুই হইল না। মাপেসার প্রদত্ত বরের ন্যায় বর কয়জনের ভাগ্যে জুটে। জাবেয়া তাহা পাইয়াছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এখনও স্থির হইল না কিরূপ সুন্দরী সে হইবে।

জাবেয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, জনহীন পথে, লক্ষ্যহীন গতিতে চলিতেছিল। তাহার কেশ আলুলায়িত, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু দুইটি শূন্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। বেশভূষা আলু থালু হইয়া গিয়াছে, শরীর শ্রীহীন ও কৃশ ন্যায় গমনশীলা—কোন পথে, কোন স্থানে রহিয়াছে জানে না। চলিতেছে এবং ভাবিতেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, দিবা, রাত্রি, মেঘ রৌদ্র, কিছুরই জ্ঞান নাই।

চিন্তা ও উদ্বেগের যন্ত্রণা এখন চরম সীমায় উঠিয়াছে—আর সহ্য হয় না। তাহার বুক ও মস্তিষ্ক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। জাবেয়ার মনে কেবলই হইতে লাগিল, "কি প্রমাদ! কি মুস্কিল! কি করি।"

আর পথ চলিতেপারিল না। এক বৃক্ষছায়ায় বসিয়া পড়িল—বোধ হইল যেন তাহারই গৃহের পথ। তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল—নিদ্রার পূর্ণ আবেগ। জাবেয়া অমনি ঢলিয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে নিদ্রার আবেক ছুটিল। জাবেয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়াই দেখিল—সেই মাপেসা? অমনি উঠিয়া হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে জাবেয়া বলিল "আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আপনার সে বরের পরিবর্ত্তে আমাকে এই বর দিন, যেন আমি যাহা হইয়াছি তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া একটু শান্তি পাই। আর কিছু চাই না।"

মাপেসা উত্তর করিলেন, "তাহাই হউক।"

জাবেয়া বলিল, "আর, পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাহার নিকট সমর্পিত হই, তাহাকে যেন এই সৌন্দর্য্য লইয়াই ভাল বাসিতে মতি হয়!"

মাপেসা, "তাহাই হউক। আমি ত পূর্ব্বেই সে বর দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। তুমি বুঝিতে পার নাই।" মাপেসা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

নিদ্রোত্থিতের ন্যায়, ধীর পদে, আনম্র, সলজ্জ নয়নে জাবেয়া পিতামাতার গৃহাভিমুখে চলিল।

—o—

"ওঠ"

[শ্রীঅমূল্য কুমার ভাদুড়ী বি, এ]

বাজিয়া উঠেছে দামামার ধ্বনি ঝঞ্ঝনী বাজে অস্ত্রে,
সূর্য্য কিরণ রুদ্ধ আজিকে গগন বদ্ধ শস্ত্রে,
ঘোষে নির্ঘোষ পাঞ্চজন্যে শঙ্কা-বিজয়ী শঙ্খ ;
ওঠ ওঠ বীর ত্যাজি ধরণীর সুপ্তি জড়ান অঙ্ক ;

কর্ম্মের এই শুভ আবাহনে ধর্ম্ম দিয়াছে সাড়া,
তুমি দুর্ব্বল বসিয়া নীরব বাজিছে নাকাড়া কাড়া,
গরজি ডাকিছে শত্রু সংঘ ভঙ্গ কি দেওয়া সাজে ?
শূর দলে মুখ দেখাইবে পুনঃ বল কাল কোন লাজে ?

গুরু গরীয়ান, মহা মহীয়ান, হীন হ'তে হীনতম,
সকলেই আজ মত্ত আহবে কোথা কেবা তোমা সম ?
ওখানে রাধেয় বিদ্রুপ হাসি অই হেসে চলে যায়
হেলাইয়া ভুরু দোলাইয়া উরু হাসে 'কুরুকুল হায় ;

হোথায় ক্ষুব্ধ কুরু পিতামহ চিত্ত বিকার হেরি'
হোথা আচার্য্য প্রবোধি' তোমায় বাজায়-আশীষ ভেরি ;
অই হোথা দেখ নারায়ণী সেনা কতরে মরণ মাগে,
বিধাতার বিধি লঙ্ঘিছ কেন অজ্ঞান, হীন রাগে ?

কেবা আপনার কেবা কার পর কর্ম্ম করিছে কেবা ?
মূঢ় অহঙ্কার বোঝে নাক নর, এযে মিথ্যার সেবা ?
সকল কর্ম্ম দাও মোরে দাও বাড়ায়ে দিয়েছি পাণি
সকল পুণ্য—সব কল্যান আত্মীয় জনে হানি ;

অই পাশুপাত মর্ম্মের দুঃখে গুমরে তোমারি তূণে,
অই শোন বীর টঙ্কার ঘোষে শত্রুর ধনু গুনে ;
ওঠ ওঠ বীব দূব কর আর যত কিছু মিছে জপ
সৃষ্টির লাগি ধ্বংসের লীলা ওঠ গো পরন্তপ।

নিম্ন শিক্ষার কথা

[শ্রীশশিকান্ত সেন]

সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে দেশে অল্পাধিক আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু যেখানে শিক্ষার গোড়া পত্তন সেই শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে হৈ চৈ তো দূরের কথা, একটা হুঁ হাঁ পর্য্যন্ত শুনা যায় না। বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে এবং যে সময়ে শিশু বালকেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি কতটা হইতেছে, তদ্দ্বারা শিশুরা কতটা লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহার তুলনামূলক আলোচনা কেহই করিতেছেন না। যে শিক্ষা যুবকদিগকে উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী করিয়া দেয়, সেই নিম্নশিক্ষা সম্বন্ধে সকলেই একরূপ নীরব কেন? অবশ্য সর্ব্বসাধারণের জন্য নিম্নশিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার আন্দোলন একটু আধটু হইতেছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক শিক্ষা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। মানুষের উন্নতির জন্য শিক্ষা যদি আবশ্যক হয়, এবং স্বাস্থ্য যদি অত্যাবশ্যক হয়, আর এই দুইয়ের মধ্যে যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, এ কথা যদি কেহ অস্বীকার না করেন, তাহা হইলে, শিক্ষার গোড়া পত্তন যেখানে, সেই নিম্নশিক্ষা বর্ত্তমানে এ দেশে সর্ব্বত্র যে প্রণালীতে চলিতেছে অবিলম্বে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না?

নিম্ন শিক্ষার কথা অবহেলা করিয়া উচ্চ শিক্ষার আন্দোলন করা, এ যেন গোড়া কাটিয়া মাথায় জল দেওয়া, এ যেন ভিত্তি দৃঢ় না করিয়া সমুচ্চ ইমারত তুলিবার মূর্খতা। আমাদের ছাত্রেরা যে জীবনীশক্তি হারাইতেছে, যৌবন প্রারম্ভেই স্বাস্থ্য হীন হইয়া পড়িতেছে প্রচলিত নিম্নশিক্ষা পদ্ধতি তাহার জন্য কতটা দায়ী তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এ দেশে শিশুরা সকালে বিকালে পাঠশালায় লেখা পড়া করিত, আর দুপ্রহরে যখন রবিকর প্রখর হইত তখন তাহারা গৃহকোনে, গাছের ছায়ায় খেলা করিয়া বেড়াইত, ভাই বোনে কোন্দল করিয়া কখন হাসিত, কখন কাঁদিত, কখন পুকুরে সাঁতার কাটিত, গাছে উঠিয়া ফল পাড়িত, পাড়ায় ঘুরিয়া নানারূপে দুরন্তপনা করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। আর সেই সময় সূর্য্যের কিরণমালা প্রচণ্ড প্রতাপে জল শুকাইত, ফল পাকাইত, পৃথিবী পোড়াইত, কিন্তু ঐ সকল নবনীত কোমল বালকদেহে তাহার প্রভাব ব্যর্থ হইত। এখন পাঠশালার কার্য্যাদিও ১০—৪টায় সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষকেরা নিজ নিজ কাজের জন্য কিঞ্চিৎ সময় বাঁচাইতে পারিতেছেন বটে, কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্যের অত্যধিক ক্ষতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন আর কেহ পাঠশালায় শিশুদের বড় একটা রাখিতে চাহেন না। কোনরূপে বর্ণজ্ঞান হইলেই অভিভাবকেরা শিশুদিগকে স্কুলে শিশু শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। চারিটা ভাত গিলিয়া তাহারা স্কুলে দৌড়ায়, সেখানে পৌঁছিয়াই লেখা পড়ার কাজ আরম্ভ করে রৌদ্রের উত্তাপও বাড়িতে থাকে, এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতে শিশুদের চোখের দীপ্তি ম্লান হইয়া আসে—শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে। যে ছাত্রেরা মনোযোগী তাহাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও বেশ একটু ঘুমের আবেশ হয়, অনেকেই ঝিমো ঝিমো করে; তবে "ধনঞ্জয়ের" কথা স্মরণ করিয়া আবার সতর্ক হইয়া উঠে, আবার কেহ বা একটু ঘুমাইয়াই লয়, কেহ বা ফাঁকি দিয়া বাহিরে যায়, এবং একটু খোলা বাতাসে ঘুরিয়া "তাজা" হইয়া ফিরিয়া আইসে। তারপর বিকালের দিকে বাহিরে যখন সূর্য্যোত্তাপ একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, তখন ছাত্রদের পেটের ভিতর ক্ষুধার অগ্নি একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে, ছুটীর পর তাহারা ক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে গৃহে "ফিরে আসে হয়ে আধমরা।"

অনেক স্কুলেই দুপ্রহরে বিশ্রামার্থে আধ ঘণ্টার ছুটীর বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু ইহাই আমি পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করি না। অল্প বয়স্ক বালকদের জন্য ও যদি সকালে বিকালে স্কুল করা অসুবিধা হয়, তবে প্রত্যেক ঘণ্টার পরই পাঁচ মিনিট করিয়া ছুটী থাকা একান্ত আবশ্যক, ইহাতে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে অবসাদ লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহা খানিকটা কাটিয়া যাইবে, মনও একটু প্রফুল্ল থাকিবে, কিন্তু বিশ্রামার্থ প্রদত্ত স্বল্প সময় টুকুতে শিক্ষার সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে স্থগিত রাখিতে হইবে, ইহার উপর কোনও শিক্ষকেরই কোনরূপ লোভ থাকিলে চলিবে না, ছেলেরা অবশ্য এই সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না ; বরং তাহারা দুরন্তপনাই করিবে তাহাই ভাল। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের এতটুকু সময় বৃথা না যায় এ নিমিত্ত কোন কোন শিক্ষককে বড়ই হুসিয়ার দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শিক্ষকেরা অলস হইলে যেমন ছাত্রদের শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, তেমন তাহারা ব্যস্তবাগীশ হইলেও সুফল পাওয়া যায় না। খাদ্যাদি গ্রহণ ও হজম করিবার শক্তির যেমন একটা সীমা আছে, বিদ্যা দান ও গ্রহণের শক্তিরও তেমনই মাত্রা আছে।

দশটায় আহার করিয়া স্কুলে আসিতে হয়, কাজেই চারিটায় স্কুল পরিত্যাগের পূর্ব্বেই ছেলেদের খুবই ক্ষুধা পায়। ছেলেরা স্কুলের পর যখন বাড়ী ফিরে, তখন তাহাদের কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু, মলিন মুখ, অবসন্ন দেহযষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিলে দুঃখ হয়। বালক বয়সে শরীর যখন বর্দ্ধিত ও গঠিত হইতে থাকে তখন এইরূপে ক্ষুধা সহিয়া থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর। বাজারে যে খাবার পাওয়া যায় তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য। অথচ স্কুলে জলখাবারের সংস্থান রাখা শতকরা নিরানব্বই জনেরই পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ইংলণ্ডেও এ সমস্যা আছে এবং ইহার প্রতিবিধান জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য কতকটা পাওয়া উচিত এ নিয়া সে দেশে আন্দোলনের কথাও শুনা গিয়াছে ; অবশ্য আমাদের দেশে এক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যের কথা তোলাই বাতুলের কাজ হইবে। অথচ আমাদের যুবকদের স্বাস্থ্য এত শীঘ্র খারাপ হইতেছে কেন, তাহার একটা উত্তর উহারই মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মনে করি, আমাদের দেশ শীতপ্রধান দেশ নয়—এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে। যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের কথা ভাবিতে গেলে, দশটা—চারিটায় স্কুল করা আমাদের দেশে অবিধেয় বলিতেই হইবে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে—আমরা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করি না, শিক্ষা গ্রহণ করি মাত্র। বাড়ীতে ছাত্রেরা যাহার যেমন সুযোগ ও আগ্রহ আছে সেই অনুপাতে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে দিনের নির্দ্দিষ্ট পাঠ পড়িয়া আসে। ছাত্রদের সেই অধীত পাঠ-তালিকা হইতে শিক্ষক দু'চারিটা প্রশ্ন করেন, ছাত্ররা যে যেরূপ পারে উত্তর করে। সেই উত্তর অনুসারে শিক্ষক অতি সাধারণ ভাবে কিছু কিছু উপদেশ দেন, দু' একটা কঠিন স্থান সরল করিয়া দেন। এই উপলক্ষে কোন কোন ছাত্র বেত্রাঘাত লাভ করে, কেহ কেহ যে উপদেশ লাভ করে, তাহা দু' কথায় বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, "লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই" আবার কোন কোন ছাত্রের যে কিছুই হইবে না তাহা বুঝিয়া শিক্ষক তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ক্লাশে ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থে যে উপদেশাদি দেন তাহা এত সাধারণ ভাবে করা হয় যে তদ্দারা ধীমান ছাত্রেরাই লাভবান হইতে পারে কিন্তু চলনসই ছাত্রদের বিশেষ কিছুই সুবিধা হয় না, অথচ এই শেষোক্ত ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। আর যাহারা খারাপ ছাত্র বলিয়া "সার্টিফিকেট" পাইয়াছে তাহারা মাহিনা দিয়া যে উপদেশ লাভ করে তাহা এই যে, তোমার পিতার অর্থের আর অপব্যবহার না করিয়া মুদি দোকানে এপ্রেণ্টিশ হও। অথচ এই যে শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান না করিয়া, শিক্ষা গ্রহণ করেন মাত্র, এজন্য তাহাদিগকে দোষ দিতে পারি না, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই আমাদিগকে এইরূপ করাইতেছে।

ছাত্রাবস্থায় যাহারা মেকী অথবা আধমেকী, অর্থাৎ স্কুলে যাহারা চলে না অথবা খানিকটা দূর চলে, কর্ম্মক্ষেত্রে, সাংসারিক জীবনে, ব্যবসায়ে, সামাজিক নানা কার্য্যে,

জমিদারী সেরেস্তায় তাহারা যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে, কাজেই ছাত্রাবস্থাতেই ইহাদের বুদ্ধির অভাব ছিল ইহা বলা চলে না, ইহাদের বুদ্ধি বৃত্তির মধ্যে কোথায়ও জড়তা ছিল, শিক্ষক যদি সেইটুকু অপসারিত করিতে পারিতেন তবে ছাত্রজীবনে যাহারা হতভাগ্য বলিয়া দুর্ণামের ভাগী হইয়াছিল এমন অনেকেই উৎরাইয়া যাইতে পারিত, ইহারা কেন বোঝে না, কি হেতু কোথায় এদের আটকাইয়া যায়, তাহা অনুসন্ধান করিয়া সেই স্থানে এদের জন্য দৈনিক একটা বিষয়ে ১০।১৫ মিনিট খাটিলে ক্রমশঃ ইহাদের প্রতিকূল অবস্থা দূর হইয়া যাইত না কি? কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে কোন বিশেষ ছাত্রের জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কোন শিক্ষকই দায়ী নহেন, অথচ এই দায়িত্ব গ্রহণ করা, ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাই এ স্বাভাবিক বিধানের উল্টা।

ছেলেটার জন্য একটু চেষ্টা যত্ন করিলে ইহার পড়াশুনা কিছু হইতে পারে অনেক অভিভাবক ইহা বুঝেন, অর্থব্যয় করিবার কোনরূপ সামর্থ্য থাকিলে এ কার্য্যে তাহারা বিরত হন না সচরাচর যাঁহারা আছেন তাঁহারা কেহ কেহ Private tutor রাখেন, ইহাতে কিছু কিছু সুফলও পাওয়া যায়, তবে ইহার ফলও যে সকল সময় মঙ্গলজনক হয় তাহা নহে।

Private tutor রাখায় যে কি দোষ তাহার একটু আলোচনা এখানে করিতে পারি, যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল এমন অনেক পরিবারেই বড়মানুষের চাল হিসাবে ঝি, বামুন, চাকর, বাজার সরকার এবং একজন Private tutor চাই, এরা এক পর্য্যায় ভুক্ত। এদের আবশ্যক আছে—সম্মান নাই, আর Private tutor জানেন যে, Tuition এর টাকাটা তাহার ফাউ, অবশ্য এ টাকারও তাহার আবশ্যক আছে। তাহা না হইলে সে এ জন্য পরিশ্রম করিবে কেন? তাহার প্রধান কার্য্য ছাত্র বা শিক্ষকরূপে স্কুল বা কলেজে, কেরাণীরূপে আফিসে, আর কখন কখন বেকার রূপে মেসে থাকিয়া চাকরির উমেদারীতে, Tuition টা তাহার প্রধান কাজ নয়, একাজটা কাজেই কোনরূপে চলিলেই হইল, অথচ ফসকে না যায় এ দিকেই তাহাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, ১ ঘণ্টা ১।০ ঘণ্টা সময়ে ছাত্রকে স্কুলের ৪।৫টা বিষয়ের পড়া তৈরী করিয়া দিতেই হইবে। ছাত্রের কতটুকু ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে ভাবিবার তাহার সময় নাই; কাজেই তিনি তাড়াতাড়িতে ছাত্রকে শিক্ষা দিতে গিয়া যাহা করেন তাহাকে শিক্ষা দেওয়া বলে না—বলে, শিক্ষা গিলান! ছাত্রদের পক্ষে কোনটা সহজ কোনটা কঠিন এ বিবেচনা করিবার তাহার সময় নাই। আর ইহা তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়। ছেলের পড়া তৈরী করিয়া দিলেই হইল—যেন তেন প্রকারেন, কোন আপত্তি নাই। Tutor মহাশয় শব্দের মানে বলিয়া দেন, ইংরেজী হইতে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলা হইতে ইংরেজী করিয়া দেন, অঙ্ক কষিয়া দেন। Private tutor এর কল্যাণে ছাত্র তাহার দৈনিক পড়া একেবারে ready made প্রাপ্ত হয়। ইহাতে এই ছাত্রদের ক্লাশে একরূপ চলিয়া যায়, কিন্তু ইহার ফলে তাহার বুদ্ধি বৃত্তির যে কিরূপ হানি হয় সেইটা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? পড়িবার দুই একটা বিষয় অপেক্ষাকৃত কঠিন থাকে, এ গুলি প্রথম দৃষ্টিতে যতটা কঠিন বিবেচিত হয় বস্তুত ততটা কঠিন নয়, কাহারও নিকট অতি সহজে সাহায্য পাইবার আশা না থাকিলে ছাত্ররা নিজেরাই একটু ভাবিলে, একটু খাটিলে এগুলি আয়ত্ত করিতে পারে, এইরূপে পড়া আয়ত্ত করিতে গিয়া ছাত্ররা তাহাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটু একটু করিয়া মনঃসংযোগ করিতে থাকে ইহার ফলে এই লাভ হয় যে, বালকদের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য পাঠকালে আপনা হইতে কমিয়া আসে, এবং পড়িতে পড়িতে ছোট খাট বাধা অপসারিত করিতে পারায় তাহারা স্বাবলম্বনের আনন্দ লাভ করে, নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থাবান হইয়া উঠে, এবং পাঠ বিষয়ে আর একটা বাধা সামনে পড়িলে অন্যের নিকট তখনই সাহায্য লাভ করিতে না গিয়া নিজেরাই বহুবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি জন্মে, এইরূপে বাধা সরাইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টায় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। স্বীকার করি যে,

ছাত্রদের অনতিক্রম্য কতকগুলা বাধা থাকে, এরূপ স্থলে অবশ্যই তাহা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের সাহায্য পাইবে। তবে সকল সময়েই কতকগুলি অবাস্তব বা পারিপার্শ্বিক প্রশ্নোত্তর দ্বারা মূল বিষয়টী যাহাতে ছাত্রের নিকট সরল হইয়া আসে, সেই দিকেই শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

Private tutor এর প্রায় সমধর্ম্মী আর একটা উপসর্গ কলিকাতার স্কুল মহলে কয়েক বৎসর হইল দেখা দিয়াছে। ইহার নাম Coaching Class. সত্য মিথ্যা সম্যক রূপে করিয়া বলিতে পারি না, শুনিয়াছি এক দল ছাত্র আছে, এই Coaching Class এ ভর্ত্তি না হইলে তাহাদের পরীক্ষায় পাশ হইবার, উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইবার আর কোন উপায়ই থাকে না। কিন্তু ৩৪৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৮।১০৲ টাকা বেতন দিলে বাৎসরিক পরীক্ষায় কিরূপ প্রশ্ন হইবে, দৈবশক্তি অথবা অন্য কোন এক শক্তির প্রভাবে নাকি Coaching ক্লাশের ছাত্ররা তাহা "টের পায়"। এখানে প্রকাশ থাকে যে, এই Coaching class গুলি স্কুলের শিক্ষকদের দ্বারাই পরিচালিত, এবং Headmaster মহাশয়ের "সায়" প্রাপ্ত। সে যাহাই হউক, এখন জিজ্ঞাস্য এই—এই Private tutor এবং Coaching class, এই দুইটা "মন্দের" কোনটা "ভাল"? Coaching class এ ছাত্রদের অল্প টাকায় কাজ চলে। তবে সস্তার তিন অবস্থা নয় কি? শুনিয়াছি Coaching class এ মাহিয়ানার তারতম্য আছে এবং সেই অনুপাতে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের আদর যত্নেরও তারতম্য আছে। এবিষয়ের আলোচনায় আর বাহুল্যের আবশ্যক নাই। সংক্ষেপে বলা চলে যে এখানেও শিক্ষা গিলান হয়। তবে ছাত্র সংখ্যা বেশী বলিয়া হয়তঃ সে কাজটা আর একটু তাড়াতাড়ি হয়, একেত্রে গেলা তাহাতে তাড়াতাড়ি, ফল বদহজম। কাজেই Private tutor এবং Coaching ক্লাশের কল্যাণে যদি বা ছাত্র কোনরূপে একটু আধটু পড়া শুনা করিয়া ক্রমশঃ উপরের ক্লাশে উন্নীত হইতে থাকে, তথাপি একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে ইহাদের সাহায্যই ছাত্রের ধী-শক্তি বিকাশের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া পড়ে। এইরূপে অর্থব্যয় করিয়াও ছাত্র শ্রেয়ঃ লাভে বঞ্চিত হয়। আর একটা কথা অনেক Private tutor ছাত্র এবং অভিভাবকদের অপরিচিত; অজ্ঞাত কুলশীল লোকের হাতে শিশু ছাত্রের পড়ার ভার দেওয়া বিধেয় কি?

শিশুছাত্রদের Coaching class এ দেওয়া ঘোরতর অবিধেয় বলিয়া মনে করি। দশটা হইতে চারিটা ছেলেরা স্কুলে থাকে। সকালে বিকালেও যদি তাহারা সেই চেয়ার টেবিল সেই মাষ্টার বেত্র এবং রাঙ্গা চোক্ দেখিতে বাধ্য হয়, তবে তাহারা একটু ছাড়া পায় কখন? বিদ্যাশিক্ষার জন্য শিশু ছাত্রদের পাঁচঘণ্টার বেশী একটী মিনিটও ব্যয় করান পাপকার্য্য।

আজ কাল স্কুলে প্রত্যহ যাহাতে ছাত্রদের অধিক সংখ্যক exercise দেওয়া হয়, এবং সেই সকল exercise যাহাতে সংশোধন করিয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য শিক্ষকদের প্রতি কড়া হুকুম আছে। না হয় স্বীকার করিলাম যে স্কুলে ৫ ঘণ্টা ৫।০ ঘণ্টা একঘেয়ে খাটুনী খাটিয়া রাত্রে বা প্রভাতে অন্য কোন কাজ না করিয়া একজন শিক্ষক প্রত্যহ গড়ে একটা করিয়া ক্লাশের ৪০।৫০ খানা খাতা সংশোধন করিয়া দিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ছাত্রের পঠিতব্য বিষয় বুঝিতে কোথায়, কেন, কি ভাবে আটকায় তাহার সম্যক অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যেক ছাত্রের সহিত আলোচনা করিয়া এই সকল দোষ ত্রুটীর প্রতিকার করা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে সম্ভব কি?

মেকি এবং আধমেকি এই দুই রকম ছাত্রের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এ ছাড়া ক্লাশে যে সব ভাল ছাত্র থাকে তাহাদের অবস্থা কিরূপ? আমরা দেখিয়াছি নিম্ন শ্রেণীতে এই "ভাল" ছাত্রদের দুর্দ্দশা ও কম হয় না। নিম্ন শ্রেণীতে যাহা এক বৎসরের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে এই শ্রেণীর ছাত্রদের অনেকেই তাহা পাঁচ ছয় মাসে অতি সহজে শেষ করিতে পারে। কিন্তু ক্লাশের ব্যবস্থা তাহার স্বাভাবিক পক্ষে অনুকূল ত নহেই বরং প্রতিকূল। ক্লাশের সকলের যথা সম্ভব "তাল সামলাইয়া" তাহাকে চলিতে হয়। প্রত্যেক ক্লাশের উন্নতির একটা নির্দ্দিষ্ট পাল্লা বা সীমা আছে ক্ষমতা থাকিলেও সেই সীমা এই ছাত্রেরা লঙ্ঘন করিতে পারে না। কাজেই দৈনিক নির্দ্দিষ্ট সাধারণ পড়াটুকু বইয়ের উপর কয়েকবার চোখ বুলাইয়া তৈরী করিয়া ফেলে, তারপর

ক্লাসে আড্ডা সৃষ্টি করে, গল্প করে, বেশ আলস্য বিজড়িত চিত্তে "ঘণ্টা কাটাইতে" থাকে। অবশ্য তাহার এই সহজ প্রাপ্য আরামে বা বিশ্রামে আমার তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু যে সব ছাত্রদের ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই তাহাদের সহিত "মাত্রা রাখিয়া" চলিতে গিয়া এই শ্রেণীর তীক্ষ্ণ-ধী ছাত্রদের দ্রুত উন্মেষশীল মেধা স্বাভাবিক বিকাশে বাধা পায়, ফল এই হয় যে, সম্মুখে বাধা পায় বলিয়া তাহার ধী-শক্তির উন্নতি মন্দীভূত হইয়া আসে, তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়, যাহা শাণিত হইত তাহা ভোঁতা হইতে থাকে; নদীর গতি পথে কোথাও বাঁধ তুলিলে তাহার স্রোতবেগ ক্রমশঃ যেরূপ কমিয়া আইসে এবং বহু গ্রাম জনপদের কল্যাণ সাধন করিবার যে ক্ষমতা লইয়া সে ছুটিয়া ছিল, সে শক্তি যেরূপ হারাইতে থাকে, এ ক্ষেত্রেও ফল তেমনই হয়।

এই সকল ছাত্রদের কখন কখন double promotion দেওয়া হয়, আমি ইহার পক্ষপাতী নই, কারণ এক এক বৎসরের জন্য যে regular course আছে double promotion এ তাহা ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়, ইহাতে কাহারও কাহারও না হউক, অনেকের খুবই ক্ষতি হয়। নীচের ক্লাশে double promotion পাইয়া কোন কোন ছাত্রকে অনতিবিলম্বে "মাটি" হইতে নিজে দেখিয়াছি, অথচ তাহার ক্ষমতানুসারে সে সময়মত যেমন regular course টা শেষ করিল অমনি যদি সে উন্নততর course পড়িবার সুবিধা এবং অধিকার পায়, তবেই উহা তাহার পক্ষে মঙ্গলকর হয়।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল মধ্যের দিকে এবং তাহার উপরের দিকের ছাত্রদের সম্বন্ধে কি সেই সকল কথাই প্রযোজ্য নহে? আমি বলিব—না, কারণ জীবনের কিশোর বয়সের আরম্ভেই মানুষের চিন্তাশক্তি আপনা হইতে জাগ্রত হইয়া বিশ্বগ্রন্থের পাতায় পাতায় যে মাধুর্য্য যে বৈচিত্র্য তাহার রস গ্রহণে নিযুক্ত হয় এবং উহাতে যে জটিলতা, যে সমস্যা প্রকাশমান তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য কিশোরের বা যুবকের চিন্তা, বয়স অনুযায়ী যাহার যেরূপ ক্ষমতা—তদনুসারী। কিন্তু এই সময় হইতেই নানারূপে জাগ্রত চিন্তা ও ভাবনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি বিকাশলাভ করিতে থাকে, যাহার আগ্রহ আছে সে ক্লাশের বই ছাড়া "বাইরের বইও" পড়িতে আরম্ভ করে, নানাবিধ আলোচনায় যোগ দান করিতে থাকে, কিন্তু শিশু ও বালক চিত্তে আরও জানিবার আগ্রহের উত্তেজনা থাকিলেও তাহার মনন শক্তি তখনও জাগে নাই, ধারনা শক্তি তখনও দৃঢ় ও প্রখর হয় নাই, সর্ব্বোপরি তাহার মন তখনও অত্যন্ত চঞ্চল। এই সকল কারণে বালকেরা শিক্ষাকালে কোনরূপে অবহেলিত না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তবেই হইতেছে, আমাদের স্কুলে বর্ত্তমানে যে ক্লাশ বিভাগ আছে তাহার কল্যাণে আমরা তিনটী জিনিষ প্রাপ্ত হই:—প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে ছাত্ররই বাড়ীতে শিক্ষিত লোকের অভাবে অথবা অভিভাবকেরা অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকেন বলিয়া শিক্ষাকার্য্যে কাহারও সাহায্য পায় না। স্কুলে সাধারণতঃ ছাত্রেরা পড়া তৈরি করিয়া আসিয়াছে কিনা তাহাই দেখা হয়, অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণ করা হয়, ব্যক্তিগত ভাবে ছাত্রের আবশ্যকানুযায়ী শিক্ষা দান করা হয় না। তাহাদের পক্ষে স্কুলে প্রাপ্ত সাহায্য নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত। অথচ এইরূপ একটু সাহায্য পাইলে যে উৎরাইয়া যাইতে পারিত তাহাকেও বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তাড়াতাড়ি বিদ্বান করিয়া তুলিবার জন্য কতকগুলি ছাত্রকে দিয়া "গিলান" হয়। ইহা তাহাদের বুদ্ধিবিকাশের অন্তরায়। তৃতীয়তঃ অনেক ভাল ছাত্রের উন্নতির গতি মন্দীভূত হয়, ইহারা শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হয়।

শিশুদের বহুসংখ্যক বই পড়িতে হয়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করা কষ্টসাধ্য উহাতে বহু সময় বৃথা নষ্ট হয়—একথা কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত,—উহার প্রতিকারার্থে কি করিতেছি? যে বাঙ্গলা বইগুলি বালকেরা পড়িতেছে, সে গুলি কি?—নীরস নীতির বোঝা। শিশু ছাত্রেরা নীতিশাস্ত্র, বেতের ভয়ে, পরীক্ষার ভয়ে, এবং পুরস্কারের প্রলোভনে তোতা

পাখীর মত মুখস্থ করিয়া চলিয়াছে, ইহার ফলে তাহারা নীতিবিদ্ হইতে পারে, কিন্তু নীতিবান্ হইতেছে কি? বাঙ্গলার স্কুল পাঠ্য শিশু-সাহিত্যে এখনও কথামালা আখ্যানমঞ্জরী এবং সদ্ভাব শতক, পদ্যপাঠ ১ম ও ২য় ভাগের যুগ চলিয়াছে। এ যুগের গদ্য সাহিত্যের আদর্শ বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়েরা; ঈশ্বর গুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়েরা এখনও কবিতা যোগাইবার ভার বহন করিতেছেন, এখনও পদ্যসংগ্রহের পুস্তকে ইহাদের 'একচেটিয়া অধিকার' বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গলা দেশে ইহাদের লেখার দোষ দিতে পারে কে? শিশু-সাহিত্য হইতে ইহাদিগকে বর্জ্জন করিতে পারে কে? ইহাদের সুন্দর লেখায় যে সুনীতি, যে উপদেশ আছে তাহা মহামূল্য এবং শিক্ষাপ্রদ স্বীকার করি। কিন্তু ঐ উপদেশ ও নীতিবাক্যগুলি বড় উদ্ধত—আত্ম প্রকাশ করিবার জন্য যেন বড় ব্যস্ত। শিশুদের যে জীবনরস—আনন্দরস, উহাতে তাহা নাই বলিলেও চলে; যাহা বা আছে তাহা যেন বিশুষ্ক। জানি না আমাদের স্কুলপাঠ্যশিশু-সাহিত্যের মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৺উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়েরা আর কতকাল উপেক্ষিত থাকিবেন, যাঁহারা শিশুদের উপযোগী স্কুল পাঠ্য "সংগ্রহ পুস্তক" প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের নিকট নিবেদন এই যে, বই পড়িয়া পড়িবার আগ্রহ জাগ্রত হয়, এমন বিষয় তাঁহারা নির্ব্বাচন করিতে পারেন না কি? বিলাতী Text book গুলির প্রতি একবার তাঁহারা দৃষ্টি দিবেন।

ছাত্রেরা আমাকে খুব ভয় করিয়া চলে একথা অনেক শিক্ষককে সাহঙ্কারে বলিতে শুনিয়াছি, কিন্তু ইহা কি গৌরবের বিষয়? শিক্ষক মহাশয়েরা নখী, দন্তী, না শৃঙ্গী? তবে তাঁহাদেরও আয়ুধ আছে এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভয় করা এক এবং মান্য করা আর এক—দুইই সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহার কোনটা ভাল? শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার কোনটা প্রার্থনীয়? এই ভীতির ভাব ছাত্রকে আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান-শূন্য করিয়া তোলে। এই ভীতি বিনা কারণে, তাহাদের বিনা দোষে অনেক সময় অপরাধী বানাইয়া ছাড়ে; যে বিনা দোষে অপরাধ স্বীকার করে, বা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, সে ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বহীন হইতে থাকে। পরবর্ত্তী কালে কর্ম্মক্ষেত্রে এই ভীতির ভাব তাহাদিগকে কাপুরুষ করিয়া তোলে। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষককে প্রীতিভরে মান্য করিতে পারিলে ছাত্রদেরও আত্মসম্মান জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, আর ইহাতে ছাত্র মহলে উশৃঙ্খলতা বাড়িবে না। যাহারা পরকে সম্মান করিয়া চলে তাহারা উশৃঙ্খল হইবে কেন? তবে কোথাও যদি, কেবল অন্যায়ই ঘটিতে থাকে তবে একটা বিক্ষোভ—একটা ক্ষণিক বিক্ষোভ প্রাকৃতিক ব্যাপারে ঝড়ের মত হিতকর নহে কি? অনেক "বাঘা শিক্ষক" যে সব গোলমাল পাকাইয়া তোলেন, দুই একজন শিক্ষক যাঁহাকে ছাত্রেরা শ্রদ্ধাভক্তি করে, অতি সহজে দুই একটা মুখের কথায় তাহা মিটাইয়া ফেলেন—ইহা ত আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, আসল কথা এই যে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে দাস-সুলভ বশ্যতারই যেন আদর না করি। আমরা যেন মনে রাখি যে নির্ভীক মানুষ তৈরী করা শিক্ষকেরই কার্য্য—কর্ত্তব্য কার্য্য।

যে কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পাঠনা কালে ক্লাশে গেলে দেখা যাইবে ছাত্রেরা অবসাদ ভরে "জোন্ত-মরার" মত পড়িয়া আছে, এই অবসাদ বাঙ্গালী আজীবন বহন করে। শিক্ষার কারাগারে উৎপন্ন এই অবসাদ ও ভীতি লইয়া তাহারা সংসার কারাগারে এবং তথা হইতে চাকুরীর কারাগারে প্রবেশ করে। এই অবসাদ জীবনের আনন্দ ও উৎসাহ বিদূরীত করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে। যাহারা স্বাস্থ্যহীন উৎসাহ বিহীন তাহাদের চিন্তাশক্তি ক্ষীণ হয়, যাহাদের চিন্তাশক্তি ক্ষীণ তাহাদের আধ্যাত্ম জ্ঞান বিকৃত। শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে মানুষ বিদ্যা ও জ্ঞান আহরণ করিয়া শক্তিমান হইয়া বাহির হয়, আর আমরা এই পুণ্যক্ষেত্র হইতে শক্তিহীন হইয়া বাহির হই, তাহার অল্পও ভাল, কারণ তাহার প্রভাব মন্দেরই মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। আমরা তাই বলি, সুশিক্ষা অল্প দাও ক্ষতি নাই, শিক্ষার ভারে শিশুচিত্তে যেন অবসাদ না আসে। তাহারা যেন স্বাস্থ্যহারা না

হয়। সে কালে বেত্র প্রয়োগ বেশী হইত—স্বীকার করি, কিন্তু তবুও তখন ছাত্রদের স্বাধীনতা বুঝি বেশী ছিল, সে কালের মত এ কালে বোধ হয় সুশিক্ষক বেশী নাই। এখন অর্থাভাব বেশী বলিয়া এবং নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন অন্যায়রূপে অল্প বলিয়া ভাল বিচক্ষণ লোক শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতে চাহে না। এখন ইন্‌স্পেক্টরদের তাড়নার ভয়ে শিক্ষকেরা 'লেপাফা দুরস্ত' হইয়া কাজ করেন—বাহিরে সব ফিট্ ফাট্, কিন্তু ভিতরে নানারূপ গলদ থাকিয়া যায়। ছাত্র শিক্ষকের সম্বন্ধও সে কালের মত আছে কি? সে সময়কার ছাত্রদের যে সকল দুরন্ত পনার কথা শুনিতে পাই, এ কালে তাহা কেহ সহ্য করিবে না—না শিক্ষকেরা, না শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তারা। এ কথা শুনিতেছি যে কলিকাতার অনেক স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকেই ভয় করিয়া চলেন; কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় তাহার কিছু কিছু জানি। কলিকাতায় অনেকে স্কুল চালান ব্যবসা হিসাবে—অর্থোপার্জ্জনের জন্য। একটা মাষ্টার চলিয়া যাক, ২০৲ মাস-মাহিনার জন্য বহু গ্রাজুয়েট ছড়াছড়ী করিবে। কিন্তু একটা ছাত্র যেন স্কুল পরিত্যাগ করে না, ছাত্রেরা যে বিদ্যালয়ের অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র। এই যেখানে অবস্থা সেখানে গুরু শিষ্যের স্বাভাবিক অবস্থা বিকৃত হইবে না কেন?

বলিতে ছিলাম, শিশু ছাত্রেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই একটা অবসাদ ভাব বহন করিতে আরম্ভ করে, তাহার কারণ স্কুলের শিক্ষাদানের সময় নিরূপণে, স্কুল পাঠ্য শিশু সাহিত্য পুস্তক প্রণয়নে এবং নির্ব্বাচনে পাওয়া যাইবে।

স্কুল পাঠ্য বই লেখা এখন বাজারের ব্যবসা হইয়া উঠিয়াছে, বিজ্ঞাপন, সুপারিশ, খোষামোদ এবং ঘুষ চালাইতে পারিলে, বই যেমনই হউক না কেন—উহা পাঠ্য পুস্তক—হইবেই। আর ইহার দ্বারা অল্প পরিশ্রমে বেশ অর্থাগমও হইবে। এই সকল শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন এবং নির্ব্বাচন কালে কেহ শিশু চিত্তের প্রতি লক্ষ্য রাখেন বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের আর একটা অনবধানতার কথা বলি, ইংরেজী উচ্চারণ সাহেবদের মত বাঙ্গালী ছাত্র কিরূপে আয়ত্ত করিবে তাহার জন্য আন্দোলন হইতেছে—অথচ আমরা বাঙ্গলা পড়িতে জানি না। পাঠ ও আবৃত্তি, সুন্দর হস্তাক্ষর ইহাও যে শিক্ষা সাপেক্ষ এবং শিক্ষণীয় তাহা আমাদের মনেই হয় না। প্রথম শিক্ষার্থীর হস্তাক্ষর লেখার সময় শিক্ষক একটু যত্ন করিলে—কোন ছাত্রের হস্তাক্ষরই বিশ্রি হইতে পারে না—আমার এইরূপ বিশ্বাস। সুন্দর আবৃত্তি করিতে হাজারে একটা ছেলে পাবে না; সুন্দর করিয়া বই পড়িবার অভ্যাস ছাত্রদের হয় না। ইহার একমাত্র কারণ,—এদিকে আমাদের খেয়ালই নাই। কাহারও সম্মুখে কিছু পড়িতে আরম্ভ করিলেই আমরা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি; জিভের, ওষ্ঠের, তালুর জড়তা আরষ্টতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অথচ বর্ণমালার প্রত্যেকটী অক্ষরের উচ্চারণ স্থান লইয়া পূর্ব্ব পুরুষেরা কতনা চিন্তা করিয়াছিলেন। 'গালভরা হাসি' একটা কথা আছে। শব্দের উচ্চারণ ও গাল ভরিয়া মুখ ভরিয়া করিতে হয়। যথা স্থানে জোড় না দিলেই উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়। বাঙ্গলা ভাষার ও যে নিজস্ব হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদ আছে, সে কথাও আমরা ভাবি না অথচ পাঠ ও আবৃত্তি বিষয়টী শিশুশিক্ষারই অঙ্গীভূত হওয়ার যে আবশ্যক তাহা আমাদের মনেও জাগিতেছে না—অথচ বাঙ্গালীর বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী শিশুর সাহেবী কেতা দুরস্ত উচ্চারণ কিরূপে হইবে তজ্জন্য বেতন দিয়া মেম রাখা হইতেছে, ইংরেজী উচ্চারণ আমাদের ভাল হউক, ইহা চাই বই কি? কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর কথা ভুলিয়া যাই কিরূপে? কোন মোহে? কি পাপে?

আমরা এতদিন বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলাম অর্থোপার্জ্জনের জন্য, কিন্তু চাকুরী যখন দুর্ঘট হইল এবং দেখা গেল যে টাকা আয় করা স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরই একচেটিয়া নয়, বরং অনেক সময় তাহার বিপরীত, তখনই আমরা বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে বিদ্যাশিক্ষার সত্যকার উদ্দেশ্যটা কি? এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা জ্ঞানীরা করিবেন, আমরা সহজে এই বুঝি যে, বিদ্যা শিখিয়া আমাদের অর্থ উপার্জ্জন ক্ষমতা নিশ্চয়ই বাড়াইতে

হইবে। মনের জোর, চিন্তা করিবার শক্তি শিক্ষার দ্বারাই বর্দ্ধিত হইবে, আর আমাদের দেহ এই সকল কাজের উপযুক্তরূপে গঠিত হইয়া উঠিবে। ব্যাধি মন্দির দেহকে, উপযুক্ত খাদ্য এবং ব্যায়াম দ্বারা এরূপ শক্তিশালী করিতে হইবে যে ব্যাধির আক্রমণ তথা হইতে সহজে প্রতিহত হইয়া যায়। আমাদের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব যাহাতে শিক্ষার অঙ্গীভূত হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে, ভালই কিন্তু এও তো বিদ্যা শিক্ষা—বই পড়া; তাহাতে শরীর সুস্থ সবল হইয়া উঠিবে কি? নিয়মিত শয়ন, ভোজন, ভ্রমণ, ব্যায়াম ছাত্র মহলে নাই বলিতে পারি। এ সকল সুনিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে শিক্ষা দ্বারা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হইবে কেন? ড্রিল শিখিবে শিশুরা ব্যায়ামের হিসাবে, তদনুসঙ্গে দৌড়ঝাপ, হাটিবার প্রতিযোগীতা, বৃক্ষারোহণ সাঁতার প্রভৃতি কাটা, শিক্ষা করা নিম্নশ্রেণী হইতে অঙ্ক, ইংরেজী, বাঙ্গলার মত—বাধ্যতামূলক হইবে। ছোট খাট গৃহ-কাজের ভার অভিভাবকেরা যত্নসহকারে বালকদের উপর অর্পণ করিবেন। ছাত্রজীবনে-বাল্যে কৈশোরে, যৌবনে সংসারের বিবিধ কার্য্যের ভার দিয়া, কাজ শিখাইয়া তাহাদিগকে সুগৃহস্থ করিয়া তুলিতে হইবে। নাগরিক জীবনের, সামাজিক জীবনের জ্ঞান যথাসম্ভব ছাত্রাবস্থায় অধিকার করিতে হইবে। শিক্ষা পদ্ধতি স্থির করিবার সময় এ সকল বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনীয় নহে কি?

শিক্ষার দ্বারা আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চাই, কেবল বিদ্যালাভ নহে, শিক্ষা দ্বারাই স্বাস্থ্যলাভ করা চাই—শারীরিক শক্তির বিকাশ চাই, আমরা চাই সুস্থ দেহ, সুস্থ মন, যাহার দেহ সুস্থ নহে সে কর্ম্মশক্তি এবং চিন্তাশক্তি দুই-ই হারায়,—এ কথা বলিয়াছি, এরূপ লোকের দ্বারা সমাজ ও দেশ কিছুই লাভবান হয় না। শিক্ষককে ছাত্রের দেহ মন দুইয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষকের কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইতে হইবে, কেবলমাত্র লেখাপড়া শিখানই শিক্ষকের কার্য্য হইলে চলিবে না, বিদ্যালয়ের বাহিরে—ছাত্রদের ক্রীড়াক্ষেত্রের সহিত, তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত, তাহাদের আশা আকাঙ্খার সহিত, তাহাদের সঙ্গী এবং আলাপীদের সহিত শিক্ষককে বিশেষরূপে পরিচিত হইতে হইবে। ইহা কল্যাণকর, অতি কঠিন কার্য্য, আর এই নিমিত্তই পালনীয়, যত শীঘ্র সম্ভব এ সমস্যার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

আর কতদিন আমাদিগকে শিক্ষার ভারবাহী হইয়া চলিতে হইবে? আমরা চাই যে, আমরা পরিতুষ্ট মনে শিক্ষালাভ করিব এবং তদনুসঙ্গে আমাদের দেহ পরিপুষ্ট কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিবে, এক কথায় শিক্ষার দ্বারা আমরা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হইব; এবং ইহার গোড়া পত্তন করিতে হইবে—নিম্নশিক্ষায়।

শিশুরা আনন্দরাজ্যের খবর নিয়া আসে। আনন্দে তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহারা শিশু ছাত্রদিগকে আনন্দহীন করিয়া তোলেন, তাহারা মনে রাখিবেন যে, যিনি আনন্দময়, তাহারই নিকট তাহারা অপরাধী।

—o—
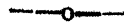
"পরের মাঝে ঘরের মাঝে
মহৎ হ'ব সকল কাজে
নীরবে যেন মরেগো লাজে
মিথ্যা অভিমান"

সন্ন্যাসী

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি, এল]

(১)

একথা যদি আর কেউ শোনে তাহলে হয়ত হাসবে, কিন্তু যে রাত্রে আমি লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি সে রাত্রের ভোরের স্বপ্নটার মধ্যেও বেজেছিল একটী মাত্র গান এবং একটী মাত্র সুর। সুরটী ছিল ভৈরবী এবং গানটীও ছিল বিরহের :—

বায়ু বহে পুব বৈয়াঁ
নিদ নেহি বিণু সৈঁইয়াঁ।।

সেই উষাটী তার আলো আধার নিয়ে চলে গিয়েছে, সে সুর থেমে গিয়েছে কিন্তু গানটা স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। সুর হারিয়ে তাল লয় সব হারিয়ে গানের কথা কটা আজ কেবলি মনের মধ্যে উঁকি মারছে। এর আগেও কতবার সে উঁকি ঝুঁকি মেরেছে এবং এমন বেখাপ্পা 'বেমানান সময়ে যে তখন ছটফট করে কাজ কর্ম্ম ফেলে ঐ গানের হারান সুরটাকে মনের স্বরলিপির মধ্যে বুকের সারেঙ্গীর তার হাতড়ে খুঁজতে বাধ্য হতে হয়েছে। আজও তাই এত দিন পরে ঐ গানটা মনে পড়ছে এই হতভাগা অভ্যাসহারা হাতটাকে দিয়ে এই সাদা কাগজের ওপর কালীর আচড় টেনে সারেঙ্গীর ওপর ছড়টানার বৃথা অনুকরণ করছি। কিন্তু তা হবে কেন? সে ছিল জীবনের ভোরের সময়—প্রাণ ছিল, হাজারটা ঘষা মাজা তার চড়ান, ভৈরবীর কোমল সুরে বাধা সারেঙ্গী; তখন লাখো পাখী তাদের লাখো রকম ডাক আমায় বিনা সুদে ধার দিত, তখন আকাশ বাতাস জলস্থল ছিল আমার না চাইতে ভরিয়ে দেবার মহাজন। তখন বয়স ছিল বাইশ বছর, প্রাণ ছিল গানের সুরের মত, মন ছিল গানের কথার মত, গতি ছিল গানের ছন্দের মত তালে বাঁধা। তখন খেয়ালে সেতালায় পা পড়লেও শেষে গিয়ে সমে ঠিক মিলত, কথা হারিয়ে গেলেও ভাব কাটত না, আর সুর? সেতো প্রাণের সঙ্গে একই হয়ে গিয়েছিল, বেসুরো হব কি করে? শুনিছি লোকে বলে সন্ন্যাসী হয় সংসারে দুঃখ পেলে, কিন্তু সুখের লোটা ছাপিয়ে উঠলে কি কেউ বেরিয়ে পড়ে? আমি কিন্তু ঠিক সেই কারণেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার এই জীবন কথা যদি কেউ শোনে তাহলে দুঃখই কেবল উদাসী করে না, সুখের ভাড়েও মানুষকে প্রবাসী করে, আপনাকে ভুলিয়ে সংসার ভুলিয়ে সব গুলিয়ে দিয়ে ছুটিয়ে 'গৃহছাড়া পথিক' করে দেয়। ভগবান বুদ্ধদেব সংসার দুঃখময় জ্ঞান করে 'ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির' পথ আবিষ্কার করতে সোনার সংসারকে চোখের জলে ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর কত গুণী কত জ্ঞানী কত কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ, কত কবির, নানক, চৈতন্য সেই পথের পথিক হয়েছেন। কিন্তু সবাই সংসারকে একরকম গাল দিতে দিতেই বেরিয়েছেন। কেউ কি সুখের ঠেলায় বেরিয়েছিলেন। তাঁরা সংসারের দুঃখটাকে বড় করে দেখে বেরিয়েছিলেন—যেন সংসারের দুঃখটাই একমাত্র সত্য আর সুখটাই মিথ্যা, মায়া, মারের প্রলোভন এবং আরো কত কি!

কিন্তু এমন কি কারু হয়েছিল যে সুখই কারু সইল না—দুঃখের টানে দুঃখের বাঁশি শুনে দুঃখকে পাবার জন্য কেউ কি বেরিয়েছিলেন? অবশ্য যাঁদের কথা বল্লাম তাঁরা একেবারে মানুষাকারে দেবতা। তাঁরা সংসারের মঙ্গলের জন্যই বেরিয়েছিলেন। তাঁদের পায়ে কোটী কোটী প্রণাম। কিন্তু তাঁরা যে প্রেমে সংসার থেকে বেরিয়েছিলেন সেই

প্রেম কেবল সংসারের দুঃখটাকে দেখেছিল এবং সে প্রেম স্বয়ং সকল রকম দুঃখকে বরণ করে সংসার হতে দুঃখকে তাড়াবার ব্যবস্থাই করেছিল। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই হয়েছিল তাঁদের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু তাঁরা, 'দুঃখটাকেই চাই, এমন কি দুঃখানুভবই পরম পুরুষার্থ' কারণ "দুঃখে যেমন আত্মাকে জাগায়, আত্মার সচেতনত্ব প্রমাণ করে এমন আর কিছুতেই নয়," এই রকম একটা তর্ক করে কি কেউ বেরিয়েছিলেন? আমার ত মনে হয় এ বিষয়ে আমিই একমেবাদ্বিতীয়ং। যদিও প্রভু যিশু এক জায়গায় বলেছেন, "যারা কাঁদে তারা ধন্য, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।" তবু তাঁর কথার মধ্যে ঐ ভবিষ্যতের সান্ত্বনাটিকেই বড় করে দেখার আভাষ রয়েছে। তিনিও দুঃখকে বরণ করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের মধ্যে আনন্দকে, সুখকে দেখে নয় দুঃখ হতে অপরকে ত্রাণ করবার জন্যে। 'চোখের জলের বাঁধন' ছিঁড়ে দিয়ে সংসারময় সুখের হাসির মুক্তিকেই এনে দেবার জন্যই তাঁদের যত সাধন-ভজন, সম যম দম নিয়ম!

দুঃখ কিন্তু তাঁদের আকর্ষণ করেনি, বিকর্ষণ করেছিল, ঠেলে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু আমায় সে বার করেছিল টেনে, কারণ আমাকে সত্যি সত্যিই 'সুখে থাকতে ভূতে কিলিয়েছিল'। সুখই আমার সয়নি। আমি দেখেছিলাম মানুষ যতই নাকি সুরে কাঁদুক না কেন সে সুখেই আছে, দারিদ্র্য অশান্তি রোগ ভোগ সমস্তরই মধ্যে মানুষ সুখেই আছে। দুঃখটাও তার সুখেরই নামান্তর কারণ সে যদি সত্যি সত্যি দুঃখেই থাকত তাহলে সে এতদিন মরে ভূত হয়ে যেত। দুঃখ তাকে জাগিয়ে রেখেছে, তাকে ঘুমুতে দেয় নি,—ক্ষিধের দুঃখের জন্য সে অন্ন সংস্থানে ব্যস্ত, শীতোষ্ণতার দুঃখের জন্য সে বস্ত্র বয়নে গৃহনির্ম্মাণে ব্যস্ত মনের দুঃখের জন্য সে শিল্পকলার সৃষ্টি করতে ব্যস্ত আর একলা থাকার ভয়ের জন্য সে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, নীতি এই রকম কত কি না সৃষ্টি করছে। সবই ত তার দুঃখের দায়ে, অথচ সে বরাবর বলছে দুঃখকে চায় না। কিন্তু দুঃখকে না চাইলে সে এত সব সুখ পেত কোথা হতে? সুখকে চায় বলে সে দুঃখকে চায় অথচ বলে সে দুঃখ চায় না সুখকে চায়। আমার কিন্তু চিরদিনই মনে হয় যে সে প্রাণে প্রাণে দুঃখকেই চায়—দুঃখকে না চাওয়ার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চাওয়া চুপ করে লুকিয়ে বসে আছে। সে যেন গোপন ইঙ্গিতে প্রাণকে বলছে, 'চাও, চাও, সুখকেই চাও সুখের দিকেই ধাও," তারপর প্রাণ যখন দুঃখকে ছেড়ে সুখের দিকে ছুটছে, তখন তার চিরন্তন সাথী দুঃখটা খুব একচোট হেসে নিচ্ছে। কারণ দুঃখের বেদনাই হচ্ছে চৈতন্যের দরজার একমাত্র দ্বারী—সেই একমাত্র সোনার কাঠী যাতে ঘুমন্ত রাজকুমারী আত্মাকে জাগিয়ে তোলে।

যাই হোক, ছোট বেলা হতে কতকটা এই রকমের ভাব আমার মধ্যে জেগেছিল। জেনেই হোক আর না জেনেই হোক আমার মনের মধ্যে এই দুঃখের বিরহই জেগেছিল—এই যে গোপনচারী দুঃখ যে মানুষকে ঠেলছে অথচ নিজে ধরা দিচ্ছে না তারই বিরহ জেগেছিল। তাই সুখে স্বাস্থ্যে স্নেহে প্রেমে ভরা সংসারের মধ্যে থেকেও আমার কাণে কেবলি বাজত—

'বায়ু বহে পূরবৈঞা, নিদ নাহি বিনুসৈঁঞা।'

কিন্তু কে সেই চিরন্তন সখা? কে আমায় এত কাছে থেকে, এত রকমে দর্শনে, স্পর্শনে, চিন্তায়, ভাবে আমার কাণের গোড়ায় বাঁশী বাজাচ্ছে? কে সে!—সে যে কে তা কিছুই ধরা গেলনা যে! ধরা বুঝি যায় না—কারণ সেই ধরে রাখে বলেই বোধহয় তাকে ধরা যায় না। সেই প্রবৃত্তি দেয় বলেই বোধহয় তার দিকে মানুষের প্রবৃত্তি নেই। সে যে না চাওয়ার ধন, সে যে দুঃখ।

যাক—যাক—না ধরা যাক, চিরদিন সে অধরাই থাক! আমি চিরদিন তারমধ্যে মুক্ত হয়েই বিচরণ করি, ধরে ফেল্লে যে আমার চলার, আমার থাকারই শেষ হয়ে যাবে! না গো না—সে দুর্ঘটনা যেন কোনোদিন না ঘটে। ওগো আমার সেঁইঞা—ওগো আমার না পাবার ধন ওগো আমার চিরন্তন বিরহমূর্ত্তি ওগো আমার চিরদুঃখ, তোমায় আমি না চাওয়া দিয়ে বরণ করলাম তোমায় পাওয়া দিয়ে আমার ভাণ্ডার ভরে নিলাম।

আজও তাই লিখতে বসে সেই বহুদিনের পুরাতন গানটি

মনে পড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্চে বায়ু চিরদিন পূর্ববৈওগাই থাকুক—আর আমার ঘুম না আসুক কারণ সেইওগা যে এত কাছে থেকেও এতদূরে! আমি ঘুমাতে চাই না—তার বুকে আছি এজ্ঞানটা এলেই সে সুখে এলিয়ে পড়ব। না, আমি সুখের মধ্যে আপনাকে হারাতে চাইনা—আমি জেগে আছি, তারজন্যে তাকে পাবারজন্যে তারই বিরহের মধ্যে জেগে আছি এইটেই সত্য হয়ে থেকে যাক।

"রোয়ে পিয়ারী শ্যাম কবি কোর,—
'হাহা কাঁহা গয়ি প্রাণসখা মোর'।"

এমন একটা ভাবের ঘোরেই বোধহয় আমায় বেরুতে হয়েছে। নইলে কেন বেরুলাম? আমার কি না আছে? কি না ছিল? অমন স্নেহময়ী মা বোন, অমন ভরাভাণ্ডারের স্বচ্ছলতা, অমন সুস্থ সবল দেহ মনের সুখ, অমন ভালবাসায় আদরে ঘেরা সংসার—সবই ত' ছিল, সবই হয়ত এখনো আছে—আমার জন্যেই কোলপেতে আছে, তবু আমি বৈরাগী কেন? তবু কেন একটা ভোরের আলো আঁধারের ভৈরবীসুরে আমায় গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া সৃষ্টিছাড়া করে সবহারাণর পথে দাঁড় করিয়ে দিলে? সেই প্রভাতের ভৈরবীসুর আমায় ভৈরবের ভিক্ষার ঝুলি বইবার জন্য চিরদিনের জন্য আহ্বান করলে কেন? এত লোক থাকতে সংসারে আমার মত একটা সামান্যলোককেই বা গৃহহারা করবার তার কি দরকার পড়ে গিয়েছিল?

আজ আবার তাই নূতনকরে সব হারাবার পথে দাঁড়িয়ে সেই অনেকদিনের পুরাণো গানটা মনে পড়ছে। কিন্তু সুরটা যেন কিছুতেই মনে আনতে পারছিনে। কেবল সুরে সুরে সেই কণ্ঠটাই মনে করতে চেষ্টা করছি কেন আমি বেরিয়েছিলাম, কে আমায় টেনে বার করেছে?

(২)

এতদিন এই খাতাখানা বৃথাই বয়ে মরেছি! কোথাকার যতরাজ্যের গান কুড়িয়ে আর পরের কথা কুড়িয়ে পুঁজিকরে আসছি। কিন্তু হঠাৎ আজ মনে হল দূর ছাই পরের কথাই কুড়িয়ে মরলাম আজ আবার নূতন করে সব ছেড়েযাবার দিনে এতে আমার এতদিনকার অন্তরের ঝুলিটা ঝেড়ে রেখে দিয়ে যাই। তাই যে দুদিন এখানে আছি আর দোঁহাকুড়ানো নয়। গান কুড়ানো নয়, কথা কুড়ান নয়, শুধু আপনাকে এই খাতাটার বাকী পাতা গুলোর মধ্যে ধরাদেবার চেষ্টায় সারাদিন খাটব। কণ্ঠী পাকান নয়, চিমটে ঝন্ ঝন্ করে সারাপথ ভিক্ষে করে বেড়ান নয়, বিবেকচূড়ামণির শ্লোক ব্যাখ্যা নয়, শুধু আপনাকে নিয়ে নাড়া চাড়া, আপনার কাছে আপনার ধরা দেওয়া। তারপর সব ছেড়েদিয়ে এখানাকেও চিরদিনের মত যারজন্য লেখা তার কাছে ফেলেদিয়ে একবারে ডুব মারব।

কিন্তু আমিত রাজপুত্র নই, মন্ত্রীরপুত্র নই, সওদাগরের পুত্র নই, কোটালের পুত্রও নই তবু সাত রাজার ধন মাণিক খুঁজতে বেরিয়েছি। এ মাণিক আমায় পেতেই হবে। অন্যে আমার মনের ক্ষিদে কিছুতে মিটবেনা। যদি মিটত তাহলে স্নেহময় সংসারের একমাত্র ধন হয়ে আমি চির অপ্রাপ্য সাতরাজার ধন মাণিকের জন্য বৃথা বেরুতামনা। যেদিন আমার চারদিকে সংসার তার স্নেহেরজাল ভালকরে জড়াচ্ছিল, যেদিন বিধবা মার বিরস মুখে স্বর্গের হাসি ফুটে উঠেছিল, যেদিন বন্ধুবান্ধবগণের আনন্দ কলরবে আমার বাড়ীটা মুখরিত হয়েছিল, যখন আমাদের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতেও পাঁচটা পাশ করা সুন্দর সচ্চরিত্র জামাই পাওয়া যাচ্ছে বলে সাত দিন হতে নহবত বসিয়ে তাঁদের আনন্দ সারাগ্রামে ছড়াচ্ছিলেন, যখন আমাদের গ্রামের দীন দরিদ্র ইতর ভদ্র সবাই যাত্রা গান থিয়েটার এবং চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সব রকম আনন্দ উপভোগ করে আমায় আশীর্ব্বাদ করছিল, ঠিক সেই সময়, সেই গায়েহলুদের রাত্রে আমার কাণে শানায়ের শব্দে কেবলি ঐ গানটাই বেজেছিল কেন? কে জানে কেন?

কিন্তু আমার এত সুখ সৈল না যে, তাই ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। পথ তখন জনশূন্য—তখন সবেমাত্র উষার আলো দেখা দিচ্ছিল—জমিদার বাবুদের বাড়ীতে আমারই জন্য তখন সবেমাত্র শানায়ের ভোরের তান ছেড়েছে। তখনও কোকিল ডাকেনি, ফিঙে জাগে নি, গাছের নূতন পাতাও বুঝি নড়ে নি। শুধু জেগেছিল আমার উদাসী প্রাণ। অনির্দ্দেশ যাত্রার জন্য যে প্রাণটা

বৎসরাবধি ছুট্ ফট্ করছিল, সেই প্রাণই ঐ রাত্রের সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাড়াকাপড়ের মত আমার শয়ন ঘরে ফেলেদিয়ে ফাগুনের মিলনের ঊষার বিরহে গেরুয়া পরে বেরিয়ে পড়ল। পূর্ব্বাকাশে যে রঙটা ফুটেছিল তাতেও যেন গেরুয়ারই রঙ্ দেখতে পেয়েছিলাম, আমের মুকুলে আর কিশলয়ে ও যেন সেই বৈরাগ্যের রঙ লেগেছিল আর পলাশগাছ ত একেবারে লালী হলুদে কাপড় পরে বৈরাগী সেজে আমার জন্যেই পথের ধারে ধারে বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়েছিল। আমি কিন্তু ছুটছিলাম, কোনদিকে না চেয়েই ছুটছিলাম, তবু কি জানি কোন ফাঁক দিয়ে সেই ভোরের সমস্ত রূপ রস গন্ধ শব্দ আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে এমনি চাপ মেরেছিল যে আজও আমি তা ভুলতে পারিনি। আজও মনে পড়ছে, সেই বাঁশীর সুরটী, সেই ভোরের আলোটুকু, সেই পলাশ শিমুলের লালে লাল হয়ে যাওয়া।

তারপর হিমালয় হ'তে মকরালয়, কেদারনাথ হ'তে রঙ্গনাথ, আদিনাথ হ'তে সোমনাথ, কামাখ্যা হ'তে হিঙ্গুলা, সারা ভারতবর্ষের সমস্ত দুর্গম সুগম স্থান সমস্তই ত' এই কবছর ঘুরে মরলাম, কত দেখলাম, কত শুনলাম কত বুঝলাম, কত ভুললাম, তবু সেই তবু সেই প্রথম প্রব্রজ্যার প্রথম ঊষার ছাপটুকুত' কিছুতেই ভোলা গেল না। ভোলা বুঝি যায় না—তাই কি? হবে।

কিন্তু ভুলতে ত' হবে; এই সব-ভোলার পথে বেরিয়ে, ভুলব ভুলব করে দিন কাটালে ত চলবে না? সেই সেদিনকার সুখ, সেই প্রচণ্ড দুঃখ ভরা আনন্দটাকে ত' ভুলতে হবেই? এই দুঃখের পথে বিরহের পথে বেরিয়ে হারান সুখটুকুর জন্যঃ কেঁদে মরলে চলবে কেন? যে দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখী করবার জন্য বেরিয়েছে তাকে দুঃখকেই সুখ বলে অনুভব করতে হবে। নইলে কেন বেরিয়েছি? কেন এই অকারণ দুঃখের বোঝা, আপন ভাবনার বোঝা বয়ে বেড়ান? আপনাকে সেই পুরাতন সংসারের ক্ষুদ্র সুখের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেই ত' হত।

কিন্তু সেই মৃদু সুখে আমার ক্ষুধা ত' মেটেনি। প্রাণ চেয়েছিল এমন একটা ভয়ঙ্কর সুখ, যার আগুণের মত জ্বালা, মদিরার মত উন্মাদনা, মৃত্যুর মত ধ্রুবত্ব। কিন্তু কোথায় সেই প্রচণ্ড দুঃখের উন্মত্ত সুখ? কোথায় গো কোথায়? এইত' সারা সংসার ঘুরে বেড়ালাম, কত অনাহার অনিদ্রাতে শ্রান্তি ক্লেশের মধ্যে অশ্রান্তভাবে ছুটে বেড়ালাম, কিন্তু কোথায় সে? সেই ত' যেখানে গিয়েছি সেইখানেই সংসার আমার জন্য দুহাত বাড়িয়ে আছে এবং যা যখন তার হাতের গোড়ায় ছিল তাই দিয়ে আমায় সুখী করবার চেষ্টা করেছে। কৈ কোথাও ত' দুঃখ-ভৈরবকে খুঁজে পেলাম না? কোথায় প্রভু, কোথায় তুমি শ্মশানালয়বাসী মরণতাণ্ডব-মগ্ন মহানন্দময় দুঃখ-ভৈরব? এত ক্লেশ এত ক্লান্তি এত ভয়ের মধ্যেও ত' তোমায় পেলাম না। পেলাম কেবল সেই চিরন্তনী অন্নপূর্ণা সদাপূর্ণা, চিরাসুখময়ী জননীকে। তোমায় ত' পেলাম না প্রভু! তুমি মায়ের কোলে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে কোথায় লুকিয়ে রইলে? হে দেশকালাতীত, হে চির অপ্রাপ্য তোমায় কি পাবনা? না পাই, তবু খুঁজতেও ত' ছাড়ব না—না খুঁজে যে উপায় নেই। তোমার শিঙ্গা যখন একবার কাণের কাছে বেজেছে তখন কি করে আর চুপ করে থাকা যাবে? হে পথ-স্বরূপ, হে গতি-স্বরূপ, তোমার চিরস্থিত পথে চিরচঞ্চল গতিকেই অবলম্বন করলাম।

তোমার পথে বেরিয়েছি বটে কিন্তু এ পথের পথিক কৈ? পথপ্রদর্শক কৈ? কে আমায় পথ বলে দেবে, সাহস দেবে শক্তি দেবে? তা যে খুঁজে পেলাম না। সবাই বলে "আমার পথে চল, অন্য পথ নেই। তোমার পথ পথ নয়, আমার পথই পথ।" আমার পথটা আমি দেখছি, কিন্তু সে বলছে "ভুল দেখছ"। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে ভুল দেখছি—তার পথই পথ, "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" কিন্তু আমি যে দেখছি আমার পথ ঐযে সামনে সোজা পড়ে রয়েছে, এবং সবাই তাতেই চলছে। কিন্তু বলবার সময় বলছে যে এ পথ তারই আর কারো নয়। আমার পথেই সবাই চলছে, তবু বলছে "এ পথ তোমার নয়, আমার।" একি রকম উল্টোপাল্টা!

আমি গুরু খুঁজে, চালক খুঁজে মরছি, কিন্তু এতদিন চললাম কি করে তাত' ভেবে দেখিনি? তাই আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমার পথ আমারই, আমার গুরু আমিই আর কেউ পথ বলে দেবার নেই! তাই কি?—

কিন্তু এই আমার নিরুদ্দেশ যাত্রার অগ্রগামী যাত্রীকে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে যাদের যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের সবারই কথা কি লিখতে হবে নাকি? না না সে যে বেজায় বড় ব্যাপার হয়ে উঠবে, তার সময় কৈ? কিন্তু দু' একজনের কথা যে না লিখলেই নয়। তাদের কথা না লিখলে যে আমার চলছে না। কেন? তা বলতে পারিনে, কিন্তু তাদের কথা লিখতেই হবে। তারা যে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে।

(৩)

সত্যকে খুঁজতে বেরিয়ে প্রথমেই মিথ্যাকে আশ্রয় করতে হয়েছিল, নাম ভাঁড়াতে হয়েছিল। এমন কি চেহারাটা পর্য্যন্ত বদলাতে হয়েছিল। সেই এক অদ্ভুৎ ব্যাপার—নিজ হাতে চুলছেঁটে, গোঁফ কামিয়ে গেরুয়া পরে শুধুপায়ে প্রথম দিন চৌদ্দ পনর ক্রোশ পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যায় একটা গ্রামের বাইরে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু কে জানত যে এই অনন্তগতির পথে সেই প্রথম মণ্ডেই আমার প্রথম আঘাত পেতে হবে।

সূর্য্য তখন মাঠের পারে সবে মাত্র অস্ত গিয়েছেন। সুমুখেই একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে গ্রামে ফিরছে। শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত আমি আমার কম্বলখানা একটা অশ্বথগাছের তলায় বিছিয়ে সবে মাত্র বসেছি। এমন সময় কোথা হতে এক বাবাজী এসে উপস্থিত হলেন—সঙ্গে একটী অল্পবয়সী গেরুয়াপরা স্ত্রীলোক! বাবাজীর বয়স যে কত হবে বলতে পারিনে, কিন্তু দেখে ত' চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের বেশী বোধ হল না। ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড ঝোলা, মস্ত একটা লাঠী আর হাতে একটা করঙ্গ। মেয়েটীর ঘাড়ে কোনো বোঝা নেই কেবল হাতে একটা একতারা,—যেন সমস্ত বোঝা নিজের স্কন্ধে নিয়ে বাবাজী কেবল আনন্দের বোঝাটুকু মেয়েটীর হাতে দিয়েছেন, এমন কি ছাতা ছটোও নিজের পুঁটলীর সঙ্গে বেঁধে নিয়ে মেয়েটীকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে দিয়েছেন।

আমি কিন্তু তাঁদের অবস্থা দেখে প্রথমটা হেসেই উঠেছিলাম। বাবাজী আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁকে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটীও দাঁড়ালেন। বাবাজী চেয়ে চেয়ে বল্লেন, "ছিঃ বাবা ঘরে ফিরে যাও, এ পথত' তোমার নয়।" আমি চমকে উঠে বল্লাম "কেন বলুনত'?"

বাবাজী আস্তে আস্তে তল্পিতল্লা নামালেন। তারপর একখানা কম্বল বিছিয়ে মেয়েটীর দিকে চাইতেই মেয়েটী তার ওপর বসে পড়ল। বাবাজী একখানা পাখা বের করে মেয়েটীকে বাতাস করতে করতে বল্লেন, "বাবা, সংসার থেকে আজ চল্লিশ বছরের ওপর হল বেরিয়েও এই দেখ আমার দশা, আজ বুড়ো বয়সেও আবার সেই সংসারই এসে আমার ঘাড়ে চেপেছে। তুমি নতুন বেরিয়েছ গ্রামের মধ্যে পর্য্যন্ত যাবে না এমনি তোমার নবীন বৈরাগ্যের অনুরাগ; কিন্তু যখন আমার মতন হবে তখন বুঝবে যে যাকে ত্যাগ করে পালাচ্ছ সে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছে। যে দিন সময় পাবে সেই দিনই সে ঘাড় মটকে ধরবে। তাই সাবধান করে দিচ্ছি ভুক্ত-ভোগীর কথা শোনো, ফেরো।"

বাবাজীর অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখে আমার খুব কৌতূহল জেগে উঠল, একনিমেষেই আমার সবটুকুই যেন তাঁর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তবু তখন নতুন অনুরাগ বলে তর্ক করবার প্রবৃত্তি আর শক্তিটাও যথেষ্ট প্রবল। আমি বল্লাম, "আমি নতুন বেরিয়েছি বটে, কিন্তু আপনার পক্ষে যে সংসার ত্যাগ করা অসম্ভব হয়েছে, আমার পক্ষে তা খুব কষ্ট সাধ্য হয়নি। আমি দুঃখে সংসার ছাড়িনি, সুখে ছেড়িছি সহজেই ছেড়িছি। আপনি যে নারীকে এই শেষ বয়সেও ছাড়তে পারেননি, সেই নারীকেই, আমি বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রেই পায়ে ঠেলে চলে এসেছি। আমার পক্ষে বৈরাগ্য সহজেই হয়েছে।"

বাবাজী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন "যাকে পায়ে ঠেলে এসেছ, তাকে শেষে হয়ত মাথায় করতে হবে।

থাক বাবা আগে থাকতে সাবধান করে দিলাম, এইমাত্র; এখন গোবিন্দের ইচ্ছাই সফল হোক।"

আমি সন্ন্যাস নিতে বেরিয়েছি, কিন্তু নবীন অনুরাগের প্রচণ্ড অহঙ্কার যাবে কোথায়? সেটা বেরিয়ে পড়ল,—আমি হেসে বল্লাম "আপনি কি গোবিন্দের ইচ্ছাতেই এই বৈষ্ণবীটী জোগাড় করেছেন।" বাবাজী ছল ছল নেত্রে আমাব দিকে চেয়ে হঠাৎ সেই মেয়েটীর পায়ে প্রণাম করে বল্লেন, "হ্যাঁ বাবা, এটী আমার গোবিন্দের মূর্ত্তিমতী ইচ্ছা।"

আমি ত অবাক! মেয়েটী চুপ করে বসে রৈল, নডলেও না চড়লেও না। বাবাজী তাকে বাতাস করতে করতে বল্লেন, "তাহলে, এমন সাধুসঙ্গ পাওয়া গেছে, আজ এইখানেই আস্তানা হোক।" মেয়েটী মাথানেড়ে সম্মতি দিলেন। বাবাজী অমনি উঠে, তাঁর তল্পি হতে কত কী বার করে ফেল্লেন। কাট জোগাড় হল, ধুনি জ্বালা হল, এমন কি রান্নাও চড়ান হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে গোবিন্দের ইচ্ছা দেখতে লাগলাম। বাবাজী হঠাৎ বলে উঠলেন, "সাধু মহারাজ, আপনি ত নিজের জন্তে কিছু করবেন না, আমার জন্তে একটু চেষ্টা করে যা হয় চড়িয়ে দেন না—আমায় এমন প্রবল বৈরাগী সাধুর সেবা করবার অবসর দেন না?"

বাবাজী এতক্ষণ আমায় "তুমি তুমিই" করছিলেন হঠাৎ আপনি বলে কেন সম্বোধন করলেন বুঝতে পারলাম না। যাই হোক আমিও নিজের জন্য কিছু জোগাড় করে নিলাম। আমার নিজের কাছে কিছুই ছিল না, সবই বাবাজীর ঝোলা হতেই পেলাম। আমরা দুজনে আহার্য্যের জোগাড়ে ব্যস্ত, এমন সময় মধুর বামাকণ্ঠে এমন স্বর লহরী সেই নির্জ্জন স্থানের আকাশ বাতাসকে ভরে ফেল্লে যে আমার প্রবল বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ও অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে বল্লে,

যদেহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রাচিৎ।

মেয়েটী যে কি গান গেয়েছিলেন তা মনে নেই, কেবল মনে আছে একটা আনন্দ, একটা মধুর অশান্তি, একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যে ও রসে আমার সমস্ত অস্তিত্বটা ভরে উঠেছিল। আমি রাঁধতে বসেছিলাম কিন্তু এমনি একটা অযাচিত মধুরসে আমার প্রাণ ভরে উঠেছিল, যে, আমি তন্ময় হয়ে ধুনির সম্মুখে চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ গান থামলে বাবাজীর দিকে চেয়ে দেখি তিনি জোড়-করে না জানি কাকে প্রণাম করছেন, ধুনির আলোতে তাঁর মুখখানি রাঙ্গা হয়ে উঠেছে আর বোধহল যেন তাঁর সেই রাঙ্গা মুখখানা অশ্রুতে ভিজে ডব ডব করছে।

আহার করতে বসে যা দেখলাম তা আবার আরও আশ্চর্য্য! মেয়েটী বসে আছেন আর বাবাজী তাঁকে খাইয়ে দিচ্ছেন। তারপর তাঁর আহার শেষ হলে তাঁর মুখ ধুইয়ে দিয়ে নিজে সেই এঁটোপাতে বসে গেলেন; এবং আহারাদি শেষ করে, ঝুলি হতে পানের একটা ছোট বাটা বারকরে ধুনির আলোতে পান সাজলেম, মেয়েটীকে খাইয়ে নিজেও একটা খেলেন।

আমার চোখে এটা এমনি আশ্চর্য্য এমনি বিশ্রী ঠেক-ছিল যে আমি আর থাকতে পারলাম না, গম্ভীর মুখে বল্লাম "বাবাজী, একটা ঘর বাঁধুন গে, এমনি করে কি সংসার করা হয়?" বাবাজী হেসে বল্লেন, "বাবা আমি জগৎ-মঠের লোক, এতবড় বাঁধা ঘর আমার রয়েছে, আমার কি এক কোণে বসে থাকলে চলে? সারা ঘরটাত' বেড়িয়ে দেখতে হবে? তাই সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘরের গিন্নী সঙ্গেই আছেন, বসতে দেবেন কেন?"

আমি তর্ক করতে লাগলাম, কিন্তু বাবাজীর দেখলাম অত্যন্ত শরীর, বিদ্রূপেও তাতে না, গালি গালাজেও তাতেনা, তর্কেও না,—কেবল হেসে হেসে আমায় হাসিয়ে দেন। আমি মাঝে মাঝে ধুনিটায় খড়কুটো দিয়ে আলোটাকে বাড়িয়ে তুলি, আর ঐ অদ্ভুৎ মানুষ দুটীর মুখের ভাব দেখবার চেষ্টা করি। মেয়েটী উদাসভাবে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে, বাবাজী তাকে বাতাস করে মশা তাড়াচ্ছেন, আর আমার সঙ্গে কথা বলছেন। মেয়েটীর মনের অবস্থা জানবার জন্য আমার মাঝে মাঝে কৌতূহল হচ্চে—কিন্তু ব্রত ভঙ্গের ভয়ে তাকে কোনো কথা বলা হচ্চে না। সেও এমনি একটা ভাব করে বসে ছিল যেন আমরা কেউ সেখানে নেই, যেন আমরা দুজন দুটী অশরীরী শব্দমাত্র। যেমন গাছের মধ্যে নিশাচর

পাখীরা শব্দ কচ্চে, মাঠে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে, শেয়াল ডাকছে, মাঝে মাঝে দুর হতে মানুষেরও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আমাদের কথাবার্ত্তার আওয়াজও যেন তাঁর কাছে সেই রকম আওয়াজ মাত্র। সে আওয়াজে যোগ দেবারও দরকার নেই ভাল করে শোনবারও দরকার নেই।

আমি অনেকক্ষণ তর্ক করে শেষে শুয়ে পড়তেই বাবাজী বল্লেন, "আহা শোন, শোন—বাতাস করব? মশা লাগছে?"

আমি বল্লাম, "না—না সেকি কথা? আপনি যা করছেন তাই করুন।"

আমি চুপ করতেই সব চুপ হয়ে গেল। সেই নির্জ্জন স্থানের গাঢ় নিস্তব্ধতা আমার ওপর চেপে বসল। আমি সেই একাকীত্বের মধ্যে ঐ দুইটী সঙ্গীর সান্নিধ্যকে যেন ভগবানের দান বলে গ্রহণ করে নিদ্রাকে আশ্রয় করবার চেষ্টা করলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নাই কিন্তু হঠাৎ এক সময় জেগে দেখি পূর্ব্বদিকে চাঁদ উঠে গাছের তলাটা আলোয় ভরে ফেলেছে বাবাজী গুণ গুণ করে গান করছেন এবং মেয়েটী আমার কম্বলের কাছে বসে আমায় বাতাস করছেন। আমিত' ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বল্লাম, "একি? এ ভারি অন্যায়? আমার ব্রতভঙ্গ করবার তোমরা কে?"

মেয়েটী সরে গেলেন। বাবাজী হেসে বল্লেন, "গোবিন্দের ইচ্ছা মহারাজজী, রাগ করছেন কেন? আপনি • মশার কামড়ে ছটফট করছিলেন রাধারাণীর ইচ্ছা হল আপনার সেবা করতে, আপনি সে ইচ্ছায় বাধা দিচ্ছেন কেন?" আমি রেগে বল্লাম "আপনার গোবিন্দের ইচ্ছা আপনারি থাক, আমার ঘাড়ে চাপাবেন না। আমার গোবিন্দের ইচ্ছা এ সব ত্যাগ করা। আপনি সে ইচ্ছায় বাধা দিচ্ছেন কেন?" বাবাজী বল্লেন, "বাবা আমি গোবিন্দের ইচ্ছায় ত' বাধা দিইনি, আপনার মধ্যে গোবিন্দজী মশার কামড়ে ছটফট করে রাধারাণীর সেবা চাচ্ছিলেন, তাই রাধারাণী সেবা করেছেন। ভয় কি আপনার আসনত' রাধারাণী স্পর্শ করেন নি। আপনার ব্রতভঙ্গ কি রাধারাণী করতে পারেন? কিন্তু বাবা গোবিন্দের যেদিন ইচ্ছা হবে, সেদিন তোমার এই ভয়ের এই মিথ্যে সংস্কারের মায়াজাল এক নিমেষে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে তোমার অন্তরের বাগানে রাধারাণীর কুঞ্জ স্থাপনা করে দেবেন। এ তোমায় বলে রাখলাম।"

আমার রাগ ক্রমশঃ পড়ে এল, কারণ এমন শুক্লরাত্রে এমন চাঁদের আলোতে, অমন বিস্তৃত একান্তের মধ্যে রাগ করে থাকা অসম্ভব, আমি পাশ ফিরে শুয়ে বল্লাম "দোহাই বাবাজী আপনার গোবিন্দের ইচ্ছা এই নতুন পথিকটীর উপর হতে সম্বরণ করুন, নইলে এখনি আমায় এস্থান ত্যাগ করতে হবে।"

বাবাজী কোনো উত্তর দিলেন না আপন মনে গান গাইতে লাগলেন। তাঁর একতারাটা যেন একটীমাত্র সুর তুলছিল "আনন্দম্, আনন্দম", আর তিনি সেই একটীমাত্র সুরকে বহুরূপে বহুতরঙ্গে ফুটীয়ে তুলে গাইছিলেন—

"কি খেলা খেলছ ওগো সুখের মাঝে দুখের মাঝে?
কি যে জাল বুনছ তুমি আমার মাঝে তোমার মাঝে?"

গান শুনতে শুনতে আমার ঘুমিয়ে পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি উঠে বসে বল্লাম, "বাবাজী আপনি কি ঘুমুবেন না?" বাবাজী হেসে বল্লেন, "ঘুম? ঘুমুতে কি আর দেবে?" আমি অমনি তর্ক জুড়ে দিলাম। মেয়েটী অমনি গান জুড়ে দিলেন, আর তর্ক করা হলনা। চুপকরে শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে রইলাম। বাবাজীর সঙ্গে বাবাজীর বৈষ্ণবীটির গানের তান ছোড়াছুড়ি আনন্দ ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হয়ে গেল। আর আমি সেই একান্ত লুব্ধ সুন্দর রাত্রে একলা সেই দুইটী আনন্দের যুদ্ধ দেখতে দেখতে কেমন হাবা হয়ে গেলাম বলতে পারব না; এবং কখন যে আমার অজ্ঞাতে উষাদেবী পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন জানতেই পারলাম না।

তারপর আজ কত বৎসর চলে গিয়েছে, কিন্তু জগৎমঠের সেই কুঞ্জধারী বৈষ্ণবটীকে আর দেখতে পাইনি;— কিন্তু ভুলতেও ত' পারিনি। কোথায় তাঁরা? কে বলে দেবে কোথায়? এই যে আজ এই কত বৎসর পরে হঠাৎ তাঁরই ভবিষ্যৎবাণী সফল করে ফেলে, আবার সেই চিরদিনকার সংস্কার বশে হাতের জিনিষ পায়ে ঠেলে পালাচ্ছি

এই সময় যে তাঁকে একবার দরকার বোধ হচ্ছে। এখন কি একবার তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না? না যাক, তবু আবার একবার দেখতে হবে, আমি চিরদিন যে পথে চলেছি, চিরদিন যে প্রবল ত্যাগকে বড় করে দেখে এসেছি সেই পথই পথ কিনা? দুঃখ ভৈরবকে আবার খুঁজতে বেরুচ্ছি, চিরদিন তাঁকেই খুঁজে এসেছি, চিরদিন তাঁকেই খুঁজব। কোথায় তুমি ওগো কোথায়? এই যে অযাচিত-ভাবে আমায় আনন্দ দিচ্ছ, এই কি তোমার স্বরূপ? তাই যদি হয় প্রভু তবে তা কেন বুঝতে দিচ্ছনা? তবে কেন দুঃখ মন্ত্রে দিক্ষিত করলে? যদি আগুণের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তুমি শীতল জল হয়ে আমায় ঘিরে ধর, কোলে কর, তবে কেন আমায় অগ্নিমন্ত্রে দিক্ষিত করলে? কেন, প্রভু কেন?

(ক্রমশঃ)

হাওয়ার দূতী

[হাবিলদার, কাজী নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লাম]

ও ভাই ভোরের্ হাওয়া।
দখিন্ পথে আসতে তোমার যায় যদি ফের পাওয়া
চপল্ আমার পলাতকা হরিণীটির চাওয়া,—
ব'লো নরম সুরে,
আজও তা'রে ফির্‌ছি খুঁজে পাহাড়্ মরু ঘুরে;
বনের মাঝে—মনের মাঝে অনেক—অনেক দূরে।
সে সরবৎ সাকী,
চিনির পানায় তোতা আমি মিঠার পিয়াস্ রাখি,—
অধর ভরা মিষ্টি চুমো আশেক্ পাবে না কি?
ব'লো'—ওগো ফুল।
রূপের গরব স্মরণ পথে পাছে ঘটায় ভুল
যে, মালঞ্চে এক কাঁদচে তোমার বিরহী বুল্‌বুল্,—
কয়ে রাখি তাই,
জাল্ দিয়ে কেউ চতুর পাখী ধরতে পারে নাই;
ধর্‌তে আশেক্ রূপের সাথে মুখের মিঠাও চাই।

হাফিজের গজল অবলম্বনে।

আর, পড়িয়ে দিও মনে—
সরাব্ পিতে বস্‌বে যবে আমার পিয়ার সনে—
ক্লান্ত তাহার কান্ত কথা কাঁদ্‌তেছে যে বনে।
ব'লো—যদি চেনো,—
তন্বী-তনুর ঋজুতায় আর ডাগর্ চোখে হেন
চাঁদ্‌বদনে ভালোবাসার রং ফোটেনি কেন?
শুন ও সুন্দরী,
তোমার রূপের তুলনা নেই এ তনু কুন্দরই,'
একটি শুধু দোষ্ এরূপে রয়েছে ঘুণ্ ধরি—
রূপ সেত নিগুর্ণ,
করুণা আর প্রেমের যদি না রয় তা'তে খুন্;
কোর্ম্মা পোলাও সেও বিস্বাদ্ না যদি দাও নুন্।
* * * *
নেই এতে বিস্ময়,
হাফিজ্! তোমার গজল্ যদি স্বর্গে গীত হয়,
মুগ্ধ হয়ে হজ্‌রত্ ঈসাও নাচ্‌বেনই নিশ্চয়।

—০—

ছোট্টন

[শ্রীহরিপদ হালদার]

যৌবনে যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাড়নায় ছিলাম ততদিন ঐ লভ্ বলে যে জিনিষটা আছে তার লাভালাভের হিসাব করবার ফুরসৎ খুব কমই হয়েছিল। যতদিন আমার সে ফুরসৎ হয়নি ততদিন আমি ছিলাম আমাদের ছাত্রমহলের 'ঋষিদাদা।' কতদিন তারা জোর করে আমাকে পড়ার ঘর হ'তে টেনে নিয়ে গিয়ে কত প্রেমের কথা, কত বিচ্ছেদের যাতনা শুনিয়েছে, কিন্তু আমার পাঠ্য-পুস্তকগুলির নায়ক নায়িকাদিগের কথায় যখন কোনও উত্তেজনা আন্‌তে পারেনি তখন সাধারণ শিল্পীর চিত্র যে আমার মন সহজে আকৃষ্ট করতে পারে এখনো বিশ্বাস হয়?

আমি অনেকদিন বাড়ী যাই নি। মায়ের এক ছেলে, বৃদ্ধ পিতার একমাত্র সম্বল, কিন্তু তা হ'লে কি হয়, আমার লাগত ভাল ঐ মামার বাড়ী। মামাই আসচেন আমাকে মানুষ করে ছোটবেলা থেকে। আর মামী 'ওগো আমার

ছোট বাবা' বলতে অজ্ঞান হ'তেন। আমি কখনও কোনও কথার উত্তর দিতে জানতাম না, কিন্তু মামীর কথায় সময়ে সময়ে বলতাম "আমি মামীমা, তোমার ছোটবাবা' হ'তে পারবনা। ছোট বললে আমার রাগ হয়। আমি এখন ত আর ছোট নই?" আমার এ কথায় তিনি আমার উপর খুসি হয়ে কেবল 'বাবা' বলেই ডাকতেন।

মামীর বাবা হ'বার পর হ'তে এই দশবৎসর তাঁর বাড়ীতে যে সুখে দিন কেটেছে সে সুখ বোধ হয় কোনও মাতার পুত্র পেয়েছে কিনা সন্দেহ। আমি মামীর স্নেহে দিন দিন লেখাপড়া শিখে কানপুর কলেজ হ'তে বি, এ পাশ করে লক্ষ্ণৌ কলেজে এম, এ পড়াটা শেষ করবার জন্যে ভর্ত্তি হয়েছিলাম।

অনেকদিন বাড়ী যাইনি বলে পূজোর সময় দু'দিনের জন্যে বাড়ী যাওয়ার অনুরোধখানি মা বাবার নয় মামীর নিকট হ'তে পৌঁছিতে লাগলো দেখে আমার মাতৃসমা, মাতৃসমাই বা বলি কেন, মাতার অধিক সেই মামীমার কাছে পূজার ক'টাদিন কাটিয়ে দিলাম। তারপর ত্রয়োদশীর দিন সকাল বেলায় তাড়াতাড়ি দু'টী ভাত মুখে দিয়ে সকালের এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে পড়লাম।

গাড়ী চল্‌তে চল্‌তে বেলা দশটার কাছাকাছি এলাহাবাদে এসে পড়ল। আমি যে গাড়ীতে বসেছিলাম সেখানেই আমাঅপেক্ষা দু'চার বৎসরের বড় এক ভদ্রলোক উঠে বেশ দিব্য স্ফূর্ত্তির সাথে আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় চালিয়ে আমাকে এমনি আপ্যায়িত করলেন যে তাতে আমি বড় অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলাম। আমার হাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের গ্রন্থাবলী দেখে বললেন "ও ছাই পড়েন কেন? ওটা অল্প বয়সেই বুড়িয়ে দেয়। পড়তে হয় বায়রণ পড়ুন, আর পারেন শেলিকে বুকে করে ঘুমান। আপনি বোধ হয় বি, এ পরীক্ষার সময় ফিলজফি পড়েন নি। আপনার চেহারাটা ইতিহাসের মত আবছায়া আবছায়া। তা দর্শন শাস্ত্রটা যদি না পড়ে থাকেন তা হ'লে শেলির প্রেম দর্শন বলে যে ছোট একটা কবিতা আছে সেটা পড়ে ফেলুন ষড়দর্শন' পড়ার কাজ হয়ে যাবে।

ভদ্রলোকের কথায় আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বোকাই ভেবেছিলেন বলে বোধ হয়। আমি তখন পর্য্যন্ত যথার্থই নিতান্ত বোকা ছিলাম, কিন্তু তাঁর কথা গুলি আজ আমাকে কতকটা সচেতন করবার মত করে ফেললে। আমার এই অবস্থান্তর দেখে তিনি একটু মুচকে হেঁসে গুণ গুণ স্বরে কি এক মধুর রাগিণীতে হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করে এমনি শ্রোত্র বিনোদন করতে লাগলেন যে সে গানে গাড়ীর সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। তাঁর মুখ দেখবার জন্যে কেবল একজনের ঔৎসুক্য আসেনি। আমি আর তিনি মুখোমুখি হয়ে বসেছিলাম, আর তিনি যার কথা আগে বললাম তিনি তাঁর পিছনের বেঞ্চিতে বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে বসেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে চোখোচখি হ'তেই আমি ঘাড় নীচু করে ফেললাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পূর্ব্বে তাঁদের দেখিনি। তবে বোধ হয় তাঁর বাক্যচ্ছটায় যখন বাহ্যচক্ষুর দীপ্তি মন্দীভূত হয়ে এসেছিল সেই সময়েই বোধ হয় তিনি গাড়িতে উঠেছিলেন।

বিনোদ বাবু কথাবার্ত্তায় আর গানে এমনি চিত্তবিনোদন করে ফেলেছিলেন যে, আমি মৌরসী মোকররী 'ঋষিদাদা' স্বত্বটী হারাতে ব'সে গেলাম। বিনোদ বাবু এতক্ষণ তাঁকে দেখেন নি। আমার দৃষ্টি তাঁর পশ্চাতের বেঞ্চ খানিতে কেন আটকে গেছে দেখাবার জন্যে পশ্চাদ্দেশে দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন "তুমি অমন করিয়া মুখের পানেতে থেকোনা ওগো চাহিয়া।"

গানের অর্থ তিনি বা অন্যান্য যাঁরা ছিলেন কেউ বুঝতে না পারলেও শুনবার আগ্রহ কারও কম ছিল না। তিনি এবার বিনোদ বাবুর পাশে আর আমার সুমুখে বসে বললেন "বাবু আমি এই ব্যবসা করেই খাই, কিন্তু আপনার গলার আওয়াজ এমন মিষ্টি তা বলবার নয়।" এই বলে তিনি আমার চার চক্ষুর জ্যোতিঃ তাঁর চঞ্চল দৃষ্টিতে হীনপ্রভ করে বললেন "বাবু ইনিত দু'খান গান গাইলেন, আপনি একখানা গাইবেন না?"

তাঁর কথায়। বিনোদবাবু বললেন "তাই ত বেশ কথা

আমি যে একবারে ভুলে গিয়েছিলাম; আমি আপন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। গান না মশায়, একখানা গান।"

"আমি কখনও গান শিখিওনি, আর গাইতে ও পারিনে।"

"তাই কি কখন সম্ভব হয় বাবু, আপনি যে রকম পরিষ্কার উর্দ্দুতে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন, তাতে' বোধ হচ্ছে আপনি ভাললোকের সঙ্গেই বেড়ান।"

"আমি ভাল লোকের সঙ্গে ঘুরলেও কোনদিন যে গান গেয়েছি বা গান শুনব বলে বিশেষ একটা আগ্রহ দেখিয়েছি তা' আমার মনে হয় না।"

"বলেন কি বাবু! গানে যার মন যায় না তার দ্বারা সব মহাপাতকই সম্ভব।"

আমি এবারে একটু লজ্জিত হয়ে ব'ললাম "আচ্ছা আপনি আগে একখানা গান, তারপর আমি গাইব।"

"আমাদের আর গান গাওয়া বাবু! পেটের দায়ে লোকের মনোরঞ্জন করবার জন্যে জোর করে সুর গুলোকে নিয়ে টানাটানি করা। তা বাবু, টানাটানির কাজে বিশেষ কোনও রস পাওয়া যায় না। আপনাদের গানই গান। আমিও গান বুঝতে না পারলেও যা বুঝেচি তাতেই জেনেচি যে প্রাণ যদি থাকে তা আপনাদের মধ্যে। গান বাবু, আমি আপনার গান শুনব বলে আমার ওস্তাদের চোক-রাঙ্গানির ভয়টাকেও ভ্রূক্ষেপ না করে আপনার সুমুখে এসে বসেছি।"

তাঁর কথায় তিনি যে বেঞ্চিতে বসেছিলেন সেই বেঞ্চির লোকগুলোর দিকে চাইতেই দেখলাম একটী প্রৌঢ় থট-মটিয়ে আমার ও তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। আমি সে প্রৌঢ়ের দিকে চাইতেই তিনি বলে উঠলেন "বাবু মির্জ্জাপুর আসবার আর বড় বিলম্ব নাই, যা হয় একটা গেয়ে ফেলুন।"

তাঁর কাতর প্রার্থনা আমার প্রাণে স্পর্শ করলেও আমি আবার ব'ললাম "আপনি আগে গান, তারপর আমারও শুনবেন।

সেই প্রৌঢ় এইবার তাঁর প্রতি ভয়োদ্দীপক স্বরে বলে উঠল "ছোট্টন।"

প্রৌঢ়ের স্বরে ছোট্টন বড়ই দমে গিয়ে বললেন "বাবু, আমার গান শুনবেন ত অনুগ্রহ করে আজ একবার মির্জ্জাপুরে নামুন না কেন? কাল আবার এই গাড়ীতেই আপনাকে চড়িয়ে দেব। আপনিত কখনও মির্জ্জাপুর সহর দেখেন নি, গঙ্গার ঠিক উপরেই আমার বাড়ী। আমি হিন্দুর মেয়ে, গানের ব্যবসা করি বলে আমাকে নিতান্ত নীচ মনে করবেন না।"

"ছোট্টনের কথাগুলি হৃদয়ে এমনি মাদকতা ঢেলে দিলে যে তা আর বলবার নয়। তার অজ্ঞাতসারে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলাম। তার বয়স কত অনুমান হ'লনা। মনে হ'ল কুড়ি একুশের বেশী নয়। সে গানের ব্যবসা করে বেড়ায় বলে তার উপর আমার কোনও অভক্তি হ'ল না। 'আমাকে নিতান্ত নীচ মনে করবেন না' এ কথাগুলি হৃদয়ের তন্ত্রীতে কন্‌কন করে বেজে উঠল।

(৩)

গাড়ী বিন্ধ্যাচলে এসে দাঁড়াতেই ছোট্টন ব'লল "বাবু, যদি নাইই গান তবে আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা দিন। আপনি নাগরী পড়তে পারেন?"

আমি তাঁর কোনও কথার উত্তর না দিয়ে পকেটবুক হ'তে একটু কাগজ ছিঁড়ে নাগরীতেই ঠিকানা দিলাম। বেচারীকে গান শোনাতে পারলাম না বলে যে ও অনুরোধটা রাখব না এও কি কোন কথা? আমার কাণ্ড দেখে বিনোদ বাবু অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললাম "আপনার কথা রাখতে পা'রলাম না বলে মনে কিছু করবেন না।"

"না বাবু, আজ না হ'ল, মানুষ বেঁচে থাকলে আর কোনও দিন শোনা যাবে।

ছোট্টন এইবার নিজের আসনে বসে পানের বাক্স বের করে কতকগুলি পান সেজে বল্লে "দিন বাবু আপনার পানের ডিবেটা।"

"আমিত ডিবেয় রাখার মত পান খাইনে, আমাকে একটা দিলেই হবে।" আমার ডিবে নাই দেখে একটী কাশীর ছোট্ট রূপার ডিবেয় করে পানগুলি সাজিয়ে

আমার হাতে দিয়ে বললেন "অনেক দূর যাবেন ও পান ক'টা খাবেন বইকি; অন্ততঃ আমার খাতিরেও খাবেন।"

এ কথায় কি আর কোনও উত্তর দেওয়া যায়! গাড়ীর প্রায় সব লোক এই ব্যাপার দেখে ঈর্ষায় একরকম অর্দ্ধোন্মত্ত হয়েছিল। এক ভদ্রলোক আমাকে ঠাট্টা করে ব'ললেন "বাবুসাহেবের কপালজোরটা খুব বেশী, নইলে ছোট্টনের হাতের পান আজ পর্য্যন্ত মির্জাপুর সহরের কোনও বড়লোকের ভাগ্যে ঘটেচে এ কথা ত কোনও দিন শুনিনি।"

এ কথার পর ছোট্টন তাঁর কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে আবার আমার সুমুখে এসে ব'সল। আমার মত ভাগ্যবান্ ছাড়া আর কারও অদৃষ্টে ছোট্টনের হাতের পান প্রাপ্তি ঘটেনি তা বিনোদ বাবুকে দিয়ে বুঝতে পারলাম। বিনোদ বাবুর পানই হ'ল আমার সহিত ছোট্টনের পরিচয়ের পথ, অথচ সে বিনোদ বাবুকে একেবারে বাতিল করে দিলেন দেখে আমি মনে ক'রলাম এ পান থেকে অন্ততঃ দুটো পান তাঁকে দি। কিন্তু ছোট্টন কি মনে করবেন ভেবে সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারলেম না।

এইবার গাড়ী মির্জাপুরে লাগতেই তাঁর চাকরবাকরেরা জিনিষপত্র নামাতে আরম্ভ করলে আর তিনি গাড়ী থেকে নেমে প্রায় দশ মিনিট কাল আমার পাশে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই প্রৌঢ় ওস্তাদজী ষ্টেষনের বাইরে যাবার জন্য তাগাদা লাগাতেই তিনি এবার ওস্তাদজীকে ভর্ৎসনার স্বরে বললেন "চলিয়ে, যাতে হেঁ?"

এইবার গাড়ী ছাড়িল আর তিনি সজলনয়নে বলে উঠলেন "বাবুসাহেব কোন রকম অপরাধ নেবেন না।"

আমি তাঁর কথায় কোনও উত্তর দিতে না পেয়ে ছলছল নেত্রে তাঁর পানে চেয়ে থাকলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গেল দেখলাম ছোট্টন সেই একই স্থানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন। আর আমি যে গাড়ীতে আছি না মির্জাপুরে নেমে পড়েচি এ কথাও বুঝতে পারিনি। আমার অবস্থা দেখে বিনোদবাবু বললেন "আর দেখতে পাবেন না মশায়, আমার দিকে দেখুন," এই বলে বললেন "এই এক যাত্রায় পৃথক ফল বলে যে কথাটা আজ তা আমি প্রত্যক্ষ করলাম। আমি এতক্ষণ যে গলাবাজী করলাম তার পুরস্কার স্বরূপ একটা পানও পেলাম না।"

তাঁর কথায় ডিবে খুলে তাড়াতাড়ি দু'টী পান তাঁর হাতে দিতে গেলেম, তিনি বলে উঠলেন "ও জিনিষে আমার অধিকার নেই, আর তাঁর সম্মানের জন্য আপনারও দেওয়া উচিত নয়।"

এ কথায় আমি আর তাঁকে পান দিতে সাহস পেলাম না আর নিজেও খেতে না পেরে ডিবেটা পকেটের মধ্যে পুরে ফেললাম। তিনি আমি তারপর যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলাম কেউ আর কোনও বাক্য নিঃসরণ করতে পারলেম না। এই ঘটনার পর তাঁর সব স্ফূর্ত্তি যে কোথায় গেল ভেবে কিছু স্থির করতে পারলেম না। মনে হ'ল তাঁর জীবনে বোধ হয় এই রকম কোনও একটা ঘটনা কোনও দিন সম্ভবপর হয়েছিল আর সেইটাই আজ তাঁর প্রাণে আবার সেই স্মৃতির অভিনয় জাগিয়ে দিল।

মোগলসরাই ষ্টেষনে গাড়ী লাগতেই ভদ্রলোক কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে আস্তে আস্তে নেবে পড়লেন। আর আমিও তাঁর মনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে তাঁর সঙ্গে কোনও কথা বলতে সাহস না করে নির্ব্বাক্ বিদায় দিতে বাধ্য হয়ে পড়লাম।

(৪)

ছোট্টনের সাথে ছাড়াছাড়ি হ'বার পর যে কয়েক ঘন্টা গাড়ীতে ছিলাম সে সময়টা কি দীর্ঘ বলেই বোধ হয়েছিল। রাতে গাড়ীতে একটুও ঘুমুতে পারিনি। ঘুমের ঘোরে কেবল 'আমাকে নিতান্ত নীচ মনে করবেন না,' এই কথাটাই মাথার মধ্যে ঘুরেচে।

পরদিন বেলা আটটায় বাড়ী পৌঁছে, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনে সকলের কাছে বিজয়ার প্রণামটা সেরে মায়ের কাছে এসে বসলাম। আজ আড়াই বৎসর পরে বাড়ী এলাম দেখে মা বললেন "বাবা সে দেশে না পড়ে এখন এদেশে পড়লে হয় না?"

আমি বললাম "পশ্চিম অপেক্ষা এদেশে খরচ বেশী আর তা ছাড়া এতদিন সে দেশে বাস করবার পর এখন

এখানে শরীর ভালই থাকবে না। আমাকে বোধ হয় মামার মত পশ্চিমেই বাস করতে হবে দেখ্‌ছি।"

"তা বাছা যেখানে ভাল থাক সেখানেই থাক তাতে কোন আপত্তি নাই, তবে বৎসর অন্তর আমাদের দেখা দিয়ে যেতে ভুলোনা।"

আজ দু'দিন বাড়ী এসেছি, কিন্তু ছোট্টন যে একেবারে আমার সুমুখ থেকে চলে গিয়েছে এমন নয়, তবে পাঁচজন সমবয়সীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আর পাড়ার বৃদ্ধদের কাছে পশ্চিমের গল্প করে যতক্ষণ কা'টত ততক্ষণই ভাল বলে বোধ হ'ত। আহারের পর দুপুর বেলায় মায়ের কাছে মাসীর যত্নের কথা বলচি এমন সময় পিয়ন এসে একখান চিঠি এনে বল্‌লে "দেখুন ত দাদাঠাকুর, আপনি পশ্চিমে ছিলেন অবিশ্যি এ নাগরী লেখা পড়তে পারবেন।"

আমি পত্রখানির শিরনামা পড়ে ব'ললাম,—"এখানি আমার।"

আমি চিঠি পড়বার পর মা জিজ্ঞেস করলেন,—"কে লিখেছে? সব খবর ভাল ত?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করে ব'ললাম,—"আমার এক হিন্দুস্থানী বন্ধু লিখেচে, আমার সঙ্গে তার একটু বিশেষ দরকার আছে। তাহলে মা, আমাকে আজই যাত্রা করতে হয়।"

"তাই কি হয় বাছা, কতদিন পরে এলে, এখন দুদিন বাড়ী থাক। কি দরকার তাঁকে চিঠি লিখে জান, তারপর না হয় যেও।"

"এ দেশের মত আমাদের দেশে বেশী ছুটী হয় না মা। আমাদের কলেজ খুলতে চার পাঁচ দিনের বেশী নাই।"

"বলিস কি!"

"হাঁ সত্যিই বলচি।"

আবার চার দিনের দিন ছোট্টনের পত্রের উত্তর পেতেই সেই দিনই মায়ের অনিচ্ছার উপর জোর করে বাড়ী হ'তে বেরিয়ে পড়লাম। পরদিন বেলা বারটার সময় পাঞ্জাব মেলে মির্জাপুরে নেমে টিকিটখানি দিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এলাম। একখানি ঘোড়ার গাড়ীর চেষ্টা দেখতেই একজন দরওয়ান বেশধারী ভোজপুরীয়া এসে সেলাম দিয়ে বললে,—"হুজুর আপনাকে গাড়ী করতে হবে না, আমি আপনার গাড়ী ঠিক করে রেখেছি।"

"তুমি কে? কার হুকুমে গাড়ী ঠিক করলে?"

"আপনি এ গাড়ীতে আসতে পারেন বলে মাজী আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেন।"

'মাজী' যে কে তা আর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

(৫)

ছোট্টনের বাড়ীখানি দেখে ভারি আনন্দ হল। পুণ্যতোয়া গঙ্গা তার বাড়ীর উত্তর দিয়ে নেচে নেচে তালে তালে সাগর সঙ্গমে ছুটেচেন। নদীর পরপারে ছোট ছোট পাহাড়গুলির নীচে হরিদ্বর্ণের শস্যক্ষেত্র সকল ধরণীকে সবুজ রঙের শাড়ী পরিয়ে যেন শুভযোগে গঙ্গাস্নানে টেনে আনচে। কত পণ্যবাহী নৌকা কাশীর দিকে ছুটেচে আর হিন্দুস্থানী বালকেরা এখন পর্য্যন্ত জলে সাঁতার দিয়ে উদ্দাম দিগ্‌গজের ন্যায় জলক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে।

এমনিকরে শোভা দেখতেই ছোট্টন এসে বল্‌লে "বাবু সাহেব, এখন স্নান আহারটা সেরে নিন, সন্ধ্যার সময় ছাতে বসে যত পারেন গঙ্গার শোভা দে'খবেন। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি নিজে পাক করবেন না আমাদের চৌকাতেই চলবে?"

তাঁদের চৌকাতে কে রাঁধেন এ প্রশ্নের উত্তরে জানালেন তিনি কোনও ঠাকুর বামুনের হাতে খান না।

তাঁর কথায় তাঁর হাতে আমার খেতে কোনও আপত্তি থাকতে পারে এমন কিছু বু'ঝলাম না। আর তিনি যে নিতান্ত নীচ জাত নন তা তাঁর আচার ব্যবহারে বেশ প্রতীয়মান হ'ল। তাঁর ঘরখানি হিন্দু দেবদেবীর চিত্রে এমনি সাজান যে তা দেখে তাঁকে নিতান্ত নীচ জাত বা একজন নাচ্‌আউলি বলে মনে হয় না।

আমি ছোট্টনের হাতের রান্না খেয়ে যে কি তৃপ্ত হ'লাম তা আর ব'লবার নয়। ব্যঞ্জনাদি হিন্দুস্থানী ধরণের হ'লেও পাচিকাররন্ধন বিদ্যার নৈপুণ্য কোনও খানিতে ত্রুটি কম ছিল না। আমি এত খাওয়া কোনও দিন খাইনি, তথাপি আমার খাওয়া হয়নি বলে আর বাঙ্গালীরা হিন্দুস্থানী তরকারী ভালবাসে না একথা বারবার জানিয়ে ছোট্টন দুঃখ

ক'রতে লাগলেন। আমি তাঁকে বার বার বুঝালুম যে হিন্দুস্থানী আচার ব্যবহার আমার মজ্জাগত হয়ে পড়েচে আর তা ছাড়া আমি হষ্টেলে হিন্দুস্থানী ছাত্রদের সাথে বাস করি; এত বলা সত্ত্বেও ঐ রাবড়ি টুকু যাতে আমি সব খাই সেজন্য মির্জাপুর সহরের জল বাতাসের গুণ বর্ণনা করতে তাঁর জিহ্বাগ্রে সরস্বতীর আবির্ভাব হ'ল। তাঁর আগ্রহ দেখে না পারলেও সেটুকু আর ফেলে উঠ্তে পারলেম না।

আহারের খানিক পরেই ছোট্টন পানের বাক্সটী নিয়ে পান সাজতে ব'সল। একটী পান মুখে দেবার পর ব'ললাম,—আপনি অত তাড়াতাড়ি না করলে, আর দু'দিন বাড়ী থেকে আসতে পারতাম।"

"না বাবুসাহেব, আপনি খুব ভাল লোক তাই এসেচেন। মা বাপ আপনাকে অনেক দেখেছেন, আমি যে আপনাকে কখনও দেখিনি।"

এ কথার উত্তর আর কি আছে। এত আবেগ, এত সরলতা, এত স্নেহ যার মধ্যে আছে তাকে মনঃক্ষুণ্ণ করা অবিবেচকের কাজ, এই ভেবে আমি যে নিতান্ত অন্যায় কাজ করেছি মনে মনে হ'ল না।

(৬)

আজ সারা বিকেলটী ধরে ছোট্টন আমার সকল পরিচয় নিয়েছে। সে যে সেই দুপুরের পর আমার ঘরে এসে বসেছিল তার মধ্যে সে একটী বারও ওঠেনি। তার চেহারা দেখে স্বার্থপর অসতী নর্ত্তকী বলে মনে হবার কোনও কারণ ছিল না। এমন সাত্ত্বিক ভাব এমন ধীরতা, শিষ্টতা আর ভদ্রতা অনেক ভদ্র মহিলার আছে কি না সন্দেহ। প্রথম দিন আমার মন তার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়েছিল সেজন্য তার সাম্‌নে ঘাড় তুলে কথা কইতে পারিনি আজ কিন্তু তার সঙ্গে নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় সকল দুখ সুখের কথা বলা হ'ল। কিন্তু হ'লনা কেবল শোনা তার দুখের সুখের কথা। ভাবলুম তাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলে সে ব্যথিত হলেও হতে পারে, কাজেই না জান্‌তে ইচ্ছা হওয়াই ভাল।

যে গান গাওয়ার কথা নিয়ে ছোট্টন আমার সঙ্গে পরিচয় করবার অবসর পেয়েছিল সে গানের কথা একেবারে চাপা পড়ে গেল, কাজেই আমিও আর তার গান শুনব বলে কোনও চেষ্টা পেলামনা। সন্ধ্যা হয়ে এল দেখে আমরা উঠ্‌তেই সেই ওস্তাদজী এসে জানালেন "লছমনপ্রসাদ বাবু উকীলের বাসাতে কাল গান হবে তাই তাঁর সরকার এসে নীচে বসে আছেন, বলত তাঁকে ডেকে আনি।"

"না ওস্তাদজী কাল কোথাও যাবার আমার ফুরসৎ হবে না। বাবুসাহেবের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা, উনি যে কদিন এখানে থাকবেন সে কদিন আমি কোথাও যেতে পা'রবনা।

আমি বললাম "আমার জন্যে আপনার কাজের ক্ষতি করেন কেন? আমাকে কালই লক্ষ্ণৌ যেতে হবে আমাদের কলেজ খুলতে ত আর দেরী নাই।"

"আপনি দু'দিন এখানে থাকবেন আর তাই যদি লোকসান মনে ক'রব তা হ'লে আপনাকে এত কষ্ট দিয়ে আ'নব কেন বলুন ত?"

ছোট্টনের কথায় মোহিত হয়ে কোন উত্তর দিতে পারলেম না। কিন্তু ওস্তাদজী তাঁকে জানালেন যে কাজটা ভাল হল না। অতবড় লোকের বাড়ী না যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

"ওস্তাদজী আপনি ভুল বুঝচেন, গান কি যখন তখন গাওয়া যায়? তার কি একটা সময় অসময় নাই? তা'হলে গান জিনিষটার কোনই সম্মান থাকে না, তাঁদের বলে আসুন দেয়ালীর দিন তাঁদের আমি গান শুনিয়ে আ'সব।"

(৭)

ছোট্টনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনদিন তার বাড়ীতে বাস করে লক্ষ্ণৌয়ে পড়াশুনায় মন দিয়েছি এমন সময় একদিন একখানি রেজেষ্ট্রী খামে দেখি আমার নামে পঞ্চাশ টাকার নোট আর তারই সঙ্গে একখানি চিঠি।

ছোট্টন লিখ্‌চে "নোট পাঁচখানা দেখে ভয় পাবেন না। এগুলি আপনারই। পূর্ব্বজন্মে আপনি আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন এখন যাতে সেই ঋণ শোধ হয় তার যেন অবসর পাই। অধিক আর কি লি'খব মাঝে মাঝে

কুশল সংবাদ জানাতে যেন ভুলবেন না। এ সংসারে আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ নাই, তবে আপনি আমার আত্মীয় না হলেও আমি আপনাকে তার চেয়ে বেশী বলে জানি।"

ছোট্টনের কীর্ত্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এ টাকা নিয়েই বা কি করি? আর যদি ফিরিয়ে দি তা'হলে তার নিঃস্বার্থপর প্রাণে বড় বা'জবে। তার মত লোকের প্রাণে ব্যথা দেওয়াটা কি উচিত? কিছুই ভেবে না পেয়ে তাঁকে লিখলুম "ভাল কাজ করেন নি। কেন আমার ঋণ বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলুন ত?

উত্তর এল "বেশ, তাই যদি মনে করেন, চাকরী করে শোধ করবেন। তা হলেই ত চলবে?"

আমি আর যে কোনও উত্তর দিব তার কোনও পথ থা'কল না, কাজেই ঘাড়পেতে টাকাগুলি নিতে বাধ্য হ'লাম। আর লিখে পাঠালাম "এ রকম করে টাকাকড়ি পাঠাবার দরকার নাই, আমি মাঝে মাঝে গিয়ে নিয়ে আসব, নইলে লোক-জানাজানির মধ্যে পড়ে যা'ব।"

ছোট্টনের জন্যে মামা মামী সবাইকে ভুলতে বসেচি। তাঁদের চিঠির উত্তর দিতে ভুল হলেও ছোট্টনের পত্রের উত্তর যেতে বেশী বিলম্ব হয় না। ছোট্টন যে আমার কে, তা এখনও বুঝতে পারিনি। মোহের টানে প্রথম দিন যখন তার বাড়ীতে পা দিলাম তখন হৃদয়টা দুর দুর করে কেঁপে উঠেছিল। ভেবেছিলাম এইবার বুঝি নরকের সোজা পথ পেলেম, কিন্তু যাকে নরক ভেবে প্রবেশ করেছিলাম লক্ষ্ণৌ ফিরবার দিন তাকে পুণ্যধাম ব'লে মনে মনে নমস্কার করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

বড়দিনের ছুটীতে যখন কানপুর না গিয়ে ছোট্টনের দরবারে হাজির হ'লাম আর মামা তাঁর পত্রের উত্তর পেলেন না, তখন তিনি মামীর অনুরোধে লক্ষ্ণৌ এসে হাজির হলেন। ছুটীর পর ফিরে এসে যখন সব কথা শুনলাম তখন আর কোনও গোলমাল না করে কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে কলকাতা এসে পড়লাম। এতবড় সহর কে কোথায় থাকে তার ঠিকানা নাই, তাই বলে ছোট্টন আমার সাথে কলকাতা আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আমি কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে তারই পয়সায় এম,এ, বি,এল পাস করে ফেললাম।

কলকাতা আমার মা বাবা খুব আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন। কিন্তু কিসে আমার খরচ চলে এ কথা জানবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ হ'লেও আমার বন্ধুর ঋণের দোহাই দিয়ে এক রকম বুঝিয়ে দিলাম।

(৮)

বি,এল পাশের পর ছোট্টনের বাসায় হাজির হ'লাম। এতদিন পড়ার তাড়নায় তার সঙ্গে ভাল করে কোন কথা বলবার ফুরসৎ পাইনি। আজ কিন্তু সন্ধ্যার পর ছাদের উপর বসে তার সমস্ত পরিচয় পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে প'ড়লাম। তাই দেখে ছোট্টন বললে "এতদিন জিজ্ঞাসা করেননি কেন? প্রথম জিজ্ঞাসা করলেই পারতেন। আপনার ধৈর্য্যকে বলিহারী যাই বাবু! আমার কিন্তু কিছুমাত্র ধৈর্য্য নাই।"

তারপর ছোট্টন আরম্ভ করলে "বাবু, আমি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমার বাবা ছিলেন একজন বড়লোকের বাড়ীর দশ টাকা বেতনের সরকার মাত্র। আমরা কনোজিয়া ব্রাহ্মণ, পিতার পূর্ব্ববাস ছিল ফয়জাবাদ জেলায়, কিন্তু অনেকদিন কাশীতে কর্ম্ম করায় সেখানকার একরকম বাসিন্দেই হয়ে পড়েছিলাম। আমি পিতার সন্তানাদির মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। মায়ের ছেলেপিলে কিছুই বাঁচত না, শেষে বিশ্বেনাথের অনুগ্রহে আমাকে পেয়ে তাঁরা আমার নাম রেখেছিলেন 'অন্নপূর্ণা'। আমি সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতা মাতার আদর যত্নে বেশ সুখে কাটালাম কিন্তু সেবারকার বসন্তরোগে কাশী উজাড় হবার যোগাড় হয়ে উ'ঠল দেখে বাপ মা আমাকে নিয়ে পরদিন পালাবার সংকল্প করতেই রাতের মধ্যেই তাঁরা সাংঘাতিকভাবে মা শীতলার নয়নে পতিত হ'লেন।

তাঁরা চলে গেলেন আর আমি বাড়ীর পাশে একটী হিন্দু বৃদ্ধা বাইয়ের বাড়ী আশ্রয় পেলাম। সে বললে তুমি আমার বোন্‌ঝি, কিন্তু বাবু, তার কথা আমার বিশ্বাস

হ'ল না। আর না হলেও বাইজীরা কোথা। আমার তখন হ'ল কি রকম জানেন ডুবন্ত মানুষের তৃণের আশ্রয় নেওয়ার মতন। সে আমাকে আদর যত্নে খুব বশ করে গান শিখাতে আরম্ভ ক'রল, তারপর বার বৎসর বয়স হ'তে আমাকে সঙ্গে করে বড় বড় মজলিশে গাইয়ে নিয়ে বেড়াতে লা'গল। এসব কাজে কোনও দিন আপত্তি করিনি আর তখন আমার আপত্তি করবার মত শক্তিও হয়নি। তারপর যখন যৌবনে পদার্পণ করলাম তখন রূপ গুণের সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে মধুকরের গুঞ্জন আমার বাসার চারিদিকে অস্পষ্ট শোনা যেতে লা'গল। এখন নিজেকে বাঁচাবার কোনও উপায় না দেখে নিজমূর্ত্তি ধারণ করলাম। বুড়ীকে একেবারে সম্পূর্ণ অধীন করে ফেললাম আর ঐ যে বুড়ো দরওয়ান দেখচেন ওর সঙ্গে ধর্ম্মবাবা সম্বন্ধ পাতিয়ে আমার দুয়ারে বসিয়ে রাখলাম, তা ছাড়া যে মাইফলে যেতাম ওঁর সঙ্গছাড়া কোথাও যেতাম না। এত করেও কাশীরমত গুণ্ডাপ্রধান স্থানে যে নিষ্কৃতি পা'ব তার উপায় থা'কল না। একদিন বাড়ীতে ডাকাত-পড়া হয়ে আট দশ জন গুণ্ডা এসে হাজির হ'ল। বৃদ্ধ আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়ে পড়লেন। আমি নিজের ধর্ম্মরক্ষার ভয়ে পায়খানার ছিদ্র পথ দিয়ে কোনও রকমে পায়খানায় লুকিয়ে থাকলাম। গুণ্ডারা আমার সন্ধান কোথাও না পেয়ে আমার জিনিষপত্র লুটতরাজ করে চলে গেল। তার পরদিন আমি কাশী ছেড়ে এখানে এসে "ছোট্টন বাই" হয়ে পড়লাম।

এখানে আসবার পর কোনও বিপদ হয়নি। একজন হাকিম আমার গানে মুগ্ধ হয়ে আমাকে বন্দুকের পাশ দিয়ে গেছেন, তা ছাড়া রাতে দু'জন পুলিশ সশস্ত্র আমার বাড়ীর চারিদিকে পাহারা দেবে এ ব্যবস্থাও করেছিলেন। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার বৎসরখানিক আগে বুড়ী মারা গেছে। বুড়ী আমার ভাল করলে কি মন্দ করলে এখনও তা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। তবে আমি নর্ত্তকীর ব্যবসা করলেও ভগবানের চক্ষে যে কোনও অপরাধী নই এ কথা ব'লবার অহঙ্কার আমি সম্পূর্ণ রাখি।"

(৯)

ছোট্টনের কথাগুলি এতক্ষণ খালি শুনছিলাম তা নয়, তার প্রতি অক্ষর যেন গিলেই ফেলেছিলাম। মাচের ব্যবসা করলেও সে যে পূজার ফুলের ন্যায় পবিত্র তা তার প্রথম দিনের আচরণেই টের পেয়েছিলাম। নইলে ছাত্রদলের 'ঋষিদাদা' কখনই তার দিকে নত হতে পা'রত না। ছোট্টনের আত্মপরিচয় শুনবার পর বললাম "তুমি নিজের পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্তে এত চেষ্টা করে হঠাৎ এ ব্রাহ্মণ কুমারের দিকে সদয় হয়ে পড়লে কেন?"

"তার কারণ কি শুনবেন? আমাদের বাড়ীর পাশে একটী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন, তাঁদের বাড়ী যাতায়াত আমার খুবই ছিল। তাঁদের বাড়ীতে আমার সমবয়সী একটী ছেলে ছিল সে দেখতে হুবহু আপনারই মত। আপনি যে তিনি নন তা আমি তখনই চিনতে পেরেছিলাম। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খেলাধুলো করে এমনি একটা টান হয়েছিল যে সেই সাত বছর বয়স হ'তে ছাড়াছাড়ি হলেও তাঁকে এখনও ভুলতে পারিনি। তিনি আর ইহলোকে নাই, সেই দুরন্ত বসন্তে তিনিও শীতলার ক্রোড়ে বিরাম-সুখ ভোগ

ছোট্টনের এই দুঃখের কাহিনীর মাঝে আমি হঠাৎ আনমনে বলে উঠলাম "আমরাও মূলে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছোট্টন। তুমি যখন এতদিন পর্য্যন্ত নিজের সমস্ত পবিত্রতা রক্ষা করে এসেচ তখন তোমার আমার একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ পাতালে হয় না?

ছোট্টন জিব কেটে বললে "ও কথা মুখে এননা, তুমি যে আমার ছোট ভাই। আমি যখন তোমার মোহ কাটিয়ে উঠেচি তখন তোমার জীবন সমাজের চক্ষে ঘৃণিত করি কেন! আমি সতী হলেও সমাজে আমাকে গণিকা ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। তা ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীতে বিবাহ হ'লে আমরা কোন্‌ সমাজ পাব বল দেখি ভাই?"

আমি তাঁর কথায় কোনও উত্তর দিতে না পারায় তিনি আবার আরম্ভ করলেন "তুমি ভাই বিয়েথা করে ঘর সংসার কর, আমি দেখে সুখী হই।"

"সে কথা পরে হবে দিদি, এখন তোমার সঙ্গে যখন একটা গুরুতর সম্বন্ধ হ'ল তখন তোমাকে আমার অনুরোধে এ ব্যবসা ছাড়তে হবে।"

আমার কথায় অন্নপূর্ণা দিদি ব্যবসা ছেড়ে আমার সঙ্গে সুদূর পশ্চিমে বাস করছেন। তাঁর আমার এখন প্রধান কর্ত্তব্য হয়েছে পতিতা নারীগণকে জ্ঞানালোকে আনা।

আবাহন

[শ্রীমতীবীণা দেবী]

গভীর নিশীথে কর্ম্ম কাতর
আবাহন বাণী কার,
স্তব্ধ হৃদয়-দুয়ারের দ্বারে
শুনা যায় বারে বার ?

পরিহরি' সুখ অলস তন্দ্রা
করম জীবন তরে,
কাতর কণ্ঠে ডাক দিয়া যায়
করম-বিহীন নরে।

বিশাল বিশ্ব, বিপুল সাধনা
মানব-জীবন ময়।
কর্ম্ম প্রবাহ প্রবল দেখিয়া
কেন মিছে পাও ভয় ?

বসিয়া কি সুখ স্বপনের কোলে
কি কাজ করিবে তুমি,
কল্পনা তব ব্যবধান হবে
আকাশ পাতাল ভূমি।

বদ্ধ জীবন মুক্ত করগো
হৃদয় রক্ত ঢালি'
সাধনা পুষ্পে অঞ্জলি দাও
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি।

পল্লীবাণী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

পল্লীর বাণী আজ আশার নহে উৎসাহের নহে, বাঙালীর পক্ষে তাহা প্রশংসার বা গৌরবের নহে—তাই আজ বাঙলার গ্রামের কথা বলিতে গেলে চক্ষে জল আসে, ক্রোধে দুঃখে মর্ম্মবেদনায় হৃদয় ফাটিয়া যায়—বলিবার অনেক কথা আছে, তাহা অনুভব করি, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিনা—'জুজুর ভয়ে' নয় আত্ম-বিস্মৃতির যে দৈন্য তাহা যে কেবল আমাদিগকে হতাশ করিতেছে তাহা নহে, দারুণ লজ্জা দিতেছে।

প্রথম অন্নাভাব—দরিদ্র বাঙালী অন্নাভাবে দিন দিন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, হতভাগ্য বাঙালী দিনরাত গতর মাটি করিয়াও একমুঠা পেটের ভাত করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—দুর্ব্বল বাঙালী আপনার প্রয়োজনের অনুরূপ পরিশ্রম করিতে পারিতেছে না, রুগ্ন বাঙালী শয্যায় পড়িয়া দিনরাত্রি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে—ঔষধ নাই পথ্য নাই, যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের অর্থ নাই, যাহারা দুবেলা দু' মুঠা খাইতে পাইলে অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারে তাহারা অনাহারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে—কেহ বা উপায়ান্তর না দেখিয়া চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি হীন কার্য্যের দ্বারা আপনার উদর পূরিত করিতেছে মাত্র। সর্ব্বাপেক্ষ শোচনীয় অবস্থা মধ্যবিত্ত পরিবারের—তাহাদের না এদিক না ওদিক—এই শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে অধিকাংশই চাকুরী-জীবী। পেটের দায়ে তাহারা অধিকাংশ সময় কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর মেস কিম্বা অন্ধকূপ বাড়ীতে বাস করিয়া দিন দিন হীন-পরমায়ু হইয়া পড়িতেছে, নিজের গ্রামের দুরবস্থার দিকে চাহিবার পর্য্যন্ত তাহাদের অবকাশ নাই। গ্রামের এমন সঙীন অবস্থা যে সেখানে গিয়াও মধ্যবিত্ত পরিবারের থাকা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের জমাজমি নাই চাষবাস নাই, যাহাকে সম্পত্তি বলে তাহা তাহাদের কিছুই নাই—কেবল চাকুরী ভরসা। মাসকাবারে সেই ৩০ হইতে ৭০ টাকা সম্বল করিয়া বাঙালী কোনদিক সামলাইবে? গ্রামে ডাক্তার নাই বৈদ্য নাই, অনাহারে আর রোগে গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে; জলকষ্টে গ্রামে গ্রামে অনেক নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। হাতুড়ে ডাক্তারের একচেটিয়া ব্যবসায়ের রোগ নির্ণয় একমাত্র জ্বর ও অতিসার, তাহাতে এইসব নোতুন রোগের কোনও প্রতিকার হয় না;—তার উপর বাঙালী অনাহারে একেবারে জরাজীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া থাকে একটুমাত্র রোগের আক্রমণেই সে একেবারে নুইয়া পড়ে—সমস্ত দেহ যন্ত্রের বিকলতায় বাঙালী অত্যন্ত দুর্ব্বল, রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার মত শক্তিও তাহার নাই।

চাউলের দর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। নদীয়া, যশহর, খুলনা, ত্রিপুরা, ঢাকা, ২৪ পরগণা, প্রভৃতি প্রত্যেক জেলায় ১০৲ টাকা মণ হিসাবে চাউল বিক্রয় হইতেছে।

দরিদ্র কৃষক উৎপাদন করিয়া অনাহারে মরিতেছে, চাকুরীজীবী বাঙালী চাকুরী করিয়া খাদ্যের সঙ্কুলান করিতে পারিতেছে না—কিন্তু আমরা অন্ধ হইয়া পঙ্গু হইয়া বসিয়া আছি। আমাদের উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় গেল, কেমন করিয়া গেল, কে উড়াইয়া লইয়া গেল তাহার কোনও খোঁজ খবর রাখিতেছি না—রাখিলেও আমাদের প্রতিবিধানের কোনও চেষ্টা নাই।

আমাদের কর্ত্তব্য এখন গ্রামে গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যের বাঁধাই করা—ব্যবসাদারের কাঁচা টাকায় ভুলিলে আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। আমাদের দেশের ধনী জমিদারগণ কি করিতেছেন? তাঁহারা কি মনে করেন এক খাজনা আদায় করা ছাড়া তাঁহাদের আর কোনও

কর্ত্তব্য নাই?—তাঁহারা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ এই অনাহার ও তজ্জনিত মৃত্যুর জন্য দায়ী। প্রজাবর্গের এই দুর্গতির জন্য অন্ততঃ বিশ্বদেবতার দরবারে তাঁহাদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন? বাঁকুড়ায় ত চিরন্তন দুর্ভিক্ষ—তা ছাড়া পুরী জেলায় দুর্ভিক্ষ, ময়ুরভঞ্জে দুর্ভিক্ষ, বগুরায় দুর্ভিক্ষ—এই সব রাষ্ট্র-অশান্তির প্রতিবিধান কে করিবে?

হাঁ, আমাদের কর্ত্তব্য আগে, কিন্তু চারিদিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বেশ বুঝা যায় আমরা কতদূর নিরুপায়;—কি ভীষণ ভারী পাষাণের চাপ আমাদের বুকের উপর অহর্নিশি আমাদিগকে মাটির সহিত পিষিয়া ফেলিতেছে—আমাদের সমাজ, আমাদের শিক্ষা, আমাদের শাসন আমাদের পারিপার্শ্বিক কোনও আশ্রয়ই আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই দারুণ দুর্দ্দৈবের সময়—রাষ্ট্রশক্তির সদ্ব্যবহার না করিলে দরিদ্র বাঙালী প্রজা আমরা অচিরেই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইব। আমাদের অভাব বলিবার নহে, লজ্জার কথা—ঘৃণার কথা,—কোনও সভ্য-জগতে এই অভাব এমনিভাবে দিনের পর দিন অবজ্ঞাত হইয়া থাকিত না—আমাদের বক্তৃতার সময় আর নাই কাজের সময় আসিয়াছে।—

"অন্ন চাই স্বাস্থ্য চাই—চাই পরমায়ু"

জলকষ্ট। বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট। এমন কোন জেলা নাই যেখানে উপযুক্ত সুপেয় জলের ব্যবস্থা আছে। এই পানীয় জলের অভাবে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, কলেরার আক্রমণ—উপযুক্ত জলাশয়ের অভাবে অবগাহন ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার কোনও উপায় নাই, ফলে খোস পাচড়া প্রভৃতি নানাবিধ চর্ম্মরোগ। নদীয়া, যশোহর, মালদহ জেলার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রাম—নীলকুঠিয়ালদের সময় খুব বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, আমরা নিজে এই গ্রামের কথা বলিতে পারি—একমাত্র জলকষ্টের জন্য এই গ্রামখানি প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই গ্রামে একমাত্র জলাশয় 'দোহাবিল' এখন প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে—এই বর্ষার সময় যেটুকু জল আছে তাহা রক্তবর্ণ দাম শেওলা ও পাঁকে ভরা—আর দু'দিন পরে ওই বিলের উপর দিয়া অনায়াসে লোক চলাচল করিতে পারিবে। গ্রীষ্মকালে গ্রামবাসী দরিদ্র প্রজার দুর্দ্দশা দেখিলে সত্যই কষ্ট হয়। অথচ গ্রামে এমন সঙ্গতিপন্ন লোক নাই যিনি অনায়াসে এই বিলের পঙ্কোদ্ধার করিতে পারেন—গ্রামের জমিদার বোধহয় এবিষয় সম্পূর্ণ উদাসীন নতুবা তিনি গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া একটা কিছু কাজ করিতে পারেন! আর তা' ছাড়া মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের কোনও রকমে দিন গুজরান হয়—দু' এক-জন অবস্থাপন্ন লোক আছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের তেমন উৎসাহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ গ্রামবাসী জলকষ্টে রোগজীর্ণ হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে—তাহাদের নিজের কোনও চেষ্টা কোনও পরিশ্রম নাই—পরে কবে করিয়া দিবে সেই আশায় অজ্ঞ গ্রামবাসী বসিয়া আছে। এইসব অজ্ঞানতা ও আলস্য দূর করিতে হইলে চাই লোকশিক্ষকের দল! আমরা বিদ্যার অভিমান লইয়া সহরে বসিয়া শুধু নাম জাহির করিবার চেষ্টায় আছি এইসব সামান্য কারণ লইয়া মাথা ঘামাইবার মত অবকাশ কোথায়? হায় বাঙালী তোমারই গ্রাম শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে, তোমারই ভাই, অনাহারে জরাজীর্ণ,—সামান্য একটা আশার কথার প্রত্যাশী—খাদ্য নাই, শয্যা নাই, সুখ নাই, স্বাস্থ্য নাই—তুমি সহরে বসিয়া কোন লজ্জায় প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা করিতেছ?—তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ভরিয়া দুষ্টক্ষতের দাগ তোমারই অসাবধানতার নিদর্শন দিতেছে, আর তুমি জাগিয়া চোখ বুজিয়া আছ? এই পঙ্গু, এই অসার, এই জীর্ণ কঙ্কালসার জীবন লইয়া তুমি সভ্যতার গর্ব্ব কর, বিদ্যার কেরদানী দেখাইয়া খেতাবী বাবু সাজিতে চাও!—লজ্জাও করে না।

শিক্ষাভাব—এই সমস্ত অজ্ঞানতা এই সব মূঢ়তা দূর করিতে হইলে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার পদ্ধতি যে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এ কথা এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন। আমাদের

বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের পল্লীজীবনের কোনও সুখ দুঃখেরই খবর রাখেন না—পল্লীবাসী ছাত্রগণকে আপনার মত শিখাইয়া পড়াইয়া মানুষ (?) করিয়া আপনার স্বীয় নামাঙ্কিত শিলমোহর করিয়া দেন—আমার গ্রাম, আমার গ্রামবাসী এ জ্ঞান আমার কোথায়?—আমার শিক্ষার মধ্যে আমার গ্রাম সম্বন্ধে কোনও কথা নাই, আমার দেশের দৈন্য কোথায়—তাহার প্রতিবিধানের উপায় কি এসব আমার কেতাবী-বিদ্যার বাহিরে, কাজেই পিছন ফিরিয়া গ্রামের দুরবস্থা দেখি, বড়জোর একআধবার হা হুতাশ করি—তার বেশী করিবার মত শিক্ষা আমার নাই।

কাজেই আমার শিক্ষার একটা অঙ্গ পঙ্গু হইয়া আছে—'কাণা গরুর' মত একদিকেই ঘুরিতেছি।

আমাদের শিক্ষা চাই—গ্রামবাসীদেরও শিক্ষা চাই। শুধু আমার শিক্ষা হইলেই কোনও কায হইবে না—"কালার কাছে রামায়ণ" পড়ার মত সবই বিফল হইবে। পরস্পর অনুভূতি ও চিন্তার অল্পাধিক বিনিময় না থাকিলে কোনও দশের কাজে সফল হওয়া যায় না। গ্রামবাসীর অজ্ঞানতায় অনেক নূতন অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে—শুধু যে এই অনাহার ও ব্যাধির অনর্থ আমাদিগের ক্ষতি করিতেছে তাহা নহে—ঈর্ষা, দ্বেষ, অশুভ-ইচ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় অকল্যাণকর প্রবৃত্তির দাস হইয়া গ্রামবাসী এখন পাকা মামলাবাজ, স্বার্থপর ও প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের কোনও কাজে তাই এত দলাদলি মতদ্বৈধতা! এইসব দূর করিতে হইলে "চাই দেশব্যাপী শিক্ষা, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, নগরে নগরে বিদ্যালয়, জেলায় জেলায়, কলেজ, শিক্ষাপরিষৎ। চাই জড়ের জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান যথেষ্ট আছে। চাই রোগের নিদান বুঝিতে, রোগের প্রতিকার করিতে, চাই পাথরে সোনা ফলাইতে, চাই বিনা মেঘে বৃষ্টি ঝরাইতে, চাই ধনধান্যে দেশ ভাণ্ডার বোঝাই করিতে, চাই ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুদ্‌ব্যোম পঞ্চদেবতাকে জাতীয় যজ্ঞশালার দরজার কাছে হুকুম তামিল করিবার জন্য হাজির থাকিতে। অজ্ঞান, অনশন, অস্বাস্থ্য এই তিন অপদেবতাতে যেন যজ্ঞহানি না করে।"

আমরা মোটামুটিভাবে পল্লীগ্রামের কথা বলিলাম। আগামী সংখ্যা হইতে অভাব, অভিযোগ, ঘটনা প্রভৃতির অবতারণা করিয়া প্রতিকারের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

—o—

পঞ্চামৃত

মাতৃত্বের সাধনা।

মেয়েকে মাতৃত্বের গৌরব বুঝাইয়া দাও—বুঝাও যে অতবড় গৌরব রাজরাজেশ্বরীরও নাই। ছেলে কোলে মায়ের মত বর ও অভয়ের অমন ছবি, প্রেম ও নির্ভরের অমন চূড়ান্ত মেলা, স্বর্গ ও পৃথিবীর অমন পাবন সঙ্গমতীর্থ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মায়ের কোলের ছেলে—ও ত ছেলে নয়, ও যে দেশ—ওযে পুরাতনের সবটুকু, আবার ভবিষ্যতের আরো কত কি। মাকে স্তন্য দিয়া তাহার কোলের সেই নন্দনের কুঁড়িটিকে বর্ণে মধুতে গন্ধে শতটি দলের নয়নরঞ্জন শোভায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মা শুধু শিশুর দেহের মা নয়, তাহার কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলির মা, মুকুলিত জ্ঞানের প্রতি দলটির মা, আত্মার অন্তর্লীন দেবত্বটি অবধি ধরিয়া জীবনের সবটুকুর স্তন্যদায়িনী মা; পশুর মা আর মানুষের মা যে এইখানে তফাৎ।

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।

নারায়ণ—বৈশাখ।

বাঙালীর অবনতি

বাঙালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity আছে, intuition আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ঠ নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীরশক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা' হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হ'য়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না; সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। তারপর অবসাদ তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার; ধনদৌলত, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ কচ্ছে। শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই (সেখানে) প্রেমও থাকেনা, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এদেশে আছে; ভেদক্লিষ্ট ভারতে ও আর কোথাও ত নাই। আর্য্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁক ডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত তা'রা, তা বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ
নারায়ণ—জ্যৈষ্ঠ।

নূতনের পথ।

আজিকার ভারত অভিনব পন্থা ধরে নাই কি? নব্যতন্ত্রের কাছে পুরাতনের জবরদস্তি সত্যই কি অমোঘ অপ্রতিহত? নূতনের মধ্যে, সহস্র যুগযুগান্তর নিশ্চিতত্ব, গতানুগতিকের উপর কোটী অযুত মানবের অনন্তনির্ভর এ সমস্তের প্রভাবই শ্লথ হইয়া আসে নাই কি? যাহার ভূত বলিয়া কল্পিত পদার্থটার প্রতি অন্ধবিশ্বাস একবার চলিয়া যায় তাহার কাছে পথে ঘাটে লোকের সাতঙ্ক আড়ষ্টভাব কৌতুক জাগায় মাত্র।

দেশের মধ্যে জাতিনাশ সমাজচ্যুতি নরক প্রভৃতির ভয় সম্বন্ধে এমনিভাব আজ আসে নাই কি? রাত্রির চক্ষের পাতায় ঘনায়মান ঘুম পরিপূর্ণ বিশ্রামের মধ্যদিয়া অপসারিত হইয়া গেলে প্রভাতে যেমন স্বচ্ছ—স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি পুনরায় ফিরিয়া আসে, তেমনি অতীতের ইতিহাসে শ্রুত হাজার হাজার বছরের ভ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়া এমন একটা কিছু ফিরিয়া আসিতেছে, চেষ্টা ছিল না, বহুকাল গিয়াছিল। এটা যদি ভ্রমের যুগের অবসানে স্বপ্নদৃষ্টির পরিবর্ত্তনে সত্যদৃষ্টির সঞ্চার বলা যায়, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে সত্যের যুগাবির্ভাব সন্নিকট।

শ্রীসত্যবালা দেবী।

জনসাধারণের শিক্ষা

সম্প্রতি লণ্ডনের এক পল্লীপাঠাগারের কর্ম্মাধ্যক্ষ লিখিয়াছেন—

"আমাদের পুস্তকালয় হইতে যে সব গরীব ও নিম্নশ্রেণীর লোক নিয়মিতরূপে বই লইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একজন পাহারাওয়ালা আছে, সে কেবল সমাজবিজ্ঞান (Sociology) সম্বন্ধে পুস্তক পড়িতে ভালবাসে; একজন বড়লোকের দারোয়ান আছে, তাহার প্রধান পাঠ্য মনোবিজ্ঞান (Psychology); দুইজন ছেঁড়া ন্যাকড়া সংগ্রাহক আছে তাহাদের একজন বৌদ্ধধর্ম্ম এবং আর একজন ললিত কলার (Fine Arts) সম্বন্ধে পুস্তক অত্যন্ত পছন্দ করে।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় শিক্ষার পথে আমরা কতদূর পিছাইয়া আছি। এমন কি এ পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা জন-সাধারণের মধ্যে উপযুক্তভাবে প্রসার লাভ করে নাই—বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা লজ্জার কথা।

হিন্দুস্থান।

—o—

দ্বীপান্তরের বাঁশী

[শ্রীপদ্মপাদ দেবশর্ম্মা]

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাপ্তিস্থান—৪।১ বাজাবাগান জংসন রোড্ এবং অল্ ইণ্ডিয়া পাবলিশিং কোম্পানি ৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৲ একটাকা।

দ্বীপান্তর-নির্ব্বাসিত কবির দুঃখময় জীবনের এই অভিব্যক্তি আমাদের কাব্য সাহিত্যের এক নূতন সম্পদ। বস্তুগত জীবনের অভিজ্ঞতা যেরূপ অসাধারণ, রসানুভূতি সেরূপ তীব্র, এবং ভাবসাধনাও সেরূপ তন্ময় হইয়াছে। বজ্র আঁকা যাঁর চরণ, যাঁর মুখ ভ্রূকুটিকুটিলতাপূর্ণ তাঁকে আদর করিয়া হৃদয়ে ধরা গভীর অনুভূতি সাপেক্ষ। আর কেহ দুঃখকে এমন করিয়া চিরবাঞ্ছিতের মত বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না—

যত মম দুখ যতগো বন্ধন
ঘিরি দু'টী ঐ চম্পক চরণ
তব লীলা নৃত্যে বাজি
ছন্দে উঠে বাজি
নিখিলেরি দুখ নাশিবে।

দুঃখকে সাথী করিয়া তাই তিনি ব্রজের নিকুঞ্জ পথ চিনিতে পারিয়াছেন—তাই তিনি 'বঁধু আঙ্গিনায় দুখের বেসাতি' করিতেছেন।—

ব্রজের নিকুঞ্জ পথ দুখ যে চিনায়ে দেয়,
পাপ ব্যথা বাঞ্ছ তার অবলাবে
বুকে নেয়।

* * * *

তারি তো আচলে গিট
এ মায়ার ফাঁসি,
মোর সাধিয়া নিগড় পরা
আমি যেচে কারাবাসী।

কবির দুঃখানুভূতির মধ্যে মানুষী সন্দেহ ও সংশয় তিরোহিত হইয়া কবির প্রাণের মধ্যে একটা 'জাগরণ' সাড়া দিয়াছে

বিকায়েছি ওগো কত যে চরণে
কত যে করেছি পর
কে জানিত বল দুখের ধূলায়
এ পথে তাহারি ঘর?

দুঃখ ও বিপর্য্যয়ের হলাহল মন্থন করিয়া যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, কবি তাহাই আমাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। আর দিয়াছেন পাপের মধুর সান্ত্বনা, দুষ্কৃতির অমোঘ অভয়! পাপকে তিনি মধুর মিলনের অন্তরায় বলিয়া মনে করেন না—

অভাগীর পাপ কথা কি দোষ হয়েছে তায়?
ভুলাক কাঞ্চন সাজে যে তারে ভুলাতে চায়।
এ অঙ্গে কালিমা ধূলি
তার, পরাণে বেজেছে বলি
তোদের দুখের স্বামী এত সুখে মোর হয়—

কবিহৃদয়ের ইহাই সর্ব্বংসহা উদারতা!

জীবনের পতন আছে সঙ্গে সঙ্গে মার্জ্জনা আছে বলিয়া চিরদিন নীতিবিদ্ পণ্ডিতগণের অবজ্ঞা ঘৃণাকে উপেক্ষা করিয়া পতিত প্রাণ সান্ত্বনা পায়।

পাষাণে পড়িয়া বড় চরণে লেগেছে ব্যথা
দরদে সোহাগ ভরে সে তাই বলেছে কথা

শুষ্ক নীতির বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুনকে যাহারা একান্ত করিয়া দেখে, মানুষের প্রবৃত্তি ও অনুভূতির যাহারা কোনও খোঁজ রাখে না অথবা রাখিলেও যারা মনকে চোখ রাঙ্গাইয়া "আপ্তবুলি" আওড়ায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

তোরা যত দিলি গালি
সে কাছে টানিল খালি

তোদের এ কুলটার চরণে ধরিল প্রেমে।

পাপকে এমনই স্নেহে ও ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া কবি আপনার হৃদয়ের উদারতা ও মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন।

কবির ভাব প্রকাশের সার্থকতা সাধারণ ভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না—তাহার কারণ সাধারণ অনুভূতির উপরে এমন একটা উচ্চ স্তর আছে যেখানে ভাব-প্রবণ কবি সাধনার সাহচর্য্যে কখন কখন আরোহণ করেন সেখানে তাঁহার সমগ্র বোধাতিশয্যের নিয়ে পড়িয়া থাকে, আমাদের এই লৌকিক সংসার—এই সাধারণ অনুভূতি, আমাদের এই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম জীবনের চিরাভ্যস্থ গতানুগতিক মনের ধারা। তাই শব্দের কমনীয়তা ও ছন্দের মাধুর্য্যের অভাব হইলেও আমরা ভাব হিসাবে একটা আনন্দ পাইতে পারি।

কবির জীবনের মধ্যে এমনি এক একটী চরম মুহূর্ত্ত আসিয়া সেই পরম অনুভূতির সন্ধান দেয়—কবি আর তখন শুধু কবি নন তখন তিনি সাধক! কবি তখন তন্ময়, তখন তাঁহার "প্রতি অঙ্গ কান্দ্র ক্ষুধাতুর"

কবি-জীবন হইতে সাধক-জীবনে এই যে উত্থান ইহাই বর্ত্তমান কবিতা গুলিকে দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছে—

আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই আধ্যাত্মিক কবিতা; সেগুলি কবিতা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও তাহাদের স্থান অনেক উচ্চে। বাকীগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে খাঁটি কবিত্বও আছে—

"হে আমার সীমন্তের সোহাগ সিন্দূর!
তব প্রেমে কলঙ্কিনী
করিবে বৈকুণ্ঠরাণী
আমারে? সবে না সে যে সুখ ভরপুর;
তুয়া সঙ্গ-সুধা মোর মরণ ঠাকুর!"

"হইয়ে কামনা বালুকার কণা
সে ছিল মরমে বিঁধি
প্রেমরস ডারি মুকুতাটী করি
থুয়েছি অমূল নিধি
সুখ বেদনার সে ধন আমার
হৃদয় রুধিরে গড়া
কি আছে গো বল মধুর বিমল
এমন পাগল করা।"

"সৃষ্টি মোদের চুম্বন মধু
প্রণয় আঁখির লোর।

এই কয়টী উদাহরণেই কবি-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথমে কবি পারিপার্শ্বিক জগতের উপর ওতপ্রোতভাবে বিশ্বচিত্রকরের সম্মোহন তুলিকার মধুর স্পর্শকে অনুভব করিয়া বলিতেছেন—

এ সৃষ্টি দীপালী—কে দিলরে জ্বালি
খচিত তপন তারা?

পরে তাঁহার আবির্ভাবকে তিনি প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়া বলিতেছেন—

তার নাহি নাকি নাম ধাম সখি
মোর আঙ্গিনার নীতি
ধ্বজ বজ্র আঁকা সে চরণ লেখা
কেন হেরি দিবারাতি?

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রিয়-দেবতার উদ্দেশ্যে কত না আদরের আহ্বান কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে তাই কবি বলিতেছেন

লইতে আদরে নাম ফুরাইল ভাষা

তবু সাধ মিটে নাই, এ সাধ যে মিটিবার নয়। সে যে "দরশের কান্তি" "পরশের কোমলতা' সে যে কবির "ঐহিক বাঞ্ছিত" "ইন্দ্রিয়ের সফলতা" তাই কবির ডাকিয়া সাধ মিটিল না, তৃপ্তি হইল না—

হলো না যে বলা তবু
* * * * *
জনমি জনমি তবু বাড়িল পিয়াসা।

তারপর কবি ভাব-সাধনার তন্ময়তার মধ্যে "দুখের গায়ে সুখের আলো" দেখিলেন—বুঝিলেন তাঁহার সেই ব্যাকুল আহ্বানের আগে কবে কোনদিন কেমন করিয়া তিনিই যে তাঁকে আহ্বান করিয়াছেন—

আমার ডাকে তোমার সাড়া
কেমনে মিশায়ে রয়?
"এসগো" স্বরে এমন করে
'এসেছি কে' বলে যায়।

তিনি বুঝিলেন—

"আমি যার কাঙালিনী
সে পরশ-মণি
আমারি হৃদয়ে রাজে ;"

"আমি অলি সেই ফুলে ফুলে মধু
মোর বতরে লালসা মিটাবার বঁধু"

কবি আপনাকে সমগ্রভাবে পূজা-নিবেদনের অর্ঘ্যস্বরূপ আপনাকে উৎসর্গ করিতে চান—

"না তেয়াগী দেশকাল ব্যবধান
তবু না পাসরি সই
প্রাণারাম প্রেমে বলগো কেমনে
হইব গো প্রেমময়ী ?"

"ভোগ সুখ বাসনায়
মন্দির আরতিময়,
ইন্দ্রিয় সরস যোগে
পরম পাবন।"

প্রেমিক-নিজ প্রেমে সন্দিহান হইয়াই বুঝি বলিতেছেন—

তোরা আঁখি ভরি দেখে নাকি সুখী
অধরে অধরে রাখি,
এমন করিয়া মনে মন দিয়া
কে জানে দেখিতে সখি ?

আবার আপনার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নির্ভরতায় বলিতেছেন—

বিন্দু বলে কি প্রেম ধরে কম
রমণীর আহা নয়ন জল ?

কবি ব্যক্তি-জীবনের দিক হইতে প্রেমকে বিশ্বের অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন—

"রাধার দু'টি রাঙা পায়ে
অনন্ত পড়েছে ধরা
সেথা কত বিশ্ব উঠে ভাসে
চিদানন্দে মাতোয়ারা।"

"সে যে সীমার মাঝে অসীমরাজে
দিশ্বলয়ে গগন পারা—"

প্রেমের বেদীতে কবি দেখিতেছেন কোটি কোটি বিশ্বের সহস্র বৈচিত্র্য, সমগ্র সৌন্দর্য্যের চিরন্তন আরতি হইতেছে।

প্রাণের অসীম নির্ভরতার সঙ্গে, প্রেম-নিষ্ঠার সঙ্গে কবি বলিতেছেন—

শুনেছি শ্রীপদ নখমণি চাঁদে
মোর মত রাজে অনন্ত শ্রীরাধে—
কোটী বিশ্বদোলা গলে গুঞ্জমালা
মোর সে হৃদয়-চোরা।

আর এক স্থানে—

এ মধু অবনী তারি হাতছানি
সতীকুল লাজ নাশা ;
সে নটরাজার পক্ষে চমৎকার
সচিত্র প্রণয় ভাষা।
সে হয়েছে গঙ্গা রজত তরঙ্গা
আমারি তারণ লাগি
জন্ম জন্ম ভরে তাহে স্নান তরে
পূর্ণকুম্ভ যোগ মাগি।

কবি এখনও প্রেমের সাধনা হইতে বিরত হ'ন নাই, প্রেমের সন্ন্যাসী এখনও প্রেমকে সম্বল করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার প্রেম যে অসীম, গভীর অতলস্পর্শ তিনি যে শুধু খুঁজিতেই চান। এই চিরন্তন চাওয়ার মধ্যেই যে তাঁহার সকল কামনার সর্ব্বসার্থকতা, এই নিখিল পাওয়ার মধ্যেই যে তাঁহার অসীম চাওয়া তাঁহাকে প্রেম-উন্মাদ করিয়াছে—

চিরটি দিনের সে পাওয়া বঁধুরে
কত করে পেতে সাধ
তাই বুকে লয়ে—পাইনি ভাবিয়ে
আমার প্রেম-উন্মাদ

এখনও যে তিনি যমুনার কূলে কূলে সেই যমুনা-পুলিন-বিহারী বংশীধারীকে পাইবার জন্যই হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে "ফুঁ" দিয়া প্রেমের বাঁশী বাজাইতেছেন ;—

এ লীলা যমুনা জলে কানু আছে কানু নাই
অফুরন্ত সুখ বুকে কেবলি কাঁদিতে চাই।

——o——

বিশ্ববাণী

বিংশশতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্যকাহিনী

ফরাসীদেশের অন্তর্গত কোন এক গ্রাম্য ধর্ম্মমন্দিরে যিশুখৃষ্টের একখানা পবিত্র তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ঐ চিত্রের কপোলদেশে বিন্দুবৎ রক্ত দেখা দেয়। তাহার পর হইতে ঐ রক্তবিন্দু আকারে বর্দ্ধিত হইতে থাকে উক্ত মন্দিরের ধর্ম্মযাজক ইহা লক্ষ্য করিয়া কিছুদিন, পর পর ঐ চিত্র হইতে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিতে থাকেন। ঐ ক্ষুদ্র শোনিতবিন্দু কিরূপে সময়েব সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ধারায় পরিণত হইয়াছে তাহা বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ফটোগ্রাফ দর্শনে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে সেই শোণিত-স্রাবী চিত্রময়ী প্রতিকৃতির বিভিন্নস্থান হইতে রক্তধাবা নির্গত হইয়া কেনভাসখানা প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই অলৌকিক ঘটনা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, ইউরোপের নানাস্থান হইতে সম্ভ্রান্ত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গ এই রক্তক্ষরণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। লণ্ডন হইতে এক ইংরাজ এই বিচিত্র ঘটনাব সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য সেই ধর্ম্মমন্দিরে একপক্ষ কাল অবস্থান করেন এবং ধর্ম্মযাজকের অনুপস্থিতিতে চিত্রের পশ্চাদ্দেশে এক বস্ত্র খণ্ড সংলগ্ন করিয়া দেন। অনতিকাল পরেই শোণিতস্রাব আরম্ভ হইল ; কিছুক্ষণ পরে বস্ত্রখণ্ড বাহির করিয়া দেখা গেল যে তাহাও রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। ইংরাজ পুরুষটী সেই রক্তের নমুনা লইয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কোন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাগারে রাসায়নিক পরীক্ষার পর দেখা যায় ইহা যে শুধু মানব দেহের রক্ত তাহাই নহে, চারিপ্রকার নর রক্তের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাঁটি রক্ত। এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনার কারণ নির্দ্ধারণে কেহই সমর্থ হন নাই। তবে কি প্রেমের অবতার মহাত্মা যিশুর অমর আত্মা তাঁহার উপাসক-বৃন্দ গত যুদ্ধে যে অজস্র অপরিমেয় ভ্রাতৃরক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছে, স্বর্গলোক হইতে এই পৈশাচিক লোমহর্ষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিবার জন্য, চিত্রময় দেহ হইতে রক্তপাতের ইঙ্গিতে বলিতে চাহিতেছেন "রে স্বার্থান্ধ নরপিশাচগণ, দেখ, চেয়ে দেখ, তোদের নিষ্ঠুরতা আমার দেহে কি নির্দ্দয় প্রহারই করিয়াছে, এখনো সাবধান হ"।

ইউরোপে সত্যযুগের অবতারণা

সকলেই অবগত আছেন বহুকাল হইতে ফ্রান্সের লোকসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। গত মহাসমরে লক্ষ লক্ষ ফরাসী পুরুষ মাতৃভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। ইহার ফলে ফ্রান্সের অবস্থা চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। মহাসমরের ফলে একদিকে লোকসংখ্যা যেমন অসম্ভবরূপে কমিয়া গিয়াছে সেইরূপ অপরপক্ষে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও তদনুপাতে বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন সমস্যা এই দাঁড়াইয়াছে যে কি উপায়ে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। যদি সত্ত্ব সত্ত্বই কোনা উপায় উদ্ভাবন না হয় তবে বিশ বৎসরের মধ্যে ফরাসী জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে সমগ্র ফ্রান্সদেশে সন্তান ধারণে সক্ষম স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ২০ লক্ষ অধিক। কিন্তু কি উপায়ে এই ফরাসী রমণীদিগের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া লুপ্তপ্রায় জাতির লোক-বল বৃদ্ধিকরা যায় এই সমস্যা চিন্তাশীল ফরাসীদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন দুই উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। প্রথম—ফরাসী রমণীদিগের সহিত বিদেশী পুরুষের বিবাহ দান। দ্বিতীয় বহু বিবাহ প্রথা প্রচলন। কিন্তু উক্ত উভয় প্রস্তাবই দেশবাসীদিগের মনোমত হয় নাই। সম্প্রতি কোন এক ফরাসী ধর্ম্মযাজক প্রস্তাব করিয়াছেন, একমাত্র বিবাহ প্রথা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ সাধন করিলেই দেশের মহা সমস্যা সমাধান হইতে পারে। বলিহারি যাই, সত্য সত্যই এইবার ইউরোপে সত্যযুগের অবতারণা হইতে চলিল।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে স্ত্রী বিক্রয়

সাউথওয়েলসে স্ত্রী ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। কাউনসেল টিনডেল বিচারালয়ে প্রকাশ করিয়াছেন যে নিউসাউথ ওয়েলসে আইনের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া দুইপক্ষ ইচ্ছানুরূপ লেখাপড়া করিয়া স্ত্রী ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। মিঃ টিনডেল স্বয়ং এই প্রকার কয়েকটী ব্যাপারে পরামর্শদাতা হইয়াছেন। বিধির কি বিধান, শেষকালে কিনা সুসভ্য ইংরাজের দেশেই এই বিংশ শতাব্দীর নবযুগে স্ত্রী ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে !

ক্ষীয়মান জাতি

পার্লিয়ামেন্টের কোন সভ্যের উত্তরে মিঃ ফিশার ভারতে প্রতি সহস্রে মৃত্যুর সংখ্যা যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯১৩—২৪·৭২
১৯১৪—৩০·০০
১৯১৫—২৯·৯৪
১৯১৬—২৯·১০
১৯১৭—৩২·৭২
১৯১৮—৬২·৪২

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ মৃত্যুর হার এতদূর অসম্ভব বাড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মিঃ ফিশার তদুত্তরে বলেন যে ইনফ্লুয়েঞ্জাই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু অর্দ্ধাহার, অনাহার যে মূলে থাকিয়া সহস্র সহস্র অসহায় ভারতবাসীকে ইনফ্লুয়েঞ্জার রাক্ষসী ক্ষুধা পূরণ করিয়াছে তাহার সন্ধান রাখে কে ?

বলশেভিক মৈত্রী

বলশেভিক গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছে যে বিনাশ্রমে কেহই আহার্য্য পাইবেনা। খাদ্যবিভাগ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কেহ যে পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অগাধ ধনরাশির উপর অলসদেহ এলাইয়া দিয়া, বিলাসের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া জীবন যাপন করিবেন সেই পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে রুশিয়ার ধনী নির্ধন নাই, সকলকেই পরিশ্রম করিয়া খাদ্য পাইতে হইবে। পরিশ্রম না কর উপবাসে মরিতে হইবে। দেশের সমস্ত ধন সমস্ত জমি জনসাধারণের সম্পত্তি। যাহার প্রাসাদ তুল্য বৃহৎ অট্টালিকা আছে, এখন সে একা তাহা ভোগ করিতে পাইবে না। পরিবারের লোক সংখ্যার অনুপাতে বাটীর কতক অংশ পূর্ব্ব মালিককে ছাড়িয়া দিয়া, অবশিষ্ট অংশ যাহারা এককালে ক্ষুদ্র কুটিরে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারিত না, তাহাদেব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি চিরাভ্যস্ত কুটিরবাসীকে এক বৃহৎ অট্টালিকাতে থাকিবার স্থান দেওয়া হয়। দেহে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাব, প্রশস্ত কক্ষের উপযোগী অগ্নিকুণ্ডও ছিল না ; কাজেই সেই কুটিরবাসিগণ শীতের অসহ্য তাড়নে বাধ্য হইয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধকার গুহাসদৃশ নিজ নিজ কুটীরে ফিরিয়া গেল। জন্মগত অভ্যাস, ধারনা, কি সহজে পরিত্যাগ করা যায় !
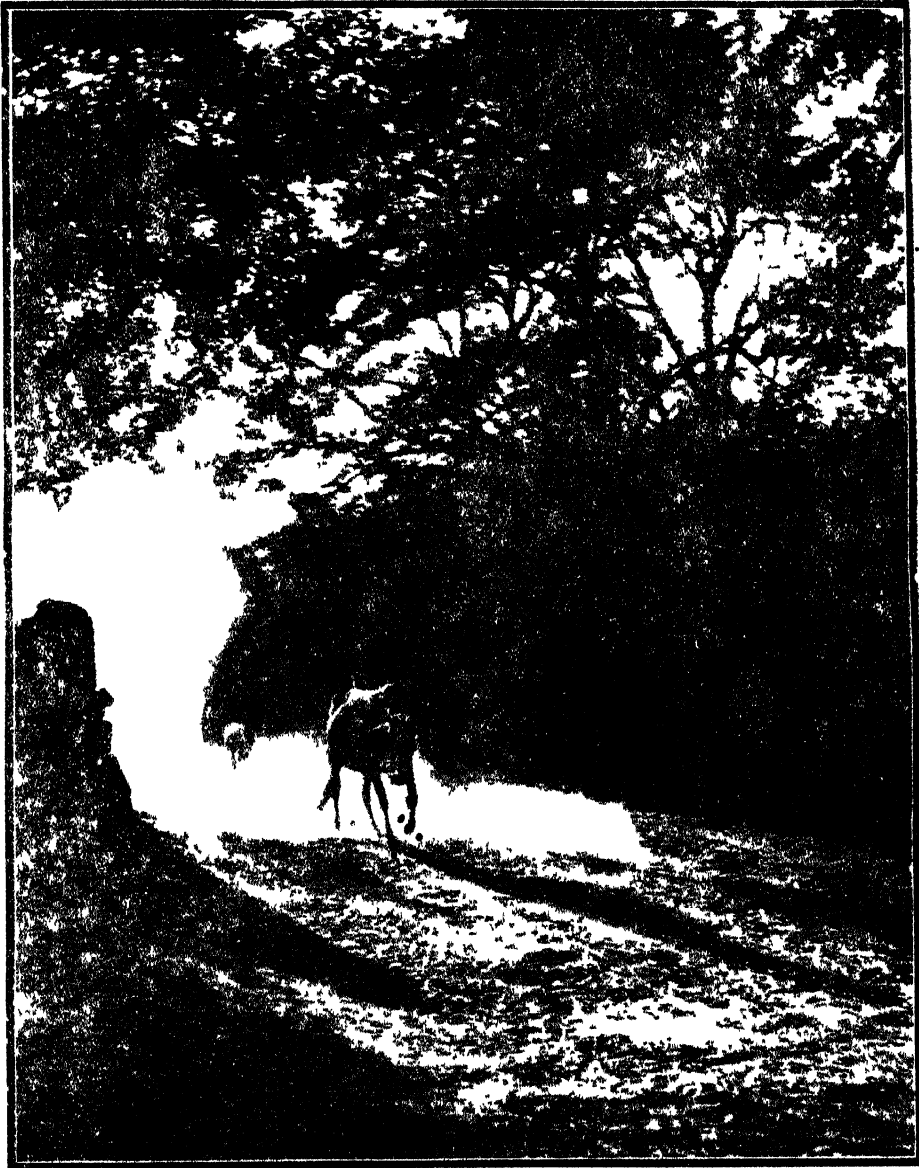
—·—

উপাসনা

RINTED BY
THE ACME PRINTING & PROCESS WORKS
AMHERST STREET, CALCUTTA

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমার জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমার কৈশোরের মধুবন, তোমার সম্পদের দ্বারকা, তোমার ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত।"

১৬শ বর্ষ। ভাদ্র—১৩২৭ ২য় সংখ্যা।

আলোচনী

ভারতের প্রজাতন্ত্র কোন পথে যাইবে?

বিশ্বজনীনতা

বিশ্বমানবের পূজামণ্ডপে বিশ্ব-দেবতার নিত্য আবির্ভাব জন্য সকল জাতিই আহুত হন। দুর্ব্বল, সবল, হীন অর্ব্বাচীন সব জাতিই মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সেই সান্ধ্য পূজার আয়োজনে যোগদান করেন। এ পূজায় সকল জাতির স্বতন্ত্র সাধনা সম্মিলিত। কোনও একটী বিশিষ্ট জাতির সাধনা সার্থক হইলেও বিশ্বদেবতার চক্ষে তাহা একটি উপকরণ মাত্র।

প্রত্যেক জাতিই তাহার ইতিহাসের অভিব্যক্তি দ্বারা তাহার বিশেষ আবেষ্টনে যে বিশিষ্ট ভাব ফুটাইয়া তুলিতেছে, তাহার অভাব হইলে বিশ্বদেবতার পূজা অঙ্গহীন হইবে। পাঁচটী প্রদীপ একসঙ্গে জ্বালা চাই, এক প্রদীপে দেবতার আরতি হয় না। আলোক রেখার একটী রশ্মির অভাব হইলে, সে রেখা নিষ্প্রভ।

রাষ্ট্রীয়তা

জাতিগত সাধনার বিশিষ্টতা রক্ষামন্ত্র আজ যুদ্ধের পর শান্তি সভায় উচ্চারিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তার যে আন্দোলন ইউরোপ এক প্রকাণ্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে তাহা Right of self determination, জাতির আপনার ইতিহাস আপনি গঠন করিবার স্বত্বের আন্দোলনে পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে যাহার ফল অনুমান করা আপাততঃ ধারণার অতীত। একদিকে যেমন এক একটী জাতি তাহার আপনার বাস ভূমিতে আপনার সভ্যতা বিকাশের অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছে অপর দিকে দেশ বিদেশে বিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত কোন বিশিষ্ট জাতি জ্ঞাতি ও গোষ্ঠীবদ্ধ হইবার জন্য রাষ্ট্র বিপ্লব আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্ব-জাতি-মণ্ডল

(League of Nations) জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের গঠন ও স্বাধীনতাকে উৎসাহ দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সেই পূর্ব্বান্দোলনকে সজীব রাখিতে তৎপর, এমন কি ইতিহাসকে তিরস্কার করিয়াই পোল্যাণ্ড, যুগোস্লেভিয়া প্রভৃতি নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের কাগজে কলমে সৃষ্টি করিয়াছে। এই সৃষ্টি টিকিবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ইতি-মধ্যেই পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভে তুষ্ট না হইয়া যে বিজীগিষু হইয়াছিল তাহাতেই সর্ব্ব-জাতি-মণ্ডলের হঠকারিতা প্রতীয়মান এবং আজ যে রুশিয়ার অভিযান তাহার ফল কি হইবে তাহা সর্ব্ব জাতি-মণ্ডলও জানে না। তাহা ছাড়া অষ্ট্রিয়া ও তুর্কীর ধ্বংশে এবং রুশিয়ার ভাঙ্গাগড়া হইতে নানাজাতি সুযোগ লাভ করিয়া সর্ব্ব-জাতি-মণ্ডলের পরি-পোষণে স্বাধীন রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছে। সমগ্র ইউরোপে প্রায় এখন ত্রিশটী স্বাধীন রাজ্যের সমাবেশ হইল।

বাস্তবিক এক হিসাবে দেখিতে গেলে এই যে বড় যুদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে দুইটী বিপরীত শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। অনেকগুলি ছোট ও খণ্ড রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা অথবা এক কেন্দ্রস্থ প্রভু-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাহাদের সমাবেশ, ইউরোপের রাষ্ট্র-গঠনের এই দুই বিরোধী অন্তর্নিহিত শক্তি গত শতাব্দীতে যে কঠিন সমস্যা আনিয়াছিল, তাহারই একটা মীমাংসা আপাততঃ গত যুদ্ধে হইল। এথেন্সের প্রজাতন্ত্র যেমন অতীতকালে কবসাইরাকে আশ্রয় দিয়াছিল তেমনি এই যুদ্ধেও বিভিন্ন রাজ্যের মিত্রতা স্থাপনে একই প্রকার রাষ্ট্রগঠন প্রণালীর সমাবেশ দেখা যায়। খণ্ড রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য অথবা সমষ্টির অধিকার দুইই রাজ্য-গঠন ও বিকাশের সহায়। এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের মীমাংসা যে নির্ভুল অথবা চিরন্তন হইল তাহাও নহে। কিন্তু এটা ঠিক টিউটনীয় দিগের সেই মিটেল ইউরোপার স্বপ্ন এখন বিলীন হইল। সমগ্র ইউরোপ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হউক না কেন, অথবা League of Nations নিরাকার ব্রহ্মের মত নির্ব্বিকার, এবং তাহার উপাসক উইলসন সাহেব ধ্যানযোগে নির্ব্বিকল্প হইয়া থাকুন না কেন।

জাতীয়তা

সর্ব্বজাতি-মণ্ডল দ্বিতীয় আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেয় নাই। জাতিধর্ম্মের বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য দ্বিতীয় আন্দোলন রাষ্ট্রকেও বিকাইয়া দিতে পারে বলিয়া উহাকে কেহ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। পূর্ব্ব ইউরোপের তুরানীয়েরা মাথা তুলিয়াছে। বুলগেরিয়ার অধিবাসীগণ শ্লাভদিগের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। ম্যাগিয়ারগণ আপনা-দিগকে ইউরোপীয় মনে করিতেছেন। তুর্কীগণ ধর্ম্মের দোহাই ছাড়িয়া তুরানীয় দিগের সহিত মিশিতেছে। রুষিয়ার ফিনগণ তাহাদের খণ্ড রাজ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট; দক্ষিণে তাতারগণ সত্তরলক্ষাধিক তাহারা, মস্কোর অধীনতা মানিতে চাহে না। মধ্য-এশিয়ার তুর্কমান গণও সত্তর লক্ষাধিক, তাহারাও জাত্যাভিমানে মত্ত হইয়া অন্য তুরানীয়া দিগের সহিত যোগদান করিয়া বিষম বিভ্রাট বাধাইতে পারে। পশ্চিম এসিয়ায়, সিরিয়া ও ইজিপ্ট দেশে আরব জাতি খিলাফতের প্রভুত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইতে তৎপর হইয়াছে। আরব জাতির নেতাগণের মধ্যে কেহ কেহ কেবল আরব দেশে, সিরিয়া মেসোপটেমিয়া লইয়া সন্তুষ্ট নহেন; উত্তর আমেরিকা ও সুদূর সুডান পর্য্যন্ত ঘিরিয়া এক প্রকাণ্ড আরব সাম্রাজ্য তাঁহাদের কল্পনায় ভাসিতেছে।

সকল ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-ধর্ম্মের এক প্রচণ্ড বিরোধ অবশ্যম্ভাবী; ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত, তুরানীয়, মঙ্গোলীয়, আরবীয়, মধ্য ইউরোপীয় ও মধ্যএসিয়া সংক্রান্ত আন্দোলন সবই রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ-নীতিকে সংশোধন করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। ইউরোপ নহে, এসিয়া এই দুই আন্দোলনের বিরোধের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। ইহার মীমাংসা হইতে পারে কিনা তাহাই এক্ষণে আমাদের আলোচ্য।

রাষ্ট্রের গঠন-নীতি

ধর্ম্ম ও জাতীয়তার মাপ কাঠী কিম্বা কুট-নীতির বিচারের দ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা হয় না। ভাষা, ধর্ম্ম অথবা জাতি-শ্রেণী এক হইলে রাষ্ট্র যে নূতন করিয়া গড়িতে

হইবে অথবা আধুনিক প্রবল দেশ সমূহের সুবিধা ও অসুবিধানুসারে রাষ্ট্র যে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে হইবে এ বিচার নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক, জগতের অকল্যাণ কর। একটা নূতন সভ্যতার বীজ যেখানে আছে সেখানকার মাটী খুঁড়িয়া ফেলিয়া যদি বীজকে নষ্ট করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে বৃথা পণ্ডশ্রম, বৃথা মানুষের ক্লেশ। কারণ সেই সভ্যতা আপনার মনোমত রাষ্ট্র ও সমুদায় সামাজিক অনুষ্ঠান অনুকূল আবেষ্টনে গড়িয়া তুলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবেই, আপনিই একীকরণ বা পৃথককরণ-শক্তি জাগ্রত হইয়া সেই সভ্যতা গঠন ও বিকাশের মাল-মসলা যোগাড় করিয়া লইবে।

তাই এই সকল বিষয়ে ধর্ম্ম, ভাষা, অথবা কূট নীতির চর্চ্চা ছাড়িয়া ভিতরকার সভ্যতার নিগূঢ় ও অদম্য শক্তি অনুসন্ধানের জন্য ভৌগলিক (Regional) এবং জাতির ও সমাজের ক্রম-বিকাশ-গত ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তুলনামূলক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এইরূপ বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাস এবং জাতীয় মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রের বিচিত্র প্রকৃতি

দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সামাজিক ইতিহাস ও তুলনামূলক মনস্তত্ত্বের জ্ঞান আমাদের নাই বলিলেও হয়। এতকাল রাষ্ট্রের ভাঙ্গা গড়া অন্ধ প্রকৃতির সেই অনধিগম্য নিষ্ঠুর ক্রিয়া অথবা কয়েকটি প্রবল জাতির সুবিধা ও অসুবিধার উপর নির্ভর করিয়াছে। এই যুদ্ধের পর মানুষ সত্যসত্যই রাষ্ট্র ও সমাজ এমন কি ইতিহাসকেও বিজ্ঞান ও আদর্শের সঙ্কেতে গড়িয়া তুলিবার আশা পোষণ করিতেছে। এই আশা কিন্তু ব্যর্থ হইবে, যদি পাশ্চাত্য জাতি সমুদায়ের রাষ্ট্র ও সমাজের মাপ কাঠি অবলম্বনে আমরা বিশ্বজগতের রাষ্ট্র ও সমাজকে বিচার করিতে বসি।

রাষ্ট্র জিনিষটা যে জাতি, সামাজিক ইতিহাস ও ভৌগলিক অবস্থা বিশেষে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় দেয় তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই।

ইউরোপে রাষ্ট্র যে একণে এক সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বভুক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহার সে প্রকৃতি প্রাচ্যখণ্ডে দেখা যায়না কিন্তু ইহার ইতিহাস জার্ম্মানীর সেই নিবিড় অরণ্যে যেখানে প্রথম টিউটনীয় প্রজা-তন্ত্রের সূত্রপাত হয়, সেইখানে আরম্ভ।

রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান

জাতিতে জাতিতে অনন্ত যুদ্ধ বিপর্য্যয়ের মধ্যদিয়া যখন ইউরোপীয় সভ্যতা রোমের কলেবর বৃদ্ধির সেই বিরাট আয়োজনের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছিল তখন রাষ্ট্র অথবা আইন কানুন, স্বাধিকার অথবা নীতি, উপনিবেশ অথবা সাম্রাজ্যের আদর্শ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতের বিপুল বিস্তার চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। রোমের সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্র পাশ্চাত্য ইতিহাসের মূল ও আদর্শ হইয়াছে। গ্রীস যেমন ইউরোপকে কলা ও দর্শন দান করিয়াছে, রোম আরও নিবিড় ভাবে রাষ্ট্র-গঠন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ নির্ণয় করিয়া ইউরোপের কর্ম্ম রাশি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। রোমীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংশের পর যখন ইউরোপ বর্ব্বরতায় আচ্ছন্ন হইল তখন জার্ম্মানীর অরণ্যে টিউটন গণ যে প্রজাতন্ত্রকে বিকাশ করিতেছিল তাহাই রোমের হাতে অঙ্কিত হইয়া সমগ্র ইউরোপময় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

যুদ্ধের ভিতর দিয়া যে সমাজের অভ্যুত্থানে তাহাতে রাষ্ট্র অনতিক্রম্য শক্তির আধার হইয়া শেষে মানুষের জীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রিত করে; পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম অথবা যাবতীয় শ্রেণী সমূহ রাষ্ট্রের, রাজার অথবা যুদ্ধ-নায়কের শক্তি সন্নিকট আত্ম সমর্পণ করে। এবং সমাজের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার অসাম্য ও অনধিকারের ও সৃষ্টির হয়—যেমন (ক) দাসত্ব প্রথা (খ) জাতি বিশেষে সামাজিক—স্তর বিভাগ (গ) স্ত্রীলোকের অধীনতা (ঘ) যোদ্ধৃ বিভাগের প্রভুত্ব, ক্ষাত্রধর্ম্ম, বুশিডো অথবা চিভেলরির প্রতিপত্তি এবং (ঙ) বিজিতগণের জমি কাড়িয়া লইয়া রাজন্য ও জমিদারবর্গের অভ্যুত্থান। ল্যাটীন ও টিউটন জাতি অল্প-বিস্তর সামাজিক স্তর বিভাগ সৃষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের অধিকা

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্নভাবে বণ্টন করিয়া চিরকালই একটা শ্রেণী বিরোধের উপকরণ যোগাইয়াছে। এই শ্রেণী-বিরোধই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া ইউরোপের যত কিছু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পতনঅভ্যুত্থান। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া ইউরোপীয় জাতি সমুদায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার মহিমা প্রকাশ। বৈষয়িক উন্নতি এই শ্রেণী বিরোধকে প্রবলতর করিয়া ক্রমাগত একটা উত্থান-পতনের চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তা, অভিব্যক্তি বা বিবর্ত্তন বাদ (Evolution) বিরোধকেই জীবের জীবন ও উন্নতির একমাত্র পন্থা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে; এবং এই বিবর্ত্তনবাদ রাষ্ট্র, সমাজ, অথবা বৈষয়িক জীবন ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্রেণীবিরোধকে উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছে।

রাষ্ট্র ও শ্রেণীবিরোধ

কিন্তু জীব জাতির উন্নতি যে কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা ও বিরোধের মধ্য দিয়া হইয়াছে তাহা নয়। জীবের সহিত জীবের সহযোগিতা ও সাহচর্য্য অনেকদিক হইতে তাহার উন্নতির সহায় হইয়াছে। ক্রোপাট্‌কিনের ইহাই প্রনিধান বস্তু ছিল, কিন্তু ক্রোপাট্‌কিনের বিজ্ঞান সম্মত বিচার কেহ শুনে নাই। সামাজিক ইতিহাস, রাষ্ট্রের বিকাশ ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবনের অভিব্যক্তি ডারুইনের অনুযায়ী মতান্তরে ইউরোপে বিপরীত ধারা অবলম্বন করিয়াছে। তাই বিরোধ ছাড়িয়া সমবায়কে জীব বিজ্ঞান অথবা সমাজ বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে নাই। আজিকার এই শ্রেণী বিরোধের দিনে (Centre Party) কেন্দ্রবর্ত্তী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা, ধনী অথবা শ্রমজীবীর সমূহ-তন্ত্রের কথা উঠিলেও সে কথা দলাদলির এবং ধর্ম্ম (!)—ঘটের চীৎকারে কেহ শুনিতে পায় না।

রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগৎ Parliament শাসনপ্রণালী আবিষ্কারের দ্বারা এই বিরোধকে প্রজাতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। পুরাতন গ্রীসের শ্রেণী-বিরোধ (Stasis) প্রজাতন্ত্রের প্রধান শত্রু ছিল। আরিষ্টটল এই শ্রেণীবিরোধ নিবারণ পন্থা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরিষ্টটলের সেই আদিমকালের উপদেশ আজও এই শ্রেণী বিরোধের যুগে বিশেষ প্রযোজ্য। গ্রীসের সেই আদিম ধনী নির্ধনের সংঘর্ষ, রোমের সেই প্রচণ্ড শ্রেণী বিরোধ ও রাষ্ট্রবিপ্লব তখন নূতন আকার গ্রহণ করিয়াছে। ফ্রান্সের Syndicaism অথবা শ্রেণী-তন্ত্র ইংলণ্ডের শ্রমজীবি আন্দোলন, পূর্ব্ব ইউরোপে কৃষক-আন্দোলন, Bolshevism অথবা চরম-তন্ত্র সবই ধনী নির্ধনের বিরোধকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রের অনুষ্ঠানকে বিবিধপ্রকারে আধুনিককালে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

সকল পাশ্চাত্যদেশে শিল্প ও শ্রম বিষয়ক আইন-কানুনের প্রকৃত কর্ত্তা রাষ্ট্র নহে, এই সকল বিষয়ে যাবতীয় আইন শ্রমজীবী-সংঘ এবং তাহাদিগের নেতারাই তৈয়ার করিতেছেন, Parliamentএর নেতারা নহে। এই হিসাবে Parliamentএর যাহা প্রাণ সেই দলাদলি নীতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপ সংযোজন বা সংমিশ্রন নীতিকে আশ্রয় করিতেছে। দল-বিভাগ নয়, দলমিশ্রনের দিকে ইউরোপ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপের প্রায় সকল দেশই সম্মিলিত দলের দ্বারা এক্ষণে শাসিত। পাশ্চাত্য জগৎ এখন বিরোধের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া জোট বাঁধিয়া শান্তিজল ঢালিতে চাহিতেছে।

কিন্তু ইউরোপ যে দলবিভাগ-নীতি পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছে সেই দলবিভাগ মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের শাসন সংস্কারের নাম ভাড়াইয়া ভারতবর্ষে আজ জুড়িয়া বসিতেছে। দেশীয় মন্ত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা আমাদিগের শাসন সভার সদস্যগণের মধ্যে দল বিভাগকেই আশ্রয় করিবে। দল বিভাগের সর্ব্বপ্রধান দোষ প্রকটিত হয়, যখন ইহা অর্থের স্তরবিভাগের সহিত মিলিত হইয়া হিংসা ও দ্বেষকে উৎসাহ দেয়। কিন্তু এই দোষ যাহা পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে আপাততঃ প্রকটিত হউক বা না হউক দল বিভাগ বলিলেই আমরা অধিকতর ভোটের দ্বারা

শাসন বুঝি। যাহারা সংখ্যায় কম তাহাদের মতামত অনাদৃত এমন কি উপেক্ষিত হয়। রাষ্ট্র ক্রমে একটা বিরাট কলে পর্য্যবসিত হয় এবং সমগ্র দেশের যাবতীয় সংঘ সমূহকে পিষিয়া ফেলিয়া কলের অনুযায়ী ভোট গুণানির জন্য দেশকে কতকগুলি কৃত্রিম ভাগে বিভক্ত করে। প্রজাতন্ত্র জাগিয়া উঠে সেই একবার ভোট দিবার সময়ে দলাদলির চীৎকারে সেই কৃত্রিমবিভাগ গুলায়। অন্য সময় প্রজাতন্ত্র নিতান্ত কর্ম্মবিমুখ। রাষ্ট্র যাহা বলিবে প্রজা তাহা করিবে। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রেও। শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তা মেরামত প্রভৃতির জন্য লোকেরা সেই রাজধানীর অর্থও কর্ম্মকুশলতার প্রত্যাশী। প্রজাতন্ত্র দল বিভাগকে অবলম্বন না করিয়া, মাথা—গুণানিকে আশ্রয় না করিয়া, যে চলিতে পারে, ইহা পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতায় নাই। ভারতবর্ষের আর এক-প্রকার অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। রাষ্ট্র গঠন ও সংস্কারের নিয়মই এই যে দেশের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে না মানিলে বিফলতা অবশ্যম্ভাবী।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিশিষ্টতা

আমাদের মনে হয় এই নূতন সংস্কার দেশের অতীতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ভবিষ্যৎকে নিতান্ত অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্র আর এক বিপরীত-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই বিচিত্র অভিব্যক্তির কথা এইবার বলিব। ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্রের সহিত সেই আদিম ও স্বাভাবিক সমূহ-তন্ত্রের (Communabism) নিবিড় সম্বন্ধ।

সেই আদিম দ্রাবিড়ী-সম্ভূত সমাজ বিন্যাস ও রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এখনও আমরা ভারতবর্ষের তথা কথিত পতিত জাতি ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা সুদৃঢ় পঞ্চায়েত, গ্রাম সভার প্রামানিক বা মণ্ডল ও কর্ম্মচারী ও বিভিন্ন শিল্পী চৌকীদার, গবাইত, ও ভৃত্যগণের সমাবেশ দেখিতে পাই। বিবিধ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোজনে যে সভা গঠিত হয় তাহার অধিপতি একজন বড় মণ্ডল। প্রত্যেক গ্রামের ছোট মণ্ডল তাঁহার অধীনে থাকিয়া গ্রামের সকল কার্য্য গ্রাম্য পঞ্চায়েতে বসিয়া তত্ত্বাবধান করেন। জাতি অনুসারে সেই পুরাতন পরগণা বা পট্টিবিভাগ সম্মিলিত সর্দ্দারগণের শালিশ সভা এবং নিম্ন জাতি-দিগের জননায়ক, রাজার শাসনপ্রণালী এখনও অনেক স্থানে বিদ্যমান। কিন্তু এইপ্রকার সমাজবিন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সজীবতা ও স্ফূর্ত্তির পরিচয় পাই, ভারতবর্ষের জাতি পঞ্চায়েত সমুদায়ে, পঞ্চগ্রাম, দশগ্রাম অথবা শত-গ্রামের শাসনে, আমাদের পল্লীসমাজের সমূহ-তন্ত্রে। গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য চৌকীদারকে, কৃষিকর্ম্মের সাহায্যের জন্য ছুতার, কামারকে, গ্রামের খাল পরিষ্কার ও জল-সেচনের জন্য সাধারণ ভৃত্য প্রভৃতিকে জমি দেওয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই যেখানে দেশীয় প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি পররাষ্ট্রের নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়া লুপ্তপ্রায় হয় নাই, সেখানেই এইপ্রকার সমাজ বিন্যাস ও শাসন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ যেখানে দ্রাবিড়ীজাতির প্রাধান্য সেখানে ইহা সুস্পষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সভায় জননায়ক কর্ত্তৃক বিবাদ নিষ্পত্তি ও গ্রাম্য কার্য্য পরিচালন, গোচারণ মাঠ, পতিতজমি খাল জঙ্গল প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের স্বত্বপ্রতিষ্ঠা, গ্রাম্যসভা সমুদায়ের সমবায়ে দশগ্রাম, শতগ্রাম প্রভৃতির সামাজিক শাসন শুধু যে দ্রাবিড়ী সভ্যতার পরিচায়ক তাহা নহে, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতিতে আর্য্যজাতি ও শ্রেণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রাম সমুদায়েও এই প্রকার ব্যবস্থাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সবদিকেই অপরিচিত প্রবলতর জাতি অথবা শিল্পী কৃষাণদিগের সমাগমে গ্রামের প্রকৃতি হয়ত কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রাম্য সভার স্বাধীনতা, ও কর্ম্মকুশলতা, বিভিন্ন গ্রাম লইয়া একটা বৃহত্তর সামাজিক জীবন আজও বিনষ্ট হয় নাই। মুসলমান-জায়গিরদার, মহারাষ্ট্রীয় দেশপাণ্ডে, রাজপুত ঠাকুর, শিখ করদার, ইংরাজ তহশিলদার গায়ের অথবা আইনের জোরে গ্রামের বুকের উপর জুড়িয়া বসিয়া গ্রাম্য সমাজের সমূহ-তন্ত্রকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, গ্রাম্য সমাজের খাজনা সম্বন্ধে সমূহ দায়িত্বকে

অস্বীকার করিয়া প্রত্যেক গ্রামবাসীর সহিত স্বতন্ত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইয়া সমূহ-কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়াছে, তবুও সেই সমূহ-বোধ আজও বিলুপ্ত হয় নাই। বাংলা দেশে যাহা এখন অচেতন, দক্ষিণে উত্তরে তাহা সদাজাগরূক ও অধিকাংশ দেশেই গ্রামবাসীগণ আজও খাল, কূপ, মন্দির, পাঠশালা ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের গ্রাম্য সভার তত্বাবধান করিয়া থাকে, বিচিত্র প্রকার কর বৃত্তি মাহিমাই স্থাপন করিয়া সাধারণ ভাণ্ডার অথবা সমূহ পণম পূর্ণ করিয়া লয়, নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েতে বসিয়া সকলপ্রকার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে। এই সিরিজের আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি টিনাভেলী ও তান্জোর জেলার এইপ্রকার সমূহ কর্ম্মের উল্লেখমাত্র করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার সবিশেষ বিবরণ যখন এই পুস্তক প্রকাশিত হইবে তখন আপনারা দেখিবেন।

Decentralisation Commission এর উপদেশ সত্বেও, বিভিন্ন প্রদেশে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিল পাশ হইলেও আমার মনে হয় দেশের পুরাতন ও স্বাভাবিক গ্রাম্য ও জাতি সমূহ-শাসনের কিছুই সদ্ব্যবহার হয় নাই। আর প্রজাতন্ত্রের এই দুর্দ্দিনে এই বিপরীত দলবিরোধের যুগে যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটা বিশিষ্টতা আছে, তাহা বুঝিলে শুধু যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান জাতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিব তাহা নহে, পাশ্চাত্যের প্রজাতন্ত্রে যে শ্রেণীবিরোধ রুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের সহিত প্রবলভাবে এখন জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারও একটা মীমাংসা দেখাইতে পারিব। আমাদের গ্রাম্য সভা সমুদায়ের সম্মিলন ও সমবায়ে এমন একটা Peasant Democracy গড়িয়া উঠিতে পারে যাহা আমাদিগকে মণ্টেগু প্রচারিত বিদেশী প্রজাতন্ত্রের কৃত্রিমতা হইতে শুধু রক্ষা করিবে নহে, ইহা রাষ্ট্রজীবনে বিরোধের পরিবর্ত্তে মিলন, হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রীর বাণী বহন করিয়া জগতেরও কল্যাণ আনিয়া দিবে।

ভারতবর্ষের গ্রাম্য সমাজে, সমূহ, শ্রেণী প্রভৃতিতে যে প্রজাতন্ত্র বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহাতে শ্রেণীবিরোধ জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। গ্রাম্য সমাজের পঞ্চায়তে সকল জাতিই তাহাদের স্বার্থ সঙ্কুচিত করিতে শিখিয়াছে। শিল্পিগণের শ্রেণীতে বিভিন্নজাতি তাহাদের সাধারণ ব্যবসায়ের মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ বিশিষ্ট স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। এইপ্রকার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের উন্নতিও বিস্তার হইয়াছে বিভিন্ন গ্রাম্য পঞ্চায়তের সম্মিলনে, বিভিন্ন শ্রেণী সমুদায়ের একত্র সমাবেশে। পাশ্চাত্য জগতে রাষ্ট্রের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্বের নিকট সকল স্থানীয় অথবা সামাজিক গোষ্ঠী সমুদায় আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিয়াছে। ভারতবর্ষের সমূহ-তন্ত্রে শ্রেণী, পূগ অথবা গোষ্ঠী সমুদায় প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতবর্ষের আত্মা একটা সামাজিক সাম্য, একটা কর্ম্মকুশলতাকে উৎসাহ দান করিয়া প্রজাতন্ত্রের অটুট ভিত্তিস্থাপনা করিয়াছে। রাষ্ট্রীয়শক্তি সমাজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ভূরি পরিমাণে সঞ্চারিত হওয়াতে চীন ও ভারতবর্ষে এমন একটা নীরব ও কর্ম্মঠ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার সহিত চটুল ও কলহপ্রিয় পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

সমূহ-তন্ত্রের ভবিষ্যৎ

বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী সমুদায়ের সজীবতা একদিকে যেমন সর্ব্বভূক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বেড়জাল বিস্তার প্রতিরোধ করিয়াছে, অপরদিকে ব্যক্তির স্বাধিকার প্রমত্ততাকে নিবারণ করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি আনিয়াছে। শ্রেণী বিরোধ নিবারণ করা হইয়াছে আর একপ্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় সমিতিতে, গ্রাম অথবা শিল্পের সাধারণ উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন শিক্ষা করিয়া জাতি ও শ্রেণীর বিরোধের মীমাংসা হইয়াছে। হইতে পারে আমাদের দেশে ও চীনরাজ্যে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির অভাব পরাধীনতা ও পরপীড়নের কারণ হইয়াছে। কিন্তু সমূহ-শক্তি অটুট থাকায় এইপ্রকার রাষ্ট্রের যে বিকাশ নাই তাহা অসম্ভব। বরং দেশের প্রাকৃতিক শক্তি ও জাতির সামাজিক আদর্শের অনুযায়ী এইপ্রকার রাষ্ট্রকেই অতীতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বপ্রতিষ্ঠা (Political

self determination) বিদেশী ধাতের প্রজাতন্ত্রকে এসিয়ার ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দিয়া এসিয়াকে স্বাধীন হইতে বলিলে স্বপ্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত জন্মে। একদিকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের সভ্যনির্ব্বাচন সম্বলিত পরোক্ষ প্রজাতন্ত্র হইতে আমাদিগকে নির্ব্বাচিত সভ্যের দায়িত্ব বোধ শিখিতে হইবে। অপরদিকে আমাদের স্বাভাবিক ও পুরাতন প্রত্যক্ষ প্রজাতন্ত্রের স্বাভাবিক উন্নতি ও প্রসার হইবে সমবায় ও সম্মিলনের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী, সমিতি, গ্রাম্যসমাজ, মণ্ডলী প্রভৃতি লইয়া এক বিরাট রাষ্ট্র সমবায়ে। এমন একটা রাষ্ট্রীয় সমবায় গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী, সমাজ ও সমূহের স্বাতন্ত্র্য ও কর্ম্মকুশলতা অক্ষুণ্ণ থাকে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র সমূদায়ের সমবায়ে একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি বিকাশলাভ করিয়া প্রত্যেকের স্বধর্ম্মপালনের সুবিধা, প্রত্যেকের বৃত্তিবিপ্লবে নিবারণ হইতে পারে! মানুষের ও সমাজের স্বাভাবিক বৃত্তি নিচয়ের তুষ্টি বিধান করিয়া এমন সব গোষ্ঠীর বিকাশসাধন করিতে হইবে যাহাতে মানুষ রাষ্ট্রীয় কলের অধীন না হইয়া আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তৎপর হয় এই ধরণের আদর্শ ইউরোপে আজকাল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ চিরকাল ইহাই। ইউরোপে এই আদর্শ কিরূপে রাষ্ট্রীয়গঠনে পরিণত হইতে পারে, আমাদের আদর্শ কিরূপে পাশ্চাত্যের নিকট আত্মবিক্রয় না করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ পরে আলোচনা করিব।

—o—

শর্করা বা চিনি প্রস্তুত প্রণালী

গ্লুকোস অথবা আঙ্গুরের চিনি

(Glucose on Grape Sugar)

[শ্রীশ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

গ্লুকোস বা আঙ্গুরের চিনি মধুর আস্বাদপূর্ণ বৃক্ষ লতাদির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, এমন কি নানা রকম সুমধুর সুপরিপক্ক ফল ও নানা রকম ফুলের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। বহুমূত্র রোগীর মূত্র রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উক্ত গ্লুকোস চিনি শতকরা ৮।১০ ভাগ হিসাবে রহিয়াছে। বিশুদ্ধ গ্লুকোস আখের চিনি (ইক্ষু চিনি বা Cane Sugar) হইতেও অতি সামান্য পরিমাণেই পাওয়া যায়। আখের চিনিকে শতকরা ৯০ ভাগ য়্যালকোহল এবং হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড (Hydrochloric Acid) মিশ্রিত করিয়া নরম তাপে গরম করিলে আখের চিনি গ্লুকোস এবং ফ্রাক্টোস হইয়া যায়। (Cane Sugar is hydrolised and breaks up into Glucose and Fructose.)

এখন মনে করুন ক=Carbon, অঙ্গার সার, খ=Hydrogen, জলজান, গ=Oxygen বাষ্পজান

অতএব

$$\underset{\text{আকের চিনি}}{\text{ক}_{১২}\text{খ}_{২২}\text{গ}_{১১}} + \underset{\text{জল}}{\text{খ}_২\text{গ}} = \underset{\text{গ্লুকোস}}{\text{ক}_৬\text{খ}_{১২}\text{গ}_৬} + \underset{\text{ফ্রাক্টোস}}{\text{ক}_৬\text{খ}_{১২}\text{গ}_৬}$$

শ্বেতসারকে জল মিশ্রিত করিয়া সালফিউরিক য়্যাসিড দ্বারা রীতিমত ফুটাইতে হয়, তাহাতেই গ্লুকোস উৎপন্ন হয়। জল মিশ্রিত সালফিউরিক য়্যাসিড ও শ্বেত-সার সংমিশ্রনে যে তরল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাতে চক অর্থাৎ সাদা খড়ির গুড়া মিশ্রিত করিয়া তাহাকে ফিলটার করিয়া লইতে হয়। ফিলটার করিবার প্রণালী ঠিক যেমন ভাবে জল ফিলটার করা হয় ঠিক তেমনি ভাবে এই তরল গ্লুকোস ফিলটার করিতে হয়। প্রথম কলসীতে তরল পদার্থ, মধ্যে হাড়ের কয়লার গুড়া ও নীচের কলসীতে মুখে ব্লটিং কাগজের মত

এক প্রকার ফিলটার করিবার জন্ত কাগজ পাওয়া যায় সেই কাগজ দিয়া তারপর তরল পদার্থের কলসীর তলদেশ ছিদ্র করিয়া দিতে হয়, মনে রাখা কর্ত্তব্য ছিদ্রটী যেন একেবারে খুলিয়া না দেওয়া হয়, অল্পে অল্পে ও ধীরে ধীরে পড়িতে দিতে হয়। তারপর তরল পদার্থটী একটা কড়াইয়ে রাখিয়া পুনরায় স্ফটিকাকৃতি করা হয়। বিদেশ হইতে যে সমস্ত ফল ফুলুরিগুলি টিনে রক্ষিত হইয়া আসে সেগুলি এই গ্লুকোস চিনির রসে মিশ্রিত হইয়া থাকে। ঐ তরল পদার্থটী ফিলটার হইয়া যখন নীচের কলসীতে পড়িয়া জমে, তখন ঐ তরল পদার্থকে একটা কড়ায়ে রাখিলে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায় এবং উহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। এই গেল এক প্রকারের শর্করা প্রস্তুত প্রণালী। আর এক প্রকারের ফল(Fructose or Fruit Sugar) হইতে শর্করা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এখন ফ্রাক্টোস (Fruit Sugar) প্রস্তুত প্রণালী—ক৬ খ১২ গ৬

আঙ্গুর শর্করা এবং ইক্ষু শর্করা মধ্যেও এই ফ্রাক্টোস প্রকারের চিনি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ফ্রাক্টোস সাধারণতঃ আখের চিনি হইতে প্রস্তুত করা হয়। প্রথমতঃ আখের চিনিতে জল মিশ্রিত সালফিউরিক (Sulphuric Acid) য়্যাসিড মিশ্রিত করিতে হয়, তারপর তাহাকে, ঐ য়্যাসিড মিশ্রিত তরল চিনিতে বেরিয়াম কারবনেট্ (Barium Carbonate) নামীয় এক প্রকার পদার্থ মিশাইলে, ঐ য়্যাসিড জল মিশ্রিত চিনি তলায় পড়িয়া যায় আর য়্যাসিড উপরে থাকে উহাকে (উপরের জলটাকে) অতি সন্তর্পণে ঢালিয়া লইলে নীচে চিনি থাকিয়া যায়। এই প্রকারে চিনিকে য়্যাসিড হইতে পৃথক করিতে হয় তারপর উক্ত চিনিতে চুণের জল মিশাইয়া ধুইতে ও ফিলটার করিতে হয়। তারপর উহাকে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড (Dioxide) দিয়া পুনরায় ধুইয়া শুকাইলে ক্যালিসিয়াম কার্বনেট (Calcium Carbonate) চলিয়া যায়। তারপর ঐ তরল পদার্থে চিনির একটা স্ফটিক মিশাইলে উক্ত তরল পদার্থ ক্রমে ক্রমে স্ফটিকাকৃতি হইতে থাকে। এই চিনি বহুমূত্র রোগীর বিশেষ উপকার করে। এখন দেখা যাউক সাধারণতঃ আখের চিনি কি প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গুড় যে প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা বোধকরি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যাহা হউক অনেকের হয়তো না জানাও থাকিতে পারে; আখগুলিকে প্রথমতঃ আখের কলে পিশিয়া রস বাহির করিতে হয় সেই রস পরে একটা লোহার বড় কড়াইয়ে ঢালিয়া জাল দিতে হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া চুণের জল ও দুধ দিয়া গাদ তুলিতে হয় এইরূপ ভাবে আর যখন গাদ বা গুড়ের ময়লা না উঠে তখন আরও একটু ঘন করিয়া পাক করিতে হয়। তারপর কলসীর কিম্বা হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া দিলে অতি পরিষ্কার গুড়ে পরিণত হয়। কলসী বা হাঁড়ীর নীচের অংশে সার অর্থাৎ বেশ দানাদার গুড় জমে আর উপরে যেটা তরল থাকে তাহাকে মাত বলে। এই মাত ও সার গুড় একটী বড় ঝাঁঝরা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। রাখিলে মাত গুড় সমস্তই ঝরিয়া যায় তারপর ঐ ঝাঁঝরায় যে দানাদার পদার্থটী থাকে তাহাকে শক্তিসঞ্চারিণী বা কেন্দ্রবিমুখী (Centrifugal) মেসিনে বা যন্ত্রে ফেলিয়া স্ফটিকাকৃতি দানাদার পদার্থটীকে পৃথক করিতে হয়, এইরূপে চিনি প্রস্তুতের গোড়াপত্তনী হয়। এখন উক্ত বস্তু খুবশাদা করিতে হইলে কি কি উপায়ে করিতে হয় তাহার প্রণালীও পরে বর্ণনা করিতেছি। এখন দেখা যাউক আরও কত প্রকারে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। ব্রিটন বা ইউরোপ মহাদেশে পালং জাতির এক প্রকার শাকের (Beet Root) মূল হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ মূল হইতে যে রস উৎপন্ন হয় তাহাতে শতকরা ১৩।১৪ অংশ পরিমাণে চিনি থাকে। এখন কি প্রকারে উক্ত চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথমতঃ ঐ বিট্ (Beet) বা পালংশাকের মূলকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া ঐ গুলিকে গরম জলে সিদ্ধকরিতে হয়। সিদ্ধ করিলে যখন ঐ মূলগুলি মণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হয় তখন খুব বড় লোহার কড়ায়ে ঢালিয়া ধীরে ধীরে পেষ্টনকারী যন্ত্রের সাহায্যে তাহার সমস্ত রস নিষ্কাশণ করিয়া লইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ নিষ্কাশিত মণ্ডের উপর জলধারার বন্দোবস্ত রাখা আবশ্যক যাহাতে পুনরায় ঐ মণ্ডকে গরম জলে ফেলিয়া নিষ্কাশণ করা যায়। এইরূপভাবে নিষ্কাশিত রসকে চুণসহ জাল দিয়া ঘনীভূত করিলে পদার্থের নীচে য়্যাসিড বা অম্লদ্রব্য পড়িয়া যায় ও এক প্রকার তরল পদার্থ উপরে থাকে ঐ পদার্থের মধ্যে এক প্রকার অঙ্গারবিশিষ্ট গ্যাস বা বাষ্প (Carbon dioxide) পরিচালন করিতে হয় তাহাতে উক্ত চুণ যাহা পূর্ব্বে মিশ্রিত করা হইয়াছিল তাহাকে পৃথক বা দ্রব (Decompose) করিয়া ফেলে। ঐ অঙ্গারবিশিষ্ট বাষ্প (Carbon dioxide) পরিবর্ত্তে গন্ধকবিশিষ্ট এক প্রকার বাষ্প (Sulphur dioxide) পরিচালনা করিলে তাহাতে পদার্থের বর্ণ শুভ্র ও স্বচ্ছ হয়।

—o—

নারী-বোধন

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

কত শতাব্দী ধরে এ অশ্রুর অপার জলধি সুরাসুর মিলে মন্থন করলাম, তবু তোমরা কি সুধাভাণ্ড ধরে উঠবে না? ভারতের নারীশক্তি, ওগো বঙ্গের জীবনলক্ষ্মী, তোমাদের হাতের সুধা না পেয়ে দেবতা ত কখন অমর হয় নি। আমরা বুদ্ধি, তোমরা যে প্রাণ; আমরা নিষ্ক্রিয় পরম ধন, তোমরা যে লীলান্বিত জগচ্ছক্তি। নূতন জীবন যদি আসে, "সেই শিল্পী কুশলীর শ্রেয়সী বিরচনা" যত স্নিগ্ধ মাতৃরূপ আগে ভরে উঠবে না কি? এই সোণার দেশ ত শিশুরূপ ধরে তোমাদেরই স্নেহকোল জোড়া করে বার বার ফিরে আসে; তোমাদের বুকের সুধার সঙ্গে জ্ঞানের ধারা না পেলে সে মুকুলিত ভাবপদ্মগুলি ফুটবে কেন, জগদুদ্যান গন্ধে আমোদ করবে কেন?

আমাদের পাপে তোমরা মরেছ, পতির জগতভরা নিন্দায় আজ ভারতের সতী শবরূপা। এই শব স্কন্ধে আমরা আজ বুদ্ধিহারা দশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাই আজ সৃষ্টি বুঝি যায়। কোথায় সে বিষ্ণুচক্র! এ মৃত সতীর দেহ শতখণ্ড করে দাও; সে পুণ্য বরাঙ্গপাতে ভারত ভূমে আবার শত মাতৃতীর্থ গড়ে উঠুক।

তোমরা আজ অপমানিতা, মূক, অন্ধ, হৃতসর্ব্বস্বা; তোমরা হিন্দুর অধর্ম্মের সঙ্গিনী, ধর্ম্মের কেউ নও। মরে গিয়ে হিন্দু আজ বুঝেছে নারী তার বৈকুণ্ঠের পথের কণ্টক, সে আজ মুক্তি নিতে একা যাবে। শক্তিহীন মুক্তিকামুক তাই আজ সর্ব্ববিধ মুক্তি থেকে এমনি করে বঞ্চিত। ভারতের বুদ্ধি আজ পাপভীত, তাই জাহ্নবীর মত মুক্তিপ্রদা পুণ্যময়ীকে হারিয়েছে; স্বর্গের কামনায় সন্ন্যাসী ভারত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, তাই পুণ্যপিশাচ সেজে সে এখন আপনার ঘরে আপনি দস্যু। জীবনের যত ষড়ৈশ্বর্য্য যত বিভূতির মনিরত্ন দিয়ে সাজান কাঞ্চন দেউলে মায়াবাদের সিঁদকাটি হাতে করে এসে সে পরমধন লুটে নিতে চায়। সে বোঝে না পরমধন যে রাজরাজ্যেশ্বরের হৃদয়মণি, যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া যায় সেইখানেই দ্যুলোক ভূলোকের অনন্ত সম্পদ আপনা আপনিই গড়ে ওঠে। সে যে লীলার ঠাকুর, তার গতির ছন্দই যে অনবরত সৃষ্টিময়, তার হাসি তার কান্না যে কানায় কানায় রূপে-রসে-শব্দে-গন্ধে ভরা।

তোমাদের হস্তে জাতির উৎসবের শঙ্খ, সে শঙ্খ মূক বলিয়া আমরা সকল সুখ সকল কল্যাণ-হারা এমন হতশ্রী। এত যুগ আত্মস্বার্থ বলি দিয়া যে অনুপম ত্যাগমন্ত্র শিখিয়াছ, সে তপস্যা ত তোমাদের দেহের অণু পরমাণুতে মূর্তিময়! আজ অন্তঃপুরের সে আত্মঘাতের ব্যর্থতা থেকে বাহিরে আমাদের জাতির জীবনে স্নিগ্ধ দেবীত্বমণ্ডিতা মাতৃরূপে ফিরে এস; নারীর পূজায় সেই কোটী গৌরী উমা ও লক্ষ্মীর রূপে দেশমাতার পূজায় ভারতে আবার দেবতার আবির্ভাব হউক।

কর্ম্মে যে তোমরা দশভূজা সে কথা কি ভুলে গেলে? তোমাদের স্নেহচ্ছায়াদায়ী অঞ্চল যে পাণ্ডব সভায় কৃষ্ণার অফুরন্ত অঙ্গসাটী, সে স্নেহাঞ্চল আকুমারী হিমাচল প্রেম-স্পর্শে আবরিয়ে জুড়িয়ে আছে; এ পাপভীত জাতির সকল লজ্জা দৈন্য ও নগ্নতা কি অপূর্ব্ব অসীম বেষ্টনে বেড়ে ঢেকে রেখেছে। কত দৃপ্ত দুঃশাসন আসিল গেল, পাশায় বিকিয়ে এত টানাটানিতেও জাতি-গরিমা যে আমাদের নগ্ন হ'ল না, সে তোমাদের সতীত্বের পুণ্যে তোমাদের ত্যাগময় শিশু কোলে স্নেহবিহ্বল মাতৃত্বের মাধুর্য্যে।

বাঙ্গলা দেশের মেয়ের প্রাণসম্পুটে গোপন স্বর্গটুকু এই শঙ্খমুখর মঙ্গলমধুর যুগোৎসবে জগতকে দেখাব বলে

আজ যে বঙ্গের সাধ হয়েছে সে কথা মনে রেখো। ওগো নারী-দেবতা, অগম্যা-দীনা-জ্ঞানহরা-কাঙ্গালিনীরূপে আমাদের এমন করে ঘিরে অভিষ্ট করলে কেন ? যার প্রাণ আছে, কাঁদিবার অশ্রু আছে, স্বর্গ রচনার বেদনা আছে, তার যে বড় বিড়ম্বনা—বড় জ্বালা! তা' কি জান না ? তোমার ললিতকোমল অঙ্গভরা রূপে ও যৌবনে যে লীলার ঠাকুর অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন, তাঁকে ডেকে বলি, "ওগো জীবন-দয়িত ! ব্যথা দিলে অফুরন্ত, তবে একটি ছোট্ট শিশুর সামর্থ্য দিয়ে পাঠালে কেন ? যারা সোনার পালঙ্কে ঘুমে কাতর, তাদের দিয়েছ রাজ্যপাট ; আর এই ঘুমন্ত পুরীতে যুগযুগান্তের পাগল-জাগরণ বুকে দিয়ে আমায় নিয়ে তোমরা এ খেলা আমার যে প্রাণান্তক হ'লো !"

ভারতের মাতৃশক্তি ! মনে রেখো, তোমরা অনন্তের ঠাকুরের নিত্যপূজার দেউল। আমরা লীলা-সুন্দরকে পাবার জন্যে জপ তপ যোগ যাগ ছাই পাঁশ কত কি করে মরি, এইটে বুঝিনে, ঐ সবল জীবনকুঞ্জগুলি একবার চোখ মেলে দেখতে জানলে ভববন্ধন টুটে যায়। তোমাদের বরাঙ্গ ভরে যে মন্ত্র গীত, যে চন্দন-গঙ্গোদক চিরনিবেদিত, যে বিগ্রহ অনুপ্রাণিত, তাহা তোমরাও ভুলেছ। এ জাতির জীবন রাগিণী তাই আজ বেসুরা বাজছে, আত্মাশক্তি পুরুষের বাসনায় তাই আজ দেহের পসরা নিয়ে 'পৃথিবীকেই আঁকড়ে ধরেছে—সে শুধু ভোগ বিলাসেরই সামগ্রী হ'য়ে পড়েছে। এই অশক্তির দিক দিয়েই তার শক্তি ফুটে উঠেছে।'

সন্ন্যাসী ভারত আজ পরম ধনেও বঞ্চিত, পশুরূপী বাহন হারিয়ে দেবতাও আজ দ্বিপদ পশুতে পরিণত। যোগ যাগ জপ তপের অষ্টবন্ধন ও কামিনী ত্যাগের দুশ্চেষ্টায় আজ আমরা কামিনীসর্ব্বস্ব ও অতিকামুক। তাই প্রবর্ত্তক বলছে—"ভীষণ জোর করিয়া যখন নারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তখন তাহার অর্থ আমার ভিতরে অগোচরে একটা ভীষণ বুভুক্ষা নারীর দিকে প্রধাবিত। তলে তলে একটা বিকট আকর্ষণ আছে বলিয়াই, বাহিরে এই বিকট বিকর্ষণ। নারীকে শুধু দোষ দিলে হইবে কেন ?" কেবল নারীই কি পুরুষকে বিপথে নিয়ে যায় ? আজ অবধি কত অসহায়া নারীর সর্ব্বনাশ যে পুরুষ করেছে তাহার তুলনায় ট্রয়ধ্বংসমূলা হেলেন কয়টা আছে ? আর পুরুষেরই এ পাপ সহজ ও সুলভ, কারণ শতবার নারীকে প্রলুব্ধ করে কুপথে লইলেও তো সমাজ তাকে কিছু বলিবে না।

নারীকে 'সহজ চক্ষে' আপনার নিত্য সুহৃদ চিরসঙ্গীর মত দেখলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ সহজ হয়ে আসে। আর নারীকে দূরে পরিহার করে আবরণ দিয়ে রাখলে সেই ভয়ই মানুষকে পেয়ে বসে, যৌন-সম্বন্ধই সব সম্বন্ধ ছাপিয়ে উঠে। নারীকে পর্দ্দায় লুকিয়ে অসূর্য্যম্পশ্যা করে কামিনী নাম দিয়ে বাঙ্গলায় আজ কামিনী ছেয়ে গেছে ; উপন্যাসে কবিতায় রঙ্গমঞ্চে সংসারে আজ সহধর্ম্মিণীর জায়গায় কামিনীর আসন, পুরুষের ভোগের কলুষে ও ত্যাগের তাড়নায় নারীর সহজ মাধুর্য্য আজ নষ্ট হতে বসেছে।

তাই যুগ-শঙ্খের আরাবে নব-তন্ত্রী সাধক আজ নারীবোধনের মঙ্গলঘট বসিয়েছে ; মায়ের বুকে দেবীর প্রেরণা জাগুক, যুগদেব তপস্যা সফল হোক। ভারতের ঋষিযুগের সহধর্ম্মিণী আবার যজ্ঞের মণ্ডপে, স্বয়ম্বর সভায়, মুনীর তপোবনে, রাজার সিংহাসনে বসুক ; ভারতের সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয়ে জগতে জীবনের মহারাস-বংশী বাজাক।

এস নবযুগের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যারা পাগল আছ, তারা এস। দুঃসাধ্যসাধন সহজ মানুষে করে না। আমরা তাদের চাই যারা জগত জুড়ান একটা কি অবাককাণ্ড দেখেছে, তাই নিয়ে তারা পাগল। এ পাগল যে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করবার জিনিস, কারণ এই বস্তু-তন্ত্রী ভিসেবী মুদির দুনিয়ার ভাগ্যে পাগল আছে তাই মাঝে মাঝে স্বর্গ মর্ত্ত্য আলোর বাঁধনে মিলে এক হয়ে যায়। নিখিল নর্ত্তিত নীল বিথারে যে বিশ্বভাব আজ জেগেছে, তার পাগল কই ? নবযুগ রচনার সত্য যখন আসে, স্বর্গের ধন বলে এত অচেনার মত সবার মাঝে চমক লাগিয়ে দেয়, যে কেউ তাকে ঢিল মারে, কেউ অভিসম্পাত করে, আর কেউ লুটিয়ে পড়ে প্রাণটা তার পায়ের তলায় বিছিয়ে দেয়। সে ভাবের ভাবুক তাই সবার কাছেই পাগল। মানুষের আবির্ভাবে পশুর দেশ আকুল হয়ে ওঠে, এস

সেই জীবন্ত বৈকুণ্ঠ, আঁধারের আলো, মরার জীবন, পশুর দেবতা নব সৃষ্টির পাগল, ভারতের দীনা আজ তোমায় চায়। আবার সৃষ্টি কর, আবার সংহিতা লেখ, আবার ইন্দ্রপ্রস্থ গড়, জগতে গোলকধাম বিরাজ করাও।

—•—

প্রেততত্ত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি, এ]

ছায়াদর্শন বা প্রেতদর্শন

ইংরাজিতে যাকে Hallucination বলে আমরা তাহাকেই 'বোধ-ভ্রম' এবং দৃষ্টিগত বোধভ্রমকে 'ছায়াদর্শন' বলিতে চাই। এই বোধভ্রম চিৎক্রিয়ারই একটা অলৌকিক বিকাশ মাত্র। যে কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় এই বোধভ্রমের বশীভূত হইতে পারে। তবে সবরকম অনুভূতির মধ্যে দর্শন-অনুভূতি মানুষের মধ্যে বেশী প্রবল এই জন্য প্রায়ই চোখের বোধভ্রম বা 'ছায়াদর্শন' সংখ্যায় বেশী ঘটে। ভ্রম এই জন্যে বলি যে দৃষ্ট বস্তুর বাহিরে কোন বাহ্যসত্তা থাকে না। অনুভূতিটা পুরামাত্রায় জ্ঞানের বিকার, যাটা 'Subjective' বা চিদাত্মক অনুভূতি।

শতের মধ্যে অন্ততঃ দু একজনও এমন আছেন যাঁহার জীবনে কখন না কখন এই ছায়াদর্শন ঘটিয়াছে। অনুভূতি প্রায়ই সজাগ অবস্থায় ঘটে; কখনো কখনো মোহাবস্থায় (Hypnotised) ঘটে। নিদ্রাবস্থায় ঘটিলে তাহাকে আমরা স্বপ্ন-দর্শন বলি। এ প্রবন্ধে আমরা যে ছায়াদর্শনের আলোচনা করিব তাহা সুস্থ মনে সজাগ অবস্থায় ঘটে।

ব্যাধিগ্রস্ত ও বিকৃতমস্তিষ্ক লোকেরও প্রায় এই বোধ-ভ্রম ঘটিতে দেখা যায়। এই জন্য সুস্থচিত্ত, সুস্থমস্তিষ্ক লোকেরও সত্যমূলক বোধ-ভ্রম হইলেও সাধারণে উহাকে তাদের মাথার বিকার বা গোলমাল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। এই জন্যেই এতদিন ছায়াদর্শন ব্যাপারকে অলৌকিকের আত্মপরিচয়ের একটা ইঙ্গিত বলিয়া মানিতে কেহ রাজী হন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলে অনেক ক্ষেত্রেই এইসব ছায়াদর্শন যে ভবিষ্যঘটনা বা দূরদেশস্থ বর্ত্তমান সত্যঘটনার সূচনা করে তাহা প্রমানিত হইয়াছে। প্রায়ই মরনোন্মুখ বা সদ্যমৃত ব্যক্তির ছায়াদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা পরক্ষণেই তাহার মৃত্যু সংবাদ আসে। এই সব Veridical বা সত্যসূচক ছায়াদর্শনকে চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির (S. P. R.) অনেক সভ্য জীবাত্মার বিদেহ অস্তিত্বের একটা প্রবল প্রমান বলিয়া মনে করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সব প্রমান ও যুক্তি দেখান তাহার আলোচনা যথাস্থানে করিব। উপস্থিত সর্ব্ব জাতীয় ছায়া-দর্শনের কিছু সাধারণ পরিচয় দিব।

সমস্ত প্রকার বোধভ্রমকে তিনটী প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যাউক। (ক) ব্যাধি ঘটিত বোধভ্রম (খ) সুস্থ-ব্যক্তিতে সহজ সজাগ অবস্থায় পরীক্ষা-ঘটিত বোধভ্রম (গ) সুস্থ ব্যক্তিতে সহজ সজাগ অবস্থায় স্বতঃঘটিত বোধভ্রম —এই স্বতঃঘটিত বোধভ্রম আবার দুই প্রকার (১) অমূলক বোধভ্রম এবং (২) সমূলক বা ঘটনাসূচক বোধভ্রম।

(ক) ব্যাধিঘটিত বোধভ্রম

যে সব লোক রোগে দীর্ঘকাল ভুগিয়া দুর্ব্বল মস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছে বা যাহারা রোগের অবস্থায় বিকারগ্রস্ত হয় তাহারা প্রায়ই কতরকম খেয়াল দেখে; আমরা সে সবের মধ্যে কোনো সত্য অনুভূতি আছে কিনা তাহা না দেখিয়া

উহাদের বিকারের প্রলাপ বা খেয়াল বলিয়া মনে করি। এই সব বোধ-ভ্রমের মূলে খুব সম্ভব কোনো বাস্তব সত্তা কিছু থাকে না; সহজ চৈতন্য রোগপ্রাবল্যে অসাড় বা বা অক্রিয় হইয়া পড়ায় অতীত স্মৃতির ছাপ অনেক সময় চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে, এবং এত প্রখর ভাবেই উঠে যে অনুভূতিতে তাহা রূপ ধরিয়া দেখা দেয়—এই সব চিৎ-পটের প্রতিবিম্বকে মায়াবীরূপ বলা যায়। বস্তু সত্তা না থাকায় উহাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছু নাই।

(খ) সুস্থ মস্তিষ্কে পরীক্ষা ঘটিতবোধভ্রম

আমরা টেলিপ্যাথী বা 'মন-চালা' ব্যাপার আলোচনা কালে দেখিয়াছি অলৌকিক অতীন্দ্রিয় উপায়ে একচিত্ত অপর চিত্তে নিজ ভাবিত ভাবনাকে জাগাইতে পারে। পরীক্ষাকর্ত্তা পরীক্ষা পাত্রকে ইচ্ছামত ভাবাইতে, কল্পিত-রূপ দেখাইতে বা কাজ করাইতে পারে। পাত্র সজ্ঞান বা মোহমুগ্ধ উভয় অবস্থাতেই পরীক্ষকের ইচ্ছাশক্তির অধীন হয়। ইচ্ছা করিলে পরীক্ষক পাত্রের অজ্ঞাতসারে (উভয়ের মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও) তাহাকে যে কোনো মায়াবী রূপ দেখাইতে পারে; আর এই মায়াবী রূপটা খাঁটি কল্পিত জিনিসও হইতে পারে বা কোনো সত্য বস্তু বা দৃশ্যও হইতে পারে। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বোধভ্রম এই জাতীয়। চিৎ-তত্ত্বানুসন্ধান সভার কার্য্য বিবরণীতে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

নিম্নে দু' একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল:—

(১) উক্ত সভার অন্যতম নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এড্‌মণ্ড গর্ণির পরিচিত S. H. B—নামধেয় কোন ভদ্রলোক লিখিতেছেন:—

১৮৮১ খৃঃ অব্দে নভেম্বরের এক রবিবারে আত্মার ইচ্ছা-শক্তি সম্বন্ধে এক বই পড়িতে পড়িতে ইচ্ছা হইল ইহার পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্ণয় করিব। কেনসিংটনে হগার্থ রোডে ২২নং বাড়ীতে আমার দুই মহিলা বন্ধু বাস করিতেন। আমি সে সময়ে প্রায় তিন মাইল দূরে কিলডার গার্ডনস্ রোডের ২৩নং বাড়ীতে বাস করিতাম; আমি সমস্ত মনের বলের সহিত ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, উক্ত বন্ধু দুটী তাহাদের শয়নকক্ষে বিছানার কাছে আমার ছায়ামূর্ত্তি দেখুক। আমার এ মতলব বিন্দুবিসর্গও মহিলা দুটীকে জানিতে দিই নাই। সেই রাত্রিতে ১টার সময় আমি তাহাদিগকে ছায়া মূর্ত্তিতে দেখা দিবার মনন করি। যাহাতে আমার মায়াবীরূপটা স্পষ্টভাবে তাহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধরা দেয় তাহার জন্য খুব একাগ্রভাবে ধ্যান করি।

পর বৃহস্পতিবারে আমি মহিলা দুটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। বসিয়া আলাপ পরিচয় হইতেছে এমন সময় জ্যেষ্ঠ মহিলাটী আপনাহ'তেই বলিয়া উঠিলেন—"গত রবিবার রাত্রি ১টার সময় আমি আপনার মূর্ত্তি শয়ন ঘরে দেখিয়া বড় ভয় পাই। মূর্ত্তি ক্রমশঃ বিছানার কাছে আগাইয়া আসাতে আমি চীৎকার করিয়া ছোট বোনকে তুলিলাম, সেও সেই মূর্ত্তি দেখিতে পায়-

পত্রোক্ত ঘটনাটীর সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মায়ার্স ও গর্নি উক্ত মহিলার ছোট ভগ্নি শ্রীমতি ভেরিটীর জবানবন্দী লয়েন। মিস্ ভেরিটী উহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

(২) শ্রীযুক্ত মায়ার্স বর্ণিত ঘটনা:—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক একদিন আমাকে তাঁহার এক অদ্ভুৎ অভিজ্ঞতার কথা জানান। ইনি ভারত সরকারের অধীনে এক উচ্চপদে বহুদিন আসীন ছিলেন। ভারতবর্ষে বাসকালে একদিন রাত্রে তিনি তাঁর শয্যার পাদদেশে এক ভদ্র মহিলার মায়াবীরূপ দেখেন। শুধু দেখা নয়, তাঁর বোধ হইল যেন মহিলাটী তাঁর সাহায্য—প্রার্থিনী। এই ঘটনাতে তিনি এত উদগ্রীব হন যে উহার উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহাকে বিলাতে পত্র লেখেন। মূর্ত্তিদর্শনকালে মহিলাটী বিলাতেই ছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি সংবাদ পান যে রমণীটী মায়াবী রূপে ইচ্ছা বলে দেখা দেওয়া যায় কিনা এই পরীক্ষা ঠিক ওই সময়েই করিতেছিলেন; এবং তৎকালে তিনি চেষ্টার ফলে মোহাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।"

মায়ার্স বলেন এই ঘটনার সত্যতা নির্ণয় করিবার

পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকটী আপনা হইতেই তাঁহাকে পত্রযোগে ইহা জানান।

Frank Madmore রচিত Thought Trans—ference গ্রন্থে ও চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠে এই জাতীয় অনেক প্রামানিক ঘটনায় উল্লেখ আছে।

(গ) স্বতঃঘটিত-বোধভ্রম

আমরা অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর ঘটনাগুলির আলোচনা করিব। মায়াবীরূপ দর্শনের যে সব স্বতঃঘটিত দৃষ্টান্ত আছে তাহা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে পড়ে।

(১) অমূলক ছায়াদর্শন :—দ্রষ্টা কোনো ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজগতের জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে এবং মন স্বরূপে থাকার জন্য তখন চিত্তে তৎকালভাবিত বিষয়ের জাগ্রতমূর্ত্তি বা রূপ দেখে। এ শ্রেণীর মায়াবীরূপের বস্তুগত সত্যতা নাই। ইহা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেরই কোনো স্বতঃ উত্তেজনার ফল।

(২) সমূলক ছায়াদর্শন :—এ শ্রেণীর দৃষ্ট মায়াবীরূপ অন্যরূপ। দ্রষ্টা অন্যমনস্কাবস্থায় থাকিয়া দূরদেশস্থ কোনো আত্মীয়স্বজন বা প্রিয়জনের শুদ্ধমাত্র মায়াবীরূপ দেখে। কখনো বা মায়াবীরূপকে কথার দ্বারা সংবাদ দিতে শোনে, কখনো বা শুদ্ধমাত্র কথাই শোনে। কখনো কখনো দূরস্থ স্থানের দৃশ্য ও ব্যক্তির মূর্ত্তিও দেখে। পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় ঠিক সেই সময়ে বা অব্যবহিত, পূর্ব্বে দৃষ্টব্যক্তি হয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত না হয় মরিয়া গিয়াছে, না হয় কোনো কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। মৃত বা মরণাপন্ন বা আর্ত্ত নিজে জানেনা যে তার মায়াবীমূর্ত্তি দ্রষ্টার চক্ষুগ্রাহ্য হইতেছে। দ্রষ্টাও মায়াবীরূপধারীর তৎকালীক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। এমন কি তাহার তৎকালীন বাসস্থান কোথায় তাও জানেনা। জানিলেও সে স্থান দ্রষ্টা পূর্ব্বে দেখে নাই। পণ্ডিতপ্রবর গর্ণি ও মায়ার্স রচিত সুবিখ্যাত Phantasams of the Living & Dying গ্রন্থে ও উক্ত সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণীগুলিতে এই জাতীয় বহু প্রামানিক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

দৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তির সহিত ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু বা বিপদের এই যে ঘটনার মিল ইহা দৈব ঘটিত কিনা তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই উভয় ঘটনার কাল-সংযোগ ও বস্তুগত-সাদৃশ্য বা মিলের সঙ্গে পরস্পরের কার্য্য কারন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তদন্ত করিবার জন্য গর্ণি নিজে ভার গ্রহণ করেন। তিনি ৬০০০ এই জাতীয় বিশ্বস্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া খুব সাবধানতার সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেন। তাহার এই আলোচনা উক্ত দুইটী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর দর্শনাচার্য্য সেজউইক মহোদয়ের কর্ত্তৃত্বে চিৎতত্ত্ব-সভা একটা সবকমিটী নিযুক্ত করেন। এই সভা বিজ্ঞাপন যোগে দেশবিদেশের লোককে পত্রযোগে যে-যার জীবনের মৃত্যুজ্ঞাপক ছায়াদর্শনের অভিজ্ঞতা জানাইতে বলেন। ফলে ১৭০০০ দৃষ্টান্ত সভার হাতে পৌছে। গর্ণি প্রাপ্ত ৬০০০ ও সেজ্‌উইক প্রাপ্ত ১৭০০০ দৃষ্টান্ত একত্র যোগে আলোচনা করিয়া সভা গণিত-সাহায্যে হিসাব করত দেখাইয়াছেন যে মৃত্যুজ্ঞাপক ছায়াদর্শনের সংখ্যা অনুপাত দৈবের মিলে কোনো মতেই হয় না। যদি এরূপ ছায়া-দর্শন দু চারিটা হইত তাহা হইলে দৈব-যোগ বলা যাইত; কিন্তু ইহারা সংখ্যায় এত বেশী যে, ব্যক্তির ছায়াদর্শন ও তাঁহার মৃত্যু এই উভয় সমকালীন ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারনাত্মক ধরণের কোনো একটা সম্বন্ধ থাকাই সম্ভব। সভার মন্তব্য এই যে, সব রকম ভুলভ্রান্তি বাদ দিয়া হিসাব করিলেও দেখা যায় যে অমূলক ও সমূলক ছায়াদর্শনের মধ্যে সংখ্যানুপাত দৈবযোগ অপেক্ষা ৪৪০ গুণ বেশী। সভার মন্তব্য ঠিক যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় তাহা এই;—"Between deaths and apparitions of dying person a connection exists which is not due to chance alone. This we hold as a proved fact. The discussion of its full implications can not be attempted in this paper;—nor perhaps exhausted in this age." (চিৎ-সভার বার্ষিক বিবরণ ১০ ভলুম, প। ৩৯৪)।

অর্থাৎ "মরনাপন্ন কোনো লোকের ছায়াদর্শন সেই

সময়েই তাহার মৃত্যু এই দুই ঘটনার মধ্যে দৈবের মিল ছাড়া অন্য সম্বন্ধ কিছু আছে যাহার সম্যক নিরাকরণ এ পুস্তকে বা এ যুগে সম্ভব নয়—"। সভা অবশ্য এ করিবার সময় ভুলিয়া-যাওয়া ঘটনা ও মনে-রাখা ঘটনার সংখ্যাগুলিকে হিসাবের ভিতর খুব উদারভাবেই ধরিয়াছেন।

সাধারণ লোকেরা তালিকায় প্রমাণকে তত আমলে আনেনা। জীবনে ঘটিয়াছে এইরূপ একটা সত্যমূলক ছায়াদর্শনের অভিজ্ঞতা তালিকা পঠিত হাজার ঘটনার চেয়ে বলবান। যাহারা বিশ্বস্ত আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনিয়াছেন মাত্র তাহাদেরও তাই। ছায়াদর্শনের সময় দ্রষ্টারা তখনি তখনি অভিজ্ঞতা বিশদ ভাবে লিখিয়া রাখেন না; কাজেই সন্দেহবাদীরা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু এ জাতীয় লিপিজাত ঘটনায় ১৭টী দৃষ্টান্ত সভায় বিবরণীতে স্থান পাইয়াছে।

পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা এই শ্রেণীর সত্য-মূলক ছায়াদর্শনের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথম—ঃশুদ্ধমাত্র ছায়ামূর্ত্তিদর্শন —মিস্ ম্যাবেল গোর লিখিত বিবরণ—ফেব্রুয়ারী ১৮৯১। গ্রিগো।

১৮৮৯ খৃঃ ১০ই এপ্রেল তারিখের সকালে বেলা ৯॥০টার সময় আমার ছোট ভাই আর আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে রসুই-ঘরে কিছু খাবার আনতে যাচ্ছিলাম। প্রায় অর্দ্ধেক সিঁড়ি নামা হয়েছে এমন সময় আমার ভাই হটাৎ বলে উঠ্‌লো—"ওকি? ও যে জন্ ব্লানী, জন্ এখানে আছে তা তো জানতাম না!" এই জন ব্লানী কিছু দূরে এক বাড়ীতে বাস করতো। সে আমাদের হলের চাকর ছিল। অসুখে পড়ায় কয়েকমাস আগেই সে কাজ ছেড়ে চলে যায়। আমি ওই কথা শুনেই সেই দিকে তাকালাম, কিন্তু কাকেও দেখ্‌তে পেলাম না, যে জায়গায় ছায়ামূর্ত্তি দেখা গিয়েছিল সেটা একটা লম্বা সরু হলের মত, তা হতে বেরিয়ে যাবার মোটে একটা দরজা; আমরা সেই বরাবর গেলাম, কিন্তু কাকেও দেখতে পেলাম না; দরজাটাও বন্ধ ছিল। উপরে ফিরে যাবার সময় আমার ভাই বল্‌লে 'জনকে এত মলিন বিবর্ণ দেখালো কেন? আর অমন করেই বা তাকিয়ে ছিল কেন?' আমি ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম 'জন কি করছিল?' ভাই বললে—"তার জামার হাতা দুটা গুটানো ছিল, আর কোমরে একটা সবুজ রঙের আপ্রন (apron) পরাছিল—চাকররা যে বেশে বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করে। আমি তারপর দাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম 'জন কতক্ষণ ফিরে এসেছে?' দাসী তাই শুনে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—'সে কি বলছেন? জন্ যে আজ সকালে মারা গেছে?' তারপর অনুসন্ধানে জানলাম আমার ভাই যখন জনের ছায়ামূর্ত্তি দেখে তার দু ঘণ্টা আগে জন মারা গিয়েছে। আমার ভাই তা শুনে বলে "তবে আমি জনের ভূত দেখেছিলাম।"

কুমারী ম্যাবেলের ভাইকে সভা হতে জেরা করায় সে ওই সব কথাই বলে; এবং রেজেষ্ট্রী আফিসে তদন্ত করাতে জানা যায় জন ব্লানি ঐদিন সকালে ঐ সময় মারা যায়।

দ্বিতীয় :—শুদ্ধমাত্র ভৌতিকশব্দ শ্রবণ — সার্‌জন ড্রামণ্ড হে K. C. B. লিখিত বিবরণ :—

"১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন রাত্রিতে জাগ্রত অবস্থায় স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম,—আমার পুত্রবধূ যেন বলছেন 'রবার্টের (আমার ছেলে) অসুখের কথা বাবা (শ্বশুর—আমি) যদি জানতে পারতেন ভাল হতো।' আমার ছেলে ও পুত্রবধূ তখন দূরে অন্যত্র বাস করছিলো। শব্দ শুনে চম্‌কে উঠে আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে আমার স্ত্রীকে ঘুমহতে জাগিয়ে এই ব্যাপার শোনালাম, আর ডাইরিতে লিখে রাখ্‌লাম। পরে চিঠি লিখে খবর নিয়ে জানলাম রবার্টের সত্যই তখন বড় অসুখ আর আমার পুত্রবধূও বিশেষ রকম চিন্তিত হয়ে ওই কথাগুলো উচ্চারণ করেন।"

সভা সার ড্রামণ্ড হে'র পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূকে স্বতন্ত্র-ভাবে জেরা করিয়া এ ঘটনায় সত্যতা নিরাকরণ করে।

তৃতীয় ঃ—ভৌতিক মূর্ত্তি ও শব্দ যুগপৎ দর্শন ও শ্রবণ—

রেভারেণ্ড ম্যাথু ফ্রষ্টের লিখিত বিবরণ :—

"এসেক্স্। আন্থু। ৩০।১৮৯১ সালের এপ্রেলের প্রথম বৃহস্পতিবার আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় আমার পিছন দিকে জানালায় একটা ধাক্কার মত শব্দ হয়; পিছন ফিরে সেইদিকে তাকিয়েই আমি আমার স্ত্রীকে বল্লাম 'এই যে ঠাকুরমা (বা দিদিমা) এসেছেন ?' বলেই তাঁকে অভ্যর্থনা করতে দরজার কাছে এগিয়ে যাই; তারপর আর দেখ্‌তে পেলাম না। আমি একটু আশ্চর্য্য হলাম। বুড়ীর বয়স ৮৩ বছর আর স্বভাবে একটু রঙ্গরহস্য প্রিয় ছিল জেনে আরো একটু এদিক ওদিক দেখে বাড়ীর চারিদিক খোঁজ করি, কিন্তু কোনই সন্ধান পেলাম না। আমার স্ত্রী শব্দটা শুনেনি; পর শনিবার ইয়র্কশায়ার হতে খবর হলো দিদিমা ঠিক উক্ত ঘটনার আধ ঘণ্টা আগে মারা গিয়েছেন। শেষ দেখা তাঁর সঙ্গে যখন সে ছ বছর আগে। তখন তাঁকে বলেছিলাম 'যদি বেঁচে থাকি দিদিমা তোমার অন্ত্যেষ্টী-ক্রিয়ার সময় হাজির হবো।' ঘটনার সময় আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল, বয়স তখন ২৬। আর আমি জানতামও না দিদিমার অসুখ করেছিল—"

সভার জেরাতে ফ্রষ্ট পত্নী ঐ কথাই বলেন, তবে তিনি নিজে কিছু শুনেননি বা দেখেন নি।

চতুর্থ—দর্শন, শ্রবণ ও ত্বাচ ঘটিত দৃষ্টান্ত ঃ—

মিঃ ম্যালিসন প্রদত্ত বিবরণ :—"১৮৭৪ বা ৭৫ খৃষ্টাব্দে আমি একবার সমুদ্র যাত্রা করি। সঙ্গে আমার ছোট ছেলে ছিল। যাবার দিন রাত্রিতে অর্দ্ধনিদ্রিত স্বপ্নাবস্থায় থাকবার সময় মনে হল যেন দেখলাম ছেলে জাহাজ হতে জলে পড়ে গেল, আর আমি সেই সংবাদ স্ত্রীকে এনে দিলাম। বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে শুন্‌লাম সেই রাত্রিতেই তিনি বোধ করলেন কে তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। স্ত্রী সেই অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে মূর্ত্তিকে ছুঁতে গিয়ে বোধ করলেন আমারই কোটের কাপড়ে হাত দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলতে শুনলেন—"হাঁ আমি ফিরে এসেছি"; তাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কিন্তু এডি কোথা ?" কোনো আর উত্তর না পেয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌লেন।"

একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভ্রমের আরো অনেক দৃষ্টান্ত গর্ণি-রচিত Phantasms of the living গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম ঃ—দূরস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা ও স্থান দৃশ্যের বোধভ্রম। মিসেস প্যাকেটের বর্ণিত ঘটনা :—"২৪শে অক্টোবর। ১৮৮৯ দিনের বেলা, আমার স্বামী কর্ম্মস্থানে আর ছেলেরা স্কুলে গেলে বাড়ীতে একা বোধ করায় আর মনটা অজ্ঞাত কারণে কেমন খারাপ বোধ হওয়াতে একটু চা তৈরি করে খাবার আয়োজন করছি এমন সময় হটাৎ আমার ভাই এডমণ্ড্ জনকে সুমুখে দেখি। তার মূর্ত্তিটা আমার দিকে অনেকটা পিছন-ফেরা ধরণের ছিল; আর ছুটো দড়ি পায়ে তার জড়িয়ে গিয়ে যেন সে উল্টে পড়ে যাচ্ছে এই ভাব। একটা রেলিং বয়ে যেন নীচে পড়ে যাচ্ছে। ছায়ামূর্ত্তিটা মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল। আমি চা ফেলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম "হায়! হায়! এড্ ডুবে মলো ?" বেলা সাড়ে দশটার সময় আমার স্বামী চিকাগো হতে তারের খপর পান যে আমার ভাই জলে ডুবে মরেছে। তিনি বাড়ী ফিরে এসে আমায় বল্লেন—"এড্ চিকাগোর এক হাঁসপাতালে বড় পীড়িত, তার খপর পেলাম।" আমি তাতে বল্লাম "না এড্ জলে ডুবে মরেছে; আমি তাকে পড়তে দেখেছি।" তারপর যা-যা দেখেছিলাম তা যথাযথ বর্ণনা করলাম, বল্লাম—"এডের মাথাখালি ছিল; সেলারের নীল পোষাক পরা; রেলিং টপ্‌কে সে জলে পড়লো। তার প্যান্টটা গোড়ালির কাছে গুড়ানো ছিল, প্যান্টের ভিতরের সাদা লাইনিং দেখা গিয়েছিল।" জাহাজ বা বোট্‌টা কেমনতর দেখতে তাও বর্ণনা করলাম।

এর আগে এমন অভিজ্ঞতা আমার কখনো হয়নি। আমি যে দুর্ব্বল স্নায়ু বিশিষ্ট তাও নয়। আমার ভাইএর মৃগী বা মাথা ঘোরা রোগ ছিলনা—"

চিৎতত্ত্ব সভা মিঃ প্যাকেটের কাছ হইতে প্রামানিক বিবরণ পাইয়াছিল। এবং মিঃ প্যাকেট চিকাগো যাইয়া উক্ত বোটের অন্য লোকের কাছেও যা সংবাদ সংগ্রহ করেন তাতে শ্রীমতী প্যাকেটের বর্ণিত খুঁটানাটী সমস্তই মিলিয়াছিল। এ ঘটনাটীর বিশেষত্ব এই যে ইহাতে বুঝা যায় ছায়াদর্শন ব্যাপারটা মৃত্যুর অনেক পরে ঘটে।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত :—মৃতের সঙ্গে জীবিতাদ্রষ্টার মরিবার আগে চুক্তি ছিল—যে আগে মরিবে সে জীবিতকে তারদেহান্ত অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ সূক্ষ্মশরীরে দেখা দিবে।

এইরূপ পূর্ব্ব-চুক্তি অনুসারে মায়াবীরূপে বা সূক্ষ্মদেহে মৃত্যুর পর দেখা দেওয়ায় দৃষ্টান্ত পণ্ডিত প্রবর গর্ণির Phantasm of the Dying গ্রন্থে বহু পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে।

আমরা নিম্নে তিনটী উদাহরণ দিতেছি।

(৬ক)—ক্যাপটেন কোল্টের প্রদত্ত বিবরণ :—

"আমার এক ভাই যুদ্ধে যান। তাঁর সঙ্গে আমার এই চুক্তি ছিল যে তিনি হত হইলে মৃত্যুর পর যদি বুঝেন তাঁর দেহান্ত অস্তিত্ব বজায় আছে তাহা হইলে আমার এই বসিবার ঘরে (যে ঘরে চুক্তি করা গেল) সূক্ষ্মদেহে আমাকে দেখা দিবেন। পরে তিনি সত্যই যুদ্ধে হত হন। মৃত্যুর ১৪ঘণ্টা পরে আমি সেই ঘরে তাহার প্রেতমূর্ত্তি দেখি। তাঁহার দক্ষিণ রগে একটা গুলির আঘাত ও তাহা হইতে রক্ত ঝরিতেছে। মুখ রক্তহীন সাদা, যেন মোমের তৈয়ারী।"

অনুসন্ধানে মৃত-দেহের কোটের পকেটে একখানা পত্র পাওয়া যায়। পত্র Captain Coltএর লিখিত। উহাতে ক্যাপ্টেন তাঁর প্রত্যেক চুক্তির কথা মনে করাইয়া দিয়াছিলেন। মৃত্যু সম্বন্ধে খপর লইয়া জানা যায় গুলির আঘাত ও আহতস্থান ও রক্তের ধারা সবই সত্য।
(Myers—Vol. II Sec. 725. a)

(৬খ)—লর্ড ব্রুহাম বর্ণিত বিখ্যাত ঘটনাঃ—

"আমার এক অত্যন্ত প্রিয় বাল্যবন্ধু ছিল। তাঁহার নাম পুরা না দিয়া 'জি' বলিয়া উল্লেখ করিব। আমরা স্কুল শিক্ষা ছাড়িয়া কলেজে পড়িতে যাই। আমরা এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, গল্প-গুজব করিতাম। আত্মীয়তা এমনিভাবে খুব ঘনিষ্ট হইল। একদিন আমরা দেহান্তে জীবাত্মা থাকে কিনা এই লইয়া তর্কবিতর্ক করি। তর্ককালে উভয়ে এই চুক্তি করিলাম যে উভয়ের মধ্যে যে আগে মারা যাইবে সে প্রেতমূর্ত্তিতে জীবিতকে দেখা দিয়া এই সন্দেহ নিরাকরণ করিবে। চুক্তিপত্র নিজেদের দেহ-রক্তে সই করা হইল। পরে কলেজ ছাড়িয়া 'জি' সিভিল-সার্ভিস্ পাশ করতঃ ভারতবর্ষে কাজ লইয়া চলিয়া গেল। আমাদের আর বড় চিঠিপত্র চলিত না। কয়েক বৎসর এইভাবে যাওয়ার পর আমি 'জি'কে একরকম ভুলিয়াই গেলাম। তার পরিবারবর্গ দুরবাসী হওয়াতে আমি 'জি'র বড় কোনো সংবাদ পাইতাম না। ফলে আমার মন হইতে 'জির' স্মৃতি একেবারে মুছিয়া গেল।

তারপর বহুদিন পরের কথা। নরওয়ে দেশে গষ্টিনবার্গ সহরে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলাম। একটা হোটেলে ছিলাম। ভ্রমণক্লান্তি দূর করিবার জন্যে রাত্রিতে হট্‌বাথ্ (উষ্ণস্নান) করিয়া উঠিয়া চেয়ার হইতে পরণের কাপড় লইতে যাইব এমন সময় দেখি 'জি' উহাতে বসিয়া স্থির চোকে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। দৃষ্টিমাত্রে আমার কি হইল জানি না; তারপর যখন জ্ঞান সঞ্চার হইল দেখিলাম মেঝেতে পড়িয়া আছি। চেয়ার শূন্য। 'জির' প্রেতমূর্ত্তি অদৃশ্য।" (হিস্‌লপ রচিত Science and future life হইতে গৃহীত)।

(৬গ) দুই বালিকা-বন্ধু চুক্তি করে যে—যে আগে মারা যাইবে সে জীবিতাকে দেখা দিবে।" চুক্তিকে বলবৎ করিবার জন্য উভয়ে আংটী বদল করে এবং সর্ত্ত করে যে মৃতবন্ধু প্রেতমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া জীবিতার আংটী ফিরাইয়া দিবে। পরে একজন যখন মারা যায় তখন তার প্রেতাত্মা জীবিতাকে দেখা দেয়। জীবিতা দেখিল মৃত সখী বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া সেই আংটীটী দেখাইতেছে।" (Gurney's phantasams of dead; page 477—vol. II)

গর্ণি তাহার উক্ত গ্রন্থে এই শ্রেণীর বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনাগত সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। তবে আত্মার দেহান্ত অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাদের প্রামানিকতায় কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, যদিচ সে সন্দেহের কোনো হেতু দেখা যায় না। এইজন্য আমি আর এক শ্রেণীর ছায়াদর্শনের দৃষ্টান্ত দিব তাহাদের প্রামানিকতা সন্দেহ করা কঠিন হইবে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি সম্বন্ধে সন্দেহকারী বলিতে পারেন, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে দেখা দিবার একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা বশতঃ তাহার অজ্ঞাতসারে টেলিপ্যাথী বলে ইচ্ছা ঘটিত চিন্তাপ্রবাহ দ্রষ্টার মস্তিষ্ক যন্ত্রে এই বোধভ্রম ঘটাইয়াছিল। না হইতে পারে যে তাহা নহে, তবে ইহাকে টেলিপ্যাথী সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলেনা এইজন্য যে মৃত্যুর আনুসঙ্গিক স্থান ও দৃশ্য ঘটিত যে খবরাখবর তা মরনাপন্নের নিজেরই সব ক্ষেত্রে জানা ছিলনা। যাহা হউক নিম্নের দৃষ্টান্তগুলিতে এ রকম সন্দেহের স্থল যে নাই পাঠক তাহা নিজেই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন। ১৪।৯।৯১।

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ—মিস্ ডড্সনের বর্ণিত ঘটনা :—

"১৮৮৭ সালের ৫ই জুন রবিবার রাত্রি ১১-১২টার মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। আমি তখন বিছানায় শুইয়া; জাগ্রত ছিলাম। হটাৎ শুনিলাম যেন কে আমার নাম ধরিয়া তিনবার ডাকিল। আহ্বানকারীকে আমার খুড়া মনে করিয়া দুইবার সাড়া দিলাম। বলিলাম—'এস জর্জ্জ খুড়ো আমি জেগে আছি।' কিন্তু তৃতীয় ডাকটা শুনিয়া মনে হইল যেন আমার মা ডাকিতেছেন। মা এ ঘটনার ষোল বছর আগে মারা গিয়াছিলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম 'মা নাকি?' তার পরেই দেখি আমার বিছানার নিকটবর্ত্তী কাঠের পর্দ্দার পাশ হইতে দুই কোলে দুইটী শিশুকে লইয়া মা আমার দিকে আসিলেন। শিশু দুটীকে আমার পাশে শোয়াইয়া কাপড় ঢাকা দিয়া আমাকে বলিলেন—'তুমি শপথ কর, ছেলে দুটাকে পালন করবে? তাদের মা এই মাত্র মারা গেল?' আমিও বলিলাম—'হাঁ মা তাই করবো।' তিনি বলিলেন—'না, শপথ কর যে ওদের মানুষ করবে?' আমিও বলিলাম,—'হাঁ, শপথ করছি।' তার পরেই বলিলাম, 'মা একটু থাক, কথা কও, আমি বড় মনের অশান্তিতে আছি।' উত্তরে তিনি বলিলেন—'না বৎস, এখন নয়।' তার পরেই দেখিলাম তিনি তেমনি ভাবে পর্দ্দা ঘিরিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও পাশে শিশু দুটীর অস্তিত্ব বোধ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে উঠিয়া কিছুই দেখিলাম না। ৭ই জুন মঙ্গলবার সকালে খবর পাইলাম, আমার sister-in-law (ননদ বা ভ্রাতৃবধূ) তিন সপ্তাহের একটী সদ্যোজাত শিশু রাখিয়া মারা গিয়াছেন। *শিশুর জন্মের কথাও এর আগে জানিতাম না।" সভার জেরার উত্তরে—"আমি শুইয়াছিলাম, ঘুমাই নাই। ঘরে রাস্তার গ্যাসের আলো আসিতেছিল। শরীর ভাল ছিলনা। সংসারিক চিন্তায় অশান্তিতে ছিলাম। আমি একাই ছিলাম আমার বয়স ৪২ বৎসর। পরদিন প্রভাতে খুড়াকে সমস্ত কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, 'তোমার মাথায় অসুখ হয়েছিল বা!' এ রকম অভিজ্ঞতা আরো দু চার বার আমার হইয়াছিল, কিন্তু দৃষ্টি ঘটিত কোনো ভ্রম নয়; খুব মানসিক উদ্বেগের সময় মনে হইত কে-যেন আমার মাথায় হাত দিতেছে কখনো বা মনে হইত কে-যেন হাতে হাত দিতেছে—

(চিৎ তত্ত্ব সভার বিবরণী ১০। পত্র ৩৮০)

সভাপক্ষে এ ঘটনার তদন্তভার পড়ে দর্শনাচার্য্য পণ্ডিত সেজ্উইকের উপর। যে সেজ্উইক এ সব বিষয়ে সন্দেহবাদী এবং তদন্ত ব্যাপারে মহা সাবধানী। প্রেততত্ত্ব ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে সভার যে সব কঠিন নিয়মাবলী তাহা ইঁহারই দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়। এবং পাঠক জানেন কি রকম সে মাপকাটী। একটা হত্যাপরাধীকে ফাঁসী দিতে যে ধরণের সতর্ক প্রমান দরকার হয় তদপেক্ষা দশ গুণ সতর্ক ও কঠিন প্রমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে এই সব অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস্য বলিয়া সেজউইক গ্রাহ্য করিতে নারাজ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ—মিঃ এফ্, জি বর্ণিত ঘটনা।

*বোষ্টন। ১১।১।১৮৮১।

"আপনাদের সভার দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে আমি এই নিজ অভিজ্ঞতা পত্রযোগে জানাইতেছি। কেহ সহজে বিশ্বাস করিবে না বলিয়া আমি এ যাবৎ বাহিরের কাহাকেও এ কথা বলি নাই।

"১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আমার একমাত্র ছোট ভগ্নি 'সেণ্টলুই' নগরে হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। আমাদের ভাইবোনে অত্যন্ত ভালবাসা ছিল, কাজেই এ খবরে আমি যারপর নাই দমিয়া যাই। তার মৃত্যুর বৎসর দু' এক পরে আমি কর্ম্মোপলক্ষে এখানে ওখানে বেড়াইতে থাকি। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আমি যুক্তরাজ্যের পশ্চিম প্রদেশে যখন অবস্থান করি সেই সময় এই ঘটনা ঘটে। সেণ্ট জোসেফ্ নগরীর এক হোটেলের একটী বড় ঘরে আমার অর্ডার পাঠানো কাজে নিযুক্ত আছি। বেলা তখন দুপুর। কাজ কর্ম্মের সুবিধা ঘটায় মনটী খুব স্ফূর্ত্তিযুক্ত। চুরুট পাইতে খাইতে অর্ডার লিখিতেছি; এমন সময় হঠাৎ মনে হইল আমার পাশেই বাঁ দিকে কে যেন বসিয়া আছে। একখানা হাত তার আমার টেবিলের উপর। চকিতের মধ্যে চোখ ফিরিয়াই দেখি আমার সেই ভগ্নি! চোখো-চোখি হইতেই আমি আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম। মূর্ত্তিও মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। দেখিলাম যেন আস্ত জীবন্ত! অখণ্ড স্বাভাবিক মূর্ত্তি। অত্যন্ত স্নেহভরে ও সহজভাবে আমার দিকে তাকাইয়াছিল।

"আমার দৃষ্ট ঘটনা যে মাথায় বিকৃতি ঘটিত ভ্রমদর্শন নয় তাহার প্রমান শুনুন। এই ব্যাপারে অত্যন্ত উন্মনা হইয়া আমি পরের গাড়ীতেই বাড়ী রওনা হই। বাড়ী আসিয়া বাবা ও মা'কে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। বাবা একটু এ সব বিষয়ে অবিশ্বাসী ধরণের লোক ছিলেন; তিনি প্রথমটা হেসে উড়িয়ে দিবার ভাব দেখান; পরে আমি যখন বলিলাম ভগ্নির মুখের ডানদিকে একটা লাল রক্তের আঁচড়-দাগ দেখিয়াছিলাম তখন তিনি বিস্মিত হইয়া গম্ভীর হইলেন, মা কিন্তু একথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্পষ্টই আবেগভরে কাঁপিতে লাগিলেন। এত বেশী যে মনে হইল তিনি বুঝি মূর্চ্ছা যাইবেন, পরে সামলাইয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'হাঁ বাবা, তুমি সত্যই তাকে দেখেছ! যে আঁচড়-দাগের কথা বল্লে তা সত্য, আমি ছাড়া আর কেহ জানেনা; মৃত্যুর পর তার শব-দেহটীকে পরিষ্কার করে মুছিয়ে দিতে গিয়ে আমি অ-জান্তে অসাবধানে আঁচড় কেটে দিয়েছিলাম। বাছার মুখশ্রী এমন করে বিকৃত করে দিয়ে মনটা, বড় খারাপ হয়ে যায়; তারপর কেউ না জান্তে পারে এমন করে পাউডার দিয়ে সে দাগটা ঢাকা দিয়ে দি, সেকথা বাড়ীর কেহ জানেনা তোমার বাপও না——অথচ আমি সেই দাগ দেখিলাম! মা আমার এ অভিজ্ঞতায় এত অভিভূত হইয়া পড়েন, যে রাত্রিতে ঘুম হইতে উঠিয়া আমার ঘরে আসিয়া আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'না বাবা আমি বিশ্বাস করি তুমি তাকেই দেখেছো?' কয়েক সপ্তাহ পর মা স্বর্গ-লাভ করেন; মৃত্যুকালে তাঁর মনে এই বিশ্বাস ও বিশ্বাসজনিত শান্তি হইয়াছিল যে তিনি অচিরে পরলোকে তাঁর আদরের মেয়ের সহিত মিলিত হইবেন—।"

তৃতীয় দৃষ্টান্তটী আরো আশ্চর্য্যজনক:—

রুশ দেশবাসী ব্যারন ভন্ ড্রিসেন্ কর্ত্তৃক বর্ণিত ঘটনা।

"আমার শ্বশুর এম্, এন্, জে, পনোমারেফ তাঁর ভবনে মারা যান। অনেকদিন হতেই কঠিন রোগে ও রোগ-যাতনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন; এই জন্যে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে তাঁর সেবার জন্য যেতে হয়। শ্বশুরের সঙ্গে আমার বড় সদ্ভাব ছিল না। নানা কারণে সেটা ঘটে আর মৃত্যু পর্য্যন্তও সেই ভাব থাকে। আমাকে আর সকলকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করে তিনি দেহত্যাগ করেন। নবমদিনে তাঁর আত্মার শান্তিকামনায় স্বস্ত্যয়ন পাঠ হবে (Liturgy); আমার বেশ মনে পড়ে আমি সে পূর্ব্বরাত্রে শুতে যাই, এবং নিদ্রা যাবার আগে পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ ধরে বাইবেল পড়ি। আমার স্ত্রীও সেই ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন। ঘর নিস্তব্ধ। আলো নিভিয়ে দিয়ে শুতে যাব এমন সময় মনে হল কে-যেন বাইরে চলে বেড়াচ্ছে। চটীজুতোর শব্দ বলে বোধ হল; আমার ঘরের দরজার কাছে এসে থেমে গেল। আমি সেই দিকে কান আর

চোখ ফিরিয়ে বলে উঠ্‌লাম 'কে ওখানে?' কোনো উত্তর না পেয়ে দেশালাই জাল্‌লাম, আলো জ্বলে উঠ্‌লে চেয়ে দেখি দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার শ্বশুর! অথচ দরজা বন্ধ। গায়ে তাঁর একটা লম্বা নীলরংএর ঝোলা গাউন, তার ধারে ধারে কাঠবিড়ালীর লোম (squirrel-fur) বোতাম অর্দ্ধেক খোলা, তার ভিতর দিয়ে ভিতরের সাদা কুর্ত্তী ও কাল প্যাণ্ট দেখা যাচ্ছিল। শ্বশুর যে তার সন্দেহই রইলো না। আমার ভয় হয়নি। লোকে বলে ভূত দেখবার সময় ভয় পায় না, কেননা ভূতেরা নাকি ভয়কেও ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারে!—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি কি চান্?' প্রেতমূর্ত্তি আমার বিছানার দিকে দু পা এগিয়ে এসে বললেন—'ব্যাসিল্ ফেডরোভিচ্ আমি তোমার উপর অন্যায় করেছি তোমার কাছে অপরাধী; আমায় মাপ কর, তা না করলে আমি পরলোকে শান্তি পাচ্ছি না?' কথা বলবার সময় তাঁর দক্ষিণ হাত আমার দিকে মেলে দেওয়া আর বাঁ হাত উপর দিকে বাড়ানো। আমি তার ডান হাত ধরলাম, হাতটা বেশ লম্বা আর হিমঠাণ্ডা বোধ হল। হস্তমর্দ্দন করে আমিও বল্‌লাম,—"নিকোলাস্ আইভানোভিচ্ ঈশ্বর জানেন আপনার উপর আমার আর কোনো বিদ্বেষ নাই?

প্রেতমূর্ত্তি মাথা নত করিয়া (bowed) বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে বিলিয়ার্ড ঘরে ঢুকলেন এবং অদৃশ্য হয় গেলেন! আমি মুহূর্ত্তেক সেই দিকে তাকিয়ে তারপর নিজের গায়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে (আঙুল চালিয়ে) আলো-নিভিয়ে কর্ত্তব্য সাধন জনিত শান্তিলাভ করে নিদ্রা গেলাম। পরদিন যথারীতি আমার শ্বশুরের উদ্দেশ্যে স্বস্ত্যয়ণ পাঠ হয়ে গেল। কাজ শেষ হলে আমাদের Confessor কুলপুরোহিত পাদরী রেভঃ ব্যাসিল আমাকে অন্তরালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, 'ফেডরোভিচ্ তোমাকে একটা গোপনীয় কথা বলবার আছে।' আমার স্ত্রী এমন সময় সেখানে এসে পড়েন। পাদরী বাবা ইতস্ততঃ করছেন দেখে বল্‌লাম, 'আপনি কি বলতে চান্ বলুন; আমার স্ত্রীর কাছে আমার লুকাবার কিছু নেই।' ভরসা পেয়ে তিনি বল্লেন—'আজ রাত তিনটের সময় তোমার শ্বশুর মহাশয়ের প্রেত আত্মা আমাকে দেখা দেন এবং আমায় অনুরোধ করলেন যেন তোমার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ঘটিয়ে দি।'

ব্যারন ড্রিসেনের এই ঘটনা বর্ণনার সময় পাদরী ব্যাসিল কাশিন জেলার কোইপারিস গ্রামে বাস করিতে-ছিলেন। তিনিও জেরায় উক্ত ঘটনায় সমর্থন করিয়া পত্র দেন।

পাঠক পাঠিকারা এই ধরণের সত্যমূলক ছায়াদর্শনের বহুতর প্রামাণিক ঘটনার বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে মহাত্মা গর্ণি ও মায়ার্স রচিত Phantasms of the Dead এবং Human Personality and its bodily survival গ্রন্থদ্বয় পড়িবেন।

এখন এই শেষোক্ত ঘটনা তিনটী পড়িয়া পাঠক সব-দিক বুঝিয়া বিচার করুন Telepathy বা ভাব-চালনা মত দিয়া ইহাদের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন কিনা।

পনোমারেফের ও মিস্, ডড্‌সনের জননীর ছায়ামূর্ত্তির দৈহিক বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ উঠিলে এই কথা বলা যায় যে ডাঃ ওয়ালেস্ (ডারুইনের সহযোগী বিবর্ত্তনমতবাদী) বিজ্ঞানবিৎ ক্রুক্‌স ও জীবতত্ত্ববৎ ফরাসী পণ্ডিত ব্যারাডুক কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও পরীক্ষা সিদ্ধ প্রেত কর্ত্তৃক সূক্ষ্ম জড়দেহ ধারণের তত্ত্ব মনে রাখিবেন। পরীক্ষা ফলে তাঁহারা বলেন যে, "দেহমুক্ত জীবাত্মা কোনো কোনো অনুকুল অবস্থা সাহায্যে অজ্ঞাত উপায়ে উপস্থিত দেহীদের সান্নিধ্যে পরস্পর মধ্যে চৌম্বক সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া শেষোক্তদের দেহ হইতে (দেহী) সূক্ষ্ম পদার্থ সংগ্রহ করিয়া কার্য্যো-পযোগী সাময়িক একটা দেহ গড়িয়া তুলিতে পারে; শুধু তাই নহে আরো অনুকুল অবস্থায় গঠিত সূক্ষ্ম দেহকে জীবিত ব্যক্তির স্পর্শ-যোগ্য করিতেও পারে।" ইহা সম্ভব, তবে এখনো জোর করিয়া বলা যায় না যে তাহা হইতেই হইবে। তবে এও কথা, যে ইহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা লব্ধ সিদ্ধান্ত সত্বেও অবিশ্বাস করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান গবেষনা লব্ধ ফল ইহা ছাড়া অন্য কারণ ব্যাখ্যা দিতে পারেনা; বিশ্বাস করা না করা বিজ্ঞানের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধীন।

পূর্ব্ব কথিত চিৎসভা গঠিত 'ছায়াদর্শন সমিতির' সভাপতি ও তদন্ত কর্ত্তা দর্শনাচার্য্য সেজউইক এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে জানাইয়া এবং কারণ ব্যাখ্যায় টেলিপ্যাথীর সক্ষমতা বিচার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আচার্য্য সেজউইক মৃতের প্রেতমূর্ত্তি দর্শন সম্বন্ধে বলিতে চাহেন :—

"আমরা অতঃপর মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে ছায়াদর্শনের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচার করিয়া এইটুকু বলিতে সক্ষম হই যে ইহাদের ঘটনা বৈচিত্র্যও হেতুতত্ত্ব হইতে আন্দাজ করিতে পারিতেছি যে দেহান্তে জীবাত্মা স্বতন্ত্রভাবে সজ্ঞানে বিদেহাবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারে, এবং অবস্থাবিশেষে জীবিতদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারে। আমরা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছি যে সব ক্ষেত্রেই দৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তি দ্রষ্টার চিত্তবিকার ফল নহে, বরংচ মূর্ত্তির সহিত মূর্ত্তি-ধারী বিগত দেহীর সম্বন্ধ আছে এবং তাহারই মরনান্ত চেষ্টার ফলে এই ছায়ামূর্ত্তি ঘটে। তবে প্রামানিক দৃষ্টান্তের সংখ্যা এত বেশী নহে যাহাতে উহাকে স্বতঃসিদ্ধ অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে।"

চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির অধিকাংশ সভ্যেরই এই মত। ব্যক্তিগত মত দ্বৈধ আছে ও থাকিবেই। পণ্ডিতপ্রবর মায়ার্স বিশ্বাস করেন এসব দেহমুক্ত জীবাত্মারই কাজ। মিঃ ফ্রাঙ্ক পড্‌মোর এ মতের গোঁড়া প্রতিবাদী। এবং স্বয়ং সেজউইক ও তদীয় পত্নী কোনো মতই প্রকাশ করিয়া দিতে রাজী নন।

যাঁহারা টেলিপ্যাথী মত দিয়া ব্যাখ্যা করার পক্ষীয় তৎ-তত্ত্ব যা জানা গিয়াছে তাহা দিয়া সত্যই কি এসবের ব্যাখ্যা হয়? টেলিপ্যাথী অর্থে অতীন্দ্রিয় উপায়ে এক মন হইতে অন্য মনে ভাব চলে না। কিন্তু এইভাব প্রবাহ যে যাতায়ত করে কি করিয়া তাহা না বুঝাইতে পারিলে শুদ্ধমাত্র একটা অর্থহীন অজ্ঞাত শক্তির নাম-দোঁহাই দিয়া এইসব জ্ঞাত, পরীক্ষা প্রমানিত অভাবনীয় ঘটনার ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। টেলিপ্যাথী নিজে একটা অলৌকিক অতি প্রাকৃত ব্যাপার না হইলে এই সব অলৌকিক ঘটনারও ব্যাখ্যা হইবে না। কেননা ঘটনাগুলি দৈবঘটিত ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। যদিও ধরা যায় যে দেহমুক্ত জীবাত্মা থাকে তাহা হইলে সেই বিদেহ আত্মা স-দেহ আত্মার সঙ্গে যে যোগাযোগ স্থাপন করিতেছে তাহার তো একটা প্রাকৃত পন্থা থাকিবে? কি সেই পন্থা? নিশ্চয়ই এই টেলিপ্যাথী! ঘটনাগুলা বিশ্বাস করিলে—আর না করিলে উপায় নাই—বিশ্বাস করিতে হইবে টেলিপ্যাথী সত্য বাস্তব একটা অলৌকিক শক্তি এবং এই শক্তি বলেই মৃত ও জীবিতের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। জীবিত হইতে জীবিতে ভাব চালনা বিজ্ঞানসিদ্ধ হইলে মৃত হইতে জীবিতে ভাব চালনা অসিদ্ধ হইবে কেন? তবে আপত্তি হইতে পারে যে এসব ক্ষেত্রে এক জীবিত ব্যক্তির চিত্ত হইতে অপর জীবিত ব্যক্তিতে ভাবযোগে ছায়ামূর্ত্তি ফলিত হইতেছে।

এইটাই এক্ষণে প্রমানযোগে বিচার্য্য। কুমারী ডড্‌সনের দৃষ্টান্তে উক্ত ধরণের টেলিপ্যাথী না হয় খাটিল, কিন্তু রুশদেশীয় ব্যারন ড্রিসেনের ও ব্যবসাদার এক্‌ 'জির বর্ণিত ঘটনার এই ধরণের টেলিপ্যাথী সাহায্যে ব্যাখ্যা চেষ্টা আদৌ খাটেনা। অপিচ খাটাইবার চেষ্টাতে সঙ্গত-কারণরূপ প্রেতবাদের প্রতি জাতক্রোধ এবং ন্যায়যুক্তির প্রতি ইচ্ছাকৃত অনাদর প্রকাশ পায়। কোন জীবিত-ব্যক্তির ইচ্ছা বা অজ্ঞাত-সারে ভাবতরঙ্গ উঠিয়া যুগপৎ দুই ভিন্ন স্থানে দুই ভিন্ন জনের কাছে এরূপ দেহময় গতি ও বাকসম্পন্ন প্রেতদেহের আবির্ভাব ঘটাইতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কুমারী ডড্‌সনের ঘটনাতেই কি এ উপায়ের ব্যাখ্যা খাপ্‌ খায়? তাহার ননদ রা ভ্রাতৃবধূ মারা গেল অসহায় শিশু রাখিয়া; কিন্তু তাহার বহুদিন মৃত মায়ের ছায়ামূর্ত্তি কেন দেখা দিল এবং কোন জীবিত আত্মার মানস-ক্রিয়া ফলে তাহার আবির্ভাব ঘটিল বুঝা যায় না।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক আলোচনা প্রয়োজন নাই। যতপ্রকার অলৌকিক-ঘটনা রূপ প্রমাণ আছে সকলের সম্যক আলোচনা শেষে কারণ-বিচার অধ্যায়ে ইহার পুনরবতারণা করা যাইবে

(ক্রমশঃ)

প্রভাতে

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

আজি, তুমি এলে মোর জীবনের স্রোতে
ফুলের মতন ভাসিয়া,
তরুণ অরুণ প্রভাত স্বপন
তিমির রজনী নাশিয়া !
কে জানিত ওগো জীবনে আমার,
উজলি উঠিবে কিরণ তোমার,
চারিদিক হাসি উঠিবে আবার
উদিবে তোমার প্রতিমা,
তুমি এলে আজ, তারি সাথে এল
জীবনে আমার গরিমা !

ওগো, কত লোক আছে, কত পথ আছে
কেন এলে মোর দুয়ারে !
ভগন আমার কুটীর মগন
বিপুল গভীর আঁধারে !
বরষার মেঘে ভরা দশদিক,
এই পথ দিয়ে চলেনা পথিক,
ফুলবনে আর গাহেনা ত পিক,
সহসা দাঁড়ালে থমকি ;
আমারি দুয়ারে, হেরিয়া তোমারে
আমিই উঠিনু চমকি !
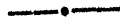
সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি, এল,]

৪

তার পর যাদের যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের সবারই কথা লিখে রাখার দরকার নেই। যে সব দোঁহা যে সব গান, যে সব বচন এই হতভাগা খাতা খানার প্রথম পাত গুলোয় ধরে রেখেছি তাতেই তাদের কথা বলা হয়েছে। এদিকটা কেবল আমার কথাতেই ভরব আর কারো নয়।

* * *

শাস্ত্র বলেছেন, বৈরাগ্যমেবাভয়ং—আমিও সেই অভয়কে বুকে নিয়ে সারাসংসার ঘুরে বেড়ালাম এবং সেই জন্যই বোধ হয় অভয়কে আর খুঁজেই পেলাম না। কোথায় হে ভয়ানাং ভয়ং, কোথায় তুমি ভীষণং ভীষণানাং ? তোমায় যে খুঁজেই পাই না প্রভু ! পুরাণে পড়েছিলাম এক দৈত্য নারায়ণকে দুধা দেবার জন্য সারাসংসার তাঁকে তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছিল। রত্নাঠ কোথাও

জায়গা না পেয়ে শেষে সেই দৈত্যের বুকের মধ্যেই চুপ চাপ ঢুকে বসে ছিলেন। দৈত্য বেচারী সারাসংসার খুঁজে তাঁকে আর না পেয়ে শেষে যাই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে বসেছে অমনি তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে ঠাকুর সাগরতলে গিয়ে লুকুলেন। আমারও তাই হয়েছে নাকি? তাহলে ত' চুপ করে বসা হবে না, বসলেই ত' সে বুক থেকে বেরিয়ে লম্বা দেবে।

আমি এই রকম একটা তর্কই বোধ হয় অজ্ঞানে করে ফেলেছিলাম, এবং সেই সিদ্ধান্তই এখনো আমার পেয়ে বসে রয়েছে।

যাই হোক চলন্ত মন্দিরে অচল ঠাকুরকে অজ্ঞাতে বহন করে, আমি যেবার কেদার বদরি নারয়ণ পথে চলছিলাম তারই কথা বলব। পাহাড়ের পথে চলার আনন্দে আমার ভয়ঙ্কর ঠাকুর অভয় মূর্ত্তিতে পদে পদে ধরা দিচ্ছিলেন তবু ধরতে পারিনি। অরূপ ঠাকুর বহুরূপে আমায় ধরা দিচ্ছিলেন তবু দেখতে পাইনি। তবু বাইরের না-ধরাটাকে অন্তরের ধরা বলে ধরে নিতে, বাইরের না-দেখাটাকে অন্তরের দেখা বলে ধরে নিতে আমার অন্তরের অন্তর এক মুহূর্ত্তও বোধ হয় ভুল করেনি। কিন্তু এমনি আমার পাগল প্রাণ, এমনি আমার বৈরাগী মন যে সব পাওয়াকে ত্যাগ করে ছুটেই চলেছিল। বন্ধুর পথে ক্লেশের পথে ভয়ের সেই পরম বন্ধুকে ক্রমাগত পেয়েও আমার মনটা যে কিছুতেই তাঁকে পাওয়া বলে স্বীকার করেনি, এখনও যে সেই চির-অপাওয়ার রয়েই গিয়াছে! যাক—যাক—তাই হোক!

কিন্তু আমিও ত' ছাড়াছিনে। সাত রাজার ধন পেতেই হবে, নইলে কি মরর নাকি? কিছুতেই মরা হবেনা আমি অমৃতের ছেলে যে, মরব কি করে? ও কথা যাক—

এইবার যার কথা লিখব সেই আমার সন্ন্যাস জীবন আকাশের মধ্যাহ্ণ সূর্য্য। কিন্তু দুদিনের জন্য সেই আলোর সাহচর্য্য পেয়েছিলাম; তবু তাকে আমার সইল না। তার উজ্জ্বল আলোককে মায়ার ছায়ায় কোমল করে নিতে গিয়ে তাকে হারাতে বাধ্য হইছি। সে আমার জীবনের দিকচক্রবালের তলে নেমে গিয়েছে, আর কি উঠবে, আর কি দেখা হবে!

তার সঙ্গে দেখাটাও এক অদ্ভুৎ রকমে হয়েছিল। আমি তখন বদরি কেদার যাবার জন্য হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হইছি। বেলা তখন ঠিক দুপুর! আমার একটা বদ অভ্যাস বাল্যকাল হতেই হয়েছিল যে কাউকে না খাইয়ে আমি খেতে পারতাম না। সন্ন্যাসী হয়েও সে অভ্যাস যায়নি, তাই ভিক্ষা করে ফিরবার মুখে একটী অতিথিও জুটিয়ে এনেছিলাম—একটী দুর্ভীক্ষ পীড়িত বালক।

আমি আমার ভোজ্য প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করিছি, বালকও ক্ষুধাতুর নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করছে, আমি কেবল আমার শাঁখটায় একটা দীর্ঘ ফুৎকার দিয়ে নামিয়ে রেখেছি, এমন সময় পার্শ্বে চেয়ে দেখি জটাজুটসমাযুক্ত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি,—আমার নিবেদিত আহার্য্য বস্তুর দিকে দৃষ্টি করে দাঁড়াইয়ে আছেন। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যার্থনা করতে যাচ্ছি এমন সময় তিনি আমার ত্যক্ত আসনে উপবেশন করে ওঁ ব্রহ্মার্পনমন্ত বলে আহার করতে আরম্ভ করলেন।

'ক্ষুতাতুর বালকটীর কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম হয়তো মধ্যাহ্ণ গগনে সূর্য্যনারায়ণও থমকে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুৎ মানুষটীর অদ্ভুৎকার্য্য দেখছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো দিকে দৃষ্টি না করে ভোজন পাত্রটী নিঃশেষে শেষ করে আচমন করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মৃদু হেসে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "ওঁ তৃপ্তোস্মি।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

তিনি ত তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন, কিন্তু এই দুইটী ক্ষুধাতুর প্রাণীর কি হল? কি আবার হবে? আবার আহার্য্য প্রস্তুত হল কিন্তু আমার জন্য নয়—ঐ বালকের জন্য। কি জানি কেন আমার আহারের প্রবৃত্তি একেবারে চলে গিয়েছিল। আমি কেবল ঐ তেজঃপুঞ্জ মানুষটীর কথা ভাবতে লাগলাম। কেবলি মনে হতে লাগল এ কেমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ! চাওয়া নেই চিন্তা নেই, অমনি

এসে যা সুমুখে পেলে তাই খেয়ে চলে গেল ? সভ্যতার ধার ধারে না, নিয়মের ধার ধারে না, না বলে না কয়ে পরের জিনিষকে আপনার করে নিয়ে ব্যবহার করলে! দয়া ধর্ম্ম নেই, কোনো বন্ধন নেই অথচ এমন প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি যে হঠাৎ বারণও করা গেল না।

আমার সমস্ত রাত্রি ঘুম এলনা, ঐ অদ্ভুত মানুষটার মূর্ত্তি ক্রমাগত মনের চক্ষের সম্মুখে জেগে উঠে আমায় ব্যস্ত করে তুললে। তাই প্রভাতে উঠে তার খোঁজে বেরুলাম। কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পেলাম না। তখন আবার ভিক্ষা করে এনে দ্বিপ্রহরে ঠিক অমনি করে রেঁধে বেড়ে বসে রইলাম; দুবার শাঁখেও ফু দিলাম, কিন্তু কৈ সে ত এল না।

তার পরদিনও তাঁর খোঁজ করলাম, কেউ তার খোঁজ দিতে পারলে না। কেউ তাকে চেনেই না। আমার কিন্তু আর দেরী করা চল্ল না, কারণ যাত্রীর দল পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। আমাকেও লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল। কিন্তু দুদিন চলতে না চলতেই আবার তার সঙ্গে অদ্ভুৎ অবস্থায় দেখা।

পাহাড়ের সংকীর্ণ আর পিছল রাস্তায় অতিকষ্টেই চলতে হচ্ছিল, পা পিছুলেই একেবারে হাজার হাত তলায় পড়ে যেতে হবে। আমি কোনো দিকে না চেয়ে চলছিলাম, এমন সময় দূর হতে একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। সঙ্গীরা বল্লে, কেউ নিশ্চয় পা পিছলে গড়িয়ে পড়েছে। আমার আর সাবধানতা চল্ল না, যথাসাধ্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা জায়গায় কতক গুলো লোক দাঁড়িয়ে পাশের "খড়ের" দিকে চেয়ে কি বলাবলি করছে। আমিও দ্রুত সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। হাত দশ বারো নীচে একটা স্ত্রীলোক অতিকষ্টে একটা পাহাড়ে লতাধরে ঝুলছে হয় ত আর একটু হলেই সে পড়ে যাবে। আমি আরও চমকে দেখলাম সেই আমার অদ্ভুত সন্ন্যাসীটাও হাসি হাসি মুখে সেই দিকে চেয়ে আছে। কেউ কোনো রকম সাহায্য করছে না। আমি আর কোনো কথা না বলে আমার প্রকাণ্ড মুরাঠাটা খুলে ফেলে একজনকে বল্লাম "এটা ধর আমি নেমে গিয়ে ওকে উঠিয়ে আনছি।" যণ্ডা যণ্ডা মানুষগুলো আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, তারা বোধ হয় এত বড় দুঃসাহস করতে কাউকে কখন দেখে নি। বিশেষতঃ দুটো মানুষকে ধরে রাখার শক্তি কারু ছিল কিনা সন্দেহ। ঐ পিছল আর সঙ্কীর্ণ পথে পা বাধাবার মত কিছুই ছিল না। কেউ যখন ঐ টুকু মাত্র সাহায্য আমায় করলে না এমন কি আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগল, তখন আমি ঐ অদ্ভুৎ মানুষটার দিকে চাইলাম। তিনি হঠাৎ বল্লেন মায়া মায়া!

মায়া! হোক মায়া, আমি আর থাকতে পারলাম না তাঁর হাতে আমার মুরাঠার একটা দিক ছুড়ে দিলাম। সেও যেন কলের পুতুলের মত সেটা চেপে ধরলে! কিন্তু কি তার শক্তি! একটু হেল্‌লেও না অনায়াসে দুটো মানুষকে টেনে ওপরে তুলে ফেলে যোঁৎ যোঁৎ করে চলতে আরম্ভ করলে! আমিও সঙ্গ নিলাম।

কিন্তু এই আলাপে এমনি আমাদের আলাপ জমে উঠল যে সমস্ত পথটা সে আর আমার ছাড়লে না। কিন্তু কি অদ্ভুৎ তার বৈরাগ্য কি অদ্ভুৎ তার ধৈর্য্য! পথে কতলোক অসুখে পড়ছে, কত কাতর ক্রন্দন শুনতে হচ্চে, কিন্তু কোনো দিকে তার দৃষ্টি নাই। সে অচল ধৈর্য্যে দিনের পর দিন চলেছে ত' চলেইছে। কতবার আমায় কতলোকের জন্য পথ-চলা বন্ধ করতে হয়েছে কিন্তু সে কারও কাছে সাহায্য চায়ও নি, কারুদিকে ফিরে তাকাও নি। মাঝে মাঝে যখন জিজ্ঞাসা করিছি যে যাত্রীদের সাহায্য না করা কি ভাল হচ্চে সে কেবলি হেসে বলেছে "পাপের বন্ধন যদি বন্ধন হয় পুণ্যের বন্ধন কি বন্ধন নয়? মায়া—মায়া— মায়া! আবার মায়ার বশবর্ত্তী হব কেন?"

মায়া! জীব রূপে শিব নিজে হাত পেতে ভিক্ষে চাচ্ছেন সাহায্য চাচ্চেন, আর আমি বলব মায়া—ভেলকি—মিথ্যে! ঐ যে মেয়েটা ছেলে কোলে করে পথ চলতে পথের ধারে বসে পড়ল, তারপর তার দু বছরের ছেলেটা পথের ধারে ওলাউঠায় মারা গেল, কেউ তার দিকে চাইলে না এইটেই

কি মায়া কাটানর পথ? তবে যাঁরা এই দুর্গম পথ সুগম করবার জন্য মাঝে চটী করে রেখেছেন, ধর্ম্মশালা করে রেখেছেন, তাঁরাও ত মায়ারই প্রশ্রয় দিয়েছেন। কালী কম্‌লি ত' নিজে ছিলেন পরম বৈরাগী পরম ত্যাগী মানুষ! তাঁরই বা এ মাথা ব্যথা কেন হয়েছিল যে তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়ে সাধুদের জন্য এই সব আশ্রয় তৈরী করিয়েছেন?

কিন্তু সে সময় আমার এসব তর্কের কথা মনে হত না—কারণ তখন যে মায়া কাটাতেই বেরিয়েছিলাম। আমার অবাধ্য মনটা যে মাঝে মাঝে ভুল করে সেই মহামায়ার মায়াতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ত তার জন্য লজ্জিতই হতাম। বন্ধুটী নিজের কার্য্যের দ্বারা উপদেশের দ্বারা আমার সেই ভুল কাটিয়ে দিত। তবু আমার পদে পদে ভুল হয়েছে—কত সময় পাহাড়ের ধারে বসে হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভায় মগ্ন হয়ে গিয়েছি, দিগন্ত বিস্তৃত তুষারের উপর সূর্য্য রশ্মির খেলা দেখতে দেখতে পথ হাঁটাই ভুলে গিয়েছি, সেই মনোরম প্রদেশের শোভায় গাম্ভীর্য্যে আপনাকে হারিয়ে শুধু বাহিরটার মধ্যেই ডুবে গিয়েছি তবু সেই পথের বন্ধুটী আমায় ত্যাগ করেন নি। সে বাহিরের সব মায়া ত্যাগ করেছিল কিন্তু এই কুড়িয়ে পাওয়া বন্ধুটীর মায়া ত্যাগ করতে পারে নি। আমি একদিন সেই কথা বলে তাকে চমকেও দিয়েছিলাম। সেও একদিনের জন্য আমার সঙ্গ ছেড়ে পালিয়েছিল, কিন্তু তা কেবল একদিনের জন্য—পরদিন যে চটীতে পৌঁচেছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি বন্ধু আমার অপেক্ষায় একটা পাথরের ওপর চুপ করে বসে আছে। আমায় দেখে সে লজ্জিত হল, কিন্তু তারপর বুঝিয়ে দিলে, যে আমরা গুরু-ভাই, আমাদের পরস্পর সাহায্য করার দরকার। গুরু-ভাই যে কি করে হলাম তা জানিনে তবে একপথে এক উদ্দেশ্যে চলিছি বলেই যদি গুরু-ভাই হই তা'হলে ত' ঐ পথে যত যাত্রী চলেছে সবাই ত' গুরু-ভাই। কেন যে সে আমায় গুরু-ভাই মনে করেছিল তা আজও বলতে পারিনে। শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসীর পথ অবলম্বন করেছিলাম বলে? বৈরাগ্য মেবাভয়ং বলে স্বীকার করেছিলাম বলে? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা স্বীকার করেছিলাম বলে? কেন তা জানিনে তবু সে আমায় ভাই বলে স্বীকার করেছিল, আমিও তাকে দাদা বলে বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম, বুঝি খুব ভালও বেসেছিলাম। কিন্তু সংসার ছেড়েও, যার জন্য সংসার, সেই ভালবাসাকেই সত্য বলে স্বীকার করে ফেলেছি, মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারি নি, এটা কিন্তু তখন সাহস করে স্বীকার করতে পারি নি।

তারপর কত কষ্ট কত পরিশ্রমের পর কেদারে পৌঁছে, সমস্ত যাত্রীরও যে ভুল হয়েছিল, আমাদের দুজনেরও ত' সেই ভুল ঘটতে কসুর হল না। সকলেই যেমন মন্দিরের মধ্যে ঢুকে হাউ হাউ করে কাঁদছিল, আমরা দুজনেও প্রায় তেমনি করেই কাঁদতে আরম্ভ করেছিলাম। হিমালয়ের বিশাল অরূপের মাঝখানে সেই পাথরের একটা ছোট মন্দিরে পাথরেরই একটী ছোট্ট বিগ্রহ মূর্ত্তি—অথচ এই দুইটী বৈদান্তিক মানুষের প্রাণে সেই নিতান্তই ছোট্ট শান্ত বস্তু এবং সীমাবদ্ধ স্থান অনন্ত যাত্রার পরিসমাপ্তির আভাষ এনে দিলে। আমি অন্ততঃ তখন মনে মনে বলেছিলাম, পেলাম, ওগো "পেলাম, তোমায় পেলাম।"

বন্ধু আমার অন্ততঃ সেই মূহূর্ত্তের জন্য, তার নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করলে না। তারও বৈরাগ্যের অনুরাগ তার গোপন প্রাণের চিরন্তন ভুলগুলিকে একেবারে গলাটিপে মারতে পারেনি। সেও যেন চোখের জল দিয়ে স্বীকার করলে, যে, ভুলের ওপরই যেন জগতের যত সৌন্দর্য্য যত রস যত আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। আমিও এত চেষ্টা করে এত পরিশ্রম করে গিয়ে যাকে পেলাম তা দুঃখ নয়- দুঃখের আভাবও তাতে ছিল না। তাতে যতটুকু দুঃখ ছিল তার সবটুকুই আনন্দ,—দুঃখ নয়, দুঃখ কোথাও নেই, দুঃখ কোথাও কখনো ছিল না। ঐ শিলাময় বিগ্রহের কঠিনত্ব, ক্ষুদ্রত্ব সসীমত্বের মধ্য দিয়ে একটা অনন্ত অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া গেল। যেন কে আমায় বলে দিলে যে যাকে ছোট মনে করছ তারই মধ্য দিয়ে যদি বড়কে দেখতে পাও তাহলে আর ভয় কি—ভয় কোথাও নেই, কোথাও থাকতেই পারে না। ভয়টাই মায়া, মিথ্যা—যেখানে যাও সেইখানেই এই ভয়ের মধ্যে অভয়কে দেখতে পেতে পার।

যা তোমার বাধা দিচ্ছে, যাকে নিতান্তই ছোট বলে সসীম বলে অবজ্ঞা করছ সেই ছোট্ট নিতান্তই হাতের মধ্যেকার কঠিন পাথরটুকুই তোমার অসীমের মধ্যে প্রবেশের দরজা। প্রত্যেক বড় বস্তুই অ-জড়ের মধ্যে দৃষ্টি প্রবেশের গবাক্ষ।

কেদারনাথ ঐ অফুরন্ত পর্ব্বতমালার মধ্যে ছোট্ট এক-খানা পাথর হয়ে বসেছিলেন, অথচ সেই ছোট্ট পাথরটুকুকে ছুঁয়েই "আমি নগাধিরাজ" দেবতাত্মা হিমালয়ের স্পর্শ পেলাম। ঐ ক্ষুদ্র মন্দিরের চূড়াকে দেখতে গিয়েই আমার মনটা অনন্ত আকাশের মধ্যে পৌঁছে গেল। আমি অন্তরকে পেলাম, সুন্দরকে পেলাম, আনন্দকে পেলাম।

কিন্তু কোথায় আমার চিরসাধনার চিরপ্রত্যাশিত দুঃখ-ভৈরব কোথায় গো তুমি? যা! তোমারত' পেলাম না? এই যাকে পেলাম, সেইতো দেখছি সর্ব্বব্যাপী হয়ে রয়েছে। আমার বাঙ্গালা মায়ের বুক হ'তে এতদূরে পালিয়ে এলাম এখানেওত' সেই "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" তাই রয়েছে? তা হলে উপায়?

বন্ধুকে সে কথা বল্লাম। সে বল্লে "ছোট সুখ ছেড়ে বড় সুখকেই মানুষ চায়, দুঃখকেত' কেউ চায় না। আনন্দকে না চাইলেও সে যখন আছে তখন তাকে পেতেই হবে। এখানে দুঃখ পেতে আসনি সুখ পেতেই এসেছ—সুখই পেয়েছ। যে যা চায় সেইরূপেই ভগবান তার কাছে ধরা দেন—তোমাকেও দিলেন।"

আমি বল্লাম, "ভুল, আমি দুঃখ পেতেই বেরিয়েছি, কিন্তু দুঃখ কোথাও নেই বলেই ধরতে পারলাম না—সুখই আছে তাই পদে পদে সুখকেই পাওয়া যাচ্ছে।"

বন্ধু বল্লে, "মিথ্যা কথা, তোমার প্রাণ সুখ চায় তুমি তাকে একটা অদ্ভুৎ জিনিষ বোঝালে সে বুঝবে কেন? সে সুখকেই খোঁজে—সংসারে সুখ নেই তাই সে সংসারের বাইরে সুখকে খুঁজতে বেরিয়েছে, দুঃখকে ছেড়েছে তাই পদে পদে সুখকেই পাচ্ছে। সুখকে ছোট বস্তুতে বেঁধে ফেলাই দুঃখ, তুমি ভুল করেই হোক আর যা করেই হোক সুখের পেছনেই বেরিয়েছ, কারণ তোমার অন্তরাত্মা জানেন যে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'; তাই ক্ষুদ্রকে ছেড়ে বৃহত্তের দিকে অনন্তের দিকে ছুটে বেরিয়েছ। সেইজন্য সুখকেই পাচ্ছ।"

আমি বল্লাম, "সুখ যদি হয় বড় হওয়ায়, আর দুঃখ যদি হয় ছোট হওয়ায় তাহলে ত' আমার ভুল হচ্ছে—আমি যখন দুঃখকেই চাই তখন আমার ও' ছোটই ত' হতে হবে?"

বন্ধু আমার হেসে বল্লে, "ছোট হবার কি তোমার আর জো আছে? একবার যে বড় হওয়ার মুক্ত হওয়ার আস্বাদ পেয়েছে, সেকি, আর ফিরতে পারে? পারে না!"

"পারে না? তবে যে বিরাট সত্ত্বা এই বিশ্বকে অতিক্রম করেও অনন্ত হয়ে আছেন, তিনিই বা ছোট ছোট হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন কেন? যে ছোট তার পক্ষে হয়তো বড় হওয়াতেই আনন্দ। আর যে বড় তার নিশ্চয়ই ছোট হওয়াতে নিজেকে সীমায় আবদ্ধ করাতেই আনন্দ। আমি যখন সর্ব্বব্যাপী তখন আমার ছোটই ত' হতে হবে।"

বন্ধু বল্লে "ভুল, ভুল—তোমার কোথায় যেন মস্ত ভুল রয়ে গিয়েছে। ফিরবার মুখে গুরু মহারাজের কাছে তোমায় কিছুদিন রাখতে হবে দেখছি।"

কেদার হ'তে বদরিবিশালা তারপর গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ অতিক্রম করলাম। অন্নজীবী দেহ যে এত কষ্ট সইতে পারবে তার আশা আমার ছিল না। কিন্তু মানুষের শরীরে যে কত সয় তার প্রমাণ নিয়ে যখন সংকল্প করলাম, মানস-সরোবরে যাব, তখন বন্ধু আমার হাত চেপে ধরে বল্লে, "এখন কাজ নেই ভাই, আগে চল গুরুদেবের কাছে গিয়ে দেহ আর মনটাকে তৈরী ক'রে নাও তারপর মানস-সরোবরেই হোক আর যেখানেই হোক যেও।"

আমি বল্লাম "কষ্টের ভয় করছ? কষ্টকেইত' আমি চাই—আমায় কোথাও গিয়ে বসা হবে না।" বন্ধু আমার কাতর হয়ে ব'ল্ল, না ভাই "না, মিছি মিছি কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই। উদ্দেশ্যহীন কৃচ্ছ কোনো ফল দেবে না। আগে সত্যকে, উদ্দেশ্যকে ঠিক করে নাও তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। যোগের দ্বারা দেহকে, সমাধি দ্বার

বুদ্ধিকে শুদ্ধ করে না নিয়ে এখন কোনো কাজ করা হবে না। এই ক'মাসে তোমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে—এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।"

আমি তর্ক করলাম বটে, কিন্তু হতভাগা দেহটা বন্ধুরই অনুসরণ করলে এবং কিছুদিনের মধ্যেই কণখলে ফিরে এসে আমার বন্ধুর গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হল। তারপর যা আরম্ভ হল তার বিশেষ বর্ণনা করে কি করব। এই পথে বেরিয়ে সবাইকে যা করতে হয় তার সমস্তই আমায় করতে হল। সম, যম, দম, নিয়মের সমস্তই পালন করলাম, নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই শেষ করলাম। তারপর ছ-মাস ধরে একটা ছোট ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে শরীরটাকে এমন শুকিয়ে তুল্লাম যে নিজেই নিজেকে চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আহার সংযম করতে করতে প্রায় অনাহারে গিয়ে ঠেকেছিল। তারপর ক্রমশঃ সেটাকে বাড়াতে বাড়াতে যখন স্বাভাবিক আহারে এসে পৌছালাম তখন আমার শরীর যেন একটা কিসের তেজে অন্তর-বাহিরে জ্বলতে আরম্ভ করেছিল। একটা তত্ত্বকে আর একটা তত্ত্বে মিলুতে মিলুতে—সংসারটা যে ভূয়ো এবং আমি যে প্রায় সেই ভূয়োর সামিল একটা অস্তিত্ব-মাত্র এই জ্ঞানটা আগুনের অক্ষরে নিজের ওপর লিখে ফেলেছিলাম। বন্ধুই কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতে পেত আর কেউ নয়। এই একান্ত বাসের ফলে যখন আমার মনটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত তখন সে এসে সাহস না দিলে বল না দিলে বিশেষতঃ তার সঙ্গটুকু না দিলে হয়ত একদম শুকিয়ে মরেই যেতাম। কিন্তু এমনি করে সংসারটা মিছে করে তুলেও সেটার যখন কিছুতেই অন্ধকার মরল না, তখন গুরু আমায় নবরাত্রি করালেন ৯ দিনের জন্য একটা ঘরের মধ্যে একদম একলা বন্ধ করে রাখলেন। সেই ৯ দিনের পর আমি হোম শেষ করে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন আমার শরীরটাও যেমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, সারা সংসারও যেন তেমনি প্রাণহীন ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিল।

কিন্তু বন্ধু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "বাঃ তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি তুমি লব্ধকাম হয়েছ। আজ জোর করে বলতে পারি তোমার পূর্ণ সন্ন্যাস হয়েছে, আজ তোমার 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা' তোমার জন্মও সার্থক।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না—কিন্তু আমার অন্তরের অন্তর হতে কে যেন বল্লে—'আর পারিনে'। আমি উদাসভাবে বন্ধুর দিকে চাইলাম, প্রভাতের আকাশের দিকে চাইলাম, তারপর ফিরে দূরে যেখানে হিমগিরির তুষারের আভাসে চকমক করছিল সেদিকে চেয়ে রইলাম। কি যে সারা সংসার আমার কাণে বলছিল তা মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে, যে সমস্তই যেন ছায়া ছায়া! ছায়া ছায়া ছায়া ছায়া—সত্যও নাই মিথ্যাও নাই, আমি আছি কিনা যেন তারও ঠিক নাই।

তাই বলে এটাও সত্য নয় যে এই কৃচ্ছের মধ্যে এই ধ্যান ধারণা সমাধির মধ্যে কোনো সুখ পাইনি। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টোই হয়েছিল, এমন একটা ভয়ানক মাদকতা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসেছিল যে আমি এক মুহূর্তও অপব্যয় করিনি। এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির মধ্যে এই ভয়ঙ্কর শুষ্কতার মধ্যে এমন একটা নেশার জিনিষ ছিল যার প্রচণ্ড সুখ ত্যাগ করতে প্রাণ চাইত না, কেবলই ভয় হত পাছে এই কৃচ্ছের এই সুখময় দুঃখের শেষ হয়ে যায়। এই যে চব্বিশটা তত্ত্বকে নিয়ে রাতদিন খেলা করা, এর মধ্যে কেবল যে তত্ত্বানুভবের সুখ ছিল, তা নয়, একটা প্রচণ্ড আত্মানুভূতি আত্মকর্তৃত্বানুভবের সুখে আমায় মাতাল করে তুলেছিল। আমিই একমাত্র 'অচলং ধ্রুবং' বাদবাকী সমস্তই চঞ্চল ও পরিণামী। এই অচল আমিকে পূর্ণভাবে অনুভব করে আত্মরসে বিভোর হওয়ার মধ্যে যে সুখ ছিল সে সুখের সঙ্গে কোন সুখের তুলনা করব? গীতা বলেছেন—'অত্যন্তং সুখম্ শ্নুতে'—

কিন্তু সেই সুখ যে কতখানি তার অনুভূতি নিজে না করলে কিছুতেই বোঝাবার জো নেই। অথচ নিজ-বোধগম্য সেই রসে আমার চিত্ত যেমন একদিকে সরস হয়ে উঠেছিল তেমনি আর একদিকে সে যে প্রচণ্ড শুষ্কতা অনুভব করছিল, এ কথা প্রথম প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে বুঝতে পারিনি। ক্রমশঃ মনের একটা

দিক যতই আত্মবশ হয়ে "ন কিঞ্চিদপি" চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠছিল আর একটা দিক তেমনি একটা ভীষণ একত্বের শুষ্কতায় পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করেছিল। একদিক দিয়ে যেমন প্রচণ্ড সুখকে অনুভব করেছিলাম আর এক দিক দিয়ে তেমনি সজোরে আমার সেই চিরকালকার আশার বস্তুর সঙ্গে—দুঃখের সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে পীঠাপীঠী ভাবে আপনাকে অনুভব করেছিলাম। অথচ সে কথাটা ধরতে পারিনি; বুঝতে পারিনি কিসের অভাব? কার অভাব? আমি যখন সমস্ত বহুত্বকে অখণ্ড একত্বে পরিণত করছিলাম তখন কিসের চিরন্তন ক্রন্দন আমার পিছনে লেগেই ছিল? সেই মহাসুখের পেছনে যে দুঃখ বিপরীত মুখে বসেছিল, সে কে গো? তাকেত' কেউ দেখিয়ে দিলে না?

গুরু বলে দিলেন, সেই হচ্ছে অনাদি মায়া, সেই হচ্ছে আত্মার আদিম ভ্রম, মূলস্থ প্রবৃত্তি-মূলক ভ্রান্তি! ভ্রান্তি? হবে। কিন্তু আমার আত্মা তা মানছে না কেন? সে কেন কেবলই বলছে যে একের দিকে চাইলে আমিকে এক ছাড়া, অস্তিমাত্র ছাড়া আর কিছু বলেই ধারণা হবে না। আমির দিকে চাইলে সমস্ত তুমি সমস্ত ইদং এক অখণ্ড অস্তিত্বের মধ্যে মিলিয়ে যাবেই।—আবার তুমির দিকে চাইলে, বাইরের দিকে চাইলে কিছুতেই বহুছাড়া অসংখ্য ছাড়া "এক" দেখা যাবে না। অথচ এই "ঐক" এবং "বহুব" মধ্যে কোথায় যে একটা পরম যোগ আছে তা এই প্রচণ্ড একীকরণ যোগের দ্বারাও ধরা যাচ্ছে না। বা বাহ্যজগতে জাগ্রতজগতের বহুত্বাভিমুখী বিভ্রম যোগের দ্বারাও ধরা যাচ্ছে না। যদি সাংখ্যযোগের এই একত্বাভিমুখী চেষ্টাকে আত্মার সত্যোপলব্ধির চেষ্টা বল, তাহ'লে সেই আত্মার এই সংসারাভিমুখী বহুত্বাভিমুখী স্বাভাবিক চেষ্টাকেই বা ভ্রমাত্মক বল কেন? হয়ত এই দুই চেষ্টাই সত্য। হয়তো যোগের দ্বারা একত্বের অনুভবও যেমন সত্যকে অনুভব করা, মায়াধীনভাবে বাহ্যজগতে বহুকে অনুভব করাও তেমনি সত্যকেই অনুভব করা। যিনি পরম এক তিনিই হয়ত নিজের একত্বের মধ্যে বহুত্বকে অনুভব করতে না পেরে আমারই মধ্য দিয়ে বহুত্বকে অনুভব করছেন। কে জানে এই দুইভাবেই সত্যের উপলব্ধি হয়ে চলছে কিনা।

আমার এই সব সন্দেহের উত্তর পেলাম না, কেউ দিলে না বা দিতে পারলে না। কিন্তু গুরু আমার কথা শুনে বল্লেন, "তোমার এই সন্দেহই হচ্ছে তোমার অস্তিত্বের কারণ, তুমি এই সন্দেহ যে উপায়ে পার দূর কর। আমার কাছে থেকে এর উত্তর পাবে না—আমি যতদূর জানি তোমায় দেখিয়ে দিয়েছি। এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।"

আমি গুরুদেবের পায়ে প্রণাম করে বল্লাম, "আপনি আমায় যা দেখালেন তার দাম যে কত তা কেমন করে জানাব? আত্মা হতে জগৎ সৃষ্টির জলন্ত অনুভূতিই যে মানুষ প্রতিনিয়ত ভুলছে। সেই ভুলটাকেও যে দূর করার দরকার, নইলে যে কিছুই হতোনা। আমার মনের একটা দিকের অন্ধকার দূর করে দিয়ে আপনি যে উপকার করলেন তার উপযুক্ত দক্ষিণা কোথায় পাব? তার দক্ষিণা আপনার শ্রীচরণ নিরন্তর স্মরণ দ্বারা যতটুকু দিতে পারি তাই দেব। আমার একটা সন্দেহ দূর হয়েছে বটে কিন্তু আর একটা যে নিগূঢ় সন্দেহ জেগেই রয়েছে তাও আমায় দূর করতে হবে। আত্মকর্তৃত্বের ওপর যেমন আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস জন্মেছে আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই যেমন অন্তরে অন্তরে বুঝতে পেরেছি, তেমনি বাইরেই বা কেন অত অসংখ্য তুমিত্বের ধারণা হচ্ছে এরও একটা শেষ মীমাংসা আমাকেই করতে হবে। আপনি আমায় সাহস দেন, আশীর্বাদ করুন যেন এতত্ত্বেরও মীমাংসা আমাতে ফুটে ওঠে।"

গুরু আশীর্বাদ করলেন। আমিও তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে বন্ধুর কাছেও বিদায় নিলাম। বন্ধুকে বল্লাম যে যদি এ তত্ত্বের মীমাংসা এই প্রচণ্ড তুমি-তত্ত্বের মীমাংসা করতে পারি তা হলে নিশ্চয়ই তাকে সে তত্ত্ব বোঝাব। সেও হেসে বল্লে—"মায়া—মায়া—অনাদি মিথ্যা—

জ্ঞানীনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

তোমার দেখছি এ মায়ার হাত হতে নিস্তার নেই।"

আমি উদাস ভাবে বল্লাম "হয়তো নেই—হয়তো কারুরই নেই। তোমারও নেই আমারও নেই হয়তো গুরুদেবেরও নেই।"

বন্ধু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বল্লে—"আমিও বেঁচে থাকব, আবার দেখা হবে, নিশ্চয়ই হবে। তখন কি বল শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম।"

(ক্রমশঃ)

কয়েদী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ]

কর্ত্তাবাবু নিদয় কেন হও
মানছি আমার আছে হাজার কসুর,
হাতে এখন নাইযে কানা কড়ি
সইবে না কি একটা দিনের সবুর ?

দু'দিন ধরে পচ্‌ছি কয়েদ ঘরে
তেষ্টা পেলে দাওনি ফোটা জল,
বুক ফেটে যায় ঘরের কথা ভেবে
বোনা মাঠে আজ এয়েছে ঢল !

রহিম আমায় আনলে যখন ধরে
আঁচলে কেউ মুছলে চোখের পাতা ;
ছেলে মেয়ে ভাবল বাবা বুঝি
শোধ দিতে চায় জমিদারের "গাঁতা"।

এই দুটো দিন অনাহারেও তারা
চেয়ে আছে আমারি পথ পানে
ছেলে মেয়ে কাঁদছে ক্ষিধের জ্বালায়
আমি তবু রইছি বেঁচে প্রাণে !

আমার সে যে লজ্জাশীলা অতি
পরের কাছে ফুট্‌বে না তা'র মুখ
গরীব তবু আমি ছাড়া কেও
জানেনা তা'র দুখের এতটুক !

অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া প্রাণী
'ভুরোর জাউ'য়ে ক'দিন ছেলে ভোলে
'লক্ষ্মী আড়ী' তাও খেয়েছি 'ভেনে'
একমুটো ধান নাইক আমার "ডোলে!"

মাচান-ভরা কচি ঝিঙের জালি
উঠান ভরা কনকা রাঙায় শাকে
'অষুধ' করি নাইক এমন পাতা
সব খেয়েছে তোমারি এই পা'কে।

পরিবারের গয়না কবুল করে'
দু'বার বাঁচি তোমার কবল থেকে,
তিন বছরের মেয়ের তাবিজ দু'খান
ঘুম ছিলনা আমার ঘরে রেখে।

দুধের ছেলের সোনার পদক টুকু
উস্থুল প'ল তোমার চাঁদার খাতে
আর কি আছে এই পোড়া জান ছাড়া
ফাঁসীর দড়ি দাওনা আমার হাতে!

—০—

খনা-রহস্য

[শ্রীমণিকান্ত হালদার]

'ঘরমুখো' বাঙ্গালীর ছেলেকে ভাগ্যচক্রে পড়িয়া যদি কখন বাহিরের পথে পা দিতে হয়, অমনি পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া গণা-গাঁথার ধুমধাম্ পড়িয়া যায়। যদি বা এই সমস্ত ব্যাপারে উপস্থিত কালে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অভাব ঘটে, তাহা হইলেও শুভযাত্রার দিন-ক্ষণ দেখিবার উপায় একান্ত দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে না। ঘরের গৃহিনী অথবা জননী তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'ঘরোয়া' শাস্ত্রের আবৃত্তির দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ণয়ে তৎপর হইয়া পড়েন। যথা,—

"মঙ্গলের ঊষা বুধে পা,
যথা ইচ্ছা তথা যা।"

ইহার মূল্য কিন্তু বেদ বাক্যের অপেক্ষা কোন অংশেই লঘুতর নয়। থাক্‌না যতই তাড়াতাড়ি, হ'ক্‌না যতই প্রয়োজন, অথবা পড়ুক না কেন মাথায় দায়িত্বের চাপ;— এই 'ঘরোয়া' শাস্ত্রের কৃপায় সকল 'কসুর' মাপ হইবে, ওজরের নজির মিলিবে এবং আপত্তিরও নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। এই রকমে আমরা সপ্তাহে পাঁচ-পাঁচটি দিন করিয়া বৎসরে দুশ-চল্লিশটি দিন শুভ যাত্রার ডায়েরীর পাতায় খরচ লিখিয়া রাখি। আবার জমার পৃষ্ঠায় যে ক'টা দিন পাই, তাহার মধ্যেও কতকগুলি মন্তব্য আছে। যথা,—

"শূন্য কল্‌সী শুক্‌না না,
শুক্‌না ডালে ডাকে কা।
যদি দেখ মাকন্দ চোপা,
এক পা না যেও বাপা॥"—ইত্যাদি।

এই যে সমস্ত 'ঘরোয়া' শাস্ত্রের বে-পরওয়া শ্লোকরাশি চলিত কথায় ইহাদিগকে "খনার বচন" বলে।

আমাদের অনাদি কালের মনু হইতে আরম্ভ করিয়া হারীত-অত্রি-উশন-পরাশর এবং শেষকল্পে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজীব গোঁসাই পর্য্যন্ত সমুদায় স্মার্ত্তগণের ব্যবস্থার তুলনায় এই সকল আধুনিক বচন-অনুশাসন গুলি অনেকটা সমমূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সমস্ত মানিতে মানুষ বাধ্য। কেবল "খনার বচন" নয়, "ডাক্‌পুরুষের বচন," "মহাপুরুষের বচন" ইত্যাদি করিয়া আরো অনেক আছে। কিন্তু দেখা যায়, সে সকলকে প্রবচন, নীতিবচন, কিম্বা বুদ্ধি-বিমোচন বলিয়া সাব্যস্ত করিতে গেলে অনেক রাগ করেন। বিশেষ খনার বচন সম্বন্ধে ত বাদ প্রতিবাদের কথাই নাই। কিন্তু 'গোঁয়ার্ত্তুমি' বলে এক,—ন্যায় বলে অন্য; উপকথা যাহা শুনায়,—ইতিহাস শুনায় তাহা হইতে ভিন্ন! তাই উপস্থিত সময়ে খনাকে লইয়া বড়ই সমস্যায় পড়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 'খনা' বলিয়া কেহ ছিল কি-না, সেই একটা মহা সংশয়। এ কথায় অনেকে

বলিতে পারেন, তবে খনার বচন গুলি কি অপৌরুষেয় ?—এ প্রশ্নের উত্তরেও আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে 'হাঁ' বলিতে পারি না। অতএব দেখা যাক্, বাস্তবিক খনা কেহ ছিল কি-না, এবং এই সকল বচননিচয়ের উৎপত্তি কোথা হইতেই বা হইল।

খনার জীবনী

সচরাচর বাঙ্গালা ভাষায় নীলমনির "নবনারী," হারাণ চন্দ্রের "প্রতিভাসুন্দরী" প্রভৃতি সর্ব্বজন বিদিত পুস্তকাবলীতে খনা-সম্বন্ধীয় কাহিনী অল্প বিস্তর বর্ণিত আছে। তদ্ব্যতীত খনাকে লইয়া বহুতর কথা কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। মোটের উপর খনার জীবনীটি এই রকম দাঁড়ায় ;—

প্রাচীনকালে প্রথিত নামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বরাহ একজন অন্যতম রত্ন ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিহিরের জন্মকালে তিনি গণনার দ্বারা জানিতে পারিলেন যে তাহার পরমায়ু মাত্র এক বৎসর (কেহ কেহ বলেন দশ বৎসর)। ভবিষ্যতে যাহাতে সন্তানের অকাল মৃত্যু দেখিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি সদ্যভূমিষ্ঠ মিহিরকে একটি পাত্রে করিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেন।

দৈবক্রমে পাত্রটি ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কার উপকূলে গিয়া লাগে। সেই সময়ে খনা কতিপয় রাক্ষসীর সহিত স্নানে নামিয়াছিল। খনা পূর্ব্ব হইতেই রাক্ষসীগণের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে। সুতরাং খনা ভাসমান পাত্রের মধ্যে শিশু মিহিরকে সন্দর্শন করিয়া গণনার দ্বারা জানিল যে তাহার বয়স শত বৎসর, কিন্তু পিতার ভ্রমে এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

খনা তখন শিশুমিহিরকে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে লাগিল। ক্রমে মিহিরও রাক্ষসীগণের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিল। অবশেষে খনাকে বিবাহ করিয়া এবং পরে নিজ জীবনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সস্ত্রীক উজ্জয়িনীতে আগমন করে। আসিবার সময়ে তাহারা সিংহল হইতে তিনখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তন্মধ্যে একখানি ভ্রমক্রমে পথে নষ্ট হইয়া যায়।

যাহা হউক তাহারা এ দেশে আসিয়া আত্ম পরিচয় দিলেও বরাহ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। অবশেষে আবার গণিয়া দেখা সত্বেও পুত্রের পরমায়ু সেই এক বৎসরই হইল। তাহা দেখিয়া খনা বলে,—

"কিসের তিথি, কিসের বার
জন্ম নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন,
পলকে জীবন বারদিন॥"

অতঃপর সেই রকম গণনা দ্বারা বরাহ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন, এবং পুত্র মিহিরকে এবং বধূ খনাকে গ্রহণ করেন।

কথিত আছে, একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য আকাশের নক্ষত্র সম্বন্ধে বরাহকে কোন কঠিন প্রশ্ন করেন। শেষে খনা শ্বশুরকে এই প্রশ্ন লইয়া চিন্তিত এবং তাহার সমাধানে অসমর্থ দেখিয়া, অনায়াসে তাহার সঠিক উত্তর নিরূপণ করিয়া দিল। তাহার পর হইতে বিক্রমাদিত্যের সভায় খনার অলৌকিক গুণ প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং রাজা তাহাকে নবরত্ন সভার অন্যতম রত্নপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইহাতে বরাহ আপনার পুত্রবধূর কলঙ্কের ভয়ে ভীত হইয়া মিহিরকে তাহার জিহ্বা চ্ছেদনের জন্য আজ্ঞা করেন। মিহির ইহাতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ; কিন্তু খনা স্বয়ং গণনার দ্বারা নিজের মৃত্যু জানিতে পারিয়া স্বামীকে পিতৃ নিদেশ পালন করিতে বলে। এবং এইরূপেই তাহার জীবনের অবসান হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন, যে খনা শ্বশুরের গণনায় ভুল ধরিয়া দিত বলিয়া ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া বরাহ পুত্রকে উক্তরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করেন।

ফলতঃ গ্রন্থাদিতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে খনার জীবন-চরিতের সম্পূর্ণ উপাদান গুলির একান্ত অভাব। কোথায় তাহার প্রকৃত জন্মস্থান, কে তাহার মাতা পিতা, এ সমস্ত কিছুই জানা যায় না।

খনার অস্তিত্ব কাল্পনিক

লোক-প্রচলিত খনার কাহিনী হইতে আমরা কোন সত্যবস্তু গ্রহণ করিতে পারি না। যদি ইহাকে বাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেই হয়, তাহা হইলে কঙ্কাবতীর উপাখ্যান, দুয়োরাণী, সুয়োরাণীর রূপকথা এবং ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাহিনী, এ সমস্তই বা বস্তুহীন বলিব কেন? কিন্তু বলিবার প্রয়োজন আছে, আমরা বলিব। যে হেতু মানব-প্রকৃতির মূলে এমন একখানি কষ্টিপাথর আছে, যাহা দ্বারা সোনা কি পিতল নিরূপণ করা যায়। আমাদের স্বভাবে এমন কোন সামগ্রী আছে, যাহাতে আমরা সম্ভব ও অসম্ভবের একটা স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হই। এইরূপে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, খনার জীবনী একটা উপন্যাস ভিন্ন কিছুই নহে।

খনাকে আমরা যত বড় করিয়াই দেখি না কেন, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে, বরাহ-মিহিরের খ্যাতিই খনার নামের অবলম্বন। বরাহ মিহিরের সর্ব্বব্যাপী পরিচয়ের সঙ্গেই খনার আত্ম-প্রকাশ। বরাহ-মিহির যদি না থাকিত তাহা হইলে খনার এ দেশে আসিবারও সম্ভাবনা ছিল না, পরন্তু আমরা হয়ত তাহাকে জানিতামও না, চিনিতামও না। অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহাকে জানিতে চিনিতে পারিলেও সে রকম নির্ব্বাক-নত-ভাবে অতিরঞ্জন-রঞ্জিত নয়নে দেখিতাম কিনা সন্দেহ।

যাহাই হউক, এক্ষণে যে বরাহ-মিহিরকে অবলম্বন করিয়া খনা যশের উচ্চমঞ্চে চড়িয়া বসিয়াছে, এবং আমা-দিগকে আশ্চর্য্য ও হতবুদ্ধি করিয়াছে, সেই বরাহ মিহির সম্বন্ধেই প্রথমতঃ কতকগুলি সমস্যা জমিয়া রহিয়াছে। আমরা যাহাকে বরাহের পুত্র মিহির বলিয়া জানি, তাহার অদ্ভুত জীবনের বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে ছিল বলিয়া ইতিহাস স্বীকার করেন। এই উজ্জয়িনী মালব-দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং বর্ত্তমান ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। সে স্থান হইতে সমুদ্রের ব্যবধান অনেক দূর। আমাদের খিড়কীর দরজায় যেমন পুকুরঘাট থাকে, উজ্জয়িনী হইতে সমুদ্রতীর একেবারে সে রকম নয়। সুতরাং উপাখ্যান বর্ণিত মিহির জন্মগ্রহণ মাত্রই যে সে ভ্রান্ত গণনায় অল্পায়ু বিবেচিত হইয়া পিতা কর্ত্তৃক সমুদ্রের জলে পরিত্যক্ত হইল এ কথা উপাখ্যানেই সম্ভব। পরন্তু দেখিতেছি, শিশু মিহির সমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কাদ্বীপের তীরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার এ রকমভাবে বিনা হালে বিনা পালে লঙ্কায় যাইতে নিশ্চয় অনেকদিন লাগিয়াছিল। কিন্তু একথা এই বিংশ শতাব্দীর জীবন্ত মানুষ কেমন করিয়া স্বীকার করিবেন যে, যে মানুষ দুটিদিন অনাহারে থাকিলে দুর্ব্বল বিকল হইয়া পড়ে, তখন এই সদ্যভূমিষ্ট শিশু মাতৃস্তন্যের একান্ত অভাব সত্ত্বেও কোনরূপে বাঁচিয়া গেল? সমুদ্রে ঢেউও কি ছিলনা? ঝড়ও কি উঠে নাই? এমন কি, লঙ্কায় রাক্ষসীদের স্নানের ঘাটে পৌঁছিয়াও, সে নরপুত্র হইয়া সকলের অভক্ষ্য রহিয়া গেল? পরন্তু অতবড় বয়সের খনা, শেষে কি-না তাহার পরিণীতা হইল?—এই সমস্ত উপাখ্যান-সুলভ অতিপ্রাকৃত ব্যাপার, ইহা প্রকৃত মানুষের স্বাভাবিক জীবনে কেমন করিয়া সত্য হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ বরাহমিহির সম্বন্ধে আর একটি বড় সমস্যা আছে। আমরা সকলেই জানি, বরাহমিহির রাজা বিক্রমা-দিত্যের নবরত্ন সভার রত্নবিশেষ ছিলেন। প্রকৃত বিক্রমা-দিত্য যে কে ছিলেন, তাঁহার সভার নয়টি রত্ন সকলেই এক যুগের মানুষ কিনা, ইহা লইয়া ইতিহাসে একটা মস্ত মতান্তর আছে। যাহা হউক, এ সমস্তের মীমাংসা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নয়। কিন্তু নবরত্নগণ যে সময়েরই হউন, তাঁহারা মোটের উপর যে মাত্র নয়জনেই আমাদের নিকট প্রসিদ্ধ, তাহাই আমরা অবগত আছি। যথা,—

> ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু-
> বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসঃ।
> খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ
> সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

অর্থাৎ ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ-মিহির এবং বররুচি এই নয়জন" মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্ন বলিয়া সুবিখ্যাত। এই শ্লোকে স্পষ্টই দেখিতেছি, "বরাহমিহিরো" শব্দটি এক বচনান্ত। ইহা দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে "বরাহমিহির" একই ব্যক্তির নাম; ভিন্ন দুজনের নাম নহে। পরন্তু একান্ত বলপূর্ব্বক ইহা হইতে দুইজন ধরিয়া লইলে শ্লোক-রচয়িতাকে মূঢ় বিবেচনা করিতে হয় এবং তাহার বিশেষ বোধের জন্য "মুগ্ধবোধের" ব্যবস্থা দিয়া তাঁহার স্বর্গস্থ আত্মাকে পুনরায় সন্ত্রাসিত করা হয় মাত্র।

অতএব বরাহমিহির যে অদ্বয় ব্যক্তি, তাহা এই স্থানেই প্রমাণিত হইল। সুতরাং বরাহ, মিহিরের পিতা নয়; কিম্বা মিহির, বরাহের পুত্র নয়। অতঃপর "নাইমাথা"র মাথায় অস্থিরতা জন্মাইলে তাহার চিকিৎসাটা আধি-ভৌতিক রকমেই হওয়া উচিত।

খনার ভাষার অসম্ভাবনীয়তা।

খনার কথিত জীবনীতে দেখিতেছি, সে সিংহলবাসিনী। সুতরাং তথাকথিত ভাষাই যে তার মাতৃভাষা, ইহা স্বভাবতই সত্য। পরন্তু উজ্জয়িনীতে বাস-নিবন্ধন তথাকার ভাষাও যে তাহার আয়ত্ত না হইয়াছিল, এমন নয়। কিন্তু সে সকল ছাড়িয়া বাঙ্গালা ভাষাতেই তাহার বচন নিচয় রচিত হইল কেন? খনা কি তবে বঙ্গবাসিনী? আমাদের প্রচলিত খনা সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকায় তাহাও ত স্বীকার করা হয় না। খনার বচনের ভাষাও আবার পণ্ডিতি ভাষা নয়, সে সমস্ত চলিত বাঙ্গালায় গ্রাম্য কথায় গঠিত কিন্তু তাহার ও রকম বাঙ্গালা শিখিবার সম্ভাবনা কোথায়?

অতঃপর ইতিহাসে বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াই প্রমাণ পাইতেছি। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কি রকম ছিল, তাহাও আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের ভাষা হইতে ভারত-চন্দ্রের ভাষা এবং তাঁহার ভাষা হইতে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ভাষার একটা বিশেষরকম পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। এইরূপে খনার বচনের ভাষা ভারতচন্দ্রের সময়কার বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং প্রমাণ পাইতেছি যে খনা ষষ্ঠ শতাব্দীর নহে, পরন্তু তাহার অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা দুইশত বৎসরের অধিক হইবে না।

অতএব খনা সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী সকল অমূলক। যেহেতু সে বরাহমিহিরের কেহ নয় পরন্তু তাহাকে বঙ্গ-বাসিনী বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বেই প্রমাণ পাইয়াছি যে বরাহ মিহিরের পিতা নয় অথবা মিহির, বরাহের পুত্র নয়, "বরাহমিহির" সমব্যক্তি। এবং তিনি পুত্রলাভার্থ হিমা-লয়ের পারে মানস সরোবরে গিয়া কস্মিনকালে স্নান করিয়াও আসেন নাই, তাঁর বাস্তবিক এ রকম সন্তানও জন্মে নাই, পরন্তু তাহার অল্পায়ু নিবন্ধন বিসর্জ্জন করিবার প্রয়োজনে বহুযোজন পথ ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে ভারত-মহা-সাগরের কূলেও যাইতে হয় নাই। সুতরাং খনা আমা-দের লঙ্কাবাসিনীগণ, অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গরমণী। তিনি রক্ষজনোচিত রুক্ষ ভাষায় কথা ক'ন্‌না.--কিন্তু সূক্ষ্মভাবে, দিন-ক্ষণ দেখে ঠিক বাঙালীর মেয়ের মত লাজ-ভয়-ময় স্বভাবকোমল স্বরে কথা বলেন। তিনি "বর্গী এলো দেশে" গানের সুরে তাঁর সাত কোটি বোন্‌-পো বোন-ঝিকে ঘুম পাড়াইতেছেন,—"পথে বাহির হ'সনে মাণিক, বনে আছে জুজু" বলিয়া সকলকে ভীত সচকিত করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু হে ভগবান্, খনামাসীর এ অন্যায় এ কুমতি যেন ব্যর্থ হয়। আমাদের জগতের প্রতিবেশী বন্ধুরা ওই যে পথে পথে বাঁশী বাজাইয়া গান করিতেছে, নিশান উড়াইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, রক্তবরণ ভাঁটা লইয়া খেলিতেছে,—উহা দেখিয়া আমরা যেন অস্থির হই, চঞ্চল হই, অশিষ্ট হই,—সেও ভাল, কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু খনামাসীর মায়ামন্ত্রে আমরা যেন ঘুমাইয়া না পড়ি, সুবুদ্ধি ছেলে বলিয়া সুখ্যাতি লাভ না করি।

খনার বচন।

অনেকে বলিবেন, যদি খনা বলিয়া কেহ না ছিল, তবে তাহার "বচন"গুলির উৎপত্তি হইল কোথা হইতে? কিন্তু ইহার উত্তরকল্পে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রচলিত "বচন" যে খনার রচিত তাহাই বা নিশ্চয়তা কি? কতকগুলি

বচন দেখিতে পাই বটে, যাহার শেষে ভণিতার স্থানে খনার নাম আছে; তেমনি আবার কতকগুলিতে হয়ত অন্যের নাম দেখা যায়; কোন কোনটায় পুনরায় কাহার নামেরই উল্লেখ নাই। যেমন,

(১) মধুমাসের ত্রয়োদশ দিনে
যদি রয় শনি,
সে বৎসর শস্য হানি
খনা বলে গণি।

(২) নরা গজা বিশে-শয়,
তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা,
ব'লে গেছে বরা পাগলা॥

(৩) চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥

ইত্যাদি। সুতরাং এই রকম সমস্ত দেখিয়া ইহা বলা যায় না যে প্রচলিত "বচন" মাত্রই খনার বচন। যেহেতু ডাক্ পুরুষের বচন, মহাপুরুষের বচন, সাঁইয়ের কথা, পাগলের কথা ইত্যাদি করিয়া কত বচন কত কথাই যে বঙ্গসমাজে ভিড় করিয়া আছে, তাহাব ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশ বহুবচনের দেশ। ব্যাকরণে কোন দিকেই ঐক্য পাওয়া যায় না।

আরও কতকগুলি বচন আছে, যাহা খনার বচন বলিয়াই ধর্ত্তব্য হয়। যথা,

"হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা,
সব না ফলে, ফলে আধা।"

হাঁচির ইতিহাস যে কি, তাহা জানিনা কিন্তু টিক্‌টিকির বাধা সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। সকলেই অবশ্য শুনিয়া আসিতেছেন, খনার যখন জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হয় তখন সেই কর্ত্তিত জিহ্বা বর্ত্তমান টিক্‌টিকি কুলের কোন এক পুণ্যবান্ পূর্ব্বপুরুষ ভক্ষণ করে। খনার মস্ত জিহ্বাখানি সে টিক্‌টিকি পুঙ্গবের ক্ষুদ্র উদরে ধরিয়াছিল কিনা জানিনা, কিন্তু শুনা যায় সেইদিন হইতেই সে সপরিবারে পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগ্নি আত্মীয় বন্ধু সমস্তের সহিত সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং সেই পুণ্যে তাহাদের অধস্তন সমস্ত টিক্‌টিকিই বংশানুক্রমে সিদ্ধ হইয়াই জন্মিয়া আসিতেছে। এইজন্য তাদের ডাকে এতটা মস্ত নিষেধবিধি আছে।

এস্থলেও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, হাঁচি-টিক্‌টিকির অনুশাসন আমাদের কল্পিত খনা কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয় নাই, ইহা তাহার তিরোভাবের পরে হইয়াছে।

খনার বচনের মৌলিকতা

অধিকন্তু খনার বচনে যে সকল সিদ্ধান্ত সংগৃহীত আছে, তাহার সমস্তগুলিই যে মৌলিক অথবা জ্যোতিষশাস্ত্র সঙ্গত, তাহাই বা কে বলিতে পারে? অধুনা সর্ব্বজগতের লোক স্বীকার করিবেন, যে ভারতবর্ষীয়গণ এককালে দর্শন-গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অতএব গার্গ্য, আর্য্যভট্ট, লীলাবতীর তুলনায় আমাদের কল্পিত খনা জ্যোতিষশাস্ত্রের কতখানি উন্নতি এবং আবিষ্ক্রিয়া সাধন করিয়াছিল, তাহা জ্যোতির্ব্বিদগণের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু আমি যাহা শুনিয়াছি কিম্বা জানিয়াছি তদ্বারা বলিতে পারি, খনার বচনে জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধীয় যে সকল নিয়ম আছে তাহার অধিকাংশই অসত্য এবং অমৌলিক।

তবে এই আমাদের অনুমিত হয়,—জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সব জটিলতা আছে তাহাই সরলভাবে সর্ব্বদা ব্যবহারে আনিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা 'ছড়ায়' গাঁথিয়া একটা সহজ নিয়মে ফেলা হইয়াছে। যেমন শুভঙ্করীর বচন সমস্ত গণিতের কঠিন কঠিন সমস্যা (Problem) সকল কতকগুলি সহজ প্রক্রিয়ায় (Process) বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাও ঠিক্ সেই রকম। অবশ্য যেমন এগুলি "শুভঙ্কর" বা "শুভঙ্করী" নাম্নীয় কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত নয়, তবে 'বাবা শুভঙ্কর' বা 'মা শুভঙ্করীর' কোন কোন ভক্ত গণিত বিশারদ কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে,—খনার বচন সমস্তও ঠিক্ সেইভাবে গঠিত বলা যাইতে পারে। খনার বচনের স্রষ্টা কেবল বাঙ্গালী গণক-পণ্ডিতগণই

মহেন, দিনক্ষণভীত সাধারণ গৃহস্থ এবং বহুদর্শী কৃষকাদি পর্য্যন্ত অনেককেই জানিতে হইবে।

আমরা প্রতিবৎসরই দেখিতেছি, "নূতন পঞ্জিকার" প্রথমেই আরম্ভ হইয়াছে,—

"হরপ্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী,
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
কোন্ গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রীবর,
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর।
ভব কন ভবানীকে কহি বিবরণ,
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ।"

বর্ষে বর্ষে হরপার্ব্বতীর এই কথপোকথন, ইহা কি বাস্তবিক বলিতে হইবে? পঞ্জিকা প্রণেতৃগণ কিছুতেই বলিতে পারেন না যে সত্য সত্যই তাঁহারা হরপার্ব্বতীর উক্ত আলাপ সজ্ঞানে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া থাকেন।

এই রকমে, খনার নাম দেখিলেই বলা যায় না যে সেই এ সমস্ত বচনের রচয়িত্রী, একান্ত পক্ষে ক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই নানাজনের দ্বারা এই "খনার বচন" সৃষ্ট হইয়াছে।

খনা শব্দের উৎপত্তি

শব্দাপভ্রংশের নিয়ম অনুসারে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে "ক্ষণ" হইতে "খনা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এরকম উদাহরণ বিরল নয়। যথা, 'এক্ষণ' হইতে 'এখন', 'শিক্ষা' হইতে 'শেখা' 'অক্ষি' হইতে 'আখি', 'দক্ষিণে' হইতে 'দখিনে' ইত্যাদি। অতএব 'ক্ষণ' হইতেই যে 'খন' বা 'খনা' হইয়াছে, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। মানুষের স্বভাবই এই, যে, সে যেখানে যা কিছু আশ্চর্য্যের বা ভয়াদি ভাবের বস্তু দেখে, সেখানেই একটা দেবতা বা মহাপুরুষের কল্পনা করিয়া লয় এবং তাহার সহিত কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ঘটনা জড়িত করিয়া নূতন নূতন রূপকের কাব্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু সে সকল আখ্যান বস্তুর কোনই সত্যতা নাই। আমাদের দেশে ইহার উদাহরণ অনেক আছে যেমন মৃত্যু হইতে যমরাজের উৎপত্তি, কলেরা ও বসন্ত হইতে "ওলাদেবী" ও "শীতলাঠাকুরুণে"র জন্ম সর্পভয় হইতে "মা মনসার" সৃষ্টি ইত্যাদি।

তেমনি "ক্ষণ" হইতেই যে "খনা" জন্মাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই যে 'ক্ষণ', ইহাও বড় সহজ জিনিষ নয়। কথায় বলে,—

"ক্ষণের মাথায় দিয়ে পা,
যাঁহা ইচ্ছা তাঁহা যা।"

—কি জানি, কোন্ ক্ষণের কোন রন্ধ্রে শনি বসিয়া আছে, হয়ত তাহার কোন্‌খানে বৃহস্পতির বারবেলা অমঙ্গলের ঘাঁটি পাকাইয়া রহিয়াছে, অথবা কোথায় যে কোন্ গ্রহ বিগ্রহ আবদ্ধ হইয়াছে,—সে সব কি বলা যায়?

বাস্তবিক এই ক্ষণের মারপেঁচ লইয়াই খনার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। অনন্ত যে কাল স্রোত, তাহাকেই যখন "মহাকাল" রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে, তখন "ক্ষণ" হইতে খনার ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

উপসংহার

মানুষ মাত্রেই সুখ চায়, শান্তি চায় এবং সংসারে সর্ব্বদা নিরাপদ থাকিতে ইচ্ছা করে। ইহা স্বাভাবিক। এই সুখ-শান্তির তৃষ্ণা এবং নিরাপদ থাকিবার বাসনা এমন বলবতী যে এই কারণেই মানব সমাজের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, মনুষ্যের এই প্রকৃতি ক্ষেত্রে যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ-রাজি পতিত হয় তাহা হইলে পরিণামে তাহা হইতে প্রচুর সুফল লাভ করা যায়। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি অজ্ঞানের আবর্জ্জনা আসিয়া পড়ে, তবে মানুষের এই অদম্য স্বভাব হইতেই নানাপ্রকার কুসংস্কার আকার পাইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া জাগিয়া উঠে। তদ্দ্বারা মানুষের বুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া পড়ে, জ্ঞান জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং চিত্তের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়। তখন মানুষ নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে না, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হয় না এবং চলন্ত জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে একান্ত অক্ষম হইয়া পড়ে। তখন সর্ব্বদাই যে একটা যা-তা রকমে

অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়ায়; ভুত মানে, প্রেত মানে; হাঁচি টিক্‌টিকির শব্দে মূর্চ্ছা যায়; তেলি দর্শন, খালি কলসী প্রভৃতি অশুভ মনে করে।

মধ্যে আমাদের দেশেও ঠিক্ তাহাই হইয়াছিল। তাহার ফলে মানুষ দেখিল,—প্রাচীনের জ্ঞান-গরিমার স্বর্ণ-দ্বারে মরিচা ধরিয়াছে; সত্য-জাগ্রত অখণ্ড-অনন্ত পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে; মানব-প্রীতি, বিশ্ব-নীতি প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই সঙ্কীর্ণতার অন্ধকূপে সমাধি লাভ করিয়াছে। এবং ইহারই অপরিহরণীয় পরিণতিতে পূর্ব্ব সত্যকে জড়াইয়া অনেক রকম মিথ্যা, সার্ব্বজনীন নীতিকে ছাড়িয়া নূতন শাস্ত্র এবং পবিত্র প্রীতিকে পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ আচার ব্যবহারের প্রচার হইয়াছে।

কিন্তু আজ এদেশের এ সমস্ত অন্যায় সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। মধ্য যুগের "ধোঁকা" যাহা কিছু এখনো আছে, তাহাও আর বিশ্বের বাজারে বিকাইবেনা। বর্ত্তমানের জগত সত্য-মিথ্যার মাঝে একটা পরিষ্কার সীমারেখা টানিয়া দিতে ব্যস্ত। আজ জগতের ইতিহাস জীবনলাভ করিয়াছে; সে কল্পনাকে সঙ্গী করিবে কেন?

অতএব খনা-সম্বন্ধীয় যদি কোন সত্য ইতিহাস থাকে, তবে তাহা প্রকাশিত হউক। নচেৎ উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে আমরা খনার অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছিনা।

—০—
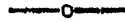
গুণের মূল্য

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি,এ,]

আমার নাম নবজীবন ভাদুড়ী। বাড়ী মনোহরপুর; জেলা যশোহর। পেশা নেটিভ্‌ ডাক্তারী। গল্পটী আমারি জীবননাট্যের একটা অঙ্ক।

তিন বছরের ছোট ছেলেটাকে আমার হাতে স'পে দিয়ে জীবনপথের সঙ্গিনী যেদিন হাত ছেড়ে দিয়ে পথের ধারের অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল তখন আমার যা হয়েছিল এতদিন পরে তার এক অক্ষরও ভুলিনি।

লোকে বল্‌তে লাগ্‌লো, "বিয়ে কর, এইতো বয়স—মোটে ২৫।২৬ বৈতো নয়?—ছেলেটাকে তো মানুষ করতে হবে?" আমি বল্‌তাম—"ছেলে মানুষের জন্যে যদি বিয়ে করা তা হলে দরকার নেই—বড়বৌদি, আছেন তাঁর পেটের পাঁচটা ছেলে যে স্নেহে মানুষ হচ্ছে আমার কুঁচোটাও তাতেই মানুষ হবে—" বৌদি শুনে বল্লেন 'তা তো ঠিক্ ঠাকুরপো'র না হয় স্ত্রী গিয়েছে বড়'র (ছেলে) তো ম মরেনি—।' শুনে বুকটা কতক ঠাণ্ডা হল। কিন্তু আসল-ভরসা ছিল, চাঁপার মা, বুড়ী ঝি। খোকার মাকেও সে মানুষ করে। তার কেউ না থাকায়, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার ঘর করতে আসে।

দিন যায়, ছেলে খেয়ে দেয়ে বড়ই হয়। মা-মরা ছেলে বলে, আদর দিতাম খুব। আদরে ছেলে একটু দুরন্ত, বদমেজাজী হয়ে পড়লো। বাপে তা সইবে; পরে কাঁহাতক সইবে তা? ছেলে একদিন কেঁদে এসে নালিশ করলে 'জ্যাঠাইমা গালে চড় মারলে কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'কি করেছিলি?' ছেলে—'ঝি খাবার এনেছিল, আমি তুলে নিয়েছিলাম একটা' আমি।—অন্যায় করেছিলে তাই মেরেছেন। ছেলে।—'খুনিদিদিও তো নিলে তাকে

কেন যাবলে না ?' আমি।—'সে বলে নিয়েছিল হয়তো। ছেলে।—'না, অমনি কেড়ে নিল' আমি। 'না—মিথ্যা কথা, যাও।'

ছেলে কি মিথ্যা বলতে শিখেছে ? কে জানে ? বাপের মন ছেলের দশদে পাপের সম্বন্ধে পাপ ভাবে। হবেও বা—। তারপর একদিন বৌদির মুখোস্ খুলে যেতে দেখ্লাম ? সে দিন দুধ বেশী ছিল না; বৌদি নিজের ছোট ছেলে দুটীকে বাটী ভরে খাইয়ে, শেষে দুটাকখানেক তাদেরি এঁটো দুধে জল ঢেলে চিনি দিয়ে খোকাকে আমার খেতে দেয়। দেবতার জাত তাতেই সন্তুষ্ট। কেবল বল্লে—'মাগো কি পাতলা' বলেই মুখ পুঁছে খেলতে চলে গেল। আমি আড়াল হতে জানলা দিয়ে দেখলাম ? কেন দেখলাম ? কপালের গেরো ! অজ্ঞান যে ছিল ভাল। কিম্বা দেবতাই দেখালেন। চুপ করে চলে গেলাম।

জন্ম থেকে খোকাকে মানুষ করেছিল বুড়ীঝি চাঁপার মা' পাকালোক সে। সে অনেক আগে থেকেই বুঝেছিল। বলতে এলে চোক্‌টিপে বা ধম্‌কে থামিয়ে দিতাম।

তখন থেকে প্রায়ই এমনি কিছু না কিছু চোখে পড়তে লাগলো। বুঝলাম চুপে চাপে সরে পড়াই ভাল।

ভেবে চিন্তে তখন একদিন ছেলের হাতধরে কাকেও কিছু না বলে, মুরলীগঞ্জের দাতব্য হাঁসপাতালে চল্লিশ টাকার এক ডাক্তারী চাকরী নিয়ে বিদেশবাসী হলাম। দাদাকে বৌদিদিকে পরে পত্র দিয়ে জানালাম। তাঁরা আমার কাণ্ড দেখে ব্যাপার কি জানতে পত্র দিলেন। আমি বৌদির পত্রের উত্তরে লিখলাম—'এঁটো জলো দুধে ছেলে মানুষ হতে পারে, জলো স্নেহে হয় না—'। তারপর দেখা শুনা আলাপ পরিচয় বন্ধ হয়ে গেল।

হাঁসপাতালেরই একপাশে ঘর পেয়েছিলাম, বাপ ব্যাটায় থাকি। এক উড়ে বামুন রুগীদের পথ্যি রাঁধতো। তাকে টাকাখানেক দিলে সে আমাদের দুজনেরও অখাদ্য হলেও অবশ্য খাদ্য দু মুঠোভাত আর ঘুসোচিংড়ির পাঁচন রেঁধে দিত। এমনি করে চলে। বাইরে রুগী দেখে কিছু কিছু উপরী রোজগার হতো। ছেলেকে কাছেই একটা ইস্কুলে দি। নিজেই পড়াই।

এমনি করে দিন যায়। একদিন হাঁসপাতালে একটী বিধবা বামুনের মেয়ে ইন্‌ডোর পেসেণ্ট হয়ে ভর্ত্তি হয়। তার একটী অবিবাহিত মেয়ে আর ছোট একটী ছেলে রোজ তাকে দেখতে আসতো। ওয়ার্ডের একটা বেয়ারা ছিল। রুগীদের আত্মীয়স্বজন এলে তাদের সঙ্গে বড় দুর্ব্যবহার করতো। অনেকে এইজন্যে তাকে কলাটা-মুলোটা কিম্বা গণ্ডাকত পয়সা ঘুষ দিতো। দিয়ে দেখা করে বা আত্মীয় রুগীর ভাল পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়ে নিতো।

একদিন তখন আমার ডিউটী রোগীদের দেখতে লেগেছি। সেই বিধবার মেয়েটীর প্রতি ওয়ার্ডার খুব কড়া কড়া কথা প্রয়োগ করছে। সে ঘুষ দিতে পারেনি বলে, ব্যাটা খুব জবরদস্তি করছে; মেয়েটী বার হতে, আর মেয়েটীর মা ভিতর হতে খুব কাকুতিমিনতি করছে। আমি যেন দেখেও দেখছিনি, শুনেও শুনছিনি এমনিভাবে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম। তারপর ওয়ার্ডারকে একটু ভারি স্বরে বল্লাম "ওকে আসতে দাও" বলতেই সে ব্যাজার মুখে তাকে নিয়ে এল। মা ও মেয়ে ও ছেলেটী বড় খুশী। মা ও মেয়ে আমার দিকে এমন করে তাকালে যাতে বুঝলাম তাদের বুকে কৃতজ্ঞতার প্লাবন এসে মুখের কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

'মেয়েটী কাপড়ের ভিতর হতে একটা পিতলের গ্লাসে করে খানিকটা ঘোল এনেছিল, মাকে খাওয়াবে। আমার দিকে সভয়ে তাকিয়ে বল্লে 'মা খেতে চেয়েছে,—দেব কি ডাক্তার বাবু ?' আমি শুঁকে ও পরীক্ষা করে দেখে বল্লাম 'এটা খারাপ দিওনা—'। মেয়েটী তা সরিয়ে নিলে। তারপর আঁচল হতে চারটী চিঁড়ে ভাজা বার করে বল্লে 'চিঁড়ে ভাজা খেতে পারে কি ?' আমি বল্লাম, 'পাবে—তবে আর দুদিন সবুর করতে পারলে ভাল হয়।' শুনে মেয়েটী মার দিকে তাকালে। মা মাথা নেড়ে জানালে 'নিয়ে যাও থাক্।' মেয়েটী বল্লে—'মা এসে অবধি কিছু খায়নি এখানে—ডাক্তার বাবু।'

আমি। কেন ? এখানে তো খেতে দেওয়া হয়।

মেয়ে। এখানে সব ছোঁওয়াছুঁয়ি বলে খায়না সেদিন

একজনের এঁটো বাটীতে মাকে খাবার দিতে এসেছিল। মা খায়নি। লোকটা তাতে মাকে যা তা বল্লে!

আমি। কি বল্লে?

রোগীণী মেয়েকে চোখ টিপে দেওয়াতে মেয়ে আর কিছু বলিল না। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা অসহায়া, অনাথা, নিতান্ত দায়ে পড়েই হাঁসপাতালে আসে তার উপর খেতে পায়নি আজ দশদিন! ওই মেয়ে পাড়া হতে এটা ওটা ভিক্ষে করে এনে খাইয়ে যাচ্ছে। বিধবার পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। একজনের বাড়ী পাচিকা বৃত্তি করে সন্তান-পালন করছিলেন। রক্তাতিসার অসুখ হওয়ায় ধনীমনিব তাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়েছেন। হায় ভগবান!

মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! দৈন্তের এই নিদারুণ নির্য্যাতনের ভিতর দিয়ে বালিকার মুখে চোখে মাতৃভাব যেন ফুটে উঠেছে! কি মিষ্টি কথাগুলি! কি মাতৃভক্তি কি সহগুণ আর সেবাধর্ম্ম! বয়স আন্দাজ ১৪।১৫ হবে। অবিবাহিতা। আমি সব শুনে বড় আঘাত পেলাম। হাঁসপাতালের লোকজনকেই বা কি বকবো। এখানে ব্যবস্থাই এই! এও একটা বিলাতি কল। রোগীকে ওষুধপত্র দিয়া সারাবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অধিকাংশ রোগীই হিন্দু; তাদের সংস্কার-গত আচার বিচার বাঁচিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবার কোন নিয়ম নাই। দাতব্যকারীরা এইটে যদি দেখেন।

আমি বল্লাম—আমার ঘর ওইখানে—ওই দেখ—তুমি গিয়ে খাবার করে আনতে পার? যা দরকার হয় আমি দেবো। শুনে মেয়েটী যেন হাতে স্বর্গ পেলে। বিধবাটীর চোখ জলে ভরে এল। আমি একটু আত্ম-প্রসাদ লাভ করলাম। এত অল্প খরচে মানুষের ভক্তি পাওয়া যায় জানতাম না; আমি উঠলাম। মেয়েটী ও ছেলেটী আমার পিছনে পিছনে চললো। ওয়ার্ডার আমার কাজ ও কথা হতে বুঝলো রোগিণী আমার অনুগ্রহ পেয়েছে। সেও তাঁর উপর একটু নরম চাল ধরলো।

ঘরে এসে মেয়েটীকে সমস্ত জিনিস দেখিয়ে দিলাম। হাঁসপাতালের ভাণ্ডার হতে, সাগু, মিছরি, ভাল দুধ আনিয়ে দিলাম। মেয়েটী খাবার তৈরী করতে লাগ্‌লো। আমার ছেলে বন্ধু তখন হাঁসপাতালের উঠান হতে পেয়ারা পেড়ে এনে আয়েস করে খাচ্ছিল। বিধবার ছেলেটী তাই দেখে চোখদিয়ে ভাগ পাবার ইচ্ছে জানালো। ছেলেও আমার, করুণপ্রার্থীর অ-তারবার্ত্তা বুঝতে পেরে তাকে ছুটো দিলে। মুহূর্ত্তেই দুজনে খুবভাব হয়ে গেল। যেন কত-কালের পরিচিত দুজনে।

এদিকে মেয়েটী নারীসুলভ পটুতাগুণে দিব্যব্যবস্থা বন্দোবস্তের সঙ্গে খাবার তৈরী করতে লাগ্‌লো। আমি বসে বসে দেখতে লাগ্‌লাম। কে জানে কেন মনটা এই দীনদুঃখিনীর প্রতি ঝুঁকে পড়লো? মিছে কথা বলবো না, মনের কথাও চাপ্‌বো না, মেয়েটী দেখতেও বেশ। সুগঠনের ওপর একটা কমনীয়তা তাকে বড় সুন্দর করে তুলেছিল। বলতেই বা দোষ কি; সুন্দরী কিশোরীকে সে চোখে দেখবার বয়স তো আমার যায়নি। আমার বয়স তখন ২৭।২৮ হবে। প্রকৃতিদেবী শূন্যস্থান ভালবাসেনা বলেই হোক আর যে জন্যেই হোক্ উদাসী বিরহী মনটা কিছুদিন হতে শূন্যপূরণের জন্যে যেন হা হা করছিল। চুপ করে বসে থাকা অসহ্য বলে কথা আরম্ভ করলাম—তোমার নাম কি? কি বলে ডাক্‌বো?

মেয়েটী মুখের দিকে একবার তাকিয়েই মাথা আরো হেঁট করলে—

আ। বলনা, লজ্জা কি, ডাকতে তো হবে?

মে। গৌরীবালা—

আ। বেশ নামটী তো, তোমার আর কে আছে?

মে। আর কেউ নেই ওই ছোট ভাইটী।

আ। বাবা কতদিন হল মারা গেছেন—

মে। তিন বছর হল।

আ। এই গাঁয়েই বাড়ী?

মে। হাঁ—এখান হতে আধক্রোশ হবে—যে বাড়ীতে সেদিন রুগী দেখতে গিছলেন সেই বাড়ীর পাশে—

আ। তুমি কি করে জান্‌লে?

মে। আপনাকে সেদিন দেখেছি—

আ। তোমাদের কি করে চলে?

মে। চৌধুরী বাড়ীতে মা—(চুপ করিয়া) রাঁধেন—

আ। তারা ডাক্তার দেখালে না? এখানে পাঠালে কেন?

এর উত্তর মেয়েটী কি দেবে? আমি বুঝলাম—! এযে এ-কাল! দুধ বন্ধ করলে গরু কসাইবাড়ী যায়; অনুগত সেবাকরী লোকজন রোগাক্রান্ত হলে হাঁসপাতালে তো যাবেই!

আ। তোমরা থাক কোথা?

মে। নবকালী চাটুজ্যে মশাইএর বাড়ীতে একটা ঘর নিয়ে আমরা থাকি—

আ। নিজেদের ঘর ছিলনা?

মে। ছিল—তা বাবার দেনা ছিল বলে চাটুজ্যে-মশাই তা কিনে নিয়েছেন—ঐ একটু ঘর থাকতে দিয়েছেন।

আ। বটে! গরু মেরে জুতো দান করেছেন! তা তোমরা ভাই বোনে এখন সেথা আছ—মা তো হেথা—ভয় করেনা?

মে। না। বাড়ীর ভেতর আরো লোকজন থাকে—

আ। তোমার খুড়ো জ্যাঠা, মামা, মেসো কেউ নেই?

মে। খুড়ো আর মেসো আছে। আমার কাকার সঙ্গে বাবার ভাব ছিলনা, তাই কাকা আমাদের খোঁজ করেনা। তিনি কোথা আমি তা জানিনি—

আ। মেশো খোঁজ করেনি?

মে। হ্যাঁ, মাকে নিয়ে গিছলেন—তা মা কিছুদিন থেকে চলে আসে—

আ। কেন?

মে। আমি তা জানিনি।

'জানিনি' কথাটী মেয়েটী অনেক যেন ভেবে চিন্তে 'কক্ত-মিস্ত' হয়ে বল্লে। ভাবলাম লোকের ঘরের কথা টেনে বার করবার দরকার কি? গরীবের সংসারে কত কথাই আছে যা বলবার নয় শোনবার নয়।

খাবার তৈরী হলে মেয়েটী গুছিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে আসবে, এমন সময় আমি বল্লাম—'গৌরী, তুমি আর তোমার ভাই এখানে চারটী খেয়ে যেও—কেমন?' গৌরী উত্তর দেবার আগে চাঁপার মা কোথা হইতে উত্তর দিল—'নেমন্তন্ন তো করছ? এদিকে ঠাকুর বলে হেথা আজ আসবেনা; রাজবাড়ী বামুনভোজন আছে সেথায় যাবে—।" আমিতো ভারি অপ্রস্তুত। পরক্ষণেই বল্লাম 'আচ্ছা আমিই রেঁধে খাওয়াবো—'। বলেই চল্লাম।

তা শুনে যেতে যেতে গৌরী বল্লে—"ডাক্তার বাবু আমি রাঁধতে জানি আপনাদের আজ রান্নাবান্না করে দেবো?" আমি বল্লাম—"বেশতো তা ভালই হবে মেয়ে-ছেলের হাতের রান্না কতদিন খাইনি—।' গৌরী যেন তাতে বড় অনুগৃহীতা মনে করলো। মেয়েটীর এক একটী কথা ও কাজে তার ভিতরের গুণগুলি যেন ফুটে বেরুতে লাগলো।

সে এসে মাকে খাওয়ালে। দুঃখের সঙ্গে সহানুভূতি করে; দুঃখীকে ভালবেসে, তার দুঃখের লাঘব করে শুকনো বালিরচড়া বুকটায় কি একটা ভারি মধুর পুলকের শিহরণ জেগে উঠলো কি একটা রসের স্রোত বইতে লাগলো! নিজের ঘরসংসার ভেঙ্গে গেলে মানুষ মনে করে তার সব গেল, সব ফুরালো তার আনন্দবাজার বুঝি এবারের মত শেষ গেল। তা যায়না। তা যে যায় তা মনের দোষে; মন যে কতটা ব্যাপক কতটা প্রসারনশীল, কত যে নিতে পারে তা সে জানেনা। আমাদের এই স্বার্থের খোসায়বদ্ধ 'ছোট্ট আমিটা' নিজের কণাটুকু হারালে মনটাকে আর সব হতে গুটিয়ে নিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে। তাই তারা এই রসের বাজারে থেকেও নীরস হয়। সব-পাওয়ার মধ্যে ডুবে থেকেও সব হারা হয়। এই দুঃখিনী-মেয়েটীর আর ততোধিক দুঃখিনী তার মায়ের ছোট্ট করুণ ইতিহাসটা আমার ছোট-আমির খোসায় দুটো টোকা মেরে তাকে বাইরের দিকে চোখ মেলতে শেখালে।

সেদিন পাশের একটা গাঁ হতে এক ধনীরা আমায় নিতে পাল্কী পাঠায়। আমি 'ও বেলা যাব বলে' এ বেলা ডাক রদ করে দিলাম। মেয়েটী মাকে খাওয়াতে খাওয়াতে কত কি বলতে লাগলো আমি তখন হলের এককোণে একটী রোগীর ব্যাণ্ডেজ খুলছিলাম। কাণ ছিল মায়ে ঝিয়ের কথায়। রোগী দু একটা উঃ আঃ করে আমার শোনার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিলো, আমি তাকে ধাপ্পুড়ি দিয়ে থামিয়ে দিই। মা উত্তরে বল্লে—"বেশত, গিয়ে রেঁধে বেড়ে

ডাক্তার বাবুকে যত্ন করে খাইও—তিনি যখন বলেছেন পাতে পেসাদ খেও—আহা সব হাঁসপাতালের ডাক্তার এমনি হয় না কেন?" প্রশংসা শুন্‌বার যে সুখ তা অতিবড় জিতেন্দ্রিয় সংসার বিরাগী নিঃস্বার্থপর মহাপুরুষেও অগ্রাহ্য করতে পারে না; আমি তো কীটস্য কীট্!

কলের মত রুটীন্ ধরে দিনের পর দিন কাজ করে করে—জীবনটা যেন কেমন হয়ে আসছিল। রোগীদের রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে নাড়ী টিপে টিপে লোকের দুঃখতেও আর প্রাণে স্পন্দন জাগছিল না—বুঝছিলাম প্রাণ বলে জিনিসটায় পলি পড়ে কেমন হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় কোথা হতে যে দমকা হাওয়া বইলো, হটাৎ প্লাবন এলো কে জানে, একটা নবীন আনন্দের অনুভূতিতে ঘুমন্ত অন্তরপুরী চঞ্চল হয়ে জেগে উঠ্‌লো! বুঝলাম প্রাণ মরেনি; তার 'কোমা' অবস্থা এসেছিল।

মেয়েটী ও ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ীতে গেলাম। চাঁপার-মাকে বল্লাম কি বন্দোবস্ত করিছি। সে শুনে রাজী হল। তাকে দিয়ে বাজার হতে কিছু মিষ্টান্ন আনালাম। চাঁপার-মাকে বল্লাম 'একে পোষ্ট আপিসের পুকুরে নাইয়ে আন্। মেয়েটী একটা ছিন্ন মলিন কাপড় পরেছিল। তার কাপড় চাইতো। অনেকদিন পরে বন্ধুর মার পেড়াটী খুল্‌লাম, তা হতে একখানি বাসীকরা কাপড় বার করে, গৌরীকে বল্‌লাম—'এটী পরো নেয়ে এসে।' অনেকদিন পর ভাবিনি এ কাপড় আবার কেউ ব্যবহার করবে! বা কাকেও ব্যবহার করতে প্রাণধরে দিতে পারবো! চোখ ভিজে এল। কিন্তু মনেতো কোনো দুঃখু হলনা। বড় তৃপ্তি হল। কাপড়টা একবার সার্থক হয়েছিল তার দেহের লজ্জা কমিয়ে আর শোভা বাড়িয়ে। আজ মনে হ'ল সে আবার সার্থক হবে এই দুঃখিনী বড় লক্ষ্মী মেয়েটীর দেহ-স্পর্শ করে। আমি তাই ভাবছি গৌরী ভাবছে 'ব্যাটা-ছেলের বাড়ীতে মেয়েছেলের কাপড় কোথা হতে এল?' বুঝে বল্‌লাম—"খোকার মার কাপড়—অমনি পড়ে আছে আজ তিন চার বছর।" গৌরীর সরল উৎসুখ চোখদুটী আমাকে নীরবে যে প্রশ্ন করলো তাও বুঝলাম। বল্‌লাম—খোকার মা নাই, আজ দু'বছর তিনমাস হল চলে গেছে।" বলেই বাজার চলে গেলাম কখনো যা করিনি। দরকারও হয়নি। প্রকৃতির কোলের জীবদের মত, যেদিন যা জুটতো তাই খেতাম চাঁপার মা যা দরকার বুঝ্‌তো এনে দিতো। ভাঁড়ার বলে আমার কিছু ছিলনা শোবার তক্তপোষের নিচে একটা ঝুড়ী আর দু চারটে চা, বিস্কুটের বাক্স দু একটা বা শিশিবোতল। এই যা।

বাজার সেখান হতে মাঠপার, রেল ইষ্টিশেনের কাছে। যেতে বাজার করতে আসতে ঘন্টা দেড় লাগ্‌লো। হাঁস-পাতালের চাকর নফর ছিল, পাঠাতে পারতাম, পাঠালাম না। এও একটা আনন্দ! ফিরে এসে দেখি বাড়ীর উঠান বারান্দা, শোবার ঘর, রসুই ঘর সবেরই চেহারা বদ্‌লে গেছে যেন কোন যাদুকরীর করপরশে সব সোনা হয়ে উঠেছে? সব ঝর্ ঝর তর্ তর্ করছে বেশ গুছানা-গাছানা হয়ে পড়েছে। বিছানাটী তো ছিল অনন্ত-শয্যা! তাও ঝাড়া পোঁছা, পরিস্কার। রসুই ঘরে ঢুকে দেখি স্নান করে এসে সেই কাপড়খানি পরে মাথায় একরাশ ভিজে কাল চুল পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে গৌরী আমার খোকাকে জোর করে ধরে নিজের খাবার খাওয়াচ্ছে—। আমাকে দেখে সে একটু অপ্রস্তুত হল। খোকা না খেয়ে ছুটে পালালো। আমি বল্লাম—'তুমি খাও ওর জন্যে তো আনিনি।' তারপর খেলে কি না খেলে জানিনি। বাহিরে এসে দাঁড়াতেই বাজার তার কাছে ধরে দিলাম। নিপুণা গৃহিনীর মত সে সেগুলির ব্যবস্থা করতে বস্‌লো, দূর হতে দেখ্‌লাম—লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যেন লক্ষ্মীর উদয় হয়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরা মনে কি একটা আশা উঁকি মেরে জেগে উঠ্‌লো।

সেদিন আর আমাকে কেউ ডেকে পায়নি। গৌরী নিঃশব্দে নিপুণ হাতে কখন যে কত-কি রেঁধে ফেলেছে তা দেখে অবাক! অথচ কত অল্প সময়ে। আর আধ-সিদ্ধ ভাত আর ঘুসোচিংড়ির পাঁচন তৈরী করতে নিত্যানন্দ ঠাকুর চড়কের গাজন লাগিয়ে দিতো! বন্ধু আর সেই ছোট ছেলেটাকে নিয়ে খেতে বস্‌লাম, কি সে তৃপ্তি! কিসে উৎসব সেদিন অনাহারী মনের ও রসনার। খেয়ে উঠে গৌরীকে খাওয়াতে বস্‌লাম। সেতো লজ্জায়

তাতে হাত দিয়ে বসে রইলো দেখে বাইরে গিয়ে বল্লাম।

খাওয়া সেরে আবার সব গুছিয়ে গাছিয়ে গৌরী মার কাছে গেল। মায়ে ঝিয়ে কত কথা হল। মা শুনলে মেয়ের কাজের কথা, শুনে খুব খুসীই হলো। আমি একটু বাদে গিয়ে বল্লাম—আপনি যদ্দিন না ভাল হন তদ্দিন আপনার ছেলে মেয়ে আমার ওখানেই থাক্ খাওয়া দাওয়া করুক একলা কোথা গিয়ে থাক্‌বে? দিব্যি মেয়েটী আপনার? আমার বছরখানেকের নোংরা অগোছ ঘরকন্নাকে গুছিয়ে গুছিয়ে কি চমৎকার করে দিয়েছে—"। বিধবার আনন্দোজ্জল চোখের সজল চাহনি তার উত্তর দিল।

গৌরী ও তার ভাই তাই থাকে। দিনকয়েক না যেতেই বিধবার রোগ আবার খারাপ ভাব নিলে। রক্তা-তিসার খুব বেড়ে উঠ্‌লো। তিনি বুঝলেন এ যাত্রা রক্ষা নাই। মেয়েও বুঝলো মাকে আর বাঁচাতে পারবে না। সে আসন্নমাতৃ বিরহেরগুরু ভার ভয়কে বুকে চেপেও আমার ঘরকন্নার কাজ আর মায়ের সেবা করতে লাগ্‌লো! আমি দেখি আর অবাকই হই?

তারপর যে দিন শেষ হয় সব, সে দিনের কথা। বিধবা কাতরকণ্ঠে বড় ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"ডাক্তার বাবু আমার মেয়েটী আর ছেলেটী রইলো! এমনি করে দয়া রাখ্‌বেন—ওদের কেউ রইল না আর—।" 'গৌরী' বলে ডেকেই বিধবা থেমে গেল। মনের কথা মুখে বেঁধে গেল। আমি দেখলুম আর দেরী না। আমার প্রার্থনাটী জানিয়ে অনুমতি নি। বল্লাম—'মা আমার ঘরের কথা তো জানেন সব, গৌরী তো আমার স্বজাতি ওকে আমার হাতে দিয়ে যাবেন?' আমার ঘর সংসার ওর হবে—আপনার আপত্তি আছে—" এত আনন্দে এত সুখেও বুঝি মানুষ মরেনা! বিধবার মরনপার মুখ অপ্রত্যাশিত আনন্দের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো—মেয়ের দুটী হাত আমার হাতে দিয়ে দুঃখিনী আর কিছু বলতে পারলো না। চোখের আলোটুকু একবার মেয়ের মুখের উপর পরক্ষণেই আমার মুখের উপর পড়ে ক্ষণিকের মত জলে উঠে নিভে গেল।

গৌরী বুঝিল! তারপর সে যে কাজ করলে তাতে তার পূর্ণ পরিচয় পেলাম। সে ছোট ভাইটীকে কোলে করে নিয়ে বরাবর আমার ঘরে চলে গেল। ছোট্ট ছেলে মরণ রহস্য কিছুই জানেনা—তবু সেই চিরবিরহের অন্ধকার তার শিশু হৃদয়েও একটা অস্পষ্ট আভাষ এনে দিল। আপনা হতেই সে জিজ্ঞাসা করলে 'দিদি মায়ের কি হল?' বুদ্ধিমতী দিদি বেশ স্বাভাবিক সহজ স্বরেই বল্‌ল—'মা ঘুমুলো!'

* * * *

একমাস পরে গৌরীকে একদিন কাছে ডেকে বড় আদরে শুধালাম 'গৌরী আমার এ ঘর পছন্দ হয়?' গৌরীর সমস্ত দেহলতাটী অনাস্বাদিতপূর্ব্ব কি এক পুলকে শিউরে উঠে কথার উত্তর দিল। আমি বল্লাম—'বুড়ো বর, ভাঙ্গা ঘর পছন্দ হয় তো?' গৌরী বসে পড়ে দুহাতে পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দিলে।

গ্রামে যখন রাষ্ট্র হল আমার বিবাহ হবে গৌরীর সঙ্গে তখন নরকালী চাটুয্যে যার Family ডাক্তার আমি—এসে বল্লে 'করছেন কি ডাক্তার বাবু?

আ। বিয়ে—

নী। কাকে জানেন?

আ। গৌরীকে—

নী। ওর মায়ের কীর্ত্তির কথা জানেন?

আ। খুব জানি? অমন কন্যারত্ন যে গর্ভে জন্মায় তাঁর মত কীর্ত্তিমতী নারীর পায়ের ধুলোর যোগ্য নয় দেশের চাটুজ্যে বাঁড়ুয্যের দল!

নবকালী একজন মাতব্বর সে গ্রামের। তাঁর কল্যাণায় আমার সে গাঁয়ে ডাক (call) অনেক কমে গেল। ফলে গৌরীর সঙ্গে প্রথম প্রণয়ের আলাপ পরিচয়ের জন্য অনেক সময় পাওয়া গেল।

ভাববার কথা

আধ্যাত্মিকতা বনাম কর্ম্ম

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ]

নীরব অবিশ্রান্ত সুচিন্তিত কর্ম্ম-ভারতে এখন ইহাই চাই। আজকাল জগৎটাকে মায়া বলিয়া অলসতার জন্য কর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। "কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড" এখন 'পরম অমৃতভাণ্ড' হইয়াছে। অবশ্য পরাতত্ত্বের চিন্তাই চরমে মানবের লক্ষ্য। কিন্তু হাড়মাস একত্র থাকিলে তবে তো পরমার্থের চিন্তা? সারাদিন যদি অর্থচিন্তা করিতেই চলিয়া যায়, তবে পরমার্থ চিন্তা করিবার অবসর থাকে কই? অনেকের ধারণা শুধু আধ্যাত্মিকতত্ত্বের আলোচনা লইয়া থাকিলেই ভারতবাসীর জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইবে। কিন্তু অতীতের ইতিহাস খুলিয়া দেখ ভারত শুধু 'চালকলা' খাইয়া পরমার্থ-লাভে সিদ্ধ হয় নাই। একদিন তাহার পার্থিব ঐশ্বর্য্য চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল—ব্যবহারিক জীবনে, শিল্প-, কৃষিবিজ্ঞানে সে অদ্বিতীয় হইয়াছিল। কিন্তু ভোগের দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি নাই দেখিয়া ভোগী ভারত যোগী হইতে শিখিয়াছিল। আর তাহার অপূর্ব্ব যোগসাধনায় মানবের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম সত্যসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ব্যবহারিক ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অপূর্ব্ব পারমার্থিক ঐশ্বর্য্য পাশাপাশি চলিয়াছিল!

আজ আমরা সেকালকার সেই আধ্যাত্মিকতার ফাঁকা আওয়াজে চারিদিক ফাটাইয়া দিতেছি—কিন্তু সে আধ্যাত্মিকতা আজ কোন্ দেহ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইবে? দেহহীন প্রেতাত্মার মত সে আজ আমাদের অচলায়তনে একটা উৎপাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের সফলতার দ্বারা ভোগের জন্য তাহাকে দেহ দাও—সে মূর্ত্ত হইয়া নবীন জীবনে আবার আমাদিগকে নূতন আধ্যাত্মিকতা দান করিবে।

অবশ্য স্বীকার করি দেশে বেশ একটা জাগরণের ভাব আসিয়াছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, সর্ব্বোপরি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ—যে নূতন যুগের উদ্বোধন করিয়াছেন। তাহার প্রথম কিরণপাতে 'দীনাকাঙালিনী' ভারত আবার চক্ষু মেলিয়াছে—ধাবমান জগতের দিকে চাহিয়া সে আপনার অবস্থার কথা বুঝিতে পারিয়াছে—কিন্তু এখনও অনেক বাকি আছে।

শিক্ষার অভাবে এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় সমস্ত দেশটা একবারে ডুবিয়া রহিয়াছে, সে অন্ধকার দূর করিতে হইলে অনেক ত্যাগ, অনেক সাধনা চাই। এখন কেবল তাহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বাংলার কথা ভাবিলে তবুও হৃদয়ে একটু আশা আসে—কিন্তু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ কি বিশাল কর্ত্তব্য সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী;—

* * * * * *

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে,

* * * * * *

বড় দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার !
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।".

এ দারুণ দৈন্যের মাঝে শক্তির বজ্রনিনাদে ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শে স্বর্গ হইতে বিশ্বাসের ছবি আনিতে হইবে।

সার্দ্ধ সপ্ত শতাব্দীর সুদীর্ঘ পরাধীনতায়, উচ্চবর্ণ সমূহের কঠোর সামাজিক অত্যাচারে দেশের লোক ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ—যে তাহারাও সেই একই অনন্ত আকাশের তলে বিচরণ করে, একই সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হয়—একই দেশের ফলে জলে, একই মায়ের স্নেহক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত। হয় তাহারা জানে না যে তাহাদের ভারতেরই পুণ্য তপোবনে জ্ঞানের প্রথম রশ্মি জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল—তাহাদের ভারতই একদিন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্যের জন্মভূমি রূপে পবিত্র হইয়াছিল—তাহাদের স্বদেশেই শিবাজী, প্রতাপাদিত্যের বীর বিক্রম প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহাদের জন্মভূমিই প্রতাপ সিংহ, গুরু গোবিন্দের পবিত্র শোণিত রেখায় রঞ্জিত হইয়াছিল—পদ্মিনী, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই একদিন তাহাদেরই ঘর আলো করিত—এসব কথা আজ যেন ভারতবাসীর নিকট অতীতের কাহিনী মাত্রে পরিণত !

এই সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগাইতে হইলে দ্বারে দ্বারে নিরাশার দারুণ প্রতিধ্বনির মধ্যেও ভারতের পুণ্যকাহিনী শুনাইতে হইবে, ত্যাগ মন্ত্রের মহনীয় আদর্শ চোখের সামনে ধরিতে হইবে—কুটীরে কটীরে বলিতে হইবে 'ওরে, তোরাও আমাদের ভাই, তোরা ও আমরা একই মায়ের ছেলে—তোরাও জগতের একজন—তোরাও সেই অনন্ত শক্তিমান বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তার সন্তান—আয় ভাই, একবার সব মলিনভাব দুর করিয়া দিয়া প্রাণের সহিত ভাই ভাইকে আলিঙ্গন করি। প্রেম এবং ঐক্যের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া হৃদয়ের সব শক্তি মাতৃ-অর্চ্চনায় নিয়োগ করি।'

যদি এইরূপ চলিতে পার—অহঙ্কার, অভিমান ত্যাগ করিয়া—বংশমর্য্যাদা, জাতিত্বের গৌরব বিস্মৃত হইয়া—একবার বাহু প্রসারিয়া ভাই ভাইকে বুকে টানিয়া হৃদয়ের জ্বালা ভালবাসার অশ্রুজলে জুড়াইয়া দিতে পার, তবেই দেশের মঙ্গল-অন্যথা নয়।

আমাদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন লিখিতে পড়িতে জানে না। মুষ্টিমেয় তোমরা কয়েকজন শিক্ষিত—মনে করিও না বক্তৃতা করিয়া, সভাসমিতি করিয়া, বই লিখিয়া দেশটাকে মানুষ করিয়া তুলিবে। বাস্তবিক কাজটা অত সহজ নয়—এজন্য জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া লোক-সেবায় জন্মভূমির উপকারে নিজেকে বিসর্জ্জন করিতে পারে—এমন সব প্রকৃত সেবক চাই—যাহারা নিজেকে ভুলিয়া, স্বীয় হৃদয়কে অনন্ত আকাশের মত বিস্তৃত করিয়া তন্মধ্যে পতিত ভারতকে স্থান দিতে পারে—আবশ্যক হইলে সুখবিলাসিতার যাবতীয় বন্ধন বীরের ন্যায় ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে—তাহাদের দ্বারাই কাজ হইবে—অলস, ভীরু, বাকপটু, কাপুরুষগণের দ্বারা কখনো হয় নাই, হইবেও না। বই লিখিবে, পড়িবে কে? বক্তৃতা করিবে, শুনিবে কে? রিপোর্ট বাহির করিবে দেখিবে কে? কংগ্রেসাদি ঘটাইবে খবর লইবে কে? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া দেশের লোককে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে—যাহাতে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে দেশের গায়ে কোথায় কোন্ ক্ষত কি ভাবে হইয়াছে এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতীকার করা যাইতে পারে।

এই বৈজ্ঞানিক যুগের জ্ঞানালোক এবং ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের কথা দ্বারে দ্বারে পৌছাইয়া দিতে হইবে। কেহ না শুনিলেও বিবিধ কৌশলে শুনাইতে হইবে। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার সারাংশকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া দেশকাল পাত্রোপযোগী করিয়া লইতে হইবে—তাহাতে এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইবে। তখন স্বাধীনতার লীলাভূমি, জগতের তীর্থক্ষেত্ররূপে এক মহত্তর নূতন ভারত জগতের সম্মুখে এক মহান্ আদর্শ প্রচার করিবে।

—o—

তেলা-পোকা

(প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ)

[শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী]

তেলাপোকার সঙ্গে অল্প বিস্তর পরিচয় সকলেরই আছে। ইহাদের ব্যবহার এবং অভ্যাস সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে গৃহীরা কতদূর সন্ধান রাখেন জানিনা; পূর্ব্ববঙ্গে যে নামে ইহাদের সম্বোধন করা হয় তাহা হইতে বুঝা যায় সে দেশের অধিবাসীরা তেলাপোকার গুণপনা কিছু কিছু জানেন। বরিশাল জেলায় তেলাপোকাকে "তেলাচোরা" বলা হয়। চৌর্য্য-কার্য্যে তেলাপোকা বিশেষ ওস্তাদ। সাধারণতঃ যে সব কীটেরা গৃহস্থের ক্ষতি করিয়া থাকে তাহারা দিনে এবং রাত্রিতে নিতান্ত বোকার মতন খোলাখুলি ভাবে নিজেদের কর্ত্তব্য সমাধা করে। তেলাপোকা সেরকমের বোকা জীব নহে; ইহারা রাত্রির অন্ধকারে গৃহস্থের ঘরে, ভাণ্ডারে, দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে নিজেদের কোনা ঘুচি ছাড়িয়া মানুষের আহার্য্য বস্তু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে আসিয়া লাগে। ঐ সময় যদি কেহ জাগিয়া থাকে এবং কানটা একটু খাড়া রাখে, তাহা হইলে শুনিতে পায় ঘরে খড় খড় শব্দ হইতেছে। চট্ করিয়া আলো জ্বালিয়া চোরের সন্ধান করিলে নিরাশ হইতে হয়। যেমনি আলো দেখা অমনি ইহারা চট্‌পট্ এক মুহূর্ত্তে যে যার জায়গায় কিম্বা কোনে, গর্ত্তে অথবা কোন বস্তুর ছায়ার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া বসিয়া পড়ে। কাজেই ইহাদের নাম তেলাচোরা হওয়াই উচিত। ইন্দুর অন্ধকার রাত্রিতে ঘরের মধ্যে অনেক রকমের উপদ্রব করে; সে উপদ্রবের একটা সীমা আছে, অর্থাৎ ইন্দুরে মুখ চালায় তুলা ভরা লেপ তোষক এবং খাদ্য দ্রব্যে। কিন্তু ইহারা সময় সময় জ্যান্ত জীবন্ত মানুষের উপর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া বসে। বছর কয়েকের কথা, তখন আমি বরিশালের অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে আমার মাতুলের বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে একদিন রাত্রি শেষে উঠিয়া দেখি আমার ডান হাতের কোড়ে আঙ্গুলের ডগা জ্বালা করিতেছে এবং তাহার উপরকার চামড়াটা অল্প কোরানো। আমি এবিষয় দিদিমার কাছে প্রশ্ন করায় টের পাইলাম রাত্রিতে তেলাচোরা আমার অঙ্গুলের উপর মুখ চালাইয়াছে। তেলাচোরার এই কাণ্ড আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকিলেও, দেখিলাম সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে উহা কিছুই নূতন ঠেকিলনা। সুতরাং ইহাদের দৌরাত্ম্য কতদূর পর্য্যন্ত চলে তাহা বিশেষ বুঝিতে পারা গেল। নোয়াখালি অঞ্চলে, শুনিতে পাই ইহাদের "তেলাচাটা" বলা হয়। তেল চাটিয়া সাবাড় করায় ইহাদের কৃতিত্বের পরিচয় অনেক বার পাইয়াছি; বিশেষ ভাবে শীতকালের জমাট নারিকেল তেলচাটায় ইহারা বিশেষ পটু। এইতো গেল তেলাপোকার সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এইবার অন্য পরিচয় দেওয়া যাক।

সাধারণতঃ তেলাপোকা দুই জাতীয়। এক জাতীয় অত্যন্ত ছোট—অনেকটা যেন ছোট প্রজাপতির মত। ইহাদের সহিত পরিচয় ঘটে পুঁথির স্তূপে কিম্বা কৌটার মধ্যে অনেক দিনের পুরাণ মসলার আবর্জ্জনায়। ইহারাও রাত্রিকালে কাজে কর্ম্মে বাহির হয় দিনের বেলায় আড়ালে আবডালে বসিয়া চুপটি করিয়া নাতিদীর্ঘ দুইটি গুম্ফ সোজা করিয়া অল্পে অল্পে নড়ে। ইহাদের বর্ণ ফ্যাকাশে-বাদামী।

আর এক শ্রেণীর তেলাপোকা (অর্থাৎ সচরাচর যাহা আমাদের নজরে পড়ে) বড়। ইহাদের বর্ণ গাঢ় বাদামী। দৈর্ঘ্যে ইহারা সাধারণতঃ দেড় ইঞ্চি সময় সময় দুই একটি দুই ইঞ্চিও, দীর্ঘ হয়। ইহারা পক্ষবিশিষ্ট হইলেও উড়িয়া বেড়াইতে সহজে পারে না ছোট জাতীয় তেলাপোকাব মধ্যে যাহাদের বর্ণ তুলনায় অপেক্ষাকৃত ফিকে এবং যাহাদের পেটের তল ঈষৎ লালচে তাহারাই স্ত্রী জাতীয়।

বড় জাতীয় তেলাপোকার মধ্যে সাধারণতঃ যে সব তেলাপোকা প্রত্যহই আমাদের নজরে পড়ে তাহারাই পুরুষ। স্ত্রী-জাতীয় বড় তেলাপোকা বেশীর ভাগ অন্ধকারে বাক্সের তলে কিম্বা ভিতরে কাপড়ের নীচে অথবা আবর্জ্জনার আড়ালে থাকে। ইহাদেরও দেহের গঠন পুরুষদের তুলনায় একটু চৌকা (অর্থাৎ লম্বা-ধরণের নয়) পাখনা খুব ছোট—ছোট বলিয়াই একটুও উড়িতে পারেনা। পুরুষ তেলাপোকার পাখনা চারিটি একটু বড় থাকায় উহারা সময় সময় আত্মরক্ষার জন্য এঘর হইতে ওঘর (অর্থাৎ একটানে পনের ষোল গজ পর্য্যন্ত) উড়িয়া যাইতে পারে। আত্মরক্ষায় পুরুষদের তুলনায় স্ত্রী-জাতীয় তেলাপোকারা অপেক্ষাকৃত অপটু হওয়ায় পুরুষদের মতন যখন তখন মানুষ কিম্বা অনিষ্টকারী অন্য জীবের সম্মুখে বাহির হয়না। স্ত্রী-জাতীয় তেলাপোকার দেহের বর্ণ বাদামী নহে—কতকটা কৃষ্ণ-বেগুনের রঙের মত। ইহাদের দেহের বর্ণে আবার থাকে থাকে শাদায় কালোয় মিশান বিচিত্র বর্ণ বিন্দুর কয়েকটি অর্দ্ধ গোলাকার খাঁচ আছে খাঁচের পাশে পাশে খুব ছোট ছোট রোঁয়া আছে।

সাধারণ ভাবে তেলাপোকার অঙ্গকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম মস্তক ও মুখ, দ্বিতীয় স্কন্ধ ও বুক, তৃতীয় পেট, চতুর্থ পুচ্ছাংশ। প্রথম তিনটি অংশের এক একদিকে তিনটি করিয়া দুইদিকে ছয়টি পা এই ছয়টী পায়ের গায়ে করাতের দাঁতের মত তীক্ষ্ণ কয়েকটি করিয়া কাঁটা আছে। ইহার সাহায্যে তেলাপোকা সহজে লম্বিত বস্তুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখে। পুচ্ছাংশে দুইপাশে দুইটি ছোট কাঁটাব মত আছে। দেখিয়াছি এই কাঁটার সাহায্যে ইহারা ডিমের থলিয়াকে সোজা করিয়া ধরিয়া রাখে। পুরুষ তেলাপোকার পেট লম্বা গঠনের—স্ত্রী-জাতির চ্যাপটাধরণের। বোলতা কিম্বা প্রজাপতির দেহ যেমন কয়েকটি চক্রখণ্ডে পরস্পর গ্রথিত ইহাদের ঠিক তেমনি না হইলেও অনেকটা সেই রকম। পুরুষ জাতীয় তেলাপোকার পাখনার গড়নও স্ত্রী জাতির পাখনার গড়নের চেয়ে স্বতন্ত্র।

কয়েকটি স্ত্রী-জাতীয় তেলাপোকা ধরিয়া তাহাদের একটি ধানের পুরাতন জালায় কিছু ধানের তুসের মধ্যে রাখিলে কিছু দিন পরে দেখা যায় যে কয়েকটি স্ত্রী-তেলাপোকার পুচ্ছাংশের নীচে একটি অতি ছোট (মণি-ব্যাগের গড়নের মত) ডিম্ব থলিয়া লাগিয়া আছে। স্ত্রী-তেলাপোকা কয়েকদিন ঐ থলিয়াটি লইয়াই স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘোরা ফেরা করে। ক্রমশঃ থলিয়াটি একটু বড় (তেঁতুলের বিচির মত) এবং ঘন বাদামী বর্ণের হইলে স্ত্রী তেলাপোকা উহাকে কোন একটি লম্বমান বস্তুতে আঁটিয়া দেয়। এই থলিয়াব মধ্যে অনেক গুলি ছোট ডিম্ব থাকে। কয়েকদিন পরে একদিন হঠাৎ তন্মধ্য হইতে ক'একটি ছোট ছোট পোকা বাহির হইয়া পড়ে।

শিশু অবস্থা হইতে বৃদ্ধ অবস্থা পর্য্যন্ত পৌছিতে যে সময় লয় সেই সময়ের মধ্যে ইহারা বহুবার দেহের (পাখনা এবং পদ, সবটারই অঙ্গ লইয়া) চর্ম্ম পরিত্যাগ করে। চর্ম্ম পরিত্যাগের অব্যবহিত পরে ইহাদের দেখিলে মনে হয় যেন একটি অতি শুভ্র ভীমরুলের বাচ্চা মাটিতে পড়িয়া আছে, চর্ম্ম পরিবর্ত্তনের পর কয়েক ঘণ্টা ঐ রকম অবস্থায় পোকাটি অত্যন্ত কাতর থাকে তার পর আস্তে আস্তে চলা ফেরা সুরু করে এবং ঠিক বর্ণ ফিরিয়া পায়। ইহাদের সম্বন্ধে আরও যৎকিঞ্চিৎ বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—o—

শ্বশ্রূ

[শ্রীএককড়ি দে]

অমরনাথের স্ত্রী বিষ্ণুদাসী খিড়কি দিয়া বাড়ীর উঠানে আসিতেই অমরনাথের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। অমরনাথ সস্নেহে শুধাইলেন, "কোথায় গমন হয়েছিল?" সম্পূর্ণ অপ্রতিভ ভাবেই বউ বলিল—এই কায়েত কাকার বাড়ী। এই দুইটী পরিবার নিতান্ত পাশাপাশি বাস করাতে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, সুতরাং অমরনাথ আর কিছু বলিলেন না।

রৌদ্রের সোনালি রঙ টুকু ঘরের কালো মেঝে ও সুমার্জ্জিত গৃহসজ্জায় উপর পড়িয়া বহিয়াছে—বিষ্ণুদাসী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ও হাতছানি দিয়া ডাকিল—"শোন।" এইরূপ ডাকাডাকি অবিশ্রান্ত চলে, সুতরাং বিনা আগ্রহে অমরনাথ ঘরে গিয়া তক্তাপোষের বিছানায় বসিলে বউ অমরনাথের কাছেই বিছানায় দুই কুনুই রাখিয়া বলিল, "দেখ আচার্য্য মশাই এসেছিলেন তাই গিয়েছিলাম।"

"আচার্য্য কে? আনন্দপুরের?"

"হাঁ—বেশ লোক, আমাকে ক্ষেপা মা বলে।"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তা হলে, দেখছি, লোকটার ধাতজ্ঞান আছে।"

"আমি বুঝি ক্ষেপা? আমাকে বল্লে, মা তোমার সব লক্ষণ ভাল। এখনো তোমার দুটী ফল আছে। ভালো ফল। আচ্ছা, ছেলে না হলে তুমি আমায় ভালবাসতে? আবার বিয়ে করতে?"—বলিয়াই বিষ্ণুদাসী অমরনাথের গাল টিপিয়া দিল। অমরনাথ অল্প হাসিতে লাগিলেন—"কবচ টবচ নিলে নাকি? আচ্ছা বউ, ওরা কি ক'রে জানবে যে তোমার ফল আছে? কোন জ্ঞান নেই—নিরক্ষর, কি আচার্য্য?"

"ঐ তোমার কেমন? তুমি কিছু বিশ্বাস করতে চাও না, না গো না ওঁরা সব জানতে পারেন।"

অমরনাথ উঠিয়া বলিলেন—"তা আচ্ছা, এখনকার একবার পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"সেত আসবে, সেই দুপুর বেলা?"

"তাত জান, ছাড়তে চান না, আহা বুড়া মানুষ, সঙ্গী পান না, আমারও উচিত যাওয়া।"

"তা যাও—তবে আপনি একটু জল খেয়ে যান্।"

বউ অধিক আদর করিতে হইলে, শুধু খপ্ করে, আপনি তা বলিয়া ফেলিত।

"তা বরং দাও"—বলিয়া অমরনাথ খাইতে বসিল।

"তুমি যাও বাপু, আমি আমার কাজগুলা সেরে নিই, তুমি বাড়ী থাকলে, কাজে আমার মন লাগে না।"

"অমর বলিল," তোমার কোন হুঁস্ নেই, কি যে বল? বউ সে কথায় কান দিল না, তখন সে কাজে হাত দিয়াছে।"

রৌদ্রের বর্ণ শাদা হইয়াছে স্নিগ্ধতা যেন কোথাও নাই, বিবর্ণ প্রকৃতির মুখে অস্বস্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট—অমরনাথ দ্রুত বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বউয়ের মুখের ভাব হালকা নাই, খুব ভারী হইয়াছে। এইরূপ মুখের ভাবের সঙ্গে অমরনাথের যথেষ্ট পরিচয় আছে, এবং ইহাকে সে ভয়ও করে, কারণ এই মুখের ভাবে অনেক অকাজ ঘটিয়াছে—ছেলে মারা, ঘরের দ্রব্যাদি ভাঙ্গা গহনা ভাঙ্গা ইত্যাদি। অমর এ অবস্থায় বড় অস্বস্তি বোধ করিত! অমরনাথও বিরক্ত হইয়া স্নান করিল না এবং বামুনঠাকুর ভাত শুকাইতেছে খবর দিলে, শরীর ভাল নাই বলিয়া অমরনাথ পাশ ফিরিয়া শুইল। বউয়ের রাগ পড়িল না, প্রচণ্ডবেগে দেরাজ,—আলমারি খোলা দেওয়া চলিতে লাগিল, আমার কোন সুখ নাই, মা নাই, বাপ নাই যে দুঃখের কথা বলি। অনেক তপস্যা করিলে তবে অমন স্বামী পাওয়া যায়, কিন্তু যে আমার মন্দ করবে তার সর্ব্বনাশ হবে হবে—কাহারও বাসায় মরিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে ঘর

হইতে বাহির হইবার কালে মুখে পরদার কাপড়টা লাগাতে বিষ্ণুদাসী তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তুমি খাবে না খেয়ে কেন তুমি আমার রাগ বাড়াচ্চ? অমরনাথ ভয়ে বলেন, আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়, ভুল করে হ'ক ঠিক ক'রে হ'ক, উহার কষ্টত হইতেছে।

অমরনাথ উঠিল, মিনিট দশেক পাছু পাছু ঘুরিলে বউ ঘরে যাইয়া ডাকিল "একবার আসুন।" অমরনাথ আসিয়া দাড়াইল। বিষ্ণুদাসী হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—"দেখ, তুমি কোথাও গেলে আমার ভাল লাগে না।"

"ছিঃ, এতে আমার বড় কষ্ট হয়, কষ্ট নয় অনিষ্ট হয়। আমার সম্বন্ধের তোমার বিশ্বাসটা ত ভুল—ভুলের উপর তোমার এত সত্য ধারণা, তাই তোমার পূজা অর্চ্চনাতেও সন্দেহ হয়"—বধূ না বুঝুক, অমরনাথ স্নেহময় কথা গুলা বলিয়া গেলেন।

"তা হ'ক, তুমি এখন খাবে এস।"

"নাঃ নাঃ, কখন কি কিছু"—কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই অপ্রতিভ ভাবে বিষ্ণুদাসী খাইতে যাইবার জন্য অমরনাথকে ঠেলিতে লাগিল ও শুধু বলিল "দেখ তুমি খুব ভাল কিন্তু তুমি ত জান তোমার এর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল, সে বিধবা হয়েছে। তুমি রাস্তা হাঁট, রাস্তা যেন আলো হয়।"

অমরনাথ কি বলিতে যাইতেছিল, বউ হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—"তা হ'ক চল, খাবে চল।"

সেদিনকার মত আপোস হইয়া গেল, কিন্তু ইহা উহাদের নিত্য ঘটনা।

অমরনাথ ও বিষ্ণুদাসী ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন—অমরনাথ ভাবিত তা থাক্‌, ও যাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে, তাই নিয়ে থাক। আবার কখন কখন স্বামী স্ত্রীর ধর্ম্মমত এক নয় বলিয়া সন্তপ্তও হইত। বিষ্ণুদাসী বড় একগুঁয়ে। অমরনাথ পত্নীর এই ভাবটাকে পরের কাছে উনি খুব জেদাল ইত্যাদি বলে সুখ্যাতি করিত, আবার যখন বিষ্ণুর জিদ তাহাকে ডিঙ্গাইয়া যাইত, তখন ক্ষুন্নও হইত।

একদিন বিষ্ণুদাসীর জ্বর হইয়াছে। জ্বরটা ছাড়িল না। তিন চারি দিন রহিল। অমরনাথ দেখিল শুধু জ্বর, কোন ভয় নাই, হিসাব মত ছয় দিনের দিন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে, সুতরাং চিকিৎসার ভার গ্রামের ডাক্তারের উপরই রহিল, জ্বরে মাথাব্যথা থাকেই বিষ্ণুর মাথায় বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস হইল মাথায় ঘা হইয়াছে, ঘায়ে পোকা হইয়াছে সেই যাতনা। সে অমরনাথকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, "তুমি সহর থেকে সাহেব ডাক্তার আনিয়া আমায় দেখাও।" অমরনাথ অনেক বুঝাইল ও কিছু নয়, মাত্র জ্বরের দরুন মাথায় যাতনা, কিন্তু সে কথা কে বুঝে? মিছামিছি কতকগুলি টাকা দিয়ে সহর থেকে ডাক্তার আনায় বাজে খরচ করিবার মত অমরনাথের স্বচ্ছল অবস্থা নয় বলিয়া অমরনাথ উদাসীন থাকিল। কিন্তু বিষ্ণুদাসী ক্রমশই বেশী উতলা হইতে লাগিল—জ্বরাবস্থায় অত মনশ্চাঞ্চল্য ভাল নয় বুঝিয়া অমরনাথ ভগিনীপতিকে নিজের অসুখ বলিয়া টেলিগ্রাম করিল। বৃন্দাবন ছুটিয়া আসিল—রাস্তাতেই অমরনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ—বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?" অমরনাথ সকল কথা খুলিয়া বলিল। বৃন্দাবন বলিল "আচ্ছা, আমি থামাইয়া দিতেছি।" বাস্তবিকই বৃন্দাবনের কথায় বিষ্ণুদাসীর বোধ হইল যে সেটা জ্বরের দরুণই বটে। জ্বর যথাকালে সারিয়া গেলে, অমরনাথ মুখ ভারি করিয়া বলিল—"আমার কথায় বিশ্বাস হল না ত?" বিষ্ণুদাসী তাহার কোলে নিজের মাথা তুলিয়া দিয়া শুইয়া শুইয়াই বলিল, "আমার নিজের মনে বিশ্বাস হতেছিল কই, একজন পর লোকে বলাতে তবে ত বিশ্বাস হল।" অমরনাথের আলাহিদা মত হইতে পারে না বিষ্ণুদাসীর এই আমিত্ব অমরনাথ ভালবাসিতেন না—তিনি স্ত্রীর মাথার চুলগুলো আঙ্গুল দিয়া চিরিয়া দিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুদাসী, সে যে বড় একগুঁয়ে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু মোহনপুরের পঞ্চাননের মানতী ছেলে,

ঠাকুরের কাছে তাহার চুল দিবার কথা ছিল দেওয়া হয় নাই। এখন তাহার মনে হইল, ঠাকুরের মানতী চুল দিলেই তাহার একগুঁয়েপনা যাইবে, তাহা হইলে সে আর কাহাকেও জ্বালাতন করিবে না। সে সুর ধরিল আমি একবার কাকার বাড়ী দিয়া বেড়াইয়া আসিব। অমরনাথ স্ত্রীকে জানিত; দুই একবার আপত্তি করিয়া পাঠাইয়া দিল। বিষ্ণুদাসীর পিত্রালয়ে মোহনপুরের নিকটে। বিষ্ণু ৭ দিনের কড়ারে রওনা হইল। অমরনাথ একটু স্ত্রীর শাসনে থাকিত। অমরনাথ ভাবিত পুরুষ-সিংহপনা করিতে গিয়া একটা অত্যাহিতঘটানর চেয়ে স্ত্রৈণ অপবাদ ভাল। বিষ্ণুদাসী চলিয়া গেলে প্রথম প্রথম অমরনাথ স্বস্তিবোধ করিল। কোথাও যাইয়া কতক্ষণ আসিয়াছে সদাই মনে করিতে হইত না, বাড়ীতে এতক্ষণ আ গুণ লাগিয়া গিয়াছে মনে করিয়া আলাপ করিতে করিতে রসভঙ্গ করিয়া মাঝখানে পলায়ন করিতে হইত না। গ্রামের সকলেই অমরনাথকে শ্রদ্ধা করে, এতদিন অমরনাথ অল্প সময়ের অবসরে কোনরূপে তাহাদের শ্রদ্ধা বাচাইয়া বাঁচাইয়া চলিতেছিল—এখন তাহাদের জন্য কি কি করিতে হইবে, সব খোঁজ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু ভিতর বাড়ীতে প্রবেশকালে বাড়ীটাকে উলঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—যেন সে জমাট নাই নাওয়া খাওয়ার অনিয়ম হইতে লাগিল, সাধ করিয়া একটা বাজাইয়া সে সব কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে লাগিল।

সাতদিন বিষ্ণুদাসীর সবুর সহিল না। ৫ দিনের সন্ধ্যা কালেই সে ফিরিয়া আসিল। অমরনাথ শুধাইলেন, "এত শীঘ্র যে ফিরিলে? বিষ্ণুদাসী বলিল কাজ হইয়া গেল"—অমরনাথ তাড়াতাড়ি শুধাইলেন "কাজ কি?"

"দেখ তোমায় বলি নাই, তুমি নিষেধ করবে বলে, তুমি নিষেধ কবার পর যাইলেত ফল হইত না—আমি ঠাকুর তলায় গিয়াছিলাম, আমার অপরাধ লইও না। ছেলেবেলা হতে আমার মোহনপুরের ঠাকুরের দোরে চুল মানত ছিল তাই ঘাড়ের দু গাছি চুল দিয়া ভূত নামাইয়া আসিলাম।" অপরাধীর মত অল্প হাসিয়া বলিতে লাগিল, "দেখো আমি আর তোমায় জ্বালাতন করিব না" অমরনাথ মনে করিলেন, মন্দ নয়, যদি এ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে চুল না দেওয়ার জন্যই রাগ হইত, এখন আর রাগ করিতে নাই, তবে আর বোধ হয় অনর্থক উৎপাত করিবে না। অমরনাথ আশ্বস্ত ভাবে শুধাইলেন, "খরচে কুলাইল,ত?" বিষ্ণুদাসী সঙ্কুচিত হইয়া বলিল "তা কি করে কুলাবে? অনেকগুলা টাকা কাকীর কাছে ধার করেছি।" ইহাতে অমরনাথ যথার্থই বিরক্ত হইল—বলিল, "আমি এতবড় মানুষ নই যে তুমি ওরকম ভাবে টাকা খরচ করে আমার জিভ বাহির করব" বিষ্ণুদাসী খুব সরলভাবে সহজ কথায় বলিল "দেখ হেঁটেই যেতাম, ৫।৬ ক্রোশ রাস্তা? গেলেই ভাল হত।" টাকা খরচ হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীর এই বিষম সঙ্কুচিতভাব দেখিয়া অমরনাথ ব্যথিত হইলেন, করুণস্বরে বলিলেন, "আমি কি তোমায় হাঁটতে বলেছি। পরেও থেকে থেকে অমরনাথের কেবলি মনে হইতে লাগিল, ভাগ্যে অনাথার মত হাঁটে নাই, বাপ্‌রে।"

অমরনাথের ছেলে মেয়েগুলি প্রায় আদুল গায়ে হিমভোগ করিত। সে দিকে বিষ্ণুদাসীর লক্ষ্য ছিল না। ইহা লইয়া অমরনাথ বলিতে গেলে বিষ্ণু খুব নির্ভরতার সহিত উত্তর করিত, কপালে থাকে, অসুখ করবে। অমরনাথ বলিত কপালের উপর একটা জামা চড়াইয়া দিলে, কপালের ত আর হাঁপ লাগিবে না। দুজনে বাদানুবাদ চলিত, কিন্তু ফলে ছেলেরা আদুল গায়েই থাকিত।

অমরনাথের একবার পীড়া হইল, পীড়া কঠিন, রীতিমত চিকিৎসা হইতে লাগিলেও বাড়ীর সকলে বিষম চিন্তিত কেবল বিষ্ণুদাসী প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই আছে। সে যে মানত করিয়াছে উনি ভাল হইলে দুই জনে বাবা তারকেশ্বরের কাছে যাইয়া পঞ্চপ্রণাম খাটিবে আরও সব কি কি করিবে। আর বুঝি, ভোরের বেলা, সে স্বপ্নও দেখিয়াছে যে কে যেন বুড়াবামুন তাহাকে বলিতেছেন, "তোর ভয় কি, ভাল হবে।" তবে আর মারে কে?

অমরনাথ এই সবগুলিই আশঙ্কা করিয়া স্ত্রীকে মেসায় বলিতেন—"দেখ, বিপদে আপদে দুরের ঠাকুরের মানত না করিয়া বাড়ীতে ত বিষ্ণু আছেন, তাঁকেই জানাইও, নইলে ঘরের ছেলে না খেলে, পরের ছেলের পেট ভরাইয়া

লাভ কি হইবে। বিষ্ণু এ কথাটা যে মানিত না, তা নয়, কিন্তু সে যে দেখে, মুড়ি ও চালের পুটুলি বাঁধিয়া সবলোক ঠাকুর তলায় ছুটে?

অমরনাথ সুস্থ হইল। কিছুদিন গেল। তখন বিষ্ণু-দাসী বায়না ধরিল যে এই মাঘমাসে তারকেশ্বর যাইতে হইবে, অমরনাথ বলিল, "এখন বড় হিম, তুমিত সব ছেলে-গুলিকেই লইয়া যাইবে, কিছুদিন যাক্।" বিষ্ণুর তাহাতে রাগ, বলে "হিমে কিছু হবে না, বাবার তলায় যাইলে কি অসুখ হয়?"

অমরনাথ দেখিলেন চুল দেওয়া বুঝি বৃথা হইয়াছে—সেই আমিত্ব। ঠাকুর তলার সম্বন্ধেও যে বলে, "তুমি নিষেধ করলে, ফল হত না!"

অমরনাথ লোকজন লইয়া স্ত্রীকে তারকেশ্বর লইয়া গেলেন। সেখানে পৌছিয়া দিয়া বিশেষ কাজ আছে বলিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। পঞ্চপ্রণাম খাটা উপবাস করা, এ সব দেখিতে তাহার বড় মায়া হইত। কাজ আছে শুনিয়া বিষ্ণু বিশেষ আপত্তি করিল না, দুই জনে ঠাকুরতলায় ত আসিয়াছে। বিষ্ণুদাসী পরদিন ফিরিল। অমরনাথের দুইদিন বিলম্ব ঘটিল। বাড়ী আসিয়া তিনি দেখিলেন তাঁহার একটী কন্যার জ্বর বিষম সর্দ্দি কাশি, বড় ভয় হইল। বিষ্ণুও উন্মনা হইয়াছে দেখিয়া অমরনাথ তাহাকে হিম লাগাইয়া দোষ করিয়াছে, ইত্যাদি কথা কিছু বলিলেন না। চিকিৎসার ত্রুটী হইল না, কিন্তু মেয়েটী মারা গেল। অমরনাথ দেখিলেন, স্ত্রীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়, অনবরত বিড় বিড়্ করিয়া বলে "হিম লাগালাম, হিম লাগালাম।"

* * * *

ইহাদের মাঝের ফাঁক টুকু কন্যাটীর মৃতদেহ ভরাট করিয়া দিয়াছিল।

ক্রন্দন

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ]

শান্ত শীতল বইছে হাওয়া
মৌন মধু সাঁজ,
নিশার ছায়া আস্‌ছে নেমে
জম্বু বন মাঝ।

শ্যামল তৃণে সটান শুয়ে
একটা বড় সাপ,
সেবন করে শীতল বায়ু
গর্ত্তে বড় তাপ।

পার্শ্বে তাহার ছাগল চরে
পায়না কিছু ডর
শৃগাল ত তার পড়শী নিকট
এক পাড়াতেই ঘর।

ক্ষণেক তরে হিংসা ও দ্বেষ
ভুলে তাহার প্রাণ,
করতে চাহে আজকে সাঁজের
আনন্দটী পান।

কোথায় তুজন কৃষাণ ছিল
দেখতে পেয়ে তায়,
দূরে থেকেই ঢিলের রাশি,
ছুড়তে লাগে গায়।

অসন্তোষ ও বিরক্তিতে
সাপটী ঢোকে ঘর,
বললে যেন তীক্ষ্ম চোখের
চাউনি খরতর,

"যদিই আমি ভুলতে পারি
হিংসা ব্যবসায়
ভুলতে ওরা দেবেই না যে
কোন ক্রমে তায়।

মানুষ ওরা ভীরুর ভীরু
ক্রূরের চেয়ে ক্রূর,
ওদের মত হতে আমার
জন্মশতেক দূর।"

—o—

অমলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী নিরুপমা দেবী]

(৬)

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই চারিবৎসরে আমাদের পরিচিত নবনারী কয়টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-ঘটনা আর কিছু ঘটে নাই। রমেন এখন একটি রীতিমত দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবক হইয়াছে। গ্রাম্য-স্কুলের পড়া তার অনেক দিনই শেষ হইয়াছিল। এখন সে নিজের চাষবাস ক্ষেত খামার তত্ত্বাবধানের অবসরে গ্রামের যত অকাজের কাজ কুড়াইয়া বেড়ায়, এবং সেইজন্যই যে নিজের তেমন শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিল না—ইহাও অনেকে বলিয়া থাকে। "ওসব ডাংপিটে কাজ কর্‌লে কি ঘরকন্নায় মন বসে"—অনেক গৃহিণী রমেনের মাকে এরূপ উপদেশ দিয়াও থাকে। "যত বারোয়ারী কাজ, কোথায় কার কি হল, কে কোথায় মর্‌ছে কাকে গঙ্গা দিতে হবে সবেতেই তোমার রমেনের ছুটোছুটি। কেনরে বাপু অত বাড়াবাড়ি কেন। নিজের শ্রীবৃদ্ধি কর বিয়ে থা কর্‌-তা নয়। বিয়ের কথা বল্‌লেই বল্‌বে খাওয়াব কি? বিয়ে কি করলেই হল"—আরে বাপু তা কে না জানে, কিন্তু তোর চেয়েও যার অবস্থা খারাপ সেও তো বিয়ে থা' করে গুছিয়ে ঘরকন্না কর্‌ছে? আর তুই যেন দিন দিন ডাংপিটে হয়ে যাচ্ছিস্?" উদ্দেশে রমেনের উপর যখন গ্রামের বর্ষিয়সীরা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন তখন রমেনের মা বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিতেন এইবার নিশ্চয়ই তিনি ছেলের বিবাহ দিবেন। কিন্তু তাহার পরে ছেলের সামনে কথা পাড়িয়া আবার তাঁহার সংকল্প বিচলিত হইয়া যাইত। ছেলে যে কি মন্ত্রে তাঁহাকে ভুলাইয়া দিত বলা যায় না।

ভিতরে একটা কথাও ছিল। ছেলে দু তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে তীর্থ করিতে তাঁহাকে লুকাইয়াই চলিয়া গিয়াছিল। কোন তীর্থে নাকি কোন্ সাধু রমেনের হাত দেখিয়া বলিয়াছিল "বিবাহ করিলে মঙ্গল হইবে না!"

সে অমঙ্গল পাছে বিধবার পুত্রের জীবনটির উপরই নির্ভর করে এই ভয়ে মাতাও পুত্রের বিবাহের তত চেষ্টা করিতেন না। অন্য লোককে একথা বলিতে সেই সাধুর বা পুত্রের নিষেধ ছিল, তিনিও বলিতে ইচ্ছুক ছিলেন না—কিন্তু সময়ে সময়ে প্রতিবাসিনীদের বাক্যচ্ছটায় সাধুর কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেন। আবার সে কথা তাঁহার মনে পড়াইয়া দিলে তবে তিনি নিরস্ত হইতেন।

বালিকা অমলাও এখন আর বালিকা নাই। সে সেই না সধবা না বিধবা না কুমারী অবস্থায় খুড়া-খুড়ির ঘরেই আছে। সেই সংবাদ প্রচার হওয়ার পর তাহাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহেও নাই, খুড়াখুড়িও সে সাহস বা ইচ্ছা করেন নাই। বাহ্যিক একখানা সাড়ী ও হাতে গাছকতক কাচের চুড়ি ব্যবহার করিলেও মেয়েটি যে একরকম বিধবা দলেরই অন্তর্ভুক্ত তাহা সকলেই জানিত।

সেবারে গ্রামে ভীষণ মারীভয় চলিতেছিল। গৃহে গৃহে —কত দীপ অকালে নিভিয়া হাহাকার উঠিতেছিল। একদিন প্রভাতে গ্রামের জনকয়েক লোকের সঙ্গে রমেনও শ্মশানঘাটে এক হতভাগ্যের দেহটাকে ভস্মাবশেষ করিতে নিযুক্ত ছিল। মানুষের হাতে মানুষের যেটুকুর সব শেষভার সেটুকু যখন যথারীতি সম্পাদিত হইয়া চলিতেছে, প্রজ্জলিত চিতানলের দূরে বসিয়া জটলা করা ও তামাকু বা গাঁজার শ্রাদ্ধ করা ছাড়া যখন অন্য আর কাজ নাই (পাড়াগাঁয়ে মদের চলন নাই, এক আছে তাড়ি, তাহা ভদ্রলোকে খায়না। কাজেই গাঁজা ছাড়া কোন কোন "শ্মশান বন্ধুর" অন্য গতি নাই) তখন রমেন সেস্থান হইতে একটু দূরে নদীর ধারে ধারে যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। ললাটে তাহার চিন্তার রেখা নিকটে কেহ দর্শক থাকিলে সে যে অত্যন্ত অন্যমনস্ক তাহা সহজেই ধরিতে পারিত।

দর্শক একজন জুটিল। একটা অপরিচিত কণ্ঠে "মশায় শুনতে পাচ্ছেন, এটা কি মহেশপুর গ্রাম?" এইরূপ একটা জোর গলার আহ্বানে রমেন সচকিতে মুখ তুলিয়া চাহিল। এতক্ষণ সে নদীতীরের বালুকারাশিই পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটু একটু খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া সেই ছোট ছোট গর্ত্তগুলির ভিতরেই বোধহয় তাহার চিন্তাগুলিকে প্রোথিত করিতে চাহিতেছিল। এইবার আগন্তুকের পানে চাহিল বটে কিন্তু তখনো শীঘ্র উত্তর দিয়া উঠিতে পারিল না। আগন্তুকটি তাহার গ্রামে যে একবারেই আগন্তুক তাহা তাহার প্রশ্নেই বুঝা যায়। তা ছাড়া এরূপ হ্যাট্‌কোটধারী অথচ এমন সম্ভ্রমোৎপাদক মূর্ত্তি রমেন ইতিপূর্ব্বে বোধহয় খুবই কম দেখিয়াছে। এ নিজে বাংলা ভাষায় কথা না বলিলে হয়ত রমেন ইহাকে সাহেব বলিয়াই ভ্রম করিত।

সে আবার বিমূঢ়ের মতন চাহিয়া রহিল দেখিয়া লোকটি এইবার হাসিয়া ফেলিয়া একেবারে রমেনের কাঁধের উপর হাত রাখিল, "কি মশায়? সত্যই কি শুনতে পান্‌না,—কিন্তু চমকে উঠলেন যে দেখলাম? ঝাঁকানি দিয়েই উত্তর আদায় করব কি?"

আবার বিস্ময়ের একটা তরঙ্গ; একি হৃদ্যতা না অভদ্রতা? কিন্তু লোকটার মুখে চোখেতে হাসির সঙ্গে মোলায়েম স্নিগ্ধভাব। আর বয়সেও রমেনের চেয়ে খানিকটা বড় হইতে পারে মাত্র। কাঁধের উপর হাতখানা ঝাঁকানি না দিয়া কোমলভাবেই স্কন্ধকে স্পর্শ করিয়াছিল। রমেন দেখিল তার উত্তর দেওয়ার দেরী করিলে তাহারই অভদ্রতা হয়। একটু মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গেই রমেন প্রতি প্রশ্ন করিল।

"কি বল্‌ছেন?"

"এতক্ষণে এই উত্তর? নাঃ আপনি মশায় দেখ্‌ছি কালারও বাড়া। ওঃ—আপনারা শবদাহ কর্‌তে এসেছেন দেখ্‌ছি?"

"আপনি আমায় ছুঁয়েও ফেল্‌লেন? আমি দহন বহনকারীর মধ্যেরই একজন।"

"আর আমি তাদের চেয়েও অপকৃষ্ট কাজ করে তারই মধ্যে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত সেরে নিয়ে থাকি। এর জন্য আপনার সঙ্কোচের কিছুই নেই জানবেন।"

"সেকি? আপনি কি করেন—কোথায় থাকেন?"

মাথার হ্যাট্‌টা লোকটার হাতেই ছিল সেটা অন্য

হাতের উপরে একটু ঠুকিয়া একটু বেশী রকম হাসিতে হাসিতে লোকটি উত্তর দিল।

"ডাক্তারি করি আর কি! আমাদের অস্পৃশ্য কিছু আছে কি? মেথর মুর্দ্দাফরাস, যা খুসি আমাদের সবই বলতে পারেন।" সরল গ্রাম্য যুবক বিস্ময়ে সলজ্জে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "ছিছি এও কি একটা কথা? আপনি ডাক্তার আপনি তাহলে তো ভগবানের প্রতিরূপ, সর্ব্বদা স্বতঃশুদ্ধ। আপনারা মানুষের জীবন দাতা"

"এবং ধনের অপহর্ত্তা। তবে ব্রহ্মজ্ঞানটা আমাদের ভেতরে যত সহজে পাবেন তত বোধ হয় আপনাদের মুনিঋষিদের মধ্যেও দেখতে পান কিনা সন্দেহ। বিকারের বস্তু যখন জগতে আমাদের কিছুতেই নেই তখন আমরা একেবারে ব্রহ্মবই অনুরূপ। নয় কি?" কথাগুলা বলিয়া আগন্তুক হস্তের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা মুখে তুলিয়া ধরিয়া যেন নিজের হাসিটাই সামলাইয়া লইতে সজোরে তাহাতে গোটাকতক টান দিল। রমেনের ইহার আর উত্তর দিবার ইচ্ছা হইতেছিল না; এই সাহেব-বেশীর সঙ্গে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয়ে এবং এরূপ ব্যঙ্গ ভরা রহস্যালাপের তাহার সময়ও ছিল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল "ও সব কথা থাক্ আপনি—আপনি—আপনার—"

"আঃ—কিনাম কোথায় ধাম—এটুকুও জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারছেন না মশায়? আপনি দেখছি বেজায় লাজুক মানুষ। আমি আপনিই তবে সেটুকু বলছি শুনুন। নাম রাজেন্দ্র রায়, ধাম অনেক দূরে, নাম করলে চিনবেন না, পেশা তো জানতেই পেরেছেন।"

"এ গ্রামে কি আপনার পরিচিত কেউ আছেন?—"

"এই আপনি। আর কাউকে পরিচিত বলার সাহস রাখি না। এইবার আপনার মনে মনে এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই জাগছে যে এখানে তবে এসেছেন কেন? তারও উত্তর—আমার পেশা তো জেনেছেন, এ শ্রেণীর লোকেরা কোন নতুন জায়গায় কেন আসে তা অবশ্য না বললেও আন্দাজ করতে পারবেন।"

রমেনের বিস্ময় এখনো পূর্ণমাত্রায়ই রহিয়াছে। সে একটু ভাবিয়া মৃদু মৃদু যেন নিজ মনেই বলিল "প্রাক্টিসের জন্য? এই পাড়াগাঁয়?"

"হ্যাঁ মশায়! আজকাল সহরে আমাদের দলের এতই ভিড় যে অগত্যায়ই আমাদের পাড়াগাঁ খুঁজে নিতে হচ্ছে।"

"তাই কি খুঁজতে বেরিয়েছেন? ঘুরে ঐ বোটের মত নৌকা ঐখানিতেই বুঝি এসেছেন?"

তারপরে রমেন সহসা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "তা উপযুক্ত সময়েই এসেছেন কিন্তু। কলেরায় এখন এদিকের গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন যাচ্চে। অথচ হাতুড়ে গো-বৈদ্যের দু এক পান ওষুধ ছাড়া কারু পেটে একটু ওষুধও পড়ছে না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই আপনি এদিকে এসে পড়েছেন। হয়ত কতক লোক রক্ষা পেয়ে যাবে। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে তো এদিকে পাশকরা ডাক্তারই নেই।"

আগন্তুকও এইবার একটু গম্ভীরভাবে হাসিয়া বলিল "আপনি যে আমার কিছু না জেনেই অনেকখানি উঁচুপদ দিয়ে ফেল্লেন্ বন্ধু। ভগবান করুন তাই হোক্। যেন আমার বন্ধুর এই উচ্চ আশাটি সফল করতে আমি পারি।"

"তা পারবেন, আপনাকে দেখেই একথা আমার মনে হচ্চে।"

আগন্তুক এইবার একটিও উত্তর না দিয়া দ্বিগুণ স্নিগ্ধ কোমল মুখে রমেনের হাতটা ধরিয়া এমনভাবে একবার একটু নাড়িয়া দিল যে রমেনের বিস্ময়ের স্থানটা একটা গূঢ় আনন্দ আসিয়াই অধিকার করিয়া ফেলিল। লোকটা এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন মনের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িতেছে।

সত্যই সে যেন রমেনের কতকালের পরিচিত। অথচ তাহার মহিমা-সুন্দর দীর্ঘায়ত সুগঠিত দেহে ও বেশভূষায় তাহার মার্জ্জিত সুন্দর কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে, তাহাকে উচ্চতর সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে রমেনের একটুও দেরী লাগে নাই। তবুতো সঙ্কোচ আসিতেছে না। প্রথম আলাপেই লোকটার নূতন ধরণের অসঙ্কোচ অমায়িকতা রমেনের কেমন যে ভাল লাগিয়াছিল, তাহায়

পরেই তাহার এই বন্ধু বলিয়া সম্বোধন এই হৃদ্য সুন্দরভঙ্গী এ যেন আরও মধুর।

দূর হইতে রমেনের সহযাত্রী কেহ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল "এসহে, স্নান করে নাও।" 'যাই' বলিয়া উত্তর দিয়া রমেন তাহার এই নব-লব্ধ বন্ধুটির দিকে চাহিবামাত্র সে তেমনি সুন্দর হাসি হাসি ভঙ্গীতে মাথা হেলাইয়া বলিল "আসুন তবে। আমার বন্ধুটির নাম তবে রমেন কি?"

রমেন সলজ্জ হাস্যে বলিল "মিত্র!" "আচ্ছা—যাঁর সংকার করলেন আশাকরি তিনি আপনার গ্রামবাসীই মাত্র কেউ হবেন,—না?"

দেখিতে দেখিতে রমেনের মুখে একটা নীল আভা জাগিয়া ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। এই আগন্তুকের আগমনে তাহার সহিত কথাবার্তায় কি যেন একটা সে ভুলিয়াছিল এই প্রশ্নে তাহা জাগিয়া উঠিয়া ব্যথায় তাহার অন্তরবাহ্য ভরিয়া তুলিল। সে মৃদু স্বরে বলিল 'হ্যাঁ—না—এই গ্রাম্য সুবাদই বটে।'

ডাক্তার রাজেন্দ্র রায় রমেনের মুখের দিকে একটু অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া বলিল "এঁর নামটি—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"৺রতনচন্দ্র বসু।"

"৺রতনচন্দ্র বসু? মশায় এটা মহেশপুর গ্রামই কি?"

"হ্যাঁ? কেন—আপনি কি তবে তাঁকে চিনতেন?"

"না—তার নামটা শুনেছিলাম। ইনিও কি এই কলেরাতেই মারা গেলেন?"

"হ্যাঁ—এখন প্রায় এইতেই বেশী লোক যাচ্চে। ইনি ঘণ্টাকতকের মধ্যেই মারা গেছেন" বলিতে বলিতে রমেনের স্বর যেন গাঢ় হইয়া আসিল। নিজের আরক্তিম মুখখানা সে সহসা অন্যদিকে ফিরাইয়া ফেলিল। রাজেন্দ্র রায় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যেন অন্যমনস্কের মত বলিলেন—

"আপনি তাঁর আপনার কেউ নন বললেন,—কিন্তু এ গ্রামের সকলে বোধহয় পরস্পরের প্রতি একটু অসাধারণ সহানুভূতিশীল। আপনারা অনেকেই তো এসেছেন। আপনার তো বেশ আঘাতই লেগেছে বলে মনে হচ্চে এ ঘটনায়। এ গ্রামটা তাহলে অন্যান্য পাড়াগাঁয়ের মত নয়।"

"এখন যে এবিপদ সকলেরই ঘরে ঘরে। নৈলে আমাদের গ্রাম যে এমন কিছু অসাধারণ তা বলে আপনার মনে একটা ভুল ধারণা ধরিয়ে দিতে ইচ্ছা করি না। কেননা আপনি যখন এখানে বাস করাই স্থির করছেন। আমরাও সাধারণ গ্রাম্যলোক বলেই জানবেন।"

"কিন্তু আপনিও রমেন বাবু কি মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে নিজেকে তাই বলতে চান? এটুকুও আমায় ভুল বোঝানো হবেনা কি?"

এইক্ষণ পরিচিতের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকটে লজ্জিত হইয়া রমেন মৃদুস্বরে বলিল—

"আমি ওঁদের স্বজাতী আর বাড়ীর কাছে বাড়ী বলে ওঁদের অনেকটা সুখ দুঃখেও জড়িত, তাই আমায় হয়ত একটু চিন্তিত দেখছেন। যিনি গেলেন তিনি তো গেলেন, কিন্তু বাকি যারা রৈল তাদের অবস্থা বড় শোচনীয়ই হবে।"

"কেন এঁর কি উপযুক্ত পুত্র কি অন্য কোন আত্মীয়স্বজন নেই? কে কে আছেন এঁর?

"এঁর স্ত্রী, শাশুড়ী, ছোট দুটি ছেলে মেয়ে, অনাথা ভাইঝি, এঁদের দেখবার আর কেউই নেই, অবস্থাও এমন কিছু নয় যে পুরুষের অবর্ত্তমানেও তাতে ভালরূপে চলবে।—আমায় ওঁরা ডাকাডাকি করছেন। আমি তবে আসি?"

ডাক্তার মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। রমেন ফিরিতে ফিরিতে আবার ডাক্তারের পানে চাহিয়া বলিল "কিন্তু আপনি এ গ্রামে কারুকে চেনেন্ না বলছেন, নতুন এসেছেন, আপনার—"

বাধা দিয়া ডাক্তার—"বোটেতেই আমার সমস্ত ব্যবস্থা আছে আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না, আসুন" বলিয়া বিদায়-নমস্কারের ভাবে দুই হাত তুলিয়া নত মস্তকে ঠেকাইল। অপ্রতিভ হইয়া রমেনও তাহার অনুকরণ করিয়া বলিল "আবার দেখা হবে আশা করি?" "হ্যাঁ—আপনাদের

গ্রামেই যে বাস করতে এসেছি, দেখা হবে বৈকি। কত সাহায্যই নিতে হবে আমাকে আপনার কাছে যে।"

রমেন সানন্দ ভঙ্গীতে মাত্র ইহার উত্তর দিল এবং এই বিদেশীয় পোষাকে দেশী ডাক্তারটির দুইহাত পকেটে পুরিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ পদবিক্ষেপে গমন ভঙ্গীটি বেশ সপ্রশংস নেত্রে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে নিজ সঙ্গীদলের সহিত মিলিত হইল।

৪

সেই গ্রামের একজন বড় লোকের পরিত্যক্ত একটা অট্টালিকা ডাক্তারের জন্য ভাড়া পাওয়া গেল। গ্রামবাসীরা সমুদ্রে মজ্জমান ব্যক্তির সম্মুখে কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্তির মত এই ডাক্তার সরকারকে সাদরে গ্রামে বরণ করিয়া লইয়াছিল। গ্রামে তখন ধুকুমারী ব্যাপার পুরামাত্রায় চলিতেছে। গ্রামবাসীরা কেহবা মরিতেছিল কেহবা ডাক্তারের চিকিৎসা ও যত্নে প্রাণ ফিরিয়া পাইয়া তাহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তারটিও গ্রামবাসীদের প্রতি যেন তাহার সাধ্যেরও বেশী বেশী মাত্রায় আত্মীয়তা এবং আন্তরিকতা দেখাইয়া সে গ্রামের সুনাম ও স্নেহ প্রচুর পরিমাণে অর্জ্জন করিতেছিল।

সেদিন বেলা প্রায় একপ্রহরের পর ডাক্তার যখন কেবলমাত্র মুখ হাত ধুইয়া প্রাতঃক্রিয়া শেষ করিতেছি, প্রভু যাহাতে একটু প্রাতরাশ শেষ করিবার সময় পান সেজন্য ভৃত্য প্রভুর অপেক্ষাও অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত তাঁহার হাতে হাতে সমস্ত আগাইয়া দিতেছে এমন সময় যে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার মুখের পানে না চাহিয়াই মুখ ধুইতে ধুইতে ডাক্তার বলিল "নাঃ—এ ভগ্ন-দূতের দায়ে তো আর বাঁচি না। কিহে আবার বগে কে প'ড়ল?"

রমেন উত্তর দেয় না দেখিয়া আবার ডাক্তার হাসিরই সহিত "কিহে ভলেনটিয়ার কিম্বা উনবিংশ শতাব্দীর 'নাইট' উত্তর নাই যে?" বলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়াই হাসিটা থামাইয়া দিল।

"মজুমদার বাড়ী থেকে ফিরে একটুও বুঝি ঘুমুতে পারনি? এতটা বাড়াবাড়ি ক'র না হে, সময় বড় খারাপ, মুখ চোখ বেজায় বিশ্রী হয়ে গেছে তোমার। তোমাকে নার্সিং থেকে বরখাস্ত করতে হবে দেখ্ছি কিছুদিন। এখন বর্ত্তমান খবর কি? ওখান থেকে ফিরে ইতিমধ্যেই আবার কাদের বাড়ী ঢুকতে হয়েছিল?"

"মৃত রতন বোসের নাম মনে আছে কি? শ্মশানঘাটে যাঁর মৃতদেহের সৎকার করতে গিয়ে আমাদের প্রথম দেখা"—

ডাক্তার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"কি হয়েছে আবার তাদের? কি খবর?"

"তাঁর স্ত্রীর কলেরা এই শেষ রাত্রি থেকে,—চল শীগ্‌গির।"

"চল।"

ভৃত্য যথাসাধ্য ব্যস্ততার সহিত তাহার ধড়াচূড়া পরিতে লাগিল। ভৃত্য সানুনয়ে একবার বলিল "একটু খেয়ে নেন্ বাবু।"

"এই যে ঠিক্ করে রাখ্ শীগ্‌গিরই ফিরে আস্‌ছি।"

পথে যাইতে যাইতে শুষ্কমুখে একটু হাসি আনিয়া রমেন বলিল "এও তোমার অনাহারী ডাক্তারীর" কল্—যা এগ্রামে তোমার বেশীর ভাগই চল্‌ছে—বুঝেছ। এইজন্যই তো তোমার এত সুখ্যাতি বেড়ে যাচ্ছে। খুব প্রাক্‌টিস্ করতে এগ্রামে এসেছিলে যাহোক'—ডাক্তারও হাসিয়া বলিল "আরে এসব তো পসার ফাঁদ্‌বার প্রথম চাল্ ডাক্তারদের। পরে স্বমূর্ত্তি বেরুবে।"

"ক'মাসইতো হ'তে চলল। ভিজিটের যাহোক্, আর কত খয়রাতি চিকিৎসাই চালাবে? ওষুধ গুলোতো সমুদ্র পেরিয়ে অমনি আসেনি? সে দেশের লোককেও কিছু এমনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা ক'রে কৃতজ্ঞ ক'রে তোলনি বা এখানে আদাড় গাঁয়ে শেয়াল বাঘ্ হলেও সে সব দেশে তুমি এমন কিছু ছিলে না যাতে—"

"কি, একটা নেটিভ্ গণ্ডমুখ্যু ছোকরার হাতে একজন য়ুরোপ সম্মানিত ডাক্তারের এতবড় অপমান? নেটিভ্‌টা কিনা আবার ইণ্ডিয়ার একটা মুখ? এর চেয়ে সে সব

দেশের চাষার মেথরের কাছে অপমান হওয়াও শ্লাঘার ছিল যে।"

"তা নেহাত্ মিথ্যে নয়।—ঐ তাঁদের বাড়ী।—"

ডাক্তার এতক্ষণ বেশ স্ফূর্ত্তির সহিতই চলিতেছিল এইবার গতির বেগ থামাইয়া দিয়া বলিল "ঐ বাড়ী? তুমি যে খয়রাতি চিকিৎসার কথা বলছ, বল দেখি এখান থেকে কি করে তা নেওয়া চলে?"

"এঁদের অবস্থা রতনকাকা মারা গিয়ে আরও খারাপ হয়েছে, সেকথা প্রথম দিনই তোমার সঙ্গে আমার হয়েছিল—মনে নেই? কিন্তু যেখানে কোন' অভাব নেই সেখানেও যে তারা অম্লানবদনে ওষুধগুলো পর্য্যন্ত—"

"যাক্ যাক্ রোগের প্রথম অবস্থাটা কেমন দেখেছিলে?"

"রোগের প্রথম আক্রমণটা বা রোগীর অবস্থা বেশীক্ষণ আমি দেখিনি। মজুমদার বাড়ী থেকে ফিরে মার বকুনি ও কান্না হজম করতে করতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি জানত তখন প্রায় সকালই হয়ে এসেছে। একটু বোধহয় ঘুমিয়েও ছিলাম। মা ই আবার আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বল্লেন "টুনি মণি কেঁদে অস্থির করছে, ওরে তোর ডাক্তারকে ডেকে আন, রতন-ঠাকুরপোর বৌটাও বুঝি যায়", রমেন একটু থামিয়া আবার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "মার কাছে তুমি আমারই ডাক্তার হয়ে গেছ।"

ডাক্তার সে কথার উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিল—"টুনি মণি তাঁদের সন্তান বুঝি? রোগীকে তুমি দেখই-নি তাহ'লে?"

"হ্যাঁ—দেখেছি বৈকি ঘণ্টা খানেক। যেমন এসব কেস্ হয়ে থাকে—ঠিক সেই রকমই। এইতো দরজা, দাঁড়াও একটু তুমি, খবরটা দিই।" রমেন্ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "এস।"

পল্লীগ্রামের দরিদ্রের দীন অঙ্গনেরও যে মার্জ্জনা টুকু প্রাত্যহিক ক্রিয়া, সেটুকুও সেদিন সে লাভ করে নাই। এই লক্ষণেই যেন সে গৃহের ভীতি-বিহ্বলতাটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। দুইটি বালক বালিকা তাহারা ডাক্তারের আগমন সংবাদেই যেন আশান্বিত ভাবে একটা ঘরের মধ্য হইতে ত্রস্তে বাহিরে আসিল। ডাক্তার রমেনের পানে চাহিয়া বলিল "ঐ ঘরেই কি রোগী আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলে মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে যাওনি কেন? তোমারও এমন ভুল?"

রমেন নতনেত্রে বলিল "কোথায় সরিয়ে দেব, ওঁরা রোগী নিয়ে ব্যস্ত, এদের দেখ্বার কে আছে?"

"তোমার মার কাছে।"

"পারিনি, বড় কাঁদছে।"

"তা বল্লে হবে না, আমায় একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে ওদের তাঁর কাছে দিয়ে এস।"

উভয়ে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। দীন গৃহের মলিন শয্যায় ততোধিক দীনা মলিনা রোগিণী, রোগের তীব্র আক্রমণে ছটফট করিতেছে। ডাক্তার তাহার শয্যার নিকটে মাটিতেই বসিয়া পড়িয়া একাগ্র তীক্ষ্ণ চক্ষে রুগ্নার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। একটা কম্পিত ভগ্নস্বর শুনা গেল "আসনটায় উঠে বস বাবা, মাটি।" হাত তুলিয়া গৃহস্থদের সে চেষ্টা নিবারণ করিয়া ডাক্তার বলিলেন "এখন কি রকমে কি হল বলুন দেখি একটু।"

'অমা, ডাক্তার বাবুকে বল্।"

'রমেন দাদা, তুমিত শুনেছ সব।"

'থাক্, অত্যাচার অপচার হয়নি তাহলে কিছু?" এইবার ডাক্তার রুগ্নার মুখের নিকটে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকেই দুএকটা প্রশ্ন করিয়া উত্তর লইল এবং পকেট হইতে কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া দ্রুত হস্তে প্রেস্-ক্রপসন লিখিয়া শেষ করিবা মাত্র রমেশ সেখানা টানিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার মুখ তুলিল। সেই বালক বালিকা দুটীকে দ্বারের নিকটে দেখিয়া চারিদিকে চাহিতেই দেখিল অত্যন্ত নিকটে একটী বৃদ্ধা বসিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। ডাক্তার বলিল "এদের এসময়ে বাড়ীতে রাখা উচিত হচ্ছে না; অন্ততঃ এ ঘরে তো নয়ই। আপনাদের আত্মীয় স্বজন কেউ যদি থাকেন—"

"কেউ নেই আর বাবা, তুমি ওদের মাটিকে বাঁচিয়ে দাও। তোমার সুখ্যাতি সবাই করে। তোমার হাতে ওষুধে কথা কয় শুনেছি, তুমি বাবা—"

"শুনুন, ভগবানের ওপর নির্ভর করুন, মানুষের কোনই সাধ্য নেই। তবে চেষ্টা যথাসাধ্য করা যাক্ এই-টুকু মাত্র মানুষের হাত। ছেলেদের রমেনের মার কাছে রেখে আসুন।"

"আহা সেও এই গেল। এতক্ষণ সমানে আমার সঙ্গে সেবা কর্‌ছিল। যেমন মা তেমনি ছেলে, হতভাগী মেয়ের কপালে নেই পেলেনা। তপিস্তে চাই অমন পাত্তরের গলার মালা দেবার গো। তা যদি হতো আজ কি এত ভাবনা!"

ডাক্তার এইবার আদেশের স্বরে বলিল "ছেলেদের তাঁর কাছে দিয়ে পাঠান দেবী কর্‌বেন না।"

বুড়ী যেন বিব্রত ভাবে বলিল "যা' অমা তবে দিয়ে আয়—"

ঘরের কোনার দিকে ঘেঁসিয়া একটু পিছন ফেরা ভাবে অমলা বসিয়া ছিল। এতক্ষণ কেবল তাহার চাপ্ চাপ্ রুক্ষ চুলের এলো খোঁপার পাশ দিয়া কর্ণের একটু অংশ ও তাহার আরক্ত আভা মাত্র দেখা যাইতেছিল—এইবার সে কুণ্ঠিত ভাবে মাথায় কাপড় আর একটু টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই রোগিণী গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিয়া উঠিল "না গো অমাকে পাঠিও না, এখুনি দরকার হবে, তুমি যাও মা।"

"তবে তাই যাই, চল্ তোরা।" বালক বালিকা প্রবল আপত্তি জানাইয়া দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইল "না।" বৃদ্ধা বিব্রত হইয়া অমলার পানে চাহিল "কি করি বল্ ওরা কি আমার কথা শুন্‌বে? তুই—"

ডাক্তার নিজেই উঠিয়া পড়িয়া দ্বারের নিকটে একেবারে তাহাদের মাথায় হাত দিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল "টুনি মণি লক্ষ্মী ছেলে মেয়ে তোমরা, তোমাদের রমেন দাদার বাড়ী আমায় দেখিয়ে দেবে চলত। তোমাদের মা এখুনি ভাল হয়ে যাবেন, কিছু ভয় নেই, চলত।" বালক বালিকা তবু নড়িতে চাহে না। তাহাদের প্রায় টানিয়া লইয়া উঠানে পৌঁছিতেই গৃহ হইতে একটা জ্বলন্ত রূপ-জ্যোতির শরীরিণী মূর্ত্তি আসিয়া ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। মৃদু কণ্ঠে বলিল "আমি দিয়ে আসছি, আপনি কষ্ট পাবেন না।"

ডাক্তার নিঃশব্দে বালক বালিকাদের স্কন্ধ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। অমলা তাহার হস্ত প্রসারণ করিয়া বালক বালিকা দুটীকে যেন কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাদের মাথার উপরে মুখের উপরে নিজের মুখ নামাইয়া এত মৃদুস্বরে তাহাদের কি বলিতে বলিতে যন্ত্র চালিত পুতুলের মত চালাইয়া লইয়া গেল যে তাহার একবর্ণও ডাক্তারের কর্ণে প্রবেশ করিল না। কেবল সেই দৃশ্যটা ডাক্তার একাগ্র দৃষ্টিতে যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় দেখিয়া লইল, এবং তাহার পরে রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

শীঘ্রই অমলা ফিরিল, তখনো ঔষধ লইয়া রমেন ফিরিতে পারে নাই। অমলা আসিয়া দেখিল ডাক্তার "আমি আপনাদের রমেনের বন্ধু, ছেলের মত, কেন সঙ্কোচ করছেন" দু একবার মাত্র এই কথা বলিয়া রোগিণীর হাতের পায়ের খিল্‌ধরা ছাড়াইয়া দিতেছে শুষ্ক জিহ্বা ও অধরে পানীয় সিঞ্চন করিতেছে। বৃদ্ধা মাঝে মাঝে "বাবা এইজন্যই লোকে তোমার এত সুখ্যাতি করে,—তুমি দেবতা" ইত্যাদি বাক্যে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন আর রুগ্না তারস্বরে "অমলা—অমলা কেন গেল, অমা কই" বলিয়া কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। অমলাকে দেখিয়া সকলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ডাক্তারও হাত গুটাইয়া লইয়া সরিয়া বসিলেন। অমলা ব্যস্তভাবে রুগ্নার সেবায় লাগিয়া গেল।

রমেন ফিরিলে রোগিণীকে ঔষধ খাওয়াইয়া ডাক্তার বলিল "বার দুই তিন ওষুধটা পেটে প'ড়ে তার কিরকম ফল হয় সেটুকু দেখে যেতে হবে আমাদের। রমেন তুমি ততক্ষণ বাইরে খানিকটা আল্‌কাতরা ও গন্ধক পোড়াবার ব্যবস্থা কর। ফেনাইল কি ইউক্যালিপটাস্ এনেছ তো?"

"না—ওষুধ নিয়েই চলে এসেছি।"

"চাকরটাকে জানাতে পারলে সে দিয়ে যেত। এমন কোন লোক নেই যে একটু চিঠি নিয়ে যায়।"

"না, আমিই যাই আবার", "পারম্যাঙ্গানেট্ অব পটাস্‌ও এনো একটু। এ্যাণ্টিসেফটিকটা চারিদিকে এসময়ে একটু বেশী বেশী চালালে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তুমিই আবার দৌড়ুবে?

"হ্যাঁ।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন "এই এলি আবার যাবি এখনি? তোর মা কেঁদে ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছে আর তুই বাছা পরের জন্য রাতদিন এমনি ছুটোছুটি ক'রে গেলি যে।"

রমেন উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া যায়, এইবার অমলা মুখ তুলিয়া ডাকিল "শোন, এতক্ষণ যখন কেটেছে আরও একঘণ্টা কাটুক। একঘণ্টা পরে তোমরা তো যাবে তখনি গিয়ে পাঠিয়ে দিও। আর ব'লে দিয়ে যাও তাদের কি রকমে ব্যবহার করতে হবে, আমিই ওগুলো করবো। গন্ধক পোড়ানোও এখন থাক্, ছেলেরা তো বাড়ী নেই, হবে একটু পরে।"

অমলা রমেনকে নিকটে ডাকিয়া যথাসাধ্য মৃদুস্বরে কথাগুলা বলিলেও ডাক্তার সবই শুনিতে পাইল। রমেন ডাক্তারের পানে একবার চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল ডাক্তার নিঃশব্দে উভয়ের পানে চাহিয়া আছে। রমেনের সহিত দৃষ্টি মিলিতেই ডাক্তার রমেনকে বলিল "তাই হবে, বোস একটু বড় হাঁপিয়েছ।" "না, ঘরে বাহিরে খারাপ গ্যাস্ জমে গেছে একটু, দেখ্‌ছ না, এর মধ্যে থাকা সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। দেরী করা ঠিক্ নয় আমি এলাম বলে।"

নিষেধ না মানিয়া রমেন আবার চলিয়া গেল। ডাক্তার ঔষধের ক্রিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য নিস্তব্ধভাবে বসিয়া কখনো রোগিণীর পানে কখনো দ্বারপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল আর অমলা তাহার খুড়িমার রোগযন্ত্রণা লাঘবের জন্য প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়া চলিল।

ঘণ্টার মধ্যে দুই তিনবার ঔষধ খাওয়াইয়া যেন উপকার বোধ হইল। মাঝে মাঝে রোগিণীর তন্দ্রা আসিতে লাগিল। রমেনও ফিরিয়া আসিয়া তাহার যথানির্দ্দিষ্ট কাজ সারিয়া লওয়ার পরে ডাক্তার এইবার রমেনের পানে চাহিতেই রমেন বলিল "হ্যাঁ তুমি এইবার উঠ, মজুমদার বাড়ী থেকে লোক এসে বসে আছে দেখে এসেছি।" ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তুমি?"

রমেন নত নেত্রে বলিল "আমি এইখানেই আছি।"

ডাক্তার গম্ভীর মুখে আদেশের স্বরে বলিল "আমি ডাক্তার সেইজন্য বলছি খাওয়া এবং ঘণ্টা দুই ঘুম তোমার চাই। পেটখালি রেখে তুমি আজ বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারে না। দু'ঘণ্টা তোমায় ঘুমুতেও হবে, কাল সমস্ত রাত তুমি জেগেছ।"

বৃদ্ধা বলিলেন "সত্যি নাকি? যাও ভাই বাড়ী যাও তবে, মায়ের অন্ধের নড়ী তুমি, খেয়ে ঘুমিয়ে আবার এস তখন।"

রমেন আর সেখানে কোন কথা না বলিয়া ডাক্তারের সঙ্গে বাহির হইয়া যায় এমন সময় মৃদুস্বরে ডাক পড়িল "রমেন দাদা।" রমেন মাটীর দিকে চাহিতে চাহিতে অমলার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। আঁচল হইতে কি একটা জিনিষ খুলিয়া অমলা তাহার পায়ের নিকটে রাখিয়া এবার এত মৃদুস্বরে কথা বলিল যে ডাক্তার তাহার কিছুই শুনিতে পাইল না। তাহার পরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে রমেন যখন সোনার দুইটী ক্ষুদ্র ফুল হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া ডাক্তারের পানে চাহিল তখন ডাক্তারের বিষয়টা বুঝিয়া লইতে আর বাকী থাকিল না। ডাক্তারের ঋণ শোধার্থই অমলা ইহা রমেনের হাতে দিয়াছে। রমেন যেন কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার অবকাশ মাত্র না দিয়া ডাক্তার "এস বলিয়া তাহাকে প্রায় টানিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পরে তাহার হাত হইতে ফুল দুইটী তুলিয়া লইয়া বলিল "কি এ দুটী? কানের ফুল?" "হ্যাঁ" বলিয়া রমেন অতি মলিন হাসি হাসিল। তারপরে বলিল "কিন্তু তুমি তো—"

ততক্ষণে ডাক্তার সেদুটাকে নিজের পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। "আমি মজুমদার বাড়ী চল্‌লাম, তোমায় যা বল্লাম, একটু খাওয়া ও ঘুম বুঝলে?"

রমেন একটু থতমত খাইয়া গেল। ফুল দুটা সে এখনি

অমলার কাছে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে জানিত কিন্তু রাজেন্দ্র যে সেতুটাকে পকেটে ফেলিল সে কি অন্যমনস্কতার দরুণই? তাহাই বোধ হয়, আচ্ছা সে পরে চাহিয়া লওয়া যাইতেছে, আগে তাহার স্নেহের অত্যাচার হইতে ত নিষ্কৃতি পাওয়া যাক্। রমেন মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল "আমি আর ঘণ্টা খানেক পরেই যাব। ওঁদের একটু সাহস পেতে দেখি আগে, এখনো তেমন উপকার বোধ হয়নিত।"

"একঘণ্টা থাক্‌লেও তা দেখ্‌তে পাবে না, কেস সহজ নয় রমেন। ছেলে মানুষি করনা, তুমি ত এঁদের বলবুদ্ধি ভরসা সব দেখছি, তুমি একটু শক্ত হয়ে নাও আগে।"

রমেন ডাক্তারের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল "তাহলে একেবারে সাংঘাতিক?"

"এখনো ঠিক বলা যায়না- তবু সেই রকম [illegible] [illegible] এস তুমি বাড়ী যাও।"

[illegible] ছাড়াইয়া লইয়া রমেন এইবার ডাক্তারের কাছে [illegible] কাতর "তুমি আমায় [illegible] [illegible] [illegible] সময়ে। ওদের এমন বিপদ [illegible]

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া খানিকটা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "কিন্তু দেখো—কখনই থাকতে পাবেনা। ওঁদের কানে আমি যে বীজমন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছি, নিশ্চয় এখনি তোমায় তাড়িয়ে দেবেন। তাই বল্‌ছি চল—"

"আচ্ছা সে দেখ্‌ছি, তুমি তাহ'লে ফুল দুটো—"

"হ্যাঁ—নিয়ে চল্লাম"।

"নিয়ে গিয়ে অনর্থক কি করবে? দাও ফিরিয়ে দিই গে।"

"অনর্থক কিহে?, আমার ভিজিট।"

"রসিকতার স্থানকাল খুব চমৎকার পেলে যে দেখ্‌ছি! দাও না—

"শুধু স্থানকাল নয় পাত্রও।"

বলিয়া ডাক্তার গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল আর রমেন একটু অবাক হইয়া ডাক্তারের এই অদ্ভুতপূর্ব্ব রসিকতার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইবার এবং চেষ্টায় হতভম্ব ভাবে অমলাদের উঠানের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

—o—

মরণ-সেতু

(Hood এর Bridge of Sighs হইতে)

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় বি, এ]

আর এক হতভাগী—
মরণের অনুরাগী,
বেঁচে তিক্ত প্রাণ,
মরণে পরায়ে মালা,
জুড়ায়েছে সব জ্বালা,
লভেছে নির্ব্বাণ।

নব কিশলয় সম,
রূপ তার নিরুপম
গড়া বিধাতার
তোল তা'রে স্নেহ ভরে,
আদরে যতন করে,
ভুলি' দোষ তার

দেখ তার আবরণ
যেন 'মৃত আভরণ'—
ঝরে তাহে জল ;
ঘৃণা রেখে ভালবেসে
লও তারে ; পেয়েছে সে
ব্যথা অবিরল।

ছুঁয়োনা বিরাগ ভরে ;
বিষাদিত ক্ষণ তরে
হও করুণায় ;
কলঙ্কের কথা তা'র—
ভেবনা এখন আর
মাপ কর তা'য়।

খুঁটে খুঁটে আলোচনা
করিও না করিও না
মরণের পর ;
এবে তার লাজ নাই
আজ যাহা আছে ভাই
সকলি সুন্দর।

অবলা যে দুর্ব্বলা,
বাড়াইয়া দেয় গলা
মরিবারে ত্বরা,
সুগভীর সে পতন ;
তবু মুছ সে বদন
বুদ্‌বুদে ভরা।

পিতা, মাতা কেবা তা'র
ভাই বোন সে কাহার
কেহ জান নাকি ?
সব চেয়ে প্রিয়তম
কেবা ছিল প্রাণ সম—
দিল ওরে ফাঁকী ?

বৃথা কর কাল ক্ষয়,
কোথা বাড়ী, কোথা রয়
ভাবি' মিছামিছি ;
বেঁধে দেও এলোকেশ,
সংযত কর বেশ—
তার চেয়ে ছি ছি !

আহা দয়া এত কম
অকরুণ নিরমম
বসুধা অপার,
উষ্ণ ব্যথা বাজে চিতে
এত বড় ধরণীতে
ঠাঁই নাই তা'র।

প্রীতি, ভক্তি, মায়া স্নেহ—
না ছিল তাহার কেহ,
সকলি বিকার ;
ভালবাসা জ্বলে পুড়ে,
হাড় কালি করে উড়ে,
গিয়েছিল তার।

এমন কি বিধাতার,
শত দয়া করুণার—
অনন্ত নির্ঝর,
নাই, নাই, সব ফাঁকী
ভাবিল সে হতভাগী
ব্যথিত জর্জ্জর।

প্রাসাদের আলো ঝলে,
দূরে অই নদী জলে,
শত শত আলো ;
চেয়ে সে দেখিল তা'ই
তা'রি শুধু গৃহ নাই
তা'রি বুকে কালো।

যদিও মাঘের বায়ু
জড় সড় সব স্নায়ু—
করেছিল শীতে,
তথাপি যে সে আঁধার,
পারে নাই সে পাথার—
ভয় প্রদানিতে।

যেতে হ'বে, যেথা হো'ক,
ধরণীর কু-আলোক--
ছাড়িয়া কোথাও ;
ধরাবাসে, কারাবাসে,
জীবনের ইতিহাসে,
উন্মত্ত উধাও।

সাহসে করিয়া ভর,
ঝাঁপ দিল তার পর,
তুহীনের নীরে ;
ছি ছি করেছিস্ একি ?
হীন নব ভাব দেখি—
দাঁড়াইয়া তীরে।

পরেতে পারিস্ যদি
এই জল নিরবধি
প্রাণ পূরে খাস্ ;
হাত মুখ প্রক্ষালন
করিস্ রে অনুক্ষণ
যতক্ষণ শ্বাস্।

নব কিশলয় সম,
রূপ তার নিরুপম !
গড়া বিধাতার
আজ তা'রে স্নেহ করি'
যতনে উঠাও ধরি'
ভুলি' দোষ তা'র।

সুকোমল দেহ ওর—
না হইতে সুকঠোর,
ভাল করে দাও ;
ভাল করি' ধীরে, ধীরে,
সযতনে দুখিনীরে
ধুয়ে পুঁছে নাও।

বিদ্রূপেতে ভাজা, ভাজা,
এ জীবনে বড় সাজা—
পেয়েছে ও প্রাণ,
শত হৃদি-হীনতায়,
কাটায়েছে দীন তায়,
আজ অবসান।

হাঁ করিয়া চোখ দুটি
ভবিষ্য দেখিছে খুঁটি
দাও পাতা ঢাকি' ;
বুক' পরে দুটি হাত,
জুড়ি' আহা এক সাধ,
দাও ওর রাখি'।

এই ভাবে রাখ তা'য়,
সে যেন গো বিধাতায়
হ'য়ে অন্যমনা—
চুপ করি, মনে, মনে,
করিতেছে সযতনে
ধীরে উপাসনা।

মানিয়া পতন তার
যত মন্দ ব্যবহার
লইতেছি আজ,
পাপ ভার যত তার
সে বিচার বিধাতার
সে তাঁহারি কাজ।

জমি ও জমির খাজনা

জমিদারের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক জমি আর তার খাজনা নিয়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ দুটি কথার সংজ্ঞা (definition) নেই। আমি আগে খাজনার কথা বলব, তারপর জমির কথা। খাজনার সংস্কৃত এবং বাঙলা প্রতিশব্দ "কর" আর ইংরেজী প্রতিশব্দ "rent" একথা না বললেও চলত, কিন্তু এ দুটো কথা এক জিনিষকে বোঝায় না এবং এর একটি অন্যটির প্রতিশব্দ নয়, সেইটে বোঝাবার জন্য কথাটা বলা অনাবশ্যক মনে করছি না। জমি সম্বন্ধীয় করের অর্থ জমি থেকে যে আয় হয় তারই যে অংশটা রাজাকে দেওয়া যায়। Rent এর অর্থ জমির ব্যবহারের বিনিময়ে যা দেওয়া যায়। প্রথমটায় জমি আমারই, আমি চাষ আবাদ করে তার থেকে কিছু লাভ করি, রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাজাকে সেই লাভের একটা অংশ দিই। এই অর্থেই এদেশে প্রাচীন কাল থেকে এ পর্য্যন্ত "কর" কথাটার ব্যবহার চলে আসছে। দ্বিতীয়টায়, জমি অন্যের, আমি কেবল ব্যবহার করি, আর সেই ব্যবহারের মূল্যস্বরূপ যার জমি তাকে কিছু দিই। এর প্রভেদটা এত স্পষ্ট যে স্পষ্টতর করে তা আর বুঝিয়ে দেবার আবশ্যক নেই। এই জন্যই হিন্দুরাজত্ব কালে এবং মুসলমান রাজত্বকালে রাজা জমি ক্রোকবিক্রী করতে পারতেন না এবং করতেন না। যথা সময়ে কর দিতে না পারার জন্য জমিদারের "বৈকুণ্ঠ" দর্শন পর্য্যন্ত হত, কিন্তু প্রজার প্রতি কোনো অত্যাচারের কথা শোনা যায় নি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ কোম্পানী। তাঁরা দেশের কর আদায়ের ভার পেয়ে কর শব্দের ইংরেজী অনুবাদ করলেন rent এবং শব্দ ও অর্থের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তা থেকে তাঁদের দেশে, অর্থাৎ—বিলেতে যে অর্থে rent শব্দটার ব্যবহার আছে সেই অভ্যস্ত অর্থ টাই বুঝলেন। বিলেতে জমিটা জমিদারের, প্রজা তার ব্যবহার করে এবং ব্যবহারের মূল্যস্বরূপ কিছু দিয়ে থাকে, তারই নাম rent, কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা আরও বুঝলেন যে পতনোন্মুখ নবাবী-গবর্ণমেণ্ট প্রজার উপর যে সকল অবৈধকর বসিয়েছিলেন সেগুলি "আচারাৎ" প্রজার অবশ্য দেয়। সুতরাং জমির আসল কর ও এই অবৈধ করগুলি যোগ করে যা হল তাই হল rent. ১৭৯৩ সালের ৮ রেগুলেশনের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় এই অবৈধ করগুলিকে বৈধ করে দেওয়া হল। ব্যবস্থা হল all cesses (abwab, mathat, mangan &c) are to be consolidated with the substantive rent (asl) **in** one sum. তবে কোম্পানী বাহাদুর দয়া করে বলে দিলেন যে, এর উপরেও যদি কেহ কোনো কর আদায় করেন, তা অবৈধ হবে। No *new* cesses are to be imposed; কিন্তু এ বিধির সম্মান রক্ষা করা হল একে লঙ্ঘন করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভুল ভ্রান্তিগুলো ক্রমে যত দেখা যেতে লাগল, ততই অল্প অল্প সংশোধক বিধিব্যবস্থা হতে লাগল। এই সংশোধক বিধির মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন একটি এর দ্বারা প্রজার স্বত্ব কতকটা নির্দ্দিষ্ট করবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না। হাই-কোর্টের বিচারপতিরা একটা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে বললেন এই আইনে প্রজার অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃত করা হয় নি। আরও বললেন যে, চিরাগত আচার প্রতিষ্ঠিত ভোগস্বত্বের যে অধিকার সে অধিকার প্রজার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। (Selections from papers relating to the Bengal Tanancy Act, 1885) এর মধ্যে এই আইনের খাজনা বৃদ্ধির ধারাগুলি নিয়েও অনেক আন্দোলন সমালোচন হতে লাগল।

এই ত গেল খাজনার কথা, জমির কথাও সংক্ষেপে একটু বলি। জমি মানে যে কেবল চাষের জমি বা বাসের জমি বা বাগান-পুকুর করবার জমি, তা নয়, তা আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। জমি সংক্রান্ত ভিতর এ সকল ত আছেই, আরও আছে নদী, নালা খাল, বিল, পাহাড়, পর্ব্বত, বন, খনি প্রভৃতি। আগে এ সকলে প্রজার অধিকার অব্যাহত ছিল। প্রজা প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধে মাছ ধরত, বনের ফল খেত, বন থেকে জ্বালানী কাঠ আনত, বনে গোরু চরাত, পাহাড়পর্ব্বত থেকে ঘর তৈয়ের করতে পাথর নিত, খনি থেকে যথাসাধ্য খনিজ নিত। সেকালের বিধি ছিল গ্রামের চার দিকে চারশ' হাত জমি, অথবা তিন বারে লাঠি ছুড়ে যতদূর ফেলা যায় ততদূর পর্য্যন্ত জমি, পশুচারণের জন্য রাখতে হবে। নগরের চার দিকে এর তিন গুণ।

"ধনুঃ শতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ
শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু॥"

(মনু ৮।২৩৭)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নি, জরিপও হয় নি। সুতরাং গ্রামস্থ এবং গ্রামের নিকটস্থ প্রাকৃতিক জলাশয়, বন প্রভৃতি জমিদারীভুক্ত করে নিতে জমিদার কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করলেন না। প্রজা এখন গোরু চরাবার স্থান পায় না। গ্রামের গো-চর জমি ত সব আবাদ হয়ে গিয়েছে, বনের গো-চরের জন্য কর দিতে হয়। আর গোচর জমির অভাবজনিত ঘাসের অভাবে গাই আর তেমন দুধ দেয় না।

জ্বালানী কাঠ ত পাওয়াই যায় না, যেখানে বন আছে সেখানে মূল্য দিয়ে জমিদারের কাছে কিনতে হয়। প্রজা কাঠের অভাবে গো-চর জ্বালিয়ে তার জমিকে সারশূন্য করে ফেলছে। আর যেহেতু প্রজার "বৃক্ষ রোপন" করবার অধিকার আছে কিন্তু "ছেদন" করবার অধিকার নাই, সেই হেতু প্রজার নিজের আজ্জানো গাছটি মরে গেলে, গাছের মৃত্যু সংবাদটি জমিদারকে দিয়ে, মৃতগাছটি তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। যে সকল প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছ ধরবার অধিকার প্রজার চিরকাল ছিল, এখন জমিদার তা উচ্চ মূল্যে বিক্রী করে, প্রজাকে নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট জ্ঞানত বা অজ্ঞানত জমিদারকে একটু বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন।

"সবুজ পত্র"
আষাঢ় ১৩২৭

শ্রীহৃষীকেশ সেন

বাংলার লোক-সঙ্গীত

এদেশের হিন্দু কৃষকদিগের কবি-গান মুসলমান কৃষকদিগের জারি-গান তাহাদের নিজস্ব জিনিস। নিরক্ষর কবিওয়ালা ও জারিওয়ালার রচনা-শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সন্ধ্যা হইতে পরদিন বেলা ১২টা পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া কৃষকগণ কবির নেশায় বিভোর হইয়া বসিয়া থাকে।

এই সকল অনুষ্ঠান আমাদের জাতির মধ্যে ভাব-চর্চ্চাকে জাগ্রত রাখিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। জনসাধারণের মনকে কেবল আহার, বিহার ও স্বার্থ সাধনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই। তাহাকে ছন্দ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছে। যে জাতির মধ্যে এই æsthetic আনন্দ যত অধিক সে জাতি মহত্ত্বের দ্বারা সভ্যতার তত উচ্চ স্তরে আনন্দলাভ করিতে পারে।

কথকতা, যাত্রা, জারি-গান ইত্যাদি সামাজিক আমোদ-প্রমোদের বাহিরে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বাউল-গানকে অবলম্বন করিয়া আরেকটী নির্ম্মল ও পবিত্র সাধনার পথ খুলিয়া গিয়াছে।

যেদিন হইতে এই ভারতের পবিত্র তীর্থে এশিয়ার দুইটী বিরাট ধর্ম্মের মিলন হইল, সে দিন হিন্দু বৈষ্ণবের প্রেমের সাধনার সহিত মুসলমানের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সহজ আড়ম্বরহীন সাম্যের আদর্শের মিলন ঘটিল, সেদিন হইতে কবীর, দাদু ইত্যাদির মধ্য দিয়া সমাজের নিম্ন-

স্তরে সাধনার একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ জাগিয়া উঠিল। পণ্ডিতদিগের দার্শনিক কচকচিকে তাহারা ব্যঙ্গ করিল। জাতিভেদের ভূতটাকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিল। রাম-রহিমের অভেদ প্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিল। এই হিন্দু-মুসলমানের বিশুদ্ধ আদর্শের পরিচয় পাই আমাদের দেশের বাউল গানের মধ্যে।

এই সকল বাউল সাধকগণের মধ্যে যাহারা নিরক্ষর, সমাজে অবজ্ঞাত, অস্পৃশ্য, ধনীর মন্দিরে যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের মধ্যেই বিশুদ্ধ সত্যটী প্রতিফলিত হইয়াছে। তাহারা ভগবানকে নিজের গড়া মূর্ত্তির মধ্যে দেখার কৃত্রিমতা অবলম্বন করে নাই। তাহারা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই। পণ্ডিতের টোলে বিধি-ব্যবস্থার ধার ধারে নাই। তাহারা সোজাসুজি নিজের ভিতরে ডুব দিয়া নিজের আত্মার মধ্যে ভগবানকে খুঁজিয়াছে। সেখানে বন্ধুর প্রেম লাভ করিয়া বাহিরে আসিয়া সকল মানবের প্রেমের মধ্যে তাঁহার প্রেম লীলা সম্ভোগ করিয়াছে।

তাহারা গাহিয়াছে—

"যার জন্যে পাগল হ'য়ে বেড়াস্ বনে,
সে যে তোর ঘরের কোণে,
তারে আদর করে আপন ঘরে
ডেকে নেরে সযতনে।"

হিন্দু বাউলের উল্লিখিত উক্তির সহিত একটী অজ্ঞাত-নামা মুসলমান ফকীরের রচিত বাউল গানের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে।

"যেই অবধি হৃদয়ে প্রিয়ে করেছ আসন,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দরশন॥
আকাশে পাতালে দেখি, জলে আর স্থলে দেখি,
সব ঠাঁই প্রিয় নূরে ব্যাপৃত রওশন॥"

প্রিয় যিনি তাঁহার প্রেমের স্পর্শ হৃদয়ে লাভ করা মাত্র চারিদিকের চরাচর তাঁহার নূরে অর্থাৎ আলোতে উদ্ভাসিত বলিয়া অনুভূত হয়।

"মোসলেম ভারত"
আষাঢ় ১৩২৭

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

কৃষকের দারিদ্র্য মোচন

শোচনীয় দুরবস্থা হইতে কৃষককে উদ্ধার করিতে হইলে প্রথমে তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। তাহার প্রধান উপায় তিনটি—(১) কৃষি ব্যাঙ্ক, (২) কৃষক-সমবায়, (৩) জীবনবীমা।

ঋণভার প্রতীকার উদ্দেশ্যে কৃষক-সমবায় (Co-operative Credit Society) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহার উপকারিতা দেশের লোক ক্রমে বুঝিতেছে। এ বিষয়ে রাজপুরুষদের চেষ্টা প্রশংসনীয়। ইহার দ্বারা কৃষককে আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

আর একটা অতি প্রয়োজনীয় কায, উপযুক্ত মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে, পাটের কলওয়ালারা যখন শতকরা তিনশত টাকা লাভ করিয়াছে, তখন পাটের উৎপাদয়িতারা উদারান্নের অভাবে বাধ্য হইয়া উপযুক্ত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পাট বেচিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কৃষক-সমবায় যদি এই সময় তাহাদের পাটের মূল্য চড়াইয়া, একটা নিদ্ধারিত মূল্যের নীচে বিক্রয় করিবে না বলিয়া পাট ধরিয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে আর তাহাদের অন্নবস্ত্রের এত ক্লেশ হইত না।

বর্ত্তমান যৌথ ঋণদান সমিতিগুলির (Co-operative Credit Societies) এ কায করিবার কিছু বাধা আছে। পাট, গম, তৈলশস্য, তুলা প্রভৃতির বড় ব্যবসায়ী প্রায়ই ইংরাজ বণিক্। কার্টেলের মত কায করিতে হইলে এই প্রবল বণিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়া সম্ভব। সরকারী সাহায্যে এই ঋণদান সমিতির কি এই সংঘর্ষের মধ্যে যাইবার সাহস হইবে?

কিন্তু কৃষি-ব্যাঙ্ক ও কৃষক-সমবায় কৃষকের চলতি কারবার চালাইবার জন্য। স্বাস্থ্যের অভাবে ব্যাধিতে এবং বার্দ্ধক্যে যখন কারবার অচল হইবে, সে দুর্দ্দিনে কে তাহার সাহায্য করিবে?

এই ক্ষতি নিবারণের একমাত্র উপায় জীবনবীমা। এই নীতিতেই ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন-বীমার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

জীবন-বীমাকেও প্রাথমিক শিক্ষার মত বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। জ্ঞানের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে, লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবনবীমা করিবে না। প্রথমে বাধ্য করিয়া করাইতে হইবে, তার পর যখন তাহার উপকারিতা দেখিবে, বুঝিবে, তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিবে। যাহারা বড় বড় কল কারখানায়, শিল্প বাণিজ্যে কায করে, তাহাদিগকে একটা লাভের অংশ (bonus) মূলধনীরা দিয়া থাকেন এবং জীবনবীমার সাহায্য করেন। সেই হিসাবে, যাঁহারা কৃষকের নিকট হইতে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া সব চেয়ে বেশী লাভ করেন, সেই জমিদারেরা কৃষকের জীবন-বীমার খরচের একটা অংশ দিবেন। ইংলণ্ডে যাহা হইয়াছে এদেশেও তাহা হইতে পারে।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" শ্রীহৃষীকেশ সেন।

শ্রাবণ ১৩২৭

পারস্য গীতি কবিতা

পারস্য সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অংশ-গীতি-কবিতা। ইউরোপের গীতি-কবিতা হইতে পারস্য গীতি-কবিতার বিশেষ পার্থক্য এই যে, ইহা একাধারে গীতি এবং কবিতা। পারস্যের গৌরবের দিনে এ সকল গজল 'বরবত' নামক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সভাস্থলে গীত হইত। বঙ্গদেশে এই জাতীয় গজল হিন্দু-মুসলমান সকলেরই নিকট সুপরিচিত। সময় সময় কবি এবং সাধকগণ এই সকল গজল গাহিয়া (বা অন্যের দ্বারা গান করাইয়া) উচ্ছ্বসিত ভগবৎ প্রেমে মাদকতাময় অপূর্ব্ব তরঙ্গ উপভোগ করিতেন। যে দিন চাঁদের আলোতে আকাশ ভরিয়া যাইত, 'দখিন হাওয়া'র বিবশ পরশে প্রাণ আবেশে ঢুলু ঢুলু করিত, সেই সকল রজনীতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা উদ্যান-বাটিকায় উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিকদিগের সভা বসিত; আর চন্দ্র যখন পশ্চিমাকাশের কৃষ্ণ নিবিড়তার ভিতর ঘুমাইয়া পড়িত, তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই "গোলাবের ইতিহাস", "বুলবুলের প্রণয়-কথা", "সুরার মহিমা" ও "প্রেমের মাধুরী" গীতাকারে চলিতে থাকিত। পারস্য কাব্যের সাধারণ মূর্ত্তি প্রায় সর্ব্বত্রই একরূপ। খোদা-তা'লার মহিমা বর্ণন, হজরত মোহম্মদের প্রশংসা; আশ্রয়-দাতার (Patron) গুণকীর্ত্তন, স্বদেশের মহাত্ম্যবর্দ্ধন ও সেই সঙ্গে আত্ম-প্রশংসা এই সকলের ধারাবাহিক অবতারণা প্রত্যেক কাব্যেরই প্রারম্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গীতি-কবিতাগুলির আলোচ্য বিষয় প্রেম ও সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির বক্ষে উদ্ভাসিত যে সৌন্দর্য্যের ধারা মনকে সংসারের কলুষরাশি হইতে অপসারিত করিয়া অনন্ত অনধিগম্যের দিকে প্রেরণা দেয়, নদীর কলনাদের ও পাখীর কূজনে উষার সৌন্দর্য্যে ও চন্দ্রের কৌমুদীতে যে মহিমা, যে কমনীয়তা স্ফূরিত হইতেছে সেই সকল অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা কিরূপে বিধাতার উদ্দেশে আপনার উচ্ছসিত প্রেমরাশি নৈবেদ্য দেয়, পারস্য গীতি-কবিতায় তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। হাফেজের কবিতা ইহার আদর্শ। পারস্য গীতি-কবিতায় যেমন লালিত্য, কমনীয়তা ও নিরঙ্কুশ কল্পনার উদ্দাম লীলাভঙ্গী দৃষ্ট হয়, পারস্য-গদ্যসাহিত্যেও আবার তেমনি বর্ণনার ওজস্বিতা ও অলঙ্কারের চরম বিচ্ছুরণ দৃষ্ট হয়।

পারস্য কাব্য-কাননের বসন্তের দিন আর এখন বিদ্যমান নাই, তথাপি সেই মৃত সাধকদের পবিত্র অস্থিপুঞ্জ স্থানে স্থানে বিচ্ছুরিত রহিয়া সমগ্র পারস্য দেশটাকে যেন একটা শান্তস্নিগ্ধ তীর্থভূমিতে পরিণত করিয়াছে। যে দেশের স্তন্য পান করিয়া হাফেজ ও সাদীর উন্মেষ হইয়াছিল, যে দেশের দয়েল-শ্যামার কাকলীতে জামী ও রুমীর অমর বীণা বাজিয়া উঠিয়াছিল, যে দেশের উদাস হাওয়া ও নিশার নীরবতা ওমর খাইয়ামের প্রাণে বিশ্বদ্রোহী অভিমান জাগাইয়া তুলিয়াছিল, অযুত সাধকের পদরজ বক্ষে ধরিয়া লক্ষ পীরের জাগ্রত সমাধি উদরে পুষিয়া যে দেশের গরিমা মহিমান্বিত হইয়াছে, তাহার প্রতি ধূলিকণাটি প্রতি প্রস্তররেণুটী আমাদের প্রতি হৃদয়ের সহস্র তরঙ্গাভিঘাত জাগাইয়া তুলে না কি?

"মস্‌লেম ভারত" মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, বি, এ

আষাঢ় ১৩২৭

দূরের বঁধু

বঁধু দূরে—বঁধু দূরে,
গাও অনাহত মধু সুরে!

অতি দুঃসহ পরশ আমার
কাছে থেকে তাই সহেনা তোমার,
দূরে সরে যাই তবু যদি পাই
তোমারি আভাস সুরে!

দূরে আছ তাই ভালবাস
চলে যাও তাই ফিরে আস;
আদর করিতে হওগো নিঠুর
কাঙাল বেদনাতুরে!

চিত্র-পরিচয়

শ্রাবণ সংখ্যা.

["নবজন্ম"—বিশ্বের তরুণ শিশুটী জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া অতীত হইতে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে——জন্ম মৃত্যুর চিরন্তনী লীলার মধ্যে দণ্ডে দণ্ডে তাহার "নবজন্ম"]

রাখালী

চিত্রশিল্পী---শ্রীপুলিন বিহারী দত্ত।

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে,' তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমার জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমার কৈশোরের মধুবন, তোমার সম্পদের দ্বারকা, তোমার ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত।"

১৬শ বর্ষ | আশ্বিন—১৩২৭ | ৩য় সংখ্যা

আলোচনী

[পঞ্চভূত]

মাসিক কাব্য পরিচয়
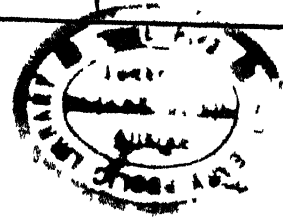
উপাসনা তিন চারি মাস বন্ধ থাকার পর গত শ্রাবণ হইতে নূতন ভাবে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। এ বৎসর আমরা নানাকারণে মাসিক কাব্য-সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের বন্ধুবান্ধব ও পাঠকগণের অনুরোধে ও আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় এই মাস হইতে সমালোচনা প্রকাশ করিব। কেহ কেহ বলেন,—'আপনারা মাসিক পত্রের শুধু কবিতাগুলির সমালোচনা না করিয়া প্রবন্ধ গল্প চিত্র ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়গুলিরও সমালোচনা করেন না কেন?' তাহার উত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে—মাসিক পত্রিকাগুলির নির্ব্বিচারে সকল প্রবন্ধ নিবন্ধের সমালোচনার ভার গ্রহণ করিলে কোনো বিষয়েরই প্রকৃত আলোচনা এবং কোনো মাসিক পত্রেরই যথাযোগ্য সমালোচনা করা ঘটিয়া উঠিবে না। তাহার প্রথম কারণ,—সকল মাসিক পত্রিকার সার্ব্ববিষয়িক সমালোচনার জন্য যে পরিমাণ পরিসরের প্রয়োজন তাহা একখানি মাসিক পত্রিকায় জুটিয়া উঠা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় কারণ—মাসিক পত্রিকায় যে সকল বিষয়ের প্রবন্ধ নিবন্ধাদি থাকে সে সকল বিষয়ের পরিপুষ্ট জ্ঞান না থাকিলে নির্ব্বিচারে গদ্য পদ্য সমগ্র সাহিত্যের সমালোচনা করা সম্ভব নহে। আমাদের সকল বিষয়ে সমান অধিকার বা অধিগতি না থাকায় ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। দাবাখেলায় অধিকার যাহাদের অপেক্ষাকৃত সামান্য তাহারা অনেক সময় বসিয়া বসিয়া উপরচাল দিয়া থাকে তাহাতে বিজ্ঞ খেলোয়াবের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। সেইরূপ উপর চালাকী চালাইয়া আমরা বিজ্ঞতার ভান করিতে চাহি না। "উল্লেখ যোগ্য নহে" "জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ" "সারগর্ভ" "সরস সুন্দর রচনা ভঙ্গি" "বেশ সাবলীল গতি" "সমালোচনার অযোগ্য" ইত্যাদি কয়েকটি বাঁধি বুলির সাহায্যে ২৫টা গল্প ও ২৫টা প্রবন্ধেরও সমালোচনা (?) করা যাইতে পারে। কিন্তু এ প্রবঞ্চনা সাহিত্য ক্ষেত্রে চল

উচিত নহে। মাসিকপত্র ও মাসিকপত্রের লেখকদের প্রতি সুবিচার করিতে হইলে প্রায় কোনো রচনারই সমালোচনা ২।১ কথায় চলিতে পারে না।

কাব্য সমালোচনাতেই যে আমাদের বিশিষ্ট অধিকার একথা আমরা সগর্ব্বে বলিতে চাহিনা। তবে আ[illegible]রা সমস্ত মাসিক পত্রিকার সমস্ত কবিতাই মনোযোগ সহ[illegible]রে পাঠ করিয়া থাকি—সমালোচনা লিখিবার আগে সা[illegible]ত্য-সেবী ও রসজ্ঞ বন্ধুগণের সহিত কবিতাগুলি সম্বন্ধে [illegible]লোচনা করিয়া থাকি—বা[illegible]লার নবযুগের কাব্য সাহিত্যের উন্নতি অবনতির ধারাটিকে আমরা অনুসরণ করিয়া [illegible]সিতেছি এবং নববঙ্গের সমস্ত কবির প্রায় সমস্ত রচনাই আমরা পাঠ করিয়াছি। আমাদের কোনো সাম্প্রদায়িক বি[illegible] নাই—কোনো কবির প্রতি আমাদের অযথা পক্ষপাতও নাই। আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ও রসজ্ঞান আদর্শ অনুসারে যতদূর সম্ভব সুবিচার করিতেই আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে উদ্যোগী হইব। আমাদের সমালোচনায় কোনো ত্রুটী থাকিলে সুধী সমাজ তাহা প্রতি-সমালোচনায় দেখাইয়া দিলে কৃতজ্ঞ হইব।

আর একটী কথা, বঙ্গদেশে এতগুলি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, এক 'সাহিত্য' ব্যতীত কোনো প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র বর্ত্তমান সাহিত্যের সমালোচনা করেন না। পুস্তকের সমালোচনা অল্পবিস্তর সকল পত্রিকাতেই থাকে। কিন্তু মাসিকপত্রে এমন অনেক জিনিস প্রকাশিত হয় যাহা কখনো পুস্তকস্থ বা পুনঃ মুদ্রিত হয় না। সেগুলির প্রকৃত সমালোচনা হইলে লেখক ও পাঠক উ[illegible]য়েই সমধি[illegible] উপকৃত হইতে [illegible]রেন। নিন্দা ও প্রশংসা দুইই হিতকর [illegible] প্রশংসায় লে[illegible] উৎসাহ লাভ করেন নিন্দায় লেখক আপনার ত্রুটীগুলি [illegible]ক্ষ্য করিয়া সংশোধন করিয়া লইতে পারেন। সমালোচনায় নিন্দা প্রশংসা দুইয়ের সমবায়ে পাঠকের মনে রসজ্ঞতা প্রবুদ্ধ হয়। আমরা মাসিকপত্রের কবিতা সমা[illegible] ভার লইয়াছি। আমা-[illegible] [illegible]গিগণকে অ[illegible] [illegible] তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ের ভারগ্রহণ [illegible]রুন। [illegible] কোনো মাসিকপত্র গল্প ও উপন্যাসের, কো[illegible] মাসি[illegible]পত্র যদি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের, কোনোটি দার্শনি[illegible] প্রব[illegible] সমালোচনার প্রা-লয়েন্ তাহা হইলে একদিকে যেমন বাংলায় সমালোচনা সাহিত্যের (critical lit.) শ্রীবৃদ্ধি হয় অন্যদিকে তেমনি লেখক ও পাঠকের প্রভূত আনুকূল্য ও সুবিধা হয়। মানসী ও মর্ম্মবাণী যদি গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের ভারতী যদি চিত্র শিল্পের, পল্লীবাণী যদি ইতিহাসের, ব্রহ্মবিদ্যা যদি দর্শনের, সবুজপত্র যদি সমাজ-বিজ্ঞানের সমালোচনার ভার লয়েন তাহা হইলে অধিকাংশ বিষয়েই সুসমালোচনা প্রত্যাশা করা যায়। প্রবাসী রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আলোচনায় শীর্ষস্থানীয়। নারায়ণ এ বিষয়ে প্রবাসীর অনুসরণ করিলে রাষ্ট্রনীতিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

গত ছয়মাসে কবিতা হিসাবে মাসিক সাহিত্যগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানসী ও মর্ম্মবাণীতে ক্রমেই কবিতা কমিয়া আসিতেছে। বঙ্গের দুইজন লব্ধ-প্রসিদ্ধ কবির রচনা মানসীতে আর আমরা দেখিতে পাইনা—একজন শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী অন্যজন শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাও মানসীতে আর দেখি না। কবি শ্রীকালিদাস রায় বরাবর একভাবেই মানসীতে আছেন। কবি কুমুদ-রঞ্জনকেও মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। পূর্ব্বে ইনি মানসীতে ছিলেন না। দুই একটী মহিলা কবির নীরস কবিতাও মানসীতে দেখিতে পাই। সম্পাদক মহারাজ নিজেও আর লেখেন না। মোটকথা কবিতাহিসাবে মানসীর অবনতিই হইয়াছে।

ভারতী ত সত্যেন্দ্রনাথের একচেটিয়া। তবে সত্যেন্দ্র বাবুর ভাল ভাল কবিতাগুলি ভারতীতে প্রকাশিত হয় না। কিছুদিন হইতে দেশের গণ্যমান্য লোকদিগকে একজন কবি কবিতায় নির্লজ্জ গালাগালি দিয়া ভারতীর মন্দির কলঙ্কিত করিতেছেন। কবিত্ব হিসাবে সেগুলি যেমনি হউক—ভারতীর মর্য্যাদা তাহাতে রীতিমত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। চটুলতা ও তরলতার পক্ষপাতী ভারতীতে ইতোমধ্যে দুইজন শক্তিশালী কবির আমরা সাক্ষাৎ পাইয়াছি, একজন শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়, অন্যজন শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। কুমুদবাবুকেও ভারতীতে আজকাল দেখি—ইনি ভারতীর মন্দিরে নূতন প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে আজকাল কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির কবিতা প্রকাশিত হয় না, বিজ্ঞাপন-বৃংহিত গল্পমেদো-ভাবাক্রান্ত অতিকায় মাতঙ্গের অপাঙ্গের মত মিট মিট করিতে থাকে। ভারতবর্ষে কবিতা অত্যন্ত অল্পই প্রকাশিত হয়। ২।৪টা যাহা প্রকাশিত হয় তাহা তৃতীয় শ্রেণীর। ভারতবর্ষে কাব্যসাহিত্যের অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। প্রমথনাথ দেবকুমার কুমুদরঞ্জন, কালিদাস করুণানিধান ইত্যাদি কবিগণ যাঁহারা ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক ছিলেন আজকাল ভারতবর্ষে আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না।

প্রবাসীর কাব্যসম্পদের ক্ষয় বৃদ্ধি বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কবি কুমুদরঞ্জনের কবিতা আজকাল প্রবাসীর প্রবন্ধের পাদপীঠে দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন রবীন্দ্রনাথ কবি কুমুদরঞ্জনের কবিতার সুখ্যাতি করার পর হইতে প্রবাসী ভারতীতে তাঁহার কবিতার সমাদর বাড়িয়াছে। প্রবাসীতে প্রবীন কবি বিজয় বাবুকে আমরা মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। প্রবাসী কতকগুলি শক্তিশালী নবীন কবির রচনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ দান করিতেছেন।

স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় সবুজপত্রে কবিতার সমাদর নাই। সুকবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কবিতাই উহাতে মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। সবুজপত্রে কবিতা খুঁজিতে গেলে প্রবন্ধের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেই কবিত্ব ফল্গুর ন্যায় অন্তঃস্তরে প্রবাহিত হইতেছে।

সাহিত্যে কবিতা প্রকাশিত হয় না বলিলেই চলে। নারায়ণের সম্পাদিকা কবি। তাঁহার পত্রিকায় কবিতার সংখ্যাও বেশী। তবে সৎ কবিতার সংখ্যা—মুষ্টিমেয়। প্রতি সংখ্যায় সম্পাদিকা, কুমুদরঞ্জন কালিদাস ও বসন্ত-কুমারের কবিতা থাকে। এ ছাড়া পরিমলকুমার জ্ঞানাঞ্জন ও মহিলাকবিরা মাঝে মাঝে আছেন। ইঁহাদের ভাল কবিতাগুলিকে কিন্তু কলিকাতার পত্রিকাতেই দেখি।

মালঞ্চে কবিতা as numerous as black berries—২।১টী ছাড়া বাকী সবই অপরিপক্ক হাতের মক্সো। মালঞ্চের কবিতা নির্ব্বাচন অত্যন্ত অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা সূচনা করে।

মোসলেম ভারত নূতন মাসিকপত্র। কি [illegible] ভাবেতে সত্যেন্দ্রনাথ কুমুদরঞ্জন কালিদাস ইত্যাদি কবিগণের কবিতা প্রকাশিত হইতেছে। কাজী নজরুল ইস্‌লাম নামে একজন মুসলমান নবীন কবি তাঁহার রচনায় প্রভূত শক্তির পরিচয় দিতেছে।

সওগাতের বহুদিন সংবাদ জানিনা। পল্লীবাণীতে কবিতার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী কিন্তু প্রায় সবগুলিই কবিতানামের অযোগ্য। সন্দেশে কবিতার একটু অবনতি লক্ষ্য করিতেছি। প্রতিভা ও ঢাকা রিভিউয়ে সৎকবিতার সন্দর্শন ঘটে না বলিলেই হয়। অর্চ্চনার কাব্য সম্পদ মন্দ নয়।

কবিতার দিক হইতে নারায়ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নারায়ণে কবিতার বড়ই দারিদ্র্য ছিল। কবি বারীন্দ্রকুমারের সমাগমে শুষ্কবৃক্ষে মঞ্জরী উদ্গমের ন্যায় নারায়ণ কবিতায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন শুধু তুলসীপত্রে নারায়ণের অর্চ্চনা চলিতেছিল—এখন অতসী বেলা কুন্দের প্রচুরতায় নারায়ণ শ্রীমণ্ডিত। কবিতা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সম্পাদক মহোদয় আরো একটু অবহিত হইলে ভাল হয়।

যমুনার সম্পাদক কবি। যমুনার কবিতাগুলি সুরচিত এবং সুনির্ব্বাচিত, শুনিয়াছি নববর্ষে অনেকগুলি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এখনো সব পত্রিকা দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করি নাই।

কবিগণের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ, দুই প্রমথনাথ, দেবকুমার রমণীমোহন, করুণানিধান নীরব। কুমুদরঞ্জন অতিরিক্ত মুখর। এমন মাসিক পত্র পাইনা যাহাতে কুমুদরঞ্জন নাই। "ন তজ্জলং যন্ন সুচারু পঙ্কজং।" বারানসী হইতে প্রকাশিত কাপড়ের দোকানের বিজ্ঞাপন ভারাক্রান্ত ঘুড়ির কাগজে ছাপা প্রবাসজ্যোতিতে পর্য্যন্ত তাঁহার কবিতা দেখিতে পাইতেছি। অতিরিক্ত প্রসব করিলে যে কুফল হয় তাহা হইতে কুমুদ বাবুর লেখনী অব্যাহতি পাইতেছেন না। কবি কালিদাসের

রচনা আজ কাল কম দেখিতে পাই। মানসী ও পরিচারিকায় অবশ্য প্রায় প্রতিমাসেই থাকে। কবি কালিদাস আজকাল অল্প লিখিতেছেন—কিন্তু অল্পসংখ্যক রচনার যে সুফল হইবার সম্ভাবনা তাহাত বড় দেখিতে পাইতেছি না। এখন তাঁর হাতে ব্রজের বেণুও বাজিতেছে না—বাংলা মাঠের রাখালী বাঁশীও বাজিতেছে না বরং মাঝে মাঝে কাঁসী বাজিতেছে। কবি যতীন্দ্রমোহন নিজের সম্পাদিত পত্রিকা ব্যতীত অন্য কোনো পত্রিকায় কবিতা দেন না। কবি যতীন্দ্রমোহনের রচনা-যমুনায় ভাটা পড়িয়া আসিয়াছে। ইন্‌জিনিয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ দিনকতক ধধূপের মত আকাশে উঠিয়াছিলেন—আমরা ভাবিতে-ছিলাম বোধ হয় তারকাপংক্তির মধ্যেই বা স্থান পা'ন। কিন্তু ক্রমেই দীপ্তি ম্লান হইতেছে। ভুজঙ্গবাবু নীরস অনুবাদে ব্যস্ত। গিরিজানাথ বাবু বোধ হয় পাঁয়তারা কষিতেছেন—ছয়মাস পাঁয়তারার পর তিনি এক ঘা দেন। সেকরার ঠুকঠাক-কামারের ঘা। মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবী বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের ব্যঙ্গ রসের চটক কোথা গেল? জীবেন্দ্রকুমার একভাবেই চলিয়া-ছেন—তাঁহার রচনা সম্বন্ধে নিন্দারও কিছু নাই প্রশংসারও কিছু নাই। বসন্তকুমার ইতোমধ্যে বড়ই শোকতাপ পাইয়াছেন। তাঁহার শোকশায়কাহত হৃদয়ের কারুণ্যসজল উচ্ছ্বাসগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার অন্যশ্রেণীর কবিতাগুলি নীরস ও আন্তরিকতাশূন্য। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচনা—আমাদের ভালই লাগে। কয়েকটি উদীয়মান কবির রচনা বেশ আশাপ্রদ। সাধনায় অবহিত হইলে তাঁহারা কবি পদবী লাভ করিতে পারেন। এই নবীন কবিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান পরিমল কুমার, বিশ্বপতি, হেমেন্দ্রলাল, সাবিত্রীপ্রসন্ন, প্যারী-মোহন, কৃষ্ণদয়াল বসু হাবীলদার কাজীনজরুল ইসলাম, মণিকান্ত হালদার, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, কিরণধন চট্ট, চণ্ডীচরণ মিত্র যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জ্ঞানাঞ্জন চট্ট ইত্যাদি। স্ত্রী-কবিগণের মধ্যে প্রফুল্লময়ী, অমিয়া দেবী, কালিদাসী দেবী তরুলতা দেবী ইত্যাদির কবিতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কবি বারীন্দ্রকুমারের অজস্র রচনা প্রকাশিত হইতেছে কবিতায় যথেষ্ট ভাবগাম্ভীর্য্য আছে—কিন্তু ছন্দোবন্ধের শিথিলতার জন্য হৃদয়গ্রাহী হইতেছে না। বেনামীতে যাঁহারা লেখেন তাঁহাদের মধ্যে 'দরবেশ' ও 'বনফুলের' রচনা আগ্রহ সহকারে পড়ি।

মাসিক কাব্য সমালোচনা

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ।—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "রাসরাগ" পড়িয়া পাঠকের রোষ-রাগই বর্দ্ধিত হয়। ভাষার বাহার দেখিয়া হাস্যসম্বরণও করা যায় না। কতকগুলি ললিত শব্দের একত্র সমুচ্চয় হইলেই কবিতা হয় না। পাঠকগণকে ভাষার নমুনা কবির যমুনাতীর হইতেই দিতেছি—

চল চল সখি চল যমুনাতীরে
বেণু বন শিহরণগুঞ্জিত স্বনন ঘন মুখরিত চন্দন গন্ধী তীরে।
হিমধারা ভরুনিত, বিকসিত কুসুমিত
মোদিত নন্দসুত নির্ম্মল কেলি পূত
বিকল বিহগকুল বিস্ময় বিলোকিত
শ্যামল পুলিন পরে শ্যামেরে ঘিরে।

পাঠকের যদি অবসর থাকে তবে বসিয়া বসিয়া সমাস ভাঙ্গুন। একঝুড়ি তুষের মধ্যে কয়টি দানা মিলিবে তাহা বলিতে পারি না। উদ্ধৃতাংশে তবু ললিত পদবিন্যাস আছে। নিম্নোদ্ধৃত অংশে অর্থত প্রাঞ্জল নহেই লালিত্যও নাই।

বিমোহিত পিপাসিত প্রকাশ অযুত আঁখি
সে অরূপ. অপরূপ নয়নে নিচল (?) রাখি,
প্রবল প্রাণের টানে কিছু নাহি থাকে বাকী
নয়নে পরাণ ঢালি দিল অচিরে।

তারপর—"সকল মিলিয়া যায় এক সে শ্যামের সাজে"
"চুম্বন কত করি কহিব কিরে"
"মন্দ কালিন্দীতে (?) ধবল কমল রাশি (?)
"মাধব সমাধি মাঝে মগনা ধীরে" ইত্যাদি পংক্তিগুলি কবির রচনা দৈন্যের চরম নিদর্শন। "গুরুঘন কম্পন স্পন্দিত" ইত্যাদি অনেক গুরু গম্ভীর বচন সত্ত্বেও কবিতার

অবস্থা রোচনীয় না হইয়া শোচনীয়ই হইয়াছে। "কুসুমিত" ও "কেলিপূত"কে কোনোরূপে মিলের মধ্যে ধরিলেও "তীরের" সহিত "তীরের" মিল সহ্য করা যায় না।

"কালার জননী মোরা কালার ভগিনী মোরা
কালারূপ পাগলিনী প্রণয়িনী প্রেমডোরা
রাসরাগে অনুরাগে দিশেহারা সব মোরা"

এই কয় পংক্তির মধ্যে যে রস (?) আছে তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার ভার বৈষ্ণব শাস্ত্রবিদ্‌গণের হস্তে প্রদান করি। মোট কথা কবিতাটির সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, ইহা ভারতবর্ষের পৃষ্ঠকে ক্লিষ্ট করিয়াছে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের "অপূর্ণের দেশ" কবিতাটি "অপূর্ণের দেশ" হইতেই আহৃত। কবিতাটি যেন "ঊর্দ্ধে তুলে ক্রুদ্ধ নখর ঝম্প দিবার জন্য—"। এই যে অপূর্ণের দেশ—এদেশ "কম্পিতকায় কুরঙ্গিনী অমব হয়েই মবণ ব্যথা সয়" এদেশে "আগ্রহের ওই উদগ্রতাতেই ব্যগ্রসেবকবর্গ" এদেশে "কর্ণিকারেব কুঞ্জে পুষ্প পুষ্পিত নয়" কিন্তু "গঙ্গা রুদ্রজটায় লোধ্র ফুটাইতে থাকে কেন না সে পথ পায়না।" কবিতাটির মিলগুলি সুন্দর হইলেও ভাষা অনুপ্রাস কণ্টকিত হইলেও ভাবটি একেবারেই ফুটে নাই। অনেক স্থলে ভাল করিয়া অর্থও বুঝা যায় না।

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্তেব "দৈন্যবরণ"। কবি কবিতায় দৈন্যবরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হইয়াছে। ভাষা ও ভাবের দীনতার অভাব ঘটে নাই। কবি "দাঁড়ালে দুয়ারে তুমি" লিখিয়া মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন। "তুমির" সহিত মিল দেওয়াত তাঁব পক্ষে সহজ নহে শেষে লিখিলেন "কামনাগন্ধ বিলাসছন্দ খেলে না হৃদয় চুমি," আর একবার 'তুমি'র মিল দিতে 'ভূমি' গ্রহণ করিয়াছেন "তুলি অঙ্গুলি ভূমি—যে ডাকে তোমারে দেখাও তাহারে কোথা সাধনায় ভূমি"। কবি একস্থলে "শিঙ্গা ফুকিয়াছেন" "শিঙ্গার" বদলে 'শিঙা' কিংবা 'শৃঙ্গ' ব্যবহার করিলে ভাল করিতেন। অদ্ভুত কল্পনাও আছে "পুণ্য সরযূতীরে—দীনের চরণ (?) পাতিল আসন কোশল-প্রসাদ শিরে।"

—ভাদ্র। "অন্তিম প্রার্থনা" শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—। এই অন্তিম প্রার্থনার পর কবি কাব্যলক্ষ্মীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেই ভাল হয় অন্ততঃ ভারতবর্ষের নিকট হইতে। কবিতাটিতে ছন্দ ভাব ভাষা কোনোটারই মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। সমালোচনার যোগ্যও নহে। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেনের "অপরূপ" অপরূপই হইয়াছে। নমুনা—দিবসে দুপুরে কাছে আসি, মুখখানি ভরা শুধু হাসি, নয়নে নয়ন রাখি, চুরি করে প্রাণপাখী—কিছু নহে বল পরকাশি, দিবসে দুপুরে কাছে আসি। কবি একটু ভাবিয়া দেখিতেও বলিয়াছেন। যথা—

"আরো দেখো বাঁশী আছে কত কত সুরে বাজে কত মত কাহার বাঁশরীস্বরে, যমুনা উজান ধরে, কার বাঁশী করে উনমত দেখো ভেবে, বাঁশী আছে কত।" কবিতাটি আগাগোড়া ত্রুটী-কণ্টকিত।

"শ্রীমতীর বেশবিন্যাস"—শ্রীনরেন্দ্র দেব বিরচিত। কবি বলিতেছেন "বিনায়ে বিনায়ে বিনোদ গোখুরে—বাঁধিল কবরী কত।" গোখুর—কি গোখুরা সাপ—তা' যদি হয় তবে, বাপ্‌রে বাপ! চিরুণী নয়ত? মহিষের শৃঙ্গের বদলে কি গোরুর খুরে নির্ম্মিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে? কবিতায় রঙ্গের অভাব নাই—"রঙ্গিল রাধা রঙ্গিলাধর রক্তিম রসরাগে। লাক্ষা রসের অরুণ বরণে, রঙাইল বাই রাতুল চরণে।" ইত্যাদি—

"কালোতে আলো" শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী। কবিতায় "সুগম্ভীর স্বরে খাতার অক্ষরে পাতায় কুসুমে কয়, হেসোনা হেসোনা গরবিনি অত গরব ভাল নয়।" কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। "জন্মাষ্টমী।" শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত। যামিনী বাবু অতি কষ্টে মিল দিয়া যেকয় পংক্তি লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমরা তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছি। রচনায় বিন্দুমাত্র সৌষ্ঠব নাই। ২৪ লাইন কবিতায় 'য়' এর মিল দিয়াছেন ৬টি—'রে' এর মিল দিয়াছেন ৮টি। ভাষায়ও বিন্দুমাত্র লালিত্য নাই। কবি ৮।১০ বৎসর এখনো মক্সো করুন। "মিলনে' শ্রীভক্তলতা দেবী। কবিতায় ভাষা ভাব-ভঙ্গি, সকল-দিক হইতেই নিদারুণ দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

"বঙ্গবন্দনা"। শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ। শ্রীপতিবাবুর কবিতায় যাহা থাকে অর্থাৎ কুঞ্জ, গুঞ্জিত, নন্দিত মঞ্জুগন্ধ, আনন্দ ঝঙ্কৃত ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ যাহা লইয়া তাঁহার কবিতা তাহা এ কবিতাতেও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এমন প্রাণহীন শব্দঝঙ্কার এমন রসহীন ঝুনঝুনি লইয়া কবিতা হয় না। তারপর ভাষাতেও বড় গোলযোগ করিয়াছেন। "শুভ গঙ্গা যমুনাহারের" শুভের সার্থকতা কি? "সিন্ধুনীলাভজল" না—'নীলাভ সিন্ধুজল'? "উর্ম্মিলা প্রীতিরাগছন্দা (?) জল", জল কি স্ত্রীলিঙ্গ? "পুষ্পিত তরুদল শঙ্কিত ভূমিতল" তরুদল পুষ্পিত বলিয়াই কি ভূমিতল শঙ্কিত? "অঞ্চল, ফুল মধুগন্ধা" ফুলমধুগন্ধা কি অঞ্চলের বিশেষণ?—না—বঙ্গভূমির বিশেষণ? ফুল মধুগন্ধা কি সমাস? "কর্ম্মদণ্ড করে ভাস্বর মহীয়ান," ভাস্বর —না—ভাস্কর? যদি ভাস্বর হয় তাহা হইলে ভাস্বর কে? আর যদি ভাস্কর হয়, তাহা হইলে তাঁহার করের কর্ম্মদণ্ডের কল্পনা বড়ই আজগুবী। "ন্দা" দিয়া আর মিলাইতে না পারিয়া কবি 'ত্তা'র শরণাপন্ন "সর্ব্ব বেদনা শোকহন্তা" ইহাও কি বঙ্গ জননীর বিশেষণ? "ধান্যের ঝাঁপি" কি? "হেমন্তে হেরি তোমা" ও "ঝঙ্কারি বীণা ওমা" মিলিতে দেখিয়া না হাসিয়া থাকা যায় না। "পুণ্যপীযূষ প্রেমানন্দা"র অর্থ কি? কি সমাস? "চণ্ডীপ্রসাদ যত কাব্যপাপিয়াগণ—স্তন্য তোমার পিয়ে ধন্য করিলে মন। কাব্যপাপিয়ার স্তন্যপান ও মন ধন্য করার কল্পনা বিচিত্র। "আলোপন্থা" কালো কহ্লার মত বঙ্গজননীর কুটীরে শোভা পাইতেছে। "মন্ত্রমরম মাঝে অক্ষয় জ্ঞান রাজে ধ্যান নিরত জ্ঞানানন্দা।" অদ্ভুত পদবিন্যাস। কবিতার শেষশ্লোকে আসিয়া কবি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন—কারণ 'ত্তা' ও 'ন্দা' কবির ঝোলাঝুলিতে তখন নিঃশেষিত। কাজেই আবার "অঞ্চল ফুল মধুগন্ধা" কেই ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছে। শ্রীপতি বাবুকে আর কি বলিব? তিনি নিজেই কবিতাটি আর একবার পড়িলেই নিজেই লজ্জিত হইবেন।

"ছাড়াছাড়িতে" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের রাজসাহীর চাষার ভাষায় রচিত গান। কবিতাটী আমাদের বেশ ভালই লাগিয়াছে।

"কবীর"—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ। কবিতাটি চলনসই। মাঝে মাঝে ছন্দের দোষ আছে।

"তিলক-তর্পণ" শ্রীনরেন্দ্র দেব। মহাত্মা লোকমান্য তিলকের উদ্দেশে মাসিকপত্রে যতগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে এই কবিতাটী সকলগুলির চেয়ে আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কবিতার ভাষা ভক্তিতে ভরপুর ভঙ্গি সুগম্ভীর।

কবি বলিয়াছেন—"বন্দীর গৃহ মন্দির যার, শৃঙ্খলতার কণ্ঠেরহার, নিগ্রহ ছিল সম্মান তার, দণ্ড,—পুরস্কার।" বড়ই সুন্দর।

"বাদলা রাতে" শ্রীমহিলাসুন্দরী গুহ। কবিতাটিতে বেশ শব্দ ঝঙ্কার আছে। এই মহিলাটির রচনা বেশ আশাপ্রদ। করুণানিধানী ভঙ্গিটি বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন।

নারায়ণ।—আষাঢ়। 'প্রৌঢ়ে কবি' শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। নারায়ণের প্রথমপাতে প্রকাশিত হইলেও কবিতাটি তেমন সুন্দর হয় নাই। মাঝে মাঝে ব্র্যাকেট দিয়ে কতকগুলি শব্দকে ছন্দের বাহিরে রাখিলে রচনা শক্তির দৈন্যই সূচিত হয়। "নীরব উৎসব" শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী বসুর অষ্টপদী কবিতা। নীরস রচনা। "অপেক্ষায়" শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতার ভাবভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র মৌলিকতা নাই—এ সব কথা অন্য কবিরা সরস ভঙ্গিতে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। "অপলক চাহনিতে তোরণ রচনার" কল্পনা অদ্ভুত রকমের মৌলিক। "অভিষেকে অজস্র বসুধারার" কথা বুঝিলাম না। "অধরযুগল চূতপল্লব জীবনদল বেদিকার পাশে নিয়ত রহিবে তারা" দুঃসহ কল্পনা। "প্রসাধন মম চিরবসন্ত বাজিবে সেঙ্গে যৌবন বনে মুকুলিবে সে পরশে।" ইহাতে বসন্তের গৌরব বা ছন্দের মর্য্যাদা কোনোটিই রক্ষিত হয় নাই।

"আমি ও তুমি" শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বালকের রচনা বলিয়া মনে হয়। কবি "ধৈর্য্যবারিতে অবগাহন করিতে চাহিয়াছেন" তাহাতে আমাদের ততটা আপত্তি ছিল না—কিন্তু তিনি আরো বলিয়াছেন "আমি রৌদ্রতপ্ত ধূসর ধূলায়, (যাবো) গরবে লাঙ্গলটানি" আমাদের মতে তাঁহার অধিক তীব্র রৌদ্রে লাঙ্গল টানা উচিত নহে।

লাঙ্গল টানার পরই "গোষ্ঠপানে"। রচয়িতা শ্রীক্ষেত্র লাল সাহা, এম, এ। ছন্দটি বেশ। "গুঞ্জাফুল"—না "গুঞ্জাফল"? "ওদনদধি পাঁচনী সহ সুষমা শুভচিন্"—বুঝিলাম না।

"ভাঙ্গা বীণার গানে" শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, "অসীম সসীম, অনন্ত" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বেশ ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন কিন্তু জোরালো করিতে পারেন নাই।

"মিলিয়ে নাও"—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। কবি গানটীতে মিল দিতে পারেন নাই—কাজেই পাঠকদিগকেও "মিলিয়ে নাও" বলিয়া অনুরোধ করিয়াছেন।

—শ্রাবণ। "পাগলের খেয়াল", পাগলটি হইতেছেন শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। গানটী মন্দ হয় নাই।

"অভাগা।" শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবীর। কবিতাটী চলনসই। বাঁশী মল্লারে কেন গান গাহিবে বুঝা গেল না।

(ক্রমশঃ)

—•—

সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, এম্‌-এ]

শাজাহান তাজমহল না গাঁথিয়া যদি গোটাকতক ধর্ম্মশালা তৈরি করিয়া যাইতেন—তাহা হইলে হয়তো মানুষের কাজে লাগিত। লোকজন আসিয়া তাহাতে বিশ্রাম করিত, খাওয়া দাওয়া করিত বিদেশে আশ্রয় পাইয়া কতটা উপকৃত হইত! আর তাজমহলে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ার কথাতো দূরে থাক, একটা গোরু বাঁধিয়া রাখিবার খোঁটা পর্য্যন্ত নাই! প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়ীটা পড়িয়া আছে—এক পয়সা ভাড়াও আসে না। এইরূপ দোকানদারি বুদ্ধিতেই সংসারের বেশীর ভাগ লোক হিসাব করে। এমন যে সুন্দর ঐ তরুণী, যাহার অরুণিম অধরে যেন সুধা ক্ষরিতেছে মুখ দিয়া বচন অমিয়া ঝরিতেছে, ভ্রমরের মত কালো চোখ দুটির উজল তারা প্রাণের নীরব আবেশ যেন বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে, কালো এলোচুল গোলাপী রঙের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া, প্রশস্ত ললাটখানিতে অলস অলকার ঢেউ তুলিয়া কত শোভার সৃষ্টি করিয়াছে, সংসারের বুদ্ধিভাগী রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূল্য ঠিক করিলেন তেইশ টাকা দশ আনা। মানুষের ভিতর যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বণ আছে—তাহার দাম নাকি অত! অবশ্য আমি যুদ্ধের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—এখন হয়তো মানুষের মূল্য কিছু বাড়িয়া থাকিতে পারে।

জগৎকে দেখা, তাহার সৌন্দর্য্যকে দেখা এবং মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করার একটা ধারণা আছে। যে স্বভাবেই সুন্দর, অথবা মানুষের হাতে গড়িয়া সুন্দর—তাহাকে শুধু আমার প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া দেখিলেই চলিবে না! প্রকৃতির আনন্দ—তাহার সৌন্দর্য্য নিজের ভাবেই, নিজের নিষ্প্রয়োজনীয় ভাবেই অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়া আছে। এই যে মাথার উপরে অসীম নীলের বিস্তার, সেই নীলের মধ্যমলে গ্রহ-তর্পন-তারকা-চন্দ্রের যুগ যুগ ধরিয়া নটনলীলা; ঐ যে অভ্রভেদী গিরিশিখর, অনন্ত বিস্তৃত নীলজলধি, উহা কি প্রয়োজনে লাগিতেছে জানি না। ঐ নীলকে ধরিয়া যদি আমার রঙের কারখানা চলিত, কিম্বা হিমালয়ের সাদা বরফ আমার দোকানে মন হিসাবে বিক্রয় হইত, নীলাম্বুধির জলরাশি সেঁচিয়া লবণ বাহির করিয়া ব্যবসা চালানো যাইত—তাহা হইলেই কি ঐ সকল সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের বিশ্বে সার্থকতা ঘটিত?

কালো মেঘের কোলে চপলার ঐ যে উদ্দাম হাসি,

পাহাড়ের পাদদেশে ফুলের ঐ যে ঠেলাঠেলি, স্রোতস্বিনীর পাশে ঐ যে সবুজের নয়ন মনোরম বিস্তার—উহার সার্থকতা কি কেবল মানুষের প্রয়োজনেই? নধর লোহিত ঐ যে গায়ে ছিটে-ফোঁটা হরিণ শিশুটি মায়ের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, কোমল তৃণের আগাটি ভাঙিয়া খাইতেও যাহার কষ্ট বোধ হইতেছে, যাহার প্রাণ-কেড়ে নেওয়া চাহনিতে কি একটা করুণ-সুন্দর রস ঢালিয়া দিতেছে ওর দিকে চাহিয়া সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইব, না উহার মাংস কয় সের হইবে, তাহা ভাবিয়াই জিহ্বা হইতে প্রেমাশ্রু নিঃসরণ করিব?

সুন্দরকে নিষ্প্রয়োজনের ভিতর দিয়াই দেখিব। আমাদের জীবনে সেই নিষ্প্রয়োজনীয়তা মস্ত বড় একটা প্রয়োজনরূপে আছে। ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিই—তাহাতে কাজ হয় না বটে, কিন্তু দিনের বেলায় যে কাজটুকু করি, তাহা ঐ অকাজের সময়টুকুতে বিশ্রাম পাই বলিয়া। মানুষ শুধুই রক্তমাংস, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন নয়—২৩৷৶৹ অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক বেশী। যে রাসায়নিক এই অপূর্ব্ব মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন—তাঁহার সুন্দর শিশুটিকে লইয়া আমি যদি ২৩৷৶৹ দিই, তিনি খুসী হইবেন কি? অথবা তাহাকে মারিয়া যদি ঐ মূল্যের একখানি চেক দিই—তাহা হইলেই তাঁহার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে কি? কিম্বা প্রিয়তমের মৃত্যু হইলে সান্ত্বনা দিতে গিয়া যদি ঐ টাকা তাঁহার হাতে দিয়া প্রবোধ দিই—শোকের দারুণ জ্বালা নিবিয়া যাইবে কি?

তা যখন হয় না, তখন মানুষের দাম অন্যপ্রকারে কষিতে হইবে। তাহার ভিতর নিষ্প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই তখন জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দেখিতে পাইব। সৌন্দর্য্য অনুভব এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ভিতর প্রয়োজনের কথা নাই। নিষ্প্রয়োজনেই তাহার চরম সার্থকতা। হিসাব বুদ্ধির নিকট যাহা নিষ্প্রয়োজন—প্রয়োজনাতীত এমন একটা স্থান মানুষের জীবনে আছে, যেখানে নিষ্প্রয়োজনটাই মস্ত বড় একটা প্রয়োজন।

ঊষা তাহার সোণার আঁচল উড়াইয়া আসে—পাখী গায়, মানুষ অভিভূত হয়। শিশু তাহার আধ আধ ভাষায় কথা বলে, কচি ঠোঁটে মিঠে হাসি হাসে—মানুষের মন তাহাতে গলিয়া যায়। যুবতীর অঙ্গলাবনী ঢল ঢল করিয়া প্লাবিয়া বহিয়া যায়—মানব সে প্লাবনে ভাসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে। বসন্তের আগমনে নবকিশলয়ে সাজিয়া বৃক্ষলতা সূর্য্যকিরণে ঝলমল করে—কবির মন সেরূপে রসে ভরিয়া উঠে। অসীম সৌন্দর্য্যের নিকেতন এই বিশ্বজগৎ মানুষকে পাগল করিয়া রাখিয়াছে। চিত্রে, কাব্যে, ভাস্কর্য্যে মানুষের সেই পাগলামি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির হাসিরাশি হৃদয়ের প্রেমোচ্ছাস, অন্তরের নিভৃত অনুভূতি মানবের সৌন্দর্য্য বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া—তাহাকে উদাস করিয়া, পাগল করিয়া, প্রয়োজনের পারে লইয়া গিয়া আর্টের সৃষ্টিতে নিযুক্ত করিয়াছে। তাই ধর্ম্মশালা না হইয়া তাজমহলের সৃষ্টি হইয়াছে—তাই কবি বলিয়াছেন—

একথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর সা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবনযৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল
এ তাজমহল।

"বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষা" সমালোচনা

[শ্রীরাধারমণ নন্দিস্বরস্বতী, বিদ্যাভূষণ]

গত কার্ত্তিক মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে * অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, পি-আর-এস্ লিখিত "বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে তিনি একটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"* * * আমরা বিলাতী শিক্ষার মহিমায় ইংরাজের নিকট দাবী করিলাম, স্বায়ত্ত-শাসন। সরকার বলিলেন, তোমরা অযোগ্য। বেসরকারী ইংরেজ বলিলেন, তোমরা অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য। আত্ম-অভিমানে বড় আঘাত লাগিল—আমাদের বেদ, উপনিষদ্, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক প্রভৃতি সমস্ত তালপাতার এবং তুলট কাগজের জীর্ণ পুস্তক বাহির করিয়া দেখাইলাম,—তাঁহারা অনুকম্পার হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, কিছু বলিলেন না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি আমাদের এ পুরুষের ক্ষমতার প্রমাণ বলিয়া জগতের আদালতে গৃহীত হইল না। এমন সময়ে ভাগ্য-ক্রমে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র একেবারে জগতের সম্মুখে ভারতের বাণী প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইলেন।"

তাঁহার অন্যতম্ সিদ্ধান্ত এই, "দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, জাতীয় দাবী বলবত্তর করিতে হইলে, আমাদের আরও অনেক বিশ্ববিজয়ী বিখ্যাত পণ্ডিত সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারতের তপোবনের স্থান আজ ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় অধিকার করিয়াছে, সুতরাং মনীষার উৎকর্ষ-সাধনের দায়িত্ব আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের।" অন্যত্র সন্দর্ভকার লিখিয়াছেন,—"ভারতকলঙ্কের মোচন প্রথম করিয়াছেন বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্গালী জগদীশচন্দ্র।" স্থানান্তরে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় বলিয়াছেন,—"কিন্তু যাঁহারা আমা-দের শত বক্তৃতায় শত আবেদনেও কর্ণপাত করেন নাই, আমাদের সেই "ভাগ্যবিধাতাগণ" (!) সহসা রবীন্দ্রনাথের বীণার ঝঙ্কারে চমৎকৃত হইয়া যখন বলিলেন, তাইত ভারত-বর্ষ তবে অসভ্য নয়, যখন তাঁহারা জগদীশচন্দ্রের প্রচারিত নবীন সত্যকে (শুধু নবীন? অথবা নবীন অথচ প্রাচীন! "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" মনু।) বরণ করিতে যাইয়া স্বীকার করিলেন যে, ভারতবর্ষের লোক এখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ; তখন হইতে বিদেশে বহুকালপরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পুরাতন ধারণাগুলি ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল।"

উপরিলিখিত বাক্য সমূহের অন্তর্গত কোন কোন সিদ্ধান্তকে আমরা সাধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। তন্নিমিত্ত বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমাদিগের মতানুসারে প্রতিবাদ যোগ্য বাক্য সমূহের শিষ্টসম্মতরূপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রবন্ধকার এবং শিষ্টগণসমীপে আমাদের নিবেদন, ইহাকে পরদোষানুসন্ধানহেতুক প্রতিবাদ মনে না করিয়া প্রকৃত তত্ত্বাববোধের উপযোগিনী সাধ্বী সমালোচনা বিবেচনা করিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

---

* ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" প্রকাশিত হয়। আমি পৌষ মাসে বক্ষ্যমান প্রবন্ধ দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিয়া ইহা "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করি। সন্দর্ভ অমনোনীত হইলে আমার নিকটে উহা ফেরৎ পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পও প্রেরিত হয়। দুইমাস পরে এক স্মারক-পত্রও দিয়া-ছিলাম, কিন্তু এতাবৎকাল ঐ প্রবন্ধ "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" প্রকাশিত অথবা আমার নিকট প্রতিপ্রেরিত না হওয়ায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া সম্প্রতি অন্য পত্রিকার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম।—লেখক।
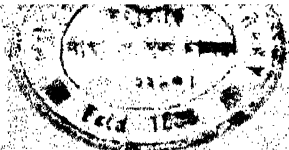
উদ্ধৃত সন্দর্ভাংশ সমূহের মধ্যে প্রধান সিদ্ধান্ত দুইটী। আজ এই যে, "ভারতের বাণী"র সভ্যজগৎ সমক্ষে প্রথম প্রচার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্র। এতদুভয়ের বিদ্যা ও মনীষাই "প্রথম ভারতকলঙ্কের মোচন" করিয়াছে। আমরা ইহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। কেন তাহা বলিতেছি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার অন্তর্গত চিকাগো মহানগরীতে যখন বিশ্বধর্ম্মমহাসভার (World's Parliament of Religions) আয়োজন হয়, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রতিভার দীপ্তিতে তখনও সভ্যজাতিগণের চক্ষুর সম্মুখ হইতে ভারতের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকার কিঞ্চিন্মাত্র অপনীত হয় নাই। তন্নিমিত্তই তখনও পাশ্চাত্য দেশীয় সুধীগণ, ভারতের আদি মহাবাণী—ভারতের সুপ্রাচীন দিব্যসভ্যতার শাশ্বত মহাসাক্ষী—শোপেনহর-শ্লিগেল্-উইলিয়মজোন্স্-মোক্ষমূলর প্রভৃতি নিষেবিত বেদান্তকে এবং তদনুগৃহীত দশ কোটি ভারতীয় আর্য্যকে ঐ নিখিলধর্ম্মসম্মেলনক্ষেত্রস্বরূপ মহাসভার এক কোণেও কিঞ্চিৎ স্থান দিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিভা তৎকালে সুদূরপাশ্চাত্য দেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল কিনা জানি না; কিন্তু জগদীশচন্দ্র ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর ধর্ম্মেতিহাস সভায় (Congress of the History of Religions) উপস্থিত হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন ইহা আমরা জ্ঞাত আছি। দূরপাশ্চাত্য দেশে ভারতকলঙ্কের মোচন ব্যাপার প্রথম আরব্ধ হইয়াছিল রাজা রামমোহনের উজ্জ্বল প্রতিভা দ্বারা। আনন্দমোহন, অতুলচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ ছাত্ররূপে এবং মহাবাগ্মী কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারকরূপে সিন্ধুপারে যাইয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব দীপ্ত প্রতিভা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিকশিত করিয়া ভারতকলঙ্ক মোচনের দ্বিতীয় বর্ত্ম পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলি তখনই প্রকৃতপক্ষে ভারতকলঙ্কের মোচন হইয়াছে, যখন এই বিশ্বমুণিক, পরবিজিত হীন ভারতের জনৈক দীন ভিক্ষুকের চরণতলে সভ্যতাগৌরবোচ্চশীর্ষ অত্যুন্নতিশালীতবক্ষ বিজ্ঞানমদোদ্ধতচিত্ত পাশ্চাত্য কোবিদকুল সসম্ভ্রমে অবনত হইয়াছে। ভারতের পরম-গৌরবসঙ্গীত তাবৎকাল কাহারও বীণার তন্ত্রীতে পূর্ণ রাগ-তানমানলয়ের সহিত ঝঙ্কৃত হয় নাই,—যাবৎকাল জনৈক গৈরিকবসন সন্ন্যাসীর কলকণ্ঠের সুধাবর্ষিললিতমধুরতান-তরঙ্গ (যাহার অপার্থিব উন্মাদনায় বিমুগ্ধ হইয়া গৌরবগর্ব্বিত আমেরিকা বলিয়াছিল, "* * * * an utterance that many of his hearers declared would of itself have been music, had you not understood a word."—Detroit Free Press.—"* * * * the wonderful voice, a voice all music, now like the plaintive minor Strain of an Eolian harp, again deep, vibrant, resonant."—*Mrs. Mary C. Funke.*) পাশ্চাত্য ভূমণ্ডলের বিস্তৃত বক্ষঃ পরিপ্লাবিত করিয়া ছুটে নাই। যথার্থরূপে তখনই "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পুরাতন ধারণাগুলি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ" করিয়াছে,—যখন ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্রের শিক্ষাচার্য্য সেই বিশ্ববিজয়ী নবীন সন্ন্যাসী অনন্ততত্ত্বগর্ভ বেদের নূতন অথচ চিরপুরাতন মহাসত্যকে বিশ্ব সমক্ষে জলদগম্ভীর নির্ঘোষে প্রচারিত করিয়া বিশ্বামদান্ধসভ্যতাভিমানীর ভারততিরস্কারপটুমুখ হইতে এই বাক্য নির্গত করাইয়াছেন,—"After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation."—*The New York Herald.* "রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র জগতের সম্মুখে ভারতের বাণী প্রচার করিবার" পূর্ব্বেই "বেদ, উপনিষদ্, কাব্য, অলঙ্কার নাটক প্রভৃতি সমস্ত তালপাতার এবং তুলট কাগজের জীর্ণ পুস্তক (কাব্য, অলঙ্কার, নাটক প্রভৃতি এক একখানি পুস্তক না কি?) বাহির করিয়া" দেখাইলে "তাঁহারা অনুকম্পার হাসি হাসিয়া" কেবল "মাথা নাড়িলেন" অথবা আরও কিছু করিয়াছিলেন, অপিচ "আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের" ঐ সকল "কীর্ত্তি আমাদের এ পুরুষের ক্ষমতার প্রমাণ বলিয়া জগতের আদালতে গৃহীত" হইয়াছিল কি না; পাশ্চাত্যপ্রভুশক্তি তত্তাবৎ দর্শনে কেবল "অনুকম্পার হাসিই" হাসিয়াছিলেন কিংবা স্তব্ধনেত্রে মুগ্ধ হৃদয়ে ঐ "জীর্ণ পুস্তক" রাশির দিকে শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিপাতও করিয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় করি

বার নিমিত্ত নিম্নে প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—"No religious body made so profound an impression upon the Parliament and the American people at large, as did Hinduism * * * * * And by far the most important and typical representative of Hinduism was Swami Vivedananda, who, in fact was beyond question the most popular and influential man in the Parliament.

* * * * * on all occasions he was received with greater enthusiasm than any other speaker, Christian or 'Pagan'."—*Hon'ble Mr. Merwen-Maeir Snell.*

"Prof. Vivekananda .. ..being wellfilled with the ancient lore of India (ইহা "ভুলট কাগজের জীর্ণ পুস্তকই" বটে !) made an address which captured the Congress, so to speak. There were bishops and ministers of nearly every Christian church present and they were all taken by storm.—*The Press of America.*

"In Detroit, an old conservative city, in all the clubs he is honoured as no one has ever been... ....."—*Mrs. Bagley.* "The Hindu monk's* * * * *discourse .....made a profound impression not only on the audience......but on the religious world generally.—*The Ratherford American.*

"......the names of Shankaracharya and Ramanuj are becoming with many almost as familiar as Huxley and Spencer. The public libraries are running after everything that has reference to India : the books of Maxmuller, Colebrooke, Deussen, Burnouf, and of all the authors that have ever written in English on Hindu philosophy, find a ready sale ; and even the dry and tiresome Schopenhauer, on account of his Vedantic background, is being studied with great eagerness"

—*The Brahmavadin 1896.*

অতএব আমরা বলিতে চাই, মহামনীষী জগদীশচন্দ্র এবং কবিবর রবীন্দ্রনাথই যে "ভারতের বাণী" সভ্য জাতিগণের সম্মুখে প্রথম ঘোষিত করিয়া ভারতের কলঙ্ক মুছিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিদ্যা এবং মনীষাই যে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য জাতির উপরি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ইহা সত্য নহে বৈজ্ঞানিকচূড়ামণি জগদীশচন্দ্র এবং কবিকুলগৌরব রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্যে ভারতগৌরবপ্রতিষ্ঠামূলে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন ইহাতে সংশয়লেশমাত্র নাই। কিন্তু সত্যসন্ধ হইয়া নিরপেক্ষ বিচার করিলে আমরা কি দেখিতে পাই না যে, জগদীশচন্দ্রের Response to the Living and Non-living প্রভৃতি তত্ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রভৃতির কাব্য গৌরব সভ্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই একটী জ্যোতির্ম্ময়ী তরুণ যতিমূর্ত্তি এবং তৎপ্রচারিত মহাসত্য সভ্যজগতের হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? ("Vivekananda and his cause found a place in the hearts of all true christians"—*Iowa State Register*) জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার সমীপে নমিত হইবার পূর্ব্বেই কি সেই বিশ্ববিজয়গৌরবশ্রীমণ্ডিত মহাযোগীর দিব্যশক্তি সমীপে সভ্যজগৎ তাহার উন্নতশীর্ষ অবনত করে নাই ? ("Lifesize pictures of him were seen posted up in the streets * * * * * * * and hundreds of passers-by were observed to stop and do reverence with bowed head and folded hands to these likenesses."—*The Life of the Swami Vivekananda.* Vol. *II*)

সুদূর সিন্ধুপারে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জগন্মুগ্ধ জয়-ডঙ্কার শব্দ হইবার পূর্ব্বেই কি এক "অলৌকিক

বৈদ্যুতিকশক্তি" মহাবীর্য্য সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু বুদ্ধের অপেক্ষা চমৎকবী মহীয়সী শক্তি প্রকট করিয়া সহস্র সহস্র শুদ্ধ সভ্য নরনারীর জড়বাদকণ্টকসংকুল হৃদয় ক্ষেত্রে স্বীয় সুবর্ণ সিংহাসন স্থাপিত করেন নাই? (A triumph more signal and more sudden, has scarcely been known in history. None of the great religious teachers of the world, Buddha, Jesus Christ, Mahomet or Confucius made converts by hundreds by a first attempt. But this Hindu Preacher * * * * * dispelled, by one effort, some of the illusions of ages from the minds of hundreds of people and roused them to a sense of the truths of a religion which they have either never heard of or must have always despised—*N. N. Ghose*) জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী বিদ্যা সভ্যজগতের বিদ্বৎসমাজে সমাদর লাভ করিবার পূর্ব্বেই কি এক প্রাচ্যপাশ্চাত্য-সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা দিগ্বিজয়ী কুমারব্রহ্মচারীর অশ্রুতপূর্ব্ব পরমাদ্ভুত বৈদুষ্য দর্শনে পাশ্চাত্যসুধীবৃন্দ মুগ্ধ এবং চমৎকৃত হন নাই? ("Here is a man who is more learned than all our learned professors put together."—*Prof J. H. Wright of the Harvard Univesity.* "Vivekananda is * * * * * * learned beyond comparison with most of our Scholars." *The Boston Evening Transcript*) পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে জগদীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের বিদ্যা গৌরব প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেই কি এক তপোবীর্য্যদীপ্ত যুবপরিব্রাজক পৃথিবীর ইতিহাসে অনুপম ও অদৃষ্টপূর্ব্ব এক সুধীগণমহাসম্মেলনক্ষেত্র ("Packed with six or seven thousand men and women representing the best Culture of the Country and on the platform learned men of all the nations on the earth."—*Swami's Epistles Part I*) এবং পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে (Graduate Philosophical Society of the Harvard University) উপস্থিত হইয়া তাঁহার দিগন্তোদ্ভাসিনী প্রতিভা-চ্ছটায় ভারতের কলঙ্কতমঃ অপসারিত করেন নাই? এই সকল ব্যাপার অধুনা প্রায়ঃ সর্ব্বজনবিদিত। তথাপি যে কি কারণে যেন মহাশয়ের ন্যায় প্রসিদ্ধ সুধীপুরুষ সেই ব্যবহারিক জ্ঞান বিজ্ঞানে এবং পারমার্থিকী প্রজ্ঞায় বর্ত্তমান যুগে অন্যাপেক্ষা প্রশস্ততা প্রকরসিংহকে, ("He is by far the greatest man that India has produced in the British period of her history,"—*Professor K. N Mitter*) বর্ত্তমান ভারতের নবপথ প্রদর্শক নবযুগ প্রবর্ত্তক মহিমময় মহাচার্য্যকে, ধর্ম্মের গুরু, শাস্ত্রের উপাধ্যায়, সমাজের পুরোহিত, কর্ম্মের নেতা সেই বিশ্ববন্দ্য মহাদর্শ কেন্দ্র শ্রীনরেন্দ্রনাথকে ("Swami Vivekananda has opened a new vista, a new heaven and a new earth and heralded an era of a new synthesis and construction in our religions and social ideals, in our national aims and aspirations * * * * *"—*Prof K N Mitter.*) "ভারত কলঙ্ক মোচনের" অন্ততঃ অন্যতম সহায়রূপেও নির্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা অনুভব করিতে আমরা একান্ত অক্ষম।

'শিক্ষা' শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুশীলন করিয়া দেখিলেও বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত তথা কথিত শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত করা যুক্তিসঙ্গত হয় না, এবং তাদৃশ শিক্ষায় যাহারা সফল তাঁহাদিগকেও প্রকৃত "পণ্ডিত" বলা যায় না কারণ "শিক্ষা+গুবোশ্চ হলঃ' ইত্যঃ। ততষ্টাপ্। "শিক্ষা শিক্ষণে"।" শাব্দিক ভরত শিক্ষা শব্দের অর্থ করিয়াছেন "বিদ্যোপাদান"। উপাদান শব্দের শিষ্ট সম্মত অর্থ সমূহের মধ্যে 'হেতু' ও 'প্রবৃত্তিজনক জ্ঞান' এই অর্থদ্বয় প্রশস্ত। শাব্দিক জটাধর বিদ্যাকে মোক্ষ বিষয়িনী শুদ্ধা ধী এবং বৈয়াকরণ নাগোজী ভট্ট পরমোত্তম পুরুষার্থ সাধনহেতুভূতা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃষ্ট জ্ঞানের যাহা হেতু, আত্মজ্ঞানরূপ

পরমনিঃশ্রেয়সসিদ্ধিহেতুকপ্রবৃত্তিগমকজ্ঞানই যাহার লক্ষণ, ধীবৃত্তির সম্যক্ উৎকর্ষসাধনেই যাহার সার্থক্য তাহাই শিক্ষা শব্দের বাচ্য। এতৎসম্বন্ধে আমরা ১৩২২ সালের "ব্রহ্মবিদ্যা"র মাঘ সংখ্যায় "চরিত্র ও শিক্ষা" শীর্ষক সন্দর্ভে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। অধুনা আমাদিগের বক্তব্য এই যে, শিক্ষার উক্তপ্রকার লক্ষণকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিলে, বর্ত্তমান ভারতের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কিরূপ হইবে তাহা আমরা পাঠককেই নিরপেক্ষভাবে প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি। আর্যশাস্ত্রে পণ্ডিত শব্দ কোন্ অর্থে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও এস্থলে অনুসন্ধেয়। সুতরাং পণ্ডিত শব্দের প্রাচীন ও প্রকৃত এবং আধুনিক ও ব্যবহারিক সর্ব্ববিধ অর্থই অনুসরণ করিলে অপক্ষপাত বিচারে শ্রীবিবেকানন্দ স্বামিপাদের অপেক্ষা মহীয়ান পণ্ডিত বর্ত্তমান যুগে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। স্বামীর জীবনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানগৌরব, ব্যবহারিক বিদ্যা নৈপুণ্য এবং ঔদার্য্যমহত্ত্বাদি গুণরাশির যাদৃশ পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয় জগতের ইতিহাসে তাহার অভিব্যক্তি দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ("Such a marvellous combination of philosophic insight with historical culture is a rare spectacle in a human being"—*Prof K N. Mitra*) পারমার্থিক জ্ঞানাদির কথা দূরে থাকুক,—যিনি তাঁহার ছাত্রদশায় বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার প্রথম বিকাশকালেই, বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক স্পেন্সারের মতবিশেষের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকটে যশোভাক্ হইয়াছিলেন, যিনি যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার অলৌকিক জ্ঞান এবং কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধির চমৎকারী লীলা প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপক হেষ্টিকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, ("I have travelled far and wide but I have never come across a lad of his talent and possibilities even in the German universities amongst the philosophical students." *Professor Hastie*),—যিনি তাঁহার জীবনের ত্রিংশবর্ষে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক James William, প্রসিদ্ধ তড়িত্তত্ত্ববিদ্ Hicolas Tesla, অধ্যাপক Elisha Grey, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক Sir Hiram Maxim, Lord Kelvin, Prof. Helmholtze প্রভৃতি সুধীগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; এবং সময়ান্তরে অধ্যাপক James কর্ত্তৃক আচার্য্য (Master) সম্বোধনে সমৃদ্ধ এবং Rev. Dr. Mills কর্ত্তৃক "A man of gigantic intellect, indeed one to whom our greatest University professors were mere children." বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন, (*The Modern Review, May 1919*; *The Life of the Swami. Vol. II.* দ্রষ্টব্য) তাঁহাকে যদি "বিশ্ববিজয়ী বিখ্যাত পণ্ডিত" "ভারত কলঙ্ক মোচন" স গ্যাসের অগ্রগণ্য মহীপুন না বলিব তবে আর কাহাকে বলিব জানি না। সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "একথা ভুলিলেও চলিবেনা যে ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ দুইটি মাত্র।" আবার কিন্তু ইহাও ভুলিলে চলিবেনা যে, "It may be said of that first interchange of thought in the higher plain of metaphysics that Swami Vivekananda "went, saw and conquered"; ইহাও ভুলিলে চলিবেনা যে, "we have seldom seen such a concesus of opinion about the dead worthy's merits."—*The Indian mirror, 10th July 1902*); ইহাও ভুলিলে চলিবেনা যে, "Swami Vivekananda was born in a country which produced the authors of Bhagavadgita and Vedanta sutras and will be unhesitatingly ranked with them by the future historians of India."—*The Malabar Mail*, এবং সর্ব্বোপরি ইহাও ভুলিলে চলিবেনা যে, "The Swami brought the East and West together as no other man did for a long long time." *The Indian mirror 1902 8th July.*)

অতএব আমরা বলি, বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে যে মহাবীর্য্য যোগীন্দ্রের অলৌকিকী শক্তি ভিন্নাদর্শ, ভিন্নধর্ম্ম, ভিন্ন-প্রকৃতিক প্রাচ্যপাশ্চাত্যের প্রথম প্রীতিসম্মেলন সাধিত করিয়া বিরুদ্ধ ভাবপ্রবণ উভয় মহাদেশের মধ্যে ভাববিনি-

মন্ত্রের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে যে সিদ্ধাচার্য্যপাদের সম্ভ্রান্ত মহাসিদ্ধিরই অবশ্যম্ভাবিফলস্বরূপ আজ ভারতীয় বিস্তার বিশ্বব্যাপিসমাদর দৃষ্ট হইতেছে,—পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জগদীশচন্দ্রের ভূয়িষ্ঠ কীর্ত্তি, রবীন্দ্রনাথের গরিষ্ঠ সম্মান, প্রফুল্লচন্দ্রের বিশিষ্ট প্রশংসা ব্রজেন্দ্রনাথের শিষ্টসমাদর প্রভৃতিকে যে নিয়তমহাকর্ম্মা পুরুষশ্রেষ্ঠের স্বহস্তেরোপিত স্বশক্তিবারি সেচনে অঙ্কুরিতস্বকীয়জীবনব্যাপিঅদ্ভুত সাধনে পরিবর্দ্ধিত এবং নিজশিক্ষাপুষ্ট পরবর্ত্তিসতীর্থগণের প্রযত্নে পল্লবিত দিব্যমহাতরুর সুন্দর সুধামধুর ফলস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিতেও দীর্ঘদর্শিগণ কুণ্ঠিত নহেন, যে বিশ্ববিজয়ী মহাশূর ভারতবিজেতৃগণকে বিজিত করিবার নিমিত্ত অপ্রতিম মহাবীর্য্য ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য সাহসে বক্ষঃ বাঁধিয়া ভারতকলঙ্কমোচনযজ্ঞের স্রুক, স্রুব, কুশাদি আবশ্যক সম্ভার এবং অবদান্য-উদ্‌গাতৃ-হোতৃ প্রভৃতি সাধক সংগ্রহের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন,—("Some people think that very little fruit has come of the lectures that Swami vivekananda delivered in England and that his friends and admirers exaggerate his work. But on coming here (England) I see that he has exerted a marked influence everywhere.....I must say that Vivekananda has opened the eyes of a great many and has broadened their hearts"—*Mr. Bepin Ch Paul.*) অধিক কি জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও যে বিশ্ববরেণ্য ঋষিরাজের প্রাক্‌সমারব্ধবিরাট্‌যজ্ঞের যোগ্যতর সাধকত্বমাত্র, বর্ত্তমান যুগের নবভারতেতিহাসের উপোদ্‌ঘাতপৃষ্ঠায় সে মহারাজাধিরাজের ভাস্বর মহিমরাগরঞ্জিত-অঙ্কিতবিরাট্‌ দীপ্ত বতিমুর্ত্তি সগৌরবে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই ভারতকলঙ্কধ্বান্তবিধ্বংসি মূর্ত্তভারত গৌরবরবির ("Shining like the Sun of India"—*Annie Beasant*) প্রখর প্রতিভাকিরণমালার প্রতি কেন যে ইতিহাসদর্শিসেনমহাশয়ের দৃষ্টি নিপতিত হইল না, তাহা আমরা অনুভব করিতে একান্তই অসমর্থ। সন্দর্ভকার "বাঙ্গালী আশুতোষের" "বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের" "বাঙ্গালী জগদীশচন্দ্রের" নামসমূহের স্বীয় প্রবন্ধে সগৌরবে ভূয়ঃ সমুল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু মহাকবি হোমারের জন্মদান গৌরব লইয়া কবির মৃত্যুর শত শত বর্ষ পরে যেমন সপ্তনগরী পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,—তেমনই যে বঙ্গীয় যুবসন্ন্যাসীর নাম তদীয় জীবৎকালেই পৃথিবীর ভারতেতর অন্যতম সভ্যজাতির জাতীয় বিশ্বকোষে অন্তর্নিবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, ("They are about to write his biography for the national Encyclopedia of the U S. of America. thus making of him an American citizen." *The Brahmavadin 19th Feb 1896*), তাঁহার চিরস্মরণীয় নাম যে কোন কারণে অন্ততঃ ভারতকলঙ্কমোচনক্ষম ভারতবাসিগণের নামসূচীরও অন্তর্ভুক্ত হইলনা, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। বহু মনীষি স্বামিপাদকে ভারতের জাতীয় আদর্শ সমূহের স্ফুরদ্‌বিগ্রহস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় ইতিহাস হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিলে একান্ত একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয় না কি? আমরা শ্রীস্বামীপাদের অনুবর্ত্তী এবং গুণমুগ্ধ সেবক; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত স্তুতিবাদের এমনকি যুক্তিপ্রমাণেরও মূল্য সাধারণ্যে স্বল্প বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাব্যতা অনুভূত করিয়াই, আমরা এই প্রবন্ধে সর্ব্বত্রই ভিন্নসম্প্রদায়ানুগত অথচ নিরপেক্ষ সত্যসন্ধ সুধীগণেরই অভিমতাদি যথা প্রয়োজন উদ্ধৃত করিয়াছি। তৎসমুদয় পাঠ করিলেই প্রকৃততত্ত্ববুভুৎসু পাঠক আমাদিগের প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধ করিতে পারিবেন। এই সকল আলোচনা করিয়াও যদি কেহ মনে করেন যে আমরা জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গৌরব স্বীকারে কুণ্ঠিত, তবে তাহা আমাদিগের নিতান্তই দুর্ভাগ্যের ফল বলিতে হইবে। কারণ আমরা ঐ মনীষি যুগলের বিশ্বগৌরবের মুক্তকণ্ঠস্তুতিবাদী। কিন্তু স্বয়ং জগদীশচন্দ্রও যাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রতিভা ও অলোকসামান্যা প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকটিত ফলস্বরূপ জগদ্ব্যাপিমহাবদাননিচয়ের অনন্ততা ও গভীরতা উপলব্ধ করিয়া বিস্ময়ে বলিয়াছেন "What great things were

accomplished in these few years! how one man could have done it all!" (*The Swami's Life, Vol IV. appendix B*), সেই বিশ্বগুরুসন্ন্যাসীর শ্রীচরণতলে আমাদিগের ক্ষুদ্র শিরঃ অবনত করিয়া তাঁহার অবশ্যপ্রাপ্য স্তুতির অঞ্জলিটী প্রদান না করিলে আমরা কি স্বেচ্ছায় একটী দুর্লভ অথচ সুলভ সুকৃতির পুণ্যফল লাভে বঞ্চিত হইব না?

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা অধুনা অধিক বলিবার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ "ভারতের তপোবনের স্থান আজ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিকার করিয়াছে" কিনা এবং অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও কোনকালে উহা করিতে পারিবে কি না, তাহা বিশেষ চিন্তা সহকারে প্রণিধান যোগ্য। ইতোমধ্যেই বহু সুপণ্ডিত ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতায় ন্যায়ানুমত সংশয় এবং আক্ষেপ উত্থাপিত করিয়াছেন। ভূদেব, বঙ্কিম, কেশব, বিদ্যাসাগর, স্বামীজি, জগদীশ রবীন্দ্র প্রভৃতি বর্তমান বঙ্গের মুখ্য মনীষিগণের মধ্যে কেহ কি যথার্থই "বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে" "মনীষার উৎকর্ষ সাধন করিয়া" বরেণ্য হইয়াছেন? দেশে অন্যবিধ প্রশস্ততর শিক্ষাবিধানোপযোগি সুনিয়ন্ত্রিত সংস্থানের অভাব নিবন্ধন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত শিক্ষারই অনুসরণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারই মনীষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। স্বয়ং শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয়ও সমগ্রভারতের "ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে" যে "রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুইটী মাত্র' কে "বিশ্ববিজয়িপণ্ডিত"রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদুভয়ের অন্যতর মনীষী রবীন্দ্রনাথের মনীষা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে কি পরিমাণে ঋণী তাহা সুধীজন মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু সেন মহাশয় বলিয়াছেন "কবিপ্রতিভা ভগবানের দান।" ইহার উপরি আর যুক্তিপ্রয়োগ চলে না। তবে প্রকৃতদর্শিগণ অবশ্যই জানেন, রবীন্দ্রনাথের সাধকোচিত নীরব সংযতস্বাধ্যায় তাঁহার অদ্ভুত বৈদুষ্যসিদ্ধির মূলে একটী গুরুতর হেতু। অপিচ ইহাও ভাব্য যে, শ্রীস্বামিপাদের বিশ্ববিদ্যালয়ানুগতশিক্ষার সাফল্য বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। লেখক মহাশয় যে বলিয়াছেন, "পাণ্ডিত্যলাভ পুরুষকারের "আয়ত্তাধীন" (!), ইহাই সর্ব্বথা উপাদেয় সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথ যে তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে পরমোপাদেয় এবং প্রাচীন তপোবনলব্ধ বিদ্যার তুল্য বিবেচনা করেন না, তৎপক্ষে মুখ্য প্রমাণ তদীয় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। শ্রীবিবেকানন্দ স্বামিপাদও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীকে দোষসংকুল বলিয়া প্রাচীন গুরুগৃহবাস রীতিরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ এই, উহার সহিত তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে সম্মিলিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (*Swami's Complete work Vol V Page 1169*)। প্রাচীন তপোবনের মূল অবলম্বন শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মচর্য্য। তদুপরি অধ্যেতার বিদ্যা সাধন সাহায্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হইত। আধুনিক শিক্ষা সংস্থানের সাধ্য, সাধন ও সাধক এই অঙ্গত্রয়ই পৃথগ্‌বিধ। প্রাগ্‌ভবীয় বিদ্যাসংস্কারপ্রবণ ছাত্র ব্যতীত এই সংস্থানের "দায়িত্বে" কদাপি কেহ "মনীষার উৎকর্ষ" সাধন করিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত মল্লিখিত "চরিত্র ও শিক্ষা" সন্দর্ভ হইতে কিয়দংশের উল্লেখ করিব। "বিশ্ববিদ্যালয়ানুসৃত পাশ্চাত্যশিক্ষাও তদনুসারিসভ্যতার প্রভাবে আমাদিগের জীবনসংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্রতর হইতেছে, ইহা সূক্ষ্মদর্শিগণ স্বীকার করেন। Huxley, Kead প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, তীব্র জীবন সংগ্রামের ফলে দেশবাসীর হৃদয়ে নীচতা প্রভৃতি কুনীতিমূলক অসদ্বৃত্তিনিচয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উপযুক্ত প্রতিভামূলক প্রকৃষ্ট তত্ত্বসমূহের বিকাশ হয় না। প্রত্যেক মনুষ্যের ন্যায় লোকসমষ্টিস্বরূপ প্রত্যেক জাতিরও কোন বিশিষ্টভাব প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। উক্ত ভাববিশেষের সহিত সমুচ্চয় বা সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক জাতীয় শিক্ষার বিধান করিলে চরিত্রের যাদৃশ উৎকর্ষ সাধিত হয়, ইতরোপায়তঃ তদ্রূপ হয় না। পণ্ডিত Mill তাঁহার সভ্যতা সন্দর্ভে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে মহাবীর্য্য ইংরাজ জাতিও যে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং সেই অতি তীব্র সভ্যতানুগতশিক্ষা দ্বারা যে এই ইদানীং দুরবস্থাপন্ন ক্ষীণবীর্য্য জাতি অতিমাত্রায় বিঘটিত হইবে, ইহা সুধীগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন। ভাবশিক্ষাসমুচ্চয় সিদ্ধি ব্যতীত জাতীয়

অভ্যুন্নতি কদাপি সাধিত হয় না। অতএব যে জাতির জাতিত্ব যে ভাববিশেষে পিণ্ডিত, তজ্জাতি স্বজাতীয়ত্বের রক্ষা ও ক্রমোন্নায়সাধন হেতু তদ্‌ভাববিশেষের পরিপুষ্টিসাধনক্ষমা সুতরাং উপযোগিনী শিক্ষাকে অবলম্বন না করিলে ঐ জাতির বৰ্দ্ধিষ্ণুতা সুদূরপরাহত, বৰ্দ্ধিষ্ণুতা সম্বন্ধেই বিশেষজ্ঞগণ সংশয় করিয়া থাকেন।" এই নিমিত্ত আমাদিগের দীন বুদ্ধিতে আমরা "উচ্চশিক্ষা" বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাকে বুঝিনা। কেননা তাদৃশী শিক্ষা আমাদিগের চরিত্রের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না, এবং তাহা না পারিলে ঐ শিক্ষা সমাজের অবনতিরই কারণরূপে নিশ্চিত হয়। উপসংহারে এই সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে আমরা এই স্থলে বর্ত্তমান কালোপযোগি (?) তিনটী প্রমাণের উল্লেখ করিয়া সন্দর্ভ সমাপ্ত করিলাম।

(ক) **Society is not benefited but injured, by artificially increasing intelligence without regard to character."—H. Spencer.**

(খ) "The people of India do not seem new-a days to concern themselves * * * about the training of their boys in the elements of common morality"—F. C. Lewes, Director of Public Instruction, Agra and Oudh.

(গ) "Worthy citizens can only be produced by good education and the highest education is that which is based on sound relegious teaching." *Rev Kalicharan Bannerjee*

—o—

তানকা *

[শ্রীশচীন্দ্র মোহন সরকার, বি,এ,]

হৃদয় রক্ত
নাচিছে তালে তালে ;
বাঁধন শক্ত—
প্রিয়ার বাহু মূলে ;
পরাণ পড়ে ঢলে।

---

* তানকা—জাপানী সনেট।

·পলাতক

[শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ]

সংসার সংগ্রাম হতে ওরে ভীরু কে তুই পলাস,
উর্দ্ধ-দৃষ্টি স্বিন্ন-দেহ লক্ষ্যহীন পাইয়া তরাস।
কে তোরে শিখাল ভাই পলায়ন নিরাপদ অতি,
নাহি তাহে মৃত্যুভয় পলায়নে মিলিবে সদগতি।
উঠিছ পড়িছ ছুটি শতবার পাথরে কঙ্করে,
কুক্কুরেরা ছুটে পিছে, ছিন্ন অঙ্গ কণ্টক নিকরে।
শত শত গুপ্ত কূপ, পন্থাহীন তব পথে রাজে,
মস্তিষ্ক হইবে চূর্ণ পড়ে গিয়ে কোনোটীর মাঝে।
ইহা হতে রণক্ষেত্র নহে বেশী সঙ্কট সঙ্কুল,
এপথে সহায় কোথা ? তথা তবু আছে বন্ধুকুল।
জিজ্ঞাসি লুকাবে কোথা নক্রভরা নদীর ভিতরে
সিংহের গুহায় কিম্বা অহিময় গিরির গহ্বরে ?
কপিকুল সঙ্গে কিম্বা কাননের তরুর শাখায় ?
আহার্য্য-পানীয়হীন ছায়াহীন মরু-বালুকায় ?
তুফান তরণী পরে দস্যুদের গোপন নিবাসে ?
অথবা সে কাপালিক সাধকের যূপের সকাশে ?

কাঁপিতেছ থরথর ছায়া হেরি করিছ চীৎকার,
হৃৎপিণ্ড করে স্তব্ধ, শুষ্কপত্রে শিবার বিহার।
একি তব মৃত্যু নহে তমোগর্ভে জীবন যাপন ?
একি তব মৃত্যু নহে পশু সহ আরণ্য জীবন ?
একি তব মৃত্যু নহে—কাতরতা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ?
শীতাতপে ঝঞ্ঝাবজ্রে বাঁচিবে কি রোগের জ্বালায় ?
সেকি তব মৃত্যু নহে কর যদি আত্মায় গোপন ?
ক্লীবতা কি ঘৃণ্য নহে ? বরেণ্য কি এই পলায়ন ?
শত ভয় হতে তবে নহে ভালো একের বরণ ?
আত্মার মরণ হতে শ্রেয়ঃ নহে দেহের মরণ ?
মৃত্যু সনে নিত্য বাস—বিন্দু বিন্দু হৃদিরক্ত পাত
তাহা হতে নহে ভাল ব্যথাহীন মৃত্যুর সাক্ষাৎ ?
সাধনা অপূর্ণ যদি সিদ্ধিপথে তবু অগ্রসর
নরত্ব ত্যজিয়া হায় পলাতক হইবে পাথর ?
একান্ত নৈরাশ্য হতে ক্ষীণ আশা তাও শ্রেয় তবে।
জীবন-সংগ্রামে জয় স্বপ্ন নয়, মানুষেই লভে।

—o—

অমলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ·]

(৪)

রোগেব প্রথম আক্রমণটা কাটিয়া গেলেও অমলার খুড়িমা আমাশয়ের মত ভাবে কয়েকদিন শয্যাগত হইয়া রহিলেন। ডাক্তার তাহাতে বড় আশান্বিত হইল না, কেননা এরূপ কেস্ সে অনেক দেখিয়াছে। একেবারে

চটপট রোগের মুখ ফিরিল তো ফিরিল, কিন্তু বাঘের এরূপ ওৎ পাতিয়া ব'সিয়া থাকা ইহা বড় শুভলক্ষণ নয় বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল। কোন সময়ে অসতর্ক পাইয়া পাছে সে আবার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু বাদবাকি সবাই মনে করিল "রোগ যখন গোড় পাতিয়াছে তখন এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন"; প্রতিবাসিনীরা বলিল "হাজার হলেও বিধবার জীবন, বেঁচে উঠবে বৈকি। একি নতন রোগ? কিম্বা ঐরকম কেজো প্রাণ, যে চোখে কানে কেউ দেখতে শুনতেও পাবে না।" এমন কি ডাক্তারের পুনঃ পুনঃ সাবধানতা সত্ত্বেও রমেনও এই ভুল করিল, সেও ভাবিল "আর ভয় নাই"। রুগ্নার আত্মীয়দের মত সেও আশান্বিত হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন একটু মুশ্‌কিলে পড়িয়া ভার ভার করিয়াই রমেন ডাক্তারকে জানাইল "এবেলা আর তাহার সেখানে না গেলেও চলে।" ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে বলিল "কেন বল দেখি? আমি কি তোমায় বল্‌ছিনা যে এখনো আমার ভয় যায়নি? এখনো—"

"কিন্তু এ তোমার মিথ্যা ভয়। এবেলা বেশ ভালই আছেন উঠে ব'সে কথা কইছেন খুব সম্ভব আর ভাবনার কিছু নেই। এ যাত্রা বেঁচে গেলেন।"

"চল দেখি একবার দেখে আসি।"

"কিন্তু তাদের তোমার সময়ের দাম আছে, বারে বারে এখন না গেলেও চল্‌তে পারে বোধ হয়।"

"আমার সময়ের দাম?" হঠাৎ ডাক্তার হো হো ক'রিয়া হাসিয়া উঠিল "হ্যাঁ তার অনেকটা দামই নিয়ে ফেলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেতো চুকেই গেছে হে, আরতো বেশী আমি চাইনি।"

রমেন গম্ভীর মুখে বলিল, "ঠাট্টা করোনা, গরীবের ঘরের সেই ফুল দুটোর যে তোমার এই যত্ন আর আজ ৫।৭ দিন ধ'রে বারে বারে এই রকম করে ছুটোছুটি, চিকিৎসা. এসবের শোধ হয়েছে এ কেউই মনে করে না; ওষুধের দামের কথা তো ছেড়েই দি। তাই তারা কুণ্ঠিত হচ্চে যে তাদের তো বেশী কিছু আর সাধ্য নেই, তুমি আর তাদের জন্য তোমার এত সময় নষ্ট করনা।"

ডাক্তার হাসিমুখেই উত্তর দিল, "তুমি তো আমায় এই কমাস ধ'রেই দেখে আসছ রমেন, আমি যতক্ষণ না নিজে সন্তুষ্ট হব ততক্ষণ আমার হাতে যে রোগী এসে পড়বে সে যেতে বারণ করলেও আমি তাকে না দেখে ছাড়বনা। তাঁরা যাই বলে থাকুন আমি আমার কাজ ক'রে যাব।"

"আমিও সে কথা তাদের বলেছি কিন্তু তারা কেবলই কুণ্ঠিত হয়। এই জাখনা আবার আমার হাতে আজকে কি গছিয়েছে।"

ডাক্তার আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

"ওঃ—এতক্ষণে তোমার মুখভারের কারণটা বোঝা গেছে। দেখি কি জিনিষ?'

"দেখাতে বারণ,—বিক্রি করে যা হয় তোমার ওষুধের হিসাবে জমা দিতে হবে আমায়।"

"বিক্রি ক'রে? দেখাতেনা হে—জিনিষটা কি?"

"হ্যাঁ দেখাই আর তুমি টপ্ ক'রে পকেটে ফ্যাল, বস্ত দাম কি বৃত্তান্ত তাদের কিছুই খবরও দিতে পারবনা।" ডাক্তার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল "সে রাগ আর তোমার যাচ্চেনা দেখছি। না দেখাও মুখেই বল।"

"একটা পদক"।

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "কেন প্রথম দিনই তো আমায় দিয়েছেন অনেক—।"

সে সামান্য দুটো ফুলে কতই তোমার হয়েছে?"

"সামান্য তো আমি বলিনি। এ পদক বোধহয় টুনি মণির?"

"হ'তে পারে, আমি এটা সেক্‌রার দোকানে বিক্রি করতে যাচ্চি।"

"এবং আমি তোমায় তা যেতে দিচ্চি না। স্বেচ্ছা-সেবক হয়ে বেড়াচ্ছ সেই ভাল—আর দালালি ক'রে কাজ নেই। দাও আমায় পদকটা।"

"তারা আমার ওপরে রাগ করবে। আর তোমার নিতেই বা এত সঙ্কোচ কিসের? নেবেনাই বা কেন—যখন—"

"ফুল দুটো অম্লানবদনে নিয়েছ, এই কথা তো?

একটা জিনিষের ওপর লোভ হ'লে সব জিনিষেরই ওপর কেন না হবে এইতো তোমার ধর্ম্ম? কিন্তু এটা হল অন্য রকমের জিনিষ; চাই কি এই রকম আর গোটাকতক ফুল গড়িয়ে সেট্ মিলিয়ে একজোড়া বোতাম করে বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তোমায় দিয়ে যেতে পারব হে,—যখন আমি এ গ্রাম ছেড়ে যাব,—বুঝেছ?" সহাস্য উজ্জ্বল-চক্ষে রমেনের পানে চাহিয়া রাজেন্দ্র এই কথা বলিতেই মুহূর্ত্তে রমেনের আস্কন্ধগণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল। "আঃ—কি বল" বলিয়া রমেন চকিতে রাজেন্দ্রের দিকে পাশ্ ফিরিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। রাজেন্দ্র স্থিরদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া ঈষৎ যেন গম্ভীরভাবে বলিল, "ঠাট্টা করিনি। হয়ত সেই দিনের জন্যই—সেই জন্যই ফুল দুটো আমি নিয়ে ফেলেছি রমেন"। রমেনের মুখ চোখ ইতিমধ্যেই আবার বিবর্ণ হইতে সুরু করিয়াছিল, সে মৃদুস্বরে বলিল "যার কাছে আর ও বাড়ীর দিদিমা বুড়ীর মুখে একদিনের একটা পুরোনো ঘটনার সম্ভাবনার আভাষ পেয়ে তুমি আমার সম্বন্ধে এই এক ঠাট্টার ব্যাপার পেয়ে বসেছ দেখছি। কিন্তু এ তোমার উচিৎ নয়। এতে আমার ওপরে নির্দ্দয়ব্যঙ্গ ছাড়া—"

চকিতে রমেনের কম্পিত হাতটা নিজের হাতে টানিয়া লইয়া সজোরে চাপিয়া ধরিয়া রাজেন্দ্র এমনি গম্ভীর কণ্ঠে "রমেন" বলিয়া ডাকিল যে তাহার সেই আকস্মিক তিরস্কারেই রমেনের কথা আর অগ্রসর হইল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া রমেন আর্দ্র ভারকণ্ঠে বলিল, "আমি আমার ওপরে তোমার স্নেহকে চিনিনা মনে ক'রনা। জানি আমি, যাতে আমি আঘাত পাই এমন কথা তুমি কখনই বল্‌বেনা। কিন্তু এতো তুমি জাননা—আমি তো তোমায় কখনো বলিনি ভাই, যে এখানে আমার কতখানি বেদনা লুকনো আছে, তাই বলছি—"

বাধা দিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে রাজেন্দ্র বলিল—

"তাও জানি আমি রমেন। তুমি না বল্লেও আমি তা বুঝেছি জেনো, তবে সে ব্যথা যে কতখানি তার হয়ত পরিমাণ জানিনা।" তাই এমনি ক'রে তোমার সে রুদ্ধ প্রবাহের মুখ অন্ততঃ আমার কাছে খুলে নিচ্ছি। আমার কাছে তোমার জীবনের সবই যখন খুলেছ তখন এ সর্ব্বোত্তম সব টুকুর কথাই বা কেন গোপন রাখবে?" রাজেন্দ্রর হাতের মধ্যে রমেনের হাতখানা তখনো কাঁপিতে-ছিল। নির্ব্বাক তাহাকে রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে নিকটে আকর্ষণ করিয়া উভয়ে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। একখানা হাতে রমেনের একটী হাত ও অন্য হাতটা তাহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া রাজেন্দ্রও নির্ব্বাক-ভাবে অন্যদিকেই চাহিয়া রহিল। পাছে রমেন ব্যথা পায় বলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিও ফিরাইল না। এই নিঃশব্দ সহানুভূতি ক্রমশঃ রমেনকে যেন অনেকখানি সান্ত্বনা দিল। এ যেন সে জগতের কোথাও আশা করে নাই। ধীরে ধীরে রমেন উচ্চারণ করিল "কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? একথা নিজের মনের কাছেই যে আর খোল্‌বার পথ নেই? যা অন্তরাত্মার সঙ্গে মিশে মনের ও স্পর্শের অগম্য হয়ে আছে যাকে নিজের মনের মধ্যেও যে কোন অনুভূতির সঙ্গেও টেনে আনা পাপ তখন সেকথা আর কেন ভাই? সে নিয়ে আলোচনা না করাই কি ঠিক্ নয়? আমার নিজের কাছেও যা অস্পৃশ্য অবাচ্য তোমার কাছেও তা তাই থাক না কেন।"

ডাক্তার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে সহসা বলিয়া উঠিল, "কিন্তু কেন? যাকে আত্মার সঙ্গে এমন অভিন্ন-ভাবে জড়িত বলে জান্‌ছ, তাকেও মনে অনুভব করা পাপ বলে গণ্য হবে? তাকে আমার তৃষ্ণার জল বলে, ক্ষুধার অন্ন বলে, সর্ব্ব কামনার তৃপ্তি, সর্ব্ব ব্যথার শান্তি বলে আমি ভাব্‌তে পাবনা? এই কি ধর্ম্ম? যা আমার আমিত্বকে ধারণ করে আছে তাকেই আমি অধর্ম্ম বল্‌ব, একি রহস্য? এতো জীবের সহজ ধর্ম্ম নয়, এ মানুষের কৃত আত্মার ওপর অত্যাচার। এর নাম সমাজ এর নাম দেশাচার?"

"মানুষের যে সমাজ ছাড়া থাকবার স্থান নেই। ভাই, তার নিয়মে এ রকম চিন্তা মনে রাখা বা আলোচনা করাও হয়ত পাপ। হয়ত সে সধবা—হয়ত তার স্বামী আছে।"

"থাকলেই বা! সে স্বামী তার কে—যার সঙ্গে তার

অন্তরের কোন যোগসূত্র নেই? আর যার সঙ্গে এমনি করে সে একাত্মা হয়ে গেছে সেই-ই তার কেউ নয়?"

রমেন সাতঙ্কে সলজ্জায় বাধা দিয়া উঠিল, "তার দিক্ দিয়ে ওকথাগুলো বলনা ভাই, তার কথা আমি কিছু জানি না। সেই যখন বিয়ে হবার কথা উঠেছিল অবশ্য আমিই মাকে অনেক করে রাজী করাই, সে কথা সেও জানত। সেই সময় তার একটু কিছু হয়ত মনে এসেছিল, অন্ততঃ আপত্তি ছিল না কিছু, এইটুকু জানি। কিন্তু তারপর এই চার পাঁচ বৎসরের কথা আর আমি কিছু জানিনা। তখন সে ছেলেমানুষ তেরো চোদ্দ বছর বয়সমাত্র। সেই তখনকার খেলার মধ্যেব সে কথা তার হয়ত মনেই নেই।"

রাজেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল "কিযে বক্‌ছ পাগলের মত, মেয়ে মানুষে কখনো এই জিনিষটা ভোলে? তিনি তোমার সে দিনের ভালবাসা ভুলেছেন এই তুমি বল্‌তে চাও? একি কখনো সম্ভব? বিশেষ তাঁর মত এই রকম জীবনে? যদি তিনি স্বামীসম্মিলিতা হতেন, তাঁর স্বামীর সঙ্গে ভালবাসার আদানপ্রদান হত, তাহ'লে সম্ভব ছিল বটে—কেননা এরকম ঘটনা এত কিছু বিরল নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে—এতো সম্ভব বলে মনে হয় না।"

রমেন্দ্র যেন সভয়েই বলিয়া উঠিল, "না—না—আমি এর কিছু জানি না, তাব কথা আমি কিছু বল্‌তে পারব না। না—সে—"

রাজেন্দ্র একটু নিস্তব্ধভাবে রমেনের পানে ক্ষণেক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তাঁর সঙ্গে তো তোমার দেখা হয়—কথাবার্ত্তাও চলে—"

রমেন বাধা দিয়া বলিল, "এখন যেমন প্রত্যহই দেখা হয় কথা হয় এমন এতকালতো হয়নি। সেই ঘটনার পরে পথেঘাটে কখনো কচিৎ দেখা হলে সেও সরে যেত' আমিও তাই। তাদের বাড়ীও আমি চার বৎসর পরে স্বতন কাকার মৃত্যু শয্যায় যাই, আর এই খুড়িমার ব্যাপারে এখন যা যাচ্ছি। এ ছাড়া আর তার সঙ্গে আমার কোনদিন কোন কথা হয়নি।"

"কথা নাইবা হল রমেন, মানুষের অন্তর কি কেবল কথারই অপেক্ষা করে? শত কথাতেও যা প্রকাশ পায় না—একটু দৃষ্টিতে বা কোন একটু ব্যবহারেও তা যে ধরতে পারা যায়।"

রমেন একটু যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল "না—তাও না—"। একটু ম্লান হাস্যের সহিত বলিল "তাও আমার সম্ভব নেই জেনো। তাইতো একে মনেরও অগম্য স্থান বল্‌তে চাই।"

"কিন্তু এই যে তুমি বিয়ে না ক'রে এই রকমে জীবন কাটিয়ে চলেছ—এই তোমার সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসীর সাজ—এ কার জন্য তাও কি সে জানেনা বা মনে ভেবেও দেখেনা বল্‌তে চাও? তুমি কি পাগল?"

রমেনও একটু নিস্তব্ধ হইয়া একটু যেন ভাবিয়া লইয়া যেন একটা আশানিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়াই উত্তর দিল, "কি জানি তাও বল্‌তে পারি না। আমি যে মাকে বুঝিয়েছি আমার মস্ত ফাঁড়া আছে—সাধু সন্ন্যাসীতে বিয়ে করতে বারণ ক'রেছে, সেও তা শুনেছে হয়ত।"

"তবু কি আসল কথা তাঁর বুঝতে বাকী আছে? মনেতো হয় না।"

"কিন্তু তবু সে যে বিবাহিতা, হয়ত তার স্বামী বেঁচে আছে, সে কথা কি সে ভুল্‌তে পারে? আসল কথা ভুলছ কেন?

"ভুলিনি কিন্তু একথাটা আসল নয়, এটা মানুষের মন-গড়া নকল কথা। আমি আসল কথাটাই জান্‌তে চাই—যাতে সে যে বিবাহিতা কিম্বা তার স্বামী আছে, সব কথাই ফুঁয়ে উড়ে যেতে পারে।"

"ওঃ তুমি যে সাহেব তা ভুলে গেছি। কিন্তু ছোটকাল হতে য়ুরোপ বেড়িয়ে বেড়িয়ে তোমার যা ধর্ম্ম বলে ধারণা জন্মেছে আমাদের দেশে তাকি সম্ভব বলে মনে কর? তোমার ও নীতি সর্ব্বত্র খাটিবে না হে।"

"গোটাকতক এমন বড় বড় নীতিকথা আছে যা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বহৃদয়ের ওপর খেটে চলেছে। তাকে যে ছেঁটে খাটো করে তারই নাম দেশ কাল পাত্র। ছুটো কাচা জিনিষের কথা পরে হবে আগে আসল জিনিষটাব খোঁজ চাই।"

"সে খোঁজও এদেশে সহজে পেয়ে ওঠো কিনা সন্দেহ। অব্যবহারে প্রকৃতিদত্ত বস্তুও বংশপরম্পরায় ক্রমে লোপ পেয়ে আসে, এওতো জান। স্বাধীন হৃদয়—নীতির রাজ্য বনের পশুদের মধ্যে ?—(আমার এ কথায় রাগ কর না ভাই)। মানুষ যতদিন মানুষ নাম নিয়েছে, ততদিন সে সংযমের বশে চলে। চলে তাদের স্বভাবকেও বংশ পরম্পরায় সংযমী করে তুলতে চেষ্টা পাচ্ছে নাকি ? যে দেশে এটা জন্মগত সংস্কারেই দাঁড়িয়েছে সে দেশে এ খুবই সম্ভব ভাই। আমার বিশ্বাস অমলা তার বিয়ের কথা তার স্বামীর কথা নিশ্চয়ই মনে ভেবে থাকে। তাতে—"।

এইবার অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "ঐ কথা দুটো ছাড়তো, অসহ্য লাগছে যেন। সেই বিয়ের নাম বিয়ে, না তার নাম স্বামী যার কথা অমলাই জানে না ? দেখো সে কখনই—কি যে বল তার ঠিক্ নেই—সেই বিয়ে—না সেই স্বামী—তার জন্য সে—গাঁজাখুরী—অসঙ্গত—একেবার অসম্ভব। আর যা—সঙ্গত সম্ভব তাই নিয়ে কিনা এ ছোক্‌রা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে তর্ক করে আমার কাজ পর্য্যন্ত আমায় ভুলিয়ে দিলে। ওঠো ওঠো—চল তোমার খুড়িমাকে দেখে আসি। আর তোমার—"

রমেন অনুপায় ভাবে ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রের পশ্চাতানুবর্ত্তী হইল। দ্বারের নিকট গিয়া আজ আর তাহার পা উঠিল না।

"তুমি দেখে এসো, আমি যাচ্ছি' বলিয়া সে পালায় দেখিয়া রাজেন্দ্র তাহার মুঠার মধ্য হইতে একটা স্বর্ণনির্ম্মিত বস্তু কাড়িয়া লইয়া বলিল "আচ্ছা যাও—।"

রোগিণীকে দেখিয়া রাজেন্দ্রও একটু আশ্বস্ত হইল—আরোগ্যের লক্ষণই বটে। তথাপি আরও দু একদিন সতর্ক থাকিবার উপদেশ দিয়া রাজেন্দ্র বলিল "এখন আমি আরও দু একদিন আস্‌ব, তাতে আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না, ডাক্তারের এ জোর টুকু করবার অধিকার আছে।" স্ত্রীলোক কয়জনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, বোধহয় কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলনা। শেষে বৃদ্ধা দিদিমা কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন "বাবা তুমি একথা বলছ তুমি কি ডাক্তারের মত ব্যবহার করেছ ? কোন্ কথাটা তোমার বলব ? আপনার লোকেরও বেশী তোমার মতন ছেলে—"

"তাই বুঝি, দিদিমা, আপনার লোকটিকে এই মণির গলার পদকটুকু কেড়ে নিয়ে ভিজিট্ পাঠিয়েছেন ? খুব আপনার লোক বলে মনে করেছেন তো।" বলিতে বলিতে রাজেন্দ্র বৃদ্ধার পায়ের নিকটে সেটুকু রাখিয়া দিল।

বৃদ্ধা অপ্রস্তুত হইয়া দ্বিগুণ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমি ওসব কিছু জানিনা বাবা, ওসব অমা জানে। তোমার ঋণ তোমার যত্ন একি শোধবার জিনিষ। আমাদের তার সাধ্যই বা কি—" "যদি শোধবারই জিনিষ নয় তবে কেন শুধতে গেছেন দিদিমা আপনি রমেনের দিদিমা যখন, আমারও তাই।" লজ্জিতা দিদিমা "এতো আমার ভাগ্যির কথা, দাদা, তুমি আমার নাতি হবে। শোধবার কথা আমাকে বল'না—আমি কিছু জানি না" বলিয়া ডাক্তারের জেরা হইতে নিজে বাঁচিলেন।

এইবার অমলার উত্তর দিবার পালা। সে একটু মুখ তুলিয়া দিদিমার কথার সূত্র ধরিয়া "এই সামান্য জিনিষে আপনার কিইবা শোধ যাবে" এই রকম একটু কি বলিতে গিয়া দেখিল ডাক্তার তাহারই দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিতেই ডাক্তার চোখ্ নামাইল বটে, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ যে অমলার বক্তব্য শুনিতেই কানপাতিয়া পড়িয়া আছে তাহা অমলাও বুঝিতে পারিল। কুণ্ঠা তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেও কর্ত্তব্যবোধে সে অসাময়িক লজ্জাকে দমন করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল "আমরা ,আপনার ঋণশোধ করতে যাইনি। কেবল একটু ওষুধের দাম ওতে যা হয়—"

"তাকি মণির জিনিষ কেড়ে নিয়েও দেবেন ? জানেন শিশুদের জিনিষে জগতে কারও অধিকার নেই ? আপনার ফুল যখন .আমায় দিয়েছিলেন আমিতো ফিরিয়ে দিইনি, সেতো আমি তখনি নিয়েছি।"

"কিন্তু সে কতটুকু—কি সামান্য জিনিষ—তাতে—"

"তাতেই অনেক হয়েছে। এ যা পাঠিয়েছিলেন তাতে আমার ওপর একটু অবিচারই করেছেন।"

লজ্জিতা কুন্ঠিতা অমলা বিব্রতভাবে রমেনের স্কন্ধেই তাহার লজ্জাটা চাপাইতে চাহিল—"রমেনদাদাকে দিয়েছিলাম—আপনাকে তো নয়। তিনি কেন আপনাকে জানালেন ?"

"তার ওপরও অবিচার করবেন না, আমি তার কাছ থেকে কেড়েই নিয়েছি। মণির জিনিষটা মনির গলায় আবার পরিয়ে দেবেন। আরও দুদিন আপনারা আমার এ দৌরাত্ম্য সহ্য করুন, খুড়িমাকে আমি আরও একটু ভাল দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাই। আমাকে আরও দিন দুইতিন আস্‌তে দিতে হবে আপনাদের।"

সকলকে যেন একটা উচ্চ মহত্বে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়া ডাক্তার নিঃশব্দে একবার মাথা হেলাইয়া চলিয়া গেল। কেবল অমলা নিজের মনের মধ্যে এক এক বার যেন বিদ্যুৎচকিতের মত চমকিয়া উঠিতেছিল, ডাক্তারের এরূপ ভাবান্তর আজ কেন লাগিল! তাহার কথাগুলা যেন আজ কেমন একটা ব্যথার মধ্য হইতেই বাহির হইয়া আসিতেছিল। সে—কি অমলা এই পদকটা পাঠাইয়াছে বলিয়াই ? ডাক্তারের অসাধারণ মহত্ব, যাহা সবলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ন্যায় গরীবে তাঁহার সেই মহিমাকে খর্ব্ব করিবার অসঙ্গত স্পর্দ্ধা ধরিয়াছিল বলিয়াই কি ? কিন্তু তাহাতে কি অত উজ্জ্বল মুখের কান্তি এমন নিভিয়া কালি হইয়া যায় ? তাবা কি এমন বেদনায় ভরিয়া উঠে ? আর বিদায়ের একটু আগে আরও দু একবার আসিবার আদেশের সঙ্গে সেই যে শেষ দৃষ্টিটা এটার কথা মনে পড়িতেই অমলার অন্তরের সেই বিদ্যুৎবিকাশ যেন তাহাকে স্পর্শ বার বার করিয়াই অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। সে দৃষ্টি কি বিষন্ন! কি ম্লান!—যেন কাতরতা ভরা—কিন্তু কেন ? ডাক্তার কি তাহাদের অকৃতজ্ঞ ভাবিয়াই এমন ব্যথিত হইয়া গেলেন ? তাহার এই ব্যবহারে ঐ মহাপ্রাণ কি অপমান বোধ করিলেন ? আঃ—এমন ভুলও তাঁহাতে সম্ভব কি ? গরীব হইলেও তাহাদেরও তো একটা মনুষ্যত্ব আছে ? সেটুকু বুঝিয়া ফুল দুটা তো লইয়াছেন, নিজে তাহাকে আবার নিজের ঔদার্য্যে অনেক বলিলেন, কিন্তু এটায় এমন দুঃখ বোধ করিলেন কেন ? অবিচার ? তাঁহার সর্ব্বজন—বিদিত মহত্বকে অপমান ? এও কি তাহাদের দ্বারা সম্ভব ? তাঁহাকে রমেন দাদার দ্বারা একটু বুঝাইয়া দিতে হইবে যে দরিদ্রা অমলা তাঁহাকে অপমান করে নাই।

(ক্রমশঃ)

—০—

দুই-দিক

[শ্রীঅমূল্য কুমার ভাদুড়ী, বি-এ,]

তোমরা বলিবে বল।
স্থানুগতি মোরা এমনি চলিব চির মন্থর দল।
তোমরা বলিবে নারীরে শিখাও আদর্শ মাতা হবে,
আমরা বলিব শিক্ষিতা নারী গোবর ঘেঁটেছে কবে ?

যদিও তোমরা মিথ্যা নজীর করিয়া রেখেছ পুষ্ট,
আমরা বলিব তোমাদের সব উগ্রতা দোষে দুষ্ট।
তোমরা কহিবে তোষামোদ ছাড়ি সত্য কহিতে পষ্ট,
আমরা বলিব নির্ব্বোধ নহি তাহাতে অনেক কষ্ট।
দানা পানি সব বন্ধ রইবে সংসার চলা ভার।
তখন কেহ কি দেবে এক মুঠো যাইলে কাহারো দ্বার।
তোমরা বলিবে শিক্ষিত কর—হীন জাতি তোল টেনে
আমরা বলিব স্পর্দ্ধা হইলে চলিবেনা আর মেনে।
তোমরা বলিবে 'বুজরুকি' ছেড়ে খাঁটী পথ দিয়ে চল।
আমরা বলিব জয়ী সেই যার কৌশল, ছল, বল।
বিধবা বেওয়ার জমীটুকু হায় নেওয়া কি উচিৎ হবে ?
আমরা বলনা উপকার তার কেমনে করিব তবে ?
নাবালক আহা! দেখিতে তাহারে কেহ যে কোথাও নাই!
আমরা তাহারে টানিয়া লইয়া আশ্রয় দিই তাই।
তোমরা বলিবে ইহাতে মোদের বিশেষ স্বার্থ আছে,
বালক তোমরা কি বল বোঝাব ছেলে মানুষের কাছে।
একঘরে করি সমাজদ্রোহীরে ধোপা ও নাপিত বন্ধ ?
অপরাধে তার চিরকালই নাকি তোমাদের থাকে সন্ধ ?
তোমরা বলিবে সমাজের নাকি খোলা খানা আছে পড়ে!
শাঁস যাহা ছিল, আমরাই নাকি দি'ছি সব শেষ করে।
অবোধ পাগল! মোদের সমাজ-বাঁধন বড়ই শক্ত।
সৃজনে ইহার লেগেছিল কত মুনি ঋষি আর ভক্ত।
তোমরা চাহিছ বল্লালি-রীতি ভেঙে টুটে করি দূর—
নূতন করিয়া গড়িবে জাতিরে করি সব ভাঙ চুর।
অক্ষয় বট সত্য যুগের লক্ষ ঝটিকা সহি'।
নির্ম্মূল করা শক্ত তাহায় শুষ্ক উপাধি বহি।
শুধু মুখে দড় কথার গাঁথুনি নাহি হৃদয়ের বল
বিবেক কহিছে কানে কেনে "মূঢ় দুই-দিক ভেবে চল"।

মুক্তির পথ

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

তখনও প্রভাতের চিরপরিচিত চিরবাঞ্ছিত স্নিগ্ধ রৌদ্র বৃক্ষশির হইতে ধরাতল স্পর্শ করে নাই। নির্ম্মল গগণ-প্রান্তে এক টুকরা কালো মেঘ সুবিস্তীর্ণ শ্যাম চিত্রপটের ন্যায় আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ঘন-পল্লবিত শাখায় বসিয়া পাখীরা স'বে প্রথম রাগিণীর সকরুণ মূর্চ্ছনায় জগতের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছিল। প্রাঙ্গনের পার্শ্ব হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমগন্ধ মৃদু সমীরণে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিতেছিল।

অতসী আপনার নির্জ্জন নিভৃত কক্ষে বসিয়া আপন মনে সুধীরের আলোকচিত্র খানি সদ্যোগ্রথিত পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করিতেছিল। ছবির চারিপার্শ্বে ফ্রেমের উপর মালাটি বেষ্টন করিয়া চাহিয়া দেখিল, ঠিক মনের মতন না হওয়াতে মালা ছড়া খুলিয়া পুনরায় নিপুণতার সহিত ছবির ফ্রেমের গায়ে ঝুলাইয়া দিল। এবার সফলতার আনন্দে তরুণীর তরুণ মুখখানি ভরিয়া উঠিল। একখানা তাম্রপাত্রে কয়েকটি ফুল ও একটু চন্দন লইয়া অতসী স্বামীর চিত্রখানি পূজা করিল। ভক্তি প্রপূরিত হৃদয়ে আলেখ্যের পদবন্দনা করিয়া ধীরে ধীরে গৃহান্তরে প্রবেশ করিয়া মধুরকণ্ঠে ডাকিল "মা",—শয্যায় শায়িতা তন্দ্রাচ্ছন্না সুমিত্রা দেবী বধূর সম্বোধনে উঠিয়া বসিলেন। হস্তদ্বারা চক্ষু দুইটি মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এতবেলা হ'য়ে গেছে একটু আগে ডেকে দিলেই পারতে বউমা।" "না মা, বেলা বেশী হয়নি, সমস্ত রাততো ঘুমোও না তাই সকালে একটু ঘুমিয়েছিলে বলে ডাকি নাই।" সুমিত্রাদেবী বধূর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন "ভোরবেলা স্বপ্ন দেখছিলাম সে যেন ফিরে এসেছে মা, রাম চরণের সাথে ঘরে ঢুকে আমায় যেন ডাকছে।" সুমিত্রা-দেবীর নয়নদ্বয় অশ্রুভাবে ছল ছল হইয়া উঠিল, তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইত অতসীর চক্ষু দুইটিও শুষ্ক ছিল না। সে নতমুখে আস্তে আস্তে কহিল "চরণদাদা ফিরে এসেছে মা।" সুমিত্রা দেবী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন "সে কখন এলো মা, তাকে আমার কাছে ডেকে দিতে বল।" ক্ষণকাল পর কর্ত্তার আমলের পুরাতন ভৃত্য রামচরণ গৃহে প্রবেশ করিয়া ম্লানমুখে কহিল "সে আমার সাথে দেখা করলে না মা, তার অধঃপতনের কথা আপনার কাছে কেমন ক'রে বল্‌বো? আমার দুরদৃষ্ট তাই সুধীরকে এমন অবস্থায় দেখে এলাম মা—" সহসা রামচরণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইল, সে অধোবদনে মেজের-বসিয়া পড়িল। সুমিত্রা দেবী চক্ষে অঞ্চল দিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। অতসীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে কষ্টে হৃদয় ভাব দমন করিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল "চরণদাদা, তোমার বোধহয় কাল থেকে খাওয়া হয়নি? ওঠ, সকাল সকাল স্নান করে একটু জল খাবে এস।" অতসী যেদিন নববধূবেশে প্রথম এ বাড়ীতে পদার্পণ করে সেই দিন রামচরণকে দেখাইয়া সুমিত্রা দেবী বলিয়াছিলেন "এই আমার বড় ছেলে, একে তোমার লজ্জা করতে হ'বে না মা, এ তোমাদের চরণদাদা।" লজ্জাজড়িতা নববধূ প্রথম দৃষ্টিপাতেই রামচরণকে তাহার পরমাত্মীয় 'চরণদাদা' বলিয়াই হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে রাম-চরণের প্রতি গভীর স্নেহে ও আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয়পূর্ণ হইয়া উঠিল। আকার ইঙ্গিত বা ব্যবহারে সে যে সাধারণ একজন ভৃত্য, ইহা অতসীর মনে নিমেষের জন্যও উদিত হয় নাই। আজও তাহার শুষ্ক মলিন মুখ

দেখিয়া অতসীর অন্তরে স্নেহপ্রস্রবণ উছলিয়া উঠিল। সে পুনরায় মৃদুস্বরে কহিল "স্নান করতে যাও চরণদাদা।" মুক্ত গবাক্ষ পথে প্রভাতের উজ্জ্বল রৌদ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া ঝলমল করিতেছিল সেইদিকে চাহিয়া রামচরণ কহিল "যাই দিদি।"

(২)

অকালে পতিবিয়োগের পর সুমিত্রা দেবী একমাত্র বংশের দুলাল নয়নের মণি পুত্র সুধীরকে উচ্চবিদ্যাশিক্ষা লাভের আশায় বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন। সদ্যে বিধবা মাতার আঁধার হৃদয়ে পুত্রের ভবিষ্য মূর্ত্তিটি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বেশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। লেখাপড়া শিখিয়া জ্ঞানবুদ্ধি অর্জ্জন করিয়া সুধীর যে একদিন বংশের মুখ সমুজ্জ্বল করিবে ও পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে ইহা মনে করিয়াও মাতৃ-হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। মানুষ আশা করিতে পারে কিন্তু আশার সফলতা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সুধীর লেখা পড়া শিখিল, কিন্তু মানুষ হইল না। মধুময় যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া পিতার অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আপাত সুখোন্মত্ততায় দিশেহারা যুবক পাপের পঙ্কে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিল। তাহার নিকট হইতে লজ্জা সঙ্কোচ সম্ভ্রম সংশয় বহুদূরে অপসৃত হইয়া গেল। পুত্র-গৌরবকাঙ্ক্ষী-মাতৃ-হৃদয় নিদারুন মনস্তাপে অপমানে অবসাদে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। সুমিত্রা দেবী স্নেহের উচ্চতম শিখরে এতদিন পুত্রকে আরোহণ করাইয়া কল্পনায় তাহার একটি আদর্শ ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কাল বৈশাখির প্রচণ্ড ঝটিকায় তাঁহার কল্পিত সুখসৌধ ও পুত্রের অনন্য সাধারণ মনোমদমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। হতাশার সুতীব্র তাপে মাতৃহৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল। পুত্রবৎসলা বিধবা স্নেহপ্রবণ বাহু প্রসারিত করিয়া অঙ্কচ্যুত সন্তানকে আর আপনার নিরাপদ বক্ষোনীড়ে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার জন্য মা একটি নবীন প্রয়াসে যত্নবতী হইলেন। নিজে দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া নববধূ অতসীকে গৃহে লইয়া আসিলেন। ভাবিলেন যে, পুত্র স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে সত্য, এবার প্রেমের বন্ধনে তাহাকে ফিরিতেই হইবে। কিন্তু মা'র সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া অতসীর প্রীতি সুকোমল লজ্জা শঙ্কিত মধুর মুখখানি দেখিয়া এবং তাহার প্রেম পূরিত হৃদয়ের আকুল আহ্বানে ভ্রান্ত যুবক ফিরিয়াও চাহিল না। পিতার বিষয়ের অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া বালীগঞ্জে একটি বাগান বাড়ী কিনিয়া উপযুক্ত সঙ্গীদের সহিত সুধীর প্রমোদসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া আসিল কিন্তু সুধীরের গৃহে ফিরিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। পুত্র-বিচ্ছেদ-কাতরা মাতার নয়নে অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল। অতসীর মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা তুষানলের ন্যায় তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

(৩)

সেদিন রামচরণের নিকটে পুত্রের চরম অধঃপতনের কথা শুনিয়া সুমিত্রা দেবীর হৃদয়ে নিদারুন শেলাঘাত হইল। নিরাশার ঘনান্ধকারে তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

কিছুদিন হইল তাঁহার শরীরটা ভাল যাইতেছিল না। এই সংবাদে নিরতিশয় মনস্তাপে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন বহুদিন পূর্ব্বে স্বামীর জীবিতাবস্থায় সুমিত্রা দেবীর কঠিন 'হৃদরোগ' হইয়াছিল, অনেক অর্থ ব্যয় ও অনেক যত্ন চেষ্টায় তিনি সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ দিন পরে পুনরায় তাঁহার সেই রোগের লক্ষণ দেখিয়া অতসী মনে মনে শঙ্কিতা হইল। যাঁহার স্নেহাঞ্চল ছায়ায় স্বামী পরিত্যক্তা অভাগিনীর জীবনটা নির্ব্বিবাদে অতি-বাহিত হইতেছিল, তাঁহাকে রোগ শয্যায় শায়িত দেখিয়া অতসী চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যাহার যৌবন প্রারম্ভে বসন্ত সমীর হিল্লোলিত আশালতা অঙ্কুরেই শুখাইয়া গিয়াছে, যাহার জীবনের শান্তি পর্ব্বে অশান্তির তীব্র ঝটিকায় মধুর স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সুমিত্রা দেবীর অভাবে তাহার ভবিষ্য-জীবনের চিত্রটি

হৃদয়ের নিভৃত প্রান্তে স্থান দিতেও অতসী শিহরিয়া উঠিল। শাশুড়ীর স্নেহময় বক্ষোনীড় ছাড়া তাহার স্থান কোথায়? সে কোথায় যাইবে? সেদিন মুগ্ধা কিশোরী শত আশার আশ্বাসে আনন্দের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তাহার কুমারী হৃদয়ের অমলিন ভক্তি প্রীতির সলিল ধারায় জীবন দেবতার চরণযুগল ধৌত করিয়া তাহার জীবন যৌবন সুখ দুঃখ সর্ব্বস্ব তাঁহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল। তখন কে জানিত দেবতা তাহা গ্রহণ করিবেন না। আজ এ বিপদের দিনে অতসী কাহার কাছে দাঁড়াইবে? কে তাহারে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ নীরে স্নান করাইয়া তাহার তাপদগ্ধ হৃদয়টি জুড়াইয়া দিবে? কেহ নাই, কিছু নাই তাহার সব শূন্য, সব বৃথা।

অতসী স্বামীর চিত্রটির নিকটে লুটাইয়া পড়িল। অজস্র অশ্রুধারায় বক্ষস্থল সিক্ত করিয়া নিজের মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়া একটু শান্ত হইল। রামচরণকে ডাকিয়া ডাক্তার কবিরাজ আনিবার ব্যবস্থা করিল।

সুমিত্রা দেবীর অসুখের মূলে কতবড় হৃদয় ব্যথা যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এ কথা আর কেহ না বুঝিলেও অতসীর নিকটে অপ্রকাশ ছিল না। পুত্রের হৃদয় হীনতা ও অবহেলাতেই তিনি যে পরপারের শান্তির আশায় উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন, এ কথা স্মরণ করিয়া অতসীর সুকোমল হৃদয় খানি বিদীর্ণপ্রায় হইয়া উঠিত। সে আপনার প্রাণ দিয়া এই ভাগ্য বিড়ম্বিতা মাতার সকল দুঃখ সকল দৈন্য ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। এক স্নানাহারের সময় ব্যতীত অতসী শাশুড়ীর শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিত না। পরিচর্য্যার একাধিক লোক থাকা সত্ত্বেও সে নিজের হাতেই তাঁহার সমস্ত সেবা ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কাপড় কাচা হইতে পথ্য রান্না তাহাও সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিত। অসমর্থ রুগ্ন সন্তান যেমন স্নেহময়ী মার উপরেই সমস্ত ভার বিন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে; সুমিত্রা দেবীও তেমনি বধূর হস্তে নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি অতসীর অনুরোধ উপরোধ কিছুই শুনিতে চাহিতেন না। সেটি তাঁহার ঔষধ সেবনের অনিচ্ছা।

(৪)

অতসীর প্রাণান্ত সেবা যত্ন, ডাক্তার কবিরাজদের হাত যশ দেখাইবার প্রলোভন, কিছুতেই সুমিত্রা দেবী নিরাময় হইতে পারিতেছিলেন না; বরং তাঁহার অবস্থা দিনের পর দিন উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। প্রাতঃকাল হইতেই আজ তাঁহার রোগের যন্ত্রনা বৃদ্ধি পাইতেছিল। মুখ নীল হইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে হাত দুইটি মুষ্টি বদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। অতসী শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল "এই ঔষধ টুকু ডাক্তার বাবু বুকে মালিশ করিয়া দিতে বলেন মা।" সুমিত্রা দেবী সজোরে কয়েকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন "আর ঔষধ নয় মা, আর ওসব এনো না। এখন মরণই যে আমার শান্তি। তাকে একবার দেখ্‌তে পেলেই আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত। আমার শেষ আশা অন্তিমের সাধ একি কেউ পূর্ণ করতে পারবে না মা?" সহসা বালিকার ন্যায় সুমিত্রা দেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার তাপিত হৃদয়ে অতীতের শত সহস্র স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল। সুধীরের বাল্যকালের কত ঘটনা, কত হাসি কৌতুক, আব্দার অভিমান আজ স্মৃতির সাগর মন্থন করিয়া একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বহুদিনের হৃদয়ের রুদ্ধ জ্বালা আজ সুমিত্রা দেবীর নয়ন পথ হইতে অশ্রু আকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল। কিছুকাল পর তিনি অশ্রুবেগ সম্বরন করিয়া স্নেহ জড়িত কণ্ঠে কহিলেন "ঔষধ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে কেন মা? ওসব ফেলে দিয়ে তোর ঠাণ্ডা হাতখানা আমার বুকে বুলিয়ে দে অতসী, আমার সব জ্বালা শীতল হ'ক্।" অতসী নত মুখখানি তুলিয়া কি যেন বলিতে যাইয়া পারিল না। তাঁহার ওষ্ঠাধর বারম্বার কম্পিত হইতেছিল। ইন্দীবরবিনিন্দী নয়ন হইতে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোকে এ অশ্রুবিন্দু সুমিত্রা দেবীর নিকটে গোপন রহিল না। তিনি শীর্ণ ডান হাতখানা বাড়াইয়া অশ্রুলোচনা বধূকে কোলে

কাছে টানিয়া লইলেন। সযত্নে সস্নেহে তাঁহার ললাটের কেশগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া মমতাপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "কেঁদনা মা, আমি মরতে চাইলেই মরণ আমার কাছে আসবে না। তোমায় এমন ভাবে রেখে আমার মরণও যে পালিয়ে যাবে বউমা। শুধু দুঃখ দিতেই তোকে ঘরে এনেছিলাম এত দুঃখও দিলাম মা।" অশ্রুধৌত মুখ নত করিয়া অতসী কহিল, "তুমি আমায় দুঃখ কষ্ট দাওনি মা ওকথা বলো'না। তুমি ঔষধ পত্র খেয়ে সেবে উঠলেই আমার কোনই দুঃখ কষ্ট থাকবে না মা।" বধূর সকরুণ কণ্ঠের আবেগপূর্ণ কথা কয়েকটি শুনিয়া সুমিত্রা দেবীর মর্ম্মস্থলে শেল বিদ্ধ হইল; পরগৃহ হইতে আনীতা পরের মেয়ের হৃদয়ের আকুলতা ও ব্যগ্রতায় নিজের সন্তানের হৃদয় হীনতা বক্ষের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সাথে সাথে অতসীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ মমতার প্রস্রবন ছুটিল। মনের মধ্যে অনুতাপের একটু ক্ষীণছায়া প্রসারিত হইল। তিনি জানিয়া শুনিয়া তাঁহার চরিত্রহীন পুত্রকে সংসারে বাঁধিবার জন্য অতসীর মুকুলিত জীবনটি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, এ কথাও মনে পড়িল। তিনি ঔষধ খাইলে যে এত সন্তুষ্ট হয়, ঔষধ না খাইয়া আজ আর তাহাকে ব্যথা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি কোমল স্বরে কহিলেন, "কোথায় কি ঔষধ দেবে দাও মা। খাবার কি ঔষধ পত্র আছে নিয়ে এস—তুমি আমার মা হও, আমি আর তোমার কথার অবাধ্য হ'ব না অতসী।"

(৫)

গভীর রাত্রি। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ম্লান চন্দ্র নির্নিমেষে ধরার পানে চাহিয়া আছে। সমস্ত পৃথিবী নিথর নিঝুম নীরব, যেন সুপ্তিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে শন্ শন্ শব্দে নির্ম্মল সমীরণ বহিয়া যাইতেছে। আজ অতসীর চোখে নিদ্রা নাই, সে মুক্ত গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া ছায়াচ্ছন্ন শান্ত সুপ্ত জগতের পানে চাহিয়া চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল চিন্তার ছায়ায় তাহার মন ম্রিয়মান ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। সুমিত্রা দেবীর অজ্ঞাতসারে সে যে সুধীরের নিকটে জীবনের এই প্রথম মাতার অভিমসাধ পূর্ণ করিবার জন্য মিনতি করিয়া চিঠি লিখিয়া রামচরণকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছে। আশা নিরাশার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতেছিল। রামচরণের সাথে স্বামী যদি সত্যই ফিরিয়া না আসেন, এ আশঙ্কায় তাহার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল, কিন্তু আশা কুহকিনী সে আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া তরুণীর সুকোমল হৃদয়ে কল্পনার মায়ারাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। সে মায়াপুরীর মাঝখানে স্বামীকে আদর্শ মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতসী হর্ষোৎফুল্ল বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার নিকট হইতে নৈরাশ্য আকুলতা আশঙ্কা দূরে বহুদূরে অপসৃত হইয়া গেল। পত্রের কম্পনে, মৃদু বায়ু প্রবাহে সে তাহার প্রিয়তমের আগমন আশায় চকিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু প্রভাতে রামচরণকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া তাহার মায়াস্বর্গ ভোজবাজির তাসের খেলার মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আলোকোজ্জ্বল হৃদয়টি নিরাশার অন্ধকারে আবৃত হইল। সে রামচরণের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। একটি প্রশ্ন করিবার শক্তিও যেন তাহার ছিল না। অতসী নীরবে থাকিলেও রামচরণ নীরব রহিল না; সে ব্যথিতস্বরে কহিল "তাকে ফিরাতে পারলাম না দিদি!" অতসী মূঢ়ের ন্যায় বিহ্বল স্বরে কহিল "মাকে কেমন ক'রে বাঁচান যাবে চরণদাদা? ডাক্তার কব্‌রেজ বল্‌ছেন মার মনের অসুখেই এতটা কাহিল ক'রে ফেলেছে, মন ভাল হ'লে অসুখ ভাল হ'তেও দেরী হ'বে না।" একটু চুপ করিয়া বাধ বাধ কণ্ঠে অতসী কহিল "আচ্ছা চরণদা, মার অসুখের কথা বলতে পেরেছিলে কি?" সুধীরের প্রতি কথা প্রতি কাজটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুনিবার জন্য অতসীর হৃদয় উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখ ফুটিতেছিল না। প্রবীন চরণদা'র নিকটে স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে যাইলেই কোথা হইতে যেন বিশ্বের লজ্জাসঙ্কোচ আসিয়া অতসীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া ফেলিত। নয়নদ্বয় মৃত্তিকা সংলগ্ন হইত। আজও সে চেষ্টা করিয়া একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। তাহার আগ্রহ ও চঞ্চলতা রামচরণের নিকট অবিদিত রহিল না। সে কহিল "কিছুই বল্‌তে পারি নাই দিদি, কাকে বল্‌বো? তারা তাকে কি বিষে যে জ্ঞানহারা ক'রে রেখেছে তা' তোমার কাছে বল্‌তে পারবো না দিদি। তুমি যার জন্যে উতলা হ'য়েছ, সে শয়তানদের হাত থেকে তাকে না ফিরাতে পারলে তাকেই যে আগে হারাতে হ'বে বোন।" রামচরণের কথায় অতসীর আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতরে রামচরণের তীক্ষ্ণ কথাটি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল "তাকেও হারাতে হ'বে বোন।" সে প্রস্তর প্রতিমার মত রামচরণের মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, স্বামী তাহার চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও সুখে আছেন, শান্তিতে আছেন, মনের আনন্দে আছেন। আজ রামচরণের অসম্পূর্ণ কথায় তাহার ভুল ধারণা তিরোহিত হইল। সে বুঝিতে পারিল সে যাহাকে সুখ শান্তির কেন্দ্রভূমি ভূস্বর্গ মনে করিয়াছে, সেখানে বিশ্বের গ্লানি পঙ্কিলতা এবং প্রাণক্ষয়কর প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা ব্যতীত আর কিছুই নাই। সেখানকার সমীরণ স্পর্শেও মানবের পরমায়ু তিলে তিলে হ্রাস হইয়া আইসে। নিমিষের মধ্যেই অতসীর লজ্জা সঙ্কোচ অদৃশ্য হইয়া গেল। সে কম্পিত কণ্ঠে কহিল "চরণদা, তাঁকে রক্ষা করবার কোন উপায়ই কি নাই?" "উপায় আছে দিদি, তুমি কি পারবে?" অতসী ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল "আমি পারবো না কি বলছ চরণদা, তাঁর প্রাণের কাছে আমার আর কি—" কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিল। রামচরণ সান্ত্বনার স্বরে কহিল "তুমি যদি একবার সেখানে যেতে পার দিদি, তা'হ'লে তাকে ফিরাতে পারি, কিন্তু মার কাছে এ কথা প্রকাশ করো না।" অতসী ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিল "ভবানীপুরে আমার দিদি আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তারপর তোমার সাথে বালীগঞ্জে যাব, মা জান্‌বেন দিদির ওখানেই যাচ্ছি। তারপর মাকে সব বল্লেই হবে।"

(৬)

দুইদিন হইল সুমিত্রা দেবীর ব্যারামের একটু উপশম হইয়াছে। তিনি সানন্দচিত্তে অতসীকে দিদির সহিত দেখা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। একটি ঝি ও রামচরণ অতসীর সাথে যাইবে স্থির হইয়াছে। ভবানীপুর অতসীর দিদির বাসা হইতে বালীগঞ্জ যে অধিক দূর নহে এ কথাও সুমিত্রা দেবীর নিকটে অপ্রকাশ ছিল না। এই সুযোগে কোন উপায়ে বধূর চাঁদমুখখানি দেখিয়া সুধীরের জ্ঞানচক্ষু যদি উন্মীলিত হয়—স্নেহময়ী মাতার হৃদয়ের গুপ্ত প্রদেশে একটি আশার ক্ষীণ আলোক রেখা মৃদুমন্দ জ্বলিতেছিল।

যাত্রার অনতিপূর্ব্বে সুমিত্রা দেবী অনেকদিনের পর ঘরের মেজেয় মাদুরে বসিয়া অতসীর সুদীর্ঘ কেশগুলি বহু যত্নে নিপুণতার সহিত বাঁধিতেছিলেন ক্ষণকাল পর চুল বাঁধা শেষ করিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে কহিলেন 'কাপড় জামা প'রে এস মা।" বধূ যখন পাশের ঘর হইতে একখানি সাধারণ কাপড় ও তেমনি একটি জামা পরিয়া ফিরিয়া আসিল, সেদিকে চাহিয়া সুমিত্রা দেবী ঈষৎ অনুযোগের সহিত কহিলেন "একি বেশ মা? এখনও আমি মরি নাই এবেশে কুটুম বাড়ী যেতে আছে? অতসী সলজ্জকণ্ঠে কহিল "ভাল কাপড় পরলে শুধু ট্রেনের ধুলো বালিতে নষ্ট হ'বে মা, সেইজন্যে এইখানাই পরেছি।" সুমিত্রা দেবী সে কথায় ভুলিলেন না। নিজে উঠিয়া গিয়া বধূর বাক্স হইতে তাঁহার মনের মতন সাড়ী ও জ্যাকেট বাহির করিয়া আনিলেন। কচি কলাপাতা রংয়ের সিল্কের জ্যাকেটের উপরে সেই রংয়ের মাদ্রাজী সাড়ীখানা আধুনিক ফ্যাসানে পরাইয়া, তিনি যখন কয়েকখানি সুরুচি সম্পন্ন গহনা লইয়া বধূকে পরাইতে বসিলেন, তখন আর অতসী চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নতমুখে মৃদু আপত্তি করিয়া কহিল "না মা, আর গয়নায় কাজ নাই। সে যেখানে যাইবার সঙ্কল্পে ছলনা করিয়া দিদির নিকটে যাইতেছিল, সেখানে সাজিয়া গুজিয়া অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া যাইবার কথায় তাহার শরীর ও মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার নিকটে যাইতে

তাহার আবার সাজ সজ্জা কিসের? তাঁহার কাছে তুচ্ছ সোনা মুক্তারই বা কি প্রয়োজন? কিন্তু সুমিত্রা দেবীকে বার বার বাধা দিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে বসনভূষণে সাজিতে হইল। সুমিত্রা দেবী বধূর সুসজ্জিত ব্রীড়াবিজড়িত দেহলতাটির দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল—এত রূপ, এত গুণ দিয়া ভগবান্ কেন ইহাকে এ ব্যর্থ জীবনভার বহিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। ইহার কি প্রতিকার হইবে না? এই অনাঘ্রাত দেবপূজার শুভ্র কুসুমটি সুতীব্র খরদহনে ম্লান হইয়া অবশেষে একদিন ধরাবক্ষে ঝরিয়া পড়িবে।

প্রণতা বধূকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার নির্ম্মল ললাটে একটি সস্নেহে চুম্বন দিয়া সুমিত্রা দেবী তাহাকে বিদায় দিলেন।

(৭)

অপরাহ্নকাল। নিভৃত কক্ষে দিদির কোলে মাথা রাখিয়া অতসী কহিতেছিল "আজ আমার থাক্‌বার উপায় নাই দিদি, মাকে যে অবস্থায় রেখে এসেছি তাতে থাকা অসম্ভব। আজ রাতের ট্রেণে রওনা হ'য়ে কাল ভোর বেলা মার কাছে পৌঁছুতেই হ'বে দিদি।" ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অতসী পুনরায় কহিল "চরণদা গাড়ী ডাকতে গেছে। তুমি আমায় বালীগঞ্জে যেতে অনুমতি দাও দিদি, মাকে না ব'লে এসেছি তুমি বল্লেই যেতে পারি।" অতসীর কথায় তাহার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া দিদির চক্ষুর কোলে অশ্রু ছল ছল হইয়া উঠিল। তিনি ছোট ভগিনীর মস্তকটি সস্নেহে বক্ষের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন "তাকে ফিরাতে পারলি অসী? যদি না পারিস্ শুধু অপমান হ'তে বাগান বাড়ীতে যাওয়া, কেমন হ'বে বোন?" "অপমান কিসের দিদি? নিজের বাড়ীতে সেখানে তিনি থাকৃতে তাঁর স্ত্রীকে কে অপমান করবে দিদি? সংসারের জ্ঞানহীনা ছোট বোনের সরল কথায় দিদির অধরোষ্ঠে বিষাদের হাসি খেলিয়া গেল। যে হৃদয় হীন পাষণ্ড একদিনের তরেও স্ত্রীকে—স্ত্রীর অধিকার দিতে সক্ষম হয় নাই, তার কাছে আবার স্ত্রীর মান অপমান। দিদি কথা কহিলেন না, নীরবে বসিয়া রহিলেন। অতসী পুনরায় আস্তে আস্তে কহিল "তুমি চিন্তা কোরছ কেন দিদি? এতে চিন্তার কিছু নাই। সাবিত্রী গভীর রেতে গহন বনে শমন রাজার কাছ থেকে মৃত-স্বামী ফিরিয়ে এনেছিলেন। আর আমি নিজের বাড়ীতে ঝিকে নিয়ে চরণদাদার সাথে কয়েকটি অসৎ-সঙ্গীর কাছ থেকেই কি তাঁকে ফিরাতে পারব না?" একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দিদি কহিলেন "সাবিত্রীর মতন কি তোর মনের জোর আছে বোন? তুই সুধীরকে দেখে হয়তো কেঁদে কেটে অস্থির হ'বি?" দিদির কথায় বাধা দিয়া অতসী কহিল "আমি কান্না কাটা কিচ্ছু কোরব না দিদি, আমার মনে হয় আমি গেলেই তিনি ফিরে আস্‌বেন। মাকে বাঁচাতে হলে তাকে বাঁচাতে হ'লে আমার যে সেখানে যেতেই হ'বে দিদি।" অতসীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ শুনিয়া এবং তাহার হৃদয়ের আগ্রহ দেখিয়া দিদির মনও দ্রবীভূত হইল; সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও মুখে তাঁহাকে অনুমতি দিতেই হইল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন "শুধু ঝি চাকরের সাথে তোর বাগান বাড়ীতে যাওয়া ঠিক হ'বে না অ'সী, আমি এখান থেকে অন্য কাউকে সঙ্গে দিচ্ছি সেই সাথে যাক্।" "না দিদি, বাড়ীর লোক ছাড়া অন্যলোক দেখ্‌লে তাঁর বড় লজ্জা হ'বে। তুমি আর কাউকে সঙ্গে দিওনা। চরণদাদা সাথে থাকৃতে কোন অন্যায় হ'বে না।" দিদি শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে অতসীর দিকে চাহিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যে স্বামী পাপের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহার লজ্জা ঢাকিতে সতীর এ ব্যগ্রতায় তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া গেল।

(৮)

বসন্তের গন্ধামোদিত সমীরণ-হিল্লোলিত মধুর সন্ধ্যা। ত্রয়োদশীর নির্ম্মলচন্দ্র সুনীল গগনে সমুদ্ভাসমান। চারিদিকে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা নিবিড় হইয়া আসিতেছে। দূরে তরুতল হইতে ঝিল্লীধ্বনির সহিত বিহগ কাকলি

ঝিশিয়া ধরণী পুলকিত, কানন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। কম্পিত শঙ্কিত হৃদয়ে অতসী সুধীরের বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তখন দ্বিতলের আলোকোজ্জল গৃহখানি নর্ত্তকীর নুপুর শিঞ্জনে এবং কোমল কণ্ঠের স্বর লহরীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য অতসীর চরণ দুইটি কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয় বিচলিত হইল। গীতবাদ্যক্ষোভিত প্রমোদ কক্ষে হৃদয় দেবতার সন্নিধানে ছুটিয়া যাইবার জন্য তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে হাত দুইটি জোড় করিয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিল। "অক্ষম দুর্ব্বল সন্তানকে বল দাও হরি, এ ভগ্ন হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিশয্যায় ফেলিয়া দিওনা।" প্রার্থনার সাথে সাথে অতসীর যুগলনয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

নীচের আলোকোজ্জল নির্জ্জন গৃহে অতসীকে ঝির নিকটে রাখিয়া রামচরণ উপরে উঠিয়া গেল। প্রমোদ গৃহে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিল "সুধীর"। তখনও মজলিস্ আনন্দ-প্রবাহে তরঙ্গিত হইয়া উঠে নাই। দুই একটি বন্ধু ছাড়া অবশিষ্ট বন্ধুবর্গের তখনও শুভাগমন হয় নাই। সুধীরের মত্ততা চরমে পৌঁছিবার তখনও বিলম্ব আছে। রামচরণের দিকে চাহিয়াই সুধীর চমকিয়া উঠিল। নত মস্তকে বসিয়া রহিল, তাহার সহাস্য মুখখানি মলিন হইয়া গেল। তাহার আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া রামচরণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল "সুধীর নীচে চল দিদিমণি এসেছেন।" তাহাদের বাড়ীতে রামচরণের দিদিমণি কে ইহা বুঝিতে সুধীরের বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইল না। তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সহসা রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে শুষ্ক বিহ্বল কণ্ঠে কহিল "কে এসেছে?" বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল "দিদিমণি তোমায় নিতে এসেছেন, সুধীর উঠে এস।" গীত বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। আমোদে বিঘ্ন হওয়াতে বন্ধুবর্গ বিরক্ত হইয়া বিস্ফারিত নয়নে সুধীরের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর প্রথম পারিষদ তারিণীবাবু ঈষৎ বিদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "সুধীর বাবু যে চুপচাপ হ'য়ে গেলেন, ব্যাপারখানা কি? কোথাকার এক ব্যাটা মাঝে মাঝে আলাতন করতে আসে এবার আবার কাব্য নিয়ে এসেছে"—তারিণী বাবুর মুখ হইতে কথাটি কাড়িয়া লইয়া নিবারণ বাবু জড়িত কণ্ঠে কহিলেন "কাব্য ব'লে কাব্য বাবা, এ আবার নূতন কাব্য। বাগান বাড়ীতে দিদিমণি হাঃ হাঃ—চাকরের সাথে।" শুষ্কতৃণ স্তূপে একটি দীপশিখা ফেলিয়া দিলে যেমন তাহা প্রচণ্ডবেগে দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, নিবারণ বাবুর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সুধীরের সুষুপ্ত মনুষ্যত্ব সেই মহা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। সে ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া কহিল "খবরদার, ছোট মুখে বড় কথা বলোনা নিবারণ, এ আমাদের চাকর নয়, এ আমার দাদা।" পরে রামচরণের হাত ধরিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে নীচে নামিয়া আসিল। "এই ঘরে বউমা" বলিয়া ঝি দরজার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। সুধীর ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া নত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া একটি কথা বলিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না। ক্ষণকাল পর পায়ে মৃদুকরস্পর্শে সচকিত হইয়া সুধীর চাহিয়া দেখিল অতসী তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। উজ্জ্বল দীপালোকে অতসীকে দেখিয়া সুধীর বিস্মিত হইল, একি তাহারই স্ত্রী? সেই আড়াই বছর পূর্ব্বের নোলক পরা অশ্রুভরা ক্ষীণকায়া বালিকা, এ আজ কোথা হইতে এত সুষমা এত মহিমা লাভ করিয়াছে? এই স্ত্রী, ইহাকে ফেলিয়া, স্নেহময়ী মাকে অশ্রুসলিলে ভাসাইয়া সোনার সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আজ সে কোথায় আসিয়াছে? সুধীরের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। নয়ন হইতে অনুতাপের পূত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে কথা কহিতে পারিল না। শুধু তাহার ব্যথিত নয়ন দুইটি স্ত্রীর মুখের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। অতসী আনতমুখে স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে কহিল "আমি তোমায় নিতে এসেছি। তুমি আমার সাথে এস।" সে কণ্ঠস্বরে জ্বালা নাই উত্তাপ নাই, অভিমানের একটু মৃদু আভাষও নাই। সুধীরের কাণে এবং প্রাণে স্বর্গীয় রাগিণীতে ধ্বনিত হইল "আমি তোমায় নিতে এসেছি" সমস্ত বিশ্বজগৎ যেন মধুর কাকলিতে গাহিয়া উঠিল "নিতে এসেছি" "নিতে এসেছি।"

সুধীর উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে কহিল "তুমি আমায় নিতে এসেছ। কিন্তু আমিতো ফিরে যাবার উপযুক্ত নই। কতদিন মনে ক'রেছি এ পাপের পথ থেকে ফিরে যাব, আমি মুক্তিলাভ করবো, কিন্তু এ কালো মুখ লোক সমাজে তোমার কাছে, মার কাছে কেমন ক'রে দেখাব সেই লজ্জাতেই যে ফিরে যেতে পারি নাই। লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে নিজের গলায় ছুরি দিয়ে মরতে সাধ হ'য়েছে। আমি জানি তা' ছাড়া আমার আর মুক্তির অন্য পথ নাই। সুধীরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। স্বামীর সকরুণ কথাগুলিতে অতসীর হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে আত্মসংযত হইয়া কহিল "আমিই আজ তোমায় মুক্তির পথে নিয়ে যেতে এসেছি। সন্তান শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও মার কাছে ক্ষমা পায়, আমাদের মাও তোমাকে ক্ষমা ক'রে কোলে তুলে নেবেন।" "মা ক্ষমা করবেন তা' জানি, কিন্তু এ জীবনেও তো তোমার ক্ষমা পাবার কোন অধিকার রাখি নাই।" একটু ইতস্ততঃ করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে সুধীর কহিতে লাগিল "আচ্ছা আমি যদি এসব সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে ভাল হ'তে পারি, মাকে পূজো করে তোমাকে ভালবেসে আবার মানুষ হ'তে পারি; তখন কি তুমি আমায় একটু ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে পারবে? অতসী, বল, বল লজ্জা করোনা। আজ তোমাকে দেখে আমার যে এ নরক থেকে ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা হয়। মানুষ হ'বার প্রবৃত্তি হয়। বল অতসী তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌তে পারবে কি?" এবার আর অতসীর অবাধ্য নয়ন কোন শাসন বাক্যের অধীন হইতে পারিল না, দুই চক্ষুতে বর্ষারধারা ছুটিল। সে অশ্রুসিক্ত মুখখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া লজ্জাজড়িত মৃদু কণ্ঠে কহিল "তুমি সমস্ত অবস্থায় আমার ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র। আমি এখনও তোমায় ভক্তি করি, ভাল—" অতসীর সলজ্জকণ্ঠে রুদ্ধ হইল। ভাববিহ্বল সুধীর কয়েক মুহূর্ত্ত স্ত্রীর সরমরঞ্জিত শান্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। আনন্দোজ্জ্বল মুখে কোমলকণ্ঠে কহিল "বল অতসী আবার বল; তুমি এখনও আমায় ভালবাস, ঘৃণা করো না?" স্বামীর পুনঃ পুনঃ আহ্বানে অতসী অশ্রুপূর্ণ মুখখানি স্বামীর বক্ষে লুকাইয়া কথা কহিতে পারিল না। তাহার অবারিত উচ্ছ্বসিত অশ্রুবিন্দুই সুধীরের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল।

প্রভাতে রোগ শয্যায় শায়িতা মাতার পদতলে লুটাইয়া সুধীর অনুতাপ বিদ্ধ রুদ্ধস্বরে কহিল "আমায় ক্ষমা কর মা" সুমিত্রা দেবী তাপিত বক্ষে পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। মাতার স্নেহাশ্রু ধারায় পুত্রের বিগত দিনের সমস্ত মলিনতা সমস্ত কালিমা ধৌত হইয়া গেল।

ব্যথা

[শ্রীমতী শৈলজা সেনগুপ্তা]

কি মধুর সুষমায় পরিপূর্ণ হয়ে
বিকশিয়া উঠেছিল চিত্তশতদল
তোমার নয়ন পাতে ; পুষ্প অর্ঘ্যলয়ে
মুঞ্জরিল শুষ্ক তরু, হৃদিকুঞ্জতল।
অযুত পাপিয়া কণ্ঠ পুলকে শিহরি'
ঝঙ্কারিয়া সারা হিয়া উঠিল কুহরি'।

আজিতো বসন্ত শেষ তপ্ত-মৃদু-শ্বাসে
নীরব উৎসব তার ; নিদাঘের সাঝে
মরণের হিম স্পর্শ—পুনঃ ফিরে আসে
শোকশীর্ণ ধরণীর জীর্ণ হিয়া মাঝে।

আজি কোন্ কল্পপুরে অভিসার তব !
জাগায়ে তুলিছ-সেথা মাহেন্দ্র লগনে
পরশ মাধুরী দানে চিত্ত নব নব ;
সঙ্গীত তুলিছ তার গগনে গগনে।

(আর) হেথা পড়ে' নিশিদিন চিত্ততৃষাতুর ;
(শুধু) পবন তুলিয়া যায় বেদনার সুর।

ভাববার কথা

অর্থ বনাম খাদ্য

[শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য]

"ধান্য গোধূম শস্যজাত,
দেশ বিদেশে যায়গো কত—
সপ্তকোটী শিশুর মুখের
মাতৃ-বুকের স্তন্য সে।"

ভারত যে কোন যাদুকরের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যে সাতকোটী কচি ছেলের মুখের গ্রাস অপরকে দিয়া প্রাণহীন হইতেছে এতদিন ভারত তাহার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে নাই, এতদিন সে বুকের উপর সোনা ফলাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়াছে, কিন্তু—কালের অনিবার্য্য গতিতে এবং ততোধিক অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে আজ আর তাহার সে দিন নাই; একদিন সুখ স্বচ্ছন্দে যে পৃথিবীর মাথার উপরে ছিল আজ সে বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষুক কেবলই দাও দাও করিয়া মাথা ঠুকিতেছে—

বিশ্বসংঘ যখন নিজের নিজের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধ পরিকর সে সময় ভিক্ষুকের করুণ ক্রন্দন কে শুনিবে? সরকারী হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় এখনকার প্রত্যেক ব্যক্তির বাৎসরিক আয় গড়ে দুই পাউণ্ড—অর্থাৎ ত্রিশ টাকার কিছু বেশী এরূপক্ষেত্রে ভারতে নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য মহামনস্বীগণের বুদ্ধি দরকার হইবে না। এই সমস্যার দিনে ভারত টাকার কাঙ্গাল। কেন এমন হইল, কিসে এমন হইল এই প্রসঙ্গে একজন অর্থনীতিজ্ঞ বন্ধু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য মনে করি—তিনি বলিয়াছিলেন—ভারতে খাদ্যের অভাব কখনও হয় নাই,—এবং হয় না, সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা ভারত-জননী এক দেশে না হয় আর এক দেশে শস্য উৎপাদিত করিয়া সন্তানকে উপহার দেন তাহা শুদ্ধ ভারতের পক্ষে যথেষ্টের চেয়েও বেশী, বাঙ্গলার সেই সর্ব্বনাশা ছিয়াত্তরেমন্বন্তরের সময়ও কেবল মৌসুমী বায়ুর আনুকুল্যের অভাবেই বাঙ্গালায় সময় মত আহার্য্য আসিতে পারে নাই।

কথাটা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল, আজ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি ধান চাল বোঝাই বড় বড় জাহাজ, শূন্যমার্গে বড় বড় পতাকা উড়াইয়া বুকের ভিতরটাকে নাড়া দিতে দিতে চলিয়া যাইতেছে। আর অনাহারে, অর্দ্ধাহারে প্রপীড়িত ভিক্ষুকের দল, বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাহাই দেখিতেছে।

চোখের সামনে না দেখিলে কি কিছু প্রত্যয় হয়? তাই যখনই এই বড় বড় জাহাজগুলো বুকের ভিতরটা নাড়া দেয় তখনই ভাবি ভারতের অভাব খাদ্যের না অন্য কিছুর? এত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও ভারতকে অন্য দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনাইয়া খাইতে হয় নাই—অধিকন্তু এই দুর্দ্দিনেও আমাদের ভারত জ্ঞানে অজ্ঞানে কত বড় বড় দেশের উদর পূর্ণ করিবার জন্য নিজের গোলা শূন্য করিয়াছে সে হিসাব রাখিতে আমরা জানি না। জানিবার মধ্যে শুধু জানি যে আমরা গরীব; জগতের মাঝে নিজেকে এমনি খেলো করিয়া দেখি বলিয়াই দৈন্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে।

যে টা চাহিবার জিনিষ, সেইটাই আমরা চাহিনা, আমরা টাকা চাই, খাবার চাইনা, তাই মরিতেছি।—তাহার

অভাবে, খাদ্যের অভাবে নয়। ভারতে খাদ্যের অভাব আজও হয় নাই। আমরা বিলাসিতা চাহিয়াছি, স্বাস্থ্য চাই নাই, তাই টাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকার প্রবর্ত্তকেরা আমাদিগকে চিনিয়াছে, আমরা কিন্তু টাকাকেও চিনি নাই, অপরকে চিনিবার কথা ত দূরে; টাকার মনভুলান মোহে গোলা শূন্য করিতেছি নিজেও সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরণতলে বিনীত হইতেছি, কিন্তু টাকাপ্রেয়সী তার চোখের একটা চাউনিমাত্র দিয়া প্রাণটী লইয়া পলাইতেছে আবার প্রেয়সীকে ধরি ধরি করিয়া চারিদিকে ছুটিতেছি বিদেশীর পদাঘাত সহ্য করিতেছি, বণিকের কার্য্যালয়ে যাইয়া পাচকের জীবনকাল ক্ষয় করিতেছি, কিন্তু যখনই তাহাকে হাতে পাইতেছি তখনই যে সে কোন দিক দিয়া যাইতেছে তাহার সন্ধান লইতে গিয়া চক্ষে 'সর্ষপপুষ্প' ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না।

ঘরের গোলা শূন্য—হাতেও একটী পয়সা নাই, ভাই বোন পুত্র কন্যা খাইতে না পাইয়া মরিতেছে, আর তাই চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছি; কি কিনিয়া তাহাদের খাওয়াইব খাদ্য দ্রব্য সব চক্ষের সম্মুখে, নাই কেবল টাকা, তাই এই অনশন। কই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ত এখনও খালি হয় নাই—মার ভাণ্ডার যে এখনও প্রায় তেমনই অটুট অফুরন্ত কই মা অন্নদে! তোর সে মুক্ত দান? মহারুদ্ররূপী ভিক্ষুক আজও যে বর্ত্তমান, সে তার ভিক্ষাপাত্রের পরিসর বর্দ্ধিতা, করিয়া তোরই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।—

আজ ভারতের নানাস্থানে অন্নকষ্ট বস্ত্রসংকট, কিন্তু ভারত যাহাদিগকে বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাসের আহার্য্য যোগায় তাহারা কেমন স্বচ্ছন্দে আছে, সেখানে যে famine অর্থে খাদ্যাভাব আর আমাদের দেশে 'দুর্ভিক্ষ' অর্থে অর্থাভাব। Scarcity of food ভারতের চিন্তা নয় ভারতের চিন্তা Scarcity of money লইয়া। যেখানে অর্থের স্বচ্ছলতা সেখানে খাদ্যের অভাব যদি 'প্রকৃতির নিয়ম হয় তবে যেখানে খাদ্যের, অভাব সেখানে অর্থের প্রাচুর্য্য হইলনা কেন? পোড়া ভারতের কপাল কি এমনই পুড়িয়াছে? যুদ্ধের সময় যখন জাহাজ মারার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল তখন বিলাতের লোকে খাবারের পরিমান কমাইতে বাধ্য হইয়াছিল—তাহাও অর্থাভাবে নয়—খাদ্যাভাবে, কিন্তু যদিও এই ভারতে আজ খাদ্যাভাব হয় নাই, তথাপি অর্থাভাবে মানুষ মরিতেছে, টাকা খাইয়া কি মানুষ বাঁচে? সমস্যার কথা বটে; খাদ্যদ্রব্য প্রচুর কিন্তু খাইতে পাইনা, এ কোন যাদুকরের খেলা? আজ আমরা টাকার পদতলে বিক্রীত-ঘৃণিত কুক্কুরেরও অধম।

এখন টাকার মাহাত্ম্য দেখা যাউক, যেখানে টাকা সেখানে কিরূপ অবস্থা, দেখ; সহরে যাও দেখিবে কোন অভাব নাই মোটর, ট্রাম, ল্যাণ্ডো সেই সমানভাবে ছুটিয়াছে,—কাপড় সাতটাকা জোড়া, এ কথা মনে আনিতেও ভয় হয়। প্রশস্ত রাজপথ ছাড়িয়া গলির ভিতর কেরাণীর মেসের মধ্যে প্রবেশ কর দেখিবে একটা অস্ফুট মর্ম্মন্তুদ যাতনা যেন সেখানকার বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মুখ বেদনা-ভার-ক্লিষ্ট, সুদূর পল্লীতে তাহাদের স্ত্রীপুত্র, ভাইবোন পেট ভরিয়া খাইতে পায় না এখানে কি লইয়া তাহারা সুখ করিবে?

সহর ছাড়িয়া পল্লীতে যাও সেখানে একদণ্ড তিষ্টিতে পারিবে না—সেখানকার দমকা বাতাস বুভুক্ষিতের দীর্ঘ নিশ্বাস বহিয়া আনিতেছে, পুত্রহারার আকুল ক্রন্দন সেখানকার অণুপরমাণুকে জড়াইয়া আছে পতিহারার গভীর আর্ত্তনাদ, পীড়িতের বিকল ক্রন্দন, পিশাচের ক্রুর হাসি তোমাকে প্রতিক্ষণে জানাইয়া দিবে তুমি কোথায় আসিয়াছ!

ঐ দেখ নবীন চাষী হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত একটা শত-গ্রন্থি বিশিষ্ট গামছা পরিয়া শিশি হাতে তিনক্রোশ দূরে ডাক্তারখানায় যাইতেছে; জিজ্ঞাসা কর এখনই সে কাঁদিয়া ফেলিবে, কেহ তাহাকে এতদিন একটা কথার সহানুভূতিও দেখায় নাই। যে দুঃখের সাগরে সে পড়িয়াছে তাহার তরঙ্গ অতি ভীষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু এতদিন সে তাহার বুকে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, তোমার একটী কথাতেই তাহা সরিয়া গিয়াছে—ঐ দেখ নবীনের চোখের জল তোমার সহানুভূতির সাড়া দিয়াছে! জিজ্ঞাসা কর শুনিবে আজ প্রায় পনরদিন তার তিনটী

ছেলে মেয়ের অসুখ, ডাক্তার আনিতে হইয়াছিল ; আজ চার বৎসর যাবৎ ক্ষেতে ধান নাই, কর্জ্জ করিয়া ডাক্তারের ফী দিয়াছে, কিন্তু পয়সা অভাবে ডাক্তার আর ঔষধ দিতে চায়না, আজ বোধ হয় ঔষধ মিলিবেই না। দুগ্ধপোষ্য রোগীগুলি আজ দুদিন ভালরূপ পথ্য পায় নাই, আজ আর হয়ত কিছুই জুটিবে না, আর যে সে কি বলিবে তা সে নিজেই জানে না, শুধু তার বুক ভাসিয়া গেল, মাটি ভিজিয়া গেল, আর দেখিতে চাও ?—

ঐ দেখ বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপ, মেরামত অভাবে তার কড়ি বর্গাগুলি খসিয়া পড়িতেছে, উপরে চামচিকার বাসা নিম্নপ্রদেশ পারাবত-বিষ্টায় পরিপূর্ণ ; শ্রীহীন দেবীমণ্ডপটী স্বতঃই তোমায় জানাইয়া দিবে ইহারা পূর্ব্বগৌরবের ইতিহাস নেহাৎ যা তা নয়, সাবধানে চল, ঐ দেখ মাথার উপরে কড়িকাঠটী প্রতিক্ষণেই পড়ি পড়ি করিতেছে। এপাশে কতকগুলি আবর্জ্জনা, ওপাশে শুষ্ক একটা কুলের গাছ, পাখীটা খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে ; আর ঐ দেখ মানুষগুলি মরি মরি করিতেছে, বিছানা হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে কে ? মানুষই ত, চল দেখি কি বলে, বলিবার কিছু নাই, ক্ষণপ্রাপ্ত সংজ্ঞা ঐ আবার লুপ্ত হইল, এই যে পাশে দু তিনটী ছেলে মর মর ঘরের ভিতরে ওদু'টী কে—মেয়েমানুষ নয় ? সংজ্ঞা নাই, তাইত ব্যাপার কি ? ঔষধের শিশিহাতে করিয়া কে একজন আসিতেছে ওকি ! কাঁদে কেন ? না না কাঁদুক, বুক হাল্কা করুক, ও দুষ্টু ওকে কাঁদিতে দাও, জিজ্ঞাসা কর—কিছুই বলিবে না—মা, বাপ, ভাই বোন কেহই তাহার কথা শুনিতেছে না তুমি কে যে তোমাকে সে তাহার দুঃখের কথা জানাইবে ?

ঐ শোন কে কোথায় কাঁদিয়া উঠিল, কে বুঝি খেলা সাঙ্গ করিল। কাহার ঐ যে আবার নূতন রোদনের রোল এবার কিন্তু অত জোরে নয়, বুঝিয়াছি চীৎকারের শক্তি নাই। গলাটা টিপিয়া যদি কেহ বক্ষের ধনকে ছিনাইয়া লয় তখন কি আর চীৎকারের শক্তি থাকে ? এ তাই—কল্পা ক্ষীণা জননীর অন্তরের নিধি বুঝি ইহলীলা সংবরণ করিল। হরি ! হরি ! এ যে সৎকারের লোক নাই, গাড়ীতে করিয়া ওকি লইয়া যাইতেছে শবদেহ নয় ? কি করিবে ? বনে ফেলিয়া দিবে ? এতে যে মড়কের বৃদ্ধি ? সে কথা উহারা তোমাদের অপেক্ষা ভাল জানে—আরও ভাল উপদেশ তোমাদের দিতে পারে ! তবে কি নিরুপায় ? হ্যাঁ সম্পূর্ণ তাই, এই কি ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁ—যাহার নাম তোমাদের মুখে তাহার অনুভূতি পল্লীর এই বুকে।

পাঠক ! ইহাই আজ দুর্ভাগ্য ভারতের রাজনীতি ? লক্ষ লক্ষ জীবন্ত মানুষের শোণিতে এর প্রতিষ্ঠান, মড়ক এর আহ্লাদ, দুর্ভিক্ষ এর ক্রীড়া, নরকঙ্কাল এর প্রজা আর আর্ত্তের করুণ চীৎকার এর নাট্যশালার সঙ্গীত।

ব্যথার ব্যথী

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

ক্ষুব্ধ পবন গুমরিয়া মরে
        রুদ্ধ বেদন বহিয়া,
গগনের বুকে কালো হ'ল মেঘ
        দহন-জ্বালায় দহিয়া।
শ্রাবণের ধারা আকুল কাঁদিয়া
তরু হ'তে পাতা পড়িছে ঝরিয়া,
অসীম সিন্ধু মরে গরজিয়া—
        ধরণীর ব্যথা হেরিয়া,
ম্লান ছবি তার রাখিয়াছে সবে
        আপনে মর্ম্মে ধরিয়া।

সহজিয়া

[শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল্]

তারপর আবার ঘূর্ণীপাকে দু'বৎসর ধরে ঘুরলাম। কিন্তু সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণীর মধ্যে কি যে পেলাম, কি যে হারালাম তার জমা খরচ দিতে পারব না; সময় সেই, কারণ এবার সেই ঘূর্ণায় আমায় পেয়ে বসেছে। দু'দিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে এসে আবার আমায় সেই আদিম ঘূর্ণায় পেয়ে বসল। যতদিন না এই ঘূর্ণার শেষ হয় ততদিন বুঝি আমার শান্তি নেই স্বস্তি নেই। হয়ত স্বস্তি এই জগতেই নেই হয়তো আমার জীবনে চঞ্চলতার মধ্য অচলত্বের অনুভবই সত্য তাই অচঞ্চলত্বের মধ্যে নিজেকে রাখতে গেলেই আমায় ছুটে বেরুতে হবে।

যাই হোক আমি গুরুচরণ হতে বিদায় নিয়ে নিতান্তই একলা হলাম। অথচ যেখানেই গিয়েছি, যতই আমি ছাড়া আর কেউ আছে কিনা প্রমাণ নেবার জন্য ঘুরে ঘুরে পর্ব্বতে কন্দরে মরুভূমে বেড়িয়েছি ততই যেন সেই মহান

দ্বিতীয়ের অনুভূতি পদে পদে হয়েছে। এমন কি কত বার পশুপক্ষীতে আমায় রক্ষা করে প্রাণ বাঁচিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমারই সঙ্গে আর একজন বহুরূপে আমায় রক্ষা করে আমায় সাহায্য করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন আমারও যেমন শান্তি নেই স্বস্তি নেই তারও যেন আমারই জন্য শান্তি নেই স্বস্তি নেই। এই ভবঘুরে মানুষটার জন্য সেও যেন ভবঘুরে হয়ে পড়েছে। তাই বাঘ ভালুকে আমার দেহটাকে খায়নি, এমন কি বনের বাঁদরে আমাকে মরণ হতে রক্ষা করেছে। এমনি করে প্রত্যক্ষভাবে বাইরে আর একজনকে অনুভব করা—পূর্ণভাবে পারব না। এককলে কি অনুভব করতে পারলাম। কখনো [illegible] পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে না [illegible] যেমন আপনাকে অনুভব করতে পারি। [illegible] পূর্ণভাবে আপনাকে ছেড়ে না দিলে এমন ভাবে 'পূর্ণ তুমি'র অনুভব কি পাওয়া যায়? আমার মনে হয়—হয় না। কিন্তু এই দুজনের সঙ্গে আমার [illegible] কে এদের এক [illegible]—পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করাচ্ছে? তা যে কিছু তাই ধরতে পারছিনে।

এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার একত্ব যখন আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল, তখন হঠাৎ কে যেন বলে উঠলে "ঘরে ফিরে চল, কোথায় [illegible] তোতে আমাতে মিল—দেখতে পাবি।"

কিন্তু কোথায় ফিরব? ক্রমাগতই ত ঘুরছি, ফিরছি, আবার কোথায় ফিরব? তবু সেই অনাহত ধ্বনি ক্রমাগত হতে লাগল, "ফিরে চল—ফিরে চল।"

[illegible] সময় মানুষ হতে এত দূরে গিয়ে পড়েছিলাম, যে যাকে জিজ্ঞাসা করব, যে কোথায় ফিরতে হবে, তার উপায় ছিল না। অথচ দিনের পর দিন এই সাড়ে তিনহাত লম্বা ভ্রমে ঢেরা মানুষকে দেখবার জন্ম আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল।

তারপর পাহাড়তলিতে পৌঁছে যে দিন প্রথম মানুষের মুখ দেখলাম, সেদিন যে কি আনন্দ পেয়েছিলাম তা বলতে পারিনে। মানুষের মুখে এত শোভা এত সুখ এত আকর্ষণী শক্তি আছে! আমি সমস্তদিন ধরে একটা গাছের তলায় বসে মানুষ দেখতে লাগলাম।

আমার একত্বই দুঃখ—আমার বহুত্বই সুখ যাদের দেখছিলাম, তারা ছিল ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বনকাটার দল। তারা একটা সন্ন্যাসীকে তাদের তাঁবুর কাছে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কি মনে করেছিল জানি না—কিন্তু আমি কিছু না চাইতেই দেখলাম আমার কাছে ধুনি জ্বালা হল, ভাল রুটী পাকান হল—কত ফলপাকড় এসে জুটে গেল। আমি না চাইতেই মানুষ আমায় আদর করে ভালবেসে ভক্তি করে আপনার করে নিলে। হায় রে এই মানুষকে মায়ার জীব বলে ঘৃণার জীব বলে দূরে পালিয়েছিলাম।

কি আছে এই মানুষের মধ্যে? কোথায় এই মানুষের সঙ্গে আমার যোগ? কি আমি এদের মধ্যে পাচ্ছিলাম তাই চুপ করে বসে সময় কাটাচ্ছিলাম? কাকে পাচ্ছিলাম? কে সে? আমি নিজে না আর কেউ? আমার এ সব প্রশ্ন সে সময় উদয় হয়নি, কিন্তু তারপর যখন ক্রমশঃ আবার মানুষের মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করলাম তখন ক্রমাগতই এই প্রশ্ন জেগে উঠতে লাগল। আমি মানুষের সঙ্গ ছেড়ে পশু পক্ষীর মধ্যে যেন আপনাকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। এই আপনার সঙ্গে প্রকৃতির যেন একটা সম্পূর্ণ মিল হয়ে গিয়ে না সুখ না দুঃখের একটা অ-জল অ স্থলের মত স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তারপর যাই আবার আমারই মত কতকগুলা জীবের মধ্যে এসে পড়লাম তখনি আমার 'আমি'ও প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল, জগৎও জেগে উঠল আমি তখন আবার পাগলের মত ছুটতে লাগলাম। সে যে কি আনন্দ কি সুখে আমায় ঠেলে নিয়ে চলেছিল তা কি কাউকে বোঝাতে পারব?

এই রকম অবস্থায় আমি এই প্রয়াগে এসে উপস্থিত হয়েছি। পুণ্য সঞ্চয়ের জন্ম নয়, সন্ন্যাসী দর্শনের জন্ম নয়, কারুর কাছে কোনো উপদেশ নিতে নয় শুধু এই মহা-মেলায় মহামানুষকে অনুভব করতে। মানুষের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতে আর আমার পাশে চির-দ্বিতীয়কে অনুভব করতে।

কিন্তু এখানে এসে একি করে বসলাম? আমার এত

দিনকার সমস্ত বৈরাগ্য, এতদিনকার সমস্ত চেষ্টা সাবধানতা সব ভাসিয়ে দিলাম। এ আমি কি করলাম? এক মুহূর্ত্তের ভুলে—প্রলোভনে নয়, ভুলে-ভুলে—এ আমি কি করলাম? এ আবার কাকে আমার একক জীবনের মধ্যে এনে দাঁড় করালাম? সে বালিকা ত' কিছুই জানেনা, তার কেন এই সর্ব্বনাশ করলাম? সে এখন কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই কিছু-দিন পরেই বুঝতে পারবে তার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? একটা অদ্ভুত খেয়ালের বসে তার পিতাই তার কি ক্ষতি করেছেন!

কিন্তু আমিই বা কেন সেই অদ্ভুৎ মানুষটার কথায় ভুললাম। মানুষকে অত্যন্ত কাছে একেবার প্রাণের মধ্যেই যদি অনুভব করবার ইচ্ছা ছিল, তাহলে সেই পাঁচ বৎসর আগেই ত' তা করতে পারতাম। যখন সমাজের মধ্যে আত্মীয়ের মধ্যে স্নেহ ভালবাসার মধ্যে ছিলাম তখন কেন আপনাকে ধরতে পারিনি? ছি—ছি একি করলাম?

প্রয়াগে এসে এই যে ঘটনা ঘটে গেল এর জন্য কাকে দোষ দেব? আমাকে? আমাকেই? আমি কি এই অদ্ভুৎ মানুষটার মাথায় এই অদ্ভুৎ খেয়াল ঢুকিয়ে দিয়ে ছিলাম? সে যে আজ ক'বছর হতে মনের মত সন্ন্যাসী খুঁজে বেড়াচ্ছিল উপদেশের জন্য নয়, সাধু সঙ্গের জন্য নয় জামাই করবার জন্য—এই ঘটনার ওপর কি আমার কোনো হাত ছিল? তারপর আমিও যে, "একটা মানুষ একটা নিতান্তই আমার আপনার মানুষের জন্য" পাহাড় পর্ব্বত নদীনালা অতিক্রম করে এখানে এসে পড়েছি, এটার ওপরেও কি আমার হাত ছিল? কৈ তাত বুঝতে পারছি নে?

তবে কেন এই ঘটনার জন্য আমার এত অস্বস্তি হচ্ছে? এই যে ছোট্ট একটা মানুষকে হাতের গোড়ায় পাওয়া, এই যে আমাকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সাধন ভজন সব বিলিয়ে দিয়ে কেবল আর একজনকে অনুভব করা বিধানন্দের প্রতীকরূপে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া এইটাই যদি আমার এ জগতে আসা—এই কথাই যদি সত্য হয় তাহ'লে কেন এতদিন এই রকম করে মিছে ঘুরে মরলাম? কেনই বা এত কৃচ্ছ এত সাবধানতা, এত ছুটোছুটী হাঁটাহাঁটী করে মলাম? সবই যদি আবার রমণী চরণে ঢেলে দিতে হবে তবে কেন বাল্যকাল হতে এই মেয়েমানুষকেই নরকের দ্বার বলে বুঝতে চেষ্টা করে এসেছি? কেন—কেন? মানুষের সেই অনাদি ভ্রম যদি আবার আমায় করতেই হবে তবে কেন এতদিন ঘুরে মরিছি?

যাক—যাক—এই কেন র উত্তর নিতে আবার আমি বেরুব। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার এতদিনকার সমস্ত চেষ্টার একটা ছোট্ট রকম বিবরণ লিখে রেখে যাচ্ছি। কার জন্য? তারই জন্য যে নির্দ্দোষী বালিকা আমার এবং তার পিতার খেয়ালের কাছে আপনাকে অজ্ঞাতে বলি দিলে।

অজ্ঞাতে? তাকে কি এই রকম একটা ব্যাপারের জন্য এতদিন ধরে তৈরী করা হয়নি? তা যদি না হবে তা হলে তার মুখ দেখে তার কথাবার্ত্তা শুনে আমারই বা হঠাৎ এ রকম স্খলন হল কেন? তার ঐ সুন্দর মুখের মধ্যে প্রাকৃতিক নারীত্ব ছাড়া আরও যে কি একটা দেখতে পেলাম। সেটা কি ভুল? হবে। যাইহোক সেই বালিকার কাছে আমার একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন আছে! সে হয়তো আমার এখন বুঝতে পারবে না। চিরদিনই সে কিছু ষোড়শীই থাকবে না। সেও বড় হবে। তখন সে মনে মনেও অন্ততঃ আমার এই অদ্ভুৎ কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ চাইবে। সেই ভবিষ্যতের জন্য এই কথা-গুলো লিখে রেখে যাচ্ছি।

কিন্তু তখনো যদি সে না বোঝে? নাই বা বুঝলে! তবু আমায় লিখে যেতে হবে। তাকে বুঝিয়ে যেতে হবে যে যদি সে সন্ন্যাসীকে বিয়ে করবার জন্যই জন্মদিন হতে প্রস্তুত হয়ে এসে থাকে তা হলে তার স্বামী চিরদিনই সন্ন্যাসী থাকবে। তাকে কোনোদিনই হাতের গোড়ায় পাওয়া যাবে না। হাতের মধ্যে পেলেই তার স্বামীর সন্ন্যাসীত্ব থাকবে না।

স্বামী? কে স্বামী? কার স্বামী?—আমি তার

স্বামী? এতবড় মতিভ্রম আমার ঘটে গেল? তার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে এসে তারই ওপর নিজের একটা স্বত্ব স্বামিত্বের অভিমান লাভ করে বসলাম? এই হল এতদিনকার সাধন ভজনের ফল? ওগো কে তুমি আমার আড়ালে বসে এতবড় ক্ষতি করলে? আমার আত্মাভিমানের মাথায় এমনি করে বজ্রাঘাত করে আবার এ কোন অভিমানের জন্ম দিলে? তোমার সঙ্গে যে কিছুতেই, পেরে উঠ্‌লাম না। সবই মনে হচ্চে আমি করছি, কিন্তু তারপরই দেখছি কিছুই ত' আমি করিনি, সবই যেন গোপনচারী তোমারই কাজ? আমার আড়ালে তোমার বিদ্রূপের হাসি বেশ শুনতে পাচ্ছি। ওগো হেসোনা গো হেসনা। দয়া কর, বুঝিয়ে দাও,—সাহস দাও, বল যে এ কাজ আমি করিনি। বল, "এ ভুল তোমার নয়—আমার। তোমারই মধ্যদিয়ে আমিই এ ভুল ইচ্ছে করে করছি। শতভাবে সহস্রভাবে অফুরন্ত-ভাবে এই ভুল আমি করে আসছি—আমি করব। তোমার কি সাধ্য আমার এই অফুরন্ত ভুলকে নির্ভুল করে দাও।"

বুঝবে কি তুমি? এমনি করে ভালবেসে বুকের মধ্যে প্রাণের মধ্যে আত্মার কাণে কাণে এ কথা বলবে কি?

যাক, কি কথা লিখতে কি কথা লিখে বসলাম। ওগো কিশোরী, তুমি যেদিন এই খাতাখানা খুলবে সেদিন যেন এমনি একটা দিন হয়। সেদিন যেন এমনি ভয়ঙ্কর কাঠফাটা রৌদ্রে দিগদিগন্ত অত্যন্ত পরিষ্কার সত্যের মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর এবং স্পষ্ট হয়। যেন তোমার অন্তরে বাইরে কোথাও কোনো ছায়া না থাকে কোনো কোমলতা না থাকে। সেদিন যে বাতাস বইবে তাতে যেন মলয়ের আভাস না থাকে, পাখীর গান না থাকে, বসন্তের কোনো আয়োজন না থাকে। যেন এমনি বৈশাখের বিরাট শুষ্কতার মধ্যে আমার সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি যেন সেদিন তোমার মধ্যে তুমি ছাড়া আর কারো অনুভূতি না থাকে;

আমি বিদায় নিলাম। চিরদিনের জন্যই বিদায় নিলাম—অন্ততঃ এই বিদায় যেন চিরবিদায় হয়। তুমি মুক্ত, সম্পূর্ণ মুক্ত! তোমার আমার মধ্যে কোনোদিন কিছু হয়নি। খেয়ালের বসে তোমার খেয়ালী পিতা যা করলেন, তা তোমার কাজ নয় তাতে তোমার কোনো হাত ছিল না। সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিবাহ হয় না—শাস্ত্র এ বিবাহ মানবে না, মানতে পারে না। সমাজও মানবে না—তুমিও মেনো না। আমিও মানব না—অন্ততঃ না মানতেই চেষ্টা করব। তবু যদি সময় সময় তোমায় মনে পড়ে ত' দুঃস্বপ্ন বলেই মনে করতে চেষ্টা করব।

আমি আন্তরিক এই কথা বলে গেলাম। আর, তুমি যাতে বিশ্বাস কর সেইজন্যই এই খাতাখানা, এই দিনে দিনে বেড়ে—ওঠা মনের বোঝা খানা তোমার কাছে ফেলে দিয়ে গেলাম। তুমি এর ধুলো ঝেড়ে সারটুকু গ্রহণ কর—আর অসার যা কিছু আছে ঘরের বাইরে ফেলে দিও।

আমিও আমার সমস্ত পুরাতন জীবনকে এই এত-কালের সঙ্গীটার সঙ্গে তোমার পায়ে ফেলে দিয়ে নূতন বাসে নূতন আশায় বেরিয়ে পড়লাম।

ওঁ শিবমস্তু ওঁ।

(ক্রমশঃ)

প্রেততত্ত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি এ]

অতীন্দ্রিয় দর্শন (Clairvoyance)

অলৌকিক আর এক রকমে আমাদের কাছে আত্ম-পরিচয় দিতেছে। এ প্রবন্ধে তাহারই বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সচরাচর আমরা চোখ দিয়া দেখি, কাণ দিয়া শুনি; আর দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় বাহির হইতে বাস্তব রূপ ধরিয়া আমাদের জ্ঞান-গ্রাহ্য হয়। কিন্তু অলৌকিকের ইঙ্গিতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে সব সময়ে চোখ দেখেনা, কাণ শোনে না; দৃষ্ট বস্তু বা শ্রুত শব্দ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরেও থাকে না অথচ উহাদের 'বোধ' জন্মে। ইহাই অতীন্দ্রিয় দর্শন বা শ্রবণ। ব্যাপার যে গাঁজাখুরী নয়, উপরন্তু ভয়ানক সত্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

প্রাচীনকালের চিৎতত্ত্ববিৎরা 'অতীন্দ্রিয় দর্শন' বলিতে বুঝিতেন বিনা দর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে অদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টিবোধ। দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান দ্রষ্টা বা অন্য কোনো জীবিত ব্যক্তির চেতনাগত থাক বা না থাক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; চোখের সম্মুখে না থাকিলেই হইল। আধুনিক চিৎতত্ত্ববিৎরা 'অতীন্দ্রিয়দর্শন' বলিতে এই বুঝিতে চাহেন যে দৃষ্টবস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান কাহারো চেতনা-গতও হইবে না।

চেতনা-গত যে বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞান তাহা উপস্থিত চোখের বাহিরে থাকিলেও উহাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করানো যে যাইতে পারে তাহা টেলিপ্যাথীতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে এমন শক্তিও রাখে যে ইচ্ছা করিলে অদৃষ্ট বস্তুকে দেখিতে পায় যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে বা তার নিকটস্থ আর কেহ সজ্ঞান নহে। এইরূপ অজ্ঞাত অদৃষ্ট বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করানকেই অতীন্দ্রিয় দর্শন বলা হইতেছে।

(বৈজ্ঞানিক চিত্তত্ত্ব সভা S. P. R.) এই অভিনব দূর-দর্শন শক্তির অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে একমত হইয়াছে। তারপর দেহমুক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান রূপ তত্ত্বের প্রমাণে ইহার কার্য্যকারীতা কতদূর তাহাও বিচার করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে তাহারই কিছু প্রমাণ দেওয়া যাইবে।

আপনা হইতে এরূপ শক্তির পরিচয় দেওয়ার বা পর কর্তৃক অন্যে এই শক্তির বিকাশ করার অনেক দৃষ্টান্ত এদেশে অনেকে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কিন্তু কখনো সে সবের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আমরা করি নাই। এখন পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতরা এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত পন্থায় আলোচনা করিতেছেন।

অতীন্দ্রিয় দূরদর্শনে যাহাদের স্বভাবশক্তি আছে চৈতন্যের সব অবস্থাতেই এই শক্তির পরিচয় দিতে পারেন। (১) পর কর্তৃক ঘটিত মোহাবস্থায়, (২) আত্ম ঘটিত মোহাবস্থায়, (৩) স্বপ্নাবস্থায়; (৪) সহজ জাগ্রতাবস্থায়, (৫) মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, (৬) এবং দেহান্তে অস্তিত্ব থাকিলে মৃত্যুর পরও জীব-চৈতন্য এই শক্তির পরিচয় দেয়।

এই শক্তির আর একটা আশ্চর্য্যকর বিশেষত্ব এই যে অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টার বোধশক্তি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের ঘটনার সহিত সংযোগ ঘটাইতে পারে।

আমরা নিম্নে প্রত্যেক ধরণের অতীন্দ্রিয়দর্শনের এক একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) পরিঘটিত বা আত্মঘটিত মোহাবস্থায় অতীন্দ্রিয় দর্শন

এমন কেহ কেহ আছে যাহার জাগ্রতচেতনাকে মোহমুগ্ধ করিতে পারিলে এই শক্তির বিকাশ পায়—

অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় দূরদর্শনশক্তি জাগিয়া উঠে, বাহিরের চোখ বুজিলে ভিতরের চোখ খুলিয়া যায়। এই মোহাবস্থা পরের দ্বারা মেসমেরিক পন্থায় আনীত হইতে পারে, বা নিজে হইতে আপনা আপনি আনীত হইতে পারে।

(১ক) চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সভায় বর্ত্তমান প্রধান মিডিয়ম শ্রীমতী পাইপার আপনা হইতে এই মোহাবস্থা প্রাপ্ত হন। এ অবস্থা একরকম পূর্ণ সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থায় তিনি প্রায়ই অতীন্দ্রিয় দূরদর্শন শক্তির পরিচয় দেন। স্বীয় দর্শনাচার্য্য জেমস নিজে ইহার প্রমাণ পান। মোহাবস্থায় শ্রীমতি পাইপার যখন কথাবার্ত্তা বলিতেন তখন সে সব কথাবার্ত্তা কোনো না কোনো বিদেহ আত্মার উক্তি বলিয়া প্রকাশ পাইত।

পাইপারের এই অবস্থায় তার আচরণ ও একদিন তাহার অতীন্দ্রিয় দর্শন শক্তির পরিচয় পান। মিসেস পাইপার তখন বিলাতে লজের বাটীতে সমাসীন। পাইপারে আবির্ভূত আত্মা স্যার অলিভারের এক খুড়া মাসীর বলিয়া পরিচয় দেয়। স্যার অলিভার তাহাকে এমন এক সংবাদ বা বার্তা জানাইতে বলেন যাহা পাইপার বা উপস্থিত কেহ জানিত না। উত্তর—" বড় দুঃখের বিষয় চার্লি পাখীটা খেয়ে অসুখ করে বসেছে, তার পেটে কি হয়েছে—তার কষ্ট হয়েছে পাখী খেয়েই অসুখ হলো।—কি যেন একটা পাখীর মাংস—খুব অসুখ—খুব কষ্ট পেয়েছে—তার ভাগে জানতে পার— কিন্তু যা বললাম ঠিক জানতে পারবে—সেও তোমাকে বলবে—" ইহার টীকা স্বরূপে লজ বলেন—"ব্যাপারটা এই। উক্ত 'চার্লি' আমার খুড়ীর পালিত পুত্র। তখন সে ক্যানেডার অন্তঃপাতী ম্যানিটোবা স্থানে। বড়দিনের ভোজ খাওয়া উপলক্ষ্যে সে একটা বনমুরগী শীকার করে এনে, মেরে খায়—ফলে এই অসুখ। উক্ত চার্লীর ভগ্নিকে পত্র লিখে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অবগত হই। তবে পাখী খেয়ে চার্লির অসুখ হয়নি, পাখী খাবার আগেই সে পেট কামড়ানিতে ভুগছিল, পাখী খেয়ে রোগ আরো বাড়ে, বড় কষ্ট পায়—।" পাইপার মুখে বার্তা পাওয়া যায় ১৮৮৯ খৃঃ ২৯শে ডিসেম্বর। বিদেশে তদন্তে জানি এ ব্যাপার অর্থাৎ চার্লির পাখী খেয়ে অসুখ বিলাতে কেউ জানতো না—।"

(১খ) মিসেস্ পাইপারের মোহাবস্থায় দূরদর্শন শক্তির দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত শ্রীযুৎ গনারের পরীক্ষা লব্ধ। শ্রীযুৎ গনার বিলাতী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপক। ইনি লণ্ডনস্থ তাঁহার মাতা ও ভগ্নিকে নির্দ্দিষ্ট কোনো দিনে অসময়ে অসম্ভব অস্বাভাবিক এক কাজ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। কেন যে তাহার কোনো উল্লেখ করেন নাই। পরে সেই দিনে গনারের মা ও ভগ্নি বৃষ্টির সময় এক হ্যানসম ক্যাবে (গাড়ী) চড়িয়া রিজেন্ট-পার্কে ভ্রমণ করিতে যান। এ ব্যাপার গনার নিজেও জানিতেন না। এদিকে লিভারপুলে লজের বাটীতে শ্রীমতি পাইপার মোহাবস্থায় যথাযথ সেই ভ্রমণ ঘটনা বর্ণনা করেন। পরে লজ ও গনার পত্রযোগে উভয়ের কৃতকার্য্যের পরিচয় পান। উভয় ঘটনা অর্থাৎ কৃত ও বর্ণিত দুই-ই মিলিয়া যায়।

(১গ) জীব ও শারীর তত্ত্বের জগদ্বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞান পণ্ডিত আচার্য্য রিসেট্ একবার তাহার পরীক্ষাগারে কোনো যুবতীকে মোহমুগ্ধ করিয়া দূরদর্শন ঘটিত পরীক্ষা করিতেছিলেন। পরীক্ষার বিষয় একটা মোড়ক করা জিনিসকে খামে মুড়িয়া শিলমোহর করত মুগ্ধাকে বলিবার জন্য দেওয়া হয়, মুগ্ধা উহা বলিবার আয়োজন করিতেছেন এমন সময় আচার্য্য উন্মনা হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—"বলিতে পার ল্যাংলে কি করিতেছে?" [ল্যাংলে অধ্যাপকের দূরবর্ত্তী এক পরীক্ষাগারের সহকারী, তখন একটা দ্রাবক লইয়া পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল] শ্রীমতি প্রশ্নমাত্রেই বলিয়া উঠিল—"ল্যাংলে গা পুড়াইয়া বসিয়াছে তাহার গায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে সে কেন সাবধানে এসব নাড়াচাড়া করেনা?" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করেন "কিসে পোড়াইল?" উত্তর—"জানিনা; উহার রং লাল নয়, ঘোর বাদামী রংএর।" আচার্য্য তদন্তে জানিতে পারেন সেইদিন বেলা ৪টার সময় ল্যাংলে ব্রোমিন লইয়া একটা পাত্রে ঢালিতে গিয়া অসাবধানে গা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। আচার্য্য লিওনিনাকে লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন সন্ধ্যা ৬ঘটিকার সময়। ল্যাংলের বিপত্তি ঘটে বেলা ৪টার সময়।

(Psychical Research by Barret, Home University. p. 152)

(১ঘ) মোহাবস্থ দূরদর্শন শক্তি যে ভবিষ্য ঘটনা দেখিতেও সমর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ডাঃ আলফন্সো টেষ্টি কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা ইহার এক [illegible] দৃষ্টান্ত।

"ডাঃ টেষ্টি নিজে শ্রীমতি ইনটেমসকে [illegible] স্বামীর সমক্ষে মোহমুগ্ধ করেন। মোহাবস্থায় শ্রীমতি [illegible] লাগিলেন—"আমি দুই সপ্তাহ অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি, [illegible] পূর্ণকাল পর্যান্ত থাকিবে না; [illegible] পড়িয়া যাইব; ফলে গর্ভপাত হইবে। [illegible] দুর্ঘটনার পর আমি অজ্ঞান হইয়া [illegible] মিনিট এই অবস্থায় থাকিব।" পরে ঘটনা [illegible] কি ভাবে চলিয়া শেষে তিন দিন [illegible] মস্তিষ্ক বিকৃত থাকিবেন [illegible] ও বর্ণনা করিলেন। মোহভঙ্গে তাঁহার আর কিছুই মনে ছিল না কি বলিয়াছিলেন। সে সব কথা তাঁহাকে জানানোও হয় নাই। ডাঃ টেষ্টি [illegible] ডাঃ [illegible] লাটুরকে জানান। ১২ই মে উপস্থিত হইলে তিনি উক্ত বাড়ীতে উপস্থিত হন। স্বামী স্ত্রী দুজনকে [illegible] নিযুক্ত দেখিলেন। শ্রীমতিকে আবার মোহমুগ্ধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার পূর্ব্বাহ্নে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন। তাঁহাকে জাগানো হইল। কথিত দুর্ঘটনার সময় নিকট হইয়া আসিল। তাঁহারা যথাসাধ্য সাবধান হইলেন। এমন কি জানালা খড়খড়ি বন্ধ করা হইল শ্রীমতি এই সব সতর্কতার কাণ্ড দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন না কেন এসব হইতেছে। উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা তাহাকে কি করিবে? বেলা ৩া০ হইল। শ্রীমতী সোফা হইতে উঠিলেন, উদ্দেশ্য বাহিরে যাইবেন। ডাক্তার ও তাঁর স্বামী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? ব্যাপারখানা কি বলুন তো? আমি বাহিরে যাইতে চাই এবং যাইবও।"

ডাক্তার বলিলেন—"না ভদ্রে, কখনই না; আপনার স্বাস্থ্যের খাতিরে এই নিষেধ, যাইতে পাবেন না—"

শ্রীমতি। "যদি আমার স্বাস্থ্যের খাতিরে, তাহা হইলে তো আরো আমার যাওয়াই উচিৎ?"

ডাক্তার এর উত্তরে কি বলিবেন? তিনি নীরব। তাঁর স্বামী তখন নিরুপায় দেখিয়া সঙ্গে যাইতে চাহিলেন; উদ্দেশ্য অদৃষ্টের সঙ্গে শেষ পর্যান্ত লড়াই করা। উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার ঘরেই থাকিলেন। * * হঠাৎ বাহির হইতে একটা যাতনা সূচক শব্দ শোনা [illegible] ডাক্তার বাহিরে গিয়া দেখেন শ্রীমতি ভয়ে প্রায় অজ্ঞান [illegible] অবস্থায় স্বামীর দুই হাতে ধৃত হইয়া আছেন। [illegible] —দরজা খুলিয়া বাহির হইবামাত্র একটা বড় [illegible] দিক লাফাইয়া ছুটিয়া আসে; শ্রীমতি ভয় পাইয়া পড়িয়া গিয়া এই অবস্থাপন্ন। আশ্চর্য্য এই [illegible] বছরের মধ্যে সে স্থানে কোনো ইঁদুর দেখা [illegible] বাকী সমস্ত ঘটনা যেমনি কথিত হইয়াছিল ঠিক বর্ণে বর্ণে তাহা ঘটে।'

মন্ত্র বলে (mental suggestion) লোককে পূর্ণসজাগ ও সহজজ্ঞানের অবস্থায় দূরস্থ বস্তু বা দৃশ্য দেখানোর দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কোনো এক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ কয়েকটী অল্পবয়স্কা কুমারী বালিকাকে চক্রে বসাইয়া তাহাদেরই পাড়ার এক ছোকরাকে জেল কয়েদীর বেশে দেখাইয়াছিলেন। বালিকারা তাহাকে আরো অল্পবয়সে দেখিয়াছিল। সিদ্ধপুরুষ সে ছোকরাকে কখনো জীবনে দেখেন নাই। বালিকারা যে কয়েদীর বেশ বর্ণনা করিয়াছিল তাহা সাধারণ কয়েদীরা পরে। ছোকরা তখন কোনো দূরদেশে জেল খাটিতেছিল। উহারা তাহার সে অবস্থা জানিত না। ছোকরার তৎকালীন সে অবস্থা অবশ্য তদন্তে নির্ণীত হয় নাই; তথাপি পাড়ায় বয়োবৃদ্ধিরা সে সম্বন্ধে যা বলিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস্য নহে।

(২) স্বপ্নাবস্থায় দূরদর্শন—

আমরা অতঃপর স্বপ্নাবস্থায় দূরস্থ বা নিকটস্থ অজ্ঞাত অদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টিবোধের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব।

(২।ক) বর্ত্তমান ঘটনা দর্শন :—"আমেরিকার অন্তঃপাতী আইওয়া নগরের প্রধান পুরোহিত পাদরী ডাঃ লি-র

পুত্র একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন তাঁহার পিতা সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইতেছেন আর তিনি তাঁহাকে ছুটিয়া গিয়া ধরিতে যাইতেছেন ; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন ঘড়িতে রাত ২।১৫ মিনিট। তিনি তাঁহার পত্নীকে জাগাইয়া স্বপ্নের কথা বলিলেন। সকালে উঠিয়া পিতাকে তারের খবরে সংবাদ দেন ও পত্র দিতে বলেন। উত্তরে পিতা লিখিলেন ঠিক ওই সময়ে তিনি সত্যই পড়িয়া গিয়া বিশেষভাবে আহত হন।" (চিৎতত্ত্ব সভার বিবরণী ৭ম ভলুম। প। ৩৮।)

(২।খ) মিসেস্ কেলিন বর্ণিত ঘটনা :—"আমার শিক্ষয়িত্রীর হাত হইতে একটা আংটী খেলাচ্ছলে খুলিয়া নিজ আঙ্গুলে পরি। রাত্রিতে শুইবার সময় যখন খুলিতে যাই দেখি একটা পাথর তাহা হইতে খুলিয়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। বিদ্যালয় বাড়ীর সব ক্লাসে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, পাইলাম না। বড় মন খারাপ হইল কেন না আংটীটী আমার শিক্ষককে তাঁর কোন আত্মীয় উপহার দিয়াছিলেন। যাহা হউক রাত্রিতে ঘুমনো অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম আমাদের ড্রিল ঘরের একটা কাঠের তলায় উহা পড়িয়া আছে। ঘুম ভাঙ্গিলে আলো লইয়া সেই ঘরে গিয়া যথাস্থানে আংটীটী পড়িয়া আছে দেখিলাম।"

(২।গ) অতীত ঘটনাদর্শন বা শ্রবণ :—

ওয়াল্ডিং নগরীর রেক্টার রেভ ই, কে ইলিয়ট বর্ণিত ঘটনা ;—(তাঁহার ডায়েরী হইতে)। ১৪।১।১৮৮৭—স্বপ্ন দেখিলাম খুড়া H. E.—পত্র দিয়াছেন। পত্রে আমার প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ। আমার ভাই অসুখ হইয়া সুইজরলণ্ডে বাস করিতেছিল। তার শেষ পত্রে ভাল থাকার খবর পাই। পত্রে ৩রা জানুয়ারী খুব কাল অক্ষরে লেখা। ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া সত্যই দেখি এক পত্র আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পত্রে ভাইএর মৃত্যুসংবাদ এবং ঐ তারিখেই (৩রা জানুয়ারী) মৃত্যু হইয়াছে—।" ডায়েরীর লিপি জাহাজে থাকিবার সময়ে লেখা।

(২।ঘ) ভবিষ্যৎ ঘটনা দর্শন :—শ্রীমতি সিজউইক্ রচিত প্রবন্ধ হইতে। প্রবন্ধ সভার পঞ্চম সংখ্যক বিবরণীতে মুদ্রিত হয়। পত্র সংখ্যা ৩৩১। স্বপ্ন দ্রষ্টা একজন ইন্‌জিন্ চালক। "১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি একটী নূতন আমকোয়া ইনজিন্ চালাইবার ভার পাই। ২৯শে মে স্বপ্ন দেখিলাম ইনজিন্ যুক্ত ট্রেন একটা সরু অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটা উচ্চ পাথরের সাঁকোর উপর আসিয়া পড়িল, এবং পার না হইতে হইতে কাত হইয়া ৭০ ফিট্ নীচে এক নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। আমি পরদিন স্বপ্ন কথা বাড়ীর লোককে জানাই। বাড়ীর মহিলা (এখন মৃতা) বলিলেন—"তুমি মারা যাইবে।" আমি বলিলাম—"না। আমি সে বিষয়ে স্বপ্নে নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" দ্বিতীয় দিনে আমি সেই ইনজিন চাপিয়া একটা অজানিত পথ দিয়া যাই। দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন দৃষ্ট সরু খাঁজ পথে আসিয়া পড়ি। আমি দেখিলাম সম্মুখে একদল লোক রাস্তা মেরামতে নিযুক্ত। ইনজিনিয়ারকে গাড়ী থামাইতে বলিলাম, সে পারিল না, গাড়ী ততক্ষণে একটা সাঁকোর উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। রাস্তায় বাধা দেখিয়া ইনজিনিয়ার লাফ দিয়া পড়িল। আমি গাড়ী থামাইতে পারিলাম না, গাড়ী লাইনছাড়া হইয়া দুটা পাক্ খাইয়া নীচে পড়িয়া গেল আমি শুদ্ধ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটা সামান্য আঁচড় ছাড়া আর কোন আঘাত পাই নাই। জ্ঞানভূমি অতিক্রম করিয়া উপরে চাহিয়া দেখি সাঁকোটা অবিকল স্বপ্নদৃষ্ট সাঁকোর মত। প্রায় ২০০ ফিট লম্বা। পাঁচটি খিলানাক্ত। প্রায় ৫৪ ফিট উচ্চ। আর যে জায়গায় গড়াইয়া ইনজিন পড়ে তাহা ৭০ ফিট খাড়া।"

(২।ঙ) স্বপ্ন দৃষ্ট ভবিষ্য ঘটনায় দৃষ্টান্ত :—(চিৎতত্ত্ব সভার নবম সংখ্যক বার্ষিক বিবরণী হইতে) "১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে তামাক বিক্রেতা ওয়ালটার জোন্‌সের ছোট ছেলের অসুখ হয়। একদিন রাত্রিতে তাঁর পত্নী এনেটা স্বপ্ন দেখেন একটী মালবাহী টানা গাড়ী তাঁহাদের বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া থামে। গাড়ীতে তিনটী শবাধার (coffin)। দুইটা শাদা ও একটা নীল

রংএর। শাদা দুটা কফিনের মধ্যে একটা বড়। নীলটা সবচেয়ে বড়। গাড়ীর চালক বড় সাদা কফিনটা জোন্সের বাড়ীর দরজার নিকট ডাক্তার সাহেবের কাছে রাখিয়া গেল।

জোনস্ পত্নী নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন-কথা তাঁর স্বামীকে ও এক প্রতিবেশীকে বলেন। নীল কফিনটার কথা একটু বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন।

১০ই সেপ্টেম্বর উহাদেরই এক নারী বন্ধুর একটী ছেলে হয়। ছেলেটী ২০শে তারিখেই মারা যায়। পর সোমবার দিন ডাক্তার উহাদের পীড়িত ছেলেটাও মারা যায়। ডাক্তারের শিশুর বয়স ১ বছর চার মাস মাত্র। স্থির হয় দুটা শিশুকেই একদিনে কবর দেওয়া হইবে। কবর দিবার দিন পাড়ার পাদরী জোন্স ও তাঁর পত্নীকে খবর দেন যে পাড়ায় আর একটী ছেলে মারা গিয়াছে, এবং তাহারও শবদেহ ঐ দিনই নির্দ্ধারিত কবর দেওয়া হইবে। জোন্স পত্নী অমনি স্বামীকে বলেন যে এ ছেলেটীর কফিন যদি নীল বর্ণের হয় তবে তাঁর স্বপ্ন সত্য হইবে। কারণ আর দুটা শাদা ছিল। যথাকালে তৃতীয় মৃতদেহের কফিন উপস্থিত হইলে দেখা গেল উহা নীল-রংএর; সাইজ মাপিয়া দেখা গিয়াছিল সেটা সব চেয়ে বড়। জোনস্ শিশুর কফিনটা দুটা সাদার মধ্যে বড়। মৃতদেহের বয়সানুসারে কফিনের সাইজ বানানো হয়।"

বাহুল্য ভয়ে স্বপ্ন দৃষ্ট ভবিষ্য ঘটনার দৃষ্টান্ত বেশী দিলাম না। বহু সংখ্যায় এ জাতীয় ঘটনার বিবরণ 'চিরন্তনভাব বিবরণীতে' দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সভার মতামত প্রবন্ধ শেষে অবগত করানো যাইবে।

৩। সজাগ অবস্থায় দূরদর্শন —

চেতনার সহজ ও সজাগ অবস্থায় অদৃশ্য বা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনেক স্বভাব সেন্সিটিভ্ লোক (অনুভূতি-প্রবণ) আছেন যাঁহারা পূর্ণসজাগ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এই শক্তির পরিচয় দেন। কি উপায়ে যে তাঁহাদের মুহূর্ত্তের মধ্যে বহির্জ্ঞান রুদ্ধ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় আর অলৌকিক ঘটনার অনুভূতি হয় তাহার এ পর্য্যন্ত কোনো কারণ নির্ণয় হয় নাই, তবে হয় যে তাহার বহুপ্রামাণিক দৃষ্টান্ত আছে। অনেকের আবার এমন শক্তি আছে যে একখণ্ড উজ্জ্বল কাঁচ বা পাথরের খণ্ডে বা যে কোনো ঝকঝকে জিনিসে এমন কি নিজের নখের উপর চোখ রাখিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয় দেখিতে পান; ইহাকেই মোটামুটী ভাবে crystal-gazing বা স্ফটিক-দৃষ্টি বলে। অবশ্য উক্ত কাচ বা পাথরে বা নখে যে কোনো বাস্তব চিত্র (আয়নাতে ছবির মত) ভাসিয়া উঠে তাহা নয়; ও জিনিসটা চিত্র সংযোগের উপায় মাত্র, অন্তর্দৃষ্টি শক্তি ফুটাইবার একটা উপলক্ষ্য। "হাত" বা কর-রেখা দেখিয়া যে ভবিষ্যৎ বলা ইহাও এই জাতীয় অলৌকিক শক্তির দৃষ্টান্ত। আর এক-শ্রেণীর জাগ্রতাবস্থায় দূরদর্শন দেখা যায়। দ্রষ্টার হাতে কোনো অনুপস্থিত লোকের ব্যবহৃত (হাতে ছোঁয়া) জিনিষ দিলে, উহার স্পর্শমাত্রে দ্রষ্টা সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দেয় যাহা ঐ স্থানে বসিয়া পাওয়া স্বভাব নিয়মে অসম্ভব। অনেক তান্ত্রিক নাবব-মন্ত্র বলেও অপরকে এই শক্তিসম্পন্ন করিতে পারেন যে আমাদের দেশে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে আমরা ইহার আলোচনা কখনো করি নাই তার কারণ একদল পক্ষে পূর্ণ অবিশ্বাস অপরদল পক্ষে বিনা তর্কে অতি বিশ্বাস মাত্র।

আমরা অতঃপর এই দুই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(এক) সজাগ অবস্থায় স্বতঃঘটিত দূরদর্শন—

বিশ্ববিখ্যাত ঋষি সুইডেনবর্গের নাম সকলেই জানেন। সন্দেহবাদী দার্শনিক বাক ক্যাণ্ট এই সুইডেনবর্গের অলৌকিক শক্তির চাক্ষুষপ্রমাণ পাইয়া নিজের সন্দেহবাদ ত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয়বাদ অবলম্বন করেন। ক্যাণ্ট সুইডেনবর্গের অলৌকিক কার্য্য লইয়া এক পুস্তক লেখেন — নাম "Dreams of a spirit seer" (অতীন্দ্রিয় দর্শীর অনুভূতি)। এই পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

"ষ্টকহল্‌ম নিবাসী ডাচ্ রাজদূতের বিধবা পত্নী শ্রীমতী হার্টভিলের কাছে এক স্বর্ণকার কিছু পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দেয়। শ্রীমতি জানিতেন সে টাকা তাঁর স্বামীর জীবিতকালে মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু রসিদটা

খুঁজিয়া না পাওয়ায় তিনি পাওনাদারকে কিছু বলিতে ভরসা পান নাই। অথচ সামান্য টাকাও নয়; তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া সুইডেনবর্গের শরণাপন্ন হন। সুইডেনবর্গ যে দেহমুক্ত জীবাত্মাদের সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করিতে পারিতেন এ কথা তখন সর্ব্বত্র রটিয়াছিল। বিধবার অনুরোধ সুইডেনবর্গ অগ্রাহ্য করিলেন না, সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি রাজী হইলেন যে ও সম্বন্ধে ঠিক খপর তিনি তাঁর স্বামীর সহিত আলাপ করিয়া জানিবেন। এ ঘটনার তিনদিন পরে শ্রীমতি তাঁর নিজ বাড়ীতে একটা সান্ধ্যভোজ দেন। সুইডেন-বর্গও অবশ্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই শ্রীমতিকে বলিলেন—"আপনার স্বর্গীয় স্বামীকে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলেন সে দেনা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রসিদ তাঁহার দ্বিতল গৃহে একটা 'ব্যুরোর (আলমারি বা ড্রয়ার-টেবিল) ভিতর আছে।" শ্রীমতি বলিলেন—'সেটা ঝাড়াপোছা করে পরিষ্কার করা হয়েছে—তাতে যা ছিল সব সরানো হয়েছে সব কাগজ পত্রের মধ্যে রসিদ পাওয়া যায়নি।" সুইডেন-বর্গ বলিলেন—"না, ঠিক্ করে খোঁজা হয়নি; আমাকে তিনি বলে দিয়েছেন, ঠিক্ কোথায় আছে; বাঁ দিকের ড্রয়ারটা খুললে আর একটা গা-বাক্স দেখা যাবে, সেটাও টেনে খোলা যায়, বাহির হতে বোঝা যায় না যে ওটাও একটা টানা ড্রয়ার—তার ভিতরে তাঁহার গুপ্ত জরুরী সরকারী চিঠিপত্র আছে আর রসিদটা তারই মধ্যে আছে—।" তাঁহার এই অদ্ভুত বার্ত্তা শুনিয়া উপস্থিত সকলে উপর ঘরে গেলেন, এবং কথিত নির্দ্দেশমত কাজ করা হইলে দেখা গেল সত্যই তার মধ্যে সেই রসিদ রহিয়াছে। জীবিত কেহ তাহার অস্তিত্ব জানিত না; তাঁহার পত্নীত নয়ই।"

(তথ) উক্ত-গ্রন্থ হইতে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত:—"১৭৫৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে শনিবার বেলা ৪টায় সুইডেনবর্গ ইংলণ্ড হইতে গটেনবার্গে ফিরিয়া আসেন। তারপর এক বন্ধুর দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হন। আরো অনেকে ভোজ খাইতে আসিয়াছেন প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ কথাবার্ত্তার পর সুইডেনবর্গ হঠাৎ বাহির হইয়া যান, তারপর ঘরের ভিতর আসিয়াই সকলকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-ভাবে বলিলেন—"ষ্টক্‌হলমে ভয়ানক আগুন লেগেছে আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে—।" এই বলেই তিনি বার বার বাহির ও ভিতর করিতে লাগিলেন। ষ্টক্‌হলম সে স্থান হইতে পাকা ২৫ ক্রোশ দূরে। সুইডেনবর্গ আবার বলিলেন—"আমার এক বন্ধুর বাড়ী ভস্মসাৎ আমার বাড়ীও বিপন্ন।" তারপর রাত্রি ৮টার সময় তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন—"বিপদ কেটে গিয়েছে, আগুন নিভেছে—" এই সংবাদে চারদিক হুলুস্থুল পড়ে এবং তখনি নগরের শাসনকর্ত্তাকে জানানো হয়।

রবিবার সকালে নগরের শাসনকর্ত্তা সুইডেনবর্গকে ডাকিয়া পাঠান এবং উক্ত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা পড়া করেন। তিনি অগ্নিকাণ্ডটার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যথাযথ খুঁটিনাটী সহকারে বর্ণনা করেন। সোমবার দিন সন্ধ্যায় Board of trade কর্তৃক গটেনবার্গ হইতে প্রেরিত দূত ফিরিয়া আসে। দূতযে লিখিত বিবরণ লইয়া আসে তাহার সহিত সুইডেন- বর্গের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যায়। পরে সরকারী দূতও নগর-শাসনকর্ত্তার কাছে যে বিবরণ আনে তাহাও মিলিয়া যায়। উভয় পত্রেরই বর্ণনা সুইডেনবর্গের বর্ণিত দৃশ্যের সমর্থন করিয়াছিল।

(৩) সজাগ অবস্থায় ইঙ্গিত-ঘটিত দূরদর্শন (Ramport-psychometry)

এ জাতীয় অতীন্দ্রিয়দর্শনের বিশেষত্ব এই যে দ্রষ্টা হাতে কোনো মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির ছোঁয়া-নাড়া জিনিস দিবামাত্র তাহার এই অলৌকিক শক্তি ফুটিয়া উঠে। সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুৎ আর আর হিল বলেন অন্যান্য প্রেত-ব্যাপারকে প্রেতবাদ (spirit theory) না দিয়া অন্য 'বাদ' সাহায্যে ব্যাখ্যা হইতেও পারে, কিন্তু এই যে ইঙ্গিতঘটিত অদ্ভুত শ্রেণীর অতীন্দ্রিয়-দর্শন ইহার কোনো জাগতিক হেতুই পাওয়া যায় না, অথচ ইহা বিশেষ

রকমে পরীক্ষিত সত্য। কাহারো একটা ব্যবহৃত জিনিসের সঙ্গে এই জ্ঞানলাভের কি যে অজ্ঞেয় সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না। নিম্নে ইহার কয়েকটী পরীক্ষিত সত্য দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(৩চ) হিল সাহেবের বর্ণিত শ্রীমতী তোষাইটের দৃষ্টান্ত :—

শ্রীযুৎ আর আর হিল নিজের মাথা হইতে এককুচী চুল কাটিয়া তাঁর এক পরিচিত লোক মারফৎ উক্ত শ্রীমতীর কাছে পাঠান। শ্রীমতি চুলের গোছাটী হাতে করিয়া হিল সাহেবের আকার প্রকার কারুকর্ম্ম সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা দেন।

অনেকে টেলিপ্যাথীযোগে ইহার ব্যাখ্যা দিতে পারেন—এই বলিয়া, যে হিলের নিজজ্ঞান উক্ত মহিলা নিজ সুপ্ত চৈতন্যের ক্রিয়া দ্বারা জানিয়াছিলেন। অথচ হিল অন্য উপায়েও টেলিপ্যাথীর সম্ভাবনা বাদ দিয়া পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্ণয় করেন। যাই হউক অন্য দৃষ্টান্ত যোগে দেখাইব যে টেলিপ্যাথী দিয়া ইহার ব্যাখ্যা হয় না।

(৩ছ) প্রসিদ্ধ বেলজিক নাট্যকার মেটারলিঙ্ক বর্ণিত ঘটনা।

মেটারলিঙ্ক একবার ই[illegible] হইতে এক অপরিচিতা কুমারী বালিকার নিকট হইতে হাতে-লেখা নাম সই পাঠাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া এক পত্র পান। পাশ্চাত্য-দেশে নামজাদা গ্রন্থকারেরা একরূপ অসংখ্য অনুরোধ পত্র দ্বারা প্রতিদিন ব্যতিব্যস্ত হন। মেটারলিঙ্ক তখন এই জাতীয় অতীন্দ্রিয় দর্শনের সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেন। পত্র পাইয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল এই পত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিবেন। তিনি অবিলম্বে পত্রটা লইয়া তাঁহার পরিচিত মিডিয়ম শ্রীমতী ম'র কাছে উপস্থিত হন। তাঁহার হাতে পত্রটী দিয়া কবিবর উক্ত বালিকার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জানিতে চাহেন। শ্রীমতি পত্রখানি লইয়া তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন; তিনি বাধা দিয়া পত্র-লেখিকার সংবাদ পাইতে ইচ্ছা জানাইলেন। মিডিয়ম তখন বালিকার বয়স, চেহারা, রূপ, তার ঘরবাড়ী ও তৎকালীন কৃত কাজের খবরাখবর দিতে লাগিলেন। বলিলেন,—" বালিকার বয়স ১৫ কি ১৬ হইবে। তাহার স্বাস্থ্য বড় ভাল নহে। বালিকা একটী ভাল সুসজ্জিত বাড়ীর সুমুখে একটী সুন্দর ফুল বাগানে উপবিষ্টা—বাড়ীটা একটা পার্ব্বত্যদেশে স্থাপিত। একটা ঝাঁকড়া লোম-বিশিষ্ট লম্বা ঝোলা কাণযুক্ত কুকুর লইয়া খেলা করিতেছে। বাগানের গাছের ফাঁক দিয়া সমুদ্র দেখা যাইতেছে—"। মেটারলিঙ্ক তারপর পত্রযোগে উক্ত সময়ে বালিকা কেমন ছিল, কোথায় ছিল, কি করিতে-ছিল ইত্যাদি বিষয় অবগত হন এবং সমস্তই সঠিক হয়, কেবল সময়ের মিল হয় নাই। বালিকা কুকুর লইয়া বাগানে গেল। করিয়াছিল সত্য কিন্তু ঠিক যখন মিডিয়ম দেখিতেছিলেন তখন নয়।

(৩জ) মেটারলিঙ্কের দ্বিতীয় পরীক্ষা :—'আমি তখন জার্ম্মানীতে এলবারফিল্ড নগরে তত্রত্য দেশবিখ্যাত ক্রালের গণনাকারী ঘোড়াগুলি দেখিতে গিয়াছিলাম। মাঝ পথ হইতে আমি আমার স্ত্রীকে এক পত্র লিখি, পত্রে গন্তব্য স্থান বা দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধে কোনোই উল্লেখ ছিল না। আমার স্ত্রী সেই পত্র লইয়া অতীন্দ্রিয় দর্শীনী শ্রীমতি ম'র কাছে উপস্থিত হন। পত্রটী তার হাতে দিয়া পত্নী আমার সম্বন্ধে জানিতে চাহেন—মিডিয়ম পত্র হাতে করিয়াই বলিতে লাগিলেন—আপনার স্বামী খুব দূরে বিদেশে, সে দেশের ভাষা জানি না—একটা বড় বাঁধানো উঠান, গাছের ছায়া পড়েছে, তথায় বামদিকে একটার সং-বাড়ী পিছনে একটা বাগান—আপনার স্বামী একটা আস্তাবলে, কতকগুলা ঘোড়াকে পরীক্ষা করছেন খুব তন্ময় হয়ে—ক্লান্ত ভাব—"। পত্নী জিজ্ঞাসা করি-লেন—"তিনি কি ঘোড়া কিনিবার মত করেছেন?

উত্তর—"কিছুমাত্র না—বেচাকেনার কোনো ভাবই নয়—ইনি ঘোড়া নিয়ে এত ব্যস্ত কেন বুঝছি না—এঁর ঘোড়াঘোড়া-বাই নাই অন্য একটা গভীর মৎলব উঁচু ধরণের—"

"পরে আমার স্ত্রী এই কথা বর্ণনা করিয়া আমায় পত্রে জানালেন—গোটাকয়েক ভুল আন্দাজ ছাড়া অন্য সব

বিষয়েই আশ্চর্য্যভাবে ঠিক। প্রথম ভুল সময়ের। শ্রীমতী যখন আমায় আত্মাবলে দেখেন আমি তখন তথায় ছিলাম না। দ্বিতীয় ভুল পোষাক সম্বন্ধে। আমি এবং ঘোড়ার মালিক ক্রাল্ সাধারণ পোষাকেই ছিলাম। আমার গন্তব্য বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার স্ত্রী জানিতেন, এই অনুমানে ঘটনাটীকে টেলিপ্যাথী দিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারিত কিন্তু স্থানটার টীনাটী বর্ণনা কি করিয়া ঠিক হইল? আমার স্ত্রী কখনো সে স্থান দেখেন নাই।

ব্যবহার করা জিনিসের স্পর্শযোগে এমন করিয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অসংখ্য প্রামাণিক ঘটনা আছে। বেশী দৃষ্টান্ত তোলা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। মোহাবস্থাতেও এই উপায়ে দূর ঘটনার বা দৃশ্যের বা বস্তুর অনুভূতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শ্রীমতী পাইপারের বাক্যালাপে।

(গ) সার অলিভার লজ কর্ত্তৃক বর্ণিত Uncle Jerry'র ঘটনা খুব বিখ্যাত। লজপ্রদত্ত বর্ণনা খুব বড়, এইজন্য সংক্ষেপে উহার আভাস দিতেছি। ইঁহার এক খুড়া দূরবিদেশে বাস করিতেন। এই খুড়ার আবার এক যমজ ভাই ছিল, তিনি তখন মৃত। সার লজ উক্ত মৃত খুড়ার এক ব্যবহৃত বস্তু প্রার্থনা করেন। প্রার্থনামতে উক্ত খুড়া সেই মৃত ভ্রাতার একটী সোনার ঘড়ি লজকে পাঠাইয়া দেন। লজ এই ঘড়িটী মিসেস পাইপারকে তার মোহাবস্থায় দেন এবং উক্ত খুড়া সম্বন্ধে সংবাদ জানিতে চাহেন। মিসেস্ পাইপার ঘড়িটাকে কপালে ঠেকাইয়া বলিতে আরম্ভ করেন ঘড়িটী যাহার তিনি প্রায় ২৫।৩০ দিন আগে মারা গিয়াছেন। তাহার নাম ছিল 'জেরিমিয়া', সকলে জেরি খুড়ো বলিত। ঘড়ীর উপস্থিত মালিক রবার্ট খুড়ো। ঘড়ির পিছন দিকের ডালাতে কাঁটা বা ছুঁচ্ দিয়া নাম সইকরা আছে। সার লজ এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। ঘড়ি খুলিয়া দেখা হইল, এক কোনে অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট আঁচড়ে নাম সই করা আছে।"

(৩) কাচদৃষ্টিযোগে অতীন্দ্রিয় দর্শন (crystal gazing)—অতঃপর আমরা 'কাচ-দর্শন' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কাচ খণ্ড, উজ্জ্বল পাথর খণ্ড, পাত্রস্থ জল বা নখ প্রভৃতির উপর চক্ষু রাখিয়া মনঃসংযোগ করতঃ কেহ কেহ অদৃশ্য বা অজ্ঞাত দূরস্থ বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এই ধরণের অতীন্দ্রিয়দর্শন খুব বেশী মাত্রায় দেখা যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বহুদেশে লোক বিশেষে এই অদ্ভুত শক্তির চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছে, এবং অনেকে এখনো করে। অনুশীলনে এ ক্ষমতা লাভ হয় কিনা ঠিক জানিনা, তবে স্বভাবশক্তি অনেকের মধ্যে দেখা যায়। ইতপূর্ব্বে বলিয়াছি এ ধরণের দ্রষ্টারা বাস্তবিক উক্ত বস্তুতে কোনো সত্য ছবি বা ছায়া দেখেন না; দৃষ্ট বিষয়টীর অস্তিত্ব পুরামাত্রায় চিৎপটে, বাহিরে কোথাও নয়; অথচ উহার মূল বাহিরের বস্তু জগতে। এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার। (কাজেই দাঁড়াইতেছে এই যে সত্যকার দেখাটায় চক্ষুর কর্ত্তৃত্ব খুব কম। চোখ দেখেনা, দেখে আর একজন, চোখদুটো যেন তাহার জানালামাত্র। আমাদের সমগ্র জীব চৈতন্যের একটু ভগ্নাংশ মাত্র এই দেহেন্দ্রিয়রূপ পাঁচটা ফুটা দিয়া সত্যবস্তুর পরিচয় পায়, আর সে পরিচয় ওই ভগ্নাংশই, শুধু ভগ্নাংশ নয় ভগ্ন বা বিকৃত রূপও বটে। আমরা মূল বিশ্বসত্বার একটু অংশ এবং সেই একটু অংশের বিকৃত রূপই দেখি জড় ইন্দ্রিয় দিয়া; আর আমাদের অব্যক্ত সুপ্ত-চৈতন্য (Sublimnal self) অন্তর্য্যামী থাকিয়া অন্য উপায়ে সেই সত্যের সাক্ষাৎ করে। এ সাক্ষাৎকার পুরামাত্রায় ও অবিকৃত ভাবেই ঘটে।—কি করিয়া সেটা যে ঘটে তাহার কারণ নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চিৎতত্ত্ব সভা অবলম্বন করিয়াছেন। যাবতীয় অলৌকিক ব্যাপারকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ধারাবাহিক ভাবে বুঝিয়া তারপর সমস্তগুলিকে একটী বৃহত্তর সুসংযত যন্ত্রবদ্ধ বিশ্বব্যাপারের অঙ্গ মনে করিয়া synthetically (ঐক্যভাবে)* বুঝিতে গেলে এই মতটী অনেক সাহায্য করিবে। অবান্তর কথা ছাড়িয়া কাচ-দৃষ্টির ইতিহাস দেওয়া যাউক:—

এই যে কাচ-দর্পণ যোগে দূরস্থ অদৃশ্য বা অজ্ঞাত বস্তু দেখার ক্ষমতা ইহা অনেকটা সজাগ অবস্থায় স্বপ্ন

দেখার মত। বহিরিন্দ্রিয়ের কাজ ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হইয়া ভিতরের লুপ্ত বা সুপ্ত স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠে। এইজন্য ইহাকে নামান্তরে দিবাস্বপ্ন বা জাগ্রদ্স্বপ্ন (reverie) বলা যায়। তখনি উহাকে clairvoyance বা অতীন্দ্রিয় দর্শন বলা যায় যখন অন্তর্দৃষ্টিতে দূরস্থ অদৃশ্য বর্ত্তমান অতীত বা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনা জাগিয়া উঠে। ইহার আর এক বিশেষত্ব এই যে দৃষ্ট ছবি জলন্ত বাস্তবের রূপ ধরে। এবং তখনি আমরা বুঝিতে পারি; অন্ততঃ স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই যে জীবচৈতন্যের একটা বৃহত্তর অংশ অন্তর্য্যামী ভাবে আমাদের ভিতরে কুটস্থ রূপে বিদ্যমান।

ইতিহাসের দিক দিয়া এই শক্তির আদিতত্ত্ব খুঁজিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীনকাল হইতেই নানা-দেশে অতীন্দ্রিয় উপায়ে গুপ্ত সত্যের সন্ধানে এই শক্তির চর্চ্চা ও প্রয়োগ হইত। প্রাচীন গ্রীস্ বা দেবমন্দিরে যে দৈববাণী হইত তাহার মূল এইখানে। দ্রষ্টা নানাপন্থায় এই শক্তি জাগাইতে চেষ্টা করিতেন।

ভারতবর্ষে ও আরবদেশে এই শ্রেণীর লোক দেখা যাইত, এখনো আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক আরব্য গ্রন্থকর্ত্তা নাম ইব্ন্ খালদুস এই শক্তির বিকাশপন্থা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন "দর্পণ, কাচ, বা পাথর-খণ্ড, এমন কি পাত্রস্থ জলে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া কোনো কোনো লোকে অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তি লাভ করিত। আধারটা অদৃশ্য হইয়া একটা ধোঁয়ার আবরণ গড়িয়া উঠিত; আর দ্রষ্টা এই ধূমপটে নানা চিত্র দেখিত। চিত্র বাস্তবের রূপ ধরিয়া এমনি ফুটিয়া উঠিত যে সে মনে করিত চোখ দিয়াই দেখিতেছে। বাস্তবিক কিন্তু সে মনশ্চক্ষেই দেখিত।"

আধুনিক কালে যে পন্থায় অতীন্দ্রিয় দর্শন ঘটে তাহা উক্ত পন্থারই অনুরূপ।

মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবেত্তারা ইহাকে শয়তানের কারসাজী মনে করিয়া এ প্রক্রিয়াকে জোর করিয়া বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। চেষ্টাসত্ত্বেও এ পদ্ধতি চলিয়া-ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ডাঃ ডিঃ এই বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

প্রাচীন ও আধুনিক মিশর আরব, পারস্য ভারত, চীন, জাপান, প্রভৃতি দেশেও ইহার খুব অভ্যাস দেখা যায়। আমেরিকায় লাল ইণ্ডিয়ান ও নবজীলণ্ডের আদিম মেওরী জাতির মধ্যে এই অভ্যাস ও চর্চ্চা খুব বলবৎ। সভ্য অসভ্য যাবতীয় আধুনিক জাতিদের মধ্যে ইহার খুব প্রচলন। এমন কি মহাগুণী জ্ঞানী পণ্ডিতরাও ইহার অনুশীলন করেন। ফরাসীদেশে শ্রীযুৎ ডুশাটেল্ ও ডাঃ অষ্টি এ বিষয়ে লইয়া বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন।—ডাক্তার অষ্টি (Osty) তাহার সুবিখ্যাত Lucidite et Intuition গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার চরম করিয়াছেন। আমরা এইবার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব।

(৩।ট) চিৎতত্ত্ব সভার বার্ষিক বিবরণী হইতে সংগৃহীত কুমারী 'x' এর অভিজ্ঞতা :—

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১০ই আগষ্ট তারিখে আমার আত্মীয় 'ডিঃ' আমাকে পত্রযোগে জানান যে তিনি পথে একটা দুষ্ট কুকুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার নিজ কুকুর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও কুকুরটা তাঁহাকে অনেক জায়গায় কামড়াইয়া দেয়। কুমারী 'x' ঘটনার খুঁটীনাটী পান নাই; তিনি পত্রযোগে 'ডি'কে অনুরোধ করেন এসব না খবর দিতে, কেন না তিনি নিজে কাচ দৃষ্টিযোগে (বা কাচদর্পণে) সমস্ত জানিবেন।—কুমারী 'x'এর কথা—" আমি তখনি কাচদর্পণে মন সংযোগ করিলাম দেখিলাম আক্রমণকারী কুকুরটা কাল এবং আকারে খুব বড়। রিট্রিভার জাতীয় কুকুর ডি'র টেরিয়ারকে তাহাকে পিছন হইতে মারিতেছে—'ডি'র তৎকালীন পোষাকও দেখিলাম। টেরিয়ারের কলারটা মাটীতে পড়িয়াছিল কিনা আর ঘটনাটা বাগানের সবুজ ঘাস ভূমিতে কিনা, সেগুলা ভাল ধরিতে পারিলাম না—" পরে তদন্তে 'ডি' কর্ত্তৃক বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়। শ্রীযুৎ মায়ার্স নিজে এ বিষয় তদন্ত করেন। স্বপ্নটার যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত কুমারী করেন—তাহাও অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়।

(৩।ঠ) ডাঃ জোসেফ ম্যাক্সওয়েল প্রদত্ত ঘটনা:—

"একটী অতীন্দ্রিয়-দর্শী মিডিয়ম একবার কাচ-দর্পণ-

যোগে আমাকে জানাইল—"সমুদ্রবক্ষে একটা জাহাজ দেখছি—তার নাম লিউসল্যাণ্ড তাতে একটা নিশান উড়ছে, নিশানে সাদা, কাল, লাল তিনটা সমান্তরাল চওড়া দাগ আড়ভাবে—মাঝসমুদ্রে হঠাৎ ধোঁয়াতে জাহাজ ঢাকা পড়ে গেল—তাতে অনেক নাবিক আরোহী ইউনিফরম্ পরা মানুষ উপর ডেকে ছুটোছুটী করছে জাহাজ ডুবে গেল——।"

এ ঘটনার আটদিন পরে ইয়ুরোপের সমস্ত খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হইল লিউসল্যাণ্ড জাহাজের বয়লার ফাটিয়া গিয়া জাহাজ গতিহীন হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ডাঃ ম্যাক্সওয়েল তাঁহার Metapsychical phenomena (অতীন্দ্রিয় ঘটনাবলী) নামক গ্রন্থে এই মিডিয়ম প্রদত্ত আরো অনেক বিশ্বস্ত সত্য ও প্রমাণিত ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। শুধু ম্যাক্সওয়েল নহেন যে যে ব্যক্তি এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় হাত দিয়াছেন তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিশেষে এইরূপ অতীন্দ্রিয় উপায়ে জ্ঞানলাভ শক্তির পরিচয় দিয়াছে। এই শক্তির অস্তিত্ব সত্যতা সম্বন্ধে আর কেহ সন্দেহ করেন না, ভেদ কেবল কারণ ব্যাখ্যা লইয়া।

(২।ড) মায়ার্স রচিত Human personality গ্রন্থ হইতে Sir J. Barnaby বর্ণিত ঘটনা, (vol II, 590)

"লর্ড ও লেডি র‍্যাডনরের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমি নিমন্ত্রণে যাই। ১৮৮৯।১৫ই আগষ্ট। সল্‌সবেরী ষ্টেশন হইতে উভয়ের সঙ্গে গাড়ী করিয়া লংফোর্ডক্যাস্‌লে গিয়া উঠি। পথে লেডী র‍্যাডনর আমায় বলেন—'আমাদের ওখানে এক মিস্ এ—আছে। তার সঙ্গে পরিচয় হলে আপনি খুব আনন্দ অনুভব করবেন, তার একটু বিশেষত্ব আছে। সে ছায়ামূর্ত্তি দেখতে পায় প্রেতদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়—কাল ... সে তার কাচ-দর্পণ দেখে আমাদের বলে—যে সে একটা খুব বড় ঘর দেখ্‌ছে ঘরের মেঝেটা কাল সাদা মার্ব্বেল পাথরে টালি মোড়া। ঘরে অনেক লোক তারা সব মেঝেতে বসে চেয়ার গুঁজছে (গার্হস্থ্য দৈনিক উপাসনার ভাবে ছিল)—একজন লম্বা বৃদ্ধলোক—লম্বা সাদা দাড়ী—দাঁড়িয়ে বাইবেল পড়ছে—তাঁর পিছন হতে একটী মেয়েমানুষ উঠে তাঁকে কি বল্‌তে গেল—তিনি হাতটা নেড়ে তাঁকে বারণ করে পড়তে লাগলেন, এই পর্য্যন্ত—বলিয়াই লেডী র‍্যাডনর বলিলেন "বাড়ীটা ও সেই স্ত্রীলোকটীর বর্ণনা শুনে বোধ হল লর্ড ও লেডী ল—র কথা বলেছে যাহোক্ আজতো তাঁরা তোকে আসছেন—জিজ্ঞাসা করা যাবে সত্য কিনা—। সেদিন সন্ধ্যারপর ভোজ অন্তে আমি লর্ড ল—র সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় লেডী র‍্যাডনর এসে লর্ড ল'কে বলিলেন—"লর্ড ল'—আপনাকে একটা কথা, জিজ্ঞাসা করবো, বলবেন? অবশ্য কথাটী খুব silly কিন্তু তা হোক আমি সত্য কিনা জানতে চাই। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন না—কেন জানতে চাচ্ছি।" লর্ড ল—রাজী হইলেন। লেডী র‍্যাডনর লর্ডকে সেই কল্পিত পারিবারিক উপাসনার কথা জিজ্ঞাসা করেন। লেডী ল—র উঠিয়া পাদরীকে কথা বলিতে যাওয়া—তাঁহার বাধা দেওয়া ইত্যাদি। লর্ড শুনিয়া অবাক হইলেন, তিনি সমস্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।"

শ্রীযুৎ মায়ার্স লেডী র‍্যাডনর ও সেই মিডিয়ম কুমারী এ—কে স্বতন্ত্রভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্য নির্ণয় করেন।

সপত্নী

[কথক, শ্রীহেমেন্দ্র কবিরত্ন]

লাজকুণ্ঠাপূর্ণচিতে, সুভদ্রারে লয়ে'
সব্যসাচী প্রবেশিতে আপন আলয়ে
ভাবিতে লাগিল। মনে—"পাঞ্চাল দুহিতা
মানিনী গর্ব্বিনী দৃপ্ততেজোসমন্বিতা
না জানি কি ভাবে বরি লইবে ভদ্রাবে
সপত্নীবিদ্বেষ নারী সম্ববিতে নারে।"

প্রণাম করিতে ভদ্রা দ্রৌপদী চরণে
"এস বোন" বলি বাঁধি স্নেহ আলিঙ্গনে
লইলা পাঞ্চালী। ভদ্রা কহিলা কৌতুকে
"আমি যে সপত্নী!" শুনি, হাসি ভরা মুখে
পাঞ্চালী কহিল—"বিশ্বে পঞ্চস্বামী যাঁর
সপত্নী সহিতে কষ্ট কিছু নাই তাঁর।"

বিস্ময় বিমুগ্ধ চিতে ভাবিলা অর্জ্জুন
কারে থুয়ে কারে দেখি কেহ নহে ন্যূন।

—•—

সপত্নী

[শ্রীএককড়ি দে]

বিবাহের পাকা দেখা কার্য্য সমাধা হইলে, নমীবালাকে কে যেন সহসা লোকান্তরে টানিয়া আনিল—পূর্ব্বে তাহার সকলই ছিল, অস্পষ্ট, ক্ষীণ, ছায়াময়, ঝিলমিল; সুখের কথা মনে করিতে যাইলে, কৈশোরধর্ম্মে ক্ষীণ, অতিক্ষীণ একটু সুখরশ্মি চমকিয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহার পর কি, তাহার আর স্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা যাইত না; কতকগুলা

সুখদুঃখের কবন্ধমূর্ত্তি ঠেলাঠেলি মেশামিশি করিয়া চিন্তার স্থান ভরিয়া দিত; সে স্থানে কোন চিন্তার পথ ধরিয়া অধিকদূর অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না, স্বপ্নের ধারার মত সে রেখাটী হঠাৎ কোন এক বক্র পথ ধরিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত—তাহার পর সব বিশৃঙ্খল। তথাকার কল্পনার ছবির পথ বর্ণহীন অঙ্গহীন—সে কল্পনা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কল্পনাকে সম্পূর্ণ করিয়া আবদ্ধ হয় নাই।

বিনোদকে যখন সে চোখে দেখে নাই, শুধু কাণে শুনিয়াছিল, শুনিয়াছিল কেহ কখন তাহার বিরসবদন দেখেনাই, চোখদুটী যেন পদ্মদল জলে ভাসিতেছে, কণ্ঠস্বরে ক্ষীরধারা, তখনই সে পতঙ্গবৎ বহির্মুখ বিবিক্ত হইয়া-ছিল, আজ আশীর্ব্বাদের ধান্যকণা, দুর্ব্বাদল মাথায় লইতে দৃশ্যমান বিশ্বমূর্ত্তি, দুর্ব্বাএই [illegible]—কল্পনার আলোক ধান্যকণার মত [illegible]

অগ্রহায়ণের হেমপ্রভাতে যখন [illegible] রাগিণী ননীবালার হৃদয়ের তরলতা ও [illegible] স্নিগ্ধতার সঙ্গে ঐকতানে লয় মিলাইতেছিল, শীতের রুক্ষতাও প্রায় কাটিয়া আসিয়াছিল, তখন পারিবারিক [illegible] দীন ও অসম্পূর্ণ আয়োজন লইয়া বরের নিকট হইতে একটী লোক আসিল। ইহার বিরুদ্ধ আলোচনায় প্রাঙ্গন ভরিয়া উঠিয়াছে, এমত সময় কর্ম্ম-নিরত একব্যক্তি মন্তব্য প্রকাশ করিল—আরে? বিনোদটা কেমন কেমন? যেন ক্যাপা ক্যাপা? সংসারটার সঙ্গে কেমন তার খাপ খায় না।

কর্ম্ম বাড়ীর কথা উচ্চ কণ্ঠেই হইয়া থাকে, ননীবালা তাহা শুনিতে পাইল। তখনি আবার শোনা গেল, ননীমা'র ছেলের যখন বিয়ে হবে, তখন দেখিও কেমন কোথাও কোন খুঁৎ পাও—বিনোদের কে করছে বল।

ননীবালার মনের বীণা কর্ম্মকোলাহলের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গে স্পন্দিত হইতেছিল; মধুর, করুণ, প্রচণ্ড রাগিণীর অবরোহণাধিরোহণে তরঙ্গাভিঘাত চঞ্চল স্রোতের উপর হংসীর মত ক্লান্ত, বড় অস্থির, বড় ক্রীড়াশীল, বড় আত্ম-বিস্মৃত—প্রত্যাক্তের কিশোরতার কিছু তরল, কিছু চঞ্চল, মধ্যাহ্নের গম্ভীরতায় বড় স্পর্দ্ধিত, বড় স্ফীত, অপরাহ্নের বিষণ্ণতায় উন্মনা, বিহ্বল, অবসন্ন।

বিবাহ হইয়া [illegible] ছে। বিবাহের পর বাঙ্গালীর মুনি-মুনের আটাহ কা[illegible] শ্বশুর বাড়ীতেই [illegible]। সংসারের সঙ্গে সমান [illegible] না পারার কোন লক্ষণ এ কয়দিনে দেখা যায় নাই—ননীর অনেক দুর্ভাবনা ঘুচিল।

বিবাহের পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বিনোদলাল কয়েক বার শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিল। দেখা গিয়াছিল বিনোদের বু[illegible] ভিতরকার জিনিষগুলি উৎকৃষ্ট, এবং সেগুলি সে অতি সাবধানে ঢাকা দিয়া রাখে, সা[illegible]ধণের নিকট প্রকাশ পাইতে দেয় না; কি জানি [illegible] হয়ত বলিবে, বাহিরে যে [illegible] [illegible] কত বদ।

[illegible] উত্তাপাধিক্যে যেমন পৃথিবী কখনো কখনো নড়িয়া উঠে, সেইরূপ কিসের প্রেরণায় বিনোদকে দুই এক ক্ষেত্রে মাত্র বেখাপ্পা দেখা গিয়াছে।

কিশোরী ননীর এতটুকু হৃদয়ের আশা ও উৎকণ্ঠা কমই বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র তড়াগেরও সমস্ত হৃদয় ব্যাপিয়া তরঙ্গ বিক্ষোভ হয়, ক্ষুদ্র পুষ্পের সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া রূপের লহর উঠে, ক্ষুদ্র বদন ভরিয়া আলোকের ভাতি ফুটিয়া উঠে।

ননী সমস্ত সংসারটাকে বিচিত্র বিভিন্ন বর্ণের পশম দিয়া বুনিয়া একখানি হৃদয় জোড়া আসন বুনিয়া তাহার উপর তাহার চিত্তকে বসাইয়াছিল, আসনে বিচিত্র ফুল, বিচিত্র লতাপাতা, ফুলে ফুলে মধুমাছি, পাতায় পাতায় অলিকুল, লতায় লতায় সুখের পারাবত—কিন্তু হায়রে ননীবালা, তোমার পারাবতের পশ্চাতে শ্যেনপক্ষী।

বিনোদলাল পোষ্ট অফিসে কর্ম্ম করে। পোষ্ট অফিসের নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মে একদিন কোথাও টান পড়ে নাই। অফিসের কেরাণী, পোষ্ট ম্যান, রানার, ইহাদেরই কাহাকে সুয়ো কাহাকে দুয়ো করিয়া দিন কাটিতেছিল। ইহাদের উপরই বিনোদের রাগ অভিমানের অন্ত ছিল না—পোষ্ট ম্যান চিঠি হইতে ফিরিতে দেরী করিলে ডিউটীখেলাপের দোহাই দিয়া পোষ্ট মাষ্টার বাবু বড় বকিতেন, কিন্তু বিটে

বাহির হইবার সময় প্রায়ই কথায় কথায় বিলম্ব হইয়া যাইত। তখন বিনোদবাবু বলিতেন, "চালাকি করে ঠিক সময়ে ঘুরে আসতো—দেখবো কেমন?" কিন্তু এখন সেই বিরাট নিরবচ্ছিন্নতার দূর কোণে এক ছিদ্র হইয়াছে, বস্ত্রাচ্ছাদিত পিঞ্জরের একখানি বক্র অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাকার বস্ত্রাবকাশ মধ্যদিয়া ভিন্ন জগতের আলোক রশ্মি পরিস্ফুট। বিনোদলালের মানস বিহঙ্গ এখন সেই অবকাশ স্থান দিয়া বহির্গত হইয়া বহির্জগতের বিহগজাতির 'কাকলী' শুনিতে চায়—বিভিন্ন জাতীয় ফলের রসাস্বাদনে লালায়িত হইয়া উঠে—ধীরে বিনোদলাল ধীরে—মাকাল ফলের রসাস্বাদনে লোলুপ কেন? জলতলস্থিত প্রাসাদ বাসিনী তোমার মানস রাজকন্যা উপরিস্থিত জগতে সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু সাবধান, সুড়ঙ্গপথ রুদ্ধ কর, ভুজঙ্গ মস্তকের মাণিক্য কাড়িয়া লও, অপর রাজপুত্র বন্দিনী করিবার জন্য তড়াগ তীরে দণ্ডায়মান।

পাঁচদিনের ছুটী লইয়া বিবাহ কর্ম্মোপলক্ষে বিনোদলাল একবার তাহার বন্ধুবাড়ী গমন করিয়াছিল। বৈশাখ মাসের পল্লীগ্রাম বড় মধুর—গৃহকুঞ্জে দোয়েলের প্রথম গীতের ডাকে ঘুম হইতে উঠিয়া পল্লীবালারা চঞ্চল পদক্ষেপে পুষ্প চয়নে যায়। তাহাদের, 'পুণ্যিপুকুর' আছে, 'হরির চরন' আরও কত। গাছের ডালে উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া ফুল খুঁজে—নীচে কেহ দাঁড়াইয়া থাকিলে পুষ্পভ্রমে তাহাদের গলায় আঁকৃসি পরাইয়া দিয়া টানাটানি করেনা ত? শুচিস্নাতা বর্ষীয়সীরা অশ্বত্থগাছে জল দিতে যান, ব্রতের নৈবেদ্য হাতে করিয়া পুরোহিত বাড়ী তাহা সমর্পণ করিতে যান, পট্টবস্ত্র পরিহিতা বধূরা 'গুপ্তমাণিক' ব্রতের আয়োজন লইয়া অনশনে ব্রাহ্মণের পথ নিরীক্ষণ করেন। তখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি সম্ভ্রমে প্রাণ ভরিয়া উঠে, তখন মনে হয়, ধর্ম্মের অভয়পদকটী উঁহাদের বক্ষবস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

বিনোদলাল পল্লীশোভা দেখিয়া, ধর্ম্মভাবের সজীবতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। বিনোদ গাছের পাতায় নব বধূর সরমমাখা মুখচ্ছবি দেখিল, নবোদগত অশ্বত্থ কিশলয়ে তাহার হৃদয়স্থিত পরম সুন্দরের লাবণ্য প্রতিভা দেখিয়া গুণ গুণ্ স্বরে 'আমায় বল দাও', 'আমায় বল দাও' গান ধরিয়াছে, এমন্ত সময়ে পাশের বাড়ীতে শঙ্খধ্বনি হইল। বিনোদলাল জিজ্ঞাসা করিল,—শাঁখ কিসের হে শীতলচন্দ্র?

বন্ধুটী বলিল,—বিয়ের। বড় করুণ কথা হে! মেয়েটীর কেহ নাই, দূর সম্পর্কের মামার বাড়ী থাকে। মামাও উপবাসের খাসমহালের প্রজা। উহার বাড়ীর গরু গুলির বাচ্ছা হয় এঁড়ে, আর মেয়েগুলির সন্তান হয় বকনা। নিজের বড় মেয়েটীও জুগিয়ে উঠলো, কিন্তু এটীর জন্য গ্রামে ঘোঁট আরম্ভ হ'য়েছিল। মেয়েটীও বেশ সুশ্রী নয়। বর জুটে না, শেষে নাকি কোন কলেজের ছোক্‌রা বাপের ত্যাজ্যপুত্র হইবার ভয়ও গ্রাহ্য না ক'রে বিনা কড়িতে ওটীকে উদ্ধার করতে চেয়েছে। বিনোদলাল মনে ভাবিল,—বরকে দেখিতে পাইলেই বলা নাই, কহা নাই, খুব জবর করিয়া কোলাকুলি করিবে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বিবাহ বাড়ী থম্ থম্ করিতেছে। বিশেষ আয়োজন নাই, সুতরাং কোলাহল নাই। কন্যা কর্ত্তা ভাবিতেছেন, বাপে বেটায় কলহ করিয়া বিবাহ, কুশ্রী কিছু না হইয়া পড়ে। শেষ ট্রেণে নামিলেও সময় বহিভূত হইয়া যায়—বিপ্রদাস বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাগ্নীর উপর মামীটার রাগের মাত্রা সা থেকে রে, রে থেকে গা ক্রমশই চড়িতেছে। সেই ট্রেণে এ গ্রামের এক ব্যক্তি বাড়ী আসিল—মামা বড় ব্যস্ত হইয়া শুধাইল, আর কাহারও নামিল দেখিলে? সে বলিল—না। তখন বাড়ীর সকলকার সন্দেহ, বিরক্তি, ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া কর্ত্তার হৃদয়ে বেদনায় পরিণত হইল। পুরোহিত বলিলেন—তুমি কাঁদিওনা, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি বর আসিবেই। শৈলর কপালে কখনও এমন হইবে না। এই বয়সেই তাহার কত দয়া! কত মায়া!

সহানুভূতির ডাকে বিপ্রদাসের হৃদয়-বেদনা পুরোহিত চরণে আত্ম নিবেদন করিবার জন্য লুটাইয়া পড়িয়া মাথা তুলিতেই দেখিতে পাইল, প্রতিবেশী শীতলবাবু বিনোদ-

লালকে সঙ্গে লইয়া খবর লইবার জন্ত গৃহ প্রবেশ করিতে-ছেন। শীতলবাবু শুধাইলেন, কোনও খবর পেলেন? কোনও খবর পেলেন? এমন সময়ে বাহিরে কে বলিল, বাবু টেলিগেরাফ্। শীতলচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট টেলিগ্রাফ্ লইয়া বাহিরে আসিল, বিনোদও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। বিপ্রদাস কেমন একপ্রকার মুখে বসিয়া রহিল। টেলিগ্রাফ্ পড়িয়া শীতলচন্দ্রের মুখ শুকাইল— বরের বসন্ত হইয়াছে। বিলম্ব দেখিয়া পুরোহিত বাহিরে আসিয়া বিবরণ শুনিলেন। পুরোহিত বিবর্ণ মুখে বাড়ী ঢুকিতেই, বিপ্রদাস ছুটিয়া আসিয়া শুধাইল, কি খবর চৌধুরী মহাশয়? পুরোহিত বলিলেন। বিপ্রদাস শুনিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, বাড়ীতে বিষম কান্না উঠিল। বিনোদলাল শুধাইল, আজ রাত্রে বিবাহ না হইলে মেয়েটীর কি হবে? শীতল বলিল, কি আর হবে, চির-বৈধব্য। জানিনা কিসের প্রেরণা—সেদিন দিব্য চাঁদ উঠিয়াছিল, পূর্ব্বাহ্নে বিনোদলাল ধর্ম্মভাবের সজীবতা দেখিয়াছিল, প্রকৃতির মুখে বিরাট সৌন্দর্য্যের খণ্ডপ্রকাশ দেখিয়াছিল—বিনোদবাবু বলিলেন, আমি বিবাহ করিব। কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া শীতলচন্দ্র অবিশ্বাস করিলেন না। জানা হইল, করণীয় ঘর বটে। শীতল বাড়ী ঢুকিয়া উন্মত্ত বিপ্রদাসকে বলিল, কাকা ভাবিবেন না, কন্যা লইয়া আসুন, লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়—বর আসিয়াছে। পুরোহিত বলিলেন সে কি? বিপ্রদাস তারস্বরে হরি! হরি! হরি! হরি! বলিয়া উঠিল।

বিনোদলাল শৈলের ভারগ্রহণ করিলেন। একবার ভাবিলেন না, ননীবালার কি হইবে—একবার ভাবিলেন না, শৈলের কি হইবে—একবার ভাবিলেন না, তাঁহার কি হইবে?

বিবাহের পরদিনই বিনোদ শৈলকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া দূর সম্পর্কীয়া এক পিসীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু শৈলের ভাবগতিক দেখিয়া পাঠাইবার জন্ত তাড়াতাড়ি করিতে হইল না। শৈল নিজের বাড়ীটাকে বেশ গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিনোদলালের উত্তেজনা কমিয়া গেলে ননীর কথা মনে হইল। তাহার দীপ্ত অনুরাগের কথা মনে হইল। মনে হইল বড় অপরাধ করিয়াছি। আবার মনে হইল, এ ত পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি, সে স্ত্রী, সে ত ইহার অংশ পাইবে—তবু থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতে লাগিল, অপরাধ করিয়াছি। একবার মনে হইল, যাই, সব কথা নিজে তাহাকে গুছাইয়া বলিয়া আসি, সে আমার অপরাধ লইবে না। আবার মনে হইল, একটু পুরাণ হউক, এখন যাইতে পারিব না। বিনোদলাল ভুলের উপর ভুল করিল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে ধীরে, অতি সঙ্গোপনে, অতি সন্তর্পণে ননীবালার বাড়ীর উপর একটী নক্ষত্র ফুটিল— তাহার নিম্নে মেঘ চঞ্চল, তাহার নিম্নে বায়ু চঞ্চল, চঞ্চল-পক্ষী নীড়ান্বেষণে গমন করিতেছে—বড় চঞ্চল; ননীবালার, হস্তস্থিত দীপশিখা, সেও বড় চঞ্চল—অকস্মাৎ ননীর মন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল, বড় চঞ্চল! বড় ভীত! ননীবালা পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কে যেন তাহার বুকের উপর একটা পাহাড় চাপাইয়া দিতেছে, আর তাহার উপর হইতে কে উঁকি মারিয়া টিপি টিপি হাসিতেছে— ধীরে, অতি সঙ্গোপনে, অতি সন্তর্পণে সেই মুখখানা ননীর হৃদয় তলে ফুটিয়া উঠিল, ননী দেখিল সে মুখখানা তাহারই বিনোদলালের।

সংবাদ গোপন রহিল না। ননী শুনিল—শুনিয়া বড় কান্না কাঁদিল। ননী নিত্য কাঁদে, প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিলে কাঁদে, রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া কাঁদে। বুক বাঁধিয়া বাপ মা কত বুঝায়, পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণেরা কত বিবাহ করিতেন, তা হ'ক, বিনোদলাল আসিবেনই।

ননী কাঁদে, আর ভাবে, তিনি আসিবেন কেন? আমি যাইতে পাইব না? আমার বাড়ী, যাহার প্রত্যেক ধূলিকণার উপর আমার অধিকার। সেখানে যাইতে পাইব না? গৃহ প্রাঙ্গনে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিব, আমার হৃদয় দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি, তাঁহাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, গৃহখানিকে সুমার্জ্জিত সিংহাসন করিয়া

রাখিব, সেখানে যাইতে পাইব না কি? আবার অভিমান হয়, তুমি সুখে থাক, আমি মলিন মুখেই জীবন কাটাইব, তোমায় দেখিতে হইবে না।

ক্রমশঃ অভিমানই প্রবল হইয়া উঠিল—আমি দাসীবৃত্তি করি, তিনি শুনুন, আমি কদর্য্য অন্ন খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি, তিনি শুনুন, আমি মলিন বদনে সময় ক্ষেপণ করি, তিনি শুনুন, পীড়ায় ঔষধ পাইনা, রোগ শান্তি হইলে পথ্য পাই না, তিনি শুনুন—একদিন চট্ করিয়া ননীর মাথায় খেয়াল উঠিল, দাসীবৃত্তি করিতে হয় ত, অপর কোথাও না তাঁহার পিসী বা তাঁহার শৈলত তাহাকে চিনে না, তাহারা কি কেবল অন্নের পরিবর্ত্তে তাহাকে দাসী রাখিবে না? উৎকট অভিমান ভরে সে তাহাই ধার্য্য করিল। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, শুধাইয়া শুধাইয়া পথ চলিয়া চলিয়া শৈলর নিকট উপস্থিত হইল।

বড় কান্না আসে! বাড়ী ঢুকিতে বড় কান্না আসে! মিথ্যা পরিচয় দিতে বড় কান্না আসে। অতি দীনহীন পরিচয় দিয়া শৈলের কাছেই আশ্রয় লইয়াছে, গৃহকর্ম্ম করে, ভাণ্ডার গৃহের একপ্রান্তে মাদুর পাতিয়া রাত্রি-যাপন করে।

ননীর গৃহত্যাগে বাপ মা বড় ভয় পাইয়াছিলেন, পরে সন্ধানে জানিলেন, ননী বিনোদলালের বাড়ী গিয়াছে, তাঁহারা ভাবিলেন, থাকুক।

শৈলকে দেখিয়া ননীর তত হিংসা হয় না—বড় সরল, বড় উদার, বড় মায়ার শরীর। শৈল তাহার সপত্নীর কথা বলে, কত দুঃখ করে, উদ্দেশে তাহাকে কত আদর করে, বলে সে আমার বোন্, আমরা একত্রে সংসার না করিলে তিনি অসুখী হইবেন।

অনেক দিন [illegible] ও দাসীতে সখীত্ব জন্মিয়াছে। একদিন [illegible] দুইজনে বসিয়া দশ-পঁচিশি খেলিতেছে, হঠাৎ বিনোদলাল বাড়ী ঢুকিয়া, বিস্ময় কোন মতে কাটাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ। এই যে দিব্যি ভাব হইয়া গিয়াছে!

"বাদল-দিনে"

[শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়]

বাদল নামিছে ঘন শ্বাসেতে,
আজি আমি নাই আমার প্রিয়ার পাশেতে।
অলস আঁখি দুটি,
হয়তো আছে ফুটি
না জানি এখনো কত আশেতে!

পাগল বহিছে বেগে বায়ুরে,
প্রিয়া নাই পাশে শিথিল সকল স্নায়ুরে।

হয়তো চারি ধার,
আমারে খুঁজি তার
বিবশে ফিরিছে দু'টি বাহুরে !

গুমরি কাঁদিছে আজি দেখা-য়ে,
আমি নাই পাশে কার কাছে আজি সে আছে ?
বিধুর বুক টুটে,
ওঠে যা উঠে ফুটে
নীরব তাহার দেয়া নেয়া-যে !

গীতা ও ভাগবত

[শ্রীস্মরজিৎ দত্ত, এম্‌-এ]

(১)

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

হিন্দুর ধর্ম্মসাহিত্যের ইতিহাসে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের স্থান যে সর্ব্বোচ্চে তাহা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, ইতিহাস ও পুরাণ ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাসের ক্রম বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ তাহা জন্মমরণাধীন মানব-রচিত নহে। পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মই তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে কমলযোনির হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। শিষ্য পরম্পরায় মুখশ্রবণ বিষয়ীভূত হইয়া তাহা লোক সমাজে প্রচারিত হয়, এই নিমিত্তই তাহার নাম "শ্রুতি"। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সেই বাক্য ও মনের অতীত পরম পুরুষকে ইতিহাস কর্ত্তৃত্বের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিবার উপহাসজনক প্রয়াস না করাই ভাল। সত্যবতী নন্দন এই বেদকে অল্পমেধা মানবগণের বোধ সৌকর্য্যার্থ চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াই "বেদব্যাস" নামে পরিচিত হন। সুতরাং শ্রুতিকর্ত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রুতির প্রচারক বেদব্যাসকে আমরা ইতিহাসের সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে পারি। তৎপরে স্মৃতি। হিন্দু সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই স্মৃতির প্রণয়ন। উচ্ছৃঙ্খল সমাজের পরিণাম যে ভীষণ বিষময় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রত্যেক পরিবার যেন 'ছোট' রকমের একটী সমাজ। পরিবারের মধ্যে সংযমের বন্ধন না থাকিলে, বাধ্য-বাধকতা না থাকিলে যেমন সে পরিবারের কোন শ্রেয়ই লাভ হয় না, পরন্তু সকলকেই অনর্থ ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ সমাজের উদারতার সহিত তাহার বন্ধন না থাকিলে সমস্ত জাতিই চূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই সমাজবন্ধন মানব জীবনের ক্রমোন্নতির ফল। সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ পশুর ন্যায়ই জীবন যাপন করিত। যাহা হউক, স্মৃতিকে আমরা ধর্ম্ম শাস্ত্র বলি,

মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরা
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী।
পরাশরশঙ্খব্যাস লিখিতা দক্ষগোতমৌ
শতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিংশতি মহর্ষি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যেও আমরা ব্যাসকে দেখিতে পাই। তৃতীয় স্তরে, দর্শনের যুগে দেখি কপিল, পতঞ্জলি, গোতম, কণাদ, জৈমিনি ও ব্যাস এই ছয়জন মনীষী মহাপুরুষ যথাক্রমে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে আমরা ব্যাসকে বেশ সুস্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাই। পতঞ্জলির ব্যবহারিক দর্শন অমূল্য যোগের কোন মূল্যই থাকিত না, যদি ব্যাস তাহার ভাষ্য না লিখিয়া দিতেন। কিন্তু যোগভাষ্যকার বলিয়াই যে শুধু দর্শনক্ষেত্রে ব্যাসের পরিচয় তাহা নহে। ষড়দর্শনের মধ্যে যেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই ব্যাসের মস্তিষ্ক প্রসূত। বাদরায়ন প্রণীত বেদান্ত ভারতের তথা জগতের ধর্ম্মজীবনের চরম পরিণতির শেষ বিচার। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দার্শনিক Kant ও Hegel এর Transcendental Philosophy এখনও বেদান্তের সীমায় পৌছাইতে পারে নাই। বিখ্যাত দার্শনিক Schopenhauer কিরূপ বেদান্ত-ভক্ত ছিলেন তাহা তাঁহার নিজের কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়—"It is my consolation in life and will be so in death."

তৎপরবর্ত্তী মহাকাব্যের যুগের রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় বিরাট গ্রন্থ জগতের কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা Macdonell সাহেব বলিতেছেন—"The Mahabharat is equal to about eight times as much as the Illiad and Odyssey put together, and is by far the longest poem known to literary history." যে কবির শ্লোক শ্লোকত্বপ্রাপ্ত হইয়া করুণরস প্রস্রবণের মুখোদ্‌ঘাটন করিয়াছিল, তপোবনাধিষ্ঠিত সেই মহামুনি বাল্মীকিই রামায়ণের রচয়িতা। আর দ্বিতীয় গ্রন্থখানি জীবের মঙ্গল-চিন্তনে রত, উদারমতি, বিপুলকীর্ত্তি ব্যাসদেবেরই লিখিত। ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে রামায়ন অপেক্ষা মহাভারতের প্রভাব যে অনেক অধিক তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কথায় বলে "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" পূর্ব্বোক্ত Macdonell সাহেব বলেন—"It is an encyclopaedia of moral teachings"—অর্থাৎ ইহা নীতিশিক্ষার একখানি বিশ্বকোষ। পরিশেষে পুরাণের সময়ে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই অষ্টাদশ মহাপুরাণই পারাশরির বিশ্ব বিশ্রুত নাম ঘোষণা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য করিতেছে। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতই সর্ব্বোত্তম; এবং তাহা ব্যাসদেবের স্বরচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। অন্যান্য পুরাণগুলি তদীয় শিষ্যগণ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া নিজেরাই লিখিয়া গুরুর নামেই প্রচারিত করেন—যেহেতু তাহা তাঁহাদিগের স্বকপোলকল্পিত অথবা স্বতঃস্ফুরিত বিদ্যা নহে।

যাহা হউক এই পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইলাম হিন্দুর ধর্ম্ম-সাহিত্যের বিরাট মঞ্চের প্রতিস্তরেই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শান্ত-সৌম মূর্ত্তি বিরাজিত, এবং তাহার ইতিহাসে তাঁহার পুণ্যশ্লোক নাম ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক এবং কপিল প্রমুখ দর্শনকারগণকে যদি ধর্ম্মসাহিত্য-গগনের গ্রহনক্ষত্র বলা যায় তাহা হইলে মহামুনি বাদরায়ণকে তন্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী গ্রহেশ্বর সূর্য্য বলিলে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হয় না। যাহা হউক আমরা দেখিতে পাইতেছি যিনি ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা তাহারই লেখনীপ্রসূত গীতামৃত এবং লীলামৃতসাগর ভাগবত।

অনেকে ভাগবতকে বেদব্যাস-বিরচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। না করিবার কারণও তাহারা প্রদর্শন করেন। জিজ্ঞাসুগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এস্থলে কতকগুলির উল্লেখ করিব, সত্যানুসন্ধিৎসুগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন ভাগবত যে বেদব্যাস বিরচিত নহে তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে পরীক্ষিতের সমীপে ভাগবতের বক্তা হইতেছেন—শ্রীশুকদেব। ইহা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। মহাভারতে লিখিত আছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর ৮ মাস ২৫ দিন রাজ্য করেন তৎপরে মহারাজ

পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর রাজ্য পালন করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৯৬ বৎসর পরে শুকদেব মুমূর্ষু, অভিশপ্ত রাজাকে এই ভাগবত শ্রবণ করান। কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ৩৩২ ও ৩৩৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"অন্তর্হিতঃ প্রভাবন্তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা" এবং

"গুণান্ সন্ত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎ পরং"

ভীষ্মদেব মোক্ষধর্ম্ম উপদেশকালে যুধিষ্ঠিরকে শুকদেবের জন্ম ও মরণ বৃত্তান্ত বলেন। শুকদেবের তিরোধানে দ্বৈপায়ন অত্যন্ত শোকাতুর হইলে—

তমুবাচ মহাদেবঃ শান্তপূর্ব্বমিদং বচঃ।
পুত্র শোকাভি সন্তপ্তং কৃষ্ণং দ্বৈপায়নং তদা॥
মমচৈব প্রসাদেন ব্রহ্মতেজোময়ঃ শুচিঃ।
স গতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ॥
দৈবতৈরপি, বিপ্রর্ষে তৎ ত্বং কিমনুশোচসি॥

সুতরাং মহাভারত হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শুকদেব যুধিষ্ঠিরের বহুপূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। তাহা হইলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৯৬ বৎসর পরে কিরূপে শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত শ্রবণ করাইলেন? কিন্তু ভাগবত বলিতেছেন যে শুকদেবই পরীক্ষিৎকে ভাগবত শ্রবণ করান; আর শুধু তাহাই নহে তাঁহাকে "ষোড়শবর্ষং সুকুমার পাদং" অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষীয় সুকুমার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ মহাভারত বিরুদ্ধ কথা ব্যাসদেব কখনই বলিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ ভগবান্ নৃসিংহ দেব কর্ত্তৃক বর যাচনায় অনুরুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিলেন যে ভগবন্নিন্দা জনিত মহাপাপ হইতে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু যেন মুক্ত হন। তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন—

ত্রি সপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহতেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্বৈ কুলপাবনঃ॥

ভাঃ ৭।১০।১৮

অর্থাৎ হে নিষ্পাপ! তোমার পিতা একবিংশ পুরুষের সহিত পবিত্রীকৃত হইয়াছে যে হেতু ইহার বংশে হে সাধো, কুলপাবন তুমি জন্মগ্রহণ,করিয়াছ।

এখন ভাগবতের মতে ব্রহ্মা, মরীচি ও কশ্যপ এইমাত্র তিন পুরুষ হিরণ্যকশিপুর পূর্ব্বতন। তাহা হইলে ভগবান্ কিরূপে তাহার ত্রিঃসপ্ত অর্থাৎ একুশ পুরুষের উদ্ধার করিলেন। টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন:—যদ্যপি কশ্যপো মরীচির্ব্রহ্মা চেতি তৎ পিতৃত্রয় এব পূর্ব্বজাস্তথাপি ত্রিঃ সপ্তভিঃ সহেতি প্রাক্ কল্পগতপিত্রভিপ্রায়েণোক্তমিতি। ইহা যে নিতান্ত জোর্ করিয়া বলা তাহা আর দেখাইয়া দিতে হইবে না। কেননা, একবিংশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী সাতটী কল্পেই নিঃশেষ হইয়া যায়। অষ্টম এবং তৎপূর্ব্ব কল্পের ব্রহ্মাদির গতি কি? আর ব্রহ্মা, মরীচি, কশ্যপ ইঁহারা তো স্ব স্ব কর্ম্মেই মুক্ত। ইঁহাদের মুক্তির অন্যাপেক্ষা থাকিতে পারে না। আরও এক কথা, হিরণ্যকশিপু যদি এই জন্মেই মুক্ত হইবেন তবে জন্মান্তরে তিনি ও তদ্‌ভ্রাতা কিরূপে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দন্তবক্র ও শিশুপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন? অতিশয়োক্তি করিতে গিয়া কি শেষে ভগবান্ স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া আপনার বাক্য মিথ্যা করিলেন? তাই মনে হয় বেদব্যাস ভাগবতের রচয়িতা হইলে ভগবদুক্তির এতাদৃশ অসঙ্গতি কখনও তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইত না।

ভাগবতের স্থানান্তরে লিখিত আছে ব্রহ্মাকে বিষ্ণু বরপ্রদান করিলেন—"ভবান্ কল্প বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ"। তৎপরে দশম স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা মোহবশতঃ বৎসসহ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণকে হরণ করেন। এস্থলেও ভগবদুক্তির অন্যথা হইল। এত অসম্ভব বাক্য যে গ্রন্থে দৃষ্ট হয় তাহা কখনও ঋষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করা চলে না। পূর্ব্বোক্ত তিনটী প্রমাণেই আমরা তর্কের ছলে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ভাগবত প্রণেতার আর্ষত্ব সমর্থন করিতে পারি। কিন্তু দেবী ভাগবতের টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে ভাগবত পুরাণ বোপদেব রচিত। বোপদেব "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। তিনি ও তদ্‌ভ্রাতা জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। Macdonell সাহেব বলেন—ভাগবত ত্রয়োদশ শতাব্দিতে রচিত হয়। অবশ্য তিনি একথা বলেন নাই যে বোপদেবই ভাগবত রচনা করেন। হেমাদ্রি গ্রন্থে লিখিত আছে

বোপদেব একদা রাজসচিব হেমাদ্রিকে স্বরচিত ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতে বলেন। হেমাদ্রি বলিলেন, অত বড় বিরাট গ্রন্থ পাঠ করিবার অবকাশ তাঁহার নাই, অতএব সংক্ষেপে উহার মর্ম্ম লিখিয়া দিলে পড়িতে পারেন। বোপদেব তাঁহার ইচ্ছানুসারে [illegible] রচনা করেন তাহার কতকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুঃ শ্রীমদ্ভাগবতং পুনঃ।
পঞ্চপ্রশ্নাঃ শৌনকস্য [illegible]।
প্রশ্নাবতারয়োশ্চৈব [illegible]।
নারদস্যাত্র হেতূক্তিঃ [illegible]।
সুপ্তঘ্ন দ্রৌণ্যভিভব স্তদস্ত্রাৎ পাণ্ডবাবনম্
ভীষ্মস্য স্বপদ প্রাপ্তিঃ কৃষ্ণস্য দ্বারকাগমঃ
শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো জন্ম [illegible]।
[illegible] র্ত্ত্যাত্যাগঃ, [illegible] ॥ ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ মত [illegible] "পুরাণ ও ব্যাসদেব" নামক [illegible] সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও [illegible] বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। ভাগবতের ১।৫।১৫ শ্লোকে নারদ ব্যাসদেবের নিকটে ভদ্রোচিত [illegible] [illegible] করিতেছেন :—

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥

অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতই কামাসক্ত ও মন্দ বুদ্ধি। ব্যাসদেব পূর্ব্বরচিত গ্রন্থে সকাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া ধর্ম্মের নামে নিন্দিত, ঘৃণিত বিষয়ে মানবকে প্রণোদিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মহান্ দোষ হইয়াছে। তাঁহার বাক্য হইতে তাহাকেই অর্থাৎ সকাম ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম মনে করিয়া ইতর জন নিবৃত্তির পথে যাইতেই চাহিবে না।

যিনি ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা, যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিষ্কাম ধর্ম্মবাদ গীতার অমৃতধারা নিঃসৃত হইয়াছে তাঁহার উপরে এই অযথা দোষারোপে নিতান্তই দুঃখজনক সন্দেহ নাই। ব্যাসদেব ভাগবতের রচয়িতা হইলে নিজের গ্রন্থের প্রতি এইরূপ নির্ম্মম অবিচার গুলি কখনই করিতেন না। আবার ভাগবতের ১২।১৩।১১ শ্লোক বলিতেছেন—

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তে হ্যমৃত সাগরঃ॥

অর্থাৎ অন্যান্য পুরাণ সকল সজ্জন সভায় ততক্ষণ শোভা পায় যতক্ষণ অমৃত সাগর ভাগবত শ্রবণ করা না হয়। ভাগবত যদি ব্যাসদেব কৃত হইবে তাহা হইলে তিনি অন্যান্য পুরাণ সমূহকে এরূপভাবে ন্যক্কৃত করিয়া ভাগবতের প্রাধান্য স্থাপন কখনই করিতেন না। আর যদি এরূপ ভাগবতকে বেদব্যাস বিরচিত স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার ন্যায় মহর্ষির নিকট হইতে এতাদৃশ অহঙ্কার ও গর্ব্বের উক্তি আশা করা যায় না। ভাগবত বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও "সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্" বলিয়া তাঁহার অবতারের প্রতি অশ্রদ্ধা ও সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। জীবন্মুক্ত, সমদর্শী ঋষি বেদব্যাস এরূপ সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

তৃতীয়তঃ ভাগবতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা প্রাচীন ঋষি ব্যাসের বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতের ভাষা অতি সরল, সুপ্রাঞ্জল। আদ্যন্ত প্রায় সমগ্র গ্রন্থই অনুষ্টুভ ছন্দে লিখিত। পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রায়ই সরল সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত। ইলিয়াড, ইনিড, পিয়ার্স প্লাউম্যান, রামায়ন এবিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে, কিন্তু ভাগবতের ভাষা এমনই গুরু গম্ভীর ও দীর্ঘবৃত্তি ছন্দোবহুল যে তাহা কদাপি মহাভারতকার বেদব্যাসের হস্ত হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে না। তবে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন বেদব্যাস একজন নহেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পূর্ব্বে আরও সাতাশ জন বেদব্যাস ছিলেন, পরেও থাকিবেন। পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন :—

বেদব্যাসা ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতিঃ সত্তম।
চতুর্ধা যৈ কৃতো বেদো দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ।৩।৩।১০
ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসোঽষ্টাবিংশতিতমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥৪।২
যথা তু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈ র্ব্যস্তা ব্যাসৈ স্তথা ময়া।৪।৩

বোপদেব কর্ত্তৃক এই ভক্তি রসসাগর লীলামৃত গ্রন্থ রচনা কেমনা সম্ভব হইবে?

ভাগবত গ্রন্থ যাহারই কৃত হউক না কেন তাহা যে বিশ্ব সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম রত্ন তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। আর তাহা যে আমরাই বিশ্বকে উপহার দিয়াছি সেই সৌভাগ্যে আমরা আজ গৌরবান্বিত।

ব্যাসদেব কি বোপদেব লইয়া মারামারি না করিয়া— "পিবত মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"। "আবার খাব" সন্দেশ বৈকুণ্ঠ মোদক কি ভীমনাগের প্রস্তুত, তাহা লইয়া অনর্থক বাদানুবাদে সময় ক্ষেপন না করিয়া তাহার আস্বাদনে রসনার পরিতৃপ্তি সাধনই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহারই রচিত হউক না কেন—ভাগবত যে "আবার-খাব" সন্দেশের অপেক্ষা আদরনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনিই কেন ভাগবত রচনা করুন না সেই মহা কবিকে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কোটি কোটি প্রনাম না করিয়া থাকা যায় না। যিনি যশোধন মানববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই বিপুল যশের অধিকারী হইয়াও আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে বহুদূরে থাকিয়া আপনাকে গোপন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন—তিনি মানুষ হইলেও দেবতার অপেক্ষা বরীয়ান্। পরম ভাগবত না হইলে এইরূপে বিপুল যশোরাশিকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে আর কে পারে! আর সেইরূপ আদর্শ পুরুষ না হইলেই বা ভাগবত তাঁহার হাত হইতে বাহির হইবে কেমন করিয়া?

'গীতাঞ্জলির' প্রথম গীতিপুষ্পে—

আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে;
তোমার ইচ্ছা কর গো পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি—
"আমারে" আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্ম দলে।

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া সেই পরম দেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সেই "গীতাঞ্জলির"ই জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল-পুরস্কার স্বীকার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সেইসঙ্গে কবির কথা যে শুধু মুখের কথা—প্রাণের কথা নহে তাহাই দেখাইয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ—বাঙ্গলার—ভারতের এসিয়ার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন সন্দেহ নাই—কিন্তু আমরা শুধু দেখাইলাম ভাগবতের কবির প্রাচ্য-প্রথা আর গীতাঞ্জলির কবির পাশ্চাত্য প্রথায় কত প্রভেদ। ভক্তের নামকীর্ত্তনে যে প্রাণের স্পন্দন তাহা শুকোচ্চারিত হরি কথায় আশাকরা মূঢ়তা।

যে ভাগবত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—

সবৈ পুংসাংপরোধর্ম্মো যতে ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

যে ভাগবতে হরি কথামৃতপানে বিভোর হইয়া সপ্তম দিবসেই তক্ষক দংশনে মৃত্যু অবধারিত জানিয়া ও অভিশপ্ত রাজা মরণের সরোষ ভ্রূভঙ্গকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন— দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকতক্ষকোবা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ। যে ভাগবতে পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব সুপ্তা মাতা সুনীতির অঞ্চল শয্যা ছাড়িয়া নিশীথের গভীর অন্ধকারে নিঃসঙ্গ হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মর্ম্মভেদী স্বরে "কোথায় পদ্মপলাশ লোচন শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া অম্বর অবনী কম্পিত করিয়া সেই গহন কাননে সিংহ শার্দ্দুলের মর্ম্মভেদ করিয়া তাহাদের হিংস্র নয়নে সহানুভূতির অশ্রু বহাইয়া ছিল— যে ভাগবতে শিশু পুত্র প্রহ্লাদ ভগবদ্বেষী অসুররাজ পিতার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার স্নেহপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে নির্ভীক হৃদয়ে বলিয়াছিল—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
এবা পুংসাপিতা বিষ্ণৌ ভক্তি শ্চেন্নব লক্ষণা
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীত মুত্তমম্॥

যে ভাগবত ভগবৎ প্রেমবিহবলতার চিত্র দিতেছেন— এবং—ব্রতঃ স প্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥

যে ভাগবত ভক্ত-প্রবর অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি দেখাইয়া বলিতেছেন—

যঃ কৃষ্ণ পাদাঙ্কিত মার্গপাংশুষ্চচেষ্টত প্রেম বিভিন্ন ধৈর্য্যঃ।

যে ভাগবতে কৃষ্ণগত মনঃ প্রাণা গোপ কুমারীগণ জাতি কুলমান পরিত্যাগ করিয়া শারদী জ্যোৎস্নাপ্লুত যমুনা তটে প্রাণ বল্লভের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও তৎসঙ্গ কিছুতি

ফলতঃ বনে বনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—

তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

আর কত বলিব—বলিতে বলিতে যে "পোহায় জীবন যামিনী"—সেই ভাগবতের কবি যে আমাদের কত গৌরবের তাহা প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার ভাষা বুঝি মানবের নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবত এমনই অপার্থিব উপাদেয় গ্রন্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতার সহিত তুলনা করিয়া গীতা হইতে উচ্চতর বলিয়া ঘোষণা করিবার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারি না। অনেকের মতে গীতা ভক্তি শাস্ত্রেরই গ্রন্থ নহে। ভক্তির বিচারে গীতা যে পর্য্যন্ত গিয়া নীরব হইয়াছেন সেইস্থানে ভাগবতের আরম্ভ। গীতাতে জ্ঞানের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উল্লেখ মাত্র আছে, আর ভাগবত হইতে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তির অপ্রতিহত ধারা উৎসারিত হইতেছে। কিন্তু যে সকল ধৈর্য্যশীল সৌভাগ্যবান্ পাঠক গীতা ও ভাগবত উভয় গ্রন্থই মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন গীতা ও ভাগবতে প্রভেদ ততখানি ব্রহ্মসূত্র ও শারীরক বা শ্রীভাষ্যে প্রভেদ যতখানি। ভাষ্যকে যদি সূত্রের উপর আসন প্রদান চলে তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে গীতা অপেক্ষা ভাগবতের স্থান উচ্চে। প্রকৃতপক্ষে ভাগবত গীতার মহাভাষ্য। গীতাতে যাহা সংক্ষেপ সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে ভাগবতে তাহাই বিস্তৃত ও বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। ফলতঃ গীতাকেই যে ভিত্তি করিয়া তাহার উপরে ভাগবতের বিরাট সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে পরে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জ্যোতিষানন্দের স্বপ্ন

(১)

[জাতিবিভীষিকা]

সেদিন সন্ধ্যার সময় শুনিয়া আসিলাম, কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ মেসে একজন নিম্নশ্রেণীর ভদ্রলোক আপনাকে উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া বেশ সুখে দিনপাত করিতেছিলেন; রাত্রিকালে দৈবাৎ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রিই তাঁহাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়; ভদ্রলোকটি নাকি রাত্রির অবশিষ্ট অংশটুকু কাটাইয়া প্রাতঃকালে চলিয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়া বিশেষ কাঁদাকাটি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করেন নাই। শুনিয়া আসিয়া মনটা বড়ই অশান্ত বোধ হইতে লাগিল। শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম একি হৃদয়বিদারক কাণ্ড আবহমান কাল হইতে হিন্দু সমাজে ঘটিয়া আসিতেছে, একি অসহ অত্যাচার ও উৎপীড়নের শকট সমাজবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভগবান! ইহার কি শেষ নাই? তবে কেন বাঙ্গালীকে মনুষ্যজন্ম দিয়াছিলে? এই যে পৃথিবীব্যাপী নবযুগের উন্মেষ হইয়াছে সাম্যবাদের পাঞ্চজন্যশঙ্খ নিনাদে একটা তুমুল কোলাহল আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কি ভারত কেবল বধির হইয়া থাকিবে? ভারতের হৃদয়ে নূতন আকাঙ্ক্ষায় আবেগ স্পন্দন কি জাগিবে না, সাম্যের মহামন্ত্র কি তাহাতে ধ্বনিত হইবে না? যে সময়ে স্বরাজের ধ্বনিতে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত, যে সময়ে আমরা কল্পনার চক্ষে একটা

একতাবদ্ধ ভারতের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, সে সময়ে এ আর্ত্তনাদ কর্ণে পৌছায় কেন? যেখানে শক্তি ও সহৃদয়তা বিরাজ করিবার কথা সেখানে এ বিরোধের সুর বাজে কেন? সম্মুখে একখানি হিন্দু জ্যোতিষের গ্রন্থ পড়িয়াছিল, মনটা সুস্থির করিবার জন্য সেইখানি খুলিয়া বসিলাম, কিন্তু তখন আমার সেই প্রিয় পুস্তকখানিতেও মন বসিল না। জাতিভেদ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "জাতের বিড়ম্বনা" শীর্ষক পুস্তকখানি পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে শেষ পৃষ্ঠায় আসিয়া দেখিলাম লেখক মহাশয় বলিতেছেন—"যাহাকে শূদ্র ভাবিয়া সমাজের এককোণে ফেলিয়া রাখিয়াছ, মনে করিয়া ঘৃণার ভরে যাহার দিকে ফিরিয়াও চাওনা, যাহাকে সেবার পরিবর্ত্তে বিদ্রূপ করিয়া আপনার প্রাধান্য প্রচার করিয়া আসিয়াছি, সেখানিও সেই ভগবানের সজীব মূর্ত্তি। তাহাকে দূরে ঠেলিতে গিয়া তুমি ভগবানের নিকট হইতেই সরিয়া পড়িয়াছ। তোমার প্রত্যেক আঘাত সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের অঙ্গেই বাজিয়াছে। অন্ধ তুমি ব্রাহ্মণত্বের স্পর্দ্ধা কর—মূর্ত্তব্রহ্মকে চিনিলেনা?" কথা কয়টি হৃদয়ে বড়ই বাজিল। উহাদের বিষয়ই চিন্তা করিতে করিতে কখন নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলাম মনে নাই।

হঠাৎ স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম এক বিশাল জটাজুটধারী উগ্রমূর্ত্তি আমার নয়ন সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার বেশভূষা ও ওজস্বীবপু দেখিতে লাগিলাম। পরিধানে রক্তজবারাগেরঞ্জিত বসন, প্রান্তভাগে হরিৎ আভা, এক-হস্তে ত্রিশূল অপর হস্তে কমণ্ডলু; এক চক্ষে রুদ্রের ভৈরব বিজলী আর নয়নে শান্তির কমনীয় প্রতিচ্ছবি। যেন একচক্ষে করুণার ধারা বহিয়া বলিতেছে "লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, পদদলিত ভয় নাই শান্তি আসিবে" আর এক নয়নের রৌদ্র বিভীষিকা যেন বলিতেছে—"অত্যাচারী, অবিচারী সাবধান! এই অপূর্ব্ব করুণা ও রুদ্রের একাধারে মিলন আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। তাই ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। ক্রমে অল্প অল্প সাহস সঞ্চারে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল, করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রভু আপনি কে, আপনার নিবাস কোথায়? গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল—আমি শিবের অনুচর নন্দী, ভৃঙ্গী আমার সহচর। শিবের আদেশে আমি পৃথিবীর সকল স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াই, কোথায়ও গোলাগুলির গোলা বর্ষণের মধ্য দিয়া অসির ঝনঝনার উপর দিয়া রক্তগঙ্গা বহাইয়া চলি, আবার কোথায়ও বা ধর্ম্মের আলোকের সাথে, জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডার হস্তে শান্তিধারা প্রবাহিত করিয়া দিই। নিবাস আমার স্বর্গের মাঝখানে নন্দন উপবনে মন্দাকিনী সৈকতে পারিজাত নিকুঞ্জে। আমি শিবের ইচ্ছায় রুদ্র ও করুণার মিলনে গঠিত, একহাতে শান্তি অপর হস্তে শাস্তি লইয়া আমি চলিয়াছি। পতিত লাঞ্ছিত সমাজের অত্যাচারে দাবদগ্ধ লোক সকল আমাকে ডাকিয়া বলে কি করিব বলিয়া দিন এবং, "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌"—আমি আপনার শিষ্য আপনার আশ্রিত, কি উপায় বলিয়া দিন প্রভু।

এই বলিয়া মহাপুরুষ অল্পক্ষণ থামিলেন, সেই অবসরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রভু গীতায় যে পড়িয়াছি—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

উহার অর্থটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এই যে ভগবানের শক্তির অভ্যুত্থানের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সত্যই অবতারের আবির্ভাব না আপনারই করুণা ও রৌদ্রভাবের একটা লীলা?'

ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"অবতার মানে আর কিছুই নয় আমারই এক একটা শক্তিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে; তারপর আমার লীলামুক্ত অলক্ষ্যে সকল সময়ে সকল স্থানেই চলিতেছে। ঈশ্বরের আদেশে আমার মন্ত্র 'অত্যাচার, অবিচার ও পতন' এবং করুণা প্রেম ও আত্মোন্নতি। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ইহার সাধনই আমার ধর্ম্ম। যখন আমি অশিব দক্ষযজ্ঞ

বুঝিতে পারিলাম—স্বর্গের মাঝখানে অর্থাৎ সেই বজ্রের দেশে, তাই তাই কুলিশ কঠোর, নন্দনকাননের অর্থাৎ শান্তির সর্ব্বোচ্চ স্থানে, মন্দাকিনী সৈকতে, অর্থাৎ করুণার ধারা তাহার নিকট দিয়া বহিয়া গিয়াছে আর পারিজাত নিকুঞ্জে অর্থাৎ পারিজাতের সৌরভের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া প্রেম তাহার হৃদয়ে। সেই ভীষণ ত্রিশূল আস্ফালনে ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি "মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সেই অন্তর্ভেদী 'মা' শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম তখনও রাত্রি কিছু অবশিষ্ট আছে বাতায়ন পথ দিয়া ইন্দুকিরণ আসিয়া আমার মুখে চোখে পড়িল। ভাবিলাম আমি কি চন্দ্রগ্রস্ত হইলাম? কিন্তু তখনও বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে আর হৃদয়বীণার ভৈরবী ঝঙ্কারে বাজিতেছে—"অত্যাচার অবিচার পতনের মূল।"

"ঘরের মায়া"

[শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(ভাদ্র সংখ্যার 'ঘরের মায়া' নামক চিত্র দৃষ্টে লিখিত)

সন্ধ্যা আকাশ ধূসর হয়ে এল
চলরে এখন ঘরের পানে চল,
নামচে আঁধার পাতার ফাঁকে ফাঁকে
নীড়ে ফিরে এল পাখীর দল;

গোধন গুলি ফেল্‌ল মুখের গ্রাস,
আঁধার দেখে লাগল বুঝি ত্রাস,
বুকের মাঝে বাজ্‌ল কাহার ডাক,
জাগল কাহার নয়ন ছল' ছল।

আকাশ ভরে এল সাঁঝের মায়া
পড়্‌ল মনে আপন গৃহের কথা,
বাঁধন তাদের নিতেই হবে গলে
হোক্ তা কঠিন দিক্ তা শত-ব্যথা;

তোরে কা'রো শক্ত জোয়াল বওয়া,
কারো খাঁটি দুধটুকু রোজ দেওয়া,
এরই তরে ফিরছে ওরা ঘরে,
ফেলে রেখে অর্দ্ধভুক্ত লতা।

মুক্তি ওদের মুক্তি নাহি হায়,
মুক্তি বুঝি চায়না ওদের মন,
আপনারে বিলিয়ে দিল ভবে,
স্বাধীন হৃদয় দিয়ে বিসর্জ্জন;

মুক্ত হাওয়া লাগলে ওদের গায়,
মন কি ওদের মুক্তি নাহি চায়,
পাগল হয়ে ওঠে না কি প্রাণ,
ফেলতে ছিঁড়ে চায়না কি বন্ধন?

নামে যখন সাঁঝের তরল কালো
বলে যখন ঘরের পানে চল,
মুক্তি ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়
ঘরের মায়ার সুরু জোয়ার জল;

বাঁধন তাদের যায়রে ডেকে ডেকে,
আয়রে চলে আয়রে আমার বুকে,
তোদের বেধে রাখব রে এই ঘরে,
সন্ধ্যা আকাশ ধূসর হয়ে এল;
নীড়ে ফিরে আসছে পাখীর দল।
চলরে এখন ঘরের পানে চল।

Printed at Sreegouranga Press 71, 1 Mirzapur street by Pulin Behari Dass.
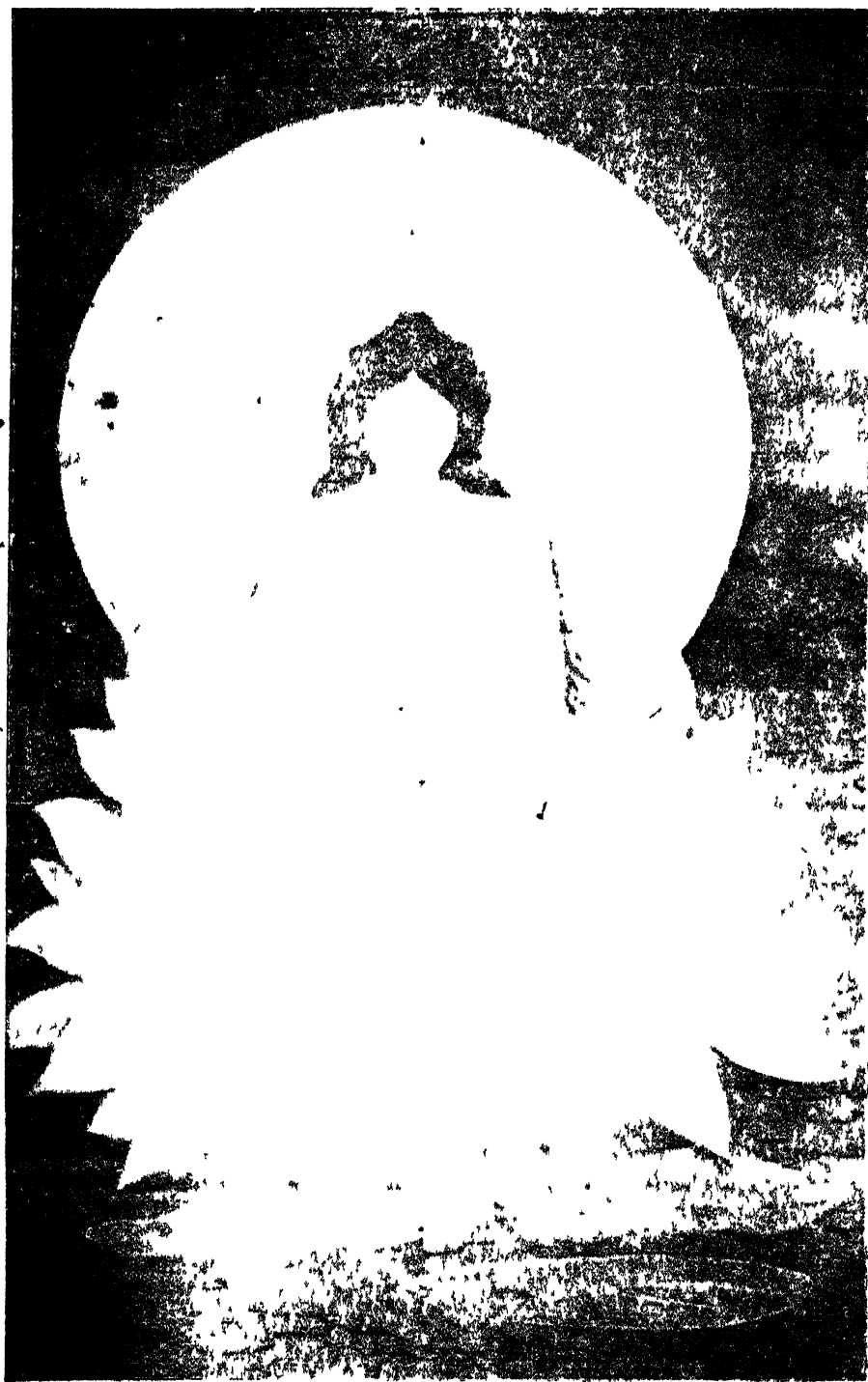
উপাসনা

"সাগর—মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে কবে এই তটিনী পারাপার,
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ—যুগ পশরা ল'যে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে!"
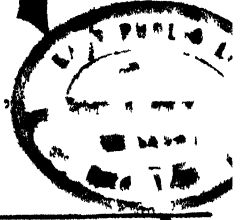
১৬শ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩২৭ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনী

প্রজাতন্ত্রের যুগান্তর

পাশ্চাত্য জগতে যে নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ পরিস্ফুট হইতেছে তাহাদের মধ্যে সকলেই—রাষ্ট্র যে সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বশক্তিমান হইয়া এক্ষণে প্রজার ও নানাবিধ সমূহ-অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিতেছে তাহার প্রতিরোধ করিতে চাহে।

রাষ্ট্রকে সামাজিক আদর্শ ও বিকাশের একমাত্র নিয়ন্তা করিলে এমন একটা ঔদাসীন্য প্রশ্রয় পায় যাহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সমাজের কর্ম্মকুশলতা খর্ব্ব হইতে থাকে। পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্র আজ বুঝিতে পারিতেছে যে প্রজাকে সজাগ রাখিতে হইলে তাহাকে ভোটের সময় এক পক্ষ না হয় অপর পক্ষের সহিত হাঁ বা না বলাইলে শুধু চলিবে না। প্রজাকে স্বাধিকার দিতে হইবে। প্রজার জন্য স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রের যাঁহারা প্রধান সমালোচক তাঁহারা সকলেই এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে যত্নবান। অধিকাংশ চিন্তাশীল লেখকগণ শ্রেণীকেই কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন। শ্রমজীবীদিগের নানা শ্রেণী একতা ও সমভাব দেখাইয়াছে। শ্রেণী-স্বার্থ সদা জাগরূক। সভা নির্ব্বাচনের সময় কতকগুলি দেশ বিভাগ, কখনও শ্রেণী সংঘের মত স্বাভাবিক ও সমগ্র জীবনের পরিচায়ক নহে। তাঁহারা বলেন কৃত্রিম দেশ বিভাগ উঠাইয়া দাও। শ্রেণীকেই নির্ব্বাচনের কেন্দ্র কর।

শুধু নির্ব্বাচনের আধার নয় শ্রেণীকে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রধান ক্ষেত্র করিতে হইবে, তাঁহারা বলিতেছেন। এক এক শ্রেণী চৈতন্য অসংখ্য সমূহ-শাসনে পরিব্যাপ্ত হইয়া দেশময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে একটা দক্ষ স্বায়ত্ত-শাসন গড়িয়া তুলিবে। এবং কৃত্রিম বিভাগ নীতিকে প্রশ্রয় না দিয়া পার্লামেণ্ট দেশের সকল প্রকার গুণ ও কর্ম্ম বিভাগের পরিচয় দিবে। শ্রেণী, গুণ ও কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য সভা নির্ব্বাচনের সময় রক্ষা না হইলে প্রজাতন্ত্র অঙ্গহীন থাকিবে।

রুশিয়ার সোভিয়েট অবলম্বিত প্রজাতন্ত্র অন্য এক বিপরীত নীতিকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডে অথবা ফ্রান্সে যে সকল প্রজাতন্ত্র সংস্কারের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে সকলেই-শ্রেণী চৈতন্য (class-consciousness) কে আশ্রয় করিয়া বৈষয়িক জীবনের বিরোধকে রাষ্ট্রীয় গঠন প্রণালীর উপকরণ করিয়া

গ্রহণ করিয়াছে। এই কারণেই ফ্রান্সের Syndicalism (শ্রেণী-তন্ত্র) এবং ইংলণ্ডের Triple Industrial Alliance (শিল্পত্রয়-সম্মিলন) "direct-action" অথবা সহজ ও প্রচণ্ড বিরোধের দ্বারা রাষ্ট্রকে খর্ব্ব করিবার আন্দোলনকে সজাগ রাখিয়াছে।

অধুনাতন প্রজাতন্ত্রের প্রধান নায়ক, লয়েড জর্জ্জ অথবা মিলারা এই শ্রমজীবীসংঘের হটকারিতা ও বিপ্লব প্রবৃত্তিকে প্রজাতন্ত্রের প্রধানতম শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অথচ ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের ক্রম বিকাশে শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী বিরোধ-প্রসূত বিপ্লববাদকে একটা অস্বাভাবিক স্বার্থপরতা প্রক্রিয়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার নয়।

প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ রুশিয়ায় বিকাশলাভ করিতে পারে না। একটা প্রধান কারণ এই যে রুশিয়ায় বড় কারখানা এবং মূলধনের অথবা ধনীর বৈষয়িক জীবনে প্রতিপত্তি তত নাই। বিভিন্ন গ্রামের মীরের স্বাধীন সমূহের সমবায়ে রুশ Peasant democracyর (কৃষক প্রজাতন্ত্রের) আধুনিক অভ্যুত্থান।

এই নূতন প্রজাতন্ত্রের নূতন গঠন প্রণালী ও শাসনরীতি কেহ কেহ বলিতেছেন জগতে এক যুগান্তর আনিবে। এই নূতন প্রজাতন্ত্র রুশিয়ার বহু শতাব্দীর পুরাতন সেই গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে স্থাপিত এবং ইতালীর রাজনাতিক কাভুর যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, যে রুশিয়ার গ্রাম্য সমাজ পৃথিবীর শাসন প্রণালীর যে একদিন যুগান্তর আনিবে তাহা নিতান্ত অলীক নয়। রুশিয়ার মীর অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েত চিরকালই স্বায়ত্বশাসনের কেন্দ্র ছিল। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে জমি সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া, সকলের উপর সঙ্গত ভাবে কর স্থাপন করা, গ্রামের নানা প্রকার বিবাদ মামলা মিটাইয়া দেওয়া, ইত্যাদির ভার এই মীর অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর এখনও ন্যস্ত আছে।

এই প্রকার স্বায়ত্বশাসন সমগ্র স্লাভদেশ, চীন ও ভারতবর্ষে বিশেষ পরিচিত। সম্প্রতি আয়ার্ল্যাণ্ডে 'সিন্‌-ফিন-তন্ত্র' এই প্রকার স্বায়ত্বশাসনের পুনর্জ্জীবন দিয়া সেখানকার রাষ্ট্র বিপ্লবকে এত সহজ করিয়াছে।

রুশিয়ার এই মীর পরস্পরের মিলনে সহযোগে প্রসার লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি গ্রাম্য-পঞ্চায়েত ক্রমশঃ এইরূপে জেলা সহর ও প্রাদেশিক সমিতি ও সংঘবদ্ধ হইয়াছে।

চরমপন্থী "বলসেবী"গণ রুশজীবনের এখন ভাগ্য বিধাতা। কিন্তু অনুধাবনের বিষয় এই যে, যে রাজনৈতিক দলই এখন প্রভুত্ব করুক না কেন, শাসন যন্ত্রের মূল চক্র হইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজের সমাবেশ। সেই চক্র এখন কি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা এতদূর হইতে এখন বলিতে পারা যায় না।

সোভিয়েট অথবা সমূহ তন্ত্রের মূল-শক্তির কারণ এই যে ইহা শ্রমজীবিগণকে শ্রেণী অথবা শিল্প হিসাবে নহে, কার্য্যস্থান,—গ্রাম, দোকান অথবা কারখানা হিসাবে ভাগ করিয়া লইয়াছে। স্বায়ত্বশাসনের কেন্দ্র হইয়াছে কর্ম্মভূমি কৃষকগণের সভা গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে অবলম্বন করিয়াছে। সৈন্যগণের সভা, বিশেষ বিশেষ, রেজিমেণ্ট অথবা সৈন্য বিভাগকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রমজীবিগণের সমিতিগুলির কেন্দ্র হইয়াছে বিশেষ বিশেষ দোকান, কারখানা ও কর্ম্মস্থান।

রুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের পর, হাঙ্গারী এবং জার্মানীতে সোভিয়েট ঠিক এই ভাবে আপনি জাগিয়া উঠিয়াছে। পরে হয়ত নানা রাজনৈতিকদলের প্রেরণায় নূতন প্রথার ভোট দিবার প্রণালী, স্ত্রীলোকের নির্ব্বাচন, কর্ম্ম অথবা শিল্পকে ত্যাগ করিয়া পুরাতন প্রণালীর ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আসল সত্য হইতেছে এই যে নরম ও গরম দলের বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে সোভিয়েট-তন্ত্র মানুষের কর্ম্মকেন্দ্রকে, তাহার শ্রমজীবনের সকল চেষ্টার অধিকারকে আশ্রয় করিয়া প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শিল্পী ও শ্রমজীবী কৃষক, দোকানী তাহাদের কর্ম্মস্থলেই স্বায়ত্বশাসনের শিক্ষা ও আদর্শ লাভ করিয়াছে। গ্রাম ও গ্রাম্যসমিতি জেলার সভায় জেলা ও জেলার সভা প্রাদেশিক সভায় এবং প্রদেশ জাতীয় সভায় সভ্য পাঠাইয়াছে।

আর এক বিশেষত্ব এই যে এই নির্ব্বাচিত সভ্যগণকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও যে কোনও সময়ে শ্রমজীবি

প্রয়োজন বুঝিলে ফিরাইয়া আনিতে পারে। জারমানীতে এই ব্যবস্থার অভাব-কারণে সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে এত আন্দোলন ও অসন্তুষ্টি দেখা গিয়াছে।

পাশ্চাত্য ইউরোপে শ্রমজীবিসংঘ সমুদায় বিশেষ বিশেষ কারখানায় স্বায়ত্তশাসনের ভার লইয়া প্রজাতন্ত্রকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। রুশিয়ার সোভিয়েট শ্রমজীবি-দলকে একটী প্রকাণ্ড বিভাগ লইয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত না করিয়া স্থান বিশেষে তাহাদিগকে কেন্দ্রীভূত ও একত্র করিয়াছে। এইরূপে এমন অসংখ্য সভা ও সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে যে গুলি শুধু শিল্প ও ব্যবসায়ে নহে সমগ্র সামাজিক, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

ভারতবর্ষ ও চীন কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্প-প্রধান পাশ্চাত্য ইউরোপে যে শ্রেণী বিভাগ সমাজের উন্নতির সহিত জড়িত হইয়া রাষ্ট্রীয় গঠন ও বিকাশ প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা এদেশে শোভা পায় না। সুতরাং সেই শ্রেণী বিভাগ যদি রাজনৈতিকদলের নাম ভাঁড়াইয়া আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে একটা স্থান খুঁজিতে চাহে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বিজাতীয় হইবে।

কৃষক প্রজাতন্ত্রের (Peaant democracy) গঠন ও বিকাশ বিভিন্ন প্রকারে হয়। আমরা রুশিয়ার নব্য-প্রজাতন্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, তাহার গঠন ও আদর্শ কি প্রকারে পাশ্চাত্য ইউরোপের প্রজাতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতবর্ষ ও চীন প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠান যদি আমাদের সমাজের গঠন ও বিকাশের ধারা অবলম্বন না করিয়া একটা নূতন আদর্শ আনিতে চাহে তাহা হইলে নূতন অনুষ্ঠানও টিকিবে না, আমাদের পুরাতন ধারাও নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্য ও সমন্বয় স্থাপন, উৎপন্ন ধনের যে তারতম্যের অভাব হেতু সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা কৃষিপ্রধান দেশের বিশেষত্ব, যে সামাজিকতা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারকে দমন করিয়া প্রত্যেক কৃষক সমাজকে অনুপ্রাণিত করে, তাহা ত আমাদের আছেই, আর আছে আমাদের হিন্দুর সেই গ্রহণ স্পৃহা, বর্জ্জন না করিয়া সামঞ্জস্য আনয়নের আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন—এই আদর্শ হিন্দুর বর্ণধর্ম্মের সহিত উচ্চ, নীচ জাতি, অহিন্দু ও পতিত জাতির সহিত একটা মিলনের পথ খুলিয়া রাখিয়াছে, গ্রাম্য সমাজের নীরব প্রজাতন্ত্রে উচ্চ ও নীচ জাতির একটা সমভাব জাগাইয়া রাখিয়াছে, হিন্দুর অধ্যাত্মজীবনে একটা ভাবুকতা ও বিশ্বজনীনতা আনিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মত আরও কত লোক-ধর্ম্মের আন্দোলন অভ্যুত্থানকে সজীব রাখিয়া বর্ণধর্ম্মের বন্ধনকে অবজ্ঞা করিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক সামাজিকতা ও ঐক্য এবং সমূহ-ভাবের ভিত্তিতে নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের গ্রাম্য সমাজে, জাতি-শাসনে, শ্রেণী-ধর্ম্মে যে সমূহের ভাব সম্মিলন লক্ষিত হয় তাহাকে নূতন রাষ্ট্র গঠনের উপকরণ করিয়া লইতে হইবে, যেখানে সঙ্কীর্ণতা প্রশ্রয় পাইয়াছে সেখানে সম্মিলন ও সমবায়ের দ্বারা বিশালতর ব্যক্তিত্বের সূচনা করিয়া, যেখানে ক্ষুদ্র গণ্ডীর নিয়ম নিষেধ মৈত্রীর অন্তরায় হইয়াছে সেখানে বৃহত্তর জীবনের নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া, যেখানে আচারের গুরুভার স্বাধীন প্রাণের সহজ বিকাশকে প্রতিরোধ করিয়াছে সেখানে আচারকে বর্জ্জন করিয়া। এসিয়ার নব্য-প্রজাতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে সমূহ ও শ্রেণীর সমবায়ে। সমূহ ও শ্রেণীর সহযোগ রাষ্ট্রকর্ম্মকে যথাযথ খর্ব্ব করিয়া জনসমাজের শাসন কুশলতাকে দৈনিক জীবনে জাগাইয়া রাখিবে। কেন্দ্রীকরণ নহে, প্রসারই নব্য-রাষ্ট্রের নীতি। আর এই প্রসারের আধার হইবে, ব্যক্তির স্বাধিকার নহে, সমূহের দায়িত্ব।

পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধিকার স্থাপন চেষ্টা ও সমগ্র সমাজের ঐক্যস্থাপন চেষ্টার বিরোধের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া যথেচ্ছাচার ও যথেচ্ছদমনের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। জাগিয়াছে এখন একটা সাগর-মন্থনের উন্মত্ত কোলাহল, উঠিয়াছে কত বিষম হলাহল বিষ, যাহা পান করিয়া কত দেশ অসহ্য বেদনায় কাতর। বিশ্বমানবের বিচিত্র ইতিহাসের কত ঋজু পথ বাহিয়া শেষ-নাগ এখন সাগর-বিক্ষুব্ধতরঙ্গমালার আঘাতে, দেব মানবদৈত্যের বিপুল প্রচেষ্টার তাড়নে পরিশ্রান্ত হইয়া এখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। প্রজা-লক্ষ্মী কালের

লীলা-কমল হস্তে ধারণ করিয়া সাগরবেলায় আসিয়া উঠিলেন, সদ্যস্নান সিক্তবসনা। তিনি কাঁহার অঙ্কশায়িনী হইবেন? ত্রিশূলপিনাকধারী শিব যে হলাহল গণ্ডুষ করিয়া তাণ্ডবনৃত্যে মাতিয়া রহিয়াছেন। বিশ্বরমা প্রজা লক্ষ্মীকে লইয়া যে বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিতেছে তাহাকে বোধ করিবেন কে? নারায়ণের উদ্বোধন কর। ভারতবর্ষ, তুমি যাঁহার স্থূল শরীর তাঁহাকে আর একবার জাগাও, তোমার মনোময় রূপটিকে আর একবার ধ্যান কর,—মহালক্ষ্মীকে তুমিই বরণ করিতে পারিবে, অশান্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে তুমিই বিশ্বকে রক্ষা করিবে। নমো নারায়ণায়।

অপূর্ব্ব দেউল

[শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

অর্ঘ্যরচি' ফুলদলে পূজারী সে করে আরাধনা,
দেবতারে তুষিবারে স্তবগীত করিছে রচনা।
রতন-খচিত-দেব-সিংহাসন খানি গড়িবারে
ধনীর বিপুল অর্থ পদতলে আসে ভারে ভারে।
যত আসে, পূজারীর রসনায় তত আসে জল,
দেবতা মিলান্ শূন্যে, দৃষ্টি তার রহে অচপল
অর্থ 'পরে। দেবতা সে পাষাণ তবুও মনে হয়
রহি' রহি' সিংহাসন নড়ি' উঠে; নিজ পরাজয়
পূজার বিদ্রূপ মাঝে নিত্য হেরি' উঠিয়াছে জাগি';
চারিদিকে আঁখি মেলিয়াছে "কোথা ভক্ত অনুরাগী!
নিরন্ন দীনের কণ্ঠে বাহিরে ধ্বনিছে আর্ত্তস্বর,
"পূজি প্রীতি দিয়ে শুধু, ধরেছি হৃদয়ে, নাহি ঘর!
সিংহাসন হতে নামি' ঠাকুর রহিল "একি ভুল!
এতদিন দেখিয়াও দেখি নাই অপূর্ব্ব দেউল!"

সাময়িক সাহিত্য

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত, এম্‌-এ]

আজ বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্য শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের পথে চলিয়াছে, সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যতে দুই চক্ষু রাখিয়া বর্ত্তমান উপযোগিতার কষ্টিপাথরে ইহাকে পরখ করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। যাঁহারা বলেন এ সাহিত্য এখনও শিশুসাহিত্য আলোচনার যূপকাষ্ঠে ফেলিলে 'ইহার প্রাণ রাখিতেই প্রাণান্ত' ব্যাপার হইবে, তাঁহাদের কিন্তু এটা মস্ত ভ্রম, কারণ এত বয়সেও যদি সাময়িক সাহিত্যকে শিশুর মত গায়ে হাত বুলাইয়াই রাখা হয়, একটু চোখরাঙ্গানির দাপটও যদি ইহা সহ্য করিতে না পারে, তবে ইহার পরিণাম হইবে—ভাবের জন্য ভাষার স্থবিরত্ব আর কল্পনার পঙ্গুত্ব। আবার সাময়িক সাহিত্যের প্রভাব যখন লোকশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের উপরও অসীম, তখন ভয় হইবে যে সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে ক্লৈব্য ছড়াইয়া গিয়া গোটা সমাজটাকে এক অথর্ব্ব আকার ধারণ করিতে বাধ্য করিবে। কবির কথায় তখন সাহিত্য সমাজ সবই 'থমকি' থেমে যাবে পথ মাঝে' তাহা হইলেত বিশ্বসাহিত্যের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকায় ইহার কেবল ক্রন্দনই সার হইবে সেটাও একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয় কারণ এটা হবে সব বিষয়েই আগে চলার যুগ, এখনকার দিনের সাধন-মন্ত্রই যে 'আগে চল আগে চল ভাই' কারণ 'পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।'

বিশ্বের সকল সাহিত্যেই সাময়িকপত্রের প্রভাব অতুলনীয়, যে সকল বিদেশী সাহিত্য ভাব মাধুর্য্য ও রচনা পারিপাট্য লইয়া শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই পূর্ণ বিকাশের মূলে ঐ সাময়িক সাহিত্য। যে সাহিত্যকে ভাবে ভাষায় অনেকটা অনুকরণ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য চলিয়াছে, সেই ইংরাজি-সাহিত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি-সভ্যতা সাময়িক সাহিত্য হইতেই প্রসূত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যযুগে যখন বিলাসিতার মোহ-বর্ত্তে পড়িয়া ইংরাজ জাতি নাস্তিক ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিল, যখন আপনাদিগের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহারা ঘৃণিত ও হেয় অনুষ্ঠান হইতেও পশ্চাৎপদ হইত না সেই সময়ে পুণ্য আলোকরশ্মি তাহাদিগকে সেই মহান্ধকার হইতে উঠাইয়া পবিত্র ও জ্যোৎস্নালোকে আনিতে সহায়তা করিয়াছে। অধর্ম্ম-রূপ আলেয়ার আলোয় আকৃষ্ট হইয়া তাহারা যে ধর্ম্মের পথ সাধনার মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল সাময়িক সাহিত্য তাহাদিগকে সেই পরিত্যক্ত পথে প্রত্যাগত করিতে কত আয়াস স্বীকার করিয়াছে। সেই আয়াস সেই শুভপ্রয়াসের জন্য আজ ইংরাজি-সাহিত্য সর্ব্ব সমাদৃত আর সেই সাধনা-তরুর অমৃতপ্রসূ আত্মনির্ভরতা ও তেজস্বিতা ইংরাজ জাতিকে সভ্যতার অত্যুচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই প্রকারে সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। বস্তুতঃ ভাষার ক্লীবত্ব দূর করিয়া পৌরুষত্ব আনিতে হইলে সাময়িক সাহিত্যের একান্ত আবশ্যক, আমাদিগের বঙ্গদেশেও সাময়িক সাহিত্যে সমাজ ও লোক সাহিত্যে যে উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে তাহা ইউরোপীয় দেশের সাহিত্যের তুলনায় অল্প হইলেও নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভাষার যে অশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা একটা জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, সেই জাতীয় গৌরবের মূলীভূত কারণ উক্ত সাময়িক সাহিত্য। এমন কি ভাষা ও সমাজের মহাদুর্দ্দিনে আমাদের দেশেও সাময়িক সাহিত্য অনেকটা উপকার করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রবল বন্যা আসিয়া যখন বাঙ্গলা চর্চ্চাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, যখন

বাঙ্গলা ভাষা বর্ব্বরের ভাষা বলিয়া আখ্যাত হইত এমন কি ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা ভাষার নামে ভ্রুকুঞ্চিত করিতেন তখন বাঙ্গালী জাতিকে এই কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে—বাঙ্গলাভাষাকে মহাপ্রলয় হইতে উদ্ধার করিতে সাময়িক সাহিত্যই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম অগ্রসর হয়। এ সময়ে 'প্রভাকর' পত্রের প্রচারে ভাব প্রবণ বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে ভাবের বিকাশ হয়, তাহা হইতেই বাঙ্গলা শিক্ষার প্রতি সাধারণের একটী প্রবল আকর্ষণ জন্মিয়া যায়। যুক্তি সম্বন্ধে অধুনা মতামত ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে 'প্রভাকরের' কিরণ সম্পাতে ভাষা-জননীর ললাটদেশ প্রথম প্রদীপ্ত হইয়া উঠে,এই সময় হইতেই বঙ্গভারতীর জীর্ণপ্রাসাদ সংস্কৃত হইতে লাগিল; সুশিক্ষিত ও সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, লোকের রুচি ও মানসিক প্রবণতা নূতন দিকে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিল বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদন-মোহন তর্কলঙ্কার "সর্ব্ব-শুভঙ্করী" নামক মাসিক-পত্র প্রকাশ করিয়া সমাজ ও সাহিত্যের কল্যাণকর বিষয় সমূহ সুরুচি-সঙ্গত ওজস্বী ভাষায় লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীর্ণমন্দির সংস্কারের পর ভাষা জননীর চরণে মনোজ্ঞ নৈবেদ্য পাত্র অর্পণ করিলেন। এই সময়ে অক্ষয় কুমারের প্রতিভাগুণে 'তত্ত্ববোধিনী' বঙ্গে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিল; বাঙ্গলা ভাষায় যে ওজস্বী গম্ভীর রচনা সম্ভবপর সাহিত্য বিজ্ঞান ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে, ইংরাজী ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষার অলোচনা হইতে পারে, 'তত্ত্ববোধিনী' শিক্ষিত সমাজের নিকট এই সত্য প্রতিপাদিত করিল; নিরাভরণা ভাষাজননীর অঙ্গে রত্নরাজি নিবেশিত হইল। অক্ষয়কুমারের—"তত্ত্ববোধিনী" ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ভাবের প্রবাহ উৎসারিত করিয়া দিল; ইতিহাস পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রভৃতি সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। এই প্রকারে বঙ্গভাষার উন্নতির যে বীজ উপ্ত হইল, ক্রমে 'বঙ্গদর্শন' 'সাধনা,' 'প্রচার,' 'আর্য্যদর্শন,' প্রভৃতির দ্বারা ফলপুষ্প শোভিত বিরাট পাদপে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের সাহিত্যগৌরবে, আর্য্যদর্শনের প্রবন্ধ বৈচিত্র্যে, বান্ধবের ভাবগাম্ভীর্য্যে, সাধনার কবিত্ব ঝঙ্কারে ক্রমে বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব কত অংশে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বঙ্কিমের পাঞ্চজন্য শাঁখের গম্ভীর নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া কত নবীন সাধক সাহিত্যসেবার ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল, কাহারও হস্তে মধুরালাপী হৈমবীণা এবং কাহারও হস্তে বা গম্ভীর-নাদী রণভেরী। বঙ্গভাষার সেই দীপ্ত-উষার লোহিতচ্ছটা অবর্ণনীয়।

কিন্তু বর্ত্তমান সাময়িক সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে একটু নৈরাশ্যের উদয় হয়। অবশ্য সে নৈরাশ্য এমন কিছু মারাত্মক নয়, কারণ নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের ফলে এ মেঘ কাটিয়া যাইবেই। আসল কথা এই বঙ্গ-দর্শন প্রভৃতির লেখকগণের একটা লক্ষ্য বা mission ছিল, যাহা এখনকার সাময়িক সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় না। তখন অনাদৃত বঙ্গভাষাকে বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে পরিগণিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাই তাহাদের সাধনার ফল এত শুভ হইয়াছিল; কত আয়াস, কত প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে বঙ্গভাষা আপনার গরিমাদীপ্ত মস্তক উন্নীত করিতে পারি-য়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালের সাময়িক পত্রের অধিকাংশ লেখকগণই বিস্মৃত হইয়াছেন। সাময়িক সাহিত্যের উপাদান ত প্রায় একই রহিয়াছে, তবে এত বিভিন্নতা কেন? ইহার প্রধান কারণ একের মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ছিল, অপরের মধ্যে প্রাণের অভাব। বঙ্গভাষার উন্নতি-কল্পে যে একাগ্রতা তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এক্ষণে পুনরায় সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; যে মহাপ্রাণতার উত্থান হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিলীন হইতে চলিয়াছে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে প্রাণোন্মাদী উদার সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার শেষ সুরটুকু শুধু ধ্বনিত হইতেছে। যে সাহিত্য-সাধনা জীবনের অস্থিমজ্জাগত আকুল আহ্বান দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা বিশ্রাম সময়ের ক্ষণিক তৃপ্তির উপাদান স্বরূপ প্রায়ই গণ্য হইয়া থাকে, তাই ইহাতে প্রাণের অভাব।

বর্ত্তমান কালের সাময়িক সাহিত্যের উপাদান সমূহের মধ্যে এই তিনটিই প্রধান—কবিতা ছোট-গল্প বা উপন্যাস

এবং বিবিধ প্রবন্ধ। পুরাতন নব্যভারতে একজন লেখক "হেমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"কেবল সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাঁহারা কাব্য রচনা করেন তাহারা অধম-শ্রেণীর কবি। যাঁহাদের কাব্য-পাঠে হৃদয় সন্তোষের সহিত পবিত্রতা ও উন্নতিলাভ করে, দেবত্ব অনুভব করে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারাই দেব-জাতীয় কবি। কবি সরস্বতীর পুরোহিত, দেহমনে শিব, সত্য, সুন্দর, অনুভূতিতে গৃহী, ব্রতে সন্ন্যাসী। হৃদয় তাঁহার বিশ্বের অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য তিনি লালায়িত।" সাময়িক সাহিত্যের অতি অল্প সংখ্যক কবিতাই এইরূপ দেব ভাবান্বিত, উচ্চ-প্রাণতায় উচ্ছ্বসিত। শ্রুতিমধুর নাচুনীছন্দে ভাববিহীন শব্দসম্ভারযুক্ত কবিতা মাসিকপত্রের কলেবর পুষ্টি করিতেছে; উহার লেখকদের কাব্য সাহিত্যের যথার্থ উন্নতির দিকে লক্ষ্যমাত্র নাই, অবশ্য ভাষার ঝঙ্কারও চাই, সঙ্গে সঙ্গে ভাবের দ্যোতনারও প্রয়োজন। মোট কথা ক্ষণিক তৃপ্তির দিকে ছুটিতে গিয়া কবিত্বশক্তি নষ্ট করিলে চলিবে কেন? কবির লক্ষ্য হওয়া চাই সমাজ ও জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি, চিরসুন্দরের আবাহনের জন্য, আর জাতি ও সমাজে 'শিবে তরঙ্গতয়ে'—তাহাতে বিশ্বের অনুভূতি থাকিবে, সহৃদয়তা ও সুহৃদয়তা থাকিবে তাহা পল্লীর ব্যথা দারিদ্র্যের অভিযোগ ও পারমার্থিক চিন্তা জাগাইয়া তুলিয়া পাঠকের মনে সহানুভূতির যে তারটি উঁচু সুরে বাঁধা আছে তাহাতে একটা ঝঙ্কার দিয়া যাইবে। ইহাই যে কবিত্বের চরম আদর্শ।

কিন্তু সাময়িক সাহিত্যের আসল দৈন্য উহার তথা কথিত হাল্‌কা সাহিত্য লইয়া, ছোট-গল্প ও উপন্যাস লইয়া। শরৎবাবুকে বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অসীম মনস্তত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা আর কোনও উপন্যাসে পাই না অবশ্য অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী উপন্যাস রচনায় সেই আদর্শ অনেকটা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, আরও দুই চারিজন লেখক লেখিকা দুই একখানি গ্রন্থে আপনা-দিগের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বড়ই অল্প উৎকট ফেরঙ্গ-সাহিত্যের অনুকরণে প্রেমের উপন্যাসে বঙ্গসাহিত্য প্লাবিত হইয়া যাইতেছে ইহার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে বঙ্গসাহিত্য কি করিবে? ইহার পর ছোট-গল্পের কথা বলিতে গেলে আরো দুঃখ হয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের "ক্ষুধিত পাষাণ" 'কাবুলি-ওয়ালা' প্রভৃতি গল্পগুলি এবং প্রভাতকুমারের 'ষোড়শী' 'দেশী ও বিলাতী'র গল্পগুলির ন্যায় যে উৎকৃষ্ট গল্পরাজি বক্ষে লইয়া বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত, তাহার তুল্য ছোট-গল্প সাময়িক পত্রে খুঁজিয়া পাই কৈ? এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন—"যদি আমাদিগের দেশে 'ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন' 'উইণ্ডসর ম্যাগাজিন' 'রয়েল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি বিলাতী মাসিক পত্রের আমদানি বন্ধ হইয়া যাইত, তাহা হইলে বাঙ্গলায় বহু মাসিকপত্র শীত-কালের পদ্মনালের মত শুকাইয়া সরু হইয়া যাইত।' ইহা কি সাময়িক সাহিত্যের পক্ষে কম লজ্জার কথা? আসল কথা যে জাতি এতকাল পরাধীনতার শৃঙ্খল-ভারে অবনত, কেবল গোলামীগিরি যাহার পেশা, চিরদুঃখ দারিদ্র্য লাঞ্ছনে যাহার জীবনটা একটা দৈনন্দিন চক্রাবর্ত্তে পরিণত তাহার জীবনে বৈচিত্র্য কই; সুতরাং গল্প সাহিত্যে যাহা জীবনেরই প্রতিচ্ছবি তাহাতেও বৈচিত্র্য মিলে না। এইজন্যই এত নকল-সাহিত্যের আমদানী কিন্তু বৈচিত্র্য যখন জীবনের মধ্য দিয়া না পাই তখন তাহাকে কল্পনার ভিতর দিয়াও আনিতে পারি। এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে যখন নূতন ছন্দে নূতন তানে মানুষের মানসবীণা বাজিয়া উঠিতেছে; যখন স্বায়ত্ত-শাসন, সমাজ-সংস্কার শ্রমজীবি-সমবায় কৃষিবাণিজ্যের মধ্যে মনুষ্যত্বগঠন প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই চিন্তাতরঙ্গে মানুষের চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে তখন উহার কয়েকটী তরঙ্গ একত্র বাঁধিয়া লঘু-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিলে দোষ কি? বৈচিত্র্যও আসিবে আবার নূতনভাব সহজ কথায়, সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও চলিবে। এইরূপ না করিলে লঘুসাহিত্যের গতি ফিরিবে না, কেবল অরণ্যে রোদনই সার হইবে।

এইবার প্রবন্ধের কথা বলিতে গেলে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্যের ভাব মনে উদিত হয়। নৈরাশ্য আসে কেন না উত্তম প্রবন্ধ-লেখকের সংখ্যা মাসিক সাহিত্যে বড়ই অল্প, আশা হয় কারণ নূতন চিন্তার হিল্লোল প্রবাহিত

হওয়ায় চারিদিক হইতে নানাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা হইতেছে। আশা আছে সাধনাতেই সিদ্ধি আসিবে। বর্ত্তমান সাময়িক সাহিত্যে প্রকাশিত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ একটা নূতন আলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। মনে হয় ঐতিহাসিক মহলে যে নবজাগরণের মহামন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ও প্রনষ্ট কীর্ত্তির একটা মধুর চিত্র নয়ন সম্মুখে স্থাপিত করিয়া আমাদিগকে পুনরায় কর্ম্মের পথে আহ্বান করিতে পারিবে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রথম প্রয়োজন জাতীয়ভাবের উদ্বোধন এবং তাহা প্রধানতঃ করিতে হইবে এই সাময়িক সাহিত্যের মধ্য দিয়া। বাঙ্গলার নিজস্ব ধারা বহাইবার চেষ্টা—ও সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় জীবনে ভাগবত বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস ইহাই হইবে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বায়ত্ব-শাসন যে মানুষের জন্মগত অধিকার (birth right) জন্মশস্পৎ নিজের স্বত্ব বুঝিয়া নির্দ্ধারণ করিবার যে তাহার দাবী আছে এবং আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া যে তাহাকে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে এই জাতীয় চৈতন্য (national self consciusness) ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশায় বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাহার কারণ বোধ হয় বাঙ্গালীর মগ্ন চৈতন্য এখনও জাগে নাই। তাহাকে জাগাইবার ভার সাময়িক সাহিত্যকেই লইতে হইবে। সমাজের দিক হইতে, শিক্ষার দিক হইতে পরমার্থ চিন্তার দিক হইতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ সাময়িক সাহিত্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে। মোটকথা জাতির হৃদয়ে যদি কুলকুণ্ডলিনী না জাগে, তবে বৃথা এ সাহিত্যসাধনা, বৃথা এ প্রাণান্ত পরিশ্রম। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সকল দিক্ হইতে সাহিত্যকে ও গড়িয়া তুলিতে হইবে. জাতীয়সাহিত্য গঠন করিতে হইলে, সামাজিক, দার্শনিক ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ ললিতকলাবিষয়ক' প্রবন্ধের ন্যায় একরূপই আবশ্যক, কোনটাই অবহেলা করিলে চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক সাহিত্যের আর একটা কর্ত্তব্য আছে। এই চিরদুঃখ দারিদ্র্যপিষ্ট জাতির জীবনে পেচকবিনিন্দী গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে হাঁসির ধারা ফুটাইতে হইবে। এইরূপ হাস্যরসাত্মক রচনা পূর্ব্বে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িক সাহিত্যে প্রচার করিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম "শুভ্র নির্ম্মল সংযত হাঁসি ফুটাইয়া তুলেন,"—জাতীয় জীবনে এই নির্দ্দোষ হাসির উৎস বা humour এর sprit এটাও বড় প্রয়োজন।

আসল কথা সাময়িক সাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী হয় চিন্তাশীলতার অভাব ও অনুকরণ-স্পৃহা। রবীন্দ্রনাথ স্বভাব-কবি, ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ, তাঁহার কবিত্ব ঝঙ্কারে দেশ মুগ্ধ হইল, অমনি একদল বিসর্গ জুটিয়া গেল, সেইরূপ কেশসংস্কার, সেইরূপ বেশবিন্যাস, সেইরূপ ভাব সাধন, রবীন্দ্র ছন্দে রচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু আসলে দেব গড়িতে বানর হইল। সে শক্তিও নাই, ভগবানের সেইরূপ আশীর্ব্বাদও নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট লেখকের সংখ্যা বড়ই অল্প, অথচ মাসিকপত্র দেশ প্লাবিত করিয়াছে; সুতরাং অপকৃষ্ট রচনা সাময়িক সাহিত্যে স্থান পাইবেই। সেইজন্যই বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সমালোচনার প্রয়োজন। কঠোর সমালোচনা যদি যথার্থ সাম্য হয় তবে তাহাও আদরনীয়; নিন্দাবাদ কেবল নিন্দার খাতিরে বড়ই ঘৃণ্য ও লজ্জাকর।

সাময়িক সাহিত্যের প্রধান গুণ ইহা বিশ্বসাহিত্যের ও বিশ্বের ভাবহিল্লোলের অল্প বিস্তর খবর আনিয়া দেয় এবং ইহাও বুঝাইয়া দেয় যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের ভাববিকাশ এক কেবল দেশ ও পাত্রভেদে উহার অভিব্যঞ্জনা ভিন্ন। এক্ষণে আমাদিগের দেশের কয়েকটা উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র বিশেষ কার্য্য করিতেছে, এটা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কারণ সাময়িক সাহিত্যই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মিলনের প্রশস্ত সেতু। যে যুগে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই যুগে বিশ্ব-সাহিত্যে ভাব ও ভাষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সুতরাং সাময়িক সাহিত্যের উৎকর্ষের দিকে আমাদিগের সতর্ক-দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। আশা আছে সাময়িক সাহিত্যই আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া সাধনার মার্গ দেখাইয়া দিবে এবং তখনই আমরা—বঙ্গভাষার কল্যাণ-সাধনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বলিতে পারিব—

"দ্যুলোক ভূলোক পুলকি' আলোকে জননী আমার রাজে
অযুত-ভক্ত অমলরক্ত মরম-কমল মাঝে।
কোটী সন্তানে মিলিয়াছে আজি পুষ্পাঞ্জলিপাণি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো নিখিল জ্ঞানের রাণী।"

পূজার আহ্বান।

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ,]

এখনো বোধন সানায়ের তান
পশেনিক কানে তোর ?
ওরে পরবাসী আয় আয় ফিরে
মুছিয়া নয়ন লোব।
সুবোধ ছাত্র গুটাবে গ্রন্থ,
আয় জ্বলন্ত আয় জীবন্ত
হর্ষোদ্ধত স্পর্দ্ধিত প্রাণে
ছিঁড়ে ফেলে সব ডোর।
ছুঁড়ে ফেলে দে'রে সব দায়িত্ব
প্রভুর গৃহের চাবি
জাগাইয়া তোল অটল অবুঝ
সব আবদার দাবি।
আয দুর্দ্দম আয দুর্ব্বাব
ফেলে চলে আয় কাজ কারবার
জননী তোদের ডাকে বার বাব
দুঃখ বজনী ভোর॥
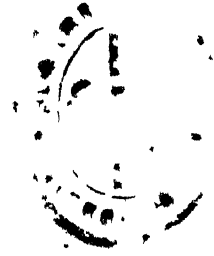
পা-দু'খানি

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টেব অপ্রকাশিত
উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত]

ক্ষুদিরাম গাঙ্গুলী, ওরফে ক্ষুদু মোক্তারের যে শুধু মোক্তারীতেই চল্‌ত না এ কথা সবাই জানে। হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারী হ'তে আরম্ভ করে ষষ্টি-মনসার পূজারী-গিরীও তার আয়ত্ব ছিল। সে তার মক্কেলেব মকর্দ্দমার মোক্তার, বিষয়ের আম-মোক্তার, দেহের ডাক্তাব এবং ধর্ম্মের কর্ণধার।

কিন্তু এহেন লোকেরও 'ধর্ম্ম ব্যতিক্রম' ঘটে থাকে এইটেই আশ্চর্য্য! নিতান্তই যাকে প্রতিদিন মুটেগিরী

করে খেতে হবে, যাকে মা বোন ভাই, সকলেরই অন্ন জোটাতে হবে, তার মনের মধ্যে যদি মা-লক্ষ্মীর কাঠা এবং পেঁচা অর্থাৎ অন্ন এবং অর্থ ছাড়া অন্য কিছু উঁকি মারে তাহলেই মহাবিপদ। কিন্তু মা-লক্ষ্মী ত' শুধু পেঁচার ওপরেই কাঠা হাতে করে বসে থাকেন না—তিনি কখনো কখনো পদ্মের ওপরও ত' পা দু'খানি রাখেন ? তাই একদিন তাঁকে ধ্যান করতে গিয়ে তাঁর পা দু'খানির দিকে হঠাৎ ক্ষুদুর দৃষ্টি পড়েছিল। অমনি তার কাঠের মত বুকের সেঁউতিটা সোণার কমল হয়ে ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার কপালও ভাঙ্গল—পেঁচা গেল উড়ে, কাঠা গেল ধূলায় পড়ে। অমনি তার সংসারের চারদিকে ইঁদুরের ছুটোছুটী ছুঁচোর কিচ্‌কিচি লেগে গেল।

কিন্তু এতে তার কিছুই দোষ ছিল না। সে বেচারী মা-বোনকে পুষ্‌তে হবে বলে, ভাইদের পড়াতে হবে বলে, বিয়েই করেনি। সে কুলীনের ছেলে, ইচ্ছে করলে একটা ছেড়ে পাঁচটা বিয়ে করে অনেক কুলীনের কুলরক্ষা করতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। সে মা-বোনদের সত্যি সত্যি ভালবাসত।

তার ভাগ্যদেবতার হঠাৎ এই অপরূপ পরিবর্ত্তনের কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না—এবং এ রকম ঘটনা ঘটবার আশঙ্কাও পূর্ব্বাহ্নে কিছু দেখা দেয়নি। এইটেই সবচেয়ে বিপদের কথা। নইলে প্রথম থেকে যদি আমাদের এই সাবধানী ক্ষুদিরাম মোক্তার এ রকম বিপদ ঘটবার কোনো সূচনা দেখতে পেত তা'হলে নিশ্চয়ই সে চানক্য-নীতি, অবলম্বন করে 'নখাশৃঙ্গী শস্ত্রপাণি' হতে অনেকদূরেই থাকত। সে যখন আশান্বিত মনে, ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন মনে করে লক্ষ্মীপতি নারায়ণের তুলসি কানে গুঁজে, '——' পুরের জমিদারনীর নতুন-তৈরী সহরে বাড়িতে দেউড়ীর মধ্যে কম্পিত হৃদয়ে প্রবেশ করছিল, তখন কি সে জানত যে সেই নারায়ণের লক্ষ্মীই এই বাড়ীর মধ্যেই তাঁর জন্য এমন একটা বিপদ জুটিয়ে রেখেছেন ? সে কি জানত যে তার মুরুব্বি, ভবদেব ঘোষাল এই বাড়িতে তাঁর আম্‌মোক্তারী জুটিয়ে দিয়েই তাকে এমনি বিপদে ফেলাবেন ?

সেত' মনে করেছিল যে এই লক্ষ টাকার সম্পত্তির অধিকারিণী রাঙ্গগিন্নি তাকে বড় বড় মকর্দ্দমার ভার দিয়ে দুদিনের মধ্যে হাজার দু হাজার টাকার মালিক করে দেবেন। প্রথম প্রথম ঘটেছিলও তাই। প্রথম প্রথম পরদার আড়াল হতে যে সব আজ্ঞা বেরুত, পরদার এপার ওপার হতে যে সব কাগজ পত্র হিসেব নিকেশ গমনাগমন করত, তাতে ভয় পাবার তেমন কিছুইত' ছিল না। তবু কেন এমনটা ঘটল ?

ঘটল যে কেন, তা বলতে পারিনে—কিন্তু এটা নিশ্চয় যে সাবধানী লোকের অসাবধানতার কারণ প্রথম হতেই কিছু না কিছু ঘটেছিল। নইলে আমাদের ক্ষুদু লোকটা মোক্তার হয়েও, এত হিসেবী হয়েও এত ভালমানুষ হয়ে জন্মেছিল কেন ? সে প্রথমদিনই যখন শুনলে যে পর্দ্দার আড়াল হতে একটী মধুর কোমল স্বরে কে বলছে ;—"মার আমার শরীর বড্ড খারাপ, তিনিত কিছুই দেখতে পারবেন না সবই দেখতে হবে আমাকে, আমি ছেলে-মানুষ, কিছুই তেমন বুঝিনে, আপনি দয়া করে আমায় ভাল করে, সব বুঝিয়ে দেবেন—ঘোষাল মশায় আপনার ওপরেই আমাদের নির্ভর করতে বলে দিয়েছেন"—তখনি তার মনটা এত গলে গেল কেন ? তখনি তার মনটা পর্দ্দার তলা দিয়ে কোন এক অদৃশ্য কক্ষে প্রবেশ করে একটা অদৃশ্য শব্দরূপার দৃশ্যরূপের সন্ধানে ঢুকে পড়ে-ছিল কেন ? সে যদি সম্পূর্ণ সাবধান থাকত তা হলে মুহূর্ত্তের জন্যও এ ভুল হত কি ?

কিন্তু এরকম ভুল তার এক সেকেণ্ডের জন্যই ঘটে-ছিল—বাস্তববাদী ক্ষুদিরাম এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সাবধান হয়ে বলেছিল, "আমায় বিশ্বাস করুন, আমি কখনো আপনার অবিশ্বাসের কাজ করব না। আপনারা যদি আমার ওপরে নির্ভর করেন তা হলে কখনো তার জন্যে অনুশোচনা করতে হবে না। আপনারা—"

তার কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই ভেতর হতে উত্তর হল, "বাঁচলাম,—আমার বড্ড ভয় ছিল। কিন্তু আপনার কথায় আশ্বস্ত হলাম। আপনি যদি আমাদের স্বার্থ নিজের স্বার্থ মনে করে কাজ করেন, তা'হলে আমাদেরও মঙ্গল—

আর—" মধুর স্বরটী ঐ পর্য্যন্ত এগিয়েই থেমে গেল কিন্তু ক্ষুদিরামের মনটী আরও অনেক দূর এগিয়ে, আরও যে কতকি ভেবে নিলে তার ঠিক কি?

"—" পুর এষ্টেটের মস্ত একটা মকর্দ্দমা তখনই ক্ষুদিরামের হাতে এসে পড়েছিল। এবং তাকে সেই সূত্রে প্রায়ই, ঐ এষ্টেটের গঙ্গাবাসের জন্য তৈরী, সহরে বাড়িতে যাতায়াত করতে হচ্ছিল। এবং ঐ সূত্রেই সে ঐ মসলিনের পর্দ্দার এপার হতে অনেক কাগজ পত্র অনেক উপদেশ ও নিবেদন পর্দ্দার ওপারে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছিল। কিন্তু এই সব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যের মধ্যে তার চোখদুটী একদিন অত্যন্ত অসাবধানতায় পর্দ্দার তলদেশ দিয়া দু'খানি পদ্মফুলের মত চরণের ওপর আটকে গিয়ে সেইখানেই মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরের মত কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তা সে জানতেই পারেনি। সে মুখে উত্তর দিচ্ছিল, মনও তার মকর্দ্দমার ব্যাপারে বেশ সতেজে কাজ করে যাচ্ছিল, কিন্তু তার চোখ দুটো যে কখন এমন ভাবে একখানা সরুকালো পাড়ে ঘেরা রাঙ্গা পা-দু'খানির আঙ্গুলের উপর আস্তে আস্তে নড়ছিল তা সে টের পায়নি। অবশ্য সেই রাঙ্গা পায়ের মালিক বেচারীও টের পায়নি, কারণ, চোখের দৃষ্টির স্পর্শত' দেহ দিয়ে তেমন টের পাওয়া যায় না। কিন্তু সেইদিন হতে এমনি হল যে তার মন তার কথাবার্ত্তা তার হাত পা যতই প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাক, হতভাগা চোখ দুটো পর্দ্দার তলদেশ দিয়ে শ্বেতপাথরের মেজের উপর কি যে খুঁজে মরত তা কে জানে। তার চোখে যে কোন রাঙ্গা-কমলের রঙের দাগ লেগে গিয়েছিল তার খোঁজ কে দিতে পারে?

কিন্তু চোখ যখন তার বিশ্বাসঘাতকতা করছিল, মুখ সে সময় যথাসাধ্য বিশ্বাসীর মতই কার্য্য করে যাচ্ছিল। তবে কাগজ পত্র দেবার নেবার সময় হাতটা যদি একটু তার কেঁপে থাকে সেটাতে কি কিছু দোষ ঘটেছিল? কিছু না। কিন্তু একদিন তার গলাটাও বেসুরো হয়ে কি একটা কথা বলে ফেল্লে আর অমনি ভেতর হতে উত্তর এল, "কি হয়েছে মোক্তার বাবু? অসুখ করেনি ত?"

স্বরের মধ্যে এত করুণা থাকতে পারে তা কি কেউ জানে? আবার করুনায় যে এত আঘাত করে তাকি কেউ বিশ্বাস করবে?

ক্ষুদিরাম তাড়াতাড়ি গলা ঝাড়িয়া বলিল—"না—না অসুখ করেনি ত'। আপনি সইগুলো করিয়ে এনে দিন—মাকে বলবেন—"

"কি বলব?"

তাই ত' কি বলতে হবে?—মোক্তারের সবই গুলিয়ে যেতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লে, "আজ্ঞে, কাল গোবিন্দ দ্বাদশী—আমরা গরীব ব্রাহ্মণ খেতে পেলেই খুসী।"

ভিতর হতে সামান্য রকম একটা মধুর হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। উত্তরও এল—"তাইত, আপনাকে একদিনও জল খাওয়ান হয়নি ত'। কাল আমাদের দ্বাদশীর-পারনে আপনার নেমন্তন্ন রইল। ভুলবেন না, এখান থেকেই কাছারী করবেন।"

ধাঃ, কি করতে কি হয়ে গেল! কি বলবার তার ইচ্ছে ছিল, আর কি কথা সে বলে ফেল্লে! যাক আর উপায় ত' নেই—নিজেই যেচে নেমন্তন্ন নিয়েছে; এখন উপায়? সে কুলীন—নিষ্ঠাবান বামুনের ছেলে, কায়েতের বাড়ি জলগ্রহণ সে করবে কি করে?—সে যে বংশজের বাড়িই পাত পাড়তে পাঁচ টাকা মর্য্যাদা নেয়। একাজ সে করবে কেমন করে?

কিন্তু পেটে খেলে পিঠে সয়—অর্থাৎ যেখানে তার অন্নজল, সেখানে যদি টাকাই নিতে পারে ত' সত্যিকার অন্নই বা নেবেনা কেন? ভবদেব ঘোষালও সেই রকম বুঝিয়ে দিলেন। সেও সেই রকম বুঝতে বাধ্য হল, এবং দ্বাদশীর দিন চোব্য-চোষ্য-লেহ্যপেয় সব রকমে উদরপূর্ত্তি এবং অদৃশ্য একটী করুণাময়ীর নানা রকমের আদর আপ্যায়ণ হজম করে সে কাছারী চলে গেল।

কিন্তু আদর জিনিষটা সব সময় যে খুবই ভাল জিনিষ তা বলা যায় না—যে পায় তার পক্ষেও না—যে করে তার পক্ষেও না। এক্ষেত্রেও তাই হল, মাঝে মাঝে শব্দভেদী আদর ছুড়তে ছুড়তে একদিন রায়গিন্নি স্বয়ং সম্মুখে এসে আমাদের ক্ষুদিরামের অনেক গুণগ্রাম এবং সুখ্যাতির সঙ্গে

লুচী কচুরী খাইয়ে তার বাড়ীর সব অবস্থা জেনে নিলেন। তাঁর মাতৃহৃদয় সহজেই এই কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্রাহ্মণকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্নেহে ভরে উঠল।

কিন্তু তাঁর পিছনে দরজার ওপারে যে কোমল চরণ দু'খানি এসে, পেমে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছিল সে চরণ দু'খানি দরজার বাইরে আর এল না। তবু সেই পা দু'খানি যে খুব কাছে এসে থেমে গিয়েছিল এই কথাটাই আমাদের মোক্তার মশায়ের ডাইরীর মধ্যে দলিলের তাড়ার সঙ্গে মকর্দ্দমার তারিখের সঙ্গে এমন ঢুকে গিয়েছিল, যে সে ডাইরী সে ছাড়া আর কারো চোখে পাতে না পড়ে আমাদের ক্ষুদ্র গাঙ্গুলীর সেদিকে খুব সাবধানতা ছিল।

কিন্তু তাই বলে, তার কর্ত্তব্যের অবহেলা ছিল না—এমন কি ঐ চরণ দু'খানি তার মনের ঢেঁকির উপর ক্রমাগত উঠে পড়ে তার মনহতে অসম্ভব কাজ আদায় করে নিচ্ছিল। বলতে কি, ভবদেব ঘোষাল একদিন আশ্বাস দিয়ে ফেলেছিলেন যে হয়ত, তার ভাগ্যে মোক্তারী কাজ ছেড়ে মফঃস্বল দেওয়ানীর কাজ হওয়াটা শীঘ্রই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

এমন সময় কু-লোকের কু-নজর পড়ে গেল। পড়বারই কথা। কারণ যেখানে অকারণ পর্দ্দার আড়ালের গোপনতা, সেইখানেই সন্দেহ সেইখানেই ভয়। এতবড় এষ্টেটের অধিকারিণী মাত্র দুইটী বিধবা স্ত্রীলোক যাঁদের একবেলা দু'মুঠো আলোচালে চলবার কথা—তাঁদের শত্রুও ঢের। সমাজ তাঁদের ওপর ত' কড়া নজর রেখেইছে উপরন্তু জ্ঞাতি শত্রুর অভাব নেই। যখন এই দুইটী স্ত্রীলোক এই বুদ্ধিমান যুবক আর পাকা বুদ্ধিমান দেওয়ান ভবদেব ঘোষালের সাহায্যে বিষয়টাকে বেশ সুবন্দোবস্তের মধ্যে এনে ফেললেন, তখন চতুর্দ্দিকে সোরগোল পড়ে গেল। "——"পুর হতে নানা গুজব উঠে সহরের নানা স্থান অস্থান এমন কি মোক্তার-লাইব্রেরী পর্য্যন্ত একটা বিশ্রী সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠল। অমনি সমাজ এবং ধর্ম্ম দুই মাথানাড়া দিয়ে উঠলেন। আমাদের ক্ষুদ্র মোক্তার প্রমাদ গণল।

তার প্রমাদগণবার কারণ যে কেবল বাইরের হাসি বিদ্রূপ টিটকারী মাত্র ছিল তা নয়, তার বাড়িতেই তার মা বোনরা পর্য্যন্ত এমন ভাব অবলম্বন করেছিল যে তাতে ঘরে বাইরে উভয়তঃই সে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল; তবু সে এসব কিছু গ্রাহ্য না করে থাকতে পারত, কিন্তু তার মনও যেন সময় সময় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে বলে দিত, "কাজ নেই তোমার এ ঝঞ্ঝাটে, "——"পুরের কাজ ছেড়ে দাও।" কিন্তু তবু সেত' তা পারলে না।

কেন পারলে না তাও বলি—ভবদেব সবকথা শুনে বল্লেন, "ভয় কি বাবা, তুমি যদি ধর্ম্মপথে থাক, তা হলে ধর্ম্মই তোমায় রক্ষা করবেন। তোমায় যখন কর্ত্ত্রীরা অবিশ্বাস করছেন না, তখন বাইরের দুটো গুজব শুনে, ঠাট্টা শুনে এ কাজ ছেড়ে দিলে চলবে কেন? তোমার ওপর ওঁদের অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে,—এখন হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে ওঁরা কি বলবেন? কি কারণ তুমি দেখাতে পারবে?"

ক্ষুদ্র, এই কথাগুলো অনেক রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবলে, কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পেলে না। এমন সময় একদিন, অন্দর হতে ডাক এল। সেও কেমন ভয়ে ভয়ে বৈঠকখানার ভেতরে প্রবেশ করে অন্দরের পর্দ্দার কাছে যে চেয়ারখানা তার জন্য পাতা থাকত তাতেই গিয়ে বসল। মনকে খুব করে বুঝিয়েই এসেছিল যে আজ যেন সে তাকে দূষী না করতে পারে। কিন্তু এমন সময় সেই পর্দ্দাটা নড়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দার অত্যন্ত নিকটে, এমন কি ঠিক তলাতেই সেই দারুণ দু'খানি পদ্মফুলের মত পা। অমনি তার বুক কেঁপে উঠল, অমনি তার সমস্ত মনটা রুণ্ রুণ্ ঝুন্ ঝুন্ করে বেজে উঠল। অশ্রুত একটা কনক নূপুরের শব্দে তার অন্তরাকাশ ভরে উঠল—সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। অমনি ভিতর হতে শব্দ হল 'উঠছেন কেন? বসুন না—"

ক্ষুদ্র মোক্তার ভয়ে কেঁপে বসে পড়ল—আজ ভিতরকার আওয়াজটা কেমন যেন একটা বেসুরো বল্লে।

ভিতর হতে আবার কথা বেরুল "দেখুন একটা বিশেষ কথা বলতে আপনাকে ডেকিছি। বলতে একটু লজ্জা

করছে, কিন্তু না বল্লেও নয়।"

"বলুন।"

"কথাটা এই, একটা বিশ্রী কথা শত্রুরা রটিয়ে আপনার এবং সেই সঙ্গে আমাদের অনিষ্ট করবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু তার বিষয় কিছু করবার আগে জানতে চাই, আপনার কি এ বিষয় কিছু বলবার আছে?"

"আমার? আমার কি বলবার থাকবে?"

"কিছু নেই?"

"কৈ কিছুই ত' দেখতে পাচ্ছিনে।"

"তা হলে আরও একটু বুঝিয়ে বলি, যে কথা চারদিকে রটেছে, আমাদের জ্ঞাতিরা যা নিয়ে আমাদের এত শত্রুতা করবার চেষ্টা করছেন, সে কথার কারণ কি কেবল কু-লোকের কু-মনে জন্মেছে—না তার কারণ অন্য কোথাও থাকতে পারে?"

"তা ছাড়া আর কোথায় থাকতে পারে?"

"কোথাও না? এ রকম কথা রটবার কারণ অনেক সময় আমাদের নিজের অসাবধানতা থেকেও ঘটে—আপনি নিজে বেশ স্মরণ করে দেখুন, কোন মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় কি আপনি নিজের ব্যবহারে, কি কোনো কথার ভুল করে এই অন্যায় গুজব রটবার কারণ ঘটান নি?"

ক্ষুদ্র মোক্তার ঘেমে অস্থির—কিন্তু ক্রমশঃ তার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠল। সে কিছুকাল নীরবে থেকে শেষে গম্ভীর মুখে বলল, "আমি জ্ঞানতঃ কখনো অসাবধান হইনি—বিশেষতঃ অসাবধান হবার কোনো কারণ কখনো ঘটেনি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যখন আপনাদের এরকম সন্দেহ জন্মেছে, তখন আর এ চাকরী করা আমার চলবে না। আমি আজ হতে অবসর নিলাম। দয়া করে কাউকে পাঠিয়ে, কিম্বা অন্য যে কোনো উপায়ে হোক আমার কাছ থেকে সমস্ত হিসেবটা বুঝে নিলে চির-অনুগৃহীত হব।"

ক্ষুদিরাম উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ভিতর হতে আবার অনুরোধ এল, "কিন্তু যদি বলি, যে আমরা আপনাকে সন্দেহ করিনি, তবু কি আপনি আমাদের কাজ আর করবেন না।"

ক্ষুদিরাম নত বদনে বলল, "না আর তা হয় না, আমি আর এ কাজে থাকলে কারুরই মঙ্গল নেই।"

"মঙ্গল আছে কি না আছে, আপনি কি করে বুঝলেন? যে প্রশ্নটা করে ছিলাম সেটা আমার নিজের নয়, সেটা আমার মা'র! তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু তাঁর কথায় আপনি হয়ত বেশী আঘাত পেতেন, তাই আমাকেই প্রশ্ন করতে হল। আমি নিজে আপনাকে একটুও অবিশ্বাস করিনি। আমি একবারও ভাবিনি যে আপনি হতে এরকম কথা উঠবার কারণ ঘটতে পারে। ভবদেব কাকাও তাই বুঝিয়ে ছিলেন, তবু মা তা মানতে চান নি। কিন্তু আপনি যদি এই রকম সামান্য একটা কথায় এতটা রাগ করেন তাহলে—"

"না—না রাগ নয়। আপনি বুঝে দেখুন, যখন একবার ঐ রকম একটা সন্দেহ যার মনে উঠেছে তখন আর আমার কি এ কাজে থাকা উচিত? যেখানে শুধু বিশ্বাস নিয়েই কারবার সেখানে একবার সেই বিশ্বাসের একটু নড়চড় হলেই প্রথম থেকেই সাবধান হতে হবে নইলে শেষে মনস্তাপ পেতে হবে।"

"মনস্তাপ? কার মনস্তাপ?"

"মনে করুন আমারই।"

"আপনার মনস্তাপের কারণ আপনি না ঘটালে আর কেউ ঘটাবে না—আমাদের পক্ষ হতে তা ঘটবে না এটা নিশ্চিত।"

"জগতে কিছুই নিশ্চিত নয়। আর আপনি অনুরোধ করবেন না—আমায় একাজ ছাড়তেই হবে।"

"অর্থাৎ এ হতে বুঝতে হবে যে আপনিও একাজ ছাড়বার একটা অছিলা খুঁজছিলেন। আমার প্রশ্নটা হয়ে আপনি এখন সরে দাঁড়াতে চাচ্ছেন? কিন্তু—"

পরদার উভয় দিকই ক্ষণকালের জন্য নীরব ছিল। হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে ক্ষুদিরাম বলল, "আমি ঠিক সরে না দাঁড়াতেও পারি,—কিন্তু আর এমন ভাবে এখানে এসে কাজ করব না। আপনাদের যা আদেশ হবে আপনারা আমায় জানাবেন আমি প্রাণপণে তা করব। আপনাদের দয়া আমি কখনো ভুলব না—কিন্তু যখন কথা একবার উঠেছে তখন আমার মত সামান্য লোকের আর এর মধ্যে

থাকা বিপদজনক হবে। আপনি মাকে আমার সব কথা নিবেদন করবেন।"

ক্ষুদিরাম ত' "কমলি"কে ছাড়লে কিন্তু "কমলি" যদি না ছাড়ে ত' সে কি করিবে? সে কাজ ছাড়ল, কিন্তু "—" এষ্টেটের কাজ তাকে ছাড়ল না। এমন কি তার ক্রোধ শান্তির জন্যই যেন নানা সময়ে নানা উপায়ে নানা দ্রব্যের উপহার পাঠিয়ে "—" এষ্টেটের মালিকগণ ক্ষুদিরামের সংসারের মঙ্গলকেই উৎকোচ দিতে লাগল। অন্ততঃ ক্ষুদিরামের মা সেই সমস্ত উপহারাদি ঘরে তুলতে তুলতে তাঁর কন্যার কর্ণে এই ধরনের কথাই বল্লেন—ডাইনী গুলো তাঁর বাছাকে ছাড়ে না যে!

ক্ষুদিরাম আবার যে ক্ষুদ্র মোক্তার সেই ক্ষুদ্র মোক্তারই হল। কিন্তু তার মনটা সেই শেষ দিনটাকে এমন একটা ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে মনের মধ্যে গেঁথে রাখলে, যাতে সে কেবলি মনে করতে লাগল যে কাজটা ভাল হয়নি তবু ঠিক হয়েছে। অর্থাৎ মনের মধ্যে একজন বলছে, বেশ করেছ, আর একজন বলছে, ছি অমনি করে দুঃখু দিয়ে চলে আসে? কিন্তু কাকে সে দুঃখ দিলে? কে তার এই রকম বিদায় নেওয়াতে দুঃখ পেয়েছে—তার যে ঠিক নেই? সে নিজে না আর কেউ? কে জানে কে!

তার মনের যখন এই রকম দোটানা অবস্থা তখন হঠাৎ এমন একটা খবর এল যাতে সে একেবারে ভেতরে বাইরে অস্থির হয়ে উঠল। সে সকালে উঠে নামাবলি গায়ে দিয়ে কোন এক যজমানের বাড়ি মনসা পূজো করতে যাচ্ছে, এমন সময় এক টেলিগ্রাম! সে টেলিগ্রাম খানা খুলে পড়েই ভয়ে কেমন ধারা হয়ে গেল। যেন তাকে সত্যি সত্যি মনসা দেবীর একটা চর এসে কামড়ে দিলে। টেলি-গ্রামে লেখাছিল "শীগ্‌গির চলে এস, ভবদেবকে মেরে ফেলেছে।" টেলিগ্রাম আসছে "—" পুর হতে অর্থাৎ যে এষ্টেটের সে কাজ করত তারই মালিক কন্যা লক্ষ্মীদাসী করছেন।

এখন সে কি করে? সে প্রণমত' তাড়াতাড়ি পূজোটাত সেরে এল। তারপর মাকে এসে সব কথা বল্লে। মা বল্লেন "কাজ নেই বাবা সেখানে গিয়ে।" কিন্তু তার মন যে কিছুতেই থামতে চায় না। অসহায়া দু'টী স্ত্রীলোক তার সাহায্য চাচ্ছে, আর সে চুপ করে থাকবে? তাকে বিশ্বাস করে বলেই ত' তারা তাকে ডেকেছে, তবে কেন সে চুপ করে থাকবে?

অনেক ভেবে চিন্তে সে যাওয়াই ঠিক করলে। এবং তার ক্যাম্বিসের ব্যাগে দুখানা কাপড় নিয়ে গরুর গাড়ি করে "—" পুরে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে যা শুনলে তাতে তার প্রাণ ভয়ে আর রাগে এক সঙ্গে ছোটো এবং বড় দুইই হয়ে উঠল। এবং সব চেয়ে যে কাণ্ডটা রায়গিন্নির মেয়েটী করে বসলেন, তাতেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। তিনি ওখানেও পর্দার আড়ালে এসে যা বলবার তাই বল্লেন বটে, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে একটুও আড়াল রইল না! তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বললেন "আর আপনার ঘরে থাকলে চলবে না। ভবদেব কাকা, আপনার হাতেই আমাদের সঁপে দিয়ে গিয়েছেন! আপনি যদি এখন সরে দাঁড়ান তাহ'লে বুঝব আপনি শুধু নিষ্ঠুর নন কাপুরুষ। আপনাকেই এই অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।"

কিন্তু ক্ষুদিরাম গাঙ্গুলী যে মোটে ক্ষুদ্র মোক্তার! প্রতি-শোধ নেবার মত লোক কি সে? এত বড় যুদ্ধ চালাবার মত শক্তি সৈন্য, সাহসই বা কৈ? বুদ্ধি বা কৈ?

তবু তাকে এ ভার নিতে হল। সে পুলিসের সাহায্য নিলে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করলে—সাক্ষীসপিনা জোগাড় করলে, এবং অপরাধীদের সগুষ্ঠি চালান দিয়ে মকর্দ্দমা রুজু করে দিলে।

কিন্তু এমন সময় যখন চারিদিক সে বেশ পরিষ্কার করে এনেছে, যখন ভয় ভাবনা তার দূর হবার মত হয়েছে, ঠিক সেই সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এমন একটা বিপদ তার ঘাড়ে এসে পড়ল যে সে একেবারে সাত হাত মাটীর তলে পুঁতে গেল। সেদিন বৈকালে "—" পুরের কাছারীতে বসে সে কাগজ পত্র দেখছিল এমন সময় অন্দর হইতে তলব এল, "রাণীমা তাঁকে এখনি ডেকেছেন।"

সে তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু প্রবেশ করেই যা'কে দেখতে পেল তাতেই আবার আপাদ মস্তক

ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল। "—" এষ্টের অপর সরিক এবং অর্দ্ধেকের মালিক শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁহার হাতে একখানা চিঠি। নিকটেই "—"—রায়-গিন্নী একখানা আসনে আরক্ত চক্ষে গুম্‌ হয়ে বসে আছেন। ক্ষুদিরাম প্রবেশ করিতেই স্বরূপচন্দ্র কুটিল হাসি হেসে বল্‌লেন, "আসুন মোক্তার মশায়, একটা বড় বিশ্রী ব্যাপারে আপনাকে আমরা ডেকিছি। জ্ঞাতি জ্ঞাতিতে শত্রুতা হতে পারে, কিন্তু এমন শত্রুতা পরে ছাড়া করতে পারে না। দেখুন দেখি এ পত্রখানা কার হাতের লেখা ?"

ক্ষুদিরাম কম্পিত হস্তে পত্রখানা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। কিন্তু তার চক্ষুর দোষ ত' কোনো কালেই জন্মেনি, তার মাথা কখনো গোল হয়নি—তবে এ পত্রখানা দেখতে দেখতে তার মুখ এ রকম শাদা হয়ে গেল কেন ? তবু সে খুব জোরে আপনাকে সামলে নিয়ে বল্লে, "এ জাল—এ পত্র আমার লেখা নয়। তবে আমার লেখার মত ঠিক দেখতে ! আপনারা যখন খুন করতে পারেন তখন জাল করতে আপনাদের আটকাবে কেন ?"

"চোপ্‌ রও রাস্‌কেল ? যত বড় মুখ তত বড় কথা ! এ পত্র কোথায় পাওয়া গেছে জান ? লক্ষ্মীর ঘরে ; আর কে পেয়েছেন তা জান ? পেয়েছেন এই জ্যাঠাই মা নিজে,—আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানতাম না। মকর্দ্দমার মিটমাটের জন্য এসে তোমার এই কাণ্ডের কথা শুনে চুপ করে বসে আছি। আমার হাতের তলায় থাকলে তোমার ঐ হাড় কখানা নিয়ে তুমি এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে না। জ্যাঠাই মা, তোমার চাকরের চোক রাঙানি সইতে আমি থাকতে পারব না আমি চল্লাম। কিন্তু তুমি ভাল চাও ত' এখুনি এর উপযুক্ত শাস্তি করে বিদেয় কর। আর—"

রায়-গিন্নি ক্রোধ-রুদ্ধ-কণ্ঠে বল্লেন "আর কি ?" স্বরূপ বাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন "আর কেবল এই হতভাগাটার একার দোষেই কি এ রকম চিঠিটা বেরিয়েছে। এর অন্য পক্ষের বিষয়ে যদি তুমি সাবধান না হও ত জ্যাঠার উইলটার শেষ দিকটা স্মরণ করো।"

স্বরূপবাবু চলে গেলেন। ক্ষুদিরাম কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল। রায়-গিন্নি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন "যাও তুমি আজই এখান থেকে চলে যাও—এ চিঠি জাল হতে পারে কিন্তু কেউ সে কথা বিশ্বাস করবে না। তুমি যাও ক্ষুদিরাম—পালাও, নইলে কি হবে কে জানে ? এ কি বিপদে পড়লাম আমরা ?" ক্ষুদিরাম হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে বল্লে "ছি—ছি এমন কথা বিশ্বাস করলেন আপনি ? এ কাজ এমন কাজ আমি করব ? আর না হয় আমার কথা ছেড়ে দিন—আপনার অমন মেয়ের সম্বন্ধে যা ঐ লোকটা বলে গেল সে কথাই বা আপনি মা হয়ে শুনলেন কি করে ? উঃ এও হয়—"

ক্ষুদিরাম চুপ করে থেকে তারপর ধীরে ধীরে উঠে বের হয়ে গেল। একবার সন্ধ্যার মধ্যেই "——"পুর ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হল—কিন্তু হঠাৎ তার ভয় হয় করতে লাগল যারা এরকম কার্য্য করতে পারে তারা ত' তাকে মেরেও ফেলতে পারে ? এতক্ষণ সে দুঃখের চিন্তায় প্রাণের আশঙ্কার চিন্তা করতেই পায় নি। কিন্তু যাই তার এই রাত্রে অসহায় অবস্থায় গোজানে এই ১০।১২ ক্রোশ পথ যাবার কথা মনে হল অমনি তার প্রাণের ভয় দেখা দিলে।

কিন্তু সবই যখন ঠিক হয়েছে তখন আর দেরী করা চলে না। তাই সে কোনো রকমে কিছু নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছে এমন সময় এক অদ্ভুৎ ব্যাপার ঘটে গেল। সে যাকে কখনো দেখেনি, যার পা দু'খানি ছাড়া কোনো অঙ্গের তার সাক্ষাৎ হয়নি সেই শব্দরূপা লক্ষ্মী ব্যক্তরূপা হয়ে তার সুমুখে এসে দাঁড়াল। সে তার সামান্য লণ্ঠনের আলোতে চিনতে না পেরে বল্লে "কে ?"

"আমি লক্ষ্মী—আপনার ঐ রকম একটা অন্যায় অপবাদ ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই যাওয়া হবে না। আপনি যেতে পাবেন না।"

ক্ষুদিরাম প্রথমটা অত্যন্তই চমকে গিয়েছিল, কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে বলল "কিন্তু মা যে—"

"মার কথা ছেড়ে দিন—তিনি মেয়েমানুষ। কিন্তু আপনি পুরুষ মানুষ হয়ে যদি এই বিপদ হতে আমাকে

আর নিজেকে উদ্ধার না করে চলে যান, তা'হলে এতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে কেন এত বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত ছিলাম? না আপনার যাওয়া হবে না।"

"কিন্তু মা যে আমায় যেতে বল্লেন?"

"তিনি ভয়ে বলেছেন। আপনার ত' ভয় পেলে চলবে না। এ বিপদ হতে উদ্ধার না হয়ে উদ্ধার না করে আপনি কি করে যাবেন?"

ক্ষুদিরাম ধীরে ধীরে তার চৌকীখানায় বসে পড়ল। তারপর বল্লে "কিন্তু এ ঘটনার পর আর এখানে থাকা চলতে পারে কি?"

"পারে, নিশ্চয় পারে—আপনি যখন নির্দ্দোষ আমি যখন নির্দ্দোষী তখন কার ভয়ে পালাবেন আপনি? মা যদি না বোঝেন, সমস্ত সংসার যদি না বোঝে তবু আপনার পেছুলে চলবে না—"

"ওমা কি বেহায়া মেয়ে গো—চল রাণীমা তোমায় ডাকছেন" এই কথা বলে চন্দুরী দাসী এসে লক্ষ্মীর পাশে দাঁড়াল। লক্ষ্মী তার দিকে ফিরে বল্লে, "বেহায়া হই আর যা হই তোর কি? যা মাকে বলগে আমি আগে এই মানুষটার যাওয়া বন্ধ করব তারপর এখান থেকে নড়ব।"

চন্দুরী ভয় পেয়ে চলে গেল—কিন্তু যাবার সময়ও সে বিষ না ঢেলে যেতে পারলে না। সে বলে গেল—"বড়লোকের মাকড় মারলে ধোকড় হয়—আপনার বেলা লীলে খেলা পাপ লিখেছ গরীবের বেলা—"

ক্ষুদিরাম এইবার উঠে বল্লে "আর না এইবার যান আপনি। এ সইবার ক্ষমতা সবারি নেই—আমাকে যেতেই হবে।"

লক্ষ্মী যেন তার পথ আগলে বল্লে, "কিছুতেই নয়। এই সইতে হবে, এর সঙ্গে লড়তে হবে, নইলে কিসের আপনি পুরুষ মানুষ? কিসের আপনি ব্রাহ্মণসন্তান? কোন শক্তির আপনি গর্ব্ব করেন? তিন গাছা পৈতের? সেতো সবাই বইতে পারে? এটুকু যদি সইতে না পারেন তাহলে পূর্ব্বপুরুষের কি সব তপস্যার অহঙ্কার করেন? না আপনার কিছুতেই যাওয়া হবে না।"

ক্ষুদিরামের যাওয়া হল না। তাকে সব সহ্য করে থাকতেই হল। কিন্তু রায়গিন্নি কেঁদে কেটে অস্থির হলেন—এমন কি একদিন নাকি তিনি তাঁহার রুগ্ন শরীরেই খিড়কীর পুকুরে রাত্রি নয়টার সময় স্নান করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দাসীরা তাঁহাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে—এই রকম জনরব।

অবশেষে এক রাত্রে তিনি যখন কন্যার পায়ের গোড়ায় মাথাকুটে বল্লেন "তুই যদি ঐ বাঁদরটাকে না ছাড়বি তাহলে আমি মাথা কুটে মরব—তখন লক্ষ্মী বল্ল "আচ্ছা, ওকে বিদায় দিয়ে আসছি।"

এই কথার পর তাকে আর কেউ "——" পুরে দেখতে পায়নি। তার বালিসের নীচে হতে যে পত্র পাওয়া গিয়েছিল তা এই :—

মা,

যে আমার জন্য এত সহ্য করেও তোমার উপকার ভিন্ন অপকার চিন্তা করেনি তাকে দিয়ে সত্যি সত্যি তোমার অপকার করালাম। যিনি আমায় ত্যাগ করেন নি, তাকে আমিও ত্যাগ করতে পারলাম না। বিনাদোষে যার তোমরা এত লাঞ্ছনা করেছ, আজ তিনি অধমার ওপর দয়া করে সত্যি সত্যিই দোষ করলেন—দেখি এখন সংসার কি বলে? তুমি যা বলবে তাও জানি, তবু বলছি পারত' ক্ষমা করো। ঠিক জেনো সংসার যতই বলুক আমি কিছুতেই মানতে পারব না যে আমি অপরাধী। আর যিনি আমায় আশ্রয় দিলেন তাঁর বিষয়ে এইটুকু বলতে পারি যে অনাশ্রয়ের যদি কেউ আশ্রয় থাকে ত' তিনি তাঁকে আশ্রয় দেবেন।

ইতি—তোমার বিদ্রোহী কন্যা

লক্ষ্মী।

চিরদিনের

[শ্রীহেমলতা দেবী]

হারিয়ে গেছে
সবটুকু সুখ
তারি পিছে
ধাইনি,
বাড়িয়ে দেছে
বুক ভরা দুখ
ফেলতে তারে
চাইনি।

কথা এসে
বুকের কাছে,
ব্যথা হয়ে
জড়িয়ে আছে,
সুখের পালা
চুকিয়ে তবু
দুখের পালা
গাইনি।

দুঃখ সুখে
রাখব ধরে
গোপন বুকে
বলব শুধু
তোমায় বঁধু
সেথায় আমি
পাইনি।

সুখের টানে
দুঃখের পানে,
আসা যাওয়ায়
তুফান আনে,
সেই তুফানে
হৃদয় জানে,
আমি ভেসে
যাইনি।

সকল সহা'র
অকূল পারে
হারিয়ে যাওয়ার
অন্ধকারে
বাই যে তরী ;
ভুলেও কভু
এ পার পানে
বাইনি।

—— ——

নবীনের আহ্বান

রাত্রি এসে দিনের পারাবারে মিশেছে; যামিনীর সৌন্দর্য্যহাট ভেঙ্গে গেছে। উদয়াচলের রঙীন মেঘমালা ঊষার শিশির স্নাত তনুটিকে বেঁধে ফেলেছে। বক্র চাঁদের উজ্জ্বল দেহ আকাশ যাত্রার মাঝখানে এসে সূর্য্যরশ্মির প্রথম আঘাতে বিবশ বিরস হয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। অরুণ সারথির বিজয়ী অশ্ব আকাশ পথে ছুটে এসে দিগন্তের ভালে একটানা রক্তিম আভা ফলিয়ে দিয়েছে। রাত্রি ও দিবসের দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে নিশিথিনী নিরালা প্রহরের সকল সাথীদের সঙ্গে ক'রে রণে ভঙ্গ দেবার যোগাড় করছে। কিন্তু প্রভাতের ঐ শুকতারা মায়ের স্নেহ চোখে নীরব স্নিগ্ধ সম্মুখে চেয়ে রইল। সে এখনও গগনের নিভৃত কোণে অম্লানভাবে এই নবীন ও পুরাতনের বিপ্লব মিটি মিটি দেখছে, তার যে এখনও নিভে যাবার সময় হয়নি' কারণ সে যে তাদের বিবাহ যজ্ঞের ঋত্বিক্। ভোর বেলাকার আকাশে বিবাহের উৎসব যে তাকেই কর্তে হ'বে। তাই দেখতে দেখতে আলো-আঁধারীর মাঝখানে রাত্রি ও দিনের, পুরাতনের ও নবীনের, বিজয়ী ও বিজিতের বাসরমিলন হ'য়ে গেল. প্রভাতের কাঁপনধরা উজ্জ্বল বাতাসে বনের পাখী উৎসবের কোমল ধৈবত সুর জুড়ে দিলে। তার কুসুম শয়নের যত ফুল সব তা'দের গন্ধবার্তা বহন করে দিকে দিকে সেই মিলনের কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগল। প্রভাতের মাহেন্দ্রক্ষণে প্রাচীন ও নবীন বধূ ও বর রূপে উষার কিরণের গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে মিলিত হয়ে গেল। শুকতারা তার কাজ সারা করে যাত্রা করলে যাবার সময় সেই অকিঞ্চন রিক্ত ভিখারিণী বধূকে আবার নবীন হ'বার রঙীন সাধটি যৌতুক দিয়ে গেল। পুরাতনের হৃদয়ে নবীনের আহ্বান প্রভাতের সামগানের মধ্যে জেগে উঠল।

মায়ের সকল ইচ্ছার মধ্যেই শিশু জন্মিবার পূর্ব্বে বাস করে। মা যখন শিবপূজায় বসেন তখন তাঁর সেই দেব-চিন্তার মধ্যে শিশুর সৃষ্টি চল্‌তে থাকে; তাঁর সকল আশা সকল ভালবাসার চারিধারে তাঁর শিশুটি যেন গৃহের কোলে বসে থাকে। যখন প্রস্ফুটিত যৌবন মায়ের সমস্ত জীবনটাকে আনন্দে আত্মহারা করে দেয় তখন তার সেই অজাত সন্তান যেন বসন্তের লীলা নিয়ে তার চারিধারে ফাঁদ পেতে বসে। তেমনি নবীনের জন্ম পুরাতনের সকল বাসনার সার্থকতার মধ্যে—জীবনের যে আদর্শকে পুরাতন আপনার সকল ইচ্ছার বেগে বেগবান করেছিল, আপনার সকল স্বপ্নের জালে মোহযুক্ত করেছিল, আপনার কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলেছিল; আপনার হাজারদীপে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে নিয়ে চোখের সামনে ধরেছিল, কিন্তু নিজেকে রিক্ত ক'রে দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল, নবীন এসে সেই জীর্ণ জীবনের অফুরন্ত কাজ স্কন্ধে তুলে নেয়। নবীনের দেহ পুরাতনের কুরূপ ও সুরূপে নিজের মহিমা প্রকাশ করে। নবীনের অভিনব রূপ মনুষ্যত্বের বোঝাপড়ার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কাতর আকাঙ্ক্ষায়, চিরজীবনের সত্যবোধের নূতন আলোকে, আপনার সৌন্দর্য্যের নিত্য নব ভাবগুলি বজায় রাখে বটে, কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে ছেলের মূর্ত্তি ও প্রকৃতির যেমন একটা বিশেষ সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় তেমনি পুরাতনের রূপ গুণ নবীনের দেহ ও মনে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে থাকে।

পুরাতনের আনন্দরূপ ও শক্তিরূপ, নবীনের হাসিগান-ভরা তরল নির্ঝরের অঙ্গে অঙ্গে চলার শক্তি, অনন্তবিহারের উল্লাসে ও সৌন্দর্য্যে, সচল ও সতেজ গতির ক্রীড়াময় আদর্শে, যেন তার শেষ স্মরণচিহ্নের মত রেখে যায়। তাই কবি মাঘ মাসের ঝরাপাতার শেষ করুণ হাহাকারকে একটা নূতন জীবনের আহ্বান ব'লে মনে ক'রে পুরাতনের মহিমা-গীতি গেয়ে উঠ্‌লেন,

"জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় বারে বারে।
ডাক্ দিয়ে যায় নূতন পাতার দ্বারে দ্বারে॥"

পুরাতন নিজের জীবন ও শক্তিকে নিঃশেষিত ক'রে দিয়ে, নিজের অসীম আনন্দ ও শরীরের সুকুমার লালিত্য-টাকে বার্দ্ধক্যের কম্র ও জীর্ণ হাতে তুলে দিয়ে মৃত্যুর সাগর থেকে যেন নবীনকে অমৃতের মত মন্থন করে বাহির করে। পুরাতন নিজের শরীরের সমস্ত বীর্য্যটাকে নবীনের উদ্দেশে শেষ ক'রে দিয়ে, নিজের মৃতদেহের চারিধারে পূর্ব্বজীবনের সার রসটাকে জড়িয়ে নিয়ে প্রবালের মত স্তরে স্তরে নবীনের জীবনকে গড়ে তোলে। তাই নবীন চিরকালের জিনিষ। তাই কবি মুগ্ধ মনে প্রশ্ন করে উঠ্‌লেন,

"হে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন না তুমি চিরন্তন ?"

এই কারণেই নবীনের আহ্বান যে সৃষ্টির কোন্ আদিম বসন্তের নূতন প্রকৃতির উদয় গানে স্বচ্ছ আকাশে দিগ্‌ধূর কর্ণে বেজে উঠেছিল সেটা কল্পনা করা শক্ত। প্রকৃতির বুকে জন্মমৃত্যুর লীলা চল্‌ছে ; মানুষের সমাজে, জাতিতে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, ভাবে, আদর্শে সেই নিস্তব্ধ ধ্রুব সশক্তির খেলা চল্‌ছে ; আর বিশ্বের এই বিরাট্ অঙ্গনে নিখিল মানবকে একটা অনাদি খেলার সঙ্গী করে নিয়ে, ভক্তি ও বাৎসল্যের হাওয়ার মাঝে, আশীর্ব্বাদের আলোক অঙ্গে মেখে সেই ব্রজের গোপাল যে নিত্যলীলায় সৃষ্টিকে জাগিয়ে রেখেছেন সেই অনন্ত খেলার মাঝেও পরিবর্ত্তন চলেছে। সেই চিরনবীন খেলা যেন প্রকৃতির নিত্যনব মোহন বধূবেশেরই মত —যে বসনের অভিনবত্ব ও পরিবার ভঙ্গী কখনও পুরান হ'তে চায় না।

জীবের চৈতন্যে ও জীবনপ্রকাশের মধ্যে পরিবর্ত্তন শরতের রৌদ্র ছায়ার মতই ঘন ঘন আসে ও যায় এটা স্বীকার করি, কিন্তু মানুষ যে সান্ত ও সীমাবদ্ধ, জীব যে সীমারেখার ভিতরেই নবীনের কসরৎ ক'রে—তার বাহিরের আলোক ও আনন্দের পথ যে বন্ধ। তাই এক জীবনের সমষ্টিগত সত্যের বিকাশ ত্যাগ ক'রে তাকে একটা নূতন প্রকাশিত type এর নামে সেটা দান-পত্র লিখে যেতে হয়। এটাই হচ্ছে মৃত্যু ও ধ্বংসের সার্থকতা, এটাই হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ম, এটাই হচ্ছে ক্রমবিকাশ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূলমন্ত্র। পুরাতন যে বার্দ্ধক্যের গতিহীন আনন্দহীন আরামে বিশ্বকে ভোগ কর্ব্বে ভগবানের সে সহ্য নাই। পুরাতনকে বিশ্বের যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে যেতেই হবে ; কারণ তার জীবনের হব্য হ'তেই সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে নবীন জ্যোতির্ময় পুরুষের মত দিব্যের আলোকে ফুটে উঠবে। সৃষ্টির বিকাশ যে আনন্দের অবাধ গতির মধ্যে। সৃষ্টি যে যৌবনের সচলতায় চল্‌ছে, তাই বার্দ্ধক্যের নিশ্চলতা বিধাতা সহ্য কর্ত্তে পারেন না। তাই Tennyson পুরাতনের অক্ষমতা ও নবীনের আহ্বান এই দুটো যাচাই ক'রে আনন্দে গেয়ে উঠ্‌লেন,

"Ring out the old, ring in the new
Ring out the false, ring in the true"

তিনি পুরাতনের শোকে মুহ্যমান হ'য়েও বুঝেছিলেন যে সমস্ত বিশ্বটা নবীনের আহ্বানে নবীনের সোপান বয়ে একটা অনির্দ্দেশ্য পথে অভিসার যাত্রা কর্চ্ছে ; তার মধ্যে প্রকৃতিও কোন্ নবীন পুরুষের উদ্দেশে সেই "রাধারূপ অপরা"র মত ঘন অন্ধকার রাত্রিতে যেন অভিসারিকার মত চলেছেন ; তারি মধ্যে একটা জীব মরে অন্য একটা উচ্চতরের জীবকে জল দিচ্ছে, একটা জাতি মরে অন্য জাতিগুলোকে তাদের আদর্শ ঠিক ক'রে নিতে বল্‌ছে যাতে ক'রে মানবতার একটা উচ্চতর সত্য পৃথিবীতে উদ্বোধিত হয়, যাতে ক'রে সমস্ত জাতি বুঝতে পারে যে নবীনের আহ্বান প্রেমের আহ্বান আকাশ-বীণার সোণার তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছে, পুরাতনের অগ্নিসংস্কার হ'য়ে গেছে, মানুষ, কুকুরশিয়ালের মত কাড়াকাড়ি কর্ব্বে জন্মে নি', জীবকে জীবন ধারণের জন্যই অন্নের যোগাড় দেখতে হ'য়, খালি উদর পূর্ত্তি কর্ব্বার জন্যেই বিধাতার এই বিশাল সৃষ্টি তার জন্যে পড়ে নেই। তাই পুরাতনের মৃত্যুতে লোকের কাতর হ'বার দরকার নেই কারণ নবীনের আহ্বান সেই শোকের চেয়ে আরো বেশী সত্য। Tennyson মৃত্যুর আনন্দ ও সত্যেরটাকে বুঝেই বলে ছিলেন,

"I wage not feud with death
For changes wrought on form and face
Eternal process moving on,
From state to state the spirit walks"

"কবি" পরিবর্ত্তনটাকে "form" ও "face" এর মধ্যেই রেখেছিলেন কারণ পুরাতনের অন্তরের জীবন নবীনের অন্তরের সম্পূর্ণ সজাগ থাকে—তাই পুরাতনের ও নবীনের মিলন সত্য—তাই কবি প্রকৃতির মধ্যে এই মহামিলনের সত্যকে উপলব্ধি করে গাইলেন,

"And East and West without a breath
Mix their dim lights like life and death
To broaden into boundless day."

জন্ম ও মৃত্যুর মিলন যেমন সত্য, রাত্রি ও প্রভাতের মিলনও তেমনি সত্য, আবার সেই মিলনের শক্তিতে যে দিবসের সৃষ্টি হ'ল সেটাও তেমনি মহাসত্য। তাই নবীনের আহ্বান যেন পুরাতনকে একটা নতুন জীবনে জাগিয়ে তোলে, তাই নবীনের আহ্বান নবীনের প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান।

এই মহাসত্যটা যেন একটা আনন্দময় নাটকের আকারে প্রকৃতির চিরনবীন রাজ্যে নিত্যই অভিনীত হচ্ছে। প্রকৃতি যে "নব যে নব নিতুই নব"। নবীনের আহ্বান যেন সেখানে সমস্ত সুন্দর রাজ্যটাকে আনন্দে সজীবতায় অবাধ গতির মধ্যে দিয়ে কি জানি কোথায় নিয়ে চলেছে। নবীনের আহ্বান শুনেই বেণুবন নবীন পবনের কাছে ব্যাকুল আকাঙ্খা জানাচ্ছে,

"নূতন পাতার পুলক ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আজ এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।"

কাননের "শুষ্ক অচল চাঁপার তরু" নবীনের আহ্বানে জেগে উঠে বলছে—

"আমার চলা নবীন পাতায়
আমার চলা ফুলের ধারা"

বসন্তের আগমনে শীত বুড়ো পালাবার উদ্যোগ কর্চ্ছে কিন্তু বসন্তের নবযৌবন বৃদ্ধকে একেবারে মর্ত্তে দিবে না তাই তারা বলছে,

"নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাবছে বুঝি?
ওসব কেড়ে নেবে উড়িয়ে দেবে
দখিন হাওয়ার পর"

পুরাতন তার সমস্ত জীবনে যে সত্যকে সঞ্চিত করেছে নবীন সেই সত্যের প্রাণকে পুরাতনের ভিতর মর্ত্তে দিতে চাচ্ছে না। শীত বুড়ো নবীনের এই অত্যাচারে দুঃখিত হ'য়ে ব'লে উঠল,

"পুরাণো শীত পাতা ঝরা
তারে এমন নূতন করা?
মাঘ মরিল ফাগুন হ'য়ে
খেয়ে ফুলের মার গো"

পুরাতন কখনও নবীনের হাতে আত্মসমর্পণ কর্ত্তে চায় না। সে হেরে যায় বটে, কিন্তু যুদ্ধ শেষে নবীনের কাছে তার ধনরত্ন দিয়ে যেতে বড় কুণ্ঠাবোধ করে। নবীন-বসন্ত যৌবনের রসিকতা ও হাসি নিয়ে বৃদ্ধের দুঃখে কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করে বল্লে,

"সবাই মিলে সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী! হায় হায় রে।
গোপন প্রাণের পাগলাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি! হায় হায় রে?"

পুরাতনের ভিতর অন্তরে যে সেই নিত্যানন্দময় চির-ক্রীড়াসক্ত পুরুষটি ব'সে আছেন তাকেই বাহির করে আনাই নবীনের আহ্বানের ফল, নবীনের যৌবনের উদ্যোগ। শেষে পুরাতনের ও নবীনের মিলন হ'য়ে গেল, তাদের মধ্যে জয় পরাজয়ের দ্বিধা আর থাকল না। তাই নবীন আনন্দে গেয়ে উঠল,

"সামনে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি।
শাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি।"

নবীনের মেলায় আজ যৌবনের দলের সামনে পুরাতনের জরা ও জীর্ণতার পরচুলা খসে গেল, পুরাতন আজ নবীনের প্রাণ ও আনন্দ নিয়ে আবার যৌবনের তরঙ্গে ঝাঁপ দিল। তাই আজ পুরাতন প্রত্যাগত যৌবনের গানটি গেয়ে বসন্ত-বিপিন উচ্ছ্বসিত কর্ত্তে লাগল—

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম
বারে বারে
ভেবে ছিলাম ফিরব না রে
এইতো আবার নবীন বেশে
এলাম তোমার হৃদয় দ্বারে।"

আজ যে শীত বুড়োর বার্দ্ধক্য যৌবনে ফুটে উঠ্‌ল তার আনন্দ ও গতিতে একটা গভীর সুষমা রয়েছে। তাই 'ফাল্গুনী'র 'কবিশেখর' বলছেন "প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হ'য়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা দেখ্‌তে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।" পুরাতন তাই আজ বসন্তবনের আনন্দ পবনে ভেসে তার সাথিদের কাছে আবার যেন চেনা পরিচয় ক'রে বেড়াচ্ছে,

"কেগো তুমি?—আমি বকুল
কেগো তুমি? আমি পারুল
তোমরা কেবা? আমরা আমের মুকুল গো
এলাম এবার আলোর পারে।
তুমি কে গো? আমি শিমুল
তুমি কে গো? কামিনী ফুল;
তোমরা কেবা?—আমরা নবীন পাতা গো।"

পুরাতন আজ নবীনের আহ্বানে আবার তারি যৌবনের দলে দেখা দিয়েছে। নবীন পাতা নবীন ফুল তাই মরণের পরে আবার নবীন হয়ে ফুটে উঠ্‌বার আশায় পুলকিত হচ্ছে; আজ তারা দেখ্‌তে পেলে যে তারা অজর, অমর, অক্ষয়—উর্ব্বশীর চিরযৌবন যে তাদেরই। এইজন্য আজ বনে বনে অমরতার গান গভীর সুরে বেজে উঠ্‌ল,

"এবার যখন ঝরব মোরা,
ধরার বুকে—
ঝরব তখন হাসিমুখে।
অফুরানের আঁচল ভরে
মরব মোরা প্রাণের সুখে।"

নবীন আশায় বসন্তযৌবন মনে মনে ভবিষ্যৎ আনন্দের কল্পনা কর্ত্তে লাগ্‌ল। আজ পুরাতনের নবীন বেশ দেখে তাদের আনন্দ শতধারে বয়ে যেতে লাগ্‌ল। বনদেবীর দ্বারে দ্বারে গান উঠ্‌ল,

"এই কথাটাই ছিলাম ভুলে
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে
অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া
বুকের মাতন টুট্‌বে বাঁধন যৌবনেরি কূলে কূলে।"

প্রকৃতি এই রকম ক'রে তার আনন্দ ও জীবনকে প্রতিনিয়ত নবীনতার মধ্যে ভোগ কর্চ্ছেন; তাই তিনি চিরসত্য, চিরানন্দময়; তাঁর দেহে পরিবর্ত্তন আছে, নবীনের নূতন পরিচ্ছদ আছে কিন্তু মৃত্যু নেই, কারণ তিনি সদাই সচল, তাঁর অনন্ত জীবনের মধ্যে দিয়ে একটানা আনন্দের ধারা বয়ে চলেছে, সে ধারা কখনও মৃত্যুর মরুভূমিতে নিজেকে শুষ্ক রিক্ত ক'রে দেয়নি। মানুষের সমাজে ও ধর্ম্মে এই মহাসত্যটী চিরকাল নিজেকে ব্যক্ত ক'রে আস্‌ছে।

পৃথিবীর যে বয়স কত হ'ল তার ঠিকানা নেই—কিন্তু তবু সে চিরনবীন—কারণ অনবরত চলার মধ্যেই যে তার জীবনের সত্য লুকিয়ে রয়েছে, আনন্দের আবেগই তার সব পাকাচুল কাল ক'রে দিয়েছে, তার প্রৌঢ় জীবনের হর্ষ ও আনন্দ পরিবর্ত্তনের গভীর রহস্যের কাছে তাকে ধীর-মন্থরে নিয়ে যাচ্ছে, যতই পথ বাড়ছে, চলার সত্য আর রহস্যের আনন্দ তার কাছে আরও নিবিড় হয়ে তা'কে অনন্তের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। "ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলিথালি আঁকড়ে বসে থাকিসনে—বেড়িয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল"—এটাই হচ্ছে নবীনের আহ্বান। বসে থাকাতে আনন্দ নেই, পুরাতনকে বক্ষ দিয়ে ঘিরে, প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে অন্ধকারের কোণে বসে থাকাতে মানুষ নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার, জড় হ'য়ে বসে থাক্‌তে পারে। কিন্তু তাতে আনন্দ নেই, প্রাণ নেই,—সে জীবন সত্যের আলোকে পদ্মের মত কখনও ফুটে উঠ্‌বে না। নবীন সমস্ত দুদিকে অগ্রসর হতে ডাক দেয়, কারণ নবীনই

দৃষ্টিটাকে সত্যের আলোকে পঁহুছে দেয়, প্রকাশ ও চৈতন্তের নব নব রূপকে তার চক্ষের সামনে একটী চিত্রপটের মত বিস্তার ক'রে দেয়। মধু বৃন্দাবনের ব্রজনারীগণ সেই নিত্যনব শ্যামের বাঁশীর ডাকে পুলকিত হ'য়ে পুরাতনের সকল আকর্ষণ সকল নিন্দা, সকল লাঞ্ছনা পিছনে রেখে সেই নবীনের অভিমুখে উধাও হ'য়ে ছুটত বলে—তাদের সেই প্রেম সত্য, সেই পাগল-করা প্রেমের সকল লীলাও সত্য। শ্রীরাধা যে তাঁর কুল হারিয়ে সকল অপবাদ, যমুনার জলে বিসর্জ্জন দিয়ে নবীনের অভিসার কুঞ্জের কথা মনে করে বলতেন,

"যাতে হুঁ মেরি পিয়ারা কুঞ্জে
চাঁদনী ঘুম রাতে কানাইয়া আওবে॥"

সেই প্রাণের আবেগ সেটাও চিরসত্য ও চিরপবিত্র, কারণ নবীনের মধ্যে যে সত্যের আহ্বান তাঁকে ডেকে নিয়ে চলেছে সে সত্যকে এড়াতে গেলে যে জীবনকে বঞ্চনা করা হয়, মানুষের দেবতাপ্রকৃতিকে অমান্য করা হয়। মানুষকে চলার লীলায় সব সুখ দুঃখ ভাসিয়ে নিয়ে চলতে হবে, কারণ পথে চলাটাই সত্য, স্থানু হ'য়ে বসে থাকলে তো চলবে না। কর্ত্তব্য খুব বড় জিনিস তা' মানি, কিন্তু কর্ত্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষ মালা যা'রা জপছে তা'দের সেই আবৃত্তিটা কেবল ঘূর্ণেঘোরা চাকার মত পথের সঙ্গে তা'র পরিচয়ও নেই সম্পর্কও নেই। পুরাতনের এই আবৃত্তির মধ্যেই অসত্য মাকড়সার জালের মত নিজের মিথ্যা জাল বিস্তার করে। তাই নবীনের অগ্রসর হওয়ার আহ্বান শুনে মানুষ যে গেয়ে উঠে,

"পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়,
আমার ঘরে থাকাই দায়।"

সেটা মানুষের প্রাণের উত্তর কারণ তার পথ যে অনন্তের অবাধ গতির মধ্যে। আনন্দই, যে সে পথের আলো, খেলাই যে সে পথের বাতাস। সেই ধ্রুব-জ্যোতিকে আমরা চলার লীলাতেই পাব, আনন্দের আবেগে পাব, খেলার উল্লাসে পাব, গানের ঝঙ্কারে পাব। সেই ব্রজের গোপাল যে লীলাই ভালবাসেন; চলার মধ্যে যে চলার আবেগ আছে সেই আবেগটাই যে তাঁর কাছে ভক্তের নৈবেদ্য, ভক্তের ফুলচন্দন; তিনি যে বাঁশীর কোমল মূর্চ্ছনায় চিত্তটাকে একটী সঙ্গীতের জীবন দিয়েছেন। একটী বিশ্বব্যাপী খেলার ইচ্ছাস্রোতে যে, জগতে সব সৃষ্টি মানস-সরোবর বক্ষে ফুল্লশতদলের মত আনন্দে জেগে উঠ্ছে। নবীনের আহ্বান তাই খেলার ডাক্ দেয়; তাই না কবি গাইলেন,

"খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেছে ফুল
খেল্‌তে খেল্‌তে ফলবে ফলে॥
খেলারি ঢেউ জলে স্থলে।"

নবীনের এই খেলার আহ্বান যে মধু বৃন্দাবনের ছায়া ঘন কুঞ্জে কুঞ্জে যাবার জন্যে আমাদের ডাক্‌ছে, আমাদের গান গেয়ে গেয়ে সুখ দুঃখের হাহাকারকে একতারার ঝঙ্কারে ডুবিয়ে দিয়ে, গানের মুখরতার মধ্যে নিবিষ্ট করে দিয়ে অমৃতলোকের পথে চল্‌তে হবে।

আজ পৃথিবীময় যে প্রলয়ের মহাগ্নি জ্বলে উঠেছে সেই অগ্নির দীপ্তিতে রুদ্রের মূর্ত্তি বেশ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই পবিত্র আহুতির মধ্যে জগতের পুঞ্জীভূত পাপ ভস্মসাৎ হচ্ছে; সভ্যতার ব্যভিচার ও পশুত্ব ভাব রুদ্রের কশাঘাতে শান্ত হবে। জগতে আজ নূতন যুগের অভ্যুদয় দেখা দিচ্ছে। শান্তির দূত আজ ভারতের কাণে নবীনের অগ্রসর হওয়ার আহ্বান শোনাচ্ছে।

কোন জাতিকে আত্মরক্ষার জন্যই পুরাতনের চারিধারে নিজের জীবনসূত্রগুলিকে রাখ্‌তে হয় কিন্তু জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে বিশ্বমানবতার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নবীনকে আশ্রয় না করলে চলে না। তাই পুরাতন ও নবীন উভয়দিকেই আমাদের দৃষ্টি থাকা দরকার। পুরাতন ও নবীন উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী ভাব আছে; তাদের আত্মার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ও সত্যের আদানপ্রদান আছে। তাই যখন কোন জাতি আত্মরক্ষার জন্যে সত্যের অনুসন্ধানে আত্মার যে প্রাণের সদর রাস্তা রয়েছে তারি চারিধারে ও সামনে প্রতি পদবিক্ষেপে বিশাল পাথরের প্রাচীর গেঁথে রাখে, যাতে ক'রে বাইরের বাতাস ও আলো কোন রকম প্রতিকূলতা ও সঙ্কটের আবহাওয়া না তৈরি

কর্ম্মে পারে তখন "পুরাতন" সেই জাতির বদ্ধ জীবনের জন্যে হয়তো অশ্রু বিসর্জ্জন করে, কিন্তু আবার যখন তার সীমাবদ্ধ জীবনের বড়াই করে সে জাতি নবীনের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে তখন "পুরাতন" তার অন্ধবিমূঢ় বুদ্ধির জন্যে একটা অবজ্ঞার হাসিহাসে, কারণ পুরাতনের যে আসল নবীনের শরীরে অবস্থান্তরিত হয়েছে, তাই নবীনকে তুচ্ছ করে পুরাতনকে আঁকড়ে থাকা মৃতদেহের প্রতি বাৎসল্য—তাতে যে মিলনের কোন সৃষ্টি নেই। এই কারণে আমরা একটা অন্ধশক্তির পূজা ক'রে বেড়াই। পুরাতনের শ্মশানে যে শত শত ভূতযোনি ঝটিকার অন্ধকারে শাস্ত্রের বজ্রধ্বনি মাথায় ক'রে মনুষ্যত্বকে চিতায় চড়িয়ে দিয়ে তাণ্ডব নৃত্য কচ্চে সেই ভূতযোনিকে পূজা ক'রে ক'রে আমরাও আনন্দহীন শুষ্ক জীব হ'য়ে পড়ছি। পুরাতনের মৃতদেহ যে পূতিগন্ধপূর্ণ, তবুও আমাদের ঘ্রাণশক্তি নেই, তার চক্ষে যে আর পলক পড়ছে না, শুধু আমরা অন্ধ, "পুরাতন" যে মানুষেরই মত নবজগতে বাস করে সে কথা বুঝি না, আমরা বিচারবুদ্ধি হারাতে বসেছি। পুরাতনের লৌহবর্ম্মে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আত্ম-রক্ষা করবার দিন আর নাই—অগ্রসর হ'তে হবে, যৌবনের শক্তিকে অন্ধকারে নষ্ট হ'তে দিলে পাপ ও অধিকারের শক্তিকে অন্ধকারে নষ্ট হ'তে দিলে পাপ ও অবিচারের শাস্তিস্বরূপ আমাদের মস্তকে ভীষণ অভিশাপ বর্ষিত হবে। নবীনের আহ্বান আজ আমাদের বিশ্বমাতৃকার চরণের দিকে ডেকে নিয়ে চলেছে। বৈশাখী প্রভাতের নির্ম্মল বাতাস আজ এই বার্ত্তাবহন করে নিয়ে এসেছে—উঠ জাগ, বসে থাকলে চলবে না—অমর তোমার আত্মা বিরাট তোমার শক্তি, এ ক্ষুদ্রতা এ নগণ্যতার বেশ তোমার সাজে না—চলে চল, চলার মধ্যেই সত্য খুঁজে পাবে, চলার আনন্দে জীবন পাবে, বল পাবে—ভুল ভাবনা গ্রাহ্য কোরো না,—পড়তে পড়তেই পথ চল—বদ্ধ অবস্থায় আঁধারের কোণে নিরাময়, নির্ব্বিকার নিরঙ্কুশ হওয়ার চেয়ে মুক্ত পথে শঙ্কটের মধ্য দিয়ে, অসত্যের অন্ধকার ভেদ ক'রে, ভ্রম প্রমাদের কুহেলিকা অতিক্রম ক'রে সেই চিরনবীনের বাণীর ডাক লক্ষ্য ক'রে বেরিয়ে পড়। "ভাঙিব পাষাণ কারা, ছুটিব পাগল পারা" নবীন সন্ন্যাসীর এই গান বিপ্লবের সুরে বাঁধা কিন্তু অসত্যের অধীনতা যে আর যুগব্যাপী ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলেছে। কত যুগের অধীনতার নীরব ক্রন্দনের সাধনা ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ ক'রে আজ হঠাৎ চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই বাণী আমাদের বীজমন্ত্র ক'রে নেবার সময় আজ এসেছে। আমাদের ভাবে কর্ম্মে ধর্ম্মজীবনে ও সমাজ-জীবনে নবীনের এই সত্যের পথে আহ্বানকে, প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলতে হবে, তাহা না হ'লে হাজার স্বায়ত্বশাসন পেলেও ভারতের উদ্ধার নেই। ইউরোপের সাধনা অগ্রসর হওয়ার ভিতর নিত্য লীলায়িত হচ্ছে বলেই সেখানকার সমস্তজাতি জ্ঞানে কর্ম্মে ঐশ্বর্য্যে শক্তিতে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে কেমন শীর্ষস্থান অধিকার করেছে; তাদের জীবন নবীন, নিত্য লীলাময়—তাই তারা ধন্য।

ভারতের জাতীয়জীবন ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তাই ধর্ম্মের সত্য সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের নবীন ও সচল হ'তে হবে। অন্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে সত্য সেটা গভীর ও বিচিত্রমুখী হউক বা অগভীর ও একান্ত হউক—অবাধে একটা বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করে যুগের পর যুগ অতিবাহিত করে প্রতিনিয়ত পুরুষ হ'য়ে বয়ে চলেছে। আমাদের দেশে জাতীয় জীবনের মহা-সত্যের ধারা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে প'ড়ে পথ হারিয়েছে অথবা পুরাতনের প্রতি মোহান্ধতার শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং ক্রমে বদ্ধজালায় পরিণত হয়েছে। ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ জিনিস নয়—ধর্ম্ম অনন্তের পরিচয় দেয়। সেখানেও নবীনের আহ্বান আসে, ভগবান্ যে আমাদের জীবনের কোন ক্ষেত্রে ব'সে থাকতে দেবেন না। প্রাচীনের মৃতদেহ টেনে নিয়ে চলে অযথা পথের বোঝা বাড়িয়ে আমাদের আনন্দের জাতিকে আড়ষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। Book of Revelationএর চতুর্থ অধ্যায়ে একটি চমৎকার শ্লোক আছে—"After this I looked, and beheld, a door was opend in heaven and the first voice I heard was as it were a trumpet talking with, which said "Come up hither, I

shall shew the thing that shall be here after." এই শ্লোকে ভবিষ্যতের রত্নরাজির জন্ত মানুষকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে সেই "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্"কে আমরা পথযাত্রার "নিত্য বৈ সত্যজ্ঞানের মধ্যে" পাব কারণ তিনি যে আনন্দের অবাধ গতির মধ্যেই ধ্রুব; তাকে ত্যাগের মধ্যে পাব, পথে হারাতে হারাতেই পাব। ভক্তের পাদ্য অর্ঘ্য নৈবেদ্য সকলই পথের পুণ্যপানে উদার আলোর নিবেদন করতে হ'বে আমাদের আত্মাকে অনন্তের পথে বিকীর্ণ করে দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে, কারণ আমাদের পথ চেয়ে সাগর তীরে যে উন্মুখ দেবতাটী বিরাজ করছেন—তিনি ত অচলায়তনের অন্ধকারপিঞ্জরে বাস করেন না। সেখানে তাকে কোথায় পাব। অনন্ত নীলিমার বক্ষে ভেসে বেড়ান যার অভ্যাস, তাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করলে সে ক্লিষ্ট হয় কেন? তার কারণ সে তার মধ্যে প্রয়োজনমত আলো বাতাস পায় না তা নয়—সে অল্প পরিসর স্থানে প্রয়োজনের অধিক পায় না। তাই যতদিন সুপ্তি ঘোর আমাদের চোখের অঞ্জন ছিল ততদিন বেঁচে থাকবার প্রয়োজন পিঞ্জরের মধ্যেই সফল হয়েছে; কিন্তু আমরা অগ্রসর হ'বার জন্য মেতেছি। আর আমাদের দেশকালের সীমার মধ্যে আত্মাকে একান্ত করে লৌহ-নিগড়ে বেঁধে রাখা চলবে না? যা' আছে, সেটা পেয়েছি, সেটাই পথ যাত্রার শেষ কাম্য বস্তু নয়, আরো আছে, এগিয়ে চল—এইটাই আমাদের স্মরণ রাখতে হ'বে। অন্ধসংস্কারও শুষ্কক্রিয়ার মধ্যে নিবিষ্ট থাকলে পথের শেষের মানুষটিকে সম্পূর্ণ করে পাবনা; যেখানেই বদ্ধতা সংকীর্ণতা এসে মানুষের চলার বেগ থামিয়ে দিয়েছে সেখানেই উপর থেকে ডাক আসছে—জগতের পথপ্রদর্শক, জগতের অধিনায়ক আমাদের কখনও বসে থাকতে দেবেন না—কারণ মানুষের সচলতার মধ্যেই মানুষ্যত্ব সে মনুষ্যত্বের কুঁড়ি যতদিন না অনন্তে ফুটে উঠ্‌বে ততদিন তার চক্ষে আর বিরাম নাই—আজ এই উৎসবের দিনে ভগবানের নাম আশীর্ব্বাদ মাথায় করে কবির এই নবীনের আহ্বানটী মনে রাখতে হ'বে—

"বাঁধন যত ছিন্ন কর আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে
অকূল প্রাণের সাগরতীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয় ক্ষতির
যা' আছে আর সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।"

শিব-পরিণয় *

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি-এ]

গণেশ বন্দনা

ধেয়াব মানসে হে সিদ্ধিদাতা
তোমারে বিঘ্নহর
বিনায়ক-বলি তীর্থে তোমার
রব চাহি পথ' পর।
নাগেশ ভূষণ কিবা মণিমালা
তব গল দেশে রাজে
প্রমথ রুদ্র গণাধিপ তোমা'
স্মরিব হিয়ার মাঝে।
ইন্দ্র রাজের উপরে যখন
আরোহি' অন্ধকার
প্রভূত ক্ষমতা ব্যর্থ করিয়া
মৃত্যু আনিল তাঁর
ক্ষমাশীল তুমি গণপতি তা'রে
করেছিলে উদ্ধার।
বিশ্বোপকারী হে লম্বোদর
সংসার হ'তে করহ ত্রাণ
মহা গণপতি লম্বোদরীর
পয়োরাশি তুমি করিলে পান
যে হেতু বিষ্ণু না করিল তব
চরণে নমস্কার
সেই হেতু তুমি মথিলে জলধি
আশ্রয় গৃহ তাঁর
মহা গণপতি ওহে গজ মুখ
তব জয় জয়কার।
তুষিবারে তাই বিষ্ণু তোমারে
কহিয়া প্রিয় বচন
বহু সাধনায় হে করুণাময়
লভিল তোমার মন।
বক্র তুণ্ড আছে আছে তব
মহা বিজ্ঞান বল
ওহে ওহে দেব মহা গণপতি
হে কৃষ্ণ পিঙ্গল।
আদি শক্তির প্রথম ক্রিয়া
হে একদন্ত তুমি
বিঘ্ন হরণ মহা গণপতি
শম্ভুর স্নেহ ভূমি।
সবার অগ্রে জপে ও যজ্ঞে
স্বাহাকারে পূজা তব
ক্রমে বাঁধা তুমি বেদে ওঙ্কার
মহারূপী অভিনব।
আদি শক্তির সেবক তুমি হে
প্রিয় সুত তুমি তাঁর
চন্দ্র মুকুট তুমি গণপতি
জগতের ব্যবহার।
অরুণ বসন তব দেহ রাগে
আরো অরুণিম ময়
তব আশ্রয়ে অধিকারী পদ
লভিব সুনিশ্চয়।
মন্ত্র নায়ক হে শক্তিরূপ
প্রভু জটাজূট ধর
পূজিব তোমারে করিও রক্ষা
আমারে অতঃপর।
আছে বল্লভা স্বরূপ ধারিণী
শক্তি তোমার পাশে
চারি হাতে তব শোভিছে আয়ুধ
রাক্ষস ভূত নাশে।
বিনাশ দণ্ড পরন্তু আঘাতি
অজ্ঞান পাপ মতি

* কৃষ্ণরাজদান কৃত শিব-পরিণয় নামক কাশ্মীরি ভাষায় রচিত কাব্যের সংস্কৃত-ছায়া হইতে

ছলে ও মুষলে নাশ' দুঃখ ক্রোধ
ওহে মহা গণপতি।
যুগ্ম সিংহ— বাহন ধূম্র
হে অতি পরাক্রমী
সংসার সার নিদান তুমি হে
তোমার চরণে নমি।
ভব পাবাবার হেরি দুস্তর
গভীর তর হে অতি
ভক্তেরে তব হেথা হতে প্রভু
দাও দাও পারগতি।
ওহে মহা গণপতি ॥

সদ্‌গুরু স্তুতি

আনন্দরূপ অমৃত পিয়াও
ওহে শিবনাথ আমারে
ওহে সদ্‌গুরু দেখাও প্রকাশ
মোরে মোহতম মাঝারে।
এই যে র'য়েছে, অজ্ঞান মাঝে
কোথা খুঁজে মরি তোমারে
জ্ঞানের মার্গ ওহে সদ্‌গুরু
দেখাও দেখাও আমারে।
সংসার মায়া— জাল দিয়া মোরে
রেখেছ আবৃত করিয়া,
লভিব লভিব আমি হে মুক্তি
তোমারি করুণা স্মরিয়া,
এই দীন জনে ওহে সদ্‌গুরু
চাহ চাহ কৃপা করিয়া।
কাম ক্রোধ লোভ মোহের আঁধারে
রেখেছে আমারে ঘেরিয়া
মমতা বিতরি' মুক্ত কর গো
গুরু মোরে কৃপা করিয়া।
ওহে সন্তোষ ওহে সুবিচার
সৎসঙ্গ হে ধর্ম্ম
তোমরা আমারে গেছ পরিহরি
করেছি আমি কুকর্ম্ম

এস এস সবে সহসা আসিয়া
পরমা সে গতি দাও
ওহে সদ্‌গুরু অমৃতপ্তের
পানে কৃপা চোখে চাও।
চরিত্রবান পুরুষ যাঁহারা
বিবেকশাসিত চিত্ত
বহু সাধনায় লভেছেন তাঁরা
ঈশ্বর পদবিত্ত।
তাঁদের মাঝারে দাও দাও ঠাঁই
করুণা করিয়া আমারে
ওহে সদ্‌গুরু অকিঞ্চনের
এই নিবেদন তোমারে।
আনন্দ নামে অন্তরে আছে
মন্দির, তারি মাঝারে
আসন রচিয়া যোগরত মনে
পূজিব পূজিব তোমারে
উপনিষদের সার কথা গুরু
প্রকাশিয়া কহ আমারে।
বৃথায় বাল্য যৌবন গেল
সংসার তাপে দহিয়া
বার্দ্ধক্য আসে অদূরে হে গুরু
ওই যে লজ্জা বহিয়া।
উপদেশ সহ দেহ বুদ্ধিরে
দাও দাও নাশ করিয়া
কেহ নহে মোর আমি নহি কা'র
বুঝি তব পদ স্মরিয়া।
ব্রহ্মানন্দ মাঝারে আমারে
রাখ রাখ দৃঢ় ধরিয়া।
নির্ম্মল ধ্যান নিষ্ঠা তটিনী
যোগ জলে আছে ভরিয়া
সিনান করায়ে হে গুরু তাহাতে
দাও হে শান্তি আনিয়া।
ইন্দ্রিয় যা'রা চেতনা হরিয়া
বিষয়ে পশিল গোপনে
আমার মাঝারে একরূপ করি'
ফিরাও সবারে যতনে।

জ্ঞানের লোচন বিকাশো যতনে
পদ্মের মত মানসে
এক রূপ হ'য়ে আমাতে মিশিয়া
সাযুজ্য দেহ হরষে।
বস্তুতঃ আমি স্বচ্ছ সলিল
আছিলাম ধরা মাঝারে
তুষার কঠিন ব্যবহার বশে
করিয়াছ তুমি তাহারে
বিচার অনল তাপে আর বার
বিগলিত কর আমারে।
কৃষ্ণ আমার নাম যেই মত
হৃদয় মাঝারে আশা অবিরত
সচ্চিদাকাশ লভুক্ প্রকাশ
আমারা মাঝারে অবাধে
এ সংসারের হীনতা মাঝারে
না পড়ি তোমার প্রসাদে।

উমার প্রাদুর্ভাব

পরম শিব শরণ নিছি
তব চরণ তল
নিত্য মুখে শিবায় নম
শিবায় নম বল।
যিনি পরম আত্মা যাঁ'র
আনন্দেরি রূপ
স্বচ্ছন্দ তাঁহারি নব
নামটি অপরূপ।
জনম নিলা তাঁহা হইতে
বাহিরিয়া সে মায়া
প্রণমি তোমা' প্রণমি তোমা'
স্বচ্ছন্দ-ছায়া।
ঈশ্বরেরি ইচ্ছা বলি'
মায়ারে কর জ্ঞান
বিনির্গত যাঁহা হইতে
বিষ্ণু ভগবান্।
বিষ্ণু মায়া হইতে বিধি
জন্ম নিরুপম
শিবায় নম শিবায় নম
শিবায় নম নমঃ।
লক্ষ যুগ সহ ভুবন
চতুর্দ্দশ সংখ্য
ত্রিসংসার বিশ্ব আর
মিলায়ে এক সঙ্গ
ব্রহ্মারি সে 'বাসনা বশে
উৎপাদিত হ'ল
শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ
শিবায় নমঃ বল।
দক্ষ প্রজা পতি প্রথমে
জনমে তাঁহা হ'তে
জগদ্ব্যব- হার তাঁহারে
শিখান নানা মতে
তাঁহার বহু কন্যা পরে
জনমে নিরুপম
শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ
শিবায় নমঃ নমঃ।
তা'দের মাঝে দুহিতা এক
জনম নিল তাঁ'র
ভগবানেরি মায়া আসিয়া
পশিলা সংসার।
মাতার কোলে উমা নামেতে
জনমে নিরুপম
শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ
শিবায় নমঃ নমঃ।
তাঁহার পিতা মাতার সবে
ঘোষিল জয় জয়
যাঁদের মত ভাগ্যশালী
কদাপি কেহ নয়।
এমন সুতা জনম নিল
যাঁহার গৃহতল
শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ
শিবায় নম বল।
ব্রহ্মা ঋষি দেবতা লোক

নায়ক যেই জন
মহাধিকারী পদে তাঁহারে
করিলা নিয়োজন
সে মহামায়া করিল দয়া
যাঁহারে এঁরি সম
শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ
শিবায় নমঃ নমঃ।
গঙ্গাধর ভুবন সার
শিব ত্রিলোক নাথ
কন্যা এল তাঁহার পাশে
বিবাহ হবে সাথ।
সাতাশ সুতা রহিল বাকি
চন্দ্রে দিল বিয়া
মুহূর্ত্তেরি জ্ঞাপক যা'রা
গগনে জ্বলিয়া।
শিব শকতি রূপেতে যিনি
সবার হিতকরী
উমাশকতি অভেদরূপা;
সে পদ শিরে ধরি
ভক্তি প্রেমে সবার হিয়া
তখন উথলয়
সকলে মিলি ঘটায়ে দিল
দোঁহার পরিণয়।
দক্ষ প্রজা পতির চিত
হরষে পরিপূর
আসিল শিব তাঁহার পাশে
পবিত্রিয়া পুর।
কহিল শিব বল স্তব
কর্ণমূলে মম
শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ
শিবায় নমঃ নমঃ।
আপন সুখ দুঃখের কথা
বন্ধু জনে কহিতে হয়
আপন কথা সহচরেরে
শুনাল' শিব সদাশয়।
যেখানে যেখানে আমার বুদ্ধি
পরিসর লভিয়াছে
সেখানে সেখানে তুমি রহিয়াছ
সব ঠাঁই তাঁরি পাছে
এ দীন কৃষ্ণ রক্ষা বিধান
তোমার চরণে যাব।

সম্বন্ধীদিগের প্রতি দক্ষের উক্তি

সমাহিত মনে পরমানন্দ পাই
পেয়েছি শ্রীশিবে এমন বন্ধু নাই।
পদ্ম যেমনি সরোবরে ফুটি রয়
বাল্যানন্দ আজি মম উথলয়।
শিব হে তোমার তুষ্টি বিধান করি
সমুদিবে মম হর্ষ হৃদয় ভরি'।
এই যোগেন্দ্র শ্রীগঙ্গাধর
সুতা বরে যাঁরে স্বয়ংবরে
দধি ও পায়স তাঁহার খাওয়া
আপন হস্তে পরমাদরে।
তাঁহার মায়াতে বুদ্ধি যে হার মানে
ব্রহ্মাবিষ্ণু নাহি বুঝে খেলা তাঁর
আদি ও অন্ত কোনো জন নাহি জানে
হের শ্রীশিবের লীলা কি চমৎকার।
ধবল কান্ত দেহ কর্পূর সম
কি চারু সুষমা কেবা বর্ণিতে পারে
সে দেহ গন্ধ কিবা প্রাণ মনোরম
দিগ্‌দিগন্তে কতদূর বিস্তারে!
ব্রহ্মা তিনিই তিনিই বিষ্ণু
তাঁহারেই জেনো জগৎ পতি
যিনি অধঃ পুনঃ স্বচ্ছন্দ, সে
শ্রীশিব বিশ্বজনের গতি।
ভেদ বিরহিত ভক্তি তিনিই
তাঁর আছে শুধু শুদ্ধ জ্ঞান
প্রাণিগণ মাঝে বিরাজেন তিনি
হয়ে শাশ্বত মন পরাণ।
বাহির হবেন ঔষধিরূপে,

সে পরমশিব শাস্ত্র সার
তিনিই শাস্ত্র বেদ ও বিদ্যা
অর্ণব সব বিদ্যাধার
বিরাজেন শিব জগৎ মাঝারে
বিন্দু স্বরূপ প্রণব সার।
ভক্তি প্রেমে লক্ষবার জপে ধর্ম্মে যজ্ঞে আর
পুষ্প উপহারে
তপ করি ভক্তি ভরে তাঁহার চরণ 'পরে
সঁপ' আপনারে।
থেকোনা ফিরায়ে গ্রীবা হে কৃষ্ণ বিলম্ব নাহি কর
রত হও পূজায় তাঁহার
দেবতারে দণ্ডদণ্ড পুষ্পদণ্ড সম ধৈর্য্যধর
শিবপদে করি নমস্কার।

উমার সহিত শিবের কৈলাসে প্রস্থান

উৎসব হইয়া গেল যবে সমাপন
পরমা শক্তিরে
লভিয়া অচিরে
দক্ষরাজ লক্ষনাম করিলা ধারণ।
পদ্মসম বিকশিত হইল সংসার
কি নব ফুলন্ত
শোভন বসন্ত
সমুদিল রমণীয় ধরণী মাঝার।
স্থল কমল দলে
মিলিল কুতূহলে
অরিএ পুষ্পেরবিভা কেমন!
কুসুম কুসুমে কি
মিলন আজি দেখি
মনের সনে মনে কিবা মিলন?
ধরাতে যত ঠাঁই
নাহিক ভেদ নাই
ফুল বরণে মিলে ফুলবরণ।

শ্বশুর ঘরণীরা
মাথার দিয়া কিরা
কহিল করিবারে দ্বিরাগমন
শ্বশ্রূশ্বশুরেরি
আদেশ শিরে ধরি'
যাত্রা করিলেন শিবভবন
রুদ্র উমা দোঁহে
হৃদয়ে প্রকাশো হে
শূণ্য মন হোক তব আসন।
বিরাগী তাঁর পাশে
কি হবে চেল বাসে
স্পৃহা যে কিছুতেই নাহিক তাঁর;
অপরিমেয় তাঁর
সোনারি ভাণ্ডার
ধনের মাঝে তিনি সকল সার।
দ্রব্যেধনে তাঁ'র
কি হবে মনে যাঁ'র
আঁধার করি' লোভ নাহি দাঁড়ায়
বিষ্ণু কমলজে
প্রদানে জনমযে
পরম দেব তাঁ'র তুলা কোথায়?
বলহ তাঁ'র কাছে
ভূষণ কিবা আছে
ভোগের বস্তু বা কি আছে আর?
যাঁহার পদ ছায়া
আপনি মহামায়া
উরিলা মোহিবারে ধরা মাঝার।
পরম দেব সেই
ভুবন তিন এই
করুণা পারাবার সৃজন যাঁ'র।
জ্ঞানরূপ যে আগার
সহস্র সোপান তা'র
এ কৃষ্ণেরে বিপর্য্যয় হ'তে কর ত্রাণ
যেই ধাম ঊর্দ্ধে রাজে
লহ মোরে তা'র মাঝে
এ হোক্ পরম মম প্রথম সোপান।

দক্ষের ক্রোধ

উমা আর মহেশ্বর ত্রিভুবন সার
হৃদয় মাঝারে ধ্যান করিব দোঁহার।
কৈলাস পর্ব্বত'পরে চির কৃপাবান
উমারে করিয়া সঙ্গে যবে চলি যান
গিরিরাজ ধরে শোভা বৈকুণ্ঠের প্রায়
দোঁহার করিব ধ্যান এ মম হিয়ায়।
একদিন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন জনে
দেবগণ সহ রত বেদ আলাপনে
স্বর্গলোক মাঝে বসি ;—দক্ষ সেইক্ষণ
অভীষ্ট সিদ্ধির তরে উপস্থিত হন।
সেই ধর্ম্ম সভা মাঝে দেবতা নিকর
উঠি জয় ধ্বনি সহ কৈল সমাদর।
শিবেরে নমিল দক্ষ মোহে অচেতন
শিব নাহি কৈল কিন্তু কোনো সম্ভাষণ।
না খুলিল মহেশ্বর নিজ ওষ্ঠাধর
না নমিল দক্ষরাজে, না দিল উত্তর।
প্রথম কর্ত্তব্য ছিল নিরাকার তাঁর
শ্বশুর দক্ষের' পরে যোগ্য ব্যবহার।
শিব তাই মায়াজালে দক্ষেরে ঘেরিয়া
ঘোর মোহ মাঝারে দিলেন ডুবাইয়া।
জ্বলিল দক্ষের মুখ আগুণের প্রায়
ঠিকরিয়া জ্বালা তা'র চৌদিকে ছড়ায়।
হেরিয়া দক্ষের মুখ হেন মনে লয়
মহাকাল বুঝি এবে সাধিবে প্রলয়।
মোহমত্ত দক্ষরাজ আপনা আপনি
আপনার সনে কথা কহিলা এমনি।
অপমান কৈল শিব সভাতে আমার
এবার করিব আমি তার প্রতিকার।
অভীষ্ট ভাবনা প্রেমে হয়ে এক প্রাণ
শোভা হেতু যজ্ঞের করিব অনুষ্ঠান
অমর করিয়া যশঃ স্থাপিব আপন
নিমন্ত্রিব ব্রহ্মা বিষ্ণু সহ দেবগণ।
নাহি নিমন্ত্রিব শুধু দেব গঙ্গাধরে
এই পণ অপমান-প্রতীকার তরে।
ভবিষ্যে করিবে যা'রা যজ্ঞ আয়োজন
আর না পাইবে শিব তা'দের দর্শন।
জপ যজ্ঞ ব্যবহারে কেহ শিবে আর
আনিতে পারে না—এই প্রতিজ্ঞা আমার।
সে আমারে লজ্জা দিল, লজ্জিয়া সে জনে
তা'র পূর্ব্ব উপহাস জাগাইব মনে।
চলিলাম নিজ যজ্ঞ সমাধান তরে
এরূপ ঠাহরি যুক্তি আপন অন্তরে
করিলেন দক্ষ এক যজ্ঞ আয়োজন
দেবতা সমাজ আর কৈল নিমন্ত্রণ।
দূতগণে দিল কহি বিভূতি ভূষণ
শিব যেন যজ্ঞে নাহি পায় নিমন্ত্রণ।
ওহে কৃষ্ণ নামধেয় যখন তখন
মুখে শিব শিব নাম কর উচ্চারণ।
দেব চন্দ্র কলাধর প্রসন্ন হইয়া
অনুভব ভাবে কভু তোমারেতুষিয়া
দিবেন শরণাগতে অভয় চরণ।
করহ বদনে সদা 'শিব' উচ্চারণ।

দক্ষযজ্ঞ

আসে দক্ষ প্রজাপতির যাগে
পুষ্পপাখা লয়ে দেবতাগণ
আসিল ধাতা বিষ্ণু পুরোভাগে
ব্রহ্মলোকে গিয়াছে আবাহন।
সপ্তঋষি ছিলেন বসি যথা
বেদ পাঠে নিরত করি চিত্ত
হইলা সব দেবতা আসি তথা
পুষ্প পাখা লইয়া উপনীত।
দেবতা যত বসিয়া চারিভাগে
করিতেছিল যজ্ঞ দরশন
দক্ষ প্রজাপতি সবার আগে
কহিল শিবে করিনি আবাহন।
কৈলাসেতে বসিয়া শিব কন
জগন্মাতা ভবানী পানে চাহি'

মোদের নাহি এল নিমন্ত্রণ
কিবা যে হেতু বুঝিতে পারি নাহি ।
জগন্মাতা উত্তরেতে ক'ন
"ব্যস্ত পিতা আছেন নানা কাজে
আমরা তাঁরি আপন পরিজন
যাবেন ল'য়ে মোদেরে সব পাছে ।
মোদের কথা পড়েনি তাঁর মনে''
এমন কথা দেবী কহিলে পরে
মহেশ্বর মৌন নতাননে
রহিলা বসি বহুক্ষণ ধ'রে ।
দেবী কহিলা "বিনা নিমন্ত্রণ
পিতার গৃহে যাইব আগে আমি
গুরুর গৃহে কিসের আবাহন
আজ্ঞা তব বেদ যে মানি স্বামী ।
যাইব অমি যাইতে কিবা দোষ
পিতার গেহ নিজেরি সে যে গেহ
যে গেহে মম অশেষ পরিতোষ
যাইব প্রভু আজ্ঞা মোরে দেহ।"
আজ্ঞালয়ে শিবিকা' পরে মায়া
নন্দী সাথে আরোহিয়া শিবাণী
চলিল, তাঁর বাহক রূপ ধ'রে
শক্তি যত বহি শিবিকাখানি ।
দক্ষরাজ বাসে পঁহুছে যবে
দেখিয়া যেন দেখেনা কেহ তাঁ'রে
ভাবিলা দেবী এমনি কিরে হবে
সবাই কানা হয়েছে সংসারে।
অবাধে গিয়া যজ্ঞ সভামাঝ
দক্ষরাজে সম্বোধিয়া ক'ন
আপনি আমি আসিনু পিতা আজ
তুমিত মোরে করনি আবাহন ।
হায়রে দুঃখ মজি এ কোন্ মোহে
ভুলিলে পিতা জগৎ পতি শিবে
নিমন্ত্রণ দিলেনা আমা দোঁহে
জগতে পূজা তবে কাহারে দিবে ?
দক্ষ কহে উত্তরে তাহার
সন্ন্যাসী সে ভস্মমাখা দেহ
কপালমালা কণ্ঠে দুলে যাঁর
নিমন্ত্রন করে কি তাঁরে কেহ ?
নীলিমাময় কণ্ঠ বিষাধার
নগ্নরহে যাহার সব দেহ ?
নিমন্ত্রণে এ রাজসভা মাঝে
আনিলে সভা লজ্জিত যে হবে
মাথা যে নীচু হইবে মম লাজে
ভদ্রজনে কি কথা মোরে ক'বে ?
ভুজঙ্গেরি মাল্য দোলে গলে
শ্মশানে বাস করিছে যেই জন
ভঙ্গারসে যে আছে বিহ্বলে
তাহারে আমি করিব আবাহন ?'
গৌরীদেবী তাঁহারে কন তবে
'নিন্দা কর কাহারে তুমি পিতা
তেমন রূপ কাহার আছে ভবে
আপন নাশ আনিছ জান' কি তা' ?
দক্ষ বাণী শুনিয়া মনে সতী
দারুণ রোষে সহসা জ্বলি উঠে
রুক্ষ পদ বাক্যে জ্বালা অতি
ঘেরিয়া দেহ বাহির হয়ে ফুটে
জ্বালা রূপিণী তোমার জয় সতী
চৌদিকেতে ধন্য বাণী ছুটে।
কৃষ্ণ, জ্বালা দেবীরে পূজা কর
আপনি শুন চরিত গাহি তার
শিব ক্ষেত্রে রহি নিরন্তর
বহেন যিনি নিখিল ধরা ভার ।
সর্ব্ব নামে চিন্তা যিনি
দুঃখ তাপ হরি'
নিত্য যাঁ'র, স্তোত্র উঠে
ভক্ত মুখ ভরি
শক্তি রূপে বিশ্বে যিনি
নিত্য বিরাজি'
কৃষ্ণ তাঁর চরণ মুলে
শরণ মাগে আজি ।
চরণ তলে শরণ লয়ো
কাতরে যাচি মাগো

রক্ষা কর স্মরণে মম
নিত্য জাগো জাগো।

জ্বালারূপাদেবীর স্তোত্র

দ্বিব নাম দেশে গিয়া দ্বিব শৈল আরোহিয়া
নানা ফুল করি আহরণ
যিনি মহামায়া খনি করি তাঁর জয়ধ্বনি
পূজিব তাঁহার শ্রীচরণ।
মহা বিদ্যা স্বরূপিণী জগৎ জননী যিনি
মহামায়া শিবের প্রেয়সী
যেই দেবী বিষ্ণুজায়া সিদ্ধি যাঁর পদছায়া
মহামায়া বিশ্বের রূপসী।
কাল যবে এক ছিলা ব্রহ্মাবিষ্ণু বাহিরিলা
জ্বালা রূপ অন্বেষণ তরে
হৃদয়ে লইয়া ব্যথা ফিরিলা না পেয়ে কোথা
ম্রিয়মাণ বেদনার ভরে
সবিতা কুণ্ডলাকার কর্ণমূলে দোলে যাঁর
রক্ত বাস যাঁর পরিধানে
ইন্দ্রাক্ষী রূপিণী যিনি চন্দ্রকলা সুশোভিনী
মহামায়া রূপ কেবা জানে।
ভক্তে ধন্য করিবারে সৃজিয়া এ বসুধারে
জ্বালামুখী রূপ দেখাইলা
ত্রিভুবন চরাচর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
তাঁহা হ'তে জনম লভিলা।
শিব শক্তি স্বরূপিণী ভুজ চারি ধরি যিনি
আমা সবে করিলা পালন
প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে তাঁহার ইচ্ছার বলে
উৎপাদিত নিখিল ভুবন।
হে জননী ভগবতী নাশ' নাশ' পাপ মতি
পার্ব্বতী সতি রূপিণী তুমি
তোমার দর্শন আশে ধেয়ে এনু শৈল বাসে
সুদূর এ পুণ্যতীর্থ ভূমি।
সজ্জন পুরুষ যা'রা তব কৃপা বলে তাঁরা
লভিলেন পরমা গতিরে
করিয়া তোমার সেবা আনন্দ লভিল যেবা
সেই ধন্য হইল অচিরে।
দয়া রূপা দরশনে মুক্তি দেহ ভক্ত জনে
মহাশক্তি শুন ভক্তি বাণী
তব হৃদে স্নেহ রাজে এসেছি তোমার কাছে
ধন্য কর বিনয় প্রদানি।
আমার হৃদয় মাঝে তব দীপ্ত রূপ রাজে
অজপা রূপিণী জানি তোমা'
তাই মম দৃষ্টি আগে তব রূপ নাহি জাগে
প্রাণে তুমি অনুভূতি সমা'
এ হৃদয়ে পরকাশি নাশ মা আঁধার রাশি
ঘেরি' আছে মোরে লোভ ছায়া
আমার মিনতি ধর কৃপাময়ী রক্ষা কর
দূরিত হারিণী মহামায়া।
ব্যাপি বিশ্ব চরাচর তুমিআছ নিরন্তর
বিনাশিয়া যত নিন্দ্য কর্ম্ম
মোদের কলুষ নাশি অপহর দুঃখ রাশি
পাতকীরে দয়া তব ধর্ম্ম।
প্রজাপতি দক্ষ রাজে মহাক্রোধ যবে বাজে
দূরে রহি তোমারে না স্মরি'
আততায়ী বোধে তা'রে বীরভদ্র প্রাণে মারে
যজ্ঞভূমে দেব সভা পরে।
তুমি যে দিয়েছ স্মৃতি তা'র মাঝে আমি নিতি
ধ্যান দেবী! করিব তোমার
তুলি নানা কণ্ঠ তান গাহিব মা তব গান
ঝঙ্কারিয়া মনোবীণা তার।
যে প্রদ্যুম্নপীঠ মাঝে তোমার মূরতি রাজে
রত্নদীপ ধূপ ঘুরাইয়া
আরতি করিব তব অর্পিব ভোজন সব
ভক্তিভরে আত্ম নিবেদিয়া।
হে জননী হে ভবানী আপনি তুমি গো বাণী
পরম জ্ঞানিনী বেদ নিধি
তুমি গুরু শ্রেষ্ঠ মানি বিদ্যাপথে মোরে আনি
উদ্ভাসিয়া দাও মম হৃদি।
মমত্ব মাঝারে আনি আছি বহু দিন থামি'
মোক্ষ আনি দিবে মোরে করুণা তোমার
সুদিন এসেছে কাছে এ কৃষ্ণ কাতরে যাচে
পাই যেন আত্ম শক্তি আত্মার মাঝার।

(ক্রমশঃ)

পূজার দিনে

[শ্রীকালিদাসী দেবী]

শুন্‌বি তোরা কেউ ?
পূজার হাটে ভাঙা বুকে
বয় কি সুখের ঢেউ ?
শিউলি-ঝরা আঙ্গিনাতে—
দোয়েল-ডাকা বনে
কিসের ব্যথা জাগিয়ে তোলে
ছাপিয়ে ওঠে মনে !
শুনবি যদি আয়—
পূজার কথা মনে হলেই
বুক যে ভেঙ্গে যায়।

বনে ঘেরা এই গ্রামেতেই
দালান ছিল কত
পূজার ধুম— কতই হ'ত
নাইকো মনে অত !
কাঠাম দেওয়া হ'তে মোরা
বাড়ী বাড়ী ঘুরে
গেতাম মায়ের আগমনী
নিত্যি নূতন সুরে !
'রাখাল দাদা' গড়তো ঠাকুর
মূর্ত্তি কি যে যার
রবি বর্ম্মার রঙিন ছবি
তার কাছেতে ছার।

বিদেশ হ'তে আসতো সবে,
তারাও মোদের সাথে—
বিলের মাঝে নৌকা বে'ত
চাঁদনি-উজল রাতে।

পূজার দিনে উঁচু নীচু
সবাই যেতো ভুলে,
একই সাথে রহিম কানাই
নাচতো হৃদয় খুলে।
সেকি মধুর বাদ্যি ঢাকের
কোথায় রে 'ব্যাগ পাই'—
আজও মনে হলে ভাবি—
হায়রে সেদিন নাই !

'পেসাদ' পেতে কাড়াকাড়ি
বলির আখটি ধরে,
কত মধুর দিন কেটেছে
ঝগড়া ঝাঁটি করে।
ধীরে ধীরে সবাই যখন
'গাঁওটী' গেল ছাড়ি
বর্ষা বাওয়ে ভাঙ্‌লো দেয়াল
লুটিয়ে প'ল বাড়ী।
চোখের সুমুখ দিয়ে
সুখের সে দিন ছবির মত
কোথায় প'ল গিয়ে !

দশ বাড়ীতে পূজা হ'ত ;
আজকে বিজন বনে
দিন দুপুরে শিয়াল ডেকে
বেড়ায় আপন মনে।
পুকুর গুলো শুকিয়ে গেল
'ভরাট' হ'ল বিল,—
ফোটে না আর পদ্ম 'শালুই'—

উড়ে বেড়ায় চিল !
বাজেনা আর বার মাসে
তের পূজার গান
চেঁচিয়ে ম'লেও খবর নিতে
আসে না এক প্রাণ !

মোর-ই দুটী চাষী—
গাঁয়ের মায়া ভুলতে নারি,
রইছি বনবাসী !
পতিত আজি "ছিনুর" ভিটে
রমা কুলুর মাঠ
সপ্তাহেতে দুদিন করে'
আর বসে না হাট।
মহামারীর নিত্যি খেলা
আজ এ গ্রামের পরে
ছেলে মেয়ে ভুগে ভুগে
রইলো না আর ঘরে।

দাদা মামা যারা ছিল
নাইকো কেহ আর
এখন শুধু বেঁচে থেকে
বোঝা বওয়াই সার।
শিউলি যখন আজও ফোটে
তখন ভাবি মনে,
আবার বুঝি চাঁদের সে হাট
ব'সবে বিজন বনে।
এমনি করে যাচ্ছে বরষ
মিথ্যে আশা ভাই
পূজোর দিনে মাতবে আবার
এমন মানুষ নাই!

পথহারা

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

বসন্তের নীরব নিস্তব্ধ অলস মধ্যাহ্নে তরুশ্রেনী বেষ্টিত ছায়া-শীতল কুটীর তলে একটি মাদুরের উপর শয়ন করিয়া জয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে কি একটি মধুর স্বপ্ন দেখিতে ছিল। সহসা পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে তাহার নিদ্রাটুকু ভাঙিয়া গেল। সে ক্ষিপ্র হস্তে গায়ের কাপড় খানি সুবিন্যস্ত করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল সলিল দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—ভিক্ষুকের মত তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। জয়া কথা কহিল না, শুধু তাহার স্বাভাবিক স্থির-দৃষ্টি ঈষৎ ভৎর্সনার ভাবে সলিলের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার ভাবার্থ এই—"আজও আবার আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ কেন?" সে নয়নের সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে সলিলের দুর্ব্বল হৃদয় বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহার সযত্ন নিগূঢ় কল্পনায় ভাবা মনের মধ্যে উলট পালট হইয়া গেল। কারণ সলিল জয়াকে যতটা ভাল বাসিত—আবার তদপেক্ষা অনেক বেশী ভয় করিত। তাই শুষ্ক কণ্ঠে সে ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল "আমি তোমার কথাতেই তা'দেকে সম্মতি দিয়েছি; শেষে কিন্তু তুমি আমায় পরিত্যাগ কর্‌বো না জয়া, একথা তোমায় শপথ করেই বল্‌তে হ'বে। তা' না হ'লে আমি স্থির হ'তে পারব না।" সলিলের কথা শুনিয়া জয়া

অনেকক্ষন নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল "তুমি ত জান সলিল, জগতে কোথায়ও আমার দাঁড়াবার স্থান নাই। তোমার স্ত্রী যদি আমায় তোমার ঘরে আশ্রয় দেয়, তা'হলে আমার অমতের কোন কারণ ঘটবে না।" সলিল আনন্দ পূরিত গদ্ গদ্ কণ্ঠে উত্তর করিল "যাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি তাকে তুমি অন্ততঃ আমার স্ত্রী বলো না জয়া। অঙ্গহীনা মেয়ের বিয়ে আবার বিয়ে, টাকায় কারও হৃদয় বিক্রি হয় না। তোমার আদেশ তাই আমি পালন করতে প্রস্তুত হ'য়েছি, স্ত্রী যে আমার কে তা' আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সমাসীন সুহৃদ জানে। আর জানেন বিধাতা পুরুষ। তুমি আমায় নিরাশ করো না জয়া।" উত্তেজনার মুখে শেষের কথা কয়েকটি বলিয়া সলিল একটু অপ্রতিভ হইল, সে বেশ ভাল করিয়াই জানিত এ প্রেম-প্রীতির কথা গুলি অন্যের নিকেট শ্রুতি-মধুর হইলেও জয়ার নিকটে ইহা নিতান্তই নিরস কটু কষায় বলিয়াই প্রতীয়মান। একদিন কথা প্রসঙ্গে সলিলের অফুরন্ত ভাবোচ্ছাসে জয়া বাধা দিয়া বলিয়াছিল "অন্তরের ভাবরাশি মুখে এত ব্যক্ত করলে অন্তর যে শূন্য হ'য়ে যায় সলিল, তোমার যা বলবার তা' তুমি না ব'লে চুপ ক'রে থাকলেই আমি বেশী বুঝতে পারি।" সেইদিন হইতে সাবধান হইয়া সলিল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; তাহার হৃদয় মন পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া গেলেও সে মুখে আর কোন কথা প্রকাশ করিবে না। কিন্তু আজ এই বাসন্তী-বায়ু-হিল্লোলিত নিভৃত মধ্যাহ্নে নিজের মানসী-প্রতিমার অনিন্দ্য সুন্দর মধুর মুখ খানির দিকে চাহিয়া বিংশ বর্ষীয় তরুন যুবক তাহার কোন অতীত দিনের কোন তুচ্ছ প্রতিজ্ঞার কথা সম্পূর্ণ রূপেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।

জয়া হিন্দু ঘরের বাল্য বিধবা। বয়স আঠার বৎসর, বিশ্বশিল্পী যেন তাঁহার নিখুঁত নৈপুন্য দেখাইবার জন্যই এ স্বর্ণ প্রতিমা সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। যেমন চিত্ত-বিদাহ অনল-সন্নিভ সমুজ্জল রূপ তেমনিই তেজোদীপ্তি পূর্ন তাহার সুশোভন স্বভাব ও নির্ভীক কান্তি বিনত দৃষ্টি। জয়া সৌন্দর্য্যে যাহাই হউকনা কেন—ভগবান সৌভাগ্যে সকলের নিম্নের আসন তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাই দশম বৎসরের জ্ঞান হীনা বালিকার বিবাহের তিনটি মাসের মধ্যেই জীবনের সমস্ত আশা ভরসার মূলে কুটারাঘাত হইয়া শ্বশুর গৃহের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, একমাত্র মাতৃ-স্নেহাঞ্চলে হতভাগিনী তাহার একটু খানি লুকাইবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিনের পর দিন কাটাইতেছিল, কিন্তু সর্ব্বসুখ-বঞ্চিতার এ আশ্রয় টুকুও সংসারের নির্ম্মম কঠোর আঘাতে টিকিয়া রহিল না। কাঙ্গালকে সর্ব্বপ্রকারে পথের কাঙ্গাল করাই বুঝি সর্ব্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত তাই জয়া মাতৃহীনা হইয়া এবিশাল জগতে নিতান্তই একাকিনী অবলম্বন-বিহীনা হইয়া পড়িল। সে যখন সংসার সমুদ্রের আবর্ত্তে পড়িয়া দশদিক অন্ধকার দেখিতে ছিল সেই নিরাশার অন্ধকারে একটু ক্ষীন প্রদীপ শিখাটির মতন জয়াবই বাল্যকালের খেলার সঙ্গী ও স্বজাতি সলিলআসিয়া তাহার অভয় দিয়া বলিল "আমি আছি জয়া তুমি আমাব ওপর ভরসা করিতে পার, বিশ্বাস করতে পার।" সেই আশ্বাস বাক্যে জয়া আশান্বিত হইয়া হৃদয় বাঁধিল। মায়ের যৎসামন্য যা পুঁজি পাট্টা ছিল তাহারই দ্বারা কোন প্রকারে নিজের এক বেলার হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বাড়ীর পুরাতন দাসী অন্য জায়গায় কাজ করিলেও স্নেহবশে রজনীতে জয়ার গৃহেই শয়ন করিত। এমনি করিয়াই দিন কাটিতে লাগিল। জয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল তাহার দিন একভাবে কাটিলেও সলিলের দিন ঠিক তেমন ভাবে কাটিতে চাহিতেছে না। বাল্যের স্নেহ কৈশোরের সকৌতুক হাসি, অযাচিত সহানুভূতিও অনাবিল মমতার অন্তরালে কোথা হইতে তার একটি নূতন ভাব সলিলের হৃদয় দুয়ারে সমাগত হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। এই ভাবটি উপলব্ধি করিয়া জয়ারও হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে তাহার সুপ্ত নারীত্বও যেন পুলকিতান্তরে এ উৎসবে যোগ দিবার জন্য আকুলিত হইয়া তাহার কাণে কাণে কলগুঞ্জনে কি একটি অব্যক্ত সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। যেমন অগ্নি অধিক ক্ষন ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া থাকে না, সমীরন স্পর্শে তাহাকে প্রজ্জলিত হইতেই হয় এ ঠিক তেমনি সময়। সলিল একদিন বুঝিয়া উৎকণ্ঠাকম্পিত কণ্ঠে জয়ার নিকটে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল।

জয়া খুব বেশি বিস্মিত হইল না, কারণ এ প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া সলিল যে থাকিতেই পারিবে না ইহা তাহার জানাই ছিল, সে শান্ত কণ্ঠেকহিল "না, বিধবা বিয়ে করে তোমার মতন দীন দরিদ্র বন্ধু-হীনকে দুঃখের সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে আমি সহায়তা করব না সলিল। আজ যদি তুমি ধনী হতে সমাজ যদি তোমার টাকায় বশ হত তাহলে আমি বিবেচনা করে দেখতাম" কথাটা সেদিন এই পর্য্যন্তই হইয়া রহিল। হঠাৎ বিরূপা লক্ষ্মী ঠাকুরানী কুড়িটাকা বেতনে পাটের আফিসের ছোট বাবু সলিলের প্রতি প্রসন্ন নয়নে দৃষ্টি পাত করিয়া তাহাকে সৌভাগ্যের উচ্চস্তরে আরোহন করাইতে উদ্যত হইলেন। নির্ব্বান্ধব সুন্দর সচ্চরিত্র যুবকটির প্রতি সলিলদের পার্শ্বের গ্রামের কন্যাদায়গ্রস্ত জমিদার মহাশয়ের অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়িল। একমাত্র মসীবিনিন্দিত একখানি পদ ঈষৎ খঞ্জ মেয়েটির বর জামাতা হইবার উপযুক্ত বলিয়া তিনি সলিলকে সাদরে আহ্বান করিলেন কিন্তু সলিল সম্মত হইলনা। এ সুখ-সৌভাগ্যের সম্ভাবনা সে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরিয়া আসিল বটে কিন্তু জয়ার প্ররোচনায় তাহার আদেশে তাহাকে সম্মত হইতেই হইল। জয়া বলিল "এ বিয়ে তুমি হাত ছাড়া করো না সলিল, এতে তোমার কত উপকার হ'বে, আমারও একটা আশ্রয় হবে।" জয়ার এই স্বল্প কথা কয়েকটি শুনিয়া সলিল আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এ বিবাহ ব্যাপারে সলিল জমিদারী পাইবে, বৃদ্ধ শ্বশুরের মৃত্যুর পর সে স্বাধীন হইয়া জয়াকে বিবাহ করিবে। জয়া বুঝি সেই কথাই ইঙ্গিতে জানাইতেছে। এই কল্পনায় মাতিয়া সলিল পুলকিতান্তরে বিবাহে সম্মতি দিয়া আজ আবার নিভৃতে জয়ার মুখের পাকা কথা শুনিবার আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার গৃহদ্বারে আসিয়াছিল। কিন্তু গুছাইয়া কথাগুলি বলিতে না পারায় অনুতপ্ত অপরাধীর মতন সলিল নবকিশলয়ে সজ্জিত একটি নিম্ব বৃক্ষের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণের পর জয়া তাহার চাপাঠোঁট দুইটি খুলিয়া বলিল "তোমার কথা তাহলে শেষ হয়ে গেছে সলিল? আমি এখন উঠ্‌তে পারি?" সলিলের নিকট হইতে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া জয়া ধীর মন্থর গতিতে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

(২)

বিবাহান্তে সলিল একটি দিন মাত্র জয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহাও অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু সময় অল্প হইলেও সে তাহার মন্তব্য অনেকটা প্রকাশ না করিয়া ফিরিল না। তাহার শ্বশুর রোগশয্যায় শায়িত তিনি তাঁহার বিষয় সম্পত্তি সমস্তই জামতার নামে উইল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার একটা হেস্ত নেস্ত কিছু হইলেই সলিল স্বাধীন হইয়া জয়াকে বিবাহ করিবে। শ্বশুরের বিষয় আসয় তাহার হইলেই শ্বশুরের কন্যার সহিত সলিল কোন সম্বন্ধ রাখিতেই প্রস্তুত নহে ইত্যাদি। সলিলের এ সব অর্থহীন প্রলাপ শুনিয়া জয়া কোন উত্তর দেওয়া দরকার বোধ না করিয়া একটু হাস্য করিয়াছিল মাত্র। সেদিনের মতন সলিল চলিয়া গেল। জয়ার বিশ্বাস ছিল পূর্ব্বের মতনই সলিল নানা রূপ অছিলা লইয়া তাহার গৃহ দ্বারে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু এক দুই করিয়া ছয়টি মাসের মধ্যেও সলিল আর তাহার তৃষিত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া ডাকিতে আসিল না "জয়া আমি এসেছি।" পরিবর্ত্তনশীল জগতের এ পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিয়া জয়া মনেমনে বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু সলিলের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইল না। সলিল যখন তাহারই মতন অর্থহীন স্বজন-হীন অবস্থায় ছিল তখন দুজনের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ সেদিন কোথায় সলিল আজ ঐশ্বর্য্য শালী হইয়া আত্মীয় স্বজন বেষ্টিত থাকিয়া কুটিরবাসিনী দীন দুঃখিনী জয়াকে কিসের কারণে স্মরন করিবে? সেদিন সন্ধ্যা বেলা ঘরের কোনে মাটীর প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, আর নিজের দুরদৃষ্টের কথা আপন মনে চিন্তা করিতেছিল হঠাৎ প্রাঙ্গন হইতে ডাক আসিল "জয়া আমি এসেছি।" সে কণ্ঠের সে আহ্বানে আজ জয়ার সমস্ত দেহ মন আনন্দে যেন সজাগ হইয়া উঠিল। সলিল তাহাকে ভুলিয়া বসে নাই; আবার আসিয়াছে। আজ জয়া আনন্দ পূরিত হৃদয়ে প্রফুল্ল মুখে সলিলকে অভ্যর্থনা করিয়া বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসাইল। নিজে কাছে

বসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল "এতদিনে মনে হয়েছে সলিল ?" অর্তকিত ভাবে কথাটা বলায় জয়া লজ্জায় আরক্তিম হইল। সেটা বুঝিতে পারিয়াই সলিল প্রফুল্ল মুখে বলিল রোজই ত তোমায় মনে থাকে জয়' আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শ্রাদ্ধ শান্তি মিটিয়ে শাশুড়ীকে কাশী রেখে এলাম। এই সব গোলমালেই এত দিন আসতে পারি নাই।" সলিল একটু থামিয়া বাধ বাধ কণ্ঠে পুনরায় কহিল "তোমার আদেশ আমি পালন ক'রে এসেছি জয়া—এবার আমার ইচ্ছাও তোমায় পূরণ করতে হবে। আশ্বিন মাসের প্রথমে দিনও আমি ঠিক করে ফেলেছি। কল্‌কাতা গিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের ব্যবস্থা নিয়ে আমি তোমাকে আমার ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহন করব।" জয়া স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল "না সে হতে পারে না।" তাহার দৃঢ় কণ্ঠের এই ক্ষুদ্র কথাটি শুনিয়া সলিলের আশা উৎসাহ নিমেষের জন্য ভূমিসাৎ হইয়া গেল। সে সুখ স্বপ্নে বিভোর ছিল স্বপ্ন তাহার নয়ন পথ হইতে অন্তর্হিত হইল। জয়ার ক্ষুদ্র "না" কথাটী তাহার বক্ষে বজ্রের ন্যায় বাজিল। হায় নাবি তোমারি আশার আশ্বাসে সে যে আজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। নহিলে—তাহার এ ঐশ্বর্য্যে কি প্রয়োজন ছিল ? তাহার এ প্রতিপত্তির কি আবশ্যক ছিল? কিছুই না—বিন্দু মাত্রও না। জয়া সলিলের নিকট হইতে গমনোদ্যত হইয়া কি যেন ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নতমুখ খানি উন্নমিত করিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল "তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তোমার ভরসা রাখি, যদি দরকার হয় তা'হ'লে আমি তোমার স্ত্রীর কাছেও আশ্রয় নিতে পারব্। নিজের বিবাহিতা স্ত্রী থাকৃতে এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর সলিল।" স্ত্রী শব্দ শুনিয়াই সলিল জ্বলিয়া উঠিয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল "স্ত্রী আবার বোল্‌ছ জয়া, সে আমার কেউ নয়, এক সম্প্রদানের সময় ব্যতীত একটি নিমেষের জন্যও আমি তাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করি নাই। স্ত্রী তুমিই আমার, একথা সেও জানে। বল জয়া তুমি আমার ঘরে আসবে কি না ?" "আর কিছু বলোনা সলিল, আমিও মানুষ—দেবতা নই, তোমার স্ত্রী যদি আমায় তার ঘরে স্থান দেয়, তা হ'লে আমি যাব।" বলিয়া জয়া স্তব্ধ মূর্ত্তির মতন অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। আর সলিল কি উপায়ে স্ত্রীর দ্বারা জয়াকে বিবাহে সম্মত করাইবে মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

কয়েক দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়া স্থির করিল সলিলের স্ত্রী সম্মত হইলে সে সলিলের গৃহিনীই হইবে। কারণ সে মনে মনে সলিলের প্রতি, অনুরাগিনী। সর্ব্ব সুখ বঞ্চিতাকে জগতের অনাদৃতা উপেক্ষিতাকে যে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে কিসের প্রলোভনে সে তাহাকে বিমুখ করিবে ? তাহার নবীন জীবনের মুকুলিত হৃদয়ে উদ্বেলিত আশা উচ্ছাসিত আকাঙ্ক্ষা সবই কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? তাহার অপরাধ কি ? এই পরিপূর্ণ আনন্দময় জগতে সে কিসের আশায় সলিলের অমূল্য প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া নিদারুণ দুঃখ যাতনা নৈরাশ্যকে বরণ করিতে যাইবে সেও যে রক্তে মাংসে গড়া ক্ষুদ্র মানবী—দেবী নহে।

(৩)

শরতের শিশিরসিক্ত উৎসব-হাস্য-রঞ্জিত প্রভাত। জয়া নদী হইতে একটি জলপূর্ণ কলসী কক্ষে বাড়ীতে ঢুকিয়াই বিস্মিতা হইল। তাহার ঘরের সম্মুখে মৃত্তিকার উপর বসিয়া একটি মেয়ে উৎসুক নয়নে ঘন ঘন পথের দিকে চাহিতেছিল। মেয়েটির বয়স বোধ হয় পনের ষোল বৎসরের অধিক হইবে না। গায়ের বর্ণ যেন মূর্ত্তিমন্তী শ্যামা-মার মত শ্যামল দীপ্তিতে পূর্ণ। স্থির-বুদ্ধি-সমুদ্ভাসিত উজ্জল চক্ষু, সুশোভিত মুখখানির সুষমা অবর্ণনীয়। জগন্মাতার মতনই সে মুখ অপার্থিব মহিমাব্যঞ্জক। তরুণীর সর্ব্বাঙ্গে কোথাও এতটুকু অলঙ্কারের রেখাও নাই। রমনীয় বাহু দুইটিতে দুই খানি রাঙ্গা শাঁখা সেই কালোর উপর যেন সগৌরবে হাসিতেছে; পরনে একখানি সাধারণ টুক্ টুকে লাল পেড়ে শাড়ী, অলক্তক-রঞ্জিত ছোট দুই খানি পদযুগলের কিয়দংশ বেষ্টন করিয়া প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে; পূর্ব্ব গগনের উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় একটি সিন্দুরের ফোঁটা তাহার অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ ললাটের মধ্যস্থলে ও সীমন্তে সুশোভিত রহিয়াছে। জয়া বিস্ফারিত নয়নে এই

দেবীভাবসম্পন্না অপরিচিতা মেয়েটির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া চাহিয়া কক্ষের কলসী বারান্দায় নামাইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল "তুমি কোথা থেকে এসেছ ?" "আমি—" অপরিচিতা হাত বাড়াইয়া জয়ার পদধূলি মাথায় লইয়া মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিল "আমি তোমারি ছোট বোন দিদি, আমার নাম লক্ষণা—এখন চিনেছ ?" জয়া চমকিয়া উঠিল এই লক্ষণা ? হায় সলিল—ইহাকেই তুমি উপেক্ষা করিয়া ভিখারীর মতন কাহার দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ।' জয়া ঘরের মধ্য হইতে এক খানি আসন আনিয়া লক্ষণার নিকটে বিছাইয়া দিয়া তাহাকে উপবেশন করিতে বলিল। আবার সেই ভুবন-ভুলান মধুর হাসি হাসিয়া লক্ষণা বলিল— "আসন রেখে দাও দিদি, ছোট বোন্‌কে অত আদর করতে হবে না। আমি তোমায় নিতে এসেছি, বল দিদি, কবে তুমি আমায় সত্যিকার দিদি হ'তে যাবে ?" লক্ষণার কথায় জয়ার মুখখানি লজ্জায় রক্তিম আভা ধারণ করিল। সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারিল না। একটু কাসিয়া হাতের অঙ্গুলি দ্বারা পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে গম্ভীর কণ্ঠে কহিল তোমার স্বামীর কাছে সবই বুঝি শুনেছ ? আমায় ঘরে নিয়ে তোমার কি সুখ হবে লক্ষণা ?" তোমায় পেলে তিনি সুখী হবেন, তাঁর সুখেই যে আমার সুখ দিদি।" জয়া আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, স্বামীর জন্য স্ত্রীর হৃদয়ে এ মহৎ আত্ম-ত্যাগের মন্দাকিনী-ধারা কোথায় হইতে প্রবাহিত হইতে পারে ? হায়, ভাগ্য-বিপাকে সে যে এ সুখের অধিকারিনী নয়। নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসে অঙ্কুরেই যে তাহার আশালতা ধূলিধূসরিত অবস্থায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে কেমন করিয়া এ রসের আস্বাদ জানিবে। জয়াকে নীরব দেখিয়া লক্ষণা তাহার আরও নিকটে সরিয়া বসিল। একখানি বাহু-দ্বারা জয়াকে বেষ্টন করিয়া লক্ষণা পূর্ণ কণ্ঠে কহিল "কথা বল দিদি, আমার সাথে তোমার যেতেই হ'বে। তিনি যে তোমার আশাপথ চেয়ে আছেন।"

এবার জয়া কথা কহিল শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে কহিল "লক্ষণা, তুমি আমায় নিতে এসেছ, তোমার প্রতি তোমার স্বামীর গভীর ভালবাসার প্রতিদান দিতে বুঝি ?" সাধ্বী রমণী সবই সহিতে পারে—কিন্তু অপরের মুখে স্বামীর হৃদয়হীনতার কথা কিছুতেই বুঝি সহিতে পারে না। তাই জয়ার এ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপপূর্ণ কথাতে লক্ষণার প্রফুল্ল বদনমণ্ডলের উপর একটি বেদনার ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে নিমেষের জন্য। লক্ষণা তেমনি প্রফুল্ল কণ্ঠেই উত্তর করিল— "পাওয়ার চেয়ে দিতেই যে বেশী আনন্দ দিদি, এ জীবনে তুমিই তাঁকে সুখী করো। আমার ত এক জন্মেই ফুরিয়ে যাবে না—আমি পরজন্মে তাঁকে সুখী করবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে তাঁকে সুখী দেখেই সুখী হ'ব।" জয়া চমকিয়া উঠিল, লক্ষণা কি নূতন কথা কহিতেছে পরজন্মে ভগবানের শ্রীচরণে সকলেরই কি মিলন হইবে ? এ জন্মেই কেহ ফুরাইয়া যাইবে না। এ কথাটির মধ্যে কি শান্তি কি সান্ত্বনা যে লুকান রহিয়াছে। জীবনের পরেও জীবন আছে সে জীবনে বুঝি কেবল আনন্দ, কেবল উচ্ছ্বাস আর অবিচ্ছিন্ন অনন্ত মিলন—হায় মোহ, এতদিন কি যবনিকা নয়ন সম্মুখে প্রসারিত করিয়া সেই অনন্ত অসীম অব্যয় মধুরতর চিত্রটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলে। আজ তোমার অন্ধ যবনিকা সরাইয়া লও, দুঃখিনী জয়া আজ তাহার স্বপ্ন রাজ্যের ধ্যানে তাপিত ব্যথিত চিত্ত শীতল করুক। সলিলের অযাচিত অজস্র প্রণয় নিবেদনে যে জয়া মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই আজ সেই জয়ার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। পাষাণ গলিয়া ক্ষরিয়া মহা পারাবারের সৃষ্টি করিল। জয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল "লক্ষণা এ পথহারাকে তুমিই পথ দেখিয়ে দিলে বোন, তুমি আমার বয়সে ছোট না হ'লে আমি আজ তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ধন্য হ'তাম। যে স্বামীর জন্য তুমি এত ত্যাগ স্বীকার করেছ বোন—আমারও ত সেই স্বামী ছিলেন। তিনি এ জগতে না থাকলেও পরজগতেত আছেন। আমি পাষাণী তাই তাঁকে ভুলে ব'সে আছি।"

অপরাহ্নে লক্ষণাকে বিদায় দিয়া সে যেখানে বসিয়াছিল —মধ্যাহ্নে বিশ্রাম শয়ন করিয়াছিল জয়া সেই স্থান গুলি

ভক্তিভরে প্রণাম করিল। লক্ষণার কথা গুলি তাহার অবয়বের মাধুর্য্য-রাশি মনের মধ্যে বার বার আলোচনা করিয়া জয়া বাকী বেলা টুকু কাটাইয়া দিল। ক্রমে দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিল। গৃহস্থ বধূরা সেদিনের মতন নদীর কাজ সারিয়া অস্ফুট কল হাস্যে পথ মুখরিত করিয়া জয়ার অঙ্গনের পার্শ্ব দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। আজ আর জয়া ডাকিয়া কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না। সন্ধ্যার ম্লানতা অপসারিত করিয়া শরতের উজ্জ্বল চন্দ্র ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। জলে স্থলে গগনে পবনে আনন্দের উৎস ছুটিতে লাগিল। জয়া অবসন্ন হৃদয়ে চন্দ্র-কিরণ-পতিত বারান্দার উপর আপনার মলিন অঞ্চল খানি বিছাইয়া শয়ন করিল। সিন্ধু লহরীবৎ চিন্তা তরঙ্গে তাহার হৃদয় মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। মনে পড়িল বাল্যে সঙ্গিনীদের সহিত খেলা ধূলা। বহুদিনের বিস্মৃত স্বপ্ন কাহিনীর মত পিতৃ স্নেহের মধুর আস্বাদ। পিতৃ বিচ্ছেদের সুনিবিড় বেদনা। তাহার পর মনে পড়িল একটী মাধুরীভরা সন্ধ্যায় লাল চেলিতে আপনার অশ্রুসিক্ত মুখ খানি ঢাকিয়া মাতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন অপরিচিত দেশে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়দের মধ্যে কয়েকটি দিবস অবস্থান। তাহার পর প্রত্যাগমন কালে একখানি নিভৃত গৃহে একটি কিশোর দেবতার নিকটে সেই চির বিদায় কাহিনী। বিবাহের সময় সেই সুন্দর তরুণ মুখ খানি সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। নিদ্রার ঘোরে বালিকার চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিতেছিল। তাই ভাল করিয়া দর্শন হয় নাই। ছোট ননদিনীর সকৌতুক আদেশে সে সেই নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট অধ্যয়ন রত তরুণ দেবতাকে প্রথম এবং শেষ নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছিল। আজ কতদিনের পর জয়ার নয়ন সম্মুখে সেই দেবতার মূর্ত্তি জীবন্ত বেশে যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। স্মৃতির সাগর মন্থন করিয়া মনে পড়িল দেবতার সেই মাদকতাপূর্ণ স্পর্শন ও অমৃত-বর্ষী কণ্ঠস্বর। "আজ তুমি চলে যাচ্ছ জয়া আবার কবে আসবে?" সেই সোহাগ ঢালা কথাগুলি শ্রবণ করিয়া মূঢ় বালিকা উত্তর দিয়াছিল "আমি আর আসব না।"

"ছিঃ জয়া, ও কথা বলতে নেই। আবার তুমি আসবে—আবার আমাদের দেখা হবে পুতুল খেলা নিয়ে আমায় ভুলে যেও না।" এই যে হতভাগিনী জয়ার স্মৃতির সাগরের শ্রেষ্ঠ রত্ন। ইহাঁ অপেক্ষা বেশীত তাহার ভাগ্যে লাভ হয় নাই। হায়, দেবতা, সংসারের তুচ্ছ পুতুল খেলায় সত্যই যে পাষাণী এতদিন তোমায় ভুলিয়া গিয়াছিল। তুমি পাতকীর এ অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেহান্তে তোমার সেই শান্ত শীতল শ্রীচরণে তাহাকে কি তুলিয়া লইবে প্রভু? ওগো, বলে যাও—অভাগিনী জয়াকে একটি বার বলে যাও। জয়ার নয়ন পথ হইতে কত কালের কত বর্ষের কত দিনের সঞ্চিত অশ্রুর প্লাবন ছুটিল। সে দুটি হাত জোড় করিয়া ঊর্দ্ধদিকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল "ওগো, ক্ষমা কর, আমি আর জীবনে মরণে তোমায় বিস্মৃত হব না। তোমার ধ্যান মূর্ত্তির পূজা ক'রে উপাসনা ক'রে আমার এ অভিশপ্ত ব্যর্থ জীবন কাটিয়ে দেব তোমার এক দণ্ডের ক্ষণিক স্মৃতি আমার সমস্ত জীবনের পাথেয় হইয়া রহিবে প্রভু।" চিন্তা-ক্লিষ্টা ব্যথিতা জয়া সেইখানে পড়িয়া অশ্রুনীরে ভাসিতে লাগিল। চন্দ্রকিরণ দুঃখিনী বিবশার মুখের উপর লুটাইয়া পড়িল। তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে জয়া দেখিল শরতের নীলাকাশ ভেদ করিয়া সেই তরুণ দেবতার মূর্ত্তি যেন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বেশে নামিয়া আসিতেছে। বক্ষে তাহার অম্লান পারিজাত মালা, সৌরভে বিশ্ব আমোদিত করিয়া তুলিতেছে মুখে সেই অমৃতবর্ষী মধুর বাণী "আবার দেখা হ'বে।" জয়া পুলকিতান্তরে শুনিতে লাগিল রজনীর নীরব নিস্তব্ধতা যেন বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইতেছে, "আবার দেখা হবে; আবার দেখা হবে।" আকাশের চন্দ্র অযুত নক্ষত্র পুঞ্জও যেন সমস্বরে বলিতেছে "আবার দেখা হবে। ওগো আবার দেখা হবে।" শেফালিগন্ধামোদিত বায়ু জয়ার কাণে কাণে যেন গাহিতেছে "ওগো দেখা হবে, আবার দেখা হবে।" তরুপল্লব শাখা দোলাইয়া মর্ম্মর স্বরে বলিতে লাগিল "তোমাদের দেখা হবে, আবার দেখা হবে।"

রজনীর মধুরতাময় স্বপ্ন স্মৃতিতে জয়ার সমস্ত দিনটার

যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় সুনিবিড় পুলকে ফাটিয়া গেল। তাহার বিষন্ন মলিন বদনে আনন্দের স্নিগ্ধ হাসি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেবতা যে তাহাকে দর্শন দিয়া অভয় দান করিয়াছেন—জয়ার আর দুঃখ কি? বেদনা কি? কিছুই না—তাহার সব জ্বালার নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। তাপিত দগ্ধ হৃদয় শান্তির শীতল নীরে অবগাহন করিয়াছে।

জয়া আজ আর নিজের জন্য রান্না করিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহারাও যেন আজ জয়ার নিকট হইতে সভয়ে প্রস্থান করিল। স্নানান্তে একটু মিষ্টি মুখে দিয়া জল পান করিয়া জয়া নিজের নির্জ্জন নিভৃত গৃহতলে ছিন্ন অঞ্চল বিছাইয়া তাহারই উপরে লুটাইয়া পড়িল। তাহার উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ের গুপ্ত প্রদেশে আজও ক্ষীণ আশার বাতিটি জ্বলিতে লাগিল —আজও যদি সে নিদ্রাচ্ছন্ন নয়নে রজনীর অমল উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় সেই দেব মূর্ত্তিটির দর্শন পায়। আবার যদি সেই হৃদয় স্নিগ্ধকারী অভয় বাণী শুনিতে পায়। ভগবান আবার জয়ার নয়নে নিদ্রা দিয়া সেই ভুবন মোহন মানসী মূর্ত্তি একবার দেখাও। শুধু দেখাও—জয়া আর কিছু চাহিবে না। সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া এ জীবনের জন্য জয়া আর কিছুই চাহিবে না।

"দিদি" জয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল মূর্ত্তিমতী কল্পনা স্বরূপা লক্ষণা প্রীতি প্রফুল্ল বদনে ডাকিতেছে। "দিদি" জয়া উঠিয়া দাঁড়াইল দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লক্ষণাকে বক্ষের নিকটে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল "আজও এসেছ লক্ষণা, দিদির কথা মনে আছে?" "মনে আবার থাকবে না। আজ শুধু আমি আসি নি আমরা দুই জনাই তোমায় নিতে এসেছি দিদি। এ জঙ্গলে শূন্য পুরীর ভিতর একা ... থাকা হবে না দিদি তোমার কথা আমি তাঁকে সব বলেছিলাম; তিনিও বলেছেন তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে তোমার স্বামীর স্মৃতি পূজো করে আমাদের ভক্তি ভালবাসা দিবার অবকাশ দাও।"

জয়ার নয়নে সমাগম হইল সে জড়িত কণ্ঠে কহিল "না লক্ষণা আমি আর সংসারে থাকব না। এখানে প্রতি পদে পদে সত্যকে ভুলিয়ে দেয়। আমি কাশী গিয়ে কোন গৃহস্থ পরিবারের রান্না করে দিয়ে আমার একবেলার হবিষ্যান্নের সংস্থান করে সেইখানেই থাকব মনস্থ করেছি। তা' ছাড়া আমার স্থান কোথায়ও নেই বোন, শ্বশুর শাশুড়ি স্বর্গগত কাজেই সে পুণ্যভবনের দ্বারও আমার কাছে চির রুদ্ধ। লক্ষণা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অঞ্চলের প্রান্তে আপনার চক্ষু দুইটি মার্জ্জনা করিয় কহিল "দিদি তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। শোকে তাপে জর্জ্জরিতা আমার সংসার ত্যাগিনী স্নেহময়ী মা'র কোলে আমি নিজে গিয়ে তোমায় রেখে আসব, বল দিদি তুমি এতে আপত্তি করবে না?" "আপত্তি কোরব—এ পথ হারাকে তুই যে বার বার পথ দেখিয়ে দিচ্ছিস বোন, ভগবান তোকে চির সুখে রাখবেন তোর মা'র কোল আজ থেকে আমারও মার কোল হ'ল লক্ষণা সলিলকে একবার ডাক।" সলিলকে ডাকিতে হইল না; সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া সবই শুনিতেছিল। জয়ার কথায় সম্মুখে আসিয়া ম্লান মুখে বলিল "আমায় ডেকেছ জয়া?" জয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিতে লাগিল "তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে সলিল, আমি তোমার বাল্য-সঙ্গিনী তুমি শুধু সেইটুকু মনে রেখে আর সব ভুলে যেও ভাই। আরও একটি অনুরোধ তুমি আমার এই ছোট বোনটীকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কষ্ট দিও না। এ দেবীকে চিনতে চেষ্টা করো"। জয়া লক্ষণার দক্ষিণ হস্তখানি লইয়া সলিলের কম্পিত হস্তের উপর তুলিয়া দিল। সলিল সে করপল্লব খানি সস্নেহে গ্রহন করিয়া অনুতাপ দীর্ণ জড়িত কণ্ঠে কহিল তোমার আদেশ আমি প্রাণ দিয়াও পালন করব জয়া, একে চিনতে যেন পারি এই আশীর্ব্বাদ ক'রো"।

বেদনার মাধুরী

[অধ্যাপক শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম-এ]

তোমার ব্যথার দান মাথায় তুলিয়া লয়ে
সফল মানিনু মোরে আজ,
সবারে ফিরায়ে শুধু গোপনে বরিয়া নিলে
দীনহীনে, রাজ-অধিরাজ !
কেমনে বুঝিলে প্রিয় ! এ বুকে ধরিবে দান,
এ হৃদি রহিবে অচপল,
আঘাত সহিয়া যদি পাঁজর টুটিয়া যায়
এ নয়ন হবে না সজল ?
তুমি যে বেসেছ ভালো কভু তো জানিনি মনে,
বেদনায় জানাইলে তাই,
তারি এ সহন-সুখে গরবে ভরিল বুক,
ভাবিয়া বিভল হয়ে যাই।
সবার আড়ালে আমি কাটানু বরষ মাস,
আপনার মাঝারে গোপন,
তোমার ভুবন-পথে চলেছি পথিক সদা
অনাহূত, চকিত চরণ ;
কে মোরে চাহিবে কবে ভাবিয়া হয়েছি সারা,
থমকিয়া চলিয়াছি পথ,
দু'ধারে মেলিয়া আঁখি পিছনে ফেলিয়া এনু
ছায়াময় অতীত জগত ;
সমুখে চাহিয়া দেখি পথের নাহিক শেষ,
প্রসারিত মরুভূ অপার,—
কোথায় মিলায়ে গেল স্বপনের মরীচিকা
মুকুলিত আশা বাসনার !
আমারে চলিতে হবে—এই শুধু জানি মনে,
কোথা—আজি জানিতে না চাই,
আমারে বহিতে হবে তোমার দুখের দান,
এ জীবনে বুঝিয়াছি তাই।
যে গান লুকায়ে বুকে সুর হ'য়ে ফুটিল না,
যে কথা হারায়ে র'ল আজ,
যে কুঁড়ি পাতার আড়ে দল-বাঁধ টুটিল না,
ঝরে গেল কাননের মাঝ,—
তুমি কি শুনেছ প্রিয় ! তুমি কি দেখেছ তাই ?
বুঝেছ এ নিভৃত হৃদয় ?
তাই কি নিখিলে শুধু আমারে ডাকিয়া নিলে,
হে আমার চিরপ্রেমময় !
এ নহে বেদনা সখা !—স্নেহের মাধুরী তব,
দাও দাও বুক ভরি' দাও !
দুখের প্লাবনে তব করুণা বহায়ে আজি
জীবনের পিপাসা মিটাও !
ব্যথায় বিদলি' হিয়া শোণিতে সরস করি'
আঘাতে বুঝালে বারবার,—
সবার চোখের আড়ে কত ভাল বাসিয়াছ,
জানিয়াছ মরম আমার !

মাছ-মারা

[অধ্যাপক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, এম-এ]

(১)

কাঁসাইয়ের বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছে— তেঁতুলের ছোট কুঁড়েখানির চারিদিকে জল থৈ-থৈ-করিতেছে। বাপ-পিতামহের ভিটা কেমন করিয়াই বা ছাড়া যায়—জমিদারের পাইক একবার আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল— তবুও তাহার মায়া কাটাইতে পারে নাই— মহাজনের নিকট ধার করিয়া সে কুঁড়ে খানি আবার ছাইয়া লইয়াছে। দেনার দায়ে গরু বাছুর নিলাম হইয়াছে—ঘরের লক্ষ্মী ম্যালেরিয়ায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে—বর্ষার এই দুর্দ্দিনে গৌরীকে লইয়া তেঁতুল মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে।

(২)

নামে গৌরী হইলেও রংটা তাহার ঠিক উল্টা রকমেরই ছিল। বারো বছরের মেয়ে—ভরা মুখখানিতে ভাসা ভাসা চোখ দু'টি দিয়া যখন সে পিতার নিকট অভিমান জানাইত—তেঁতুল আর থাকিতে পারিত না। জেলে ডিঙির এক মাচায় তাহাকে বসাইয়া লইয়া ট্যাঁটা হাতে মাছ মারিতে বাহির হইয়া যাইত। আজ বোয়াল, কাল রুই, পরশু কাৎলা তেঁতুলের অব্যর্থ সন্ধানে মারা পড়িত। পাড়া-পড়শীকে গৌরী দু'হাতে সেই মাছ বিলাইত— অন্নের অভাবের দিনে মাছের প্রাচুর্য্য তাহাদের খাওয়ার দুঃখ কতক দূর করিয়াছিল।

(৩)

স্বেচ্ছা-সেবকেরা কলিকাতা হইতে বন্যাপীড়িতগণকে সাহায্য করিতে আসিয়াছে। তেঁতুলের ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁহারা জন কয়েক স্থান লইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন গৌরীর ভাসা চোখে মজিয়াছে—সে নাকি কলিকাতার কোন্ মাসিক পত্রিকার কবি-সম্পাদক। রোমান্স ঘটিল না—গৌরী তাঁহার ছলাকলার মর্ম্ম বুঝিল না। অসময়ের উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইল না। তাই মেয়েটিকে লইয়া গভীর রাত্রে একদিন সে রিলিফের নৌকায় পাড়ি দিল।

(৪)

তেঁতুল আজ সর্ব্বস্ব-হারা হইয়া সেই পাথারে ঘুরিয়া বেড়ায়— নৌকাতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়—মাছ আর তেমন করিয়া বিঁধিতে পারে না লক্ষ্য ফস্‌কাইয়া যায় সে মন-মরা হইয়া থাকে কোন গতিকে দিন কয়টা কাটাইয়া যাইতে পারিলেই বাঁচে।

(৫)

অমাবস্যার রাত্রি—ঘোর অন্ধকারে একটু তফাতের জিনিসও দেখা যাইতেছে না—তেঁতুল ডিঙির উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে, অতীত জীবনের দুঃখের কথা স্মরিয়া আধ ঘুমন্ত অবস্থায় গাঁজা টানিতে টানিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে—এমন সময় জল কাটিয়া বড় মাছের মত কি একটা সাঁতরাইয়া আসিতেছে—হঠাৎ সে শব্দটা শুনিতে পাইল। শুনিয়াই অব্যর্থ সন্ধানে ট্যাঁটা ছুড়িল। এই মাছটা মারিতে পারিলেই এক মাসের গাঁজার পয়সার জন্য ভাবিতে হইবে না— সে নেশার ধূমে বুকের ব্যথা ধোঁয়ার মত উড়াইয়া দিবে।

*　　*　　*　　*

সকালে জেলেরা দেখিল গৌরীর বুকে ট্যাঁটা বেঁধা—তাহার চারি পাশের জল রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে—সেই লাল জলে শুভ্রকেশ তেঁতুলের মৃতদেহ ভাসিতেছে। অদূরে স্বেচ্ছাসেবকদের সেই ডিঙিখানি আপন মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

ভক্ত

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

দেবতা ছিল মন্দিরে,
ভক্ত বসে ছিল পায়,
সহসা দূরে মঞ্জীরে
শব্দ ওকি শোনা যায়!
দেবতা কহে, "ভক্ত আমার, ওদিক পানে চাস্‌নারে।"
ভক্ত কহে, "উতল হিয়া ব্যাকুল প্রভু চাহিবারে।"

দেবতা কহে, "শক্ত যে—
মায়ার ফাঁসী আছে হোথা।"
"কি দোষে দোষী ভক্ত এ,
হে প্রভু, তুমি আজি কোথা?"
দেবতা কহে, "ভক্ত আমার আমি যে আছি বুকে তোর।"
ভক্ত কহে, "দেবের বেশে কে তুমি হোথা ওগো চোর।"

দেবতা ক্ষোভে কুন্ঠিত,
—ভক্তের আজি হ'ল একি?
ভক্ত রহে লুন্ঠিত
দেবেরে তার নাহি দেখি।
দেবতা কহে, "ভক্ত মোরে কিসের তরে চিনিছনা?"
ভক্ত কহে, "মায়ায় ভীত প্রভু আমার কভু যে না।"

———

নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান *

[শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ]

বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন ও ক্রমবিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের যে স্থান, বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের স্থানও ঠিক তদনুরূপ। বস্তুতঃ, গিরিশচন্দ্র ছাড়া, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, রঙ্গলাল বন্দ্যাপাধ্যায় এবং মতিরায় প্রমুখ যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি অনেকেই নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রই আমাদের নাট্য-সাহিত্যের ছাঁদ ঠিক করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ নাটক লেখক ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরিশচন্দ্রের ধারা কতকটা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ছন্দে তিনি মাইকেলকেই অনুসরণ করিয়াছেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ক্ষীরোদ প্রসাদ উভয়ের রচনার ধারা কতকটা অনুসরণ করিলেও, তিনি স্বীয় প্রতিভা দ্বারা উহাকে আরও সাজাইয়াছেন এবং 'উজ্জলে মধুরে' মিশাইয়াছেন। শুধু নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, দীনবন্ধুবাবুর 'সধবার একাদশী' ও 'জামাইবারিকের ছাঁদে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যদিও গিরিশচন্দ্রের ছাঁদ কতকটা লইয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহার নিজস্ব স্বদেশপ্রেমাত্মক সঙ্গীত, হাসির গান, তাঁহার ছন্দ ও ভাষা এবং অভিব্যক্তির নূতন-ভঙ্গী দ্বারা বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের বিশিষ্টতার যেরূপ স্পষ্ট ছাপ দিয়া গিয়াছেন, অপর কোন নাটক লেখক তাহাতে সমর্থ হন নাই এবং সেই জন্যই দেখি যে, নবীন নাট্যকারগণ অপর সকলকে ছাড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলালকেই অনুকরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্র লালের স্থান কোথায়, এই প্রশ্ন সমাধান করিবার পূর্ব্বে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য তাঁহার নাটক সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা।

দ্বিজেন্দ্র লালের নাটক সমূহকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) তাঁহার প্রহসন ও হাস্যরসাত্মক নাটক, (২) নাট্যকাব্য; (৩) নাটক (বা গদ্যনাট্য)

প্রথম— **হাস্যরসাত্মক নাটক ঃ—**

'সাহিত্য', 'ভারতী' ও অপরাপর মাসিক পত্রাদিতে দ্বিজেন্দ্র লালের যে হাসির গান প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই গুলিকে ভিত্তি করিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে 'কল্কি-অবতার' 'বিরহ' 'ত্র্যহস্পর্শ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' এই কয়খানি প্রহসন রচনা করেন। প্রহসন রচনার ইতিহাস সমন্ধে দ্বিজেন্দ্র লাল নিজে লিখিয়া গিয়াছেন;—"বিলাত হইতে আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ সমূহে অভিনয় দেখি, এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটক গুলির সহিত আমার পরিচয় হয়। প্রথমতঃ প্রহসন গুলির অভিনয় দেখিয়া সে গুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কিঅবতার' একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব্ব রচিত কতকগুলি হাসির গান একত্র গাঁথিয়া 'বিরহ' নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ 'ত্র্যহস্পর্শ' রচনা করি এবং সে খানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।" (নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)

(১) সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার (১৩০২)—

---

* "দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পদক" প্রাপ্ত

আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইবার পর এই প্রহসন খানিই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথমপুস্তক। ইহার ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "স্থানে স্থানে দেব-দেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে নহে। গ্রন্থ খানির প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেব-দেবী বিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য্য, কারণ হিন্দু সমাজ, ধর্ম্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট যে, একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে। * * * বর্ত্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অর্থ পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলাত-ফেরৎ—এই পঞ্চম সম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।"

যে সময় দ্বিজেন্দ্র লাল 'কল্কিঅবতার' লেখেন, তখনও তিনি সমাজের ব্যবহারের কথা ভুলেন নাই, তজ্জনিত দুঃখ ও অভিমান তাঁহার হৃদয়কে তোলপাড় করিতেছিল। প্রত্যুত, তাঁহার 'একঘরে' প্রবন্ধে ও কল্কি অবতার' প্রহসনে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। একটী কেবল গোঁড়া সমাজপতিদের উপর প্রযুক্ত গালি গালাজ, অপরটী সমাজের সকল সম্প্রদায়ের ভণ্ডামির উপর ব্যবহৃত ব্যঙ্গ ও শ্লেষের চাবুকাঘাত। 'একঘরে' পাঠ করিয়া কবির হিন্দু-সমাজভুক্ত আত্মীয় বন্ধুরাও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজের নেতা "বঙ্গবাসী"ও "কল্কি অবতার" পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর হয় নাই।" 'একঘরে'র প্রতিপাদ্য বিষয়ই যে 'কল্কি অবতারে'র একাধিক স্থানে কবি উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল ;—

"হাঁস খেলে দোষ নাই মুর্গি খেলে দোষ
প্যাঁজ খাওয়া দোষ, আর হিং খাওয়া নয়;
চীনে গেলে ধর্ম্ম থাকে, বিলেত গেলে যায়।

'কল্কি অবতারে' কবির Reformed Hindoos, 'আমরা পাঁচটি ইয়ার' 'বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল' ইত্যাদি সাতটী বিখ্যাত হাসির গান আছে। এই গান গুলির অভিনব আস্বাদ পাইয়াই সকলে দ্বিজেন্দ্রলালের জয় জয়কার করিয়াছিলেন।

(২) বিরহ (১৩০৪)—এই প্রহসন খানি দ্বিজেন্দ্র লাল রবীন্দ্র নাথকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন—

"* * * আমি 'মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী' হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।"

এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটার প্রথম অভিনীত হয় এবং ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের থিয়েটারে অভিনীত প্রথম পুস্তক। ইহার অভিনয়ের প্রথম রজনীতেই দ্বিজেন্দ্র দর্শক বৃন্দের নিকট ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরহের আদর শুধু রঙ্গমঞ্চেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, সাহিত্যিক দিগের নিকটেও ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক পুস্তক বলিয়া আদৃত হইয়াছিল।

ইহাতে "তোমার বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই" "ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের ঐ ডোবার ধার দিয়ে" ইত্যাদি বিখ্যাত হাসির গান ও "হেসে নাও দু'দিন বৈত নয়" সুন্দর গীতটী স্থান পাইয়াছে। 'বিরহ' অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই ইহার গান গুলি বাঙ্গালী সমাজে পরিচিত হইয়াছিল এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। শুধু ছন্দের ঢঙে ও বর্ণনার অদ্ভুতত্বে দ্বিজেন্দ্রলাল যে হাস্যরসের অবতরণা করিতে পারিতেন তাহার দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে যথেষ্ট আছে ;—

যথা ;—

"পতি কাছে নাই, পতি বিনে আর কে আছে নারীর সম্বল ?
কাঁচা আম দুটা পেড়ে আন সখি গুড় দিয়ে রাঁধি অম্বল।"

(৩) ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার (১৩০২)—ইহার উৎসর্গপত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "গ্রন্থখানিকে উদ্দেশ্যহীন বিবেচনা করাই শ্রেয়, কারণ তাহাতে গ্রন্থ-কারের গৌরবের হেতু না থাকিলেও সাধারণের পক্ষে যেটুকু আমোদ, সেই টুকুই nett লাভ। ... ..."

এই প্রহসনে দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত গান "পার ত জন্ম না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলা"—আছে। এই গানখানি "Be not born on Fridays, if you can

help it—"নামক একখানি ইংরাজী গানের অনুকরণে লিখিত। ইহা ছাড়া "হ'তে পাত্তাম আমি মস্ত একটা বীর" "তারেই বলে প্রেম, যখন থাকেনা Future এর চিন্তা, থাকে না ক shame" ইত্যাদি নির্ম্মল হাস্যরসের গান আছে। এই প্রহসনে হাস্যোদ্দীপক ঘটনাও আছে। এবং নীতি শিক্ষার উপাদানও আছে, কিন্তু ইহার আখ্যান বস্তু সকলেরই নিকট অপ্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার পুনর্মুদ্রণের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

(৪) প্রায়শ্চিত্ত—এই পুস্তকখানি ১৩০৮ সালে ক্লাসিক থিয়েটারে "বহুৎ আচ্ছা" নামে অভিনীত হয়। এক বৎসরের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ইহাতে দ্বিজেন্দ্র কতকাংশ বর্জ্জন করেন।

এখানি দুই অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসাত্মক নাটক। ইহাকে প্রহসন বলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের আপত্তি ছিল। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন" অনেকের এই পুস্তকখানিকে প্রহসন কল্পে অভি'হত করেন, আমার বিবেচনায় সেটি একান্ত ভ্রম। হাস্য রসাত্মক নাটক মাত্রেই যদি প্রহসন হইত তবে Molier এর Comedy গুলিও প্রহসন।" এই পুস্তকখানি বিদ্বজ্জন সমাজে যথেষ্ট আদর পাইয়াছিল, তাহার কারণ ইহার নির্ম্মল পরিহাস। এই গ্রন্থে বিলাতি আচার ব্যবহার ও 'কায়দার' পক্ষপাতী সমাজের উপর ব্যঙ্গের কশাঘাত আছে বটে, কিন্তু তাহা উপভোগ্য এবং সে পরিহাস সুরুচিসঙ্গত। এই নাটকেই দ্বিজেন্দ্রের সুবিখ্যাত হাসির গান—"আমরা বিলাত ফের্ত্তা ক' ভাই"; "একটা নূতন কিছু কর," "কটি নব কুল কামিনী! অন্ধকার হ'তে আলোকে চলেছি মন্দগামিনী।"—প্রথম প্রকাশিত হয়। এই নাটকখানিতে দ্বিজেন্দ্র যে নীতিশিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তিনি 'চম্পটির' মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন—"দেখছি যে বিলাতি চালের চেয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎআচ্ছা।"

১৩০১ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্তই দ্বিজেন্দ্রের দাম্পত্য-জীবনের পূর্ণ সুখের বৎসর, এবং তাঁহার এই সময়ের রচনাতেও মনের সেই আনন্দ প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সময়েই তাঁহার উল্লিখিত হাস্যরসাত্মক নাটকগুলি এবং পশ্চাল্লিখিত শিল্পসৌন্দর্য্যময় নাট্যকাব্য তিনখানিও প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয়—নাট্যকাব্য ঃ—(পদ্যে লিখিত 'পাষাণী' 'সীতা' ও 'তারাবাই')

(১) পাষাণী (১৩০৭)—এই কাব্যখানি শব্দ-সম্পদে রসনা-চাতুর্য্যে ও চরিত্রাঙ্কনে অনিন্দ্য-সুন্দর। ইহার অমিত্রাক্ষর কবিতাও সুখপাঠ্য। এই নাটকে কবি ব্রাহ্মণ গৌতমের এক অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ইহার প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আজি অন্ধকার গহ্বরে একখানি ছবি দেখিলাম, অপূর্ব্ব-সুন্দর মহান্, ফিডিয়াসের ভাস্কর কর্ম্ম, র‍্যাফেলের চিত্র।" কিন্তু পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনাও বাহির হইয়াছিল। 'মন্দ্রের' ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে তাহার উত্তর দিয়াছেন, "কোনও এক পত্রিকার সম্পাদক মৎপ্রণীত 'পাষাণী' নাটকের সমালোচনায় কহিয়াছিলেন যে আমি নাটকে রামায়ণের আখ্যান অনুসরণ করি নাই, যেহেতু অহল্যাকে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরানিকী অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতম বলিয়া ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্মিকীর রামায়ণ খানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই।"

এই নাট্যখানিতে দেবদেবীদের লইয়া ব্যাঙ্গ রঙ্গ আছে বলিয়া অমৃত বাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে বলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র তাহাতে সম্মত হন নাই। সেই অবধি এই নাটকখানি কোনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার "বঙ্গবাণী" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"দ্বিজেন্দ্রলাল 'পাষাণী' নামে নাটক লিখিয়াছেন, সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে উহাকে বঙ্গ ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিতে পারা যায়। * * বঙ্গসাহিত্যে কোন নাটকে ইতিপূর্ব্বে একাধারে এই সমস্ত গুণ দৃষ্ট হয় নাই।" বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সমালোচক ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন,—নাট্য-সাহিত্যে পাষাণী "Unique"—অদ্বিতীয়।

(২) সীতা—এই নাট্য প্রথমে 'নবপ্রভা' পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়। এখানি পদ্যে লিখিত, অমিত্রাক্ষরের ধরণে বিবিধ মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহার প্রকাশ কালেই বহু প্রশংসাবাণী এবং অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনাও প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময় দ্বিজেন্দ্র প্রতিকূল সমালোচনার উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "একজন সুধী সমালোচক কহিয়াছিলেন, যে আমি সীতার চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া রামের চরিত্র-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছি। আমার বিশ্বাস আমি তাহা করি নাই। * * পরিশেষে আমি সুধীবৃন্দকে অনুনয় করি যে, তাঁহারা যেন এই নাটকখানিকে কাব্যকলা হিসাবে মাত্র দেখেন, ইতিহাস বা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বসেন।"

এই কাব্যখানি কবি তাঁহার পত্নীর স্মৃতিতে উৎসর্গ করেন। এই পুস্তকে তিনি সীতার চরিত্র একটু নূতন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। এ কালের পক্ষে বিচার করিলে কবির সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার 'বঙ্গবাণী' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "'পাষাণী'র কবি, আর একটী কাব্য লিখিয়াছিলেন,—সীতা। এই কাব্যদ্বয় দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বঙ্গ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে বলিয়াই আশা করি।"

(৩) তারাবাই (১৩১০)—এই গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন, "আমি যদিও এ নাটকের মূল বৃত্তান্ত 'রাজস্থান' হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ নাটক ইতিহাস নহে।"

এই নাটকখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দেই লেখা, কিন্তু ইহাতে মাইকেলের বাক্যবিন্যাস ও গুরু-গম্ভীর ছন্দোমাধুরী নাই এবং উহা রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরেরও অনুরূপ নহে। ৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ একাধিক সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালকে এই ত্রুটী দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে বহুদিন তিনি আর পদ্যে নাটক রচনা করেন নাই।

এই নাটকখানি 'ইউনিক্' থিয়েটারে অভিনীত হয়। কবিবর দেবকুমার রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন, "'মন্দ্রের' পর 'তারাবাই' নামক একখানি নাট্য-কাব্য প্রচারিত ও অভিনীত হইলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া পড়ে।"

তৃতীয়,—**নাটক** (বা গদ্য-নাট্য):—

'তারাবাই' প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯০৩ খৃঃ ২৯শে নভেম্বর দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রী বিয়োগ হয়, তাঁহার জীবনের নাটকেও সুখের অঙ্কে যবনিকা পতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রচনার ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রের অন্যতম সুহৃদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "প্রৌঢ়তার শীর্ষে আরোহণ করিতে না করিতে তিনি সতী সাধ্বী পত্নীর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন। * * জীবন নাট্যের হাসির অঙ্ক ফুরাইল, ভাবের অঙ্ক আরম্ভ হইল।

"পত্নী-বিয়োগের পূর্ব্বে হইতে যে ভাবের লহরী আসে নাই এমন কথা বলিতে পারি না, 'সীতা' 'পাষাণী' প্রভৃতি নাটক ভাব-সূচনার প্রথম যুগের লেখা। এ লেখার ভাব আছে; সে ভাবাভিব্যঞ্জনায় যথেষ্ট কারীকরিও আছে। * * পরন্তু পত্নী বিয়োগের পর সে ভাব উদ্দাম প্রবাহ-তরঙ্গে ভাষাও সাহিত্যকে যেন ডুবাইয়া পরিস্নাত করাইয়া তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে দেশ-হিতৈষণার সোনার কমল, বিশ্বমানবতার পারিজাতমালা, জাতি-প্রীতির নন্দন কুসুম—পরস্পর নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া গিয়াছে।" (মানসী, আষাঢ়, ১৩২০)

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রের আত্মীয়—বন্ধু শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন আর আপনি হাসির গান লেখেন না কেন?" উত্তরে দ্বিজেন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"এখন হাসতে গেলে কান্না আসে।" এরূপ কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটক-রচনার ইতিহাস নিজেই লিখিয়াছেন—"বিলাত যাইবার পূর্ব্বে আমি 'হেমলতা' ও 'নীলদর্পণ' নাটকদ্বয়ের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃ-দল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি। আর Addison এর Cato এবং Shakespeare এর Julius Cæsar এর আংশিক অভিনয় দেখি সেই সময় হইতেই অভিনয়-ব্যাপারটীতে আমার

আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটী আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।"

তাঁহার রচনার ধারা-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও তিনি লিখিয়াছেন,"—'তারাবাই' প্রকাশিত হইবার পর স্বর্গীয় কবি নবীন চন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কাপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর, মাইকেলের ছন্দ মাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল, যে, অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে, কিন্তু দ্রুত কথোপকথন গদ্যের মত হইতেই হইবে। * * * * দেখিলাম যে Shakespeareএ খানিক গদ্য খানিক পদ্য, তথাপি দুইটী খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজী ভাষার সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালাতে "তুমি যদি আস সখি, আমি সেথা যাব" ইহার পরে "নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জ বিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু একত্রে উভয়ই চলে, গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে। Carlyleর মতে সামান্য হইতে গভীরতম এমন কোন ভাব নাই, যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতররূপে প্রকাশ না করা যায়। পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায় কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই।

"বঙ্কিম বাবুর গদ্য অনেক স্থলেও পদ্য। Schiller, Lessing, Ibsen, Moliere, ইত্যাদি মহানাট্যকারগণের বহু মহানাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। Schillerএর গদ্যের ভাষাও রূপক অনুপ্রাসে পদ্যের চৌদ্দপুরুষ।

"তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়ে নাটকগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয়, ততই ভাল। সেই জন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয়, ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্ত্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। * * * এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেই জন্য আমি আমার 'তারাবাই' এর পরবর্ত্তী নাটকগুলি, (রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার পতন ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে পদ্যের আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। * * * যখন উক্ত নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম, তখন একখানি অপেরা (সোরাব-রুস্তাম) গদ্যে পদ্যে রচনা করি। কারণ 'অপেরা'র কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রুতি-মধুর করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম। সে অপেরা খানি অনেক স্থলে Shelley এর অনুকরণে লিখিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহা আমার কবিতায় অত্যধিক আসক্তির ফল। মাঝে মাঝে কবিতায় দুই একখানা নাটক লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই।" ("আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ"—নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭)

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রলাল ক্রমান্বয়ে দশখানি নাটক রচনা করেন ;—প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার-পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, বঙ্গনারী, পরপারে, ভীষ্ম ও সিংহল বিজয়। তদ্ভিন্ন 'সোরাব-রুস্তম' নামক একখানি নাট্য-রসক ; 'পুনর্জন্ম' নামক একখানি প্রহসন এবং 'আনন্দ-বিদায়' নামক একখানি 'প্যারডি-নাট্য' লেখেন। প্রথমোক্ত নাটক দশখানির মধ্যে 'বঙ্গনারী' ও 'পরপারে' সামাজিক, এবং 'ভীষ্ম' পৌরাণিক ; তদ্ব্যতীত অপর সাত খানিই ঐতিহাসিক এবং 'ভীষ্ম' ও 'সিংহল বিজয়' ব্যতীত সকলগুলিই গদ্যে রচিত।

নিম্নে নাটক কয়খানির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

(১) প্রতাপসিংহ—এই নাটকখানি প্রথমে 'নবপ্রভা' পত্রিকায়, পরে ১৩২২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'তারাবাই' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের রাজপুত বীর-পূজার যে সূচনা দেখা যায়, প্রতাপসিংহ, মেবার পতন ও দুর্গাদাস নাটকে তাহার পরিণতি। এই নাটকে কবি স্বদেশ-প্রাণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। নটকুলেশ্বর ৺অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফীর ভাষায় আমরা বলিতে পারি, 'অশ্রুমতী' নাটকে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতাপ চরিত্র 'জ্বালাইয়া' দিয়া গিয়াছেন, তাহার পরে অপর

কাহারও সেই চরিত্র লইয়া নাটক লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করা সহজ-সাধ্য নহে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভা সেই পরিচিত চিত্রকেও নূতন করিয়া আঁকিয়াছেন। এই নাটকের 'শক্তসিংহ' ও 'মেহেরউন্নিসা'র চরিত্র দ্বিজেন্দ্র লালের নিজের সৃষ্টি। তিনি এক সময় স্বয়ং শক্তিসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অভিনয়ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এই নাটকে কবির সুপ্রসিদ্ধ গান, "সাধে কি বাবা বলি'-স্থান পাইয়াছে। অমৃতবাবু একদিন দ্বিজেন্দ্রের মুখে এই গান শুনিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন এবং পরে অবগত হন্ যে দ্বিজেন্দ্র একখানি নাটক লিখিয়াছেন, তাহাতে গীতটী আছে। সেই কথা শুনিয়া অমৃতবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ নাটক খানি ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করাইবার জন্য লইয়া আসেন।

শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, 'প্রতাপসিংহ' নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন দেখিতেছেন?"

ক্ষীরোদ বাবু উত্তর দেন, "কি আর বলিব, তিন অঙ্কেই দেখি নাটক শেষ হইয়া যায়, কিন্তু শক্তসিংহ একটা লাথি মারিতেই আরও দুই অঙ্ক বাড়িয়া গেল। অদ্ভুত ক্ষমতা।" একজন নাট্যকারের মুখে অপর একজন নাট্যকারের এরূপ প্রশংসা—কম গৌরবের কথা নহে। বস্তুতঃ ষ্টারে 'বিরহ' ও 'প্রতাপসিংহ' অভিনীত হইবার পর হইতেই দ্বিজেন্দ্রের নাট্যকার বলিয়া খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) দুর্গাদাস— (১৩১৩)—দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার পিতার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া এই নাটকখানি রচনা করেন এবং তাঁহারই চরণ-কমলের উদ্দেশে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি-রূপে অর্পণ করেন

দুর্গাদাস নিঃস্বার্থ প্রভু-পরায়ণতার ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার আদর্শ চিত্র। জনৈক সমালোচক বলেন "দুর্গাদাস ও সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। দুর্গাদাসে তিনি যে চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা-সাহিত্যে দুর্লভ।" কিন্তু দুর্গাদাস যেন অতি-মানুষ, দ্বিজেন্দ্রলাল এইরূপ ভাবেই আঁকিয়াছেন, তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে রক্ত মাংসের মানুষে দোষ ও গুণ উভয়ই আছে; সেইজন্যই দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ৺লোকেন পালিত মহাশয় দুর্গাদাসকে, 'bundle of qualities' বলিতেন। এই নাটকে কবির প্রসিদ্ধ গান "পাঁচশবছর এমনি ক'রে" স্থান পাইয়াছে। এই নাটক খানি প্রথমে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎকালে 'নব্যভারত' দুর্গাদাসের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কিয়দংশ এইরূপ ;—"দ্বিজেন্দ্রলাল আজ মানববেশে আমাদের নিকট উপস্থিত নন, তাঁহার লেখনীদ্বারা আজ এক স্বর্গীয় প্রভা বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়াছে। দুর্গাদাস সেই স্বর্গীয় প্রভা। * * * পুস্তকখানি কি কবিত্ব, কি স্বদেশ-প্রাণতা কি নিঃস্বার্থতা, কি পবিত্রতা, কি দয়া, কি ক্ষমা এ সকলের যেন আদর্শ। যাহা চাই, তাহা পাইয়াছি। বাস্তবিকই বলিতেছি দ্বিজেন্দ্রলাল এই একখানি পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।" (নব্যভারত, চৈত্র ১৩১৩)

(৩) মেবার-পতন :—এই খানিই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম উদ্দেশ্যমূলক নাটক। ১৩১৫ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, "মৎপ্রণীত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের একটী পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। * * * * কিন্তু এই নাটকে আমি একটী মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম * * এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। * * অতএব ইহাই আমার প্রথম উদ্দেশ্য-মূলক নাটক।"

এই নাটকে কবি ইহাই বুঝাইয়াছেন যে জাতিকে উন্নত করিতে হইলে মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া হৃদয়কে উদার করিতে হইবে। যিনি বলিয়াছেন, "আবার তোরা মানুষ হ," এবং কি করিয়া মানুষ হইতে হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এই নাটকের জন্যই কবি তাঁহার "মেবার-পাহাড়" নামক সঙ্গীতময় রচনা করেন। তাঁহার বন্ধু দেবকুমার বাবু লিখিয়াছেন, "দ্বিজেন্দ্র যখন, 'মেবার পাহাড়, উড়িছে যাহার, রক্ত পতাকা উচ্চশির' গানটী রচনা করেন,

তখন তিনি দ্বিজেন্দ্রের পাশে বসিয়াছিলেন। পরে তিনি দ্বিজেন্দ্রকে মেবারের পতন বিষয়ে একটী গান লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় আর একটী গান লিখিত হইল,

"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার
রক্ত নিশান উড়েনা আর।"

এই নাটকখানি অভিনীত হইয়া নাট্যামোদী জন সমাজে যেমন সমাদৃত হয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন লিখিয়াছেন, "এই কাব্যের 'মেবার-পাহাড়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটী হৃদয়োচ্ছাস আছে যে সকল দিক বিবেচনা করিলে উহাকে তাঁহার এই যুগের সর্ব্বগুণ ঘনীভূত শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য-ভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা হয়।

(৪) সোরাবরুস্তাম। (১৩১৫)—মিনার্ভায় একদিন 'হিন্দাহাফেজ' নামক অপেরা দেখিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ও তদীয় বন্ধুবর্গ সেই অপেরার কুরুচি দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহাতে থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্র বাবু অধরবাবুকে বলেন, "তা হ'লে রায় সাহেবকে একখানা সুরুচি-সঙ্গত অপেরা লিখিতে বলুন না।" অধর বাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে এই কথা বলায় তিনি বলিলেন "হইতে পারে Mathew Arnoldএর 'সোরাব রুস্তাম' হইতে একটা অপেরা সহজেই লিখিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে একখানি নাটক নষ্ট হইয়া যায়।" দ্বিজেন্দ্র ৪।৫ দিনের মধ্যে এই অপেরা খানি লিখিয়া দেন। বস্তুতঃ সোরাব রুস্তামের বিয়োগান্ত আখ্যান-বস্তু নাটক রচনারই উপযুক্ত, নাট্যরঙ্গের নহে। কবি ইহার প্রথমভাগে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সমাপন করিয়াছেন Tragedy ভাবেই।

এই গ্রন্থে তাঁহার বিখ্যাত হাসির গান 'যখন আমার বিয়ে হ'ল ভাবলুম বাহা বাহারে!' স্থান পাইয়াছে।

(৫) নুরজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "মৎপ্রণীত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক হইতে নুরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথম প্রভেদ এই যে,—আমি এই নাটকে দেবচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষগুণ সমন্বিত মনুষ্য চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে,—বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতে আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি। তৃতীয় প্রভেদ এইযে—আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জ্জন করিয়াছি।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে 'দুর্গাদাস' পাঠ করিয়া মনস্বী ৺ লোকেন পালিত বলেন যে, 'দুর্গাদাস' চরিত্র "bundle of qualities" হইয়াছে। যদিগুণের সঙ্গে weaknessএর উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে চরিত্র আরও ফুটিত। সেই উপদেশ বা অনুরোধের ফলেই নুরজাহান চরিত্রের সৃষ্টি। নুরজাহান রচিত হইলে পালিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, "দ্বিজু, তুমি এইবার ঠিক নাটক লিখিয়াছ।"

কবি এই গ্রন্থে স্বগতোক্তির পরিহার করিয়া যে কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গ্রন্থখানি পাঠ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। এবং তিনি এই নাটকে নুরজাহানের মনের ভিতরের যে যুদ্ধ দেখাইয়াছেন, তাহা রসগ্রাহী পাঠকের নিকট উচ্চ সমাদর পাইয়াছে এবং এই নাটক রচনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যশিল্পীর শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার উপযুক্ত বলিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভিনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "নুরজাহান মনস্তত্ত্বের সুগভীর আলোচনায় পরিপূর্ণ। মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম সুনিপুন বিশ্লেষণ নুরজাহান চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালার আর কোনও নাটকে এ ভাবের চরিত্র-বিকাশ দেখি নাই।" (ভারতী, আষাঢ় ১৩২০) এই গ্রন্থকেই অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলেন।

(৬) সাজাহান (১৩১৫)—এই নাটকখানি মিনার্ভায় অভিনীত হইয়া এরূপ সমাদর পাইয়াছিল, কবির অপর কোনও নাটক সেরূপ আদর পায় নাই। অল্পদিনের মধ্যে সাহিত্য ক্ষেত্রেও 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া খ্যাতি লাভ করে।

বস্তুত দ্বিজেন্দ্রলালের মোগল ঐতিহাসিক 'নুরজাহান' ও 'সাজাহান' নাটক দুইখানিতেই তাঁহার নাট্য প্রতিভার চরম বিকাশ হইয়াছে। এই দুইখানেই উদ্দেশ্য বিহীন বলা যাইতে পারে, কারণ নাটকীয় সৌন্দর্য্য ও চরিত্র বিকাশ ব্যতীত তিনি কোন নীতি প্রচার করিতে বসেন নাই। 'Art for Art's sake' হইলে কলাপ্রতিভা যেরূপ ফূর্ত্তি পায়, কোন একটা উদ্দেশ্য থাকিলে সেরূপ পায় না। সেই জন্যই বঙ্কিম চন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ'কেই সাহিত্যিকেরা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন' এবং তজ্জন্যই আমরা 'নুরজহান' ও 'সাজাহান'কেই দ্বিজেন্দ্র লালের শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া থাকি। কিন্তু এই দুই খানির মধ্যে কোন খানি শ্রেষ্ঠ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ ভিন্নরুচিই এই মতভেদের কারণ। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ একদল বলেন 'নুরজাহানই দ্বিজেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটক পক্ষান্তরে আর এক দলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকার বি, এল 'বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন, "সাজাহানকে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়াও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না, জগতের সমক্ষে দেখাইবার মত বাঙ্গালা সাহিত্যে যে দুই একটী বস্তু আছে, তাহার মধ্যে এই একটী।"—প্রফুল্ল বাবুর এই প্রশংসাবলি একটু অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, কারণ 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রের অতুল কীর্ত্তি এবং বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতের সমক্ষে দেখাইবার বঙ্গ-সাহিত্যে যে দুই একটী বস্তু আছে, 'সাজাহান' তাহার মধ্যে একটী—একথা বলিতে আমাদের দ্বিধা হয় কারণ সাজাহানে দ্বিজেন্দ্রলাল Sentiment এর লীলা দেখাইয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ Sentiment ই তিনি King Lear হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সাজাহান রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু ও প্রবীন সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসুর মুখে শুনিয়াছি যে, একদিন মহেন্দ্র বাবু বলেন যে 'আজকাল ছেলেকে বাবা এত কষ্ট করিয়া মানুষ করেন, শেষে ছেলে বড় হইয়া বাবার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, তাঁহার আশাভরসা নষ্ট করিয়া দেয়, এই লইয়া একখানা নাটক লেখা যাইতে পারে।' এই কথা শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র বলেন "হাঁ পারে Shakespear এর King Lear এর মত। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা হইলে ভাল হয়।" ভাবিয়া তিনি King Lear অবলম্বনে 'সাজাহান' রচনা করেন।

King Lear এর সহিত সাজাহানের অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়েই রাজা, বৃদ্ধ এবং সন্তানিগণের নিষ্ঠুর আচরণে মর্ম্মাহত। সাজাহানকে দ্বিজেন্দ্র Lear এর অবস্থাতেই ফেলিয়াছেন কিন্তু সাজাহান Lear এর সহিত সম্যক্ একরূপ হয় নাই—ইহার প্রতিবন্ধক ইতিহাস। পুত্রগণের নির্ম্মম ব্যবহারে সাজাহানের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহার ক্ষত কালবশে শুকাইয়া যায়, এবং তিনি প্রকৃতিস্থ হন, কিন্তু Lear এর হৃদয় কন্যাদের নিষ্ঠুর আচরণে একবার যে ভাঙ্গিয়াছিল, তাহা আর জুড়ে নাই এবং Cordelia র মৃত্যুর চরম আঘাতে সেই হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাজাহান ও ঐতিহাসিক সাজাহানে বিশেষ পার্থক্য আছে। দ্বিজেন্দ্র সাজাহানকে সন্তান-স্নেহ-প্রবণ, কোমলপ্রাণ, ক্ষমাশীলরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সাজাহান পুত্রগণের বিদ্রোহবার্ত্তা শুনিয়া বলিতেছেন, "এ রকম কখন ভাবিনি, অভ্যস্ত নই।" এ কথাগুলি ভাণ বলিয়া মনে হয়, যখন আমরা ইতিহাসের কথা স্মরণ করি। কারণ, পিতৃদ্রোহিতা ও সিংহাসন লাভের জন্য ভ্রাতৃযুদ্ধ মোগল সম্রাটদিগের কুলক্রমাগত আচরণ এবং সাজাহান নিজেও পিতার বিরুদ্ধে দুইবার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের মাপকাঠিতে আমাদের নাটকের বিচার করা উচিত নহে, কারণ নাটক ইতিহাস নহে। ইতিহাস অক্ষুন্ন রাখিতে গেলে কল্পনাকে খর্ব্ব করিতে হয় অথচ কল্পনার গতি অবারিত না হইলে উৎকৃষ্ট নাটক সৃষ্টি হয় না।

'সাজাহান' নাটক স্ত্রী-চরিত্রে ভাগ্যবান্। 'নাদিরার' সহিষ্ণুতা, ও পতিভক্তি হিন্দুকুল রমণীদেরও আদর্শ স্থানীয়। মহামায়ার বীর পত্নীর মত কথা রাজপুত ললনারই উপযুক্ত। এবং অক্ষুণ্ণ-শুভ্র-সৌন্দর্য্যময় জাহানারা-

চরিত্র অঙ্কিত করিয়া দ্বিজেন্দ্র 'সাজাহানে'র সম্পদ আরও বাড়াইয়াছেন। পিয়ারার চরিত্র কাল্পনিক। সুজার দ্বিতীয়-পত্নীর অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহেন।

সাজাহানে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কয়টী চরিত্র আঁকিয়াছেন, প্রধান অপ্রধান সকলগুলিই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নাটকে কবির প্রেমবিষয়ক অপূর্ব্ব সঙ্গীত, "আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে" এবং তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে অন্যতম সঙ্গীত' 'আমার জন্মভূমি' স্থান পাইয়াছে। তাঁহার 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' —এই সঙ্গীত দুইটীর মধ্যে, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, 'আমার জন্মভূমি'কেই ভাল বলিতেন।

(৭) চন্দ্রগুপ্ত (১৩১৬)—এই নাটকে চাণক্য চরিত্রটী এত উজ্জ্বল যে, অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এই নাটকের নাম 'চন্দ্রগুপ্ত' না রাখিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল 'চাণক্য' রাখিলেন না কেন? তাহার কারণ এই যে, চাণক্য-চরিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল হইলেও, নাটকীয় হিসাবে উহা নাটকের কেন্দ্র নহে। শুধু 'চন্দ্রগুপ্তে' কেন, আমাদের মনে হয় দ্বিজেন্দ্রের সমস্ত নাটকীয় চরিত্রের মধ্যেই চাণক্যের চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং চাণক্য চরিত্রেরই বিশেষত্ব, তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বর্ণভেদকেই নাটকের ভিত্তি স্বরূপ করা হইয়াছে।" দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের পতনের কারণ চাণক্যের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। এবং ইহাই এই নাটকের মূলমন্ত্র;—নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথনেই তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

"চাণক্য—ওঃ ব্রাহ্মণের সে প্রতাপ যদি আজ থাকতো?

কাত্যায়ণ— নাই কেন ব্রাহ্মণ?

চাণক্য—(আপনমনে) তার নিজের দোষে। জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে'ছ নিজে বাড়বে? শরীরকে অনশনে রেখে মস্তিষ্ক বড় হবে? তা কি সয়? সয় না—তাই এই পতন।"

নির্ব্বোধ বাচালের কথায়, এবং কাত্যায়নের সকল বিষয়েই পাণিনির Quotationএ কবি হাস্য-রসের অবতারণা করিয়াছেন। এই নাটকে কবির "আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী" ও "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!"—দুইখানি বিখ্যাত সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রের হৃদয়ে ফল্গুনদীর মত মাতৃভক্তির যে ধারা প্রবাহিত হইত, নিম্নলিখিত চাণক্যের কথায় আমরা তাহার প্রতিধ্বনি পাই।

"চাণক্য—মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল—তারপর পৃথক হ'য়ে এলে—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত; * * * *"

(৮) পুনর্জ্জন্ম—ইহা একখানি প্রহসন, নাটক নহে। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "ডীন সুইফ্‌ট সত্যসত্যই একজন জীবিত পঞ্জিকাকারকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে নিরুপায় হইয়া পঞ্জিকাকার আপনাকে জীবিত প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে একজন উকিল নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে, তথাপি ঐ পঞ্জিকাকার স্বীয় অস্তিত্ব সন্তোষকররূপে প্রমাণ করিতে পারে নাই। সেই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান প্রহসন খানি রচিত হইল।"

এই প্রহসন খানি বিমল হাস্যরসের উৎস এবং ইহাতে শিখিবার বিষয়ও যথেষ্ট আছে। "প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত" গীতটী এই প্রহসনে স্থান পাইয়াছে

(৯) পরপারে;—এই নাটকখানি ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "পরপারে আমার প্রথম সামাজিক নাটক।"

অধর বাবু 'পরপারের একটী সমালোচনা লিখিয়াছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল 'পরপারের' দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অধর বাবু বলেন—"সামাজিক নাটক বলিলে লোকের মনে স্বভাবতঃই সরলা প্রফুল্ল ও বলিদানের কথাই উদিত হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে যে সমাজে যৌবন-বিবাহ অপ্রচলিত, ও স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব

সে দেশে ভ্রাতৃবিরোধ, কন্যার বিবাহ ও বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী ভিন্ন সমাজিক নাটকের আর কি উপাদান আছে? 'পরপারে' সে শ্রেণীর নাটক নহে; ইহা কবিপ্রতিভার সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। শিল্পচাতুর্য্যে, সূক্ষ্ম চরিত্র বিশ্লেষণে ও পরস্পর বিপরীত প্রবৃত্তির সংঘর্ষণে একখানি উৎকৃষ্ট নাট্যকাব্য রচিত হইয়াছে। * * * স্নেহ কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, ক্ষমা, ত্যাগ একদিকে—কৃতঘ্নতা, অত্যাচার কপটতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, অপরদিকে। স্বর্গের সঙ্গে নরকের এমন তুমুল সংগ্রাম বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রদর্শিত হইয়াছে কি না, জানিনা।"

এই নাটকের 'সরযূ'তে কবি এক নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। সরযূ শিক্ষিতা, স্নেহময়ী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, রসিকা, তেজস্বী, সরযূ 'সরলা' নহে, 'সূর্য্যমুখী' নহে, 'প্রফুল্ল' নহে, ভ্রমরও নহে। ইহা বঙ্গকাব্য-সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি।

বিশ্বেশ্বরের চরিত্রেও কবি এক অভিনব চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বলিতেছেন, "তাও কি হয় পরেশ! মানুষ অকৃতজ্ঞ! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মর্ত্ত্যে ভগবানের অবতার, মানুষ অকৃতজ্ঞ। .... মানুষ আমার ভাই. এমনই বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বেশ্বর।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদানে আমরা যেমন বাস্তব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত ও চরিত্রের সংঘাত দেখিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রের 'পরপারে'তেও আমরা সেইরূপ চিত্র পাইয়াছি এবং দেখি যে, এই নাটকের Tragedy বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুতে নহে, ইহার Tragedy বিশ্বেশ্বরের বিবেকের বিলাপে।

ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন "নাটকে শান্তার চরিত্র একটু অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বেশ্যা এরূপ হয় কি না, জানি না। বেশ্যার স্বার্থ ত্যাগের কথা শুনিয়াছি এ চিত্র যদি কল্পনিক হয়, হউক। কাল্পনিক বীভৎসতা অঙ্কিত করায় লাভ নাই; কিন্তু কাল্পনিক সৌন্দর্য্য চিত্রিত করার সমূহ উপকার আছে।" রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা'র প্রাণের কথায় বলিয়াছেন, "দেবতারে মোর কেহত চাহে নি, নিয়ে গেল সবে মাটীর ঢেলা; দূর-দুর্গম মনোবনবাসে পাঠাইল তারে করিয়া হেলা।"—বস্তুতঃ পতিতার মধ্যেও বনবাসের কষ্টে সীতাদেবী রহিয়াছেন, মানবরূপী রামচন্দ্র মনোবনবাস হইতে সেই দেবতাকে ডাকিয়া আনিলেই ত পতিতার দুঃখ ঘুচিয়া যায়! দ্বিজেন্দ্রের 'শান্তায়' ইহারই, কতকটা আমরা দেখিতে পাই।

'শান্তার' নিম্নোদ্ধৃত গানটীতে দ্বিজেন্দ্রলাল বারাঙ্গনার জীবনের দুঃখ অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

"আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
—ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি নিভৃতে নয়ননীরে করি অভিষিক্ত নৈশ উপাধান।
* * * * *
আমি জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা এসে হেসে চলে যায়;—
আমি অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়—"

দ্বিজেন্দ্রলাল রসিকতায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু বিশ্বেশ্বর যখন সরযূকে তাহার নূতন দাম্পত্য জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, "আমারও একদিন এমনই ছিল দিদি!" বলিয়া অতীত জীবনের কাহিনী বলিতেছেন, তখন যে রসিকতার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। হাস্য ও অশ্রু, সরল ও গম্ভীর, মধুর ও করুণ মিশাইতে তাঁহার সমকক্ষ বঙ্গ-সাহিত্যে আর কেহ নাই—এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু করুণ রসিকতার স্ফুরণেও তাঁহার মত অপর কেহ সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। পরপারে এই রসিকতার পূর্ণ বিকাশ।

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতৃভক্তির যে প্রতিধ্বনি আমরা চাণক্যের মুখে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে দেখিতে পাই, 'পরপারে' সরযূর মুখেও দ্বিজেন্দ্র সেই মাতৃভক্তির কথা বলিয়াছেন—"মাতৃভক্তি—যে কর্ত্তব্য সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল, জীবনে প্রথম মহাশিক্ষা, মনুষ্য-প্রকৃতির মজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম;........."

বস্তুতঃ Ibsen এর আদর্শে রচিত না হইলেও 'পরপারে' যে সমাজ-সমস্যা-মূলক নাটক, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের অপরাপর নাটকের ন্যায় 'পরপারে' রঙ্গালয়ের দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে

নাই। কিন্তু উত্তরোত্তর ইহার আদরের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হইতেছে।

(১০) আনন্দ-বিদায়—এই খানিই দ্বিজেন্দ্রের শেষ রঙ্গ-রচনা। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম প্যারডি নাটিকা। * * প্যারডির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ নহে, রঙ্গ। তাহাতে কাহারও ক্ষুব্ধ হইবার কথা নহে, বরং প্রীত হইবার কথা।"

এই নাটিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের, গিরিশচন্দ্রের, ক্ষীরোদপ্রসাদের ও অতুলকৃষ্ণের গানগুলির যে 'প্যারডি' লিখিয়াছেন তাহার রঙ্গরস উপভোগ্য ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার আখ্যান ভাগ সুরুচিসঙ্গত নহে, এবং ব্যঙ্গ সর্ব্বত্র অনাবিল নহে।

দ্বিজেন্দ্রলাল যদিও ভূমিকায় বলিয়াছেন, "এ নাটকে কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই," তথাপি পাঠক-সাধারণে এ কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

(১১) ভীষ্ম—কবির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক ১৩২০ সালে ইহা প্রকাশিত হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে ইহা অভিনীত হয় নাই।

এইখানিই দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ নাটক, কারণ "সিংহল বিজয়' ও 'বঙ্গনারী' দ্বিজেন্দ্র অসংশোধিত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই নাটকখানি গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনাতেই লিখিত। এই নাটকের স্থানে স্থানে কবি তাঁহার মার্জ্জিত রুচির মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রের 'ভীষ্ম' যখন ষ্টার থিয়েটারে পড়িয়াছিল, সেই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভীষ্ম' নাটক প্রকাশিত হয়। ইহাতে উজ্জ্বল বর্ণে পাপের কোন চিত্র নাই, বরং নাটকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই রসজ্ঞগণ সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রের 'ভীষ্মে' অন্য ক্রটী যাহাই থাকুক না কেন, তিনি ভীষ্মের যে মহান্ চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এবং ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে তিনি ইহাতে পাপের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে পাপের উপর সহানুভূতি আসে না, বরং বিতৃষ্ণাই জন্মে। এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রের "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে—" নামক গঙ্গাস্তোত্রটী স্থান পাইয়াছে, এবং এই নাটক অভিনীত না হইলেও এই গানখানি জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র বলিতেন, দ্বিজেন্দ্রলালের এই গঙ্গাস্তোত্রটীই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত, কারণ ইহার ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(১২) সিংহল-বিজয়—এই নাটক খানি প্রথমে পদ্যে রচিত হয়; পরে অধর বাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন পদ্যে তাঁহার গদ্যের force নাই। দ্বিজেন্দ্র নিজেও সেই ক্রটী লক্ষ্য করেন এবং পদ্য ভাঙ্গিয়া গদ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পরে ১৩২২ সালে তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়।

এই নাটকে কবির স্বভাব-সিদ্ধ রচনা-নৈপুণ্যের অভাব নাই, ইহাতে নাটকোচিত চমকপ্রদ ঘটনার সংস্থানও আছে, এবং কবিত্বের উচ্ছ্বাস আছে। এই নাটকে কবির অপরাপর গানের মধ্যে "ওরে আমার সাধের বীণা" এবং "ভারতবর্ষ"—এই মহাসঙ্গীত দুইটী স্থান পাইয়াছে। কবি জীবিত থাকিলে হয়ত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া উৎকৃষ্টতর ভাবে উহা প্রকাশ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ্ব-ভারতীর চরণে শেষ বিল্বদল বলিয়া ব্যক্তিমাত্রেই ইহাকে সমাদরে গ্রহণ করিবেন। রঙ্গালয়েও ইহা আদর পাইয়াছে।

(১৩) বঙ্গনারী—দ্বিজেন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩২২ সালের ১১ই চৈত্র এই নাটকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

ইহা একখানি সামাজিক নাটক।—উদ্দেশ্য-শূন্য নহে, বরং বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়ের একটা বিচার করাই ইহার উদ্দেশ্য।

সামাজিক নাটক রচনার কথাপ্রসঙ্গে একদিন শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র মিত্র মহাশয় দ্বিজেন্দ্রকে "Improvident marriage" সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিতে বলেন। সেই কথামত, ক্ষমতার অতীত ব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়ার ফল দেখাইবার উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্র "বঙ্গনারী" নাটক

রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই নাটক লিখিতে লিখিতে গণিকা চরিত্র তাঁহার চোখের সামনে এতই উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে তিনি গণিকা চরিত্র লইয়া আর একখানি নাটক লিখিতে ইচ্ছা করেন। তদনুযায়ী তিনি গণিকা চরিত্র 'শান্তা'কে অবলম্বন করিয়া "পরপারে" নামক একখানি নাটক রচনা করেন। তাঁহার পুত্র দিলীপকুমার বাবু লিখিয়াছেন, "তিনি নাটকখানি লিখিয়া যথাযথ সংশোধিত ও পরিশোভিত করিবেন স্থির করিয়া তৎকালে অগ্রে 'পরপারে', 'আনন্দবিদায়' 'ভীষ্ম' প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হন্। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অকাল-মৃত্যু নিবন্ধন নাটকখানি সম্পূর্ণরূপ সংশোধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল না।" দ্বিজেন্দ্রর মৃত্যুর পর দেবকুমার বাবুর নিকট এই নাটকখানি পাওয়া যায়।

ইহার অন্তর্গত একটী দৃশ্য গিরিশচন্দ্রের বলিদানের একটী দৃশ্যের অনুরূপ হইয়াছিল বলিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন,' যে, যদি ঐ দৃশ্যটীর সুচারুরূপে পরিবর্ত্তন না করিতে পারি, তবে মুখবন্ধে স্বীকার করিবেন যে, এ দৃশ্য-সাদৃশ্য তাঁহার ইচ্ছাকৃত না হইলেও ঐরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার কয়েকটী গান ৺প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় নির্ব্বাচিত করিয়া দেন, কারণ গান-সংযোগের পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

পণপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহা তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'সদানন্দের' কথার অধিকাংশ গ্রন্থকারের নিজের অভিমত। সদানন্দ বলিতেছেন, "দেবেন্দ্র, পুত্রকন্যা যখন এ সংসারে এনেছে, তাদের ভরণ পোষণ করতে তুমি বাধ্য। ছেলের ভরণ-পোষণ তুমি পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত করবে, আর মেয়েদের দশবছর না পেরোতেই সে ভরণ পোষণের ভার বরপক্ষের উপর চাপিয়ে দেবে, বাকী পনের বৎসর ভরণ পোষণের জন্য বরপক্ষকে কি কিছু দেবে না? * * * কন্যার পিতারা চান কন্যাদের একেবারে ফাঁকি দিতে;—সমাজ সে ফাঁকিটা দিতে দিচ্ছে না,—এই তার অপরাধ।"

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করিলাম এবং তৎপ্রসঙ্গে আমরা তাঁহার অসামান্য নাট্য-প্রতিভার দৃষ্টান্ত স্থানে স্থানে দেখাইয়াছি। কিন্তু নাট্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে এখনও দেখাইতে হইবে,—সেই সময়ের নাট্যজগতের অবস্থা, ও দ্বিজেন্দ্র তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; এবং দ্বিজেন্দ্র আমাদের নাট্যসাহিত্যে কি সম্পদ দান করিয়াছেন ও তাহা নাট্যসাহিত্যকে কতদূর উন্নত করিয়াছে;—এবং তজ্জন্য আমাদিগকে তাঁহার চরিত্রাঙ্কন, গান, ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

আমাদের রঙ্গালয়গুলি নৃত্যগীত ও আমোদের বিলাস গৃহ। সে স্থানে অভিনয়োপযোগী নাটকগুলিও সুতরাং সাহিত্য হইতে দূরগত ও বিকৃতরুচির পরিচায়ক হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার লিখিয়াছেন, "এমন এক সময় ছিল, যে সময় স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের দুই একখানি নাটক ছাড়া, বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ এমন কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে ভদ্রব্যক্তিরা সেখানে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। * * * দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের এই হাওয়া অনেকটা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা থিয়েটারে যাইতে ঘৃণা বোধ করিতেন, এমন অনেক ব্যক্তিও 'ডি, এল, রায়ের নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, জানি।" (বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালই বাঙ্গালার নাট্যশালাগুলিকে মেছুয়া বাজার হইতে আনন্দ বাজারে পরিণত হইবার প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এবং সেই জন্যই বাঙ্গালার লোকশিক্ষকগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

চরিত্রচিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল সুনিপুন শিল্পী ছিলেন। প্রত্যুত, তাঁহার সাজাহান, চাণক্য ঔরংজেব, নুরজাহান, দুর্গাদাস প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেরূপ উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ উজ্জ্বল চরিত্র নাট্যসাহিত্যে বিরল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রের সৃষ্টচরিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমাদের বোধ হয় তিনি মানবজীবনের সূক্ষ্মতম ঘটনা সমূহের ধারণায় তত পটু ছিলেন না; কারণ 'নুরজাহান' ছাড়া আমরা অন্য কোথাও সেভাবের চরিত্র-বিকাশ দেখিতে

পাই না। অবশ্য, নুরজাহানের চরিত্র সৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রের অসামান্য কীর্ত্তি। নুরজাহান মনস্তত্ত্বের সুগভীর আলোচনায় পরিপূর্ণ। বাঙ্গালার আর কোন নাটকে এভাবের চরিত্র-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

খ্যাতনামা সমালোচক ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চরিত্রাঙ্কনের একটা প্রধান দোষ যে তাঁহাদের ঘটনা-সংস্থান এক একটা স্বতন্ত্র অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। বাস্তব জীবনের ঘটনা নানা কার্য্য-কারণ অভিপ্রায় ও ইচ্ছার জটিল সমাবেশ ও ঘাতপ্রতিঘাতে হয়। * * নানা বিরোধী অভিপ্রায়ের মিশ্রন ও ঘাত প্রতিঘাত যাহা সত্যকার বাস্তবজীবনের উপকরণ, তাহা কোথাও পাই না!" তিনি দেখাইয়াছেন, "বাস্তব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত ও চরিত্রের সংঘাত আমরা পাইয়াছি— গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' ও 'হারানিধিতে' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে'তে।" (উপাসনা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২৬)।

যাহাহউক, আমরা শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারি যে, "দ্বিজেন্দ্রের অনেকগুলি চরিত্র লৌকিকতার ক্ষেত্রেই যে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা, ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়া সহানুভূতি অর্জ্জন করিতেছে, তাহাও বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি সংখ্যা কম না হইলেও উহাদের অনেকগুলি পরস্পরিত সংস্করণ মাত্র। মনে হয় যেন, একই চরিত্র তিনি অন্যত্র একটু অন্যভাবে, রং বদলাইয়া দেখাইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই যে তিনি, অনেকগুলি নাটকে এক একটী 'পাকাটে মেয়ের' চিত্র আঁকিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার 'পিয়ারা', 'হেলেন' 'রাজিয়া' প্রভৃতিতে ঐ একরূপ বিকাশই দেখা যায়, মনে হয় শুধু যেন তিনি তাহাদিগকে বিভিন্ন পোষাকে দাঁড় করাইয়াছেন মাত্র।

তাঁহার গানের সম্বন্ধে এক কথায় বলিতে পারা যায় যে গানই দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীর প্রাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হাসির গানগুলি অবলম্বন করিয়াই তাঁহার প্রহসনগুলি রচিত হইয়াছিল এবং জাতীয় সঙ্গীত ও অপরাপর গান গুলিকে কাঠামো করিয়াই তাঁহার দেশ ভক্তিরও মনুষ্যত্বের আদর্শমূলক নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল। মনস্বী কবিবর স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র বলিতেন, দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গীতগুলি যেন গিরিশিখরে উৎপন্ন সমুন্নত তরুরাজির মত তাঁহার নাটকসমূহের উপর দাঁড়াইয়া সেগুলিকে, উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া আছে।"

অনেক সময় দেখা যায়, শুধু গান গাহিবার জন্যই তিনি তাঁহার নাটকে কয়েকটী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রের গানের উল্লেখ যোগ্য বিশেষত্ব, তাহার সুরের নবীনত্ব। তাঁহার সঙ্গীতে সুরই ছিল প্রাণ, কথাগুলি বহিরবয়ব মাত্র।

'হাসির গানে' তিনি বঙ্গসাহিত্যে বিলাতী রহস্য সঙ্গীতের ও পরিহাস-কবিতার সুর, বঙ্গীয় কবিতার নিজস্ব করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে ভাবে ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও হাস্য বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ সুরুচিসঙ্গত রসিকতা ও নির্ম্মল পরিহাস-রচনার ভঙ্গী বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন।

সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন, "দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন্, হাস্যরস-সমুজ্জ্বল মধুর গানের রচয়িতা নন্, তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত।" তাঁহার স্বদেশ প্রেমাত্মকগান— কথা ও সুরের নূতন ভঙ্গীতে— মাতৃপূজার উপযোগী যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে, সেরূপ সঙ্গীতের প্রচলন বাঙ্গালায় ছিল না। পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে সেই সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীতপ্রিয় বাঙ্গালীকে একটী অমূল্য সম্পদ দিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ভাব সম্বন্ধে কোনও সমালোচক বলেন, "এই কবির দার্শনিকতা, ভাবুকতা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও, মনে হয়, জীবনের পরিব্যাপ্ত বস্তুধারণার তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত সমস্ত বঙ্গীয় লেখককেই অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যের ভাষা ও রচনাভঙ্গীতে তাঁহার যে স্বকীয় বিশেষত্ব, তাহাও বঙ্গসাহিত্যের নূতন সম্পদ।

তাঁহার সেই 'পদ্য ভাঙ্গিয়া গদ্যের' ভাষা নবীন নাটক-লেখকগণের আদর্শের স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "দ্বিজেন্দ্র-লালের লেখার আর একটী গুণ আছে, তিনি স্ফুটোক্তির সাহায্যে, বিরোধালঙ্কারের অভিব্যঞ্জনা ঘটাইয়া এমন একটী অভিনব-রসের অবতারণা করিতেন, যে শ্রবণ মাত্রেই পাঠকগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী অপূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া যাইত। * * অনেক ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা মালো-পমার সম্মিলনে রসের সঞ্চয় করা হইত।" (সাহিত্য—১৩২০)। নিম্নে আমারা কয়েকটী উদাহরণ দিলাম;—

"নারীর রূপ যা, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান, নারীর রূপ যা—ইন্দ্রধনুর মত সেই আদি শুভ্ররূপকে রঞ্জিত করে; নারীর রূপ— যাহার মহিমায় পৃথিবী মদভরে মাথা উঁচু ক'রে স্বর্গকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্চ্চে, যেন বলছে, দেখাও দেখি এর মত তোমার কি আছে? ... ... ('পরপারে')

"মা— যার সঙ্গে একদিন একঅঙ্গ ছিলে, একপ্রাণ, একমন, একনিশ্বাস একআত্মা— যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল— তারপর পৃথক হ'য়ে এলে অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত ...." (চন্দ্রগুপ্ত)

"মাতৃভক্তি— যার কোমল করস্পর্শে কর্ত্তব্যের কাঠিন্য খসে' পড়ে, ভক্তি স্নেহে হাস্য করে, মাতৃভক্তি— যে কর্ত্তব্য তর্কের ধার ধারে না, যুক্তির সাহায্য চায় না... ..." (পরপারে)

এই ভাবের লেখার সাহায্যে তিনি ভাষায় একটা নবীন তেজ, একটা নূতন জোর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি ধ্বনির অনুপ্রাসেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন;—"একি সরিৎ-রঙ্গ, শততরঙ্গ, নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।"

তিনি গদ্যে যে কাব্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত:— জাহাঙ্গীর— "সে দিন গবাক্ষ পথে দেখলাম কি মূর্ত্তি! যেন তুষারের উপর ঊষার উদয়, যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত। ... ..." (নুরজাহান)

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রের ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন "আমাদের কাব্যভাষাকে সর্ব্বাঙ্গ রঙ্গময়ী করিয়া তুলিবার আশায় যে সকল বঙ্গকবি নিজেদের প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই সকল কবির মধ্যে মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলালের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

"বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরং' সঙ্গীতে আমরা যে তেজ, যে পৌরুষ (masculinism) দেখিতে পাই, সেই তেজ, সেই সজীবতা, সেই পৌরুষ দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ভাষার সাহায্য না লইয়া বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই দ্বিজেন্দ্র লালের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি।" (অর্চ্চনা, আষাঢ় ১৩২০)

বস্তুতঃ কাব্যের শ্রেষ্ঠবিকাশ নাটকে। ইউরোপের অনেক বড় বড় কবি এই নাটক লিখিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। Shakespeare ও কালিদাসের মত মহা-কবিরাই প্রকৃত নাটক লিখিবার উপযুক্ত। এবং বলিতে গেলে, প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরাজী ও স্পেনীয় ভাষাই প্রকৃত নাট্যশিল্পের গৌরব করিতে পারে। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও প্রকৃত নাটক সৃষ্টি হয় নাই। এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও যে প্রকৃত নাটকের আদর্শ গতি ও পরিণতি আছে এবং তাহা Shakespeareএর নাটকের মত perfect, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, আমাদের বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া, গিরীশ চন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নাটক কোনও এক বিষয়ের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, কারণ তাঁহাদের নাট্যপ্রতিভা প্রধানতঃ এক দিকে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র—যেমন আমরা দেখিতে পাই যে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ তাঁহার ধর্ম্ম-মূলক নাটকের ধর্ম্মভাবে, দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভার পরিচয় সামাজিক নাটকের সৃষ্টিতে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহার নাটকসমূহের অবিমিশ্র অতুল-নীয় কাব্য সৌন্দর্য্যে—চরিত্র সৃষ্টিতে নহে, কারণ তাঁহার চরিত্রগুলিতে প্রাণ নাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে

একাধারে যে বিবিধগুণ সমাবেশ দেখা যায়, তাহা অন্য কাহারও নাটকে নাই। কারণ দ্বিজেন্দ্রের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী; এবং সেইজন্য তাঁহার দেশ প্রেমাত্মক সঙ্গীত হাসির গান, তাঁহার ছন্দ, ভাষা, এবং অভিব্যক্তির নূতন ভঙ্গী ও উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা দ্বিজেন্দ্র নাট্য সাহিত্যকে যেরূপ সম্পন্ন করিয়াছেন, অপর কোনও নাট্যকার তাহা পারেন নাই। ফলতঃ, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সমূহ, বাঙ্গালার নাট্য সাহিত্যে বিশুদ্ধ রুচির স্রোত প্রবাহিত করিয়া, নবীন ও ভবিষ্য নাট্যকারগণকে এক অনন্যকরণীয় অভিনব আদর্শ দান করিয়া, বাঙ্গালার নাট্য সাহিত্যকে স্থায়ী উচ্চ সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে; এবং বর্ত্তমানে, তাঁহার 'পাষাণী', 'সাজাহান, 'নুরজাহান' ও 'মেবারপতন'ই নাট্য-সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অশ্রুর দরবার

[শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

অস্ফুট অঙ্কুর, মঞ্জরীভগ্ন,
কর্ত্তিত মূর্ত্তি, ও হারা তরী মগ্ন,
প্রবলের পীড়নের দুর্য্যোগ রাত্রি,
যাত্রায় প্রাণ হারা তীর্থের যাত্রী,
বুকে চাপা নিশ্বাস, মুখে চাপা বাক্য,
লাঞ্ছিত দুর্ব্বল, গোপনের সাক্ষ্য,
করিতেছে আহ্বান, অশ্রুর দরবার
ধর্ম্মের নকীবেরা ফুকারিছে বারবার।

দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা, জাগে তাঁর ক্রন্দন,
কুরুনারী দেয় নারে ক্রুরে অভিনন্দন,
ধ্বংসের কংস যে রয় সেথা শঙ্কিত,
কেউ তার কালো নাম করেনা ক অঙ্কিত।
জেতা সেথা ভয়ে কাঁপে, বল হারা দম্ভী
হৃত-বাক ইতিহাস শূল অবলম্বি'।
শক্ত সে ঠাঁই বড়, অশ্রুর দরবার,
ধর্ম্মের নকীবেরা ফুকারে যে বারবার।

সেথা আসে কার্থেজ, রোমে লয়ে সঙ্গে
কাঁদে রাঙা ইউরোপ নেপোলিয়া অঙ্গে।
নাদিরের কাছে জাগে শ্মশানের দিল্লী,
দামামার সাথে বাজে রোদনের ঝিল্লি,
কথা কয় নির্ব্বাক, মূক সেথা বক্তা,
পীড়িতের পাদপীঠ নৃপতির তক্তা,
শক্ত সে ঠাঁই বড়, অশ্রুর দরবার
ধর্ম্মের নকীবেরা ফুকারিছে বারবার।

রয় সেথা প্রেমিকেরা ছল ছল নেত্র,
সুরধুনী গঙ্গার উদ্ভব ক্ষেত্র,
বাল্মিকী বীণা বাজে ক্রৌঞ্চের দুঃখে,
বুকে পদ ধরি হরি তোষে 'ভৃগু' রুক্ষে।
সেথা ফুটে উঠে ন্যায় বিনয়ের সদ্মে,
'গয়াসুর' লুটে সেথা হরিপাদপদ্মে।
শক্ত সে ঠাঁই বড়, অশ্রুর দরবার
ধর্ম্মের নকীবেরা ফুকারিছে বারবার।

মরণ-লীলা

[অধ্যাপক, শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার, এম-এ,]

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা।
নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষো ধর্ম্মঃ ॥
—কঠোপনিষৎ

আমাদের এই এক ছটাক বুদ্ধি ত্রৈরাশিক কষিয়া বলিয়া দিল—অমুক কাজটা অন্যায় হইয়াছে, এইরূপ হইলে ঠিক হইত। কিন্তু বিশ্ববিধাতা কি নিয়মে ত্রৈরাশিক কষেণ, তা বুঝিতে মহা মহা পণ্ডিতের বুদ্ধিও হার মানে। শ্লাভজাতীয় একজন যুবক অষ্ট্রীয়ার যুবরাজের প্রাণসংহার করিল, তাহাতে বিশ্ব জুড়িয়া যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কোটি কোটি মানব পরিবারের হৃদয় ভাঙ্গার অশ্রু-ধারার প্রবল স্রোতে সে আগুন নিবিল না—একজনের পাপে লক্ষজনের কেন এ শাস্তি, আমাদের ত্রৈরাশিক তাহা বলিয়া দিতে পারিল না। মস্ত একটা ঝড় আসিল—শিলাপাতে, বজ্রাঘাতে কত প্রাণহানি, কত নির্দ্দয় ক্ষতি সংসারের উপর নিমেষে আসিয়া পড়িল; আমাদের মধ্যে যাহার বুদ্ধি একটু কম সে বিধাতার নিন্দাবাদ করিল যাহার খানিকটা বুদ্ধি আছে, সে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই চুপ করিয়া রহিল, আর যাহার দৃষ্টি আরও একটু সূক্ষ্ম সে এই সংহার লীলার অন্তরালে মস্ত বড় একটা মঙ্গলের ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তিভরে গাইয়া উঠিল—

"এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এইতো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই দীপ্তি,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।"

বৈজ্ঞানিক আসিয়া বলিলেন—জীবন-মৃত্যু একগাছি শিকলের Link মাত্র—এ কেবল ঢেউএর ওঠা নামা।

"সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হ'য়ে গল্‌বে।
ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে' আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে
মরণে ফল ফলবে।"

ভক্ত আসিয়া বলিলেন—

"রোগ শোক দারিদ্র্য যাতনা ধর্ম্মাধর্ম্ম
শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা জীবে
বল কেবা কিবা করে।

দার্শনিক ঋষি বলিলেন—

"ন জায়তে, ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো, নিত্যঃ, শাশ্বতোঽয়ং, পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
—"আত্মা জ্ঞানময়, নাহি জনম, মরণ,
না হন উৎপন্ন, না করেন উৎপাদন
স্বরূপেতে সুগোচর
বর্ত্তমান নিরন্তর।
সদা কাল নব, নাহি বৃদ্ধি, নাহি ক্ষয়,
শরীরের ধ্বংসে তার ধ্বংস নাহি হয়।"

বিনাশ কোথায়? জগতে বিনাশ নাই।

"না সতো বিদ্যতে—ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই কথা বলিতেছেন। তবে আমরা বিনাশকে এত ভয় করি কেন? না চিরকাল হইতে ভাবিয়া আসিয়াছি—মরণের ব্যথা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।

জানি, মরণের মত ধ্রুব এ সংসারে আর কিছুই নাই। তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর আমি কৌপীন-মাত্র-সম্বল পথের ভিখারী—কিন্তু অন্তিমে তোমার জন্যও যে সাড়ে তিন হাত জমি, আমার জন্যও ঠিক তাই। কিন্তু আমরা সংসারে সর্ব্বদাই এমনভাবে চলি যেন আমাছাড়া আর সকলকেই মরিতে হইবে; আমি যেন সংসারে চিরদিন দেখিতে শুনিতে আর ভোগ করিতেই আসিয়াছি। মরণকে বেশ ভয় করি, সময় সময় অপরকে মরিতেও বলি অন্ততঃ উপলক্ষ বিশেষে মরিলে প্রশংসাও করি এমন কি সাময়িক উত্তেজনা বশে কিম্বা তথা কথিত একটা আদর্শের প্রেরণায় হয়তো নিজের বহুমূল্য প্রাণটাও বিসর্জন দিয়া ফেলি।

মানুষ জরায় মরে; রোগে মরে; জড় বা চেতন কোনো প্রাকৃতিক শক্তির হাতে মরে; সময় সময় নিজে নিজেও মরে —কখনো বা বাইরের ঠেলায়, কখনো বা অন্তরের প্রেরণায়। একটা লোক বুড়ো হইয়া মারা গেল তাহার জন্য তত দুঃখ করিলাম না—বলিলাম—"নাতিপুতি রেখে বেশ গিয়েছে।"

একজন রোগে ভুগিয়া মরিল, মানুষের হাতে যা উপায় আছে তা প্রয়োগ করা গেল— ডাক্তারে বাঁচাইতে পারিল না— দুঃখ হইল, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, মনের এক কোণে এই তৃপ্তিটুকু জাগিয়া রহিল। বজ্রাঘাতে—ভূমিকম্পে মানুষ মরিল— কষ্ট হইল—কিন্তু প্রকৃতির উপর হাত নাই— সহ্য করিতে হইল। নৌকা ডুবিয়া, রেলে চাপা পড়িয়া অথবা বাঘের হাতে কেহ মারা পড়িল— এতে দুঃখের মাত্রা কিছু বেশী হইল, কেননা ইহার প্রতিকার হয়তো অনেকটা আমাদের আয়ত্বের মধ্যেই ছিল। তারপর একটা লোক নিজেকে নিজেই— মারিল—বড় দুঃখ হইল—কেননা এ মরা, না মরা—টা তাহার নিজের হাতেই ছিল। কিন্তু এই নিজের উপর হাতটা থাকিলে বোধ হয় কবির আক্ষেপের প্রতিকার গোড়াতেই হইয়া যাইত, তাহা হইলে কাঁদিয়া বলিতে হইত না—

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!"

আত্মরক্ষা তুহে সমাজ নির্দ্দেশ করিলেন— আত্মহত্যা মহাপাপ। আমরা ছেলেবেলা হইতে তাই শুনিয়া আসিতেছি—সুতরাং আমাদেরও বিশ্বাস আত্মহত্যা মহাপাপ। বিংশ শতাব্দীতে নরকের ভয় অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজকে তেমন বিচলিত করে না—তবুও সেই যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতার উপর গড়া এই বিশ্বাসটি অনেকের মনেই বেশ অচল অটল হইয়া আছে। আমার অসুখ হইল তেমন যত্ন লইলাম না। বেশ অত্যাচার চালাইতে লাগিলাম— মরণের মুখে যাইতে হইল—এর নাম কি আত্মহত্যা নয়? হিংসা, পরস্ত্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, দুরাকাঙ্খা—"স্বদেশ প্রেম" নাম লইয়া লক্ষ নরের মুণ্ড চাহিল—আমরা স্বদেশিকতার দোহাই দিয়া তাজা মাথাগুলি রাষ্ট্র-রাক্ষসীর হাড়কাঠে আগাইয়া দিলাম—জানিয়া শুনিয়া মরণের মুখে প্রবেশ করিলাম—দেশের লোক ধন্য ধন্য করিল, বলিল, কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ। এ আত্মত্যাগ আত্মহত্যার নামান্তর নয়? স্বামী মৃত—পতিই সতীর গতি—ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অবলাকে চিতায় ভস্মীভূত হইতে হইল—ঢাকের শব্দে মানবপ্রাণের আর্ত্তনাদ কোথায় ডুবিয়া গেল—লোকের কোলাহলে সতীর জয় জয় নাদে উৎপীড়িতের গভীর যাতনার কথা কেহ টেরও পাইল না! এই পুণ্যময় স্বর্গ প্রাপ্তি—বীভৎস্য নরহত্যা কিম্বা আত্মহত্যা নয়? তবে ধর্ম্মের নামে এই সব অনুষ্ঠান হওয়ায় ইহাতে নরহন্তার ফাঁসি নাই! কিম্বা আত্মহত্যাকারীর নিন্দা নাই? কিন্তু বিশ্বের বিশ্বের বিধাতা যিনি তাঁহার চক্ষুতো চিতা-ধূমে রুদ্ধদৃষ্টি হয় নাই।

তবে একটা কথা আছে—স্থল বিশেষে আমরা মানুষের মরণের—স্বকৃত অথবা পরকৃত—প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না—আমরা এমনই সংস্কারবদ্ধ জীব। মাতার ধর্ম্মনাশে উদ্যত—দুর্বৃত্তের বিনাশকারী পুত্রকে আমরা সাধুবাদই করিয়া থাকি—যদিও সে নরহন্তা বই

আর কেহই নয়। আমরা সংস্কারবশে অথবা স্বার্থের প্রেরণায় যে আদর্শকে মহান বলিয়া প্রচার করি—তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক তাহার জন্য লোকে প্রাণদান করিলে জয় জয়কার করি—এমন কি ধর্ম্মের নামে অথবা আইনের বলে মানুষকে মানুষ মারিবার জন্য নিযুক্ত করিতে ও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হই না। ধর্ম্মের নামে খ্রীষ্টশিষ্য নিজের ভাই মানুষকে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছে—এক হাতে কৃপাণ—আর এক হাতে ধর্ম্মগ্রন্থ রাখিয়া প্রাণের বিনিময়-মূল্য জগতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—স্বদেশ-প্রেমের নামে দেশে দেশে "কন্‌স্‌ক্রিপসন" আইন জারি করিয়া মানুষ মানুষকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরমেধ যজ্ঞের হোতা করিয়াছে। রাজপুত-রমণী চিতায় প্রবেশ করিয়াছে—সাধু প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে— আমরা ধন্য ধন্য করিয়াছি সেটা আমাদের সংস্কার অনুযায়ী হইয়াছে।

পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—জীবনের সুখ দুঃখের একমাত্র উৎস অভাবে আজ সতীর প্রাণ প্রবাহিনী শুষ্ক-প্রায়, দেহে চৈতন্য রহিল না—পতির অবলম্বিত সেই অজানা পথে প্রাণ-পাখী উড়িয়া গেল। সংসারের বিজ্ঞ হিসাব-বুদ্ধি দাড়ি নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"আহা, বেঁচে থাকলে মেয়েটির দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের কত উপকার হতো হতভাগিনী নিজের এই দুঃখটুকু পরের মুখ চেয়ে সয়ে থাকতে পারল না!" সঙ্গে সঙ্গে সংসারের এই বিজ্ঞ-বুদ্ধির রায়ে শাস্ত্র আসিয়া সায় দিয়া এই ধারণাটাকে খুবই পাকা করিয়া দিল। কিন্তু সৃষ্টি-ছাড়া একটা হিসাব-ভোলা-ক্যাপা কোথা হইতে আসিয়া বলিয়া গেল—"হায়, নিষ্ঠুর স্বার্থময় সংসার, কেবল নিজের সুখের কথাটাই ভাব্‌লে; কে বলেছে ও বেঁচে থাকলে তোমাদের আশা পূর্ণ হতো, ও পাগল হয়ে গিয়ে হয়তো সারা জীবন নিজেও দারুণ দুঃখ পেতো, আবার সংসারেরও মহাদুঃখের কারণ হয়ে থাকতো। আমার প্রভু, জগতের প্রভু ভোলানাথ মহেশ্বরই এ হিসাব জানেন। তিনি তাঁর বুদ্ধিতেই কাজ করেন—তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তার কি বুঝবে বল? 'মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ—জীবন মরণ লীলার ভিতর দিয়ে রুদ্র এই কথাই যে অহরহ তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন।"

আমরা হিসাব করিয়া দেখি প্রেমাবতার খৃষ্ট ছয়মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বারো জন শিষ্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি জানিয়া শুনিয়া নিতান্ত খোকার মত অল্প বয়সে নিজের অমূল্য জীবনটা বিসর্জ্জন দিলেন—আহা অমন লোক যদি আর বিশ পঁচিশ বৎসর বাঁচিতেন, না জানি তাহা হইলে কিনা করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু ঐ নিরীহ লোকটি না মরিয়া যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ত্রৈরাশিকের নিয়ম অনুসারে ছয়মাসে বারো-জন হিসাবে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে কয়টি শিষ্য পাইতেন, প্রাণদান করিয়া নিজের মহত্ত্ব প্রভাবে আজ তিনি তাহার কোটিগুণ শিষ্যলাভ করিয়াছেন—মৃত্যু দিয়াই তিনি প্রাণকে পাইয়াছেন—

"সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেইত তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ।"
সেইত—তোমার প্রাণ।"

জার্ম্মাণ অধ্যাপক পণ্ডিতরত্ন হিকেলের কথায় বলি—"যদি জীবনে আমার কোনো জিনিসে অধিকার থাকে, তবে সে আমার নিজের প্রাণ এবং তার যদিচ্ছা ব্যবহার।" অবশ্য ইহার দ্বারা আমি সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর সচরাচর যে সব আত্মহত্যা হয় তাহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছি না।

ক্ষুধার জ্বালায়, ক্রোধের বশে, লোকলজ্জায় কতজন আত্মহত্যা করিতেছে——সেগুলির নিবারণ সমাজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—সমাজের বিচারবুদ্ধিতে যাহা মঙ্গলজনক সেই জীবন রক্ষা ব্যাপারটা একান্ত আবশ্যক। তাই সমাজ ব্যক্তির নিজের জীবনের ঐ যদিচ্ছ ব্যবহার ক্ষমতার উপর হাত দিতে চায় তাই আত্মহত্যার এত নিন্দা। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা ভাল মন্দ আছে মানুষ খুন করাও যেমন সময় সময় সমাজে সমর্থিত হয়—যেমন মাতার ধর্ম্মনাশকারীর প্রাণবধ!

নিরুপায় পিতামাতাকে সমাজের নিন্দা-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কুমারী স্নেহলতা যখন সেই পোড়া সমাজেরই নৃশংস পণ প্রথার সমীপে আত্ম-বলিদান

করিল তখন বিজ্ঞ-সামাজিকগণ শাসনদণ্ড লইয়া একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। ব্যক্তির এই উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের ভাল লাগিল না। কিন্তু হে জরাজীর্ণ, নিষ্ঠুর সমাজ, যে পাপ পদ্ধতির জন্য আজ এই স্নেহের পুতলীটি—বাপ মার কোল শূন্য করিয়া মরণের পথে চলিয়া গেল—সে নারকীয় প্রথা তুমিই না প্রচলিত রাখিয়াছ—কুমারীর প্রাণবলি পাইয়াও তো কই তোমার চৈতন্য হইল না!

তাই আজ বঙ্গের শত শত ঘর অন্ধকার করিয়া দলে দলে কুমারীগণ সমাজের এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে সব স্নেহের ডোর ছিন্ন করিয়া যমের কবলে অগ্রসর হইতেছে—তুমি শুধু বসিয়াই নিন্দাই করিতেছ; সমালোচনাই করিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহার প্রতিকার কিছু করিয়াছ কি? যতদিন তাহা না করিবে এই নরমেধযজ্ঞ চলিতে থাকিবে—কেহ ঠেকাইতে পারিবেনা,ঘরে বসিয়া তোমার চোখরাঙানির দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিবে না—কাজে কিছু না করিয়া শুধু সমালোচনা করিলে কি হইবে?

নিজের প্রাণটার শেষ নিজে করা যত সহজ মনে করা যায়, তত নয়। সংসারে অনাহারে, রোগে শোকে মানুষ নিয়ত কত কষ্টইতো পাইতেছে, মুখে কতবার মৃত্যু কামনা করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক মৃত্যুর ছায়া দেখিলেই—তখনই জীর্ণ প্রাণের শীর্ণ অবশেষটুকুকে কত আশাভরে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিতেছে যেন তাহাকে কোনোদিন মরিতে হইবে না! আজ যদি শাহাজানের মত কোনও সম্রাট আসিয়া বলেন "সংসারে কে আছ এস, তোমার জীয়ন্ত সমাধির উপর তাজ গেথে দেবো"—কয়জন অগ্রসর হইতে পারিবে, বল তো?

অশীতিপর বৃদ্ধার নয়নের মণি একমাত্র গুণবান পুত্র কথা কহিতে কহিতে মরিয়া গেল—কই সে তো প্রাণ বিসর্জ্জন করিল না! ষোড়শী যুবতীর জীবনের আশা আহ্লাদে আগুন দিয়া প্রাণাধিক পতি কোন্ অজানা দেশে প্রস্থান করিল—কই তাহার তো প্রাণ বাহির হইয়া গেল না! পিতা থাকিতে পুত্র মরিতেছে, বন্ধু থাকিতে বন্ধু যাইতেছে কিন্তু সংসারের এই নিঠুর মরণ-লীলার মাঝে কে কাহার সঙ্গী হইতেছে বল?

একটি বালকের সন্ন্যাসে মতি হয়—তাহাতে সকলে তাহাকে উপদেশ দেন "বাবা. সবাই যদি সংসার ধর্ম্ম না ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে থাকে, তাহলে বিধাতার সৃষ্টিরক্ষা কিসে হবে বল?" বালক উত্তর করিল "সবাই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে এমন শুভ দিন যে আসবে না সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবে যদিই বা কোন দিন তাই হয়, তাহলে যিনি এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা সৃষ্টি করেছেন কোটি বিশ্বের প্রলয় স্থিতি যাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিরন্তর সংঘটিত হচ্ছে তিনিই তাঁর রচিত সৃষ্টির একটা কিছু উপায় করতে পারবেন এ বিশ্বাসটুকু আমাদের থাকা উচিত।"

প্রাণ বিসর্জ্জন ব্যাপারেও তাই। অমুক এই অবস্থায় নিজের প্রাণটা শেষ করিয়াছে—তাহার সেই মরণের জন্য যদি সাধুবাদ করি, অমনি হাজার হাজার লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়া সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবে—এই ধারণা যাহার সামান্য একটু বুদ্ধি আছে, সে-ও পোষণ করিবে না। অপর এক-জনের উদ্দেশে প্রাণ দিতে পারে এমন হৃদয়ের যোগাযোগ সংসারে দুর্লভ—যদি দুই একটি ঘটনা সেইরূপই হয়, তবে তাহা আমাদের স্বার্থ-নীচতা-কলুষিত ধরাকে পবিত্র বই অপবিত্র করিবে না।

> "বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
> রয়না পড়ে কোনো লাভের আশে,—
> যাবার লাগি মন তারি উদাসে
> যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া;
> পথে চলা সেইত তোমায় পাওয়া।"

পতির জন্য সতীর স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগের হেতু আদর্শ প্রেমিক ভিন্ন কে আর বুঝিবে? যাহার ব্যথা সেই জানে যে তাহার ব্যথায় ব্যথী সে-ও কতক জানে, যে গিয়াছে সে যে কত কষ্ট কত বেদনা পাইয়া তবে নিজের এই অমূল্য জীবনটা হেলায় বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে জানিবে?

সে মৃত্যুকে মৃত্যুহীনের অপরূপ সাজে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। শরীরের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে সংসারের যত মত আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার কাছে তুচ্ছ বোধ হইয়াছে—

স্বর্গীয় প্রেমের অমিয় মাধুরী তাহাকে মরণের দারুণ যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিয়াছে। সে প্রবাসী পথিকের মত অনন্তের অনন্ত পথে যাত্রী হইয়া জীবন দেবতার উদ্দেশে নশ্বর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—মরণের পরপারে অমর হইয়া সংসারের নীচতা, মলিনতা ভুলিয়া গিয়া সত্যশিব সুন্দরের রুদ্রলীলার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

"যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর মাঝখানে
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু—তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার কাটা সেই জানে
ভব সাগর মাঝখানে।
রক্ত যে তার মেতে ওঠে—মহাসাগর কল্লোলে
ওঠাপড়া ছন্দে হৃদয়
ঢেউএর সাথে ঢেউ তোলে।
অরুণ আলোর আশিষ লয়ে
অন্তরবির আদেশ বয়ে
আপন সুখে—যায় সে চলে কার পানে
ভবসাগর মাঝখানে।"

শরৎ-স্বপ্ন

[শ্রীমারীচচন্দ্র ধূম্রলোচন]

৺শারদীয়া পূজা আসিতেছে। অতএব পূজার সংখ্যার প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক মহাশয় তাগাদা লাগাইয়াছেন। কি করি? নাচার—কারণ গরীব লেখকদিগর এই পূজার সময়টা যে অবস্থা হয় তাহাতে নিশ্চয়ই অশ্রুহীন "অমর চক্ষেও জল আনে"। এ যেন "না যাইলে রাজা বধে যাইলে ভুজঙ্গ, রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।"

যদি বা কোনো গতিকে কিছু লিখিতে বসি অমনি অন্দর হইতে শব্দভেদী বাণ আসিতে থাকে, "ঐরে, তবেই এবার ছেলেদের পূজোর কাপড় চোপড় হয়েছে। এই সময় 'লেখা লেখা খেলা আরম্ভ হ'ল? "ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার যদি এই এমন একটা উপযুক্ত সময়ে কিছু না লিখিয়া পাঠাই, তাহা হইলে, "মধ্য রাত্রি তৈল" পুড়াইয়া এই যেটুকু সম্পাদকীয় 'নেক' এবং পাঠকীয় 'নজর' অর্জ্জন করিয়াছি দুইই ভাসিয়া যায়। অতএব কিছু লিখিতেও হইবে অথচ এই লেখার খবরটা যাহাতে আমি এবং সম্পাদক মহাশয় ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির বিশেষতঃ কোনো বিশেষ ব্যক্তির দৃষ্টি-শ্রুতি ও জ্ঞান গোচর না হয় এই জন্য গভীর রাত্রে কলম লইয়া বসিলাম।

কিন্তু কি যে লিখিব তাহাও ত' খুঁজিয়া পাইতেছি না। একে সমস্ত দিনের হাঁটাহাঁটিতে দেহ যন্ত্রও' প্রায় গান্ধি মহারাজের non-co-operation নীতি অবলম্বন করিয়া বসিয়াছে। মন বেচারীর অবস্থাও শোচনীয়, কারণ যদিও সে capitalist কিন্তু অপর স্থানে অর্থাৎ উদরের মধ্যে অধিকতর capital সঞ্চিত হওয়ায় মনের ভাণ্ডার প্রায় খালি। একদিকে দেহের শ্রমিকগনের জড়ত্বের ধর্ম্মঘট, অন্যদিকে মনের ঘটাকাশের "ঢন্ ঢন্" ভাব। এই দুই ভাবের উপর যখন তাম্রকূটের ধূমের যোগ সঞ্চার হইল তখন আমার অচিরে যে ধূম্রলোচন হইতে হইল এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কাহারও সন্দেহ থাকিতেই পারে না।

তারপর কখন যে অবাধ্য হস্ত হইতে নলটা খসিয়া গড়গড়াকে নাগপাশে জড়াইল, কখন যে মাথাটা ঢুলিয়া চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এইটুকু শপথ করিয়া বলিতে পারি যে আমার এই সমস্তই অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু মা সরস্বতীর পাদপদ্মের সম্মুখে বসিয়া হেমন্তের ভেকের'মত নিদ্রাদেবীকে আশ্রয় করাত' সহজ অপরাধ নয়? তাই বোধ হয় মা আমার

প্রতি অকৃপা করিয়া তাঁহার অপর মূর্ত্তিতে অর্থাৎ দুষ্ট মূর্ত্তিতে আমার স্কন্ধে চাপিয়াছেন। এবং তাহারই ফলে, এই সর্ব্বদোষ দুষ্ট প্রবন্ধের জন্ম।

কিন্তু এ বিষয়ে আমার পক্ষেও কিছু বলিবার আছে। নারায়ণ যখন যোগ নিদ্রায় ছিলেন তখন যদি তাঁহার কর্ণমলা হইতে দুই দুইটা দৈত্যমধু এবং কৈটভই জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার এই কাক নিদ্রার কালে মনের মলা হইতে যাহা জন্মগ্রহণ করিল তাহাও যে কতকটা দুষ্ট দৈত্য জাতীয় হইবে তাহাও নিশ্চিতই। কিন্তু সেই পুরাকালের দুইটা দৈত্যকে অবলম্বন করিয়া কতনা পৌরাণিকী কথার জন্ম হইয়াছে, এবং সেই কথা কত সটীক অটীক মস্তিষ্ককে না আলোড়িত করিয়াছে। অতএব আমার এই নিশীথ নিদ্রাজাত ইদানিকী কথা কি আপনাদের শ্রোতব্য হইবে না?

না হয়, নাই হউক—আমি বলিবই, কারণ না বলিলে ঐ যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেই ঐতিহাসিক (?) মারীচের অবস্থায় পড়িতে হইবে। অতএব আপনারা শুনুন অথবা না শুনুন আমি বলিয়া যাই।

আমিত' ঘুমাইলাম, কিন্তু আমার মনত, ঘুমাইতে পারে না। কেন? বাঃ! সে যে কবির মন, তাহার ঘুমাইলে চলে? তাই সে ঘুমাইল না'ত বটেই, উপরন্তু আমাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত উড়াইয়া একেবারে কৈলাসে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল। যদিও আমার কালিদাসের অলকায় অন্ততঃ মিনিট পাঁচেকের জন্যও নামা উচিত ছিল, কিন্তু ঐ শারদীয় সংখ্যার প্রবন্ধের মূল ধাকাটা আমার মন বেচারীকে এমন জোরেই লাগিয়াছিল, যে, লীলাকমলহস্তা বালকুন্দানুবিদ্ধকুন্তলাদের উচ্চ বিমান উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক একেবারে সে আমোকে ধূর্জ্জটীর প্রাসাদের বাহ্যোদ্যানে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

কিন্তু কে জানিত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া হিমালয় উল্লম্ফন পূর্ব্বক এত দূরে আসিয়াও সেই চিরন্তন নিয়ম ঘটিবে যে,

"যদি যাই বঙ্গে ত' কপাল যায় সঙ্গে।"

এখানে আসিয়াও দেখি যে শিবালয়ের সম্মুখস্থ প্রান্তরে একটা বিশাল বিল্ব-বৃক্ষের মূলে ইন্দুর, পেচক, সিংহ; মহিষ হংস ও ময়ূরের এক বিরাট সভা বসিয়াছে এবং সভার আলোচ্য বিষয়ও সহযোগিতা বর্জ্জন! সভাপতি হইয়াছেন দেখিলাম বাবা ভোলানাথের বাহন যণ্ডরাজ নন্দিকেশ্বর! এবং আমি যে সময় উপস্থিত হইলাম সেই সময়ের বক্তা ছিলেন মহিষাসুর স্বয়ং।

মহিষ বলিতেছিলেন—

"অতএব পূর্ব্ব বক্তা যাহা বলিলেন, আমি তাহা সমর্থন করি। কিন্তু ইহার মধ্যে আমি আরও এই একটু নূতন কথা জুড়িয়া দিতে চাই, যে, আমরা পরস্পরের সহ-যোগিতাও বর্জ্জন করি। কারণ, দেখুন, যদিও সিংহের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করিতে করিতে টিনের তরবারী হস্তে ঠোঁট কামড়াইয়া দন্ত বিকশিত করিয়া দেবীর পদতলে থাকিতে হয়, তথাপি সিংহ ও আমি উভয়েই একযোগে দেবীকে ধারণ করিয়া থাকি। দেবীর দক্ষিণ পদের ভার পশুরাজ ধারণ করেন এবং আমি অসুররাজ হইয়াও তাঁহার বাম পদের ভার ধারণ করি। আমাদের পরস্পরের যুদ্ধই দেবীর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ। সিংহ যদি আমার বামহস্তের কণুইয়ের উপর তাঁহার পুরুষানু-ক্রমিক দংষ্ট্রাঘাতের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে সহযুদ্ধ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতা ত্যাগও হয়, দেবীও পশুশক্তি এবং অসুরশক্তি উভয় শক্তির আশ্রয় না পাইয়া হয় তাঁহার বাৎসরিক বঙ্গাভিজান ত্যাগ করেন, না হয় পদব্রজে যাইতে বাধ্য হন।"

মহিষাসুরের এই (amendmentএর) শোধন প্রস্তাবের পর মূষিকরাজ উঠিয়া বলিলেন, "আমিও এই সংস্কৃত প্রস্তাবের সমর্থন করি, কারণ পেচক রাজ যেখানে উপস্থিত থাকেন, সেখানে আমার উপস্থিতি যে অন্ততঃ আমার পক্ষে বিপদজনক, তাহা নিশ্চয়ই বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ আমাদের যাইবার পূর্ব্বেই আমার চিরশত্রু মার্জ্জাররাজ, ষষ্ঠি-দেবীকে বহন করিয়া ষষ্ঠির দিন হইতে সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন। এ অবস্থায়, কেবল দেবতাগণের বিরুদ্ধে সহযোগিতাবর্জ্জন নীতিত্যাগ করিলেই চলিবে না। নিজেদের মধ্যেও ঐ নীতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।"

খবরদার

শিল্পী।— শ্রীমান অরবিন্দ দত্ত।

মুষিকরাজ নীরব হইবামাত্র, ময়ূর ও হংস উভয়ই চীৎকার করিয়া সমস্বরে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তখন কেশরী কেশর ফুলাইয়া হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "কি! তোমরা দেবতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছ, বলিয়া কি আমার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করিবে না কি? দেবতাদের বহন করিতে না চাও, করিও না,—এবং আমরাও তাহাতে সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাই বলিয়া মহিষের স্কন্ধের উপর আমার যে চিরন্তন সত্ত্ব তাহা আমি ত্যাগ করিব কেন? বিড়ালই বা মুষিকের উপর তাহার জন্মগত সত্ত্ব ত্যাগ করিবে কেন? মহিষের সহিত আমার বিড়ালের বা পেচকের সহিত মুষিকের, ময়ূরের সহিত সর্পের যে সহযোগিতা তাহা ত্যাগ হয় না কারণ—"

সিংহের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মহিষ লাঙ্গুল আস্ফালন পূর্ব্বক বলিলেন, "কারণ তাহা নাড়ীর যোগ, রক্তের যোগ,—ঘাড় মটকাইবার যোগ।"

সিংহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া বলিলেন, "হাঁ তাই,—সে যোগ কেহ সহজে ছিঁড়িতে পাইবে না, অন্ততঃ আমি তাহা দিব না।"

সিংহকে কেশর ফুলাইয়া উঠিয়া দাড়াইতে দেখিয়াই অন্যান্য পশু পক্ষী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আমি তখন একবার সভাপতির দিকে চাহিলাম। দেখিলাম বৃষরাজ তাঁহার ভগ্ন অভগ্ন চারিটী পদই পেটের তলায় লুকাইয়া অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে রোমন্থন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সভা যে ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে সেদিকে ধর্ম্মবরের-দৃষ্টিই নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে "সভাপতি মহাশয়, আপনার গলদেশের ঘণ্টাটী নাড়িয়া সভায় শান্তি আনয়ন করুন।" ধর্ম্মরাজ নিমিলিত নেত্রে তাঁহার লাঙ্গুলের দ্বারা মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে বলিলেন, "ঘণ্টা নাড়িয়া এতদিন চলিয়াছে, আর কি তাহা চলিবে? কলিকালে মোটে আমার একটী মাত্র চরণ। সত্য, তপস্যা, যজ্ঞ ও দান—এই চারিটী চরণের মধ্যে সত্য, তপস্যা এবং যজ্ঞ তিনটীই আমার গিয়াছে, বাকী ছিল দান। তাহা ত্যাগ করিয়া তোমরা আবার না কি সত্যকেই গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু আমার ঐ ভগ্ন পদে দাঁড়াইবার শক্তি কি আর আমার আছে? মিছামিছি যখন তোমরা আমার ঐ ভগ্ন পদ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিতেছ, তখন আমার শুইয়া পড়িতে হইয়াছে। তোমরা বাঙ্গালী, চিরকাল দাতার জাতি, বিশেষতঃ এই কলিযুগে তোমরা ঘোরতর দাতা হইয়া উঠিয়াছিলে—হঠাৎ যদি আজ সত্যযুগের সত্যাগ্রহ আরম্ভ কর তাহা হইলে যে অকাল জলদোদয় হইয়া সব ওলটপালট হইয়া যাইবে। তোমরা অতি বুদ্ধিমান জাতি হইয়াও এরূপ অকালোচিত কার্য্য করিলে দেখিয়া আমি শুইয়া পড়িয়া কেবল রোমন্থন করিতেছি, ও মাঝে মাঝে লাঙ্গুল নাড়িয়া মাছি তাড়াইতেছি।"

বৃষ-রাজের বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, দেখি সভায় ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সিংহের গর্জ্জন, মহিষের ফোঁস ফোঁস, ময়ূরের কেকা, পেচকের চীৎকারে সভাস্থল মুখরিত;—এবং ব্যাপার যখন মৌখিক হইতে নখদান্তিক অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন আমি দ্রুত-গতিতে কৈলাসালয়ে প্রবেশ করিলাম। ভয়ে নয়, কৌতূহলে। জগন্মাতার অন্তঃপুরের অবস্থাটাও ত' দেখার প্রয়োজন?

প্রথমেই গণেশদাদার মহলে প্রবেশ করিলাম—দেখিলাম সিদ্ধিদাতা দাদা-আমার, নিজেইসিদ্ধিতে ভোঁ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মদক্ষরিত হস্তিমুণ্ডের ব্যালোল গণ্ডস্থলে মধুলুব্ধ মধুপেরা নিরাতঙ্কে একেবারে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। এবং আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, কলাবৌ এর স্কন্ধ ভেদ করিয়া এক কাঁদী বড় কাঁচা কলা বাহির হইয়াছে। এবং ততোধিক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, দাদার ঘরময় তাঁহার বাহনের অসংখ্য বংশধরগণ ঘোরতর কিচ্‌কিচ্ শব্দে ছুটাছুটী করিতেছে, বোধহয় বহুদিন হইতে এখানে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, মা লক্ষ্মী পেচকের দ্বারা 'রিলিফ' পাঠান নাই।

আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না, কারণ মুষিকেরাও সংখ্যায় অধিক হইলে কি না করিতে পারে?

বড় দাদার মহল হইতে ছোট দাদার মহলে প্রবেশ করিয়া দেখি, ছোট দাদা ধনপতি কুবেরের সহিত দাবা খেলিতেছেন। রাজরাজা এমন এক কিস্তি দিয়াছেন, যে

ছোটদাদা তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছেন এবং মিছামিছি গড়গড়ায় মুখনলে টান দিতেছেন। কলিকায় অগ্নি যে কখন নিভিয়া গিয়াছে, সেদিকে তঁাহার হুঁস নাই। আমি কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম, "দাদা এ খেলার ত' আর চলন নাই। এখন 'নিলাম সাঁকোর' 'রাজকীয় কোদালী' নামক ক্রীড়া বিশেষই ভদ্র সমাজে প্রচলিত।" কিন্তু দাদাদের দেবকর্ণে সে কথা বোধ হয় সম্পূর্ণ প্রবেশ করিল না, কারণ শক্তিধব "কিসের নিলাম?" বলিয়াই "এই তোমার নৌকো নিলাম," বলিয়া কি একটা "চাল" দিলেন। ধনপতিও যুদ্ধক্ষেত্রের উপর নির্ব্বিকল্প, সমাধিলাভ করিতে করিতে বলিলেন। "কোদাল? কার কবর খুড়তে হবে?"

আমি তখন ব্যাপার বুঝিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া, মা লক্ষ্মীর নিকট গেলাম। মা লক্ষ্মী তখন পাটের বস্তার উপর বসিয়া, নোটের তাড়া গুনিতেছেন। রাজরাজা ধনপতি কুবেরের একজন ফিনান্স্ মিনিষ্টার হিসাব দিতে দিতে বলিতেছেন, "মা, এই দশকোটী টাকাটা গোঁজামিল দিতে হইবে, কারণ ইহার অর্দ্ধেক মাটিতে ও পদ্মার জলে, এবং অর্দ্ধেক ইঁদুরে নষ্ট করিয়াছে।

আমি মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম, এবং সে মুখে কি যে দেখিলাম বলিতে পারি না। কিন্তু মাকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া সে স্থান হইতে মা সরস্বতীর পদ্মালয়ে যাইবার জন্য মানস-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানকার অবস্থা আরো ভয়ানক,—একেত, সরোবরের তীরে তীরে রক্তপিপাসু ভয়ানক ভয়ানক জলৌকা-চিনা, মহিষা—সর্ব্ববিধ জোঁকের—মিলিত অমিলিত, কিলি কিলি হিলি হিলি, তদুপরি শুনিলাম হংসগণ সমস্তই জল ছাড়িয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও পদ্মের অভাবে কেহবা উত্তর মেরুতে পলায়ন করিয়াছে, কেহবা অকর্ম্মক বাধায়ও সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছে। যে বৃদ্ধ হংসটী এখনও এপার হইতে যাত্রীগণকে সরোবর মধ্যস্থ মায়ের প্রাসাদে লইয়া যাইতেছে,তাহার অবস্থাও শোচনীয়। সমস্ত পুরাতন পক্ষ খসিয়া পড়িয়াছে, গায়ের মাংস বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর নূতন যে পক্ষ তাহার গায়ে আঠা দিয়া লাগাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাও সরোবরে, ভাসিতেছে। যে দুইটী পক্ষহীন ডানা পুরাতন গৌরবের সাক্ষীরূপে রহিয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া 'অবলা' পশুর প্রতি অত্যাচার-নিবারনী সভার সভ্য হইবার মনস্থ করিয়া ফিরিতে হইল।

এইবার স্বয়ং জগন্মাতার বিরাট অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সেখানকার অবস্থা! ভূত প্রেতেরা ক্রমাগতই লম্ফঝম্ফ করিতেছে, এবং তাহারাও যে সহযোগিতাবর্জ্জনে শীঘ্রই যোগ দিয়া দক্ষযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি করিবে তাহার ভয় দেখাইতেছে। কেবল ভৃঙ্গী-ঠাকুর বাপু বাছা করিয়া তাহাদের থামাইয়া রাখিতেছেন।

আমি কোনরূপে পাশ কাটাইয়া মায়ের 'হল-অব অডিয়েন্স্'এ প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানকার অবস্থাও তেমন আশাপ্রদ বোধ হইল না—মায়ের সিংহাসনের দুই পার্শ্বে জয়া বিজয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঢুলিতেছে, মাতৃকাগণ তাঁহাদের ক্রোড়স্থ শিশুগুলিকে থামাইতে পারিতেছেন না, কারণ স্তনে দুগ্ধ নাই। ক্রমাগত খেতে দে খেতে দে—"ও—ও—না—না" ইত্যাদি শব্দে অন্নপূর্ণার বিশাল কক্ষ মুখরিত।

কিন্তু মা কৈ? কোথায় মা তুমি? আমার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, আমার হৃদয় ভেদ করিয়া সেই অভ্রভেদী কক্ষ ভেদ কবিয়া শব্দ হইল, "কোথায় মা—?" কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল, কোথায়—কোথায়—কোথায়।

আমি দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইবামাত্র দেখি, সম্মুখেই নিষ্পত্র নিষ্ফল অভ্রংলিহ বিশাল বিল্ববৃক্ষ। তাহাব মূলে যোগ বেদীতে স্বয়ং দেবাদিদেব বাবা ভোলানাথ, সমস্ত ভুলিয়া নিবাত-নিষ্কম্পমিবপ্রদীপঃ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখস্থ ধুনির অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে। এবং তাঁহার নিকটে বটুক ভৈরবের বাহনটী শুইয়া হাঁপাইতেছে তাহার জিহ্বা প্রায় সাড়ে তিন হাত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

বিল্ববৃক্ষের উপরে চাহিয়া দেখি স্বয়ং কালভৈরব দুই শাখায় দুই বিশাল চরণ রাখিয়া ত্রিশূলের তুলিকা হস্তে

মায়ের আকাশ ব্যাপী চাল-চিত্র চিত্রিত করিতেছেন। এবং বাবার অষ্ট-পার্ষদ নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে সেই চিত্রণ-কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমস্ত দিগদিগন্ত এমন নিস্তব্ধ যেন যোগমগ্ন হর তাঁহার তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে সমস্তই ভস্মীভূত করিয়া উত্তর সাধকগণ সঙ্গে শবসাধনায় বসিয়া আছেন। আমি সেই ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় ভীত হইয়া ডাকিলাম "বাবা"। কিন্তু কোনই উত্তর পাইলাম না—উপরন্তু কাল ভৈরব সেই পত্রহীন বৃক্ষশাখা হইতে এমন ভাবে আমার দিকে চাহিলেন যে ভয়ে আমি প্রায় শুকাইয়া এতটুক হইয়া গেলাম। হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল,—"মা কৈ?"

সেই মহাস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সেই করুণ শব্দ হয়ত জগৎপিতার চিত্তব্যোমের পরম শঙ্কের স্তব্ধতাও ভাঙ্গিয়াছিল। তাই হঠাৎ যোগমগ্ন হরের নয়ন তিনটাই খুলিয়া গেল। এবং মুহূর্ত্তের জন্য কি করুণার হাসিতে সেই নেত্র ত্রয় হাসিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই আবার মুদ্রিত হইয়া গেল। আমি ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ নয়ন মুদ্রিত করিলাম। অমনি কি দেখিলাম।—মা আছেন, মা রাজরাজেশ্বরী হইয়াই আছেন! এত দৈন্য এত লজ্জা এত নিরাশার মধ্যেও মা আছেন। "যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু" আছেন, তাঁহাকে এখানে ওখানে সেখানে না দেখিতে পাও তবু তিনি আছেন। যিনি সর্ব্বরূপা যিনি সর্ব্বাণী তাঁহাকে ক্ষুদ্রতার মধ্যে, বিভক্তের মধ্যে, নির্দ্দয় কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলির মধ্যে না দেখিতে পাও তবু তিনি আছেন। এ শুধু অন্ধ অজ্ঞ ভক্তির কথা নয়—এই পতিত অধম জাতির চিরন্তন নির্য্যাতনের পঞ্চ তপস্যাগ্নির মধ্য হইতে লব্ধ ভয়ঙ্করের মধ্যে অভয়ের উপলব্ধি! ক্ষণিকের জন্য এই লজ্জিত জাতির একটী অধমাধম ব্যক্তির চিত্তেও ইহার চিরন্তন দুঃখলব্ধ সত্য বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। দেখিলাম আমারও চিত্ত-কালীদহে মা আমার মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিতে আছেন—আছেন—আছেন। দিক-হস্তিগণ মায়ের মস্তকে নিরন্তর মন্দাকিনী ধারা ঢালিতেছে, বিশ্বপদ্ম মায়ের চরণে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বকে লইয়া সর্ব্বাণী আমার আছেন—আছেন।

আমি মহাপুলকে মায়ের চরণে প্রনাম করিতে যাইবামাত্র আমার মাথাটা বোধ হয় ঠক করিয়া কাঠের চেয়ারের হাতলের উপর পড়িয়াছিল। তাই চমকিত হইয়া চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমার টেবিলের আলোটা ধুমাইতেছে, এবং ঠিক সেই সময় ঘড়ীটা টং টং টং করিয়া কি যে বলিল ঠিক ধরিতে পারিলাম না, তবে আমার নিদ্রাচ্ছন্ন কর্ণে যেন শুনাইল,—আম র্ র্ র্—সং—সং—সং।

বার্দ্ধক্য

[কথক, শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন]

গোপ দস্যুগণ যবে, যাদব-রমণী সবে
করিছে হরণ
অর্জ্জুন কহিল রোষে, "মরিলিরে কর্ম্মদোষে
থাক্ থাক্ আর কিছুক্ষণ।"
দ্রুত স্কন্ধ হ'তে খুলে গাণ্ডীব লইল তুলে
বীর-দম্ভ-ভরে
করিবারে জ্যা-রোপণ ক্ষুব্ধ, চমকিত মন
সে শকতি কে লইল হ'রে ?
নাহি বল, বৃথা দর্প বিষ হীন যেন সর্প
ধরণীতে আর
নাহি কৃষ্ণ, চলে গেছে সকলি হরিয়া নে'ছে
বলীয়ান্ ছিল বলে যাঁর।
ঝরিছে নয়নে ধারা ভাবে জিষ্ণু বাক্য-হারা
একি বিড়ম্বন
যৌবন আছিল যবে বল, প্রভা ছিল তবে
সাথে ছিলে তুমি নারায়ণ ;
আজি জরাগ্রস্ত দেহ, গেছে সবি নাই কেহ
শ্রীমধুসূদন,
তুমিও ত্যজিলে আজ বুঝিলাম পেয়ে লাজ
বৃদ্ধ হ'লে বৃথা এ জীবন।

কাঁচের কাজ

CLASS-BLOWING, GRINDING AND ETCHING

[শ্রীসুরেশচন্দ্র নাগ]

বস্তুর প্রকৃততথ্য অনুসন্ধানের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি করিয়া থাকে। তন্মধ্যে চাক্ষুষ-জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া স্বচ্ছ কাঁচের যন্ত্রে অধিকাংশ স্থলেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সমুদয় সম্পাদিত হয়। বাস্তবিক কাঁচের যন্ত্র তৈয়ারী ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের একটি প্রধান অবলম্বন। আমি এ প্রবন্ধে কাঁচের যন্ত্র তৈয়ারী করিবার প্রণালী বিবৃত করিব।

Acid ও Alkaliর বিদ্যুতের শীতোষ্ণতায় ও আলোকের প্রক্রিয়া কোন্ কোন্ বস্তুর উপর কি কি প্রকার হয় তাহা কাঁচ-পাত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে পরীক্ষা (experiment) করিয়া দেখিবার অন্য কোন সহজ উপায় আমাদের জানা নাই। অভ্র (mica), clear celluloid ও fused silicaর ভিতর দিয়া দেখা যায় বলিয়া এগুলিও সময় সময় ও স্থানবিশেষে যন্ত্র তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঁচের যন্ত্র সহজে তৈয়ারী করা যায়। কিন্তু সহজে ভাঙ্গে, এজন্য ইহার কাজ একটু আয়াস-

সাধ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিও কাঁচে প্রস্তুত হয়।

কাঁচের কাজ তিন প্রকার।

১। Blowing—কাঁচ গালাইয়া পাত্রাদি তৈয়ার

২। Grinding—ঘসিয়া কাটা ও ছিদ্র ও পালিস করা

৩। Etching—মাপের দাগ আঁকিয়া (graduate) মান যন্ত্রাদি (metres) তৈয়ারীকরা।

কাঁচ গালাবার কাজ আবার দুইটি উপায়ে হইয়া থাকে। Pot-blowing ভাটা বা উনানের সাহায্যে কাঁচ তৈয়ারী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ তৈয়ারী হয়।

Table-blowing বা টেবিলে blow-pipeএর সাহায্যে তৈয়ারী কাঁচের নল ও rod হইতে বৈজ্ঞানিক কার্য্যোপযোগী কাঁচ-পাত্র গড়া ও যোড়া হয়। এই Experimental glass blowingএর কথাই কেবল এই প্রবন্ধে লিখিব।

Experimental glass blowingএ যে সমস্ত কাঁচের নল ব্যবহার হয় তাহা sodaglass বা german-glass বলিয়া পরিচিত। English glass বা Lead-glass এই কার্য্যে অনুপযোগী। Table ware ব ঘরের আসবাবএর জন্য English glass বিখ্যাত, এবং ইহা সময়—সময় Crystal বা স্ফটিক নামে কথিত হয়।

প্রথমে কাঁচের সমস্ত দোষ গুণ বিচার করিয়া এবং উহার Constitution বা ধাত নির্ণয় করিয়া, পরে উহাকে কাটিয়া, ছিঁড়িয়া, বাঁকাইয়া, টানিয়া, গালাইয়া, ফুলাইয়া ও যুড়িয়া নানা প্রকারে যন্ত্রাদি তৈয়ার করা যায়। দুই এক বৎসরের পুরাণ কাঁচ সাদাটে হইয়া যায় (frosted), অতএব নূতন কাঁচ, fresh soda-glass ব্যবহার করা উচিত। আস্তে আস্তে গরম ও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা না করিলে কাঁচ ভাঙ্গিয়া যায়। কোন প্রকার খোঁচ (sharp corners) কাঁচ পাত্রে থাকিলে সে পাত্র সহজে ভাঙ্গে, অতএব এবড়ো খেবড়ো যোড়া কোনমতে টেঁকসই হয় না। একবার ফাট ধরিলে ঐ কাঁচ ত্যাজ্য। চারিধারে সমান তাপ দিয়া (heating uniformly) কাঁচের নল গালান উচিত, না করিলে ফুঁ দিয়া উহাকে পাত্রাদি করিবার সময় উহা সমভাবে ফুলিয়া (symmetrically) উঠিবে না। এবং সমান তাপ বজায় রাখিতে হইলে উক্ত নলটিকে সর্ব্বদাই অঙ্গুলি দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কার্য্যোপযোগী রাখিতে হয়। কাঁচের নল ইত্যাদি বাঁকান কিংবা টানিয়া সরু করিতে হইলে উহা কেবল গরম অবস্থাতে করা যায়। এই কয়টি কথা মনে থাকিলে, glass-blowing সহজে আয়ত্ত হয়।

Experimental glass-blowingএ বিশেষ কোন ছাঁচ কিংবা অপর দামী যন্ত্রাদির আবশ্যক নাই। একটি Blow pipe ও একটি Foot bellowsই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর যাহা কিছু লাগে তাহা সবাই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন।

Coal-gas বা Oil-gasএর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া Blow pipeএর ভিতর দিয়া বায়ুর প্রবাহ (blast) একটি নীল বর্ণের অগ্নিশীর্ষ উৎপন্ন করিতে পারে। উহা Blow-pipeএর মুখে নিয়ত সমভাবে শোঁ শোঁ করিয়া জ্বলিতে থাকে। উক্ত শীর্ষের শিরোদেশ (১ম চিত্র দেখ) অর্থাৎ (গ) চিহ্নিত স্থান Oxygenএর আধিক্যবশতঃ আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় না। এখানে তাপ অপেক্ষাকৃত কম, ও Lead-glassএর কাজ ভাল হয়। (ক) চিহ্নিত স্থানে Hydro carbonএর আধিক্য-বশতঃ Reduction কার্য্য প্রবল ভাবে সম্পন্ন হয়। (খ) চিহ্নিত স্থান ইহার সামান্য উপরে, ঐ স্থানে প্রবল তাপ উৎপাদিত হইয়া soda-glassকে একেবারে গালাইয়া ফেলিতে পারে।

একটা কাঁচের নলকে কাটিয়া পুনরায় উহাকে কি প্রকারে যুড়িতে হয়?

একটি কাঁচের নল লও; কাঁচ কাটা ছুরি দিয়া উহাকে (২য় চিত্র দেখ) (ক) চিহ্নিত স্থানে ভাল করিয়া দাগ দাও। পরে উক্ত দাগের দুই পাশে ধরিয়া দুই হাতে টানিতে টানিতে সামান্য বাঁকাইয়া ভাঙ্গ।

এক্ষণে ঐ নলের এক অংশের (৩য় চিত্র দেখ) (ক চিহ্নিত স্থান) এক দিক ছিপি দিয়া বন্ধ কর। এবং

(২য় চিত্র)
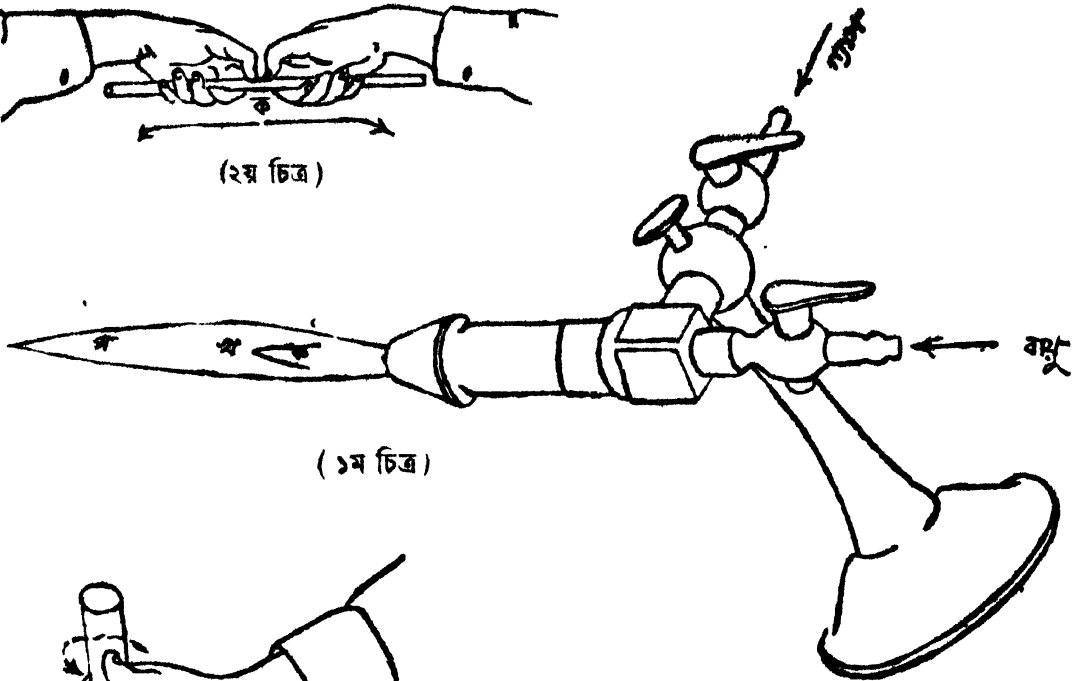
(১ম চিত্র)
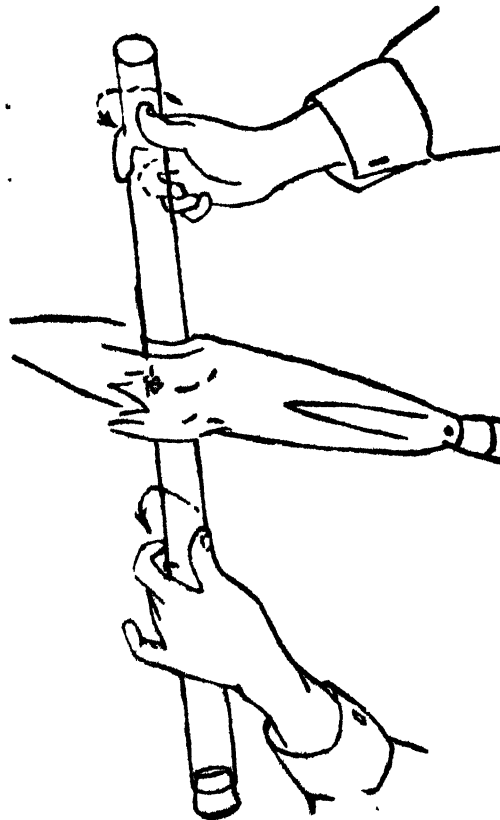
(৪র্থ চিত্র)
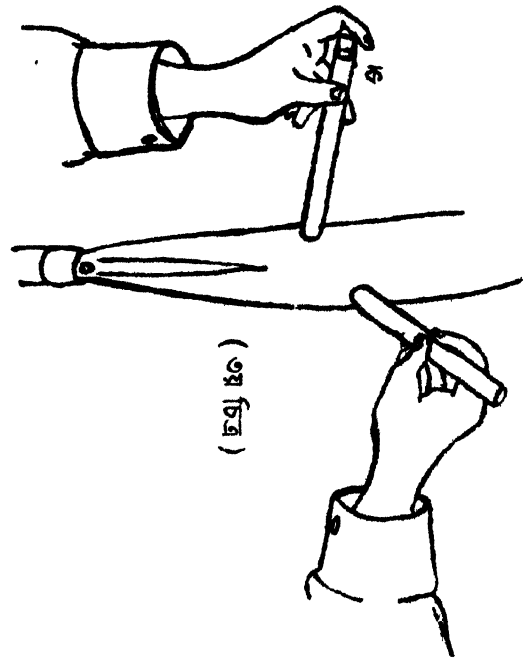
(৩য় চিত্র)

Blow-pipeএর মুখে এই প্রকারে ধরিয়া দুইটি নলকে এক সময়ে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গরম করিতে থাক।

যখন উক্ত নল দুইটির যুড়িবার মুখ দুইটি বেশ গলিয়া আসিবে তখন সাবধানে মুখ দুইটিকে একত্র কর। এক্ষণে যুক্ত নলটিকে শীষ হইতে উঠাইয়া লও। এবং ফুঁ দিয়া যোড়া জায়গাটি একটু ফুলাইয়া লও। ঠাণ্ডা হইবার পূর্ব্বেই উহাকে শীষের ভিতরে ঘুরাইতে থাক। (৪র্থ চিত্র দেখ) এবং যখন চারিধার বেশ গলিয়া আসিবে তখন আবার উহাকে শীষ হইতে উঠাইয়া ফুঁ দিয়া একটু ফুলাইয়া লও যেন উক্ত (ক) চিহ্নিত স্থান, নলটিতে টানিয়া সোজা করিবার সময়, সমান হইয়া যায়।

একটা মোটা Boreএর নল ও একটা Capillary boreএর নল কি প্রকারে যুড়িতে হয়?

Capillary নলটিকে লইয়া—তাহার যুড়িবার দিকটিকে গরম করিলে উহার ছিদ্রটি আপনি গলিয়া বন্ধ হইবে, তখন উহাকে লইয়া ঠাণ্ডা দিকে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিলে অপর দিক ফুলিয়া একটি গোলক (bulb) হইবে। এই গোলক অত্যন্ত পাত্‌লা হইবে, একটু আঘাত দিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল। ইহা করিলে capilaryর মুখ ছড়ান হইবে। তৎক্ষণাৎ উহাকে পুনরায় শীষে ধরিয়া গরম রাখ। এই প্রকার ছড়ান জায়গাটা ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিবে, ও ইহার পরিধি যখন প্রায় মোটা নলটির মত হইবে তখন মোটা নলটি ও শীষের ভিতর গরম কর এবং দুইএর যুড়িবার ধার দুইটি যখন সমান লাল হইয়া আসিবে তখন উহাদিগকে সাবধানে লাগাইয়া দেও। তৎপরে (৩য় ও ৪র্থ চিত্রে) পূর্ব্বের দর্শিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী সমস্ত যোড়া সমাপ্ত কর।

একটা নলকে কি প্রকারে (Draw out) ছুঁচাল করিতে হয়?

৪র্থ চিত্রে দর্শিত উপায়ে নলটিকে সমান তাপে গরম কর। (ক) চিহ্নিত জায়গাটি গরম হইয়া যখন কমলা রং হইবে, তখন উহার পরিধি কমিলেও ধার (wall) মোটা হইবে।

এখন নলটিকে শীষ হইতে সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া লও। (৫ম চিত্র দেখ) এবং অঙ্গুলির মধ্যে ঘুরাইতে ঘুরাইতে দুই হাতে আস্তে আস্তে দুই দিকে টান। এইরূপ করিলে নলটি (ক) চিহ্নিত জায়গায় ছুঁচাল হইবে।
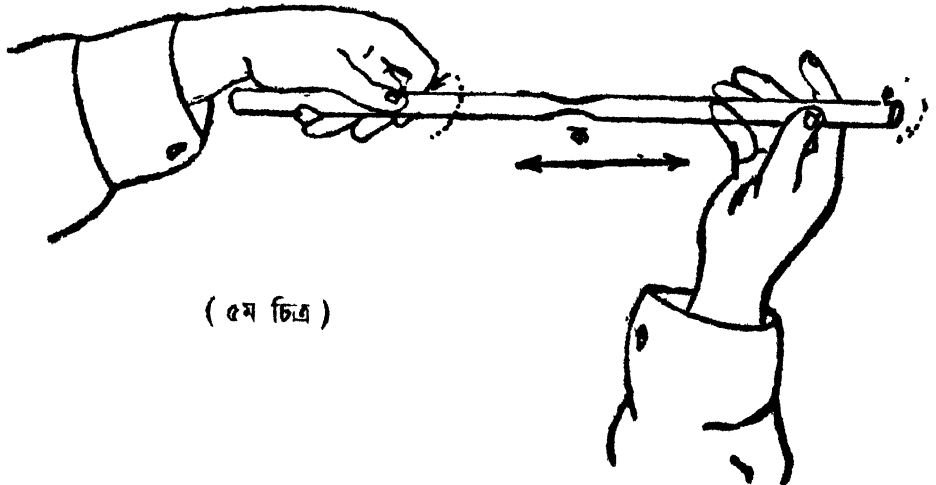
(৫ম চিত্র)

দেউলে।

[শ্রীপুলক চন্দ্র সিংহ]

চলরে ফিরে অবুঝ ওরে
ঘরেই ফিরে চল্,
দাঁড়িয়ে পথে শুনিস্‌নেরে
পথের কোলাহল !
কাঁচিয়ে ঘুঁটি খেল্‌বি ফিরে
খেলার খেলা আবার ফিরে
দাঁড়িয়ে ফাঁকে পথের বাঁকে
তাকাস ফিরে ফিরে,
নাম ধরে কেউ ডাক্‌বেনা-ক
চল্ ফিরে 'চ' ঘরে !

খেলার মুখে দান পড়েনি
তাইতে পেলি লাজ;
হারের কাতে হার্‌লি, শেষে
জিত্‌বি নাকি আজ !
যাচাই করে বাছাই করে,
দেখ্‌লি তবে জনমভরে
দেউলে নিজে বুঝিস্‌নে যে
ফুটলনা-ক আঁখি
মনে বসে মন দেখে যে
দিস্‌নে তারে ফাঁকি !

পরের পিছে ছুট্‌লি মিছে
কি ফল পেলি তায়,
মন দিয়ে মন পাস্‌নে বলে
কাঁদিস নিরুপায় ।
নানান ছলে ভুলিয়ে যারা
পড়ল সরে, কোথায় তারা,
তুই শুধুরে কেঁদেই সারা
শূন্য পানে চেয়ে,
ফাঁকায় একা দেখিস আঁকা
বাঁকা সোজায় ছেয়ে !

নিকট কেন সুদূর হ'ল
আপন জনে পর
জীবন কিসে বিফল হ'ল
শূন্য কেন ঘর !
জগৎ যুড়ে এইত চলে
কার বা হাজে কার বা ফলে
ঘরে ঘাটে কেউ বা পথে
চলছে তবু খেলা,
কেউ বা তীরে, ভাস্‌ছে কারো
কাল সাগরে ভেলা !

ফুলের মাঝে কাঁটার জ্বালা
ফলের মাঝে বিষ,
মনের মাঝে মানের আগুণ
সর্ব্বনেশে রিষ !
কিসের তরে দুষ্‌ব কারে,
আলোর পাশে অন্ধকার এ,
ফণীর শিরে শোভেন মণি
পাবার লোভে ফিরে,
মৃত্যু-মুখে চাস্‌রে যেতে
আবার কেন ফিরে !

রূপ-গাঙেতে বান্ ডেকেছে
ডাকুক্-না-ক বান
ঘোম্‌টা ফাঁকে ত্রস্ত আঁখি
থাক্‌নারে তার টান !
সে সব দিনের ধূলাখেলা
শেষ করে-নে পড়ল' বেলা
যাত্রা শেষে সবাই ভেসে
একলা যাবে হায় !
দিন ফুরালে সন্ধ্যা হলে
কোন্ সে অজানায় !

উপাসনা

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

বাড়ীতে বিগ্রহমূর্ত্তি আছেন। কেবলমাত্র একা শালগ্রাম শিলা নহেন, হাত-পা-ওয়ালা অষ্টধাতুর গোপাল ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি আমাদের বাড়ীতে বহুদিন হইতে পূজা ভোগ রাগাদি পাইয়া আসিতেছেন। তবে বিশ্বাসের সেই প্রাচীন যুগে পূর্ব্বপুরুষের হাতে-দেহে-মনে প্রাণে তাঁহাদের সদাচার সেবা সেবার অনুরূপই হইত, এখনকার এ অবিশ্বাসী যুগে মাদৃশ অবিশ্বাসী হতভাগ্য সেবকের নিকট সে প্রকারের কেন তুলনায় তাহার কোনো অংশের কিছুই হয় না।

একদিন ঠাকুরপূজা করিতে বসিয়াছি—তা পূজার ভাষা কি জানি? আজীবন—জীবনের শৈশব হইতে ... যাহা দেখিয়া আসিতেছি সেই ঠাকুরমার ... পুরাতন দ্রব্যসম্ভারের মত আর কিছু নূতন নাই। সেই বিধি নির্দ্দিষ্ট পুষ্পপত্র হইতে সাজানো— ... রঞ্জিত ফুল—বিল্বদল দূর্ব্বা আতপ তণ্ডুল— ... চন্দনাদি লইয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাদনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি ... সম্পাদনে ধ্যানমন্ত্রে—জপমন্ত্রে—বিসর্জন মন্ত্রে স্বার্থ ... অথজপে কুশীর জলে শ্রীভগবানকে বিসর্জন দিয়া আসিতেছি।

অকস্মাৎ প্রশ্ন হইল মনে—যে সকল ব্যক্তির পূর্ব্ব-পুরুষের স্থাপিত শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি আছেন (একথা বলিবার তাৎপর্য্য—আজকাল এই মহা সমস্যার ভীষণতম অন্ন বস্ত্র চিন্তার যুগে নূতন করিয়া বিগ্রহ উপগ্রহ টানিয়া আনিয়া পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা হওয়া সম্ভবপরই নহে) এবং যাহার পূজা-ভোগ আরতির পরিপাটী ব্যবস্থা আছে; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পূজক-হস্তে দেবতার পূজা না করাইয়া নিজেই পূজার্চ্চনা—আরতিতে অধিক কাল ক্ষেপণ করেন—আর যাঁহারা আপনপর নির্ব্বিশেষে জনসমূহের যে কোনোরূপ সাহায্য বা অন্নবস্ত্রের পূজায় ব্যস্ত উভয়ের মধ্যে কাহার ব্রত সত্যগ্রহ?

যিনি শ্রীভগবানের প্রকৃত ভক্ত—যাঁহার মনে মুখে "তাঁহারি" চিন্তা—পূজার্চ্চনায—ভোগ আরতিতে "তাঁহারি" কথা, "তাঁহারি" লীলা—"তাঁহারি" নাম গান যাঁহার প্রাণে সংগীত হইয়া উঠে সে সকল নীরব পূজক—নিভৃত সাধক—অন্তর্লীন মহাপ্রাণের সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। কিন্তু আমার মত লুব্ধ জীব, যাহার পূজা হইলেই ভোগ এবং সে ভোগে রসনা-তৃপ্তিকর দ্রব্যসম্ভারে নিজের উদর পরিতোষ পূর্ব্বক তৃপ্ত করিয়াই যাহার সুখানুভূতি—ভগবান্ যাহার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না—দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণ যাহার প্রবল সৈন্যসামন্ত—তাহার স্থান কোথায়?

শান্তির বর্জ্জন করিয়া—শ্রীভগবানের প্রসাদের নামে সন্নত-দুগ্ধ আতপান্নে আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া লোকনয়নে ভক্তি-মার্গের উত্তরাধিকারিত্বের দাবী করা যাইতে পারে কিন্তু ভগবান বলিয়া যদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে তবে তাঁহার এজলাশে এরূপ স্বত্বের মোকদ্দমায় যে কিরূপ বিচার বা রায় নিষ্পত্তি হইবে তাহার দলিল দস্তাবেজ অজ্ঞাত লোকের অন্ধতম অন্ধকার গর্ভে লুক্কায়িত। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠকগণ (যদিও ইহা প্রবন্ধ নহে একটা সত্য কথা লেখামাত্র) এই প্রবন্ধে লেখককে দল বিশেষের লোক—পৌত্তলিক-বিরোধী—নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক—নরনারায়ণ মতানুবর্ত্তী ইত্যাদি নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন কিন্তু লেখক অহরহ যাহার উপাসনা করে প্রারম্ভিক বক্তব্যে সেই ভোগ ভগবানের আভাষ দিয়াছে।

মন্ত্রার্থ উপলব্ধি না করিয়া—সিদ্ধমন্ত্র প্রভাবে—দ্রব্য মহাত্ম্যে শব্দশক্তি বলে পার্থিব জগতে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে সত্য কিন্তু অসত্যদ্বারা কখনও সত্যবস্তু লাভ হইতে

পারে কিনা?—তাহা স্বীয় স্বীয় মন মহাশয়কে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে বাধা নাই।

গড্ডালিকা-পথে অযথা কালকর্ত্তন না করিয়া কর্ম্ম-জীবনের অমূল্য সময় বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করিলে অসীম উপকার সংসাধিত হইতে পারে। প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী অথবা প্রকৃতি হইতে জীব-কার্য্যে আত্মনিয়োগ বা পরিবর্জ্জন স্বীকার করিলেও এতাদৃশ আত্মপ্রবঞ্চনারূপ কার্য্যে যে কোনো শ্রেণীর লোকের যে অনন্ত ক্ষতি তাহা যে কোনো মতাবলম্বীই স্বীকার করিবেন- কারণ পার্থিব জগতে আত্মসুখ সকলেই বাঞ্ছা করে।

নিজেই নিজের কাছে হ'য়োনা বঞ্চিত
নিজেকে নিজের হ'তে কর সুরক্ষিত॥

বাঙলা দেশের চাষা

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়]

মেঘ জানে গো মোদের ব্যথা,
বৃষ্টি জানে মন,—
লক্ষ্মী মায়ের পায়ে পায়ে
কাতর নিবেদন!
দেয়ার বুকে গুর্ গুরিয়ে
উঠে মোদের দুখ,
মেঘের মাথায় ঝলক দিয়ে
উথ্‌লে উঠে সুখ!
চিত্ত ভরে' মর্ত্ত্য পরে
মেঘেরি ডাক শুনি,
আকাশ চেয়ে নূতন মনের
পঞ্জিকাটি গুনি!
বাঙ্‌লা দেশের চাষা মোরা,
মেঘ তাকিয়ে রই,
মাঠের আলে ঠেকিয়ে মাথা
মনের ব্যথা কই!

লক্ষ্মী মায়ের চরণ-তলে
আমরা বসত করি,
কণক্ ধানে—নেপা-পোছা
ধানের গোলা ভরি।
পোষ পার্ব্বন কোজাগরে
মোদের আঙিনায়
আলপনাতে চরণ ফেলে'
লক্ষ্মী দেখা দেয়।
পউষ মাসে লক্ষ্মী বাঁধি
নতুন সোণা খড়ে,
সিঁদূরকোটো কড়ি দিয়ে
লক্ষ্মী পাতি ঘরে।
বাঙ্‌লা দেশের চাষা মোরা,
মেঘ তাকিয়ে রই;
মাঠের আলে ঠেকিয়ে মাথা
মনের ব্যথা কই।

আর জানিনে দেবতা কোন,
　　শাস্ত্র জানিনাক' ;
তোমার দু'টি রাঙা পায়ে
　　রাখো মোদের রাখো।
ক্ষুধায় যে জন যোগায় মুখে
　　অন্ন দুই মুঠি
তারেই মোরা দেবতা বলি,
　　তারই পায়ে লুটি।
বুকে তোমার মেঘের স্নেহ,
　　কাঁখে সোণার ঝাপি,
দাঁড়াও এসে মধুর হেসে
　　আলেরি কোল ছাপি' !
বাঙলা দেশের চাষা মোরা,
　　মেঘ তাকিয়ে রই,
মাঠের আলে ঠেকিয়ে মাথা
　　মনের ব্যথা কই !

দেবতা নিয়ে সারা বছর
　　আমরা কবি ঘর,
তারি পায়ে মোদের যে গো
　　সকলি নির্ভর।
বারি মোদের সুখের ঝাবি,
　　মেঘখানি সম্বল,
বলদ-গরু—মোদের বাছা,
　　ধন কড়ি—ফসল !
বুক জোড়া এই মাঠ খানি গো,
　　মন ভরা মাগ ছেলে,
জীবনখানি মিষ্টি মানি
　　দেবীর কৃপা পেলে !
বাঙলা দেশের চাষা মোরা,
　　মেঘ তাকিয়ে রই,
মাঠের আলে ঠেকিয়ে মাথা
　　মনের কথা কই !

ভ্রাতৃ-বধূ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

কয়দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর—হঠাৎ সেদিনকার সকাল—মেঘহীন নির্ম্মল নীল আকাশে, পরিপূর্ণ শোভায়—শরৎ শ্রীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিল। শেফালি তাহার কোরক-জীবনের দুঃস্বপ্ন বিজড়িত নিদ্রাত্যাগ করিয়া শুভ্র-সুন্দর হাসিটি শরতের বর্ষা-ধৌত নব-নির্ম্মল শষ্পচরণে নিবেদন করিয়া ধন্য হইল।

প্রভাত এই আনন্দ সংবাদটি ধরণীর ঘরে-ঘরে প্রেরণ করিয়াছিল। বিছানার উপর অনেকখানি আলো আসিয়া পড়াতে অমরেন্দ্র মাথা তুলিয়া পূর্ব্বের জানালা দিয়া দেখিল—আকাশে মেঘ নাই—উষার রক্ত-চেলির আঁচল-খানি ঝলমল করিতেছে। ফিরিয়া দেখিল বধূ রমা তখনো নিদ্রামগ্ন। তাহার কপোলে আকাশের রক্তিম আভা প্রতিফলিত—ওষ্ঠাধর ঈষৎ কাঁপিতেছে।

সে চুপ্ করিয়া পাশে বসিয়া রমাকে দেখিতে লাগিল—

এমন করিয়া দেখিয়া লইবার অবসর বড় একটা ঘটে না। সংসারের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া রমা যখন ঘরে আসে তখন অমরেন্দ্র গভীর নিদ্রিত থাকে—এবং সকালের আলো ফুটিবার আগেই সে স্বামীর পার্শ্ব হইতে পলাইয়া বধূজনোচিত লজ্জার খ্যাতিটিকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করে।

কিছুক্ষণ পরে অমরেন্দ্র একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল, কেন রমার ঘুম ভাঙ্গিতেছে না! সকালে সে'ত এমন করিয়া কোনদিন ঘুমায় না। ধীরে ধীরে কপালে হাত দিতেই দেখিল, তাহা উত্তপ্ত—সেই সঙ্গে-সঙ্গে রমাও চক্ষু চাহিয়া ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া মেঝের উপর দাঁড়াইয়া—অমরেন্দ্রের প্রতি করুণ দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল,—"এত বেলা হয়েছে—আমাকে ডেকে দাওনি কেন? দিদি কি বল্‌বেন, বলত?"

অমরেন্দ্র বলিল, "তোমার জ্বর হয়েছে যে।"

রমা একটি ছোট্ট মৃদু হাসিল। ঐ ছোট হাসিটির ভিতর নারী-জীবনের অনেকখানি রহস্য নিহিত ছিল। জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিয়া চলিতে গেলে চলে কি?

এমন সময় গঙ্গামণি, মহেন্দ্রের বড় মেয়ে, ঘরের বাহিরে থাকিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "খুড়িমা, মা বল্লে, টে'পির মা, কাল বলে গেছে সে আস্‌বে না—এত দেরী করে কাজ সুরু করলে চল্‌বে না।"

মহেন্দ্র অমরেন্দ্রের দাদা। গঙ্গামণির বয়স এগার বার হইবে।

রমা তাড়াতাড়ি খিল খুলিয়া ফিস্ ফিস করিয়া বলিল—"আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, গঙ্গু।"

গঙ্গা। দুই-চোখ ঘুরাইয়া বলিল—"এখন উঠলে? বাবা!"

গঙ্গা চলিয়া গেল—তাহার পায়ের শব্দে হয়ত মাটি কাঁপে নাই—কিন্তু রমার ক্ষুদ্র, ভয়ভীত হৃদয়খানি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁপিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরের সময় মহেন্দ্র আহার করিতে বসিয়াছিলেন তাহার বহু পূর্ব্বে অমরেন্দ্র কাজে বাহির হইয়া গেছে। আট-টা পঁয়তাল্লিশ না ধরিতে পারিলে 'শিয়ালদা' হইতে দেড়-মাইল হাঁটিয়া আপিসে, সময়ে পৌছান যায় না। সাহেবের মেজাজ বড় কড়া; ততোধিক বড় বাবুর। সূর্য্যের উত্তাপ বাঁচাইবার জন্য ছাতি মাথায় দেওয়া চলে—গায়েও ফোস্কা হয় না; কিন্তু বালির তাৎ বড় নির্দ্দয়!

সম্মুখে গৃহিণী অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা;—হাতে, হাতার বদলে, দোদুল্যমান্ হাত পাথা।

সুক্তনি দিয়া ভাত মাখিয়া খাইতে খাইতে কর্ত্তা বলিলেন—"খাসা রান্না হয়েছে—আজ,—বৌমা আমার

জগদম্বা স্তব্ধ হইয়া এই সুখ্যাতি শুনিয়া লইলেন। রান্না ঘরের দোরের ফাঁক দিয়া রমা দেখিতেছিল—তাহার মুখখানি হর্ষ-বিকচ হইয়া উঠিল।

আরম্ভেই যদি অভিনেত্রী গানটা বেসুর এবং বেতালে ধরিয়া বসে তাহা হইলে তাহাকে লয়ে এবং সুরে ফিরাইয়া আনা কঠিন হয়। প্রারম্ভে মহেন্দ্র এই দোষ করাতে সেদিনের সাংসারিক আলোচনা মোটেই জমিতে ছিল না।

গৃহিণীকে অতিরিক্ত গম্ভীর দেখিয়া মহেন্দ্রও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। যে মেঘ আরম্ভেই ডাকিতে থাকে—তাহাকে ভয় না করিলেও চলে,—কিন্তু স্তব্ধ-মৌন মেঘ দেখিয়া পথিক থমকিয়া দাঁড়ায়—তাহার সম্ভাবনা যে বৃহৎ!

দুধটা গরম করিবার জন্য উনানের উপর বসাইয়া দিয়া রমা অবসর বুঝিয়া দোরের ফাঁকে চোখ দিয়াছিল। তাহার পর ব্যঞ্জনের সুখ্যাতি শুনিয়া কিছুক্ষণের জন্য কোন কথাই আর তাহার মনে রহিল না। ইত্যবসরে দুধ উথলাইয়া উঠিয়া খানিকটা উনানের মধ্যে পড়িয়া যাওয়াতে একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ বাহির হইল।

মহেন্দ্র বলিলেন—"কিসের একটা পোড়া গন্ধ যেন।"

জগদম্বা বলিলেন—"আর কি—আমার কপাল

পড়েছে—তোমার চার-পেয়ে লক্ষ্মীটি দুধ চড়িয়ে—ঘুম দিচ্ছেন।"

মহেন্দ্র বলিলেন—"কেন? তাঁর শরীর ভাল নেই?"

জগদম্বা তখন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আর হাড় জ্বালিও না বল্‌চি। সমস্ত দিন ও' হাড়ে-নাড়ে জ্ব'লে ম'লুম—তার উপর তোমার ঐ কচি খোকার মতন কথা শুনে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—ধর ধর তোমরা ওই গুণের ধুচুনিটিকে নিয়ে—আমি দিনকতক বাপের বাড়ী যাই—আমার হাড়ে দুর্ব্বো গজাক্‌——"

মহেন্দ্রনাথ গৃহিণীর বচন-সুধার সহিত গাঢ় গব্য-রস পান করিয়া—বিশ্রাম করিতে গেলেন।

সকাল হইতে বকুনি খাইয়া রমার আত্মতৃপ্তি হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু অন্ন তাহার কণ্ঠ দিয়া নামিতে চাহে না। কোনো রকমে চুলটা দিয়া বাঁধিয়া—শকড়ি এবং পোড়া বাসন লইয়া সে ঘাটে চলিয়া গেল।

টেঁপির মা আসিয়া বলিল, "ছোট মা, খাওনি যে?"

রমার দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয় আর কি!—অতি কষ্টে রোধ করিয়া বলিল—"আমার বোধ করি জ্বর হয়েছে, টেঁপির মা।"

টেঁপির মা সস্নেহে বলিল, "তবে কেন মা, তুমি এই এঁদো জলে—ভিজে কাপড়ে রয়েচ। ঘরে যাও গো—ঘরে যাও।"

রমা গৃহে ফিরিল। টেঁপির মা পুকুরধারে বসিয়া বক্ বক্ করিতে লাগিল।

"কচি মুখখানি শুকিয়ে গেছে—তাও কি কেউ দেখতে পায় না। ওমা—এমনও যে হয় তা জন্মে দেখিনি।"

গঙ্গামণি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া ডিটেক্‌টিভের কাজ করিত। খুড়িমার জ্বরটা যে একটা সম্পূর্ণ বানান গল্প তাহা সে নিজে বিশ্বাস করিয়াছিল—ভাত না খাইবার যে কি কারণ তাহাও তাহার অবিদিত ছিল্‌না। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় রাগ হইল টেঁপির মার স্নিগ্ধ বচনে। সে গিয়া বর্ণান সমেত সব কথা জননীর নিকট হাজির করিল। আর কি রক্ষা আছে!

অলক্ষণের মধ্যে পুকুর পাড়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। টেঁপির মার চেঁচাড়ির মত চেরা গলা, ভাঙ্গা কাঁসরের মত যখন বাজিয়া উঠিল—তখন কর্ত্তা ত্রাসে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং ছেলের দল উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া আসিল। কলহপ্রিয়া গৃহিণী দেবর্ষি নারদের নাম জপ করিতে লাগিলেন এবং পাড়ার সেরা দুষ্ট ছেলেরা জুতা উল্‌টাইয়া দিয়া হর্ষে দু-কাটি বাজাইতে লাগিল।

টেঁপির মা জীবনে অনেক মিথ্যা বলিয়া অনেক প্রতারণা করিয়া বুঝিয়াছিল—যে কিছুতেই কিছু হয় না; কপালই সম্বল ফলে—অতএব মিথ্যা বলিয়া, পরের খোসামুদি করিয়া লাভ কি? গতর খাটাইয়া দু-মুঠো জীবিকা উপার্জ্জন করিতেই হইবে—তা' তোমার ঘরেই হউক—আর অপরের ঘরেই হউক। তাই সে হ'ক বলিতে পিছাইল না। ফলে তাহার জবাব হইল।

স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অমরেন্দ্র কতকটা উদাসীন ছিল। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা নিশ্চয়ই পছন্দ করিবেন না। দেশে ক্রমেই নারীর প্রতি, আরো সত্য করিয়া বলিতে গেলে, স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য জ্ঞানটা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ ইহাকে ইংরাজি শিক্ষার সুফল বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমাদের গোবিন্দ খুড়ার মত অতি বিচিত্র,—তিনি বলেন আপিসে স্ত্রীর অসুখ বলিয়া ছুটি চাহিলে সাহেব দ্বিরুক্তি না করিয়া ছুটি দেন; কিন্তু বৃদ্ধা মাতাকে অন্তর্জলি করা হইয়াছে বলিলেও চক্ষু রক্তবর্ণ করেন। সনাতন ভারতবর্ষ স্ত্রী রত্নের,—মজ্জাগত নিবৃত্তি বশতঃই হয়ত—উচিত মূল্য জানিত না এবং বুঝিত না; কিন্তু সে ভ্রান্তি ভগবৎ-কৃপায় এবং মহদৃষ্টান্তে অচিরে দেশ হইতে দূর হইবে—ইহাই তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র ভরসা!

যাহারা অমরেন্দ্রকে চিনিত তাহারা কিন্তু তাহাকে দোষ দিত না। একান্নবর্ত্তীর ঔদাসীন্য অন্যতম স্বতঃসিদ্ধ। সেখানে কর্ত্তাই একমাত্র শক্তিমান্—এবং বাকি সকলে তাঁহার হাতের পুতুল—অমরেন্দ্র এই কথা বুঝিত—পুতুল কি কথা কহে?

টেঁপির মা চলিয়া গেল; কিন্তু সংসার চক্র তেমনি অবিশ্রান্ত গতিতেই ঘুরিতে লাগিল। রমার দোষ—সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—তাই তাহা তাহার বুকের উপর দিয়া চলিল। রমা ভাবিল রথের চাকা ত' ধরিত্রীর বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়—কৈ তিনিত কিছু বলেন না। তবে সেই বা কেন বলিবে?

মহেন্দ্র পুরুষ—নির্গুণ ব্রহ্মের অংশ—প্রকৃতি চালাইলে তিনি চলেন। তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই—প্রকৃতির চক্ষু দিয়া তিনি দেখেন—প্রকৃতির কাণ দিয়া তিনি শুনেন—নিজের বুদ্ধি দিয়া চলিতে গেলেই প্রলয় হয়—তাই আবার তিনি ধ্যান-মগ্ন হইয়া নির্গুণতার তপঃসাধনায় রত হন।

ফলে এক রবিবারে অমরেন্দ্র উপলব্ধি করিল যে রমা জীবনের পথে অত্যন্ত বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে—আর বুঝি ধরিয়া রাখা যায় না।

রবিবার দিন দুই ভাই একত্রে আহার করিতে বসিত। ইহা একটা মৌলিক প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শনিবারে কলিকাতা হইতে বাজার আসিত—এবং রবিবারে জগদম্বা তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি, কলা-কৌশলের নৈপুণ্য দেখাইয়া দুই ভাইকে চমৎকৃত করিতেন।

সকালের আটটা পঁয়তাল্লিশ ধরিবার যোগাড়-যন্ত্র রমাই করিত। সেটা ত' বড়-বেশী কিছু নয়—স্ত্রী-জাতির পরম-ধর্ম্মই ত' পতি-সেবা। তাহার পর জগদম্বা যথা সময়ে স্নান-আহ্নিক সমাপন করিয়া, পিত্ত-পড়া নিবারণের জন্য এক বাটি মিছরির সরবৎ পান করিয়া, গালে দোক্তা-মিশ্রিত এক ট্যাপর পান গুঁজিয়া, কর্ত্তার জন্য পঞ্চ-ব্যঞ্জন রাঁধিতে বসিতেন। হাজার হউক বয়স হইয়াছে—টুকি-টাকি মুখ-রোচক একটু-আধটু—না করিয়া দিলে মুখে যে ভাত উঠে না।

রমার সেই সময় জ্বর আসিত—সে আর বসিতে পারিত না। রান্না ঘরের ভিজা মাটির উপর আঁচল পাতিয়া সে কিছুক্ষণের জন্য অচৈতন্য অবস্থায় কাটাইত। জগদম্বা বলিতেন—লাগানি-ভাঙ্গানি করিতে তাহার রাত কাটিয়া যায়—তাই এই অকাল-নিদ্রা—তাই শরীর দিন-দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। ইহাও তাহার চালাকি এবং তাঁহাকে জব্দ করিবার উপায়। কাহিল হইয়া পড়িলে আজ-কালকার ছোঁড়ারা স্ত্রীকে কাজ করিতে দেয় না; অতএব সংসারের সম্পূর্ণ ভার ত' তাঁহার কাঁধে আসিয়া পড়িয়াছে—তিনি আর পারিয়া উঠিতেছেন না। মহেন্দ্র সেই কথা শুনিয়া ব্যঞ্জনা হীন স্তব্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার কর্ণে টেঁপিরমা'র পরম সত্যটি কিন্তু অকারণে মৃদু-গুঞ্জন করিয়া যাইত। সে বলিয়াছিল সাতটি শেয়াল পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়াও ঐ দেহখানি নিঃশেষ করিতে পারিবে না।

সেদিন দুই-ভাই আহার করিতে বসিয়াছে। জগদম্বা মলয় পর্ব্বতের মত মধ্যস্থলে বসিয়া হাতপাখা নিঃসৃত মৃদু সমীরণ বীজন করিয়া মক্ষিকুলকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন—এমন সময় গঙ্গামণি দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়া এক অভিনব শব্দের দ্বারা জ্ঞাপন করিল যে তাহার ক্ষুধাকে নিবৃত্ত রাখা আর সম্ভবপর নহে।

জগদম্বা এক নিশ্বাসে জ্বলিয়া উঠিয়া—গঙ্গাকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন—"যা না, খুড়িমাকে বল্‌গে—তিনি দেবেন।"

কঠোর হাস্য করিয়া জগদম্বা বলিলেন—"ভীমরতি হয়েচে কিনা—রোজ শুনচ যে তার ঠাকুরপোর পেছন ফিরতে তর সয়না—সেকি জেগে?—কাল আবার শনিবার গেছে—হুঁ।"

অমরেন্দ্রের সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার প্রতি চকিতে একবার চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বৌমাকে একটু বুঝিয়ে বলো—বাস্তবিক এমন করলে সংসার চলে কেমন করে?"

অমরেন্দ্র ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

জগদম্বা সুরকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বুঝবে ঠাকুপো—মনে করচ আমরা পেছু লাগি—আব তোমার দোষও দেই নে—অতলাগন্-ভাঙ্গনে—অমরত'ও যে বিষ হয়ে উঠে। বাপ্‌রে এ বয়সে অনেক দেখ্‌লাম—কিন্তু এমনটি—দেখিনি—দেখব না;—বুদ্ধির ক্ষুরে নমস্কার!—কর্ত্তা ঠিক বল্‌তেন্—মেয়ে আন্‌বে মুখুটিব ঘর থেকে—দূব থেকে চাটুয্যেকে পেবনাম করবে—তা এঁব ত কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই—হ্যাদড় থ্যাস্—গোবব-গণেশ।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিল। মহেন্দ্র মনে কবিলেন এই সুযোগে ভাইটিকে আবো দু-কথা বুঝাইয়া বলিলে হয়ত' একটা উপায় হইবে। তাই তিনি বলিলেন—"সংসারে একটা উদাসীন থাক্‌লে চলে কৈ—একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে তুল্‌তে হবে—মা থাক্‌লে তোমায় কিছু বল্‌তুম না। তাঁব রাজ একজনে কত করবে—বিশেষতঃ আজকালকার মেয়েবা যেন কেমনধারা একটু তেড়া-বেঁকা ধবণেব।"

অমবেন্দ্র এবার কথা কহিল;—আপনারা যা ভাল বোঝেন কববেন—শাস্তি দিতে হয় দেবেন—আমি—" বলিতে বলিতে আর কিছু বলিল না।

এইখানেই সেদিনের আলোচনা বন্ধ রহিল—কারণ টেঁপিব-মা আসিয়া উঠানে বসিতেই—জগদম্বার মন তৎ-প্রতি প্রধাবিত হইল। তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"তুই মাগি, এই অসময়ে—খাবার-দাবাব সময় বুঝে কি কত্তে এলি?"

জগদম্বার কথায় যথেষ্ট বিষ ছিল এবং টেঁপির-মা তাহা সহিবার পাত্র নয়।

সে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "দেখ বড়মা, মুখ সাম্‌লে কথা কোয়ো—এ'তো ছোট-মা নয় যে ঠোঁট সেলাই করে বসে আছে—মাগি-ছাগি বলা আমার সইবে না—বলে দিচ্ছি। কেন এসেছি—তা কি জান না? গতর খাটিয়ে যা কামিয়েছি—তার কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে—আদায় করতে এসেচি—তোমরা বে'মানি. করতে পার—কিন্তু ছোটবাবু ত' আছে—আজ একটা হেস্ত নেস্ত করে তবে যাবো।"

জগদম্বা রাগে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। উঠানের কোণে একটা মুড়ো—খেংরা ছিল—সেটা বজ্র মুষ্টিতে ধরিয়া—তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"আর একটি কথা কইবি ত' ঝেঁটিয়ে তোর মুখ গুঁড়ো করে দেব।"

কিন্তু টেঁপির মা বয়সে পুরুষের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে—সে দমিবার পাত্র নয়—সে বলিল—"মার্‌না দেখি—মাগি তোর কত বড় যুগ্যোত্তা।"

মলয় পর্ব্বত অগ্নি বমন করিল। ঝেঁটা মারিতেই টেঁপির মা তাহা কাড়িয়া লইয়া জগদম্বার মুখে মারিতেই—গজ-কচ্ছপেব যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

মহেন্দ্রের রাগে কাছা-কোঁচা বিলকুল খুলিয়া গেল—তিনি এমন অসামাল হইলেন যে আসন হইতে উঠিতে উঠিতে দুইবাব পড়িয়া গেলেন।

অমরেন্দ্র উঠিয়া গিয়া—বৌ-দিদির পায়ে ধরিয়া বলিল—ছি ছি বৌদি কি করচ—ছোটলোকের গায়ে—হাত দিতে আছে?—পায়ে পড়ি তুমি ঘরে যাও।"

টেঁপির-মার প্রতি চাহিয়া বলিল, "টেঁপির-মা একি করচিস তুই—বাড়ী যা।—তোব হিসেব করে—পাওনা আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আস্‌ব।"

জগদম্বা ঘরে চলিয়া গেলেন। টেঁপির মা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"কি করলুম—আমি গো—আমার কি দশা হ'বে গো—ওগো আমার হাতে যে দড়ি পড়ল—"

অমরেন্দ্র তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

৪

টেঁপিরমার পাওনা শোধ করিয়া অমরেন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া দেখিল যে জগদম্বা পিত্রালয় গমনের জন্ম প্রস্তুত। তাঁহার পোষা-মানুষটি কোমর বাঁধিয়াছেন।

কর্ত্তার ইচ্ছা যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন তাহাকে বাধা দিতে যাওয়াটা ভুল!—কর্ম্ম সম্পাদনের যন্ত্র-গুলি সেই সঙ্গে এমন ধারাল এবং সুচাল হয় যে—সমস্ত কর্ম্মটাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রতীত হয়। সেই মুহূর্ত্তের জন্ত নতি স্বীকার

বুদ্ধিমানের কাজ—অভিজ্ঞতার দ্বারা অমরেন্দ্র ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল।

কাপড় চোপড় অচিরে পোঁটলা পুঁটলির আকার ধারণ করিল এবং বাক্স পেঁটরা সচল হইল। জগদম্বা কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না কথা কহিলেন না। রমা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল—তিনি মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

কর্ত্তা থাকিবে, লাঠি হাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন—অমরেন্দ্র গিয়া প্রণাম করিল—তিনি কথা কহিলেন—"সংসারের অশান্তিতে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে আছে—দিন কতকের জন্যে ঘুরে আসুক, মনে করলাম—কি বল?"

অমরেন্দ্রের হাসি আসিতেছিল—সে বলিল, "বেশত। —আপনি কি ছুটি নিয়েছেন?"

মহেন্দ্র বলিলেন—"না, কৈ আর ছুটি পেলাম, সুমুখে পুজো—বাবুরা ছুটি দিলেন না—মাত্র দুদিনের ফুরসতে—রেখে আসতে যাচ্ছি।"

জগদম্বা গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন—গঙ্গা তাঁহার পার্শ্বে বসিল,—সামনের দিকে, গহনার বাক্সের পাশে কর্ত্তা ঠেসা ঠেসি করিয়া একটু জায়গা করিলেন। গাড়ী ষ্টেশন মুখে ছুটিল।

অমরেন্দ্র ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন রমা চুপটি করিয়া পাশ্তলার দিকে বসিয়া আছে। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িতেই—রমা তাহার পা দুখানি কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া—ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

গরম দু-খানি কচি হাত, কেবল সেবার কাজে লাগিবার জন্য নিয়ত উৎসুক। নারী সংসারের পূজায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছে। তাহার অধিকারের কথা জানে না, ভাবে না—সে প্রসঙ্গ উঠিলে কাণে আঙ্গুল দিয়া পাপ হইতে আত্মরক্ষা করে।

অমরেন্দ্র ডাকিল,—"রমা শোবে এস।"

রমা ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল। তাহার উষ্ণ কপোলের উপর হাত রাখিয়া অমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ বুঝি জ্বর ছাড়েনি?"

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কি জানি।"

"তাইত" বলিয়া অমরেন্দ্র গভীর চিন্তামগ্ন হইল। সোম-মঙ্গল দুইদিন মহেন্দ্র বাড়ী থাকিবেন না। ইত্যবসরে ডাক্তার ডাকা যায়। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতে এই কাজ করা কি উচিত হইবে? তাহার চেয়ে বড় প্রয়োজন কিন্তু রমাকে জল-তোলা বাসন মাজার কাজ হইতে নিবৃত্ত করা। রান্না সে ছাড়িবে না। টেঁপির-মাকে ডাকিলে সে আসিয়া কাজ করিয়া দিবে—কিন্তু সেটাই কি উচিত হইবে?

তবে কি করা যায়! কিছুনা—কিছুনা—কিছুনা—অমরেন্দ্র আর ভাবিতে পারিল না। কেই বা রোধ করে সেই বিরাট শক্তির বিপুল ইচ্ছাটিকে। কতবার উঠিল—জল খাইল—ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক করিয়া পায়চারি করিল। ঘুম আসে না। বুকের মধ্যে অশান্ত মন, ক্ষোভে দুঃখে আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রমা শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে—দীপের স্তিমিত আলোকে দেখিল—তাহার অধর প্রান্তে হাসির ম্লান রেখা?

আপিসের সোমবারের জমা কাজের কথা মনে করিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল।

নিশাবসানে সে স্বপ্ন দেখিল—সাগরের তীরে একটা বহুমূল্য মাণিক কাদার মধ্য হইতে কুড়াইয়া পাইয়া যত মুঠার মধ্যে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে ততই পিছলে তাহা মুঠা হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। ক্রমে হাত অবসন্ন হইয়া আসিল—ওদিকে সমুদ্র ফুলিয়া উঠিয়া দুলিয়া দুলিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—আর বুঝি মাণিকটিকে ধরিয়া রাখা যায় না—

ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল সে রমাকে বাহুবন্ধনে বুকের মধ্যে টানিয়া রাখিয়াছে। রমা অসম্ভব কাঁপিতেছে—তাহার আবার জ্বরের উপর নূতন করিয়া শীত দিয়া জ্বর আসিয়াছে।

রমাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া—কেমন করিয়া সে আফিস যায়—কেমন করিয়া বাড়ীর বাহির হয়! চুপটি করিয়া গালে হাত দিয়া অমরেন্দ্র ভাবিতে লাগিল। বড়বাবু ও সকলের উপর নারাজ—পুরাতন লোকের উপর

তার মোটেই প্রীতি নাই। নূতন লোক বাহালির সময় তার একটা মরশুম পড়িয়া যায়। কেহ হাঁকে দু-শো—কেহ দিতে চায় চার-শো। পূজার পূর্ব্বে তেমন একটা সুযোগ ঘটাইবার বিধিমত চেষ্টাই তিনি করিবেন—যদি আজ বিনা নোটিশে সে অনুপস্থিত হয়।

কিন্তু উপায় কি? একবার পোষ্টাফিসে যাইতে পারিলেও ত' হইত। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া দোরটি নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া বাড়ির বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় গয়লানী তাহার দুধের কেঁড়ে লইয়া প্রবেশ করিল।

অমরেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া একটুই আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "কেষ্টোর মা, তুমি একটু বস্‌বে? ছোট বৌএর বড় জ্বর হয়েছে—আমি একবার ও-পাড়ায় গিয়ে ডাকঘরে খবর দিয়ে আসি—যে আপিষ যেতে পারব না।"

কেষ্টর মা কহিল—"বাবু বাড়ীতে আর কেউ নেই নাকি?"

"না, কাল রাত্তে বড় বৌ বাড়ী চলে গেছেন।"

"আচ্ছা বাবু—থাকৃচি আমি—তুমি এসো গিয়ে।"

ডাকঘর হইতে ফিরিবার পথে টেঁপির মার সহিত দেখা হইল—সেস্বতঃ প্রনোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ছোট বাবু—আমার ছোট মা কেমন আছে?"

"তার ভারি জ্বর, অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে রয়েছে—আজ আর আমার আপিস যাওয়া হবে না"

বেলা ৩টার সময় রমা চক্ষু চাহিয়া দেখিল, অমরেন্দ্র তাহার কাছে বসিয়া আছে—তাহার স্নানাহার হয় নাই।

রমা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। বলিল "তা হবে না—তুমি সমস্ত দিন উপস করে থাকবে—আমি এখন ভাল আছি—"

কিন্তু অমরেন্দ্র কিছুতেই তাহাকে উঠিতে দিল না।

রমার সমস্ত হৃদয়টা বারবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অন্তরের নিভৃতে নিহিত জননীটির নিশ্বাস বাষ্পোচ্ছ্বাসে যেন ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ হইয়া যায় আর কি!

৫

মহেন্দ্র ফিরিয়া উপলব্ধি করিলেন যে ভ্রাতৃবধূর অসুখটি সহজও নয় এবং অল্প দিনেরও নয়। ডাক্তার ডাকিলেন; টেঁপির মাকে হাতে ধরিয়া আনিয়া কাছে বসাইলেন। মোটা পর্দ্দার অন্তরালে যে হৃদয়-বিদারক ব্যাপারটি ঘটিয়া আসিতেছিল তাহার কথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং অমরেন্দ্রের উপর মনে মনে অনেকখানি অভিমানও করিলেন। কেন সে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলে নাই!

পরদিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার ছোট ভগ্নী সুরেশ্বরীর কাছে উপস্থিত হইলেন।

"সুরি, তোকে যে দিন কতকের জন্য আমাদের ওখানে যেতে হবে দিদি!—ছোট মা যে একেবারে লেটিয়ে পড়েছেন।"

"বড় বৌদি?"

"সে বাপের বাড়ী গেছে। তাকে আর আর বিরক্ত করতে চাইনে—আর তার দ্বারা সেবা যত্নও চলে না।"

কষ্টে সুরেশ্বরী হাসি চাপিল। বড় বৌদিদির দেহখানির কথা মনে করিলে তাহার হাসি আসিত।

সুরেশ্বরী যাইতে প্রস্তুত হইল। রমার অসুখ শুনিয়া তাহার শাশুড়ী বলিলেন,—"তবে তুই আর দেরী করিসনে, সুরো—আজই চলে যা। সংসার আমি চালিয়ে নিতে পারবো।"

সন্ধ্যার আগেই মহেন্দ্র ফিরিয়া পরম স্বস্তিভরে রোয়াকের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। অমরেন্দ্র ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। সুরেশ্বরী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

"ছোড়দা, খুব আশ্চর্য্যি হচ্চ না?"

"তুই কোত্থেকে রে?"

"তাই বটে—এই কোলকেতায় রোজ দুবেলা তোমার আনা-গোনা—একটি দিন ভুলেও দেখ্‌তে যাও না—সুরি আছে কি নেই।"

অমরেন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোর ছোড়দার কথা বলিস্‌নে সুরি,—এত বড় একটা কাণ্ড ঘটতে বসেছিল—তা' ওকি আমাকে একটি দিনের জন্যে—একটি কথা বলেচে? ও সন্ন্যেসী—সংসারের খবর রাখেও না—আর রাখ্‌তে চায়ও না—" বলিতে বলিতে অভিমানে মহেন্দ্রের গলা ভারি হইয়া আসিল।

"বেশ আছ—যাহোক ছোড়দা, তুমি।"

অমরেন্দ্র নিরীহের ও নিরুৎবেগ হাসি হাসিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রমা শয্যার উপর চুপটি করিয়া বসিয়াছিল—সন্ধ্যার মলিন আলোকে তাহাকে দীপ শিখাটির মতই দেখাইতেছিল।

চাদরখানা খুলিয়া রাখিতে রাখিতে অমরেন্দ্র বলিল—"শুন্‌লে ত'? অত্যাচার করে করে অসুখ করলে তুমি—আর দোষ হলো আমার। কপালে পুরুষ বটে!"

রমা ম্লান হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

মানুষ খায় দায়, হাসে খেলে আর বলে সে যা করে—তাই সব হয়, সব চলে। হঠাৎ এই সহজ স্রোতটি বাঁকিয়া গেলে ভাবিতে বসে, কেন এমন হয়! যে চালায় তার কথা মনে আসিয়াও যেন আসে না। তাই সবটাকেই রহস্যের মত বোধ হয়। আসল যেটি—কেমন করিয়া তাহা সকলের পিছনে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে! রমার মলিন হাসিতে—সন্ন্যাসীর ত্যাগের তলায়—সকল রহস্যের সমন্বয়রূপে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন—গোপন ছিল—তাহার আভাসটা যেন সকলের মনেই ছায়া ফেলিতেছিল—তবুও যেন স্পষ্ট করিয়া সে কথা মনে করিতে কাহারো ইচ্ছা হয় নাই—প্রবৃত্তি হয় নাই!

খাওয়া দাওয়ার পর সুরেশ্বরী অমরেন্দ্রের স্থান দখল করিয়া বলিল—"আমরা দুটি বোনে থাকব—তুমি ছোড়দা, বড়দার কাছে গিয়ে শোও গে।"

দুই ভাই অনেক দিনের পর এক ঘরে, এক সঙ্গে শুইতে পাইল। দুজনের মনেই কত দিনের পুরাতন কথা জাগিয়ে উঠিল। মা-বাবা—ছুটো-ছুটি আমোদ-আহ্লাদ! তার পর বিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র অনেক দিন পরে অতীত জীবনের কথা মনে করিয়া মনে-মনে সুখ পাইলেন—কিন্তু ক্রমেই যতই নিকটের কথা মনে হইতে লাগিল ততই যেন মনে হইল একটা লোহার বকলস্ তাঁহার গলায় কে জোর করিয়া পরাইয়া দিয়া—সমস্ত স্বাধীনতা—সমস্ত সুখ-শান্তি নিমেষে হরণ করিয়া লইয়াছে।

বিছানার উপর উঁচু হইয়া বসিয়া মহেন্দ্র ডাকিলেন—"অমর, জেগে আছ?"

"কেন দাদা?"

"বৌমাকে কল্‌কেতার কোন ডাক্তার দেখালে হয় না?"

কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া অমরেন্দ্র বলিল,—"কেন? আমাদের নরেশ ত' ডাক্তার ভাল। আপনাকে কি বিশেষ কিছু বলেছে?"

"বলেছে। বলেছে—এর ঢের আগেই চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত ছিল। এযে ঠিক সেই হলো গোড়া কেটে—আগায় জল!"

অমরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

মহেন্দ্র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হায়-হায়! যদি আগে জান্‌তে পারতুম! মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই—এ শাস্ত্রের বচন বড় সত্যি কথা, ভাই—আজ আমার চোখ ফুটল—নূতন করে জ্ঞান হলো।"

একথায় অমরেন্দ্র আর কি উত্তর দেয়!

মহেন্দ্র নিজের মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন—"কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারিনে সমাজের বিধি-বিধান। এক সঙ্গে থাকতে হবে—আর কতক লোকের সঙ্গে কতক লোকের দেখা সাক্ষাৎ হবে না—কথাবার্ত্তা হতে পারবে না! কি করে যে চল্‌তে পারে ভেবেই পাইনে! কর্ত্তা-গিন্নীর ত্যাগের চরম চাই—হুঁ—ঠিক তার উল্টো, ত্যাগ ও' মাথায় থাকুক, সত্যিটুকু বল্লেই যে তিন কুল উদ্ধার হয়ে যেত!"—ইত্যাদি

অমরেন্দ্র আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু মহেন্দ্র, নিদ্রা আসে না দেখিয়া—উঠিয়া তামাক সাজিলেন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া তাহা সেবন করিলেন।

সুরেশ্বরী ও কত রাত পর্য্যন্ত নিজের সুখ-দুঃখের গল্প করিয়া—বলিল, "না ভাই, তুমি ঘুমোও—রোগা মানুষ—আমি আর বক্-বক্ করব না।"

রমা কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রিত হইয়াছিল—হঠাৎ তাহার মনে হইল বুকের উপর কে যেন চাপিয়া বসিয়া তাহার দম বন্ধ করিয়া দিতেছে। কিছুতেই আর নিশ্বাস পড়ে না প্রাণ যায় আর কি!

সুরেশ্বরীকে ডাকিতেই সে উঠিল—রমা বলিল—"ঠাকুর ঝি—আমার প্রাণ যায়;—আর দম ফেল্‌তে পারিনে বুঝি—"

সুরেশ্বরী ছুটিয়া গিয়া ডাকিল—ছোড়দা-ছোড়দা শিগ্‌গীর এসো—ছোট বৌদি কেমন যেন হয়ে গেছে—"

মহেন্দ্র এক লাফে উঠিয়া অমরেন্দ্রকে তুলিলেন—"তুই ছুটে যা—নরেশকে ডেকে আন—একবার দেখে আয় গিয়ে—

অমরেন্দ্র তখনি ছুটিল ডাক্তার ডাকিতে—যাইবার সময় বলিয়া গেল—বোধ হয় ততক্ষণ তর্ সইবে না।"

মহেন্দ্র [illegible] কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না। ছুটিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। রমা ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া রহিয়াছে—বাষ্পোচ্ছসিত কণ্ঠে মহেন্দ্র ডাকিলেন

"—ছোট মা—লক্ষ্মী মা—আমার, কি হয়েছে মা?"

রমা মহেন্দ্রের প্রতি চাহিল—কিন্তু কিছু মাত্র লজ্জা না করিয়া আপনার কন্যার মত বলিল—"বাবা, বড্ড কষ্ট যে—"

আবার চক্ষু উর্দ্ধে উঠিয়া হাত-পা অসাড় হইল। সুরেশ্বরী কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—"দিদি কাঁদিস্‌নে—এই শান্ত নিঃশব্দ মানুষটিকে শান্তিতে চলে যেতে দে সেই শান্তির

দেশে!—মা তুমি থাক্‌বে কেন আমাদের ঘরে?—এই পাপীর ঘরে!—জীবনে বড় ক্ষোভ রয়ে গেল যে একদিনও তোমার মত ব্যবহার তোমার সঙ্গে করতে পেলেম না।—নিজের চোখ দিয়ে দেখলাম না, তুমি কে, তুমি কি?—নিজের কাণ দিয়ে শুন্‌লাম না তোমার সত্যিকার কাহিনী!—ধার করা চোখে—ধার করা কাণে—তোমার সঙ্গে—আমি কি পাষণ্ডের ব্যবহারই না করেছি!—ছোট-মা আমার,—মার্জ্জনা করো এ বুড়ো অক্ষমের অপরাধ—এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে যা কিছু করেছি, স্বেচ্ছায় করিনি—জ্ঞানে করিনি—যখন তুমি তা জান্‌বে-বুঝবে—তখন আমি ক্ষমা পাবো—এই আমার ভরসা—" বলিতে বলিতে মহেন্দ্র আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের রোলে নিশীথ গগন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

* * * *

নরেশ ডাক্তার নাড়ি টিপিয়া—ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—"আপনারা ব্যস্ত হবেন না—কিছু ভয় নেই—এটা একটা, ফিট্ হয়েছে—এখ্‌খুনি ভাল হয়ে যাবে।"

মহেন্দ্রের দুই চক্ষে অশ্রু উদ্দাম হইয়া উঠিল!

বেলা নয়টা-দশটা আন্দাজ একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারের সম্মুখে থামিল। বাহিরের ঘর হইতে চক্ষু তুলিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন গাড়ী খানার মাথায় পরিচিত বিছানা-বাক্স এবং গাড়ীর মধ্যে ততোধিক পরিচিত রমণী মূর্ত্তি তাঁহার বিপুল কলেবর লইয়া বসিয়া। তাঁহার অন্তরাত্মা ত্রাসে প্রকম্পিত হইল।

জগদম্বা ধীর গম্ভীর পদ বিক্ষেপে অন্দরে প্রবেশ করিতেই মহেন্দ্র কাঁধে চাদর খানি ফেলিয়া বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সুরেশ্বরীকে দেখিয়া জগদম্বা বিস্ময় প্রকাশ মোটেই করিলেন না। সে প্রনাম করিতে—বলিলেন—"ভাল আছিস ত?"

এত রোগা কেন?" সুরেশ্বরী কোন কথার উত্তর দিল না।

ঠিক সেই সময়ে খিড়কির দ্বার দিয়া একরাশি মাজা বাসন হাতে টেপির মা প্রবেশ করিতেছিল। জগদম্বার সরোষ দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ যেন তাহাকে নিমেষে দগ্ধ করিয়া দিয়া গেল। হাত হইতে বাসনের বোঝা ঝন্-ঝন্ করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। সে আর মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল না—খিড়কির পথে পুকুরের পাড়ে পাড়ে ছুটিয়া একেবারে ঘরে পৌঁছিল। যাহারা তাহাকে ছুটিতে দেখিল—তাহারা অবাক্ হইয়া গেল—মানুষকে বাঘে তাড়া করিলেও-বুঝি সে অমন করিয়া ছোটে না।

বাড়ীর অবস্থা বুঝিয়া লইতে বেশী দেরী হইল না। নিমেষে-নিমেষে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল—কিন্তু তাহা সম্ভৃত-বজ্রমেঘের মত কর্ত্তার মাথাটির প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া রহিল। কিন্তু পোষা-বাহনটির কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না।

অমরেন্দ্র মহেন্দ্রের অনেক খোঁজ করিল—অবশেষে ষ্টেশনে গিয়া সংবাদ পাইল যে তিনি কলিকাতার টিকিট খরিদ করিয়া সাড়ে দশটার গাড়ীতে রওনা হইয়াছেন।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল—তবুও মহেন্দ্র ফিরিল না।

বড় অন্ধকার রাত্র, অমরেন্দ্র লণ্ঠন জ্বালিয়া ষ্টেশনে তাঁহাকে আনিতে গেল।

পৌনে এগারটার গাড়ীতে মহেন্দ্র আসিয়া নামিলেন! বড় বেশী কথা বার্ত্তা হইল না, দুই ভাই ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

খানিক আসিয়া—নির্জ্জন পথের উপর মহেন্দ্র অমরেন্দ্রের বাঁ হাত খানি চাপিয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে আনিতে মিনতি করিয়া বলিলেন—"ভাই আমার একটী কথা রাখতেই হবে—"

অমরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল মহেন্দ্রের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ—আলোতে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল—চুল গুলি রুক্ষ—মুখখানি শীর্ণ—ঠোঁটের উপর চটা পড়িয়া শুকাইয়া গেছে।

"দাদা—কি হয়েছে?"

"কিছু না ভাই—আগে আমায় কথা দে—বলিতে বলিতে চাদরের খুঁট হইতে একখানি পাঁচ শ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন,—মা আমার কিছুতে বাঁচবে না—তুই বল, কাল তাকে কল্‌কেতায় নিয়ে যাবি—রাক্ষুসি, আমার মাকে আস্ত খেয়ে ফেল্‌বে—তুই বল—কথা দে—"

অমরেন্দ্রের কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল—চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল—সে ভাঙ্গা গলায়—ভাঙ্গা কথায় বলিল, "দাদা, আমি কোনদিনও' তোমার কোন কথার অবাধ্য নই।"

মহেন্দ্র তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"ওই ত' আমার ভরসা,—জীবনের সম্বল।"

ইতিহাস-বিজ্ঞান *

বা

মানব-সভ্যতার প্রকৃতি ও ক্রমিক বিকাশের নিয়ম

[অধ্যাপক— শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম-এ]

বিষয়ানুবন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস-বিজ্ঞানের প্রকৃতি

বিজ্ঞানের লক্ষণ সমূহ

(ক) জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গিত্ব— সত্য সমূহ

(১) শৃঙ্খলাবদ্ধ
(২) পরস্পর সম্বদ্ধ
(৩) পৃথক পৃথক বর্ত্তমান নহে
(৪) পরস্পর বিরোধী নহে

(খ) জ্ঞানের সামান্যত্ব ও সাধারণতা

(১) তথ্য সমূহের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত ঐক্যের আবিষ্কার
(২) সর্ব্বসাধারণে প্রযোজ্য নিয়ম ও সূত্র সমূহের আবিষ্কার
(৩) নিয়ম ও সূত্র সমূহের প্রকৃতি—তথ্য সমূহের মৌলিক কারণ গুলির বিশ্লেষণ
(৪) সুতরাং তথ্য সমূহের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও মৌলিক কারণ সমূহের আবিষ্কার
(৫) কার্য্য কারণ সম্বন্ধের প্রকৃতি—
 i. পারম্পর্য্য
 ii. সাহচর্য্য

(গ) জ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাচিত্ব—

(১) কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের ঘটনার আবিষ্কার (ভবিষ্যতের দ্বারোদ্ঘাটন)
(২) বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন কারণ সমূহের কার্য্যের প্রভাবে ও প্রতিবন্ধকতার ফলে ভবিষ্যতের আভাষ ও ইঙ্গিত মাত্র প্রাপ্তব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ও গণ্ডী

মানব-বিষয়ক তথ্য ও ঘটনা সমূহ

(ক) দেব বিষয়ক ও জড় বিষয়ক নহে

(খ) সমবেত সঙ্ঘ বিষয়ক তথ্য ও ঘটনা সমূহ-ব্যক্তি বিষয়ক নহে

(গ) সর্ব্ববিধ তথ্য ও ঘটনা সমূহ—

(১) ভৌগোলিক
(২) বৈষয়িক
(৩) সামাজিক
(৪) রাষ্ট্রীয়
(৫) নৈতিক
(৬) আধ্যাত্মিক
(৭) ভাষা বিষয়ক
(৮) সাহিত্য ও কলা বিষয়ক
(৯) শিক্ষা বিষয়ক

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস বিজ্ঞানরূপে আলোচিত হইতে

পারে কি না ঃ—ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম বা সূত্রগুলি আবিষ্কার করিবার পদ্ধতি।

(ক)

ইতিহাসালোচনায় অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্ত্তন—প্রাণ-বিজ্ঞানের প্রয়োগে ইতিহাস প্রকৃত "বিজ্ঞান" রূপে আলোচিত হইয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারে।

(খ)

ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের সম্ভবপরতার কারণ—

(১) মানবের প্রকৃতি

(ক) মানব-ব্যক্তির প্রকৃতি—

(১) অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ বিশিষ্ট জীব।

*(২) বিভিন্ন অঙ্গের কার্য্য সমূহ পরস্পর সম্বন্ধ।

(খ) মানব সঙ্ঘ বা সমাজের প্রকৃতি—

(২) বিভিন্ন সমাজাঙ্গের কার্য্য সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ।

২। মানবের সহিত প্রকৃতিও বাহ্য বস্তুর সমন্ধ

(ক) পারিপার্শ্বিক পদার্থ ও শক্তি সমূহ মানবের কর্ম্মক্ষেত্র—ইহার

(১) অবস্থান
(২) আয়তন
(৩) আকৃতি
(৪) স্থলমণ্ডল
(৫) জলমণ্ডল
(৬) নভোমণ্ডল

(খ) মানব-ব্যক্তি ও সমাজের উপর ইহাদের আধিপত্য।

(গ) ভূগোল ইতিহাসের আধার, ভিত্তি, সুতরাং কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্তা

(ঘ) ভূগোল প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের "বিজ্ঞান"

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাসের প্রধান প্রধান সূত্র বা সাধারণ নিয়ম সমূহ—সমাজ ও বিশ্বের ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনা সমূহের আলোচনার ফলে কোন্ কোন্ সত্যের উপলব্ধি হয়।

(ক) পরিবর্ত্তন

ইতিহাসের মূলকথা (এজন্য ইতিহাসকে পরিবর্ত্তন সমূহের বিবরণী বলা হয়)—মানব ব্যক্তি ও সমাজ নিরন্তর চলন্ত গতিশীল—সর্ব্বদা এক একটী অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কালের ভিতর দিয়া এক একটী ভবিষ্যতে পদার্পন—মানবের সকল অবস্থায়ই এই তিন কালের মধ্যে অবস্থান।

(খ) পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি

(১) দ্বিবিধ

[প্রকৃত প্রভাবে, নিজের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিবার জন্য]

১। পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক [নৈতিক ও প্রাকৃতিক] ভাব ও শক্তি সমূহের উপযোগী হইবার জন্য মানব ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্ত্তন।

২। মানব ব্যক্তি ও সমাজের প্রভাবে পারিপার্শ্বিক [নৈতিক ও প্রাকৃতিক] ভাব ও শক্তি সমূহের পরিবর্ত্তন।

৩। এই জন্য ইতিহাসকে মানব ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধ-নির্দ্ধারক বলে।

(২) জীবনী শক্তির বিকাশ—জীবনের ক্রমিকঅভিব্যক্তি পুষ্টি— উন্নতি—সভ্যতা।

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাসের প্রধান প্রধান সূত্র বা সাধারণ নিয়ম সমূহ—

সভ্যতা

(১) ঊর্দ্ধগতি—উন্নতি—উচ্চে আরোহন।

* (১) অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ বিশিষ্ট সজীব পদার্থ।

(২) জড় জগতের উপর মানবের জয়লাভ—বৈষয়িকতার পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিকতার ক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও অভিব্যক্তি।

(৩) ক্রমশঃ বৃহত্তর সত্য সুন্দর ও কল্যাণের আবিষ্কার—"সৎ" "জ্যোতি" ও 'অমৃতে'র ক্রমিক উপলব্ধি।

(৪) মানবের ক্রমিক সম্পূর্ণতা লাভ, দেবত্ব প্রাপ্তি—আত্মার স্বাধীনতা ও মুক্তি।

(৫) "তম" "অসৎ" ও "অবিদ্যা"র ক্রমিক লোপ—অসত্য, অশিব ও অসুন্দরের নাশ।

(৬) সুতরাং সভ্যতার বিবরণ মানব-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস—নৈতিক জীবনের অভিব্যক্তির নিঃসন্দেহ ও ভ্রমহীন চিত্র।

(৭) সুতরাং ইতিহাস-বিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র (সভ্যতা=মানবধর্ম্ম)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইতিহাসের প্রধান প্রধান সূত্র বা সাধারণ নিয়ম সমূহ

(৩) ব্যবস্থা সংঘটন—

(১) সভ্যতা (মানবধর্ম্ম)র বিকাশের উপায় সমূহ—নৈতিক বেষ্টনী।

(২) উপায় সমূহের বিবরণ—

(ক) প্রতিষ্ঠান

(খ) রীতিনীতি

(গ) যুগধর্ম্ম

(৩) সুতরাং সভ্যতার ইতিহাস

(ক) ব্যবস্থা সংঘটন বা নৈতিক বেষ্টনীর বিবরণ।

(খ) ব্যবস্থাসংঘটন (উপায় সমূহ—নৈতিক বেষ্টনী)র পরিবর্ত্তন সমূহের বিবরণ (বিপ্লব ও যুগান্তর)

সপ্তম অধ্যায়

ইতিহাসের প্রধান প্রধান সূত্র বা সাধারণ নিয়ম সমূহ।

ব্যবস্থা—সংঘটনের পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব বা যুগান্তর।

(ক) কারণ—স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী যেহেতু,—যে সকল অবিদ্যা ও অসৎ বিনাশের জন্য, ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মাভ্যুত্থান ধ্বংশের জন্য যুগান্তরের সৃষ্টি সেই সকল স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে—

অবিদ্যার উৎপত্তি—

(১) সনাতন

(২) কাল পরিবর্ত্তনে অতীত কালের বিদ্যা বর্ত্তমানে অবিদ্যা হইয়া পড়িতে পারে।

(খ) উপকরণ—যে সকল শক্তির দ্বারা যুগান্তরের সৃষ্টি হয়

(১) অভাবের শক্তি—চিন্তা—ভাবনা আদর্শ আকাঙ্ক্ষা—ব্যাকুলতা (ইতিহাসকে ভাব ও আদর্শ সমূহের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের চিত্র বলে)

(২) আদর্শ জীবনের শক্তি—বীর—অবতার—মহাপুরুষ

১। সত্য সমূহের স্রষ্টা ও আবিষ্কার কর্ত্তা।

২। "বিদ্যা" ও "জ্যোতি" অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা।

৩। যুগের প্রবর্ত্তক-সভ্যতার সংস্থাপন ইতিহাসের স্রষ্টা।

৪। এজন্য ইতিহাসকে মহাপুরুষদিগের জীবনী বলে।

(৩) প্রতিষ্ঠান—

১। আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের দৃশ্যমান মূর্ত্তি—স্থূল আকৃতি।

২। মাহাপুরুষের স্থায়ী চিহ্ন—মূর্ত্তিমান কর্ম্ম ও চিন্তা।

৩। সাধারণের সমবেত কর্ম্মের উত্তেজক।

৪। সাধারণের সমবেত কর্ম্মের ফল ও লক্ষণ— সর্ব্বসাধারণ ইতিসাসের শ্রষ্টা।

৫। এজন্য ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের বিবরণ বলে।

(গ) রূপবৈচিত্র্য—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না— রূপান্তর পরিগ্রহ

(১) কালভেদে সমস্যাভেদ

১। অবিদ্যার রূপ পরিবর্ত্তন

১। সামাজিক

২। রাজনৈতিক

৩। আধ্যাত্মিক

৪। বৈষয়িক

৫। চিন্তা সম্বন্ধীয়

২। সুতরাং অবিদ্যা নাশের উপায় যুগান্তররূপ পরিবর্ত্তন

১। সামাজিক

২। রাজনৈতিক

৩। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত সত্যে রূপ পরিবর্ত্তন—"বিদ্যা" বৈচিত্র্য

১। সামাজিক

২। রাজনৈতিক

(২) দেশভেদে সমস্যা-ভেদ

১। অবিদ্যার স্থান পরিবর্ত্তন

২। সুতরাং যুগান্তরের স্থান পরিবর্ত্তন—...কর্ম্মক্ষেত্রের বৈচিত্র্য

১। মিসর

২। ভারত

৩। গ্রীস

৩। সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠার স্থান অর্থাৎ সভ্যতার কেন্দ্র বৈচিত্র্য

অষ্টম অধ্যায়

ইতিহাসের প্রধান প্রধান সূত্র বা সাধারণ নিয়ম সমূহ

৫। ক্রমিক অভিব্যক্তির ফল সভ্যতা বৈচিত্র্য

(ক) ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট জাতীয়-জীবন সমূহের বিকাশ-বিভিন্ন জাতীয় চরিত্র

(১) ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন সমাজ পদ্ধতি, ধর্ম্ম পদ্ধতি; ব্যবসায় পদ্ধতি, শিক্ষা পদ্ধতি, রাষ্ট্র পদ্ধতি, সাহিত্য ও কলা পদ্ধতি

(২) এরূপ জাতীয় বিশেষত্ব ও বিভিন্নতার কারণ সর্ব্বতোমুখী বৈচিত্র্য সৃষ্টি কেন হইল ?

১। মানব সঙ্ঘ সমূহ বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে

২। বিচিত্র অবস্থা সমূহ

(১) ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক

(২) মানবীয় ও ঐতিহাসিক—অন্তর্দ্দেশীয় এবং

(৩) বহির্দ্দেশীয়

(খ) এজন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সভ্যতা সমূহের বিশেষ বিশেষ ইতিহাস আছে—এই ইতিহাসের দুই দিক

(১) স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য

(২) বিশাল মানব সমাজের ইতিহাসের পরিপূর্ণতা দান

(গ) এই বিচিত্র সভ্যতা সমূহ এবং এই জাতীয় জীবনের ইতিহাস সমূহই ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচ্য ক্ষুদ্রতম সমষ্টি।

(১) জাতি সমূহ বিশাল মানব-পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

(২) সুতরাং ইতিহাস-বিজ্ঞানকে একটী বিশ্ব-নাটক বলা যায়

১। রঙ্গমঞ্চ—পৃথিবী

২। দৃশ্য—ভিন্ন ভিন্নদেশ সমূহ

৩। অঙ্ক—ভিন্ন ভিন্ন যুগ সমূহ

৪। ব্যক্তি—ভিন্ন ভিন্ন জাতি সমূহ

নবম অধ্যায়

ইতিহাসের উপদেশ সমূহ

(ক) "বিদ্যা," "সৎ," সত্য, ধর্ম্ম সমূহের আপেক্ষিকতা

(১) দেশ-সাপেক্ষতা—ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সত্য, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন ভিন্ন অবতার

(২) কাল-সাপেক্ষতা—ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন সত্য, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন ভিন্ন অবতার

(৩) সুতরাং বিবিধ সসীমতা ও অসম্পূর্ণতা—পরিবর্ত্তনশীলতা ও অচির-স্থায়িতা

(৪) ক্রমিক সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি

(খ) বিশ্বজনীনতা, সর্ব্বপ্রেমিকতা এবং উদারতা

(১) সকল জাতিরই মহত্ত্বের স্থান আছে—পৃথিবীতে ভগবচ্চিহ্নিত বিশেষ কোন জাতি নাই

(২) সকল দেশেরই গৌরব কাহিনী আছে—পৃথিবীতে ভগবচ্চিহ্নিত বিশেষ কোন দেশ নাই

(৩) সকল যুগেরই কার্য্য—কোন না কোন সত্য প্রতিষ্ঠা করা

(গ) বিশ্বের ক্রমিক পূর্ণতার উপায়—

(১) জাতীয় পূর্ণতা

(২) ব্যক্তিগত পূর্ণতা

(ঘ) সুতরাং ব্যক্তিগত পূর্ণতা বিকাশের উপায় প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বজনীনতা

(ঙ) সত্য যুগ—অতীতকালে ছিল না, ভবিষ্যৎকালে আসিলেও আসিতে পারে।

দশম অধ্যায়

ইতিহাসালোচনার প্রণালী—ইতিহাসের গূঢ় অর্থ—কোন যুগের ইতিহাস অবগত হইবার জন্য কোন্ কোন বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ আবশ্যক

(ক) রঙ্গভূমি বা কর্ম্মক্ষেত্র—পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিসমূহের প্রভাব ও কার্য্য—প্রাপ্ত কর্ম্মক্ষেত্র

(খ) সমস্যা-সমূহ—কর্ম্ম-কৃৎদিগের কার্য্য প্রতিষ্ঠিত সত্য—আকাঙ্ক্ষা সমূহ

(গ) কর্ম্মকৃৎ—কি প্রকার

(ঘ) প্রতিষ্ঠা সমূহ—সমবেত কর্ম্মের নিদর্শন

(ঙ) কর্ম্মের পরিবর্ত্তন—কর্ম্মকৃত দিগের কর্ম্মের দ্বারা এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য ও প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রভাবে কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ রূপান্তরিত হইল।

---

* শ্রীযুক্তবিনয়কুমার সরকার, এম-এ মহাশয়ের "ইতিহাস-বিজ্ঞান" এর বিষয়ানুবন্ধ দশ অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক অধ্যায় অবলম্বন করিয়া বিশদভাবে আলোচনা করিবার জন্য সুধী-বৃন্দকে অহ্বান করিতেছি।

"রেল গাড়ীতে"

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

(চল্‌তি গাড়ীর তালে)

দার্জিলিঙের ডাক গাড়ীটি
চললো যেন ঘর বাড়ীটি ;
ঐ আপিসের রেলিং ধ'রে
তোমরা কি সব দেখ্‌ছো ওরে !
এই সে বাগান, হায় দুজনে
কতই আমোদ বন-ভোজনে !
দমদমাকে দমিয়ে দিয়ে
তীরের মতো ধায় এগিয়ে ;
বেজায় ছোট পুকুর ঘাটে
কল্‌সী কাঁখে বৌটি হাঁটে !
চুপটি করে ঘুপটি মেরে
মাছ রাঙাটি ঝিমোচ্ছে বে !
ঠ্যাং তোলা বক ডোবার ধারে,
শেয়াল তাকায় বারে বারে ;
কলার গাছে দোয়েল বসা,
মস্ত বড় ক্ষেতটি চষা ;
আব্‌ঝানো ঐ জান্‌লা খুলে
কিশোরী চায় মুখটি তুলে ;
পোলের ওপর দুইটি ছেলে
চুরুট মুখে বস্‌লো হেলে ;
মুক্ত মাঠে সন্ধ্যেবেলা
পল্লীশিশুর ছোট্ট মেলা ;
বাঁশ বাগনের মধ্যিখানে
পর্ণ কুটীর মনটি টানে !

অস্তাচলে আগুন জ্বলে,
কুকুর কাঁদে গাছের তলে ;
সাঁজের আকাশ ডাক্‌ছে মোরে,
ডাক্‌ছে কেন এমন ক'রে।
হাত ছানি দে' ডাকছে তরু,
দেখতে মধুর, কোমর সরু !
এই তো এলাম রাণাঘাটে,
মানুষ গুলা বেজায় খাটে !
ফিরিওলা মরছে হেঁকে,
কটি মিঠাই নিলাম ডেকে ;
ইষ্টিসনের বিরাম-গৃহে
যাত্রীরা সব দেখছো কি হে ?
ওঁতে বসে ঘোমটা টেনে
দেখছে বধূ শাসন মেনে ;
প্রিয়ের সাথে ইঙ্গ নারী
পায়চারিতে মগ্ন ভারী !
কন্যা কোলে স্বামীর পিছে
বৌটি যেতে তাকান মিছে !
ঘটাং ঘটাং ঘণ্টা বাজে,
সবাই বিষম ব্যস্ত কাজে !
রসগোল্লা ফেলছে গিলে,
'পয়সা দিতে জল না মিলে !

* * * *

আবার গাড়ী চললো ধীরে,
ঠাঁই পেয়েছে সবাই কি রে!
জ্যায়গা বুড়ো জুড়ে ব'সে!
হুঁকোয় চুমো খাচ্ছে ক'সে!
কষ্ট ক'রে ব'সে দেখি
বাইরে আঁধার ঘনায়, একি!
ছুটছে গোপাল পুচ্ছ তুলি,
তাম্মাম্ পথে উড়ছে ধূলি;
ট্রেন চলেছে বেজায় ছুটে,
ঝোপের মাথা পড়ছে লুটে;
কাকের সভা বটের গাছে,
কেউ বা ওড়ে গাছের কাছে;
পল্লীগৃহে পিদিম জ্বলে,
ভাবছি তাকে নয়ন জলে!
না, না, খানিক নেই রে দেখে,
প্রাণের পটে নেই না এঁকে!
মস্ত মাঠের মধ্যিখানে
কখন এলাম কেই বা জানে!
ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে,
জ্যোৎস্নাতে আজ প্রাণ ফুটেছে!
ইচ্ছে করে হেথায় আমি
বেড়িয়ে বেড়াই জ্যোৎস্না যামি!
নিথর মাঠে মনের সুখে
আকাশটাকে পূরবো বুকে!
দালান-কোঠার বদ্ধ হিয়া
উড়বে ডানা বিস্তারিয়া!
আস্‌মানে ঐ জ্বলছে বাতি,
দিনের মতো উজ্জল রাত্তি!
অথচ নেই শব্দ সাড়া,
নেইক পল্লী নেইক পাড়া;
'এই এসেছি পোড়াদা-তে,
মন কাঁদে ঘোর নিরাশাতে!
কি যেন কি পাবার লোভে
ছুটেছিলাম, কাঁদছি ক্ষোভে!
এঁকে বেঁকে ছুটলো গাড়ী,
পদ্মাপারের বাহার ভারী!
ধব্‌ধপে ঐ ধূলার বুকে
জ্যোৎস্না ঘুমোয় পরম সুখে!
শেয়াল গুলা প্রহর ঘোষে,
ডাকছে কুকুর বিষম রোষে!
এই তো এলাম যাঁড়ার পোলে,
এর কথা কি মানুষ ভোলে!
বিশ্বখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার
মাথা ঘামায় কার্য্যে ইহার;
দুরন্ত সেই পদ্মা আজি
পাড়ি দিতে সবাই রাজি;
ঈশ্বরদি-তে পৌঁছে গেছি,
মানুষের সেই চেঁচামেচি।
চা-চুরুটের বিকি কিনি,
খাচ্ছেন ব'সে উনি ইনি;
প্লাটফরমে বহুৎ মুটে,
আবার গাড়ী চললো ছুটে।

* * * *

বাইরে কত দেখবো একা!
ক্লান্ত চোখে যায় না দ্যাখা;
গাড়ীর ভিতর দেখি চেয়ে
একটা ছোঁড়া উঠলো গেয়ে;
বাঁ পাশে মোর দুইটি যুবা
বল্‌ছে—হাসো গাও নতুবা;
গল্প তখন চললো বেড়ে
মাথা নেড়ে হাতটি নেড়ে :—
"কাপড়ের দাম বেজায় চড়া,
মানুষ গুলার জান্ কি কড়া!

ষ্টারের এখন পসার বেশী,
কাবুলীদের কী শক্ত পেশী!
লড়াই যদি এম্নি চলে
তলিয়ে যাব কোন্ অতলে!
চাক্‌রি গেছে ভাদ্র মাসে,
আবার ভাদ্র ফিরে আসে!
ঝক্‌মারি কি বলবো মশাই!
দেশ বিদেশে ঘুরছি মিছাই!
আমি এখন ভবঘুরে,
শ্বশুর আছেন দিনাজপুরে;
যাইতো দেখি, হয় তো হবে,
ছেলে পুলে বাঁচবে তবে!"
ব'সে থেকে এঁদের সনে
ভাবছি কত সঙ্গোপনে।
নানান্ জনের দুঃখরাশি
আমার প্রাণে আসছে ভাসি'!
হাস্তে আবার হেসে উঠি,
সুখের চরম সুখটি লুটি;
কাম্‌রাটির ঠিক একটি ধারে
চার ভুটানি ভাবছে কারে?
চক্ষু বুঁজে জপ্‌ছে মালা,
অর্ঘ্য প্রাণের হচ্ছে ঢালা;
এই পাহাড়ী বন্য জাতি
কোত্থেকে পায় জ্ঞানের বাতি!
এই ভারতের শাক্য মুনি
ধর্ম্ম দেছে—এই তো শুনি!
আম্‌রা এমন উদাস সাঁজে
মত্ত আছি বাজে কাজে;
অর্থ আরাম বিলাসিতা
এতই পূজ্য—বলবো কি তা!
সেই ভবানীর পুণ্য দেশে
থামলো গাড়ী নাটোর এসে!

এই মাটিরই প্রতি রেণু
আজকে প্রাণে বাজায় বেণু!
ভুভারতের কই সে রাণী!
শুনছি বুকের ধুক্‌ধুকানি!
পুণ্যদেশের আজ কি দশা,
জ্বরের জ্বালায় যায় না বসা!

* * * *

চললো গাড়ী তাড়াতাড়ী,
সুখের এখন বাড়াবাড়ি!
এদেশ বিশেষ পরিচিত,
এই বরেন্দ্রে জন্মেছি তো!
কুরল পাখী মুহুর্মুহু
বলছে কেঁদে—"উহু উহু!"
চন্দ্রালোকে পল্লী সোনার
স্বপন ছাখে বড্ড মজার!
সন্ধ্যেটি না হতে হতেই
নেতিয়ে পড়ে একেবারেই!
সহর বাইরে পরিপাটী,
পল্লী সতীর হৃদয় খাঁটি;
সহর সত্যি কুটীলতা,
পল্লী প্রাণের সরলতা!
হোক্ না দীনা হোক্ না ক্ষীণা,
ভাবছি—হৃদয় উচ্চ কি না!
মূর্খ অলস অন্ধ আতুর
সবাই তাকে করছে ফতুর!
তবু বুকে ঠাঁই দিয়েছে,
পুষছে আপদ বেছে বেছে;
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া ঝাঁটি,
মারামারি কান্নাকাটি;
মারতে 'জাতি' মাতামাতি,
"ছুঁ'সনে" কেবল দিবস রাতি;

সংকীর্ণ মন হৃদয়গুলি
উদারতা যাচ্ছে ভুলি';
সহরের প্রাণ নয়ক কোমল,
এদের মোটেই দ্যায় না আমল!
গুণী জ্ঞানীর বড্ড আদর,
দরদ্ বোঝে—বোঝে কদর্!
সহর বলে, বেঁচে মর,
নয় তো বাবা স'রে পড়!
কই এসেছি, এলাম কোথা?
উত্তরে ঐ আলোক হোথা!

এলাম এখন সান্তাহারে,
থামলো গাড়ী একেবারে!
বোচ্‌কা-সামিল বৌটি আমার
নেইক সাথে—ভয় কি আবার!
কাছেই বাড়ী এখান থেকে,
পথটি গেছে এঁকে বেঁকে!
আগুন-লাগা বাড়ীর মতো
নাবতে সবাই ব্যস্ত কত!
কুলী কুলী, আয় না বাবা!
ধর্ এ-বোচ্‌কা, বাক্স নাবা!
'টিকেট টিকেট'—দেখুন মশাই,
ওরে কুলী, থাম্‌না'রে ছাই!

উভয়-সঙ্কট

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি-এ]

(১)

(বিপিন বাবুর বাড়ীর অন্দর-মহল। র'কের উপর উপবিষ্টা বিপিনবাবুর গৃহিণী পত্নী আচারিণী, কতকগুলা মাজা বাসন গঙ্গাজলে পুনর্ধৌত করিতে ব্যস্ত। সম্মুখে মোক্ষ ঝি দণ্ডায়মানা। বাউন ঠাকুরাণী দুর হইতে দাঁড়াইয়া বাসনের সংস্পর্শ বঁচাইয়া গঙ্গাজল ঢালিতেছে।

গৃহিণী। পুরুৎ ঠাকুর বল্লে যে চোদ্দটা ছুর্ব্বোতেই হবে?

মোক্ষ। শোনো কথা! বল্লেনা তো আমি নিজে বলছি—মা?

গৃ। আর গোবর যা এনেছিস্ তা গাই গরুর তো?

মো। শোনো কথা! তা নয়? গইলে হতে নেইনু যে মা?

গৃ। টাট্‌কা?

মো। হেঁই মা! এইমাত্র সমুখে নাদ্‌লো—তা থেকে নেইনু তুলে!

গৃ। কিছু মাড়াস নিতো? কাছা কাপড় তোর?

মো। অবাক করলে মা! বলো কি মা? ঠাকুর দেবতার পুজো? আমার কি বিবেচনা নেই গা!

[খিড়কির দরজা দিয়া বিশুর ও উষার—ভাইবোনের বগলে একটা বই; হাতে কয়েকটা পাকা কাঁচা পেয়ারা। ভোজন নিযুক্ত]

বি। (ভগ্নীকে দেখাইয়া) দেখ্‌ছিস্ কেমন পাকা?

উ। পাকা গুনো নিজে নিলে, আর আমার গুনো কাঁচা—আচ্ছা দাদা! দাওনা একটা পাকা রেখে?

বি। ঐতো পেয়েছিস্ দুটো

উ। হ্যাঁ তাই নাকি? এই বুঝি তোমার পাকা? ওইটে নেবো—

বি। তা আর জানি নি গা! বলে আমি কত কষ্ট করে পাড়লুম—

উ। নেই দিলে; চাইনি। বলে দি মাকে?

বি। কি বলে দিবি?

উ। সেই? সেই কথা?

বি। (রাগতঃ ভাবে) কি কথা শুনি?

উ। (এ দিক ও দিক, মায়ের দিক, ভাইয়ের মুখের দিক তাকাইয়া) সেই যা মাড়িয়েছ ?

বি। কি মাড়িইছি শুনি ?

উ। ইঃ জাননি কিনা ? দাও ওই পাকাটা, তা হ'লে বল্‌বোনা—

বি। (উত্তেজিত ভাবে) কি বলবি শুনি ?

উ। (রাগতঃ ভাবে) কি আবার ? কিসের হাড় মাড়িয়েছ ?

বি। (সভয়ে মার দিকে তাকাইয়া, পরে ভ্রূকুটী করিয়া বোনকে) তোকে বলেছিল হাড় মাড়িইছি— ? বল দিকিন্‌ ? বই কেড়ে নেবো—

উ। ইঃ আমারও তো বই নিয়েছ ? ওইতো ?

বি। (বগল হতে বইটা ছুড়িয়া দিয়া) ভারিতো পচা বই, নিগে যা—মাড়িইছি—? তোকে বলেছিল ?

উ। (কাদা হইতে বইখানা কাঁদন-কাদন মুখে তুলিয়া লইয়া) না মাড়াওনি ? মাড়িয়েছ তো ? কুকুরের হাড়—হাড়—হাড়—

গৃহিণী। (হঠাৎ দুজনের দিকে চোখ ফিরাইয়া) কি মাড়িয়েছে রে ? কে ? কোথা কি মাড়িয়েছিস্‌ বিশে ?

বি। না মা কিছু মাড়াইনি

উ। মাড়াওনি ? বা রে মিথ্যুক !

বি। মাড়িইছি ? ইষ্টিপিট্টি মেয়ে ? বই ছুঁয়ে বল্‌ছিস্‌ ?

উ। হ্যা বলছিতো ?

গৃ। বলি কি মাড়িয়েছে পোড়ামুখী বল্‌ না ?

উ। (সভয়ে) পেয়ারা তলায় ? (বিশুর দিকে তাকাইয়া)

বি। (মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া) পে-য়া-রা-ত-লা-য় ? পেয়ারা তলায় কি হয়েছে ?

উ। (রাগিয়া) কিসের হাড় মাড়িয়েছে মা ?

গৃ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কিসের হাড়রে ? ওমা সে কি কথারে ? বল্‌ না—মুখপোড়া কি মাড়িয়ে মরিছিস্‌ ?

বি। কি আবার মাড়াবো ?

গৃ। (গর্জ্জন করিয়া) মাড়াস্‌নিতো মিছে কথা বলছে ও ?

বি। ওরই মিছে কথা ?

উ। হ্যাঁ গো ? আমার মিছে কথা। মায়ের পায়ে হাত দিয়ে দিব্বি করতো ?

(বিশু আগাইয়া আসিল)

গৃ। (ব্যস্তভাবে উঠিয় দাঁড়াইয়া) খবরদার ছুঁবি তো যমের বাড়ী পাঠাব ! চল দেখি—কোথা কি মাড়াল ! চল্‌তো উষি দেখাবি কোথাকার কিসের হাড় ! অ্যাঁ একি কাণ্ড গো ! এই অবেলা, বেস্পতিবারের বারবেলা ; নক্ষীছাড়ার জন্মদিন যে গো !

কাঠা। গাল দিওনি মা ছেলের জন্মদিনে—

গৃ। সাধ করে গাল দেয় ? বল না হুলোমুখী কোথায় কি মাড়িয়েছে দেখি।

(বাসন ফেলিয়া উঠিলেন ও চলিলেন। সভয়ে উষা পিছন পিছন চলিল। বিশু বাহির বাড়ীতে শরণ লইল)

দৃশ্যান্তর।

খিড়কির বাগান, ঘাটের ধার পেয়ারা তলা।

গৃ। কোনখানে কি মাড়িয়েছে ?

উ। ওই দেখ, গোবরের ওপর ঐ যে হাড় কিসের—

গৃ। তাইতো বটে। কিসের হাড়—গো ?

(দূর হইতে আলগোছা মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া)

তাইতে বটে—ডাক্‌তো বাউন ঠাকরুণকে—

(উষার প্রস্থান)

কল্লে কি গো হতভাগা ছেলে ! বেস্পতিবারের বার-বেলা—জন্মদিন—! করি কি মা ! এমন শাস্তিও ছেল কপালে—

(বসিয়া প'ড়িয়া আরো ঝুঁকিয়া হাড় পরীক্ষা করন)

কুকুরের কি গরুর কে জানে ! কল্লে কি মা ! গলায় আবার তারকনাথের কবচ বাঁধা !

(বাউন ঠাকরুণ ও ও-পাড়ার চাটুজ্যে গিন্নির প্রবেশ)

চাটুজ্যেগিন্নি। কি হয়েছে গা বিশুর মা ?

গৃ। কে খুড়ী ? এস মা—আর কি হয়েছে, নক্ষীছাড়া ছেলে বার বেলায় কিসের হাড় মাড়িয়ে মরেছে—দেখতো বাউন ঠাকরুণ—

[উভয়ে আগ্রহের সহিত শুচি বাঁচাইয়া হাঁটু পর্য্যন্ত

পায়ের কাপড় তুলিয়া আঙুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাড় পরীক্ষা করিতে লাগিল—].

কিসের হাড বল দিকিন খুড়ী ?

চা গৃ। তাইতো বাছা—বোঝা যাচ্চে না—পাখী টাকীর হাড় হবে বা—

গৃ। পাখীর কেন হবে গা ?

বাউন ঠা। তাই কি হয় গা ? অত মোটা হাড় !

চা গৃ। তাও বটে ! আর কিই বা হবে তাও তো—

গৃ। গরু টরুর হাড় বা ! সে হলেই তো গেছি মা।

বাউন। আশ্চর্য্য কি মা ভাগাড় তো ওই মাঠ পার—কুকুরে শেয়ালে

চা গৃ। কাঠের কুঁচো কি পাতর টাতর নয় তো ?

গৃ। কি মুস্কিল ! আমি কি কানা না অন্ধ ?

চা গৃ। বালাই ষাট্ তা কেন হবে মা আমিই চোখে দেখ্‌তে পারছিনি—

গৃ। (গম্ভীর ভাবে চাক্ষুষ পরীক্ষা করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) হুঁ—ও হাড়ই বটে !

বাউন। হাড় বৈ কি মা ! বেশ বোঝা যাচ্ছে—

উ। দাদা বলছিল অমনি আর একটা এই খানে ছিল

গৃ। কই ?

উ। সে দাদা ঢিল মেরে জলে ফেলে দিয়েছে—

গৃ। ঢিল মেরে না হাত দিয়ে ? ঠিক্ দেখেছিস্ ?

উ। সত্যি মা ঢিল মেরে—

[বিপিনের সধবা ভগ্নী ইন্দু ঘাটে কাপড় কাচিতেছিল মা ও মেয়ের কথোপকথন শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। বুঝিল কি একটা আচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। গা ধোওয়া সারিয়া হাসিতে হাসিতে অকুস্থানে হাজির হইল]

ই। কি হ'ল বৌদি ? আজ আবার কি কাণ্ড ? অরণ্য না লঙ্কা ?

গৃ। থামো তুমি, তোমার সবতাতেই হাসি ঠাট্টা—

উ। দাদা কিসের হাড় মাড়িয়েছে পিসি মা—

ই। বটে ? দাদার দেখছি নিজের হাড়ে মায়া নেই—

গৃ। তোমাদের আস্কারাতেই আরো খেয়েছে—

বাঠা। পাঁঠার হাড় নয় তো ? কাগে টাগে এনে ফেলেছে ?

গৃ। না গো না দেখছনা, গরু টরুর নয়তো ?

ই। (গম্ভীর ভাবে) পাঁটার হাড় অত মোটা হবে বোন ? বৌদির যেন হাড় অহাড় জ্ঞান নেই—

গৃ। বল্‌তো ভাই ! চিল্‌শকুনিতে এনে ফেলে গেচে —বা।

উ। (উৎসাহে) কাল মা বাগানের পাঁচিলে একটা শকুনি বসেছিল। দেখেছি আমি, ননিও দেখেছে ; হুটু তাকে ঢিল্ মারলে—

গৃ। ঐ শোন খুড়ী ! তা হলে তো নিশ্চয়ই গরুর হাড়—শুন্‌লে বল্‌ছিলে পাঁটার হাড় !

ইন্দু। কাল যখন পাঁচিলে শকুনি বসেছিল আর খাল-পারে গো-ভাগাড়, তা ছাড়া গত অমাবস্যায় করিম জোলার গরু মরেচে তখন এটা তার হাড় না হয়েই যায় না, বৌদিই ঠিক, রায় বাহাল—আসামী কোথা ? ফেরার নাকি ? নবরাত্রি গঙ্গাস্নান গঙ্গামাটী মর্দ্দন, গঙ্গা-তীরে বাস, গোবর ভোজন—

(গৃহিণী ছাড়া সকলের মুচকিয়া হাস্য)

গৃ। দোহাই ঠাকুরঝি তোর পায়ে পড়ি ! যা এখান হতে, জ্বালাসনি আর ; ভাই বোনে যদি এত মেম সাহেব হয়েছ তো মিলে মিশে ঘর করনা শোওয়া বসা করলেই হতো—? তা খুড়ী বার বেলায় হতভাগা ছেলে এই করলে গা ?

ই। আবার কেষ্ট পক্ষের বেস্পতিবার !

গৃ। ও মা সে কি গো ! হ্যাঁ খুড়ী ?

খু। তাওতো সত্যি !

(সকলে বাড়ী মুখে ফিরিল, পথে চলিতে চলিতে)

গৃ। ওমা বলচ কি গো ? হতভাগা ছেলে কল্লে কি ? গলায় যে লক্ষ বাউনের পাউনের ধুলো ?

ই। (ন্যাকা ভাবে) ও সব কি পচে গেল ? আর কাজ হবে না ওতে ?

গৃ। তাই হয় ? কথা শোনো—। সে যাগ আবার অবেলায় নেয়ে মরবো গো খুড়ী ?

খু। কেন ? ছুঁয়েছ না কি ?

গৃ। আসবার সময় কপাটে গা ঠেকেছে—বিশে তো কপাট ছুয়েছে? হাঁ্যা উষি ছোয়নি তোর দাদা?

উ। না মা কই দেখিনি?

গৃ। (রাগিয়া বিকৃত কণ্ঠে) না ছোঁয়নে? অমনি আলগোছা ঢুকেছিল বাড়ীতে। ঠিক দেখেছিস্?

উ। (সভয়ে) চৌকাটে পা দিয়েছিল—

ইন্দু। তা হলিইতো হলো। চৌকাট কপাট এ সব তো জোড়া—তোমার ছোঁয়া হয়ে গেছে বৌদি। ওর আর মার নেই—বিশেষ জামকাটের দরজা। খুব অশুদ্ধ কাট। কৃষ্ণপক্ষ, বেস্পতিবার মুছুলমানের মরা গরুর হাড়, শুকনিতে এনে ফ্যালা। এ ত্রিবেণীর গঙ্গার ঘাটে স্নান ছাড়া আর উপায় নেই—

গৃ। দেখ্ ঠাকুরঝি? জোড় হাত করছি তোকে ক্ষেমা দে—

(হাসিতে হাসিতে ইন্দু পলাইল)

হাঁ্যা খুড়ী নাইতে তো হবে?

খ। গঙ্গাজল পরশ্ করলেই হবে?

গৃ। তাই হয় গো? গরুর হাড় ছোঁওয়া হলুম—

(সকলেই ঘাটে একটা একটা ডুব দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কয়নান্তর দেখিল পুরুহিত হলধর স্মৃতি-চুঞ্চু বাহির বারান্দায় কুশাসনে ঋজ্বায়ত দেহে উপবিষ্ট হইয়া নস্য গ্রহণপূর্ব্বক অধীত স্মৃতিতত্ত্বকে শান দিতেছেন)

চুঞ্চু। এই যে বৌমা! একি অবেলায় স্নান কেন?

গৃ। (সর্ব্বাঙ্গে গড় করিয়া) আর কেন বাবা। ছেলেটা এই বারবেলায় বাগানে কোথায় গরুর হাড় মাড়িয়ে ছিষ্টি ঘজিয়ে বসেছে—

চু। তা গঙ্গোদক স্পর্শ করলেই হতো! শাস্ত্রেই আছে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"

খুড়ী। আমিও তো তাই বলি? সর্ব্বশুদ্ধি গোবর তাতে যখন হাড় পড়ে আছে তা ছুঁলে না নাইলেও হয়—

চু। অবশ্য কথা! "গো পুরীষং সর্ব্বপাপঘ্নং কলি কল্মষনাশনং" স্বয়ং শিব পার্ব্বতীকে শুদ্ধিতত্ত্বতন্ত্রে ঐ কথাই বলেছেন তবে অধিকন্তু ন দোষায়:—এই যা। ভালই হয়েছে—

গৃ। গোবর তো নীচে, হাড় তার ওপরে, আগেতো হাড় পায়ে ঠেক্‌লো?

চু। হাঁ্যা বউমা। ঠিক ধরেছ। বুদ্ধিমতী মেয়ে বটে তুমি। হবেনা, কেমন লোকের মেয়ে। ভূপালবাবু ইংরাজী বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এদিকে সনাতন ধর্ম্মেও কি আস্থাই ছিল! প্রত্যহ মহিম্নস্তোত্র না পাঠ করে চাটী পর্য্যন্ত খেতেন না। ঠিক বলেছ মা! গোবরে হাড় থাকাতে হাড় শুদ্ধ হল না গোবর অশুদ্ধ হ'ল এ একটা সমস্যা বটে। তা সন্দেহ স্থলে শুদ্ধিরক্ষা করাটা দুষ্যণীয় নয়—শাস্ত্রেই আছে:—

"শুদ্ধাশুদ্ধৌ ইতঃস্ততে অশুদ্ধোপি চিত্তস্থিরং"

গৃ। আমি যেন নেয়ে শুদ্ধ হলুম তা ছেলেটার কি হবে বাবা? বেস্পতিবার, আবার জন্মবার, বারবেলায় এই কাণ্ড। গলায় ঠাকুর দেবতার ওষুধ বাঁধা—এইতো কত কষ্টে পুজো মানসিক করে বাঁচিয়ে তুলেছি—

চুঞ্চু। জন্মবার আজ? বেস্পতিবার গরুর হাড়। বটেইতো। ভাবনীয় ব্যাপার। (নস্য গ্রহণ)

খু। তাইতো।

গৃ। কিছু অমঙ্গল টমঙ্গল ঘট্‌বে নাকি?

চু। বৃষাস্থি না গবাস্থি? গোপুরীষ না ষণ্ডপুরীষ?

গৃ। সে কি বাবা ঠাকুর?

চু। অস্যার্থ—গরুর না ষাঁড়ের হাড়? আর গরুর গোবর না ষাঁড়ের গোবর—

খু। করিম সেখের ষাঁড়ইতো মরেছিল শুনি, আর এদের তো বাড়ীর গাই গরু!

চু। (গম্ভীর ভাবে) তবেই তো কাঠিন্যকে প্রাপ্ত হচ্চে, "বিরোধং লিঙ্গাভেদাৎ"—ছেলের কুষ্ঠী আছে?

গৃ। (সভয়ে) হাঁ্যা আছে বই কি। আপনিই তো করে দিয়েছিলেন?

চু। একবার দেখ্‌তে হবে। পতাকী চক্রে বিষ্টি যোগ্‌টা দেখা চাই। বিংশোত্তরী দশা—হুঁ—

"গজস্কন্ধৌ নরাশ্চেতি পুরুষা ব্যাঘ্রমা চাঁপি
পুরীষে পুরুষো শেতে ক্ষীরদধৌ হয়ঞ্চ গবা।"

—পঞ্জিকেটা মা—

গৃ। উষি পাঁজীটে নেয়তো না—না তুই ছুঁসনি—মথি কোথা গেল ? বাউন মা যাওতো আমার তোরঙ্গের ওপর আর্শী চিরুণীর কাছে আছে—! কি হবে বাবা ঠাকুর ! (ঠাকরুন পাঁজী আনিতে গেল)

চু। কিছু না মা, ভয় কি ? ফাঁড়া টাড়া আছে ছোট মত—তা অমঙ্গলা দেবীর স্বস্ত্যয়ন একটা করে দিলেই হবে—বাবু কোথা ?

গৃ। কে জানে কোথা' কোন সাহেবের বাড়ী ভোজ আছে গেছেন—

চু। বাবাজী মেশেন সবেতে, তবু সনাতনে নিষ্ঠাটী বাড়ীতে আছে ! হবেই তো—তা আমার এখন আসা ব্রতোজ্জাপনের ফর্দ্দটা করা—অন্য সব যোগাড় আয়োজন হয়েছে তো ?

গৃ। আমের ডাল কি রকম চাই আর কটা কাঁঠাল পাতা ?

চু। অফলা আম গাছের শীর্ষশাখা হলেই ভাল হয়—কেন না বিধিই আছে :—

"অফলন্তং চুতশাখং করঞ্জং শাল্মলী কাণ্ডং
বিরেচকং পাপধ্বান্তুং ত্রিতাপ নাশনং তথা—"

আর কাঁঠাল পাতা—হুঁ

"চতুর্ব্বিংশতিযুগ্মং বিকল্পে তদর্দ্ধং বা—"

চব্বিশ বা অষ্টচল্লিশটা হলেই হবে—"অচ্ছিন্নং রসালং চাপি—" ছেঁড়া বা শুকনো না হয় মা—

(বাউন মেয়ে পাঁজী আনিয়া স্মৃতিচুঞ্চুর হাতে দিল)

আচ্ছা মা তুমি ব্যস্ত আছ—এই ফর্দ্দটা রেখে দাও, বাবুকে দেখিও—আমি এখন উঠি ; খোকার পতাকী চক্রটা দেখে কাল প্রাতেই এসে স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করা যাবে—

গৃ। (প্রণাম করিয়া) হ্যাঁ বাবা—আমার বড় ভাবনা হয়েছে—

চু। না—না—ভেবনা মা !

"অদৃষ্টং নির্দ্দয়ং অপি পুজয়া প্রসন্নং ভবেৎ—"

সনাতন শংকটতারন তন্ত্রে পষ্টাক্ষরে লিখছে—আচ্ছা উঠি এখন— ওহো কুষ্টীটা—

গৃ। আচ্ছা আমি ভজাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

চু। আচ্ছা মা জয়স্তু— (নস্য লইয়া প্রস্থান)

(—খুড়ীরও প্রস্থান)

গৃ। (উষাকে) তোর দাদা কোথা গেল লা ?

উ। দাদা পিসিমার বিছানায় বসে 'ঠাকুরমারথলে' পড়ছে—

গৃ। না, ঠাকুরঝির সব বাড়াবাড়ি ! নাইলে না, কাপড় ছাড়লে না—নোংরা হয়ে আছে, আর তাকে নিয়ে কিনা বিছনায় আদর করে বসানো হয়েছে—(উচ্চৈস্বরে) বিশু, বিশে, বিশে—পোড়া ! হতচ্ছাড়া—

(ইন্দু রাহির হইয়া আসিল, হাতে বঙ্কিমবাবুর রাজসিংহ)

ই। কি হচ্চে বৌদি ? তোমার কি ভুতে ধরেছে না ভীমরতি হয়েছে ? ছেলেপুলেকে অকারণ যা তা বলে গাল দাও কেন ?

গৃ। আচ্ছা ঠাকুরঝি ! তুমি থামো—এই যে নোংরা হয়ে ঘর দোর বিছানাপত্র সব ছুঁয়ে যযাচ্ছে—এর কি ? কেন কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল তো পরশ করতে পারতো ?

ই। কাপড ছেড়েছে বৈ কি ! তার প্রাণে ভয় নেই ?

গৃ। কাপড় কে দিলে ? কোথা পেলে ?

ই। আলনা হতে নিজে নিয়ে ছেড়েছে—

গৃ। ঐ তো না ! ও নিলে ? তবেই তো বেশ শুদ্ধ হ'ল সবতো ছুঁলে আগে নোংরা কাপড়ে—?

ই। তার কাপড় তাতে ঠেকেনি তো ?

গৃ। বলে কি গো ঠাকুরঝি ? মাথা খুঁড়ব নাকি ?

ই। (হাসিয়া) ওতো তোমার নিত্যক্রিয়া, নিত্যপদ্ধতি। খুঁড়ে খুড়ে অসাড় হয়ে গেছে ; আর ও ব্যাচারীকে কেন অকারণ শাস্তি দেওয়া—

গৃ। তোমার বিছানায় বসেছে ?

ই। কোথায় তা না হ'লে বসবে ? তোমার ভাঁড়ার ঘরের শিকেয় ঝুলবে ?

(সভয়ে ধীরে ধীরে বিশুর প্রবেশ। পিসির আড়ালে দাঁড়াইল)

গৃ। নিজে লেখাপড়া শিখে মেম হয়েছ বলে—

ই। দোহাই বউ দি—যা হইনি, হতে পারবো না, তা মিথ্যে রটিয়ে কেন দুষছ? তা সত্যি হলে কি তোমার রাজ্যে একদিনও থাক্‌তে পারতাম?

গৃ। কর্ত্তাটীতো খাঁটী হিন্দু?

ই। সেইতো ভরসা—'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' নইলে খরচ বাড়ে—ভয় কি বৌদি? আমি তোমারই মতের তবে ধাতের নয়—এই যা তফাৎ—এখনো বাই উগ্র হয়নি—

গৃ। ও সব শুনিনি—তোমার সব কেচে দিতে হবে—বিছানাপত্র কাপড় চোপড়—সব—

ই। কি পরে কোথায় বস্‌বো দাঁড়াবো? (বিশুকে) চল বাবা তোমার মায়েব ভাণ্ডার ঘরের শিকেয় ঝুলিগে—

গৃ। তা জানিনি! বিশে থাম্ যাসনি, তোর শ্রাদ্ধ করছি—

ই। কথার শ্রী শোনো? সাধ করে বলি ভীমরতি হয়েছে? (ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান)

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মো। না মা! অফলা আম ডাল এ রাজ্যিতে নেই—

গৃ। নাই থাক্ বা। দেশে আর অফলা আম গাছ নেই? চণ্ডীর মার বাড়ী গিয়ে বসে থাক্‌লে কি আম গাছ খোঁজ করা হয়। নে এখন সব ঘর হতে কাপড় চোপড়, বিছানা, বালিশের চাদর, ওয়াড়, মশারী বার করে নিয়ে আয়—

মো। (সভয়ে) কেন মা?

গৃ। কাচ্‌তে হবে। হাঁ করে দেখ্‌ছিস্ কি? যা'-বিশে সব ছুঁয়ে এক করে বসে আছে—

(গৃহিনী ছেলেকে এক ঘটী গঙ্গাজলে চুবাইয়া দিলেন সে শীতে হি হি করিয়া দাড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল)

মো। শুখোবে কখন?

গৃ। নেই শুকুক্—যা—

মো। কে এত কাচ্‌বে মা? আমার গতরে কুলোবে না—

গৃ। থালা ভরা ভাত তুলতে গতরে কুলোয়—না? যা বল্‌ছি উমি বিশেকে একটা ধোবার বাড়ীর কাপড় এনে দে— (উষার প্রস্থান)

মো। (আপন মনে) গতরের খোঁটা সয় মা, খাবার খোঁটা সয় না— (প্রস্থান)

উ। (আসিয়া) কাপড় কোথা মা? তোরঙ্গের চাবি কোথা?

গৃ। বাউন মেয়ে আমার মাথায় এক ঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে দাওতো—চাবি আমার কাছে দাঁড়া উঠে দিচ্ছি।

(গামছা পরিয়া রকে উচু হইয়া বসিলেন ঠাকরুন জল ঢালিতে লাগিল—মোক্ষদা এক রাশ কাপড়, বিছানা, মশারী আনিয়া রকে জমা করিতে লাগিল এমন সময় বিপিন বাবুর অন্দরে প্রবেশ—)

উ। মা বাবা এসেছেন—

গৃ। (—ভিজা কাপড়টায় আগাগোড়া নিজেকে ঢাকা দিয়া বসিয়া ঠাকরুনকে) নাও ঢালো পিঠটায় দাও—

(বাউন ঠাকরুণের তথাকরণ)

বি। একি কাণ্ড? (উত্তর না পাইয়া উষাকে) কি হয়েছে রে? ও কি? বিশে বিকালে ভিজে কাপড়ে ভিজে গায়ে দাঁড়িয়ে কেন?

উ। দাদা বাগানে কিসের হাড় মাড়িয়েছে

বি। ওঃ সেই জন্যে ওর হাড় কখানা দিয়ে প্রাচিত্তির হচ্ছে?

(ইন্দুর হাসিতে হাসিতে প্রবেশ)

(ভগ্নির দিকে তাকাইয়া) একি কাণ্ড ইন্দু?

ই। যা দেখ্‌ছ?

বি। না—সত্যি?

ই। বৌদি অভয় দিলে বলি?

গৃ। অভয় আর কি? বল না—

ই। এ হচ্চে অঙ্গশুদ্ধি কাণ্ড! সে যাগ্, তুমি ঘরের ভিতর এস—ও ব্যাচারী ভিজে কাপড়ের চাপে আর লজ্জার ভাপে ভেপ্‌সে উঠলো—

বি। বিশে কাপড় ছাড়গে শীগ্‌গির—কাল জ্বর হতে উঠেছে—আজ এই কাণ্ড! মার্‌বে দেখছি!

(ভাই বোন উভয়ের বৈটকখানা ঘরে প্রবেশ)

হ্যা ইন্দু ব্যাপারটা কি?

ই। যা দেখ্‌লে শুনলে?

বি। না সত্যি—এ রোগের উপায় ওষুধ কি ?

ই। একমাত্র উপায় ওষুধ আছে দাদা।—তা পারবে করতে ?

বি। কি ?

ই। তুমিও বোনাইএর মতো টীকি রাখ, খড়ম পর, নাক টীপে জপ তপ আরম্ভ কর, আর তোমার ওই সব কি বলে লজিক্ মজিক্ ছেড়ে হনুমান-তন্ত্র পড়, আর 'কাতন্ত্র দীপিকার ভাষ্য লেখো !

বি। যা বলছিস্ দিদি ! তা হলে তুই ওসব করছিস্নি কেন ? বোস্জা তো পরম হিন্দু,তোর সঙ্গে বনে না—

ই। আমি ঘাঁটাইনি—সব মেনে নি ; যখন বোঝাতে বসে কড়ে আঙুল কোশাতে না ডোবালে চুম্বক শক্তি উর্দ্ধগা হয়ে সাত্বিকতা নষ্ট করে ; জুতো পরলে রজঃশক্তি মাটীতে যেতে পায় না, খড়মে তা হয় ; আমি সব মেনে নি ; তুমি বৌদির সঙ্গে মতে মেল না তাই এই যত—গোলমাল বাধে—ঐ আসছেন বুঝি চল্লুম দাদা—

(অন্দরে প্রবেশ)

(নকুলচন্দ্র বসু ওরফে বোস্জার প্রবেশ—ইনি ইন্দুর স্বামী—উচ্চগণিত ও রসায়নের অধ্যাপক—অথচ পরম হিন্দু সনাতন ধর্ম্মের পরম ধ্বজা—বৈজ্ঞানিক হিন্দু-ধর্ম্মের পাণ্ডা সঙ্গে বিপিনের পিস্তুতো ভাই নবগোপাল। দুজনে তর্ক করিতে করিতে উপস্থিত—)

বি। নবু যে এস—কিসের তর্ক ? বস আসছি—

(অন্দরে প্রস্থান)

নকুল। (তন্ময় ভাবে তত্ব বুঝাইতেছেন) প্রকৃতি-পরিক্রমা মণ্ডল—বিশ্বাস হল না—? তা হবে কেন? তোমার জড় বিজ্ঞানের সব কথাই ঠিক কি ভায়া ? কথাটা মনে আছে—one generation blows-bubbles, another pricks them—(এক পুরুষে মত গড়ে অন্য পুরুষে তা ভাঙ্গে)

নবু। বটে ! তা বলে ভায়া সেই দোহাই দিয়ে মানতে হবে চন্দ্রমণ্ডলটা সূর্য্য মণ্ডল হতে লক্ষ যোজন দূরে আর তাতে পৃথিবীর যত আত্মা প্রোমোশন নিয়ে গিয়ে আড্ডা পাতে ?

নকুল। শাস্ত্রবাক্য, মানতেই হবে ; ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা ভুল বলেছেন বলতে হবে ? দক্ষ, লিখিত, গৌতম এঁদের কাছে তোমার কেপ্লার, কোপারনিকাস্ ; ইঃ এরা চামড়ার চোখে দেখ্ছে ; তাঁরা অব্যর্থ যোগ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

নবু। তা হলে তো আর মার নেই ! বিলিতি পণ্ডিত-দের মুস্কিল বটে !

নকুল। আমার মনে হয়, পরে তোমার জড়বিজ্ঞান নিজের ভুল বুঝতে পারবে—চাই কি মতটা উল্টাতে পারে যে সূর্য্য কেন্দ্র নয়, পৃথিবীই কেন্দ্র। আর সনাতন অভ্রান্ত বেদ তার পোষকতা কচ্ছেন—

নবু। বেদ হলো ভায়া অঘটন ঘটন পটীয়সী আবার সেদিন কে প্রমাণ করেছেন—আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতটা বেদের ঋষিদের জানা ছিল—কোন প্রভুর মতটা যে গ্রাহ্য তা জানিনি।

নকুল। দুই-ই মত মানবে !—কেননা বেদ নিত্য সত্য যে যুগের বা যে কালের যেটা খণ্ড সত্য বেদ হতে তাই পাবে—তারই পোষকতা আছে—

নবু। দু মতই সত্য ?

নকুল। হাঁ—আমি এখন এমনি দেখছি—এই দেখা-টাই সত্য তবে খণ্ড ও ক্ষণিকভাবে—পরে তার উল্টা দেখ্লাম তাও সত্যি। দেখাটাই সত্য। প্রত্যক্ষ কিনা ? বস্তু নিত্য সত্য নয়, অনুভূতিটাই সত্য—বেদ এই নিত্য অনুভূতির অবিচ্ছিন্ন ধারা !

নবু। চমৎকার ! তুমি গবায়ন, দেবায়ন, পিতৃযান, দেবযান ছেড়ে রসায়নের অধ্যাপক হলে কেন ? প্রতিভার অপব্যবহার এমনও করে ! ফোঁটা চিটের ব্যাখ্যাটা কি শুনি ?

নকুল। ফোঁটা ঠাট্টার জিনিস নয় দাদা। শাস্ত্রের ভিতর ঢুকতে হয় ভায়া, বার হতে টোকা দিয়ে তত্বের রস পাওয়া যায় না। আজ ১০ হাজার বছরের সনাতন প্রথা চলে যে আস্ছে এর ভিতর সত্য না থাকলে কখনো টিক্তো না—

নবু। শুনিই না তত্বটা কি ?

নকুল। ভ্রূমধ্যস্থ যে বিন্দু, ঐটী হচ্ছে আমাদের স্থূল-দেহের যোগবিন্দু; সূক্ষ্ম অধ্যাত্মদেহ ঐখানে জড়দেহে যুক্ত হয়ে আছে—এখন ওই বিন্দুটা বড় সেন্‌সিটিভ্, সমস্ত আধ্যাত্মশক্তি বা সাত্ত্বিক চিৎপ্রবাহ ওখান দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে; যাদের এখনও চিত্ত-সংযম হয় নি তাদের সাত্ত্বিক প্রবাহের অপব্যয় হয়; এই জন্যে ফোঁটা দিয়ে ওই বিন্দুটাকে insulate বা non-conducting করে রাখা হয়—আর অপব্যয় হয় না—

নবু। বা splendid তো! না জেনে সব ঠাট্টা করি —বাস্তবিক খুব illuminating বটে—

নকুল। দাদা বুঝো, বুঝে শুঝে বলো—একটা ত্রি-কালজয়ী সনাতন ধর্ম্ম ঠাট্টার জিনিস নয়—

নবু। আচ্ছা জলশৌচের পর বর্ণ বিশেষকে ভিন্ন রংএর মাটী হাতে দিতে হয় শাস্ত্রে বলে—এর কি কোনো অর্থ আছে? বামুনের হলদে মাটী, ক্ষত্রিয়ের রাঙ্গা মাটী, শূদ্রের কাল—এ সব কেন?

নকুল। নিশ্চয়! নিশ্চয়! খুব গভীর অর্থ আছে—জার্ম্মান পণ্ডিত ভন্‌গটসলির ম্লেচ্ছ হয়েও এ তত্ত্ব বুঝেছে, আর তোমরা ঋষিবংশে জন্মে বুঝলে না দাদা! এসে বোঝাচ্ছি—

(অন্দরে প্রবেশ)

নবু। Good God! this puny philosopher not six feet high—অথচ কি অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ! Past all hope—past surgery!

(নবু চুরুট ধরাইয়া চোখ বুজিল)

(বিশুকে লইয়া বিপিনের প্রবেশ, বিশুর অদ্ভুত বেশ! পায়ে ফুল মোজা, গলায় গলাবন্ধ, গায়ে উলের গেঞ্জি, পরনে হাপ্ প্যাণ্ট, সমস্ততে একটা নীল র‍্যাপার জড়ানো কমাল লইয়া ঘন ঘন শুকিতেছে—কাঁদন কাঁদন মুখের চেহারা—)

বি। ইস্‌টুপিট্ ওইখানে—খবরদার বাড়ীর ভিতর যাবিনি—

(শব্দ শুনিয়া নবু চোখ মিলিল; বিশুকে তদমূর্ত্তি দেখিয়া—বিস্মিত ভাবে)

নবু। একি? বিশুর কি হয়েছে? অমন তর সাজ কেন?

বি। (ব্যাজার মুখে বিরক্ত সুরে) আর বলো না ভাই। জ্বালাতন হইছি!

নবু। সেতো শুদ্ধান্তপুরে ঢুকলেই—পহরে পহরে হও,—ব্যাপার কি?

বি। লক্ষীছাড়া কোথায় বাগানে কিসের হাড় মাড়িয়েছে তাই গিন্নির শুচিবাই চেগে উঠেছে—ছেলেটাকে বিকালে গঙ্গাজলে চুবকানো হয়েছে! চারদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড় নিমোনিয়া হচ্ছে; আর ওতো সদ্য ম্যালেরিয়া হতে উঠেছে—এর ওপর দেখ শাস্তিখানা—একটু যদি commonsense আছে! আর ধুনোর ধোঁয়াতে মনসা নাচে—ভগ্নীপতিটি হয়েছেন ১ নং abettor!

নবু। বাস্তবিকই! ইন্দুর সঙ্গে খাপ্ খায় কি করে! mesalliance এর দুটী দৃষ্টান্ত তোমরা দুই জোড়া! তা ওকে অমন সং সাজিয়েছ কেন?

বি। বলছ কি নবু? একতো হাড় ফুটেছে পায়ে, কি সব জারম্ ব্যাসিলি রক্তে ঢুকলো কে জানে বল? তার পর এই sudden Temperature কমে যাওয়া; germ গুলো develop করতে পারে তো? কোন কালের পচা গঙ্গাজল full of Typhoid Bacilli—

(নকুলের প্রবেশ, তসরের কাপড় পরা খড়ম পায়ে)

নকুল। শুনলে নবু? গঙ্গাজলে bacilli? Mark Twain গঙ্গাজল সম্বন্ধে কি বলেছে জান? ঋষি বাক্যতো মানবে না তোমরা—

বি। রাখ তোমার Mark Twain! নিজেরা পারলেন না এখন মার্কটোয়েন, গটস্‌লির অমুক, কমনা!—

নবু। হাঁ বোসজা ঋষিরা পঞ্চনদে বসে গঙ্গাজল পেতেন কোথা?

নকুল। হাস্যকর কথা? ইংরাজি মতটা ছাড় ভায়া! ঋষিরা হিমালয়ে অলকানন্দা, গঙ্গা, ভোগবতী এ সবের তীরেই থাকতেন—পঞ্চনদের Theory exploded! আর্য্যতত্ত্ব-দীপিকায় আমার প্রবন্ধটা পড় ভায়া—

(বিপিন কি একটা ওষুধ ঢালিয়া বিশুকে দিয়া)

বি। খেয়ে ফ্যাল—

বিশু। (বিষণ্ণভাবে) যে গন্ধ!

বি। তা হোগ্—খেয়ে ফ্যাল

নবু। কি ওটা? কেন খাওয়াচ্ছ?

বি। কি একটা anticeptic, germicide ওষুধ—

নবু। ও শুধু শুধু খাওয়াচ্ছ কেন?

নকুল। ঐ এক বাতিক ওর! কারণে অকারণে নিজে আর ছেলে পুলেকে ঐ সব খাওয়ানো! জারম্ আর ব্যাসিলির সঙ্গে এঁর যুদ্ধ লেগে আছেই—মানুষ যেন শুধু খানিকটে কটের টুকরো, পোকা ঢুকলেই তাকে কেটে ফেলবে! কি দেহাত্মবোধ! ছিঃ—

নব। কতকটা তাই বটে হে! দেখ্‌লে তো মাস খানেকের মধ্যে ৬০ লক্ষ লোকের ঐ পোকার কৃপায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ে গেল? গ্রামকে গ্রাম, দেশকে দেশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে! তোমার গঙ্গাজলে যদি রক্ষে হতো তা হলে গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত দুধারের লোক অমর হয়ে থাকতো!

বি। (ছেলেকে) খা, চুপ করে রইলি যে?

নবু। দরকার কি আর ব্যাচারীকে ভিতরে বাইরে উভয়তঃ নাকাল করা? জারম্ তো ঢোকে নি?

বি। (বিস্ময়ে) ঢোকে নি? বলছ কি নবু? জাননি কি কাণ্ড হয়েছে?

নবু। না।

বি। জানলে বল্‌তে না। ব্যাপার এই বেস্পতিবারের বার বেলায় হাঁড় ছোঁয়া হয়েছে বলে—আর নাকি একটা ফাঁড়া ঘটাবার জন্যে—গ্রহউপগ্রহ সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করছে—আমাদের পুরুৎঠাকুর ছেলের কুষ্টিতে কান দিয়ে সেই ষড়যন্ত্রের পরামর্শ শুনে ব্যবস্থা করেছেন,—সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর চরণামৃত খেলে—সহস্র কোপ শান্ত হবে; তাই না শুনে ঠাকুরঘর হতে কবেকার পচা—নোংরা বাসি জল খানিকটা খাইয়ে দিয়েছে মশাই! একেবারে culpable homicide!

নকুল। (উত্তেজিতভাবে) বিপিন তুমি হচ্ছ কি? দেবতার চরণামৃত হল পচা নোংরা জল!

বি। না তো কি? কবেকার দুর্ব্বো, বেলপাতা, ফুল তাতে পড়ে পচে যা তা হয়ে আছে—dirty water! এই হ'ল চরণামৃত? একতো দেবতার চরণই নেই—তারপর ঐ জলের অমৃতত্ব! নিতান্ত মাথা খারাপ না হলে—কোনো sane মানুষ এমন বলে না!

নবু। (নকুলের দিকে তাকাইয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে) বিপিন তো out-Haeckels Haeckel even...ওর কথা শুনো না নকুলবাবু—আচ্ছা এই চরমেরতোর নিশ্চয়ই কোনো mysterious আধ্যাত্মিক তেজ আছে!

নকুল আছে না? নিশ্চয়ই আছে? একটা odic fluid—

বি। (না শুনিয়া) এটা খাওয়াচ্ছি ঐ জন্যে—ভায়া দেখ্‌ছো তো চারিদিকে কত রোগ? কে বলতে পারে ঐ জলে অজানা ব্যারামের ব্যাক্‌টিরিয়া নেই? এই ওষুধ টা antidoteএর কাজ করতে পারে।

নকুল। আর এই যে লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তি করে খাচ্ছে তারা মরে যাচ্ছে বল্‌তে চাও?

বি। যাচ্ছে না বল্‌তে চাও?

নকুল। তোমার মেচ্‌নিকফ্‌ হক্সলি, মিল মরে নি?

বি। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করা আর একটা—— ভজা দরজা জানালাগুলো বন্ধ কর—মাথার দিকে—

নবু। কেন বেশ্‌তো বাতাস আসছে?

বি। নাহে বোঝ না—ঐ পাড়ায় সে দিন একটা লোক টাইফয়েডে মরেছে—আরো দুটো হয়েছে—ঐ বাড়ীতেই—

নকুল। —জারমো-ফোবিয়া—হাইড্রো-ফোবিয়ারই দাদা—

বি। আর শুচিবাইটা—এ দুয়ের-ই ঠাকুর দাদা—

(হাস্য)

(ঔষধ খাইয়া বিশু বমি করিতে আরম্ভ করিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতার লক্ষণ দেখাইতে লাগিল—বিপিন কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িল—নবু ও নকুল উঠিয়া কাছে গেল——)

নবু। অমন করছিস্ কেন?

বি। কি জানি গা পাক্ দিচ্ছে—কেমন করছে—

নবু। বিপিনদার সবই বাড়াবাড়ি—কি জন্যে ছাইভস্ম ওটা খাওয়ানো হল যে!

নকুল। —জারম না মরুক—ছেলে তো মরতে বসলো—

বি। বাজে বকছো কেন? ওষুধ খেয়ে কি হচ্ছে—হে? তোমাদের সেই চরণামৃত খেয়ে হচ্ছে। নিশ্চয়ই তাই—। কোথাকার dirty-water—

(বিশু ক্রমশঃ অস্থির হইয়া পড়িল)

(নকুলকে) বোসজা একবার চট্ করে ডাক্তার ভাদুড়ীকে ডেকে আনো ভাই—যা ভয় করিছি তাই—

(নকুলের প্রস্থান)

বি। নবু একবার দেখতো আসছি এখনি—,

(অন্দরে প্রস্থান)

ইন্দুর প্রবেশ

ই। কি হয়েছে নবু দা?

নবু। বিশুকে তার বাপ কি ওষুধ খাইয়েছে, তাই বমি করছে—

ই। কেন?

নবু। —বৌদির চরণামৃতের জারম্ নষ্ট করবার জন্য জারম্—জারম্! —রোগ জীবাণু—বুঝেছিস্!

ই। জারম যাগ্ না যাগ্, ছেলের জান্ যে অতিষ্ঠ হতে চল্‌লো—! বাড়ীতে বৌদির হাতে একচোট্ নির্য্যাতন কি কম হলো; এখানে আবার—দাদার হাতে—এই এক শাস্তি! ওষুধই দিনরাত—কত খাওয়ানো! দুই-ই সমান!—

নবু। —একেই বলে উভয়-সঙ্কট! অন্দরে বৌদিদির হাঁচি টিক্‌টিকি, হাড়, সগড়ি—, শনি, রাহু, আর বাইরে ভায়ার ব্যাক্‌টিরিয়া ব্যাসিলি জারম! উভয়-সঙ্কট আর কাকে বলে?

ইন্দু। সত্যি বটে! (কাছে গিয়া) ঘুমুচ্ছে? ঘুমুক—

— ইতি —

শারদীয়া

[শ্রী কিরণকুমার রায়।]

(কুশীলব)

মা
মেয়ে
ধাপিদ ঝি
রায়বাবু
পুরুৎ ঠাকুর
পারিষদ

প্রথম

[ভাঙা বাড়ীর একটী কুঠুরী। আবশ্যক অনাবশ্যক নানা প্রকার জিনিসে ঘরের কোণটী অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। বিপরীত দিকে একটী তক্তপোষের উপর জীর্ণ কাঁথা গায়ে দিয়া একটী বারো তের বছরের মেয়ে শুইয়া আছে—তাহার মাথার কাছে মা রুগ্না কন্যার

কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। তক্তপোষের মাথার কাছে একটী অর্দ্ধভগ্ন টুলের উপর এক গ্লাস জল একখানা পুরাণো বই দিয়া ঢাকা রহিয়াছে—মেয়ে পাশ ফিরিয়া শুইল। ডাগা ডাগা চোখ দুটী জ্বরের তীব্র জ্বালায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল]

"ও মা—"

"কি মা?—এই তো আমি রইছি"—[মা, মেয়ের অবিন্যস্ত চুলের গোছা গুছাইয়া দিলেন। জ্বরের ঘোরে মেয়ে আবার চুপ্ করিয়া পড়িয়া রহিল। একটু পরে, চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল—]

"বড্ড তেষ্টা পেয়েছে মা—একটু জল !"

[টুলের উপরের জলের গ্লাস হইতে মা মেয়েকে জল দিলেন—বুঝি দিতে মন সরিতেছিল না—শুধু জল, তাহার সহিত এক কণা মিছরী দিবার সঙ্গতিও তাঁহার নাই। মেয়ে, মায়ের হাতখানি বুকের উপর টানিয়া আনিয়া, আবার নিসাড় হইয়া চোখ বুঁজিল]

"সাম্‌নের জান্‌লটা খুলে দাও না মা"

[মেয়ের বুকের উপর ভালো করিয়া কাপড় টানিয়া দিয়া, মা, সাম্‌নের জানালা খুলিয়া দিলেন। জানালার পাশে, একটী চাঁপা ফুলের গাছ ছিল—তাহার গন্ধ আসিয়া ঘর পূরিল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের সোণালী আলো আসিয়া মেয়ের পাংশু মুখে পড়িল—মা বুঝি আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস চাপিলেন]

"রায় বাড়ীতে বাজ্‌না বাজ্‌ছে, না মা?"

"হ্যাঁমা, কাল বুঝি— পুজো আরম্ভ—"[—বলিতে যাইয়াই মা থামিয়া গেলেন—তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, হিন্দুর ঘরের কচি ছেলে মেয়ের কাছে কত আনন্দের ধন, এই পূজা—সাত দিন একজ্বরে ভুগিয়া হয়ত দুর্ব্বল মন 'কাল পূজা, অথচ সে রোগে পড়িয়া, সে দেখিতে পাইবে না—এই নিষ্ঠুর পরিহাস সহিতে পারিবে না]

"আজ তা হ'লে ষষ্ঠী মা—"

"হ্যাঁ মা"

"আমার কবে জ্বর হ'য়েছে মা?"

"প্রতিপদের দিন"

"কবে সার্‌বে—মা?"

"দিন দুয়েকের মধ্যেই সেরে যাবে"

আমি তা'হলে পূজা দেখ্‌তে পাবো না মা?"

"কেন পাবে না মা?"

[কিন্তু বিনা চিকিৎসাতে এই সাত দিনের জ্বর যে দুদিনে সারিবে না, তাহাও তো তিনি জানিতেন। পাড়ার রমণী ডাক্তার বলিয়া পাঠাইয়াছে 'বিনি টাকায় রুগী দেখা—পয়সা দিয়া ডাক্তারী পড়ি নাই—?—ওসব হইবে না'—মার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জলের ফোঁটা গড়াইয়া গালে পড়িল—মা তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিলেন—ভয়, পাছে মেয়ে দেখিয়া ফেলে]

"কিন্তু জর না সার্‌লেই ভালো মা"

[—বলিয়া মেয়ে মলিন হাসিতে উজ্জল হইয়া উঠিল]

"সে কি মা? তোমার জ্বর আজ কালই সেরে যাবে"

"না সার্‌লেই ভালো মা—সার্‌লেই আবার পুজো দেখ্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌বে তখন আবার ভালো কাপড় জামা চাই।"

"জান্‌লাটা বন্ধ করে দিই মা—আবার যদি ঠাণ্ডা লাগে"

"আর একটু পরে দিও মা—আঁধার হ'লে পর"

"আচ্ছা"

—[—বলিয়া মা মেয়ের দুঃখের কথার স্রোত বদ্‌লাইয়াছেন, ভাবিয়া খুসী হইলেন]

"তোমাকে আর বছরের কথা বলিনিই মা?"

"কোন্ কথা?"

"ঐ যে আর বছর, পুজো দেখ্‌তে যেয়ে, কি হইছিলো?"

"কৈ না তো—আচ্ছা সে ব'লোখুনি-এখন—"

"না মা, শোনো—সে ভারী মজা হয়েছিলে—। রায়দের বাড়ীর বিজ্‌লী আছে না? সে এসেছিলো ভারী দামী কাপড় চোপড় পরে' পুজোর আরতি দেখ্‌তে; আর আমার পরণে ছিল শুধু ধুতি আর সেমিজ। আমার পাশটাতে এসে সে ঠেসে ঠুসে বসে' ব'ল্লে 'এই এখান হ'তে সরে যা'—আমি কিন্তু যেতুম্ না, কিন্তু তার জামার উপরে সব কি কাঁটাকাঁটা মত দেওয়া ছিল, আমার ভয় হ'লো মা যে সেগুনো আমার গায়ে বিঁধ্‌বে, তাই

সরে গেলুম। তখন সবাই মিলে আমাকে ঠাট্টা কর্ত্তে লাগ্‌লো যে ধুতি সেমিজ পরে এসেছে আরতি দেখ্‌তে আর বল্লো যে ময়লা কাপড় পরে ঠাকুরের সাম্‌নে গেলে, ঠাকুর রাগ করেন—তাই নাকি হয় মা? ঠাকুর তো শুধু বড়লোকের নয় গরীবেরও, তাই নয় মা?"

"তা বই কি মা—"

"আচ্ছা তাই যদি হ'বে মা, ঠাকুর যদি ময়লা কাপড় পরে গেলে রাগই করেন তবে তিনি সকলের কি করে হ'বেন—আর তাঁর পূজো ক'র্‌বারই বা কি দরকার—এই সোজা কথাটা কিছুতেই বিজ্‌লীরা বোঝে না কেন মা?"

"বড়লোক যে—এবার জান্‌লাটা বন্ধ করে দিই মা—ঠাণ্ডা আস্‌ছে বড়।"

"আর একটু খোলা থাক্ মা—বন্ধ করে' দিলে আর বাজ্‌না শুন্‌তে পাবো না—পূজোর বাজ্‌না কি মিষ্টি শুন্‌তে মা—আর একটু পরে বন্ধ করো মা"

[বাহির হইতে কে ডাকিল]

"কই সাঁঝের পিদিম্‌ও এখন জ্বালোনি—একেবারে যে ভুর্‌কুট্টি আঁধার—"

"এস বাছা—আমি আলোটা ধর্‌ছি"

[মা যাইয়া মাটীর প্রদীপ জ্বালাইয়া, বারবার এক অদৃশ্য শক্তিকে প্রণাম করিয়া, প্রদীপটা দোরের কাছে ধরিলেন। মেয়ে উৎকর্ণ হইয়া দূরাগত পূজার বাজ্‌না শুনিতে লাগিল]

"না গো কিছুতেই রাণীমা রাজী হ'লো না কত ব'লনু যে তার মেয়েটা মরে—যদি এই চিক্‌টা নিয়ে দুটী টাকাও দাওতো তার ভারী উপকার হয়—আর তোমার মা রাজার সংসার একটী দুটী টাকা তোমার কাছে তো কিছুই নয়—তা ব'ল্লো যে—'না বাবু এই বছরকার দিনে আমি অলক্ষীর 'দেরোব্বো' নিতে পার্‌বোনি'—এই নাও মা, তোমার জিনিস—গড় হই—বামুনের ঝি—ভরসন্ধ্যা হয়ে এলো—আবার সেই এক ক্রোশ পথ যেতে হ'বে—তা দেখো মা কিছু যদি মনে না করতো বলি যে তোমার আবার বাড়াবাড়ি। এই সে দিনে যখন চক্কোত্তি মশাই মেয়েটারে বিয়ে ক'র্‌ত্তে চাইলো—তখন কেন রাজী পেলে না—তা হ'লে কি এত দুঃখ্ পোয়াতে হ'তো—তা তাঁর বয়সটাই বা কি এমন বেশী আরও 'পেরথম' পক্ষও যা 'চতুত্থিও তাই—গড় হই—এখন আসি"

[মা যে সেই চৌকাট হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—চলিয়া যাইবার পরও তাহাই রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শেষ সম্পত্তিটা কুড়াইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ে তখনও উৎসুক হইয়া রায়দের পূজার বাজানা শুনিতেছিল]

"কে এসেছিলো মা?"

"ঐ ওদের বাগ্দী ঝিটা"

"কেন মা?"

"একটা জিনিস দিতে"

[বলিয়া মা খোলা জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া মেয়ের পাশে বসিলেন। মেয়ে, পাশ ফিরিয়া মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল]

"সেই গল্পটা বল না মা"

"কোনটা মা?"

"ঐ যে সেই এক গরীব বামুন ছিল, রোজকার রোজ খেতেও পেতনা—কিন্তু পূজোর সময় পূজো ক'র্‌তো—খুঁদকুড়ো দিয়ে—ঐ সেইটে"

[মা, মেয়ের পাশে শুইয়া গল্প করিতে লাগিলেন, মেয়ে শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল]

দুই

[সাজানো ঘর, দেয়ালে পেণ্টিং করা; বিলিতী ছবি, নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির পাশে রাধাকৃষ্ণ কালীর ছবিও রহিয়াছে ধব্‌ধবে ফরাস পাতা, তাহার উপর কয়েকটী তাকিয়া ছড়ান রহিয়াছে—তারই একটায় হেলান দিয়া রায় বাবু বসিয়া আছেন—সুগৌর দেহ, সুডৌল মাথা, হাতকাটা জামা গায়ে দিয়া আর ফর্‌সীর নল মুখে দিয়া ধূম্রোদ্গীরণ করিতেছেন। সামাদানে বাতি জ্বলিতেছে আর পারিষদ্‌-বৃন্দ গ্রহ উপগ্রহের মত চারিদিকে সন্ত্রস্ত বিরাজমান। ঘরের এক কোণায় কতকগুলি আল্‌মারী সাজানো আর নীচে তামাক সাজিবার আসবাব রহিয়াছে—একটী চাকর

সেখানে বসিয়া তাহারই সরবরাহে ব্যস্ত বড়বাবু হাঁকিলেন—]

"তাহ'লে কি বলহে চন্দর্—যাত্রার বদলে এবার বাই নাচ্ই আসুক্—আপত্তি কি ?"

"হেঃ হেঃ কিছু মাত্তর না—ওতে আর কি আপত্তি থাকতে পারে ?"

"কিন্তু যাই ব'লুন্ চন্দর বাবু, যাত্রাটা যেমন জমে তেমনটীকি আর কিছু জম্‌বে—এইত আর বছর মথুর সা'র যাত্রা এলো—আহা কি সুন্দরই গেয়েছিলো"

আরে যাও-বাবা—বাইনাচের কাছে ওসব যাত্রাফাত্রা—বাবা বুঝ্‌লে কিনা-ফক্কিকার—এইতো সেবার বড়বাবুর সাথে যে ক'ল্‌কাতা গিছ্‌লুম—সেই বাড়ীতে নাচ হ'লো—বুঝলে কিনা বাবা—দেখোনি তো তোমায় আর কি ব'ল্‌বো।"

"তা যা ব'লেছো ভায়া—" "হ্যা হে—এই যে আমাদের শাস্ত্রেতেইতো আছে—

ঐ যে কি—যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যতে, রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ— এর মানেতো জানাই আছে—"

বড়বাবু

"কিন্তু—বাইনাচ যদি আসেই— তবে সে নাচ্—উলীর মত নাচ্—উলী আন্‌বো"

"তাতো বটেই—বুঝ্‌লে কিনা বাবা—সে নাচ্-উলীর মত নাচ্—উলী"

[এমন সময় পুরুৎঠাকুর—সংক্রান্তি পুরুষের মত সুদর্শন—এক লম্বা ফর্দ্দ হাতে নিয়া সেই ঘরে ঢুকিলেন]

"প্রণাম হই ঠাকুর মশাই, বলি কি খবর ?"

[বলিয়া বড়বাবু ফর্‌সীর নল টানিয়াই প্রণামের কাজটা সারিয়া দিলেন]

"আজ্ঞে সব ঠিক্ তবে ছোটবাবু যে—"

[বলিতে বলিতে পুরুৎঠাকুর সেই—ফরাসের এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। বড়বাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন]

'এই ছোটবাবু, বিস্তায় অবশ্য তিনি বৃহস্পতি, কিন্তু তবুও অল্পবয়স্ক কিনা—তিনি—অবশ্য বাজার তিনি উত্তমই—করেছেন্ তবুও-দানের— মানে, ব্রাহ্মণের প্রাপ্যদ্রব্য গুলো তিনি ঠিক্-মানে—" "সে কি ব'ল্‌ছেন্ ঠাকুর—বুঝ্‌লেন কিনা, আমাদের ছোটবাবু,—তিনি যে বাবা—বুঝ্‌লে কিনা, বাজারের অর্থাৎ কিনা—তিনি বা—আরে—" "তবুও-অল্পবয়স্ক কিনা—তিনি তো আর জানেন্ না যে ব্রাহ্মণ বিদায়েই পূজা সার্থক—এই মনু বলে গেছেন্—"

[বড়বাবু এতক্ষণ উহাদের বাদানুবাদ ফর্‌সীর নলের ফাঁকে ধুমা ছাড়িয়া ছাড়িয়া শুনিতেছিলেন—মনুর উল্লেখেই হউক কিম্বা আর কিছুরই জন্যই হউক বিরক্তি বশতঃ কপালটা একটু কুঁচ্‌কাইয়াও গিয়াছিল—তিনি হাঁকিলেন]

"সে যাহোক্, ঠাকুর মশাই, আপনার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তা'র ব্যবস্থা আমি ক'রবোখুন-এখন চলুন্, সবাই মিলে প্রতিমা দর্শনে যাওয়া যাক্—আর দেখুন্ ঠাকুর মশাই—আপনি বাড়ী ফির্‌বার সময় পথে তিনু খুড়োকে বলে যাবেন্, যে কাঙালি ভোজনের জন্য আমি আর বাজে খরচ কর্‌তে পার্‌বো না—ইচ্ছেছিল এবার কল্‌কাতার থিয়েটার এনে দেখিয়ে দেবো, পুজো কাকে বলে, কিন্তু ঐ টাকার থাক্‌তিতেই পার্‌লুম্ না—এই তো ব্যাপার ;—কাঙালী ভোজন টোজন, ও সব বাজে খরচ আমার দ্বারা হ'বে না—"

[সপারিষদ্, রায়বাবু পুরুৎঠাকুরকে অনুসরণ করিয়া—মণ্ডপ ঘরের পানে চলিলেন—রায়বাবুর হাতের ফর্‌সীর নলটী—হাত ছাড়া হইয়া প্রথমে তাকিয়ার উপর, তারপর ফরাসের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল—কলিকাটী ধুঁয়াইতে লাগিল]

—•—

তিন

[ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে। আঁধার নিশি। নদীর বুক হইতে অস্পষ্ট বিজয়ার বাদ্য ভাসিয়া আসিতেছে—বড় করুণ। গৃহের ভিতর প্রদীপ শিয়রে মা ও মেয়ে শুইয়া—মেয়ের কপালের উপর পাৎলা কাপড়ের টুকরা

ভিজানো—মা বাতাস দিতেছিলেন। এই পোনোরো দিনের অনিদ্রা অনশনে, তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল—মেয়ে সেই একজ্বরেই ভুগিতেছে—চিন্তাক্লিষ্ট চোখে ঘুমের লেশও ছিল না]

"ওগো মা"

[হঠাৎ মেয়ে চম্‌কিয়া উঠিয়া, আরক্ত চোখ দুটী মেলিয়া একবার তাকাইল—স্তিমিত হাস্যে আবার চোখ মুদিল]

"ঘাট্—ঘাট্"

[মা, মেয়ের বুকের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। —মেয়ে আবার চম্‌কিয়া উঠিল]

"শুন্‌ছো মা ?—কি সুন্দর—কেমন বাজায়—ভারী মিষ্টি"

[হঠাৎ কড়্‌মড়্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল—বিদ্যুৎ চমকে ঘরটাকে চকিত করিয়া দিল—মেয়ে ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল] —"

"ঘাট্—ঘাট্—ঘাট্"—"

[মেয়ে এলাইয়া মায়ের কোলে পড়িয়া গেল]

"ঘাট্‌ঘাট্‌-ঘাট্—সব দিকিন্ মা—ভালো—"

[মেয়ের মাথা বালিশে দিতে যাইয়া দেখিলেন—মেয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছে দূরে উৎসবের বাদ্য বাজিতেছিল—]

"আমি যাবো মা—যাই মা—সই যে ডেকে গেলো"

[মা চুপ্ করিয়া শুনিতে লাগিলেন]

"যাই মা—নোতুন কাপড় নাই বা হ'লো মা—

—তাতে কি—বক্‌বে ?—বয়েই গেলো—"

[মার চোখ দিয়া জল ঝর্ ঝর্ করিয়া গালের উপর গলিয়া পড়িল]

"এখান হ'তে যাবো ? কেন ? দামী কাপড় নেই ? মা যে বলে ঠাকুর যেমন তোমাদের, তেমন আমাদের—জগজ্জননী যে—তাঁর কাছে কি বাচ্‌বিচার আছে—এখানেই থাকি ভাই—আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না—"

[মেয়ের চোখের জলে, মায়ের চোখের জলে মিশিয়া গেল—মা আঁচল দিয়া মেয়ের চোখ মুছাইয়া দিতে যাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন]

"কাঁদ্‌ছো ?—কেন ?—চক্কোত্তী ঠাকুর বলে পাঠিয়েছে—আমাকে বিয়ে ক'র্‌বে ?—তাকে বলে পাঠাও না মা যে আমার বিয়ে দেবে না—"

[মা আড় কাতালি করিয়া মেয়েকে বালিশের উপর শুয়াইয়া দিয়া নিজের বুকের ভিতর তাকে আগুলিয়া ধরিলেন গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার জমাট বাঁধিল—বাহিরে আরো জোরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—বাতাস বহিতে লাগিল]

"মা—ওমা—মা" [মেয়ে কাঁদিয়া উঠিল]

"এই যে মা—কি কি—কি চাই মা ?"

[মেয়ে হাসিয়া উঠিল]

"যাই বোন্—যাই—সই—পূজো দেখ্‌তে যাবো—ময়লা কাপড় চোপড় নিয়ে কি ঠাকুর দেখ্‌তে যায়। একটু দাঁড়া বোন্—ঠাকুরের কাছে যাবো—থাম্ সাজ গোজ করি—কেমন ?"

[উদ্দাম হাস্যে মেয়ে ঘর ভরিয়া ফেলিল—মা চুপ্ করিয়া স্তিমিত আলোয় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—আর একবার খুব জোরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল—বিদ্যুতের আলোতে মা দেখিলেন—মেয়ে অল্প অল্প হাসিতেছে—]

"ও মা—"

[চোখ দুটী স্থির চাহিয়া রহিল—দম্‌কা এক চোট বাতাস আসিয়া প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল—মা চোখের জল মুছাইতে যাইয়া দেখিলেন—মেয়ে হিম হইয়া গিয়াছে]

* * * *

"কইগো—ভর্‌সন্ধ্যে বাদ্‌লার রাত—একেবারে অলক্ষ্মীর বাথান—সাঁঝের বাতি দেওয়াও নেই—বিজয়ার প্রেণামটা দিতে এনুগো—কই মেয়ে কেমন আছে গো—"

[দূরে বিসর্জ্জনের বাদ্য ক্লান্ত করুণ স্বরে—বৃষ্টি আর বাতাসের তালে তালে বাজাইয়া শারদীয়ার শেষ জানাইতে লাগিল—]

যবনিকা

'গান'

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ,
কেমনে দিই ফাঁকি ?
আধেক ধরা পড়েছি গো,
আধেক আছে বাকি।

কেন জানি আপ্‌না ভুলে
বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তা'রে ঢাকি,—
আধেক ধরা পড়েছি যে
আধেক আছে বাকি।

বাইরে আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ,—
অন্তরে মোর তোমার লাগি
একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে
রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায়না কেন আঁখি ?
আধেক ধরা পড়েছি যে—
আধেক আছে বাকি।

———— ——

স্বরলিপি

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সা সা-ন্‌া সা | সর্সা -া -া -া | র্সণা ণা-পণা পদা | দপা -া -া -দা I মাণদা -া দা |
বি শ ০ জো ড়া ০ ০ ০ ফাঁদ্ পে ০ ০ তে ছ ০ ০ ০ কে ম ০ নে

| ণা -া -র্সা-ঋর্া | ঋণা -া সা -া | -া -া -া -া I সজ্ঞা জ্ঞা -া ঋা | র্সা -া -া -া | র্সণা পণা -া দা |
দিই ০ ০ ০ ফাঁ ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ আ ধেক্ ০ ধ রা ০ ০ ০ প ড়ে ০ ছি

| দপা -া -া -দা | দর্সা ণর্সা -া ণা | পদা -া -া -পা | পমপা -মা পা -া | -া -া -া -া II
গো ০ ০ ০ আ ধেক্ ০ আ ছে ০ ০ ০ বা ০ কী ০ ০ ০ ০ ০

II পদা দা -া দপা | ণা -া -দা -ণা | ণা র্সা -ঋর্া ঋর্ণা | র্সা -া -া -া I দা দা -া ণা |
কে ন ০ জা নি ০ ০ ০ আপ্ না ০ ভু লে ০ ০ ০ বারেক্ ০ হৃ

| ণজ্ঞর্া -া -া -ঋর্া | ঋর্সা সঋর্া -জ্ঞর্া জ্ঞঋর্া | র্সা -া -া -া I সজ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞরা | মজ্ঞা -া -া -ঋা |
দ ০ ০ য়্ যায় যে ০ খু লে ০ ০ ০ বা রেক্ ০ তা রে ০ ০ ০

সা -রা জ্ঞা -া | -া -া -া -া I "আধেক ধরা পড়েছি গো" ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় II
ঢা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০

II দা দা -া ণ্‌া | সা -া -া ঋা | জ্ঞা মজ্ঞা -া ঋা | সা -া -া -ঋা I জ্ঞা -া -মা -া | মজ্ঞা -া ঋা -া |
বাই রে ০ আ মা ০ ০ র্ ভু ক্তি ০ যে ন ০ ০ ০ ক ০ ঠিন্ আ ০ ব ০

সা -া -া -া | -া -া -া -া I সা -দা দা দা | দপা -া -া -া | ণা পদা -ণা দপা | মজ্ঞা -া -া -া I
র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্ অ ন্ ত রে মোর্ ০ ০ ০ তো মা র্ লা গি ০ ০ ০

I মা -া মা -া | সা -ঋা জ্ঞা -জ্ঞঋা | সা -া -া -া | -া -া -া -া I সা সদা -া দা | দপা -া -া -দা |
এ ক্ টি ০ কা ন্ না ০ ধন্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হৃ দয়্ ০ ব লে ০ ০ ০

| দপা ণদা -া ণা | র্সা -া -া -া I দা দা -া ণা | ণজ্ঞর্া -া -া -ঋর্া | র্সা সঋর্া -জ্ঞর্া জ্ঞঋর্া |
তো মার্ ০ দি কে ০ ০ ০ বই বে ০ চে যে ০ ০ ০ অ নি ০ মি

র্সা -া -া -া I
খে ০ ০ ০

I সজ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞঋা | মজ্ঞা -া -া ঋা | সা -ঋা জ্ঞা -া | -া -া -া -া I "আধেক ধরা পড়েছি গো"
চায়্ না ০ কে ন ০ ০ ০ আঁ ০ খি ০ ০ ০ ০ ০

পূর্ব্বের ন্যায় II II

Printed at Sree Gowranga Press, 71-1 Mirzapur Street by Pulinbehari Das.

উপাসনা

সবুজ পাতার অন্তরালে
'আয়' ব'লে কে হাত বাড়ালে,
হারানো সুর উঠ্‌ল বেজে
খঞ্জনী আর একতারাতে !

—সাবিত্রী প্রসন্ন

শিল্পী—শ্রীমান্ অরবিন্দ দত্ত]

Printed by
A[illegible] Printing & Process Works
[illegible] Amherst Street Calcutta

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা ল'য়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে !"

১৬শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩২৭ | ৫ম সংখ্যা

আলোচনী

বর্ত্তমান গীতি-কাব্য

বর্ত্তমান কবি ও কাব্যের কথা ভাবিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাবিতা পূর্ব্বে সম্মুখে ও পশ্চাতে মনে পড়ে। সব দিক দিয়া দেখিতে গেলে কাব্যের ভাব ও ভাষার আদর্শ ও মাপকাটি তিনিই এই যুগে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। একদিকে তিনি যেমন অফুরন্ত শব্দ ও ছন্দের বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া চলিতেছেন অপর দিকে তিনি প্রাচীন সাহিত্যের সকল বেদনাপুলক ভারতবর্ষের জীবনেতিহাসের সকল ভাবপুঞ্জ এবং বিশ্বের মহাকবিগণের ভাবধারাকে তাঁহার কাব্য-কমণ্ডলুতে আনিয়া মহামানবের তীর্থে সেই জন্মভূমির চরণতলে অঞ্জলি ঢালিতেছেন। স্বদেশাত্মার সেই "সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে" আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলিতে, কথা ও কাহিনীতে ফুটাইয়াছেন আমাদের সেই সনাতন কর্ত্তব্যবোধ ও ত্যাগধর্ম, প্রেমকবিতায় তিনি আনিয়াছেন বৈষ্ণবের সেই চিরকিশোর কিশোরীর অনন্ত মধুর লীলা, অসংখ্য গীতিকবিতায় তিনি ফুটাইয়াছেন সেই মাধুরী যাহা বিশ্বময় সেই এক মহা-প্রাণকে অনুভব করিয়া সুর, ও রূপে সেই একেরই প্রকাশ দেখিয়াছে এবং আধুনিক গাথাতে তিনি এই সুখ দুঃখময় গৃহে ও সমাজ জীবনের দুরূহ সমস্যাগুলি বিষণ্ণ স্নেহকোমল অঙ্গুলীতে স্পর্শ করিয়া করুণা জাগাইতেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলার অদ্বিতীয় ব্যঙ্গ ও হাস্য-কৌতুকের কবি। যেমন সুবিমল হাস্যরস সৃষ্টি করিবার পক্ষে তিনি অদ্বিতীয় সেরূপ উদ্দীপনাময় জাতীয় সংগীত সৃষ্টি করিতেও তিনি অদ্বিতীয়। গাম্ভীর্য্য ও আন্তরিকতা তাঁহার গীতি কবিতার প্রাণ। তাহা ছাড়া বিদেশী সুরকে স্বদেশী গানে প্রচলন করা তাঁহার প্রতিভার প্রধান দিক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুর ও ছন্দবন্দ নানা দিক হইতে নানাবিধ গীতিকবিতা রচনার উৎসাহ দিয়াছে।

এই শ্রেণীর কবি শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। তাঁহার ছন্দবন্দ সংস্কৃতের অনুযায়ী গুরু ও গম্ভীর, প্রাণময় সঙ্গীতে ও স্তোত্রগানে তিনি ভগবান ও জাতির জাগরণ মন্ত্র

গাহিতেছেন। আর এখনকার কোন কবির নিকট এমন নবীনের আভাষ, এমন আর্ত্তের ত্রাণ, এমন আশার কথা পাই নাই।

সর্ব্বলোক পুনঃ পাবে ত্রাণ, নবজন্ম হইবে জাতির
মা আমার, মা আমার ওই সমুদ্রের কাঁদে দুটি তীর।

গীতি কবিতায় শাক্ত ও বৈষ্ণবভাবকে আশ্রয় করিয়া তিনি জাতির ত্রিতাপী অন্তরে বরাভয়বাণী শুনাইতেছেন।

হাস্যকৌতুকের সুন্দর প্রকাশ আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের মত রজনীকান্ত সেনের "আমাদের ব্যবসা পৌরহিত্যে," উকিল, হাকিম, ডেপুটী, "যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রোত" প্রভৃতিতে প্রচুর দেখিয়াছি। এবং দ্বিজেন্দ্রলালেরই মত তাঁহার জাতীয় প্রেম নানা গান ও কবিতার সুললিত ঝঙ্কারে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যে রূপ আমরা বিশিষ্টভাবে দেখিয়াছি তাহা হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল আসরের গায়ক ভাবে নহে, অথবা স্বদেশী শোভাযাত্রার উৎসাহী গায়ক ভাবেও নহে, তাহা তাহার অশ্রুধারা-বিগলিতনেত্র-ধ্যান-গম্ভীর ভক্তসাধক রূপ, গদগদ কণ্ঠে তিনি যখন দেবতার নিকট আত্মনিবেদন করিতেছেন। সেই আত্মসমর্পণের সুর কি গভীর, কি গূঢ়, কি আন্তরিক, যখন জীবনের সব হারাইয়া, রোগ, দৈন্য ও দুঃখের দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও শান্ত নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুর দিকে চাহিয়া তিনি অকম্পিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ, গর্ব্ব করিতে চুর
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিলে মোরে,
বেদনা দিলে প্রচুর।

তাঁহার "আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে," "তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'আমি চাহিনা ওরূপ মৃত্তিকার স্তূপ,' 'আমার মায়ের ত ওরূপ নয়' তাঁহার কবীর, তুলসীদাস, রামপ্রসাদের সাধনার উত্তরাধিকারের পরিচয় দেয়। আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে এবং ভিখারীর মুখে মুখে যে তাঁহার গান গীত হইতেছে তাহাই তাঁহার সহৃদয় ভক্তি ও আন্তরিকতার সাক্ষ্য দিতেছে। র..দ্রনাথের ধর্ম্ম সঙ্গীত অপেক্ষা তাঁহার সঙ্গীত মর্ম্মস্পর্শী ও [illegible], উদ্বেগের আবেগ ও দুঃখের বেদনায় উত্তপ্ত। কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্য নাই, আছে সরলতা ও আন্তরিকতা, যাহা তাঁহাকে বিশ্বের মিষ্টিক কবিগণের মধ্যে একটা উচ্চ আসন দেয়।

কথক হেমচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় রজনীকান্ত সেনের পথে যাইয়া আমাদের সেই পুরাতন ভক্তের গানের সরলতা ও আন্তরিকতাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রেরণা অনেকটা নবীনচন্দ্র সেনের অনুরূপ। শব্দের ঝঙ্কার ও আদর্শের অনুপ্রাণনা হিসাবে তিনি অনেকটা নবীনচন্দ্র সেনের পথে গিয়াছেন। সেই ব্রহ্মর্ষিগণের হোমশিক্ষা, আহিতাগ্নি, নবীনচন্দ্রের। সেই ব্রহ্মলোকের আবহাওয়াতে ইহার জন্ম, এবং এই নবজাগ্রত স্পন্দিত-বক্ষ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের "আমরা বাঙ্গালী সাত কোটি ভাই বাস করি এই বঙ্গে" এবং মৃত্যু স্বয়ম্বর, জাতির পাতি, ইজ্জতের জন্য, দাবির চিঠি, গোখলে স্মরণে প্রভৃতি গান নবীনচন্দ্র সেনের সাময়িক গানের মত উদ্দীপনাময়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণার সঙ্গে যেখানে রবীন্দ্রনাথের মিল পাই, সেখানে দেখি আমরা একটা ভাবের লঘু চাঞ্চল্য, ক্ষণিক বৃত্তি মনোমুগ্ধকর চিত্রাঙ্কন। তাঁহার নিজের লেখা হইতে তাঁহার শিল্পের একটা নিপুনচিত্র পাই,

একলা পাকা সয়না ধাতে হাঁপিয়ে উঠে মন
সব সময়েই নয় সাথী মোর কল্পনা স্বপন
সঙ্গ খুঁজি, বাক্য সভাব চাইনে কচকচি
নিরালা আর লোকলয়ে সোণার জাল রচি
ভালবাসি এই দুনিয়া চনমনে সবক্ষণ
মন খুসী হয়, নৃত্য খেলায়, করব না গোপন।

এই সোণার কল্পনা কখনও বিঠোরা-পূজারিণী দেবদাসীর কলঙ্ক ব্যথা, কখনও বা বিষকন্যার নিদারুণ খেলা, কখনও রাজশ্রবার কাহিনী কখনও কখনও বা শব-সাধকের তপস্যা অবলম্বন করিয়া অতি মনোহর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই মোহন তুলিকা স্পর্শ আমাদেরকে Coleridgeর ঐন্দ্রজালিক মায়া অঘটন ঘটন পটীয়সী কল্পনাশক্তি ও চিত্রাঙ্কনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার
কীলক-বদ্ধ কবাট তাহে,
গৃহচূড়ে সৌভাগ্য পতাকা
গৃহতলে শুক সারিকা গাহে ;
শ্লথ আলস্যে আরামে ঝিমাই
রেশমের হিন্দোলার পরে,
দাসী নিপুণিকা আর চতুরিকা
মক্ষী তাড়ায় চামর করে।
শশকের লোহে কেশ ধুই নিতি
কাশ্মীর ফুলে বাঁধি কবির
তুষার মিশ্র শীতল মদিরা।
পান করি কভু সেতার ধরি
সুরে বাঁধা তার করে হাহাকার
বাস্প জড়িমা সুরে জড়ায়
হায় গো হায়।

আধুনিক নবীন কবিদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান। তাঁহার কবিতার বিষয় নির্ব্বাচন তাই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও নূতন।

তাঁহার গীতিকবিতার ছন্দঃ বিচিত্র ও সজীব, আবেগ অপেক্ষা কল্পনাই অধিক, কবিতায় সমগ্র জীবনও সমগ্র সৌন্দর্য্যের অভাব, অথচ সুনিপুন শিল্পী অতি যত্নে অংশগুলি সাজাইয়াছেন। Sublimity তাহাতে নাই, অথচ ক্ষুদ্র গীতিকবিতার কল্পনা উচ্ছ্বাস সৌন্দর্য্য ও মোহ সম্পূর্ণ বিদ্যমান। রচনা তাঁহার সহজ ও সরল নহে, এবং এই কারণে তিনি সাধারণের প্রিয়ও নহেন। হিন্দী, পারশী, আরবী, গুজরাটি শব্দের তিনি মেলা বসাইতে চাহিয়াছেন তাই আসরও জমে নাই, অথচ তাঁহার ছন্দের মৃদু মঞ্জুল নর্ত্তন গতি লোকের কাণকে খুবই চমকিত করে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্ব অপেক্ষ তাঁহার কারুকলা বর্ত্তমান কবিতাজগৎকে অধিক স্পর্শ করিয়াছে। হেমেন্দ্রলাল রায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের পথ ধরিয়া বেশ সিদ্ধিলাভ করিতেছেন।

যাহা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেতে পাওয়া যায় না তাহা আমরা অপর্য্যাপ্ত ভাবে পাইয়াছিলাম একজন নবীন ছাত্র, বোলপুরের সতীশচন্দ্র রায়ের নিকট। কিন্তু বাঙালীর আর তাহাকে মনে নাই ?

মনে পড়ে সে বালকে! বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
চৌদিকে প্রকৃতি, তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রূকুটি মুক্ত, উদার নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
জীবন, জীবন ভাই, আনন্দ জীবন

তিনি জীবনকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, জীবনের দুঃখ ও বিভীষিকাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার গাম্ভীর্য্য ও তুরীয়ভাব, তাঁহার প্রাণময় জীবন ও উত্তাপ তাঁহাকে কবিগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান দিয়াছে। তাই সতীশচন্দ্র রায়ের অকালমৃত্যু keatsএর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ধূমকেতুর মত তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব 'আমার এ কুঠারের ধূমকেতু জ্বালা গাঁথিবে ধবার তরে মঙ্গলের মালা।' ফুল সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু মালাগাঁথা হইয়া উঠিল না।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রতিভা ঠিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিপরীত। ইহাতেই বুঝা যায় বাংলার কাব্য এক নির্দ্দিষ্ট সরল ধারায় বহিতেছে না। কুমুদরঞ্জনের গীতিকবিতা আমাদের পল্লীমাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত সহজ সুন্দর ও সরল। জাতির অন্তরতম প্রাণের স্পর্শে হর্ষ বেদনা-পুলকিত হিয়া তাঁহার আমাদেরকে কতনা প্রেম, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য শান্ত দাস্য ইত্যাদি মধুর রসে মুগ্ধ করিয়াছে। কুমুদরঞ্জন পল্লীর প্রকৃতিমাতা ও অনুপ্রেরণাকে অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাবে ফুটাইয়াছেন—প্রকৃতি ও জ্ঞানের সমগ্রতা অপেক্ষা তাঁহার কাব্যে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের মহাপ্রাণ অধিক প্রতিভাত।

প্রণাম করি পাথর দেখে তোমরা বল ভুল
ভালবাসি শ্যাম ও শ্যামায় প্রিয় বনের ফুল
ছোঁয়াই শিরে ভক্তিভরে নদী নদের জল,
রাঙাচরণ পরশপূত নয় সে কিসে বল ?

প্রাণ যে সবায় ভালবাসে সবায় কৃপা চায়
না জানি কোন ভেকসে ষেরা নারায়ণ মিল যায়।

তিনি বাঙালীর অন্তরের শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম-রসের মধ্য দিয়া গীতিকবিতাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। তাই তিনি মানস বৃন্দাবনকে চির অমর করিয়াছেন; সেই ... , বন উপবন, গোষ্টবিহার বাংলার পল্লীতে পল্লীতে সেই শ্যামসুন্দরের দিব্যলীলা ও ব্রজবধূদিগের চিরবিরহ এবং শ্যামা মায়ের আদুরে ছেলে হইয়া তিনি অমানন্দের ... মাধুর্য্যভোগ করিয়া হৃদয়-রক্ত রঙে আঁকিয়াছেন। নিতান্ত তুচ্ছভাব ও ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ডানপিটে ছেলে, লক্ষীছাড়া, অকেজো অপ্রয়োজনীয় জিনিষকেও লইয়া তাহাকে অপরূপ মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিতে তিনি বিশেষ পটু। উপমা ও রূপক অজস্র পরিমাণে একটির পর একটি সজ্জিত করিয়া মূল ভাবটি অতি মনোরম করিয়া তুলেন। উপমা, কল্পনা, imagery, ভাবে তিনি আমাদের লোক সাহিত্যের গভীর ও আচ্ছন্ন সাধনার সাধক আমাদের লোকশিক্ষক, 'কবি' ও কথকগণের প্রতিভার উত্তরাধিকারী, তাই তিনি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব রামপ্রসাদ নীলকণ্ঠের কল্পনা ও জ্ঞানের পরিচায়ক, এবং মাইকেল নবীন-হেমচন্দ্র তাঁহার স্বভাব সুলভ সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুকবি কেমন সুন্দরভাবে নিজের আদর্শ দিয়াছেন,—

জীবে তব শিব মিলে শ্যাম মিলে শ্যামলে
চরণকমল আশে, ভালবাসা কমলে
মুখে হাসি চোখে জল, হৃদি ভরা পুলকে
ছায়াপথে গতায়তি কর তুমি ভুলকে।

যে প্রেরণায় প্রবাসী বাঙালী সারা বৎসরের কর্ম্মক্লান্তি ও গ্লানি পল্লীর স্নেহ ও শান্তিময় ক্রোড়ে ডুবাইবার জন্য আগমনীর গানের সুরে আত্মহারা হইয়া বিহ্বলচিত্তে ছুটিয়া যায়—এবং তাহার গৃহহারা প্রাণ যে পল্লীগ্রামের শান্তসন্ধ্যার দীপটিকে মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করে,—'মৌন-সাঝের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা আনছে ডেকে গ্রামের ছোট দীপটি প্রাণে বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে'—সেই প্রেরণার অনুভূতি; ঐ গ্রামের দূরাবালোকা ছোট দীপটির মত, শত শত প্রিয় স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া তাঁহার গীতি কবিতায় আমাদিগকে মুগ্ধ ও আকর্ষণ করে।

বাঙালী গৃহস্থ ও গৃহবধূর অন্তরতম প্রাণকে তিনি যেরূপ নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছেন, অন্য কোন কবি তাহা পারেন নাই। তাই তিনি যাহা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও খাটে,—

তুমি আসিবার আগে ফুটিত না হেথা
আমাদের গৃহজবা বারমেসে ফুল
তুমি আসিবার আগে রাঙা রঙে তার
সে রাঙা চরণ বলে হ'ত না'ক ভুল।

তাঁহার গীতিকবিতার অভাব তাহারই, যাহা বাংলার পল্লীসমাজ ও গৃহজীবনে আমরা এখন পাই না। সেই ব্যাপকতর দৃষ্টি, সেই বিরোধ ও সংঘাত, সেই জীবনের উত্তপ্ত অতৃপ্তি।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিভার কবি দুর্গামোহন কুশারীতে কুমুদ মল্লিকের উজানীর সুর সেইরূপই স্বাধীন, সহজ ও অকৃত্রিম ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ও বাঙালীর দুর্ভাগ্য তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আবার কোন পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিকট সেই পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকের সুন্দর স্বাধীন জীবন, সেই পাটক্ষেতের মোহ, সেই নদ ... উচ্ছ্বাস গীতি পাইব?

যতীন্দ্রনাথ বাগচীর নিকট আমরা নিখুঁত সুন্দর পল্লীর ছবি পাইয়াছিলাম! কিন্তু আর পাই না। তাঁহার লিপিকৌশল অসাধারণ। সত্যেন্দ্রনাথেরই মতন তাহার ছন্দের লঘু অবাধ গতি, চঞ্চল নর্ত্তন। করুণ রসস্ফুরণে তিনি অদ্বিতীয়। দিদিহারার মত এক একটি কবিতা বাংলা সাহিত্যের ও বাংলার স্নেহকরুণ গৃহজীবনের অতুল্যসম্পদ। সংহত ও সংযত তুলিকাস্পর্শে তিনি অপরূপ মাধুর্য্য সৃষ্টি করেন, যেমন

প্রেম গেছে যার, জীবন কি আর তার সাজে
রিক্ত কুসুম বৃন্তের কোথা ঠাঁই
রূপরসহীন কণ্টক শুধু প্রাণে বাজে
যার সব গেছে তারে বেঁচে থাকা চাই।

কুমুদরঞ্জন ও যতীন্দ্রমোহনে যে জীবনের সংকোচ,

বিরোধ ও উত্তাপ পাই না তাহা আমরা পাইয়াছি কালিদাস রায়ের কবিতায়। এইটাই তাঁহার নূতন। ইহা ছাড়া কুমুদরঞ্জনের মতন তাঁহারাও নিকট পাইয়াছি আমরা সেই আন্তরিক বৈষ্ণবভাব, সেই কারুণ্য মধুর-সৌন্দর্য্য, সেই নিখুঁত পল্লীর সুষমা ছবি, সেই বৃন্দাবন লীলা, সেই শাকভাতে সুধা। বিরোধের মধ্যে তাঁহার যে সকল গীতিকবিতার জন্ম, সেগুলিতে পাই একটা ব্যাপকতর অন্তর্দৃষ্টি, একটা সুন্দর ভাব ও আদর্শের রূপান্তর, যেটা অতীতের কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান জীবনের গঠন ও পুষ্টি সাধনে সাহায্য করিতেছে। যেমন

মানব হয়ে তোমায় পেয়ে তোমারে ঠিক লভিনি
আমি যে চাহি তোমার প্রতি অণুটি
বাসনা তাই, মরিয়া লভি তোমারে করি যোগিনী
ভস্ম হয়ে ভূষিয়া সারা তনুটি

কিম্বা বৈশ্বানর কবিতায়—

জীর্ণ এদেহ দগ্ধ করিয়া
মুক্তি আমায় দিবে গো যবে
আপনার দেহ ভস্ম মাখিয়া
আত্মা আমার বিরাগী হবে।
তাহাদের প্রভু কবিও দাহন
হে দহন, মম শুভের [illegible]
নির্ব্বাণ তবে হে চির-বুদ্ধ
আমি তব চির শরণ মাগি।

প্রহ্লাদ, দধীচি দুর্ব্বাসা মায়াবিনীর মত আর এক ধরণের কবিতায় তিনি অতীতের কর্ত্তব্যবোধকে বর্ত্তমান জীবনের বিক্ষোভের মধ্যে মধুময় করিয়া আনিতেছেন,—

একাসনে দুই রাজা ভুলনাক অটুট অক্ষয়
ভ্রাতৃস্নেহ পবিত্র পরম
তিলোত্তমা অপ্সরী সে প্রেম তার শুধু মিথ্যাময়
সৌভ্রাত্র যে সত্যের চরম।
হে তপস্বি! বীরাসন দৃঢ় কর, আরো দৃঢ় করে'
রুদ্ধ কর ইন্দ্রিয়ের দ্বার
দগ্ধ কর দুর্ব্বলতা, উগ্রজটি, রুদ্ধ কর আঁখি
শক্ত কর চিত্তের প্রাকার।

ধরিয়া মোহিনীমূর্ত্তি শূর্পণখা রক্ষের প্রেরণা
মায়াবিনী আশে পাশে ঘুরে
সংহর, সংহর, ক্রোধ সম্বর সম্বর রোষানল
বলি যেন পলায় সে দূরে।

নবীন কবিদিগের মধ্যে তাঁহার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্কৃত ভাব ও ভাষার ও ছন্দের প্রভাব লক্ষিত হয়। কমনীয়তা, ও লালিত্য এইজন্য তাঁহার কবিতার প্রধান সম্পদ

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভূতিতে কবি কখনও গিরিবালাকে নগ্ন গৈরিক সৌন্দর্য্য রাশির প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া মানব গৃহে অবতরণ করাইয়াছেন, কখনও বা জগতের অতুলরূপ ও যৌবনের বর্ণ-শ্যামলতার মধ্যে শ্যামসুন্দর ও শ্যামামায়ের স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন।

রোমগুলি মোর কদম ফুলে রয়েছে ঐ শিহরিয়া
গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে আলিঙ্গিতে আহ্লাদিয়া
দ্রবীভূত হৃদয় আমার যমুনাতে গেছে নামি'
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

কৃষক ও কৃষাণীর ব্যথায়, কুড়ানী ও হা-ঘরে কবিতায় তিনি একবারে নিম্নশ্রেণীর সুখ দুঃখ গাহিয়াছেন বিশেষতঃ হা-ঘরে কবিতাটি ঠিক The Cumberland Beggarএর সহচর হইবার যোগ্য।

তাঁহার humanism wordsworthএর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের সোণালী কল্পনা উর্ণনাভের তৈয়ারী লালপরী, নীলপরী, সবুজপরীর বস্তুতন্ত্রহীন সৌন্দর্য্যে আপনাকে একবারে আত্মসমর্পণ না করিয়া তিনি বিশ্বনাথের বিশ্ব ও খণ্ডরূপ খুঁজিয়াছেন, সর্ব্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছেন এবং নানা কবিতায় রোগ, দুঃখ দৈন্যের মধ্যে ভগবানকে চিনিয়া ডাকিতেছেন। শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী এই ভাবের ভাবুক হইয়া সিদ্ধির পথে যাইতেছেন।

অনবদ্য ছন্দবন্ধ ও ভাষার গৌরব সাবিত্রীপ্রসন্নের।

পল্লীর সুখ দুঃখ কাহিনী ও রাখালরাজের বাল্য ইতিহাসের মধ্যে প্রথম তাহার কবিতার রসস্ফুরণ। পল্লীর সংসারের দৈন্য ও নিরাশাকে তিনি অতি স্নেহ-কোমল

করুণসুরে ফুটাইয়াছেন। কুমুদরঞ্জন যেখানে পল্লীর জীবনের বাহিরের সুখ ও দুঃখের ছবি ফুটাইয়াছেন, সাবিত্রীপ্রসন্ন সেখানে পল্লীজীবনের অন্তঃস্থলে পৌঁছাইয়া দুঃখ ও বেদনার গভীরতম ও প্রচ্ছন্নতম আধার হইতে তাহার করুণ মধুর রস সঞ্চয় করিয়াছেন,—

পাঁজর ভেঙ্গে মোর
ছটা ছটা ভাদ্র মাসের কাল রজনী হয়ে গেল ভোর
বুকের মাঝে পাঁচটা পোড়া ফাগুন
জ্বালিয়ে গেছে কুলের কাঠের আগুন ;
এখন আমি দানার মত ফিরি'
বেড়া আগুন আমায় আছে ঘিরি'
রাত্রে আমি পাকা সিঁধেল চোর,
দিনে আমি বেজায় নেশা-খোর
অত্যাচারের ঘানির মধ্যে এখন
মলে ফেলছি পিষে ফেলছি আমারই এই লক্ষ্মীছাড়া জীবন !

*　　*　　*

সাজছ এখন ন্যাকা
হাতের বাঁধন দেখে তোমরা অনেক কথা কইছ ব্যাঁকা ব্যাঁকা,
তখন মুখে কেও কি চেয়েছিলে ?
দু'মুঠো ভাত কেও কি দিয়েছিলে ?
পিঁড়েয় পড়ে আমরা দু'টী প্রাণী
থাকনা—আমি সবারই ত জানি !
নাড়ী দেখার লোক ছিলনা গাঁয়ে
চুকিয়ে দিলাম হেলায় ভজার মায়ে
পেটের জ্বালায় ভজা
না, না, সে সব মিথ্যা কথা,—
সয়তানীতে অনেক আছে মজা।

কিন্তু বৃহত্তর সমাজ ও মানুষের গভীরতর বেদনা-মুখরিত হিয়া তাঁহার আপনাকে শোধন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নূতন হোমের কুণ্ড জ্বালিয়াছে,

পথের যে কাঁটা পড়েছিল পথে, পথের পথিকে
পথের কষ্ট দিতে
তাহার নিঠুর রক্ত কলকও কেমনে না জানি
বিঁধিল তোমার চিতে।
তাই কি তাদের কুড়ায়ে আনিলে ফেলিলে ত্রস্তে
দীপ্ত কুণ্ড মাঝে
আজ যে তাহারা ভস্ম হইয়া ধূসর ধুলায়
পরমাণু হয়ে রাজে।

এই নূতন অনুভূতি, জীবনের এই ব্যাপ্তি ও প্রসার খুব আশাপ্রদ, ইহা একটা বিপুল প্রানের টানে সমাজের নিখিল বেদনা দুঃখের মধ্যে একটা শান্তি ও প্রীতি আনিতেছে। "অকেজো নারী" কবিতায় তাঁহার কি তীব্র অনুভূতি, কি গভীর সমবেদনা,

পণ দিয়ে মন কিনে নিয়ে করি ঘর
তারপর শুধু আপন করিব পর ;
*　　*　　*
আমরা যে প্রাণ হেলায় বিলাতে পারি
সব প্রাণে সয় আমরা কঠিন নারী !
শুধু তোমাদের তোমাদের মুখ চেয়ে
জীবন-তরণী অবহেলে চলি বেয়ে ;
তোমরা বসিয়া পরীর স্বপন দেখ
হীরের পাতায় সোণার আখর লেখ
হাওয়ার মতন গরবে বহিয়া যাও
আমরা যে পড়ে পায়ের তলায় সেটা কি দেখিতে পাও ?

এই দুঃখ ও সমবেদনা ক্রমশঃ বিশ্বময় হইয়া দুঃখময়ের চরণতলে পৌঁছিয়াছে তাঁহার আর এক কবিতায় যেখানে তিনি এই মহাযুদ্ধে শঙ্কিত মাতৃহৃদয়ের গোপন ব্যথাকে সুর দিয়াছেন,—

কিন্তু ; সে ত মরতে পারে ফ্রান্সে কিম্বা অন্য
কোনও দেশে
তোমার ছেলে, আমার ছেলে, দুঃখময়ের
দুলাল ছেলের বেশে।
কাঁদো নারী কাঁদো—
বিশ্বমায়ের সকল কণ্ঠ তোমার সুরে এক করে
আজ বাঁধো।
তুমি যে গো বিশ্বমাতার বিরাট ছায়া, কাঁদছ তুমি
নিখিল বিশ্ব তরে
তোমার সাথে ব্যথার ব্যথিত আমিও আজ
কাঁদব পরাণ ভরে।

নিখিল বিশ্বময়
মরণ বাঁচন দু'টি কথার ঢেউ উঠেছে পাহাড় প্রমাণ,
প্রলয় বুঝি হয় ;
দ্বন্দ্ব কলরোল ছাপিয়ে বিশ্বমানব বুক চিরে আজ ডাকে
গভীর ঘুমের অসাড় মায়া সেথায় চুপে বল্‌ছে
কি যে কাকে।

এই ব্যাপকত্বর অন্তর্দৃষ্টি ও humanism বাংলার গীতিকবিতায় এই নিরাশার অন্ধকার ও মেঘ গর্জ্জনের মধ্যে বিজলি খেলায় সমাজের চিত্ত দহন করিবে সন্দেহ নাই।

জীবনের উত্তাপ ও দুঃখের সহিত নিবিড় অনুভূতির পরিচয় পাইয়াছিলাম আমরা স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের লেখায়। কিন্তু এই ভাওয়াল কবির কবিতায় পল্লীর বনফুলের সৌন্দর্য্য ও মধু পাই নাই, পাইয়াছিলাম ফণীমনসার বিষ ও জ্বালা মড়ক আজিকে হানা দিয়েছে যে পল্লীর দুয়ারে, সেই সুর। ছন্দে ও কবিতায় একটা ঝাঁঝ ও বন্ধুরতা আছে। বাংলার কোন কবি এমন স্বভাবসিদ্ধ নহে, কাহারও কবিতা এমন প্রাণখোলা সোজাসুজি, স্পষ্ট নহে। ভাষাবরণে সুশোভনতা, রস-প্রচুরতা নাই, কিন্তু কবিতা জীবন্ত, জীবনে গভীর দুঃখের অনুভূতিতে জ্বালাময়। দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তিনি একদিন বাঙালীকে বলিয়াছিলেন—

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি ম'লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?
আজ যে আমি উপোষ করি না খেয়ে শুকিয়ে মরি
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছটফট্‌
ও ভাই বঙ্গবাসী আমি ম'লে তোমরা আমার দিবে মঠ ?

দুঃখের আগুণে জ্বলিয়া পুড়িয়া পীড়িত ও দুর্ব্বলের জন্য তাঁহার একটা জ্বালাময় বেদনা ও সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এমন তীব্র অনুভূতি আর কোনও কবির বস্তুগত জীবনের উত্তাপেও কবিতায় প্রকাশিত হয় নাই।

ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান
আহা তার নরনারী ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হয়ে ম্রিয়মাণ,
বারমাস তের কাতি দিনে রেতে সে ডাকাতি,
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান !
তাদের কলিজা ভাঙ্গা যাতনা আগুন রাঙ্গা,
শিরায় শিরায় জ্বলে শিখা লেলিহান !

* * * * *

বুকের শোনিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুখ-নিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি আকণ্ঠ হৃদয়ে পূরি,
কলিজা কাটিয়া দিই করি শতখান ?

জীবনের শত দুঃখ অভাব এমন কি ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া, দেশবাসীর সমবেদনার অভাবের বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতে করিতে এই কাঙাল কবি অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন—তবুও তাঁহার সহৃদয়তা তাঁহার ভাবুকতা যায় নাই।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সমন্ধে তাই গাহিয়াছেন,

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে
জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায়
কাঁটার মালা গলে,
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন পূবে হাওয়ায়
বেরল নীড় ত্যেজে
পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা করে
রইল চোখের জলে।

আর এক ধরণের স্বাধীনতা ও জীবনের উত্তাপ আমরা পাইয়াছি কুমুদনাথ লাহিড়ীর কবিতায়। গীতিকাব্যে তিনি সতীশচন্দ্র রায়ের সাধনার পথ ধরিয়াছেন, তাঁহার কবিতার রসপ্রাচুর্য্য আছে এবং তিনি মামুলী ছন্দে কবিতা অধিক লেখেন নাই, সতীশচন্দ্র রায়ের মতন তাঁহার কবিতার ও ছন্দের স্বাধীনতা, তাঁহারি মতন পাই আবার সেই জীবনের অতৃপ্ত ক্ষুধা। তাই এতটুকু মাটিকে তাঁহার পাগল প্রাণ বহুল আয়াসে বদ্ধ মুঠিতে ধরিয়া বলিতেছে

বেথে দিব বুকে
জড়ায়ে ধরিব তোরে দুই বাহু দিয়ে
হে আমার কল্পলতা, কনক কিরণ
ফাটিয়ে পড়িছে, দেখি, চারিধারে তোর,
বিশ্বের শ্যামল শোভা প্রসবিনী তুই
আয় আয় বুকে মোর!

তিনি সেই elan vitalএর নবীন সাধক, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সৃষ্টিকে ভোগ করিবার অনন্ত ক্ষুধায় তিনি ক্ষুধিত,

কত যুগ কত দিন
বিশ্বের আবর্ত্তে পড়ি তৃষ্ণার্ত্ত পথিক
কেটে গেছে কত কাল।
হৃদয়ে ধরেছি তীব্র অনল বাসনা
চাহিয়াছি প্রাণপণে
ভুঞ্জিবারে সর্ব্বরূপে সৃষ্টি-রস-ধারা
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।
ব্যর্থ কাম—ব্যর্থ কাম। ইন্দ্রিয় কোথায়?

* * * *

পড়েছিনু কত দিন। চারি পাশে মোর
চঞ্চলিয়া চলি যায়
জীবনের কত স্রোত। মাঝখানে আমি
তৃপ্তিহীন অবিচল
শুধু গুপ্ত হিয়া-কোণে, গভীর শ্বসন
আকাঙ্ক্ষার হাহাকার
হায় জড, রুদ্ধ দ্বার, এ তীব্র বাসনা
পাবে না খুলিতে তারে?

* * * *

তাহার পর,

চমকি দেখিনু, তরু হয়ে জন্মিয়াছি
সংসারের কিনারায়
সমস্ত শিকড় দিয়ে করিতেছি পান
ধরিত্রীর স্তন্য সুধা
দুলায়ে পল্লবদল, মেলি শাখাবাহু
আলোক বাতাস সাথে
করিতেছি খেলা,

কিন্তু তাহার
তৃপ্তি নাই! তৃপ্তি নাই! ভোগচক্রে ঘুরি
চঞ্চল এ চিত্ত-বাজী
হাঁপায়ে উঠিছে আজ। কই শান্তি কই!

তিনি সৃষ্টির আরম্ভের সেই অনাদি গূঢ় ক্রন্দন শুনিয়াছেন, ফল ফুলে ভরা এই বিপুল ধরণীর সুখ দুঃখ আন্দোলনে তাঁহার হিয়া গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে, এবং ঐ সৌন্দর্য্য ভরা পাত্র হইতে সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া তিনি অমৃতের পিপাসায় "নিবেদিয়া বিশ্বদেবতার, আপনার গূঢ় আপনার" অধ্যাত্ম সাধনার কবিতায় এখন আপনার অতৃপ্তি জানাইতেছেন।

তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একজন চমৎকার শিল্পি। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার আশ্চর্য্য অধিকার। তাঁহার চারু শিল্পকলা অনেক সময়ে তাঁহার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের শিল্পকেও অতিক্রম করিয়াছে। তিনি একজন নিপুণ চিত্রকর, দুই এক রেখার নিপুন টানে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে এক সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা কাব্যে তাঁহার আর সমকক্ষ নাই। ছন্দের নর্ত্তন প্রতিশব্দের চঞ্চল চরণভঙ্গ শব্দ ছবি অঙ্কনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা কবিতার খণ্ড সৌন্দর্য্য আমাদেরকে Tennysonএর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রকৃতির চিত্র ঠিক Tennyson এর তুলিকাস্পর্শে আঁকা।

স্বপন দেখিতে ভূর্জ্জ বনানী
সবুজ টোপর পরি
ঝর্ণাতলায় ররিছে কাহার
রতনের সাতনরী।

এই না জীবন মানব জীবন
ফুল ফোটা, ফুল ঝরা
সমুখে হাস্য পিছনে অশ্রু
শয্যাশায়িনী জরা

লেখার ভঙ্গী ঠিক Tennysonএর অনুরূপ। এবং মানবাত্মার গভীর রহস্য সন্ধান বিষয়ে, Tennysonএর দৌড় যতদূর তাহার অধিক তাঁহার দৌড়ও নহে,

'অমর ! অমর ? ভালবাসা'
নিশ্চল সমাধি শুনে নড়ে
কবরে কবরে সাড়া পড়ে
'মরি নাই মরি নাই, প্রিয়
প্রেম সে যে ধরায় অমিয়"
সাহারার হা হা সম তার সাথে উঠিছে উধাও
মেরি জান ! আও—আও—কলিজামে আও !
অথচ mysticism সম্পূর্ণ বিগুমান।
কোথা হ'তে এলে বঁধু ?—সুধাইলে মুখ পানে চাও
আশা দিয়ে ভাষাটি লুকাও
কোথা—কতদূর সে বিদেশ
কোথায় আরম্ভ, তার শেষ
বল সে কি আলো, না আঁধার
শ্মশান—না মৃত্তিকা-আগার ?
কেন যাওয়া-আসা ফিরে ফিরে
যে ঘোরায়, সেও ঘোরে কিরে ?
ও হাসিতে এযে তরঙ্গিত
জীবনের বিজয়-সঙ্গীত !
ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা
লুঠ্ লিয়া দিল মেরি দিলকে পিয়ারা।

বাংলার কবিগণের সে প্রাণ ও উন্মাদনা নাই যাহাতে মহাকাব্য রচিত হইতে পারে। অনেকে বলেন পূঃ যুগের সে বীরত্ব, শূরত্ব, সে আভিজাত্যের গৌরব এবং সে রাজসভা নাই বলিয়া মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু জনসমাজের গভীরতম অনুভূতি ও জনকোলাহলের জাগ্রত চৈতন্যের প্রতিধ্বনির মত এমন উপাদান বর্তমান যুগ অপেক্ষা কোন যুগ মহাকাব্যকে দিয়াছে ? জার্মান সীজার ও হার্ডার এবং রুশ করমাসনের পথে যাইয়া বাঙালী কবি লোকচৈতন্যের ও দারিদের মহাকাব্য ও মহানাট্য সৃষ্টি করুক। তাহা ছাড়া জীবনের সতেজ অনুভূতি এখন মানুষের সঙ্কীর্ণভাব ও আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া অনন্তের সুরে তার বাঁধিয়াছে। যদি কেহ আধুনিক Shakespeare হন তিনি মানবীয় বৃত্তি ও মানব মনের ঘাত প্রতিঘাতকে অতিক্রম করিয়া তুরীয় জগতের মহত্তর আবেগ, বেদনা ও সংঘর্ষকে এই দৈনন্দিন জীবনের ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ফুটাইবেন। বাংলার গীতিকবিতায় এই নবীন আভাষ দেখিয়াছিলাম আমরা বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' এবং 'আমি' কবিতায়। বাঙালী কবি অরবিন্দ ঘোষের Perseus and Andromeda নাটক এবং Ahana এবং আরও দুই একটি কবিতায় মহাকাব্যের সেই গাঢ় রস সেবন করিয়াছিলাম। উপাদানের অভাব নাই, অভাব সেই অনুভূতির, সেই মহাপ্রাণের।

পরিচিতা

(শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়)

তোমায় আমি চিনি ওগো
তোমায় আমি চিনি,
অজানা নয় তোমার পায়ের
নূপুর রিনিঝিনি।
সাঁ সাঁ করে ছুটছে ঘোড়া,
হাহা ক'রে বায়ু,
ঘোড়ার পিঠে রাজার কুমার
অবশ বুকে স্নায়ু।
বন বনিয়ে ঘুরছে মাথা
তেপান্তরের মাঠে
ঘনায় রাতি—একলা সোয়ার,
আর কেহ নাই বাটে।

পিয়াসে তার ফাট্‌ছে ছাতি,
কাঁপ্‌ছে শ্লথ পাণি,
থেকে থেকে পড়্‌ছে মনে
বাড়ীর স্নেহখানি।
হঠাৎ একি চোখের আগে
একার মায়া কাটি,
ফুটিয়ে দিল রাজ প্রাসাদের
সাত মহলাটি!
দ্বারে নাইকো দ্বারী কেহ,
নাইকো চলা ফেরা;
সব দেশটা কেমন একটা
যাদুর মাঝে ঘেরা।
সোণার খাটে সোণার ছবি
একটি শুধু নারী,
সোণার কাঠি রূপোর কাঠি
দুই পাশেতে তারি।
তোমায় আমি চিনি ওগো
তোমায় আমি জানি,
সেই একটি নারী তুমি
রাজ কুমারের রাণী।

তোমায় আমি চিনি ওগো—
তোমায় আমি চিনি,
অজানা নয় তোমার হাতের
চুরীর রিনিঝিনি।
অরাজকের রাজ্য হ'তে
ছুট্‌ছে ঝোড়ো বায়;
দণ্ডখানি ধুলোর পরে,
মুকুট লুটে পায়।
বিচার ঘরে নাইকো বিচার,
মুখে নাইকো হাসি,
কাজের পরে উঠ্‌ছে বেড়ে

নুয়েপড়া মন্ত্রীমশাই
পড়ছে আরো নুয়ে;
সেনাপতির তরবারি
লুটায় ভুঁয়ে ভুঁয়ে।
খালি পড়ে সিংহাসন
হাজার মণিজ্বালা,
লক্ষ আলোয় রাজার সভা
হয়নি আজি আলা।
রাজার হাতী পাগ্‌লা ক্ষ্যাপা
ছুট্‌ছে মাঠে পথে,
একটি রাজা—একটি রাণী
পায়না কোনো মতে।
রূপ সায়রে অঙ্গ মেজে
আস্‌লে তুমি নারী,
হাতী তোমায় তুলে নিল
হাওদা পরে তারি।
তোমায় আমি চিনি ওগো—
তোমায় আমি জানি,
হাতীর পিঠের নারী তুমি
অরাজ দেশের রাণী।

তোমায় আমি চিনি ওগো
তোমায় আমি চিনি,
অজানা নয় তোমার গোপন
ভূষণ শিঞ্জিনী।
আদিম কালের ভোর হ'তেযে
কতই খোঁজাখুঁজি,
ছোট বড় কতই রাজ্য,
কতই গলি ঘুঁজি।
সাত সমুদ্র, তের নদী,
ঝঞ্ঝা ধারা কত
মাথার পরে পেরিয়ে গেছে

মনের মাঝে নাই স্বোয়াস্তি
হাসি নাইকো মুখে,
একটি কে যে তারই লাগি
শোণিত নাচে বুকে।
মুক্তি সেতো চায়না হিয়া
বাঁধন সেযে চায়,
বাঁধাব মত একটি বাঁধন
কোথায় ভাবে পায়!
চোখেব আগে মনেব আগে
হঠাৎ এ কাব মায়া—
জন্ম যুগেব ধ্যানেব ধনেব
স্বপন ঘেবা কায়া!
সকল থেকে তফাৎ করা
একটি সে যে নারী;
জীয়ন কাঠি মবণ কাঠি
দুই পাশেতে তারি।
তোমায় আমি চিনি ওগো—
তোমায় আমি জানি,
ধ্যানেব ধনের ছায়া তুমি
চিত্ত মাঝের রাণী।

"কান্তকবি ও তাঁহার কাব্যরস"

[শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সান্যাল]

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের এক ঘোবতব অভাব অভি যোগের দিনে কবি ও তাঁহাব লিখিত কাব্যেব সমালোচনা করিতে গেলেই কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হইবাব বিশেষ আশঙ্কা। কিন্তু সমালোচনা যে সাম্প্রদায়িকতাব ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না ইহা সাহিত্যসেবীগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকাব করিবেন। নিবর্থব দোষা-রোপ করিয়া বা অন্যায়রূপ অন্ত্রে প্রশংসাব দ্বারা সাম্প্রদায়িকভাব অক্ষুণ্ণ থাকে বটে কিন্তু উহা যথার্থ সমালোচনা (criticism in the true sense) বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে না—উহা দুষ্ট বুদ্ধির নিষ্ফল প্রেবণা বা বিকৃত বুদ্ধিব নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র! 'The business of criticism is to know the best that is known and thought in the world, and by its turn making this known to create a current of true and fresh ideas." কান্তকবিব নূতন কিছু শুনাইব, তল্লিখিত কাব্যেব নূতন তথ্য কিছু আবিষ্কাব কবিব—ইহা মনে কবিয়া হস্তক্ষেপ কবি নাই। তাঁহাব কাব্য, তাঁহাব গীতি, তাঁহাব সাধনা, তাঁহাব আত্মানুভূতি পাঠ করিতে করিতে যুগপৎ বিস্মিত, বিহ্বল ও মুগ্ধ হইয়াছি—তাই সেই অমব কবি সকাশে আমাব এই নিষ্ফল বন্দনা কৃতজ্ঞতাব অভিব্যক্তি।

পাবনা জেলা অন্তঃপাতী ভাঙ্গাবাড়ী ৺বজনীকান্ত সেনের জন্মপল্লী। খৃষ্টীয় ১৮৬৬ অব্দে বজনীকান্ত বঙ্গজ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺গুরুপ্রসাদ সেন সবজজ ও জমিদাব ছিলেন। সুতরাং শৈশবে বিদ্যার্জ্জনে তাঁহাকে অর্থাভাবেব অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। 'সাহিত্যিকেরা চিরকাল অর্থের কাঙ্গাল"—এ কথাব যথার্থ্য তাঁহাব শেষ জীবনে সবিশেষ সপ্রমাণ হইয়াছিল। বজনীকান্তেব পিতা ৺গুরুপ্রসাদও সুকবি ছিলেন। 'পদচিন্তামণিমালা' নামে তাঁহাব একখানি কাব্য ছিল।

সেখানি চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের অনু-করণে লিখিত। তৎকালে ঐ পুস্তকের বিশেষ সমাদর ছিল। সে পুস্তকখানি—কবির অদ্ভুত কাব্যনিদর্শন এক্ষণে বৃদ্ধ পিতামহ প্রপিতামহের কীটদষ্ট পুঁথির অন্তর্গত হইয়াছে। রজনীকান্তের মায়ের নাম শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী দেবী। ইনিও অতি উচ্চবংশের কন্যা। আজও ইহার রচনা বিষয়ে কোন কথা শোনা যায় নাই। মাসিক পত্রিকার পাঠকবর্গ বোধহয় অবগত আছেন যে কবির ভগিনী অনুজা সুন্দরী সুলেখিকা। অতএব কবি যে কবির বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বেশ স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। "কিন্তু বংশানুক্রমিক প্রতিভা সকলকেই কাব্য জগতের আধিপত্য প্রদান করে না। একজন গণিত ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া নিউটন বা ফ্যারাডের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন কিন্তু এক ব্যক্তি আজন্ম কাব্যোদ্যানের ভাব কুসুমরাশির চয়নে ব্যাপৃত থাকিলেও শেক্সপীয়র হইতে পারেন না। কবি মানুষের মনোগত ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন—একটী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কবির ন্যায় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। কালিদাস ইচ্ছা করিলে সাংখ্যকারের ন্যায় দার্শনিক বিচারে পটুতা দেখাইতে পারিতেন, কপিল ইচ্ছা করিলে বোধ হয় একটা কুমারসম্ভব বা শকুন্তলা সৃষ্টি করিতে পারিতেন না।" সুতরাং ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় কবিত্বের বিকাশ। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালাতেই হাতেখড়ি হয়েন—তারপর রাজসাহীর স্কুল কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। যে লোক কিছুদিন পূর্ব্বেও অসাধারণ অদ্ভুত রচনাচাতুর্য্যে বঙ্গকে মাতাইয়া গিয়াছিলেন—যে লোকের অলৌকিকী প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে সে লোকের পাঠ্যজীবন যে একেবারে নীরবনিঝুম ছিল তাহা নহে। তাঁহার বাল্যজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস কিছুই প্রকাশিত হয় নাই এবং সে সমুদয় হস্তগত করাও কঠিন। তাঁহার জনৈক সহপাঠী উকীল বন্ধুর নিকট হইতে আমি কবির নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। কলেজে পড়া সময়ে বাঙ্গলা কবিতা লিখিতে তিনি আদৌ আরম্ভ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সুতরাং এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদিন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের সমালোচনা করিলেন। সেগুলি অতি সুন্দর সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই সময়ে তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। প্রথমেই বাগ্দেবীকে স্মরণ করিয়া লিখিতেছেন—

'এতেষাং শিক্ষকানাস্তু বর্ণ্যতে প্রকৃতির্ময়া।
বাগ্দেবী দেহি মে বিদ্যামস্মিন্ দুঃসাধ্য কর্ম্মনি ॥'

তখন কালীকুমার দাস মহাশয় রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ব্যাকরণে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন তবে তাহার মধ্যে ছিল যে সভা সমিতিতে ভালরূপ বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটি রচনা করেন।

"[illegible]ক দেহ মহাবিজ্ঞো বা ব্যাকরণ তৎপরঃ
কাস্মিংশ্চিদ্যদিবা কালে ক্রিয়তেহসৌ সভাপতিঃ
সমারোহং সমালোক্য চরকীমাতং প্রজায়তে ॥"

এইখানে একটী কথা লক্ষ্য করিবার আছে। চরকী-মাতং কথাটী অসাধু প্রয়োগ। বাঙ্গলা কবিতা লিখিতে লিখিতে এইরূপ অসাধু প্রয়োগ ইংরাজী সংস্কৃতের খিচুড়ী রজনীকান্তের ব্যঙ্গ ও কৌতুক সঙ্গীতের একাধিক স্থানে দৃষ্ট হয়।

এডোয়ার্ড সাহেব তখন রাজসাহী কলেজের খ্যাতনামা বিদ্বান, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক—শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। আর শ্রীবিনোদবিহারী সেন মহাশয় সেই সময়ে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। বিনোদ বাবু এডোয়ার্ড সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র। পুনঃ-পুনঃ ভুল বলা সত্ত্বেও ইংরাজী বলার অভ্যাস বিনোদ বাবু ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এক দিন কলেজের খিলা-নের উপর একটী পাখী বসিয়াছিল। এডওয়ার্ড সাহেব সমুদয় ছাত্র সমভিব্যাহারে বন্দুক হস্তে পাখী শিকার করিতে গেলেন। রজনীকান্তও তথায় উপস্থিত ছিলেন। সাহেব বন্দুক ছুঁড়িতে উদ্যত হইলে বিনোদ শশব্যস্তে সাহেবের হাত ধরিয়া চীৎকার করিল "Sir, Sir, it will won't

die." সেই বিনোদ রজনীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি এই ভাবে আখ্যাত হইলেন—

এডওয়ার্ডো কপেরস্তা বিনোদ ইতি নামতঃ
বিস্তারস্তা বুদ্ধিবস্তা ইংলিশো সর্ব্বদা মুখে।

রাজসাহীতে বাস করিয়া ৺হরগোবিন্দ সেন মহাশয়ের নাম অবগত নহেন—এরূপ লোক অতি অল্প ছিল। এই মহাত্মারই উদ্যোগে ও আগ্রহাতিশয্যে তথায় বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার শিক্ষা অতুলনীয় এবং শিক্ষকতা কার্য্যেও ইনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার উদরের কিছু বিশেষত্ব ছিল। বয়সে প্রাচীন—কিন্তু প্রাচীন হইলেও যুবার তেজ ও বল তখনও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। কিন্তু রজনীকান্তের তাহা দেখিয়া হিংসা হইল—তিনি জ্বর জ্বর হইয়া লিখিলেন—

অজরোমরো প্রাজ্ঞঃ হরগোবিন্দ শিক্ষকঃ
বেতনে নোদরস্ফীতঃ বাগ্দেবী উদরস্থিতা।

এই সমুদয় সংস্কৃত কবিতা লিখিতে তাঁহার কাল বিলম্ব হইত না—ক্লাসে বসিয়া বসিয়া রচনা শেষ হইয়া যাইত।

একদিন ক্লাসে বসিয়া বোর্ডে লিখিলেন "রমতে রমতে রমতে রমতে"—। ক্লাসের অনেক ছাত্রকেই ইহার পাদ পূরণ করিতে বলা হইল। কিন্তু কেহই পারিলেন না। শেষে তিনি নিজেই পূরণ করিয়া শ্লোকটীকে এই ভাবে দাঁড় করাইলেন।

গহনে গহনে বনিতা বদনে
জনচেতসি চম্পক চ্যুত বনে।
দ্বিরদো দ্বিপদো মদনো মধুপো
রমতে রমতে রমতে রমতে॥

দ্বিরদঃ (হস্তী) গহনে (বিজনে) গহনে (বিপিনে) রমতে—দ্বিপদঃ (মানবঃ) বনিতা বদনে
রমতে—মদনঃ (মনোভবঃ) জনচেতসি
রমতে—মধুপঃ (ভ্রমরঃ) চম্পক চ্যুত বনেচ

রমতে অর্থাৎ হস্তী বিজন বিপিনে ভ্রমণ করে, মানব রমণীর বদনে রমণ করে, মদন মনুষ্য জন চিত্তে রমণ করে আর ভ্রমর চম্পক পুষ্পে ও আম্রকাননে রমণ করিয়া থাকে।

শ্লোকটীর রচনাচাতুর্য্য দেখিলে কে না মুগ্ধ হইবেন? ভাব ও ভাষার এমন সমান অধিকার বিশেষ প্রশংসার্হ। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে অতি অল্প সময়ে এইরূপ সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় শ্লোক রচনার ক্ষমতা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?

তারপর রাজসাহী হইতেই বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শেষে ১৮৮৯ সালে বি, এল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজসাহীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। উকীল হইবার ২।৩ বৎসর পর হইতে তিনি বাঙ্গলা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।

এক্ষনে কবিতা যা হোক কিছু লিখিলেই কবি—তাই বঙ্গভাষায় এরূপ কবিতার উদাহরণও কম নহে।—

"সখি, ধর ধর
আঁধার রেতে মোমের বাতি
না জ্বালিলে কি হবে গতি
পড়িয়া রয় বাইরে॥"

উপরিউক্ত কবি 'সখি' লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না কেননা বৈষ্ণব কবিরা কবিতা লিখিতে গিয়া 'সখি'র স্থান সর্ব্বপ্রথমে দিতেন। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান কবি বুঝিলেন না যে সখি শব্দটীর অর্থ কি?—আর তাহার মাধুর্য্য, লালিত্য এবং বিশেষত্বই বা কোথায়? আবার আঁধার রাত্রিতে অন্য কোনরূপ আলোর ব্যবস্থা না করিয়া 'মোমের বাতি' ধরিতে বলিলেন কেননা জাতীয়তাটুকু অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য হারিকেন বা দেওয়াল গিরির আলোর যে জাতীয়ত্ব নষ্ট হয় তাহা কবি সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন। দেশে এইরূপ ভাব ভাষার প্রচার যে দিনই বঙ্গভাষাকে দীনা ও ক্ষীণা করিতেছে তাহাতে কি আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে?

কিন্তু রজনীকান্তের কবিতা এ শ্রেণীর নহে। তিনি গীতি কাব্যের কবি—যাহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে গেলে Lyrical ব্যতীত আর কোন কথা পাওয়া যায় না। তাঁহার কবিতাগুলিকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম—সাধন সঙ্গীত
দ্বিতীয়—ব্যঙ্গ ও কৌতুক সঙ্গীত

তৃতীয়- স্বদেশ সঙ্গীত
চতুর্থ—প্রেম বিরহ বা বিচ্ছেদ গাথা
তৎপরে রজনী কান্তের চরিত্র।

রজনীকান্তের চরিত্র বঙ্গীয় কবিকুলের আদর্শ স্থানীয়। তিনি একাধারে মিষ্টভাষী, বিনয়ী, জনপ্রিয়, সুরসিক এবং আত্মত্যাগী। তাঁহার ভাষা তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রেরই অনুরূপ। যিনি দীন নয়নে আজীবন করুণার ভিখারী ছিলেন—যাঁহার করযুগ সেই বিশ্বপাতার অনন্ত অসীম দয়া স্মরণে চির অঞ্জলীবদ্ধ—যিনি অন্তর্চক্ষে মায়ের মাতৃমূর্ত্তি অনুভব করিয়া 'আর কতদিন ভবে থাকিব মা' বলিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইয়াছেন, যিনি উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম প্রবৃত্তি দর্শনে ব্যথিত হইয়া 'মৃতপ্রতিকারে' কোন সুফল প্রসব করিবে না ভাবিয়া 'তীব্র ভেষজের ব্যবস্থা করিয়াছেন—তিনি যে বিনয়ী হইবেন, সে আর বেশী কি? কান্ত ধর্ম্মভীরু ও ভক্ত তাই ভক্তির উচ্ছ্বাসে 'নবজীবন' লাভ করিয়া গাহিলেন—

'ঐ অভয়পদ হৃদয়ে ধ'রে' ভুলিব দুখ' সব হে,
হেসে তোমারই দেওয়া বেদনাভার হৃদয়ে তুলি', লব হে।

'পিতার পত্র' 'উকীল' 'দেওয়ানী হাকিম' ও "তারানাম করতে করতে জিহ্বাডা আমার" গান শুনিতে শুনিতে তাঁহার রসিকতা ও ব্যঙ্গের পূর্ণ প্রতিভা বুঝিতে পারি।

কান্ত সরল কবি। বর্ণ পারিপাট্যে, রচনাচাতুর্য্যে ও ভাব প্রকাশে কান্তের কোথায়ও কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছে বা সরলতার অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান কবিকুলের অনেকে কবিতা লেখেন—সে কবিতার ভাব গ্রহণ করিতে গেলে 'ধরি ধরি ধরা যায় না',—'বুঝি বুঝি বুঝা যায় না'—কখন বা পাঠক অস্বাভাবিক কল্পনা ও আবেগময় উচ্ছ্বাসের প্রবল অনুকুল স্রোতে ভাসমান হইতে হইতে আত্ম-বিস্মৃত হয় এবং প্রতিকূল স্রোতের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া কূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথ পায় না। আবার কখনও বা অলঙ্কাররূপক ও ছন্দবন্ধের ভয়াবহ আয়োজনে সাধারণ পাঠকেরা মর্ম্মগ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া সারাংশ বা কাব্যের রসাস্বাদে চির অনভিজ্ঞই রহিয়া যায়—সমাস ও ব্যাকরণের কঠিন দুর্গ ভেদ করা প্রথম প্রয়াসেই পর্য্যবসিত হয়। যদিও এ শ্রেণীর কবিতা কান্তের দুই চারিটী আছে তথাপি তাহা প্রথম স্তরের কবিতা নহে—তাহা কান্ত কবির গীতি কাব্যের কিশোর অবস্থা। তাহাই "ক্ষুদ্র হৃদয় পঙ্কল জল, আবিল পাপপঙ্কে, অদেয় অপেয় তৃষায় স্পর্শ করেনা কেহ আতঙ্কে" (কল্যাণী)।

দুইটি সমান্তরাল রেখা যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিলেও তাহার দূরত্ব সমানই রহিয়া যায় কান্তের কাব্য, ভাষা ও ভাব সেইরূপ পাঠকের হাতে হাত ধরিয়া সমান ভাবেই চলিয়াছে—কোথায়ও দূরত্বের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হ্রাস বৃদ্ধি বা তারতম্য ঘটে নাই। তাই বোধ হয় পণ্ডিত, মূর্খ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সমভাবে তাঁহার প্রতিভার পূজা করিতেছে।

কান্তের কবিতায় আবেগ আছে, উদ্বেগ নাই—; আশা আছে, হতাশের জ্বালা নাই—; আলোক আছে, তীব্রতা নাই—কল্পনার উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু সংযমের অভাব নাই। যখন বিশ্ব সংসারের তীব্র কষাঘাতে আত্মহারা হইয়া—দারাপুত্র স্বজনের বিয়োগ ব্যথাজনিত প্রাণ লইয়া সংসারী ভগবানে আত্ম সমর্পণ ও বিশ্বাস আনিতে সচেষ্ট—যখন প্রাণের সমুদয় কোমল প্রবৃত্তির করুণ উদয়—নিরাশার ম্লান মধুর ছায়া বাণিতকে ক্লিষ্ট করিতেছে—আবেগে প্রাণ প্রতিগ্রা করিয়া লোভে উদ্বেগে বিসর্জ্জন দিতেছে তখন কবি সংসারার মুখে গীত হইল—

"তুমি আপনা হইতে হও আপনার
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার;
একি, সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে!

(কল্যাণী)

মানব যখন দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের কঠোর নিষ্পেষণে দুর্গম-পথে সঙ্গীহারা হয় এবং পরিশেষে অবসন্নচিত্ত হইয়া 'ভ্রান্ত' ও 'মোহ বিকার'-গ্রস্ত হয়, "নীরস নিঠুর ধরা, তবে লয় বারিধারা, কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাব পার!"—বলিয়া শত সহস্রবার এ পৃথিবীকে অভিশাপ গ্রস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না তখন কবি ভক্তি ধারা'য় গাহিলেন।

বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে

একবিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা
করুণা কল্লোলে, প্রাণে ডাক একবার।

(কল্যাণী)

তখন বুঝিলাম কবি, হতাশের শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করেন নাই—আর সে জ্বালা অনুভব করিতে হয় নাই বলিয়াই পরমুহূর্ত্তে গাহিলেন—

'জীবনে কখন আমি ডাকিনি হৃদয় স্বামী।
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ডাকিতে বিদয় ময়।'

(কল্যাণী)

ইহা তাঁহার প্রাণের বাণী, তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় অনুভূতি যে দয়াময় তাঁহাকে এ অদিনে ত্যাগ করিবেন না বলিয়াই অধীনকে স্বহস্তে আনিয়াছেন—তাঁহার সুকোমল অঙ্কে কান্তকে ধারণ করিবেন বলিয়াই তাঁহাকে দূরে প্রেরণ করিতেছেন। সংসারে যেখানে প্রেম, যেখানে ভক্তি ও যেখানে পবিত্রতার অধিকার যত বেশী সেইখানেই পরীক্ষার নিগড় তত কঠিন—তত কঠোর॥

কান্তের সঙ্গীত সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বস্থানে সমভাবে সমাদৃত। তাহার প্রথম কারণ অপূর্ব্ব আন্তরিকতা যাহা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না—আর দ্বিতীয় কারণ ইহার সরলতা—যাহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। কান্তের সঙ্গীতগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভাবগুলি যেন অন্তরের অন্তস্থলে স্তরে স্তরে নিহিত ছিল—লেখক সেগুলিকে সংযত করিতে না পারিয়া ঠিক তেমনই ভাবে বাহির করিয়া দিয়েছেন। সেই ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া কোথায়ও জটিলতার বা প্রচ্ছন্নতার ভাব লক্ষিত হইল না। তাই পথে ঘাটে কান্তের সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল। আবার আজ ও আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকে কান্তের গাথা গাহিলেন বটে কিন্তু ঐ গানের রচয়িতা যে কান্ত তাহা জানিলেন না। কোমল ভাব যাঁহার রচনার প্রধান উপকরণ, দয়া ধর্ম্ম যাঁহার কল্পনার প্রধান সহায়, পাপীর দুর্ভাগ্য—ধার্ম্মিকের সৌভাগ্য যাঁহার একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় তাঁহার কবিতা, তাঁহার সঙ্গীত সর্ব্বস্থানে সমভাবে সমাদৃত হইবে না কেন? যে সঙ্গীতের প্রতি ঝঙ্কার যে পদের প্রতি শব্দ, যে শব্দের প্রতি অক্ষর অপূর্ব্ব ভক্তিরসে প্রতিনিয়ত সিঞ্চিত তাহা বালবৃদ্ধ যুবা যুবতী সকলের কর্ণে মধুক্ষরণ করিবে সে আর অধিক কি? যে এ সংসারে পতিত, লাঞ্ছিত অবমানিত, ঘৃণিত—যাহাকে সুপ্রিয়ভাবে একটী সম্ভাষণ করিবার কেহ নাই যে সমাজে মৃত কিম্বা জীবিত তাহা বুঝিতে পারে না, সংসারে যাহার অস্থিতি অথবা স্থিতিতে কেহ কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাণ লক্ষ্য করে না—তাহাকে যখন কবি সরল প্রাণে সরল ভাষায় ডাকিলেন সহ পতিতের প্রাণের কথা দিয়া তাহার সব মনোকষ্টটুকু আপনার বুকে টানিয়া লইয়া তাহার সুরে সুর মিশাইয়া যখন গাহিলেন—

"যদি পাতকী না হয় গত কি ছিল ত্রিভুবন পতি
পাতকী-তারণ নাম কিসে হত"—

তখন এমন কে আছে এ সংসারে যে তাহার দুঃখ বুঝিল না—যে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিল না। হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত আদান প্রদান জন্যই মনুষ্য হৃদয়ের সৃষ্টি। ইহা যে বুঝিল না সে কান্তকবির দেশে জন্মগ্রহণ করিল কেন?

(ক্রমশঃ)

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল্]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিপ্রলব্ধার কথা

(১)

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন জানকী। কিন্তু মা আমার সে নাম উল্টে দিয়ে রাখলেন উর্ম্মিলা, তবু ভাগ্য কি তাতে উলটিয়েছে? জানকী নাম, বলে, রাখতে নেই, জন্ম দুঃখী হয়; কিন্তু উর্ম্মিলাই বা কি এত ভাল। মা জানকী ত' তবু তাঁর স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনে বনে কাটাতে পেরেছিলেন, আমার যে উর্ম্মিলার মত স্বামীকে পেয়েই হারাতে হয়েছে! মা আমার ভাগ্যটাকে যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন তাই আগে থাকতেই নাম বদলে দিয়েছিলেন। তবু বাবা ডাকতেন, "মা জানকী," এবং আমিও উত্তর দিতাম। কারণ আর যে যাই মনে করুক, আমি আমার বাবাকে জনক ঋষির চেয়ে কম ভক্তি করতাম না, করতে শিখিও নি, এবং সেই জন্য নিজেরও জানকী হবার পক্ষে আপত্তিও তেমন ছিল না।

মাও যে বাবাকে কম ভক্তি করতেন তা নয়, তবু কেমন যেন তাঁর ভয় করত। আমায় সীতাদেবীর মত যে বাল্যকাল হতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্যই উৎসর্গ করে রাখা হয়েছিল, এটা মা যেন সইতে পারতেন না। কেবলি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কাজে কর্ম্মে সব সময়ই আমাদের গৃহ-দেবতা রামসীতার চরণে তুলসী দিয়ে আমার বাবার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতেন।

কিন্তু বাবার শরীরে মনে কাজে কর্ম্মে কোথাও ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না। উনি মাকে যখন তখন বুঝিয়ে দিতেন যে, "আমার জানকীর জন্য শ্রীরঘুনাথজী নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করেছেন; তিনিই আমার মা জানকীকে পায়ে টেনে নেবেন।" মা শিউরে উঠতেন, কিন্তু আমার জ্ঞান হওয়ার পর হতে মনে পড়ে আমি কখনো ভয় পাই নি। আমি কত সময় দোতালার ছাতে উঠে আমাদের গ্রামের "সরান" পথটা যেখানে মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে, সেই দিকে চেয়ে আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভাবতাম আমার সেই রামচন্দ্র ধূলো উড়িয়ে পতাকা উড়িয়ে তাড়কা বধ করে কোন দিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন।

বাবার এই ভাবটায় আমাদের যে কি রকম পেয়ে বসেছিল তা যে শুনবে সেই অবাক হয়ে যাবে। এমন কি বাড়ীর দারোয়ান ঘনবরণ সিং উৎসাহের চোটে একদিন নিজের নামটাই বদলে ফেলেছিল। ছিল ঘনবরণ হয়ে গেল রামচরণ। আর এমনি তার হাড়ে হাড়ে রামভক্তি বিঁধে গিয়েছিল যে, সে যা কিছু ছাপার অক্ষর সম্মুখে পেতো সবই রামপক্ষে ব্যাখ্যা না করে ছাড়ত না—এমন কি হনুমানজীর লেজটুকু পর্য্যন্ত বাদ যেত না। তার একদিনকার একটা ব্যাখ্যা আমার এখনো বেশ মনে পড়ে। কোথা হতে আমাদের গাড়োয়ান ছেদীলাল এক টুকরো কাগজ নিয়ে এসে দারোয়ানজীকে ধরে বসলে, "দারোয়ানজী, ইঠোতো দেখিয়ে, ইসকো মতলব তো বাৎলাইয়ে।"

দারোয়ানজী তাঁর তুলসী দাস হতে চোখ তুলে, কাগজ খানা হাতে নিলেন। তারপর প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লেন, "আরে ইয়ে তো বাংলে হরফমে সংস্কৃৎ হায়—রামো লক্ষ্মণম ব্রবীৎ।"

"মতলব কেয়া?"

"রামো রামচন্দ্র রঘুনাথজী; লক্ষ্মণ, লছমনজী সামঝা?"

"হাঁ মহারাজ, উ তো সমঝা, উসকে বাদ ?"

"অব্রবী ইসকো মৎলব অলবৎ মা জানকী হোগা আউর ওহি যো হলন্ত ত হায়হু, ওহি হায় মহাবীর জীকো দুম্ (লেজ)।"

আমাদের দারোয়ানজীর ব্যাখার অসাধারণ ক্ষমতা আগে হতেই সবাই জানতো, তাই আমাদের কোন আত্মীয়ের মুখ হতে ক্রমশ: পাঁচ হতে হতে শেষে বাবার কাণেও পৌঁছেছিল। আমরা চেপে চেপে হাসাহাসি করছিলাম বটে, কিন্তু বাবা দারোয়ানজীরই দিক নিয়ে বলেছিলেন, "ভক্তি করে যা মানে করবে তাই ঠিক হবে, তোমরা কেউ হেসো না।"

জোরে হাসবার কারো তেমন জো ছিল না, কারণ একে আমাদের বাড়ী হল গ্রামের জমিদার বাড়ী। তার ওপর এমনি একটা আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্ব্বন, শাস্ত্র পাঠ, অতিথি সেবার হাওয়া সারা বৎসর ধরে বাড়িতে বইত যে হাসি ঠাট্টা বাড়ী হতে প্রায় বিদায় নিয়েছিল। এমন কি যাত্রা গান কথকতা বা কীর্ত্তন যাই কিছু হোক না কেন সমস্ত আনন্দের জিনিষের মধ্য হতে হাসির অংশটুকু বাদ না দিলে যেন আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সে সবের স্থান হত না।

আমি জমিদারের মেয়ে, তাই চাকর দাসীরও অভাব ছিল না, খেলার সাথীরও অভাব ছিল না। কিন্তু বন্ধু বলতে যা বোঝায় সখী বলতে যা বোঝায় তাত ছোট বেলা হৈ কখনো পাইনি। যাকেই অন্তরঙ্গ করতে গিয়েছি সেই যেন কেমন একটুখানি দূরত্ব রেখে তবে কাছে এসেছে। আমি যেন কোন একটা অচেনা জগতের জীব, কি এক অজানা কারণে, বোধ হয় শাপ ভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসেছি। আমার সঙ্গে ভাল করে, প্রাণ খুলে যেন মিশতে নেই। সবারই পক্ষে আমার কথা শুনতে আছে, কাজ বললে তৎক্ষণাৎ করে দিতে আছে, আমার ঘরে ধূপ ধুনো ফুল চন্দন সবই দিতে আছে, কেবল আমার গলা জড়িয়ে ধরে দুটো মানে-মৎলবহীন মিষ্টি কথা বলতে নেই।

এই জন্ত আমার মধ্যে ছোটবেলা হতেই এমন একটা জীব জেগে উঠেছিল যা একেবারেই এ দেশের নয়, সে জন্তু কি দেবতা তা এখনো ঠিক করতে পারিনি। সে কখনো চাইত ছুটে বেরিয়ে নেচে কুঁদে অস্থির হয়ে সব শুচিত্ব সব দূরত্ব দূর করে ফেলে দিতে, আবার কখনো চাইত একদম একলা চুপ চাপ অশোক বনের সীতার মত বসে থাকতে। আর এই দোটানার মাঝখানে যে মানুষটা সমস্ত দিনের কাজকর্ম্মের মধ্যে ঘুরে বেড়াত সে যে কি ছিল, তা আমি বলতে পারব না, তার না ছিল হাসি না ছিল কান্না, না ছিল মান না ছিল অপমান, না ছিল রাগ না ছিল অনুরাগ।

(২)

যাক, এমনি করে কতদিন কেটে গেল। তারপর হঠাৎ এমন দুটী লোক আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল, তারা যেন একেবারে আলো আর অন্ধকারের মত আলাদা। একজনের নাম, হাসি, আর একজনের ঠিক নাম কি জানিনে কিন্তু বাবা বল্লেন তিনি একজন স্থাসী। আমরাও তাঁকে স্থাসী মহারাজ বলেই ডাকতাম। একজন এল ফাগুনের দিনের মত একরাশ আলো আর হাসি আর রূপ, আর সাজসজ্জার অতিশয্যত্ব নিয়ে, অন্যজন এলেন শ্রাবণ অন্ধকার রাত্রের মত গাম্ভীর্য্য নিয়ে জটাজূট সমাযুক্ত হয়ে কৌপীনবন্ত: খলু ভাগ্যবন্তের সর্ব্ব-রিক্ত মহাশয়ত্ব নিয়ে। আর আমি পড়ে গেলাম মহামুস্কিলে, কারণ এ দুজনার একজনকেও ঠেকিয়ে রাখবার জো ছিল না।

হাসি এসে আমার চাল চলন অসন বসন দেখেই হেসেই অস্থির। আর স্থাসী মহারাজ আমার ঐ সমস্তই লক্ষ্য করে বল্লেন, যে আমা হতে কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা হবেন। হাসি আমার পূজা অর্চ্চনা পড়া শুনার ধুম দেখে রেগে সমস্ত বৈ কাগজ পত্র পুড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা দিলে। আর স্থাসী মহারাজ তাঁর ঝুলি হতে একখানা পরমহংস সংহিতা বার করে আমায় উপহার দিলেন। একই বস্তু দুজনে দু রকম চোখে দেখছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সেই আঠার বছরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিচার শক্তি সমস্তই হঠাৎ কেমন। থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

অথচ দুজনের একজনকেও দূরে রাখতে পারলাম না। আমার চিরদিনকার শিক্ষা দীক্ষা যে সময় আমার ঐ স্বামী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসিয়ে দিলে, ঠিক সেই সময়ই আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে মানুষটা ছিল সে যেন হাসির হাসির হাওয়ার মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমার কাণ দুটো, শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনত, মনও তাতে যে যোগ দেয় নি তা নয়, কিন্তু মনের যা মন তা যে হাসির দূর হতে টানাটানি অনুভব করছিল সেটা ত' মিথ্যে নয়।

এই হাসিটী ছিল আমার মামাত বোন। আমার মামা ক্রিশ্চান হয়ে গিয়েছেন বলে আমার দিদিমা তাঁর মাতৃহীনা নাতনীটীকে নিয়ে মামার কাছ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছেন। তাঁর আশা বোধ হয় এই ছিল, যে আমাদের সংস্রবে এসে হাসি তার সমস্ত ক্রিশ্চানী শিক্ষা দীক্ষা হাব ভাব, বিশেষতঃ তার অকারণ হাসির উচ্ছ্বাস টুকু ভুলে প্যাঁচা হয়ে বসবে। কিন্তু ফলে হল, 'উল্টা বুঝলি রাম'। সে এসেই বাড়ি শুদ্ধ মাতিয়ে তুলল। মা তার সংস্রবে পড়ে পূজা পাঠের অবসরে ঘর দুয়ার সাজান ধোয়া মোছায় একটু বেশী মন দিলেন; ঝিয়েদের কাজ কর্ম্ম বাড়া সত্ত্বেও তারা মন খুলে গল্প গুজব লাগালে, আশ্রিত আশ্রিতারা একটু ভাল খাবার দাবার পেতে লাগল এবং তাদের ছোট ছোটো ছেলে মেয়েরা পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। অতিথিশালায়ও শুনলাম নাকি খরচ আর কাজ বেড়ে গেছে। ঝাড়ুদার বেহারা হতে আরম্ভ করে বাগানের মালী পর্য্যন্ত একটা শোভনতা রক্ষার মধুর অত্যাচারে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হয়ে ফিরতে আরম্ভ করলে। এমন কি বাবাও যেন ক্রমশঃ তাঁর কঠোর শুচিত্বের আবেষ্টনী হতে শোভন নির্ম্মলত্বের আবহাওয়ায় পড়ে স্বস্তি অনুভব করলেন, অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হল।

স্বামী মহারাজ কিন্তু নিজের অগাধ গাম্ভির্য্যের শিখরে অচল হয়ে বসে রইলেন। হাসি মাঝে মাঝে তাঁকেও নানা-প্রকারে আক্রমণ করতে লাগল কিন্তু তিনি এমনি একটা প্রশান্ত হাস্তে তার সকল রকম প্রশ্ন তর্ক যুক্তিকে ঠেলে দিতে লাগলেন, যে, শেষে হাসি আর পারতপক্ষে তাঁর ত্রিসীমা মাড়াত না। ডাকলে বলত, "ওরকম হাজার বছরের আগেকার মানুষের কাছে গেলে অকারণে বুড়িয়ে যেতে হবে।"

আমি কিন্তু এই শান্ত গম্ভীর মানুষটাকে কিছুতেই বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকতে পারতাম না, যখন তখন গিয়ে কাছে বসতাম, এটা ওটা এগিয়ে দিতাম, যখন তখন যা তা প্রশ্ন করে তাঁকে ভাবিয়ে তুলতাম, না হয় এমন একটা উত্তর নিয়ে আসতাম যা সমস্ত দিন ধরে আমায় পেয়ে বসে থাকত। বাবা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতেন সেই সময়টা ছিল আমার সব চাইতে ভয়ঙ্কর সময়, কারণ সেই সময়টা আমায় উপস্থিত থাকতেই হ'ত— বাবার সেই রকম আদেশ ছিল। কিন্তু এই রকম বাধ্য হয়ে বসে থাকা বাধ্য হয়ে ধর্ম্ম কথা শোনা আমায় যেন তেমন সইত না;—তাই বাবা যখন থাকতেন না তখন যত ইচ্ছা এবং যেমন করে ইচ্ছা হত তেমনি করে স্বামী মহারাজের ঝুলিটা নেড়ে চেড়ে দেখতাম। এবং তাঁর সেই সময়ের অবাধ সঙ্গোপনভোগ হতে যা পেতাম তাই যেন প্রকৃত লাভ বলে মনে হত। মা দিদিমা বা অন্যান্য কোন সাধুসঙ্গলোলুপ আত্মীয়ের উপস্থিতিও যেমন এই অপূর্ব্ব মানুষটার ওপর একটা ভাব-গৈরিকের আচ্ছাদন ফেলত, তেমনি আমার সঙ্গেও অনেক সময় যেন তাঁর মনের উপরকার সেই প্রবীনত্বের গৈরিকটা টেনে ফেলে দিয়ে ভিতরকার চিরন্তন কিশোর মানুষকে টেনে বার করত।

এঁর বয়স যে কত হয়েছিল তা বলতে পারিনে। বাবা বলতেন সত্তর পঁচাত্তর হবে—কিন্তু কিছুদিনের পরিচয়ের পর আমার তা মনেই হত না। আমার মনে হত যেন তিনি আমারই বয়সী। তাঁর চিমটে, তাঁর ঝুলি, তাঁর ছাই ভষ্ম, তাঁর কটা গোঁফ জটা কিছুই যেন তাঁকে বুড়ো করতে পারেনি। অন্তরের খোলা মাঠে অবাধে ছুটে ছুটে খেলে বেড়িয়ে তিনি যেন অন্তরে চিরকিশোরই রয়ে গিয়েছিলেন। না ছিল তাঁর খাওয়া দাওয়ার ঠিক, না ছিল শোয়া বসার সময়। বেড়াচ্ছেন ত বেড়াচ্ছেনই— বসে আছেন ত বসেই আছেন; গল্প করছেন ত গল্পই করে

যাচ্ছেন; আবার চুপ করে আছেন ত এমনি চুপ যেন জন্ম হতে চির-মৌন। তাঁর গল্পের সময়ও দেখিছি চারিদিকের আকাশ বাতাসও যেন গল্প করত, গম্ভীর আওয়াজে মুখর হয়ে উঠত। আবার তিনি যখন মৌন হয়ে থাকতেন তখন যেন মনে হত জগতের মধ্যে আওয়াজ বলে কোনো পদার্থই নেই। আমাদের গীত শাস্ত্রে নাকি বলে যে দিনের প্রত্যেক অংশের এক একটা প্রধান সুর আছে, এমন কি ষড় ঋতুরও এক একটা নিজস্ব সুর আছে। সেই সুর নাকি আমাদের গীত-বিশারদদের কাণে ধরা পড়েছিল, তাই বিভিন্ন সময়ের জন্য এবং বিভিন্ন ঋতুর জন্য বিভিন্ন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আমি অত শত বুঝি না, কিন্তু আমাদের স্বামী মহারাজ যখন যা করতেন বা বলতেন তার সমস্তই যেন সময়ের সঙ্গে স্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যেত।

(৩)

কিন্তু হাসিরও আমার গুণ ছিল যে কত, তা বলে শেষ করতে পারি না। সে সারাদিন নানা কাজে ঘুরছে, কিন্তু দিনের শেষে দেখতাম একখানা একখানা চমৎকার ছবি তার ঘরের জানালার পাশে তৈরী হয়ে উঠেছে। কখন যে সে এত কাজ করে, ঘর সাজিয়ে, ছেলে পিলেদের খাইয়ে মুছিয়ে, রাজ্যের লোকের তত্ত্ব তল্লাস করে, এমন কি নানা রকম খাদ্য তৈরী করেও এই কলাবিদ্যার সময় পেতো তাও ধরতে পারতাম না; কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পারতাম যে তার প্রাণের হাসিটুকু তুলির মুখে ছবির ভেতর অতি সহজেই ফুঠে উঠত আর তা সহজেই ধরা যেত। সে যা আঁকত তাতে কেবল থাকত আলো আর আলো শুধু রং আর রং। গাছ পালা, জীব জন্তু নদী সমুদ্র, পাহাড় পর্ব্বত,—সব তাতেই একটা সজীব আলোর সমাবেশ। সবই যে প্রকৃতির হুবহু নকল তা নয়, হয়ত সবটাতেই রংএর একটু আতিশয্যই থাকত, তবু যেন ঐ সব সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি হতে তাঁর মনের মানুষটাকে আমি ধরতে পারতাম।

একদিনকার কথা বেশ আমার মনে পড়ে। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল,—সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে একেবারে অন্ধকার, সমুখের দীঘীর জলও কালো হয়ে এসেছে, আম কাঁঠালের গাছের মধ্যে অন্ধকার জমে এসেছে কিন্তু আমি তার ঘরে গিয়ে দেখি যে সে ছবি আঁকচে। যদিও সেটা বরষারই ছবি বটে কিন্তু তাতে সে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নানারঙের আলো ফুটিয়ে তুলেছে, আর একটা হরিণশিশু মাথা উঁচু করে অস্তমান সূর্য্যকে দেখছে। গাছের সবুজ পাতাগুলোর ডগা লালে লাল—আকাশে নীলের সঙ্গে লালের মেশামিশি, আর একটা রামধনুর এক অংশ ছবির কোণায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বল্লাম "এ হতেই পারে না—রামধনু দেখা গেলে সূর্য্য দেখা যেতে পারে না।"

হাসি হেসে বল্লে, "তা নাই বা গেল, তবু আমি তাই আঁকিব।"

এর ওপর তর্ক চলে না তাই তর্ক বন্ধ হল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তর্ক চলতেই লাগল। একবার মনে হল বলি, যে, যা অসম্ভব তা কিছুতেই সুন্দর নয়, আবার তখনি মনে হল, যে, যা সুন্দর তাকে যে সন্তরের মধ্যে ধরা দিতেই হবে তার মানে কি? যে যে জিনিষ কেবল নিয়ম মেনে চলে তাকে সুন্দর করে তুলতে হলেই ত তার মধ্যে নিয়ম-ছাড়াকে সৃষ্টি-ছাড়াকে এনে ঢোকাতে হবে, নৈলে সৌন্দর্য্য যে কিছুতেই ফুটবে না। যা প্রত্যাশিতের মধ্যে অপ্রত্যাশিত তাই ত সুন্দর। যা নিয়মের মধ্যে অনিয়মিত তাই ত মনোমোহন।

হাসি তার ছবি থেকে মুখ তুলে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার তুলি দিয়ে আমার কপালে একটা টীপ পরিয়ে দিয়ে বল্লে, "এই দেখ এই ভুরু দুটোর মধ্যে যা ছিল না তাকে সৃষ্টি করে, প্রকৃতির নিয়মকে উল্টে দিয়ে তোমার কপালখানি কত সুন্দর করে দিলাম। চল দেখবে।

আমায় একখানা আয়নার সুমুখে দাঁড় করিয়ে সে এক মনে কি যে দেখলে তা সেই জানে, কিন্তু তার আদরের অপ্রত্যাশিত চুম্বন টুকু আমার প্রাণের মধ্যে এমন

অপ্রত্যাশিতকে এনে দিলে যাকে নিয়ে আমি ঐ আয়না খানার সামনে অবাক হয়ে নিজের দিকেই চেয়ে রইলাম। আমার চেহারার মধ্যে কি যে দেখছিলাম ঠিক জানি না, কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছিল এই ত আমি আমার কাছে ধরা দিয়েছি। আমার যে "আমিটাকে" এত তত্ত্ব দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারছিনে, এই ত আমার সেই 'আমি' একটা আনন্দে ভরা চুম্বনে সুন্দর হয়ে স্থূল হয়ে আলোক বাতাস মাটীর সমষ্টি হয়ে আপনারই কাছে ধরা দিয়েছি। এই দেহ হয়েই ত আমি আপনাকে পেয়েছি। আমি ত' অধর নই, আমি যে পূর্ণ ভাবে ধরা পড়ে গিয়েছি।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার পর স্বামী মহারাজের কাছে গেলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি চুপ করে বসে আছেন, আর বাবা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বসে আছেন। ইতিপূর্ব্বে কি কথা যে হয়েছে তা জানিনে—কিন্তু দু'জনে চুপ করে বসে আছেন দেখে আমার যেন কেমন ভয় করতে লাগল। কোনো কথাই বলতে পারলাম না, ধীরে ধীরে এক পাশে বসে পড়লাম। স্বামী মহারাজ ফিরেও চাইলেন না, কোনো কথাও বল্লেন না; কিন্তু বাবা একবার আমার দিকে চেয়েই আবার তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। তার পর হঠাৎ বল্লেন, "তা হলে কি করব ?"

স্বামী বল্লেন "তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে যাও, তা হলেই তাঁকে পাবে—তিনি আপনি এসে দেখা দেবেন, কিন্তু এখানে বসে থাকলে হয়ত পাবে না।"

কার কথা হচ্ছিল, কাকে পেতে হবে, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি অবাক হয়ে একবার এঁর পানে একবার ওঁর পানে তাকাতে লাগলাম। বাবাও কিছুক্ষণ বসে থেকে শেষে উঠে গেলেন।

আমি অবসর পেয়ে ভাবলাম একবার জিজ্ঞাসা করি, কার কথা হচ্ছিল ; কিন্তু স্বামী মহারাজ তার অবসর দিলেন না। তিনিও হঠাৎ উঠে অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, শেষে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম স্বামী মহারাজ মৃদুস্বরে গান করছেন। তাঁকে কোনো দিন গান করতে শুনিনি, তাই হঠাৎ তাঁর মধুর গম্ভীর স্বর শুনে আমি চমকে উঠে, ধীরে ধীরে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল—আমি সেই বিদ্যুতের আলোকে দেখলাম স্বামী রেলিংএর উপর হাত রেখে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে গান গাইছেন। কি যে গাইছিলেন তা মনে নেই এবং বোধ হয় হিন্দি গান বলে বুঝতেও পারিনি, কিন্তু গানটার বিষয় এইটুকু মনে আছে যে যেন সেটা প্রতীক্ষার গান, কিম্বা বিরহের গানই হবে। তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছিল যে এই এত বড় একটা আপ্তকাম পূর্ণকাম মানুষের মনের মধ্যে আবার এরকম করুণ সুরের উচ্ছ্বাস উঠল কেন ?

তাঁকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখে আমি ফিরবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় তিনি কাছে এসে বল্লেন, "মা জানকি। তোমার জানকী নাম বদলে দিলাম, আজ হতে তুমি গৌরী—গৌরী হতে তোমার আপত্তি আছে ?" আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম ; দেখলাম, তাঁর মুখে হাসির লেশ মাত্র নাই, তার পরিবর্ত্তে একটা ঔৎসুক্যের ভাব ফুটে উঠেছে। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বল্লেন, "তোমাকে কি করতে হবে জান ? একজন ঘরছাড়াকে ঘরে আনতে হবে,—গৌরী যেমন শ্মশানবাসী শিবকে গৃহবাসী মহাদেব করেছিলেন, তোমাকেও তেমনি একজনকে—কে সে জানিনে—একজন মহাত্যাগীকে মহাযোগী করতে হবে ; এই কাজের জন্যই তুমি জন্মেছ, এইটাই তোমার এ জগতে জন্মাবার কারণ—বুঝেছ ?"

আমি চুপ করে মাটীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্বামী মহারাজ পায়চারী আরম্ভ করলেন। দু চারবার ঘুরে আবার কাছে এসে বল্লেন, "এইটাই তোমার অদৃষ্ট তুমি বোঝো আর নাই বোঝো, মা, তোমা হতে এই কার্য্যই সিদ্ধ হবে। তোমার বাবাকেও তাই বুঝিয়েছি ; আর তিনি আমার কথানুসারে কাজ কর্ব্বেন বলেছেন। তুমি

গৌরী হতে পার্ব্বে না মা? একটী শিবকেও কি শব হতে না দিয়ে শঙ্কর করতে পারবে না?"

আমি কাতরভাবে বল্লাম, "কি করতে হবে বুঝিয়ে বলুন। যিনি ত্যাগী তিনি কি যোগী নন? যোগী তবে কে?"

"যিনি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করেন, যিনি অনাশক্ত হয়ে আশক্ত হন, এবং যিনি আশক্ত হয়েও অনাশক্ত থাকেন তিনিই যোগী। যিনি বিয়োগী তিনি কি যোগী হতে পারেন? যিনি সর্ব্বকে সত্য বলে স্বীকার করে মিথ্যা বলে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে যোগ-যুক্তাত্মা হয়ে অবস্থিতি করেন তিনিই যোগী। অন্য সমস্ত যোগই এই যোগের প্রাথমিক অবস্থা। তোমায় এমনি একটী যোগীকে তৈরী করতে হবে—পারবে না মা?"

আমি বল্লাম, "আমি আপনার কথা বুঝতে তেমন পারলাম না, তবে এইটুকু বুঝলাম যে কোনো একজন সন্ন্যাসীকে গৃহী করতে হবে, তাঁর মুক্তির পথ বন্ধ করে বন্ধনের পথ করে দিতে হবে। তাই যদি আমার অদৃষ্ট হয়, তাই করব।"

ন্যাসী এইবার খুব জোরে হেসে উঠলেন—এত জোরে হাসতে তাঁকে কখনো শুনিনি। তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে তাঁর আসনের উপর বসে বল্লেন, "মা মুক্ত না হলে কি পূর্ণরূপে বন্ধনের আনন্দ জানতে পারে? যে বদ্ধ জীব সে তো মুক্ত হবার জন্যই ছট ফট করছে, যে মুক্ত সেই পূর্ণ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে পারবে। যাক এসব কথা আর এখন নয়, যখন সময় হবে আপনিই বুঝতে পারবে। যখন তোমার প্রকৃত গুরুকে পাবে, যিনি সহজেই তোমার সমস্ত বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকেও মুক্ত করবেন নিজেও আনন্দ পাবেন, তখন আনন্দ পাবে, তখন আমার আজকের কথা বুঝতে পারবে। এখন যাও কাল ভোরেই স্নান করে আমার কাছে এস।"

আমি ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেলাম। পরদিন প্রভাতে তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি হোম করছেন শুনলাম রাত্রি হতে এই কার্য্য হচ্ছে। বাবা তাঁর কাছে বসে আছেন। কেন যে এই অনুষ্ঠান তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে ন্যাসী নিজে আমায় ফোঁটা পরিয়ে দিলেন, শান্তিজল দিয়ে আশীর্ব্বাদী ফুল দিলেন। তার পর বাবার দিকে চেয়ে বল্লেন, "আমার কাজ শেষ হল, আজই আমি যাব। এর পর যা যা কর্ত্তব্য তুমিই করো। হয়তো আর দেখা হবে না কিন্তু আশা আছে, তোমার এই কন্যা হতে এমন একটা সত্য তুমি জানতে পারবে, যা তোমার কেন, অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু তুমি না জেনেও সেই সত্যের জন্য নিজেও তৈরী হয়েছ এই কন্যাকেও তৈরী করেছ। তোমার চিরদিনকার আশার রামচন্দ্র আসবেন, এবং এমন ভাবে আসবেন যাতে সেই চিরন্তন গোপন সত্য তোমাদের উপলব্ধি হবে। মা জানকি! তোমায় এই টীকা পরিয়ে দিলাম, তুমি আজ হতে কেবল তাঁরই যিনি কেবল তোমারি জন্য আসছেন, যিনি কেবল তোমারি। তোমারি হয়েই তিনি সবারই এবং সবারই হয়েই তিনি সর্ব্বাতীত।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাবা নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন আমিও করলাম।

আকাঙ্ক্ষা

[শ্রীপরিমল গোস্বামী, বি-এ]

আলোকের হাসি উঠিয়াছে ভাসি
আকাশ-গায়,
স্বর্ণ বরণী আজি এ ধরণী
কি শোভা পায়।

আমার জীবনে এই শুভখণে
আলোক কই—
বিষাদ-মগন প্রাবৃটের ঘন,
গরজে অই।

দুরু দুরু হিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া
উঠিছে যেন
ঘন বরষার শেষ নাহি আর
কি জানি কেন।

শুভ্র শেফালী সাজাইছে ডালি
হারিদ বাসে,
কাশ ফুল রাশি তুলিতেছে হাসি
কিসের আশে।

মেঘেরা কে জানে ধায় কার পানে
দিবস নিশি,
কার আগমনী ধ্বনিত এমনি
সকল দিশি।

হে আমার প্রিয়, আজি কি তুমিও
এমনি করে,
মিলনের লাগি, রহিয়াছ জাগি
আমার তরে?

দূর হতে তব স্মৃতি সৌরভ
আসিছে প্রাণে,
আজি হিয়া মোর হয়েছে বিভোর
তোমার গানে।

উষা-রবি সম তুমি আসি মম
হৃদয় দ্বারে,
করিবে আঘাত স্নিগ্ধ প্রভাত
পাইব ফিরে।

আমার এ হিয়া পূর্ণ করিয়া
বিতরি' সুধা
সার্থক কর নয়নের লোর,
মিলন-ক্ষুধা।

একডালা দুর্গ

[শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ, এম-এ,]

বাল্যকালে ইতিহাস পড়িতে পড়িতে যখন প্রথম একডালা দুর্গের কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব হইতেই এই নাম আমার নিকট এত পরিচিত ছিল যে কখনও এই দুর্গের অবর্ত্তমান অবস্থান সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয় নাই। অতি বাল্যকাল হইতেই আমি এই একডালা গ্রামের নাম শুনিয়া আসিতেছি—ইহা আমার জন্মভূমি হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তবে এই একডালা গ্রাম যে ইতিহাসের সহিত জড়িত হইয়া আছে তাহা সর্ব্বপ্রথমে পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ হইতে অবগত হই। সম্ভবতঃ, স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গলার ইতিহাসের অধ্যাপনা কালে আমার বাল্যশিক্ষক মহাশয় এই একডালা দুর্গের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও এই একডালা গ্রামে একটী প্রাচীন দুর্গের অতি সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল—এখনও সম্ভবতঃ ইহা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। এ কথা আমি প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ও এতকাল তাহাই বেদবাক্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি। এই একডালা গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে ৩।৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

তাহার পর এতকাল পরে সেদিন শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় ভাগ পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলাম—যে একডালা গ্রামকে আমরা এতকাল ইতিহাস কথিত একডালা দুর্গ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, সেই একডালা গ্রাম ঐতিহাসিকগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত—এমন কি তাঁহারা এ গ্রামের নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; আর তাঁহারা একডালা দুর্গের অবস্থান সম্বন্ধে এতদিন ধরিয়া যেরূপ বিভিন্নপ্রকারের মতামত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে এতদিন পরে আমার ভয় হইতেছে বুঝিবা আমা চিরপরিচিত একডালা গ্রাম ঐতিহাসিক একডালা দুর্গের অবস্থান ভূমি বলিয়া স্বীকৃত না হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইতিহাসে একডালা দুর্গ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—(১১৫ হইতে ১২৪ পৃষ্ঠা) :—

(সুলতান) ফিরোজ শাহ্ কৌশিকী উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া শমস্ উদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ্......একডালা নামক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। একডালা দুর্গের অবস্থান লইয়া বহু মতভেদ আছে। রেনেল ও বেভারিজের মতানুসারে একডালা ঢাকার নিকট অবস্থিত।... ওয়েষ্টমেকট বলেন যে একডালা বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে মালদহ জেলার দমদমা নামক স্থানই প্রাচীন একডালা দুর্গ। মালদহ নিবাসী পণ্ডিত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করিতেন।......ইহার (একডালার) একদিকে জঙ্গল ও অপর দিকে নদী আছে!......আফিফের তারিখই ফিরোজ শাহীতে একডালার দ্বীপ বা দ্বীপমালা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।......দ্বাবিংশ দিবস একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়াও সুলতান ফিরোজশাহ্ নদী ও অরণ্য বেষ্টিত দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই।......ফিরোজশাহ্ প্রত্যাবর্ত্তনের ছলে একডালা হইতে সপ্তক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন।"

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত আমার পরিচিত একডালা গ্রামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ; আর তাঁহারা এ পর্য্যন্ত উক্ত ঐতিহাসিক একডালা দুর্গের বর্ত্তমান সংস্থান নিঃসন্দেহরূপে স্থির

করিতে পারেন নাই। উল্লিখিত বিবরণী হইতে আরও জানা যাইতেছে যে ফিরোজশাহ্‌এর সময়ে (খৃষ্টাব্দ ১৩৫১-৮৮) একডালা দুর্গের একধারে নদী ছিল ও উহা চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত দ্বীপের মত স্থানে অবস্থিত ছিল। উহা হইতে আরও জানা যাইতেছে যে সুলতান ফিরোজ শাহ প্রত্যাবর্ত্তন ছলে এমন একটা স্থলে শিবির করিয়াছিলেন যাহা একডালা হইতে সাত ক্রোশ দূরে ও গঙ্গাতীরে অবস্থিত। যদি মনে করা হয় যে গঙ্গাতীর হইতে আনুমানিক দুই ক্রোশ দূরে ফিরোজশাহের শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল (ইহা অপেক্ষা নিকটে শিবির সংস্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না—কারণ যে সময়ের কথা বলা হইতেছে উহা বর্ষাকাল; ঐ সময়ে গঙ্গার উভয় তীর বহুদূর পর্য্যন্ত প্রায় জলনিমগ্ন অবস্থায় থাকে। তাহা হইলে ইহা সহজেই অনুমিত হইবে যে একডালা দুর্গ হইতে গঙ্গার দূরত্ব তৎকালে পাঁচ ক্রোশের অধিক ছিল না।

অতঃপর দেখিতে হইবে এই সকল বর্ণনা আমার পরিচিত একডালা গ্রামের সম্বন্ধে খাটে কি না। প্রথমতঃ মহুক্ত একডালার তিন দিক এখনও নদী ও বিল দ্বারা পরিবেষ্টিত—বর্ষাকালে চারিদিকই জলবেষ্টিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ষাকালে এই গ্রামে নৌকা ভিন্ন যাওয়া বিষম শক্ত। এই গ্রাম কেন, এই গ্রাম হইতে উত্তর দিকে অন্ততঃ ৮।১০ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত, দক্ষিণে আরও ২।৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত; আর পূর্ব্ব পশ্চিমে অন্ততঃ ৪।৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত—এই বিস্তৃত ভূভাগ বর্ষাকালে প্রায় জলমগ্ন অবস্থাতেই থাকে; কেবল মাঝে মাঝে এই বিশাল জলরাশির মধ্যে দ্বীপের মতন এক একটী গ্রাম ভাসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে এই সকল গ্রামে নৌকা ভিন্ন যাওয়া চলে না—আর নৌকায় যাওয়া—তাহাও অতি বিপজ্জনক। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের দৈর্ঘ্য ন্যূনপক্ষে ১২ ক্রোশ ও প্রস্থ আনুমানিক ৫ ক্রোশ। ইহা জলভূমি নিম্নভূমি, বিল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সমূহে পরিপূর্ণ। এই ভূখণ্ড ব্যতীত রাঢ় প্রদেশের অপরাংশ উন্নত ভূমি ও স্থল-বহুল। ইহার কারণ এই যে প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশ দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত; এক্ষণে ইহার পূর্ব্বাংশ দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। ভাগীরথীর পূর্ব্ব পথ এখন একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—কেবলমাত্র দ্বারকা ও কুপিতা (কুয়ে বা কোপাই) নদীর কতকাংশ দ্বারা ভাগীরথীর পূর্ব্বপথ সূচিত হইতেছে মাত্র। আমার এই উক্তির সত্যতা প্রবন্ধান্তরে আমি বিশেষরূপে প্রমাণের চেষ্টা করিব। ভাগীরথী এই দুইটী পথের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্থানটী এত জলবহুল।

দ্বিতীয়তঃ—এই একডালা গ্রামের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে এক্ষণে ভাগীরথীর বর্ত্তমান প্রধান শাখা প্রবাহিতা—কিন্তু ভাগীরথীর আর একটা শাখা এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দূরে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রবাহিত হইত—ভাগীরথীর এই প্রাচীনতর শাখাটী এখনও সম্পূর্ণরূপে মজিয়া যায় নাই। এই প্রাচীনতর শাখাটীর তীরেই ফিরোজ শাহ শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন ইহা অনায়াসেই বোঝা যায়।

সুতরাং দেখা গেল যে, ইতিহাসের বর্ণনার সহিত আমার পরিচিত একডালার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে—কেবলমাত্র নামে নহে অবস্থান প্রভৃতির সাদৃশ্যেও এই মিল যথেষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে আমরা এই মুর্শিদাবাদী একডালা গ্রামকেই প্রাচীন একডালা দুর্গ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি—৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও স্থানীয় লোকে এখানে একটা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া দিত—এখনও সে ভগ্নাবশেষের কোনও চিহ্ন এ গ্রামে বর্ত্তমান আছে কিনা তাহা অনুসন্ধেয়। কাটোয়া বারহারওয়ারা লাইনের বাজারসন (বাজারসাউ) ষ্টেশন হইতে পশ্চিম দক্ষিণ কোণে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এই একডালা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামেই যে প্রাচীন দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গ অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে কি বলেন দেখা যাউক।

কোজাগর-পূর্ণিমা

[শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী]

আজি কোজাগর নিশি জ্যোস্নামগ্ন দশদিশি,
আসে লক্ষ্মী চঞ্চল-চরণা,
কে জাগে, কে জাগে বলি উঁকি দেয় কুতূহলী,
দ্বারে দ্বারে আলোক-বরণা ॥

যেথায় নিদ্রিত নর না যায় তাহার ঘর,
ফিরে যায় লয়ে বস্তুরাশি।
যেথায় খেলার সাথী সহ যুবা জাগে রাতি,
সেথায় দাঁড়ায় পরকাশি ॥

হেরি তারা ইন্দুনিভা দেবীর বিমল বিভা,
নাহি জানে জাগে কি ঘুমায়
ফিরাতে না পারে আঁখি বলে, কে রেখেছে আঁকি
মরি মরি হেন প্রতিমায় ॥

কে তুমি মা বল খুলি দেহ শিরে পদধূলি,
কে তুমি গো দেবী কি মানবী?
কোন্ মহা পুণ্যফলে হেরি তোমা ভূমণ্ডলে,
স্বপ্ন যেন মনে হয় সবি ॥

কহে রমা—বৎসে! আমি সুরলোক হতে নামি,
জ্যোৎস্না-রথে আসিনু ভূতলে,
বৎসরান্তে এই মত যাপি পূর্ণিমার ব্রত,
লোকে মোরে লক্ষ্মীদেবী বলে ॥—

দুরু দুরু বক্ষ ত্রাসে কহে যুবা মহোল্লাসে,
—যদি এই দীনের কুটীরে
আসিয়াছ কৃপা করে' থাক তবে চিরতরে,
আর নাহি যেতে দিব ফিরে ॥

হাসিয়া কমলা কহে　　—মোর প্রতিনিধি রহে
　　আজীবন তোমাদের কাছে।
একা আমি নাহি পারি　　তাই সৃজিয়াছি নারী,
　　মোর অংশ তার মাঝে আছে॥

আমার কমল দিয়া　　গড়েছি কোমল হিয়া,
　　সেবারত হস্তপদ তার,
মোর পদ্মপত্রবিন্দু　　তার করুণার সিন্ধু
　　উছলিয়া পড়ে অনিবার॥

আমার এ ধান্যকণা　　শিখায় গৃহিণীপনা,
　　কড়ি তারে করে মিতব্যয়ী।
আমার এ রক্তাম্বর　　ঘেরি তার কলেবর,
　　করে তারে লজ্জা-সজ্জাময়ী॥

আমার সৌন্দর্য্য তার　　অঙ্গে অঙ্গে বিস্তার,
　　ঐশ্বর্য্য তাহারে দেয় বল।
আমার এ রত্নঝাঁপি　　বক্ষে ধরিয়াছে চাপি,
　　সেই তার গুণের সম্বল॥

আমার এ পদ্মমধু　　মাতা পত্নী কন্যা বধূ,
　　সকলেরে দিয়াছি কিঞ্চিৎ।
এবে বৎস লহ চিনি　　নারী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী
　　কেহ নহে আমাতে বঞ্চিত॥

যেথা নারী রূপবতী　　যেথা নারী সাধ্বী সতী,
　　যেথা নারী করুণ হৃদয়,
যেথায় নারীর মান　　সেথা আমি বিদ্যমান,
　　এই কথা জানিহ নিশ্চয়॥—

এত বলি লক্ষ্মী মাতা　　জ্যোৎস্না লোকে পরিস্নাতা
　　মিলাইয়া গেলা আচম্বিতে।
স্বপ্ন ঘোর গেল টুটি'　　যুবক জাগিয়া উঠি
　　নিশিভোর লাগিলা ভাবিতে॥

বিধির বিধি

[শ্রীমতী নৃসিংহদাসী দেবী]

(১)

সদ্যজাত বালিকার জন্মলগ্ন দেখিয়া জ্যোতিষী যখন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "তাইত, আপনার এ মেয়ে বুঝি বা ব্রহ্মচারিণী হয়!"

"ব্রহ্মচারিণী! বৈধব্য সম্ভব না কি?"

"আচ্ছা ভাল করে দেখি।"

জ্যোতিষী আবার গণনায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। কথাটা শুনিবার পর রাধামাধব ভট্টাচার্য্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইত, উষার আশাময়ী আলোকের মধ্যে কুহেলীর অনাহূত আবির্ভাব কেমন অপ্রীতিকর। বন্ধ্যা দম্পতির বহু প্রার্থনার ফলে যদি বা বন্ধ্যাত্বের দোষ খণ্ডন হইয়াছে, এবং আসিল পুত্র নহে—কন্যা তাও আবার কৌমার্য্যব্রতময়ী ব্রহ্মচারিণী, একি বিড়ম্বনা। ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা! তাহা হইলে ত দৌহিত্র দত্ত এক গণ্ডুষ জলের আশাও তাঁহার মিটিবে না; ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর তন্ময়তা ভগ্ন করিয়া জ্যোতিষী বলিলেন—"বৈধব্যের আশঙ্কা অমূলক, বিবাহের কোন যোগ নাই, সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য।"

রাধামাধব অলক্ষ্য অদৃষ্টকে নিঃশব্দে প্রণিপাত করিয়া জ্যোতিষীকে যথারীতি প্রণামী দিলেন। তিনি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "এমন গণনা আমার জীবনে এইমাত্র প্রথম।"

স্নেহ মানুষের সমস্ত চিত্তকে অভিভূত করিয়া যখন অন্তরের মধ্যস্থলে অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করে, মানুষ তখন তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না; পরে যখন বুঝিতে পারে—নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখন ভাবে এও এক আশ্চর্য্য বটে।

কন্যা ক্রমে মাসের পর মাস একটু বড় হয়, ব্রাহ্মণ স্নেহবিহ্বল চিত্তে চাহিয়া থাকেন, এবং যখন সে শিশুকালোচিত খেলায় মগ্ন থাকে, তিনি ঔৎসুক্য ভরে তার খেলনা-কটী যোগাইয়া দেন; এমনি করিয়া কন্যা সাত মাসের হইল, ব্রাহ্মণও বুঝিলেন জীবনের সব বন্ধন অপেক্ষা স্নেহের বন্ধন বড় প্রবল; তাই অন্নপ্রাশনের দিন নারায়ণের প্রসাদ মুখে দেওয়াইয়া মেয়েটীর নাম রাখিলেন "মায়া।"

ফুট ফুটে পদ্ম-ফুলের মত মেয়েটী যখন কাহারো কোলে চড়িয়া পাড়ায় যাইত, তখন পাড়ায় এমন লোক ছিল না, যে হাজার কাজের মধ্যেও একবার তাহাকে কোলে না লইত, সকলেই একবাক্যে বলিত "ব্রাহ্মণের পুণ্যের ফল, তা এমন মেয়ে হবে না?"

কথাটা বড় মিথ্যা নয়, সন্তান সন্ততি মনোমত হওয়ার আনন্দ যে—অনেক আনন্দের শ্রেষ্ঠ তাহা ব্রাহ্মণ বেশ বুঝিতেন, কিন্তু কন্যার 'অনিবার্য্য ব্রহ্মচর্য্য' ইহা স্মরণ হইলেই কেমন একটা দুর্ভাবনায় তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিত।

এমনি ভাবে এক, দুই, তিন করিয়া, চারি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া মায়া যখন পাঁচ বৎসরে পড়িল, তিনি তখন পুত্রের মতই কন্যার শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। ব্রাহ্মণী ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া বলিতেন "ছেলেত নয় মেয়ে যে।"

তিনি উত্তরে একটু হাসিতেন মাত্র। সে হাসি নির্ম্মল শারদ জ্যোৎস্নার মত, কন্যাকে শিক্ষা দিতে তিনি কতখানি আনন্দ পান—তাহা প্রকাশ করিয়া দিত।

ছোট একখানি লালপেড়ে ধুতি পরা ছোট দু'গাছি রাঙ্গা রুলি হাতে, মায়ের হাতে স্নান করান ছোট দেহটীর সঙ্গে কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়া চুলগুলি দোলাইয়া, প্রভাত

সূর্য্যের আলোকমাখা চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ার উপর বইখানি হাতে করিয়া মায়া যখন আসিয়া দাঁড়াইত, রাধামাধব প্রায়ই তখন সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া শাস্ত্র আলোচনায় ব্রতী হইতেন। মায়া ধীরে ধীরে ডাকিত "বাবা!"

রাধামাধব পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া স্নেহ-গর্ব্বিত নেত্রে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেন "এসেছ মা।"

মায়া বইখানি তাঁর হাতে দিয়া বলিত "দেখুন।"

বিস্মিত পিতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেন "হয়েছে?"

মায়া উত্তরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িত।

তারপর তিনি যখন দেখিতেন বাস্তবিক তার কোন জায়গায় বাধিল না, তখন এই বুদ্ধিমতী বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া কি যে ভাবিতেন তিনিই জানিতেন না।

এমনি করিয়া আলোকে আঁধারে নীরব শান্তিতে দিনগুলি একভাবেই কাটিতেছিল। গ্রামের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে তাঁহার অতুলনীয় নিষ্ঠা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, শান্ত মুখশ্রী দেখিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় সকলেরই হৃদয় অবনত হইত। গ্রাম্য জমিদার চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত সম্মান করিতেন, কারণ তাঁহার ন্যায়দর্শিতা ছোট বড় বিচার করিত না। যদিও তিনি জমিদারের পৈতৃক বিগ্রহের নিত্যসেবক ছিলেন; তথাপি ব্রাহ্মণ তাহার কর্ত্তব্যে ত্রুটী দেখিলে প্রতিবাদ করিতে ছাড়িতেন না। গুণগ্রাহী জমিদার ও তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষায় উদাসীন ছিলেন না, এবং নিজের ভ্রমের জন্য ব্রাহ্মণের কাছে নত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে পরস্পরের বন্ধুত্ব বন্ধন খুব দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছিল।

(২)

সুখের সময় দীর্ঘ হইলেও নিমেষের মতই কাটিয়া যায়। ব্রাহ্মণেরও শান্তিপূর্ণ জীবনে সুদীর্ঘ দশ বৎসর পলকের মতই চলিয়া গেল। তিনি মায়াকে এই কয় বৎসরে শাস্ত্র-জ্ঞানময়ী মূর্ত্তিমতী-পবিত্রতা-স্বরূপিনী ভক্তির আধার করিয়াই তৈয়ারী করিলেন। মায়া প্রত্যহ স্নানের পর শিবপূজা শেষ করিয়া যখন তন্ময়চিত্তে পাঠ করিত—

"ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা চ ত্বং বিষ্ণু পরিপালকঃ
ত্বং শিবঃ শিবদোনন্তঃ সর্ব্ব সংহারকারকঃ।"

ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন, আর ভাবিতেন জ্যোতিষীর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী।

কিন্তু তাই বলিয়া পিতামাতার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত অবহেলা করা চলে না; কাজেই তিনি সৎপাত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সহসা পাত্র পাওয়া কুলীনের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার, বিশেষ সুপাত্র; সুতরাং দেখিতে দেখিতে মায়া একাদশ উত্তীর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

ভগবান তাঁহাকে বেশীদিন সে চিন্তার অবসর দিলেন না, অদৃষ্ট নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য আদেশে এই সময়ে তাঁহাকে পরপারের পথে যাত্রা করিতে হইল। মায়া অনেক কাঁদিল, যখন বুঝিল যতই কাঁদ পিতা আর ফিরিবেন না, তখন একবার চোখ মুছিয়া জননীর দিকে চাহিয়া দেখিল—মূর্চ্ছিতা জননী পিতার পদপ্রান্তে পড়িয়া আছেন, আর মাথার উপর হাত রাখিয়া চন্দ্রনাথ বাবু বলিতেছেন "ভয় কি মা।"

বিপদের সময় একটী অভয় বাণীতে হতাশ জীবনে কতদূর সান্ত্বনা আনে, এই সে প্রথম বুঝিল, সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল "কাকাবাবু।"

চন্দ্রনাথ বাবু মায়াকে শান্ত করিয়া, সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া মৃতদেহ বাহির করিলেন। সেদিন প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যাহার চোখের জল পড়ে নাই। তারপর চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্যোগে শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণী ও মায়াকে চন্দ্রনাথ বাবু আপন আশ্রয়ে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু বিপত্নীক, একমাত্র পুত্র অরবিন্দ কলিকাতার মেসেই থাকে, কেবল এক মাতুল কন্যা বাড়ীতে গৃহকর্ত্রী স্বরূপে ছিলেন; একদিন অপরাহ্নে তিনি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণী ও মায়াকে লইয়া যাইবার জন্য পাঠাইলেন; এতদিন পর্য্যন্ত কেহ ব্রাহ্মণীর রোদন

শুনিতে পায় নাই, কিন্তু আজ যখন স্বামীর চরণধূলি-পূতঃ আশ্রমখানি ছাড়িয়া যাইতে হইল, তখন তিনি আর্দ্রস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, "ভগবান! আরতো পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন নেই।"

পতিব্রতার এই করুণ বিলাপ শুনিবার জন্য ভগবান যেন উৎকর্ণ হইয়াছিলেন, তাই চন্দ্রনাথ বাবুর আশ্রয়ে যাওয়ার পর মাসের মধ্যেই, তিন দিনের জ্বরে ব্রাহ্মণীও স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। প্রতিবেশীবর্গ এবার আর বেদনার অশ্রু না ফেলিয়া পতিব্রতার জয় ঘোষণা করিল।

এবার মায়া কাঁদিল না,—নিদারুণ বেদনাকে বুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, বজ্রগর্ভ মেঘের মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেন যে কাঁদিল না—অন্যে বুঝিল না, চন্দ্রনাথ বাবু বুঝিলেন জননীর এই অপরিসীম শোক বালিকা কত নীরবেই অনুভব করিতেছিল, তাই আজ সে তাঁহার মৃত্যুতে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের বেদনাকে চাপা দিল।

পরে আরো ছয় মাস কাটিল, গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, আবার শরত আসিল, আবার প্রকৃতি হাসিল, কিন্তু মায়া আর আগের মত হাসিতে পারিল না, হাসিবার চেষ্টা করিলে আগেই কান্না পায় যে।

তাই সে যতটুকু পারে চন্দ্রনাথ বাবুর কাছে থাকে, অবশিষ্ট অংশ পিতার পূর্ব্ব পূজিত বিগ্রহের পদতলে বসিয়া কাটায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়, মায়া নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মতই বসিয়া থাকে। সেইখানে বসিলেই অতীতের সুখ-স্মৃতি মনে পড়ে চোখে জল আসে তবু উঠিতে পারে না. তার ব্যথিত আত্মা কি এক অপরিসীম ভাবে বিহ্বল হইয়া যায়; তার পর কখন ঘুমাইয়া পড়ে অনুভব করিতে পারে না। চন্দ্রনাথ বাবু প্রথমে নিজে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন ইদানীং বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে সময় হইত না; সুতরাং পূজার ছুটীতে বাড়ী আসার পর হইতে এই ভার অরবিন্দের হইয়াছিল, যেমনই হোক এই কাজটী তাঁহাদের পিতা পুত্রেরই নিজস্ব ছিল। অনতিজ্ঞ প্রকৃতি পিসিমা, তাহা দেখিয়া, নিজে ডাকা দূরে থাকুক, মায়ার অজ্ঞাতে এই "অলক্ষণা বাপ মা খেকো" মেয়েটাকে বহিয়া মরার জন্য তাঁহাদের তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু শরতের মেঘ যেমন চাতকের কাছে উদাসীনের মতই অবস্থান করে; পিতা পুত্রেও তেমনি সব কথা শুনিয়া যাইতেন মাত্র।

আজ কয়দিন চন্দ্রনাথ বাবু মহালে গিয়াছেন, মায়ার ভার অরবিন্দের উপরই সম্পূর্ণ পড়িয়াছে। সেদিন তাহাকে কোন বন্ধুর বিবাহে নিমন্ত্রণ রাক্ষায় যাইতে হইল। যখন সে ফিরিয়া আসিল—তখন গভীর রাত্রি, কেবল শারদ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হর্ম্ম্য সমস্ত কক্ষগুলি যেন প্রসন্নমুখে তাহাকে আহ্বান করিতেছিল। অরবিন্দ মুগ্ধভাবে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিতেই, ঠাকুর বারান্দায় দৃষ্টি পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল "মায়া! আজও কি পিসিমা তাহাকে ডাকেন নাই?"

সন্দেহের সঙ্গে সমস্ত অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল, জুতা খুলিয়া খোলা পায়েই সে ধীরে ধীরে বিগ্রহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল—শিকল বদ্ধ নাই।

একটু ধাক্কা দিতেই যখন আবদ্ধ দুয়ার সম্পূর্ণ মুক্ত হইল তখন চোখ পড়িল "মায়া, নির্ম্মাল্যের মতই দেবতার পদতলে ঘুমাইতেছে, মুক্ত দ্বার পথে শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদের মতই তাহার ললাটের উপর পড়িয়াছে।" অরবিন্দের চোখে জল আসিল "সেই মায়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সাধনার সম্পত্তি মায়া!" একটু স্তব্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—পরে ডাকিল "মায়া"—

মায়ার ঘুম ভাঙ্গিল না—আবার ডাকিল "মায়া।"

মায়া তবুও জাগিল না তখন সে ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া ললাটে হাত দিয়া ডাকিল "মায়া?"

এবার মায়া চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিল। নিজকে একটু সামলাইয়া বলিল "রোজ রোজ আপনাকে বড় জ্বালাতন করি।"

মায়ার কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া অরবিন্দ স্নেহভরে বলিল "যখন বুঝতে পেরেছ,তখন আর করবে না, কেমন মায়া?"

মায়া লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল "রোজই ত মনে করি, রোজই হয়ে পড়ে।"

কথাটায় অরবিন্দেরও হাসি আসিতেছিল, কিন্তু হাসি

চাপিয়া সে বলিল "বেশ ত আর করো না, এত ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে অসুখ হবে যে!"

মায়া কথার কোন উত্তর দিল না, দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল, অরবিন্দ হাত ধরিয়া বলিল "এস।"

তারপর ঘরে শিকল দিয়া অরবিন্দ বলিল "এত রাতে পিসিমা কিছুতে উঠবেন না মায়া। তুমি আমার ঘরে শোওগে, আমি বাইরে শোব।"

কথা কয়টা শুনিয়া মায়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "আপনি বাইরে শোবেন—"

অরবিন্দ মায়ার হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া জ্যোৎস্না-স্নাত ললাটের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিল "মন্দ কি!"

(৩)

মায়া বলিতেছিল 'আমার মনে হয় মানুষ গুলো পৃথিবীতে আসে আর জীবনের দিন কটা কেবল এলোমেলো করেই কাটিয়ে দিয়ে কেমন চলে যায়।"

তখন রাত্রি নয়টা, অরবিন্দ একখানি খালি খাটে শুইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল—সম্মুখে উন্মুক্ত গবাক্ষের উপর বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মায়া কথাগুলি বলিতেছিল। অরবিন্দ চুপ করিয়াছিল।

মধ্যে আর একটা বছর কাটিয়া গিয়াছে, ব্রজনাথ বাবু মারা গিয়াছেন পিসিমাও [illegible] গিয়াছেন, অরবিন্দও এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ীতে আসিয়াছে।

একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া অরবিন্দ বলিল "জগতের স্বাভাবিক নিয়মটাই যে ঐ রকম।"

"কি জানি আমার ভাল লাগে না" বলিয়া মায়া চুপ করিল।

অরবিন্দ এইবার অর্দ্ধ হেলান ভাবে শুইয়া বলিল "মায়ার ভাল লাগবে না বলে কি জগতের নিয়ম উল্টে যাবে?"

মায়া ব্যথিত ভাবে মুখ নত করিল, অরবিন্দ মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল, একটা কথা আজ তার মুখের কাছে আসিতেছিল, কিন্তু সে তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল। যখন সে বাড়ী আসিত, মনে করিত এই কথাটা এবার মায়াকে বলিবে, কিন্তু পারিত না, এখন উপর্য্যুপরি ছয় মাস থাকিয়াও সে সেই কথাটা বলিতে গিয়া তেমনি লজ্জিত হইয়া পড়ে। সে কেমন করিয়া বলিবে "মায়া অনেকদিন হতেই আমি তোমার দুয়ারেই ভিখারীর মত দাঁড়িয়ে আছি।"

কিন্তু আর ত মায়াকে এমন ভাবে রাখা শোভা পায় না। লোকের দৃষ্টি আর ত অনুকূল নহে; অরবিন্দের সমস্ত ধমনী চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটু খানি স্থির হইয়া নিজেকে সংযত করিয়া অরবিন্দ ডাকিল "মায়া!"

মায়া নতমুখেই বলিল "বলুন!"

অরবিন্দ নিরুত্তর হইয়া রহিল, তাহা দেখিয়া মায়া বলিল 'বললেন না?"

'বলি মায়া" অরবিন্দ আবার চুপ করিল, বলিতে গিয়াও কেমন একটু সঙ্কোচ আসিতে লাগিল, শেষে নিজেকে একটু শক্ত করিয়া বলিল "বললে কথা রাখবে কি তুমি?"

"আপনি যে ভূমিকাই করচেন, রাখার মত কিনা, না শুনে কি বলি!"

অরবিন্দ বলিল "আমার একটা কথার মীমাংসা করে দাও মায়া। স্বার্থের জন্য আর কতদিন তোমাকে এমন অবিবাহিত অবস্থায় রাখতে পারি? সমাজ কি তাহলে আমাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে? আমি জানি তোমার অভাবে আমার অনেকটা কষ্ট হবে, একটু শ্রদ্ধা একটু যত্ন করবারও কেউ রইবে না কিন্তু আর চলে না, অনেকদিন রেখেছি।"

মায়া সহসা এই অসম্ভাবিত প্রসঙ্গে নিজেকে বড়ই বিচলিত বোধ করিল একটু পরে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "কোথায় বিদায় করতে চেষ্টা করচেন?"

"আর যদি তোমাকে আমি বিদায় করে না দিই—আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে আমিই যদি আবার তোমার কাছে প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াই—নিতে রাজী হবে কি মায়া?"

বড় প্রলোভন, অরবিন্দের মত স্বামী বিপদের বন্ধু অসীম ভালবাসা সহ উপযাচক হইয়া তাহার দুয়ারে

আসিতেছে, তার উপর উপকারের একটা কৃতজ্ঞতাও ত আছে? মায়া প্রথমে কোন কথা কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে আসিয়া প্রণাম করিয়া শেষে বলিল, "আমাকে হাসি কান্নার সংসারে আর বাঁধবেন না, আমি আপনার আনন্দের সংসার দেখি, আর ছেলে মেয়ে নিয়ে বিগ্রহ নিয়ে থাকি।"

অরবিন্দ করুণ হাসি হাসিয়া বলিল "যুক্তি মন্দ নয়।" অনেকক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল, অরবিন্দ বুঝিল এই উদাস প্রকৃতি নারীর অন্তঃকরণে যতই ভালবাসা থাক সে ধরা দিতে পারিবে না। মায়াও বুঝিল, তার এই প্রত্যাখ্যান অরবিন্দকে কত বেদনা দিয়াছে. একবার নিজেকে দেখিল—সে কি অরবিন্দকে কিছুই ভালবাসে না? না, তা নয়, সে বড় ভালবাসে, কিন্তু সে শ্রদ্ধার জিনিসকে শ্রদ্ধার দ্বারাই পূজা করিতে চায়, কামনাপূর্ণ, হীন স্বার্থ বিজড়িত ভোগের মধ্যে তাহাকে চায় না। একটু নীরব থাকিয়া মায়া বলিল "দেখুন আমার জীবনে এই ক'দিনে হাসি কান্নার অনেক খেলা খেলেছি, আবার তাতে জড়িয়ে পড়ে কষ্ট ভোগ করবার ইচ্ছে নেই। আপনি আমার কি আর কতখানি শ্রদ্ধার পাত্র, তা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। মাথার জিনিষকে, নামিয়ে এনে তার সঙ্গে খেলা করতে আমার প্রবৃত্তি নেই; আমার অনেক অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করেছেন, এ অবাধ্যতাও আজ মার্জ্জনা করুন?"

"না মায়া! মার্জ্জনার ত কিছু নেই, কিন্তু তোমাকে পাত্রস্থা না করলে সমাজ শুনবে কেন?"—অরবিন্দ ধীরে ধীরে ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর দিল।

"আমায় এখানে রাখবে না।"

বিস্মিত ভাবে মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া অরবিন্দ বলিল "কোথায় যাবে?"

মায়া বলিল "বাবার এক গুরু আছেন, তিনি সন্ন্যাসী, বিন্ধ্যাচলে তাঁর আশ্রম আছে, সেখানে আমার মত অনেক শিষ্যা আছেন,—মনে করবেন না মায়া অসম্ভব বলছে; জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। সেখানে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে, আপনি সংসারী হোন, সুখী হোন, মায়ার স্মৃতি দুঃস্বপ্ন বলেই মনে রাখবেন!"

অরবিন্দ এবার উত্তেজিত ভাবে বলিল "আমি সংসারী হব মায়া! তোমার বিবাহ না করলে ক্ষতি হয় না, আমার হবে? আমার চলবে না; তাই বলে যাকে তাকে প্রাণটা বিলিয়ে দিতে হবে? এত সস্তা প্রাণ অরবিন্দের নয়।"

মায়া আর দ্বিধা না করিয়া অরবিন্দের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল "কেন আপনি আমায় এত বড় বাঁধনে বাঁধতে চান, আমার মনে হলেও কান্না পায় যে! জীবনটা কি শুধু ছেলে মেয়ে মানুষ করতে—আর তারা মরলে কাঁদতেই—সৃষ্টি হয়েছে, এর কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই?"

অরবিন্দের কানের কাছে দিব্য মন্ত্রের মত ফুটিয়া উঠিল—"এর কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই।"

সে অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পরে মায়ার মুখের দিকে চাহিল, অনেক দিন সে এমন করিয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই, কিন্তু আজ আর কুণ্ঠা আসিল না,—দেখিল সে মুখ যেন তখনো বলিতেছে "এর কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই?" অরবিন্দ ধীরে ধীরে বলিল "তাই হোক মায়া! তোমায় আমি আশ্রমেই পাঠাব, দেবীর দেবত্বের অসম্মান করবো না।"

মায়া অরবিন্দকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, একটু স্তব্ধ থাকিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল "স্বামী স্ত্রীর অন্তর যত বড়ই পবিত্র হোক, তবু তাঁরা বাসনাময় সংসারের দাস। আরো—যে অন্তর একজনকে আসন স্বরূপে দান করা যায়, সে আসনের পাশে ভগবান কোন রকমে দাঁড়াতে পারেন বটে—কিন্তু বসবার স্থান তাঁর সংকুলান হয় না। তারাই বা কি করবে? তাই মুক্তি-পথের পথিক-জন নিসঙ্গ ভাবে নির্জ্জনে আরাধনাই শ্রেয় মনে করেন। স্বার্থপর মুখরা মায়াকে মার্জ্জনা করুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার ভবিষ্যৎ জীবন শান্তিময় হোক।" মায়া আর দাঁড়াইল না।

(৪)

আজ বিদায়ের দিন, মায়া চারি বৎসর এখানে আসিয়াছে, তারপর কালস্রোতে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত কি হইয়াছে, অরবিন্দ বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া আজ সেই অতীতের কথাই ভাবিতেছিল। মায়া একদিন আসিয়াছিল, তারপর যখন সে প্রয়োজন শেষ মনে করিল, তখন আপনিই যাইতেছে তাহাতে অরবিন্দের কি? তবু আজ সমস্ত বাড়ী তার কাছে বড় শূন্য বোধ হইতেছে, মায়া চলিয়া গেলে কার কাছে সে দুটো স্নেহের বাণীর প্রত্যাশা করিয়া দাঁড়াইবে! তার মনে পড়িল, আর একদিন এমনি অন্ধকার সে বোধ করিয়াছিল, সেদিন চন্দ্রনাথ বাবুর শেষ দিন। তার পরে মায়ার স্নেহ স্পর্শেই সে শূন্য স্থান ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া, আবার আশার আলোকে স্বর্ণ স্বর্গের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল কিন্তু বিধির ইচ্ছা যে অন্য রকম।

অরবিন্দ মায়ার উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইল; সে যে আজ দশ দিন মায়ার সঙ্গে দেখা করে নাই,—এ ক'দিন শুধু মায়ার যাবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, আর নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করিয়াছে, সে ধীরে ধীরে ঠাকুর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল—

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, মায়া ঠাকুরের বৈকালী লইয়া বাস্ত, শঙ্খটা সাজাইয়া, গামছা খানি রাখিয়া, ধীরে ধীরে পঞ্চপ্রদীপ সাজাইতেছিল।

অরবিন্দ ডাকিল "মায়া!"

অরবিন্দের আহ্বানে তার তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল, পঞ্চপ্রদীপটা রাখিয়া বারান্দায় আসিয়া নতমুখে বলিল "কি বলবেন।"

অরবিন্দের ব্যথিত অন্তর মায়ার এ প্রশ্নে কাঁদিয়া উঠিল, মনে হইল বলে "কি বলবো মায়া! বলবার যে অনেক ছিল, তুমিই যে বলতে দিলে না, শুনতে চাইলে না।" তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল, মায়া তাহাকে চুপ করিতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চাহিল অরবিন্দ তাহাকে অশ্রু গোপন করিতে পারিল না—রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল "সব বন্দোবস্ত করেছি মায়া! তোমার যা দরকার হবে তুমি সঙ্গে নিও, এতদিন যতটুকু আপন ভেবে ব্যবহার করেছ, আজ সে টুকু করতে কুণ্ঠিত হয়ো না, আজ একেবারেই পর মনে করো না।"

এত স্নেহ প্রত্যাখান করিতে গিয়াও মায়ার বড় বেদনা বোধ হইল তাহারও চোখে জল আসিল, অরবিন্দের কাছে গিয়া, নিজের দুই হাতে তাহার দুই হাত চাপিয়া বলিল "মায়ার যদি জগতে কোন প্রকৃত আত্মীয় থাকেন, তবে সে আপনি, এর বেশী মায়া বলতে জানে না।"

অরবিন্দ নীরব রহিল, মায়াও আর কিছু বলিতে পারিল না, তার অন্তর কেবল আকুল ভাবে ভগবানের পাদপদ্মে লুটাইয়া বলিল "ওগো একি পরীক্ষা, আর কেন রহস্য আরম্ভ করেছ, বিশ্বেশ্বর! আর কেন মায়ার চোখে জল এনে দাও।"

অরবিন্দ একটু পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "একটু স্বার্থত্যাগ করো' মায়া! যেখানে থাক, সংবাদ দিও, অরবিন্দের জীবনের শেষ তৃপ্তি টুকুও দিতে কি আপত্তি করবে?"

মায়া তেমনি ভাবেই বলিল "না।"

সহসা সান্ধ্য নীরবতা ভগ্ন করিয়া পাশের বাড়ীতে কে মধুর কণ্ঠে গাহিল—

'এই যে যত আশা দিয়েছ তুমি নাথ!
পূরণ তরে তব নাহি কি কোন হাত?
কেবলি হাহাস্বরে আকুল ব্যথা ভরে
মানব আঁখিনীর বরষে দিন রাত।
হতাশে ভেসে ভেসে তাইত আসে শেষে
তোমারি পদতলে করিতে প্রণিপাত।'

মায়া ধীরে ধীরে অরবিন্দের হাত ধরিয়া বিগ্রহের পদতলে আনিয়া বলিল "প্রণাম করুন—জীবনে এত তৃপ্তি কিছুতে পাবেন না। জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা সার্থক হয়ে উঠবে।" মায়া প্রণাম করিল অরবিন্দও প্রণাম করিল, যখন উঠিল, তখন তার অন্তর অনেক শান্ত হইয়াছে,—তখনো অপরিচিত কণ্ঠের সঙ্গীত ধ্বনি বিশ্বনিয়ন্তার উপর অভিমান করিয়াই যেন বলিতেছে,—

'এই যে যত আশা দিয়েছ তুমি নাথ!
পূরণ তরে তব নাহি কি কোন হাত!

অমলা

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

(৬)

ডাক্তারের আশঙ্কাই ফলিল। অমলার খুড়িমার রোগ সহসা ব্যাঘ্রবিক্রমেই ফিরিয়া আসিল। অমলারা আরও একটু দোষ করিয়া ফেলিয়াছিল। রুগ্নার মাতা কন্যাকে সুস্থ মনে করিয়া ডাক্তারকে লুকাইয়াই দুটি অন্ন পথ্য দিয়া ফেলিয়াছিলেন। অমলা বা রমেন তাহা জানিলেও ইহাতে যে কোন ক্ষতি হইবে তাহা তাহাদের মনে হয় নাই। ফলে যাহা হইবার হইল। পূর্ব বিকার লইয়া রোগ আবার সাংঘাতিকতম ভাবে বিকাশ পাইল এবং এবারে ডাক্তারের সর্ব্ব যত্ন বিফল করিয়া দুই দিনের মধ্যেই অবস্থা চরমে দাঁড়াইল।

শুশ্রূষা-নিরতা হতাশাচ্ছন্না অমলা ডাক্তার ও রমেনের সমক্ষেই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল "খুড়িমাকে ইচ্ছে ক'রেই আমরা মেরে ফেল্লাম। আপনার বারে বারে নিষেধ শুনেও বুঝ্‌লাম না যে এখনো ভয় আছে। এবারে আর ভাগ্যের দোষ কি রোগের দোষ নেই, রোগ হ'তে আপনি সারিয়ে তুলেছিলেন। এবার আমিই খুড়িমাকে মারলাম।"

অবসাদগ্রস্ত রমেন ধীরে ধীরে অমলার কথায় বাধা দিল "এ ভুল করবার তোমাদের অধিকার আছে, আমার ভুলই সাংঘাতিক। আমি কেন দিদিমাকে ধমক্ দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম না। বাজেন-বাবু তো আমায়ও একথা বলে দিয়েছিলেন। এ আমারি মেরে ফেলা বৈকি!"

অমলা ইহার প্রতিবাদ না করিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

ডাক্তার এক ভাবেই রোগীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে উভয়ের কথার মধ্যে বাধা না দিয়া নিস্তব্ধ ভাবে নিজের কর্ত্তব্যই করিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে স-নিশ্বাস উঠিয়া দাঁড়াইতেই রমেন ব্যগ্রভাবে বলিল "তুমি এইবার চলে যাচ্ছ?"

ডাক্তার উত্তর না দিয়া রমেনের পানে একটা দৃষ্টিক্ষেপে তাহাকে বুঝাইয়া দিল আর তাহার থাকা নিষ্প্রয়োজন। দ্বারের দিকে ডাক্তারকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া অমলা ব্যাকুলকণ্ঠে তাহারে ডাকিল "আপনি সত্যি চলে যাচ্ছেন? আর একটু চেষ্টা দেখুন,—আর একটু থাকুন। এমন হয়েও কত লোক যে বাঁচে শোনা যায়। এখনি আপনি যাবেন না।"

ডাক্তার নিঃশব্দে দ্বার ধরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে রমেনের পানে চাহিয়া বলিল "তুমি কি থাকছ আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে আমি চল্লাম।"

শোকাচ্ছন্না বৃদ্ধা এতক্ষণ উবুড় হইয়া পড়িয়াছিল এবারে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল "তুমি আর কি করবে দাদা, যারা ক'রে মেরে ফেলবে দেবতায়ও তাদের রক্ষা করতে পারে না, তাই তুমিও পারলে না। আর তুমি কি করবে।"

বৃদ্ধার আর্ত্তরোদনের মধ্যে ডাক্তার রমেনের মস্তক স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল "টুনি মণি তোমার মার কাছে বুঝি?"

"হাঁ।"

"আমি তাদের নিয়ে যাচ্ছি তোমার মাকে এঁদের কাছে পাঠিয়ে দিই।"

"তাই দাও।"

আবার বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল "কেবল টুনি মণি নয় আমরা চারটে প্রাণী যে মা হারা হলাম। আমার এই বুড়ো বয়েসে—আর ঐ হতভাগা মেয়েটা—আমাদেরই বা জগতে আর কে থাকল?"

ডাক্তার চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে রমেনের মাতা আসিয়া সেই দলে যোগ দিলেন। অবিলম্বেই মুমূর্ষুর সর্ব্ব আধি-ব্যাধির শেষ হইয়া গেল। ইহাদের আর্ত্ত

ক্রন্দনে পাড়ার লোক বুঝিল যে না বিধবারও জীবনের দাম আছে এবং তাহারও মৃত্যু আছে।

কিছুক্ষণ পরে শ্মশান যাত্রার উদ্যোগ করিতে রমেন বাহির হইয়া গেল এবং অবিলম্বেই ফিরিয়া মাতাকে জানাইল যে সমস্ত প্রস্তুত। মাতা একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন "এরই মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল? আগেই জোগাড় করে রেখেছিলি কি?"

"রাজেন বাবু সব ঠিক্ ক'রে রেখেছেন।"

শব-বাহিরা যখন চলিয়া যায় বৃদ্ধা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "ওরে রমেন মণিকে সঙ্গে নিয়ে যা, তার তো পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে তার হাতের আগুণে তার মাকে বঞ্চিত করিস্‌নে।"

"ডাক্তার তাকে নিয়ে এগিয়ে চলে গেছেন।"

রমেন শোকস্তম্ভমানা টুনিকে নিজের মাতার ক্রোড়ের নিকট দিয়া অগ্রসর হইয়া যায়—মাতা বলিলেন, "ওরে সে যে দুধের বালক—কে তাকে সে কাজের পর বুকে করে থামিয়ে নিয়ে আসবে?"

অমলা উঠিয়া বসিয়া বলিল "আমি যাই জেঠাইমা রমেন দাদার সঙ্গে।"

"তা কি হয়, তুমি তোমার দিদিমাকে টুনিকে দেখো আমিই যাই।"

রমেন বাধা দিয়া—"কাউকে যেতে হবে না, রাজেন বাবু গেছেন তাকে নিয়ে" বলিয়া চলিয়া গেল।

মাতা স-নিশ্বাসে বলিলেন "দেবতাই বটে। সকল দিকে দৃষ্টি। হাজরাদের ছেলেটাকে কি করেই যে বাঁচিয়েছে। বেণীর ভাগ্যই তো বাঁচালে, নেহাত যার বরাত নেই তাকে কে বাঁচাবে! আহা বৌওতো ভাল হয়েই উঠেছিল। এত যত্ন করেও না বাঁচাতে পেরে ডাক্তার ব্যাচারা, ভারি মনোভঙ্গ হয়ে পড়েছে যেন বাছার ভারি দুঃখ হয়েছে বুঝতে পারলাম বেশ।"

কেহ বলিল "তা আর হবে না—কি যত্নই লোককে করেন। যার না বাঁচে সেও তো এ ডাক্তারের ত্রুটী দেখতে পায় না। সেও বোঝে যে নেহাতই বরাত নেই। আর গরীবের ওপরও যেন বেশী বেশী যত্ন। পরাণের মা বুড়ীকে কি করে না বাঁচালেন! ডাক্তারের এমন যশ কোথাও আর শুনিনি।"

শুনিতে শুনিতে শোকার্ত্তা অমলা স-নিশ্বাসে একবার ভাবিল তাহারই মূর্খতার দোষে ডাক্তারের অমন শুভ্র যশে এই একটা কালির দাগ পড়িল। তাঁহার এই আট দশ দিনের অক্লান্ত চেষ্টাকে এইরূপ বোকামির দ্বারা পণ্ড করিয়া দেওয়ায় ডাক্তার তাহাদের উপর নিশ্চয় বিরক্তও হইয়া উঠিয়াছে।

যথাকালে সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধার পর রমেনের মাতা অমলাদের বলিলেন "তোমাদের এইবার দিন দুইয়ের জন্য আমার বাড়ী যেতে হবে মা। রাজেন বাড়ীটাকে ভাল করে ধুইয়ে দেবে।"

বৃদ্ধা বাধা দিল "আমাদের আবার কি হবে বাছা, আমাদের যা হবার হোক্, আমরা তোমার বাড়ী কেন যাব এই কাল রোগের পর!"

"সে এ গ্রামের কোন্ ঘরে বা নেই? আমার যাকে নিয়ে সংসার সে-ই-ই কি করে বেড়ায় রাত দিন দেখছ ত?"

"কার জন্য তবে ঘর—দোরের ছোঁয়াচ্ বাঁচাব? আর তোমার জন্য তো নয়, ঐ ছেলে মেয়ে ক'টাকে তো ভাল রাখার চেষ্টা করতে হবে।"

বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ভাগ্য ছাড়া পথ নেই, যা ভাল বোঝ কর বাছা।"

অমলারা রমেনের মার বাড়ী গিয়াছে, তাহাদের বাড়ী টুকু যথারীতি ধৌত হইয়া একটা দিন শুখাইতেছে ইতিমধ্যে উন্মাদের মত রমেন রাজেন্দ্রের নিকটে গিয়া ডাকিল "এইবার আমার ওপর রাক্ষসীর 'বার্' পড়েছে, এস ভাই এইবার আমার ভাগ্যের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে।"

সাতঙ্কে রাজেন্দ্র রমেনের প্রতি চাহিয়া রহিল মাত্র একটা প্রশ্ন করিতেও পারিল না। রমেনই তাহাকে বুঝাইয়া দিল "বুঝতে পারছ না—আমার মার ব্যারাম হয়েছে।"

আবার জীবন যুদ্ধ চলিল। ডাক্তার অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল এ যুদ্ধ-টুকুরও হয়ত বেশী সময় পাওয়া যাইবে না এবং অবশেষে বুঝি এ যুদ্ধেও পরাজয় অনিবার্য্য।

পরের বিপদে এতদিন দিনরাত খাটিয়া রমেনের নিজের বেলায় এইবার তাহার ঘাড় ভাঙিয়া পড়িল। মাতার সেবা কিম্বা ডাক্তারের সাহায্য কিছুই সে করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না প্রথম হইতেই ঘোর হতাশায় অবসন্ন হইয়া সে শুইয়া পড়িয়া রহিল। রাজেন্দ্র কোন মতেই তাহাকে প্রবোধ দিয়া উঠিতে পারিল না।

রুগ্নার অবিরত শুশ্রূষা এবং ডাক্তারের সাহায্য করিতে একমাত্র অমলাই তাহার সঙ্গী রহিল। বৃদ্ধা দিদিমা ও নাতি নাতনি দুইটাকে কাছে টানিয়া লইয়া কেবল অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, কেন তাহাদের মত অলক্ষণাকে রমেনের মা নিজের বাড়ীতে টানিয়া আনিয়া এই বিপদ ঘটাইলেন। বৃদ্ধা লজ্জায় দুঃখে রমেন বা ডাক্তার কাহারো সম্মুখে আসিতে পারিতেছিল না।

দ্বিপ্রহরে স্নানাহারের জন্য রজেন্দ্র রমেনকে টানিয়া তুলিতে গেল রমেন উঠিল না উপরন্তু তিরস্কার করিয়া উঠিল "আমার মা চলে যাচ্ছে আমি এখন তোমার বাড়ী খেতে যাব?"

"আমার সঙ্গে না যাও বাড়ীতেই উঠে সেটুকু সার।"

"সে হবে যখন হয়, তুমি তোমার যা করবার করে এস।"

রাজেন্দ্র অমলার পানে চাহিয়া বলিল "এর কি উপায় হয়? বাড়ীতে এ ব্যবস্থা কি করতে পারবেন? আপনার একদণ্ডও রোগীর কাছ থেকে তো নড়া হবে না, তাহলে রমেন টুনি মনি এদের খাওয়া—"

"দিদিমাকে দিয়ে এক বগনো ভাতে ভাত এদের জন্য নামিয়ে দেওয়াই।"

"তাই করুন। আমি সে সময় টুকু মার কাছে থাকি, আপনি উঠে এইটুকুর ব্যবস্থা করে আসুন।"

অমলা উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "আপনিও এইবার যান।"

"যাই, রমেন স্নানটাও তো করে নিতে হবে—ঘাটে চল।"

"বাড়ীর কুয়ার জলেই স্নান করব আজ,—তুমি যাও।"

"আপনি আর একটু বসুন" বলিয়া অমলা ডাক্তারকে অনুরোধ করিয়া আবার একবার উঠিয়া গেল এবং তখনি ফিরিয়া আসিয়া বলিল "কুয়ার জলেই স্নান সেরে নাও তবে।"

"জল ঠিক্ হয়ে গেছে, আর দেরী কেন রমেন ওঠো।"

ঘোর বিরক্তির সঙ্গে রমেন রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমরা আমায় নিয়ে এরকম করছ কেন? যে সময়টা আমার দিকে দিয়ে অপব্যয় করছ সে সময়টা রোগীর দিকে দাও। আমি কি রোগী?"

"তারও বেশী—তুমি শোকী—তুমি আর্ত্ত। ওঠো ভাই!"

"না।"

রাজেন্দ্র নিরুপায় ভাবে অমলার পানে চাহিল। এই মহৎ হৃদয় বলিষ্ঠ যুবকেরও আজ অসংযত বালকের মত দশা দেখিয়া ডাক্তারের চোখে বুঝি জল আসিয়া পড়িতেছিল। অমলা রমেনের দিকে অগ্রসর হইয়া যোড় হাতে তাহার পানে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আমাদের জন্যও অন্ততঃ এটুকু কর,—তুমিও আর সাজা দিও না।"

নিঃশব্দে আর বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া রমেন উঠিয়া গেল। চোখের জল মুছিয়া অমলা ডাক্তারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিয়া বলিল "এইবার আপনিও যান।"

যাই, আপনি রমেনকে একটু সাহস দেন নৈলে ওকে নিয়ে ভারি মুস্কিল হবে দেখ্‌ছি। কি যে করবে ও আমি তো ভেবে পাই না।"

অমলা সঙ্কোচে বলিল "আমাকে সাহস দিতে বলছেন? কাদের জন্য ওঁর এরকম বিপদ ঘট্‌ল? আমাদের এ বাড়ী না আন্‌লে জ্যাঠাইমার এ ব্যারাম কখনই হত না।"

ডাক্তার শান্ত গম্ভীর মুখে বলিল "এরকম অন্ধ-বিশ্বাসে নিজের অন্তরকে অনর্থক বিষাদগ্রস্ত করবেন না। আপনার খুড়িমার সম্বন্ধেও আপনার এই রকম ক্ষোভ আছে জানি, কিন্তু জান্‌বেন তাঁর রোগের এ রকম আশঙ্কা বরাবরই ছিল, ও অত্যাচারটুকুর উপলক্ষ্য না পেলেও আবার তা ঘুরন্ত বলেই আমার বিশ্বাস। আর এক্ষেত্রেও নিজেদের দায়ী মনে করে কষ্ট পাবেন না। এ রোগের বীজ এ

গ্রামের জলে স্থলে সর্ব্ব বস্তুতে সর্ব্ব ঘরেই প্রায় ছড়িয়ে আছে। সময় মত সর্ব্বত্রেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

আর একবার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া চিন্তিত ভাবেই ডাক্তার চলিয়া গেল। বলিয়া গেল "নিজেদের স্নানাহারের প্রতিও উপেক্ষা করবেন না, মনে রাখবেন নিজে ঠিক থেকে রোগের সঙ্গে এখন আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। রমেন ফিরে এলে তাকে বসিয়ে রেখে আপনিও উঠবেন।"

সাশ্রুনেত্রে মাথা হেঁট করিয়া অমলা মৃদুস্বরে বলিল "আচ্ছা।"

ডাক্তারের কথাগুলির মূল্য যে কতখানি তাহা সে নিজের অন্তরেই যেন অনুভব করিতেছিল। শোকের মত শান্ত বিমল বস্তুকেও যাহাতে গ্লানিতে ডুবাইয়া ধরে সেই তাহার আত্ম-অনুতাপও ডাক্তারের এই কথাগুলায় যেন ক্রমশঃ মিলাইয়া গিয়া তাহার অন্তরকে শান্তশীতল করিয়া তুলিতে লাগিল।

ডাক্তরকে শীঘ্রই আবার রোগিণীর অবস্থা বুঝিতে আসিতে হইল। আসিয়া দেখিল রমেন যেন অনেকটা আশান্বিত ভাবে মাতার নিকটে গিয়া বসিয়াছে, নিঃশব্দে অমলার সাহায্য করিতেছে। ডাক্তার একটু আনন্দের সহিতই বলিয়া উঠিল "এই যে—যাক্" তার পরে অমলার পানে চাহিয়া বলিল, "আমি তো আপনাকে বলেই ছিলাম—আপনি একটু জোর দিলেই রমেন বল পাবে।"

ডাক্তারের এই কথায় অমলা একটু কুণ্ঠা বোধ করিলেও বিরক্ত হইতে পারিল না, কেননা ডাক্তার যে রমেনের বড় ভাইয়েরও বেশী হইয়াছে তাহা সেও জানিত। তাহাদের পক্ষেও তিনি আত্মীয়ের অধিক উপকারী কাজেই তাঁহার এরকম ঘনিষ্ঠ ভাবের কথা কহিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিয়া তাহার মনে হইল।

রুগ্না রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "আবার এখনি ছুটে এসেছিস্ বাছা? আমাদের মত জীবনের জন্য কি অত করতে আছে! আমি এখন ভালই তো আছি খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোও গে।"

রাজেন্দ্র তাঁহার শয্যার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল "আপনাকে দেখ্‌তেই তো কেবল বেরুইনি মা, এখনি আর ২।৪ জায়গায়ও যেতে হবে, আপনাকে একটু দেখে নিয়ে তবে বেরুব।" তার পরে অমলার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "কেমন বুঝ্‌ছেন?"

ম্লান মুখে অমলা উত্তর করিল "এক ভাবই তো চল্‌ছে নয় কি রমেন দাদা?"

রমেন এতক্ষণ মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল এইবার মৃদুস্বরে বলিল "আমার চেয়ে তুমিই সেটা ভাল বল্‌তে পারবে।"

ডাক্তার তখন রুগ্নাকে দুই চারিটা প্রশ্ন করিতে করিতে তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল দেখিয়া রমেন মৃদুস্বরে অমলাকে বলিল "এই সময়টা তুমি একটু উঠ্‌বে কি?"

অমলা নিঃশব্দে তাহাকে বুঝাইয়া দিল "একটু পরে।"

ডাক্তার ক্ষণপরে ভাল করিয়া যেন খানিকটা স্থায়ী ভাবে বসার মত করিয়া বসিয়া রমেনকে বলিল "বড় রৌদ্র ঘণ্টাখানেক পরেই বেরুব, এইখানেই একটু জিরিয়ে যাই মাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে—কেমন?"

রমেন তাহার পানে চাহিয়া এতক্ষণ কথা কহিল "কিন্তু এবাড়ীর বিছানায় তোমার শোওয়া তো উচিত হবে না, নৈলে—"

রাজেন্দ্র বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল "কি আশ্চর্য্য! ঘোড়ারা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ঘুমোয় না?" তাহার পরে অমলার দিকে ফিরিয়া বলিল "টুনি মণি দিদিমা এঁদের খাওয়া হয়েছে?"

অমলা ঘাড় নাড়িল।

"কিন্তু আপনি তো স্নানও করেন নি দেখ্‌ছি।"

অমলা উত্তর দিল না। রুগ্না এইবার সচকিতে অমলার পানে চাহিয়া বলিলেন "তাই কি? আঃ আমার কপাল তা যে বুঝ্‌তেও পারিনি। রমেন তুই কেন ওঠাস্‌নি জোর করে?" রমেন নিঃশব্দে রহিল। রুগ্না নিজেই আবার বলিলেন "তার কি উপায়ই ছিল, কেবলই যে দরকার হচ্চে বেলা—"

ডাক্তার তাঁহার বক্তব্যকে অগ্রসর করিয়া দিল "তিনটা বাজে।"

অমলা আর একথাকে বাড়িতে না দিয়া নীরবে উঠিয়া

গেল। তাহার আর ঘণ্টা আন্দাজ অনুপস্থিতির মধ্যেই রমেনের মাতা অস্থির হইয়া উঠিলেন, পুত্রের শুশ্রূষা এবং রাজেন্দ্রের যত্নে কিছুতেই তাহার সে চাঞ্চল্য নিবারণ হইতেছে না দেখিয়া অগত্যা রাজেন্দ্র অমলাকে ডাকিল "আপনি আসুন। আমাদেরই ভুল, আপনাকে স্নানাহার গুলো বাদই দিতে হবে দেখছি। মা বড় ছটফট করছেন, আমরা আছি বলে একটুও দেরী করবেন না, শীঘ্র আসুন।"

অমলা শীঘ্রই আসিল। তাহাকে নিকটে পাইয়াই উচ্ছ্বসিত আবেগে রোগিণী তাহার হাত ধরিয়া আর্তকণ্ঠে প্রায় কাঁদিয়া উঠিলেন "মা গো, তোর হাতেই ভগবান আমার শেষ সময়ের সব পাওনা যখন গচ্ছিত রেখেছেন তখন কেন সে সব সু ব্যবস্থায় পেতে দিলেন না আমায়? কেন তোকে আমি পেলাম না মা? তাহলে যে আজ আমার কোন ভাবনা থাকত না। আজ যে আমি বড় নিশ্চিন্তিতে—বড সুখে চোখ বুজতাম।"

রুগ্নার এই আর্তনাদে পরিচর্যাকারীরা ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। রাজেন্দ্র—"স্থির হোন, স্থির হোন অত জোরে না" বলিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া তাঁহার উত্তেজনা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল—"তোরাই স্থির হ বাছা আমায় দুটো কথা কইতে দে। এর পর যদি আর কথা না-ই কইতে পারি, তখন কি গোঁ গোঁ করতে করতে মরব? যা আমার মনে আস্ছে এখন বল্‌তে দে।"

"না জেঠাইমা, তোমার অসুখ বেড়ে যাবে চুপ কর তুমি, তোমার—"

অমলার এই কাতরোক্তিতেও বাধা দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "অসুখে আমার ভয় কি বল দেখি? আজ যে আমার কত সুখের মৃত্যু হত যদি রমেনকে ঘরবাসী করে রেখে যেতে পার্‌তাম; তোমার হাতে তাকে দিয়ে যেতে পার্‌তাম! এখন তার কি হবে কে তাকে দেখবে—"

ডাক্তার এইবার ডাক্তারোচিত পদ লইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল "আপনি যদি সুস্থির না হন না চুপ করেন তাহা হইলে এখনি ওঁকে এ ঘর থেকে উঠে যেতে হবে। আর একটি কথাও যদি ক'ন এখনি ওঁকে উঠ্‌তে হবে—জেনে রাখুন।"

রোগিণী অগত্যা চুপ্ করিলেন কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুস্রোত বহিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। রমেন ও অমলা নিঃশব্দে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল এবং ডাক্তারও নীরবে তাঁহার এই উচ্ছ্বাস নিবৃত্তির অপেক্ষা করিতে লাগিল, একবার নাড়িটা পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের পরিবর্তন করিয়া যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য শুশ্রূষারও যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আমি তা'হলে এখন ঘুরে আসি খানিক। আপনি এখন আর বেশী ভাববেন না, আপনার এমন কিছু হয়নি যে ওসব ভাবতে হবে। সেরে উঠে—"

রুগ্না মৃদুস্বরে বলিলেন "ওসব ভাবনা যে আমার জপমালা, তুমি তো সে সব জাননা বাবা। আজ আমার রমেন কি এমনি সন্নিসি হয়ে থাকত? সে যে কি দুঃখে—"

রমেন এইবার অস্থির হইয়া উঠিয়া মাতার মুখে নিজের হাতখানা প্রায় চাপা দিয়াই ফেলিল "মা চুপ কর—চুপ কর, অমন যদি করবে—তুমি ভাল হবে উঠ্‌বে মা—কেন অমন বক্‌ছ"—বলিতে বলিতে রমেন প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল। মাতা তখন গলদশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠ পুত্রকে প্রায় বুকের কাছে টানিয়া লইয়াই বলিলেন "না বাবা না আর বক্‌ব না—এই চুপ কর্‌ছি।"

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া টুনি মণি ও দিদিমার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া চলিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে অমলাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। অমলা ম্লান মুখে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া বলিল "জ্যাঠাইমাকে এবেলা কি ভাল বোধ হচ্চে আপনার?"

"ভাল? না ভাল এমন কিছু তো বুঝছি না।"

"মন্দ?"

ডাক্তার প্রথমটা উত্তর দিল না, তাহার পরে মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "দেখুন যারা রোগীর সেবার ভার নেন্ তাঁদের

এসব এত খুঁটিয়ে জান্‌বার দরকার করে না। কর্‌লে হয়ত রোগীর সেবার পক্ষে কিছু ত্রুটীই হয়ে যায়। একটা উৎসাহ না থাক্‌লে কোন কাজই সুচারু রকমে ঘটে ওঠে না। সে উৎসাহ সর্ব্বদা ধরে রাখার চেষ্টা করাই উচিৎ। ভাল মন্দর চিন্তাটা ডাক্তারের ওপর দিয়ে—”

অমলা প্রায় কান্নার সঙ্গেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল “আমি বুঝ্‌তে পারছি জ্যাঠাইমার বিকার হয়েছে, আর উনি বাঁচ্‌বেন না।”

ডাক্তার একটুখানি অনিমেষ চোখে অমলার পানে চাহিয়া লইয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল “বেশী কথা কইছেন বটে কিন্তু এখনো সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়নি, জ্ঞানেরও কোন বৈলক্ষণ হয়নি।”

“হয়েছে বৈকি, ওঁর স্বভাব তো আপনি বেশী জানেন না, আমরা বেশ বুঝ্‌ছি ওঁর মাথার ঠিক্ নেই।”

“তাহাই যদি হয় বিকারও তো কেটে থাকে, এতে এখনি অত নিরাশাস হবেন না। রোগীর কাছে যান্, এখনি উনি আপনাকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।”

অমলা চোখ মুছিতে মুছিতে সেইদিকে গেল, ডাক্তারও বিমনা ভাবে নিজ কর্ত্তব্যে চলিল।

দিন দুই মাত্র ডাক্তার প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ও অন্য কর্ত্তব্য নামে মাত্র রক্ষা করিয়া রমেনের মাতাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ব্যারাম হওয়ার পরে চারি দিনের দিন প্রভাতে রমেনের মাতা প্রাণত্যাগ করিলেন।

শোকে জড়প্রায় রমেনের দ্বারা পুত্রকৃত্য সমস্ত সম্পাদন করাইয়া লইয়া ডাক্তার তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল “আজ থেকে আমিও ডাক্তারী ছেড়ে দিলাম রমেন, এ নিষ্ফল চেষ্টা আর করব না। তোমার কাছেই আমায় দিন কয়েক জায়গা, দাও ভাই ডাক্তারি ভড়ংয়ের মধ্যে আর না; তারপরে নিজের বুজরুকির পাট্ তুলে নিয়ে—”

রমেন ধীরে ধীরে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল “এ গ্রাম থেকে চলে যাবে? আমার জন্য গ্রামের এত বড় ক্ষতি এ কি কেউ করতে দিতে পারে? চল তোমার কাছেই আমি থাকি কিছুদিন। মা-হারা এ বাড়ী আমি সহ্য করতে পারছি না। ওঁরাও আমার জন্য বিব্রত হয়ে নিজেদের বাড়ী যেতে পাচ্চেন না—আমায় তুমিই নিয়ে চল তোমার কাছে।”

“তাই চল—কিন্তু ডাক্তারি করতে আর অনুরোধ কর না—আমার শপথ।”

সমবেদনার স্নিগ্ধ প্রলেপে জগতের তীব্রতম ব্যথারও বোধ হয় কিছু শমতা হয়, রমেনও ক্ষণেকের জন্য তাহা যেন অনুভব করিল।

কান্নার অবকাশ

[শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ]

অবাধে আজ কাঁদ্‌তে শুধু
　　একটুকু চাই অবকাশ,
করতে তরল বুকের বোঝা—
　　ফেলতে সজল দীর্ঘশ্বাস।
গুম্‌রে উঠে প্রাণের ভিতর
বুকের মাঝে ঠেকছে ফাঁপর।
প্রাণটা ভরে’ কাঁদতে পেলে
　　আলগা হবে হিয়ার ফাঁস

কান্না চেপে চলতে যে হয়
　　কপাল এমনি-রে মন্দ,
একটু খানি কাঁদার বিলাস
　　চাইরে কাঁদার আনন্দ।
বিশ্বজনারণ্যেরে ভাই
নির্জ্জনতা একটুকু চাই
অশ্রুপাতে আঁখির ঘুচাই
　　নির্জ্জলা এই উপবাস।

প্রেত-তত্ত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি-এ]

(৪)

আসন্ন মরণের পূর্ব্বে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

একটা প্রবাদ আছে মৃত্যুর একটু পূর্ব্বেই অনেক মানুষের অনুভূতি শক্তিগুলি খুব প্রখরতা লাভ করে। এবং তাহার ফলে উহারা মৃত্যুর আগে অনেক দেহমুক্ত আত্মীয় স্বজনের প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পায়। এরূপ মৃত্যুকে meeting case বলে। প্রবাদ যে এই সব আত্মীয় স্বজন আসন্ন মরণ ব্যক্তিকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্যে আসে।

(৪ ক) কর্ণেল বি-বর্ণিত ঘটনা :—কর্ণেলের পত্নী শ্রীমতী বি-কুমারী সি-নাম্নী এক গায়িকাকে নিজ কন্যাদের সঙ্গীত শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করিবার মনস্থ করেন। কিন্তু কুমারীর একাজ করা হইলনা, তার কারণ তিনি এক ভদ্র লোককে বিবাহ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

ছয় সাত বছর পরে শ্রীমতী বি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হন। সে সময়ে তাঁহার স্বামী কর্ণেল বি—ছাড়া কাছে কেহ ছিলনা। শ্রীমতী স্বামীকে বলেন—"সমস্ত দিন ধরে শুনছি, কারা যেন আশে পাশে গান করছে; এদের মধ্যে একজনের গলা যেন চিন্‌তে পারছি কিন্তু কার যে মনে হচ্ছেনা—।" খানিক পরে শ্রীমতী হঠাৎ থামিয়া বলিলেন —"ওই দেখ ওই কোণে বসে আছে, ও যে কুমারী সি জুলিয়া ও এগিয়ে আসছে; তোমার উপর হেঁট হয়েছে—ওর হাত দুটী উঁচুতে তোলা—ও বুঝি উপাসনা করছে—ঐ দেখ—চলে যাচ্ছে—" কর্ণেল কিছুই অবশ্য দেখিতে পান নাই। শ্রীমতি আবার বলিলেন—"চলে গিয়েছে—"। কর্ণেল এসব উক্তিতে মরনাপন্নের বিকার প্রলাপ ভাবিয়া চুপ করিয়া ছিলেন। দুই দিন পরে কর্ণেল টাইম্‌স পত্রিকায় জুলিয়ার মৃত্যুর সংবাদ পড়েন। সমাধির পর আমি জুলিয়ার (কুমারী সি—) বাপের কাছে গিয়া তার খবর জিজ্ঞাসা করি। ভদ্রলোক বলিলেন—"হায়! জুলিয়া সূতিকা জ্বরে মারা গিয়াছে। মৃত্যুর দিন সে অনবরত গান করিয়াছিল—এবং গাইতে গাইতে মারা যায়—।"

(৪ খ) ডাঃ মিনো স্যাভেজ রচিত *Psychic facts and Theories* হইতে সংগৃহীত :—"দুটী ছোট মেয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই এক বিদ্যালয়ে পড়িত। উভয়ের বয়স আন্দাজ আট বৎসর। উভয়েই ডিপথিরিয়া রোগে পড়ে। বুধবার দুপুর বেলা 'জেনি' মারা যায়। জেনির বন্ধু এডিথ ও মৃত্যু শয্যায়। এডিথের বাপ মা জেনির মৃত্যু খবর তাহাকে দেয়না, পাছে এডিথ শোকের ধাক্কা পায়। যাই হোক এডিথ্ এ খবর পায় নাই; তার প্রমাণ মৃত্যুর আগে সে নিজের দুটি ফটো বাহির করিয়া জেনিকে দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেই দিন সন্ধ্যার সময় এডিথ মারা যায়। মারা যাইবার একটু আগেই এডিথ্ বলিয়া উঠিল—"বাবা আমি জেনিকে সঙ্গে নিয়ে যাব—তুমি আমাকে বলনি জেনি এখানে এসেছে?" বলিয়াই সে জেনিকে আহ্বান করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল এবং বলিল—"জেনি তুমি এসেছ আমি ভারি খুসী হয়েছি—!"

(৪ গ) শ্রীযুৎ এম, এন বর্ণিত ঘটনা :—এম্, এন্ চিৎতত্ত্ব সভার সহিত জানিত ও পরিচিত। মিডিয়ম শ্রীমতি পাইপারকে লইয়া যে সব পরীক্ষা চালিত হয়, তাহাতে ইনি উপস্থিত থাকিতেন, এবং সাক্ষাৎ ভাবে এই অনুসন্ধান কাজে সহায়তা করিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাঁহারি পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত। সে সময় ফিনিউট নামধারী প্রেতাত্মা শ্রীমতি পাইপারের ভর হইতেন। ১৮৮৮—এই

এপ্রেল এই তর অবস্থায় শ্রীযুৎ এম্, এন্ তথায় উপস্থিত থাকেন। সহসা 'ফিনিটু' তাহাকে বলিলেন—"মাস দেড়েকের মধ্যেই আপনার এক নিকট আত্মীয় মারা যাইবেন; তাহার মৃত্যু ফলে আপনার আর্থিক কিছু লাভ হবে।" কে এই আত্মীয় জিজ্ঞাসা করায় কোনো উত্তর পাইলাম না; তবে আন্দাজ করিলাম বোধ হয় বা আমার পিতা, কেননা তখন তিনি খুব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আমার পত্নী (তখন বিবাহ হয় নাই, সম্বন্ধ হইতেছে মাত্র) এ সম্বন্ধে ফিনিটুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন, 'নিকটাত্মীয়' আর কেহ নহেন, আমার পিতা জীবিত কালে যে উইল করেন তাহাতে আমার প্রতি একটু অবিচার ছিল। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পর আর একদিন ফিনিটু আমায় বলিলেন—"তোমার প্রতি উইলে যে অবিচার হইয়াছে তাহার জন্য আমি তাঁকে বিশেষ করে বল্‌বো তোমায় সুবিধে করে দেবার জন্য।"

যে মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাবা হঠাৎ হার্টফেল্ করে মারা যান। আমরা কেউ তা আশা করিনি কেননা, ডাক্তার সেই দিনই সকালে বলে যান—"আর বিপদ নাই ভয় কেটে গেছে।" ত্রদিন পরে তারে খবর পেলাম। আমরা স্ত্রীপুরুষে আবার মিসেস্ পাইপায়ের কাছে যাই। শ্রীমতির ভর অবস্থা হইলে 'ফিনিটু' বলিলেন—"তোমার বাবা এখানে (এ জগতে) এসেছেন আমি তাঁকে তাঁর রোগ শয্যাতেই মরবার আগে তোমার উইল সম্বন্ধে সুবিধা করতে খুব অনুরোধ করেছিলাম। উইলে এমনি ব্যবস্থা হয়েছিল—অমুক তার প্রধান একজিকিউটার; তোমার বাবা বলেছেন উক্ত এক্‌জিকিউটার তোমার পক্ষে একটু সুবিধে করে দেবেন, তবে যদি বাকী দুজন একজিকিউটার তাতে রাজী হন। ইংলণ্ডে—লণ্ডনে ফিরে গেলে সব ঠিক হবে—।"

তিন সপ্তাহ পরে বিলাতে ফিরে আসি। আসিয়া দেখি উইলের প্রধান এক্‌জিকিউটার সেই ব্যক্তি যার নাম ফিনিট্ করেছিলেন। উইলের ব্যবস্থাও ঠিক ফিনিট্ যেমন বলেছিলেন; আর সব একজিউটারই এক মত হইয়া উইল আমার সুবিধা অনুসারে বদলানো হইল।

শুধু তাই নয় আশ্চর্য্যতম ঘটনা এইটী যে, পিতার মৃত্যু শয্যায় 'ফিনিটের' আসা, মুমূর্ষু পিতাকে দেখা দেওয়া তাও সত্য, কেননা আমার যে ভগ্নী অন্তিম সময়ে কাছে ছিল সেই বলিল বাবা নাকি অনবরত বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন,—"কে ও বুড়ো লোকটা কেবল আমার বিষয় সম্পত্তির কথা নিয়ে জ্বালাতন করছে!"

এই জাতীয় প্রেতালাপ ঘটনার একটা বিশেষ মূল্য আছে। উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারীর পিতা যে মৃত্যু কালে বিকার-ঝোঁকে খেয়াল দেখেন নাই, বরংচ সত্যই এক সূক্ষ্মদেহী প্রেতকে দেখিয়াছিলেন তার প্রমান বহু দূরে আমেরিকায় অন্যরূপে পাওয়া গেল। আর ফিনিট নামধারী প্রেত যে সত্যই একজন স্বতন্ত্র চৈতন্য যুক্ত অশরীর কেহ—মিডিয়মের নিজ সুপ্ত চৈতন্য নহে তাহারও প্রমাণ ইংলণ্ডে এক জনের মৃত্যু শয্যায় পাওয়া গেল।

অনেকের এরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে; অনেকে এরূপ শুনিয়াছেনও; মরণাপন্ন লোক মাত্রেই যে বিকারে খেয়াল দেখে তাহা নহে। সত্যই উহারা পরলোক হইতে আগত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের আত্মাকে দেখে। বিদেহ আত্মারাই বলেন, যে নূতন পরলোক যাত্রীরা মরনান্তেই বুঝিতে পারেনা যে তাহাদের দেহান্তর হইয়াছে; বুঝিলেও বিশ্বাস করিতে চায় না এবং বাসনারূপ আসক্তি-বদ্ধ হইয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাহেনা। এসব কথা বিশ্বাস করা না করা প্রমাণ-লব্ধ নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে; সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক।

(৫) মরণান্ত দূরদর্শন

মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিদেহাবস্থায় সজ্ঞানে অবস্থান করিয়া যে এই দূরদর্শন শক্তির পরিচয় দেয় তাহারও প্রমাণ আছে। আত্মার পরলোকের জীবন প্রণালী বিচার করিলে বুঝা যায়, এই দূরদর্শন শক্তি তাহার তাহার পক্ষে আর অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নহে। পরন্তু এটা তাহার নবজীবনেরই স্বভাব-ধর্ম্ম। এরূপ জ্ঞানশক্তির অনেক প্রামাণিক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এসব দূরদর্শন যে বিদেহ আত্মারই কৃত তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে, কথিত আত্মার দেহকালীন আত্মত্ব (identity) আগে প্রমাণ করিতে হইবে।

সুতরাং পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রেতদিগের স্বতন্ত্র সজ্ঞান বিদ্যেমানত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ আছে তাহার আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

(৬) অন্যান্য ধরনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

অতীন্দ্রিয় উপায়ে বস্তু দর্শন ছাড়া শব্দ শ্রবণের শক্তিও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। কাচ দর্পণে দূরদর্শন শক্তির দৃষ্টান্ত কুমারী "—" নাম্নী মহিলার কার্য্যে দেখা গিয়াছে। ইহার অতীন্দ্রিয়ভাবে শ্রবণ করিবারও শক্তি ছিল। নিম্নে তাহার এক দৃষ্টান্ত দিতেছি :—শনিবার জুন ১১ই শ্রীযুৎ স্মিথ ও আমরা ভাব চালনা ও মন-পড়া (thought reading) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। এই সময় মিঃ স্মিথ কয়েক মাইল দূরস্থ এক স্থান হইতে তাঁহার পাহাড় বেড়ানোর বর্ণনা করিতেছিলেন আর আমি একটা shell (শামুকের খোলা, শাঁখের মত কিছু হইবে) কানে দিয়া তাহা শুনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ মিঃ স্মিথকে বলিতে শুনিলাম "তুমি কি নিরামিষভোজী ?" এ কথাটার মানে বুঝিলাম না। স্মিথ বাড়ী ফিরিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন— ঠিক শুনিয়াছেন যখন পাহাড় বেড়ানোর কথা বলিতেছিলাম তখন এক বন্ধু আসিয়া হোটেলে খানার কথা কি বলিতেছিলেন, আমিও অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করি "তুমি কি নিরামিষ ভোজী ?"

সজাগ অবস্থায় দূর-দর্শনের দৃষ্টান্তচ্ছলে লর্ড হে'র পুত্রবধূর উচ্চারিত যে কথা কয়টী অন্য স্থানে থাকিয়া লর্ড হে শুনিতে পান উহাও সজাগ অবস্থায় দূর শ্রবণের দৃষ্টান্ত বটে।

আর একপ্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দৃষ্টান্ত খুব বহুল পরিমাণে ইংলণ্ড হইতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের কোনো কোনো প্রদেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা অজ্ঞাত উপায়ে মাটীর গভীর নীচে কোথায় জল আছে তাহার সন্ধান হাত চালিয়া বলিতে পারে। আমাদের দেশে অনেক মাল-সাপুড়েরা হাত চালিয়া কোথায় সাপ আছে বলিতে পারে—অনেকে এরকম সত্য দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। ইংলণ্ডের এই 'জল' বলার লোকেরা ঐ শ্রেণীর। এই সব লোকের আশ্চর্য্যশক্তি সম্বন্ধে অনেক পুস্তকে বিশ্বাস যোগ্য বিবরণ আছে, তা ছাড়া অনেক লোকে ইহাদের কাণ্ড দেখিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহারা (এই জল-দৈবজ্ঞরা) একটা গাছের ডাল লইয়া একটা স্থানে চলাচল করে, যেখানে জল আছে সেইখানে আসিলেই তাহাদের হাত জোরে কাঁপিতে থাকে এবং গাছের ডালটা অদৃশ্যশক্তি বলে বাকিয়া যায় তখন খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে সেখানে প্রচুর ভাল জলের আধার আছে। অনেক দক্ষ ভূতত্ত্ববিৎও এই জল নির্ণয়ে হারিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই জল-দৈবজ্ঞরা কদাপি ভুল করে না।

বিশ্বস্ত লোকের মুখে এইসব শুনিয়া চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতি বিজ্ঞানাচার্য্য ব্যারেটকে এই তত্ত্ব তদন্তের ভার দেন। আচার্য্য নিজে প্রথম এগুলা প্রথমে জুয়াচুরী বা প্রবঞ্চনা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পরে নিজে উপস্থিত থাকিয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত জল দৈবজ্ঞ আনিয়া ইহার বহুল পরীক্ষা করেন, ফলে তাঁহার ধারণা হইল এ শক্তিটা মিথ্যা বা প্রবঞ্চনামূলক নহে, সত্যই তাহাদের এ শক্তি আছে। তিনি তাঁহার তদন্ত রিপোর্ট উক্ত সভার ১৮৯৭ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন। তিনি বহু পরীক্ষার ফলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন:— (১) এই জল দৈবজ্ঞদের প্রকাশিত্ব শক্তি সত্য; তবে তাহাদের সংখ্যা খুব কম; এশক্তি জন্মগত; ইচ্ছা করিয়া বা অনুশীলনে হয় না। (২) জলের স্থানে আসিলে তাহাদের হাতের কাঠি বা ডালটা যে বাঁকিয়া যায় তাহাও সত্য; এবং এ বক্রতা এমন একটা উত্তেজনার ফল যাহার উপর তাহাদের স্বাধীনশক্তি নাই এবং হাতের যে স্বতঃ উত্তেজনা তাহাও নানাধরণে প্রকাশ পায় (৩) এ শক্তিটা অন্যান্য অলৌকিক অজ্ঞেয় চিৎশক্তির ক্রিয়ার মত—সম্ভবতঃ অজ্ঞাত জলের অতীন্দ্রিয় অনুভব হইতে ইহা হয়।

অনেক বড় বড় ভূতত্ত্ববিৎ স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া কোনো কারণই দিতে পারেন না, কিন্তু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এই জল জ্ঞান অভ্রান্ত বটে।

একটা দৃষ্টান্ত মাত্র দিতেছি। "স্বর্গীয় সার্ হেনরী হারবিন শাসেক্স প্রদেশে নিজের জমিদারী মধ্যে একটা বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নিকটেই একটা কূপ খনন করিতে ইচ্ছা করেন। একটা ৯০ ফিট্ গভীর কূপ কাটা হইল, কিন্তু জল পাওয়া গেল না। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত লইয়া তিনি অন্যত্র আর একটা কূপ খনন করান, ফল তেমনিই হইল। পরে আর একটা ১০০ ফিট্ গভীর কূপ খনন করাইলেন কিন্তু সেই ফল। বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের মত লইয়া তিনি প্রায় ১৫০০০ টাকা খরচ করিয়া ইহারই নানা দিকে শাখা খাল কাটাইলেন, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় বিফল মনোরথ হইলেন। অবশেষে হতাশ হইয়া কারো কারো পরামর্শে তিনি জন মুলীন নামক বিখ্যাত জল-দৈবজ্ঞের শরণাপন্ন হন। মুলীন তাহার কাঠি লইয়া সেই স্থানটার এখান ওখান চলা ফেরা করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ পরে একস্থানে আসিয়া কাঠিটা খুব কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁকিয়া গেল। মুলীন বলিল "এইখানে খুঁড়িতে হুকুম দেন, জল পাবেন।" কথানুসারে খনন করা হইল, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় ২০ ফিট্ নীচেই প্রচুর জলের সন্ধান পাওয়া গেল। আরো দুই স্থানে মুলীনের নির্দ্দেশানুসারে ভাল জল পাওয়া যায়।"

ওয়াটার ফোর্ড নামক জনপদে রিচার্ডসন কোম্পানী নামক একটা কারখানা এই মুলীনের সাহায্যে জলস্থান নির্ণয় করেন। ইতিপূর্ব্বে কোম্পানী বহুসহস্র অর্থব্যয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই।

আচার্য্য ব্যারেট রচিত Psychical Research গ্রন্থে দ্বাদশ অধ্যায়ে এরূপ অনেক প্রামাণিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

আচার্য্য ব্যারেট এই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টায় যাহা অনুমান করেন তাহার একটু আভাষ দিব। তিনি বলেন জল-দৈবজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে এ শক্তি বিদ্যুৎশক্তির প্রকারান্তর। আচার্য্য বলেন ইহা বাজে কথা। ইলেক্‌ট্রিসিটির সঙ্গে উহার সংযোগ নাই। তাঁহারা পরীক্ষা করে তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ডিন্ ওভেনডেন্ নামক এক গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্যক্তির এই শক্তি ছিল; তিনি বিদ্যুতের ক্রিয়া মানেন না, তিনি বলেন এক অজ্ঞেয়শক্তি বলে জলের এই অস্তিত্ব জানা যায়। অজ্ঞেয় শক্তিতো বটেই; তবে তার ধর্ম্মাধর্ম্ম বা জাতিটা কি? কোনো জড়শক্তি যে নয় তাহা স্থির সিদ্ধান্ত।

আচার্য্য নিজের মত এই দেন যে এ শক্তিটা সুপ্ত চিৎশক্তিরই কাজ। পূর্ব্বোক্ত দূরদর্শন, দূরশ্রবণ যে শক্তির ক্রিয়া ফল ইহা তাহাই। দৈবজ্ঞের subconscious গুপ্ত-চিৎশক্তি অজ্ঞেয় উপায়ে গভীর স্তর নিয়ে জলের সত্বা অনুভব করে; তাহার ব্যক্ত-চৈতন্য তাহা ধরিতে পারে না। ইহারাও একশ্রেণীর clairvoyant বা দিব্য দর্শী।

মোহাবস্থায় বা জাগ্রতাবস্থায় 'মিডিয়ম' যে শক্তি বলে অদৃশ্যদর্শন করে অশ্রাব্য শ্রবণ করে জলদৈবজ্ঞরাও সেই শক্তি বলে জলের অস্তিত্ব অনুভব করে; তবে দিব্যদর্শীরা যেমন বাস্তবরূপে দৃশ্যটাকে অনুভব করে, ইহারা তা পারে না। ফলে একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ যে এইসব নানাজাতীয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাহার আর ভুল নাই।

আমরা এক্ষণে এই শক্তির মূল কারণ অনুসন্ধান বা আন্দাজ করিবার জন্য গোটাকতক কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ দৃষ্টান্তেই চারটী তত্ত্ব বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে (১) দেহীর যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান তাহা সাধারণ উপায়ে লব্ধ নয় (২) আর এই জ্ঞান-মস্তিষ্ক-বিকার জনিত পূর্ব্বপ্রাপ্ত কোনো সাধারণ জ্ঞানের লুপ্ত বা সুপ্ত স্মৃতির প্রতিচ্ছায়া নয়—(৩) অপিচ এ জ্ঞান সসীম দেশ কালে আবদ্ধ নয়। (৪) চতুর্থতঃ কোনো জানিত নিকটস্থ ব্যক্তির জ্ঞানভাণ্ডার হতে টেলিপ্যাথী বলে সংগ্রহ করাও নয়।

এক কথায়—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সীমার বাহির হইতে অদৃশ্য অজ্ঞাত অথচ বাস্তব বিষয়ের জ্ঞানলাভ এই শক্তির বিশেষত্ব। ইহা হইতে এটী স্বতঃ সিদ্ধান্ত যে আমাদের চিন্ময় আত্মা জড়দেহের সঙ্গে কতকটা জড়িত হইলেও

সম্পূর্ণভাবে তাহার অধীন নয়। যদি ক্ষণিকের জন্যও উহা জড়াতিরিক্ত ভাবে কাজ করিতে পারে দেখি তাহা হইলে ধর্ম্মতঃ উহা জড়াতিরিক্ত হইয়া থাকিতেও পারে—আর না পারিলে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পারে না, আবার স্বাধীনভাবে কাজ করিতে না পারিলে জড়াতিরিক্ত ভাবে থাকিতেও পারে না।

এখন জ্বলন্ত প্রমান বলে যখন দেখিতেছি জীবের দেহাবস্থায় চিদাত্মা জড়াতিরিক্ত ভাবে কাজ করিতে পারিতেছে তখন মানিতেই হইবে উহা অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য দেহ-বিযুক্ত হইয়া থাকে; যদি ক্ষণিকের জন্যও তাহা সম্ভব হয়, তবে কিছু কালের জন্য,—হউক বৎসর বা যুগ বা অনন্তকাল—তাহা বিদেহাবস্থায় যে থাকিতে পারে তাহার অসম্ভবতা কোথায়?

এক্ষণে অতীন্দ্রিয় দূরদর্শন ব্যাপারের দুইটী কারণ নির্ণয় করা যায়; হয় প্রথমতঃ চিদাত্মা দেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্মশরীর যোগে দূরবর্ত্তী বস্তুর সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানলাভ করে, না হয় দ্বিতীয়তঃ দেহে বদ্ধ থাকিয়াই সূক্ষ্মতর আলোক তরঙ্গ ধরিয়া বস্তুর দৃষ্টিজ্ঞান লাভ করে। আলোক-বিজ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পারি যে এমন সব সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ইথর তরঙ্গ আছে যাহা আমাদের দর্শন-ইন্দ্রিয় সহজ অবস্থায় ধরিতে পারে না। একটা অসম্ভব মাত্রায় উত্তেজনাযুক্ত হইলে চক্ষু এই সব ultra এবং Infra আলোক রশ্মি ধরিতে হয়তো বা পারে। অনেক রোগীর রোগ-ফলে অনুভূতিশক্তি এত প্রবলতর হয় যে ইহা জানা কথা পরীক্ষিত সত্য।

এখন যদি প্রমাণ হয় অন্য উপায়ে যে জীবের চিন্ময় আত্মা মৃত্যুর পর সূক্ষ্মতম জড় নির্ম্মিত দেহ (আতিবাহিক দেহ) যোগে স্বাভাবিক জড়দেহ ছাড়িয়া যায় এবং তদবস্থায় কিছুকালও থাকে তবেই আমাদের নির্ণীত প্রথম কারণটী সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

আমরা অন্য এক প্রবন্ধে পাঠকবর্গকে জানাইব যে এরূপ অতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ আছে। তার আগে এ সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞানবিৎ দুই বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের মত তুলিয়া দিয়া বিদায় লইব।—

"Under certain condition the disembodied spirit is able to form for itself a visible body out of the emanation from living bodies in a proper magnetic relation to itself, and, under certain still more favourable conditions, this body can be made tangible."

(Wallace and Crookes.)

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর রসায়নাচার্য্য Crookes কর্ত্তৃক 'Katie king'এর প্রেতমূর্ত্তি লইয়া পরীক্ষার কথা উল্লেখযোগ্য। ফরাসী জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Baradone কর্ত্তৃক প্রেতের মূর্ত্তিধারণ পরীক্ষাগুলিও অবধান যোগ্য।

পণ্ডিতপ্রবর Huxleyও এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে analogy সাহায্যে সূক্ষ্মজড়দেহী জীবের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব কদাপি নয়।

এই প্রবন্ধের একস্থানে রুশদেশীয় ব্যারন ডন্ ড্রিসেনের দৃষ্টও স্পৃষ্ট তাঁহার শ্বশুরের প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব অন্যমতে ব্যাখ্যাত হয় না। অধিকাংশ মৃতব্যক্তির ধৃতছায়ামূর্ত্তিও এই মত ছাড়া অন্য উপায়ে ব্যাখ্যাত হয় না।

পাঠকের স্বাধীন মতামতের উপর ইহার তত্ত্ব ব্যাখ্যার ভার দিয়া প্রবন্ধান্তরে মন দেওয়া যাউক।

দুর্গাবাড়ীর মাঠ

(গাথা)

[শ্রীকালীপদ বাগচী ভারতী, সরস্বতী]

কর্ম্মবিপাকে যেতে হবে মোর দূরদেশ এক গ্রামে,
গিন্নীতো কাঁদি হ'লেন আকুল পল্লীগাঁয়ের নামে ;
হাজার যুক্তি শতেক তর্ক, তবুও মানেনা বোধ,
শেষে কহিলাম "টাকা পাবো কোথা ম্যাকবাবে
দিতে শোধ ?
ষষ্ঠীতলায় তিনবার গিয়ে—মানসিক করি কত,
গিন্নী তো শেষে বিদায় দিলেন—'দিব্যি' প্রদানি শত।

নামি কালনায় জামালপুরের বাজার বায়েতে বাপি,
দামোদরের পাড়েতে যখন, তখন ডাকিল পাখী !
প্রভাতে খুঁজিয়া বৃদ্ধ একটী লইনু করিয়া সাথে,
গিন্নীর শিব-সাধনার-ধন সঁপিনু তাঁহার হাতে ;
বৃদ্ধ চলিল বিজ্ঞের মত দেখায়ে গাঁয়ের পথ,
আমি পশ্চাতে ভাবিতে ভাবিতে গিন্নীর ফাঁদি নথ !

তপন তখন মাথার উপরে রাজার মতন কড়া,
কোন মহাপাপে শাস্তি বা দিতে, দহিতেছিলেন ধরা ;
পায়ের তলায় পুলিসের মত রাজার গরমে রেগে,
পথের ধুলাও দ্বিগুণ দহিছে, কখনও উড়িছে বেগে ?
ধু ধু করে মাঠ পল্লীর বাট, দূরে দূরে চড়ে ধেনু
শুধু তরুতলে সকরুণ রবে বাজে রাখালের বেণু ;
স্তব্ধ দুপুরে গ্রীষ্মের ডরে পাখী ভুলে গেছে গান,
তরু শাখে বসি প্রাজ্ঞের মত বাঁচাইতেছিল প্রাণ !

তেঁতুলের আড়ে শুধু ঘুঘু রব, দূরে তটিনীর স্বর,
ফটিকজলের করুণকণ্ঠ উঠিছে আকাশ পর।
সমুখে মোদের বিস্তৃতমাঠ পাষাণ সমান শুয়ে,
বৃদ্ধ কহিল "আসুন জিরুই গাছতলে সব থুয়ে।"—

শরীরও ক্লান্ত ছায়াও স্নিগ্ধ আমিও হইনু রাজী,
গিন্নীর এই মাথার রতন ধূলাতে লুটাল আজি ;

বসিতে শয়ন—শয়নে নিদ্রা বাঙ্গালীর বাঁধা পাঠ
বৃদ্ধ হঠাৎ কহিল "বাবু এ দুর্গাবাড়ীর মাঠ ;
চমকি উঠিনু ; স্বপ্নের মত আজো বেশ মনে আছে—
কিছুকাল আগে কে এর বারতা দিয়াছিল মোর কাছে
উৎসাহ ভরে সুধানু "ও বুড়ো জানকি ইহার কথা ?"
বৃদ্ধ কহিল "জানি বাবু শুধু বলিতে পাই যে ব্যথা।"
শিষ্যের মত নিকটে তাহার লইলাম আমি স্থান,
বৃদ্ধ গাহিল চারণের মত অতীতের সেই গান ;—

বেশীদিন নয় বছর বিশেক আগে, দামোদর নামে
বড় দরিদ্র, ছেলেদের নিয়ে বামুন ছিল এ গ্রামে।
বিঘে দশভুঁই, চালভরা পুঁই, গাই ছিল—ছিল দুধ,
(তবু) বছরের মাঝে কত বা উপোস কতবা খাইত খুদ !
তবু কোনদিন কারো দ্বারে গিয়ে পাতেনি বামুন হাত,
মহা আকালেও তার ঘরে দিন দশজনে পেতো ভাত
রোগ হ'লে কারো—ভুলিত বামুন দিনরাত নিজ ঘর,
তার মুখে কেহ কখনও শুনেনি এ আপন এই পর !

শরতে বামুন আপনি গড়িয়া ভাঙা তালপাত ঘরে,
মায়ের পূজাটী করিত তাও যে পরের শুভেরই তরে।
এদিকের যত কাঙাল গরীব বসাত সেখানে মেলা,
তিনদিন ভোর, বামুন কখনও করেনি কাহারে হেলা ;
তার নুনভাতে পেতো বুঝি সবে প্রসাদের মহাস্বাদ,
ভোজনের কালে আঙিনায় হ'ত জলধির কলনাদ !

পূজা শেষ হ'লে শান্তির জল মায়ের আশীষ লয়ে,
ফিরিত কাঙাল মাথায় মায়ের প্রসাদ কণিকা ব'য়ে ;
মাঠের ওপারে—আজো আছে রায় রাজেন্দ্র নামে রাজা,
নহবত, কত হাতী ঘোড়া ছিল—কাছারীর ঘড়ি বাজা !

সেবার এম্নি পূজার সময় দেশে এল এক জ্বর,
রোগের জ্বালায় সবাই কাতর বাঁকী নাই একঘর।
চাষ করে কেবা, তবু জমিদার খাজনা দিল না ছাড়ি,
জেলার সাহেবে বুঝাল "দেশের লোকগুলো
পাজী ভারি ?
খাজনা দেবার ভয়েতে সবাই ব্যারাম হয়েছে বলে।"—
সাহেব শুনিয়া পাঠাল পুলিশ ; পুলিশের পদতলে,
সকল ভিক্ষা হইল বিফল—ছাড়িল না এককড়ি,
ছেলে বৌ নিয়ে থানার ঘরেতে রাখিল সবারে ভরি'
যাহাছিল ঘরে বামনীর গায় বেচি' করি অনুরোধ,
বামুন গ্রামের সকল খাজনা করিদিল পরিশোধ !
জমিদার শুনি অগ্নিশর্ম্মা, কাছারী বসিয়া ভাবে,
নয়ন রক্ত করিয়া কহিল—"আচ্ছা এ দেখা যাবে ?"

আবার পূজার রজনী আসিল—বামুনের বাড়ী পূজা,
ঘরে বামুনের ছেলে বৌ মরে তবু গড়ে দশভূজা ;—
মহা আনন্দে দেয় ফুল পায়, নবমীর সাঁঝ রাতে
দাঁড়াল বামুন আরতি করিয়া ধুপের পাত্র হাতে !
হঠাৎ তাহার অন্তরে দেবী কহিল কাতরে ডাকি,
"আমি মরি ওরে জমিদার ঘরে, পূজা হ'ল
তোর ফাঁকি।
হ'লনা আরতি ছুটিল বামুন গাঁর দশজন সাথে,
ডাকিয়া বামুন কহিল "সকলে লাঠী নিয়ে এস হাতে।"—
প্রবেশি রাজার তোষাখানা মাঝে বিস্মিত সবে চায়,
সত্যই হেথা পশুপাষণ্ড রুদ্ধ করেছে মায়।

থামিল বৃদ্ধ ;—
চেয়ে দেখি তার নয়নে আগুন রেখা,
বৃদ্ধের আঁখি মাঠের মাঝারে সে ছবি পেয়েছে দেখা ;

বলিলাম—
"বল"—কহিল বৃদ্ধ "বলিব একটু পরে"—
আবার নীরব ; মুষ্টিবদ্ধ, নয়নে সলিল ঝরে।
চাপি' হৃদয়ের আবেগ আবার কহিল শুনুন সব,—
"যুবক যেতেই সে তোষাখানার থেমে গেল কলরব।
একি ! কোণে কাঁদে গ্রামের বৃদ্ধ হরিঘোষালের মেয়ে,
বিধবারে পশু আনিয়াছে ফাঁদে—বিস্মিত সবে চেয়ে।

যুবক কহিল "মা যে এইখানে, আর কি দেখিছ ভাই ?
এই মা'র পূজা এর বাড়া বুঝি পূজা আর কোথা নাই।"
ভাঙিল চমক রাজা বলে "দামু সমুখে দারোগা বাবু
হাসি দামোদর বলিল "তাই কি ভয়েতে হইব কাবু ?
নরকের কীট মায়ের পূজার মহাউৎসব মাঝে,
সতীর নয়নে এনেছিস্ জল মার বুকে বড় বাজে।

ছেড়ে দেন মাকে" রাজা কহিলেন
"ওরে কে আছিস্ ধর্"
দামোদর কহে "ছাড়ি দেহ মায়, ধরিবে ইহার পর"
কথা কাটাকাটি মাথা ফাটাফাটি জননীতো গেল ঘরে,
ডাকাতির দোষে পুলিস্ বাঁধিয়া নিয়ে গেল ন'টা নরে !
দীন গ্রামবাসী, সকলে তাদের বিচার-কাজের তরে,
ঘুরি' দেখে সব উকীল বাবুরা বাঁধা বাবুদের ঘরে।"

কেহ দাঁড়াল না—শিক্ষিত তারা কতই দেখাল ভয়,
কহিল "যাদের টাকা নাই তাদের জেলখানা যেতে হয় ?
একদিন শেষে হুকুম হইল "দশ বছরের তরে,
নয়টী জীবের যেতে হবে ওগো দীপান্তরের ঘরে।"
মায়ের কারণে মরিতেও দামু জীবনে করেনি ভয়—
শুধু খেদ তার ঘরে দুটী রোগী তাহাদের কিবা হয় ?
সে কাজেও রাজা করেনিকো হেলা আগুন দেছিল ঘরে,
কে রাখিবে আর পুড়িল দুজন নরদেবতার বরে।"

নীরব হইল বৃদ্ধ আহার বক্ষে বহিছে তার,
সরিতের মত শতধারা হ'য়ে—কেবল অশ্রুধার !
মুছিয়া নয়ন আবার শুধানু "বল বল তারপর" ;—
সজল নয়নে বৃদ্ধ কহিল "শুনেছি ফিরেছে ঘর।

ভুঞ্জিয়া ক্লেশ, এতকাল পরে হেরিতে গৃহের ছবি
এসেছিল বুড়ো,—দেখে'গেছে আছে স্থান,
মাঠ গাছ সবি!

শুধু রোগী নাই—নাই মার ঘর নাই সে পূজার মেলা;
তারপরে তারে কেহ দেখে নাই যখন পড়িল বেলা!
আজও না কি ওগো সপ্তমী হ'তে নবমী নিশীথ ভ'রে—
ওঠে শাঁখধ্বনি পূজার মন্ত্র জনহীন মাঠ পরে!
মায়ের চরণ শিঞ্জন ধ্বনি এখনও যে শোনা যায়।
কতনা ফুলের মধুরগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া যায়!

রাজার আদেশ এ মাঠের ধারে আসিতে পাবেনা কেহ,
আসিলে রাজার কড়া এ হুকুম চাই তার মৃতদেহ!—
রাজাও আজিকে মহারাজা নামে দেশেতে
পেয়েছে যশ,
তার গুণে জ্ঞানে কত যে সাহেব জজ বাহাদুর বশ!

থামিল বৃদ্ধ চেয়ে দেখি তার আঁখি যে গগনপানে,
দুইহাতে চাপি বক্ষ শুইয়া রৌদ্রের মাঝখানে!
ডাকি ইঙ্গিতে কাছে যেতে বুড়ো বলে অতি
কি ক্ষীণস্বরে—
"আমি দামোদর একথা বলিতে বুঝি ছিনু ধরাপরে।

গত যত পাপ ফলভোগ তার করেছি; তাইতে আজি
নিজের কাহিনী বলি পাপ হ'ল তার ফল নিতে রাজী।
আজ হ'ল শেষ তোমাদের এই সভ্যতামাঝে আর
পারিব না আমি বাঁচিয়া থাকিতে জীবন হ'য়েছে ভার!
এ গ্রামের আমি প্রতি ঘরে গেছি দিয়াছিও পরিচয়
একমুঠা ভাত কোথাও জোটেনি সবাই পেয়েছে ভয়!
মানুষ যাহারা মানুষের মত ছিল আজ নাহি আর,
গ্রামের পথেযে মানুষের তরে উঠে শুধু হাহাকার
শিখেছে এখন কত লেখাপড়া হেরিনু কতই বেশ—
মুখপানে চেয়ে দেখেছি কাহারো দেহে নাই গুণলেশ!
পরের যাতনা বোঝেনা ইহারা, মাতা
ভগিনীর ব্যথা,—
তাদের ধর্ম্ম এখন কেবল 'গাল-গল্পেরই' কথা
তবে যাই বাবু"—থামিল বৃদ্ধ সব হ'য়ে গেল শেষ
চলে গেল সেই মহান্ আত্মা মথি মোর হৃদিদেশ!

* * * * *

শ্মশানে দাঁড়ায়ে ছাই রেণু লয়ে মুছিয়া অশ্রুধার
কহিনু "আজি এ সভ্য আঁধারে এস দামু একবার।"—

* * * * *

শব শেষ করি ছাই টুকুলয়ে ফিরিলাম আমি ঘরে—
হৃদয়ে রহিল রক্তের দাগ চির জীবনের তরে।

———

গীতা ও ভাগবত

[শ্রীস্মরজিৎ দত্ত, এম্-এ,]

(২)

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য নিরাকার, নির্ব্বিকার, জন্মমৃত্যু রহিত পুরুষ যে জন্মমরণাধীন অবতার হইয়া আসেন তাহা গীতা ও ভাগবত উভয়েই স্বীকার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীতে ধর্ম্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে আসেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে গোপনে নন্দগোপ গৃহে রাখিয়া আসা হয়। তমাল, তাল, নীপ, কদম্ব প্রভৃতি তরু দলে শোভিত, শুক, কপোত, কলবিঙ্ক, শিখী, পিক প্রভৃতি কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণের সমধুর কূজনে মুখরিত, ভ্রমর-গুঞ্জিত বিচিত্র কুসুম গন্ধে আমোদিত, মঞ্জুল-নিকুঞ্জরাজি-বিরাজিত সেই পুণ্যময় শ্রীবৃন্দাবনের প্রান্ত-বাহিনী প্রসন্ন-নীল-সলিলা যমুনার বিমল তটভূমিতে বৎসচারণ, বল্লবকুমারকুমারী গণের সহিত নির্ম্মল হাস্য-পরিহাস এবং ত্রিভুবন-মনোমোহিনী মুরলীগীতিতে তাঁহার আনন্দময় চঞ্চল বাল্য ও পৌগণ্ড জীবন অতিবাহিত হয়। কৈশোরের উন্মেষ হইতেই জীবনের কর্ত্তব্য প্রতিপালনার্থ তিনি নির্ম্মম, নির্ব্বিকার চিত্তে সেই মধুময়ী লীলার পরিসমাপ্তি করিয়া মধুপুরে ফিরিয়া আসেন। জরাসন্ধের সহিত যাদবগণের সমর প্রসঙ্গে তিনি দ্বারকায় গমন করেন। এখান হইতেই আমরা কুরুপাণ্ডবের সহিত তাঁহার পরিচয় পাই। এতৎপূর্ব্বে তিনি কাহারও সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিরস্ত্রে যোগদান করিয়া তিনি অর্জ্জুনকে সেই প্রথম শ্রীমুখ-ক্ষরিত গীতামৃত পান করান।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের দিগন্ত বিস্তৃত রণভূমি। তাহার পাদ ধৌত করিয়া পুণ্যতোয়া হিরণ্বতী বীচি-চঞ্চল-কল-গীতিতে আপন মনে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। ঊর্দ্ধে নীলাম্বুধির প্রতিচ্ছবি সুনীল নির্ম্মল অম্বরতল। নিম্নে সাগরাম্বরা বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ বীর্য্য-সম্পদ তাহারই ধ্বংসে বদ্ধপরিকর হইয়া সমরাঙ্গনের উভয় প্রান্তে সজ্জিত হইয়া পুঞ্জীভূত, নিবিড় অম্বুদ-রাশির ন্যায় প্রলয় ঝঞ্ঝার পূর্ব্ব-ভাব ধারণ করিয়া যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছে। সমর সূচনা করিয়া উভয় পক্ষের শঙ্খধ্বনি এবং পনবানক-গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের শোণিতোন্মাদন শব্দ সেই রণ-পয়োধিতে প্রবল তরঙ্গ তুলিয়াছে। আর সেই উত্তাল তরঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতাশ্বযুক্ত কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ রথী সব্যসাচীর শোকাবসন্ন হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পাঞ্চজন্যেরই অনুরূপ জলদ-গম্ভীর স্বরে উপদেশ দিতেছেন :—

শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থ নিষ্কাম ও নিঃসঙ্গ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি করিয়া জীব "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। সকল শোক, সকল আকাঙ্ক্ষার পরপারে দাঁড়াইয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, ব্রহ্মভূত জীব পরাভক্তি লাভ করে। এই অবস্থাই একেশ্বরবাদ (monotheism) এর চরম অবস্থা। ভক্ত সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইয়া মনে করেন ইহাই শেষ। ইহারই আনন্দে মুগ্ধ হইয়া তিনি মুক্তিকে তুচ্ছ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ইহাই ধর্ম্ম জীবনের চরম পরিণতি নহে। ইহারও পরে যাইতে হইবে। এই অবস্থায় কিছুকাল থাকিতে দ্বৈত-ভাব স্বতই চলিয়া যায়। জীবের কর্ম্ম ফুরাইয়া যায়। তখন আর ভগবানকে ভক্তের আপনা হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয় না। তখন ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ যে একই তাহাই ভক্ত-হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। বিরাট্ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলের রশ্মিকণার ন্যায় প্রতি জীবই সেই ব্রহ্মেরই অংশ ইহাই অনুভূত হইতে থাকে—পুঁথিগত বিদ্যার তরল

বিশ্বাস নহে, প্রাণে প্রাণে অনুভব! ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান। তখন ভক্ত আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলেন তৎ ত্বং অর্থাৎ তাহাই তুমি। ইহাই হইতেছে "তত্ত্বং।" এই জ্ঞানের পরই স্বরূপে বিলয়। ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভাগবত পরীক্ষিতের জীবনে ইহাই উদাহৃত (illustrated) করিয়াছেন। বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ বিষ্ণু প্রীত্যর্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন। তাহার প্রমাণ আমরা শৌনকের প্রশ্নেই পাইতেছি। পরীক্ষিৎকে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প জানিয়া শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"অভিমন্যুসুতং সূত প্রাহু ভাগবতোত্তমং" ১।৪।৯
শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতায়
য উত্তমঃশ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্॥ ১।৪।১২

অর্থাৎ অভিমন্যুনন্দনকে সকলেই পরম ভাগবত বলিয়া থাকেন! আমরা জানি, যে সমস্ত লোক উত্তমঃশ্লোক ভগবৎপরায়ণ তাঁহারা জগতের মঙ্গল, সুখ ও ঐশ্বর্য্য বিধানের নিমিত্তই জীবন ধারণ করেন, কখনই আত্মার্থ নহে। পরীক্ষিৎ নিশ্চয়ই এমন ভাবেই জীবন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জীবনের উপর দাবী তাঁহার নিজের নহে—তাঁহার আশ্রয়ার্থী লোকদিগের। তিনি এমনই ভাবে আপনাকে পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। তবে তিনি নির্ব্বিণ্ণ হইয়া এই পরাশ্রয় কলেবর ত্যাগ করিয়া পরস্বাপহরণ করিতে কেমন করিয়া সাহসী হইলেন। যে দেহে তাঁহার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই যাহা বিশ্বের হিতসাধনে নিয়োজিত হইয়া সাধারণের সম্পত্তি হইয়াছে, কেন তিনি সেই সম্পদ হইতে বিশ্বকে বঞ্চিত করিলেন? শৌনকের অনুযোগ হইতে বুঝা যাইতেছে ভারতীয় রাজজীবনের আদর্শ কত উচ্চ! পৃথিবীর অন্য কোন জাতীর ইতিহাসে এরূপ মহীয়ান রাজজীবনাদর্শ আছে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, পরীক্ষিৎ যে নিষ্কাম ব্রত লইয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম, তাহারই ফলে ভগবদনুগ্রহে ব্রহ্মশাপ তাঁহার অনুকূল হইয়া অপ্রত্যাশিত বরে পরিণত হইল। ভগবানের এমনই বিচিত্র অনুগ্রহ! পরীক্ষিৎ জীবনের আর সাতটী মাত্র দিন অবশিষ্ট আছে জানিয়া হরিকথামৃত রসে মজিয়া গেলেন। স্বয়ং শুকদেব যেন ভগবৎ-প্রেরিত হইয়াই মুনিগণ পরিবেষ্টিত সেই রাজর্ষিকে ভাগবত শ্রবণ করাইতে বসুদেব-নারদ-সংবাদ-প্রসঙ্গে বলিলেন—যিনি এই পুণ্যময় ইতিহাস চিত্তে ধারণ করিবেন

"স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। পরে দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে আমরা দেখিলাম পরীক্ষিৎ "ব্রহ্মভূতো মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছিন্নসংশয়ঃ" হইয়াছেন। তিনি তখন শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন :—

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহং।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥ ঐ ৬।৫
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চিত্তং প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন॥ ৬

গীতায় ভগবদুক্তির সহিত বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল :—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ৫।২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

এই গেল ভাগবতের মর্ম্মকথা। অতঃপর আমরা সমগ্র ভাগবত যে গীতাদ্বারা কিরূপ অনুভাবিত হইয়াছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের ছায়া স্পষ্ট লক্ষিত হয়। গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।
বিবস্বান মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন :—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয় বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ ৩
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥ ৪ ইত্যাদি

গীতার দশম অধ্যায়ে অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং॥ ১২
আহুস্ত্বামিত্যাদি
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬
কথং বিদ্যামহং যোগিন্ ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৬শ অধ্যায়ে উদ্ধব বলিতেছেন :—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতং।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ॥ ১
গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে॥ ৪
যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে॥ ৩

এইরূপে বিভূতিপ্রদর্শনার্থ উদ্ধব কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বলিতেছেন :—

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্ম্ম্যং রাজ্যহেতুকং।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ॥ ৭
স তদা পুরুষব্যাঘ্র যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ।
অভ্যভাষত মামেব যথা ত্বং রণমূর্দ্ধনি॥ ৮

এতদুক্তি দ্বারা স্পষ্টই স্বীকার করা হইতেছে যে গীতারই অনুবৃত্তি হইতেছে। অতঃপর গীতার দশম অধ্যায়ে বর্ণিত বিভূতিযোগ ভাগবতের একাদশের এই ষোড়শ অধ্যায়ে পুনর্ব্বার বর্ণিত হইয়াছে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাস যোগের কথা বলা হইয়াছে। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে এবং একাদশের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৩১-৪৪ শ্লোকে তাহারই পুনরুল্লেখ হইয়াছে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে এবং একাদশের পঞ্চম অধ্যায়ের ২য় ১৭শ শ্লোকে সেই একই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। গীতার ১৪শ-১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ের ১৯-৪০ শ্লোকে গুণত্রয়ের বিচার হইয়াছে। ভাগবতের একাদশের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা হইয়াছে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটী শ্লোকে যে গুলিকে দৈবী সম্পদ বলা হইয়াছে, ভাগবতের প্রথমের ষোড়শের ২৪, ২৫ শ্লোকে, তৃতীয়ের সপ্তবিংশের ৫-৭ শ্লোকে তাহাই পুনরুক্ত হইয়াছে। গীতার ১৩।৭—১১ শ্লোকে যে গুলিকে জ্ঞান বলা হইয়াছে ভাগবতের ১১।৩।২৪-২৬, ৫।৫। ১১-১৩, ৭।১১।৭৮ শ্লোকে তাহাই পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে।

গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ভাগবত ও তাহাই বলিতেছেন। যথা—গীতা—

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২।১০
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধি মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৮।৭

ভাগবত—

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ। ১১।২৯।৯

গীতা নবম অধ্যায়ের সপ্তবিংশ শ্লোকে বলিতেছেন :—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং॥

শুভাশুভ সকল কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমি যাহা কিছুরই অনুষ্ঠান করিনা কেন তাহা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিব। প্রাত কার্য্যের আরম্ভে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিব—"হে দয়াময়, বল ইহা তোমার অভিপ্রেত কিনা? তোমার অনুমতি না লইয়া আমি কোন কার্য্যই করিতে পারিব না। আমি যে নিতান্ত অজ্ঞানান্ধ—নিতান্ত ভ্রান্তমতি। কি করিতে কি করিয়া বসিব তাহা জানিব কেমন করিয়া! তুমি যদি আমার হাত ধরিয়া লইয়া না যাও তবে কেমন করিয়া আমি চলিব? আমার নিজের শক্তি যে কিছুই নাই, পরমেশ্বর! কেমন করিয়া শূন্যের উপর নির্ভর করিব? তাই বলি, তুমি আমায় বলিয়া দাও—

কি করিব আর কি করিব না।" এইরূপে আরম্ভে অনুমতি লইয়া তৎপরে কর্ম্ম সম্পাদনান্তে আবার ভগবানের চরণে বিনীত-দীন ভাবে একাগ্র উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিব—হে আমার প্রাণের দেবতা, আমার এই কার্য্যে কি তোমার প্রীতি হইয়াছে? তুমি যদি হাসিমুখে বল যে প্রীত হইয়াছ, তবেই মনে করিব আমার সকল যত্ন সার্থক হইয়াছে। আর যদি আমার কার্য্য তোমার প্রীতিবিধানে সমর্থ না হইয়া থাকে—যদি তোমার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া না উঠে, তবে বুঝিব আমার সর্ব্ব কার্য্য ব্যর্থ হইয়াছে; আমার পণ্ডশ্রম মাত্র—আমি ভস্মে ঘৃতসেক করিয়াছি মাত্র।" যাহা কিছুই করিব তাহা সেই পরম দেবতার প্রীতির নিমিত্ত—কি কায়িক, কি বাচক, কি মানসিক। চৈতন্য চরিতামৃত কার বলিতেছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥

আমার সমস্ত কার্য্যই যদি ভাগবৎ প্রেমের দ্বারা অনুভাবিত করিতে হয় তাহা হইলে আর নিজের জন্য কিছু করিবার স্পৃহা থাকিবেনা। আমি মাত্র ভগবানের যন্ত্রবৎ কার্য্যে করিয়া যাইব। সুতরাং ফলাফল যাহারই—তাহা কখন যন্ত্রের হইতে পারেনা। সেইজন্য এইরূপ সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া ভগবৎপ্রীণনার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। ইহাতে পাপপুণ্যের বন্ধনের আর কোন ভয়ই থাকে না।

ভাগবত ও ঠিক ইহাই উপদেশ করিয়াছেন :—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥ ১১।২।৩৪

এইরূপে একান্ত শরণাগত হইয়া যিনি কার্য্য করেন ভগবান সত্যই নিজে তাঁহার সমস্ত ভার লইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া থাকেন।

গীতার দ্বাদশে ভগবান্ বলিতেছেন :—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭

ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভয়ায়িনং।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ॥ ৩৬
বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেব বিশ্বতোমুখং।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে॥ ৩৭

গীতার অষ্টাদশে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ-দানার্থ বলিতেছেন :—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

কি আশ্চর্য্য। ভগবান্ ভক্তের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন কিনা "প্রতিজানে" অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিতেছি। ভক্তকে বুঝাইবার জন্য ভগবানের কি নির্ব্বন্ধ! তাহাকে বিশ্বাস করান তাঁহার চাইই। যাঁ'র উপর নির্ভরের এইরূপ ফলই যদি না হইবে তবে কেন লোকে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে চাহিবে? করুণাময়ের করুণার কথা স্মরণ করিতে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে—নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়!

এখন ভাগবতের একাদশে ভগবান্ উদ্ধব কি বলিতেছেন একবার শ্রবণ করুন :—

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণু ভো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সখা সুহৃৎ॥ ১১।৪৮
তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতি চোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেবচ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ১২।১১

এ পর্য্যন্ত আমরা গীতা ও ভাগবতের স্থূল উপদেশ সম্বন্ধে ঐকমত্য প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়েও যে গীতোক্ত ভগবদ্বাণী ভাগবতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে

তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। সর্ব্বাগ্রে গীতার যে শ্লোকগুলি প্রায় অবিকৃত ভাবেই ভাগবতে স্থান পাইয়াছে সেই গুলিরই উদ্ধার করিব। আমরা ভাগবতের শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিয়া সেটী গীতার কোন অধ্যায়ের কোন শ্লোক তাহাই নির্দ্দেশ করিব। নতুবা প্রবন্ধটী যথেষ্ট দীর্ঘ ও শ্লোক বাহুল্য হেতু বিভীষিকাময় হইয়া উঠিবে। এমনিই বত শ্লোকই তুলিতে হইয়াছে ও হইবে। সুতরাং যত সংক্ষেপে পারা যায় সকলের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। যাহা হউক যাঁহাদের গীতা ভাল রকম পড়া আছে তাঁহারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, নতুবা নির্দ্দেশানুসারে গীতা খুলিয়া মিলাইয়া লইতে পারেন।

১। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণ প্রকৃতি বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম॥
গী :—১৩।২০ ভা—৩।২৬।২৮

২। সএব র্যহি প্রকৃতে গুর্ণৈরভিবিসর্জ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
গী—৩।২৭ ভা—৩।২৭।১

৩। তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥
গী—১৩।২১ ভা—৩।২৭।২

৪। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতা॥
গী—৬।২৯ ভা—৩।২৮।৪২

৫। যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতর স্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥
গী—৩।২১ ভা—৬।২।৪

৬। নাহ কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈ বলাৎ।
গী—৩।৫ ভা—৬।১।৫২

৭। না দত্ত আত্মাহি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফল
গী—৫।১৫ ভা—৬।১৭।১

৮। বিমুঞ্চতি যদা কামান মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে॥
গী—২।৫৫ ভা—৭।১০।৯

৯। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি হরন্ত্যপি যতে মনঃ।
গী—২।৬০ ভা—৭।১২।৬

১০। যদা যদাহি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজ্জতি হরিঃ॥
গী—৪।৭ ভা—৯।২৪।২৬

১১। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ংযো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
গী—৯।২৬ ভা—১০।৮১।১

১২। ভজন্তি যে যথা দেবান দেবা অপি তথৈব তান।
গী—৪।১১ ভা—১১।২।৫

১৩। দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং।
গী—১১।২৫ ভা—১১।৩০।৩২

উপনিষদ বেদের শিরোভাগ বা বেদান্ত। গীতা-মাহাত্ম্যে বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার বলিতেছেন :—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন।
পার্থো বৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫

এক কথায় গীতা সর্ব্বোপনিষদের সার অথবা বেদান্ত সার। যাঁহারা ভাগবতকে বিশুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদিদ্বারা অসংশ্লিষ্ট ভক্তির প্রচারই ভাগবতের উদ্দেশ্য বলিয়া থাকেন তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমরা ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিতেছি। উহাদ্বারা ভাগবত কোন জাতীয় গ্রন্থ তাহা ভাগবতের মুখে শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠ কৈবল্যৈকপ্রয়োজনং॥ ১২।১৩।১০

অর্থাৎ সর্ব্ববেদান্তসার যে অদ্বিতীয় বস্তু, ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব যাহার লক্ষণ এবং যাহাতে নিষ্ঠ কৈবল্যই জীবের একমাত্র প্রয়োজন—সেই ব্রহ্মই ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতা ও ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ও এক। ভাগবতের উপর উপনিষদের প্রভাব কত তাহা ভাগবতে উদ্ধৃত উপনিষদ্ বাক্যাবলী হইতে বুঝিতে পারা যায়। আমরা দুই একটী শ্লোক তুলিয়া

দেখাইব যে গীতার স্থায় ভাগবতও উপনিষদ্ হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবত বলিতেছেন—

অহমেবাসমগ্রে নান্যদ যৎ সদসৎপরং।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ ২।৯।৩২

আর শ্রুতি বলিতেছেন :—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ-তৈত্তিরীয় ১।১

পুনশ্চ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন

জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিস বিশন্তি তদ্‌ব্রহ্মেতি

ঐ ৩।১

ভাগবতে আছে :—

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ

যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।

একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্‌পলান্নম

অন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ১১।১১।৬

শ্রুতি কি বলিতেছেন একবার শ্রবণ করুন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

মুণ্ডক—৩।১।১

শ্বেতাশ্বতর—৪।৬

ভাগবত বলিতেছেন :—

আত্মা বাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥ ৮।১।৮

ঈশোপনিষদ ঐ শ্লোকই সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত বলিয়াছেন ; যথা—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১

ভাগবতে আছে :—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ১১।২০।৩০

ঐ শ্লোকই ঐতেরেয় শ্রুতিতে ১।২।২১শে এবং মুণ্ডকের ২।২।৮মে আছে। প্রভেদ এইটুকু যে শেষ চরণে ঐতেরেয়ে "দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" এবং মুণ্ডকে "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" আছে। "পূর্ব্বোদ্ধৃতসর্ব্বভূতেষুচাত্মানমিত্যাদি" শ্লোকটী ও ঈশশ্রুতি হইতে গৃহীত হইয়াছে যথা :—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ঈশ ৬

আর উদ্ধার নাই বা করিলাম। জীবও ব্রহ্মে যে অভেদ এই সোঽহং বা তত্ত্বমসিবাদ যে ভাগবতেই আছে তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ১২।১১।১০ শ্লোকে স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য আমার আর কয়েকটী শ্লোক তুলিতেছি।

যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মদ্ভাব ভিন্নমাত্মনঃ।

ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতেমৃতিঃ ॥ ৬।১৬।১৭

অর্থাৎ জীব আপনাকে আমা-হইতে ভিন্ন মনে করিয়া আমাদের উভয়ের একত্ব বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই দেহ হইতে দেহান্তর এবং মৃত্যু হইতে পুনর্ব্বার মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার—

এতাবানেব মনুষ্যৈ র্যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ।

স্বার্থঃ সর্ব্বাত্মা জ্ঞেয়ো যৎপরাত্মৈকদর্শনং ॥ ঐ ৫৮

অর্থাৎ যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বভাবে মানুষের ইহাই জ্ঞাতব্য যে পরমাত্মা ও তাহাতে অভেদদৃষ্টিই তাহার একমাত্র স্বার্থ বা উদ্দেশ্য।

পুরুষেশ্বরয়ো রত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি ॥ ১১।২২।১০

অর্থাৎ পুরুষও ঈশ্বরে অথবা জীব ও ব্রহ্মে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। পরিশেষে দ্বাদশ স্কন্ধে সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে :—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদং।

এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে ॥ ১২।৫।১১

অর্থাৎ—শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন আমিই ব্রহ্ম ব্রহ্মই আমি এইরূপ অভেদ দৃষ্টিতে নিরুপাধিক অখণ্ড পরমাত্মায় জীবাত্মাকে আহিত করিয়া ইত্যাদি। ইহাই কি বেদান্তের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নহে? ইহা কি গীতার "বিশতে তদনন্তরং" নহে?

সেই নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিরাকার ব্রহ্ম যখন জীবের ন্যায় প্রকৃতির গুণাশ্রয় করিয়া স্বকীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ দ্বারা জীবচক্ষুর গোচরীভূত হইয়া থাকেন তখন তিনি ঈশ্বর বা

ভগবান্ নামে অভিহিত হন। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করাই এই অবতারের এক উদ্দেশ্য। ভক্ত যখন নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করেন তখন করুণাময় ভগবানরূপে আসিয়া ভক্তের বাঞ্ছিত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মসংস্থাপন ইঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। ভক্তের পালন বলিতেই ধর্ম্মের সংস্থাপন। যখনই ধর্ম্মবিপ্লব ঘটে তখনই ভক্তগণ উৎপীড়িত হইয়া থাকেন। তাঁহাদেরই রক্ষার জন্য ব্রহ্মের অবতার। এবিষয়ে গীতায় স্বয়ং ভগবান্ই বলিতেছেন। যথা—চতুর্থ অধ্যায়ে :—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬
যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

অবতারবাদ সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ আছে। এবিষয় প্রবন্ধান্তরে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। উপস্থিত গীতা ও ভাগবতের মতসাম্যপ্রদর্শনই আমাদের কর্ত্তব্য। ভাগবতে ও এই অবতারের বিষয় যথেষ্ট আছে। যথা :—

সত্ত্বরজস্তম ইতি প্রকৃতে গুণা স্তৈ র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। ১।২।২৩
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে। ১।৩।২৮
এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্ব্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্।
আত্মমায়য়া গুণৈ র্বিশ্বমাত্মানং সৃজতি প্রভুঃ॥ ৮।১৬।৩৮
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং। ৭।৯।৩৭

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য ইত্যাদি শ্লোক তো পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। আর একটী মাত্র তুলিয়া নিরস্ত হইব।

স্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায় যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ।
বাধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভি স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি॥
১০।৪৮।১৯

তাহা হইলে গীতোক্ত অবতারবাদই যে ভাগবতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

গীতায় বিভূতি যোগ বর্ণনের পর ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ১০।৪১

ইহাই বিস্তৃত ও ব্যাপক ভাবে ভাগবত বলিতেছেন :—

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ১।৩।২৭

গীতায় অর্জ্জুনকে কর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—কর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পণ্ডিতদিগেরও মাথা ঘুরিয়া যায়। সুতরাং তাহার প্রকারভেদ বলিয়া দিতেছি :—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। ৪।১৬
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ৪।১৭।

এখানে তিন প্রকার কর্ম্মের কথা বলা হইল—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। ভাগবত ও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। যথা :—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ১১।৩।৪৪

কথায় বলে মানুষই নিজের অদৃষ্টস্রষ্টা। মানুষ যেমন কার্য্য করে তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। জীব শুভাশুভকর্ম্মানুসারে পার্থিব সুখদুঃখের ভোক্তা হয়। ভ্রান্তমতি লোক মনে করে ভগবান্ তাহাদিগকে সুখদুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহজন্মের সুখ দুঃখ যে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল তাহা ধারণা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। তাই সে অপরকে সুখী এবং আপনাকে দুঃখী দেখিয়া সমদৃক্ ভগবানের উপর পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করিয়া থাকে। অথচ সে ভাবিয়া কিছুতেই করিতে পারেনা এ পক্ষপাতিত্বের কারণ কি? তুমি যদি বিষ বীজ রোপণ করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি অমৃত-ফলের আশা কর কেমন করিয়া? তুমি বলিবে ভগবান্ সমস্ত করাইতেছেন—"ত্বয়া হৃষীকেশ ইত্যাদি বচন দেখাইবে। কিন্তু নিজের কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কারটুকু বেশ উপভোগ করিবে। তুমি ভগবানের উপর সমস্ত ভার দিতে সাহস করনা। পাছে তিনি তোমাকে ফাঁকি দেন এই আশাঙ্কায় তুমি নিজের

হাতেই সমস্ত কার্য্যের ভার লইতে চাও এবং লইয়াও থাক। তখন তোমার কার্য্যের ফল তুমি ভোগ করিবে না ত কে করিবে? ভাল করিল কে? আমি! মন্দ করিল কে? পরমেশ্বর! এই বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহার চক্রবৃদ্ধি হিসাবে ফল ভোগ তোমাকেই করিতে হইবে! তবে যদি সর্ব্বাত্মভাবে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার যন্ত্র স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতে পার তখন আর যন্ত্রের ফল ভোগ করিতে হইবে না। যে যন্ত্রকে চালাইবে সেই যন্ত্রের পরিচালনজন্য দায়ী। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ভগবান্ তোমার কোন কর্ম্ম সৃষ্টিও করেন না, তোমাতে কর্ত্তৃত্বের আরোপও করেন না। তোমার গূঢ়স্বভাবই তোমাকে তদনুরূপ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া থাকে। তাই গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন :—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫।১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ॥ ১৫

ভাগবত তাহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :—

সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্॥

পুনশ্চ　　　　১০।৫৪।২২

যেন যাবান্ যথা ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেহ সমীহিতঃ।
স এব তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ॥ ৬।১।৪১

বেদ স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞ ব্রতনিয়মাদির উপদেশ আছে। এ সকল সকাম কর্ম্ম। ইহাদিগের অনুষ্ঠানের ফলে নানাবিধ সাংসারিক সুখ ও স্বর্গাদি লোক লাভ হয়। নিতান্ত বদ্ধ জীবদিগকে ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই এইরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা। এইরূপ সকাম কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে জীবের চৈতন্যোদয় ও ধর্ম্মে মতি হয়; তখন সে প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করে এবং জীবজীবনের চরম উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হয়। বস্তুতঃ এই সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়োঽর্থীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মফলে আসক্ত সাধকের বুদ্ধি নির্ব্বিকল্প সমাধির উপযোগিনী হয় না। তাহাই বুঝাইবার জন্য গীতা বলিতেছেন :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ২।৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

ভাগবত বলিতেছেন :—

এষ্যাং জড়ীকৃতমতি মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমান ইত্যাদি ৬।৩।২৫

পুনশ্চ :—

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥ ১১।২১।২৬
কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি হি॥ ২৭

এইরূপ সকাম যজ্ঞাদি দ্বারা পুণ্যার্জ্জন করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে বটে। কিন্তু স্বর্গসুখ তাহার ভাগ্যে দীর্ঘকালের জন্য হয় না। তাহার পুণ্য ক্ষীণ হইয়া আসিলে "পুনর্মূষিকো ভব" অবস্থা। অর্থাৎ আবার এই জরা ব্যাধি-শোক-তাপ-সঙ্কুল সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাঁহারা স্বর্গসুখ ভোগ করেন নাই, তাঁহাদের অবস্থা বরং ভাল; কিন্তু যাঁহারা স্বর্গের আস্বাদ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসেন তাঁহারা বাস্তবিকই শোচ্য। অমৃতের আস্বাদনে রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে না করিতেই আবার তাঁহাদিগকে বিষপান করিতে হয়। এরূপ ক্ষণিক সুখের জন্য কেন মানুষ লালায়িত হয়! কথায় বলে "মারিত হাতী লুঠিত ভাণ্ডার"। যদি সুখের জন্য কষ্ট করিয়া সাধনই করিতে হইল তবে যে সুখ চিরকাল একভাবে থাকিবে, যাহা হইতে বিচ্যুতির আশঙ্কা নাই, যাহা যতই ভোগ কর না কেন কখনও অনিচ্ছা আনয়ন করিবে না—সেই নির্ম্মল শাশ্বত সুখের জন্যই সাধন কর। নশ্বর তুচ্ছ সুখত সুখেরই নয়। বরং স্মৃতি রাখিয়া যায় বলিয়া তাহা চিরদুঃখের কারণ হইয়া থাকে—"ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় আঁধার

পথিকে ধাঁধিতে।" যাহা হউক এই সকল কামকামের গতাগতি দেখাইবার জন্য গীতা বলিতেছেন :—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি। ৯।২১

ভাগবত তাহারই পরিপোষকতা করিতেছেন :—

ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃ পুন র্লোকমিমং প্রতি।
পতন্তি বিবশা দেবৈঃ সদ্যোবিভ্রংশিতোদয়াঃ॥ ৩।৩২।১৬

পুনশ্চ :—

তাবৎ স মোদতে স্বর্গং যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচোদিতঃ॥ ১১।১০।১৫

কি বিড়ম্বনা! ময়ূরপচ্ছধারী দাঁড়কাক হইয়া স্বর্গে দেবতাদিগের সহিত মিশিতে গেলাম বটে, কিন্তু দেবগণ ত তাঁহাদিগের দলে লইতে বাধ্য নহেন। তবে স্বকর্ম্ম দ্বারা তাহা অর্জ্জন করিয়াছি বলিয়া স্বর্গে স্থান দিতে তাঁহারা বাধ্য। তাই যেন অনিচ্ছার সঙ্গে 'চোখ-কাণ-বুঁজিয়া' কোন মতে স্বীকার করেন। পরে যখন পুণ্য ক্ষীণ হইয়া আসে তখন যেন পূর্ব্ব-ক্লেশ-সহন-জন্য অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়াই সেই দেবগণ নির্ম্মম ভাবে এই অনভ্যর্থিত জীবটীকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানে স্বর্গ হইয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকেন। সে দীন নেত্রে মুহূর্ত্তকাল থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলেও তাহার সে উক্তিতে তাঁহারা কর্ণপাত করেন না। তাহাকে বাধ্য হইয়া "মুখটী করিয়া চূণ"—হেটমুণ্ডে এই মর্ত্ত্যলোকেই আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। এমন সুখ ভোগ না করিলে নয়!

কিন্তু কামকে "দূর" বলিলেই যে সে কুক্কুর বিড়ালের ন্যায় লেজ গুটাইয়া পালাইবে তাহা নহে। কামনাকে হৃদয় হইতে উন্মূলিত করা আদৌ সহজ নহে। মানুষ যতই কেন মনে করুকনা সে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে কিন্তু কোথা হইতে যে ছদ্মবেশে কাম আসিয়া তাহার জীবন তরণীর কর্ণ ধারণ করিয়া বসে তাহা বুঝিবার সাধ্য তাহার নাই। আবার এই কামপ্রবর্ত্তনায় মানুষ যত কিছু পাপ সম্ভব হইতে পারে তাহার অনুষ্ঠানে আপনার পশুত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। তাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩।৩৬

এতদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন :—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

কি ভীষণ ব্যাপার। মানুষ ইচ্ছা না করিলেও তাহাকে সবলে পাপে প্রবর্ত্তিত করায় এই কাম! তাই ভগবান্ বলিতেছেন জ্ঞানবিজ্ঞাননাশকারী পাপস্বরূপ এই কামকে "প্রজহি" অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া যেন তাহার বিন্দুমাত্র জীবনের অস্তিত্ব না থাকে, এমন ভাবে "জহি" হনন কর। দমন নয়, উপশান্ত নয় একেবারে "প্রজহি।" কামের দুর্দ্দমনীর প্রভাব সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্ম্মো ধৃতি র্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা॥ ৭।১০।৮

সত্যই কি তাহা নহে? যতদিন তুমি কোন কিছুর প্রার্থী না হইয়া কোন রাজা বা পদস্থ ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করিতে থাক ততদিন তোমার শ্রী তেজঃ সত্যাদি সকলই অটুট থাকে—তুমি নিজের সত্তায় বিরাজিত থাক। রাজার মুখের প্রতি তাকাইয়া কথা বলিতে তোমার বুকে বল থাকে। কিন্তু যে দিন তুমি কামনার তাড়নায় অর্থী-যাচক হইয়া রাজসমীপে গিয়াছ সেই দিনই যেন তোমার গৌরীশৃঙ্গের ন্যায় উত্তুঙ্গমান ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে! তুমি শ্রীহীন, নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছ। তোমার দীনতা তোমাকে সে ব্যক্তির চক্ষে তাহার কৃপার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। কামের এমনই প্রভাব যে সে মুহূর্ত্তে ঠাকুরকে কুকুরে পরিণত করিয়া দেয়!

বিষয়ের চিন্তাই মানবকে বিষয়ে আসক্ত করে এবং

ক্রমে কাম ক্রোধাদি উদ্রিক্ত হইয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যায়। বিষয় যে বিষম বিষ তাহা সকলে কতবার শুনিয়াছে। অনেকে কতবার অনুভব করিয়াছে। তথাপি কেহই সেই বিষকে বর্জ্জন করিয়া উঠিতে পারে নাই। উষ্ট্র কন্টকবৃক্ষ চর্ব্বণ করে। কন্টকাঘাতে জিহ্বা ও মুখগহ্বর ক্ষত বিক্ষত হয়—রুধিরপাত হইতে থাকে, তথাপি সে সেই কন্টকবৃক্ষচর্ব্বণে বিরত হয় না বিষয়ের এমনই মোহিনী শক্তি! সকলকে যেন মন্ত্র মুগ্ধ করিয়া রাখে। জানিয়া শুনিয়া, দেখিয়া বুঝিয়া যে ত্যাগ করিতে পারিনা এতদপেক্ষা দুরবস্থা আর কি হইতে পারে! পরিণামবিরস বিষয়ের আকর্ষণে স্রোতোবাহ তৃণখণ্ডের ন্যায় আমরা ধ্বংসের পথে ভাসিয়া চলি। তাহাই বুঝাইবার জন্য গীতা বলিতেছেন :—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ২।৬২,৬৩

ভাগবত তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন :—

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততোভবেৎ।
সঙ্গং তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলিনৃ্ণাং॥

১১।২১।১৯

কলে দুর্ব্বিষহঃ ক্রোধ স্তম স্তমণুবর্ত্ততে।
তমসা গ্রস্যতে পুংস শ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুত॥ ২০
তয়া চ রহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ॥ ২১

সুতরাং সংসারে সার পরম বস্তু লাভ করিতে হইলে শব্দস্পর্শ-রূপরস গন্ধ এই সকল ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈরাগ্যকে সবলে আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে। সংসারের পঙ্কিল কামনা স্রোতে এই বৈরাগ্যই আলানস্বরূপ। এই বৈরাগ্যরূপ 'খোটা' ধরিয়া থাকিতে পারিলে কামনা তোমাকে আর তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না কিন্তু এই বৈরাগ্য অভ্যাসদ্বারা লাভ করিতে হয়। অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্য-সাহায্যে মনকে নিরোধ করিতেই হইবে। মনই মানুষের অর্থ ও অনর্থের মূল। মনই মানবকে ব্রহ্মের পথে উঠাইয়া দেয় অথবা ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। এই মনকে জয় করিতে পারিলে—এই মনকে বশীভূত করিতে পারিলেই তবে শ্রেয়ঃ-সাধনের আশা করা যাইবে। মনকে বশে আনা চাইই। কেননা সেই মনই আমাকে পথ দেখাইয়া চির আলোকের রাজ্যে পৌছিয়া দিবে। সুতরাং মনকে ছাড়িলে আমার কোন মতেই চলিবে না কিন্তু মনের নিগ্রহ ও বায়ুর মত সুদুষ্কর। তাই অর্জ্জুন হতাশ হইয়া বলিলেন :—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥ ৬।৩৪

কিন্তু তাহা বলিলে চলিবে কেন? যে নৌকার সাহায্যে তুমি সংসার সাগর পার হইবে, যাহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই; আবার সংসারের পারে যে তোমার যাওয়াও চাই। তখন তাহাকে যাহাতে 'বাগে' আনিতে পার তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। মনোনিরোধের উপায় যে নাই তাহা নহে। ভগবান্ তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন :—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

কিন্তু বশে আনিতে না পারিলে আর কোন আশাই নাই।

অসংযতাত্মনো যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ॥ ৩৬

অর্জ্জুনের হতাশের প্রতিধ্বনি তুলিয়া উদ্ধব বলিলেন :—

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো-নিগ্রহ-কর্ষিতাঃ॥ ১১।২৯।২

সেই উদ্ধবই পূর্ব্বে ভগবানের বাণী বহন করিয়া ব্রজে গমন পূর্ব্বক গোপীগণকে বলিয়াছিলেন :—

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥ ১০।৪৭।২৯

সেই মনই যখন নিরুদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধ ভাব ত্যাগ করে তখন সে সুহৃদের মত হাত ধরিয়া সাধককে সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার করে। তাই গীতায় ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন :—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬।৫

অর্থাৎ মনঃ হয় শ্রেয়ের পথে না হয় ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবেই। সুতরাং মনোনিরোধ একান্ত কর্ত্তব্য। ভাগবতও ঐ কথাই বলিতেছেন :—

সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ। ১১।৭।১৫

আত্মনো গুরু রাত্মৈব—ইত্যাদি— ঐ ১৬

কিন্তু কিরূপে দুর্ব্বিনীত মনকে বশে আনিতে হইবে তাহা গুরূপদেশ দ্বারাই জানিতে হইবে। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত সাধনের পথে অগ্রসর হইবার কোন আশাই নাই। শ্রুতিও তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন- "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" পূর্ব্বে যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার মূলে জ্ঞানের প্রয়োজন; নিত্যানিত্য-বিবেক বুদ্ধি হৃদয়ে স্ফুরিত না হইলে কেমন করিয়া প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইবে? তাই সর্ব্বপ্রথমে গুরুপদাশ্রয় আবশ্যক। তিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবেন। বৈরাগ্য জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথেরই সম্বল। জ্ঞান পথে ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ ও ভক্তিপথে সর্ব্ব বিষয়েই শ্রীভগবানে সমর্পণ—আত্ম প্রীত্যর্থ সকলই পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ সকলের তৎ সেবায় নিয়োজনই প্রকৃত বৈরাগ্য। আচার্য্যরূপী স্বয়ং ভগবানই এই বৈরাগ্যোদয় করিয়া দিবেন। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধকমাত্রকেই বলিলেন—"অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলাম তাহার কারণ অর্জ্জুন পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন তিনি ত আত্ম সমর্পণ করিয়া বলিতেছিলেন—শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং। তাই বলিতেছি ভগবান্ সাধক মাত্রকেই উপদেশ করিলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪

ভাগবতও গুরুর শরণ যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ১১।৩।২২

গুরু-কৃপায় চিত্তসংযমের উপায় জানিয়া ভগবানে চিত্ত সমাধান অভ্যাস করিতে হইবে; এবং অনুক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ঈশ্বরানুধ্যান দ্বারা যথা সময়ে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে।

তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন :—

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৮।৭

ভাগবতে উদ্ধব দ্বারা গোপীগণের নিকট ভগবান্ এই একই উপদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।

অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথনা ॥১০।৪৭।৩২

কিন্তু যদি সম্যক্‌রূপে ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিতে না পারা যায় তাহা হইলে ভগবানেরই অনুগত হইয়া তাঁহারই প্রীত্যর্থ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে চিত্ত তাঁহাতে সমাহিত হইবে। যথা—গীতার দ্বাদশে—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং। ৯

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

ভাগবত বলিতেছেন :—

যদ্যনকশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলং।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ ১১।১১।২২

এইরূপে ভগবানে ক্রমশঃ ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে ভক্ত তখন সর্ব্বভূতে আত্ম দৃষ্টি করিতে থাকিবেন। এই অবস্থায় সাধক শ্রেষ্ঠ যোগী বা ভাগবতোত্তম হইয়া থাকেন। গীতা বলিতেছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৬।৩২

ভাগবত সেই একই কথা বলিতেছেন :—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১১।২।৪৫

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে উত্তম ভক্তের অন্যান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে। গীতার এরূপ একত্র গ্রথিত না থাকিলেও স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

ভা—১১।২।৪৬	ভা—ঐ।৪৭	ভা—ঐ।৪৮
গী—২।৬৪ ; ১২।১৭	গী—১২।১৮,১৯	গী—২।৫৫

ভা—ঐ।৪৯ | ভা—ঐ।৫০ | ভা—ঐ।৫১
গী—১৮।১৭ | গী—৬।৮,৯ | গী—৮।১৪

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ বর্ণিত আছে। গীতায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা কথিত হইয়াছে। যথা—

ভা—১১।১১।৯ | ভা—ঐ।১০,১১ | ভা—ঐ।১২
গী—৩।২৭,২৮ | গী—৫।৮,৯ | গী—১৩।৩২

ভা—ঐ।১৬,১৭
গী—১২।১৩-১৯

যোগীর শরীর ত্যাগ সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন :—৮।১২

সর্ব্ব দ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাং। ইত্যাদি

ভাগবত বলিতেছেন :—

পাষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃত্তরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেত্তনুম্॥ ১১।১৫।২৪

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ে গীতা ও ভাগবতের ভাবৈক্য আছে। প্রবন্ধ বিস্তার ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আমরা আর সেগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করিব না মাত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধা করিয়া দিব।

ভা—১।৩।২১ | ২।৭।৪১ | ২।৭।৪৫,৪৬ | ৩।৯।১১
গী—১০।৬ | ৭।১৪ | ৯।৩১,৩২ | ৭।২১

ভা—৩।২৪।২৫ | ৩।২৬।১১-১৩ | ৩।২৬।১৮ | ৩।২৯।৭-৯
গী—৬।২৯ | ১৩৫,· | ১৪।৩ | ১৭।১১,১৩

ভা—৩।২৯।১২ | ৩।২৯।৩১ | ৩।৩২।৩,৬ | ৪।২৯।৪২
গী—১৪।২৬ | ৯।২৯ | ৭।১৫।৪০,৪৩ | ২।৪৪
| ৮।২৪,২৫

ভা—৪।৩১।১৬ | ৭।১১।১৫,২১,২২ | ১০।৪০।৯
গী—১২।১৮,১৯ | ১১।১৭।১৪,১৫ | ৯।২৩
১৮।৪২-৪৪

ভা—১০।৪৬।২৩ | ১১।৩।৪,৫ | ১১।৩।৬ | ৭।৭।৪৪
গী—৮।৫ | ১৫।৭,৯ | ৫।১২ | ১১।৫৩-৫৫

ভা—১১।৩।৭ | ১১।৩।৮ | ১১।২৮।৩২
গী—৮।১৯ | ৮।১৮ | ৫।৮,৯

এতাবতায় আমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছি যে গীতার ভাবই ভাগবতে উপনিবদ্ধ হইয়াছে এবং ভাগবত গীতার মহা ভাষ্য বা বিশদ ব্যাখ্যা বিশেষ। এক্ষণে এই অভিমত অধিকতর দৃঢ় করিবার জন্য ভাগবত বর্ণিত কতকগুলি উপাখ্যান লইয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে সেগুলি গীতার কতিপয় শ্লোকের উদাহরণ (illustration) মাত্র অর্থাৎ তত্তদুপাখ্যান দ্বারা গীতোক্ত ভগবদ্বাণীর সমর্থন তথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কবি

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

দুঃখ সাগর মন্থন করি নীল কণ্ঠের মত
গরল করিয়া গলাধকরণ—হাস্য-বদনে কত
যোগাইতে সুধা মানবের তরে—যুগ যুগান্ত ধরি
হে কবি দেবতা কি শুভ বারতা আনিছ বিশ্ব ভরি !

দধীচির মত নিষ্কাম ব্রতে দীক্ষিত করি প্রাণ
বিশ্ব সেবায় আপন অস্থি নিত্য করিছ দান !
উঠিছে তোমার বন্দনা গীতি স্বর্গ আকুল করি—
হে কবি দেবতা কি শুভ বারতা আনিছ বিশ্ব ভরি !

তোমার তুলিকা পূবাতনে ওগো দিয়ে যায় কি মাধুরী—
আজিও কাঞ্চি কোশল মগধ হস্তিনা ব্রজপুরি
দিতেছে মানবে অমৃত সুধা কাব্যে কলায় গীতে—
আজিও বংশীধারীর বাঁশরী মুখরিত চারি ভিতে।

আজিও বনস্পতির ছায়ায় শুনি যেন বেদ-গান
হেরি যেন অই শুভ্র তাপস সমাপ্ত করি স্নান
আসিছেন ধীরে—বল্কল হ'তে জলধারা পড়ে খসি—
কোথাও শিষ্যবৃন্দ কণ্ঠে ধ্বনিত "তত্ত্ব মসি !"

তমসার তীর করিছে অধীর আজিও কবির হিয়া,
কল্লোল তুলি বহিছে 'শিপ্রা' মর্ম্মের দ্বার দিয়া,
বিরহ ব্যাধের তীক্ষ্ণ সায়কে আত্ত মিলন ক্ষণ—
বর্ষার মেঘে কি যে ব্যাকুলতা—ঝরিতেছে দু'নয়ন !

কি অমর গাথা শুনাইলে কবি বন-কল্লোল মাঝে—
বিশ্ব হৃদয়ে সঙ্গীত তার মূরলীর রবে বাজে,—
রোগে শোকে তাপে মোহ অবসাদে সান্ত্বনা দেয় নরে—
কি মহামন্ত্র প্রচারিত আজি ভারতের ঘরে ঘরে।

স্বর্গ মর্ত্ত্য সোণার শিকলে বাঁধিয়া দিতেছ নীতি;
দেবতার পদে উঠিছে মানব শুনিয়া তোমার গীতি !
ভক্ত কবির পূরাইতে আশা রাখিতে তাহার মান—
লিখে দিয়ে যান ব্রজের দুলাল— ভক্তের ভগবান !

নিখিলের সব যাউক মুছিয়া, তুমি বেঁচে থাক কবি
তোমার মন্ত্র প্রভাবে আবার জাগিবে বিশ্ব-ছবি—
মৃত্যুরে তুমি করিছ অমর চির সুন্দর করি —
হে কবি দেবতা কি শুভ বারতা আনিছ বিশ্বভরি !

মাসিক কাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

নারায়ণ—শ্রাবণ—

"দুঃখদহন"—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কবিতাটিতে যথেষ্ট ওজস্বিতা আছে। ছন্দোবন্ধও প্রায় নিখুঁত। মাঝে মাঝে ভাষার ত্রুটী আছে। যথা:—"শূন্যচেতন" "স্থূল যেন কে অচল পঙ্গু অধোগতি শুধু জানে।" "মৃতের আর্ত্তধ্বনি শোন কানে,—ভবে গেল ধরা দুঃখের দানে।"—এই "দুঃখের দানে" সুপ্রযুক্ত হয় নাই। "জীবনমৃত্যু এ মহা আহব" "এ মহা জীবনমৃত্যু আহব" হইলেও কতকটা ভাল হইত। আঘাত ও প্রতিঘাত ভাল মিল নহে।

"ঝুলি ভরি তুলি তণ্ডুল কণা
গণ্ডুষ জল পানে,
বাড়ে শুধু ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
ব্যর্থতা ব্যথা হানে
এত বড় তুই এত হীন কেন,
এমন উদার কেন দীন হেন?
আপনা ভুলিয়া এমনি করিয়া
চলিবি পাতাল পানে।" বেশ সুন্দর।

"পল্লীমার মাঠের পথে"—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী। ছন্দের মর্য্যাদা সর্ব্বত্র সংরক্ষিত হইলে এবং ভাষা সর্ব্বত্র অনবদ্য হইলে কবিতাটি অতি সুন্দর হইতে পারিত। মহিলা কবি অনেক স্থলে যুক্তাক্ষরকে দুমাত্রা ধরেন নাই। এ প্রকার চটুল ললিত ছন্দে যুক্তাক্ষর যত বেশী বর্জ্জন করা যায় ততই ভাল। যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রা ধরিলেও এ ছন্দের ললিত গতির মাধুর্য্য রক্ষিত হইত। ভাষার দুর্ব্বলতা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

এ পথে শারদ লক্ষ্মী ছুটিয়া (?) আসে
মাঠে ছড়াইয়া চারু হরিত বাসে (?)
শিশির মুকুতা মালে কদম কিরীট ভালে (?)
গায়ের সুবাস ঢালি (?) কেতকী পাশে (?)
উড়ায়ে চাঁচর কেশ মেঘে আকাশে।

"বাল্যে স্বামী হীনা"—শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। কবিতাটিতে বেশ কারুণ্য আছে ভাষাও অনেক স্থলে সুললিত, ছন্দে দোষ বড় বেশী নাই। মাঝে অর্থ বেশ স্পষ্ট হয় নাই। এ সকল কবিতার সৌন্দর্য্যই সারল্যে। প্রকাশের দোষে স্থলে স্থলে অস্বচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে। উপসংহারের নৈতিকতা টুকু কবিতার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে নাই।

"স্রোতস্বিনীর সংকল্প"—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। মন্দ নহে। শেষ শ্লোকের প্রথমাংশে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "বয়ে নিয়ে যাবো"—"ভরে নিয়ে যাব" হইলে ভাল হইত।

"মুক্তি"—শ্রীকচেন্দ্রনাথ দত্ত। উল্লেখযোগ্য নহে।

"ভাবকায়"—শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথম কবিতাটির ছন্দটি বাংলার ছন্দমঞ্জরীর নিয়ম বিরুদ্ধ। ছন্দটি আদৌ সুমিষ্ট নহে। কবিতার ভঙ্গিটি কবির নিজস্ব নহে—অপর কবির নিকট হইতে আহৃত। কবির ভাবও পুরাতন। কোনো কোনো নবীন কবি এই ভাবটিকে সরলতর ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতায় বিন্দুমাত্র রস জমে নাই। রচনায় সারল্য, প্রাঞ্জলতা বা স্বচ্ছতা নাই। সর্ব্বত্রই কষ্টকল্পনায় কণ্টকিত। ভাষা অত্যন্ত অসাবধানতার সহিত বিন্যস্ত। কতকগুলি উদাহরণ দিই—

"তোমরা শুধু জান আমায় করতে পটু কপটতা"
"কথায় কথায় ফেলতে চোখের জল,
চোখের সে জল মুছতে আমার ছল"
"কবরীটির এলিয়ে দিতে বেণী"
"তিলক লেখা মুছিয়ে,
যেথতাম সাজের অতীত রূপ যে সাজের সজ্জা মুচিয়ে।"

"নিত আদরে অনাদরের তুলে ধুয়া শতেক ছুতা"
এ রাজভোগ ও রাজ্যপদও পেয়ে,
বলি যদি গোকুল ভাল এই চেয়ে,
মানবে না কেউ বলবে সবাই মিছে তোমরা কইবে ঠাট এ।"
"গোকুল আমাব মহাবাজ্য গোকুল যে তাই শ্রেষ্ঠ সুখ"
"তাইত এ রাজপোষাক ছেড়ে পীত ধড়াই চাহে হিযা।"
"কেউ ত আমার বসেনাক পাশে
বল্লে তারা নতশিরে হাসে।"
প্রাণ দিতে সব বারণ করে প্রাণ বধিতে দেয় তাড়া।"
"দুঃখে এ তাই রুক্মে মুড়ে নিয়ে
প্রাণের দোসর কবে আছি জিয়ে"
ইত্যাদি।

'ছুতো'—'কোথা'; 'সবাই—কাটাই; 'রুক্মিণী—শরীরিণী; ইত্যাদি অধম মিল। ৩য় শ্লোকে ৬।৭, ৪র্থে, ১, ৫মে, ১, ৭মে ১ পংক্তিতে ছন্দঃ পতন হইয়াছে। এরূপ গীতি কবিতায় ৪ পংক্তিতে যদি একটী বাক্য (Sentence) শেষ হয় তাহা হইলে বচনায় কি মাধুর্য্য থাকে? উদাহবণ স্বরূপ উপরি উদ্ধৃত "এ বাজভোগও . ঠাটে এ" অংশটিব উল্লেখ করা যাইতে পাবে। বড়ই দুঃখেব বিষয় এত দিনেও বসন্ত বাবুব বচনায় সাবলীল গতি আসিল না। একটি মাত্র পংক্তি ললিত মধুব হইয়াছে—"গাছেব ছায়ায় মায়ের মায়ায় ধূলায় কাদায় সবায় লয়ে।" আব একটী মাত্র পংক্তি বেশ সরল সুন্দর হইয়াছে—তাহা এই কবিতার শেষ পংক্তি।

"বংশী মুগ্ধা"—শ্রীগিরিন্দ্রমোহিনী দাসী। বারীন্দ্রের "দ্বীপান্তরের বাঁশী" পাঠে লিখিত।

"পদ্মার পরীক্ষা"—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী। কবিতার উপক্রমণিকা টুকু সুরচিত হয় নাই। বাকী অংশ মন্দ নহে। রচনায় বেশ সহজ প্রবাহ আছে।

"জীবনযাত্রা"—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ যোগ্য নহে।

নারায়ণ—আশ্বিন—

"হাসিয়ে দিলে"—শ্রীকিরণচন্দ্র দরবেশ। কবিতাটি আমাদের বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে। ভঙ্গিটিতেও বেশ নবীনতা ও সরলতা আছে।

"নন্দোৎসব"—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়:—সুন্দর কবিতা। তুষ ঘেঁটে ঘেঁটে এইবার ২।১টী দানা পাইতেছি।

কচি দুটী হাতে কে তুমি ভাঙিলে
কারাব লোহাব শিকলি
হাসিব ধারাটি কে তুমি গড়িলে
গোকুলেব কূলে উছলি
* * * *
প্রেমের ফল্গু কে তুমি বহালে
গোপনীয় হিয়া উথলি
ব্রজের গোপাল নন্দ দুলাল
যশোদার প্রাণ পুতলি।

এ পংক্তিগুলি বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে। দু এক স্থলে মিলেব একটু আধটু ত্রুটী আছে কবিব সেদিকে লক্ষ্য বাখা উচিত।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায়েব বাংলা সাহিত্যেব অভিব্যক্তি নামক প্রবন্ধে প্রচুব অনধিকাব চর্চ্চা আছে। বসন্তবাবু এমন নীরস মাধুর্য্য হীন অবিন্যস্ত অসংলগ্ন ভাষায় গদ্য লিখিতে সাহস করিয়াছেন এবং তাহাই নাবায়ণে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে বড়ই দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। বসন্তবাবু বঙ্গমাতার কাব্যের নৈবেদ্যে অজস্র পাহাড়ে কাঁকব ঢালিয়া দিয়াছেন আবাব গদ্যেব আরতি সভায় ভাঙা কাঁসী বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। বসন্তবাবু যে বৈষ্ণব সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস এবং বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাহা এই প্রবন্ধে ঘোষণা করিয়া জানাইয়াছেন।

"পতিতা"—শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায়। বঙ্গদেশের পতিতা-সাহিত্যে এ কবিতাটি টিকিয়া যাইবে। কবিতাটি মন্দ হয় নাই। কবিতাটি পড়িয়া শরৎ বাবুব চরিত্রহীনেব 'সাবিত্রীকে' মনে পড়ে। পাতিত্য সমস্যা বঙ্গসাহিত্যকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এ সমস্যা লইয়া সমাজের মাথা ঘামাইবার অবসর কই?

"অন্তর্দ্ধানে"—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কবিতার বিন্দুমাত্র মৌলিকতা নাই। মাঝে মাঝে রচনা চাতুর্য্য আছে। ছন্দঃও মিল সর্ব্বত্র নিখুঁত নহে।

"প্রেমের জোয়ার"—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। এই লেখকের যে কয়টি গান সমালোচিত হইল তন্মধ্যে এইটিই সব চেয়ে ভাল।

"বাধা বিচার ত নাইক কিছু সবারি আজ পূরবে আশ
আয়রে ছুটে জগাই মাধাই আয়রে ছুটে হরিদাস।
উঠেছে আজ নূতন সুর এযেবে ভাই শান্তিপুর
জেগেছে আজ নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের পরশ পেয়ে॥"

মন্দ হয় নাই।

নলিনীবাবু ভাষা ও ছন্দের প্রতি আরো অবহিত হউন তাঁহার কবির প্রাণ আছে।

"ভুল"—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী। চলনসই।

প্রবাসী—শ্রাবণ—

"হাসি"—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর কবিতার কয়েকটি পংক্তি বেশ সুন্দর হইয়াছে। যথা—

অশ্রুসাগর পার হয়ে আজ এলো আমার হাসি
ভাঙাবুকের বেলায় বসি বাজায় বাঙা বাঁশী।"
কণ্ঠে মোহন মতির মালা স্বাতীর জ্যোতি ভরা॥
"তুষার তোরণ পেরিয়ে এলে ফুল ফাগুনের মধু।"

"ফুল"—ঐ—। কবিতার ভাবটি বেশ ভঙ্গিটিও সুন্দর।

"বর্ষাচিত্র"—শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। ললিত পদে ঝঙ্কারে ও অনুপ্রাসে কবিতাটী বেশ চলচলে সুন্দর। মিলগুলি সবই প্রথম শ্রেণীর। কবি ভাষা সম্পদে ঋদ্ধ, চিত্রাঙ্কনী প্রতিভাও আছে। কবিতাটী তুলিয়া দেওয়ায় ইচ্ছা ছিল স্থানাভাব প্রযুক্ত তুলিতে পারা গেল না। রসজ্ঞ পাঠককে কবিতাটি পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রবাসী—ভাদ্র—

"বনফুলের" "বিয়ের ফুল"—১ম কবিতা। কবিতার ভাবটি বেশ কিন্তু সুকৌশলে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ভাবের পক্ষে কবিতার ছন্দটি বেশ উপযোগী হয় নাই।

"আকাঙ্ক্ষা ও উত্তম"—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৪টী সনেট। রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের অনুসরণে রচিত। সুন্দর কবিতা। কবি বলিতেছেন—

"লক্ষকোটি বাসনারে নাহি করি ভয়,
সামর্থ্যেরে যদি তাহা করে পরাজয়
লাজে যেন পাই প্রভু।"
আমার আমিত্ব সে যে তোমার আদেশ,
তার মাঝে যদি থাকে কোন শঙ্কালেশ
লাজে যেন মরি প্রভু! উচ্চে তোলা শির
যদি কভু হয় নত, যদি অশ্রুনীর
ফোটে চোখে দীনতার, যদি বাহু দুটী
ক্ষুদ্রতার আরামেতে রহে সদা লুটি
ধূলিপরে অসহায়, যদি স্কন্ধে তুলি'
বহি নিত্য অপমান ভরা ভিক্ষাঝুলি,
অবজ্ঞায় কেহ যায় পদে দলি,
অপমানে যদি বক্ষ নাহি ওঠে টলি,
তোমার আসন তবে দগ্ধ হবে জানি
মর্ম্মতলে; আশীর্ব্বাদ আনন্দের বাণী
স্তব্ধ হবে চিরতরে জীবন বীমার,
বিড়ম্বনা হবে মোর এ পার ও পার।"

কবি রাজসিকতার গান গাহিয়াছেন তামসিকতা পরিহাস করিতে বলিয়াছেন।

"প্রাবিট পূর্ণিমায় গান"—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। মন্দনয়।

"বনফুল" সাধারণতঃ কবিতায় ৪টী সত্যকথা বলিয়াছেন।

"সর্ব্বদমন"—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতাটি সত্যেন্দ্র নাথের উপযুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বদমনের মুখে lecture এর দীর্ঘতার জন্য কবিতার সৌষ্টব ক্ষুন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি বেশ সুন্দর।—

"হিমালয় হতে মলয় নিলয় অঙ্কিত যাঁর যজ্ঞযূপে"
"স্তিমিত প্রদীপে তৈল টোপায় মনিময়ুরের চঞ্চু দিয়া।"
"ক্ষত্রিয় হয়ে খড়্গ হানে ও ক্ষমা ভিখারীর কণ্ঠপরে"
"এযে অকার্য্য, এযে অনার্য্য এ যে ধর্ম্মের অমর্য্যাদা"
"দেশের ইচ্ছা দলের ইচ্ছা ইচ্ছা সে জগদীশ্বরেরি।
"ঘৃণ্য সেজন কর্কশমন কৃপায় কৃপণ কৃপান পাণি"

এই কবিতার— নজরবন্দী জেয়াদা ইত্যাদি পার্শী কথাগুলো ভাল শুনাচ্ছে না। পক্ষান্তরে—'বিদ্যুৎছুরি' 'স্বর্গে তাজা' মানুষ জগতে' ইত্যাদি শব্দ বিন্যাসেও আমাদের আপত্তি আছে।

একটী তামিল কবিতা—ঐ। একটী বীরাঙ্গনার কথা। অনুবাদ মন্দ হয় নাই।

"ছন্দ হিন্দোল"—ঐ। কবিতার ছন্দটি অতি সুন্দর। ছন্দোরচনায় কবির যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও আছে। কবিতাটিতে ছন্দোমাধুর্য্য ও ছন্দোহিন্দোলের খাতিরে অনেকস্থলে সার্থকতা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। 'হেমকদম্ব' কি ? 'হর্ষের অশ্রুবিন্দু' ঘাসের ডাটায় ফুটিয়া উঠিল। ভাবটি সুষ্ঠু হয় নাই। খঞ্জন মৌননৃত্যে মগ্ন থাকুক তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু খঞ্জনের কথা বলিয়াই মেঘ সমুদ্রের মন্থনের কথা কেমন করিয়া আসে ? খঞ্জন শুধু নৃত্য আনে নাই 'মন্থন'কেও টানিয়া আনিয়াছে। তারপর 'দগ্ধদৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন' এই পংক্তিতে অনুপ্রাসের গোলমালে অর্থটাও হারাইয়া গিয়াছে। "চিত্ত নন্দন দেবীচন্দন ঝরছে' বিশ্বের ভাসছে দিশপাশ" "উড়ছে কেশপাশ" লিখলে আরো অনুপ্রাস বাড়িত। ভাসছে বিলখাল "ভাসছে বিলকুল, ঝপসা ঝাপটায় হাসছে যুঁইফুল" সত্যেনবাবু "বিল খাল" এর পর যে "বিলকুল" দিবেন তাহা আমরা জানি কিন্তু জুঁইফুলের স্থলে কেন যে "তিলফুল" দিলেন, না বুঝিতে পারিতেছি না। "বৃন্তে ছমছম স্তব্ধ ভঙ্গীর" ব্যাপারটা কি বুঝিলাম না।

"সলজ্জদৃষ্টি" শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। সুন্দর কবিতা।

'স্বদেশপ্রীতি'—Scott এর Patriotism নামক কবিতার অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ।

বিদ্যাপতি

[শ্রীননীগোপাল জোয়ারদার]

কবে কোন্ সিত পক্ষে বাসন্তী নিশায়,
কুসুম কানন মাঝে বসি' যোগাসনে,
গেয়েছিলে পদাবলী প্রীতির ভাষায়
রাধাশ্যাম-লীলামৃত মধুপ গুঞ্জনে ?

মূর্চ্ছিত মলয় তব পড়ি পদ তলে
মাধবী ভাণ্ডার তার মেলি' অতুলন,
কোকিল কাকলি থামি' লহরে লহরে,
শুনেছিল তব গান মধুর মোহন।

সঁপেছিলে যেই প্রীতি ইষ্ট দেবতায়,
তুষ্ট সেই ইষ্টদেব তোমার সঙ্গীতে।
সাশ্রুনেত্র প্রীতিপ্লুত অরুণ আভায়
চেয়ে তব মুখপানে প্রীতির ইঙ্গিতে।

উপমার মাল্যকণ্ঠে কবিকণ্ঠ হার,
অতুল ঐশ্বর্য্য তব ঝঙ্কার তোমার।

“সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তাটনী পারাপার,
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে দুকুল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা ল'য়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।”

পৌষ—১৩২৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনী

“জাতির কর্মফল” ( )

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি-এ,]

আধুনিক যুগের সভ্যমানুষকে জীবন-যুদ্ধে তাল সামলে [illegible] সব জাতির ও নাম বজায় রেখে চলতে হ'লে তিনটি [illegible] জিনিষ আয়ত্ত করা দরকার। সে তিনটী [illegible] বিদ্যাবুদ্ধি, স্বাস্থ্যশক্তি আর অর্থসম্পদ। [illegible] এর কোন একটির অভাব হ'লে সে সভ্যতার [illegible] খাড়া করে দাঁড়াতে পায় না, [illegible] পারেই না। এর কোনটী [illegible] [illegible] যায় না [illegible] ব্যক্তি সম্বন্ধে যা [illegible] বর্তমান [illegible] সভ্যজাতি সম্বন্ধেও তাই। সমাজ [illegible] ব্যক্তি-সমষ্টিরই ঘনিষ্ঠসংঘ। কাজেই যন্ত্রের [illegible] মত জাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ [illegible] তত উন্নত ও কর্মক্ষম। যে কোনো সভ্য জাতের মধ্যে তিনটী স্বাভাবিক দল দেখা যায়; সমাজের স্বভাব গঠনের ফলে এই তিন ভাগ দেখা দিয়েছে। অভিজাত দল (aristocracy); মধ্যবিৎ দল (middle class) আর শ্রমজীবী দল (proletariat)। চাষাভূষা কর্মকারেরা এই শেষদল ভুক্ত। মোটামুটী আমরা দেখি অভিজাত দল অর্থ সম্পদের অধিকারী, মধ্যবিদরা বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী আর শ্রমজীবিরা দৈহিকশক্তির অধিকারী। ব্যক্তির যেমন অর্থ বিদ্যা ও শক্তির সমন্বয় হ'লে তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়, সে জীবনযুদ্ধে সবচেয়ে সুবিধাশীল হয়; কোন জাতির এই সম্প্রদায় এই তিনশক্তির সমন্বয় হলেও সেই জাত [illegible] [illegible] চেয়ে জয়শীল হয়। দৃষ্টান্ত মার্কীন, জর্মাণ ফরাসী ইংরাজ জাতিগুলি। সেখানে দেখি প্রত্যেক সম্প্রদায় কমবেশী এই তিন শক্তিকে নিজ অঙ্গে সঞ্চয় করেছে এবং করছে। কেবল আমাদের দেশেই প্রত্যেক সম্প্রদায় একটীমাত্র শক্তিতে যা কিছু বলীয়ান। আমাদের দেশের অভিজাতবর্গীয়েরা অর্থসম্পদে সম্পন্ন, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি বা দৈহিক বলে হীন। মধ্যবিৎরা স্বাস্থ্যে ও অর্থে হীন কেবল বিদ্যাবুদ্ধিই সঞ্চয় ক'রছে তাও কার্য্যকরী বিদ্যাবুদ্ধি নয়। আর শ্রমজীবীরাই যা একটু স্বাস্থ্যও বলের অধিকারী,

বিদ্যাবুদ্ধি বা অর্থে উভয়েই পশ্চাৎপদ। ইহাদের স্বাস্থ্য ও বল আবার নামমাত্র, তবে উর্দ্ধতন দু'দল অপেক্ষা বেশী ঘটে। আবার দেখি অভিজাত বর্গের যে অর্থ-গৌরব তা পৈতৃক সম্পত্তির উপভোগে; আধুনিক উপায়ে তা বাড়াবার কোনো চেষ্টা নাই; যে টুকু অর্থবল আছে তাঁদের তা স্বার্থসুখ ও বিলাসিতায় ব্যয় হয়, দেশের কোনো কাজে লাগেনা। মধ্যবিত্তের যা বিদ্যাবুদ্ধি তা কেতাবী সৌখীনী বিদ্যাবুদ্ধি; অর্থ বা স্বাস্থ্যে নিয়োজিত হয় না আর হবার লক্ষণও নাই। শ্রমজীবীদের যেটুকু স্বাস্থ্যশক্তি তা আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অত্যাচার সহ্য করাতেই ব্যয়িত হয়।

প্রত্যেকের মধ্যে এই ত্রিশক্তির সঞ্চয় হয়ে সকলে মিলে সমবেত চেষ্টায় বেঁচে থাকবার কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই। organism বা জীব-যন্ত্রের সমূহ-কল্যাণ অঙ্গগুলির co-operation এ অর্থাৎ ঐক্যসাধনেই হয়।

জাতিরও সমূহ-কল্যান সম্ভব হয় তখন যখন এই তিনটী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযবন্ধন ঘটে। আমাদের জাতীয় অঙ্গের এই প্রত্যঙ্গ তিনটী যেন প্রতিজ্ঞা করে নন্‌-কো অপারেশন ব্রত নিয়েছে। এটা অস্বাস্থ্য জাতির স্বভাব ধর্ম্ম! অভিজাতবর্গ বংশ ও ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে স্ফীত হয়ে ল্যাজ পাকিয়ে উচ্চ আসন গড়ে তাইতে আপন মর্য্যাদায় চক্ষুবুজে বসে আছেন, মধ্যবিৎদের বিদ্যাবুদ্ধি আর শ্রমজীবিদের হাড়-সার চোষন করে বিলাসব্যসনে আরাম ভোগ করছেন। নিম্নদল দুটী তাঁদের উপভোগের মসলা রসদ জোটায়। মধ্যবিৎরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে খেয়াল দেখাচ্ছে; আর শ্রমজীবিরা মরিয়া হয়ে ব্যাধি অনাহারের সঙ্গে লড়াই করে' বলক্ষয় করছে! অভিজাতের অর্থবল, মধ্যবিত্তের বুদ্ধিবল আর শ্রমজীবীর দেহবল একত্র কাজ করে যে দেশের দুঃখ দৈন্য দূর করবে তার কোনো চিহ্ন তেমন দেখা যাচ্ছে না। আর একত্র হয়ে যে কাজে লাগবে তার কোনো সজ্ঞান চেষ্টাও দেখা যায় না।

এই একযোগিতায় বাধা ঘটনে অপরাধী কোন দল সব চেয়ে বেশী তা যদি আলোচনা করা যায় তা হলে মনে হয় প্রথম উপরকার দুই দলই বেশী; আবার এই দুদলের মধ্যে বেশী অপরাধী সবচেয়ে উপরের দলটী অর্থাৎ অভিজাত বর্গীয়রা। কেননা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে মধ্যবিৎরা তবু তাদের বিদ্যাবুদ্ধি নিজেদের বাঁচিয়ে যে টুকু উপত্তি থাকে তা দিয়ে দেশের জন্যে কিছু একটা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু অগ্রস্থানীয় অভিজাতরা তাও বাজী নন; অবশ্য দু চারজন ছাড়া। একথা স্বীকার করতে হবে আমরা যে টুকু আত্মোন্নতি করিছি তা এই মধ্যবিৎদের চেষ্টায়। তাঁরা যে পুরা মাত্রায় সফল হচ্ছেন না তার কারণ অর্থাভাব আর দৈহিক বলাভাব। এক হিসাবে মধ্যবিৎরা দু-পা খোঁড়া। এঁদের না আছে পয়সার জোর না আছে স্বাস্থ্যের বল। বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে এই দুইটী বল যোগ হলে তাঁরা আরো অনেক কাজ করতে পারতেন। রক্ত যেমন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চলাচল হয়ে সবগুলিকে সতেজ সরস ও কর্ম্মক্ষম করে, জাতীয় জীবনের অঙ্গে তেমনি সহানুভূতি সমস্ত স্তরে স্তরে চালিত হয়ে তাকে কর্ম্মক্ষম ও সজীব করে রাখে। আমাদের জাতীয় দেহে এই জিনিসটীর অভাব। প্রত্যঙ্গস্বরূপ এই তিনটী দল একরকম পরস্পর হতে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে থাকায় একটা শক্ত খোসায় যেন প্রত্যেকটী কোটর-বদ্ধ হয়ে অসাড় হয়ে পড়েছে।

আমার মনে হয় ইংরেজরা এদেশে আসবার আগে আমাদের সমাজের এই তিনটী স্তরের পরস্পরের সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগ ছিল। তখন অন্যসব দোষ যতই থাক এই সহানুভূতির যোগটা বেশী ছিল, আর এখন অন্য সব যত গুণই জন্মে থাক্ এই নাড়ীর যোগটা কেটে গিয়েছে।

এটা তখন সম্ভব হয়েছিল আমাদের পল্লীজীবনের ব্যবস্থা গুণে। তখন পল্লীর গণ্ডীর মধ্যে জমীদার মধ্যবিৎ আর শ্রমজীবি একত্র বাস করার জন্যে আর Common interest বা স্বার্থসম্বন্ধ থাকার গুণেই দায়ে পড়েও একযোগে জীবননির্ব্বাহ করতো। তখন স্বার্থের গরজেই তিনস্তরের মধ্যে একটা নিগূঢ় সংযোগ রাখতে বাধ্য

ছিল। কতকগুলা সামাজিক ও ধর্ম্মানুষ্ঠানগত ক্রিয়াকলাপ সূত্রে একের অন্যকে দরকার হতো।

এখন যেন এ সম্বন্ধ ছিঁড়ে গিয়েছে। আধুনিক কর্ম্মকেন্দ্র পল্লী ছেড়ে বড় বড় নগরে এসে পড়েছে; আর প্রত্যেক দলের কর্ম্মজীবন আলাদা হয়ে গিয়েছে। জমীদার তাঁর বিলাসিতা ও সাহেব সাধনায় নিরত; মধ্যবিৎ তার চাকরী নিয়ে ব্যস্ত; শ্রমজীবিরা তাদের প্রাণরক্ষা নিয়ে অস্থির। এমন কোনো একটা উপলক্ষ্য নাই যার অছিলায় এই তিনটী দল অন্ততঃ একবারো একত্র মেলে মেশে। যে সব সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, উৎসব উল্লাস, ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষ্য করে তিন দলে মেলামেশা হতো ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা বুঝতো তা একপক্ষে পেটের তাড়নায় ও অপরপক্ষে উপাধি উপাসনার কল্যাণে ঘুচে গিয়েছে। এখন তিন-দলের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে দেনা পাওনার সম্বন্ধ হয়েছে।

বড় ছোটকে কৃপার চক্ষে দেখেন, ছোট বড়কে ভয়ের চোখে দেখেন। আমরা শিক্ষিত মধ্যবিৎরা চাষাভুষাকে দূর হতে করুণা (pity) করার পারভাবে দেখি আমাদের স্বদেশ-সেবা বা জন-সহানুভূতি অনেকটা কৃত্রিম; আরামী (arm chair) সহানুভূতি, কলমের চোখ দিয়ে আমরা গরীবদের জন্যে মসী অশ্রু বিসর্জ্জন করি। আবার আমাদের সঙ্গে অভিজাতদের যে সংযোগ তাও বেচা-কেনার সম্পর্ক। তারা মধ্যবিৎদের সঙ্গে মেশেন সেইটুকু এবং সেই সময়ে যখন মধ্যবিত্তের বিদ্যাবুদ্ধি দরকার হয় রাজ-দরবারে উপাধি সংগ্রহের দরখাস্ত লেখাতে বা ওকালতি করাতে বা জমীদারী চালানোতে। কথা উঠতে পারে জমীদার বা মধ্যবিৎ শ্রেণীরা কি কোনো বিষয়েই নিম্ন-শ্রেণীর মুখের দিকে তাকায় না?—কত জমীদার তো প্রজার জন্য স্কুল কলেজ হাঁসপাতাল করেছেন, দানধ্যান করছেন। কত গুণীজ্ঞানী মধ্যবিৎ তো দেশের সেবা করছেন।—উত্তরে বক্তব্য—এমনের সংখ্যা কয়টি? ষোলো আনার মধ্যে এক আনামাত্র তারও নপাই নামযশ লোভে। দু একজন মধ্যবিৎ এই ধরণের নিঃস্বার্থ-সেবী।

মোট কথা—আমাদের জাতীয় অঙ্গের তিনটী প্রত্যঙ্গই পরস্পর বিযুক্ত, স্ব-তন্ত্র আত্মকেন্দ্রী। অর্থাৎ ইহারা স্বভাবে "নন-কো অপরেশন" ধর্ম্মী।

একতো প্রত্যেক শ্রেণীটীর মধ্যেই সমস্ত গুণশক্তির সহযোগিতা নাই, তার উপর এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীরও সহযোগিতা নাই, এতে যা অপকার হবার তা হচ্ছেই; এর উপর চেষ্টাচরিত্র করে যে টুকু সুবিধা সুযোগ পেয়েছি তা আপনাহতে অভিমান করে ছেড়ে দিলে কি সুবিধে তা ভেবে পাওয়া যায়না। কেবল নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার মতলব বটেতো? বা যাকে বলে—চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।

সে যাক্ এখন আমাদের অসুস্থ জাতীয় দেহটাকে সুস্থ সবল ও কর্ম্মক্ষম করতে হলে দরকার, প্রত্যঙ্গগুলি মিলে মিশে কাজ করে প্রত্যেকের ও সমষ্টির সহযোগিতা করবে। অর্থাৎ অভিজাতবর্গ, মধ্যবিৎ ও শ্রমজীবি দল পরস্পরের মুখ চেয়ে কাজ করবে। এবিষয়ে সবনীচু স্তর পূর্ণমাত্রায় উপরি দুটী স্তরের মুখাপেক্ষী। শ্রমজীবিদের ভাল করা মনে দেশেরই ভাল করা, দেশের ভাল হলেই নিজেদের ভাল।

যদি বলা যায় কোন দলের দায়িত্ব বেশী? কাদের পথপ্রদর্শন করা উচিৎ? তা হলে বলতেই হবে অভিজাত-বর্গের দায়িত্ব বেশী। কেন না তাঁরা তাঁদের সুখসম্পদ পদমর্য্যাদার জন্য এই সব নীচু দলটার কাছে বেশী কৃতজ্ঞ।

এ কারণটা এত সোজা যে তর্কের দ্বারা কাকেও বোঝাতে হয়না। মেষ ও মেষপালকের মধ্যে যে সম্বন্ধ এদেশে ওদেশে সব দেশেই জমীদার প্রজার সেই সম্বন্ধ। দেশের চাষাভুষা কৃষকদল দায়ে পড়ে দেহের রক্তকে জমীদারের সোণার তালে গড়ে তুলছে—অন্ততঃ এই টুকু ভেবেও যদি জমীদারবর্গ প্রজাদের জন্য একটু সুখসম্ভোগ স্বার্থ ত্যাগ করেন! কিন্তু তা করবার মত মনের বল

বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নাই,—এগুটী তাঁদের অর্জ্জন করতে হবে। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধি ও দৈহিক কার্য্য তৎপরতার সহযোগিতা ঘটাতে হবে।

আমরা মধ্যবিত্ত দলের লোক। আমাদের ঠিক শুষ্ক দেহ রোগজীর্ণ, উদর অন্নহীন, সম্বলের মধ্যে মেকী বিদ্যা ও অকার্য্যকরী বুদ্ধি। তবু যা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি তা ওই বিদ্যাবুদ্ধির জোরে, মাথা তুলে দাঁড়ানো মানে ব'লো মতে টীকে থাকা। তাহলেও আমাদের মধ্যে যে কজনের একটু কাজের লোক বলে নাম ডাক আছে তাঁরা কার্য্যতঃ নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে কতটা আসল খাঁটী সংযোগ রেখেছেন? বিপুল-জনসংঘের সঙ্গে আসল সহযোগিতা তাঁদের কতটুকু? এ অসহযোগিতা ইচ্ছা ঘটিত নয় ত সত্য। এর কারণ আমাদের মেকী বিদ্যা ও অকেজো কর্ম্মবুদ্ধির অভাব। আমাদের দুষণীয় শিক্ষার ফল। আমাদের দৈহিক কার্য্য তৎপরতার অভাবে, আমাদের অর্থাভাবের ফলে।

জনসাধারণের সেবা করতে আমরা ইচ্ছুক, কিন্তু অর্থ ও স্বাস্থ্যের অভাবে ও ঠিক কার্য্য পদ্ধতির জ্ঞানাভাবে আমরা কিছু করে উঠতে পারছি না। আমাদের মধ্যে কার্য্যকরী বিদ্যাবুদ্ধি জাগানো দরকার, তার সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শক্তির সহযোগিতা ঘটাতে হবে।

মধ্যবিত্তদের বিদ্যাবুদ্ধি যদি অভিজাত বর্গের অর্থ বলকে নিজের দিকে টেনে এনে একযোগ হয়ে কাজ করাতে পারে তবেই সংঘের মধ্যে অর্থ, বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বাস্থ্য একসঙ্গে দেখা দেবে। তখন তিনদলে মিলে সহযোগিতা করলে তবে যে কোনো দেশব্রত সাধন সহজসাধ্য হবে।

সমাজ-দেহের মাথা, হাত, আর পা সহযোগী হয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলে তবে উন্নতির সব বাধা দূর হবে। তার আগে কদাপি না। নিম্ন জীবের সমস্ত শক্তি তার ব্যক্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যয় হয়, কিন্তু মানুষের মত উচ্চ জীবে অর্জ্জিত সমস্ত শক্তিই ব্যক্তিত্ব রক্ষার ব্যয় হয় না; ব্যক্তিত্ব বাঁচিয়েও তার অনেকটা অংশ পড়ে থাকে যা জাতিত্ব রক্ষার জন্য দরকার হয়।

ধনীর সমস্ত অর্থ, মধ্যবিত্তের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি উদ্যম বা শ্রমজীবীদের সমস্ত দৈহিকশক্তি নিজের নিজের কাজে ব্যয়িত হয়েও অনেকটা জমার ঘরে বেড়ে উঠে সঞ্চিত থাকে, সভ্য উন্নত দেশে এই বাড়ন্ত ভাগটুকু দেশের ও স্বজাতির উৎকর্ষ সাধনে ব্যয় হয়। আমাদের দেশে যে ধনী, গুণী ও শ্রমীর প্রত্যেকের বাড়ন্ত শক্তিকে দেশের কাজে লাগাতে পারেন না তার কারণ ধনীর পক্ষে প্রবৃত্তির অভাবে গুণীর পক্ষে সময়ের অভাবে ও শ্রমীর পক্ষে জ্ঞানবস্ত্রের অভাবে। অবশ্য সবেরই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত আছে দুচার জন ধনী গুণী যে তাঁদের অর্থ বা বিদ্যা বুদ্ধিকে দেশের কাজে ব্যয় করছেন না একথা বলে মিথ্যা বলা হয়। তবে দেশের অবস্থা অনুসারে যতটা হওয়া উচিৎ তা হচ্ছে না। একথা মানতেই হবে যে নিম্নস্তরের জনসাধের অবস্থা-উন্নতির জন্য যে পরিমাণ গুণী ও ধনীর সহযোগিতা দরকার তা হচ্ছেই না। মহাত্মা গান্ধীর মত কজন মধ্যবিত্ত দারিদ্র্য ও দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে দরিদ্রের ব্যথা বা অভাব বোঝবার চেষ্টা করছেন? মধ্যবিত্তদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার ক'রছেন এমন দৃষ্টান্ত দু চারটী আছে কিন্তু জমীদারদের মধ্যে কে এমন আছেন যিনি কাউণ্ট টলষ্টয়ের মত দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন বা তাদের ছেড়ে দিয়ে দেশব্রত নিয়েছেন? একটীও ত মনে পড়ে না। সর্ব্বস্ব ছেড়ে দেওয়া দূরের কথা জনসাধারণের সঙ্গে এদের যে পূর্ব্বকালীন একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল তাও কেটে দিয়েছেন। এখন কৃষক সম্প্রদায় তাদের জমীদারদের দেখে এ দেশে কাঁপে নায়েব গোমস্তার মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে।

পল্লীতে সে কালে জমীদার, মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবীরা মিলে মিশে অনেকটা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত ছিল; একটা স্বার্থের গরজে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা ছিল; এখন সে একান্নবর্ত্তিতা ভেঙ্গে গিয়েছে; জমীদার রাজধানীতে চলে এসে ব্যসনে বা বিলাসিতায় মধ্যবিত্ত অর্থ বা যশমান লাভে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে, পল্লীতে পড়ে আছে কেবল চাষাভুষা যাদের গত্যন্তর বা অন্য কাম্য কিছুই নাই। কাজেই আর পরস্পরের মধ্যে সে আত্মীয়তা সহানুভূতি নাই।

কার দোষে যদি বলেন তা হলে কোনো পক্ষকে না চটিয়ে বলাই ভাল "জাতির কর্ম্মফল !"

মানুষের ইহজীবনের শাস্তির জন্যে পূর্ব্বজীবনের কর্ম্মফল দায়ী হয় ; জাতির আধুনিক শাস্তির জন্যে তার অতীতের কর্ম্মফল দায়ী। কেননা জাতির পূর্ব্বজন্ম মানেই তার অতীত ইতিহাস।

ফলে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে নিজেদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা না জাগলে পরনির্ভরতা অগ্রাহ্য করতে বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে বলা হয়। কিন্তু পাঠক পাঠিকারা ভাবুন সেটা করা কি উচিৎ ? বিশেষ যখন নাসা অঙ্গ, যার উচ্চতার গুণে আমরা মানুষ। আর্য্য হবার আশা রাখি। যার নিম্নতার দোষে মানুষ আমরা মঙ্গলো দ্রাবিড়ী বলে শাসিত হই এবং যার অভাবে একেবারে অনার্য্য কোল ভীল হয়ে যাবার ভয় রাখি।

বাঙ্গলার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সাহিত্য

[শ্রীসুকুমার দাশ গুপ্ত বি-এ]

(১)

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের পুস্তক সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তন্মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যাই অত্যধিক। কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনী ও ইতিহাস প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ উপন্যাসের তুলনায় অতিশয় সামান্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি কি অবনতি সূচিত হইতেছে, অদ্য আমরা তাহার বিচার করিব না। সাহিত্যের অপর একটি প্রয়োজনীয় বিভাগে কতটুকু প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়াছে—তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যে আত্মবিস্মৃত জাতির জাতীয় জীবন অপরের স্বার্থ সংঘাতে শৃঙ্খলিত ও মৃতপ্রায়, যাহার রাষ্ট্রীয় অধিকার কৃপণ দাতার নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ সামান্য কণিকার ন্যায়, তাহার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টি কখনও সম্ভব কি ? বঙ্গসাহিত্যের এই দিকটা আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতঃ এরূপ চিন্তাই জাগিয়া থাকে। প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য স্বদেশের অমূল্য সম্পদ আর আমরা এ সম্পদের পূর্ণ অধিকারী নহি। মধ্যে মধ্যে কয়েকজন স্বদেশপ্রাণ কবি ও গ্রন্থকার নূতন সুরে ও বিভিন্নভাবে দেশমাতার অতীত গৌরব, বর্ত্তমান বেদনা ও ভবিষ্যৎ আশার গান গাহিয়াছেন, কিন্তু বিবিধ কারণে তাঁহাদের গান পঞ্চম সুরে বাজিয়া উঠিতে পারে নাই—কল্পনাদেবী যেন ভীত, সন্ত্রস্তভাবে বিচরণ করিয়াছেন। অন্যান্য স্বাধীনদেশের চারণকবিগণের ন্যায় তাঁহারা প্রাণোন্মাদী সঙ্গীতধ্বনি তুলিতে পারেন নাই। চঞ্চল বিদ্যুৎ-লেখার মত সে সঙ্গীত কেবল ক্ষণিকের আলাময়ী প্রচেষ্টামাত্র।

জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত যে জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না একথা চিরদিন সম্পূর্ণ সত্য নহে। মর্ম্মবেদনার কারণ যখন বিশেষরূপে বিদ্যমান তখনই তাহা ধ্বনিত হইয়া উঠিবে ; আর বেদনা ঘুচিয়া গেলে তাহার অতীত তীক্ষ্ণতা পুনরায় সঞ্চারিত করা আংশিক-

ভাবে সম্ভব হইলেও সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। সাধারণ জনসঙ্ঘ লইয়াই জাতীয় জীবন এবং জনসঙ্ঘের মর্ম্মবাণী জাতীয় সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান উপাদান। স্বদেশের অতীত গৌরব-কাহিনী উহার অশান্তির দিনে বিশেষভাবে মনে পড়ে, কারণ তাহাতে ক্ষণিকের শান্তি ও আশ্বাস প্রচ্ছন্ন থাকে। যেদিন দেশমাতার ললাটে বিষাদের চিন্তারেখা অঙ্কিত হইয়া পড়ে, মাতৃভক্ত সন্তানের নিকট সেদিন তাহার চিরস্নিগ্ধ, করুণ মূর্ত্তিখানি দীপ্ত মহিমায় প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন প্রকারে আমাদের কবিগণ স্বদেশের গান গাহিয়াছেন। আমরা তাহা শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

কতিপয় কবিতা বা গানে বঙ্গদেশের বা ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোরমভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। জননী চিরদিন সন্তানের নিকট সৌন্দর্য্যময়ী ও মহিমান্বিতা; তাঁহার বক্ষে চিরশান্তি, কণ্ঠে 'অভয় উক্তি' সন্তানগণকে তিনি ইহলোকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং পরলোকের নিমিত্ত মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে, দ্বিজেন্দ্রলালের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" ও "ধনধান্য পুষ্পেভরা" রবীন্দ্রনাথের "আমার সোণার বাংলা" ও "স্বদেশের ধূলি, স্বর্ণরেণু বলি", এবং সত্যেন্দ্রনাথের "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি" প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অপর এক শ্রেণীর কবিতায়, দেশের দুর্দ্দিনে উহার অতীত গৌরব কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া পুনরায় জাগরণের মন্ত্র দান করা হইয়াছে। কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে নহে,—সর্ব্ববিষয়ে আমার জননী মহিমাময়ী ছিলেন; তিনি বীরপ্রসবিনী—বুদ্ধ ও শঙ্কর, প্রতাপাদিত্য ও বিজয়সিংহ, চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ তাঁহারই বুকের নিধি; আর শুধু অতীতেই তাঁহার গৌরব শেষ হয় নাই—বর্ত্তমান যুগেও বহু মনীষি তাঁহার বুকে 'মানুষ' হইয়া উঠিয়াছেন সমগ্র জগৎ সাদরে তাঁহাদের বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাই মাঝে মাঝে নিরীহের জীবনেও চেতনা জাগে—'মানুষ আমরা নহিত মেষ'; তাই "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে"। দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার" ও "ভারত আমার ভারত আমার"—সঙ্গীত দুইটী সত্যেন্দ্রনাথের "আমরা" এবং যোগীন্দ্রনাথের "চিত্রদর্শন" শীর্ষক কবিতাদ্বয় এই শ্রেণীর সর্ব্বোত্তম। সত্যেন্দ্রনাথের "কোন্ দেশের তরুলতা" সঙ্গীতটীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও অতীত গৌরবকাহিনী সুন্দররূপে সংমিশ্রিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার "দাবীর চিঠি" শীর্ষক কবিতাটীও উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুর্ব্বলের সম্পদ যে প্রবলের সম্পদ অপেক্ষা কেবল স্বাধিকার প্রমত্ততা ব্যতীত অপর কোন অংশেই ন্যূন নহে—তাহাই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর কবিতা উদ্দীপনাময়ী। ফরাসী-দেশের জাতীয় সঙ্গীত "Marseillaise" এর ন্যায়, ইহা দ্বারা "ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়"। নায়গ্রাজল প্রপাতের উদ্দাম চাঞ্চল্য, ভিসুভিয়সের যুগব্যাপী মহা-নিদ্রার পর জ্বালাময় জাগরণ—কবিতাবাণীর বিপুল বক্ষে গুমরিয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্রের "বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে", রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক্ শুনে কেউ না আসে" ও "একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্" প্রভৃতি সঙ্গীত এই শ্রেণীভুক্ত। জাতীয় গায়ত্রী "বন্দেমাতরম" প্রথমশ্রেণীর সৌন্দর্য্যপূজা ইহাতে উদ্দীপনাবাণী সম্মিলিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশের আব্‌হাওয়া, এ শ্রেণীর কবিতার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ নহে। পার্থিব সম্পদ এ দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় নহে। তপঃক্ষয়ের ভয়ে তাহার বেদনা-ক্ষিপ্ত হৃদয় সংযত হইয়াছে; তাহার যন্ত্রণারাশিতে ব্যথিত হইয়া বিপাশা হয়তো তাহাকে পাশমুক্ত করিবে, শতদ্রু শতধাবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে তথাপি চিরধৈর্য্যশীল বশিষ্ঠের মত সে আপনার যোগ-সম্পদ অক্ষুণ্ন রাখিবে। পৌরাণিক বশিষ্ঠের "Passive resistance" বহুযুগ পরে ভারতবর্ষের আধুনিক বশিষ্ঠ, গুর্জ্জরসিংহ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অরুন্ধতীর মাতৃপ্রাণ তবুও রাক্ষসগণার কথা ভাবিয়া অহর্নিশ শিহরিয়া উঠিতেছে—মৃত্যু মিথ্যা বলিয়া হত্যার পাপ ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। নব্যবঙ্গের চারণ-কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার "অরুন্ধতী" কবিতায়, বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় মর্ম্মবেদনা

ও ভবিষ্যতের আশা ও আদর্শ, প্রাণস্পর্শীরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর কবিতায় হতাশ হৃদয়ের করুণ সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আশার এতটুকু ক্ষীণরেখাও চক্ষের সম্মুখে পৌঁছিতেছে না, গৃহশূন্য, নিরন্ন ব্যক্তির নিষ্ফল ক্রন্দনধ্বনি ব্যতীত আর তাহার কোন সম্বল নাই। "দীনের দীন সবে দীন" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে" ও "পাঁচশ বছর এমনি করে" প্রভৃতি সঙ্গীতে এইপ্রকার করুণ সুর উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের "দিল্লী-নামা" শীর্ষক চারণ-গাথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'শত-সম্রাট-প্রেয়সী' দিল্লী রাণীর সহিত বহুশতাব্দী অবধি ভারতের ভাগ্য বিজড়িত। দিল্লীর উত্থান পতনের সহিত ভারত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন সূচিত হইয়াছে। সুতরাং দিল্লীর কীর্ত্তিকাহিনী এক হিসাবে আমাদের জাতীয় কীর্ত্তিকাহিনী। বিভিন্ন যুগে এই নগরীতে ঐশ্বর্য্যের হোলিখেলা হইয়া গিয়াছে ভারতলক্ষ্মীর ভাগ্যবিপর্য্যয় এই নগরীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। দিল্লীর "ময়ূর-আসন চোরে নিয়ে গেল— সিংহাসন গেল সাগর পারে"—তাই আজ সে হৃতসর্ব্বস্বা— অভিমানিনী নারীর ন্যায় মৌনী হইয়া রহিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের অনেক দুঃশাসন পুত্র দিল্লী-রাণীর দ্রৌপদী-সাড়ি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বিধাতা তাহাকে একেবারে নিরাভরণা হইতে দেন নাই। দিল্লী চির-গৌরবময়ী।

ফরাসীবিদ্রোহের মূলমন্ত্র ছিল—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা 'জনসঙ্ঘের বাণী ভগবদ্বাণী' (Vox populi Vox Dei) এবং তৎকালীন ফরাসী জাতীয় সাহিত্যে এই সমভ্রাতৃত্ববাদ বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। বিদ্রোহী-গুরু রুসোর মূলমন্ত্র ইংলণ্ডের তরুণ কবিগণের অপূর্ব্ব প্রতিভা আলোড়িত করিয়া তুলিল। বায়রণ তাই দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, শেলী রাজদ্রোহী বলিয়া চিহ্নিত হইলেন। এই বিপ্লব-পন্থীগণের কাব্যসাহিত্য ইংরেজী ভাষায় অপূর্ব্ব সৃষ্টি গৌরবস্তম্ভস্বরূপ। গ্রাম্য কবি বারন্‌স্ সাম্যবাদ প্রচার করিলেন—মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই, প্রত্যেকেই অপরের সহিত ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ, আর সমগ্র পৃথিবীতে যেদিন এই সমভ্রাতৃত্ববাদ হইবে কেবল সেইদিনই প্রকৃত শান্তির সম্ভাবনা। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়—"দুনিয়ার মাঝে একজাতি শুধু, সেজাতির নাম মানুষ জাতি।" সমগ্র জগৎবাসিগণের সহিত এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টা—আপনাপন স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিয়া সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল-কামনায় প্রত্যেক জাতির বিশেষ শক্তি নিয়োগ—যে সাহিত্য সূচনা করিতে পারে তাহাই সর্ব্বোচ্চ আদর্শের জাতীয় সাহিত্য। পৃথিবীতে সেরূপ দিন কখনও আসিবে কিনা, বিধাতা জানেন। আপনার জাতির বা স্বদেশের গৌরবকাহিনীর কীর্ত্তনে, প্রাচীর বেষ্টিত, স্বার্থঘেরা স্ব স্ব দেশ ও জাতির কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে মাত্র। তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে আপনার রাষ্ট্রীয় অধিকার বা স্বাধীনতা না থাকিলে উচ্চাদর্শের কল্পনা কেবল অস্বাভাবিক স্বপ্ন ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সকলপ্রকার স্বার্থই নীচতা জ্ঞাপন করে না। স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থকামনা মানবহৃদয়ের পবিত্র সাধনাস্বরূপ। উপরোক্ত উচ্চাদর্শের পরিকল্পনা, বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" সঙ্গীতটীতে বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর একটি কথা বলিয়া আমাদের জাতীয় কবিতাও সঙ্গীতের অংশ আলোচনা শেষ করিব। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ব্যতীত কবির দেশাত্মবোধের কল্পনা আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে—সন্দেহ নাই। ইংরেজ কবি সুইন্‌বার্ণ্ রুষিয়ার বিপ্লববাদ বা Nihilism সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন—"The mid-night has one red star—Tyranny-cide"—'জগতের অশান্তির অন্ধকারে একটিমাত্র দীপ্ত নক্ষত্র জ্বলিতেছে—সে নক্ষত্রটী অত্যাচারীর শোণিতপাত।' বিপ্লববাদ প্রচারের নিমিত্ত সুইন্‌বার্ণ অভিযুক্ত হন। পার্লামেণ্ট সভায় এই বিষয় লইয়া বহু বাদানুবাদ চলিতে থাকে। তখন, তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী বলিয়াছিলেন—"The British Government has no voice over a poet's thoughts"—"কবির চিন্তারাশির উপরে

হস্তক্ষেপ করিবার, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন অধিকার নাই।" স্বাধীন দেশের কবি বলিয়া তিনি মুক্ত হইতে পারিলেন। "Britons never shall be slaves"—'ব্রিটন জাতি কখনও কাহারও পদানত হইবে না।' প্রত্যেক ইংলণ্ড-বাসীর এই গান করিবার অধিকার আছে। এ সঙ্গীত তাহার স্বদেশ সাধনার মন্ত্র স্বরূপ। কিন্তু কোন্ পরাধীন জাতি সাহস করিয়া তদনুরূপ সঙ্গীত গাহিবে? কোন পরাধীন জাতির কবি স্বাধীন ভাবে আপন স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন? কারণ, অভিশাপ-গ্রস্ত কবির পক্ষ সমর্থন করিয়া কোন রাজমন্ত্রী বলিতে চাহিবেন না—"No Government has any voice over a poet's thoughts."

বারান্তরে আমরা কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, ইতিহাস ও উপন্যাসের দিক দিয়া জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিব

বিশ্ব-বিজয়া

[শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ]

মহামিলনের উৎসব আজ মরম-মঞ্চ তলে
বিকাশ-ব্যথায় নবীন জেগেছে বাসনার শতদলে,
তরুণ প্রাণের অরুণ আলোকে
ভরে গেছে আজ চরাচর লোকে
একটী প্রাণের প্রদীপ হেথায় হাজার শিখায় জ্বলে
মহামিলনের উৎসব আজ মরম মঞ্চ তলে!

অবারিত মাঠ উদার গগন শ্যামল নধর বন
কূলে কূলে ভরা নদী সরোবর সবই প্রিয় দরশন
দিকে দিকে আজ উৎসব বাঁশী
মুখে মুখে ভাসে মধুময় হাসি
হৃদয়ে হৃদয়ে জানাজানি শুধু মধুময় এ মিলন
অবারিত মাঠ উদার গগন শ্যামল নধর বন।

ওরে, দেবতা জেগেছে দয়া করে আজ হৃদি-মন্দির তলে
শিরায় শিরায় শোণিতের ধারা বিদ্যুৎ বেগে চলে,

অন্তর মাঝে একি রণরণি
কাণে বাজে কার আহ্বান ধ্বনি,
কোন সে প্রিয়ের আকুল পরশ টানিছে ব্যাকুল বলে ;
ওরে দেবতা জেগেছে দয়া করে আজ হৃদি-মন্দির তলে।

আয় রে নবীন শঙ্কা-বিহীন বহিরঙ্গনে আজ
শুধ্ ঘর নহে পর লয়ে তোর অনেক রয়েছে কাজ,—
কে পথিক কোথা পথ ভুলে যায়
কে অলস বসে মোহের মায়ায়,
সবারে ডাকিয়া লয়ে চল তুই বিশ্বের সভা মাঝ
আয় রে নবীন শঙ্কা-বিহীন বহিরঙ্গনে আজ।

বদ্ধ জলার ধোঁয়া হতে আজ দেহ মন দূরে লয়ে
সংসারী এস, দিশারী তোমার চলিছে পতাকা বয়ে,
তুচ্ছ কথার মালা গেঁথে মিছে
নিশি-দিনমান তাকাইয়া পিছে
কেমনে চলিবি বিশ্বের পথে এ হীন লজ্জা সয়ে,
বদ্ধ জলার ধোঁয়া হতে আয় দেহ মন দূরে লয়ে।

ওরে ও তরুণ মমতা-করুণ যুগল নয়ন ভরে
আছে আছে তোর দুঃখের ঝোরা দীন কাঙালের তরে,
শুধু তাই নয় নয়ন তোমার
অগ্নিসায়ক সম গুণ তার
দহিয়া দহিয়া ছাই করে দেবে যত কলঙ্ক ওরে !
ওরে ও তরুণ মমতা-করুণ যুগল নয়ন ভরে !

অতি দুর্ব্বার শক্তি আছে যে মহামিলনের মাঝে
বিশ্বমায়ের অভয় আশীষ অমোঘ হইয়া রাজে,
শতেক ঝঞ্ঝা অশনি আঘাত
পথের বিঘ্ন দুর্য্যোগ রাত
একটু পরশে দূরে চলে যাবে ঘোর অপমান লাজে
অতি দুর্ব্বার শক্তি আছে যে মহামিলনের মাঝে।

নিখিলের শুভ-কামনা-অর্ঘ্য মায়ের চরণ তলে
পরশ লভিয়া হয়েছে ধন্য দেবতা পূজার ফলে;
নির্ম্মাল্যের গৌরবে ভরা
কেটে যাবে যত জীর্ণতা জরা,
তুলে ধর মাথে, নবীন প্রবীন ছুটে আয় দলে দলে
বিশ্ব-বিজয়া-উৎসব আজ মরম মঞ্চ তলে!

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল্]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিপ্রলব্ধার কথা

(৪)

স্বামী চলে যাবা মাত্র, হাসি বল্লে "বাঁচলাম।" চাকর দাসীরা বল্লে "বাঁচা গেল।" বাড়ীর অনেকেই মুখে না বলুক ভাবে বোঝালে যে ভালই হল, কিন্তু আমিত কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, যে, তাঁর জন্য কার কি আটকাচ্ছিল। সবাইত' যেমন খাচ্ছিল দাচ্ছিল হাসছিল কাঁদছিল, তেমনি হাসছে কাঁদছে, উঠছে, বসছে। তবে কেন তাঁর যাওয়ার পর এতবড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস সমস্ত বাড়ীখানা হতে উঠে সজোরে আকাশের গায়ে পড়ল? কে জানে কেন?

হয়ত এতবড় একটা বৃহৎ জীবনকে এই এতটুকু সংসারে আঁটছিল না, হয়ত এতখানি প্রখর জ্ঞানের আলো এই অজ্ঞানের সংসারে সহ্য হচ্ছিল না, হয়তো বা এত কাছে এমন মুক্ত প্রাণের খোলা হাওয়া এসে সংসারের গোপনতার পর্দ্দাটুকুকে বারম্বার উড়িয়ে দিয়ে ব্যস্ত করে দিচ্ছিল। কিন্তু আর যার যাই হোক, আমার পক্ষে স্বামী মহারাজের চলে যাওয়াটা যে কি কষ্টের হয়েছিল তা বলতে পারব না। তিনি আসাতে আমি যেন এই বদ্ধগৃহের মধ্যেই বাহিরের মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিলাম, আমি যেন ঘরে বসেই হিমালয়ের পার্ব্বত্যবায়ু, সমুদ্রের উদার উন্মত্ততা, পূর্ণপ্রাণের সবল স্বাস্থ্য, সমস্তই উপভোগ করছিলাম। তাই হঠাৎ তাঁর চলে যাওয়ার পরই অনুভব করলাম, আমি বদ্ধজীব। এতদিন একথা ভেবে দেখবার সময় হয়নি, কিন্তু হঠাৎ দুদিনের জন্য এই মুক্তজীবটী এসে আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে আমি সহস্র পাশে এবং পোড়ামাটীর একটা কারাগারের মধ্যে একেবারে আকণ্ঠবদ্ধ প্রাণী।

তিনি স্বাধীন তাই স্বাধীনভাবে এসে স্বাধীনভাবে চলে গেলেন।

কিন্তু সেই বনের পাখী এসে এই খাঁচার পাখীকে দু'দিনের জন্য বাইরের বনফল খাইয়ে এমন বড় করিয়ে দিয়ে গেলেন, যে, আমার স্পষ্ট অনুভব হল, এই ছোট খাঁচায় আর আমায় আঁটছে না; আমি এই সোণার খাঁচা হতে অনেক বড় হয়ে পড়েছি। আঠার বছর বয়সেও আমায় যত বড় করতে পারে নি এই একমাসে আমি তার চতুর্গুণ বড় হয়ে উঠেছি।

হাসি আমার মুখ দেখে বল্লে "উর্ম্মিলা দিদি, তোমার কি হল? পড়া শুনা, যোগ যাগ ছেড়ে দিয়ে কী রাত-দিন ছাতে ছাতে ঘুরে বেড়াও?"

আমি বল্লাম, "ছাতে ছাতে বেড়িয়ে কি যোগযাগ পড়াশুনা হয় না?"

"হতে পারে কিনা তুমিই জান, কিন্তু আমিত' দেখি, তুমি কেবলি ঘুরছ। পিসীমা বুড়ো হয়েছেন তবু তাঁর খাটুনির অন্ত নেই, আর তুমি এমন জোয়ান মানুষ কেবল গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবে? এ কোনদেশী ধর্ম্ম?"

"সকলের কি একই ধর্ম্ম? কেউ বা গায়ে হাওয়া লাগাতেই জন্মেছে, কেউ বা ঝড় তুলতে জন্মেছে। যার যা কাজ সে তাই করছে, তাতে রাগ কর কেন?"

হাসি খুব রেগে উঠে বল্লে, "এ সব কথা কেবল চোখে ধুলো দেবার জন্য, কিন্তু এতে যে কেবল পরের চোখে ধুলো দেওয়া হচ্ছে তা নয়, নিজের চোখেও ধুলো পড়ছে। তোমাদের এই সখের ধার্ম্মিকতার খোরাক যোগাবার জন্য যারা সংসার বোকার মত খেটে মরছে, আর তোমরাও এমনি অন্ধ যে নিজেদের এই ধার্ম্মিকতার বাবুগিরীটা স্বাভাবিক আর জন্মগত হক্ মনে করে নিজেদেরও মাটী করছ। দুবেলা খেটে খুটে নিজেদের পেটের ভাত জুটুতে হত ত' দেখতাম তোমাদের যোগ-যাগ ধর্ম্মকর্ম্ম কোথায় থাকত?"

হাসির হঠাৎ এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে আমার হাসি পেল। আমি হাসতে লাগলাম, কিন্তু সে রেগে গম্ গম্ করে চলে গেল। আমিও কিছুক্ষণ ছাতে ছাতে ঘুরে নীচে নেমে গেলাম। নীচে গিয়ে দেখি, মা বসে গিয়েছেন তাঁর দৈনিক কাশীখণ্ড পাঠ করতে, আর বাড়ীর যত বন্ধুবান্ধব আশ্রিত অভ্যাগত এমন কি দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই পরম ভক্তিভরে শুনতে বসে গিয়েছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মার পাঠ শুনলাম। তারপর মাকে বল্লাম, "মা, এঁদের বৈ থেকে কাশীর মহাত্ম্য শুনিয়ে কি হবে? এই কুম্ভমেলার সময় এঁদের কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে আন না।"

আমার কথায় সকলেই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অনুমোদন করলেন। কিন্তু মা বল্লেন, "যাঁর ইচ্ছা হলে এখনি সব হতে পারে তাঁকেই বল না গিয়ে, তাঁকে না বলে আমায় বলে ফল কি?"

আমি তখনি বাবার কাছে গিয়ে সে কথা পাড়লাম। বাবাও যেন এই কথার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আমি বলবামাত্র তিনি বল্লেন, "বেশ তাই হবে মা, আমারও ক'দিন হতে তীর্থ তীর্থ মন করছে। বিশেষতঃ এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা—এক সঙ্গে দুই কাজই হবে।"

আমি বল্লাম, "দু' কাজ কি কি?" বাবা একটু যেন ইতস্ততঃ করে বল্লেন—

"তীর্থ দর্শন, সাধু দর্শন দুই হবে।"

আমার মনে হল বাবা যেন কি একটা কথা গোপন করলেন। যাই হোক আমি আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলাম না।

হাসি এই তীর্থ ভ্রমণের কথা শুনে খুব উৎসুক হয়ে উঠল, এবং তিন চার দিনের মধ্যেই সমস্ত গুছিয়ে ফেল্লে।

কিন্তু আমাদের তীর্থে-যাওয়া ত' বড় সহজ ব্যাপার নয়, এ যেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গযাত্রা। আত্মীয়-স্বজন দাস দাসী, বরকন্দাজ পাইক, অনাহুত রবাহুত কতই না লোকজনে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটা যাত্রার পূর্ব্বে ভরে উঠল। বাইরের প্রকাণ্ড উঠানে, গরুর গাড়ী পাল্কি ইত্যাদি যান বাহনে একটা ছোটখাটো বাজার হয়ে উঠল। কর্ম্মচারীদের ডাক হাঁক, ঘোড়া গরুর চিহি হাম্বা, ছেলে মেয়েদের ছুটোছুটী কান্নাকাটী, এবং সকলের ওপরে প্রজাসাধারণের ক্রমাগত আনাগোনা আবেদন

নিবেদন শুনতে শুনতে কর্তাকর্ত্রী হতে আরম্ভ করে বাড়ীর চাকর দাসী পর্য্যন্ত সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাবা শেষে বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "এত লোকজন নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।" কিন্তু মা তা শুনলেন না—বাড়ীর কুকুর বেড়ালের পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ দর্শনের ব্যবস্থা করলেন। এবং এই অবকাশে গ্রামের কত দরিদ্র অদরিদ্র ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই চোষ্যচোষ্যাদির সঙ্গে এত রকমের আর্থিক পারমার্থিক সুবিধা করে নিলে যে শেষে একদিন দেওয়ানজী এসে বল্লেন 'নগদ টাকা যদি এমনি করে এখনি হতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে এতবড় বাহিনীর তীর্থের খরচের জন্ত এষ্টেটের দেনা হয়ে যাবে।' কিন্তু সে কথায় বড়একটা কেউ কর্ণপাত করলে তাত' মনে হলনা। প্রত্যেক চাকর দাসী কর্ম্মচারীর তিন মাসের মত মাহিনা খোরাকীর সঙ্গে কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা হল। তার ওপর তীর্থে খরচের জন্তও কিছু কিছু তারা পেলে। কিন্তু পথে বেরিয়ে তারা যে এক পয়সাও খরচ করেছিল তাত' স্মরণ হয় না।

যাই হোক এই হরিশ্চন্দ্রের কটক নিয়ে আমরা গয়া কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন মথুরা করে যখন আবার কুম্ভস্নানের জন্ত প্রয়াগে ফিরলাম, তখন অনেকেরই মন বাড়ী বাড়ী করে উঠেছে। হাসিত' আর কিছুতেই থাকতে চায় না— এবং তার সঙ্গে অনেকেই বাড়ী ফিরবার জন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছে দেখে বাবা বল্লেন, "তা হলে যারা না থাকতে চায় বাড়ী ফিরে যাক।"

কিন্তু মা বল্লেন, "সেকি কথা! কুম্ভস্নান না করে? তা' কেমন করে' হবে?" কিন্তু অনেকেরই প্রাণের কুম্ভ পুণ্যে ভরে উঠেছিল, তাই তারা ত্রিবেণীর মহাযোগের স্নানের লোভ ত্যাগ করে, হাসির সঙ্গে যোগ দিলে। এবং দু'এক-দিনের মধ্যেই প্রায় অধিকাংশ লোক গৃহের দিকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। যে দুচারজন থাকলেন তাঁরা নিতান্তই মায়ের অনুগত বিশেষতঃ তাঁরা প্রাচীনা তাই এই ভীষণ জন-সংঘের নানাকষ্টের মধ্যেও তাঁরা মরণের ভয়ে ভীত হলেন না।

---

(৫)

দুলছে ফুলছে গর্জ্জন করছে, দিক হতে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে তবু একি ঠিক সমুদ্র?

পুরীতে সমুদ্র দেখিছি, কিন্তু সে ত' এমন নয়! এযে কি দেখিছি তা বলতে পারি না। পাগড়ী অপাগড়ী সচুল অচুল, সটীক, অটীক নানাজাতীয় মাথার অন্ত নেই—মাথার পর মাথায় সমস্ত দিগদিগন্ত ছেয়ে গিয়েছে। ঠিক যেন সমুদ্র অথচ এই জনসমুদ্রের গর্জ্জনের সঙ্গে জল সমুদ্রের কল রোলের তুলনাই হয় না। কারণ জল সমুদ্রের গর্জ্জনে কেমন একটা একটানা সুর আছে তাল আছে—কিন্তু এই জনসমুদ্র হতে যে আওয়াজ উঠছিল তাতে না ছিল সুর না ছিল লয়। ছিল কেবল একটা বিরাট গুমগুমানি—দূর হ'তে মনে হচ্ছিল যেন কোথায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হচ্ছে।

সমুদ্রের মত এই জনসংঘের মধ্যে ঢেউ ছিল, 'কন্তু সমুদ্রের ঢেউ দেখলেই যেমন প্রাণে একটা বৃহৎ আনন্দের উদয় হয়, যেমন সহজেই সেই দিগন্ত-ব্যাপ্ত তরল প্রকৃতির আনন্দের সঙ্গে প্রাণের আনন্দরাশি মিশে গিয়ে একতালে নেচে'ওঠে, এতে ত কৈ তা হচ্ছিল না। এই জনসমুদ্রের তরঙ্গ যখনই জেগে উঠছিল তখনি একটা "সামাল সামাল" ডাকের সঙ্গে আত্মরক্ষার পরম ভয় জেগে উঠছিল। জল-সমুদ্রের ঢেউএর মত এ ঢেউও অন্ধ এবং অকারণ; তবু সেই অন্ধ প্রকৃতির চঞ্চলতার সঙ্গে এই সচেতন চক্ষুষ্মান প্রকৃতির চঞ্চলতার এত অমিল কেন তা কিছুতেই ধরতে পারি নি? সমুদ্রের জলকণাদের মধ্যে যে পরম একত্ব যে আনবিকপূর্ণ সংযোগ ছিল, এই জনসমুদ্রের জলকণার মধ্যে তার অভাব ছিল বলেই কি দুই সমুদ্রের মধ্যে এত অমিল? কে জানে কেন?

কিন্তু এই পুণ্য লোভাতুর জন সংঘের কষ্ট দেখে কি মনে কেবল ভয় আর দুঃখেরই উদয় হয়েছিল? তাওত নয়। বেশ মনে আছে যে আমার মনে ভয়ের সঙ্গে বিস্ময়, দুঃখের সঙ্গে ভক্তিরই উদয় হয়েছিল। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম যে এই ত্যাগী ও ভোগী, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সাধু ও অসাধু, সংসারী ও অসংসারী ধনী ও নির্ধনের

মিলনভূমিতে এই মহামেলায় ভারতের সেই চিরন্তন আত্মাটাই আবির্ভূত হয়েছেন। যে আত্মা আছেন বলেই ভারত আজও ভারত। এ যে একটা মেলা—এ যে মিলন স্থান। সমস্ত বিপদ, সমস্ত কষ্টকে তুচ্ছ করে আমরা এই উন্মুক্ত আকাশের তলে এই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছি। কর্ম্ম প্রেম ও জ্ঞানের ত্রিধারা এই প্রয়াগে ত্রিনদীরূপে মিলেছে। তাই ভারতের ধর্ম্ম সাধনার সমস্ত সাধু শাক্ত ও মহান্ত, গৃহী কর্ম্মী ও ধর্ম্মী সকলেই এই পুণ্যক্ষেত্রে এই পুণ্য মুহূর্ত্তে মিলেছেন। এখানে অন্য কিছু লাভ নেই কেবল মিলনই লাভ, এবং এই পুণ্য মিলন হতে পরবর্তীর সাধনার সমস্ত রস দিকে দিকে আবার ছড়িয়ে পড়বে। তাই এই মিলনের মধ্যে এই আনন্দের মধ্যে যে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ছিল তার দিকে কারও দৃষ্টি ছিলনা—আমারও তেমন পড়েনি।

কিন্তু মানুষ নিজের কাছে নিজে এতই বড় যে এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে কেউ আপনাকে হারিয়ে ফেলতে দিচ্ছেনা। যাতে এই সমুদ্রে একেবারে মিশে যেতে না হয় তার জন্য এমনি তার প্রাণপণ চেষ্টা যে এই সমুদ্রে প্রবেশ করেই প্রথম হতে তার চেষ্টা আগে ঠেলে ঠুলে কোনো রকমে আপনাকে বাঁচিয়ে তারপর পুণ্যের যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু আদায় করি। সে মিলতে এসে অমিলকেই বাঁচিয়ে চলে তাই বোধ হয় এত ঠেলাঠেলি মারামারি।

সে যে কি ঠেলাঠেলি তা বর্ণনা করতে পারব না চারদিকে সিপাই সান্ত্রী নিয়ে নিজেদের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে আমরা যতই এই সমুদ্র ঠেলে অগ্রসর হয়েছি ততই দেখেছি যে মানুষের মিলনের মধ্যেও কি বীভৎসতা আছে, কি নিষ্ঠুরতা আছে। আবার কি দয়া আছে কি ভালবাসা আছে! চক্ষের ওপর দেখলাম কত মানুষ পা পিছলে পড়ে গেল, আর কত লোক তার ওপর দিয়ে তাকে পিষে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকাবার জো নেই এমনি এই সমুদ্রের মধ্যে পড়ে মানুষ চৈতন্যকে হারিয়ে জড়শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পুণ্যের লোভে এসে প্রাণরক্ষার দায়ে সে কি শক্তিহীন হয়ে স্রোতের মুখে আপনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে!

আর দিকে আবার এই বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে যাঁরা এই অন্ধ জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে চালাবার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের দেখে আর এক ভাবের উদয় হচ্ছিল। কি তাঁদের দয়া! তাঁরা এই ভালবাসার দায়েই কত না কঠিন হয়ে কতন না নির্দ্দয় হয়ে মায়ের কোল হতে ছেলে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে দিচ্ছেন! কত তাড়না করতে হচ্ছে কত তাড়না সহ্য করতে হচ্চে তবু তাঁদের শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই!

কিন্তু সব চাইতে ভয়ঙ্কর অথচ মহান মনে হয়েছিল এই ভাবটা, যে, এত বিপদে প্রতিপদে নিষ্পেষিত হয়ে যাবার এত ভয় তবু ত' এই পুণ্য লোভীরা থামছে না, ছুটে আসছেই আসছেই। "ঐ নাগারা বেরিয়েছে," "ঐ যে দশনামী দের দল আসছে" "ঐ যে সারদা মঠের পতাকা" এই রকম হাঁকাহাঁকির ও অন্ত নাই, অথচ সামাল সামলের ও'অন্ত নাই।

কিন্তু কি দেখছিল তারা? কাকে দেখতে, কোন রাজাধিরাজের অভ্যর্থনার জন্য মরণ তুচ্ছ করে এই বিরাট জন সংঘের মধ্যে নানাদিক হতে নানা জনস্রোত এসে মিলিত হচ্চে। কে এঁরা, যাঁদের চরণ ধূলায় লুটাবার জন্য লাহোর হতে তাঞ্জোর সোমনাথ হতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত অংশই এ মহামেলায় জনস্রোত প্রেরণ করেছে? কে এঁরা কৌপীনধারী রাজরাজেশ্বরের দল যাঁদের চরণ ধূলায় আজ অনেক মুকুটধারীর মস্তক লুটাচ্ছে! কে এঁরা দেহধারী দেবতার দল যাঁদের রিক্ততার কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমস্ত বাহুল্য লজ্জায় এঁদের গৈরিকের মতই রক্তবর্ণ।

সমস্ত সাধুদর্শন ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন বাবা বল্লেন "এইবার ফেরা যাক", কিন্তু ফেরা যাক বল্লেই কি ফেরা যায়? এই বিপুল জনস্রোত ঠেলে যাবার সাধ্য সম্মিলিত হাজার জন সৈন্যেরও ছিল কিনা সন্দেহ। আমরা ফিরতেও পারলাম না—পুণ্য করতে এসে সমস্ত দেহ মন আত্মা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এবং ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়বার মত হয়ে উঠল। বেশ বুঝতে পারা গেল সমস্ত লোকই অনেকক্ষণ হতে মেলার স্থান হতে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে

অথচ এমনি বন্ধন যে আপনার চাপে মানুষ আপনিই একেবারে নিশ্চল। আবার সে যখন চঞ্চল হয়ে উঠছে তখন নিজের ইচ্ছায় নয়, এমন একটা বিরাট কিছুর ঠেলায় যা নিজেরাই তৈরী করেছে অথচ এখন স্বেচ্ছায় তার ভিতর হতে বাইরে আসবার জো নেই।

ঠিক এমনি সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না অথচ সেই একটা ঘটনাকে অবলম্বন করে আমার সমস্ত অতীত সমস্ত বর্ত্তমান হয়ত সমস্ত ভবিষ্যৎও একটা অখণ্ডসূত্রে বাঁধা হয়ে গেল। যেন আমার অর্থহীন জীবনের সমস্ত প্রলাপকে একটা অপ্রত্যাশিত অর্থ দেবার জন্য তিনি সেই মুহূর্ত্তে দেখা দিলেন।

কে তিনি? তাত' এখনো জানি না, জানবার অবসর পেলাম কোথায়? তিনি এলেন রইলেন চলে গেলেন, বাস্—এইটুকু মাত্র বলতে পারি। আর ত' কিছু জানি না!

কিন্তু কে বলে দেবে, তিনি কে? তিনি কি? তিনি কেমন? তিনি কোথায়? ঐ ধীর-মন্থরে দোলায়মান জন সমুদ্র হতে যিনি উঠে এলেন তিনি কে? এই বিশাল প্রাণসাগরের কোন সুদূরে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন? কে তাঁর সেই অনন্ত শয্যায় দোলা দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গালে? তার বিষয়ে কিছুই জানি না—শুধু বিস্ময়ে চেয়ে আছি, আশা করে আছি—তিনি সাগর হতে উঠে এসেছিলেন আবার সাগরেই মিলিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আবা আসবেন, আবার দেখা পাব। পাব না? নিশ্চয় পাব, নৈলে কি আমার এই চির আশা এমনি ভাবে পথের দিকে চেয়ে চেয়েই মরে যাবে? না—না কখ্খন না।

তাঁকে প্রথম দেখলাম অদ্ভুত অবস্থায়। একটা পশ্চিম দেশী স্ত্রীলোককে তিনি দুই হাতে উঁচুতে তুলে যেখানে আমরা আছি ঠিক সেই সেপাই-শাস্ত্রীর ব্যূহের মধ্যে এনে ফেল্লেন। মেয়েটীর অবস্থা অতি ভয়ানক—সে একেবারে উলঙ্গ, তার কোলে একটা মরা ছেলে, লোকের চাপে ছেলেটার পেটের নাড়ী বেরিয়ে গিয়েছে, জীব বেরিয়ে গিয়েছে। মেয়েটার চোখমুখের অবস্থা যে কি ভয়ঙ্কর তা কেউ অনুমানে আনতে পারবে না। আর যিনি নিয়ে এলেন তাঁর মুখের উপর এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল যা মানুষের নয় হয়ত দেবতারও নয়—সে যে কি ভয়ঙ্কর ভাব তা যে এই এত বৎসর পরেও ভুলতে পারছিনে। তিনি এলেন যেন দেবতার ক্রোধের মত হয়ে। তিনি এমন মূর্ত্তিতে এসেছিলেন যা দেখে আমাদের ঐ অতগুলো চোগোপ্পা-ওয়ালা ভোজপুরী পাহালবানগুলো পর্য্যন্ত ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

তিনি মেয়েটাকে আমাদের ব্যূহের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এ কে নাও।" তাঁর সেই গম্ভীর স্বরে মনে হল যেন বাবা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলেন। অন্যান্য আত্মীয়াদের সঙ্গে মাও একেবারে ভয়ে পিছিয়ে এতটুকু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমিই কেবল সাহস করে সেই ভয়ঙ্করকে সম্ভাষণ করলাম। তাঁকে যে ভয় করিনি কেন, তা বলতে পারব না, সেই ভয়ঙ্করকেও যে কেন এক সুন্দর দেখেছিলাম তাও বলতে পারিনে। কিন্তু ধন্য ভগবান যে আমায় সে সময় সাহসী করে ছিলে, ধন্য আমার অন্তরের দেবতা যিনি আমায় সেই সময়ে সেই আমার রুদ্রকে শিববলে আবাহন করে নেবার শক্তি দিয়েছিলেন। ধন্য আমি! ধন্য আমি!

মেয়েটাকে আমি চাদর দিয়ে ঢেকে নিলাম সে কিছু বল্লে না। তারপর তার কোল হতে তার ছেলের মৃত-দেহটা সরিয়ে নিতে গেলাম, কি প্রাণপন বলে সে সেই মৃতদেহটা টিপে ধরে রইলে। কিছুতেই দিলে না। আমার মা বারণ করতে এগিয়ে এসে বল্লেন, "এমন সময় মড়া ছুয়ো না উর্ম্মিলা!" অমনি সেই রুদ্র মূর্ত্তি মায়ের দিকে ফিরে বল্লেন "মড়া! কোথায় মড়া?" বাবা বল্লেন, "ছেলেটা মরে গেছে তাই—" অদ্ভুত মানুষটি আরও রক্তবর্ণ হয়ে বল্লেন, "তোমাদের দ্বিধা হয় সরে যাও—যার দ্বিধা নাই তাকে কেন বাধা দিচ্ছ?" তারপর আমার দিকে তাঁর অদ্ভুৎ বিশাল চক্ষু দুটো ফিরিয়ে বল্লেন, "তুমি যা করছ কর, কারু কথা শুনো না।"

আমি মন্ত্র মুগ্ধের মতই আবার মেয়েটার কোল হতে মৃতদেহটা একটু সজোরেই সরিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু সে হঠাৎ এমন ভীষণ একটা চিৎকার করে উঠল যা ঐ

দিগন্তব্যাপী জন-সংঘের কোলাহল ভেদ করে কত দূরে কত উর্দ্ধে উঠেছিল যে তা বলতে পারিনে। আমি আবার পিছিয়ে গেলাম, তখন সেই অদ্ভুৎ মানুষটা এগিয়ে এসে সেই মেয়েটার কাঁধে হাত দিয়ে এমন ভাবে তাঁর চক্ষু দুটো মেয়েটার মুখের উপর রাখলেন যে মেয়েটার হাত আস্তে আস্তে অবশ হয়ে এল এবং ক্ষণকাল পরেই তার সন্তানের মৃত্যু অবশেষটুকু আপনি মাটিতে খসে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেও কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল।

তিনি তখন আমার দিকে ফিরে সেই মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। আমি সেই অশুচী মৃতদেহ তুলে নিলাম। কিন্তু তারপর ফিরে চেয়ে দেখি মায়ের মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। সেই মানুষটাও বোধ হয় তা লক্ষ্য করেছিলেন; তাই হঠাৎ আমার কাছে এসে হাত পেতে বল্লেন "কাজ নাই, দাও, আমিই এর ব্যবস্থা করছি। তোমরা এইটুকু ক'র যে এই হতভাগিনীর ভার নিও। যতদিন না এ সুস্থ হয় ততদিন কাছে রেখো। তারপর যেখানে যেতে চায় পৌছে দিও।" তিনি আমার কোল হতে সেই মৃত-দেহটা প্রায় একরকম ছিনিয়ে নিয়ে সন্ন্যাসীদের জন্য যে পথ পুলিস দিয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়ে ছিল সেই পথে গঙ্গার দিকে চলে গেলেন। সেই রাজাধিরাজের গতিতেও কেউ বাধা দিতে পারলে না, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবার কথাও কারু মনে উদয় হল না।

ইতিহাস-বিজ্ঞান

বিষয়ানুবন্ধের বিবৃতি

[অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ কুমার রায় চৌধুরী এম-এ বি-এল]

ইতিহাস-বিজ্ঞান অথবা Science of History কথাটা শুনিবামাত্রই প্রথমে মনে হয় ইহা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী এবং অসম্ভব। কারণ ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যথেষ্ট স্থান থাকিলেও তাহা হইতে যে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাহির হইতে পারে ইহা আপাতঃ দৃষ্টিতে অনেকে কল্পনা করিতে পারেন না।

ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝি? কোন জাতি বিশেষের অতীত ও বর্ত্তমান জীবন বিবরণী। কিরূপভাবে একটা বিশিষ্ট মানব সংঘ সমস্ত অতীত কাল ধরিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নানা কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে করিতে বর্ত্তমানের দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহাই তাহার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু মানব সংঘের ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই যে অবস্থার নানা পরিবর্ত্তন ইহার সঙ্গে প্রাকৃতিক অন্যান্য পরিবর্ত্তনের একটা মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান আছে। এই পার্থক্যের কারণ মানুষের প্রাণশক্তি ও মননশক্তি। জড় প্রকৃতির মধ্যে এইজন্য অবস্থার যে বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পারিপার্শ্বিক শক্তির সংঘর্ষে কেবলমাত্র কার্য্যকারণ বিধি (Causal law) অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে জীবনশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ইতিহাসকে চতুপার্শ্বের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া একটা

উদ্দেশ্যের অভিমুখে লইয়া যায়। সেইজন্ম ইতিহাসের বৈচিত্র্যকে শুধু কার্য্যকারণ বিধি দিয়াই ব্যাখ্যা করা যায় না।

কিন্তু ইহাই হইল বিজ্ঞানের একমাত্র অথবা সর্ব্ব প্রধান প্রণালী। বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতেছে মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা (facts of experience) অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা চারিদিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রাপ্ত হই জ্ঞানের এই সকল বিষয়কে পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া তুলনা করিয়া বিচার করিয়া বিজ্ঞান ইহাদের মধ্য হইতে সাধারণ বিধি, সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা বিচ্ছিন্ন, পরস্পর বিরোধী অসম্বদ্ধ ও খণ্ড বলিয়া মনে হয় বিজ্ঞান তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিত্ব, পারম্পর্য্য ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বাহির করিয়া তাহাদের সকলকে একটা ঐক্যের বন্ধনে বাঁধিতে চাহে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই এক কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ—যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে তাহারই ফল এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু ঘটিবে তাহা বর্ত্তমান ঘটনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে—জগতের এই মূর্ত্তিই বিজ্ঞান ধ্যান-নয়নে দর্শন করিয়া ইহাকেই সত্য করিয়া তুলিবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞানের কল্পিত এই অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ জগতের মধ্যে কোথায়ও স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র স্থান নাই,—একই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে জগতের যাহা কিছু সমস্তই আবদ্ধ। কেহই ইহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। বিরাট জগৎ যন্ত্রের মধ্যে যাহার যে স্থান, আবহমান কাল ধরিয়া সেই স্থানের সেই বিশিষ্ট কার্য্যই তাহাকে করিতে হইবে। এ যেন এক নিয়তির বিধানের মত অনতিক্রম্য, অলঙ্ঘনীয়, আবহমান কাল-ব্যাপী, ও বিরাট।

এই আদর্শ লইয়া বিজ্ঞান জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে চাহে; প্রাণের, মনের, ইচ্ছাশক্তির বিজ্ঞান কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সম্মত নহে। সুতরাং যেখানে এই মনোশক্তি ও প্রাণশক্তির অবাধ লীলা মনের ইতিহাসের সেই বিশাল রাজ্যে বিজ্ঞানের যে কোনো স্থান আছে ইহা স্বীকার করিতেই যে অনেকে আপত্তি করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। যেখানে প্রাণশক্তি আছে—সেখানে ভবিষ্যৎকে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত করা যায় না যেখানে মনশক্তির ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির প্রভাব বর্ত্তমান থাকে—সেখানে নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য-কারণবিধি দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হয় না; তাই সেখানে অতীত কর্ম্ম হইতে ভবিষ্যতের কোনো নির্দ্দিষ্ট সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না, একের জীবনপ্রণালী হইতে বহুর জীবন-প্রণালীর অথবা বহুর জীবন প্রণালী হইতে একের জীবনের কোনো পরিচয় অভ্রান্ত ভাবে লাভ করা যায় না। সুতরাং বিজ্ঞানের যাহা প্রধান লক্ষ্য—কার্য্যকারণ ব্যাখ্যা (Causal explanation) ভবিষ্যৎ রচিত্র ও সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার ইতিহাসে তাহা অসম্ভব হয়।

ইতিহাস বিজ্ঞানের বিপক্ষে এই যুক্তি ভিত্তিহীন নহে জড়জগতের অংশ বিশেষে যাহা সত্য অথবা কোনো এক বিশিষ্ট কালে যাহা সত্য—অন্য অংশে এবং অন্যকালে তুল্য অবস্থায় ঠিক তাহাই সত্য হইবে ইহা আমরা সেরূপ নিঃসন্দেহভাবে নিদ্ধারণ করিতে পারি না, রোম গ্রীস, ইজিপ্ট প্রভৃতি প্রাচীন সমাজে যাহা ঘটিয়াছে বর্ত্তমান সমাজেও তাহা ঘটিবে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী সর্ব্বদা সত্য হয় না, ইহা স্বীকার করি;—কিন্তু তাই বলিয়া ইতিহাসের মধ্যে যে কোনো নিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই কেবলই যে উহাতে অবাধ ইচ্ছাশক্তির লীলা প্রকট, অথবা ইহার বৈচিত্র্যের কোনো ঐক্য নাই কি বা থাকিলেও তাহা মূল্যহীন ইহা কোনো মতে মানিয়া লওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ দুইটী।

প্রথম মানুষের সহিত মানুষের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটী মৌলিক ঐক্যসূত্র ও বিদ্যমান আছে। আশা, আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখবোধ, স্নেহ প্রেম, ঘৃণা হিংসা প্রভৃতি আদিম প্রবৃত্তি গুলি সর্ব্বকালে সর্ব্বমানুষের মধ্যেই ভাল ও মন্দ কর্ম্মের নিয়ামক। সুতরাং এক সমাজের কর্ম্ম হইতে সমান অবস্থায়

অন্য সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ—অযৌক্তিক অর্থহীন নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকিলেও পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও ভৌগলিক শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনার কর্ম্মসৃষ্টি করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ইতিহাসের মধ্যে নির্ণয় করা অসম্ভব নহে। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমাজ ও রাষ্ট্র পদ্ধতি, ধর্ম্ম ও শিক্ষা-পদ্ধতি অনেকাংশে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা অস্বীকার করা চলে না।

সুতরাং ইতিহাসকে বিজ্ঞানরূপে আলোচনা করিবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা থাকিতে পারে না। জড় বিজ্ঞানের সহিত ইহাকে সমপর্য্যায়ে না ফেলিলেই হইল। প্রাণ বিজ্ঞানের মত ইহাকে আলোচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক জীবন বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে কিরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে এবং প্রতিদিন করিতেছে ইতিহাসকে তাহারই কাহিনী বলিয়া মনে ইহা আলোচনা করিতে হইবে।

তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইরূপ ভাবে ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাইব বাস্তবিকই ইতিহাসের সরসতা ও আকর্ষণীয়তা অনেকাংশে বাড়িয়া গিয়াছে—এক সমাজের উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি, বিধি ব্যবস্থা, বিপ্লব ও শান্তি সকল বিষয় সম্বন্ধেই আমরা কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম সূত্র এবং উপদেশ লাভ করিতে পারিয়াছি।

ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের দিক হইতে এইগুলি জড় বিজ্ঞানের তথ্যের মত তেমনতর মূল্যবান ও নিঃসন্দেহ না হইলেও ইহারা একেবারে মূল্যহীন নহে। দেশ ভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন সমস্যা তাহাদের উৎপত্তির কারণ এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সভ্যতার বিভিন্ন আদর্শ তাহার উৎপত্তি এবং নানা প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও কর্ম্ম পদ্ধতির মধ্য দিয়া তাহার ক্রমিক বিকাশ এইগুলিই হইল ইতিহাস বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সুতরাং এই আলোচনা যে নিরর্থক নহে, ইহা হইতে ভাবিবার শিখিবার, আশা করিবার এবং সতর্ক হইবার অনেক বিষয় যে পাওয়া যায় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের হৃদয়কে উদার এবং দৃষ্টিকে সুদূর প্রসারিত করিয়া দেয়—কূপমণ্ডুকের মত নিজের সমাজের মধ্যে থাকিয়া তাহাকেই সত্য ধর্ম্ম ও ন্যায়ের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া আর মনে করি না। য়িহুদী জাতির বিশ্বাস ছিল—তাহারাই একমাত্র ভগবৎ-অনুগৃহীত জাতি, বিশেষ যাহা কিছু সার ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ, যিহোবা তাহা তাহাদের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন; ইতিহাস বিজ্ঞান মানুষের এবম্বিধ ভ্রম ও মোহ ভাঙ্গিয়া দিয়া দেখাইয়া দেয় গৌরব ও মহত্ব যে কোনো দেশের, যে কোনো কাহিনীর মধ্যেই অল্প বিস্তর বর্ত্তমান—সর্ব্বজাতির ইতিহাসই সত্য-ধর্ম্ম ও ন্যায়ের এক একটী বিশিষ্ট মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে—ভিন্ন ভিন্ন জাতির অতীত ইতিহাস পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও যোগহীন নহে; বরং একই মানব আত্মা উহার মধ্য দিয়াই আপনাকে সত্যধর্ম্ম ও ন্যায়ের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। একই মানবজীবনরথ যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার দুর্গম বন্ধুর পথ বহিয়া পতন ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া ভবিষ্যের দিকে ছুটিয়াছে—কোথায় বা ইহার গতি শ্লথ, কোথায় বা আবার প্রবল, কোথায় বা সরল আবার কোথায় বা তীর্য্যগ, কোথায় বা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যদিয়া ইহার যাত্রা দ্বিধাজড়িত আবার কোথায় বা অবাধ ও স্থির লক্ষ্য।—ইতিহাসকে বিরাট মানবের এই অন্তহীন জয়যাত্রার বিবরণী বলিয়া মনে করিলে ইহার প্রতি অংশই নূতনতর রূপে আমাদের চক্ষে আবির্ভূত হয় এবং গৌরবে আমাদের মন ভরিয়া যায়। বিভিন্নজাতি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিহীন নহে, ইহারা বিশাল মানবাত্মার এক একটী বিশিষ্ট প্রকাশ—বিশিষ্ট দেশকালের আবেষ্টনীর মধ্যদিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেকেই এক একটী বিশেষ সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছে—এক একটী বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। এ যেন এক বিরাট বিশ্বনাটক যুগ যুগান্তর ধরিয়া অভিনীত হইতেছে

এক একটী জাতি এই নাটকের এক একটী ভূমিকা লইয়া আসিতেছে এবং আপনাদের নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের অভিনয় করিয়া যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইতেছে। ইতিহাস বিজ্ঞান আমাদিগকে এই বিশ্বনাটকের প্রতি অংশের ব্যাখ্যা—এবং ইহার সমগ্রের মর্ম্ম আমাদের সম্মুখে উপনীত করিয়া সমস্ত অতীতকে আমাদের সম্মুখে সজীব ও সার্থক করিয়া দেয়।

সুতরাং ইতিহাস-বিজ্ঞান যে অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ বিদ্যা তাহার সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় বাংলা অক্ষরে এ সম্বন্ধে কোনো রচনা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের নাম দেশ বিদেশ প্রসিদ্ধ। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক বাংলাভাষায় রচনা করিবেন মনে করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে একটী synopsis বা বিষয়ানুবন্ধও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকার দরুণ ইহা তিনি সম্পূর্ণ করিতে সুযোগ পান নাই। তিনি এমন সুকৌশলে ইহা রচনা করিয়াছেন যে অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা পাঠ করিলে ইতিহাস বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটী মোটামুটী ধারণা জন্মে। আমরা আশা করি—তাঁহার এই বিষয়ানুবন্ধকে অবলম্বন করিয়া আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কেহ বিশদভাবে এই সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী রচনা করিবেন। সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই সম্পূর্ণ এবং অতিশয় সংক্ষিপ্ত জানিয়াও বিনয়বাবুর এই বিষয়ানুবন্ধ উপাসনায় প্রকাশিত হইয়াছে।*

—=—

উষা

(ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল—১১৩ সূক্ত)

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ গুপ্ত এম-এ]

সকল জ্যোতির সুন্দরী তমা
লাবণ্যময়ী উষা,
উজ্জ্বল বিভা জগৎ ব্যাপিয়া
প্রকাশিত তার ভূষা ;

সবিতৃ দেবের উত্থান তরে
উপনীতা উষা আসি,
রজনী দিয়াছে উষার লাগিয়া
স্থান তার পরকাশি।

উষা রজনীর দুই ভগিনীর
অনন্ত পথ এই,
দেবের আদেশে পরে পরে তারা
ভ্রমিতেছে পথে সেই।

সুন্দররূপা ভিন্ন স্বরূপা
তথাপি সমান মতি,
পরে পরে আসে স্থির নাহি রয়
চঞ্চল স্থিতি গতি।

* উপাসনা—কার্ত্তিক ১৩২৭।

সুখ কল নাদ জাগায়ে ভুবনে
ছড়ায়ে অতুল বিভা,
মর্ত্ত্যজনেরে দিয়াছে খুলিয়া
আলোকের দ্বার কিবা।

আলোকে পূরিয়া নিখিল জগৎ
ধন তার পরকাশি,
প্রতি প্রাণী জনে তুলেছে জাগায়ে
উষা তার কাছে আসি।

ঐ যে উদিতা আকাশ দুহিতা
আঁধার নাশিয়া উষা,
শুভ্র-বসনা যৌবনবিভা
উজ্জ্বল তার ভূষা।

তুমি পার্থিব সকল ধনের
নিরুপমা ঈশ্বরি,
অয়ি লো সুভগে এসো আজি হেথা
তম যত নাশ করি।

নিত্য-উদয়া উষার দীপ্তি
অতীত বর্ত্তমানে,
অজরা অমরা শাশ্বতী উষা
প্রভাতেজো বিকিরণে।

ধনবতী উষা দিতেছে আঁধার
দূরিয়া জগৎ হ'তে,
সেইরূপে আরো হইবে উদিতা
সুদূর ভবিষ্যতে।

গগনাঙ্গন উজলি বিভায়
প্রকাশিত উষারাণী,
অন্ধকারের গুণ্ঠন খানি
সবায়ে দিয়াছে টানি।

জাগায়ে সুপ্তি—মগন জগতে
লইয়া তরুণ ভূষা,
যুজি রথে তার অরুণ অশ্ব
আসিয়াছে হেথা উষা।

আনিয়া জগতে কত বরেণ্য
পোষণীয় ধনরাশি,
বিচিত্র আভা করিয়া প্রকাশ
আঁধার দিতেছে নাশি;

অগণিত কত অতীত উষার
উপমান স্বরূপিণী,
কত প্রভাময় আগামী উষার
আগমন প্রচারিণী।

উঠ উঠ সবে, পরাণ-ধাত্রী
জীবন দিয়াছে দেখা,
আঁধার যতেক গিয়াছে চলিয়া
ফুটিছে আলোক রেখা।

ঐ দেখ উষা ছাড়িয়াছে পথ
রবির ভ্রমণ তরে,
এস যাই মোরা যেখানে মানব
দীর্ঘ জীবন ধরে।

গীতা ও ভাগবত

[শ্রীস্মরজিৎ দত্ত, এম্‌-এ,]

(৩)

১। যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ গী ২।৬০

দেবাসুর কর্ত্তৃক সাগর মথিত হইলে অমৃত উদ্ভূত হইয়াছিল। ভগবান্ মোহিনী মূর্ত্তিতে অসুরদিগকে বিমোহিত করিয়া সেই অমৃত দেবগণকে পান করান। মহাযোগী মহেশ্বর সেই সংবাদ শুনিয়া ভগবানের সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে আসিয়া ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় যেরূপ হত-চৈতন্য হইয়াছিলেন এবং সেই মোহিনীকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য শিথিলিত ব্যাঘ্রাম্বর এবং প্রসারিত-বাহু হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতা যে কিরূপ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাঁহার চিত্ত বিকৃতি ঘটাইতে গিয়া স্বয়ং কুসুমেষু ভস্মীভূত হইয়া অনঙ্গ হইয়া রহিয়াছেন সেই নির্ব্বিকার পুরুষ যোগীশ্বর শিব পর্য্যন্তও যে ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে পারেন নাই সেই ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দুর্ব্বল মানুষের কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাগবত এই হরসম্মোহন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

২। কাম সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন :—
আবৃতং জ্ঞান মেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩।৩৯

ভাগবত তাহাই যযাতির উপাখ্যানে সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। যযাতি বৃষপর্ব্বানন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনা পূরণ করিলে রোষপরবশা দেবযানীর পিতা অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ হয় নাই। তিনি কামের তাড়নায় এতদূর জ্ঞান হীন হইয়াছিলেন যে যদু, তুর্ব্বসু প্রভৃতি পুত্র গণের প্রতিজনের নিকট দীন নেত্রে যৌবন বিনিময় করিতে গিয়া সকলের নিকটই প্রত্যাখ্যাত হইলেন। তথাপি তাহার চৈতন্যোদয় হইল না। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর উপর আপন বার্দ্ধক্য চাপাইয়া দিয়া তদীয় তরুণ যৌবন গ্রহণ করিয়া সেই দুষ্পূর অনল কামের উপশান্তি করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যতই ভোগ করেন ততই যেন অযুত বাসনা জিহ্বা বিস্তার করিয়া সেই বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে তিনি বলিয়াছিলেন :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

এইরূপে তিনি উপরত হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

৩। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ৪।৭

গীতার অবতারবাদের সহিত ভাগবতের মতৈক্য পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে। এক্ষণে ভাগবত কিরূপ ভাবে তাহা উদাহৃত করিয়াছেন তাহাই দেখান যাইতেছে। সাধারণতঃ আমরা দশাবতারের কথা শুনিয়া থাকি। কিন্তু ভাগবত দ্বাবিংশ অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে প্রচলিত দশাবতারেরই নির্দ্দেশ করিব।

মৎস্য :—পৃথিবী যখন পাপে ও অত্যাচারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তখন প্রলয়জলে এই পাপমলিনা পৃথিবীকে প্লাবিত করিবার মানসেই পূর্ব্বে ভগবান্ মৎস্যরূপে সত্যব্রত রাজাকে একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া পার্থিব জড় ও চৈতন্যাত্মক পদার্থ নিচয়ের বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই নৌকায়

অবতরণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। পরে দ্বাদশ আদিত্য এককালে উদিত হইয়া পৃথিবীকে ভস্মীভূত করেন। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্কর, সংবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘমালা অবিরাম বারিবর্ষণে সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত করিয়া দেয়। তখন ভগবান্ একশৃঙ্গ মহামীনরূপে সত্যব্রত রাজার সেই নৌকা বহন করিয়া প্রলয়পয়োধিজলে বিহার করেন। এই ঘটনার সহিত বাইবেল বর্ণিত Noa's Ark এর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। (ভাগবত, ৮।২৪।)

কূর্ম্ম :—অসুরগণ প্রবল হইয়া উঠিলে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ সুরগণকে সাগর মন্থন করিতে উপদেশ দেন। সেই ব্যাপারে মন্দর পর্ব্বত মন্থনদণ্ড এবং বাসুকি মন্থনরজ্জু পরিকল্পিত হন। অসুরগণ মুখের দিকে এবং দেবগণ পুচ্ছভাগে ধারণ করিয়া সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মহাশৈল মন্দর জলধিগর্ভে মগ্ন হইয়া যায়। তখন ভগবান্ কূর্ম্মরূপে সেই পর্ব্বতরাজকে স্বপৃষ্ঠে বহন করেন। তাহাতেই দেবগণ সমুদ্রমন্থনে সমর্থ হইয়া ছিলেন। (ভাগবত, ৮ম স্কন্ধ। ৬—৮।)

বরাহ :—সৃষ্টির প্রারম্ভে কশ্যপনন্দন হিরণ্যাক্ষ বলোদ্ধত হইয়া আপনার সমর বাসনা পূরণ মানসে ত্রিলোকী বিদ্রবিত করিতেছিল; কিন্তু কোথায়ও প্রতিপক্ষ যাইতেছিল না। ভগবান তখন বরাহরূপে জলমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার-সাধনে ব্রতী ছিলেন। সমকক্ষ যোদ্ধার লাভাশায় হিরণ্যাক্ষ বরুণালয়ে গমন করিয়া বরুণ-নির্দ্দেশানুসারে সেই বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ আদি বরাহ সেই অসুরের রণকণ্ডূতি চিরদিনের মত উপশান্ত করিয়া দিয়া ছিলেন। (ভাঃ ৩য় ১৩—১৯)

নৃসিংহ :—হিরণ্যাক্ষ-সহোদর হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃহন্তা হরির নিধনার্থ উগ্রতপস্যায় ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রকারান্তরে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া ত্রৈলোক্যাধিপতি হইয়া দেবগণকে দাসত্বে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেই চিরবৈরীর সন্ধান কোথায়ও পাইলেন না। প্রতিহিংসানলকে নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া আপনিই তাহাতে দগ্ধীভূত হইতেছিলেন। স্বপুত্র প্রহ্লাদকে সেই ভ্রাতৃহন্তার একান্ত অনুরক্ত ভক্ত দেখিয়া ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরেশ্বর তাহাকে বিবিধ নির্য্যাতনে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে ভগবান্ নৃসিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। (ভাঃ—৭ম। ৮-১০)

বামন :—দৈত্যরাজ বলি যখন ত্রিভুবন আপনার অধীনে আনয়ন করিয়া দেবগণকে স্বাধিকারচ্যুত করেন তখন দেবমাতা অদিতির প্রার্থনায় ভগবান্ তৎপুত্র বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া বৈরচনির বিশ্বজিৎ যজ্ঞে গমন করেন এবং ত্রিপাদমাত্র ভূমি ভিক্ষা করেন। প্রাহ্লাদিকে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ করিয়া সেই বামন বিশ্বমূর্ত্তি হইয়া পাদদ্বয়ে ভূর্লোক ও স্বর্গ আক্রমণ করেন এবং তৃতীয় পাদ বলির মস্তকে স্থাপ করিয়া তাহাকে পাতালে লইয়া যান। (ভা—৮। ১৭-২২)

পরশুরাম :—যখন ক্ষত্রিয়গণ বলোদ্ধত হইয়া ব্রাহ্মণ দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল এবং তৎকালীন প্রতাপান্বিত রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নি মুনিকে হত্যা করিয়া সেই পাপের মাত্রা পূর্ণ করিলেন, তখন জামদগ্ন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ পরশু মাত্র সহায় নিয়া সেই সহস্রবাহু ক্ষত্রাধিপতিকে নিহত তথা পৃথ্বীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন এবং সেই রক্তে তীর্থ পঙ্ককে পিতৃতর্পণ করেন। (ভাগবত ৯—১৫-১৬)

শ্রীরাম :—রক্ষোরাজ রাবণের উৎপীড়নে যখন সুরনর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিলেন তখন ভগবান্ অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সবংশে দশাননকে নিধন করেন। (ভাগবত ৯। ১০-১১)

শ্রীকৃষ্ণ :—শিশুপাল, দন্তবক্র, কংসাদি অসুরগণ প্রবল হইয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া উঠিলে ভগবান্ দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই ভার অপনয়ন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করেন। (ভাগবত দশমস্কন্ধ সম্পূর্ণ।)

বুদ্ধ :—বেদের কর্ম্মকাণ্ডে মুগ্ধ হইয়া ভ্রান্তমতি মানবগণ যখন পশুবধ দ্বারা নামযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইল তখন ভগবান্ করুণার অবতার বুদ্ধ হইয়া মর্ত্ত্যে আগমন করেন এবং অসুরভাবাপন্ন নরগণকে বেদের সকাম কর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন।

কল্কি :—কলির শেষে যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইবে—যখন চাতুর্ব্বর্ণ্য একবর্ণমাত্রে পরিণত হইয়া ম্লেচ্ছাচার হইবে, তখন ভগবান্ শম্ভোল গ্রামে ব্রাহ্মণ

বিষ্ণুযশার পুত্র কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধন পূর্ব্বক সত্যযুগের প্রবর্ত্তন করিবেন।

৪। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং॥ ৪। ১১

ভগবানের এতদুক্তির সত্যতা প্রদর্শন জন্যই ভাগবত রাসলীলা ও কুব্জাসমাগম বর্ণনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহনরূপে—যাহার দর্শনে "মদন মূরছা পায়"—গোপকুমারীগণ মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প করিয়া কাত্যায়নীর ব্রত করেন। কাত্যায়নীর পূজা বলিতে প্রকারান্তরে সেই ভগবানেরই পূজা যথা :—

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম॥ ৯। ২৩

অবিধি পূর্ব্বক হইলেও—"লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্"। তাই তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য "মহা যোগেশ্বর আত্মারাম" শ্রীকৃষ্ণ "অবরুদ্ধ সৌরত" হইয়া সেই গোপকন্যাগণের সহিত শারদজ্যোৎস্না প্লাবিত যমুনা-পুলিনে রাসলীলা করিয়াছিলেন। আবার কংসবধার্থ গমন করিতে মথুরার পথে স্বৈরিন্ধ্রী কুব্জার নিকট হইতে মাল্যচন্দন গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে কামার্থিনী কামিনী কুব্জার অভিলাষ পূর্ণ করেন।

৫। দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭। ৪

যে যোগমায়া অবলম্বন করিয়া নির্গুণ সগুণ হইলেন, নিরাকার সাকার হইলেন, অজ হইয়াও জননমরণাধীনত্ব স্বীকার করিলেন এবং এই চরাচর বিশ্বসৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টির অন্তর্গত জীব কেমন করিয়া সেই মায়া অতিক্রম করিবে? যতদিন সে সৃষ্টির অধীন ততদিন সে মায়ারও অধীন। কেননা মায়ার সাহায্যেই এই সৃষ্টি। কিন্তু এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করিতে না পারিলে—ত্রিগুণাতীত হইতে না পারিলে, জীবের দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হইবে না। জীবের নিজের শক্তি নাই যে সে এই মায়া পাশ ছেদন করে। সাগর মধ্যে মজ্জমান হইয়া সেই সাগরের পারে—তীরে—উঠিতে হইলে সাগরতীরস্থ কোন ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত উদ্ধারের আশা কোথায়? যে তোমারই মত এই সংসারসাগরেই 'হাবুডুবু' খাইতেছে সে আপনাকেই রক্ষা করিতে পারিতেছে না তোমাকে কেমন করিয়া তীরে টানিয়া তুলিবে। এই মায়ার সমুদ্র অতিক্রম করিতে হইলে মায়াতীত সেই ভগবানের শরণাপন্ন না হইলে চলিবে না। ভাগবত জীবকে আশা দিয়া বলিতেছেন—ভগবানে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়া রন্তিদেব এই মায়াপাশ ছেদন করিয়াছিলেন। রন্তিদেবের চরিত্র অদ্ভুত। জীবের দুঃখে দুঃখিত এরূপ মহাপ্রাণের দৃষ্টান্ত জগতের কোন জাতির ইতিহাসে মিলিবে না। একদিন দ্বিপ্রহরে রন্তিদেব আহারে বসিয়াছেন। এমন সময়ে একজন ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া অতিথি হইলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি তদীয় দৈনিক অতিথিব্রত পালন করিয়া তবে নিজে আহারে বসিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া রন্তিদেব আহার্য বস্তু সমুদায় তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণ পরম পরিতোষে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া চলিয়া গেলেন। তদীয় ভুক্তাবশিষ্ট অন্নে সে দিনের মত ক্ষুধা নিবারণ করিবার মানসে তিনি দ্বিতীয়বার আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে একজন শূদ্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিল। রন্তিদেব অম্লানবদনে সেই অন্ন শূদ্র অতিথিকে ভোজন করাইলেন এবং পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় নিতান্ত দুঃখিত ও মিয়মাণ হইয়া অভ্যাগত দেবতার নিকট ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিলেন। শূদ্র তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল। দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তখনও রন্তিদেবের মুখে জলবিন্দু পড়ে নাই। ক্ষুধায় জঠর জ্বলিতেছিল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কি উপায় আর ত অন্ন নাই, এমন কি অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যও নাই। থাকিলে শূদ্র অতিথিকে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় ফিরিতে হইত না। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। তখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়ের শান্তি একমাত্র জল দ্বারা বিধান করিতে মনস্থ করিয়া জলপাত্র যেমন বদনে তুলিবেন অমনি এক চণ্ডাল কতকগুলি কুকুর সঙ্গে লইয়া জল প্রার্থনা করিল। পিপাসায় তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইতেছিল না। তথাপি তিনি জলবিন্দু গ্রহণ না করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় মৃতপ্রায় হইয়াও সেই উক্ত

জলপাত্র চণ্ডালের হস্তে প্রদান করিলেন। চণ্ডাল আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া অবশিষ্ট জলদ্বারা সেই কুকুরগুলির পিপাসা দূর করিল এবং শূন্য পাত্র রন্তিদেবকে ফিরাইয়া দিয়া বনে প্রস্থান করিল। রন্তিদেব আজ বড় আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহার পিপাসার শেষ বারিবিন্দুটুকু আজ কি মহৎ কার্য্যে লাগিয়া গেল! তিনি নিজের ক্ষুৎপিপাসা সম্পূর্ণ দমন করিয়া এই ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসাতুর দিগের যে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে পারিয়াছেন এই আনন্দে তিনি আজ ভরপূর। আমরা Sir Philip Sydney র কথা শুনিয়াছি। তিনি Jutphen এর যুদ্ধে আহত হইয়া পিপাসায় কাতর হইলে জল আনয়ন করিবার আদেশ করেন। জল আনীত হইলে তিনি যেমন সেই জল মুখে তুলিবেন অমনি দেখিলেন একটী বাহ্যমান আহত মুমূর্ষু সৈনিক সতৃষ্ণনয়নে সেই জলপাত্রের প্রতি চাহিয়া আছে। মহাপ্রাণ Sydney তখনই সেই জলপাত্র মুমূর্ষু সৈনিককে প্রদান করিয়া বলিলেন—Thy necessity is yet greater than mine' এক্ষণে Sydney র এই কাহিনীর সহিত রন্তিদেবের কার্য্য তুলনা করিয়া দেখুন। Sydney বলিলেন—আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন বেশী অর্থাৎ তোমার মৃত্যু আসন্ন, হয় ত আর অল্পক্ষণ মধ্যেই তোমার জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে। কিন্তু আমি তোমার মত অবস্থাপন্ন নহি। আমি এখনও অনেককাল জীবিত থাকিব আশা করি। সুতরাং আমি জলপানের যথেষ্ট সময় পাইব। অপেক্ষার সময় আমার আছে কিন্তু তোমার আর অপেক্ষা করিয়া থাকিবার সময় নাই। মুহূর্ত্ত বিলম্বে হয় ত তোমাকে বাসনা অপূর্ণ রাখিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব এ জল তোমারই পান করা উচিত।—ইহা খুব উদারতার ও করুণহৃদয়ের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তথাপি বিচার করিলে তাহার উক্তি হইতে আমরা আরও কিছু অনুমান করিতে পারি। যদি সৈনিক মুমূর্ষু না হইত, তাহা হইলে আর Sydneyকে বোধহয় এতাদৃশ উদারতা ও নিঃস্বার্থতা প্রদর্শন করিতে দেখিতাম না। কিন্তু রন্তিদেব সে হিসাবে কত উচ্চ—তাঁহার হৃদয় কত উদার—তাঁহার প্রাণ পরবেদনায় কতদূর বেদনাতুর! কিন্তু আমরা শুধু Sydneyর কথাই বলিয়া থাকি। রন্তিদেব চির গোপনেই রহিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ এতাদৃশ পরদুঃখকাতরতা দেখিয়া রন্তিদেবকে বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। রন্তিদেব কি বর প্রার্থনা করিলেন?

না কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
৯।২১।১৮

অর্থাৎ "আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-যুক্তা গতি চাহি না অথবা মুক্তিও কামনা করি না। যদি বরই দিতে হয় তবে এই বর দিন যেন আমি অখিল জীবগণের অন্তঃস্থিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ের সকল দুঃখ জ্ঞাত হইয়া তাহা আমার নিজের উপর লইতে পারি এবং তদ্দ্বারা যেন তাহাদিগকে সুখী করিতে পারি।" ব্যাপারটা বুঝিলেন? হয়ত জীবগণ তাহাদের সকল দুঃখের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিবে না এবং তাহা সম্ভবও নহে কেননা যে সকল জীব তির্য্যগ্যোনিসম্ভূত এবং বাক্‌শক্তিহীন তাহারা কেমন করিয়া তাহাদের দুঃখের কথা জানাইবে! আর যাহারা জানাইতে পারে তাহারাও যে প্রাণ খুলিয়া সকল কথা তাঁহার নিকট বলিবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? তাই রন্তিদেব বলিলেন আমি যেন এমন শক্তি লাভ করিতে পারি যাহাদ্বারা জীবমাত্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার সকল দুঃখের সংবাদ লইতে পারি এবং সেই দুঃখের ভার নিজের উপর লইয়া তাহাকে সুখী করিতে পারি। নিজে সুখী থাকিয়া তাহাদিগকে সুখী করিবার ইচ্ছা নহে। তাহাদের দুঃখ নিজে বহন করিয়া সেই দুঃখ হইতে মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে সুখী করিবার কামনাই তাঁহার প্রবল। ভগবানের নিকট এমন প্রার্থনা আর কোন দেশে কেহ কখন করিয়াছে কি? রন্তিদেবের প্রার্থনা শুনিয়া আমাদের বাঙ্গলার বাসুদেব দত্তের কথা মনে পড়ে। এই মহাপ্রাণ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ তলে লুটাইয়া সাশ্রু নয়নে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন—সমস্ত জীবের স্তূপীকৃত পাপের বোঝা আমার উপর চাপিয়া থাকুক। আমি সেই পাপ-পর্ব্বতের তলে অনন্ত কাল ধরিয়া নিষ্পেষিত

হইতে থাকি। আমার মুক্তিত চাহিই না; পরন্তু ঐরূপে অনন্ত নির্য্যাতন ভোগে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না। কেবল সেই জীবগণ যেন তাহাদের স্ব স্ব পাপ এইরূপে আমার উপর দিয়া নিজেরা মুক্ত হইতে পারে। আমি শুধু একাকী এই পাপরাশি লইয়া এখানে পড়িয়া থাকি! কি প্রার্থনা! মহাপ্রাণ ঈশার জীবদুঃখে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ ইহার তুলনায় কোথায় দাঁড়ায়! তাহাও স্বেচ্ছাকৃত নহে। অবিশ্বাসী অত্যাচারীদিগের দ্বারা বধ্য হইয়া তাঁহাকে এই মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। আবার তাহাও তিনি অম্লান বদনে অকাতরে নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিতে পারেন নাই। মৃত্যুকালে বলিয়া ছিলেন—হা ভগবন্, হা ভগবন্ কেন আমায় পরিত্যাগ করিলে!—Eli Eli Lama Sabakthsne. Ah God, Ah God, why do t thou forsake me!

যাহা হউক ভগবান্ রন্তিদেবের ঐ অদ্ভুত প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা ভাগবত বলেন নাই। তবে গীতোক্ত ভগবদ্বাণীর সমর্থন করিয়া বলিতেছেন:—

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্ব্বতোঽনন্ত রাধসঃ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত ॥৯।২১।১২

৬। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥৭।১৬

ভাগবত এই চতুর্ব্বিধ ভক্তেরই নিদর্শন দিয়াছেন। ভক্তি রসামৃত সিন্ধুকার শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী ভাগবত হইতে দৃষ্টান্ত তুলিয়া বলিতেছেন:—

গজেন্দ্রঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবশ্চ স চতুঃ সনঃ॥

অর্থাৎ গ্রহগ্রস্ত গজরাজ আর্ত্ত ভক্ত; ভগবানের লীলা শ্রবণাভিলাষী শৌনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসু ভক্ত; বিমাতার বাক্য বাণে বিদ্ধমর্ম রাজ্যার্থী পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব অর্থার্থী ভক্ত; এবং জীবন্মুক্ত ব্রহ্মপুত্র সনক, সনন্দন সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিজন জ্ঞানী ভক্ত।

৭। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবেতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৮।৬

ভাগবত ভরত ও পুরঞ্জয়ের উপাখ্যান দ্বারা এই উক্তির সার্থকতা বোঝাইয়া করিতেছেন। রাজর্ষি ভরতের নাম সকলেই জানেন। তাঁহারই নামানুসারে ভারতের নামকরণ হইয়াছে। তিনি বানপ্রস্থাবলম্বনে ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান ধারণার দ্বারা জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইতে ছিলেন। ব্যাঘ্রভীতা গর্ভবতী কুরঙ্গী নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়া গর্ভপাতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার সদ্যঃপ্রসূত শিশুটীর ভার তাঁহার উপর দিবার জন্যই যেন মৃত্যু মলিন মুখে, মৌনমিনতিপূর্ণনয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াই এণবধূর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সন্ধ্যাবন্দন রত রাজর্ষি সেই মুমূর্ষু মূকের নীরব প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই হরিণশিশুকে লালন করিতে তৎপ্রতি তাঁহার এতদূর আসক্তি ও মায়া জন্মিয়াছিল যে যৌনবৃত্তিপূরণার্থী মৃগ অপর এক বন্য মৃগীর সহিত বালকের স্নেহপাশ ছেদন করিয়া নিবিড় অরণ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহারই অদর্শনশোকে কাতর হইয়া যোগী ভরত তাহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া জীবন ত্যাগ করিলেন। ফলে তিনি পরজন্মে হরিণযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীনবর্হির জ্ঞানোদয়ার্থ দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট পুরঞ্জন-উপাখ্যান বর্ণন করেন। সেই পুরঞ্জন এতদূর স্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে স্ত্রীকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। জন্মান্তরে তিনি স্ত্রীত্বই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ৮।২৪

যোগীর আত্মা কিরূপভাবে দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া কোন পথে প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে তাহাই এই শ্লোকে এবং ১০ম ও ৯৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। ভাগবত ভীষ্মের নির্য্যাণ দ্বারা ইহা উদাহৃত করিয়াছেন। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ শরশয্যাগ্রহণ করিয়া এই উত্তরায়ণেরই অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ওদিকে কুরুক্ষেত্রে মহাসমরে বিরাট ধ্বংসের ব্যাপার চলিতেছে, এদিকে তাহারই একপ্রান্তে হিরণ্বতী তীরে মহাযোগী পরম ভাগবত ভীষ্ম যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কালপ্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরের অবসান হইয়াছে। মহাকালের মহাধ্বংসলীলা শেষ হইয়াছে। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে কুরুপক্ষে পাঁচজন এবং পাণ্ডবপক্ষে

মাত্র সাতজন অবশিষ্ট। ধর্ম্মক্ষেত্র আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। মানব ও পশুর ছিন্ন শব রাশি হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া হিরণ্বতীর নীলাম্বু রাশি গাঢ়রক্তে পরিণত করিয়াছে। মৃতের আত্মীয়গণ মথিতমর্ম্মে প্রিয়ানুসন্ধানে রত। ক্ষণপূর্ব্বে যে বীর স্ববীরত্বের আস্ফালনে মৃত্যুকে উপহাস করিয়াছিল এক্ষণে তাহারই রক্তস্রাবী ক্ষত হইতে বহির্গত অস্থি শৃগালচর্ব্বিত দেখিয়া সে অসহায়ে—অসহ বেদনায় চীৎকারমাত্র করিতেছে। কোথায় বা দিগন্ত মুমূর্ষের উষ্ণ বক্ষোরক্ত পানে উন্মত্ত গৃধের পক্ষবিধূননশব্দে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ বিলীন হইয়া যাইতেছে। আর অদূরে জাহ্নবীনন্দন ভীষ্ম বাসুদেবকে নয়নপথবর্ত্তী করিয়া [illegible] রণমধ্যে দাঁড়াইয়া অর্জ্জুনপ্রতি

প্রয়াণকালে [illegible] ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ [illegible] পরং পুরুষমুপৈতি
দিব্যং ৮।১০

গীতো এই উক্তি—যেন নিজ নির্য্যাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন। আর রণশ্রান্ত শোকমুহ্যমান কুরুপাণ্ডব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্বদৃশ্য বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছেন।

৯। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তালোকং বিশন্তি॥ ৯।২১

হরিশ্চন্দ্রের পিতা মহারাজ ত্রিশঙ্কু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ না হইলেও কতকপরিমাণে সাক্ষ্য দিতে পারেন। তিনি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক স্বর্গে প্রস্থাপিত হইয়া গুর্ব্বপমানজনিত মহাপাপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া অর্ব্বাক্ শিরে মর্ত্ত্যে আসিতে আসিতে আসিতে বিশ্বামিত্রের আদেশে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন।

১০। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥৯।২২

পূর্ব্বে ব্রজবাসি গোপগণ এবং পরে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপর সমস্তভার অর্পণ করিয়া তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া তচ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতেন। ফলে তাঁহারাও সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পালিত হইয়াছিলেন।

মনোময়ী

[শ্রীআশুতোষ রায়]

দূরে ছিল সেইত ভালো
স্বপন হয়ে জাগ্‌ত প্রাণে,
রূপ ধরে আজ আঁখির পরে
কেন এল গন্ধে গানে?

কেন চোখের পরশ দিয়া
তুলল হৃদি' মুঞ্জরিয়া?
সুর-হারা মোর চিত্ত-বীণা
গুঞ্জরিল তানে তানে।

এ জীবনে নাই বা যদি
মেটে আমার মিলন আশা
মনের মাঝে হবে মিলন
প্রাণের পথে যাওয়া আসা।

দেখব শুধু আঁখি ভরে'
রাখব স্মৃতি হিয়ার পরে
এই হাসি এই চোখের দেখা
জাগবে আমার নীরব ধ্যানে।

প্রেততত্ত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি-এ]

স্বতঃ কথন ও স্বতঃ লিখন

(প্রেতবার্ত্তা)

অলৌকিকের আত্মপরিচয়ের আর একটী ধরণ হইতেছে স্বতঃকথন ও স্বতঃলিখন। অতিপ্রাচীনকাল হইতে নানা-রূপে সভ্য অসভ্য সব জাতিদের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও আধুনিক সময়ে ইহার বিশেষ রকম আবির্ভাব দেখা দিয়াছে—বিশেষ চিৎতত্ত্ব সভার পরীক্ষা প্রেক্ষণের ফলে ইহার খুবই বিকাশ দেখা দিয়াছে। তাহার কারণ জীবাত্মার দেহান্ত অস্তিত্ব প্রমাণে ইহার কার্য্যকারিতা সব চেয়ে বেশী বলিয়া বুঝা গিয়াছে।

ব্যাপারটীর বিশেষত্ব এই যে কোনো কোনো মিডিয়মের এমন একটা শক্তি আছে যে হয় সজাগ বা মোহাবস্থায় হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বা হাত দিয়া এমন কথা বা লেখা বাহির হয় যাহাতে তাহার অজ্ঞাত নানা সংবাদ বা জ্ঞানের কথা থাকে; এ লেখা বা কথার উপর তাহার কোনো নিজের প্রভাব থাকে না; যেন আর একজন, হয় দূরবর্ত্তী কেহ, বা মৃত, তাহার মুখ বা হাত ব্যবহার করিতেছে। সে একটা নিশ্চল যন্ত্রের মত পড়িয়া থাকে কথিত বা লিখিত বিষয় সম্বন্ধে তাহার নিজের কোনো জ্ঞানই থাকে না; এবং এ সব কথায় বা লেখায় যেসব বার্ত্তা প্রকাশ হয় তাহা সত্য, মিথ্যা বা কাল্পনিক যা তা হইতে পারে; প্ল্যান্‌চেটে লেখা; বা হিষ্টিরিয়া রোগীর উক্তি বা ভূতে পাওয়া লোকের মুখ দিয়া এমনি ধরণের অনেক কথাই বাহির হয়; মোহপ্রাপ্ত (মেস্‌মেরাইজ্‌ড্) লোকের মুখ দিয়াও এই ধরণের উক্তি বাহির হয়। রোগ-জনিত বিকার ফলে যাহা বাহির হয় তাহা ছাড়িয়া দিলেও মন্ত্র-মুগ্ধ বা সজাগ সজ্ঞান মিডিয়মদের মুখ বা হাত হইতে বাহির হওয়া কথার একটা অলৌকিকত্ব আছে, এর সেই রহস্যের নিরাকরণ ও পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই সকল প্রাপ্ত অনেক বার্ত্তার যৌক্তিকতা ও সত্যের সহিত মিল দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে ইহা কোনো অদৃশ্য সজ্ঞান শক্তির ইচ্ছা ও চেষ্টা-ঘটিত কার্য্য। আর এর পরিচয় পাইয়াই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতরা ইহাকে অলৌকিকের আত্মপ্রকাশেরই একটা ইঙ্গিত বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং তাহার তত্ত্ব নিরাকরণে যত্নপর হইয়াছেন।

মিডিয়ম ধর্ম্মী মানুষের মধ্যে এই শক্তির প্রকাশ নূতন নহে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা দেশে ইহার ক্রিয়া ঘটিয়াছে। পুরাকালীন গ্রীস দেশের মহাজ্ঞানী সক্রেতিসের এই অভিনব শক্তি ছিল। মধ্যযুগে ফরাসী দেশের স্বনামধন্যা জোয়ান আর্কেরও এই শক্তি দেখা গিয়াছিল। উভয়েই সময়ে সময়ে অলৌকিক উপায়ে দিব্যবাণী শুনিতেন। সক্রেতিসের জীবনে দৈনিক কাজকর্ম্ম করার সময়ে এই দেববাণী দ্বারা চালিত হইতেন। জোয়ান আর্কের ঐতিহাসিক গৌরবলাভের মূলে এই শক্তি।

আধুনিককালে বিলাতের স্বনামধন্য ষ্টেনটন্ মোজেসের এই অভিনব শক্তি ছিল। মোজেস্ সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে এই শক্তির অধীন হইয়া অতি অদ্ভুৎ সব ধর্ম্ম ও দর্শন-তত্ত্বের বার্ত্তা পাইতেন। এই সকল বার্ত্তা তাঁহার মতে পরলোকগত প্রাচীন জ্ঞানীদের প্রেরিত। এই প্রভাবের বলে মোজেসের ইহ-জীবনের ধারা বদলাইয়া যায়।

তাহার জনকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া এসব কথা কেহ জানিত না। পণ্ডিতপ্রবর মায়ার্সের সহিত তাঁহার খুব পরিচয় ছিল। বিজ্ঞানাচার্য্য রাসেল্ ওয়ালেস্ ও কুক্স্ তাঁহাকে উত্তম চিনিতেন এবং স্বচক্ষে তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ও এই সব দিব্য-বার্ত্তা দেখিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। তাঁহার মরণান্তে তদীয় প্রাপ্ত সমস্ত লিখিতবার্ত্তা মায়ার্স নিজে ভালরকম করিয়া পরীক্ষা ও সমালোচনা করেন। এই সব সমালোচনা চিৎতত্ত্ব সভার নবম ও [illegible] সংখ্যক বার্ষিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। [illegible] নিজেও একজন অপক্ষপাত তীক্ষ্ণ সমালোচক [illegible]। [illegible] ইহাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ [illegible]। তিনি বলেন,—"এই সব [illegible] যখন আমার [illegible] বাহির হইত তখন আমি উহাদের প্রভাব [illegible] পারিতাম না, পাছে আমার নিজের মনের [illegible] উহাদের উপর পড়ে এজন্য আমি সেই সময় [illegible] অন্য চিন্তা করিতাম, তথাপি লেখা যেন [illegible] আমাকে বাহির হইত, আপনা হইতে অজ্ঞাতসারে [illegible] বাহির হইত, আমি তাহার বেগ সামলাইতে [illegible] পারিতাম না, সময়ে সময়ে আমি মোহগ্রস্থ [illegible] পড়িতাম, সে সময়েও আমার মুখ দিয়া ওইবগণের [illegible] বাহির হইত। মোহ ভাঙ্গিলে কিছু মনে [illegible] পারিতাম না।" মায়ার্স বলেন—এই সব লেখার [illegible] মোজেসের নিজের হস্তাক্ষর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

[illegible] কথা যে সত্য তাহার এক চূড়ান্ত প্রমাণ মায়ার্স [illegible] করেন। মোজেসের এক পরিচিতা মহিলা [illegible]। এই মহিলা তাঁহার পল্লীভবনে রবিবারে মারা যান। সেইদিন রাত্রিতে মোজেসের হাত দিয়া স্বতঃলিখন যোগে মহিলার প্রেতাত্মা নিজ মৃত্যু সংবাদ [illegible]। মোজেস তাঁহার অসুখের বা মৃত্যুর কোনো খবর জানিতেন না। তিনি তখন লণ্ডনে; মহিলার মৃত্যু-স্থান হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে। দু' একদিন পরে সেই প্রেত কর্ত্তৃক আরো অনেক বার্ত্তা প্রেরিত হয়। মোজেস্ তাঁহাকে তাহার আত্মত্ব জানিতে প্রমাণ দিতে বলায় আত্মা বলিল—"আমার হাতের লেখাই সেরা প্রমাণ।" তাই শুনিয়া মোজেস্ সেই লিখিত বার্ত্তা তাঁহার নোটবুকে আঁটিয়া রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মায়ার্স তদীয় গোপনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার অনুমতি পান। উক্ত আত্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত বার্ত্তা দেখিয়া তাঁহার উহা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি মৃতামহিলার পুত্রের সাহায্যে তাহার কাগজপত্র হইতে হাতের লেখা আনাইয়া হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ও নিজেও দেখিয়া উভয় লেখার আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পান।

মোজেস্ বলিতেন যে এ সব বার্ত্তা প্রেত কর্ত্তৃক প্রেরিত তাহার দুইটা আশ্চর্য্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যের সভাপতি গারফিল্ডের মৃত্যুর ১২ ঘণ্টা আগে মোজেসের হাত দিয়া স্বতঃলিপি বাহির হয় প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড কয়েক ঘণ্টার পরই মারা যাইবেন। ঘটনা সত্য হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত :—একদিন মোজেসের হাত দিয়া স্বতঃলিপি বাহির হয় "আমি আত্মহত্যা করিছি—বেকার ষ্ট্রীট্।" পরক্ষণেই মোজেসের মোহ হয়, সেই অবস্থায় তিনি যথেষ্ট আবেগের সঙ্গে বলিয়া উঠেন—"হাঁ হাঁ আত্মহত্যা করিছি একটা ষ্টীম্ রোলারের নীচে পড়ে—হাঁ আত্মহত্যা করিছি"। তখন সেখানে চিৎতত্ত্ব সভার এক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। কেহ বার্ত্তাটীর মানে বুঝিলেন না। পরে একটী সান্ধ্য সংবাদপত্রে খবর দেখা যায় একটী গাড়োয়ান বেকার ষ্ট্রীটে ষ্টীম্ রোলারের নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে।

চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সভা (S. P. R.) যে সব রাশি রাশি প্রামাণিক স্বতঃলিখন ও স্বতঃভাষনের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া এই কয়টী সত্যতত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে :—(১) এই সকল লিখন ও ভাষণ মিডিয়মের সহজ সজাগ অবস্থাতে ও স্বতঃ বা পরতঃ ঘটীত মোহাবস্থাতে (Trance) উভয় অবস্থাতেই বাহির হয়। (২) এই সকল লিখিত ও কথিত বার্ত্তা মিডিয়মের অব্যক্ত সুপ্ত চৈতন্য (Subliminal consciousness) হইতে আসে, (৩) কখনো বা টেলিপ্যাথী বলে অন্য জীবিত ব্যক্তির ব্যক্ত বা অব্যক্ত চৈতন্য হইতে আসে

(৪) কখনো বা মৃতব্যক্তির বিদেহ চৈতন্ত কর্তৃক টেলিপ্যাথী বলে মিডিয়মের সুপ্ত চৈতন্ত যোগে প্রকাশিত হয় কখনো কখনো বা বিদেহ আত্মা কর্তৃক মুগ্ধ মিডিয়মের দেহ-যন্ত্র অধিকৃত হইয়া তাহার মুখ ও হাত দিয়া প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত দুইটা অবস্থাকে চলিত ভাষায় 'ভর পাওয়া' 'ভরঃগ্রস্ত' বলা হয়। 'ভর' বা 'আবেশ' মিডিয়মের সজ্ঞান অজ্ঞান দুই অবস্থাতেই হইতে পারে।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া উক্ত প্রত্যেক ধরণের বার্ত্তা প্রেরণের ধরণটা বুঝাইব।

প্লানচেট্ লইয়া অনেকেই পরীক্ষা করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন যে যন্ত্রটার চলাফেরা একটা অলৌকিক শক্তির ফলেই হয়; চালকের ইচ্ছাধীন নয়; আর প্রশ্নের যে সব উত্তর বাহির হয় তা অনেক সময়ে সত্য এবং চালকের বা উপস্থিত অন্য কোনো প্রশ্নকর্ত্তার জ্ঞানের বাহিরের কথা। অন্ততঃ তাহার উপস্থিত জাগ্রত জ্ঞানে তাহার অস্তিত্ব নয়; অনেকেই এ গুলাকে দেহাতিরিক্ত আত্মার কাজ বলেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। এসব উত্তর চালক বা পরীক্ষক বা উপস্থিত কাহারো সুপ্ত চেতনা হইতে অজ্ঞাত উপায়ে সংগ্রহ করা। যে উত্তর আশা করা যায় প্রায়ই সেই উত্তর পেনসিলে বাহির হয়; যাহার উত্তর কেহ জানেনা, তাহার কোনো উত্তর প্লানচেটে পাওয়া যে একেবারে যায় না তাহা নহে। অনেক সময় পেনসিলে এমন লেখা বাহির হয় যাহা পরীক্ষকের সহজ বুদ্ধিতে জানা নাই। সুপ্ত চৈতন্যতে থাকিবারও কোনো কারণ ঘটেনা অথচ সত্য হয়। এরকম দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও কিছু অলৌকিক বটে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি;—

(১) ডাক্তার থর্ণটন্ একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞান অধ্যাপক; অলৌকিক তত্ত্ব লইয়া ইনি নিরপেক্ষভাবে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। ইনি সত্যাসন্ধিৎসু। একবার তাঁহার কন্যার-সহিত প্লানচেট্ লইয়া পরীক্ষা করিতে বসেন। নিকটে তাহার পত্নী বসিয়া; প্লানচেট্ চলিতে লাগিল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনো আত্মা উপস্থিত?"

উত্তর। হাঁ হেনরী বেন্‌স্।

প্রশ্ন। আপনি কে?

উত্তর। ভগবানের ধর্ম্ম প্রচারক—

ডাক্তার পত্নীর প্রশ্ন। আপনার সঙ্গে শেষ দেখার পর কোথায় গিয়াছিলেন?

উত্তর। আলাস্করিয়া

ডাঃ পত্নীর প্রশ্ন। সেখানে কি মারা যান?

উত্তর। হাঁ

প্রশ্ন। কিরূপে

উত্তর। বিষমাখা বর্শার দ্বারা বিদ্ধ হয়ে

প্রশ্ন। কিছু বলিবার আছে?

উত্তর। আমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন।

ডাক্তার থর্ণটন বলেন আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি বা তাঁর কন্যা যে, ইহাঁকে চিনিতেন না, কখনো তাঁর নামও শোনেন নি; এবং তাঁহার এভাবে মৃত্যুর কথা ডাক্তার কিছুই জানিতেন না। জানিত কোনো উপায়ে ইহার কারণ নির্ণয় হয় না। তবে সম্ভবতঃ হয় ডাক্তার পত্নীর সুপ্তচৈতন্য কোনো উপায়ে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল, না হয় উক্ত প্রেতাত্মা প্লানচেটে ভর করিয়া এই সংবাদ দিল। কিন্তু জীবের সুপ্তচৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী না হইলে এমন করিয়া দশ[illegible] সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে না।

(২) মিডিয়মের নিজ সুপ্ত চেতন্য হইতে প্রাপ্ত :—পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটী ডাঃ পত্নীর সুপ্ত চৈতন্য বা হেনরী বেন্‌সের মৃত আত্মা যে কাহারো কাজ হইতে পারে। ডাক্তার পত্নী হয়তো কোনো রকমে বেন্‌সের মৃত্যুকথা বা গন্তব্য ঠিকানা শুনিয়াছিলেন, ভুলিয়া গিয়া কোনো মতে মনে করিতে পারেন নাই। যদি সত্যই কোনো উপায়ে এ সংবাদ তাঁহার জ্ঞানগোচোর আসে নাই বা তাঁহার স্বামী বা কন্যা কাহারো নয় তখন মানিতেই হইবে উহা মৃতের প্রেতেরই কাজ। সব বার্ত্তাই যে প্রেতের বাহিত তাহা নয়; মিডিয়মের সুপ্তচেতনা (Sub.con) হইতে যে অনেক বার্ত্তার উদ্ভব হয় তাহার পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ আছে। প্লানচেট্ বা টেবিল লইয়া

যাঁহারা ভূত-নামানো পরীক্ষা করিয়াছেন বা করেন তাঁহারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে কথিত প্রেতরা পরীক্ষা-কারীদের মনোগত কথা ছাড়া আর কিছু বলিতে পারেনা।

(৩) আচার্য্য সিজউইক কৃত পরীক্ষা :—

আচার্য্যের এক বন্ধু ছিলেন, তিনি এসব ব্যাপারে প্রেত-বাদী। আচার্য্য বলেন যে স্বতঃ লিখনে যে সব বার্ত্তা বাহির হয় তাহা মিডিয়মের সুপ্তচেতনার কাজ। এই তত্ত্বের কোনটা ঠিক নির্ণয় করিবার জন্য একবার দুজনে মিলিয়া পরীক্ষা করেন। আচার্য্যের বন্ধুর স্বতঃলিখন শক্তি ছিল। উভয়ে স্বীকার করিয়া লইলেন যদি লিপিতে এমন বার্ত্তা বাহির হয় যাহা উভয়ের কাহারো জ্ঞানগত নহে তবেই বুঝা যাইবে যে সুপ্তচেতনা ছাড়া অন্য অলৌকিকের কার্য্যশক্তি বটে। পরীক্ষায় এমন সব বার্ত্তা বাহির হইল যাহা উভয়েরই মনোগত ছিল। অজ্ঞাত কিছু জানিবার জন্য প্রশ্ন করা হইলে তার সুবিধামত বা সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইত না। বহু পরীক্ষার ফল উভয়েই সিদ্ধান্ত করেন যে বার্ত্তাগুলি সুপ্ত চেতনা দিয়া হইতে পৌঁছিয়াছে। একবার এইভাবের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় "আগামী কল্য টাইমস্ পত্রিকার প্রধান প্রবন্ধের (সম্পাদকীয়) প্রথম লাইনটা কি থাকিবে?" উত্তরে একটা লাইন বাহির হইল। পরদিন দেখা গেল, উহা মিথ্যা। বার্ত্তাবাহী তথাকথিত প্রেতকে জিজ্ঞাসা করা হয় "মিলিল না কেন?" উত্তরে লেখা বাহির হইল—"যে প্রবন্ধের প্রথম লাইন দিয়াছিলাম তাহা প্রেসের কোনো গোলমালে হস্তগত না হওয়ায় অন্য একটা প্রবন্ধ তাড়াতাড়ি লেখা হইয়া প্রকাশ করা হয়—।" বলা বাহুল্য একথা সর্বৈব মিথ্যা। আচার্য্য সেজউইক বলেন সুপ্তচেতনা যে কিরূপভাবে আত্মশক্তির পরিচয়ে চমক লাগাইয়া দেয় তাহা ভাবিবার বিষয়। একবার বৈঠক ভঙ্গে তাঁহারা উঠিবেন এমন সময় লেখা বাহির হইল 'Khairate' তাঁহারা একথাটার মানে বা সার্থকতা কেহ বুঝিলেন না। পরে আচার্য্যের হঠাৎ মনে পড়িল উহা গ্রীকভাষার কথা উহার অর্থ "এখন বিদায় তবে"। তাঁহারা একবার "প্রেতকে" জার্ম্মান ভাষায় উত্তর দিতে বলেন। উত্তরে গোটাকয় জার্ম্মান কথা লেখা হয়; তাহাদের ব্যাকরণ শুদ্ধ বিন্যাস ছিল না; তবে কথাগুলা একত্র করিলে একটা সত্য উত্তরের আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। আমার বন্ধু জর্ম্মনীভ্রমণ কালে লোকমুখে গোটাকত চলিত কথা শুনিয়া শিখিয়াছিলেন মাত্র।

(৩) এইরূপ স্বতঃলিপিতে বার্ত্তাগুলি যে অনেক-ক্ষেত্রে টেলিপ্যাথী বা ভাব-চালনার দ্বারা মিডিয়মের সুপ্ত-চেতনায় প্রবেশ করে ও পরে লেখাতে বাহির হয় তাহার অসংখ্য প্রামানিক দৃষ্টান্ত আছে।

(৩) শ্রীযুক্ত আবথার স্মিথের পরীক্ষা :—

স্মিথ বলেন আমরা জনকয়েক একবার প্লানচেট্ লইয়া পরীক্ষা করিয়া একটা অভিনব তত্ত্ব বিদিত হই। আমার এক নারী বন্ধু প্লানচেটে হাত দিয়া বসেন। দ্বিতীয় একজন (পরীক্ষক) দূরে বসিয়া একখণ্ড কাগজে বিখ্যাত উপন্যাস লেখক ডিকেন্সের নাম লিখিয়া তাহাতে দৃঢ় ভাবে মনঃসংযোগ করিতে থাকেন। উদ্দেশ্য প্লানচেটে উহা বাহির হয় কিনা। সেই ঘরে আর একটি মহিলা ছিলেন। তিনি তখন কোন গোপনীয় পারিবারিক মনকষ্টে কাল কাটাইতেছিলেন; এই গোপনীয় ব্যাপারে জনৈক ভদ্রলোকের হাত থাকায় মহিলাটী তাহার কথা ভাবিতেছিলেন। আমরা সকলেই সেই গোপনীয় ঘটনার একটু আধটু জানিতাম, কিন্তু তখন কাহারো সে চিন্তা ছিল না; পরে দেখা গেল প্ল্যানচেটে সেই ভদ্রলোকের নাম, (Bolton) বাহির হইল। আমরা বড় লজ্জিত হইয়া সেটা চাপা দিবার চেষ্টা করিলাম। বুঝা গেল মহিলাটীর মনে উক্ত 'বোল্টন' চিন্তা এত প্রখর ভাবে তখন জাগ্রত ছিল যে পরীক্ষকের মানস চেষ্টা তাহার কাছে ব্যর্থ হইয়া গেল। পরীক্ষায় আরো জানা গেল যে শ্রীমতী—র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার সুপ্তচেতনা উক্ত নাম মিডিয়মের সুপ্ত চেতনায় উদ্দেশেই অজ্ঞাত সারে পাঠাইয়া দিল।

প্রসঙ্গ স্থলে একটা কথা বলি। মানুষের অন্তর্য্যামী

সুপ্ত চেতনা (জীবাত্মার অব্যক্তাংশ) অজ্ঞাতভাবে আশে পাশের বা দূরের অন্যান্য মানুষের মনের উপর কি পরিমান প্রভাব যে বিস্তার করে তাহা বলা যায় না। সমস্ত সদ্ শাস্ত্রে যে কায়মনোবাক্যে ভাল করার আদেশ করেন তাহা এই কারণে। আমার ভালমন্দ চিন্তা আমার জাগ্রত চেতনায় অজ্ঞাতে কত লোকের ভালমন্দ যে করে তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? এইজন্যই চিত্তশুদ্ধির উপর সর্ব্বধর্ম্ম ও ধর্ম্মচেত্তার এত জিদ্।

(অক) উক্ত দৃষ্টান্তে ব্যক্তির অনিচ্ছাসত্বে ও অজ্ঞাতসারে মনোভাব টেলিপ্যাথী বলে মিডিয়মে চালিত হইতে দেখা গেল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে পরীক্ষক মনে মনে প্রশ্ন করিতেছেন, মিডিয়মের হাতের স্বতঃলিপিতে তাহার উত্তর বাহির হইতেছ—অথচ উভয়ের কেহ তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সে সময়ে জানিতেন না। চিৎতত্ত্বসভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুৎ নিউনহাম তাঁহার পত্নীর সহিত প্লানচেটযোগে বহুকাল ধরিয়া অসংখ্য পরীক্ষা করেন! এ সব পরীক্ষা কেবল বৈজ্ঞনিকভাবে সত্য নির্ণয় করিবার জন্যই করা হয়। মায়ার্সের Human personality গ্রন্থের ২য় ভলুমের ৪২৬—৪৩১ পৃঃ মধ্যে ইহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে। পাঠক উহা পড়িলে স্বতঃলিপি ব্যাপারে টেলিপ্যাথীর ক্রিয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পাইবেন। একটা তুলিয়া দিতেছি।

শ্রীযুক্ত নিউনহামের এক ছাত্র ছিলেন। তিনি ছাত্রকে টেলিপ্যাথীর অদ্ভুৎ কাণ্ড সম্বন্ধে বলিলে ছাত্র উহা অবিশ্বাস করেন। নিউনহাম তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে বলেন। তদনুসারে, তাঁহার পত্নী প্লান্চেট লইয়া বসিলে, নিউন্হাম ও তাঁহার ছাত্র অন্যঘরে গিয়া একটা প্রশ্ন কাগজে লেখেন। প্রশ্নকর্ত্তা ছাত্র। প্রশ্ন—"আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর কৃশ্চান্ নাম কি?" উভয়েই প্রশ্ন দেখেন। কিন্তু নিউন্হাম বা উহার পত্নী ছাত্রের ভগিনীর কথা কিছু জানিতেন না। পরে উভয়ে ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিবার আগেই দেখেন, উত্তর লেখা হইয়াছে। উত্তর—"মিনা"—উইল্হেল্মিনার সংক্ষেপ। নাম সত্যই তাহা।

(অখ) প্লান্চেটে অনেক সময় ভবিষ্যৎ সত্যঘটনার আভাষ উঠে, অথচ এ ঘটনার নাম গন্ধ কি পরীক্ষক কি মিডিয়ম কেহই জানে না।

লেডি ম্যাবেল হাওয়ার্ডের ঘটনা ঃ—তাঁহাকে একবার তাঁহার কোনো বালিকা বন্ধু বিবাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তর লেখা বাহির হইল "১৮৯০ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসে তোমার বিবাহে বাগদান হইবে, কিন্তু বিবাহ পারে বছর হইবে।' ঘটনা সত্য হয়। কুমারী বলেন উক্ত সময়েই আমাদের বিবাহ নির্ণয় (engagement) হয়, অপ্রত্যাশিত ঘটনাযোগে বিবাহ পর বৎসর ঘটে। যে সময়ে উক্ত স্বলিখিলিপি বাহির হয় সে হইল ১৮৮৮ সাল। ভবিষ্য ঘটনার আভাষ সূচক বহু পরীক্ষিত ঘটনা আছে।

(অগ) একবার একটা বৈঠকে একটী বার্ত্তা পৌছে। বার্ত্তা প্রেরকের পরিচয় চাহিলে লেখা হয় যে সে এক দেহমুক্ত জীবাত্মা। নাম ধাম দিতে বলিলে প্রেত তাহা দেয় এবং পরীক্ষক তাহাকে নিজের জানিত একজন বলিয়া বুঝিতে পারে, পরে দৈবযোগে জানা যায় যে তথাকথিত প্রেত তখনো জীবিত ছিল। (মায়ার্স, দ্বিতীয় ভলুম। ১৫৫ পৃঃ)।

মোটকথা পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে অনেক স্বতঃলিখিত বার্ত্তা টেলিপ্যাথী যোগে মিডিয়মের সুপ্ত-চৈতন্যে ভাসিয়া উঠিয়া জ্ঞানগোচরে উপস্থিত হয়। এই সব বার্ত্তা।

(১) পরীক্ষকের জাগ্রত বা সুপ্ত-চৈতন্য হইতে আসিতে পারে।

(২) দূরবর্ত্তী কোনো লোকের জাগ্রত বা সুপ্ত চৈতন্য হইতে আসিতে পারিতে পারে।

(৩) এবং উক্ত দূরবর্ত্তী লোক পরীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত থাকিতেও পারে।

(৪) পরীক্ষক বা দূরবর্ত্তী ব্যক্তির অনিচ্ছিত অনেক বার্ত্তা লেখাতে বাহির হইতে পারে।

(৫) দেহমুক্ত জীবাত্মা হইতে টেলিপ্যাথী যোগে বার্ত্তা পৌছিতে পারে।

(৪) স্বতঃলিখিত প্রেত-বার্ত্তা

মিডিয়মের সুপ্ত-চেতনা বা টেলিপ্যাথী এই দুই উপায় ছাড়াও অনেক বার্ত্তা আছে যাহার উৎপত্তি অন্যত্র খুঁজিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে সমস্ত তথা-কথিত প্রেত বার্ত্তা প্রেতেরই প্রেরিত যে তাহা নয়; জীবের সুপ্ত চৈতন্য ও টেলিপ্যাথীর ক্রিয়াবলেও এমন বার্ত্তা আনিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে উক্ত উপায় আমার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই যাবতীয় ঐ শ্রেণীর বার্ত্তা [illegible] তাই তাহাতে প্রেতের হাত নাই। বিচারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই যে—যখন অন্য উপায়ে কারণ নির্ণয় সম্ভব হইবে তাবৎ অলৌকিক কিছু মানিয়া লইবার কারণ নাই। ইতিপূর্ব্বে (৩৭) দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি যার বার্ত্তা তথাকথিত প্রেতের অস্তিত্ব [illegible]; যাহার প্রেতাত্মা বার্ত্তা লিখিতেছিল সে তখন সশরীরে বিদ্যমান। তথাপি অনেক প্রেত-বার্ত্তায় প্রেতের হাত আছে—যে সব দেখে Sir William James লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "It appears that the spirit has a finger in the pie"

স্বর্গীয় ষ্টেন্টন মোজেসের পরলোক্ত দুটি ঘটনায় বেকার ষ্ট্রীটে আত্মহত্যা ও পরিচিতা মহিলার মৃত্যু ঘটিত বেশ অনুমান করা যায় উক্ত দুইজনের মৃত্যুকালীন মানসিক প্রবল উত্তেজনার তরঙ্গ মোজেসের গ্রহণক্ষম (sensitive) সুপ্ত চেতনার মধ্যে রূপ গড়িয়া তুলিয়াছিল—অথবা সত্যই তাহাদের দেহমুক্ত আত্মা মোজেসের হাতে ভর করিয়া বার্ত্তা বহন করে। অথবা দিব্যদৃষ্টিতে মোজেস উহা দর্শন করিয়া জানেন ইত্যাদি। যে কোনো ব্যাখ্যায় ইহার কারণ দেওয়া যায়।

কিন্তু এমন সব ঘটনা আছে যাহাতে মিডিয়মের সুপ্ত চেতনা বা অন্যকারো সুপ্ত-চেতনা বা টেলিপ্যাথী, দিব্য-দর্শন কিছুরই হাত নাই; প্রেতের কর্তৃত্ব ছাড়া যাহার সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই জাতীয় প্রেত-বার্ত্তার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(১) মিসেস্ টমসন একজন বিখ্যাত মিডিয়ম। মায়ার্স, ক্রুক্‌স্ লজ, সেজ্‌উইক্ প্রভৃতি মনীষীরা ইঁহাকে লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া ইঁহার শক্তি ও সাধুতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

একদিন এক বৈঠকে (Seana) মিসেস্ টমসনে এক আত্মার ভর হয়। আত্মা মিসেস বি—বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। জিজ্ঞাসাবাদে নিজের পার্থিব জীবনের অনেক খুঁটিনাটী খবর দেন। সমস্ত খপরই সত্য হয়। অথচ টমসন্ নিজে কিছুই জানিতেন না। পরীক্ষকরা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে নিজের আত্মত্ব (identity) স্থাপন করিতে বলেন—অর্থাৎ তুমি যে অমুকের আত্মা তার চূড়ান্ত প্রমাণ দাও—আত্মা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"আমার প্রাইভেট নোটবুকে পমেটমের একটা নূতন ফরমূলা লিখে রেখেছি খোঁজ কর—"। তঁহার কন্যাদের সাহায্যে উক্ত নোটবুক বাহির হইল বটে কিন্তু 'পমেটমের' ফরমূলা পাওয়া যায় নাই। পরে অনুসন্ধানে দেখা গেল শেষ দিকে মৃত্যুর দুচার দিন আগে তিনি একটা নূতন ফরমূলা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; ইনডেক্সে তাহা উঠে নাই।"

(২) দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—স্বর্গীয় ষ্টেন্টন্ মোজেসের লিখিত প্রেতপত্রাবলী হইতে :—"আমি একদিন স্বতঃলিপিযোগে বার্ত্তা পাইতেছি এমন সময় লেখা হটাৎ থামিয়া গেল—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাধা পড়িল কেন ?"

উঃ—একটী প্রেতাত্মা বার্ত্তা পাঠাইতে চায়, তার নাম ফ্যানি ওয়েষ্টরি। তাকে চেনো ?"

প্রঃ—না মনে পড়ে না।

উঃ—তোমার মা একে চেনে—তাঁর সম্পর্কে জ্ঞাতি ভগ্নি। গত ১৫ই মে সে পরলোকে এসেছে—তার কুমারী নাম কার্কহাম্—

প্রঃ—মনে পড়েছে একটু; মার্কবিতে বাস করতেন কি ?

উঃ—হাঁ; তার জন্ম হয় অ্যালকোর্ডে; মার্কবিতে

পরে এসে বাস করে; তার মায়ের কঠিন ব্যারামের সময় তোমার মা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তুমিও সঙ্গে ছিলে;—ফ্যানি তোমাকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে একগাদা গমের উপর ফেলে দেয়; তাতে তোমাকে harvest bug এ (এক রকম শস্যভুক পোকা) খুব কামড়ে দেয়—এ সব মনে করে দেখো? তখন তোমার বয়স ৫ বছর।

প্রঃ—হাঁ কিন্তু উচিৎ কি?

উঃ—তুমি এতে'তে বুঝবে, ফ্যানির আত্মা সত্যই কিনা?

প্রঃ—কিছু বলবার আছে?

উঃ—সে বলছে—"ঐহিক ইন্দ্রিয় সুখভোগে মত্ত হয়ে পরলোকে উন্নতির বড় বাধা হয়েছে তার;—তা হতে এখন ঢের দেরী—এ জীবন ঐহিক জীবন হতে বড় তফাৎ নয় আমি ঠিক্ তেমনি আছি—ইচ্ছে হয় মেরীকে নিজের প্রভাব প্রস্তুত করি কিন্তু তার কাছে এগুতে পারিনি—"

প্রঃ—উনি যে ফ্যানি কার্কহাম তার প্রমাণ দিতে পারেন?

উঃ—তোমার বাবাকে ডনিংটন ও Trap দরজার কথা জিজ্ঞাসা করো।

প্রঃ—করবো—কিন্তু আমি ও কথার কিছুই বুঝতে পারছিনি। উনি সুখে আছেন তো?

উঃ—যতটা এ অবস্থায় সম্ভব। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

টীকা প্রসঙ্গে মোজেস্ বলেন—"মা ও বাবাকে এই সব কথার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়—মা বল্লেন—হাঁ সব সত্য? তা তুমি কি করে এসব মনে রাখলে? তখন তুমিতো মোটে ৫ বছরের? "আমি সত্য কথা ভাঙ্গলাম না; বাবা বল্লেন—"কই কিছু মনে পড়েনা—" পরে শুনলাম বাবার মনে পড়েছে। ডনিংটনের বাড়ীর ছাদে যেতে একটা Trap দরজা ছিল। ফ্যানি একবার ছাদে যেতে এই দরজায় আর্দ্ধেক ঢুকে আটক পড়ে যান তাতে বাড়িশুদ্ধ লোকের একটা হাসির ধুম পড়েছিল।"

এই শ্রেণীর যে 'প্রেতালাপ' ইহাতে প্রেতের 'প্রেতত্ব' যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না; বিশেষতঃ শ্রীমতি টমসনের প্রকাশিত পমেটম বার্ত্তাটী—যে সংবাদ পৃথিবীতে জীবিত কাহারো জানা ছিল না তাহা কি করিয়া মিডিয়ম জানিল এ একটা বিস্ময়কর হেঁয়ালী।

কাজেই চিৎতত্ত্ব সভা এই জাতীয় প্রেতের আত্ম-পরিচয় ঘটিত' দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষার আয়োজন করেন। যদি অকাট্য যুক্তি বলে অসন্দিগ্ধ প্রমাণের প্রয়োগে প্রেতের ঐহিক জীবনের সত্যতা স্থির করা যায় তবেই প্রেত-বাদ গণ্যমান্য হইবে নচেৎ নহে।

সৌভাগ্যক্রমে সভা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের জন্য স্বতঃঘটিত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা, এবং ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা ঘটিত দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি করা, এই উভয়দিকেই সভা বেশী ফলবান হইয়াছেন। ইচ্ছা করিলে নিজের সুবিধা ও সুযোগমতে ঘটনা তৈয়ারী করার সুযোগ সত্যনির্ণয়ে বেশী সাহায্যকর। এজন্য ভাল বিশ্বাসী খাঁটী মিডিয়ম চাই।

স্বতঃ ঘটিত যে সব দৃষ্টান্ত বাহিরের লোক সভার জ্ঞানগোচরে আনিয়াছেন তাহাদের যতদূর সম্ভব সাবধানতা ও অপক্ষপাতিতার সহিত বিচার হইতেছে। আর সভার সভ্যারা শ্রীমতি পাইপার, হল্যাণ্ড, ভেরাল প্রভৃতি কয়েকটী মহিলাতে এই জাতিয় খাঁটী বিশ্বাসী মিডিয়ম পাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। সভার প্রতিপাদ্য, হইতেছে"—মিডিয়মে 'ভর' হয় যে আত্মার সেই আত্মা সত্যই কোনো জানিত পৃথিবীবাসীর না কোনো অজ্ঞাত মিডিয়মশক্তির কাল্পনিক নাম?" সভা এইজন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করিতে রাজী হইল:—

(১) প্রেতাত্মা জীবিতকালে কাহারো সহিত পূর্ব্ব হইতে "দেখা দিব" এই বন্দোবস্ত করিয়াছিল কিনা—

(২) স্বতঃলিপির লেখার ধরণ উক্ত প্রেতের জীবিত-কালীন লেখার সঙ্গে মেলে কিনা—

(৩) প্রেতের জীবিতকালীন কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কোনো বিশেষত্ব বা মুদ্রাদোষ মিডিয়মে দেখা যায় কিনা।

(৪) প্রেত এমন কোনো সংবাদ দিতে পারে কিনা যাহা মিডিয়ম বা তত্রস্থ বর্ত্তমান কেহ, বা জগতে কেহ জানেনা—

(৫) প্রেত ভবিষ্যৎ বলিতে পারে কিনা—

(৬) প্রেত জীবিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের চিনিতে ও তাহাদের জীবনের অতীত বর্ত্তমান কিছু বলিতে পারে কিনা—এবং জড়জগতের খবরাখবর রাখে কিনা—

(৭) প্রেত 'অদৃশ্যভর' করার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো প্রমাণ দিতে পারে কিনা—

(৮) মিডিয়ম মোহাবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্যক্তির জীবিতকালীন 'ফটো' দেখিয়া তাহার প্রেতকে চিনিতে পারে কিনা—

উপরিউক্ত প্রমাণ-লক্ষণের যে কোনোটী যদি কোনো দৃষ্টান্তে ধরা পড়ে তবে সে দৃষ্টান্তে 'প্রেত'কে প্রামাণিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আর একটার বেশী প্রমাণ লক্ষণ কোনো দৃষ্টান্তে ধরা পড়িলে সেটী আরো প্রামাণিক হইবে। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পরীক্ষার ও প্রক্ষণে পাওয়া গিয়াছে। আমরা উক্ত প্রত্যেক প্রমাণ-লক্ষণযুক্ত দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিতেছি। পাঠক দেখিবেন কোনো কোনো দৃষ্টান্তে দুই বা আরো অধিক লক্ষণ বর্ত্তমান। কিন্তু তাহার আগে সর্ব্বপ্রধান মিডিয়ম শ্রীমতী পাইপার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। "কেননা এই প্রেততত্ত্ব ব্যাপার লইয়া "প্রবঞ্চক জুয়াচোরদের মধ্যে কৃত্রিম মিডিয়ম খাড়া করিয়া লোক ভুলাইয়া দু পয়সা করিবার প্রবৃত্তি মনে কর হয়; ফলে অনেক জুয়াচুরী ধরা পড়িয়া যাওয়ায় সাধারণের কাছে প্রেততত্ত্ববিৎরা হাস্য রহস্য ঘৃণা বিদ্রূপের পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক শঠলোক ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবলে অতি সাবধানী সতর্ক পণ্ডিত লোককেও ঠকাইয়া কাজ সারিয়াছে।"

মিসেস্ পাইপার এক মধ্যবিৎ ভদ্রঘরের কন্যা। বিশেষ শিক্ষিতা না হইলেও যথেষ্ট সৎ ও সাদাসিধা। তাঁহার অলৌকিক মিডিয়ম শক্তির খবর সুধী সমাজের কাছে প্রচারিত হয় হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম জেমস্ কর্ত্তৃক। জেমসের পত্নী শ্যালিকা ও অন্যান্য কোনো কোনো রমণী পাইপারকে জানিতেন এবং তাঁহার কাছে গিয়া এইরূপ দিব্যশক্তির পরিচয় লইতেন; প্রায় আমোদ-প্রমোদচ্ছলেই কৌতূহল চরিতার্থ করিতেন। কথায় কথায় জেমস্‌পত্নী স্বামীর কাছে ইহার এসব গল্প করেন; জেমস্ প্রথমে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতেন; পরে নিজে সশরীরে গিয়া পাইপারকে লইয়া বিধিমত পরীক্ষা করেন; কিছুদিন ধরিয়া সাবধানে পরীক্ষা করিয়া তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে পাইপার সত্যই অতীন্দ্রিয়শক্তিশালিনী। তিনি এমন কথা প্রকাশ্যে বলিলেন যে "শ্রীমতী পাইপারের এই শক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমি যে কোনো পরিমাণ টাকা বাজী রাখিতে রাজি এবং এই বাজী রাখাতে যদি আমার যশমান একেবারেও নষ্ট হয় সে ক্ষতিও সহ্য করিতে রাজি আছি।" "feel as absolutely certain as I am of any personal fact in the world that she knows things in her Trance which she cannot possibly have heard in her waking state—"

জেমস্ অতঃপর শ্রীমতী পাইপারকে শ্রীযুৎ রিচার্ড হজসনের নজরে আনিয়া দিলেন; এবং হজসন ইতিপূর্ব্বে অনেক নকল কৃত্রিম মিডিয়মদের ফাঁকী চালাকি ধরিয়া দিয়া যশলাভ করায় জেমস্ তাঁহাকে পাইপার তদন্তে নিযুক্ত করেন। হজসনের মত হিসাবী, সাবধানী, ঘোর অবিশ্বাসী, জবরদস্ত তদন্তকারী খুব বিরল। কয়েক বৎসর ধরিয়া দিনরাত্রি অনন্যকর্ম্মা হইয়া এমন কি দক্ষ ডিটেকটিভ্ লাগাইয়াও হজসন মিসেস্ পাইপার বা তদীয় স্বামীর কোন প্রতারণা চেষ্টা দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্বীকার করিলেন "The hypothesis of fraud can not be seriously maintained." অর্থাৎ মিসেস পাইপারের অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তির কাণ্ড কারখানা জুয়াচুরী বা প্রবঞ্চনার ব্যাপার কিছুমাত্র নহে।

অতঃপর মিসেস্ পাইপারকে সভার পক্ষ হইতে বিলাতে আনয়ন করা হয়। এখানে আসিলে শ্রীযুক্ত মায়ার্স, অলিভার লজ্ ও অপর কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীমতী পাইপারকে লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। মায়ার্স স্বভাবসুলভ ধীরতা সাবধানতা ও

অপক্ষপাত সহকারে তদন্ত করিয়া হজসনের সহিত একমত হইলেন।

তারপর সার অলিভার লজ ঐরূপভাবে পাইপারকে নজরবন্দী রাখিয়া বহুপরীক্ষার পর বলিতে বাধ্য হন যে (১) মিসেস পাইপার তাহার মোহাবস্থায় এরূপ অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় দেন যাহার সম্বন্ধে জানাশুনা কোনো কারণ-ব্যাখ্যা চলেনা (২) মিসেস্ পাইপারের কাজ-কর্ম্মে ফাঁকি-চালাকির কোনো গন্ধ নাই। (৩) আর কোনো রকম কল্পনা-সঙ্গত জুয়াচুরী ফাঁকি চালাকির দ্বারা তাহার কাণ্ডকারখানার ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়।

এইসব মহা মহা বিজ্ঞান-রথীদের অগ্নি পরীক্ষায় ক্রমাগত পনেরো বৎসর ধরিয়া থাকিয়া মিসেস্ পাইপার সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এই পাইপারকে লইয়া অতঃপর পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

মিসেস্ পাইপারের মোহাবস্থা আপনা হইতে ঘটে; এই অবস্থায় প্রথম প্রথম মুখ দিয়া স্বতঃকথন বাহির হইত; পরে হাত ভর করিয়া স্বতঃলিখন বাহির হইতে আরম্ভ হয়। মোহাবস্থায় কোনো না কোনো প্রেতাত্মা আসিয়া ভর করিতেন। যে সে প্রেত আসিয়াই ভর করিতে পায়না; একজন কোনো পরদেহরূপ যন্ত্র চালন-ক্ষম পাইপার দেহ অধিকার করিয়া সেই মুখ-পাত্র হইয়া আলাপেচ্ছু অন্য প্রেতের বার্ত্তাবহন করিত। প্রেত বার্ত্তার প্রকাশ, প্রথম প্রথম ফিনিট্ ছদ্ম নামধারী এক বহুকাল গত জীবাত্মা পাইপারের প্রধান control বা অধিকারী ছিল। পরে সুযোগ বা সময় মত অন্যান্য অধিকারী প্রেত দেখা দেয়। এট ছদ্ম নামধারী অধিকারী প্রেত সত্যই কোন মৃত মানুষের আত্মা না পাইপারের অব্যক্ত চৈতন্যেরই একটা অভিনয় দক্ষ অংশ মাত্র তাহা বলা কঠিন; তবে যে সব আত্মার মুখ পাত্র হইয়া উহা আলাপ করে তাহারা যে জানিত মৃত ব্যক্তিদের আত্মা তাহা প্রমাণ লক্ষণ সাহায্যে কতকটা নিশ্চয় ভাবে স্থির হইয়াছে।

আমরা অতঃপর এমন সব প্রেতালাপের দৃষ্টান্ত দিব যাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ লক্ষণ গুলির সার্থকতা দেখা গিয়াছে; অর্থাৎ অমুক প্রেত যে পৃথিবীতে মানুষ রূপে এক সময় ছিল তাহার একটা না একটা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

শেষ অত্যাচার

[শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়]

(১)

একটী ভাঙ্গা শীতছিদ্র কুঁড়ে ঘরে রহিমবক্স তাহার মুমূর্ষু ছেলের পাশে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। ছেলেটী পাশ ফিরিয়া শুইয়া কাতরতা সূচক অস্ফুট স্বরে কহিল,—"বাপজান!" রহিম তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া, তাহার বক্ষে হাত রাখিয়া, কোমল কণ্ঠে উত্তর দিল,—"কি বাপজান!"

"একটু জল।" বালক কাতরতাপূর্ণ নেত্রে পিতার দিকে চাহিল রহিম তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের এক কোণ হইতে একটা ভাঙ্গা মৃণ্ময় পাত্রে জল আনিয়া বালকের মুখের কাছে ধরিল। বালক তাহার শীর্ণ রোগকাতর বিবর্ণ, পাংশু মুখখানি তুলিয়া এক নিশ্বাসে জলটুকু গলাধঃকরণ করিল। রহিম জলের পাত্র পার্শ্বে রাখিয়া পুত্রের কপালে

হাত রাখিতেই তাহার মুখ ফ্যাকাসে ভাব ধারণ করিল, দেখিল ভয়ানক জ্বর; গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে, ভীতকণ্ঠে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাপ আমার, বড় কষ্ট হচ্ছে, না?"

বালকের নাম আনার। "উঃ এখানে বড় বেদনা! বাপজান, আর বোধ হয় বাঁচব না। সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, ওঃ"—বলিয়া ধীরে ধীরে আনার তাহার নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল।

পুত্রের কথাগুলি রহিমের বুকে গিয়া শেলের মত আঘাত করিল। শরতের প্রভাতে শিশির ভারাক্রান্ত গাছগুলো নাড়া দিলে, যেমন শিশির সমূহ দরদর ধারে ঝরিয়া পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবে অশ্রু রহিমের চক্ষু দিয়া নামিয়া আসিয়া তাহার গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিয়া গেল। সে পুত্রের অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিয়া, আপনাকে সম্বরণ করিয়া, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ছিঃ ওকথা বলতে নেই আনার, জ্বর কি কারো হয় না? শীগগিরই সেরে উঠবে?"

কথাগুলি রহিম একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের মধ্যে কি যেন একটা বেদনা লুক্কায়িত ছিল, তাহা তাহার কথার সুরে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল।

(২)

কিছুদিন পূর্ব্বে রহিমের অবস্থা খুব ভাল না থাকিলেও, মন্দ ছিল না। একরকম সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে দিন কাটিয়া যাইত, কোনরূপ অভাব বা কষ্ট ছিল না। রহিম কৃষিজীবী, দু'একটা বলদ, দু'চার বিঘা জমী ও দুএক খানা লাঙ্গলও তাহার ছিল। রহিমের সংসারের মধ্যে এক স্ত্রী ও এক প্রাণপ্রিয় পুত্র। হঠাৎ একদিন তাহার স্ত্রী আমিনা বিবি, তাহার ছোট ছেলে আনারকে স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া পরকালের উদ্দেশে যাত্রা করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "দেখ, আনারকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। ওকে দেখো, যেন বাছার কোন কষ্ট না হয়।" তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস, তার পর সব নিস্তব্ধ। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল, কাজ কর্ম্মে তাহার কোন মন লাগিত না, কোন উৎসাহ আসিত না, সর্ব্বদাই আনারকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। যখন আনার তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিত, "বাপ, মা কোথায়?" রহিম তাহার কোন উত্তর দিতে পারিত না; কেবল দু এক কোঁটা জল তাহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া আসিত। রহিম সর্ব্বদাই আনারকে বুকের মধ্যে রাখিত, কি জানি যদি ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়। রাত্রে যখন অভাগা, মাতৃহারা আনার অকাতরে ঘুমাইত, রহিম নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিত, পরে উচ্ছ্বসিত হইয়া অভাগা পুত্রকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিত। এইরূপে দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

(৩)

সেবার বড় দুর্ব্বৎসর পড়িল, বৃষ্টি একদম হইল না, মাঠগুলি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। আশ্বিন কার্ত্তিক চলিয়া গেল, কিন্তু বিন্দুমাত্র বৃষ্টি আকাশ হইতে নামিল না। মাঠে ধান শুকাইয়া গেল। কোনরূপ ফসল ও আবাদ হইল না। কৃষকেরা হাহাকার করিতে লাগিল। গ্রামে কান্নার রোল পড়িল, লোকে আধপেটা করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। গ্রামের জমিদার খাজনা আদায় করিতে সুরু করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রজারা খাজনা কোথা হইতে দিবে? জমীদার প্রজাদের কোন কথা শুনিলেন না, যে খাজনা দিতে পারিল না তাহার উপর অত্যাচার করিয়া খাজনা আদায় করিতে ত্রুটী করিলেন না। রহিমের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া পড়িল; তাহার মাঠে একদম ফসল ফলিল না। তাহার উপর তাহার পুত্র হঠাৎ একদিন প্রবল জ্বরে পড়িল; গায়ে হাত পায়ে বেদনা। বেদনা যদি কমিল; জ্বর কিছুতেই ছাড়িল না; ক্রমে মন্দের দিকে যাইতে লাগিল। ঘরে যাহা কিছু ছিল বাঁধা দিয়া প্রথম প্রথম ঔষধ ও ডাক্তারের খরচ চালাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, রোগ ক্রমশঃ বাঁকা পথ অবলম্বন করিল। বেচারী নিঃস্ব! অর্থের অভাবে পুত্রের রোগের আর কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া রহিম ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে

প্রার্থনা করিল, "খোদা, আমার আনারকে বাঁচিয়ে দাও। ওকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিও না।"

ভগবান রহিমের অন্তরের গূঢ় বেদনা বুঝিলেন কি না জানি না, কিন্তু গ্রামের জবরদস্ত মগামহিম জমীদার মহাশয়ের অন্তরে তাহা আদৌ পৌঁছিল না। তাঁহার খাজনার তাগাদায় রহিমকে ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার করুণ ক্রন্দন, অবিরল চক্ষুজল, গূঢ় অন্তর ব্যথা ও কাতর আবেদন জমিদার সব উপেক্ষা করিলেন। রহিম জমীদারের হাতে পায়ে ধরিয়া কহিল, "জনাব এবার বড় আমার মন্দ সময়, হাতে কিছু নেই। দু'একদিন সবুর করুন, আমি সব খাজনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিব। আজকাল বড় জড়িয়ে পড়েছি।" জমীদার তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না বেশ কড়া ভাবে উত্তর দিলেন, "কাল খাজনা চাই।"

(৪)

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই রহিম খাজনার টাকা জোগাড় করিতে বাহির হইল। কিন্তু কোথাও ধার পাইল না; সকলেই তাহার মত গরীব; সকলেরই ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার। খাজনা আজ দিতেই হইবে, তাহার অন্যথা হইলে জমিদার তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। ঘরে মৃতপ্রায় পুত্র, অর্থাভাবে তাহার শুশ্রূষা হইতেছে না বাঁচিবে কি না সন্দেহ। তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, নিরাশার হাহাকারে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে শূন্যপ্রাণে গৃহে ফিরিয়া আসিল। অর্থের অভাবে রীতিমত চিকিৎসার ব্যতিক্রম হইতেছিল; সেইজন্য আনারের দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রহিম দেখিল আনারের প্রবল জ্বর! চোক মুখ সব লাল। বুঝি আর টিকে না। ক্রমে মৃত্যুর সকল রকম উপসর্গ দেখা দিল। শরীর শিথিল হইয়া আসিল, মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, ধীরে ধীরে শ্বাস উঠিতে আরম্ভ করিল।

রহিম পুত্রের দেহখানি বুকের মধ্যে রাখিয়া, অশ্রুজলে তাহা সিক্ত করিতেছিল। সম্মুখে আসন্ন মৃত্যু, পরে অনন্ত বিচ্ছেদ। চারিদিক হইতে রাশি রাশি অন্ধকার যেন ঘনাইয়া আসিতেছিল এ জীবনে তাহাদের এই শেষ দেখা। কি পবিত্র মুহূর্ত্ত। ঠিক এই সময়ে জমীদারের প্রেরিত পাইক দ্বয় আসিয়া খাজনা না পাওয়ার দরুণ রহিমকে মুমূর্ষু পুত্রের নিকট হইতে বলে ছিনিয়া লইয়া, জমীদারের কাছারী বাড়ীতে উপনীত করিয়া, মনিবের আজ্ঞা পালন করিল। গরীবের উপর এইরূপ পাশবিক অত্যাচার করিতে তাহাদের হৃদয় একটু কাঁদিল না, প্রাণে একটু মমতা আসিল না, দুঃখীর দুঃখে তাহাদের প্রাণ সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল না। তাহারা যখন রহিমকে টানিয়া লইয়া যাইতে অগ্রসর হইল, রহিম কোন বাধা দিল না, হৃদয় ফাটা চীৎকার করিল না। শুধু সেই পবিত্র গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইবার ভয়ে সে একবার করুণ নেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়াই, পরে ধীরে ধীরে তাহাদের সহিত বাহির হইয়া আসিল। তখন যেন তাহার চক্ষের অশ্রু জমাট হইয়া গিয়াছিল, দেহ যেন কাঠের মত শক্ত হইয়াছিল।

(৫)

রহিম কাছারী বাড়ীতে আনীত হইল। জমীদার মহাশয় তখন একটা মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া নিমীলিত নেত্রে আলবোলায় মুখ লাগাইয়া ধূম পান করিতেছিলেন। পাইকদ্বয় ধৃত রহিমকে হুজুরের সম্মুখে রাখিয়া, মস্ত এক সেলাম ঠুকিয়া কহিল "জনাব, প্রজা রহিম বক্স হাজির।" জমীদার মহাশয় চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিমকে, কহিলেন "খাজনার কি হল?"

রহিম নিরুত্তর। জমীদার তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া রোষকষায়িত নেত্রে হুঙ্কার ছাড়িলেন, "আজ যে খাজনা দেবার কথা ছিল, সে খাজনা কই।" রহিম ধীরে ধীরে নম্রভাবে কহিল, "জনাব, বড় দুর্দ্দিন পড়েছে, এবার ফসল ও ভাল হয় নি, তার উপর যা কিছু ছিল ছেলের ব্যামোতে খরচ পত্তর হয়ে গেছে। জনাব, আর কিছু দিন সবুর করুন, এই আসছে অঘ্রান মাসে সব শোধ করে ফেলব।"

"তাহলে আজ খাজনা দিতে পারবিনা?"

"না জনাব, আজ আর কোথা থেকে দিব, ঘরে একটা পয়সাও নেই। ধার ধোর ও কোথাও পেলাম না।"

"কোন কথা শুনতে চাই না। আজ যদি খাজনা না দিতে পারিস তোর ঘর দোর সব পুড়িয়ে দেওয়া যাবে। দেখি খাজনা বার হয় কি না? আমার সঙ্গে চালাকী, বেটা, বদমাইস, পাজী। রাম সিংহ যাত' বেটার ঘরে আগুন দিয়ে আয়।"

রহিম এইবার মুহূর্ত্তের জন্য পায়ের তলায় ভূমিকম্প অনুভব করিল, তাহার মস্তকে কে যেন বজ্রাঘাত করিল। হঠাৎ তাহার নয়ন পথে রোগশয্যায় শায়িত ছেলের রোগ-কাতর শীর্ণ মুখ খানি দেখা দিল, সে শিহরিয়া উঠিল, চীৎকার করিয় জমিদারের পা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "জনাব আমি গরীব, আপনি আমার মা বাপ। দোহাই জনাব ছেলেকে পুড়িয়ে মারবেন না; ঐ আমার এক ছেলে জনাব এক ছেলে, ঘরে পড়ে সাত দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। দোহাই জনাব গরীবের প্রতি বিমুখ হবেন না। আমি কাল খাজনা যেখান থেকে পাবি হাজির করব। এইবারটি মাপ করুন দোহাই জনাব"— রহিম অশ্রুজলে জমিদারের পা ভিজাইয়া দিল। জমীদার তাহার কোন কথা শুনিলেন না, "কোন কথা শুনতে চাই না আজ খাজনা চাই" বলিয়া কাছারী বাড়ী ত্যাগ করিলেন। রহিম চক্ষে অন্ধকার দেখিল, মাটীতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল।

যথা সময়ে পাইকদ্বয় রহিমের ভিটেয় অগ্নি প্রদান করিয়া উত্থিত ধূম রাশি হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া দেখিল। রহিম তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিল না, কারণ সে গরীব, জমিদার ধনী, সে অশক্ত, জমিদার ক্ষমতাপন্ন। ধনীর অত্যাচার গরীবকে নীরবে দাঁড়াইয়া সহ্য করিতে হইবে।

(৬)

মধ্য রাত্রি। নিস্তব্ধ, নিঝুম। কোন শব্দ নেই, কেবল মাত্র মাঝে মাঝে বৃক্ষের মর্ম্মর ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল; কিন্তু সে বড় পাণ্ডুর—বড় নিস্তেজ তাতে কোন মাধুর্য্য নাই। নিস্তব্ধ গম্ভীর রজনী, তা যে জন মানবের সাড়া শব্দ নেই, সব নিদ্রিত। আস্তে আস্তে জমিদার মহাশয় রহিমের দগ্ধ, ভগ্ন কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; পরে ডাকিলেন, "রহিম, রহিম।" কোন উত্তর নাই। বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে। জমিদার মহাশয় ভিতরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন রহিম তাহার অর্দ্ধদগ্ধ মৃত পুত্রটীকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। জমিদার অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন, "রহিম।" তাঁহার স্বর কম্পিত। রহিম চোক মেলিয়া তাকাইল। চীৎকার করিয়া কহিল, "জমিদার—তুমি। খাজনা নিতে এসেছ। খাজনা দেব না, কি কর্ব্বে? হাঃ হাঃ, কর যত পার অত্যাচার, আমি ডরাইনে। যাও যাও খাজনা দেব না।" পরে মর্ম্মভেদী সুরে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "দেখ দেখ, তোমার পাশবিক অত্যাচারে আমার ছেলের দশা দেখ। আর কি করবে? যা করবার তা করেছ। খাজনা দেবনা কখ্খন না। আমার বাপজান কোথায় গেলি বাপ। উঃ বুক ফেটে যায় বড় জ্বালা—বড় জ্বালা।" রহিম একরূপ উন্মাদ। জমিদার ছল ছল চক্ষে কহিলেন, "রহিম, আজ হ'তে আমার অত্যাচার সব শেষ হল। ভগবান অত্যাচারের ফল হাতে হাতে দিয়েছেন। আমায় ক্ষমা কর রহিম।"

"ক্ষমা কর্ব্ব আমি? কেন? কি জন্য? গরীবের ক্ষমার মূল্য কি? আমি গরীব যে। গরীবের যে প্রাণ নেই, তারা যে মানুষ নয়, তারা এসেছে শুধু বড়লোকের অত্যাচার সইতে।" "রহিম, আমিও তোমার মত দুঃখী। পুত্র শোক কেমন তা আমি তোমার মত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি। রহিম, রহিম আজ সন্ধ্যের সময় বেড়িয়ে এসে দেখি ছেলের আমার কলেরা হয়েছে। তারপর আধঘণ্টা পরে সব শেষ। রহিম তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। তোমার উপর অত্যাচারের ফল ভগবান আমায় হাতে হাতে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। আজ হতে আমার সব অত্যাচারের শেষ।" জমিদারের কথা শুনিয়া রহিম লাফাইয়া উঠিয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উন্মাদের এক বিকট চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ইহার পর তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহার পর জমিদারকে আর কোন অত্যাচার করিতে শোনা যায় নাই, ইহাই তাঁহার শেষ অত্যাচার।

চান্নায় বিশালাক্ষী মন্দির

[শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা জৌগ্রামের অনুমান দেড়ক্রোশ উত্তরে চান্না গ্রাম। এই গ্রাম হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে খড়িয়া নদীর দক্ষিণে বিশালাক্ষী মন্দির। মন্দিরের সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ৯৯ বিঘা; বিশালাক্ষী দেবীর সেবা ও পূজার জন্য এই জমি বর্দ্ধমান রাজসরকার দেবোত্তর দিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে বিশালাক্ষীর বর্ত্তমান সেবাইতগণ ঐ জমীর অনেকাংশ লাখেরাজ বলিয়া হস্তান্তর করিয়াছেন। আগামী বিগত ২১শে চৈত্র (১৩২৬ সাল) শনিবার এই মন্দির দেখিয়া আসিয়াছি।

জনশ্রুতি মতে, কোটালহাটের সাধক কমলাকান্ত এই মন্দির সংলগ্ন পঞ্চমুণ্ডী আসনে সাধনা করিতেন। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম এবং উহার আশে পাশে অনেকগুলি ডাঙ্গা আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির ও পঞ্চমুণ্ডী আসনের চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি জঙ্গল কাটাইয়া মন্দির ও আসনের সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

মন্দিরের পশ্চিমে দুইটী শিমুল গাছের মাঝখানে কমলাকান্তের আসন দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি এবং শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর অভিমতানুসারে বর্দ্ধমানাধিপতি বিলাতী মাটী দিয়া আসনখানা অতি পরিপাটীরূপে বাঁধাইয়া দিয়াছেন। আসনের মাঝখানে একখানা শ্বেতপ্রস্তরে কালো অক্ষরে নিম্নলিখিত চারিটী পংক্তি উৎকীর্ণ আছে—

'সাধক প্রবরস্যাস্য
পদ পঙ্কজ সেবিনঃ।
আসনং কমলাকান্ত
স্যাত্রৈবাসীদ্ বিজন্ময়।।'

বিশালাক্ষী মন্দির সম্বন্ধে ফরিদপুরের অন্তর্গত থানখানাপুর আশ্রমের বিখ্যাত সাধক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা লিখিয়াছেন, 'বিশালাক্ষী কোন্ সময়ে কাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা, তাহা নির্ণয় করিতে কাহারো সাধ্য নাই। এই মন্দিরের অর্চ্চনা পদ্ধতির বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমাদের ধারণা হয় জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক কর্ত্তৃক এই স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

'প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লানবমীতে এই বিশালাক্ষীর মন্দিরে আড়ং বসিয়া থাকে। বহুস্থান হইতে ভক্ত বিশালাক্ষী দেবীর অর্চ্চনা জন্য নানাবিধ সামগ্রী সঙ্গে করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। 'বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বত্র দেবী মন্দিরে পূজা হইয়া থাকে এই স্থানের পূজা পদ্ধতির সঙ্গে তাহার বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী মন্দিরে দেবীর সম্মুখে বলিদানের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু বিশালাক্ষী মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বেই ছাগ, মেষ, শূকর, মহিষ, হাঁস, কবুতর প্রভৃতি বলিদান করা হয়। এইরূপ বলির প্রথা শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তীকালের তান্ত্রিক সাধকগণের স্থাপিত দেবীমন্দিরে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিছুদিন পর্য্যন্ত কুচবেহার ত্রিপুরা প্রভৃতি বহুপ্রাচীন পার্ব্বত্যরাজ্যে দুর্গোৎসবাদির সময় এইরূপ নির্ব্বিচারে হীনপ্রাণীর বলিদান করা হইত

মন্দিরের চারিদিকে * 'হীনপ্রাণীর' বলিদানের ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভুলুয়া বাবা আপত্তি তুলিয়াছেন। বলিদান বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্র কি বলিয়াছেন তাহা এখানে আলোচনা করিব। 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের' ষষ্ঠোল্লাসে আছে—

'মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচর খেচরম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্।
তৎ সর্ব্বং দেবতা প্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে।
যদ্ যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ॥'

---

* মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটু দূরে অতি পূর্ব্বে ডোমেরা শূকর বলি দিত। বর্ত্তমানে চান্নাগ্রামে ডোম নাই, শূকর বলি আর হয় না। ইহা আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া আসিয়াছি।

দেবতাকে কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু প্রদান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী। যে যে মাংস বা যে যে বস্তু আপনার প্রিয় হইবে, তাহাই ইষ্টদেবতাকে প্রদান করিবে আবার কোন কোন দেশে নীলতন্ত্র ও অন্নদাকল্পের বিধানানুসারে কুক্কুট পারাবত প্রভৃতি বলিদান করা হইয়া থাকে। 'মুণ্ডমালা' তন্ত্রের ৪র্থ পটলে আছে —

'ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাৎ মৃগে মোক্ষফলং ভবেৎ॥
দত্তে পাক্ষিণি ঋদ্ধিঃ স্যাৎ গোধিকায়াং মহাফলং।'
ইত্যাদি।

শাস্ত্রশাসন ও বিচার চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ছাগ মেষ মহিষ, পারাবত প্রভৃতির বলিদান 'হীন বলি' বা ব্রাহ্মণের পক্ষে দেবীর নিকট সিংহ বলি ব্যাঘ্র বলি বা নরবলি (যথা 'সিংহ ব্যাঘ্রনরান্ দত্বা ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ') বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। 'মহানির্ব্বাণ' বলিদান সম্বন্ধে অতি উদার বিধান দিয়া বলিয়াছেন 'যে যে মাংস আপনার প্রিয় হইবে তাহাই ইষ্টদেবতাকে দিবে।' কোল ভীলের রুচি হইতে সুসভ্য সমাজের রুচি বিভিন্ন, সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে তন্ত্রোক্ত বিধানমত বলিদান করিতে পারে। এই হিসাবে চান্নার বিশালাক্ষী মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে 'ছাগ, মেষ, শূকর, মহিষ, হংস, পারাবত' প্রভৃতির বলিদান দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। আমাদের বাংলাদেশের অনেক স্থলে গ্রামের প্রান্তসীমায় 'লুড়াই-কলাই' কবুতর—বলি হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য দেশসমূহের অধিবাসীরা সম্ভবতঃ তন্ত্রের মূল বিধানানুসারে দেবীর সম্মুখে বলিদান করিয়া থাকে, কারণ তাহাদের বলিদান পদ্ধতি দেখিয়া ইহাই মনে হয়।

শ্রীমৎ ভুলুয়া সন্ন্যাসী অপর একস্থলে লিখিয়াছেন 'এই স্থানে দেবীর প্রতিমা নাই। তাম্রপাতে নির্ম্মিত পাঁচটি অস্বাভাবিক মুণ্ড আসনের উপর স্থাপিত আছে।' আমি চান্নার মন্দিরে এই পাঁচটী মুণ্ড বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে কালো রংএর মাটীর পাঁচটী ডিম্বাকৃতি মাথায় টোপর পরা মুণ্ড বস্ত্রবেদীর উপর হেলানভাবে স্থাপিত মুখ হাঁ করা নাক, ভ্রূ, চক্ষু সবই আছে। চান্না গ্রামে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরেও এইরূপ একটী মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এই শেষোক্ত মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় সম্ভবতঃ এই পঞ্চমুণ্ড পঞ্চধ্যানি বুদ্ধের মূর্ত্তি হইবে এবং বাংলার ধর্ম্মঠাকুরের পূজার প্রবর্ত্তনকালে এই মূর্ত্তি হিন্দু দেবতার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর মতে 'বিশালাক্ষীর মূর্ত্তি মাত্র পাঁচটী মাটীর মুণ্ড, স্ত্রীজাতীয় মুণ্ড বলিয়াই অনুমিত হয়। এই মুণ্ডগুলিই বিশালাক্ষীরূপে পূজিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কেবলমাত্র মুণ্ডপূজা দেখিয়াছি। ধ্যানের সঙ্গে মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। ইহা বর্দ্ধমানের রাজাদের অথবা তাঁহাদের কোন আত্মীয়ের স্থাপিত, রাজবাটীর কাগজপত্রে তাহার অনুসন্ধান করিবেন।' শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী আমাকে লিখিয়াছেন 'বিশালাক্ষী দেবী সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা নাই। সেজন্য কোন মত দিতে পারিলাম না। তবে মুণ্ডের উপরে দেবীপূজা আমি দেখিয়াছি। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থান জয়রামবাটী গ্রামে ৺সিংহবাহিনী দেবীর পূজা এইরূপে হয়। কাংস্য-নির্ম্মিত চুমকি-ঘটির আকার পাত্রোপরি একখানি মুখ, উহাতেই দেবীর আবির্ভাব। ঐ মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে অন্য দুইটি এইরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহার দুই সখি জয়া বিজয়ার আবির্ভাব কল্পনা করা হয়।'

চান্নার বিশালাক্ষী মন্দির সাধারণ চণ্ডীমণ্ডপের মত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ইষ্টকগৃহ। মন্দিরের গঠন প্রণালীতে কোন বিশেষত্ব নাই। চান্নার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'বর্দ্ধমান নিবাসী ৺মানিক রাম বাবু * ও ৺বাগুলারাম চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গঠন প্রণালী তান্ত্রিকভাবে নির্ম্মিত, এই মন্দির কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।' আমি মন্দিরের গঠন-

* প্রবাদ এই যে, ইনিই উত্তরকালে মুর্শিদাবাদের নবাব মুরাজুন্নের দেওয়ান হইয়াছিলেন ইনি দেওয়ান মানিকচাঁদ নামে বিখ্যাত।

প্রণালী বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বাংলার প্রতি গৃহে যে চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর আবাহন ও পূজা হয় সেইরূপ একখানা পাকা কুঠরীতে বিশালাক্ষীর পূজা হয়। এই মণ্ডপখানা শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া আমার ধারণা। আমি মন্দিরের মাপ লইয়াছিলাম। সম্মুখের বারান্দা পাশে দুই হাত, মাঝখানে তিনটী খিলান আছে। সম্পূর্ণ মন্দিরটী পাশে ১০॥ হাত, দৈর্ঘ্যে ১১ হাত ও উচ্চতায় ৮ হাত। ভিতরকার ছাদে ১২টী কাঠের বর্গা আছে। মন্দিরের একটীমাত্র দরজা, উহা বাহির হইতে শিকল দিয়া ভেজান থাকে। ভিতরের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে একখানা রত্নবেদী সংলগ্ন আছে। সম্ভবতঃ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় এই রত্নবেদীতে তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষীর মূর্ত্তি ছিল। এখন আর সেই মূর্ত্তি নাই। এমনও হইতে পারে যে উত্তরকালে এই মন্দিরের রত্নবেদীতে বৌদ্ধ ডোমেরা ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবে। চান্না গ্রামে ধর্ম্মঠাকুরের মুণ্ড দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে হিন্দুর বিশালাক্ষী মন্দিরে বৌদ্ধ যুগের অবসানে ধর্ম্মঠাকুরের পাঁচটী মুণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কবি ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' পড়িলে মনে হয় যে ধর্ম্মপূজা সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা। ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্ম্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড় বেশী নাই। এই মন্দির বিশালাক্ষীর, এখানে পুরোহিত তন্ত্রমতে দেবী বিশালাক্ষীর পূজা ও অর্চনা করিয়া থাকেন। 'তন্ত্রসারের' ধ্যানেই দেবীর পূজা ও ন্যাস হয়। পাঁচটী মুণ্ডের একটী মুণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেবাইতেরা অপর একটী নূতন মুণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। বেদীর নীচে পূর্ব্বদিকে ভৈরবনামের কতকগুলি ছোট বড় মাটীর ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশালাক্ষীর পূজা দৈনিক হয়, গ্রাম হইতে পূজা আসিয়া পূজা করিয়া যান। নিত্য পূজায় আধ সের আতপ চাউল, একটী ছোট গুড়ের লাড়ু ও ফুল জল বেলপাতা দেওয়া হয়। কাহারও মতে পাঁচ পোয়া আতপ চাউল, রম্ভা ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা হইয়া থাকে। তান্ত্রিকমতে পঞ্চোপচারে নিত্য পূজা হয়, ভোগ বা শীতলের কোন ব্যবস্থা নাই। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে শুক্লানবমী তিথিতে * সামান্য আয়োজন সহকারে বাৎসরিক পূজা হয়, সেই সময়ে একটী মেলাও বসে। এই পূজার সময় ছাগ ও মেষাদি বলির ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে একটু দূরে ডোমেরা শূকর বলি দিত, এখন এই বলি উঠিয়া গিয়াছে। আশ্বিনের শুক্লা নবমী তিথিতে বৎসরে একবার পূজা ও বলিদান হয়। দেবীর নিত্য ও বাৎসরিক পূজার সময় প্রায় প্রতি মন্ত্রের শেষে 'ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি প্রয়োগের বিধি আছে।

বিশালাক্ষী দেবীর অর্চনা পদ্ধতির বিবরণ শুনিয়া ভুলুয়া বাবা স্থির করিয়াছেন যে কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই অভিমতের স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। বিশালাক্ষী হিন্দু তন্ত্রোক্ত দেবী *। 'আদি কমলে' বিশালাক্ষী দেবীর ধ্যান ও পূজার উল্লেখ আছে।

'তন্ত্রসার' বলেন—

'ঋষিরস্য মহেশানি সদাশিবো মহাপ্রভুঃ।
পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দশ্চ কথিতং বিশালাক্ষী চ দেবতা॥
শক্তিঃ প্রণবমিত্যুক্তাং লজ্জাবীজমত বীজকং।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

দেবীর ধ্যানে আছে—

'দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদ প্রভাং।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গ খেটকধারিণীং॥

---

* আষাঢ়ে নবমী পূজার সময় বর্দ্ধমান রাজষ্টেট হইতে প্রতি বৎসর একটী টাকা দেওয়া হয়। যখন এই চান্না গ্রাম খাসে ছিল তখন বৎসরে দুইবার পূজার সময় ৪৲ টাকা দেওয়া হইত। এই মহাল পত্তনী দেওয়ার সময় এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

* 'বিশ্বসার তন্ত্রে' আছে—'গুড়াপ্রেতা বিশালাক্ষী সতী সাধ্বী বিরূপিনী। 'মোক্ষকারী বিশালাক্ষী বিকটাক্ষী মগন্ধিকা।'

নানালঙ্কার যুক্তগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্তাং ত্রিলোচনাং ॥
মুণ্ডমালাবলী রম্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুট মণ্ডিতাং ॥
শত্রুক্ষয়কারীং দেবীং সাধকাভীষ্ট দায়িকাং।
সর্ব্বসৌভাগ্য জননীং মহা সম্পৎ প্রদাং স্মরেৎ ॥

এইভাবে ধ্যান করিয়া যথা সম্ভব উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণকালে 'বর্ণলক্ষং জপেৎ সুধীঃ।' বিশালাক্ষীর যন্ত্র এই—'প্রথমতঃ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে অষ্টদল পদ্ম, বৃত্ত, চতুরস্র ও চারি দ্বার অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। এই যন্ত্রে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী বিশালাক্ষী দেবীকে আবাহন করিয়া যথাবিহিত পূজা করিবে। ত্রিকোণ মধ্যে মহাদেবীর পূজা করিয়া ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিবে। তৎপর 'ওঁ পঙ্কজাক্ষ্যৈ নমঃ' এইরূপে বিশালাক্ষী, বক্রাক্ষী, সুলোচনা, একনেত্রা, দ্বিনেত্রা, কোটরাক্ষী ও ত্রিলোচনা প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া পত্রাগ্রে পশ্চিমাদিক্রমে অষ্টসিদ্ধিস্বরূপিণী অষ্ট যোগিনীর পূজা করিতে হইবে। চতুরস্রে ইন্দ্রাদিলোকপালের পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। তৎপরে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপশেষে,পূজা সাঙ্গ করিবে। এই পূজায় দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে ন্যাস করিবার বিধি, কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ বামাবর্ত্ত বিধানে ন্যাস করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বিশালাক্ষী দেবীর পূজা ও ন্যাস হিন্দু তন্ত্রোক্ত বিধান মতই সম্পন্ন হয়, ইহার সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকের কোন সম্বন্ধ নাই। বিশালাক্ষীর পূজা বাংলার স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে এবং এই দেবীর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত ভক্ত তান্ত্রিক দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে কোন কোন লেখক বলেন 'চণ্ডীদাস বজ্রযান উদ্ভূত তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধক ছিলেন।' 'কোনও প্রামাণিক হিন্দুশাস্ত্রে বাশুলী দেবীর নামোল্লেখ নাই।' বজ্রেশ্বরী সাধারণের মুখে অপভ্রংশে বাজশালী বা বাশুলীতে পরিণত হইয়াছে।" এইভাবের মনগড় মতবাদের দ্বারা হিন্দুর তন্ত্রকে উড়াইয়া দিয়া চণ্ডীদাস, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি সাধকদিগকে জনসাধারণের নিকট 'বৌদ্ধতান্ত্রিক' রূপে পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই মতবাদ যে কতটা প্রকৃত তাহা হিন্দুমাত্রেই ভাবিয়া দেখিবেন। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক সাধনায় বৌদ্ধ তন্ত্রের অল্পবিস্তর প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়, তাহা বলিয়া হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র বৌদ্ধশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা কখনই বলা যায় না। জোর করিয়া যাঁহারা তারা প্রভৃতি দেবতাকে বৌদ্ধ দেবী বলিয়া প্রমাণ করিতে চান, তাঁহারা 'নূতন একটা করো' এইমতেরই পরিপোষক। ইঁহারা বৌদ্ধমতের চস্মা চক্ষে দিয়া হিন্দুর আপামর তেত্রিশ কোটী দেবতাকে 'বৌদ্ধ দেবতা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপ অভিনব ব্যাখ্যা সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট কিছুদিনের জন্য ভাল তে পারে বটে, কিন্তু তাঁহারা তন্ত্রোক্ত দেবদে প্রকৃত রহস্য জানিলে পর ঐ সাময়িক ভাব ব্যাখ্যা হইবেন না। যাহা হউক বিরাট হিন্দুসমাজ এই অভিনব ভাব প্রচারে বড় একটা আস্থা স্থাপন করেন বলিয়া মনে হয় না, তাঁহারা পূর্ব্বাপর তন্ত্রের দেবদেবীকে যে চক্ষে দেখিতেন এখনও সেই চক্ষেই দেখিতেছেন। তাঁহারা জানেন 'তারা' দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা, ইঁহার সহিত শূন্যবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই।

* * * *

* * * *

বিশালাক্ষী মন্দিরে বর্ত্তমানে তন্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর প্রতিমা নাই সত্য, ঘট ও যন্ত্রেই দেবীর পূজা ও বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। রত্নবেদীতে মৃন্ময় নির্ম্মিত পাঁচটী মুণ্ড আছে। কেহ কেহ বলেন 'বিশালাক্ষী মন্ত্র দীক্ষিত কোন সাধক এখানে পঞ্চমুণ্ডী আসনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্মৃতি রক্ষার্থ পাঁচটী মুণ্ড মন্দিরে সংরক্ষিত হইয়াছে।' কিন্তু এই উক্তি খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তন্ত্রোক্ত শৃগাল মুণ্ড, বানর মুণ্ড, সর্প মুণ্ড ও দুইটী চণ্ডাল মুণ্ড এই পঞ্চমুণ্ডের সহিত মন্দিরের পাঁচ মুণ্ডের কোনই সাদৃশ্য নাই। শুনিয়াছি চান্না হইতে ৭/৮ মাইল দূরে সারুল গ্রামেও এইরূপ

পাঁচটী মুণ্ড আছে, তবে আমি নিজে সেই মূর্ত্তিগুলি দেখিবার সুবিধা ও সুযোগ পাই নাই। কাজেই এই উভয় স্থানের পঞ্চমুণ্ড তুলনায় সমালোচনা করিতে পারিলাম না। *

'বাঙ্গালা ভাষার' অভিধানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় 'বাসুলী' শব্দ সংস্কৃত বিন্ধ্যবাসিনী হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিন্ধ্যবাসিনী ধ্বংস হস্ত-ভ্রষ্টা মহাশক্তি অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছেন। তন্ত্রোক্তা বিশালাক্ষী দ্বিভুজা, কিন্তু বিন্ধ্যাচলের দেবী-মূর্ত্তি অষ্টভুজা। এই দুই মূর্ত্তি যে বিভিন্ন তাহা তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যান পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। কাহারও মতে 'বাশুলী' বা 'বাসুলি' বিশালাক্ষীর অপভ্রংস। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি আই ই মহাশয়ের মতে বাসুলী ও বিশালাক্ষী ধর্ম্মের পৃথক্ দুই আবরণ দেবতা। 'ধর্ম্মপূজা বিধান' গ্রন্থে * আছে—

'ওঁ আয়াস্তা স্বর্গ লোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে।
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্র বিকট দশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে॥
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগ কমলে নূপুরংবাদয়ন্তী।
কৃত্বা হস্তেচ খড়্গাং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতুসা নঃ॥'
ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

'ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে—সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটি সমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্র পরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
আইতণ্ডুল দূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেস্মঙ্গল কারিণীং॥
অসিদ্ধ সাধিনীং দেবীং কালীং বিঘ্নবিনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্য মিহ কল্পয়ে॥'

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন 'বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক এবং বৌদ্ধ দেবী।' এক সময়ে গৌড়বঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানিবুদ্ধ ও বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি কল্পনা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বজ্রেশ্বরী শব্দ বজ্জশ্বরী—বাজসরী—বাজসলী বাসলী বা বাসুলীতে পরিণত হইয়া থাকিবে। *

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংস দেবের জন্মস্থান কামার-পুকুরের এক ক্রোশ উত্তরে আনুড় গ্রামেও এক বিশালাক্ষী দেবী আছেন। মাঠের মধ্যে ছাদশূন্য গৃহে দেবীর অবস্থান। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পাদটীকায় (৪৭ পৃঃ) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন,—'উক্ত দেবীর নাম বিষলক্ষী বা বিশালাক্ষী তাহা স্থির করা কঠিন। * * * মনসা দেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্যত্র অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়।' আনুড়ের বিশালাক্ষী মনসা দেবী হইতে পারেন, কিন্তু ছান্নার বিশালাক্ষী তন্ত্রোক্তা দেবী বিশালাক্ষী। সেই ধ্যানেই দেবীর পূজা হয় এবং সাধক কমলাকান্ত এই দেবীরই পূজা করিতেন বলিয়া জনসাধারণের ধারণা। এই মন্দিরে পাচটী অদ্ভুত মূর্ত্তি যে কি করিয়া স্থান পাইল সে সম্বন্ধে আমার অনুমান পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশালাক্ষী মন্দির সম্বন্ধে অধিক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই, ভবিষ্যতে পারিলে যথাসময়ে তাহার আলোচনা করিব।

---

* কেহ সাকুল গ্রামের পঞ্চমুণ্ডের বিবরণ আমাকে পাঠাইয়া দিলে আমি কৃতার্থ মনে করিব।

* এসিয়াটিক সোসাইটীর ৫৪৩৮ সংখ্যক তালপাতার পুঁথি।

* সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অমলা

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

(৭)

মাতার মৃত্যুর পরে কয়েক দিনই কাটিয়া গেল তথাপি রমেনের সেই শোকাচ্ছন্ন জড়তা তাহাকে এক ভাবেই অভিভূত করিয়া রাখিল। কোন কথাতেই সে সায় দেয় না উৎসাহ প্রকাশ করে না নিজের গৃহেও যাইতে চাহে না। রাজেন্দ্রের গৃহের এক কোণে এক ভাবেই প্রায় পড়িয়া থাকে কখনও বা একলা জানালার সম্মুখে বসিয়া বাহিরের পানে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। কি করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবে ডাক্তার তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

রাজেন্দ্র নিজের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে নাই, আবার তাহাকে তাহার নিজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। নিজের স্বভাব কিম্বা লোকের কাতরতা কিসে যে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। রমেনের মাতা ও অমলার খুড়িমাকে বাঁচাইতে না পারিলেও গ্রামে তাহার সুযশের অভাব ছিল না, হৃদয় তাহার কোমল ও পরোপকারী শপথ করিলেও সে ব্যক্তি কখনো এক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

সেদিন 'কল্‌' হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার বলিল "ওহে তোমাদের চাটুয্যেদের ছেলেটিও দেখ্‌ছি বাঁচে না।" রমেন উদাসীন ভাবেই গবাক্ষ-পথে বাহিরের পানে চাহিয়া বলিল "সতীশ?"—"হ্যাঁ! এ হতভাগা ব্যারাম কি এ গ্রাম থেকে যাবে না? মা যাওয়ার পর থেকে কিছু দিন যেন থেমে গিয়েছিল ভাবলাম তিনিই বুঝি শেষ আহুতি। ছেলেটি বাপ মায়ের একটি ছেলে, পূর্ণ যুবা—জানত?"

রমেন একভাবেই থাকিয়া উত্তর দিল "আমার ছোট বেলার বন্ধু সে, একসঙ্গে কত খেলা-করেছি মাছ ধরেছি।"

"তবে? এখনো এখবরে চুপ্‌ করে আছ যে? দেখ্‌তে যাবে না তাকে?"

"গিয়ে কি হবে?" "কি হবে? যে রমেন গ্রামের চাঁড়াল মুচির ঘরেও রোগীর সেবার জন্য গিয়েছে তুমি কি সে রমেন নও? আজ বন্ধুর জীবন-সংশয়-অবস্থার খবরেও তোমার মুখে এই কথা?"

রমেনের কোন' চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। মৃদু স্বরে কেবল বলিল "হ্যাঁ।" রাজেন্দ্র ক্ষণেক তাহার পানে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এ তোমায় আমি হ'তে দেব না, ওঠো তুমি।" রমেন তথাপি নড়ে না দেখিয়া রাজেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গেলে রমেন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। এইবার রাজেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে রমেনের হাত ছাড়িয়া দিয়া আবার নিজস্থানে বসিয়া পড়িল। রমেনের মুখ ও দৃষ্টি দেখিয়া সে বুঝিল এখনো এ চেষ্টা নিরর্থক।

একটু পরে রাজেন্দ্র বলিল "একবার মনি টুনিদেরও আর খবর নিলে না কেমন আছে তারা!" রমেন ধীরে ধীরে উত্তর দিল "ভালই আছে নিশ্চয়, নৈলে তোমার ডাক্‌ পড়ত।"

"কে বলতে পারে? আমার ক্ষমতাটা তারা ভাল্‌ করেই দেখেছে তো।"

রমেন আর কোন প্রতিবাদ করিল না। উভয়েই নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা ডাক্তারের সানন্দ সম্ভাষণ রমেনের কাণে গেল। "এই যে তোমরা ভাল আছ তো? কি খবর?" রমেন ফিরিয়া দেখিল বালিকা টুনি ভাইটির হাত ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রমেনের পানে

চাহিয়া তাহারা এ প্রশ্নের উত্তর দিল "দিদি রমেন দাদাকে ডেকেছে।" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া রমেন বলিল "কেন?" রাজেন্দ্রও এতক্ষণ নীরবেই ছিল এইবার একটু যেন বেগের সহিত বলিয়া উঠিল "কি আশ্চর্য্য! ওদের সে প্রশ্ন করার চেয়ে জেনেই এস না কেন! ওরা ছেলে মানুষ কি জানে।" টুনি ডাক্তারের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল "দিদি আপনাকেও বলতে বলে দিয়েছেন। জ্যাঠাইমার রমেন দাদার মার শ্রাদ্ধের আর বেশী দিন দেরী নেই।"

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিল "ওঃ তাইতো রমেন আর একদণ্ডও দেরী নয়, এখনি যাও। আঃ—সঙ্গের গুণ দেখ তুমি সুদ্ধ সাহেব ব'সে যাবার জোগাড় করছ যে। বাড়ী যাও।"

"তুমিও চল, নৈলে আমি বাড়ী ঢুকতেই পারবনা।"

"চল" বলিয়া রাজেন্দ্র উঠিল। চারিজনে রমেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্র দেখিল রমেনের অনুপস্থিতে এই পনেরো কুড়ি দিনে বাড়ীর যে অবস্থা হইবার কথা সেরূপ কিছুই হয় নাই। অঙ্গন খানি তেমনি পরিস্কার নিকানো পোঁছানো। রমেনের মাতা থাকিতে এই গ্রাম্য গৃহস্থের অঙ্গনের যে দিব্য শ্রী ছিল এখনো তাহা সেই ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজেন্দ্র তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিল মায় তুলসী মঞ্চের কোটরে ঘৃতের প্রদীপটিও যেন গত রাত্রের সাক্ষ্য দান করিতেছো। ধান্তের শস্যের গোলা গুলির দ্বারও সদ্য মার্জ্জন পূত।

টুনি মনির দিদিমাতা ধীরে ধীরে আসিয়া বলিলেন "আরতো এমন করে তোমার থাকা চলবে না দাদা, মার কাজের যে আর দশ বারো দিন মাত্র বাকি। পাড়া গাঁয়ের কাজ, এখনি থেকে জোগাড় না করলে"—রমেন উত্তর দিল না।

রাজেন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল "ওর অবস্থা দেখতেই ত পাচ্চেন। আপনারাই তো সব দেখ্‌ছেন শুন্‌ছেন এ ভার আপনাদেরই। বলুন কি কি ব্যবস্থা হবে কি করবো এখন আমরা?"

"তোমরা যোগ্য ছেলে, তোমরা কি জান না, আমার কি বুদ্ধি আছে? আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করো, সেই—"

"কৈ তিনি তো আসেন নি? আপনাদের বাড়ীই যাব কি আমরা?"

"তার কি মরবার অবসর আছে, এ বাড়ীতে সকালে বিকালে এসে একবার একবার পরিস্কার করে রেখে যায় মাত্র আমারওযে মহা শুভদিন এল বলে দাদা।" বৃদ্ধা চোখ্ মুছিতে লাগিল। রাজেন্দ্র অপ্রস্তুত ভাবে বলিল "তাইতো তবে এখন আপনারা কি করে রমেনের সাহায্য করবেন?" "আমাদের আবার কাজ? ভটচাযিকে ডাকিয়ে এনে তিল-কাঞ্চনে মণিকে শুদ্ধ করিয়ে নেওয়া মাত্র। তবে অমা একা তাই তার বেশী অবসর নেই। আমারতো কোন ক্ষমতাই নেই। এই কাজের জন্য সে যে আমায় রেখে যাবে এ কে জান্‌তো! কোথায় আজ আমার একটি মেয়ে সে, আমারই শ্রাদ্ধের জোগাড় করিবে, না আজ আমি—" বৃদ্ধা অতি কষ্টে তাহার শোকোচ্ছাস সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্র মৃদু স্বরে বলিল "চলুন—তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে আসি। রমেন এসো।" বাহিরের দাওয়ার এক পাশে বসিয়া পড়িয়া রমেন বলিল "তুমিই জেনে এসো।"

* * * * *

অমলার সম্মুখে কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া রাজেন্দ্র যখন বলিল "আপনার অবসর নেই—"তখন বাধা দিয়া অমলা উত্তর দিল "যথেষ্ট অবসর আছে, সেজন্য আপনারা একটুও ব্যস্ত হবেন না। তবে আর দিন নেই ভট্টাচার্য্য মশায়কে ডেকে ফর্দ্দ করে নেন্ শ্রাদ্ধের কি কত লাগ্‌বে। আর যত গুলি ব্রাহ্মণ ভোজন হবে ও অন্যান্য লোক খাবে তার ফর্দ্দ করে জিনিষ পত্রের আন্দাজ করে আনান্। এ আন্দাজ পাড়ার মুরুব্বিদের ডাকান্ তাঁরাই সব ঠিক্ করে দেবেন।"

দিদিমা বলিলেন "রমেন কি মায়ের বৃষোৎসর্গ করতে পারবে? পারলে ভাল হ'ত—তার যে মা ছিল—"

"রমেনের কাছে আপনারা চলুন একবার, আপনি পারবেন কি যেতে? আপনাদের—"কুণ্ঠিত মুখে রাজেন্দ্র অমলার পানে চাহিতেই, অমলা বলিল "আমাদের সে সামান্য কাজের জন্য ভাব্‌নার বা ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। দিদিমা তুমি ওঁর সঙ্গে যাও আমিও এখনি যাচ্ছি।"

বাহির হইতে ডাক্ আসিল "ডাক্তার বাবু শীগ্‌গির আসুন। দুবাড়ী খুঁজে তবে আপনাকে পেলাম, দেরী করবেন না।" "যাই" বলিয়া ডাক্তার অমলার দিকে ফিরিয়া বলিল "আমি কখন্ ফিরব তার ঠিক্ নেই। আপনাদের জন্য তার ব্যস্ত হবার দরকার না থাকলেও রমেনের জন্য আপনাকে হতে হবে। ও বাড়ী যান্ সব ব্যবস্থা করুন গে রমেনকে দিয়ে যথা কর্ত্তব্য করান্ গে। আপনাদেরই এ কাজের সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে। আমার দ্বারা রমেনের কোন সাহায্যের আশা বোধ হয় নেই।"

রমেনের মাতার শ্রাদ্ধের দিন ছয় সাত পূর্ব্বেই অমলার খুড়িমার তিল কাঞ্চনের শ্রাদ্ধ টুকু চুকিয়া গেল। মাতার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের বিপুল সম্ভার ক্রয় করিয়া রমেন তখন সহর হইতে ফিরিতে পারে নাই। ডাক্তারও চাটুয্যেদের ছেলেটি র জীবনের আশা পাইয়া সেখান হইতে বড় একটা নড়িতে পারে নাই। রমেনের সাহায্যে যখন সে আসিয়া লাগিল তখন তাহার অন্তরটা অনেক দিন পরে একটু লঘু হইয়া উঠিয়াছে। রমেনের বাল্য সঙ্গীটিকে সে বাচাইয়া তুলিতে পারিয়াছে।

শ্রাদ্ধ চুকিয়া গেল। গ্রামের লোক বলাবলি করিতে লাগিল "ছোক্‌রা কর্‌ল কিহে? সর্ব্বস্ব পণ ক'রে মায়ের বৃষোৎসর্গ করলে! নিজেও না হল সংসারী, ছন্নছাড়া হ'য়ে দিন কাটায়। এইবার মাটা ম'রে আরও লক্ষীছাড়া হয়ে পড়্‌ল। যে খরচটা করলে এতে জমী জমা সম্পত্তি যা আছে সবই যাবে বোধহচ্চে। মিত্তির বংশটা এবার উচ্ছন্ন দিলে দেখ্‌ছি ছেলেটা।"

সকলের উপদেশ ও তিরস্কারের জ্বালায় রমেন নিজ গৃহ কোটরেই আশ্রয় লইল। রাজেন্দ্রের বহু অনুরোধেও তাহাকে কোন কার্য্যে বাহির করিতে পারিল না। অমলার দিদিমা দুই চারি দিন তাহার খাওয়া দাওয়ার তত্ত্বাবধানে গিয়াছিল তাঁহাকেও মিষ্টমুখে বিদায় করিয়া দিল। তাঁহাদের অত ছুটাছুটির প্রয়োজন নাই, সে নিজেই নিজের সব ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

দিদিমা বেচারী রমেনের একথায় মনে মনে খুসী ছাড়া অখুসী হইলেন না। তিনি একে বৃদ্ধ মানুষ বাতব্যাধিতে অশক্ত তাহাতে শোকার্ত্তমনা, পরের জন্য এত হাঙ্গাম আর তিনি পছন্দ করিতেছিলেন না। দিনকতক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াই তিনি তাঁহাদের সাধ্যমত রমেনের উপকারের প্রত্যুপকার করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছিলেন। তিনি বুড়া মানুষ কতদিন আর এসব পারেন। আর অমলা না সধবা না বিধবা—তাহার যে বয়স ও অবস্থা তাহাতে রমেনের সহিত বেশী ঘনিষ্টতা রাখিলে দুর্নামের ভয় আছে। রমেন যে নিজ হইতেই তাঁহাদের এই কঠিন কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি দিল ইহাতে বৃদ্ধা খুসীই হইয়া গেলেন এবং অমলাকে ও সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া নীরব করিয়া দিলেন।

গ্রামে ক্রমে শান্তি আসিল, মহামারী ধীরে ধীরে নিজের মৃত্যু-পাণ্ডু অঞ্চল সম্বরণ করিয়া সে দিক্ হইতে প্রস্থান করিল। একদিন রাজেন্দ্র রমেনকে বলিল "এইবার তোমাদের গ্রাম হ'তে দোকান পাট্ তুলে ফেল্‌তে হবে। আমার বন্ধু তো দয়া করে এইবার গ্রাম ছাড়লেন, আমিও এখন পথ দেখি।"

রাজেন্দ্রের এ রহস্যে রমেন হাসিল না, গম্ভীর মুখে একটু যেন ভাবিয়া বলিল "হ্যাঁ, এরকম প্র্যাক্‌টীসের রুচি আর কতকাল টিক্‌তে পারে! যা টিক্‌ল' সেজন্য এ গ্রামের শত ধন্যবাদ নাও। কিন্তু শুধু ডাক্তার ব'লে নয় হে, তুমি এ গ্রামের সুখ দুঃখে এমনি জড়িয়ে উঠেছ যে একথা শোন্‌বা মাত্র সকলে কি যে কর্‌বে আমি তাই ভাব্‌ছি।"

ডাক্তারও গম্ভীর মুখে বলিল "হ্যাঁ অনেকের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়েছি বটে—ব্যতীত শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকুমার মিত্র যিনি এ গ্রামে আমার সব চেয়ে বন্ধু—সব চেয়ে আপনার।"

রমেন রাজেন্দ্রের পানে একটু অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দ্বিগুণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। শেষে দৃষ্টি মাটীর দিকে নামাইয়া মৃদু স্বরে বলিল "আমার আর সুখ দুঃখ বলে কি আছে যে এ গঞ্জনাটা দিচ্ছ ভাই?"

"যতদিন তুমি নিজে আছ ততদিন তোমার সুখ দুঃখ না থাকুক এদের অতীত কোন না কোন অবস্থা আছেই আছে। বিক্ষেপহীন সে অবস্থাটার কথাও তো কোন দিন

তুমি আমায় বোঝাও নি ভাই। চিরদিনই নিজেকে আমার কাছেও ঢেকে বেড়াচ্ছ।"

রমেনের পাংশুবর্ণ মুখ একটু যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল "ঢাক্‌বার বা খুল্‌বার আমার যে আর কিছুই নেই তা যে তোমায় বলে বোঝাতে হবে এ আমি ভাব্‌তে পারিনি।"

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলিল "রমেন মানুষের মন যা চায় তা ছাড়া তার মনুষ্যত্ব বলে কি কিছুই নেই? সুখের আশায় নিরাশ হয়েছ বলে মানুষ নাম কেন ছাড়্‌ছ? এত দিনও তো তুমি এই রমেনই ছিলে কিন্তু মানুষ ছিলে! আবার তাই হতে চেষ্টা কর ভাথ সুখ না পাও শান্তি দুর্লভ হবেনা। আত্মস্থ থাকাই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

রমেন যে প্রতিবাদ করিল না নিঃশব্দে রহিল, ইহাতে রাজেন্দ্র সুখী হইল না। উত্তেজনা হীন এই ঔদাস্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক অবস্থা তাহা সে বুঝিল। রাজেন্দ্র উঠিয়া পড়িয়া বলিল "চল টুনি মণিদের একটু খোঁজ নিয়ে আসি। দিদিমাকে আমার যাবার কথাটাও বলে আসি।"

"চল।"

উভয়ে অমলাদের জীর্ণতর গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইতেই বুঝিল এ গৃহে আবার একটা কি চলিতেছে। ভীত কণ্ঠে রাজেন্দ্র টুনি বলিয়া ডাকিতেই অমলা বাহির হইয়া আসিল। তাহার মলিন বেশে মলিন মুখে এমন একটা চিন্তার ছায়া ছিল যাহা দেখিয়া রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসু ভাবে শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল মাত্র। প্রশ্ন করিতে সাহসে কুলাইল না।

অমলা ক্লিষ্ট হাস্যের সহিত বলিল "এসেছেন! আপনা-দের ডাক্‌তে পাঠাব ভাব্‌ছিলাম। আপনার সামান্য ঋণ শোধ করারও যে অহঙ্কার একদিন দেখিয়েছিলাম ভগবান তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার দিন আবার এনে দিয়েছেন। দিদিমাকে দেখ্‌বেন আসুন"

"দিদিমা! তাঁর কি হয়েছে!"

"ক'দিন প্রবল জ্বর গেল, আজ দেখ্‌ছি তিনি তাঁর শরীরের বাঁদিক্‌টা একেবারে নাড়্‌তে পাচ্ছেন না"।

বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া রাজেন্দ্র বুঝিল বৃদ্ধার অশক্ত দেহে পক্ষাঘাতের আক্রমণ পৌঁছিয়াছে। এখনি হইতে বিশেষ ভাবে চিকিৎসার প্রয়োজন, তবে যদি এই অবশ দেহের শক্তি ফিরাইতে পারা যায়। বৃদ্ধার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই, জ্বর ও তখন আর নাই।

অমলা জিজ্ঞাসু ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া রাজেন্দ্র বলিল "একেবারে নিরাশ হবেন্ না, সাধ্যমত যত্ন ও চিকিৎসা ক'রে তো দেখা যাক্—পরে"—এইবার ডাক্তার একটু সঙ্কোচ হাস্যের সহিত বলিল "পরে না হয় আপনাদের প্রত্যেক বিপদেই যেমন কিছুই কর্‌তে পারিনি তেমনি ভাবেই ফিরে যাব। তবু ও কিছুনা কিছু কর্‌তে হবে তো।"

বৃদ্ধা কাতরোক্তি করিয়া বলিল" দেখো দাদা যদি পঙ্গু হ'য়ে পড়ে না থাকি তবেই ওষুধ দাও নৈলে শুধু শুধু বেঁচে উঠে যেন মরার অধিক হ'য়ে না থাকি, এমন ওষুধ যেন আমায় দিওনা দাদা—দোহাই"।

ডাক্তার স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল "যদি না বাঁচ্‌বেন তো এঁদের দেখ্‌বে কে বলুন তো। সে কথাটা ভাব্‌ছেন না?"

"ভাব্‌ছি দাদা—ভেবে যে কুল পাচ্চিনা। তবু যেন এই জন্ম হতভাগা মেয়েটার গলায় বোঝা হ'য়ে না থাকি। তিনটা অপোগণ্ড নিয়ে কি দশা হবে ওর। নিজের নাতি নাত্‌নির চেয়ে ওর ভাবনাই আমার যে এখন বেশী হয়েছে।"

বৃদ্ধা অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র বুঝিল তাঁহার যে পক্ষাঘাত হইয়াছে তাহা কেহ না বলিলেও বৃদ্ধার বুঝিতে বাকি নাই। রাজেন্দ্র তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া রমেনকে বলিল "প্রথমে কিছুদিন ওষুধ দিয়ে দেখি শেষে ব্যাটারীরও দরকার হবে বোধ হচ্ছে। তোমায় নিয়মিত ভাবে দেখা শোনা কর্‌তে হবে কিন্তু, নৈলে একা আমার মধ্যে কুলুবেনা তা ব'লে রাখ্‌ছি"।

রমেন মাথা নীচু করিল। বৃদ্ধা বলিল "তা আর তোমার বল্‌তে হবেনা দাদা, চিরদিন ওরা মা আমাদের সব আপদ বিপদে বুকদিয়ে করেছে—ওর স্বভাব তো দেখছই। মা গিয়ে বড় শোকার্ত্ত হয়েছে তাই ক'দিন আর খোঁজ খবর নিতে পারেনা। নৈলে সব বিপদে ওইতো আমাদের ভরসা। আজ ওষে আমাদের"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা নিজের

কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"কি কুক্ষনেই কাশী গিয়েছিলাম। আমিই যে সকল অনিষ্টের মূল ওদের। শেষে সেই অমলা আর সেই রমেনই এ সাবের অন্ধের নড়ী হল কেবল তাদের যা সর্ব্বনাশ করবার তা আমরা করে দিলাম। না বুঝে এক কাজ করে ফেলে আর তা ফেরাবার পথ রইল না।"

নত মস্তক রমেন ও অমলার পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া রাজেন্দ্র একটু সুদৃঢ় স্বরে বলিল "আচ্ছা আপনি একটু সুস্থ হোন্ আগে তারপরে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার ও কিছু কথা আছে। যাক্ এখন আমরা উঠি, চল রমেন্ ওষুধ আনবে।" তারপরে সহসা অমলার পানে চাহিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিল "কিন্তু দিদিমার চিকিৎসা করতে প্রত্যহই আমায় আসতে হবে, হয়ত দু তিন বারও আনা গোনা হ'য়ে যেতে পারে। সেটুকু আপনাকে কিন্তু সহ্য করতে হবে। রমেনের হাতে কিছু একটা পাঠিয়ে দিয়ে হঠাৎ একদিন আমায় আসতে বারণ করে পাঠাতে পাবেন না। আমার কাজ আজ হয়ে গেলে আমি আপনিই চলে যাব, সেজন্য আপনাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না। সহসা ডাক্তারের এইরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যে সকলেই একটু বিস্মিত ও লজ্জিত ভাবে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। অমলার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা কেবল ক্ষুব্ধ রুদ্ধ কণ্ঠে "এও কি একটা কথা দাদা তুমি—তোমায় আসতে বারণ?—অমলা ছেলে মানুষ নানান বিপদে যদি কোন দিন কিছু করে থাকে—তা কি—ওর ও মাথার ঠিক নেই দাদা"—ইত্যাদি বলিতে ছিলেন, ডাক্তার বাধা দিল "দিদিমা আপনি ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে থাকুন। মণি দিদিকে কাছে নিয়ে গল্প সল্প করুন। ওষুধ খেতে দুষ্টুমি করবেন না—বুঝেছেন? আপনাকে বাঁচাতেই হবে তা যে অবস্থায়ই হোক্। জ্বরের সময় আমায় যদি একবার ডাকতেন, তাহলে—যাক্ এখন আমি আসি।"

ডাক্তার ও রমেন চলিয়া গেলে লজ্জাতঙ্ক কুণ্ঠিতা অমলা ডাক্তারের এই তীক্ষ্ণ স্বর ও ততোধিক তীক্ষ্ণ কথা গুলার সঙ্গে ডাক্তারের কার্য্যের কোন মিল না পাইয়া যেন হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। সত্যই সে একদিন এ মহাত্মাকে অপমান করিয়াছিল বটে কিন্তু সেটুকু যে তাহাদের আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য। ডাক্তারের মত বিবেচক লোকের কাছে কি সেটুকু ক্ষমার্হ নয়? ক্ষমাও তো তিনি তখন করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার নিজ কর্ত্তব্যের তো একদিনও ত্রুটী করেন নাই। তবে আজ এই পুনঃ পুনঃ বিপদগ্রস্থা অমলাকে সেকথা আবার তাঁহার মনে করাইয়া দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? তিনিও কি প্রতিশোধ লইলেন? মানুষে একটুর লোভ ছাড়িতে পারে না। অপমানটা তিনি মনে রাখিয়াছিলেন নিশ্চয়। সেদিনের ত্রুটী স্বীকার টুকু সে যে করিবে মনে করিয়া লজ্জার কুণ্ঠায় এ পর্য্যন্ত পারিয়া উঠে নাই। ডাক্তার যখন তাহা ভোলেন নাই তখন অমলার তাহা না পারাটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারের সেদিনের কথায় তাহাকে অমলার ব্যবহারে একটু দুঃখিত বলিয়াই যেন ভ্রম হইয়াছিল। আর আজ এ যেন অন্য একটা কি! পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া এটুকু যেন বিরক্তিরই নামান্তর এবং সে অপমানকারিণী যে অমলাই মাত্র একা, তাহাও ডাক্তার বুঝিয়া রাখিয়াছেন। তাইই অমলার উদ্দেশে তাঁহার এ তীক্ষ্ণ ভাব টুকু তিনি আজ জানাইয়া গেলেন। ভাবিতে ভাবিতে অমলা দ্বিগুণ বিবর্ণা হইয়া উঠিল।

(৮)

কয়েক দিন ঔষধের দ্বারাই দিদিমার চিকিৎসা চলিল কিন্তু তাহাতে তেমন ফল পাওয়া গেল না। তখন রাজেন্দ্র ব্যাটারীর সাহায্যে তাঁহার অবশ অঙ্গকে সচল করিবার শেষ চেষ্টায় লাগিয়া পড়িল।

সেদিন ডাক্তারের কাজ চলিতেছে, রমেন ও তাহার সাহায্যের জন্য পার্শ্বে আছে। দিদিমার মূল ব্যাধি উপশম না হইলেও অন্যান্য বিষয়ে তিনি অনেকটা সুস্থতা লাভ করিয়াছিলেন। তিন জনেই মাঝে মাঝে একটু একটু গল্প চালাইতে ছিলেন। রমেন বলিল "জানেন দিদিমা সেদিন তো ডাক্তার এ গ্রাম থেকে চলে যাব বলে তল্পী তল্পা বাঁধার উদ্যোগ করছিল। আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্যে এসেই তো আপনার কাছে এখন কিছু দিনের জন্যে আটকা প'ড়ে গেল। নৈলে এতদিন উনি এ অকৃতজ্ঞ গ্রামকে

কদলী প্রদর্শন করতেন।" ডাক্তার রমেনের কথায় উচ্চহাস্য করিয়া দিদিমাকেই যেন সাক্ষ্য মানিয়া উত্তর দিল "বলুন তো দিদিমা একে অকৃতজ্ঞতা বলে না? এই যে আপনাকে কিছুতেই বিছানা থেকে তুলতে পারছি না এ আপনার স্রেফ দুষ্টুমি নয় কি? নিজের অক্ষমতা বলে একে আমি কিছুতেই মানব না বুঝলেন? আমাকে গ্রাম ছাড়াবারই এসব ফন্দি নয় কি আপনাদের। কদলী প্রদর্শন না ক'রে উপায় কি বলুন দেখি?"

দুই বন্ধুর এই হাস্য পরিহাসে দিদিমা একটু হাসিলেন বটে কিন্তু সেটুকু যেন অনিচ্ছার ভদ্রতা রক্ষা। কেননা তখনি তিনি উদ্বিগ্ন মুখে বলিলেন "হ্যাঁ দাদা একি সত্যি? তুমি এ গাঁ ছেড়ে যেতে চাচ্ছ?" ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রমেন বলিল "শুনলেনই তো, আপনারা রোগ সারাবার নামটি করেন না—সেই রাগে উনি চলে যেতে চান।"

"কিন্তু দাদা সে কি তোমার ত্রুটী? এ গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই যে তোমার চিকিৎসায় বেঁচেছে। নিতান্ত যার আয়ু নেই তুমি তার কি করবে ভাই? অন্য যদি কোন কারণ থাকে সে কথা আলাদা, তোমার মত বিদ্বান্ ছেলে এ রকম গাঁয়ে কত কাল কাটাতে পারে সেকথা আমরাও বুঝি। কিন্তু দাদা এ গাঁকে অকৃতজ্ঞ বলো না, তুমি চলে যাবে শুনলে সবাই বোধ হয় মাটীতে বসে পড়বে।"

ডাক্তার অপ্রস্তুত ভাবে বলিয়া উঠিল "আচ্ছা আপনি ভাল হ'য়ে উঠুন দেখি তবেই না একথা মানতে পারি? নইলে শুধু শুধু—" রাজেন্দ্রের কুণ্ঠাকে বাধা দিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "এটুকু যে ভগবানের হাত দাদা, তোমার মত বিজ্ঞ ছেলেকে তাও কি বোঝাতে হবে? তুমি চলে যাবে এ কথা মনে করতেও যে ভয় লাগছে ভাই। মনে হচ্চে যেন বিপদের বন্ধু জগতে আর কেউ আমাদের থাকবে না।"

রাজেন্দ্র এবার নত মস্তকে একটু যেন গাঢ় স্বরে বলিল "কিন্তু আমি আপনাদের কোনই উপকারে লাগিনি।" বলিতে বলিতে মাথা তুলিয়া চেষ্টাকৃত হাসির সহিত সে ভাবটা তখনি বদলাইয়া ফেলিয়া ডাক্তার সহজ প্রফুল্ল মুখে বলিল "ভাবছেন কেন দিদিমা, তার এখনও দেরী আছে। আর আমি চ'লে গেলেও আপনাদের চির দিনের বন্ধু আপনার এই নাতিটি তো থাকবে। জানেন আপনাদের রমেন ও এখন একটি ক্ষুদ্র ডাক্তার হয়ে উঠেছে?

দিদিমা সনিশ্বাসে উত্তর দিলেন "রমেন—হ্যাঁ, কিন্তু চিরদিন এমন করে তার কাছে দাবী করবার আমাদের কি অধিকার আছে? থাকৃত যদি আজ—"

ডাক্তার সকলের অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল অমলার পাণ্ডুবর্ণ মুখ যেন কি একটা ভাবে আরক্ত হইয়া উঠিতেছে। সে নিঃশব্দে উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে দিদিমাও এইটুকু বলিতে বলিতে সহসা যেন চমক্‌খাইয়া থামিয়া গেলেন।

তিনজনের মধ্যেই সেদিন আর অন্যকথা কিছু আসিল না। আপন আপন চিন্তায় তিনজনেই বোধহয় অন্যমনা হইয়া পড়িয়াছিল। নিজকার্য্য সমাপনান্তে ডাক্তার ও রমেন যখন বিদায় লইল গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা অমলার সহিত তখন তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না। টুনিকে দিদিমার কাছে বসাইয়া উভয়ে চলিয়া গেল।

রমেন নিজের গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া রাজেন্দ্রকে বিদায় দিবার জন্য ফিরিয়া চাহিল কিন্তু দেখিল রাজেন্দ্র ও তাহার সহিত দ্বারে উঠিয়া বলিতেছে "দাঁড়ালে কেন ভিতরে চল।"

"চল" বলিয়া রমেন অগ্রসর হইল। অঙ্গনে ঢুকিয়া চারিদিক চাহিয়া রাজেন্দ্র বলিল "সত্যিই লক্ষীছাড়া হ'যে পড়েছ এতদিনে? এমন ক'রে কতদিন চলবে!"

রমেন উত্তর না দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া পড়িল। চিরদিন একভাবে স্থিত সম্প্রতি—ধূলাচ্ছন্ন খাটিয়া খানায় একেবারে দেহটা বিছাইয়া দিয়া বন্ধুর উদ্দেশে কেবল বলিল "বস"।

"কোথায়? তোমার ঘাড়ে না মাথার উপরে?"

"যেখানে খুসী ইচ্ছা করলে ঐ জলচৌকীটার ওপরও বসতে পার।'

জলচৌকীতে না বসিয়া রাজেন্দ্র রমেনের সেই খাটিয়ারই একপার্শ্বে রমেনের ঘাড়ের নিকটেই সত্য সত্য বসিয়া পড়িয়া নিজের স্বগত প্রশ্নকে এইবার রমেনের উপর নিক্ষেপ করিল—

"এমন ক'রে কতদিন চলবে?"

তারপরে মৃদুস্বরে বলিল "সত্যই কি তুমি কিছু জাননা? তোমার কি আন্তরিকই বিশ্বাস সে তোমার—"

একটু পরে কম্পিতকণ্ঠে রমেন উত্তর দিল "আমার তাই মনে হয়। নৈলে—"

"কখনো কোন প্রমাণ পাওনি এই বল্‌ছ? কি আশ্চর্য্য! এটুকুও যে এরকম সংযত পবিত্র চরিত্রের মেয়ের পক্ষে খুবই সম্ভব। নিজের অন্তরের কথা তুমিও যেমন নিজের অন্তরকে এতদিন জান্‌তে দিতে না বল সে হয়ত ততোধিক ভাবে—"

"জানিনা আমি কিছু জানিনা ভাই।"

"তার মন থেকে তার স্বামী-বর্ত্তমানের আশঙ্কাটা আগে সরিয়ে দিতে হবে। তবেই যদি—"

"কি প্রমাণে তা সরাবে? কি করে জান্‌লে তুমি যে সে বিধবা।"

"কি আশ্চর্য্য! এরও কি প্রমাণের দরকার আছে? এই দীর্ঘ বারো তেরো বৎসরে তাহলে সে স্ত্রীর খোঁজ করত না?"

"এতেই মাত্র বিধবা প্রমাণ হয় না। শুনেছ তো তার বিয়ের জটিল ব্যাপারের কথা। অমলার মত সেও হয়ত জানেনা কে তার স্ত্রী কোথায় আছে—মরেছে না বেঁচে আছে।"

"কি আশ্চর্য্য তবুও সে স্বামী আর অমলা স্ত্রী?"

"তুমি না মান্‌লেও সমাজ দেশ আর অমলাও হয়ত তাকে মান্‌বে।"

"মান্‌তে আমি দেবনা। আমি বুঝাব তাকে যে তার বিয়েই হয়নি—সে কুমারী।"

"তোমার মতে তো? সে কথা সে মান্‌বে কেন? আর ধর্ম্ম সমাজ?"

"রমেন তুমি মুখে বল্‌ছ তার অমতই তোমার বাধা কিন্তু তোমার মনের বাধাও যে তার চেয়ে কিছু কম আছে তা বলে তো আমার মনে হচ্ছে না।"

"স্বীকারই করছি। সত্যই যদি তার বিয়ে হয়ে থাকে—তার স্বামী বেঁচে নেই একথা কে বলতে পারে? আমার পক্ষে এইই প্রচণ্ড বাধা। আর সে যদি বিধবাই হয়ে থাকে তাও তার সংস্কারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাকে নিজের সুখের জন্য গ্লানির মধ্যে টেনে আন্‌তে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এতে আমার নিজের জীবন যতই 'নয়ছয়' ছন্নছাড়া হ'য়ে থাক্‌না কেন তাকে আমি তার সম্মানের আসন থেকে নামাতে চাইনে।"

"আর সেও যদি তোমায় এই রকমই ভালবাসে? কিসের জন্য দুজনার জীবনই এমন ছন্নছাড়া করবে তোমরা? আমি এ জেনে শুনে হতে দিলে আমার পাপ হবে। ধর দিদিমা যদি মরে যায়—ঐ দুটি শিশু নিয়ে কি গতি হবে তার? লোকনিন্দার ভয়ে তোমার আশ্রয় নিতে পাবে না। অসহায়া আর অতুলনীয়া সুন্দরী এ অবস্থায় তার ওপরে সব রকম দুর্গতিই ঘনিয়ে আসতে পারে। তুমি আছ বটে কিন্তু বল্‌ছি তো তুমি ঘনিষ্ঠতা করলে জেনো দুর্নাম অনিবার্য্য। তার ফলে হয়ত বেচারা প্রাণও হারাতে পারে। সংসারে এ রকম অনেক ঘটে থাকে। এ সময়ে যদি তার স্বামী সেজে হটাৎ অন্য কেউ এসে দাঁড়ায় তাকেই কি সমাজ পুরো বিশ্বাস করবে না অমলাই তাকে স্বামী বলে প্রাণ দিয়ে নিতে পারবে? হয়ত তাতে তার যন্ত্রণা বেড়েই যাবে তার চেয়ে তার নামে যে মিথ্যা বিয়ের ধোঁয়া সকলের মনে আছে তাকে সরিয়ে দিয়ে যদি তোমরা দুটিতে—"

রমেন উঠিয়া বসিয়া উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিল "কি করে? এ মিথ্যে ধোঁয়া কে সরাতে পারে বল? আমার অন্তরের একটা কথা তবে শোন; আমার মন বলে অমলার বিয়েই হয়নি কিন্তু তার কোন প্রমাণ আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। কাশীতে অমলার বাপের পিসির কাছে গিয়েছিলাম সে এই দিদিমাকে যা বলেছে তার বেশী বল্‌তে পারলে না। কেবল জোর দিয়ে বলে যে বিয়ে হয়েছিল এইমাত্র! এলাহাবাদে যে জায়গায় অমলার বাপ আগে বাস করত সেখানে পর্য্যন্ত খোঁজে খোঁজে গিয়েছিলাম। প্রতিবাসীরা কেবল বলে যে সে মেয়ে নিয়ে একবার কোন্ দেশে চলে যায়। তারপরে হটাৎ এসে তল্পী তল্পা তুলে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। মেয়ের বিয়ে হয় কি না হয় তা কেউ জানেনা। এ বিয়ের প্রমাণ

বা অপ্রমাণ কিছুই না পেয়ে আমার অন্তর একে' নিজের অজ্ঞাতে অপ্রমাণ্য বলেই যে ধরে রাখে, এ আজ স্বীকার করছি তোমার কাছে।"

রাজেন্দ্র নীরবে সমস্ত শুনিয়া শেষে বলিল "তাহ'লে অমলার অন্তরও কি এই অপ্রমাণ্য বিষয়কে এত মেনে চলে তুমি মনে কর?"

"আমি বলেছিত সে আমি জানি না।"

"কিন্তু এইই তোমার আগে জানতে হবে। তারপরে আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব অমলা বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা।"

"কি করে বোঝাবে? বিধাতা ভিন্ন একথা বোঝাবার উপায় কারও বুঝি জগতে নেই।"

"তবে আমি এক্ষেত্রে বিধাতাই জেনে রাখ। কেননা আমার বিধানেই তোমরা চলবে।"

রমেন স্তব্ধনেত্রে রাজেন্দ্রের পানে ক্ষণিক চাহিয়া অধীর ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল "তুমি আমায় যা জানতে চাইছ সে বিষয়ে আমি এতটুকুও অগ্রসর হতে পারব না জেনো যদি না আমি নিজের মনের কাছে অকুণ্ঠিত হতে পারি। বল তুমি আমাদের কি বিধান করবে? বল আমার মন যা বলে তা কি সত্যি, সত্যি কি অমলা কুমারী? তোমার ভাবে কেন যে আজ আমার মনে হচ্ছে এ রহস্যের চাবী তোমারই হাতে আছে তা জানিনা। সত্যই বুঝি তুমি বিধাতা। সত্যি কি তুমি অমলার জীবনের কথা কিছু জান? সংশয়ে রেখনা স্পষ্ট কথা বল ভাই —জান?"

"জানি।"

রমেন্দ্র একমুহূর্ত্ত যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে ধীরে জড়িতস্বরে বলিল "কিন্তু হটাৎ যেন ভয়ও আসছে কিজানি কি শুনব বলে? থাক্ এযে অসম্ভব কথাই তুমি আমায় পাগল পেয়ে যা খুসী বোঝাচ্ছ হয়ত। তুমি কি করে জানবে? নিশ্চয় তোমার মনগড়া বিশ্বাসের ওপরই জোর দিয়ে তুমি যাহোক্ একটা বোঝাতে যাচ্চ আমায়। আমার মনের ধারণা জেনে নিয়ে সুবিধাই হ'ল তোমার।"

"রমেন কতকগুলো এলোমেলো কি বক্‌ছ। শোন। তুমি, খুঁজবার পথই যে খুঁজে পাওনি। অমলার পিতা হরিশ বোসের প্রয়াগের পাণ্ডার কেন খোঁজ করনি তার প্রতিবাসীর কাছ থেকে? সে পাণ্ডার কাছে সেই যে বড়লোক যার দৌহিত্রের সঙ্গে অমলার বিয়ের সম্বন্ধ হয় তাঁর পাণ্ডার নাম কেন জেনে নাওনি? তাহলে যে তাদের খাতায় সে বড় লোকের নাম ধাম ঠিকানা সব পেতে? তারপরে সেই দেশে গিয়ে আদত খবর জানায় যে কিছুমাত্র বেগ পেতে হত না। নাহয় দৌহিত্রের দেশ খুঁজতে আরও একটু কষ্ট পেতে—তবু কিছুনা কিছু সত্য খবর জানতে পারতেই।"

দ্বিগুন স্তব্ধ রমেনের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে-ছিল না। বহুক্ষণ পরে সে কষ্টে উচ্চারণ করিল।—"এখন আর উপায় আছে কি? এখনো যাব কি, পাব কি অমলার বাবার পাণ্ডাকে খুঁজে?"

"না সে এখন মরে গেছে ব্যাপার আরও জটিল হয়ে গেছে, আর তুমি সে জট ছাড়াতে পারবে না।"

"কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে সে পাণ্ডা মরেছে? তুমি তবে তাকে জেনেছ? অমলার কথাও জান তাহলে তুমি সত্যিই?"

"হাঁ।"

রমেন বহুক্ষণেও আর কথা কহিতে পারে না দেখিয়া রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে আশ্বস্তকরার ভঙ্গীতে আঘাত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল "তোমার মিথ্যা বাধা মনে রেখনা—জেনো অমলার বিয়ে হয়নি। যদিও হলেও সে বিয়েকে আমি বিয়ে বলে মনে করিনা—তবু তুমি জেনে নিশ্চিত হও তার বিয়ে হয়নি, ঠিক্ হয়েও পাত্রের বাপের অমতে সব ভেঙে যায়, অমলার বাপ অপমানিত হয়ে মেয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়—বৃন্দাবনে বুঝি—না? তার পরে সবতো জান মরা।"

রাজেন্দ্র নীরব হইল। কিছুক্ষণ পরে সহসা একটু হাসিয়া রমেনকে ঝাঁকানি দিয়া বলিল এইবার অমলার মনের কথা জানতে আরতো তোমায় বাধা নেই। তোমার

নিজের, কপালে যদি সে জানেনা বলেই তোমার বিশ্বাস থাকে তাও বোঝাতে পারবে—বুঝলে?"

রমেন দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না না এর আমি কিছুই পারব না। যা করবার তুমিই কর।"

[illegible] হাসিয়া উঠিল "বোঝা যাবে একথা পরে। তোমার কিছুই চেষ্টা করে করতে হবে না। আপনি যা হবার হবে, এবং আমার যা জ্ঞাতব্য তাও আশা করি শীগগিরই জানতে পারব।"

ভিখারিণী বালা

(টেনিসন হইতে)

[শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী বি-এ]

নক্সীশোভনা সে ভুজবল্লী
ন্যস্ত তাহার বক্ষে,—
ভিখারিণী বালা রাজার সদনে
দাঁড়াইল আসি নগ্ন-চরণে,
সুষমা ফুটায়ে চাঁপার বরণে
রহিল আনত চক্ষে।

শোভিছে তরুণী ছিন্নবস্ত্রা—
মেঘের আড়ালে ইন্দু!
শান্ত-উজল বিকচ নয়ন,
ঘন-কুন্তল-কৃষ্ণ-বরণ
মাধুরী-উছল অঙ্গ-গঠন
স্ফীত যৌবন-সিন্ধু!

প্রেমের অশোক ফুটিয়া উঠিল
রাজার হৃদয়-কুঞ্জে,
অভিনন্দিতে চলেন রাজন,
"নাহি বিস্ময়" —কহে সভাজন—
'লাজ দেছে আজ বালার বরণ
ঊষার হিরণ-পুঞ্জে।"

স্বরগ-সুষমা মূর্ত্তিময়ী সে
বিধাতার কারুকার্য্য!
সমুখে দাঁড়ায়ে ভিক্ষু-রমণী,
শপথ করিল রাজা সে তখনি,—
"ভিখারিণী আজ হবে রাজরাণী
আমার হৃদয়-রাজ্যে।"

আড়কাঠী

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, এম্ এ]

(১)

সেটা অজন্মার বৎসর—ঘরে ধান নাই—হাতে পয়সা নাই—দুবেলা অন্ন মিলে না, বুদ্ধু একটা কাজের সন্ধানে কলিকাতায় যাইবে মনে করিল। একদিন সে বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু বেলি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না—সে বলে আমিও সঙ্গে যাইব সীতাজী রাম চন্দ্রের সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন আর আমি তোমার সঙ্গে বিদেশে যাইতে পারিব না! একে যুবতী স্ত্রী, তাহাতে আবার পাড়াগেঁয়ে, বুদ্ধুর পাশের লোক বেলিকে নিয়ে কলিকাতায় যাইতে নিষেধ করিল—এদিকে বেলিও নাছোড়-বান্দা।

(২)

এমন সময় চা বাগানের আড়কাটি আসিয়াছে—সে বুদ্ধুকে বলিয়াছে সহরে লইয়া গিয়া ভাল চাকরী করিয়া দিবে, বেলিকেও ভাল কাজ দিবে—মজুরী দিন একটাকা। এদিকে দিন আর যায় না—যুদ্ধ থামিলে জিনিষ পত্রের দর কমিবে এই আশায় ঘটিবাটি বাড়ীঘর বন্ধক দিয়া কোনো প্রকারে এতদিন চালাইয়াছে—খাজনার দায়ে জমি হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে বুদ্ধু ভাবিল লড়াই থামিল, তবু জিনিষের দাম বাড়িল বই কমিল না—সংসার আর কেমন করিয়া চলিবে—তাই অগত্যা সে রাজি হইল। যথারীতি স্বামী স্ত্রীতে 'ফরমে' টিপ্‌সই করিয়া দিল।

(৩)

কলিকাতায় আসিয়াছে—বুদ্ধুকে চা বাগানে চালান দেওয়া হইবে সে বুঝিতে পারিয়াছে—বেলিকে আড়কাটি মাগনলাল নিজের কাছে রাখিয়া দিবে এবং দৈনিক এক টাকা দিবে এরূপ স্থির করিয়াছে স্বামী স্ত্রীর মাথায় বজ্র-পাত। না জানিয়া টিপ সই করিয়াছে এখন আইনের জোরে মাগনলাল সবই করিতে পারে! বেলি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, মাগনলালের পায়ে ধরিয়া কলিকাতায় একটা চাকরীতে বাহাল করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। মাগন একটা গোপন সর্ত্তে অবশেষে রাজি হইল। একটু স্বাধীনতা পাইয়া সুযোগ বুঝিয়া এদিকে সর্ত্ত পূর্ণ হইবার আগেই রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে চম্পট দিল।

(৪)

বুদ্ধু কলিকাতার কাছে এক পাটের কলে কাজ করিত। সেখানে কাজ করিতে করিতে তাহার হাত কাটিয়া যায়, পরে অক্ষম হওয়াতে কল হইতে বিতাড়িত হইয়া বেলিকে লইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কলিকাতায় একটা বস্তিতে একখানি খোলাঘরে উড়িয়া, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি নানাজাতির ছেলে মেয়ে পুরুষে তাহারা ১৭।১৮ জন থাকে। বেলি দারিদ্র্যের দারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পাগল প্রায় হইয়া উঠিয়াছে—সুন্দরী যুবতীর সৎপথে থাকিয়া ভিক্ষা করাও বোধ হয় পাপ! যাহার কাছে ভিক্ষা চায় সকলেই তাহাকে কাজ করিতে উপদেশ দেয়, ঘরের লোকে বুদ্ধুকে ছাড়িয়া দিতে বলে তাহাদের কাছে থাকিলে বেলিকে খাইতে দিবে বলে ভদ্রলোকের কাছে ভিক্ষা চাহিলে অনেকের করুণা তাহার জন্য উথলিয়া উঠে, ঝি থাকিলেও এই দুর্ম্মূল্যের দিনে ত্যাগ স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় ঝি রূপে তাহাকে বাহাল করিতে চায় কিন্তু বুদ্ধুকে না ছাড়িলে কেহই রাজী হয় না।

(৫)

কেন বিধি এ পোড়া রূপ যৌবন দিয়াছিলেন!—দুঃখ দারিদ্র্য মনস্তাপে অনাহারে অনিদ্রায় নানা ব্যাধিতে সুন্দর দেহখানি মলিন ও কদাকার হইয়া গেল। এইবার বিনা সর্ত্তেই কিছু কিছু ভিক্ষা মিলিতে লাগিল সে বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞ হইল—যে যৌবন ভার তাহার আরাধ্য দেবতা স্বামীর সেবার অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল আজ যেন সে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মনে মনে সোয়াস্তি অনুভব করিল।

(৬)

মাগনলাল যখন পাটের কলে 'ওভারসিয়ার' ছিল সেই সময় হইতেই কত পাপ কার্য্য করিয়াছে, কত গরীব কুলির অন্ন মারিয়াছে, কত দরিদ্রা নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হরণ করিয়াছে; বেলির বেলায় সে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই, কত প্রলোভন, কত ভয় দেখাইয়াছে, শেষে বাজী হইয়াও বেলি তাহাকে ঠকাইয়া পালাইয়া গিয়াছে সে রাগ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। খোঁজ পাইলেই আইনের পাঁকে ফেলিয়া একবার নাকানি চুবানি দিবে এই আশায় বসিয়া আছে। তাহার রাগের মাত্রা আরও বেশী কারণ এত বড় শিকার তাহার সুদীর্ঘ পাপ জীবনে একবারও আসে নাই।

(৭)

মাগনলাল এখন কলিকাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়াছে। একদিন ভিক্ষা করিতে করিতে বুদ্ধুকে লইয়া বেলি সেই বাড়িতে উপস্থিত। মাগনের স্ত্রী তাহাদের দুঃখ কাহিনী শুনিয়া সাশ্রু নয়নে তাহাদিগকে কাপড় চোপড় টাকাকড়ি এবং চাল তরকারি দিলেন; মাগন উপর হইতে দেখিল, চিনিতেও পারিল কিন্তু এই স্বর্গীয়দৃশ্যের মাঝখানে স্ত্রীর করুণা পূর্ণ আঁখি দেখিয়া সে মনে মনে লজ্জিত হইল, অন্তর্যামীর কাছে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল নিজের দাম্পত্য জীবন ও বুদ্ধু বেলির কথা তুলনা করিয়া স্ত্রীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। মাগনলালের স্ত্রী স্বামীর এই পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য হইয়া নিজের এত দিনের সাধনা সফল মনে করিলেন এবং ভিখারী দম্পতীকে তাহার কারণ মনে করিয়া তাহাদিগকে মহেশ্বর এবং সতী জ্ঞানে আপন গৃহে স্নেহ ভালবাসায় বাঁধিয়া রাখিলেন।

ডাক-হরকরা

[মতিনউদ্দীন আহ্‌মদ]

১

রোজ এসে চিঠি দিয়ে যাই। জানি না তাতে কি লেখা থাকে—শুধু দিয়ে যাই।—আমি ডাক্ হরকরা।

২

সেদিন চিঠি বিলি করতে বেরিয়েছি—রোজ যেমনি করি তেমনি। একজনকে একখানা চিঠি দিয়ে তার সদর দেউড়ির বাইরে এসে পড়েছি এমন সময় চিঠিতে আনা সুসংবাদের আনন্দলহরী ঘর ছেড়ে বাইরে এসে ছড়িয়ে পড়ল। আমার প্রাণের বীণার তারে তার সুর বেজে উঠল না। আমি ডাক্-হরকরা।

৩

আর একদিন একজনকে একখানা চিঠি দিয়ে ফিরে আসছি—তখন শুনলাম চিঠিতে-আনা দুঃসংবাদে বাড়ীময় কান্নার একটা আকুল সুর বেজে উঠে আমার পাশ দিয়ে, দিশেহারা পথিকের মত কোথায় হারিয়ে গেল। আমার প্রাণের বীণার তারে সেটা বেসুরো বেজে উঠল না।

আমি ডাক-হরকরা।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ]

চাহি শক্তি চাহি ঋদ্ধি হও রক্ত মাংসে বলীয়ান্
লভেনি কখনো কেহ বিনা বলে আত্মার সন্ধান,
বহুবিদ্যা আহরণে প্রবচনে প্রবল মেধায়
মিলিবেনা আত্মশক্তি যোগসূত্রে ন্যায়ের ধাঁধায় !

নিঃস্ব রিক্ত দুর্ব্বলের ত্যাগ-ধর্ম্ম একান্ত দুর্ল্লভ
পলিত গলিতেন্দ্রিয় লভিবে কে সংযম-গৌরব ?
চিত্ত স্থৈর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য বিত্ত ঋদ্ধি সবল যৌবন
ত্যাগ ধর্ম্মে পারে শুধু কবিবারে নিত্যের বরণ।

ত্যজিবার কিছু যার নাহি বিশ্বে সে কেমন বীর ?
বিরাট যাহার বক্ষ সেই পারে অর্পিতে রুধির।
তিতিক্ষা দাক্ষিণ্য দয়া ভিক্ষুকের ধর্ম্ম নহে কভু
ক্ষমাধর্ম্মে অধিকাব নাহি তার যেবা নহে প্রভু।

কে কহে বৈরাগী তারে যেবা রিক্ত দুঃস্থ দীন রোগী ?
ধনী হয়ে মুনি হও ভোগী হয়ে শেষে হও যোগী !
অবিদ্যা করিয়া জয় অপরারে করে অধিগত,
পরাজ্ঞানে অধিকার লভ ভাই শাসন সংযত।

রাজসিক রাজপথে অশ্বরথে উড়াইয়া ধূলি
সত্ত্বতীর্থে কর যাত্রা রথিবর জয়ধ্বজা তুলি'
পরিহরি' ক্লৈব্য দৈন্য হও শূর জীবন সংগ্রামে,
বক্ষে বহি অস্ত্র লেখা রণশ্রান্ত যাও মুক্তি-ধামে।

দেশভক্তি লোকশিক্ষা অভাগ্যের কল্যাণ সাধন
অশক্তের ক্ষীণকণ্ঠে কভু ভাই হয় না শোভন।
অক্ষমের ক্ষমা কিম্বা জীব দুঃখে কারুণ্য মমতা
বন্ধ্যাপুত্র শশশৃঙ্গ সম সে যে অসম্ভব কথা।

বিরাট সঞ্চয় যার তারই চলে বিরাট বর্জ্জন,
ত্যাগ হবে তত বড় যত ভাই করিবে অর্জ্জন।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী ক্লীব জন চির জিতেন্দ্রিয়
নিঃস্বজন অবাসনী তারা কভু নহে বন্দনীয়।

কারাবন্দী দুর্জ্জনের সৌজন্যে খ্যাতি কি সম্ভব?
নাহি ভয় বিষদন্ত ভুজঙ্গের অহিংসা গৌরব।
ভিক্ষায় যারেনা তুখ আঢ্য হয়ে নিঃস্বে কর দান
নেত্র জল নহে বল, ক্ষত্র হয়ে কর আর্ত্তে ত্রাণ।

স হারিয়া বৈশ্রবণে সিদ্ধ নাধি আন মহাধন
মহত্বের ব্রতে বীর সেই ধন কর বিসর্জ্জন।
পরো রাজ চক্রবর্ত্তী রঘুবংস সন্তোষ-প্রযাগে
সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দাও দিগ্বিজয়ী বিশ্বজিৎ যাগে।

কান্তকবি ও তাঁহার কাব্য আলোচনা

[শ্রীশৈলেশচন্দ্র সান্যাল]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় কান্ত কাব্যকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় তল্লিখিত সাধন সঙ্গীত আলোচনা করিব।

(১)

সাধন সঙ্গীত।

রজনী কান্তের সাধন সঙ্গীত গুলি বড় সুন্দর, বড় মধুর, বড় ভাবময়। পাপী তাপীর নীরস নিঠুর প্রাণেও রসের সঞ্চার করে, সাধককেও ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ করে আবার প্রবর্ত্তক-কেও পথ দেখাইয়া দেয়। কান্তের সাধন সঙ্গীত গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি অধিকাংশ সঙ্গীতেই সাকৃ-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সাধনার ক্রম উচ্চতর স্তরে আরোহন করিতে করিতে কবিকে 'দয়াল', 'অরূপ, স্বরূপ,' 'সগুণ, নির্গুণ', 'অন্তহীন, বিরাট' 'অচ্যুত অজয়' ভাবেও আরাধনা করিয়াছেন। আবার এত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াও যখন তৃপ্তি পান নাই—এত ভাবে ডাকিয়াও যখন প্রাণের পিপাসা মিটে নাই তখন বিশেষণে (attributive) স্বকীয় দৈন্য দেখাইয়া বলিলেন কি জানি ঠাকুর, 'আমি কি বুঝি, আমি কেন ভেবে মরি' তুমি যাহাই হও—সগুণই হও আর নির্গুণই হও—দয়ালই হও আর ভয়ালই হও, আমি

তাই ব'লে ডাকি প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়
যখন যেরূপে প্রাণ ভ'রে যায়
তাই দেখি প্রাণ ভরি'হে।

দিনি যত বড় সাধকই হউন না কেন আন্তরিকতা

না থাকিলে কেহই সফলকাম হইতে পারেন না। আন্তরিকতা অভাবে আত্মবিশ্বাস জন্মিতে পারে না। তাই কান্ত কবি—আমাদের সাধক কবি—গাহিলেন

"কেন বঞ্চিত হব চরণে?"

আপামর সাধারণ সবাই যে খেয়া 'পার' হইল—আমি এ অধম—আমি যে কত-আশা-ক'রে ব'সে আছি'—আমি কি জীবনে মরণে ও তোমায় পাইব না? এইখানে ভক্ত ভগবানে একটা সুন্দর অভিমানের অভিনয় দেখিলাম; আবার পরমুহূর্তেই সে অভিমানের ভাব অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থানে অকপটে দৈন্য আসিল—কবি ব্যাকুল প্রাণে ডাকিলেন:—

'যদি জাগিতেছ, প্রভু, দেখিতেছ;—

তবে ল'য়ে চল আলো বিতরিয়া'—প্রভু, তোমারই লক্ষ্য করিয়া গৃহ ছাড়িলাম কিন্তু কে যেন আমায় কণ্টক বনে টানিয়া লইয়া 'আমার পাথেয়'—আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল:—হায় প্রভু—তুমি ত আমারই "শিয়রে র'বে"—তবে আমায় আলো বিতরণে পথ প্রদর্শন কর। ভক্ত ভগবানের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই এই মহামন্ত্রের দ্রষ্টা, এই মহা বাণীর প্রচারক। "ভগবান ভক্তবৎসল" এই বিশ্বাস ভারত বাসীর অস্থিমজ্জাগত। শ্রুতিস্মৃতির সারভূত পবিত্র পুরাণের পবিত্র শিক্ষায় অনুপ্রাণিত—হৃদয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি—ভারত বাসীকে এই অমৃত বিশ্বাসের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। এই অমৃতময় বিশ্বাস হইতে শুদ্ধ প্রেম 'উপজিল' এবং প্রেমভরে কবির প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল—কবি গাহিলেন:—

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে,
কঠিনে মেশে না সে, মেশেরে তরল হ'লে।'

আবার অন্যত্র—

'ব'য়ে যাক হরি প্রেমের বন্যা (এই) শুষ্ক হৃদয় মাঝে
ডুবাও রমণী পুত্র কন্যা অভিমান ধন লাজ।'

সে প্রেমের আবার বিশেষত্ব আছে.—

"সে প্রেমের স্রোতে আপনা হারায়ে গোরা
বলে' হরিবোল হে।
সে সাথে তেয়াগি, ভুজাক্ত বাড়ায়ে পাতকীরে
দিল কোল হে॥

যে প্রেমে প্রহ্লাদ বাঁচে বিষপানে শিলা সহ
ভাসে জলে হে।
পোড়ে না অনলে, মরে না পাষাণে, বাঁচে
করি-পদতলে' হে॥

বাসনা বিজড়িত সংসার। তাই এতভাবে প্রেমভিক্ষা করিয়াও যখন বাসনার কুণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলেন না পরন্তু 'লক্ষ্যশূন্য লক্ষ্যবাসনা'র সাগরে নিমজ্জমান রহিলেন তখন কবি 'তোমারি' রূপে নবীন সাধকের কণ্ঠ হইতে বলাইলেন:—

আমিও তোমারি গো, তোমারই সকলই ত
জানিয়ে জানে না এ মোহ হতচিত
আমারি ব'লে কেন ভ্রান্তি হ'ল হেন
ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।

স্বার্থ সিন্ধুর ভীষণ গর্জ্জনে 'মোহান্ধ' হইয়া 'কার ভয়ে যেন মানব 'আপনাকে বিলাইয়া দেয়'। তখন সে ভগবানের মঙ্গল হস্তের 'আশীষ কুসুম' শিরে ধারণ না করিয়া গর্ব্বভরে ও তাচ্ছীল্য সহকারে পদতলে দলিত করে এবং ভগবানের সমুদয় শাসন তুচ্ছ করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তখন ও কিন্তু ভগবানের আশীষ তাহার উপর সমভাবেই বর্ষিত হইতে থাকে—তখনও সেই পুরুষের

'নাহি ঘৃণা নাহি রোষ,
নাহি হিংসা অসন্তোষ
শুধু দয়া শুধু ক্ষমা'

তখন কিন্তু মানব তাহার আপনার ভুল বুঝিতে পারে ও মরমে বলিয়া থাকে

"কোন্ লাজে দিব পায়, এ হৃদি কি দেওয়া যায়!"

যাহারা এই 'স্থূলদেহ পরিণাম' বুঝিয়াছে 'বিলাস বিমুখ' হইয়াছে—যাহারা সরল ব্যাকুল প্রাণে কেবলি 'তোমারে'. চাহিয়াছে—সুখ দুখে সমভাবে তোমারই মহিমা গাহিয়াছে সেই সাধকদল 'বিচারের দিনে' (day of judgment তোমার পদতলে তাহাদের প্রাণ রাখিয়া তোমার আরতি করিবে। কিন্তু হে বিশ্বপতি আমি যে 'আজন্ম পাপলিপ্ত' আমি যে

"করিনি তোমার আজ্ঞাপালন
মানিনি তোমার মঙ্গল শাসন"—আমি যে

সব হারাইয়া প্রভু, হয়েছি ভিখারী দীন
তোমারে ভুলিয়া, হায়, নিরানন্দ কি মলিন—

আমার গতি সে দিন কি হইবে? সারাদিন ছেলে খেলায় বিভোর হইয়া জীবনের সন্ধ্যাকালে মানব মনে এ অনুশোচন স্বাভাবিক। এই অনুশোচনার ফলে সে তখন বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বিচার করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না—

বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা—বিচারে মানব কখনই শেষ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারে না। তারপর 'ভক্ত হৃদয়' যখন জগতের যাবতীয় বস্তু সমষ্টির মধ্যে তাঁহারই "স্বপ্রকাশ" উপলব্ধি করিয়া "তুমি অনীয়ান—তুমি মহীয়ান" বলিয়া তাঁহাকে জগৎ সম্বন্ধে প্রচার করিতে থাকে—ভক্ত হৃদয় যখন

"কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্বমাঝারে
মত্ত এ চিত্ত তবু তর্ক বিচারে—"

বলিয়া মানবকে বৃথা 'বাগ্‌-বিতণ্ডা' করিতে নিষেধ করে ও প্রেমময়ের যথার্থ প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলে যে তাঁহারই

প্রেমে এক হৃদয়
আর হৃদে পড়ে লুটিয়া—

তখন ভক্ত হৃদয়ের এই পুণ্যপরশে তাহার চিত্ত সরস হইয়া উঠে—প্রেম অরুণের এই হেম কিরণে তাহার হৃদয় সমুজ্জল হইয়া তাহার শোককালিমা ঘুচাইয়া দেয় ও তখন সে বলিতে থাকে যে আমি

দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

এই একান্ত নির্ভরতার ফলে সে নবীনত্ব লাভ করে—তখন তাহার ভিতরে ভগবদ্দর্শনের এমন একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জাগিয়া উঠে যে সে তাহার জীবনের সেই চিরব্যাপী 'মহাভুল' ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করে:—কই হরি আমি ত তোমাকে পাই না'—যদিও বিশ্বদৃশ্য মত অস্তি প্রচারে—যদিও তোমার 'অস্তি-বিষয়ে' 'দ্বিধাহীন অনুভূতি' আমার স্তম্ভিত চিত্ত আধারে জ্যোতি দেখাইয়া নবজীবন লাভ করাইয়াছে তথাপি এ ভাবে আর কত দিন কাটাইব—'শ্রান্ত পথের পাশে আমার নয়ন মুদিয়া আসে—মৃত্যুর ছায়া আমার অনুসরণ করিয়াছে তাই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে একবার তোমাকে দেখিয়া যাইব—অন্ততঃ একবার তোমাকে "হেরিতে চাহি চ'খে, একবার তোমার স্বর" শুনিতে চাহি কাণে"। তখন আবার তাহার মনে হয় যে না এ বন্দনা গান ত বহুবার শুনিয়াছি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতেই ত তোমার স্বরূপ দেখিয়াছি—

"ও পথে যেয়ো না ফিরে এস' ব'লে
কাণে কাণে কত কয়েছ—

কিন্তু তবুও আমি 'বধির'—তবুও আমি "হৃদয়হীন' তবুও আমি 'পাপ পবন বিচঞ্চল' !!

তাই এবার আমি তোমার—

"কর পরশ চাহি যেন তুমি স্থূল।"—

সাধনার এই উচ্চতম শিখরে আরোহন করিতে সাধারণ মানব পারে না—ইহা জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফল।

প্রতি মানব জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন স্ত্রীর আদর যত্ন পুত্র কন্যার সেবা শুশ্রূষা ও আত্মীয় স্বজনের সরল সদাহাস্য মুখ পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহার আনন্দ ও শান্তি বিধান করিতে পারে না—সে তখন এই নিজহাতে গড়া কারাগৃহের দূষিত ও পূতিগন্ধময় কক্ষ ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সংসারে সর্ব্বত্রই সে তখন দুঃখ, কষ্ট, জরা ব্যাধি দেখিতে পায়—তখন সে মনে করে

"এ পারে সবই ব্যথা আঁধার শোক"—

তখন সে মনে করে যে এখানে কেবলই

"হৃদয়ে বহ্নি জ্বালা, নয়নে অন্ধতম"
"কেন পাই শুধু স্বার্থ নির্ম্মম নিঠুর গ্লানি
"হীন স্বার্থময় ধরা শুধু নিঠুরতা ভরা
শুধু প্রবঞ্চনা, অবিচার।"

ঠিক এই ভাবের উক্তিই একদিন ইংরাজ কবি Mathew Aruold এর মুখে শুনিয়াছিলাম। অবশ্য

বিপর্যায়ে মানব জীবনে এই pessimistic view ঘটিতে দেখা যায়—ইহা স্বাভাবিক।

আর একটা সুর কান্তকাব্যে বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে—সেটা ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া। হে অচিন্তনীয় মহাপুরুষ! দুঃখ কষ্টের মধ্যেই ও মোহ মুগ্ধ করিয়াই যদি রাখিবে তবে মানবকে সৃজন করিলে কেন? জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, স্নেহ, করুণা, স্বাস্থ্য, বন্ধু পরিজন' সকলই ত তাহাকে দিয়াছ তবে তাহাকে 'অন্ধকার চিরমরণ সিন্ধু নীরে' ডুবাইয়া রাখিলে কেন? তোমার স্বহস্ত সৃজিত একটী জীবন ব্যর্থ করিয়া দিলে কি তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে?—ঠিক এই কথাটাই দুঃখ কষ্ট প্রপীড়িত হইয়া Job ও একদিন বলিয়াছিল। Job যাহাকে "Land of darnkess' বলিয়াছেন—আমাদের কান্ত কবি তাহাকেই 'অন্ধকার চিরমরণ সিন্ধুনীর' বলিয়াছেন।

কান্তকবি শান্ত মাতৃমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। তাই বলিয়া তিনি যে শুধু জননীকে—স্বকীয়া আরাধ্যকে শান্ত মূর্ত্তিতেই দেখিতে পারিতেন তাহা নহে। অনন্ত মূর্ত্তিরও তাঁহার সম্যক্ ধারণা ছিল। যে 'চিরকারণ সিন্ধুর শক্তি বিন্দু' ঘূর্ণ্যমান মহাবিমানে অবস্থান করিতেছেন তাহাও সৃষ্টির বিশালতায়" ও সূক্ষ্মতায় বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। আবার ভগবানকে অনন্তের সীমায় ফেলিয়া শুধু সান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—পৃথক ভাষায় তাঁহাকে দুরধিগম্যও বলিয়াছেন। যথা—

"সে কি তোমার মত আমার মত রামার মত শ্যামারমত ডালাকুলো ধামার মত যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে।"

কিম্বা—

যদিও তোর ভারি পক্ক মাথা
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা
চন্দ্রালোকের যাবার রাস্তা
করেছিস প্রশস্ত;

তথাপি তাহার

শ্রুতি স্মৃতি বেদমন্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ন্যায় তন্ত্র,
বিজ্ঞান পায়ে না কভু করিতে সংশয়োচ্ছেদ।

'বিশ্ব রচনা'র অতুলনীয় কল্পনা কান্ত কবির নাম চির অমর করিয়া রাখিয়াছে। সূক্ষ্ম তুলি দিয়া দুই চারিটী রেখা টানিয়া দক্ষ চিত্রকর অতি অল্পেই যেমন এক বিরাট দৃশ্যের অবতারনা করেন,

শিল্পী কবিও তেমনি ভাব তুলিকায় ও শব্দ চিত্রে অতি সামান্য আয়াসে সে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিরূপে বিরাট বিশ্ব মহাশূন্যে বিরাজ করিল—কিরূপে ভগবানের মহালোক সিন্ধু ভাণ্ডার হইতে এক বিন্দু আলোক পাইয়া এই অন্ধকার বিশ্ব আলোক মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ স্রোত মাঝে সন্তরণ দিতে লাগিল, কিরূপে ভগবানের অক্ষয় তুলিকা-রঞ্জিতা প্রকৃতি দেবী নিত্য নব নব শোভা রাশির মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন তাহার বিশদ বিবরণ এই যুগে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর সর্ব্ব-শক্তিমানের এত অসীম ক্ষমতার ও কৃপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনার পরিশেষে সেই দৈন্য—সেই তুচ্ছতা—সেই দাস ভাবে উপাসনার জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি :—

তুমি কি মহান্, বিভু, আমি কি মলিন, ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিল বিন্দু, তুমি যে সুধা-সমুদ্র!
তবু তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস,
তাই এত অযোগ্যের লাজ।

এই "পঙ্কিল সলিল বিন্দু" কে ইংরাজ কবিরা "Man is but dust" ও "A heap of dust" বলিয়াছেন।—যদিও তাহাদের নিকট উহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কবি বিরাট মূর্ত্তির অন্তরালে বিশ্বের অনন্ত প্রকৃতিগত প্রাণচ্ছবিরও সুন্দর ও মধুময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন

তুমি সুন্দর, তাই তোমারই বিশ্ব সুন্দর শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন প্রভাময়।

এই ভাবটাকে আরও পরিস্ফুট করিতে গিয়া বলিলেন—

আছ অনল অনিলে, চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
শশি তারকায় তপনে।

এখানে সেই ইংরাজী কবিতাটী আমাদের মনে পড়ে

"wherever we turn thy glories shine
And all things fair and bright are thine"

কিন্তু তাঁহাব অবস্থিতিকে এ ভাবে মানব সন্নিকটে নিবেদন কবিয়াও যেন তৃপ্তি পাইলেন না—শেষে মানবকে চির সান্নিধ্য হইতে চির সংযোগে আনিলেন বহু হইতে একে পর্য্যবসান করিয়া বলিলেন :—

"ঐ এক হ'তে আসে ভিন্ন আকাশে
মেশে গিয়ে এক পারাবারে।"

তারপর ভগবানের এই সৃষ্ট রাজ্যের প্রারম্ভ হইতেই যে তাহার মধ্যে একটা চির শৃঙ্খলা বহিয়া গিয়াছে তাহাব বিশদ বর্ণনও কান্ত কবির বিশেষত্ব। সেই 'সুরু থেকে সূয্যি ঠাকুর পূবে উদয় হন'—আবার প্রতি দিন 'সাঞ্জো বেলা তাঁহাকে "যেতে হয় পশ্চিমে ডুবে"—সেই সুরু থেকেই 'ধ্রুবতারা উত্তরে স্থির হ'য়ে ব'সে আছেন'—আকাশে ঢিল মারিলে এই পৃথিবী বুক পাতিয়া লইবেন। —সেই সুরু থেকে আগুণ গরম সাগর জল লোণ', আবার রূপো সাদা, লোহা কালো হলুদ রং সোণা—আবার আমের গাছে কোন ও দিন ধান ফলিতে দেখা যায় না—যাইবেও না—অমাবস্যায় কেহ কোন দিন চাঁদ দেখে নাই—দেখিবেও না। যাহা সত্য—তাহাই চিরন্তন বহিয়া যায়—অসত্যের স্থান এ রাজত্বে নাই।

"যা ছিল না হয় না, তা আর, যা আছে তাই আছে।"

আবার "বায়ু কেন শব্দ বহে অনল শিখা কেন দহে
চুম্বক কেন লোহ টানে টানেনা মণি মাণিকে
ইক্ষু কেন সুরশ এত, নিমটে কেন এত তেতো"

এ সকল "কেন"র উত্তর দিতে বৈজ্ঞানিক অক্ষম ; আজীবন এই সৃষ্টি-রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াসও বৃথা হইবে—এ সব

"কেন'র 'কেন' তত্ত্ব কেন

নিখিল 'কেন'রামূল কারণে,"—মিলিবে,—তার পূর্ব্বে নয়। ভগবানকে পাইলে সেইদিন এ রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

তৎপরে এই সাধন সঙ্গীত ক্ষেত্রে আর দুইটী বিষয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—প্রথমটি তাঁহার শিশুসুলভ আব্দার ; দ্বিতীয়—অপূর্ব্ব জাতীয়তা। যে জননীর বুকের নিকট যে পরিমাণ অগ্রসর হইতে পারিয়াছে সে সেই পরিমাণে তাঁহার নিকট আব্দার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে আজ দেড় শত বৎসরের কথা হইল একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল —তিনি আমাদের ভক্ত, ভাবুক, সিদ্ধ সাধক কবি শ্রীরাম-প্রসাদ। এই রামপ্রসাদ মাতৃমূর্ত্তির প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ উপাসক। এক্ষণে কান্তের সাধন সঙ্গীত গুলি উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম রামপ্রসাদকে বুঝিতে হইবে। কারণ এ বিষয়ে কান্ত প্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে যদি কেহ কান্তকে অন্ধ অনুকরণ-প্রিয় বুঝিয়া থাকেন তবে তিনি ভ্রান্ত। কেননা বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা দৃপ্ত বঙ্গবাসী যদি জাতীয়তার ভাব বিসর্জ্জন না দিয়া উহার দৃঢ় সংরক্ষণে সচেষ্ট হন তবে দোষ কোথায়? আর সেই জাতীয়তা রক্ষা করিতে গিয়া যদি কান্ত কবি তাঁহার দেশের একজন সিদ্ধ ভাবুকের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি ঘৃণার পাত্র নহেন—পূজার পাত্র। জাতীয়তা বলিয়া যদি কিছু গৌরব করিতে হয় তবে প্রসাদের মাতৃনাম-মন্ত্রের জীবন্ত শক্তি লইয়া কর, মায়ের করুণাময়ী—দয়ার অবতার রূপিণী সাকারা প্রতিমা লইয়া কর—, যেখানে অযাচিত দয়া, আশাতীত ক্ষমা ও বুক-ভরা ভালবাসার নিত্য আদান প্রদান হইয়া থাকে,—যে সাধনায় পতনের ভয় নাই —যে সাধনার পথ সুগম, যে সাধনায় আশু প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হয় তাহাই কর। যুগে যুগে বাঙ্গালী গৌরব করিতে পারিবে যে রামপ্রসাদ তাহাদেরই মধ্যে এক জন।—আর কান্ত কবি তাঁহার অনুবর্ত্তক বলিয়া পুরাতনকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন বলিয়া—তিনিও আমাদের সমান সম্মান ও পূজার সামগ্রী।

প্রসাদ একদিন গাহিয়াছিলেন "আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মত, তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন"—সেই সুরই কান্তের গীতিতে পাইলাম

'আমি চাহিনা ওরূপ, মুক্তিকায় স্তূপ আমার মায়ের
কভু ও মুরতি নয়।'

প্রসাদ মাতৃনামে মাতোয়ারা—বিহ্বল ও উন্মত্ত। মায়ের অনশনে হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন; তারপর অন্তর্দাহের দারুণ পীড়নে কাঁদিয়া হৃদয়ের গুরুভারকে লঘু করিলেন এবং অবশেষে প্রাপ্তি-আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বড় কাতরে, বড় আব্দারে বলিলেন,

'মা এবার তোমায় খাব।'—তোমায় খাইলে আমার মজ্জাতে মজ্জাতে শিরাতে শিরাতে এমন কি প্রতি স্নায়ুতে স্নায়ুতে পর্য্যন্ত তুমি মিশিয়া যাইবে—তখন তুমি আমার অন্তর্দৃষ্টির অন্তরাল হইতে পারিবে না। আর কান্ত আমাদের নবীন সাধক—মায়ের নামে শুধু একটা দিব্য তড়িৎপ্রবাহের সঞ্চার করে মাত্র;—উন্মত্ততা আসে নাই তাই তিনি প্রসাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া বলিলেন

"মা আমায় পাগল করবি কবে?"

সাধনা না করিলে প্রসাদের মত একেবারে খাইয়া ফেলিবার শক্তি যে তাঁহার আসিবে না।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর মানবের প্রথম বাক্যস্ফুরণ হয় 'মা' নাম লইয়া। এই মা বর—তাহাকে কেহ বলিয়া দেয় না—ইহা তাহাকে শিখাইতে হয় না—ইহা তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ হইতে আপনি ধ্বনিত হয়; "তখন শিশু নামের নেশায় মাকে 'মা' বলিয়া ডাকে।" তাহার ক্রন্দনের প্রারম্ভে এই মা—সমুদয় অভাব অভিযোগের মূলে এই মা; তারপর, অবসাদের অবসানে শান্তির সুবিমল ক্রোড়ে এই মা। এই একান্ত নির্ভরশীল শিশু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাকে ক্রমশঃই এত আপনার করিয়া লয়—যে পরিশেষে মা ভিন্ন সে জগতে আর কাহারও নিকট তেমন শান্তি পায় না। শেষে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে একদিন সে বুঝিতে পারে যে মা তাহার বক্ষরক্ত কতখানি নিঙড়াইয়া তাহার সেই দুর্ব্বল শিশুদেহকে সবল করিয়া তুলিয়াছেন। এইভাবে সে প্রতিমুহূর্ত্তে মায়ের সত্তা অনুভব করিয়া থাকে। ঠিক এইভাবে কান্তও একদিন দেখিলেন যে তাঁহার সমুদয় অভাব অভিযোগ দূর করিতে,—অশান্তির দারুণ দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে মা তাঁহার 'স্নেহবিহ্বল' প্রাণ ও "করুণা-ছল-ছল আঁখি" লইয়া তাঁহারই শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন শৈশবকালের সেই করুণস্মৃতি তাঁহার মানসপটে একে একে সকলই জাগিয়া উঠিল—সেই 'গভীর যন্ত্রণার অবসানে মধুর সান্ত্বনা, ব্যথিত মস্তকে অবিরাম সেই স্নেহকাতর চুম্বন—চরণধূলির সঙ্গে সেই আশীর্ব্বাদ' একে একে সব কথা তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল—এই আলোকে তাঁহার সুপ্ত হৃদয় জাগিয়া উঠিল—নিরাশ্রয় শিশুর অসীম নির্ভরতা আবার প্রার্থনা করিয়া জননীদেবীকে প্রণাম করিয়া 'তাঁহার পদে অচলা মতি' মাগিলেন।

তারপর শিশুর ক্রীড়া ও মায়ের অভিমান। সারা-দিন ব্যাপিয়া খেলায় মত্ত রহিয়া মার কথা একেবারে ভুলিয়া গেল—মা এই খেলার মাঝখানে মার কথা মনে করাইয়া দিতে আসিলেন—যখন তিনি বড় আশা বুকে লইয়া "আয়রে পিয়াই বাছা পিপাসিত" বলিয়া দুবাহু সাদরে বাড়াইয়া শিশুকে তাহার শ্রান্তবক্ষখানিকে জুড়াইতে ডাকিলেন তখন শিশু মায়ের আহ্বান শুনিয়াও কোন উত্তর দিল না। মায়ের অভিমান হইল—মা অভিমান ভরে চলিয়া গেলেন। তারপর যখন নিশার অন্ধকার ধরণীর বক্ষ ছাইয়া ফেলিল—যখন তাহার খেলার সাথীরা তাহার দিকে না তাকাইয়া সকলেই আপন আপন পথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল—তখন সে আর পথ পাইল না; কাতরে ও অনুতপ্তপ্রাণে মায়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল—

কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ না মা ধুলা কাদা মেখেছি বলে'।

সেই ডাকে মায়ের প্রাণ গলিয়া গেল—মা তাঁহার সমস্ত অভিমানের বোঝা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বার বার মুখচুম্বন করিলেন। শিশু তখন—

"কত কাঁটা ফুটেছে পায় কত আঘাত লেগেছে গায়,
কত প'ড়ে গেছি গেছে সবে চরণে দ'লে"—বলিয়া তাহার দিনের দুঃখ কষ্টের বোঝা মায়ের বুকে নামাইয়া দিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত শিশু আপনার কথা বলিতে

বিভোর ছিল—তারপর যখন দেখিল যে সে মায়ের ক্রোড়ে—তখন বলিল—

"ওমা, এই ত নিয়েছ কোলে।—"

মায়ে ছেলের এই অভিমানের দ্বন্দ্বে মা হারিয়া গেলেন—পুত্র জিতিলেন।—মায়ের কোলে পুত্র আনন্দে করতালি দিল। কি সুন্দর এ দৃশ্য। দৈনন্দিন জীবনে মাতাপুত্রের এই সত্য ছবি কান্তকাব্যে পাই বলিয়াই ত তিনি আমাদের এত আদরের। এই চিত্র তাঁহার আত্ম-জীবনের প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? প্রাণ ভরিয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিলে যে চিরকাল মা তারই হার হয় তাহা কাঙ্গাল হরিনাথেও পাই—সেখানকার সে স্বরও বড় সরল—বড় মর্ম্মগ্রাহী।—

"যদি ডাকের মত পারিতাম ডাক্‌তে
তবে কি আর এমন ক'রে লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে।"

হাস্যরসে কান্তের বিশেষ অধিকার ছিল। এই হাস্যরস তাঁহার সাধন সঙ্গীতে বেশ একটু আধিপত্য দেখাইয়াছে। একপ্রকার—'হৃদয় কম্পনের সলজ্জ হাসি'—অন্যপ্রকার 'মনোহরণের মধুর হাসি।' কান্ত যখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন

ভোর ভিতর মলিন, বাইরে টিকি, মালার খুঁপে
তিলক ফোঁটা।"

—কান্ত যেদিন

"তুই নাম ক'রেছিস ভারি জবর
ক'টা তারার রাখিস্ খবর,
তুই আবার ভারি পণ্ডিত খেতাব দীর্ঘপ্রস্থ—"

বলিয়া বৃথা গর্ব্বান্বিত ব্যক্তিদের শাসাইলেন এবং উপরন্তু যেদিন "যমের বাড়ী থেকে লালপেয়াদার" আগমন বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিবেন সেদিন

'ভাব্‌তে প্রাণ শিউরে'...উঠিল ও
'শিরায় উষ্ণ শোণিত'...বহিতে লাগিল

—যেদিন ভণ্ড, প্রবঞ্চক ও লম্পট সলজ্জ হাসি হাসিয়া মরমে মরিয়া বলিতে লাগিল ;—

"আকাশ জুড়ে, মেঘ করেছে দেখ্‌লাম দূরে,
কি বুঝে ধ'রলাম পাড়ি
এখন ঝড় এল মন, ভেবে অকূলে।"

ক্রমশঃ

ভাষার প্রাণ

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ]

"টেবিলিল সূত্রধর, কাপড়িল তাঁতী" বলিয়া মাইকেলের ভাষার সমালোচনা হইয়াছিল। এই মহাকবির কাব্য-সমালোচনায় "ছুছুন্দরী বধ কাব্যের প্রথম সর্গে"র আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে "ছুছুন্দরী বধের" নাম পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায়। বর্ত্তমান কালে মাইকেলের ভাষা সর্ব্বত্র সমাদৃত। মেঘনাদবধ কাব্য তাঁহার এবং বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি। এ কাব্যের কবি অমর—যতদিন বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন মাইকেলের মেঘনাদবধ থাকিবে। মেঘনাদের সহিত ছুছুন্দরীর তুলনা করিবার স্পর্দ্ধা এক্ষণে কোন সাহিত্যিকের নাই। নিন্দাবাদের দ্বারা খাঁটি জিনিসের মর্য্যাদা কমে না, বরং বাড়ে। বিজ্ঞাপনের বলে পিতলকে পিতল-কাঁসার কাটতি হয় বটে, কিন্তু

খাঁটি সোনার জন্ত বিজ্ঞাপন অনাবশ্যক। নিন্দাবাদ, তাহার পক্ষে বিজ্ঞাপন। খাঁটি ও নকলে কি প্রভেদ তাহা একবার বুঝিতে পারিলে কে আর নকল চাই? বঙ্গভাষা বা বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে সকল মহাত্মা পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মাইকেলের স্থান অতি উচ্চে; কারণ তিনি লোক-মতের অনুবর্ত্তন না করিয়াই বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি কামনায় বুক বাঁধিয়া একটা অপরিচিত অভিনব প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গভাষায় মাইকেলী ছন্দ ও মাইকেলী প্রণালী বাদ দিলে বঙ্গভাষা যে কতখানি পঙ্গু হইয়া পড়ে, বাঙ্গালার নাট্যশালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার প্রতীতি জন্মিবে।

মাইকেলের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ দুইটা; পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ হইতে অবাধে নাম ধাতুর সৃষ্টি। তাঁহার আরও একটী বিশেষত্ব এই যে তিনি বহু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের প্রাণ-দান করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্যের আসরে নামাইয়াছেন। এই শেষটী প্রণালীই আমাদের ভাষার পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ও অপরিহার্য্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা নাম-ধাতু আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে নূতন নহে, বরং মিত্রাক্ষর ছন্দ ও নাম-ধাতু বর্জ্জনের বয়স গণিয়া বলা যায়। সাহিত্যিক কল্পনার সহায়তার জন্য, সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টির জন্য সেই সাহিত্যের সাধন-ভূত ভাষাটা এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, যে সেই ভাষার সাহায্যে যেন সহজে ও সুচারুরূপে সর্ব্বপ্রকার মনোভাবের আদান-প্রদান সম্ভব পর হয়। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের যে সকল সম্পত্তি আছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের যেরূপ প্রয়োজনীয়, নূতন নূতন সম্পত্তি সংগ্রহেরও সেইরূপ প্রয়োজন। সংস্কৃত কোষের প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ সমূহ আমাদেরই সম্পত্তি, ব্যবহারের অভাবে যদি আমাদের সেই সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সে লোকসান আমাদেরই হইবে। আমরা অন্যের নূতন শব্দকে বিলাইয়া দিয়া যদি দোরে দোরে ভিক্ষা করিয়া ফিরি তবে সে দোষ কার? যেটা নিজের সেইটাকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করিবার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ যেখানে যেখানে বিচরণ করে, সকল স্থান হইতেই যেটা সুন্দর সেইটী আনিয়া, পৃথিবীর মধ্যে যেটাকে সে আপনার বলিয়া মনে করে সেইটার শোভাবৃদ্ধির জন্য, ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি যত বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছে তাহার গৃহে তত বৈদেশিক বস্তু জগতের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, আমাদের যেটা সাধারণ সম্পত্তি তাহার যে অংশ নষ্ট প্রায় হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধারে যিনি সচেষ্ট, তিনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিক অবজ্ঞা ও তিরস্কারের ভাজন হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে আত্মঘাতী উন্মত্ততার প্রকাশ পায় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শিশু যখন ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মারামারি, লাফালাফি চেঁচামেচি করে, তখন সে পরিচয় দেয় যে তাহার জীবন আছে। জীবন চোখে দেখা যায় না, শরীরটাই দৃষ্টিগোচর হয়। সেই শরীরের মধ্যে কোথায় যে জীবন। তাহা যদিও দেখা যায় না, তথাপি জীবনের আধার শরীরের কার্য্যকলাপ ও স্পন্দনাদি দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এই শরীরটার মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব আছে। আবার শরীরের স্পন্দনাদি ক্রিয়া যত বেশী দেখিতে পাই ততই আমরা জীবনের সত্তার পরিচয় পাই। সুষুপ্ত, অর্দ্ধনিদ্রিত বা জাগরিতের মধ্যে আমরা যেমন প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারি, জীবিত ও গতাসুর মধ্যেও সেই প্রকার আমরা বিভিন্নতা বুঝিতে পারি। এইরূপে আমরা সমস্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডটাকে একটা বিশ্বরূপ বা বিশ্বকায় বলিয়া কল্পনা করিয়া ইহার মধ্যে প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপ, নড়ন-চড়ন ও কলরব প্রভৃতি হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সেই সূক্ষ্ম নিরাকার চৈতন্য স্বরূপের সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করি, চোখে দেখি না। যখন আমরা দেখি যে শিশু গলদ্ গলদ্ বকিয়া সকলকে বিরক্ত করে তখন আমরা বুঝি যে সে ভাষা শিক্ষার জন্য সচেষ্ট। পাখী যখন মুখ খুলিয়া হাঁ করিয়া গান করে তখন তাহার কথা বলা বা ভাষার পরিচয় পাই। তোতা পাখী সত্য সত্যই কথা বলে। ইহা ছাড়া শৃগাল কুকুর বা ইতর প্রাণীর

কলরবের মধ্যেও ভাষা সৃষ্টির কার্য্য আত্মপ্রকাশ করে। যে বক্তার বক্তৃতা শ্রুতিগোচর করিয়া, বা যে কুশীলবের অভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া সুখ্যাতি করে, তাহার নিকট যথেষ্ট ভাষা আছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন যিনি, তিনিই প্রকৃত অভিনেতা। কিন্তু ভাষার জীবন কোথায়? কি অবস্থায় আমরা ভাষাকে সজীব ও কিরূপ অবস্থায় নির্জীব বলি? যদিও আমরা রসনা স্পন্দনে করিয়া কথা বলি ও কর্ণের সাহায্যে তাহা শ্রবণ করি তথাপি রসনা বা শ্রবণেন্দ্রিয়ে ভাষার প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করি না। আমাদের রসনা বা কণ্ঠে যদিও বাগদেবীর আসন কামনা করি তথাপি রসনা বা কণ্ঠ আমাদের ইন্দ্রিয় মাত্র। এই ইন্দ্রিয় আমাদের কাজ কর্ম্ম করিবার পক্ষে সহায়ভূত হইলেও তাহা কেবল সহায় মাত্র। আমাদের মন বা অন্তরিন্দ্রিয় যাহা করিতে বলে বহিরিন্দ্রিয় তাহাই করে। যে ব্যক্তির জিহ্বা অসংবদ্ধ প্রলাপ বকে তাহাকে আমরা উন্মত্ত বলি। তাহার জিহ্বাকে উন্মত্ত বলি না। মানসিক কার্য্যকলাপ ও মানসিক চিন্তাশক্তির বাহ্য অভিব্যক্তি হয় ভাষা দ্বারা। ভাষার স্রষ্টা বা কর্ত্তা বাগিন্দ্রিয় নহে, অন্তরিন্দ্রিয়। নতুবা ধ্বনিপরিচালক-যন্ত্র গ্রামোফোনেরও জীবন কল্পনা করিতে হয়।

অন্তরিন্দ্রিয়ের চিন্তাশক্তির বাহিরে সাড়া দেয় ভাষা। ভাষা বাহিরের জিনিস। কিন্তু ইহার প্রাণ মনুষ্যের চিন্তাশক্তি। ভাষা জাতীয় চিন্তার ছায়া মাত্র। যে জাতি যেরূপ চিন্তাশক্তির অনুশীলন করে সে জাতির ভাষা সেই চিন্তার অনুরূপ, সমুন্নত বা অবনত। আমাদের বাগিন্দ্রিয় ছাড়াও ভাষার অভিব্যক্তির আর একটা সাধন আছে—সেটা আমাদের লেখনী। আমাদের লেখনীই প্রকৃত বাগিন্দ্রিয় স্থানীয়। কারণ ইহার সাহায্য ব্যতীত ভাষা অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সীমা ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। আবার ভাষা যেমন জাতীয় সম্পত্তি, সাহিত্য তেমনই ভাষার সম্পত্তি। সাহিত্যের সমৃদ্ধি না থাকিলে ভাষার প্রতিপত্তি হয় না।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয় খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলনাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা যখন তাঁহারাই সেই ব্যাকরণ সাধারণের নয়নগোচর করিবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে যখন একজন উৎকলবাসী সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রকার গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, শ্রীরামপুরের পাদ্রিবর্গ বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র, বাঙ্গালা ছাপিবার মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি লইয়া যখন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন ইহাই প্রকাশ পাইল যে বাঙ্গালা ভাষা তথা বঙ্গভাষীর প্রাণ ছিল না, বৈদেশিকগণের যত্ন ও অধ্যবসায়ে বঙ্গভাষা ও বঙ্গভাষীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। যদি আর একটু ফিরিয়া তাকাই, তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাই যে যে পণ্ডিতের লেখনী হইতে "অন্নদামঙ্গল" বাহির হইয়াছে, লোকরঞ্জনের অনুরোধে সেই লেখনীকেই অশ্লীলতাপূর্ণ বিদ্বেষভাবাপন্ন, পরপদানত জড়প্রাণ বঙ্গজাতির অবিকল প্রতিচ্ছায়া প্রদর্শক, কুম্ভকর্ণের ন্যায় সুষুপ্ত জীবনের উদ্বোধন-সমর্থ, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে তৃপ্ত কূর্ম্ম স্বভাব নরনারীর সাহিত্যে অনুরাগ জন্মাইবার প্রলোভন স্বরূপ, পরম রুচিকর পরকুৎসামূলক ও আদিরসের প্রস্রবণ "বিদ্যাসুন্দর' লিখিতে হইয়াছে। জাতীয় সাহিত্য যে জাতীয় জীবন বা জাতীয় চরিত্রের ছায়া স্বরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কবিকঙ্কনে বঙ্গসমাজ বা বঙ্গজাতির যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতেই দেখা যায় যে বাঙ্গালী পরাধীন, ধনলুব্ধ বিদেশীয় বাদশাহ এবং তোষামোদপটু স্বার্থান্ধ স্বদেশীয় রাজকর্ম্মচারীর নির্য্যাতনে তথা সংকীর্ণ সমাজশাসনের উৎপীড়নে বাঙ্গালা নিরাশ্রয় ও নিজ বাসভূমে পরবাসী। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মধুর প্রণয়ের বর্ণনায় নটবর কৃষ্ণের মধুর প্রণয় পীড়নে কাতরা রাধার মুখে কবি বলিয়াছেন

> "কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরথিল্ঞা নারী।
> আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥"

এ বর্ণনায় বিরক্তি অপেক্ষা তৃপ্তির ভাবই সমধিক ভাবে পরিস্ফুট। কিন্তু কবিকঙ্কণে ব্যাধের অত্যাচারে প্রাণভয়ে কাতর "বারশিঙ্গা, ভুলারু, ঘোড়ারু, ঢোলকাণ" প্রভৃতি পশুগণ "ধরণী লোটাইয়া কাঁদিয়া" বিধাতার উপর অভিমান করিয়া যে বলিতেছে

"কেন হেন জন্ম বিধি কৈল হেন বংশে।
হরিণ জগত বৈরী আপনার মাংসে॥"

তাহাতে মধুরতা বা আত্মতৃপ্তির লেশ মাত্রও নাই। এই পশুকুলের আর্ত্তনাদের মধ্যে বঙ্গজাতির একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ, একটা করুণ বিলাপ, একটা হতাশের হাহুতাশ আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ যদি না করে তবে আমরা নিতান্তই গতাসু। আমরা কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রিত। শেল, শূল, জাঠা, খাণ্ডা প্রভৃতির প্রহারে আমাদের সে নিদ্রা ভাঙ্গিবার নহে। সে নিদ্রা ভাঙ্গাইতে হইলে মাংস-গন্ধের প্রলোভন চাই। তাই প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষার কবি নিদ্রিত বাঙ্গালীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য "বিদ্যাসুন্দর" রূপ মাংসপিণ্ডের প্রলোভন দেখাইয়াছেন। তাহাতে কবি যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার কাব্য মরিয়া বাঙ্গালীর নিকট সমাদৃত হইয়াছে, বাঙ্গালী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আমিষের স্বাদ উপভোগ করিয়া অবসন্ন নিদ্রাতুর জীবনে কিঞ্চিৎ আরাম পাইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। এ যে নবাবের আল্‌সে-খানার পি-পু-ফি সু।

তাহার পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ও মধ্যভাগে যখন উৎকলীয় পণ্ডিতের লিখিত প্রথম বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ তারাশঙ্করী রীতির বিরুদ্ধে আলালী রীতি কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল তখন বুঝিলাম যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গজাতির মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে, ধাত-ছাড়া নাড়ীর পুনঃ-স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে। আবার তাহার পরে যখন তারাশঙ্করী ও আলালীর মধ্যপন্থী সাগরী বা বিদ্যাসাগরী রীতি আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল, তখন বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ-সৌভাগ্য-সূচক শুভ-শকুন প্রত্যক্ষ হইল। তাহার পরে মহাত্মা মেটকাফের মঙ্গলময় বিধান মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার অমর্য্যাদা করিয়া বাঙ্গালা সাময়িক পত্র ও পুস্তিকা যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য খেউর-গান চালাইতে লাগিল, তখন ইহাই বুঝিলাম যে বঙ্গভাষা আর নির্জীব নহে, ইহার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। তাহার পরে যখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদলের সংঘর্ষের সামঞ্জস্য করিয়া বঙ্কিমের লেখনী হইতে বঙ্গদর্শনের পত্র চিত্রিত হইতে লাগিল তখন বুঝিলাম বঙ্গভাষার চক্ষুদান হইল, বাঙ্গালী চক্ষুষ্মান্ হইল, তাহার চোখ ফুটিল। আবার ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যে যে সংস্কৃতালোচনা একচেটিয়া ছিল, সেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মহাভারতের অনুবাদ ব্রাহ্মণেতর কায়স্থ-সন্তানের লেখনী হইতে বাহির হইল, এবং সেই লেখনী আলালী রীতির মর্য্যাদা রাখিতে হুতোমপ্যাঁচার নক্সা চিত্রিত করিল তখন বুকে ভরসা হইল; প্রাণে উৎসাহ আসিল, বঙ্গভাষা প্রকৃতই প্রাণ পাইল। আবার যেদিন কুসংস্কারের লৌহ-পিঞ্জর ছিন্ন করিয়া উদ্দাম বঙ্গসন্তান অপরিচিত খ্রীষ্টধর্ম্মের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া "পবিত্র ভূ-খণ্ডের উজ্জ্বল আলোকে" পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের মায়ায় জলাঞ্জলি দিল, সেদিন জানিলাম যে জড়প্রাণ জাতির প্রাণ স্পন্দন চরমে উঠিয়াছে, অতঃপর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। পতঙ্গ-প্রকৃতি বঙ্গসন্তান অপরিচিত-পূর্ব্ব উজ্জ্বল তীব্র জ্বালায় পুড়িয়া সংজ্ঞালাভ করিয়া ঘরে ফিরিল। বলিল, "মা! আমি অপরাধ করিয়াছি। না বুঝিয়া তোমার ভাণ্ডারের বিবিধ রতন অবহেলা করিয়া পর-ধন-লোভে-মত্ত পর-দেশে ভিক্ষা-বৃত্তি আচরিয়া সুখ পরিহরিয়া অনিদ্রায়, অনাহারে কায়-মন সঁপিয়া অবরেণ্যে বরিয়া বিফল তপে বহুদিন কাটাইলাম। অজ্ঞান সন্তান ঘরে ফিরিয়াছি—অতঃপর তোমার আজ্ঞা পালিব।" এই অনুতাপ-দগ্ধ সন্তানের অনুপ্রাণনায় বঙ্গভাষা নূতন জীবন লাভ করিল। প্রতীচ্য দেশের অনুকরণে ভারতের ভাষায় অতি-প্রাচীন অবশ-অঙ্গে—বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় শোণিত-প্রবাহ পুনঃ প্রচলিত হইল, বাতে পঙ্গু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষম হইয়া প্রাণের স্পন্দন প্রকাশ করিল, চিন্তা-জড়, নিদ্রা-প্রবণ, তন্দ্রালস বঙ্গসন্তান "হাঁ-না" করিতে করিতে অবশেষে এই বৈদ্যুতিক চিকিৎসার অজ্ঞাত-পূর্ব্ব মহিমা অনুভব করিল।

চিন্তাই ভাষার প্রাণ এবং ভাষাতেই চিন্তার অভিব্যক্তি। ভাষা ছাড়িয়া চিন্তা বা চিন্তা ছাড়িয়া ভাষা থাকিতে পারে

না। ভাষা জাতীয় অনুষ্ঠান। সুতরাং জাতীয় চিন্তা প্রণালীর সহিত ভাষা অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। ভাষাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ভাষার সাহায্যেই মানুষ মানুষ। ভাষাবিহীন মনুষ্য যেমন অসম্ভব, চিন্তাবিহীন ভাষাও সেই প্রকার অচিন্তনীয়। মনুষ্যের কার্য্যকলাপ, মনুষ্যের ধারণা-শক্তি, মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী, মনুষ্যের সভ্যতার পরিমাণ, সমস্তই ভাষা ব্যক্ত করে। ভাষা চিন্তার বাহন। তাই কবিকল্পনায় বাগ্দেবী সর্ব্বচিন্তার আধার-ভূত ব্রহ্মণ্যদেব ব্রহ্মার কন্যা। জীবনবিহীন নরদেহ ও শৌনিক-পণ্য মাংসে যেরূপ প্রভেদ কল্পনা হয় না, চিন্তাবিহীন ধ্বনিও প্রভঞ্জনের নিস্বন বা কুলিশগর্জ্জনেও সেইরূপ কোনও প্রভেদ নাই। ধ্বনি ভাষার আত্মপ্রকাশের সাধন-মন্ত্র, ভাষার জীবন বা ভাষার সর্ব্বস্ব নহে। যদি কোনও ভাষায় আলোচনা করিতে চাও তবে সেই ভাষা-ভাষী নরজাতির চরিত্র আলোচনা কর। আর যদি কোনও জাতীয় চরিত্রের পরিচয় পাইতে ইচ্ছা কর, তবে সেই জাতির ভাষার আলোচনা কর।

উদাহরণ স্বরূপ আমাদের ও ইংরাজদিগের সংখ্যা-বাচন প্রণালীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা বলি এক-আশি, তাঁহারা বলেন আশি-এক (eighty one)। আমাদের চিন্তা প্রণালী এই প্রকার যে আমরা এক দুই—করিয়া গণিয়া দশ দশটার সমষ্টিকে একত্র রাখি। দশটা টাকা যখন একত্র হইল, তখন সেই দশটার সমষ্টিকে একত্র স্তূপাকারে রাখিয়া আবার এক দুই করিয়া গণিতে লাগিলাম। যখন আবার দশটা টাকা একত্র হইল, তখন আবার একটা স্তূপ হইল। এই প্রকারে গণিয়া যখন সমস্ত টাকা ফুরাইল তখন দেখিলাম হাতে একটা টাকা আছে। তাই বলিলাম এক। তাহার পর দশের সমষ্টি গুলিকে এক-দুই-করিয়া যখন আটটা সমষ্টি পাইলাম তখন বলিলাম আশি। সুতরাং আমাদের গণনা প্রণালীর স্বাভাবিক উপায়ে আমাদের ভাষা আমাদের গণা টাকার সমষ্টির নাম দিল "এক-আশি।"

ইংরাজেরা গণিবার সময় দশ দশটা গণিয়া মনে মনে একত্র করিয়া চলিলেন, অবশেষে গণনার ফল একত্র করিয়া বলিলেন "আশি এবং এক" অর্থাৎ "আশি-এক।" আমাদের "অন্যা বামা গতিঃ।" কিন্তু ইংরাজ দিগের চিন্তা প্রণালীর সহিত আমরা আমাদের চিন্তা এরূপ-ভাবে মিশাইয়া দিয়াছি যে আমরা এক্ষনে বাঙ্গালায় সংখ্যা-বাচন-কালে ইংরাজী সংখ্যা বাচন প্রণালীর অনুবাচন করি মাত্র। তাই যখন আমরা খনার মুখে শুনি "নরা গজা বিশেশয়; তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়," তখন "বিশে-শয়" কথাটার অর্থ বুঝিতে পারি না। কারণ এখন আমরা "বিশ-শয় (১২০)" স্থানে বলি "(এক) শ-বিশ।" ইহা ইংরাজী hundred and twenty র অনুবাচন।

চীনবাসি-দিগের ভাষায় বিভক্তি, প্রত্যয় বা উপসর্গাদি নাই। অসংখ্য এক বর্ণাত্মক বা ক্বচিৎ দ্বি-বর্ণাত্মক শব্দ এই ভাষার সম্বল। উদাহরণ স্বরূপ, ইহাদের গমনার্থক শব্দ "কেন্," সমাপ্তি বাচক শব্দ "লেম্,," এবং প্রথম পুরুষের একবচন বাচক সর্ব্বনাম শব্দ "তা"। অতীতকালে "তিনি গিয়াছিলেন" বুঝাইবার জন্য ইহাদের ভাষা হইবে "তিনি গমন-সমাপ্তি," বা, "তা-কেন্-লেম্।" পাশাপাশি শব্দ তিনটা বসিয়া যে অর্থ প্রকাশ করিতেছে তাহা হইতে ঐ ভাষাভাষীর চিন্তা প্রণালীর বিষয়ে আমরা এই বুঝিতেছি যে "তিনির" সহিত তৎপার্শ্ববর্ত্তী "গমন" প্রথমে সম্পর্কিত হইতেছে এবং "তিনি-গমন" এর সহিত তৎপার্শ্বস্থিত "সমাপ্তি" মিশিয়া বুঝাইতেছে যে তাঁহার সহিত সম্পর্ক যুক্ত যে গমন তাহার কালিক সম্পর্ক সমাপ্তি, অর্থাৎ "তৎ কর্ত্তৃক" "গমন ক্রিয়া" "অতীত হইয়াছে।" উপসর্গ বা প্রত্যয়াদির অভাবে কর্ত্তৃত্ব ক্রিয়াত্ব কর্ম্মত্ব বা দেশ-কালিক সম্পর্ক কি প্রকারে ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহা আমাদের চিন্তা প্রণালীর বোধগম্য নহে। অথচ চীন-বাসিগণ অবাধে এই ভাষা লইয়া ঘর করিতেছেন এবং সভ্যতার হিসাবেও তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা হীন তাহা নহে। আমাদের প্রত্যয় যে কাজ করে ইঁহাদের পদ যোজনা প্রণালীতে (syntax) পদের অবস্থিতির স্থানই তাহা করিতে সমর্থ। ইংরাজী ভাষাতে ও কতকটা এইরূপই হইয়াছে—"A man killed a tiger" বাক্যের man ও tiger স্থান পরিবর্ত্তন করিলে ডাকাইতের ঘরে বধ্য অতিথির সহিত ডাকাইত পুত্রের শয্যা পরিবর্ত্তনের ফল ফলে।

টিবেটো-বর্ম্মন (Tib to-Burman) ভাষা সমূহে বিশেষ্য ও ক্রিয় পদে প্রভেদ নাই। ইঁহাদের যা-আছে ঐ-একটা কিছু যাহাতে এক একটা শব্দের অর্থ প্রকাশ করে এবং আবশ্যক মত বিশেষ্য বা ক্রিয়ার কাজ করে। সুতরাং কর্ত্তৃবাচ্য-কর্ম্মবাচ্য নাই। ইঁহাদের মধ্যে ভাব-প্রকাশক গুণ বাচক শব্দ আদৌ নাই। ইঁহাদের বিশ্লেষণ শক্তির এত অভাব যে "মানুষ" এই সামান্য ভাবটা তাহাদের ভাষায় প্রকাশ পায় না। 'তিব্বতীয় মানুষ," "শ্যাম দেশীয় মানুষ" "চীন দেশীয় মানুষ,' "জাপান দেশীয় মানুষ," "বুদ্ধধর্ম্মী মানুষ "শিন্টো ধর্ম্মী মানুষ" প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট জাতি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের নাম ইঁহাদের ভাষায় আছে, কিন্তু চীনাও নহে জাপানীও নহে, বুদ্ধধর্ম্মীও নহে, খ্রীষ্টধর্ম্মীও নহে, বামও নহে, শ্যামও নহে, কাণাও নহে, খোঁড়াও নহে, অথচ এই সকলের মধ্যেই আছে এমন একটা সাধারণ ভাব যে "মানুষ" তাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা ইঁহাদের নাই। "মা', 'বাপ," "ভাই', ভগ্নী" ইঁহাদের ভাষায় নাই; কিন্তু আমার মা," "তোমার বাপ," "তাহার ভাই" প্রভৃতি আছে। এই সকল ভাষার সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে ইঁহাদের চিন্তাপ্রণালী বিচিত্র প্রকারের এবং আমাদের মত নহে। এবং আমরা আরও বুঝিতে পারি যে ইঁহাদের চিরাভ্যস্ত অহিফেন বা রমণী চরণের খর্ব্বতার ন্যায় ইঁহাদের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যেও একটা খর্ব্বতা বা ন্যূনতা, আছে। বোধ হয় এই ন্যূনতা না থাকিলে ইঁহারা ইউরোপীয় বর্দ্ধিষ্ণু জাতি-সমূহ অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধিশালী ও উন্নতিশীল হইতে পারিতেন।

সাঁওতাল কোল প্রভৃতি মুণ্ডাশ্রেণীর পার্ব্বত্যজাতিদিগের চিন্তা প্রণালীর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহারা কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদ একত্র জুড়িতে পারে না। যদি বলিতে হয় "চুং আসে," তবে ইহারা প্রথমে আসার সহিত সম্পৃক্ত চুংএর কল্পনা করিবে, তাহার পরে "বটে" শব্দ দিয়া তাহার সত্তা প্রকাশ করিবে। কতকটা এইরূপ হইবে—"চুং আগমন বটে"। ইহাদিগের ভাষার আর একটা বিশেষত্ব এই যে উত্তম পুরুষে দ্বিবচন বা বহুবচন বাচক সর্ব্বনাম পদ ইহাদের ভাষার দ্বিবিধ। একটী পদের অর্থে সম্বুদ্ধ ব্যক্তি বাদ পড়িলে অন্য পদে তাহাকে ধরা হইবে। "আমরা খাইতে যাই" বুঝাইতে দুই প্রকার বাক্য হইবে। একটীর অর্থ হইবে আমরা এবং তুমি, আর একটীর অর্থ হইবে কেবল আমরা। ইহার মাঝামাঝি ভাষা নাই।

আফ্রিকার নিগ্রোগণ ব্যাকরণের লিঙ্গ কাহাকে বলে, তাহা বুঝে না। তাহাদের ভাষায় লিঙ্গের ব্যবহার নাই। সেমিতিক ভাষায় (এবং তাহার প্রভাবে) হিন্দী ভাষায়, এবং ইটালীয় ও ফরাসী ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ নাই। এই সকল ভাষায় প্রত্যেক শব্দের লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট, তাহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। জর্ম্মণ ভাষায় যদিও তিন লিঙ্গ, তথাপি প্রত্যেক শব্দ নিয়ত লিঙ্গ। সুতরাং বিদেশীয়গণের পক্ষে এই সকল ভাষা আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। মালয় তেলেগু প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই লিঙ্গ থাকিতে পারে। ইতর পশুর কোনও লিঙ্গই নাই। আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের ভাষায় বহুবিধ লিঙ্গের ব্যবহার আছে।

সাধারণতঃ ভাষা তাত্ত্বিকগণ ভাষার এদিকটা দেখেন না। তাঁহারা কেবল ভাষার অস্থি-মেদ-বসা স্বরূপ ধ্বনির বিচার লইয়া ব্যস্ত। কিরূপে কোন্ ভাষায় কোন্ ধ্বনির পরিবর্ত্তন হয়, কিরূপে কোন্ শব্দ গঠিত হইয়াছে, কোন্ শব্দ শুদ্ধ, কোন্ শব্দ অশুদ্ধ এই সমস্তই তাঁহাদের আলোচনা। এ যেন প্রাণহীন শবদেহের বিশ্লেষণ দ্বারা সজীব মনুষ্যদেহের প্রকৃতি বুঝিবার চেষ্টা! আমাদের সাহিত্যিকগণ "মনান্তর," "সতীত্ব," "নিশি," "দিশি, "বাধিত," "নিরাকরণ," "চন্দ্রিমা," "সাক্ষী," "সৃজন," সিঞ্চন," "অধিনী," "কাম্য," "সক্ষম," "ব্রহ্মোত্তর," "দেবোত্তর," "সৌখ্য," "পশ্চাতে," "মনানন্দে," "ভাগ্যমন্ত," মহত্ত্ব." "আবশ্যকীয়," "জগবন্ধু," "বিমান," "প্রশস্ত," "জীবনী," "সুলোচনী," "সুকেশিনী," "সাব্যস্ত," "অধিনী," "অনাথিনী," "চন্দ্রানী," "গোপিনী," "একাকিনী," "চন্দ্রবদনী," "ননদিনী," "নিরপরাধিনী," "মাতঙ্গিনী," "ভুজঙ্গিনী," "বিহঙ্গিনী," "কুরঙ্গিনী", "শ্যামাঙ্গিনী," "রূপসী," "দিবানিশি," "নিন্দুক,"

"মর্ম্মন্তুদ," "বিপুন্তুদ" "দারা," প্রভৃতি কতিপয় শব্দকে বাঙ্গালা কোষ হইতে দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন; কেননা ইহাদের কতকগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন না মানিয়া রাজদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত, আর কতকগুলি সংস্কৃতকোষের অভিধা পরিহার পূর্ব্বক অভিনব অভিধা গ্রহণ করিয়া বিজাতীয় দার-পরিগ্রহ অপরাধে অপরাধী। সুতরাং ইহাদের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। এই সকল সাহিত্যিকদিগকে আমরা বলি যে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া ভাষা যাহাতে নূতন নূতন সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হউন। ভাষা বা ভাষার সম্পত্তি সাহিত্যই জাতীয় চরিত্রের ছায়া স্বরূপ। বঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া আমরা এই অবগত হইয়াছি যে বাঙ্গালী গল্পপ্রিয় ও গল্পী, তাই বিদেশীয় উপন্যাস গ্রন্থের এত অনুবাদ হইতেছে এবং তাহা এত অধিক পরিমাণ বিকাইতেছে। কিন্তু চারুসিংহের মনোবিজ্ঞান, রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসা, জড়জগৎ প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থ অতি অল্পই লিখিত হইতেছে। বিদেশীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত যাহাতে নানাদেশীয় নানাজাতীয় মানবের বিবরণ আমাদের দেশবাসীদিগের উপভোগ্য হইতে পারে, তাহা অনুবাদিত হইতেছে না। এখনও যাহা আদৃত হইতেছে তাহা ঐ বিদ্যাসুন্দরেরই অভিনব সংস্করণ, সেই গুপ্ত প্রণয়, সেই সহসা মিলন। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের অসারতার পুষ্টি ও সারবত্তার হ্রাস হইতেছে। বাঙ্গালী চরিত্র কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে দূরে থাকিয়া কেবল আলস্য ও জড়প্রাণতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে, দিন দিন পরজন পালিত অল্পপ্রাণ ঁ চন্দ্রবিন্দু বা পরের গলগ্রহ স্বরূপ মৌলিকতা বিহীন ফড়িংরূপী ং অনুস্বারে পরিণত হইতেছে।

মাসিক-কাব্য-সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

মানসী ও মর্ম্মবাণী। আষাঢ়—অতুলবাবুর কীর্ত্তনের সুরে গান। সঙ্গীতে কবি বলিতেছেন—

"দীনের ধনেই তোমরা ধনী দীনের দুঃখ কর হে মোচন।"

অতুল বাবুর আর একটী গান বাউলের সুরে। চন্দন সই।

শ্রীআশুতোষ রায়ের 'মিনতি' কবিতায় কোনো বিশেষত্ব নাই।

শ্রাবণ—কালো বঁধু। শ্রীকালিদাস রায়। কবি বলিয়াছেন :—

কাব্যের বিভব বহি আর কতকাল রহি?
কবি বিনা সকলি বৃথায়
সঙ্গীতের উপাদান অঝঙ্কৃত মৌনম্লান
দাও সুর দাও প্রাণ তায়।

কবি আর কালো বঁধু দেখছি দুই-ই এক ব্যক্তি।

আশ্বিন—রবীন্দ্রনাথের প্রতি। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। "ঠেলি অনলের ঢেউ বারুদের গন্ধ, যাও আরতির দীপ ফুল মকরন্দ" এই পংক্তি দুটী মন্দ হয় নাই।

পাশাপাশি। বনফুল রচিত। কবি কুমুদরঞ্জনের অনুকরণ মাত্র।

পতিতা। অমিয়া দেবী। এই কবিতায় একটী পরম সত্য সুন্দর ভাষায় প্রস্ফুট। কারুণ্যের মাধুরীও আছে।

শ্রীগিরীবালা দেবীর "কামনা" সফল হয় নাই।

মনের বনে। শ্রীকালিদাস রায়।

দাওগো দেখা আজকে সখা
গহন মনের বন পথে
বনমালি।
বনবিহারী তোমার তরে
জীবন জুড়ে বনের তরু
বল্লী পালি॥
দুঃখ শোকের বকুল তমাল
শাখে শাখে,
নিবিড় তমঃ দিন দুপুরেও
আটকে থাকে।
পিয়াল তলে ভয়াল রবে
শিয়াল ডাকে
অমঙ্গলটা রটায় খালি॥

কণ্ঠ-পথে কথায় কথায়
লতায় লতায় কাঁটায় কাঁটায়
জড়াজড়ি।
শুষ্ক ব্যথার মর্ম্মরিত
পাতায় পাতায় ঝরা ফুলের
ছড়াছড়ি।
জীর্ণ মম পাঁজর ফাঁকের
বাঁকে বাঁকে
স্মৃতির ঝিঁঝিঁ ঝাঁঝর বাজায়
ঝাঁকে ঝাঁকে
বসে আছি তোমার লাগি
আকুল আঁখে
শীর্ণ আশার জোনাক জ্বালি॥

পরিচারিকা—শ্রাবণ—পাওয়ায় খোঁজ। শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ। কবিতার ভাবটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও অনন্তের প্রতি যে একটা আকুল আবেদন ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হইতেছে তাহা আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে। ছন্দোবন্ধের শিথিলতার জন্য কবিতাটি রসফুল্লা হইতে পারে নাই। "হারাবার তৃষাভরি অফুরন্ত কবে পাই।" রীতিমত অবোধ্য।

আভাষ। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। বসন্তবাবু ললিত-সুরের সঙ্গীতটিতে আমরা রস ভাব বা সৌন্দর্য্য কিছুই পাইলাম না।

"রয়েছ তুমি যে আলোকে ছায়ায় করিয়াছ আজ একি এ মায়ায়"—ভাষাই বুঝিলাম না—ভাব ত দূরের কথা। "এত বন্ধন মাঝে হতে ওগো কেমনে যাইবে টুটে" মিলের জন্য অবশ্য কবি মহাশয়কে "টুটে" দিতে হইয়াছে কিন্তু এ "টুটে" যে কবিতার 'টুটি' চাপিয়া ধরিয়াছে। "তুমি যেন এক চকিত বাসনা—হঠাৎ সরম রক্ত-আননা, ছুটিয়া পলানো চরণশব্দ কাঁধে ঢুলে পড়া দেহ।" কবি বলিতেছেন—তুমি নিম্ন এই চারিটী—নং১, চকিত বাসনা নং২ হঠাৎ সরম রক্ত-আনন নং৩ ছুটিয়া পলানো চরণশব্দ নং৪ কাঁধে ঢুলে পড়া দেহ" এখন পাঠকগণ রসের বন্যায় হাবুডুবু খান—আমরা কিন্তু কবির কাণ্ড দেখিয়া "হঠাৎ সরম রক্ত-আনন।" কবি কি চমৎকার সমাসটিই বঙ্গ-সাহিত্যকে উপহার দান করিয়াছেন।

প্রতারণা। রেণুকা দাসী। চলনসই। "শত বারে বারে" অচল।

ঝুলনমিলন। গান—সুর পরজ বাহার। রচয়িতা শ্রীকালিদাস রায়—সুর ও স্বরলিপি দিয়াছেন—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা। সুললিত রচনা।

মধুনাম। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুনামে ভগবানের নাম আছে কিন্তু বিন্দুমাত্র মধু নাই।

ভাদ্র—সহর ও পল্লী। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবিতার ভাবটি সুন্দর—কিন্তু রচনায় তাল ফুটে নাই। রচনাটিতে সহজ সাবলীল গতি নাই—কুমুদবাবুর যাহা বিশেষত্ব এ

রচনাটিতে, তাহার অভাব। কবিকে—'তে' 'সে' ও 'যে' বড় বেশী বার ব্যবহার করিতে হইয়াছে। 'প্রতাপচাঁদ' ও 'লখিন্দরের' উপমা দুটী সুন্দর হইয়াছে—এইখানেই কুমুদবাবুর বিশেষত্ব।

বসন্তবাবু এই ভরা ভাদরে খাম্বাজে আবার গান ধরিয়াছেন। গানের নাম 'মানসী'। ললিতপদ বিন্যাসের দ্বারা পাঠককে এরূপ প্রবঞ্চনা করা কবির উচিত হয় নাই। কবির "ছলনা সুগভীর" আমরা কিন্তু ধরিয়া ফেলিয়াছি।

"মহাজাগরণ"—সম্পাদিকা। মাঝে মাঝে কবিত্ব আছে।

"আচার্য্য গুরুদাস"। শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ বসু। শুক্ল (?) শুভ্র (?) সৌম্য শান্ত ভাস্বর মোহন মিষ্টভাষী নিষ্ঠাবান বশিষ্ঠ গুরুদাসের চরণ উদ্দেশে ভক্তি অর্ঘ্য দান করিয়াছেন।

বেদনাময়। শ্রীকালিদাস রায়। কবি দেখিতেছি Schopenhauerএর সৃষ্টিতত্ত্ব কবিতায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আশ্বিন। কালোর আলো। কবিতাটি মন্দ হয় নাই।

উদাসী। শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ। চলনসই।

কোথা তুমি। অনঙ্গমোহিনী দেবী।

অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ। শ্রীকালিদাস রায়। Popeএর নীরস কবিতার ততোধিক অনুবাদ।

গণিকা। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। কুমুদবাবুর একটা বিশিষ্টভঙ্গি উপমার মালায় কাব্যরচনা। কবি এ কবিতাটিতে কতকগুলি উপমায় মালা গাঁথিয়া গণিকার "বুকের ব্যথাটি" জানাইয়াছেন। মালিকায় ফুলের সহিত কতকগুলি কাঁটা থাকিয়া গিয়াছে।

"পট্টিকা গড়ে ফেলে ছিঁড়ে সাধুর জীবনী" পংক্তিটি ভাবদ্যোতক হয় নাই। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে—

"গড়লে ছুরি কাল যে ভেঙ্গে কাজললতাটি"

মোসলেমভারত। আষাঢ়। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

> আমার বোঝা এতই করি ভারী,
> তোমার বোঝা বইতে নাহি পারি,
> আমারি নাম সকল গায়ে লিখা
> হয়নি পরা তব নামের টিকা
> তাইত আমায় দ্বার ছাড়েনা দ্বারী।
> আমার ঘরে আমিই শুধু থাকি
> তোমার ঘরে লও আমারে ডাকি'—
> বাঁচিয়ে রাখি যা কিছু মোর আছে
> তার ভাবনায় প্রাণত নাহি বাঁচে
> সব যেন মোর তোমার কাছে হারি।'

আষাঢ় সন্ধ্যায়। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। 'সোণালী ছটা' 'ধূপছায় রঙ' 'জলীব কাক' ইত্যাদি শব্দ সমবায়ে একটা তরল গান।

রজনীগন্ধা। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। ছন্দটি বেশ মিষ্ট।

মিলনস্বর্গ। শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।—হিন্দুমুসলমানের মিলন সঙ্গীত গাহিয়াছেন।

> অন্ধকার ঐ যায় যে কেটে উঠ্ছে নবীন সূর্য্য,
> আকাশ জুড়ে ঐ যে বাজে আঁধার শেষের তূর্য্য,
> ঘরের কোণে আপন মনে থাকিসনে আর বদ্ধ,
> হৃদয়-কুঁড়ি খুলচে আঁখি পাস্‌নি'কি তার গন্ধ?

গুল ই-মখমল। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। গানটি বড় মধুর হইয়াছে।

বাদলপ্রাতের শরাব। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। একটা স্ফটিক পাত্রে রাঙা সিরাজীর মত কবিতাটি টল টল করিতেছে। কবিতার শেষ দুই পংক্তি—

> "খামখা তুমি মরছ কাজী শুকনো তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে
> মুক্তি পাবে মদখোরের এই আলকিমিয়ার পাত্র চেটে।"

কবিতাটিতে পার্শীশব্দ একটু বেশী বেশী হইয়াছে। এই

সৈনিক কবির হাতটি বড় মিঠে। রচনার এই দিলদরিয়া ভঙ্গিটি আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। আমরা এই তরুণ কবির নিকট যথেষ্ট প্রত্যাশা করি।

"লায়লা তুল কদর।" সৈয়দ এমদাদ আলি। মহম্মদের সিদ্ধি লাভের কথা কবিতায় লিখিয়াছেন। ভাষা মাঝখানে একটু গদ্যাত্মক। "সুমহান্ বাণী" হইতে পারে না।

জীবনধারা। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী। "পুলক পাগল কার যেন দেখিয়ে মোহন ভৌতিকে" বুঝিলাম না। ছন্দে গোলা আছে।

বালবিধবা॥ শ্রীমতী মোতাহেরা বানু সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বালবিধবার ব্যথার কথা লিখিয়াছেন। আমরা মুসলমান মহিলা কবির রচনা এই প্রথম পড়িলাম। ইঁহার রচনায় মাধুর্য্য আছে।

মহম্মদ আজিজুল হকের গজলটি মন্দ হয় নাই।

মৃত্যু মঙ্গল। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কবিতাটিতে কবি খুব উঁচু দরের উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশটি স্মরণ রাখিলে "সারা জীবনের সত্য সাধনে মৃত্যু অমর হবে।"

শ্রাবণ। খেয়াপারের তরণী। হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম। লীলায়িত ছন্দের হিল্লোলটি আমরা উপভোগ করিলাম। মিলগুলি অতি সুন্দর ও নিখুঁত। ভাষা অনুপ্রাসললিত। পার্শীশব্দগুলি ছন্দোলহরী মালায় শুলরের মত ভাসিতেছে।

শ্রাবণ গীতি। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। বেশ ছন্দোমধুর গান।

প্রতীক্ষায়। মোতাহেরা বানু। প্রাঞ্জল রচনা।

দুঃখহারা। মহম্মদ হোসেন। হাফেজের চলনসই অনুবাদ।

হাসি। শ্রীকালিদাস রায়। পারস্য কবি হইতে অনূদিত। নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু স্বরবর্ণের অনুপ্রাসে মধুর।

গোলাব যেমন আঁধারে আলোকে হাসে
শিশিরে বাদলা বাতাসে পুলকে হাসে
হাসিতে হাসিতে বোঁটা হতে খসে পড়ে'
লুটে লুটে হেসে ভুঁয়ে যায় গড়াগড়ি।

মহাজিবীন। শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত। কবিতায় মহম্মদের উল্লেখটি বেশ সুষ্ঠু হইয়াছে। "দয়াল খোদা রুদ্রবেশে এলেন যদি প্রহ্লাদ দেশে" এ পংক্তি দুটী সুন্দর। কবিতার স্থলে স্থলে ছন্দ পতন হইয়াছে। 'হৃদয়বীণ'—৪টী মাত্রার স্থলে তিনটী মাত্রা "আকগানে যে বিশ্বমাঝ" এই পংক্তিতে মাত্রা কম পড়িয়াছে। "প্রহ্লাদ দেশে"—গুণ্‌তিতে মাত্রা ঠিক থাকিলেও শ্রুতি কটু হইয়াছে।

ছুপিট। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। ছুপিঠ নামের সার্থকতা বুঝিলাম না। কবিতাটীর ভাবের মেরুদণ্ড কি তাহাও ধরিতে পারিলাম না। নেলসান ও মেরায়াসের উপমা দুটী সুন্দর হইয়াছে।

নবীনের গান। শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কবিতাটীতে নবীন প্রাণের আশা আনন্দ নবীন ভঙ্গিতে ও নবীন সুরে ঝঙ্কৃত। এই কবিতাটী আমারা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

অনুতপ্ত। আহমদ শাহ্ আবদালী হইতে শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্তের অনূদিত। অনুবাদ প্রাঞ্জলসরস, শেষাংশটি বিশেষতঃ।

সবুজপত্র। আষাঢ়। সত্য যদি কবিতা বলিতে হয় তাহা হইলে শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "আষাঢ়ে গল্প"টিকে গদ্যে রচিত হইলেও কবিতা বলা উচিত। কাব্য-রসজ্ঞেরা গল্পটি পড়িলে রসানন্দ উপভোগ করিবেন। 'অনুরোধ' কবিতা। রচয়িতা ঐ। কবিতাটী তেমন সুরচিত হয় নাই।

শ্রাবণ। চিঠি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় পদচারণ নামক কাব্য গ্রন্থখানি কবি সত্যেন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং পূজার সময় অথবা পূজার আগে "ঢোলে চাঁটি পড়ার শব্দে" পুস্তক উপহার পাঠাইয়া-

ছলেন। অলস কবি ঐ উপহার প্রাপ্তির স্বীকারপত্র প্রেরণ করিয়াছেন গাজনের পর অর্থাৎ 'ঢাকে কাটি থামিবার পরে'। কবি ঢাকে ও ঢোলে দুইবারমাত্র চিঠি লেখেন। এবং তিনি কুড়ে গোরু কিনা সেজন্য ভিন্ন গোঠে চরেন। যে প্রকার ভাষা, ভাব ও ভঙ্গি সবুজ-সম্পাদক মহাশয় ভালবাসেন সেইপ্রকার ভাব ভাষা ভঙ্গিতে কবি তাঁহাকে পত্রোপহার দান করিয়াছেন। পেট্রার্কার ধরণের সনেটেও ইহা লিখিত। 'রসের সিদা' 'রসিদ' আ ছে 'ঢোলে চাঁটি' 'ঢাকে কাটি' আনিয়াছে ও "লেফাফা ন্ত" "লেফাফা দুরস্ত" আনিয়াছে।

পল্লী । আষাঢ়। কল্পনা—শ্রীশ—রচিত। কবিতাটিতে গুরুগম্ভীর শব্দাবিন্যাস আছে—মাঝে মাঝে কবিত্বও আছে—কেবল স্থলে স্থলে যতি-কষ্টের জন্য পড়িতে অতিকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। শব্দাড়ম্বর অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া অর্থের স্বচ্ছতা থাকিলে কবিতাটী সুন্দর হইত। 'পরচালা' পরচুলোপরা দেবদত্তনামা এক কবির রচনা—

'সুখ'—শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়। কবিত লিখিয়াছেনই—"খঞ্জ এক অতিকষ্টে অতি যাতনায় ইত্যাদি" আমরা বলি খঞ্জ কবি অতি যাতনায় আজ কাব্যক্ষেত্রে ভ্রমণ নাই করিলেন।

নিদাঘ-স্বপন। শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর "দিবানিদ্রার ফল"। আমরা শুনিয়াছি একজন দিবানিদ্রার পর শয্যাত্যাগ করিয়া মেঘলা অপরাহ্নকে প্রাতঃকাল ভাবিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন।

আরো অনেক রকম কাণ্ড ঘটে—সেজন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন "মা দিবাস্বাপ্সী :।"

শ্রাবণ। কবির অভিশাপে। বিজয়মাধব মণ্ডল। কবি বলিতেছেন "একজন কবি একটা ভ্রমর মারিয়া ফেলিয়াছিলেন সেজন্য কাব্য লক্ষ্মীর অভিশাপ সকল কবিকে আজো প্রথমে গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজার মত ভ্রমরাদি পঞ্চদেবতায় পূজা করিয়া তবে কাব্যলক্ষ্মীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। সেজন্য সকল তরুণ কবিই ভ্রমর, মলয়ানিল চাঁদের হাসি, ফুলের গন্ধ ও কোকিলকে প্রথমে অর্ঘদান করেন।" যেমন আজগুবী কল্পনা প্রকাশভঙ্গি ও তেমনি উৎকর্ষ।

রামতনু। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। রামতনু কবির নাপিত ছিল। রামতনু যেসে লোক ছিল না—সে "দেশ প্রেমে মাতোয়ারা" বাল্য বিবাহ ও বর-পণের বিরোধী বঙ্গবাসীর পাঠক ছিল এবং "পড়িত শাস্ত্রবই" এমন রামতনু হঠাৎ মরিয়া গেল—সেজন্য কবির শোক। ভক্ত নাপিতের জন্য কবির কাঁদিবার অধিকার আছে কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীকে বিড়ম্বিত করিবার অধিকার তাঁহার নাই। ভাষার বন্ধন. আগাগোড়া শিথিল, গদ্যাত্মক কষ্ট কল্পিত। ছন্দঃ পঙ্গু।

"পিতামহ মম, পিতা পাশে তার কামাতেন প্রতিদিন।"
"কর্ত্তব্য সে যে জেনেছিল বড় চরিত্রে দৃঢ় অতি
তামাকও খাইতে কোনোদিন তার হলনা যে ভুলে মতি।"
"পর্ণ ছাতাই নিবারিত তার ইত্যাদি"
"তিন পুরুষের প্রিয়সাথী তুমি কর্ত্তব্যে মূর্ত্তিমান"

এ সকল পংক্তি নাপিতের অভাবে খোঁচা খোঁচা দাড়ীর মত জঙ্গল হইয়া আছে।

অশ্রু। অশ্রু কবিতায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই। অন্যান্য দুর্ব্বল মিল ছাড়িয়া দিলেও "বুক" ও "রূপে"র মিলটা সহ্য করা যায় না।

হাসি। কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মানন্দ ঘনীভূত হলে তুমি লো তাহার তাম্ররূপ
ব্রহ্মরন্ধ্রে মিলনের ফলে জনম তোমার রসস্বরূপ।"

এত গম্ভীর ও তাম্ররূপ ধারণ করিয়া হাসি পাইলেও হাসা যায় না।

ষড়ৈশ্বর্য্য। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র মহাশয় প্রবাসে অবস্থান কালে পুস্তকের মধ্যে দুইখানি তুলসী পাতা দেখিয়া লিখিয়াছেন—

"তোরা ষড়ৈশ্বর্য্য মোর দেশস্মৃতি জাগরণে।" জাগরণের ষড়ৈশ্বর্য্য কি বুঝিলাম না।

ঝুলন গীতি। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র বাবুর একটী সঙ্গীত। চলনসই। শ্রীপ্রীতিময়ী রায়ের—'ভিখারী' মন্দ নয়।

শ্রাবণ-বরিষণ। শ্রীঅপরাজিতা ঘোষ। কবিতায় ছন্দোলালিত্য আছে।

ভাদ্র। ভাদু—শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র। কবিতায় কারুণ্য-রস ফুটিয়াছে। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "জৌলুসের জের" পড়িলে Lucy Grey ও Sands of the Dee নামক ইংরাজী কবিতা দুটী মনে পড়ে।

বড় দীঘি। শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতার অজস্র স্থলে ছন্দঃ পতন ঘটিয়াছে। অনিলবাবু মাত্রিক-ছন্দের রীতিটা আগে অধিগত করিয়া যেন ভবিষ্যতে এ প্রকার কবিতা মাসিকে প্রেরণ করেন। অনিলবাবুর কল্পনাশক্তি মন্দ নাই—তবে প্রকাশভঙ্গি আদৌ তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। ঠাকুরমার কথায় কবির বড় বিশ্বাস—অপরেও তাঁহারি মতন বিশ্বাস করেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কবি ধমক দিয়াছেন। "বিশ্বাস যদি না কর কেউ চুপ করে থাক তবে।" শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মজুমদারের "গৈবী-নাথের" ছত্রে ছত্রে কবি কালিদাসের শ্রীক্ষেত্র-মঙ্গল মনে পড়ে।

গৈবীনাথের দুইটী পংক্তি মাত্র তুলিয়া দিতেছি—

"সুন্দর হেথা গম্ভীর সনে মিশেছে মোহন বেশে
সসীমের সনে অসীম হেথায় অনুরাগ ভরে মেশে।"

"কলরব পাশে নীরবতাভাস"—অচল। মিলের দোষ একাধিক স্থলে বিদ্যমান। চণ্ডীবাবু অনেকদিন হইতে লিখিতেছেন এখনো তাঁহার ছন্দোবন্দ নিখুঁত হইল না এবং অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তির হ্রাস হইল না দেখিয়া আমরা হতাশ।

'বনফুল' রচিত 'পল্লীবাণী' কবিতাটি পড়িয়া মনে হইল কুমুদ বাবু 'বনফুল' নামে বোধ হয় তাঁহার অপেক্ষা কৃত নিকৃষ্ট কবিতাগুলি মাসিকে প্রকাশিত করিতেছেন। "পল্লীবাণীর" ভাষা ছন্দ ভাব ভঙ্গি সমস্তই কুমুদ বাবুর।

"পল্লীবাণী" একটী মাত্র বাক্যে (sentence) এ সমাপ্ত। কবিতার ১২ লাইন শুধু অধিকরণ কারক শেষের লাইনে ক্রিয়া ও কর্ত্তৃপদ। কবিতাটী কুমুদ রঞ্জনের গুণ ও 'বনফুলে'র দোষের সমবায়।

বিরহে মিলন। সরল তরল ছন্দোলীলাই কবিতাটির লালিত্য বর্দ্ধন করিয়াছে।

"সে" ভুজঙ্গ বাবুর Lyte এর Agnes কবিতার অনুবাদ। কবিতাটির অনুবাদ আরো ২।১ বার আমাদের চোখে পড়িয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে যেন ইহার একটী সুন্দর অনুবাদ পড়িয়াছিলাম। প্রথম তিনটি শ্লোকের অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। শেষ শ্লোকটির অনুবাদ তত ভাল লাগিল না।

ইংরাজীতে আছে—

I saw her once more
'T was the day that she died
Heaven's light was around her
And God at her side
No wants to distress her
No fears to appal
O then I felt then
She was fairest of all

ভুজঙ্গ বাবুর অনুবাদ—

আর একবার দেখেছিনু তারে—
যেদিন মরণ অতিথি আসে,
ত্রিদিবের আলো ঘিরিয়া বালারে,
প্রেমের হরিটি বসিয়া পাশে।
শান্ত বদনে নাহি দুখ কণা,
নয়নে না ফুটে ভয়ের লেশ।
হেরি সে মুরতি হোল অনুভূতি
মধুরতা যেন তাহাতে শেষ।

ভারতী। শ্রাবণ। শ্রাবণ-রজনী। শ্রীমোহিত লাল মজুমদার। কবিতাটির মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর কবিত্ব ফুটিয়াছে। কবিতার সমষ্টিগত সৌন্দর্য্য "মেঘ আড়ে" যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। মোহিত বাবু সেই শ্রেণীর কবি যাঁহারা কবিতার সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যের প্রতি কতকটা উদাসীন হইয়া পংক্তিগত সৌন্দর্য্যের প্রসাধনে অবহিত। কবিতার মধ্যে

organic life এর অভাব। সেজন্ত ভাবপরম্পরায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। কবিতায় পরিপক্ক হাতের কলা কৌশলের অভাব নাই।

ব্যথার স্মৃতি। প্রতিভাবান কবি কিরণধন বিরচিত। কবিতাটি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। কবিতাটির কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

প্রতি নিশি দিন ফিরি উদাসীন
সঙ্গীবিহীন প্রবাসে
লোকে ভালবাসে, কত খেলে হাসে
দিন যায় আশে হতাশে
মনে পড়ে যায়, দুধে আল্‌তায়
রেখে দুটী পায় সেই যে
অবনীর সার তনু সুকুমার
নেই সে আমার নেই যে
* * * *
চুড়ি-গুলি হাঁকে জানালার ফাঁকে,
কত জনা ডাকে 'এবাড়ী'
আধ ঘোমটায় মুখ দেখা যায়,
মন চম্‌কায় ফিবারই
* * * *
সাগরে সলিলে আকাশে অনিলে
বিশ্ব নিখিলে দেওয়ালী
চম্‌কায় দিল আলো রঙ্গিল
সবুজ সুনীল সোণালী
ছোটে ভর্ ভর্ হাসি-নির্ঝর
মণি মুক্তার ঝরনা
টুটি আবরণ রেশমী-বাঁধন
আস্‌মানী রং ওড়না
হেনা চামেলির মিঠে সুরভির
মদিরে সমীর মত্ত
আনন্দ গান ভরে' তোলে প্রাণ,
নাচে আন্ চান্ রক্ত
এত আলো গান্ হাসি অফুরান্
সবই ম্রিয়মান লাগে যে
কুটির আঁধার নিবিড় ব্যথার
স্মৃতি শুধু তার জাগে যে।
* * * *
বকুলের বনে পবনে পবনে
এই সব মনে পড়ে গো
যে ছিল সে নাই হয়ে গেছে ছাই,
জলে আঁখি তাই ভরে গো।

কলা কৌশলের চাতুর্য্যের সহিত হৃদয়ের মাধুর্য্যের শুভপরিণয়ে কিরূপ উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে পারে এই কবিতাটী তাহার উদাহরণ। মোহিত বাবু, প্রবাসীর নবীন কবিগণ, এমনকি সত্যেন্দ্র নাথ করুণানিধান বাবুকেও এই কবিতাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। শ্রীমান প্যারীমোহন সেন গুপ্তের 'মেঘের সাগর' কবিতাটীর সমালোচনা কবির ভাষাতেই করা যাইতে পারে।

"ধোঁয়ার পরে ছুটছে ধোঁয়া
মেঘের পরে মেঘের ছোটা
ফাঁকে ফাঁকে নীলের বুকে
রবির হাসির উজল ফোটা।"

কবিতায় ধোঁয়াই বেশী মাঝে মাঝে রবির হাসির মত কবিত্ব কিছু কিছু ফুটিয়াছে।

ভাদ্র। ময়ুর-মাতন। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ। কবিতাটির নাম "ময়ুর-মাতন" না দিয়া "নুপুর-মাতন" দিলেই ভাল হইত। কবি কবিতার শেষে বলিয়াই দিয়াছেন—"আজ—আকাশের ধার রুধি রসের বর্ষণ, সারা—নুপুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায়।"

ছন্দঃ ও অনুপ্রাসের মাধুর্য্যের লোভে কবি কতদূর স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন তাহা এই কবিতাটিই পরিচয় দিবে। ছন্দের চাতুর্য্যের জন্ত আমরা চিরদিনই সত্যেন্দ্র নাথকে প্রশংসা করিয়া আসিতেছি কিন্তু সকল বিষয়েই চাতুর্য্যের দ্বারা পাঠককে প্রতারণা করিতে গেলে ধরা পড়িতেই হইবে। সত্যেন্দ্র নাথের এ সকল কবিতা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" পাঠককে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। একরূপ শ্রোত্ররম অথচ দীনার্থক, হীনার্থক ও ক্ষীণার্থক শব্দ

পুঞ্জের ইন্দ্রজালে পাঠককে অনর্থক প্রবঞ্চনা করা বেশী দিন চলিবে না। এইপ্রকার রচনায় তিনি ছন্দের কসরৎ দেখাইয়া মুগ্ধকরা ছাড়া অন্য কোনো পুরস্কার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। বঙ্গীয় পাঠক তাঁহাকে ছন্দোসাম্রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছে। ছন্দের কারুকার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি এখন উচ্চতর আদর্শের অনুসরণ করিলে বঙ্গীয় পাঠক উপকৃত হইবেন। পাঠকগণ কবিতাটির মাধুর্য্য পাবেনত, উপভোগ করুন।—

ওকে আসছে গো মুখ ঢেকে লোল পর্দ্দায়
ছেয়ে কদমের পেথমের ডোর জর্দ্দায়?
ওরে দূর থেকে দেখে মেতে উঠল ভুবন
তাই হাওয়া করে ফর ফর সব ফর্দ্দায়।
কোন্ দেয়াসিনী রূপসীর বাজল নূপুর!
তাই, কেয়া বনে দেয়া সনে মাতল ময়ূর!
ময়ি পাথনায় ঢাকনায় স্পন্দে তনু,
ভরি পালকের এসরাজ পুলকের সুর?

"ওরে নড়ল কি ঘোমটার মেঘলা আষাঢ়?
"ওরে। উড়ল কি পর্দ্দার এতটুকু পাড়?
হেথা অন্তরে সংবরে সাতশো স্বপন,
হোথা লাগল কি ঢেউ তার জাগল কি সাড়?"

কেকা রবে বলে শিখি টলে পায় পায়!
হানে লাবণির পশলা সে অবনীর গায়!
তার স্পন্দনে ছড়াছড়ি ইন্দ্রধনু।
তার গোপনের শিহরণে বীণ বেজে যায়!

আজি মন ফেরে মেঘে মেঘে, অভ্র শিখায়—
খুঁজে দূর রাকা দূর রাস দূর রাধিকায়
আজ আকাশের রুধি' দ্বার রসের রণন?
সারা দু'পুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায়?

তিলক। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ। মহামতি তিলকের উদ্দেশে যতগুলি কবিতা আমরা পড়িয়াছি তন্মধ্যে ভারতবর্ষের কবিতাটী আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে—তারপর যমুনার যতীন্দ্রমোহনের কবিতাটী—তারপর সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাটী। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটীতে লোক-তিলকের শুচিগম্ভীর মর্য্যাদাটি রক্ষিত হয় নাই।

পুতুলনাচের ঘরে। শ্রীকুমুদরঞ্জন। দূর হতে কীর্ত্তি-কথা শুনিয়া আমরা অনেককেই মহাপুরুষ আখ্যা দান করি—

Distance lends enchantment to the view
And adorns the mountain with azure hue.

কাছে আসিয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আমাদের ভুল বুঝিতে পারি 'এই কথাটাই কবি 'পুতুলনাচের ঘরে' সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আজকে ঢুকে পুতুল নাচের ঘরে
লগ্ন যে আমার ভাঙলো পরে পরে
* * *
আজকে এদের ঘরের মাঝে এসে
অবজ্ঞাতে আপনি মরি হেসে।

বনের জ্যোৎস্না। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। কবি এক একটী পংক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া সাজাইয়াছেন। মানসীর সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে—রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্যকে" মনে পড়ে "এক-খান দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।" তরুণ কবি দেয়ালাতেই হেঁয়ালী রচিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

"দীর্ঘ গাছের সুপ্ত বনে তৃপ্ত যেন কিসের আশা
রুক্ষ পাতার কাণে কাণে চাঁদের আলো কইছে ভাষা"

এসব কি চলিবে? "এ কেবল কাগজের রঙীন ফানুস।"

"গাছে গাছে মাথায় মাথায় জড়িয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে
তাদের পরে আধখানা চাঁদ হাসছে বসে শুভ্রাসনে।"

কি চমৎকার ভাষার বাঁধুনী। তারপর আরো শুনুন—

সুদূর হতে দেখছি চেয়ে গাছের তলায় উজ্জ্বকালো—
লুকিয়ে আছে চোরের মত, পাহারা দেয় তীব্র আলো।"

এ অপূর্ব্ব আলঙ্কারিকতার রস উপভোগ করিতে পারিলাম না। প্যারীবাবুর শক্তি আছে কুহেলির সৃষ্টি না করিয়া ইচ্ছা করিলে জ্যোৎস্নাও দিতে পারেন।

'বর্ষার আশা'। শ্রীনবকুমার কবিরত্ন। যমুনায় একটী কবিতা পড়িয়া মনে হইল এ কবিতাটী ভারতীর গোপীবল্লভ গোস্বামী রচিত 'নাম্নি পিরীতের সমালোচক যমুনার কোনো লেখকের সমালোচনা পাঠে লিখিত 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি'। কবিরত্নের কবিতাটী সুন্দর হইয়াছে যমুনায় তাহার উত্তরটিও সুন্দর হইয়াছে। কবির লড়াই চিরদিনই উপভোগ্য।

আশ্বিন। সন্ধ্যাকালী। শ্রীকালিদাস রায়। কবিতাটি আমাদের ভালই লাগিয়াছে কবিতাটী তুলিয়া দিলাম।

আজ বরষার দিবস শেষে
তোমার পূজা সন্ধ্যাকালী
শ্মশান রচে অর্ঘ্য তোমার
উল্কামুখীর দেউটী জ্বালি;
ধূপ জ্বালে আজ আলেয়াতে
মৃকন্ধালে মাল্য গাঁথে
চিতায় চিতায় হোম করে সে
মজ্জাবসার আজ্য ঢালি।
বিদ্যুতেরি খড়্গ গায়ে
পশ্চিমাকাশ ধূপাঙ্গনে; (?)
কালো মেঘের মেষ মহিষের
রক্ত ছুটে প্রস্রবণে।
ছুলছে তমাল ঝাউয়ের চামর
তুলছে সমীর তুমুল ভাগর
জবায় কানন, অক্তে তড়াগ—
সাজায় তোমার পূজার ডালি॥
জোনাক করে ভোগ-আরতি
ঢাক বাজে মেঘমন্দ্রে আজি,
দাছরী দেয় হুলুধ্বনি
ঝাঁঝর বাজায় ঝিল্লীরাজি।
বিল্বদলের মাঝে মাঝে
নীপযূথী নৈবেদ্য রাজে,
অট্টহাসে পট্টবাসে
নদনদী দেয় করতালি॥

"ধূপাঙ্গনে" কি? বোধহয় প্রেসের গোলমালে 'ম' 'ধ' হইয়াছে। 'মুপাঙ্গনের' স্থানে 'ধূপাঙ্গনে' হইয়াছে।

ভোরাই। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ। কবিতায় 'পদ্ম-কলির হাইতোলা" "আনকো-আলো" "আল্‌তো বাতাস" "পাপড়ি ওজন পানসী"—ইত্যাদি এমন অনেক জিনিস আছে যাহাদের সহিত আমাদের পূর্ব্বে কখনো পরিচয় ঘটে নাই। পাঠককে জব্দ করিবার জন্য সত্যেনবাবু অনেক শব্দই ব্যবহার করেন কিন্তু এবার ভোরাইয়ে জবাই করিবার যোগাড় করিয়াছেন। কতকগুলি পংক্তি তুলিয়া দিতেছি পাঠক পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন এবারকার হেঁয়ালী কিরূপ কঠিন। পুরাতন মুকুলে এবং বর্ত্তমান সন্দেশে যে সকল হেঁয়ালী থাকে পরমাসেই তাহার সমাধান দেওয়া থাকে—কিন্তু ভারতীতে সেরূপ ব্যবস্থা না থাকায় আমরা বড় গোলে পড়িয়া যাই। আমরা প্রবাসীর বেতালের বৈঠককে অনুরোধ করি এই কাব্য সঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন। সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় বঙ্গের একজন সুবিখ্যাত কবির রচনার রস উপভোগ করিতে না পারিয়া সত্য সত্যই আমরা বড়ই অশরণ হইয়া পড়িয়াছি।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"ধানের ক্ষেতের সবুজে কে আজ সোহাগা দিয়ে ছুপিয়েছে
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর পানায় টুপিয়েছে"
"মোতিয়া মেঘের চামর পিঁজে পায়রা ফেরে আলোর ভিজে
পদ্ম ফুলের অঞ্জলি যে আকাশ গাঙে যায় ঢেলে।"
"আলোর জোয়ার উঠছে বেড়ে গন্ধ ফুলের স্বপন কেড়ে
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক ঝলমলে।"
ইত্যাদি।

আমরা সত্যেনবাবুর অনেক অনুরাগী ভক্ত পাঠককে এই শ্রেণীর কবিতার খুব সুখ্যাতি করিতে শুনিয়া রসলিপ্সু হইয়া প্রশংসার কারণ জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু প্রায়ই তাঁহারা "কাজ আছে বলিয়া প্রস্থান করেন।" আমাদের মনে হয় কবির ছন্দেরমাধুর্য্যে ও বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যে মুগ্ধ হওয়ায় স্বাতন্ত্র্যটাকে রক্ষা করিবার জন্য নির্ব্বিচারে প্রশংসা করেন। Rational প্রশংসা একজনেরও ভাল—Irrational প্রশংসা শত সহস্রেরও স্পৃহনীয় নহে।

ঘুমপাড়ানি গান। শ্রীযুক্ত কিরণধন বাবুর আর একটী সুন্দর কবিতা—স্থলাভাবে সমগ্র কবিতাটী তুলিয়া দিতে পারিলাম না।

আতা গাছে তোতা পাখী, ডালিম গাছে মউ
ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে লিখছে চিঠি বউ ;
মনের মত হয়না চিঠি, দেড়টা বেজে যায়,
সাব বুঝি ঐ খাওয়া হোলো—চমকে ফিরে চায়।
গাঁয়ের পথে উড়িয়ে ধুলো গোরুর গাড়ী চলে,
বাবুদের ঝি বাসন মাজে খাঁ-পুকুরের জলে,
পেয়ারা-ডালে ঝুলিয়ে দোলা খায় ছেলেরা দোল,
ইস্কুলেতে পড়ছে যারা তাদের ঘাড়ে কোঁৎকা!—
বণিকের বৈনাশিকের—শিশু হত্যার কল,
সরস্বতী আঁচল দিয়ে মোছেন চোখে জল।
ভগ্ন-অংশ একটি গানের লাগছে কানে এসে,
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলে, বর্গী এল দেশে।

* * * * *

দুধের বাটি ঝিনুক দিয়ে বাজনা বাজায় কেগো?
দুষ্টু-ছেলে দুধ খাবেনা, ভুলিয়ে তাকে দেগো।
উঠবে ছেলে পাশের ঘরে শব্দ করিসনে,
এই শুয়েছে, কাঁচা-ঘুমে জাগিয়ে তুলিসনে।
বামুন-দিদি কয়েদ কোরে আনচো কাকে ধরে?
কচ্ছিল চোর আচার-চুরি লুকিয়ে ভাঁড়ার ঘরে?
বয়েস হলে দেখ্‌চি ওটা ডাকাত হবে শেষে।
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এল দেশে!

এই কবিতাটীর রচনা সর্ব্বত্র বেশ ঝরঝরে তকতকে হয় নাই। মাঝে মাঝে ছন্দে একটু আধটু দোষ আছে।

অর্চ্চনা। আষাঢ়। কুয়াসা। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। এই কবিতাটী বড়ই ভাল লাগিয়াছে। কবিতাটি তুলিয়া দিতেছি—

১

নেইক সময় নেই কোন ভাই
ছুট্‌কো আলের কারবারে,
হরবড়ি হই গড়হাজিরই
রাজ-রাজাদের দরবারে
আম মুকুলের ঘ্রাণ টুকু,
শুভ্র ফুলের দানটুকু,
রঙিন পাতার ঝিলমিলে ভাই
তর সহেনা একবারে।

২

ভাবছি যখন যাই চলে যাই
রাতটা কেবল ভোর করে,
আটকিয়ে পথ এমনি বিপদ
মেঘ জমে ভাই ঘোর্ করে।
মৌমাছি সব গুঞ্জরে,
কুসুম কোরক মুঞ্জরে,
আলগা পেলেই পাগ্‌লা হাওয়ায়
হাত টানে হায় জোর করে।

৩

কাল্ বয়ে যায় জাল বয়ে যায়
ক্ষীরের কড়ায় আঁচ লাগে,
কাত্‌না ডুবায় মাছ লাগে হায়
চিল্ ঘুড়িটায় প্যাঁচ লাগে।
বসের হাতায় 'তার' বাঁধে
হাঁসগুলো সব সার বাঁধে,
লগ্ন আমার যায় বয়ে যায়
বাঁধ না হতেই সাঁজ লাগে

৪

তোমরা যখন যাও চলে যাও
দুই পাশে যাও ডাক দিয়ে—
বেলায় তখন কাজের সময়
কাজ যে দাঁড়ায় ফাঁক দিয়ে
নলিন আঁখির অলগুলি,
ব্যথিত মরম ভলগুলি,
কাতর চোখেই পিছন ডাকে
ঝাপটার ফাঁক দিয়ে।

পুস্তক সমালোচনা

...নার স্রোত। শ্রীপুলক চন্দ্র সিংহ প্রণীত। ...তা, কর-মজুমদার এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস শ্রীযুক্ত নীরদ রঞ্জন মজুমদার বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ...একটাকা। এই উপন্যাস খানি উপাসনায় ধারা-প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা তখন বিশেষ আগ্রহের পাঠ করিয়াছি। পুলক বাবুর হাত বড় মিঠে-ভাষার ও ভাব ব্যঞ্জনার যথেষ্ট শক্তি আছে। তিনি এই ...সে ঘটনা-বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না করিয়া ...টী সামাজিক সমস্যার কথা উত্থাপন করিয়া খুব ...ভাবে জোরাল কথায় পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করিতে চেষ্টা ...াছেন, তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়াই ...হয়। তিনি আমাদেরই ঘরের ছবি, ঘরোয়া রঙে ...ইয়াছেন। তাঁহার এ পুস্তক সাধারণ্যে আদর ...বে।

সৈনিক বধূ। ভূতপূর্ব্ব বসুমতী সম্পাদক, ভবানী ...র, শতগল্প বরাহমিহির প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা ৺কালী ...য় চট্টোপাধ্যায়ের রেনল্ডসের সোলজার্স ওয়াইফের ...অনুবাদ। কলিকাতা ১নং কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস হইতে ...র মজুমদার এণ্ড কোং হইতে প্রকাশিত মূল্য দুই টাকা; ...কৃষ্ট এণ্টিক কাগজে প্রায় ৩০০শত পৃষ্ঠার অধিক—সিল্কের ...ধাই। গ্রন্থ-সম্পাদক, গ্রন্থকারের সুযোগ্য পুত্র, শ্রীযুক্ত ...াবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নিবেদনে যাহা বলিয়াছেন ...াহা হইতে আমরা জানিয়াছি যে বহু পূর্ব্বের অনুবাদ ...লিয়া অনুবাদের কিছু কিছু হারাইয়া গিয়াছিল; সম্পাদক ...নিজেই সেটুকুর অভাব পূরণ করিয়াছেন এবং তাহাও এত সুন্দর হইয়াছে যে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই অনুভব করা যায় না।

মূলগ্রন্থখানি সৈনিক-জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে পাশ্চাত্য সমাজের সম্মুখে ধরিয়া একদিন সেখানে হুলুস্থুল আনিয়াছিল। কেমন করিয়া তরল হৃদয় তরুন যুবকের কুসুম কোমল প্রাণ আড়কাটীর কুহকে পড়িয়া অকালে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইতে রক্তে রাঙা হইয়া গেল, কেমন করিয়া সেই ননির মত কোমল পরাণটী পাষানের মত ধীরে ধীরে কঠিন হইল, ইহাই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়। এক কথায় গ্রন্থ খানি এক কালের পাশ্চাত্য রণ-জীবনের প্রকৃষ্ট চিত্রপট।

যাঁহাদের মূলগ্রন্থ খানি পাঠ করিবার সুবিধা হইবে না তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠে যে মূলের আস্বাদনই প্রাপ্ত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, পাকা হাতের অনুবাদ ভাষায় জীবন আনিয়াছে। গ্রন্থকার যেন পাশ্চাত্য কাব্য-কুঞ্জে বসিয়া দেশী রাগিণী আলাপ করিয়াছেন, সুরে প্রাণ মিশিয়াছে, তাই ভাষা এমন জীবন্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ পাঠকের সম্মুখে ধরিব—"সেই চাল নাই চুলো নাই অকর্ম্মা হা...ীন মত ছোঁড়াটা, সে কি তোমার এই রূপ গুণের যো...?" "শরীর যেন চামড়া মোড়া হাড়ের ঠাট্;" "আজ সদ্য টাট্‌কা বেশ সতেজ তালের গাছ হতে সদ্য সদ্য পেড়ে আনা খাঁটি তাড়ি পেয়েছি পাক্কা এক কলসী" "জাহাজী ভেড়েল" "বিশ্বাসঘাতকতার কল্কি অবতার," "ঠাকুরের কটাক্ষে গরীবের যে অতি নগণ্য আশা পূর্ণত দূরের কথা—ছয়লাপ হয়ে যেতে পারে।" "বাল্য বয়সের বেয়াড়া বদমায়েসীর দরুন" "অজস্র শোনিতস্রাব দর্শনে যে সব সখের সৈনিক পুরুষেরা মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন" ইত্যাদি।

অনুবাদক নিবেদনে বলিয়াছেন—"রেনল্ডসের লেখায় আমি এতই ডুবে গিয়াছিলাম যে,হয়ত অনেক স্থলে যথাযোগ্য বর্ণনার অবসরই পাই নাই, পাঠক, এ দোষ আমার, এ অপরাধ আমার অকৃতকার্য্যতার, তাই বলি দুঃখিনী সুসির উদ্দেশে একবিন্দু অশ্রুজল নিক্ষেপ করে আমাকে অকৃতকার্য্যতার অপরাধ হতে মুক্তি দানে যেন কাতর হবেন না। এ পুস্তকের মূল্যই—একবিন্দু অশ্রুজল।" আমরাও তাঁর

উত্তরে বলিব গ্রন্থকার গ্রন্থের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন পাঠকেরা তাহা যে শুধু মানিয়া লইবেন তাহা নহে, পরন্তু অশ্রুবিন্দুর পরিবর্ত্তে তাঁহারা অশ্রুধারায়—এ গ্রন্থ ক্রয় করিবেন। হতভাগিনী লুসী ও হতভাগ্য ফ্রেডীর জীবন চোখের জল দিয়া শুধু 'ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে' অনুভব করিবার জিনিস।

বাঙ্গলা পুস্তকে মুদ্রাঙ্কনের ভুল হইতে প্রায়ই দেখা যায়, এ গ্রন্থে সে ভুল নাই বলিলেই হয়—তবে একস্থানে একটি মারাত্মক ভুল রহিয়া গিয়াছে। ২৪৪ পৃঃ একচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস একাদশ ছত্রে 'ফ্রেডরিকই'র পর পূর্ণচ্ছেদ হইবে না।

অনুবাদ সাহিত্যে এই পুস্তকের বিশেষ আদর হইবে।

জাতের বিড়ম্বনা। মুক্তিপথে সিরিজের প্রথম পুস্তক। শক্তিশালী লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ দ্বারা আর্য্য পাবলিশিং হাউস, [illegible] মোহনলাল ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মূল্য তিন আনা। চাতুর্ব্বর্ণ্য [illegible] গুণাগুণ বিশ্লেষণ ব্যপদেশে তিনি তেজালো ভাষায় খাঁটি সত্যকে সকলের সামনে ধরিয়াছেন। [illegible] এখন শয়তানের মত অবাধে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নরনারীর বুকের রক্ত শোষণ করিতেছে। —মনুর মতবাদ ভারী পাথরের চাপের মত দুর্ব্বলের বুকের উপর চাপিয়া আছে। "কিন্তু ভগচ্চরণ নিঃসৃত জাহ্নবীর পূতধারা এবার শতমুখী হইয়া ছুটিবে—সে পাথর সরিয়া যাইবে। হে টিকিদাস ভট্টাচার্য্য। তুমি পুঁথির বাঁধ দিয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।'

বাঙালীর ব্যবসাদারী। মুক্তিপথে সিরিজের ২য় গ্রন্থ। অধ্যাপক শ্রীপার্থসারথি মিশ্র, এম, এ, প্রণীত। উক্ত প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। [illegible]

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বাঙালী সত্যতা ও নিষ্ঠা হারাইয়া সব তাতেই একটা খোলস পরিয়া অভিনয় করে—।

নিজের পুঁটুলি বাঁধিয়া সে শুধু অন্তঃসার হীন হইয়া পড়িতেছে। সমাজ শরীর এই [illegible] আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। খড়িমাটি ও 'রঙ মাখিয়া বাঙালী আর কত দিন বহুরূপী থাকিবে?

"কে গাবে নূতন গীতা— [illegible]
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার [illegible]
কোথা সে অগ্নিবাণী?
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি?
কালোকে দেখাবে কালো করে
আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো—
ঝড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত
বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো।"

অধ্যাপক মহাশয় যে নির্ম্মম সত্য কথা আমাদের শুনাইয়াছেন—তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সকলের সেথা কর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নবান হওয়া উচিত। এই সিরিজের বইগুলি সুলভ—বাঙালার ঘরে ঘরে এগুলি থাকা উচিৎ।

সন্ধ্যামণি। শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত লিখিত। ১৪নং জগন্নাথ দত্তর ষ্ট্রীট, গড়পার, কলিকাতা সুবোধ পাবলিশিং সমিতি হইতে শ্রীসুবোধকুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।— "ছয় আনা সিরিজের সপ্তম উপন্যাস" (?)

প্রিয়কান্ত বাবুর লেখার সঙ্গে আমাদের বহুবার পরিচয় হইয়াছে। করুণ-রস অবতারণায় তিনি দিন দিন বিশেষ সাফল্য লাভ করিতেছেন। সন্ধ্যামণির [illegible] গল্প আমরা পূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় পড়িয়াছি। [illegible] সমাধি", "প্রাপ্তি" "স্নেহের ক্ষুধা" "ফুলের [illegible]" প্রভৃতি গল্পগুলি বেশ ভালই হইয়াছে। "উপেক্ষিতা" গল্পটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করুণ ও চিত্তগ্রাহী মনে হইল। "প্রাপ্তি" গল্পের নাম প্রাপ্তি হওয়া অপেক্ষা [illegible] হইত। [illegible] দিকে [illegible] জুড়িয়া দিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করি তিনি কোন্ কারণে সন্ধ্যামণিকে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করিলেন?

মিলনের পথে। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত একখানি উপন্যাস। সুন্দর ঝক্‌ঝকে বাঁধাই—কাগজ ও

ছাপা সুন্দর—মূল্য দেড় টাকা—৪।এ মোহনলাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার হইতে শ্রীসরোজিনী ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বারীনবাবু দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই একেবারে "সব্যসাচীর" মত নানাদিক হইতে বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন—সাহিত্যক্ষেত্রে চঞ্চল করিয়া তাঁহার লেখনী নানাভাবে নানাদিক হইতে রসসংগ্রহ করিয়া বাঙালার নরনারীকে বণ্টন করিয়া দিতেছে—এতদিনকার পুঞ্জিভূত হৃদয়াবেগ এখন এমনিভাবেই দিনকতক আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ চমকিত করিবে।

অনেকদিন পরে একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস পড়িলাম—ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশ করিয়া তিনি যে চিরন্তন হৃদয়-বিনিময়ের কথা—লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নানা উপন্যাসিক নানাভাবে চরিত্র-চিত্রনের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এমন বৈচিত্র্য এমন মাধুর্য্য দিয়ে আমাদের ঘরের কথা প্রাণের কথাকে প্রাণস্পর্শী করিতে এমনভাবে কেহ সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

একদিকে রাধু ও সুন্দরীর বাল্যজীবনের মধ্যে সরসসুন্দর শিশু-প্রীতির অনাহত অনুভূতি—তাহার পর সুন্দরীর "বুড়ো বরে"র সঙ্গে বিবাহ—সুন্দরীর অকাল বৈধব্য ও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ—প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে অবিরাম বিপর্য্যয়ে মানুষী প্রকৃতির অপূর্ব্ব প্রকাশ ভঙ্গীমা—অন্যদিকে মতির সাধারণ-ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্তির পর জীবনের পরিবর্ত্তন। সমাজ-সেবায় জীবনমন উৎসর্গ করিয়াও ঈশ্বর জ্ঞানহীন "মতি সমাজ শরীরে শুধু ক্ষত ও ব্রণ খুঁজিয়া বেড়াইত—সে ছিল অশন বসনভূষণে এই সমাজ দেবতার সেবার কাঙ্গাল।" তাহার পর "পরমার্থ ভাবযোগে" যোগিনী সুন্দরীর সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেদনার বিনিময়ে অনুরক্তি।—"এই দু'জনের কামনায় যাহা গড়িয়া উঠিল তাহা হিন্দুসমাজের সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্ব। তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিলে এই সমাজ নিজেকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শুধু একটা নহে এমন কত নিরাময় সুপুষ্ট সবল দেহ গড়িয়া লইতে পারে। ইহা শুধু হিন্দু-সমাজের নহে, সমস্ত মানব সমাজের অন্তরতম সঞ্জীবন তত্ত্ব।"

সমস্ত উপন্যাস খানির মধ্যে একটা গাঢ় ঢল ঢল ভাব ওতপ্রোতভাবে ছড়াইয়া আছে—! তিনি খাঁটী বাঙলার মাটী-রূপটীকে অন্তর দিয়া পূজা করিয়াছেন। তিনি যাহা লেখেন তাহা অন্তর দিয়া লেখেন তাই ভাব ব্যঞ্জনার মধ্যে কোথাও একটু আড়ষ্টভাব বা কষ্ট কল্পনার কাকুতি আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ভাষার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, উপমাগুলির মধ্যেও একটা অনন্যসাধারণ ভঙ্গীমা আছে। মানবপ্রাণের নিত্য অনুভূত ভোগ ও ত্যাগের সমস্যাকে আপনার ভাবে ফুটাইয়া প্রেমসাধনার সিদ্ধি কোথায়, মিলনের পথে কোথায় প্রাণ বিনিময়ের সিদ্ধি সফলতা তাহা দেখাইয়াছেন। তপস্যার "কুটীর কমণ্ডলু ধুনী রুদ্রাক্ষ পিছনে পড়িয়া' থাক, "সংযমের নদী ভোগের বৈকুণ্ঠ দিয়া সব-রসের সাগর রচিতে" থাকুক।

ভাষা ও সুর। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি' প্রণীত কবিতার বই—মূল্য একটাকা—১নং তাঁতিবাগান রোড হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গে কবি বলিতেছেন—জ্ঞান তুমি হরি,
আঁকিয়াছি শিব কিম্বা এঁকেছি বানর—

প্রথম অনুষ্ঠানেই এরূপ উপমা প্রয়োগ সুষ্ঠু হয় নাই। পাঁচ ভাগে বিভক্ত অনেকগুলি কবিতা একত্র করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে—

পরিচয় আগমন স্মৃতি মৃত্যুকামনা বিরহ তপস্যা তোমাতে আমাতে, প্রাক্তন চিরদাসী এই কয়টী কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বাকী কবিতাগুলি অধিকাংশই উপভোগ্য নহে—ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যে কোনও মৌলিকত্ব নাই। তাহা ছাড়া—"পৃথ্বী"র সঙ্গে "কীর্ত্তি"র মিল, আদৌ সুসঙ্গত নহে। অনেক স্থলে ছন্দোপতন দৃষ্ট হয়। কবিতার "ঝটিকা সংক্ষুব্ধ স'রে,' "সাদ্ধি-সহস্র বর্ষের" প্রভৃতি বাক্য কবিতায় মানায় না—।

"অভিমানিনী" কবিতায় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের এর "আশ্রিত" কবিতায় রবিন্দ্রনাথের বিশ্বনৃত্যের কিছু ছায়ামত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৬শ বর্ষ মাঘ - ১৩২৭ ৭ম সংখ্যা

আলোচনী

বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা

[সম্প্রতি অন্নবস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতার কারণ এবং তাহার প্রতিকার নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত এক সংঘ গঠিত হইয়াছে, তাহারই বৈঠকে উপাসনা সম্পাদক মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই ভাবানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল— কি, কু রা]

বিগত যুদ্ধের পর হইতে, অন্নবস্ত্র এবং আবশ্যক নানাদ্রব্যাদি দারুণ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রকোপ সমস্ত দেশই ন্যূনাধিক ভোগ করিতেছে কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার প্রকোপ যত অধিক এমন আর কোথাও নহে। যুদ্ধের সময় অর্থের অতি প্রয়োজন বশতঃ নোটের বহুল প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়াছিল এই এবং এইরূপ নানাকারণে সমস্ত দেশই অল্পাধিক কষ্টভোগ করিতেছে কিন্তু ভারতবর্ষ ইহার প্রকোপে এবং তাহার নিজস্ব অনেকানেক কারণে যত ভুগিয়াছে এবং ভুগিতেছে এমন আর কোন দেশই নহে। গত আটবৎসরের হিসাবের দিকে তাকাইলে বুঝা যায় যে দেশের চাউল উৎপাদন কি প্রকার ক্রমবনতির দিকে চলিয়াছে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ইহার কারণ কি? পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যখনি এইরূপ দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যাইত বর্ম্মা হইতে চাউল আমদানি হইয়া আসিয়া দেশবাসীর অনেকটা কষ্টের লাঘব করিত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু দিন পর হইতে অর্থাৎ ১৯১৬ সালের প্রারম্ভ হইতে বাঙলা দেশে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকিলেও বর্ম্মা হইতে চাউল বাঙলা দেশে না আসিয়া, আমেরিকা ইংলণ্ড, জাপান, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশে চালান হইতে থাকে—শুধু তাহাই নহে বাঙলা দেশ হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ চাউল মাসের পর মাস বিদেশে প্রেরিত হইতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ তখন বলিয়াছিলেন—যে চাউল চালান করা হইতেছে তাহা উদ্বৃত্তাংশ, ইহা সত্য নহে। কেননা বাঙলা দেশে ১৯১৬ সাল হইতেই দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা গিয়াছিল তথাপি বাঙলা দেশ হইতে প্রেরিত চাউলের পরিমান ১৯১৬—১৭ ও ১৯১৮—১৯ সালের মধ্যে ৭৫০০০

হইতে ১৫৩০০০ টন বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন বাঙলা দেশ বাসীরা ক্ষুধায় প্রপীড়ত তখন তাহার সম্মুখ হইতে খাদ্য লইয়া গিয়া অন্য দেশবাসীর মদ চোলাই হইয়াছে—পুরী জেলায় যখন লোকে ঘাস পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিল তখন তাহারই দেশে উৎপন্ন তাহার খাদ্য জাহাজ বোঝাই হইয়া অন্য দেশে গিয়াছে।

কিন্তু ইহাই এক মাত্র কারণ নহে।

অন্যান্য কারণের মধ্যে দেখিতে গেলে, প্রথম নজরে পড়ে যে শস্য উৎপাদনের দরুণ যে প্রকার জমি আবশ্যক তাহা কথঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছে। উপরন্তু বর্দ্ধমান, মৈমনসিং এবং বরিশাল প্রভৃতি জেলায় জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে কৃষির অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

অনেক স্থলে শস্য উৎপাদনোপযোগী বিস্তৃত ক্ষেত্র দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে, নানাপ্রকার আগাছা আবার ক্ষেত্রগুলিতে শস্য উৎপাদনের পক্ষেবিস্তর বাধা বিস্তার করিয়া ক্রমাগতই সংখ্যায় বাড়িতেছে ইহা ছাড়া অধুনা কৃষিকার্য্যকে অধিকাংশ লোকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে ইহার কারণ এই যে কৃষিকার্য্য করিয়া লাভবান হইতে আমাদের দেশে প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। আর এক সমস্যা এই যে কৃষিতে সম্বৎসরের খোরাক না চলাতে বৎসরের অধিকাংশ সময় কৃষকদিগকে টাকা কর্জ্জ করিয়াসংসার চালাইতে হয়। জমিদারের নিকট হইতে তাহারা এ বিষয়ে সাহায্য পাইয়া থাকে। কিন্তু বাংলার জমিদার শ্রেণীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হওয়াতে কৃষকেরা বাহিরে হাত পাতিতে বাধ্য হইয়াছে। এদিকে সুচতুর ইংরেজ বণিক কিংবা মাড়োয়ারীগণ টাকার থলি লইয়া কৃষক দিগের সম্মুখে হাজির। তাহারা উৎপন্ন শস্য, নগদ মূল্যে এবং ভবিষ্যতের জন্য দাদন দিয়া নিজেদের জন্য জোগান লইতে কৃষকদিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছে। দাদন দিবার সময় শস্যের যে মূল্য থাকে পরে উহা বাড়িলেও কৃষকের তাহাতে আর কোন হাত থাকে না। এই রূপে বাঙলার ভাণ্ডার নানাদিক দিয়া নানা হাতে লুট হইয়া যাইতেছে।

কি উপায়ে চারি পার্শ্বের এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে? দেশ হইতে টাকার জোগান দিতে পারিলেই কৃষকদিগকে তথা উৎপন্ন শস্যকে বিদেশীর হাত হইতে বাঁচাইবার উপায় হইতে পারে। এ জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং বাজার বিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষকশ্রেণী যাহাতে বিদেশী এজেণ্টগণের সঙ্গে কারবারে না ঠকতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আইন অনুসারে শস্য বিক্রয় এবং বিনিময় সমবায় সমিতির অধীনে আনিতে হইবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। দাদনের হাত হইতে কৃষককে বাঁচাইতে হইলে তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তাহার উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমেরিকায় ফ্রান্সে এবং বেলজিয়মে এইরূপ ব্যবস্থায় প্রচুর উপকার পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে সংসারযাত্রার অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যও হ্রাস হইবার কথা।

তাহার পর কাপড়ের বাজার

গত পূজায় কাপড়ের বাজার, মুদ্রাবিনিময়ের আনুকূল্যের নিমিত্ত যত সস্তা হওয়া উচিৎ ছিল, তত সস্তা হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়বুদ্ধি প্রণোদিত মৎলব এবং চাল। কিছুদিনের জন্য কাপড় খুব সস্তায় বিক্রী হইয়াছিল কেননা সেই সময়টা বিলাত হইতে অধিকতর কাপড় আমদানী আশা করিয়া, ব্যবসায়ীরা তাহাদের গুদামজাত মালের কতকাংশ বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের একচেটিয়া শাসন হইতে মুক্তি পাইয়া, কিছুকালের জন্য কাপড়ের মূল্য কম হইয়াছিল—কিন্তু কিছুদিন পরেই বিলাতে শ্রমজীবিদিগের গোলমাল হয়, তদ্দরুণ মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি এবং বিলাত হইতে সটান রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে, আবার মূল্য বাড়িয়া যায়। স্বদেশী মিলেরা সুযোগ বুঝিয়া এই সময় কাপড়ের মূল্য চড়াইয়া দেয় এই কারণে মূল্যাধিক্য চলিতেই থাকে, যদিও সেই সময়ে মুদ্রাবিনিময় সানুকূল হইয়াছিল। বাঙলা দেশের মাড়োয়ারীরা প্রথম সুযোগ বুঝিয়া সময়মত মাল গুদামজাত করিতে পিছপাও হয় নাই—তদ্রূপ দেশের তন্তুবায়েরাও। এই সময়ে বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী এবং কল্যাণ মিলের দেয়

লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫-২০—যখন পাশেই সুরিয়া কটন, দানবার এবং নিউরিং মিল্ শতকরা ৫০-২০০ লভ্যাংশ দিতেছিল। শেষোক্ত মিলগুলি ১৯১৪ সালে কিছুমাত্র লভ্যাংশও দিতে পারিয়াছিল, কিনা সন্দেহ।

ইহা প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইতেছে ব্যবসায়ীদের নিদ্ধৃত্ত লাভের উপর উচ্চ মাশুল আদায় করা। এই সময়ে বণিকদিগের ন্যায্য লাভ সঠিক নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে ভাল হয় যাহাপেক্ষা কোন বণিককে অধিক লাভ করিতে দেওয়া হইবে না। ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্ট হইতে, এই রকম গোলমাল হইলেই, লোক নিযুক্ত হয়—যাহারা বণিকদিগের এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করে এবং কৃষিদ্রব্যের মূল্য এবং কৃষিজীবির পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত করিয়া এবং তৎসঙ্গে বণিক দিগের ন্যায্য লাভের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি এইরূপ কোনো পন্থ আবিষ্কার আবশ্যক মনে করেন নাই।

আর এক কথা ভারতবর্ষ হইতে তুলা-রপ্তানি অল্পই হইয়াছে। তুলা রপ্তানি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিলে কিংবা রপ্তানি-শুল্ক বসাইলেও বিশেষ কোন ফল হইবেনা কারণ তাহাতে জাপান ও ম্যানচেষ্টার হইতে বস্ত্র আমদানির কোন ব্যাঘাত হইবে না।

ইংলণ্ডে যে শুধু গবর্ণমেণ্ট হইতেই শিল্পরক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহা নহে, বিভিন্ন শিল্প-সংঘের মুখপত্র স্বরূপ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এক সঙ্গে মিলিয়া, তাঁহাদের নিজের নিজের শিল্প সম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যক প্রশ্নাপ্রশ্নের সমাধান করে। আমাদের দেশেও এইরকম হওয়া প্রয়োজন।

'পড়ে' পাওয়ার দাগা"

[শ্রীপ্রমোদগোপাল রায়]

এদিক ওদিক চেয়ে যখন দেখলাম কাছে বড় এমন একটা কেউ নেই তখন খপ্ করে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আলোয়ানটা ভাল করে মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চল্লাম।

বড়দিনের দিন সাতেক আগে রবিবারে ইডেন উদ্যান থেকে রাত আন্দাজ সাড়ে ছটার সময় যখন বেড়িয়ে ফিরছিলাম—বাগান যখন পেরিয়ে যাব এমন সময় একটা কুকুর শীতেই হোক আর আনন্দেই হোক কেমন একটা অনুনয়ের কাতরস্বরে ডেকে আমার পায়ের গোড়ায় লুটিয়ে পড়ল। আমি একটু দাঁড়িয়ে আশ্‌পাশে চেয়ে দেখলাম কেউ নেই। পা দিয়ে কুকুরটাকে সরিয়ে আমি রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম; তবুও সে আমার সঙ্গ ছাড়লোনা, ছুটে এসে আমার পার কাছে লুটিয়ে পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে ন্যাজ নাড়তে লাগল। গ্যাসের আলোয় তাকিয়ে দেখলাম কুকুরটা বড় সুন্দর দেখতে। লম্বা লম্বা বাদামী লোমে সমস্ত গাটি ঢাকা, ন্যাজটি চামরের মত; মুখটি সরু, চোকের কাছে খানিকটা করে কাল। গলায় কোন বগ্‌লেস ছিলোনা। আমি মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে পলাশী গেটের সুমুখ দিয়ে ছোট মাঠটায় এসে পৌছুলাম, কুকুরটা তখনো আমার পেছনে লাফাতে লাফাতে আস্‌ছে। পলাশী গেটের প্রায় সামনে পাঁচীলের পাশে বসে ছোলামটর ভাজাওয়ালা তখনো দু তিন জন খদ্দের জুটিয়ে গল্প কর্চ্ছিল, তারা কেউ আমাদের লক্ষ্য কর্ল্লোনা। মাঠের অন্ধকারে আমি আবার দাঁড়ালাম। কুকুরটা আবার আমার পা'র গোড়ায় লুটিয়ে পড়ল। আমি এদিক ওদিক চেয়ে যখন দেখলাম কাছে বড় এমন একটা কেউ নেই তখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে আলোয়ানটা ভাল করে জড়িয়ে নিলাম। সে আমার কোলে নেতিয়ে পড়ল। তার গা নরম—মখমল।

সারা রাস্তা উড়ে বেরিয়ে গেলাম। কারুর গায়ে ধাক্কা

লাগলে আমি কেঁপে উঠছিলাম পেছনে কেউ কাউকে ডাকছে শুনলে বুকটা দুর্ দুর্ করে উঠ্‌ছিলো। সমস্ত রাস্তা ওমনি ভাবে ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে বাড়ী এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

বাড়ীতে পৌঁছে মনে হলো ছি, ছি, একি নীচতা! কিন্তু এই চুরি করেও ত আমি একে রাখতে পার্ব্বোনা। ভাবলাম, যাক কালকে একটা হুলিয়া করে দিলেই হবে।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে শোবার ঘরে এসে দেখি আমার মেয়ে ইভুরাণী ভাত খাচ্ছে আর তার সাম্‌নে বসে তার মা অর্থাৎকিনা—খোকার জন্যে একটা মোজা বুন্‌ছে।

আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম "মা কৈ গো?" শচী কাঁটার ওপর মোজার ঘর গুণ্‌তে গুণ্‌তে উত্তর দিলো "ও ঘরে কি কচ্ছেন।" আমি আর দ্বিরুক্তি না করে কুকুরটা আস্তেআস্তে শচীর গায়ে ছেড়ে দিলাম। সে ধড়্‌ফড়্ করে লাফিয়ে উঠে কুকুরটা দেখে বল্লো "তোমার কি কোন কালে ছেলেমানুষী যাবেনা? আমি হাস্‌ছি দেখে বলে উঠ্‌লো "কিযে দাঁতবের করে হাস তার কোনমানে নেই। আমাকে যে এখন কুকুরটা ছুঁইয়ে দিলে আম মা'র খাবার গুছিয়ে দিই কি করে বলোত?" কুকুরটা ততক্ষণ পাপোষের ওপর সুমুখের দুপায়ের মধ্যে মুখটা রেখে মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে চেয়ে দেখ্‌ছিলো। ইভুরাণীর তখন পর্য্যন্ত হাসির দম থামেনি। আমি বল্লাম "দেখ দিকি কুকুরটা কি সুন্দর দেখ্‌তে।" "পাপোষটার ওপর শুলো। কুকুরের না কিছু করে, দাঁড়াও আমি দেখাচ্ছি মজা" এই বলে শচী আমার ছড়ি গাছটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই আমি হাত থেকে ছড়ি গাছটা কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লাম "ওর নাম কি রাখা যায় বল দিকি।" "যাও আমি জানিনে" বলে গম্ভীর ভাবে বসে আবার মোজা বুন্‌তে আরম্ভ কর্ল্লো আমি বল্লাম "বলনা?" শচী বল্লো "ভাল চাও তো এই বেলা ওটাকে বিদেয় করে এসো বলছি।" আমি বল্লাম "এসো নামই তবে থাকলো। আয় এসো।" কুকুরটা লাফিয়ে আমার কাছে এলো, আমি তাকে কোলে করে বস্‌লাম। আমার স্ত্রী আড়নয়নে একবার শুধু চেয়ে দেখ্‌লেন। আমি বল্লাম "ইভু, একে শুতে দেওয়া যায় কোথায় বল দিকি?" সে তার মার মুখের দিকে একবার চেয়ে মুহূর্ত্ত ভেবে উত্তর দিলো "সেই ভাঙা দোল্‌নাটায় ওর বিছানা করে দিলে হয়না বাবা?" সেত এখনি হয় না; আজ রাতের উপায়?" তারপর শচীর মুখের দিকে একবার চেয়ে বল্লাম "থাক, আজ রাতটা না হয় এই খাটের এক কোনেই শুইয়ে রাখবো।" একটু হেসে শচী বল্লে "কেন আমাকে রাগিযে দিচ্ছো? আর তুই পাজী মেয়ে খাওয়া হয়ে গিয়েছে ত হাঁ করে বসে রইছিস্ কেন? চ' আঁচাবি চ'।" আমি বল্লাম "এর শোবার একটা ব্যবস্থা করে দিলে না?" "তোমার যা ইচ্ছে হয় কর; আমি মাকে এই বলতে চল্লাম" বলে শচী উঠে দাঁড়াতেই মা দুয়োর গোড়া থেকে উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা কল্লেন "কি বৌমা?" তাঁর বৌমা ওমনি মাথায় ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে কোমল কণ্ঠে বল্লেন "দেখুন দিকি মা, কোথা থেকে রাস্তার একটা খেয়ো কুকুর নিয়ে এসে বিছানায় শোয়াবে।" মা হেসে রায় দিলেন "নারে কাল বেলা তিন্‌টে পর্য্যন্ত সাবান দিয়ে ঐ রাজ্যের বিছানা পরিষ্কার করেছে, ময়লা করিস্‌নে।" তারপর "আঁচাবি নাকি? আয়," বলে ইভুকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। আমি শচীকে বল্লাম "মা কি ভাব্‌লেন জান? ভাবলেন তাঁর ছেলের বৌর আজো বুদ্ধি হয় নি। তিনি 'এসো'কে দেখ্‌তেও পান নি, তোমার কথা বিশ্বাসও করেন নি।" শচী একবার আমার পানে চাইলো মাত্র, কথা কইলো না। আমি 'এসো'কে তার কোলের ওপর দিয়ে বল্লাম "দেখ দিকি কিরকম মখ্‌মলের মত নরম গা এর।" এক ধাক্কায় 'এসো' কে ফেলে দিয়ে শচী বল্লো "আঃ কি জ্বালা! কখন কি তোমার ছেলে মানুষী যাবে না?" "সেত আমার ওপর নির্ভর কচ্ছেনা, সে ভার তোমার ওপর।" "এই বুঝি ঠাট্টা সুরু হলো?" "আমি যে ঠাট্টা করিনে তার সাক্ষী ইভু, সে বলে "বাবা, মাকে তুমি যত ভালবাস মোটেই তত আমাকে ভালবাস না।" এই বলে শচীকে আমার বুকের কাছে একটু টেনে নিতেই সে বল্লে আঃ কি কর, মা আস্‌ছেন" আর সঙ্গে ইভুও ঘরে এলো। মা বল্লেন "হাঁরে সুধীর, সত্যিই তুই নাকি একটা বড় সুন্দর কুকুর এনিছিস্?" "হাঁ, এই দেখনা মা।" এসো তখন চুপ করে একটু বসে লাফিয়ে গিয়ে একটু বসে

আবার দৌড়ে গিয়ে বসছিলো। "বাঃ! বেশ কুকুরটাতো কিন্তু বেঁধে রাখিস আমাকে যেন ছোঁয়না আর ঘরদোর যেন অপরিষ্কার করে না।" এই বলে মা চলে গেলেন। আমি বল্লাম "মা পর্য্যন্ত খুসী হয়ে ভাল বলে গেলেন আর তোমার যত বাড়াবাড়ি।" "হাঁ গো হাঁ, মা কি আর কুকুরকে বলে গেলেন? তাঁর ছেলে কুকুর এনেচে বলেই বল্লেন।" "তাঁর ছেলেইত শুধু কুকুর আনে নি, তোমার বরওত কুকুর এনেছে, ভালত বল্লেনা?" "মরি মরি কি কথারি ছিরি। মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখে কিছু বাধলো না।" এই বলে দাঁড়িয়ে উঠে শচী বল্লো "পশম আনতে বলেছিলাম এনেছো?" "ঐ যাঃ! ভুলে গিইছি।" "তাত ভুলবেই।" ইভু এতক্ষণ কুকুরের খেলা দেখছিলো, এখন বল্লো "এসোর খিদে পাইনি বাবা?" আমি বল্লাম "হাঁ হাঁ পেয়েচে, তা কি খাওয়ান যায় বল দিকি?" "মা'মার কাছ থেকে একটু দুধ চেয়ে নিয়ে এসে আমার পাতের ঐ ভাতগুলো মেখে দিলে খাবে না বাবা?" "তা খাবে। আর একটা কিন্তু মাছ চাই।" শচী গম্ভীর স্বরে বল্লো "দেখ, তুমি যারি আদরের মেয়েই হও আর যারি আদরের নাত্‌নিই হও ঐ থালায় কুকুরকে খাওয়ালে এই দাসীকে ঐ বাসন মাজিয়ে এঁটো পরিষ্কার করিয়ে ছাপ করিয়ে তবে ঘরে আসতে দেবো, এই বলে রাখলাম, বুঝে স্বঝে কাজ করো।" এই বলে মেয়েকে শাসিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল। ইভু আমার মুখের পানে চেয়ে বল্লো "মা বকবে যে।" "তুই শুগে যা, আমি নীচে থেকে খাইয়ে আনছি।" ইভু আস্তে আস্তে চলে গেল।

শুতে এসে শচী যাই দেখ্‌লে সেই শোবার ঘরের এক কোণেই এসো এক খানা কাঁথা পেতে আর একখানা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে তখন শুধু একবার দেখে নীরবে আমার পানে এক কটাক্ষ হেনে চলে যায় দেখে আমি একলাফে খাট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি দুয়োর বন্ধ করে বল্লাম "আজকে রাতটাই শুধু এসো এখেনে থাকবে হে বরাঙ্গি দেহ অনুমতি।" "যদি ঘর ময়লা করে তুমি পরিষ্কার কর্ব্বে, বলো?" "আমার ডান হাত না করে বাঁ হাত কর্ব্বে।" হেসে শচী বল্লো "হাঁ বাঁ হাত বর্ব্বে বৈ কি? আমি এক ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি কিনা?" আমি বল্লাম "তা যে নও, সে আমি আর একটু হলেই প্রমাণ দিতাম।" "কি রকম?" "তুমি যখন রুখে দাঁড়িয়েছিলে এত সুন্দর দেখাচ্ছিলো যে লোভ সামলাতে না পেরে জয়দেবের স্বরে দেহি পদ—।" শচী আমার মুখ চেপে ধর্‌লো।

সকালে আমার কোন কালেই ঘুম ভাঙেনা, বিশেষ শীতকালে। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি আমার ইভুরাণীর সঙ্গে এসোর কি ভাব। বাড়ীময় তারা ছুটিতে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে।

দশটার সময় ইস্কুলের গাড়ী এনে চাপরাশী এসে ডাকলে। "বাবা? গাড়ী আয়া।" ইভু আমার কোলে মাথা রেখে বল্লো "বাবা, বলে দাওনা আমি আজ ইস্কুলে যাবনা।" আমি বলে দিলাম, গাড়ী চলে গেল। শচী এসে বল্লো "কেন ইস্কুলে যাবেনে শুনি?" আমি বল্লাম "যখন ইচ্ছে কচ্ছেনা তখন থাক না।" "দেখ, তোমার আদরেই মেয়েটা গোল্লায় যাবে।" "আদরেই যদি মানুষ গোল্লায় যেত তবে তোমার আদরে আমি—।" "থাক, যথেষ্ট হয়েছে তর্কবাগীশ মশায়, এখন থামুন্।" ইভুরাণী এসোকে কোলে করে নিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। আমি বল্লাম "দেখ, ছবছরের মেয়েকে অত শাসন করা ভালনয়। আমার কথার উত্তর না দিয়ে শচী আমার মামাত ভাই অনিল কে সামনে দেখতে পেয়ে ডাক্‌লো "ঠাকুরপো, এক কাজ করত তোমাকে এক জিনিস দেবো।" অনিল এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা কর্ল্লো "কি কাজ কর্ল্লে কি দেবেন বৌদি?" "কলেজে যাবার সময় ঐ কুকুরটাকে যদি বিদেয় করে আসতে পার তোমার এক রাঙা টুকটুকে বৌ এনে দেবো।" অনিলও তখনি লজ্জায় মুখ রাঙা করে চলে গেল। আমি বল্লাম "দেখ, ঐ রাঙা বৌর লোভটা দেখিয়োনা, ও জিনিসটা বড়ই খারাপ।" জয়ের হাসি হেসে শচী জিজ্ঞাসা কর্ল্লো "কেন?" "দেখ্‌ছোনা তার প্রমাণ আমি, একেবারে গোলাম করে রেখেছ।" "হাঁ গো হাঁ, মুখে অমন সবাই বলে, নইলে আর একটা জিনিস আন্‌তে বলে দশ দিন-পায়ে তেল দিতে হয়।" "ওঃ পশমের কথা বলছ? আজ

দেখো আনি কিনা।" শচীর সহাস্য আনন খানি দুই হাতে তুলে ধরে বল্লাম "দেখ শচী, এটা যদি শুধুই কবির জগৎ হতো তাহলে ভাবনা ছিলোনা কিন্তু এ পোড়া সংসারে যে আবার আফিস আছে। তোমার গোলামী করে যদি পেট ভর্ত্তো তবে পেট ভরে তোমার সঙ্গে শুধু প্রেমালাপই কর্ত্তাম" "যাও," বলে শচী একটা স্নিগ্ধ মধুর হাসি হেসে চলে গেল।

এসো যেন যাদু জানতো। দুদিনেই সকলকে বশ করে নিলো। বাড়ীর ঝি চাকরগুনোর সঙ্গে পর্য্যন্ত তার খেলা। আর আমার ইভুরাণীর ত কথাই নেই; খাওয়া দাওয়া ভুলে দিনরাতই তার সঙ্গে মেতে আছে। অনিল যখন হয়ত দর্শনের বিবর্ত্তন-বাদের মধ্যে ঢুকে খেই হারিয়ে ফেলছে তখন এসো পেছন হতে ঘেউ করে একবার ডেকে টেবিলের ওপর এক লাফে উঠে তখনি আবার নেমে দেছুট। আমার ছমাসের খোকার সঙ্গেই বা তার কি ভাব। খোকার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে মাঝে মাঝে ডেকে আস্তে থাবা এগিয়ে দিত খোকা গোল গোল ছোট দুখানি হাতে সেই থাবা ধত্তে গিয়ে না পেরে হাঁ করে হেসে ফেলত। এসো নিমেষে একবার ছোঁয়া দিয়ে এক ছুটে হয়ত মা যেখেনে বসে মহাভারত পড়ছেন সেখেনে গিয়ে দুপায়ের মধ্যে মুখ রেখে মার মুখের পানে চেয়ে থাকত যেন কত শান্ত ছেলেটি।

এ সংসারে আদর নেবার শক্তি আলাদা, সকলের সে শক্তি থাকে না। অনেকে চারিদিক হতে অজস্র আদর পায় কিন্তু তাদের ঐ নেবার ক্ষমতা না থাকায় সমস্ত হারিয়ে ফ্যালে। এসোর ঐ আদর নেবার নিগূঢ় তত্ত্বটি বেশ জানা ছিল। তাকে দেখে কারুর ক্ষমতা ছিল না যে কোলে তুলে নিয়ে চুমু না খেয়ে ছেড়ে দেয়।

রোজই আমার একবার করে মনে হতো এই যে ওকে চুরি করে রেখিছি এ আমার বড়ই অন্যায়। কিন্তু তাকে এতই ভাল বেসিছিলাম যে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান আমার একেবারে ছিল না, আমি আরো পার্ত্তাম না আমার ইভুরাণীর জন্যে। তার খাওয়া বসা খেলা শোয়া সবই এসোর সঙ্গে। সে চিরকালই তার ঠাকুমার কোলটি ছাড়া শুতে পার্ত্তনা; এসোর খাতিরে সে ত্যাগও সে স্বীকার কর্ল্লো।

একদিন সন্ধ্যের পর মার কাছে এসে দেখি মা এসোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি চীৎকার করে ডাকলাম "ইভু, রাক্কুসী মেয়ে এসোকে ছেড়ে দিইছিস্ কি বলে? মাকে ছুঁয়ে দিয়েছে; তোমার দেখাচ্ছি মজা।" মা হেসে বল্লেন "আহা থাক থাক। দেখ, কুকুরটা বড় আদর কাঙাল।"

সে দিন অফিস থেকে এসে দেখি শচী এসোকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে খুব আদর কচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকে খাটের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। শচী ছুটে এসে আমার মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্ল্লো 'অমন করে বসলে কেন, অসুখ করে নি ত?' "বুক ফেটে যাচ্ছে শচী" কিন্তু কথাটা এত বেশী থিয়েটারী সুরে হয়ে গেল যে শচী বুঝতে পেরে হেসে বল্লে "তবু ভাল। মাগো-মা, তুমি লোককে এত কাঁদাতেও জান।" "অমন করে যদি তুমি ঐ কুকুরটাকে আদর করত আমি ওর গলাটিপে মেরে ফেলবো।" মুখটিপে শচী জিজ্ঞাসা কর্ল্লো 'কেন?' "ঐ আভুরের মত—।" "আঃ!" আমার কথা আর শেষ হলো না।

এসো প্রায় এক সপ্তা আমাদের বাড়ী আছে।

একদিন সকালে শচী আমার গা ঠেলা দিয়ে বল্লে "আজকি আর তোমার ঘুম ভাঙ্বে না? চায়ে পান্তো হয়ে গেল।" চোক চেয়েই দেখি আমার ইভুরাণী ম্লানমুখে চুপকরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার প্রাণ কেঁদে উঠলো।

ইভুকে আমি বড় ভাল বাসি। বাপে বোধ হয় মেয়েকেই ভালবাসে বেশী। আরো একটা কারণ ছিল, ইভুটিক তার মার মতন দেখতে। তেমনি বড় বড় ভাসা ভাসা চোক; চোকে তেমনি শ্রাবণ আকাশের উদাস দৃষ্টি মুখে সদাই তেমনি প্রাণ খোলা হাসি, তেমনি ছিপ ছিপে সুন্দর গড়ন, যেন ফুলে ভরা মাধবী লতা।

আমি ইভুকে কোলে টেনে নিয়ে বল্লাম "কি হয়েছে মা তোমার? কে বকেছে?" সে আবার কোলে মুখ লুকিয়ে বল্লো "বাবা, এসো?" আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম "কোথায় গেল?" "কি জানি আজ সকাল থেকে পাওয়া

থাচ্ছে না।" ইভু কেঁদে ফেল্লো। শচী চার পেয়ালা হাতে করে ঘরে ঢুকে বল্লো "একটু খোঁজ করে দেখ না, আহা; সত্যিই কি কুকুরটাকে পাওয়া যাবে না?" কিন্তু খুঁজে দেখারপথ যে আমার বন্ধ। চোরাই মাল।

ইভুরাণী সেদিন বড় কাঁদল, এই আসে এই আসে করে কেবল ঘর আর বার কচ্ছিল।

বিকেলে ঘরে এসে দেখি শচী রাস্তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। আমাকে দেখে "আচ্ছা, সত্যিকি তাকে আর পাওয়া যাবেনা?" আমি উত্তর দিলাম "দেখ, তাকে আর খুঁজে দরকার নেই। সে জোরকরে কাছে থেকে আদর আদায় করে নিলো কিন্তু কারুর আদর তাকে ধরে রাখতে পার্লো না।" "বড় আপনার হয়ে গিয়েছিলো নয় কি? যেন কত কালের চেনা। এমন হবে জান্‌লে তাকে অত ভালবাসতাম না।" "মানুষ ভুল নিয়েইত আছে শচী।"

বাড়ীশুদ্ধ, সবলেই কুকুরটার জন্যে শোক কর্ত্তে লাগলো। আর আমার ইভুরাণীর কষ্টের যে সীমা পার সীমা নেই।

ঐ ঘটনার মাস খানেক পরে আমাদের এক ব্রাহ্মবন্ধুর বাড়ী সন্ধ্যা ভোজে নিমন্ত্রণ ছিলো। যাবার প্রায় সময় হলে আমি শচীকে জিজ্ঞাসা কর্লাম "কৈ তুমি এখনো কাপড় চোপড় পরে নিলে না?" সে ঘাড় নীচু করে উত্তর দিলো "তুমি একা যাবে, আমিত যাবনা।" আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। বল্লাম "বেশ যা হোক, মিসেস বোস্ এত করে বলে গেলেন, আর পাছে তুমি না যাও এই ভয়ে তাঁর আর কোন বন্ধু পরিবারকে নেমন্তন্ন কর্লেন না—মাও মত দিয়েছেন আর তুমি এমনি করে তাঁর মনে কষ্ট দেবে?" শচী আমার হাত ধরে বল্লো "লক্ষাটি রাগ করোনা। মিসেস বোস্‌কে দুপুরে এক চিঠি লিখে ও কথা আমি জানিইছি।"

শচী যেটায় না বলবে তাতে কারুর সাধ্য নেই যে হাঁ বলায়; অন্তত আমার ত নেই। যদিও আমার মতের বিরুদ্ধে ঐ নাটা সে খুবই কম বলত।

ইভুকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধু মহাশয়ের বাড়ী গিয়ে বস্‌তেই একটা কুকুর ছুটে এসে ইভুর কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো। ইভু আনন্দে লাফিয়ে উঠে ব'ল্লো "বাবা, এসো! আমি একে নিয়ে যাব।" "থাম্ বোকামেয়ে বলতে নেই।" মিসেস বোস্ ইভুকে বুকে জড়িয়ে বল্লেন "কিগো ইভুরাণী, ফিস্ ফিস্ করে কি বলা হচ্ছে? কুকুরটি বুঝি পছন্দ হয়েছে; কিন্তু ওটিও আমার নিজের নয় মা।" আমি বল্লাম "তবে?" "ও আজ দিন দুই হলো আমাদের বাড়ী এয়েছে। আমি ওর নাম দিইছি সোম।" এই বলে ইভুর কাছ থেকে নিজের কোলে সোমকে নিয়ে মিসেস বোস্ তাকে বড় আদর কর্ত্তে লাগিলেন। আমি বল্লাম "আশ্চর্য্য! মাস খানেক আগে দিন সাতেক ও আমাদের বাড়ী ছিলো।" "দুষ্টু বোধ হয় এমনি করেই সকলকে কাঁদিয়ে বেড়ায়। ইভুরাণী তুমি একে চাও এ আর বড় বেশী কথা কি মা? তোমার দাবীও আছে। কিন্তু পাজীটাকে আমি বড় ভাল বেসেছিলাম। ও যখন আমার কোলে চুপ করে শুয়ে থাকে মনে হয় যেন সেই আমার খোকা।" বলিয়া মিসেস বোস্ রুমালে চোক ঢাকিলেন। আমার বন্ধু বল্লেন "দেখুন সুধীর বাবু, ও যেমন আদর নিতে জানে তেমনি দিতেও পাবে। আয়, সোম্।" সোম আমার বন্ধু পত্নীর কোল থেকে লাফিয়ে আমার বন্ধুর কাছে ছুটে গেল।

একটু গান বাজনার পর খাওয়া দাওয়া হলো। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে মিসেস বোস্ সোম কে খুব আদর কর্ত্তে কর্ত্তে বল্লেন "দেখ মা ইভু, একে কিন্তু রোজ বিকেলে আমার বাড়ী বেড়াতে নিয়ে আস্‌বে। সোম দুষ্টু, আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব্বিত পাজী?" মিসেস বোস্ চোকের জল আর আট্‌কাতে পার্লেন না।

আরো খানিকক্ষণ গল্প করে যখন আমাদের বিদায় নেবার সময় হলো ভারী গলায় মিসেস বোস্ ডাক্‌লেন "সোম।"

সোম সেবার আর ছুটে এলোনা। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমরা সকলেই এক একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম "সোম—সোম।" কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বাড়ীর মধ্যে কোথাও আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

আমরা চারটি প্রাণী নীরবে সেই নীরব ঘরে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর ইতুরাণী বলে উঠ্‌লো "আবার ও কোথায় গেল বাবা?" মিসেস বোস বল্লেন "আশ্চর্য্য! যখন আমরা ওকে নিয়ে মিলন বিরহের আনন্দ দুঃখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ছিলাম সে শুধু ভয় ও আশার গভীর ভালবাসাটুকু কেড়ে নিয়ে চলে গেল। ভালবাসা দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে জগতে কি এই একই নিয়ম?" আমি বল্লাম "দেখুন, ও যেন একটা আনন্দের ঢেউ; সকলকে চুবিয়ে দিয়ে যায় নিজে কিন্তু কোথাও কারুর কাছে ধরা দেয় না।" ইতু বল্লে "আবার একদিন নিশ্চয় দেখা দেবে, না বাবা?" "আমি তোর মত গভীর বিশ্বাসে ত বুক বাঁধতে পারিনে মা।" এই বলে মিসেস বোস্ ইতুকে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্লেন।

গান

[কাজী নজরুল ইসলাম]

(লাচারী টোড়ী—কাবুফা)

অস্থায়ী :—

লক্ষ্মী আমার! তোমার পথে আজকে অভিসার।
অনেক দিনের পর পেয়েছি মুক্তি-রবিবার॥

অন্তরা :—

দিনের পরে দিন গিয়েছে হয়নি আমার ছুটি,
বুকের ভিতর মৌন কাঁদন পড়তো লুথাই লুটি;
(বসে ঢুলতো আঁখি দুটী)
আহা আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া,
লাগলো চোখে তোমার চাওয়া,
তাইতো প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার॥

সঞ্চারী :—

তোমার তরে বুকের তলায় অনেক দিনের অনেক কথা জমা,
কানের কাছে মুখটি থুয়ে গোপন সে-সব কইবো প্রিয়তমা!
এবার শুধু কথায় গানে রাত্রি হবে ভোর
শুকতারাতে কাঁপবে তোমার নয়ন-পাতার লোর
(অভি মানিনীরে মোর!)
যখন তোমায় সেধে ডাকবে বাঁশী
মলিন মুখে ফুটবে হাসি;
হিম-মুকুরে উঠবে ভাসি অরুণ ছবি তা'র॥

প্রেততত্ত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি-এ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১) প্রথম প্রমাণ দৃষ্টান্ত

জীবিতকালে দুইজন ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে এমনি একটা বন্দোবস্ত করিল যে প্রত্যেকে এক একটী কোনো চিহ্ন আঁকা বস্তু এমন ভাবে লুকাইয়া রাখিবে যে মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত কেহ তাহার ঠিকানা জানিবে না, কিন্তু মৃত্যুর পর নিজকে সজ্ঞানে বিদ্যমান দেখিলে তখন তাহার ঠিকানা বলিয়া দিবে। এমন যে হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত আছে।

যুক্ত রাজ্যের রকল্যাণ্ড হইতে শ্রীমতি এ, ফিনি লিখিয়াছেন—"আমার ভায়ের মৃত্যুর আগে কিছুকাল ধরিয়া দুইজনে পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা করি। পরকালের প্রমাণ পাইবার জন্য দুজনে এই বন্দোবস্ত করে :—এক খণ্ড ইট আনিয়া তাহার দুপিঠে কালি দিয়া একটা জানিত দাগ আঁকিলাম। পরে ইট খানা ভাঙ্গিয়া দুইখণ্ড করিয়া প্রত্যেকে অপরের অজ্ঞাতসারে এক দুর্গম স্থানে লুকাইয়া রাখিলাম। এমন সাবধানে মোড়ক করিয়া লুকানো হয় যে কেহ কাহারো লুকানো জানিলাম না। পরে আমার ভাই আগে মারা গেল। মৃত্যুর পর মাস কয়েক পরে প্রমাণ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। এক দিন আমি ও আমার মা টেবিল-চালনার দ্বারা ভায়ের কাছ থেকে সেই লুকানো ইটখণ্ডের সন্ধান পাইলাম। ভাই লিখিল, "—টোমাহকের নিচে একটা ক্যাবিনেটে সেই ইটের টুকরা পাইবে। আমি সেই নির্দ্দেশানুসারে যথা স্থানে গিয়া ক্যাবিনেটের চাবি খুলিয়া সেটাকে একটা মোড়কের মধ্যে পাইলাম।"

প্রেততত্ত্বসভার অন্যতম স্বনামখ্যাত হজসন সাহেব ইহা স্বচক্ষে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার তদন্ত রিপোর্ট মায়ার্সের Human personality গ্রন্থের দ্বিতীয় ভলুমের ১৮৪। ১৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। আরো কয়েকটা এই ধরণের দৃষ্টান্ত উক্ত গ্রন্থে ৪৯৫ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

(২) প্রেতের জীবিত কালীন হস্ত লিপির মিল ঘটিত প্রমাণ

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত ষ্টেনটন মোজেস্ প্রাপ্ত পরিচিত মহিলার প্রেত লিপির বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

ইটালির অন্তর্গত পেসারো নগরের জনৈক অধ্যাপক নাম রসি পেগননি—স্বতঃলিখন শক্তির চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার কৃত পরীক্ষাগুলিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তাঁহার অপরিচিত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা যখনি তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া স্বতঃ লিপি পাঠাইয়াছে, সব ক্ষেত্রেই হাতের লেখা মৃত ব্যক্তিদের জীবিত কালীন হাতের লেখার সঙ্গে এক রকম যে তাহা জানা গিয়াছে। একবার তাঁহার কোন বন্ধু নিজ পরিচিত কোনো মৃত মহিলার আত্মাকে আহ্বান করেন। ফলে যে স্বতঃ লিপি দেখা দেয় তাহাতে কতকগুলি ফুল ও পাতার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়। রসি পেগননি চিত্র বিদ্যার কিছু জানিতেন না। তিনি এই সব চিত্র বন্ধুকে দেখাইলে, বন্ধু বলেন—"তোমার আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; আমার মহিলা বন্ধু চিত্রকলার বড় প্রিয় ছিল। আমার হাত দিয়া তাঁহার আত্মার লিপি বাহির হইলে এমনি সব ছবি বাহির হইত।"

এই হস্ত লিপি সম্বন্ধে রসি পেগননি যাহা মন্তব্য করেন তাহা এই—"আমার হাতের লেখা খুব খারাপ এবং একই ধরনের। কিন্তু যখন মিডিয়ম হইয়া প্রেত লিপি প্রকাশ করি তখন ভিন্ন ভিন্ন বিদেহ আত্মার কৃত লেখা বাহির হয়, এবং প্রত্যেক লেখাটা সেই আত্মার জীবিত কালীন

লেখার সঙ্গে যে সমান তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আশ্চর্য্য এই যে হঠাৎ বহুদিন পরে আবার যখন সেই আত্মা আসিয়া ভর করে তখন ঠিক সেই লেখাই বাহির হয়। বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে ভরাবস্থায় আমার হাত তত অসুবিধা জনক অবস্থায় থাকিয়া ও সময়ে সময়ে অতি সুন্দর লেখা প্রকাশ করিত আর সহজ অবস্থায় শত চেষ্টা সত্ত্বেও তেমন সুন্দর লেখা বা বিশেষ ধরণের লেখা অনুকরণ করিয়াও বাহির করিতে পারিতাম না।" আচার্য্যের এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব স্বচক্ষে দেখিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন।

(৩) মিডিয়মে প্রেতের জীবিত কালীন কায়বাক্য মনগত বিশেষত্বের বা মুদ্রা দোষের পুনঃ প্রকাশ

যদি দেখা যায় যে মিডিয়মের ভর অবস্থায় তাহার ভিতর দিয়া কথিত আত্মার জীবিত কালীন কোন ব্যক্তি গত বিশেষত্ব ধরণ বা মুদ্রাদোষ দেখা দেয় অথচ মিডিয়ম তাহা জানেনা—তাহা হইলে, এ ব্যাপারটীকে আত্মার বিদেহ অস্তিত্ব সম্বন্ধে কটা প্রবল প্রমাণ বলিয়া গন্য করা যাইতে পারে :——

দৃষ্টান্ত :—

(৩। ক) শ্রীমতি পাইপারের ভর অবস্থায় একদিন এক বিদেহ আত্মা আসিয়া হজসনের সহিত আলাপ আরম্ভ করে। উক্ত আত্মা নিজেকে হজসনের এক আত্মীয় বন্ধু বলিয়া পরিচিত করে। ইতি পূর্ব্বে অন্য অনেক বিদেহ আত্মা আসিয়া আলাপ করিয়া গিয়াছে। তার পর এই বন্ধুর আত্মার আবির্ভাবের সঙ্গে মিডিয়মের লিখনে বা স্বতঃ কথনে একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। হজসন প্রশ্ন করিলে যেসব উত্তর আসিতে থাকে তাহা স্থানে স্থানে অসংলগ্ন, অসঙ্গত, ভুল বা অন্যরকমে স্বাভাবিক হইতে একটু স্বতন্ত্র। অথচ অত্মার ব্যক্তিত্ব identity অভ্রান্ত ভাবে ঠিক হইয়াছিল। উত্তর গুলির ধরণ হইতে বুঝা যায় যেন উত্তর দাতা মাথার গোলমেলে ব্যারামে ভুগিতেছে যার জন্য কথা বার্ত্তার একটু ভুল ভ্রান্তি অসঙ্গতি স্বভাবে দেখা যায়। ঘটনা বস্তুতঃ তাই। হজসনের উক্ত বন্ধু মৃত্যুর কয়েক বছর পুর্ব্বে হইতে মাথার ব্যারামে ভুগিয়াছিলেন। এবং এই মানসিক দুর্ব্বলতা মৃত্যুর পরও বর্ত্তমান থাকিয়া এই প্রেতালাপে বৈলক্ষণ্য ঘটাইতেছিল। হজসন যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন—"যদি বিরুদ্ধ মতবাদীদের মতে ইহাই হয় যে যা কিছু প্রেতবার্ত্তা সবই বৈঠকে উপস্থিত পরিক্ষক বা অন্য কাহারো দ্বারা টেলিপ্যাথি বলে মিডিয়মের অব্যক্ত চৈতন্যে প্রতিভাসিত তাহা হইলে এমন বৈলক্ষণ্য ঘটিল কেন? অপর আত্মার বেলা — — বার্ত্তা বেশ সহজ সরল ভাবে আসিল, আর এই আত্মার বেলাই সব উন্মাদ রোগীর প্রলাপের মত আসিল। অথচ এই মৃত বন্ধু সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অন্য মৃত আগন্তুকদের চেয়ে অনেক — — বেশী, স্পষ্ট ও খাঁটী! অল্পপরিচিত পুর্ব্ব প্রেতরা আমার প্রশ্নের — — চমৎকার নির্ভুল উত্তর দিল আর যে আমার — — নিকটতর ভাবে পরিচিত তার উত্তর তেমন হইল না। এই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার আমার চখের উপর ঘটাতে — — আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস হইতেছে যে টেলিপ্যাথী বা অব্যক্ত চৈতন্য ছাড়াও আরও একটা কিছু আছে — — যা আমার কাছে একটী সজ্ঞান বিদেহ সত্ত্বা বলিয়া মনে হইতেছে, যাহার বিশেষত্ব ব্যক্তিত্ব দেহাবস্থায় যেমন ছিল, মরণের পরও বিদেহ অবস্থায় তেমনি আছে যাহা প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমার অব্যক্ত চৈতন্য হইতে — — গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে না পরন্তু নিজ চৈতন্য হইতেই উত্তর দিতেছে — —" (ভলুম—১৩। ৩৪৯-৩৫০ পৃঃ)

(৩।খ) অনেকের মধ্যে কথা বলার ভঙ্গীতে মুদ্রাদোষের পরিচয় দেয়; একটা বিশেষ কথা, বিশেষ ধরণে যখন তখন বলা বা বিশেষ অঙ্গভঙ্গী বিশেষ ধরণে প্রকাশ করা ইহা-কেই মুদ্রাদোষ বলে।

উক্ত হজসন সাহেব নিজে পরলোক গমন করার পর যখন শ্রীমতি পাইপারের উপর ভর করিয়া — —সভার সভ্য ও পুর্ব্ব বন্ধুদের সহিত আলাপ ও সম্ভাষন আরম্ভ করেন তখন তাঁহার আলাপের ধরণে ও ভাষায় জীবিত কালীন মুদ্রাদোষের — — দ্বারা — — আত্মপরিচয় দিতে থাকেন। কথিত ভরকারী আত্মা যে হজসনের' তাহা

তাঁর বন্ধুরা সেই মুদ্রাদোষ ধরিয়া বুঝিতে পারেন ও বিশ্বাস করেন। নমুনা :—

মিসেস্ পাইপারের ভরাবস্থা। পরীক্ষক শ্রীযুত ডরং ও হেনরী জেমস্ In.। স্থান বোষ্টন। ১৯০৬। ভরকারী আত্মা 'হজসন'।

আত্মা—"হা! well, এত শীগ্‌গির তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে তা ভাবিনি—"

গুড্ মর্ণিং হ্যারী—তোমাদের দেখে ভারি খুসী হলাম—

হেনরী। মিঃ হজসন নাকি?

আত্মা।—হাঁ তোমাদের দেখে ভারি খুসি হচ্চি—কেমন সব? খপর কি? *first rate*?

হেনরী—হাঁ ভাল

আত্মা—হেলো জর্জ্জ মনে হচ্চে যেন আমি তোমাদের মধ্যেই রয়েছি—

জর্জ্জডর।—হেলো!

আত্মা।—তোমরা দেখছি আমার ফূর্ত্তিটা বুঝতে পাচ্ছনা—আমি সেই হজসন! আর চিরকালই হজসন থাকবো—যতই কর আমাকে বদলাতে পারচনা আর কিছুতে—

হেনরী।—হাঁ তোমার ভাবটা বুঝেছি বৈকি

আত্মা।—উচিৎ তো বোঝা—না যদি বোঝ তা হলে তোমরা কিছু হারিয়েছ বলতে হবে। আমি যা ছিলাম তাইই আছি—বরাবরই তাই থাকবো—জীবনে যত সুখের সময় গিয়েছে বা আছে তার মধ্যে সব চেয়ে সেই সময় যখন তোমাদের কাছে আমি থাকি কাটাই—" ইত্যাদি—

সার অলিভার লজ্ টীকাচ্ছলে বলেন—অবশ্য এ ধরণের কথা যে খুব প্রমাণিক তা নয়—তবে কেহ যদি আমাকে হজসনের স্বাভাবিক আলাপ অভ্যর্থনার ভঙ্গীর একটা ধরণ অনুকরণ করে লিখতে বলে তা হলে এর চেয়ে সহজ স্বাভাবিক নিখুঁৎ বর্ণনা আর দিতে পারবোনা। হজসন জীবিত কালে কথা বার্ত্তায় *first rate* কথাটী যখন তখন ব্যবহার করিতেন।

সার অলিভারের কনিষ্ঠ পুত্র রেমণ্ড বিগত যুদ্ধে ফ্রান্সে মারা যান। তাঁহার আত্মা কিছু দিন পরে লজের পরিচিত বিশ্বাসী এক মিডিয়মে ভর করিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছে। একদা এক বৈঠকে (Seance) রেমণ্ড লম্বা এক আলাপ করেন। আলাপ শেষে চলিয়া যাইবার সময় "Good bye & Good luck" কথাটী ব্যবহার করেন। লজ্ বলেন উহা তাহার একটা বচনভঙ্গী ছিল। অবশ্য মিডিয়ম উাহার কিছু জানিত না। অন্য এক বৈঠকে পরীক্ষক বা বার্ত্তাগ্রাহক (Sitter) ছিলেন রেমণ্ডের বড় ভাই ক্লেরেন্স। মিডিয়ম দিব্যদৃষ্টিতে বা মিডিয়মে ভরকারী আলাপকারী আত্মা 'Feda' বড় ভাইকে বলেন রেমণ্ড তাহার পিট্ চাপড়াইতেছে। ইহার একটু প্রামাণিকতা আছে। জীবিতকালে রেমণ্ডের একটা মুদ্রাদোষ ছিল, খুব পরিচিত আত্মীয় কাহারো কাছে আসিয়াই তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কথা কহিত।

কায়িক বাচনিক ও মানসিক মুদ্রাদোষের এই সব দৃষ্টান্ত হইতে আত্মার বিদেহাস্তিত্ব বেশ সপ্রমাণ হয়। অপরিচিত অজানিত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যখন মিডিয়ম দেহে আবির্ভূত হয় তখন তাহার মুদ্রাদোষের এই যে পুনর্বিকাশ ইহা অন্য কোনো মতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৪) মিডিয়ম বা পরীক্ষাস্থানে উপস্থিত কাহারো অজানিত কোনো তত্ত্বের সংবাদ দান

ভরাবস্থায় মিডিয়ম যদি এমন কোনো কথার খপর দিতে পারে যা তাহার বা অপর কাহারো জ্ঞান গোচরে কোনোকালে আসে নাই তবে তাহাকে একটা ভালরূপ প্রমাণ বলিয়া গন্য করা যাইতে পারে।

এরূপ ব্যাপার পরীক্ষা ফলে ঘটিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রেমণ্ড কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাহার ফটোর সংবাদ এই ধরণের। ব্যাপার এই।—সার অলিভার লজের পুত্র রেমণ্ড বর্ত্তমান যুদ্ধে সৈনিক রূপে ফ্রান্সে লড়াই করিতে যান। ঐ যুদ্ধে তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। মৃত্যুর কিছুদিন পরে আপনা হইতে রেমণ্ডের আত্মা এক মিডিয়মে ভর করিয়া আত্ম-পরিচয় দেন। সার অলিভার চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতিতে লিপ্ত থাকিয়া প্রেততত্ত্ব লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার কৌতুহল হইল। তিনি পুত্রের বিদেহ-আত্মাকে

একটা চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে অনুরোধ করেন। অর্থাৎ এমন একটা সংবাদ তাহার কাছে চাহিলেন যাহা উপস্থিত কাহারো জানা ছিল না। অনুরোধ অনুসারে রেমণ্ড এক ফটোর অস্তিত্বের কথা জানাইল। এই ফটো যুদ্ধক্ষেত্রে লওয়া হয়, উহাতে রেমণ্ড এবং তাহার আর কয়টী সৈনিক বন্ধু এবং আর কয়জন একত্র মিলিয়া ছবি তুলাইয়াছিল। এ ফটোর কথা মিডিয়মতো দূরের কথা সার লজ, তদীয় পত্নী বা বাড়ীর আর কেহ আদৌ জানিতেন না, তার কারণ ২৪শে আগষ্ট ছবি তোলান হয়, আব ১৪ই সেপ্টেম্বর রেমণ্ড মারা যায়। ২৭শে সেপ্টেম্বর পিটারস্ নামক মিডিয়মে ভর হইয়া রেমণ্ড-আত্মা ফটোর কথা উল্লেখ করে। অথচ ছবি তখনো নেগেটিভ্ অবস্থায় আছে। ১৫ই অক্টোবর রেজিমেণ্টের ক্যাপটেন সিড্‌নি উক্ত নেগেটিভ্ ইংলণ্ডে ডেভেলপ্ করাইবার জন্য পাঠান। ২৯শে নভেম্বর মিসেস্ চিড্‌স্ নাম্নী রেমণ্ডের এক সৈনিক বন্ধুর মা লজকে পত্র লেখেন যে তা'র কাছে কয়েকটী ফটো আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে রেমণ্ডের চিত্র আছে। লজ কি এক খানি ফটো পাইতে ইচ্ছা করেন না?" পত্র পাইয়া লজ তৎক্ষণাৎ ফটো চাহিয়া পাঠাইলেন। ৩রা ডিসেম্বর প্রেত মুখে ফটোর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ৬ই ডিসেম্বর লজপত্নী পুত্রের দিন-ডায়েরীতে উক্ত ছবি তোলানোর উল্লেখ দেখিতে পান। উক্ত ডায়েরী রেমণ্ডের মৃত্যুর পর এবং প্রেত কর্ত্তৃক প্রথম সংবাদ দানের পর যুদ্ধ বিভাগ হইতে তার কাছে ফিরাইয়া পাঠানো হয়। ৭ই ডিসেম্বর লজ্ ফটোর বর্ণনা শুনিয়া একটা কাল্পনিক চিত্র লিখিয়া খামে মুড়িয়া শ্রীযুৎ আরথার হিলের কাছে পাঠান। ৭ই ডিসেম্বর বিকালে ফটো ডাক-যোগে আসিয়া উপস্থিত হয়। সন্ধ্যাবেলা ঐ ফটো সকলের সম্মুখে খুলিয়া দেখা গেল যে প্রেত বর্ণিত ফটোর সহিত উহার হুবহু মিল।

ফটোর বিন্দুবিসর্গও তখন ইংলণ্ডে কেহই জানিতেন না। মিডিয়মের সুপ্তচৈতন্য ফ্রান্সে গিয়া সেথা হইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিয়াছিল কিনা এবং পারা সম্ভব কিনা তাহা সুধীদের বিবেচ্য।

(৫)—মিডিয়ম কর্ত্তৃক অঘটিত কোনো ভবিষ্য ঘটনার উল্লেখ

এইরূপ অঘটিত ঘটনার পূর্ব্ব সংবাদ যদি মিডিয়ম দিতে পারে তাহাকে প্রেতের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিবার হেতু আছে।

ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু খবর অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়ম কর্ত্তৃক স্বতঃ লিখনে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ই—জি—নামক এক ব্যক্তি লিখিতেছেন—"১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বসন্ত কালে এস্ নামক আমার এক পরিচিত ব্যক্তি একটা কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন যে রোগী ঐ অবস্থায় কয়েক বছর ধরিয়া যন্ত্রণা ভোগ করি বেন। আমি এক দিন শ্রীমতি পাতপারকে তাঁহার ভা অবস্থায় উক্ত রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। তখন রোগীর এক কন্যা পিতার সেবা করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়ে, আমি জিজ্ঞাসা করি কি করিয়া শ্রীমতিকে তার বাপের কাছ হইতে সরাইয়া একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করিব। উত্তর পাইলাম—"তাহাকে সরাইতে পারিবে না, তবে রোগীরও দেরী নাই, শীঘ্র সব যন্ত্রনার অবসান হবে। ডাক্তারেরা ঠিক বলে নাই, গ্রীষ্মকাল আসিবার আগেই তাঁর দেহান্ত ঘটিবে।" ঘটিলও তাই। উক্ত বৎসর জুন মাসেই তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।—"ই জি ডব্লিউ'।

এরূপ মৃত্যুর ভবিষ্যবাণীর অনেক দৃষ্টান্তই চিৎতত্ত্ব সভার বিবরণীতে বর্ণিত আছে। মায়াসে'র Human Personality গ্রন্থের দ্বিতীয় ভলুমের ৬২২—৬২৪ পৃষ্ঠায় কয়েটী দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৬)—ঐহিক জীবনের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও নিজ জীবনের অতীত বা বর্ত্তমান ঘটনাবলীর স্মৃতি

এইরূপ স্মৃতি শক্তির পরিচয় প্রদান বিদেহ অস্তিত্বের একটা প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী বড় অশ্চর্য্যজনক ঘটনা। পাঠক দেখিবেন জীবাত্মার বিদেহ অস্তিত্বের পক্ষে এমন অনুকুল প্রমাণ বড় কম পাওয়া যায়। সাইকিক্যাল সোসাইটীর

বার্ষিক বিবরণীর ষষ্ঠ ভলুমে ৩৪৯-৩৫৩ পৃষ্ঠায় ইহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। ঘটনার বর্ণনাকারী হইতেছে শ্রীযুৎ আলেকজাণ্ডার আসকাসফ। ইনি সাইকিক স্টাডিজ্ নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। ঘটনাটী এই:—বক্তা বা লেখক উক্ত আঃ আসকাসফ্।—আমার এক শালীর নাম মিসেস্ ভন্ উইজলার ইঁহার সোফি নামে এক কন্যা আছে। সোফির ও তাঁহার মাতার সঙ্গে 'সুরা' নাম্নী এক কিশোরী কুমারীর আলাপ ছিল। আলাপ বেশীভাগ সুরার বাপ মায়ের সঙ্গে। তাও খুব ঘনিষ্ট নয়। সুরার দুটী জ্ঞাতি ভাই ছিল, তাহারা সহোদর; নাম মাইকেল ও নিকোলাস সোফি বা তাহার মা এই দুই ভাইএর নাম শুনিয়াছিল মাত্র, কোন সাক্ষাৎভাবে আলাপ ছিল না। মাইকেল এক জন রাজনৈতিক বিপ্লববাদী ছিল। সুরা'রও মাইকেলের মত বিপ্লববাদে ঝোঁক ছিল, উভয়ে গোপন ভাবে এইসব বিপ্লবজনক মত পোষণ করিত। ফলে মাইকেল পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া সুদূর দেশে বন্দী হয়। পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া মাইকেল প্রাণ হারায়। সুরা এই শোচনীয় ব্যাপারে বড় মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে। পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে সুরা বিষ পানে আত্মহত্যা করে। ১৭ই জানুয়ারী তাহার দেহান্ত হয়।

২২শে জানুয়ারী মিসেস্ ভন উইজলার তাহার কন্যা সোফিকে লইয়া কেবল তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য একটা প্রেত—বৈঠক করেন। উইজলার পত্নীর মিডিয়মী শক্তি ছিল। প্রথম কয়েকটী বৈঠকে — — এক প্রেত-আত্মার আবির্ভাব হয়। উহা সোফির পিতার। পরে এক দিন অন্য এক প্রেত আত্মা আবির্ভূত হইয়া নাম লিখিল—"সুরা"! পরে খুব যেন আবেগের সহিত লেখা বাহির হইল-"এই বার্ত্তা নিকোলাস্‌কে বাঁচাবার জন্যে"।

প্রশ্ন।—আমরা বুঝতে পারছিনা কি বলছ?

উঃ।—মাইকেলের মত নিকোলাস ও — — সর্ব্বনাশের পথে চলেছে—কতক গুলা দুষ্ট লোক তার মাথা খাবার যোগাড় করেছে—তাকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে—

প্রঃ। আমরা কি করে তা নিবারণ করবো?

উঃ। (সোফিকে) তুমি শীঘ্র করে Technological Institute এ যাও, নিকোলাস্‌কে ডেকে তার সঙ্গে কথা কয়ে তাকে সাবধান করগে—আজই তিনটার আগে। সোফি উত্তরে জানাইল যে নিকোলাস গোষ্ঠির সঙ্গে তার তেমন পরিচয় নেই সে কি করিয়া একথা তুলিবে?—

প্রেতের উত্তর। বেয়াড়া তোমাদের সভ্যতার ধরণ! (ক্রুদ্ধভাবে)

প্রঃ। কিন্তু কি করে তাকে বুঝিয়ে অনুমত করাবো?

প্রেঃ উ। আমার নাম করে বল গিয়ে—

প্রঃ। তা হলে এখন আর তোমার পূর্ব্বমত নেই?

প্রেঃ উ। কি বিদ্‌ঘুটে ভুল!

এখন ব্যাপার এই। সোফি বা তার মা কেহই নিকোলাসের মতিগতির সহিত পরিচিত ছিল না। তাহারা এরূপ অপ্রত্যাশিত সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। এখন এই আদেশ অনুসারে কাজ করা অসম্ভব। সোফি ভারি মুস্কিলে পড়িল। নিকোলাস গোষ্ঠীর সঙ্গে তার পরিচয় এত সামান্য যে এই প্রেত বার্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া এমন একটা সাংঘাতিক কথা উত্থাপন করা নানাদিক দিয়া অসম্ভব। এ সংবাদ যে সত্য তার প্রমাণ কি? নিকোলাসের বাপ মা বিশ্বাসই বা করিবে কেন? নিকোলাসই বা স্বীকার করিবে কেন? যদি মিথ্যা হয়, সোফির কি পরিণাম হইবে? এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া সোফি চুপ করিয়া রহিল। দ্বিতীয় বৈঠকে আবার উক্ত আত্মা আসিয়া সোফিকে তার ঔদাসীন্যের জন্য তিরস্কার করিল। বিলম্ব করিলে যে বিপদ গুরুতর হইবে বুঝাইয়া দিল। তথাপি সোফি কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলনা। অবস্থা দেখিয়া সোফির মাতা তাহাকে বলিলেন—"এ যে সুরার প্রেতাত্মা তাহার সন্তোষজনক প্রমান চেও—পরে যা হয় করা যাবে—"। তৃতীয় বৈঠকে সোফি সুরাকে তাহার আত্ম-পরিচয় করাইবার মত প্রমাণ চাহিল। "সুরা" বলিল—"নিকোলাস্‌কে এখানে ডেকে আন আমি তখন আবির্ভাব হয়ে যা কর্ত্তব্য করবো"। তাও সোফি পারিল না। নিকোলাস্ কখনো তাদের বাড়ীতে আসেন ইহা। পরিচয়ও তেমন ঘনিষ্ঠ নয়, কি করিয়া তাহাকে এমন অনুরোধ করিবে? পরবর্ত্তী বৈঠকে সোফি অন্য নিশ্চয়াত্মক

প্রমাণ চাহিল—। তদনুসারে 'সুরা' বলিল "ভাল, আমি তোমাকে দেখা দিব—"।

'সুরা' কথানুসারে তাহাই করিল। সোফি এ ঘটনার দু'চার দিন পরে একদিন রাত্রি চারঘটিকার সময় কোথা হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ী ফেরে। সে কাপড় ছাড়িয়া শুইতে যাইবে এমন সময় সে খানা খাইবার ঘরের দেয়ালে নরমুণ্ডের একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিল। মূর্ত্তিটা ভাস্বর অর্থাৎ স্বয়মোজ্জ্বল। দুই তিন সেকেণ্ড থাকিয়া মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। সোফি প্রথমে ভাবিয়াছিল বুঝি রাস্তার আলো পড়িয়া এই ভ্রম বোধ ঘটাইল, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে বুঝিল না তাহা হইতে পারে না। পরদিন এক বৈঠকে সুরা আবির্ভূত হইয়া বলিল—"দেখা দিয়াছিলাম, এখনো বড় দুর্ব্বল, এর চেয়ে স্পষ্ট ভাবে মূর্ত্তিগ্রহণ সম্ভব হইলনা—"। আরো কয়েকটী অত্যন্ত নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ পাইয়া সোফির দৃঢ় বিশ্বাস হইল উহা সুরারই প্রেতাত্মা বটে। ইহার পর সোফি স্থির করিল, নিকোলাসকে না বলিয়া তার বাপমাকে বলা যাউক। তাঁরা যা হয় করিবেন। কিন্তু পরবর্ত্তী এক বৈঠকে সুরা আসিয়াই খুব রাগতঃ ভাবে আগেই বলিয়া বসিল—"ও সব মতলব করছ ওতে কিছু হবেনা।" এই বলিয়া সুরা তেজের সহিত দুর্ব্বল মনা সোফিকে নানা অকথ্য ভাষায় গাল দিল, সে সব অভিধান-ছাড়া কথা, কিন্তু আশ্চর্য্য এই সুরা জীবিতকালে ঐ সব কথা খুব ব্যবহার করিত।

যাই হোক সোফি তথাপি সুরার আদেশ অনুসারে কাজ করিতে পারিল না। সুরার বিশ্বাস হইয়াছিল সোফি তার মায়ের প্রভাবে গররাজি হইতেছে। সোফির মা কোনো প্রশ্ন করিলেই সুরা যেন খুব কুপিত ভাবে লিখিত "তুমি থাম তুমি থাম।"

তার পর একদিন বৈঠকে সুরা আসিয়া বলিল "আর উপায় নাই, সর্ব্বনাশ হযে গেছে—নিকোলাস্ বন্দী হ'তে চল্‌লো! এর পর তোমরা অনুতাপ করবে! অনুশোচনায় পুড়ে মরবে—"। সুরার এই গুলি শেষ কথা। তারপর কোনো বৈঠকে সে আর দেখা দিতনা।

মিসেস্ উইল্ডার যেদিন যেমন তেমনি বিবরণ আমায় দিতেন। কিছুদিন পরে সোফির মা নিকোলাসের বাপ-মাকে এই সব কথা জানান। তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না, এবং কোনো কাণ দিলেন না।

এমনি ভাবে সে বছর কাটিয়া গেল। সোফির মনে বিশ্বাস হইল যখন নিকোলাসের কিছুই বিপদ দেখা দিলনা তখন সুরা বা সুরার সে সব কথা মিথ্যা, ও সব আজগুবি বা ফাঁকির কারখানা। আরো একবৎসর নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। তার পরের বছর ৯ই মার্চ্চ হঠাৎ পুলিশ কর্ত্তৃক নিকোলাসের ঘর তদন্ত হয় এবং সে ধৃত হইয়া রাজধানী হইতে সুদূরদেশে নির্ব্বাসিত হইল। নিকোলাস কয়েকটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল, ফলে ধরা পড়িয়া নির্ব্বাসিত হয়। তখন সোফি, তাহার মাতা ও নিকোলাসের পিতা-মাতা সুরা প্রদত্ত প্রেতবার্ত্তার মর্ম্ম বুঝিতে পারে। তাহাদের স্থির বিশ্বাস হইল যে সত্যই সুরার আত্মা যথাসময়ে তাহাদের সাবধান করিয়াছিল।

সোফির সহিত সুরার প্রথম আলাপ যখন হয় তখন সোফির বয়স ১৩, সুরার বয়স আরো কম। এক বিদ্যালয়ে দুজনে পড়িত বটে কিন্তু আলাপ সেরূপ ঘনিষ্ঠ ছিলনা। কিছু দিন পরেই সুরা অন্য বিদ্যালয়ে চলিয়া যায়। তার পরও দুজনের যা দেখা শুনা তা দূর হইতে চোখের দেখা মাত্র। সোফির মা কখনো সুরার সঙ্গে মৌখিক ভাবে আলাপাদি করেন নাই। সুরার মতিগতি বা রাজনৈতিক মতামত সোফি বিন্দুবিসর্গও জানিত না।

[৭] অদৃশ্যভাবে ভর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার ঘটনার প্রামাণিকতা

অনেক প্রেতবৈঠকে দেখা যায় মিডিয়মে প্রেতাত্মা ভর করিয়া তাহার হাত বা মুখযোগে লেখা বা কথাদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে—এবং সেই সঙ্গে আত্মপরিচয় দিবার জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্য অলৌকিক ঘটনা ঘটাইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিখ্যাতনামা মিডিয়ম ষ্টেনটন মোজেস ও হোমের ভরাবস্থায় ইহা ঘটিত। প্রেতাত্মারা বলেন, অবিশ্বাসী লোকদের মনে প্রেতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগাইবার জন্য তাহারা এ সব করে।

আধুনিক প্রেততত্ত্ব নামক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত এ

জাতীয় ঘটনার কয়েকটী উদাহরণ দিয়াছি। সে সব ঘটনার সাক্ষী — —বড় যে-সে ব্যক্তি নহেন; বিজ্ঞান জগতের ধুরন্ধর, পণ্ডিত প্রবর রাসেল ওয়ালেস; ক্রুকস্, ও লর্ড র‍্যালে প্রভৃতি স্বচক্ষে এইরূপ অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

(৮)—মিডিয়ম কর্ত্তৃক প্রেতাত্মার দৈহিক আকৃতির পরিচয় তাহাব জীবিত কালীন ফটো হইতে চিনিতে পারা

— —ইহাও একটী বলবান প্রমাণ বলিয়া ধর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে ব্যাপার বুঝা যাইবে। সার অলিভার লজ স্থির করিলেন যে যদি সত্যই কোন বিদেহ আত্মা মিডিয়ম দেহ অধিকাব করে তাহা হইলে মিডিয়মের দেহী আত্মা নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে পায়; যদি পায় তাহা হইলে মিডিয়ম সংজ্ঞাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পরও তাহার (প্রেতের) ফটো দেখিলে বলিতে পারিবে সত্যই তাহাকে দেখিয়াছে কিনা।

এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তিনি মিসেস্ পাইপারকে লইয়া পরীক্ষা করেন।

১৯০৬ সালে ৩রা ডিসেম্বরের বৈঠকে এই পরীক্ষা হয়। ইহার পূর্ব্বে জোসেফ্ মার্ব্বেল নামক এক মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা পাইপার দেহে ভর করিতেছিল। বৈঠক শেষে যখন পাইপার সংজ্ঞাবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছেন মাত্র-ঠিক তখনি সার লজ্ এগারো খানা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ফটোর মধ্যে মার্ব্বেলের ফটো রাখিয়া পাইপারকে দেখিতে দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "এর মধ্যে কাকেও কি তুমি সম্প্রতি দেখেছ ?" উত্তরে পাইপার জোসেফ মার্ব্বেলে চিত্রখানা দেখাইয়া বলিলেন—মনে হচ্চে যেন এঁকে কোথায় দেখেছি —কোথায় তা মনে হচ্চে না—।

পরবর্ত্তী এক পরীক্ষায় মিসেস্ পাইপার দ্বিধা মাত্র না করিয়া বহু ছবির মধ্য হইতে উক্ত মার্ব্বেলের ছবিখানা দেখাইয়া দেন।

চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সভায় (S. P R.) বিশিষ্ট সভ্যেরা এই পরীক্ষাগুলি অপক্ষপাত ভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে—বিদেহী প্রেত কর্ত্তৃক মিডিয়ম দেহ অধিকার খুবই সম্ভব ব্যাপার। (ক্রমশঃ)

পল্লীপথে

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ]

দাঁড়াও দাঁড়াও শোনো দখিন পাড়ার রূপসী
দয়া করে আমার ঘরে হওগো প্রেয়সী।
দিব শাড়ী 'শান্তিপুরে'—
গামছা দিব রঙীন ডুরে
জল আনিতে দিব তোমায় পিতল কলসী॥
নারিকেল তেল দিব তোমায়
বেণী বাঁধিতে

দিব নূতন তাতারসি
পায়স রাঁধিতে।
পৈঁছা শাঁখা দিব হাতে—
খাওয়াইব দুধে ভাতে
না হয় নিজে— বর্ষারাতে
থেকে উপোষী।
দেবনাক মাজতে বাসন
গোয়াল কাড়িতে

কুট্‌তে চিড়ে পাঠাবনা
পরের বাড়ীতে।
মাঠে ঘাটে যাওয়া আসায়
মনের কথা কইতে পাড়ায়
অনেক পাবে সই সাঙাৰ্তী
সমান বয়সী ॥
হাঁটতে পাছে কাদা লাগে
আল্‌তা পরা পায়

আষাঢ় মাসে ঝামা পেতে
দেব আঙ্গিনায়।
নতুন ছাওয়া আমার ঘরে
নতুন বোনা মাদুর পরে
এস তোমায় পূজব দিয়ে
দূর্ব্বা তুলসী ॥

সমাজের ভার আমাদের বুকের উপর ঠিক কবরের পাথরের মত চেপে আছে আমরা কেও সাহস করে হাতখানি পর্য্যন্ত নাড়াতে পারি না—

* * * * *

'মুখস'টা মানুষের সত্যিকারের মুখ চাইতে অনেক কথা বেশী বলে—অস্‌কার ওয়াইল্ড।"

"মানুষের সারা জীবনের কাজের চাইতে যা ভাবা যায়, যা বলা যায় তার মূল্য ঢের বেশী—স্যার আর্থার হেল্পস্

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল্]

(৬)

হে অপরিচিত, হে রহস্যময়, এই যাকে তুমি দিয়ে গিয়েছ এও কি চিরদিন তোমারই মত চিরমৌন থেকে যাবে ? তুমি সেই যে দু'দিনের জন্য দেখা দিয়ে কোথায় কোন গোপনতার মধ্যে আপনাকে লুকালে আজও সেই গোপনতার অবসান হল না। আর এই যাকে তোমার চির স্মৃতিরূপে রেখে গেলে, এও যে চিরদিনের মত মূক বধির এবং হতবুদ্ধি হয়ে চিরসুদূর দেবতার পাষাণ প্রতিমার মত হয়ে রৈল। একে নিয়ে আর কত দিন কাটাব ? কত আর পাষাণের এই মূক প্রতিকের সেবা করে এর অধিষ্ঠাতৃদেবতার পুনরাবির্ভাবের আশায় রব ? কতদিন—ওগো কতদিন ? দিনের পর দিন গেছে মাসের পর মাস গেছে বৎসরের পর কত বৎসর চলে গেছে, তবু তুমি দূরে—অতি দূরেই রয়ে গিয়েছো। এ যে কাটেনা দিন—আর যে পারি না প্রভু।

যাক—যাক, না পারলেও পারতে হবে কারণ তাই তাঁর ইচ্ছা যে!

কতদিন হয়ে গেছে তবু সে দিনকার একটা কথাও ত' ভুলতে পারিনি। কেন পারি নি ? আমি আজন্ম সমস্ত জগৎ ভুলতে সমস্ত মায়ার বন্ধন কেটে মুক্ত পাখীর মত ব্রহ্মাকাশে ঘুরতেই ত' শিখেছিলাম। তবু যে মুহূর্তে আমার পিঞ্জর দেখতে পেলাম অমনি আপনা আপনি সেই খাঁচায় ঢুকে পড়লাম কেন ? আপনি শিকল পরলাম কেন ? এখন দাঁড়ে বসে উদ্ধমুখে চেয়ে বসে আছি, যদি খাঁচার দ্বার কেউ খুলে দেয়, যদি শিকল কেউ ছিঁড়ে দেয়! কিন্তু কৈ সেই আমার একটী মাত্র মানুষ যে এই শিকল আপন হাতে খুলে দেবে ? কোথায়—

না—না—এসে কাজ নেই, খুলতে এসে কাজ নেই; যদি খুলতে এসে এই শিকলে তুমিও বাঁধা পড় তা যে আমার মর্ম্মান্তিক হবে। না—কাজ নেই—কিন্তু—আবার কিন্তু কেন ? কোন কিন্তু নেই। আমার চিরমুক্তি—এই আশাই আমার আকাশ, এই আশাই আমার চির বিচরণ স্থান।

কিন্তু, কেন তুমি এই অদ্ভুৎ ভার আমায় দিয়ে গিয়েছ তা যে বুঝতে পারলাম না প্রভু! আমার এত খানি সচেতন প্রাণ-প্রান্তরের মাঝখানে এই মূক মূঢ় পাষাণের মন্দির বসিয়ে গেলে কেন ? যেখানে একদিন তুমি পা রেখেছিলে সেখানে এই বাক্যহীন বোধহীন জড় পিণ্ডের প্রতিষ্ঠা করে গেলে কেন ? এ যে আমার সমস্ত দিনের সযত্ন রচিত পূজা অর্চনা সেবা তোমারই প্রতিনিধি হয়ে নিচ্ছে। একে যে একমুহূর্ত্ত ছেড়ে থাকতে পারিনে, ধুয়ে মুছিয়ে খাইয়ে শুইয়ে কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি না। দিনে রাত্রে হাজারবার করে এরই চারপাশে ঘুরে মরতে হয় যে। কি শক্তি এই জড় মেয়েটীর মুখের মধ্যে দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করে গিয়েছে। এর সারা দেহে যে তোমারই বিশাল চক্ষুর সেই প্রবল দৃষ্টি ফুটে রয়েছে। আমার সারাদিন যে কেবল তোমার চ'খের সেই দৃষ্টিটা দেখতে পাই। সেই তোমার সেই দিনকার সেই চোখ, যা শত সহস্র লক্ষ লোকের চক্ষের সামনে এই মৃতবৎ মুখের উপর রেখে-ছিলে, যা মাত্র এক নিমেষের জন্য আমারও চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে আমায় অন্তরের মধ্যে রেখেছিলে—সেই তোমার সে দিনকার প্রচণ্ড করুণার দৃষ্টিটা।

তুমি চলে গেলে, কিন্তু এমন করে বেঁধে রেখে গেলে কেন, সন্ন্যাসী ? সন্ন্যাসী ত' মুক্তি দেয়, এই অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বে যিনি ব্যাপ্ত তাঁরই পরম পদই ত' দেখিয়ে দেয়। সে তো বাঁধে না। তবে তুমি সেই সেদিন অমন করে বেঁধে, অমন করে বাঁধন স্বীকার করে

তবু চলে গেলে কেন ? কিন্তু হে আমার সুদূরের দেবতা, এই ভক্তের বাঁধন একদিন তোমায় ক্ষণকালের জন্যও বেঁধেছিল এ কথা ত' সত্য। এ কথা ত' আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। সেই গর্ব্বেই যে আমার সারা অস্তিত্ব ভরে আছে, সে গর্ব্ব কি তুমি কেড়ে নিতে পারবে ? না সে শক্তি তোমার নেই। তাই আশা হয় আবার দেখা পাব—এ আশা আমার সফল হবে, হবেই হবে।

আঃ—আবার সেই সফলতার কথা। তিনি যাবার দিন যে অমূল্য পুরস্কার আমায় দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর প্রাণের শেষ কথায় ভরা এই খাতা খানাই আমার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ লাভ বলে কেন মনে করতে পারছিনে ? এই খানাতেই ত' তিনি চিরদিনের জন্য ধরা দিয়ে গিয়েছেন। আমিও ত' তাই তাঁকে না পেয়ে এই খাতাখানাতেই তাঁরই পাশে দিনে দিনে আপনাকে নূতন করে ধরা দিচ্ছি। এই খাতা খানার মধ্যে তাঁরই পাশে আমার স্থান হয়েছে ত' তবে আবার কি চাই তোর ? ওরে লোভী, ওরে বিশ্বগ্রাসেচ্ছু, এততেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না ?

যাক তাঁর কথা লিখি, ওরে মন সেইদিন গুলো আবার স্মরণ কর্!—

আমরা সেই মেয়েটীকে নিয়ে প্রায় সন্ধ্যার সময় বাসায় পৌঁছুলাম। কিন্তু তাকে এনে যে কি বিপদে পড়লাম তা বলতে পারিনে। সে কথা কয় না— উত্তর দেয় না, মড়ার মত পড়েই রইল। কি কষ্টে যে তাকে একটু দুধ খাওয়ালাম তা বলতে পারি না। ছোটছেলে তবু আপত্তি করে কাঁদে হাত পা ছোড়ে, এবং তার কান্নাকাটীর ফাঁকে ফাঁকে, দুরন্তপনার সাহায্য নিয়েই তাকে খাইয়ে দাইয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে তোলা যায়। কিন্তু এই মেয়েটী একেবারে জড়বৎ হয়ে গিয়েছে। দুঃখের ভয়ঙ্কর ঝড়ে তার আত্মা উড়ে পালিয়েছে, কেবল দেহের কোন গভীর কোণে প্রাণের একটা ক্ষীণ অবশেষ রেখে গেছে। সেই টুকু প্রাণের জোরে তার নিশ্বাস পড়ছে মাত্র, কিন্তু সেই প্রাণের শক্তি পাঁচটা ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আর এসে পৌঁচাচ্ছেনা। তাই সে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই আছে, কথাও নেই নড়ন চড়নও নেই।

এমনি করে সেই রাত্রিটা কেটে গেল। তারপর দিনও কাটে কাটে এমন সময় বাবা আবার সেই পরম আশ্চর্য্য মানুষকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি সমস্ত দিন ধরে সাধু দর্শন করে বেড়িয়েছেন। কি যে তাঁর মনে ছিল জানি নে কিন্তু আমি সমস্ত দিন ধরে মনে করিছি যে বাবা একটী লোকেরই খোঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি নিজে বেরুতে পারিনি, কারণ এই যে একটি জীবন-মৃত বস্তুর গুরু ভার তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন একে ছেড়ে এমন কি তাঁর খোঁজেও বেরুবো কি করে ? সমস্ত দিন একটু একটু করে একে খাইয়েছি সরিয়েছি নড়িয়েছি এইসব কাজে যারা আমায় সাহায্য করেছে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে, কারণ এই মরণাধিক মরণাচ্ছন্ন প্রাণীটাও' শিশুর মত লঘুভারও নয় অথচ মৃতের মত একেবারে জড় বস্তুও নয়। তাই এর কি যে প্রয়োজন কি যে অপ্রয়োজন তাত জানবার জো নেই। বিশেষতঃ সবাই এসেছে পুণ্য সঞ্চয় করতে, এরকম পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগীর সেবা করতে ত' কেউ আসে নি। তাই এক দিন যেতে না যেতেই দাস দাসী আত্মীয় স্বজন সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমিও কেবল একে সেই মহাক্ষণের মহালাভ মনে করে আগলে বসে আছি।

কিন্তু তিনি আপনিই এলেন। এবং এমন সময় এলেন যখন আমি এর মুখে বিন্দু বিন্দু করে দুধ দিচ্ছি, এবং যখন আমার চক্ষু দুটী এর মরণাচ্ছন্ন চোখ দুটীর মধ্য দিয়ে অন্য দুটী বিশাল চ'খের অপূর্ব্ব দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে!

বাবার সঙ্গে তিনি এসে দাঁড়ালেন। একসঙ্গে জীবনের দুই গুরু। আমি আস্তে আস্তে উঠতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি বারণ করলেন। তার পর আস্তে আস্তে সেই মরণাহত চক্ষু দুটীর উপর ঝুঁকে পড়ে কি যে করুণায় চাইলেন তা বলতে পারিনে সেই সময় সেই কক্ষে এমন একটা স্তব্ধতা অটল হয়ে বসে ছিল যে আমার বক্ষের রক্তের তাল ও যেন আমার কাণে অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

তিনি ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে হঠাৎ সেই করুণ দৃষ্টি আমার চোখের উপর রাখলেন। আমার যেন মনে হল আমার চ'খের মধ্য দিয়ে অতি শীতল গঙ্গা যমুনার জল

তৃষিত অন্তরে প্রবেশ করল, আমি ধন্য হলাম! আমার জন্মজন্মান্তরের সমস্ত সাধনার সাফল্য যেন এক নিমেষে আমার মধ্যে ধরা দিলে। আমি ধীরে ধীরে যেখানে ছিলাম সেইখানে বসেই তাকে প্রণাম করলাম। অমনি মধুর গম্ভীর শব্দ হলো "ও নমো নারায়ণায়। ওঁ প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।"

কি মধুর সেই আবাহন! এ আবাহন ত' কেউ করেনি ইনি এসেই একবার চেয়েই একবার ডাকতেই আমি—এই অন্তর—বেরিয়ে ছিলাম! এক নিমেষে আমি সমস্ত জগৎ হতে এঁর অন্তরে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়তমা হয়ে ধরা পড়লাম। আবার ধরা দিয়েই তখন আমি নিজের কাছেও প্রিয় হতেও প্রিয়তমা হয়ে গেলাম। ইনি এক নিমেষে আমায় এ কোন স্বর্গে নিয়ে গেলেন? এ কোথায় কোন চির পার্থিক সিংহাসনে তিনি আমায় বসিয়ে দিলেন। যখন এনি তাঁর ঐ আবাহন শুনলাম আমার অন্তরের মানুষটীও তখন না জেনেও নিশ্চয়ই বোধ হয় বলে উঠেছিল—

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে ওঁ প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে ওঁ নিধিনাম্ ত্বা নিধিপতিং হবামহে।

হে আমার লোকের মধ্যে লোকপতি তোমায় আবাহন করি। এসহে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়তম, তোমায় স্বীকার করি। ওগো নিধির মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠনিধি এস তোমায় অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করি!

---

(৭)

তারপর ক'দিন যে কি রকমে কেটেছিল ভাল স্মরণ নেই। স্বপ্নে জাগরণে মাতালের মতই কেটেছিল বোধ হয়। তিনি যে কি সব কথা বলেছিলেন, কি যে তার উত্তর দিয়েছিলাম জানিনা, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই ফাল্গুনের এক অপূর্ব্ব দিনে, বসন্তের এক অপূর্ব্ব প্রথম প্রকাশের মধ্যেই তিনি আমার জীবনকে চির কালের জন্য তাঁর দক্ষিণ পাণির মধ্যে গ্রহণ করলেন। আমার বাবাও যেন চিরপ্রার্থিত বস্তু পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন। কি আনন্দ তিনি এই সন্ন্যাসীর হাতের মধ্যে দান করলেন তা তিনি জানেন। কিন্তু মা এবং তাঁর আত্মীয়েরা সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন কারণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিবাহ ত' কোন শাস্ত্রেও নেই। লোকে শুনে কি বলবে? সমাজে আমার এই বিবাহ স্বীকার করবে কি? একি হল!

কিন্তু বাবার মনে কোনো দ্বিধা ছিলনা—তিনি যেন হারানিধি খুঁজে পেয়েছেন, তিনি যেন চিরসাধনার সাফল্য পেয়েছেন, এমনি ভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করলেন। সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয় সমস্ত নিয়মই পালন করে আমায় গ্রহণ করলেন। সমস্ত রাত্রি ধরে বাবা তাঁকে আর আমাকে একত্র বসিয়ে যজ্ঞ করলেন, তারপর ভোরের সময় আমাদের দুজনকে যেন কি একটা মহান ভাবের অগ্নির মধ্যে স্বাহা মন্ত্রে উৎসর্গ করে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

আমি একবার মাত্র সন্ন্যাসীর দিকে চাইলাম, দেখলাম তিনি একদৃষ্টে যজ্ঞাগ্নির দিকে চেয়ে বসে আছেন। সেই আলোকে তাঁর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে বেষ্টিত অপূর্ব্ব মুখখানা যেন সান্ধ্যসূর্য্যের মত ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর দেখাচ্ছিল। চক্ষে ছিল তাঁর এমন একটা জ্যোতি যা কোমল নয় অথচ কঠিনও নয়—যেন দুয়েরই সংমিশ্রণ। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কেবল অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠতে লাগলাম।

তারপর বাবা যখন শেষ আহুতি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সন্ন্যাসীও উঠে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে বল্লেন, "আমি ধন্য হলাম আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" বাবা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করতে এগিয়ে গলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আমি তখন তাঁর পায়ে প্রণাম কর্‌তেই তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন, "আপনাকে আশীর্ব্বাদ করতে পারবনা। আপনি যে আমার দান গ্রহণ করেছেন এই আমার বহুভাগ্য।"

সন্ন্যাসী একবার আমার দিকে চাইলেন তারপর বল্লেন, "কি যে করলাম জানি না, হয়ত এই বালিকার মহৎ অপকার করলাম। আমি সন্ন্যাসী হয়েও একি করলাম! মানুষ মানুষ করে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন মানুষ যে পাব তা কে জানত! আপনি যে আমায় এমন মানুষ দেবেন তা যদি জানতাম, তাহ'লে কি এমনি করে

এই প্রকাণ্ড মেলার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি? মানুষের বিরহে যত ছুটে বেড়াচ্ছিলাম ততদিন বুঝিনি যে যতদিন প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়কে না পাওয়া যাবে ততদিন ছুটোছুটী থামবে না। তাই এই বালিকার মধ্যে তাকেই খুঁজব বলে এর কাছে এসেছি। কিন্তু তবু কেন ভয় করছে?”

বাবা চুপ করে ছিলেন না, সন্ন্যাসীর শেষ কথা শুনে বল্লেন, “ভয়! আপনারও ভয় করছে?” সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন না। পূর্ব্বাকাশে যে উষার আভাষ দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিরে বল্লেন “হ্যাঁ ভয়ই করেছে, এই এতদিনকার সমস্ত সাধনার সংস্কার কি এক মূহুর্ত্তেই শেষ হয়ে যাবে? বোধ হয় যাবে না—বোধ হয় আবার যুদ্ধ করতে হবে। চিরদিন কামিনী কাঞ্চনকে ঘৃণা করতেই সাধনা করে এসেছি। হঠাৎ যে আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেছি, একি মন সহজে স্বীকার করতে চাইবে? যতদিন মুক্তি সাধনা করিছি, ততদিন বন্ধন আমায় ভয়ঙ্কর জোরেই টেনেছে, আজ আবার সেই বন্ধন সাধনা করতে যাচ্ছি অমনি মুক্তি আমায় টানতে সুরু করেছে। তাই ভাবছি, কি জানি কি হয়।”

বাবা মুখ ফিরিয়ে উষার আলোর দিকে চাইলেন। ঘরের মধ্যে যে ঘৃতের বড় প্রদীপটা জ্বলছিল তার আলো ক্রমশঃ কমে আসছিল। আমি চুপ করে কাঠের মত সেই বিবাহের আসনেই বসে একবার বাবার দিকে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ যখন প্রদীপ নিবে এল তখন ঐ অস্পষ্টতার মধ্যে অদ্ভুৎ মানুষদুটী আমার কাছে যেন কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকের জীব বলে বোধ হতে লাগল তাঁদের কথা গুলি আমার কাণের মধ্য দিয়ে তন্দ্রাহীন প্রাণের এমন একটা স্থানে প্রবেশ করছিল যে আমি সে সব কথার একটিও ভুলতে পারিনি। কখনো যে পারবো তাও মনে হয় না।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, “না কোন ভয় নেই—আমার মনে ঐ উষার আলোর মত আশা জেগে উঠছে। আমার বেশ মনে হচ্ছে এর পরে এমন একটা সত্য সূর্য্যের মত জেগে উঠবে, যার আজকের এই আলো আঁধারের সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত ভয় সমস্ত সন্দেহের অন্ধকার লজ্জায় মুখ লুকাবে। না আমার ভয় নেই—আমার চির প্রত্যাশিত সত্য তোমাদের দুজনার মধ্যে পূর্ণ প্রকাশিত দেখতে পাব। আর ভয় নেই—এস সন্ন্যাসী আজ তোমার ও আমি গুরু হব—তোমাকেও আমি আশীর্ব্বাদ করব।”

বাবা এগিয়ে যেতেই সেই সিংহের মত কেশর যুক্ত মাথাটী হঠাৎ নুয়ে তাঁর পায়ের কাছে এল—বাবাও তাঁকে কি একটা বৈদিক মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করলেন।

—o—

তার পর মা এলেন, দিদিমা এলেন, আরও অনেকে এলেন, আশীর্ব্বাদও করলেন, কিন্তু সেই সিংহের মত মাথাটা আর সেই প্রথম দিনকার মত উঁচু হয়ে উঠল না। মন্ত্র মুগ্ধ সেই পরম দুঃখে আমার চক্ষু জলে ভরে এল।

—•—

(৮)

কিন্তু যে সিংহ গিরিগহনচারী সে তাহার চিরবিচরণ স্থান ছেড়ে কতক্ষণ এই অকিঞ্চিৎকর পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে। তাই তিনি দু'দিন পরেই এই যে খাতাখানিতে আমাকে গেঁথে তুলছি এই মহামূল্য বস্তুটী আমাকে দান করে চলে গেলেন। আমি তাঁকে ধরে রাখতে চেষ্টাও করিনি। কারণ এ কথা কঠিন জানতাম যে ইনি নিজে বন্ধন না স্বীকার করলে, কেউ একে বেঁধে রাখতে পারবে না। তাই আমি একটী কথাও বলিনি, তিনিও কোনো কথা বলেন নি। শুধু যাবার সময় এই খাতাখানি আমার হাতে দিয়ে একবার আমার মুখখানা তুলে ধরেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে সেই যে মুখ ফেরালেন, সে মুখ আর ফিরিল না। আমি তাঁর কটা চুলের রাশ মাত্র শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখেছিলাম। কিন্তু সেই লালে কালোয় মেশানো ধুমকেতুর পুচ্ছটী আমার মনের আকাশে চিরদিনের মত একি উজ্জ্বল রেখায় আঁকা রয়ে গেল। একি মুছবে না?—এ ধুমকেতুর সামনের তারাটী কি চিরদিনের মত অস্তগতই থাকবে? তাকি কোন দিন উজ্জ্বল হয়ে আর দেখা দেবে না—শুধু এই প্রাণের জগতে উপপ্লব জাগিয়েই রেখে দেবে?

বাবা কিন্তু বলেছিলেন "থাক আবার আসবে। আসতেই হবে। আমার আশা বিফল হবে না। জানকি, মা, ভয় নেই তোর।"

ভয় নেই বটে, কিন্তু অভয় ত নেই। সেই পরম অভয় যে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। তার পরিবর্তে একটা দুর্নিবার কঠিন সন্তোষ যে প্রাণের মধ্যে ধীরে ধীরে আসন নেবার চেষ্টা করছে। যেন মনে হচ্ছে আমি শুকিয়ে উঠছি। কেন এই শুষ্কতা? কে বলে দেবে? কে আজ বলে দেবে—কেন? যিনি পারবেন তিনি দূরে, যিনি পারতেন তিনিও আজ তাঁর এই অবোধ কন্যাকে, তাঁর চির আদরের শিশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এ বিশাল সংসারের মরুভূমে আমায় ফেলে বাবাও আজ কতদিন হল চলে গেছেন। হায় আমার জনক ঋষি তাঁর জানকীকে ফেলে কোথায় গেলেন।

জানিনা তিনি সংসারের পারে গিয়ে তাঁর চির আশার চির সাধনার কোনো সফলতা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, কিন্তু আমি ত কিছু পাচ্ছি না এবং আর যেন পারছিও না। অথচ সেই পরম অপরিচিতকে পাবার আশাও ত ছাড়তে পারছি না। যতই মনকে বুঝুচ্ছি, বাবার অন্তঃকালের শেষের কথাগুলি যতই মনকে বলছি যে, যা পাবার নয় তাকে না পাওয়াই পরম প্রাপ্তি, তবু অন্তরের অন্তরে যে আছে সে ত' কৈ বুঝছে না। তাই ত' আজও আমার চির-বাসর শয্যায় চির-জাগরণে বসে থাকা। তাই ত' চিরদিন ধরে পথ চেয়ে সংসারের সিংহ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। অথচ যিনি আমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনিও নেই যাঁর আশায় থাকা তিনিও আসছেন না। অথচ সেই আশাতেই ঐ অত বড় মন্দির তৈরী হয়েছে। সেই পরম সন্ন্যাসীকে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি দেখতে পাই সেই আশাতে মা আমার জন্য ঐ অত বড় ধর্ম্মশালা তৈরী করেছেন। তাঁকেও বুঝতে হয়েছে যে এই আমার অদৃষ্ট! তাই অমন যে হাস্যময়ী হাসি সেও হাসি গোপন করে, প্রতিদিন ঐ ধর্ম্মশালার তত্ত্বাবধান করছে। অনেক দিন আগে তার বিবাহ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেও প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, যে, তার উর্ম্মিলা দিদির স্বামী না ফিরলে সে বিয়ে করবে না। অন্ততঃ তার বাবা যদি ফিরে এসে বিয়ে না দেন তাহ'লে সে তার দিদির মতই অপেক্ষা করবে। হয় তার বাবাকে চাই নয় তার দিদির স্বামীকে চাই।

তারপর কত সন্ন্যাসীই এলেন আর চলে গেলেন। বাবা বেঁচে থাকতেও অনেকে এসেছিলেন, আমার মায়ের আমলেও কতদিন কত সাধুকে সেই আমার একটী সন্ন্যাসীর আশায় আশ্রয় দিয়ে কত উপদেশ কত ধর্ম্ম কথা শুনালাম। কিন্তু যে কথাটী শুনবার জন্য, যাঁর মুখের বাণী গ্রহণ করবার জন্য আমাদের বৃহৎ সংসার সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে উন্মুখ হয়ে আছে, যাঁকে বরণ করবার জন্য আবাহন করবার জন্য আমি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে বসে আছি, কোথায় তিনি?

তুমি কি ফিরবে না? কতদিন তোমার প্রিয় হতে প্রিয়তমাকে ছেড়ে থাকবে? কতদিন ওগো—আর কতদিন।

আশাই কি আশার শেষ? বাবাত' তাই বলে গিয়েছেন কিন্তু তাই যদি হয় তবে এই আশা করার দুঃখের শেষ করে দাও। নিরাশার কঠিন সন্তোষকে ধরতে শেখাও। না হয় এই যাকে তোমার দেবত্বের কঠিন প্রতীক করে গেছ—এই যে মৌন জড় বস্তুকে আমার বুকের কাছে দিয়ে গেছ, আমায় এরই মত করে দাও। এই বাক্যহীন সর্ব্বচেষ্টাহীন বালিকার অবস্থার ওপরেই যেন ক্রমশঃ আমারও লোভ হচ্ছে। এর সঙ্গে থেকে যে ক্রমশঃ আমারও মূকত্ব পেতে ইচ্ছে হচ্ছে, জড় হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এ যেমন ভয়ঙ্কর দুঃখের আঘাতে একেবারে সুখ দুঃখের পরপারে চলে গেছে—আমারও তাতে লোভ হচ্ছে যে।

ফিরে আয়

[শ্রীঅক্রুর চন্দ্র ধর]

আজতো ঘরে তেমন ধারা নেইকো গণ্ডগোল
মারামারি হুড়াহুড়ির ধূম ;
আজতো নাহি কারও মুখে সেই সুমধুর বোল,
খোকার তরে ভাঙলো নাকি ঘুম ?

বেলা হলো, কই কেহতো আঁচল ধরে আজ
"খাবাল দেমা" কয়না বারে বার ;
অমনি করে হয়ে গেল ভোরের সকল কাজ
বাছা আমার নাই কি ঘরে আর ?

চাল গুলিতো তেমনি আছে ডাল মিশায়ে তায়
উণো কাজে দেয়নি দুনো ক'রে ;
বাড়ীর বাঘা কুকুরটা ওই মিট্ মিটীয়ে চায়
সোয়ার নাহি কে আর তাতে চড়ে ?

দুধের কড়ায় লবণ ফেলে চুলোয় ঢেলে জল
ঘরের বাহির যায় না কেহ হয়ে ;
"লক্ষ্মী ছাড়া দস্যি ছেলে" বিপদ অমঙ্গল
এমনি ধারা দুইটী কথার ভ'য়ে।

কলম দোয়াত কাগজ পুঁথি তেমনি পড়ে অই
উলট পালট্ হয়নি কিছু আজ ;
ধ্বংশ লালার অংশাবতার শিবটী আমার কই
স্নেহ রাজ্যের কইরে মহারাজ ?

নভেল-পড়া নেশার ঝোঁকে হায়রে কতবার
রাগ করেছি গাল দিয়েছি তায় ;
"সময় নাহি" বলে বলে দোষ দিয়েছি তার
এখন যেরে সময় নাহি যায়।

তুই কি ছিলি দুষ্টু, শুধুই শুধুই মিষ্টি খোর
শুধুই ছিলি মিশ্রি চিনির যম ?
চিনির চাইতে মিষ্টি যেরে ডাকটী ছিল তোর
হাস্য টুকুও মিষ্টি অনুপম !

ভোর হ'য়েছে ভোরের পাখী কইরে আমার কই
তোর লাগি এই বুক যে ভেঙে যায় ;
সবই দিব সবই দিব স্বর্গ হতে আজ
বাছা আমার আয়রে ফিরে আয়।

শিব সঙ্কীর্ত্তন

[শ্রীতারানাথ রায়।]

আজকাল হিন্দু সাধক সেবিত দেবমণ্ডলীর রূপ ও লক্ষণ দেখিয়া 'ঠিকুজী" সৃষ্টির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রাচীন দল বলিতেছেন হিন্দুর দেবদেবীর ব্রহ্ম বিষ্ণু হইতে আরম্ভ করিয়া মায় ষষ্ঠি মনসা পর্য্যন্ত খাঁটি আধ্যাত্মিক। আবার, বর্ত্তমান পুরাতাত্ত্বিকগণ তাহাদের ঐতিহাসিকতা মাত্র নির্ণয় করিয়া ভারতীয় হিন্দু দেববাদের ক্রমিক অভিব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। পূর্ব্বোক্তব্য খাঁটি ধর্ম্মগত, পরবর্ত্তীটি খাঁটি ইতিহাসের দিক দিয়া। আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক মিলন কোথায় ও কিরূপে সম্ভবপর তাহার আলোচনা হইতেছে না। লম্বোদরের উদরের নাগবেষ্টনীর আধ্যাত্মিকতা কি তাহা সাধকগণই বুঝুন আমরা বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখাইব কোথা হইতে কিরূপে লড্ডু ভক্ষণ করিতে গিয়া গণনাথের উদর ফাঁসিয়া গিয়াছিল আর কিরূপেইবা তিনি নাগদ্বারা সেই মহা ভাণ্ডার আগুলিয়া বাঁধিয়াছিলেন এই হিসাবে শিবঠাকুরের ঠিকুজি মূল্যবান। পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দেশেরও কোন কোন দেবতত্ত্ববাগীশ বলিয়া থাকেন শিবঠাকুরও অন্য ঠাকুরদের মতন ভারতের সম্পত্তি নহেন। উঁহার আদিম বাস ব্যাবিলোন, সিরিয়া, মিশর ঐসকল প্রদেশে। গবেষণার একটুকু নমুনা যথা—

শিবের ইতিহাস।

ব্যাবিলোনের বন্য দেবতা মেরোডাক্ বেদে প্রবেশ করিয়া 'মার্ডীক'রূপে ইন্দ্রবিরোধী অসভ্যগনেরও অপরিচিত এক দেবতা। "এই মার্ডিক বা মর্ডিত পরে হইয়া পড়েন মরুৎ। মর্দিত মেরোডাকের অন্য এক নাম ছিল বেল মেরোডাক্, বেদে তিনি বীলু। পরে মরুৎ রুদ্র হইয়া মরুৎগণের পিতা রূপে সন্তানবর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন এই জন্য রুদ্র হইলেন গণেশ। আবার "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।" অগ্নির শিখা এককালী হইলেন তাঁহার পত্নী, অগ্নি কুমার হইলেন পুত্র। যজুর্ব্বেদে যে রুদ্র সেই অগ্নি। তিনি গিরিবাসী। উমা হৈমবতী তাঁহার ঘরণী। তিনি অহিশত্রু। মিশরের সূর্য্য দেবতা 'রা' দেবী 'শেখেৎ' সহায়ে যেদিন অহি দৈত্যকে শাস্তি দিয়া সর্পদিগকে দেবতার ভূষণ বানাইয়া ফেলিলেন, সেদিন রা, রুদ্র হইলেন, শেখেৎ হইলেন শক্তি। সীরিয়ার হেট্রাইট্‌দের বৃষরূপাদেব ও সিংহরূপিণী দেবী হইতে পরে বৃষারূঢ় দেব ও সিংহবাহিনী দেবী হন। বৃষারোহীদেব বজ্রপাণি ত্রিশূলহস্ত ও মুষলধর। ইহা হইতে ভারতীয় শিবদুর্গা। ক্রমে তিনি ক্ষেত্রপতি গণপতিরূপে বাঙ্গালার কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত এবং শিব ও কালীরূপে "নানা ম্লেচ্ছ গণৈঃ-পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ," সুতরাং বৈদিক যজ্ঞভাগে বঞ্চিত। এইরকম বহুকথা সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন। *

অন্যদিকে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বলিতেছেন—বেদের রুদ্র ধ্বংসের দেবতা। সকল দেবতা তাঁহার ভয়ে জড়সড়। তাঁহার নর্ত্তনে সুধু দেবকুল কেন তৎকালীন অগ্নিময় গ্রহকুলও ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিত। দীনেশবাবুর—কল্পনায় ক্রমে যখন গলিত অগ্নিময় গ্রহগণ শীতল ও শক্ত হইল, ব্রহ্মাণ্ড শান্তরূপ ধারণ করিল রুদ্রও তেমনি শান্তিময় শিব হইয়া উঠিলেন—তিনি বৃদ্ধ হইলেন। বুদ্ধদেবের মতন মদনজয়ী হইলেন। কৌপীনবস্ত হইয়া ভিক্ষাপাত্র করে দ্বারে দ্বারে দেহি দেহি করিয়া বুদ্ধদেব যেমন নীচ পতিতদের সঙ্গে করিয়া ফিরিতেন, শিবও তেমনি প্রেত পিশাচ লইয়া থিয়া থিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভিখারীর বেশে চলিতেন। নীলকণ্ঠের গরলগ্রাস আর কিছুই নহে তাপিত জীবের হইয়া বুদ্ধের তাপ সহ্য করা। †

---

* শিবঠাকুরের ঠিকুজী শ্রীচারুবন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী ১৩২৭।

† History of Bengali Language and Literature. D. C. Sen 1911. P. 66.

উভয়মতে আকাশপাতাল পার্থক্য থাকিলেও হয়ত উভয়ই সত্য। কিন্তু শারদ সন্ধ্যায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যে গণদেব শিবের দর্শন পাই— যে আদর্শজনক, আদর্শ পতি আদর্শ যোগীর দর্শন পাই—বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যের পত্রে পত্রে যে সুকোমল কমনীয় ক্রোধহীন আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ কৃষক, আদর্শ প্রেমিকের চিত্র পাই তাহার ইতিহাস নিরস শব্দারণ্যে আমরা পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইনা। কুচনী পাড়ার বা বাগ্দিনীর পশ্চাতে ধাবমান শিবের চিত্র বুদ্ধ দেবের নয়। সমগ্র জগতের সাহিত্য মন্থন করিলেও বাঙ্গলার শিব সঙ্গীতের ভোজনরত শিব, পত্নীভক্ত শিব,—বাঙ্গালী কৃষাণ শিব ঠিক্ ঠিক্ মিলে না ইহার ঐতিহাসিকতা উদ্ধার করিতে হইলে প্রাচীন বঙ্গ পল্লীর শান্তরসাস্পদ জীর্ণকুটীরের পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। হিন্দু কৃষাণ-কৃষাণীর অন্তর্ধর্মচর্চা, অদ্ভুত পতিপত্নী সেবা, অত্যদ্ভুত কমনীয়তা ও রমণীয়তার চাক্ষুষ আলোচনা না হইলে বঙ্গসাহিত্যের শৈব কাব্য বুঝিতে যাওয়া বৃথা। অধ্যাপক দীনেশ বাবু সত্যই বলিয়াছেন—"The peasants of Bengal gave a form to the Great God that mirrored the condition of their own life *" যে জাতির "উপাসক নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া স্বীয় উপাস্যদেবতার দুঃখে বিগলিত" হয় সে জাতির অন্তর তলে তাহার ইতিবৃত্ত না খুঁজিয়া যেনতেন প্রকারেণ তাহাদের উপাস্যের ইতিহাস রচনা করা পণ্ডিত বিশেষের "টীমার" ব্যাখ্যার মতন হইয়া দাঁড়ায়।

আমার বোধ হয় ভারতীয় শিবচরিত্রে দুইটী প্রভাব আছে। এক অনার্য্য আর বৌদ্ধ। অনার্য্যের দেবতা বলিয়া সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহাকে দেবতাদিগের সহিত বিরোধে মত্ত দেখিতে পাই, অথচ কেহ তাঁহাকে যজ্ঞভাগ দিবেনা। এই অনার্য্য প্রভাবের পশ্চাতে মিশর সীরিয়ার প্রভাব আছে কিনা জানি না। প্রভাব সেইখান হইতেই আসিয়াছে কি এখান হইতেই গিয়াছে তাহা সুধীগণের আলোচ্য। সে যাহাহৌক, মহাভারতে শিবের পূজা প্রচলিত। "রামায়ণেও মহাদেবের রূপগুণ ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ও পরিণত"। ইহার কারণ বোধ হয় বৌদ্ধ প্রভাব। বুদ্ধদেবের আদর্শ বোধ হয় শিবচরিত্রের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিয়াছিল। কিন্তু যখন গুপ্ত সম্রাট-দিগের রাজত্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি হইল, দুইখানে মহা ধর্ম্ম বিভক্ত হইয়া গেল, ব্যভিচার কদাচার আসিয়া ত্যাগ ধর্ম্মকে গ্রাস করিল, নেড়া নেড়ীদের মহালীলায় ভারত কলঙ্কিত হইল, তখন আমরা পুরাণে শিব ও তাঁহার অনুচর দিগের বদখা চিত্র পাইলাম। সন্ন্যাসী শিব তখন রীতিমত গৃহস্থ, বহু পত্নীর ভর্ত্তা, পুত্র কন্যার জনক এবং মাদকসেবী। শিবের স্থান এই সময় বুদ্ধের বহু নিম্নে তিনি ধর্ম্মপূজার সহায় মাত্র।† অনার্য্য সাধারণ পূজিত শিব বৌদ্ধ ব্যভিচার মণ্ডিত হইয়া বঙ্গীয় নিম্নতম শ্রেণীর জনকুলের সম্মুখে উপস্থিত হইল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত শিবের এই চিত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বে গীত শিবগাথাগুলিতে শিবঠাকুরের সেই আলেখ্য বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান শিবের গাজনও প্রাচীন গাথার নিদর্শন। এই সকল গাথা ও প্রাচীনকাব্যে কৃষাণ শিব, বহুরূপী শিব, পত্নীর সহিত কলহরত শিব চিত্র বাস্তবিকই মনোহর। বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ উপনিবেশ দ সত্য হয় যাহা হইলে তাহার পর হইতে যতই দেশের ভাব ও চিন্তা উন্নততর হইতে লাগিল, ততই বঙ্গসাহিত্যের শিব চিত্র বিশেষত্ব হারাইয়া সুসভ্য হইতে চেষ্টা করিল। তাই ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর কবিগণের শিব চিত্র অলঙ্কৃত। তবুও ইতর সাধারণের সহানুভূতি লাভের জন্য কাটতি ও প্রসারের খাতিরে তাঁহাদিগকে সেই প্রাচীন শিবের জনপ্রিয় আলেখ্যকে পুনরাবৃত্ত করিতে হইয়াছে। বামন পুরাণের অনার্য্য দেব শিব যেমন দরিদ্র, নির্ঘণ্টুতে অনার্য্য দেব রুদ্র যেমন ক্ষেত্রপতি মাত্র' কালের সূত্রে বহিয়া সেই দরিদ্র চাষাশিব অষ্টাদশ শতাব্দী কেন আজপর্য্যন্ত বঙ্গীয় ইতর সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিতেছে। আমাদের আলোচ্য রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শিবসংকীর্ত্তনও এই সময়ের রচনা বলিয়া দীনেশবাবু নির্ণয় করিয়াছেন।

রামেশ্বরের শিবায়ন বাঙ্গালী "পুলিপোলাও" দলের

* History of Bengali Literature D. C Sen P. 240

† "সকল দরব পাই যেন ধর্ম্ম পূজার বেলা" শূন্যপুরাণ।

ইতিবৃত্ত না হইলেও প্রতি পাঠকের মনে গুয়া নারিকেল বৃক্ষ বেষ্টিত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সোণার লক্ষ্মী কুঞ্জের মাতৃকুল ও মাতৃ পালিত মাতৃ সেবিতদিগের কথা মনে করাইয়া দেয়। রামেশ্বর নিজ বাসভূমে পরবাসী ছিলেন না। তাই তিনি এই মনোরম পটের কুশল পটুয়া।

রচনা কাল।

শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন "অনুমান ১৭৫০ খৃঃ অব্দে শিবায়ণ রচনা করেন।" কিন্তু কি প্রমাণে তাহা আমরা অবগত নহি। কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের রাজত্ব কালেই কাব্য রচিত ও গীত হয়। কাব্য মধ্যে পুস্তক প্রণয়নের একটা কালেরও নির্দেশ আছে—যথা—

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কলা কোলে।
বাম হল্য বিধি কান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।
অবনীতে অ ইল যেন অমৃতের ধারা॥"

এই হেঁয়ালীর উত্তর হইলেই কাল নির্দেশ সহজ হইবে। রামেশ্বরের শৈব কাব্যকে দীনেশ বাবু শিবায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন কিন্তু কাব্যের অন্তরে এই নামের কোথাও উল্লেখ নাই, আর কবিরও কাব্যের বিশেষ কোন নামকরণ করার ইচ্ছা দেখা যায় না। তবে অধিক স্থলেই তিনি ইহাকে "মহেশের গীত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

কাব্যের নাম।

মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত
রচে রাম রাজারাম সিংহ প্রতিষ্ঠিত॥

একটি স্থলে কাব্যকে "শিব সঙ্কীর্ত্তন" বলিয়া বলা হইয়াছে—

সিদ্ধ বিদ্যা রাজ ঋষি তাহার সভায় বসি
রচে রাম শিব সঙ্কীর্ত্তন॥

কাব্যখানি "বঙ্গবাসীর কর্ত্তৃপক্ষরাই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্যিক বর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। তাহাতে কাব্যের নাম করণ হইয়াছিল শিব সঙ্কীর্ত্তন। কোন প্রমাণে তাহা অবগত নহি।

কবির বংশ ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমাদের বলিতে হইবে। কাব্যের মধ্যে কবির পরিচয় আছে—

কবিরবংশ ও ব্যক্তিগত জীবন।

ভট্টনারায়ণ মুনি সন্তান কেসর কনি
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যা নগর নিকেতন॥
পূর্ব্ব বাস যদুপুরে হেমৎসিং ভাঙ্গেযারে
রাজ রাম সিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সংগীত॥

মোটামুটি আমরা পাই। কবির পিতামহ গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী ও পিতা লক্ষণ চক্রবর্ত্তী জননী দেবী রূপবতী। কবিরা দুই সহোদর—রামেশ্বর ও শম্ভুরাম। কবির ভগ্নী গৌরী পার্ব্বতী ও সরস্বতী। এই ভগিনী দিগের গর্ভে কবির "দুর্গাচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয়।" কবি ভগিনী, ভাগিনেয় এমন কি ভাগিনেয়ী পুত্র বন্দ্যোঘটি কৃষ্ণরামের মঙ্গলের জন্য মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। কবির দুই পুত্র পরমানন্দ ও হৃদয়রাম। সম্ভবতঃ কবির দুই পত্নী ছিল সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। হর বিবাহের এয়োগণের মধ্যে রামেশ্বর ঐ দুইটী নাম বাদ দেন নাই। সম্ভবতঃ কবিরা রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান।

অধ্যাপক দীনেশ বাবু তাহার 'বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয়' গ্রন্থে কবিকে ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন কিন্তু তাহা ভুল। কবির উপাধি পিতৃ পিতামহের সময় হইতেই চক্রবর্ত্তী।

যদুপুর মেদনীপুর জেলায় ঘাটাল থানার অন্তর্গত। তথকার জমীদার হেমৎ সিংহের অত্যাচারে কবি পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ের জমিদার উগ্রবংশীয় রাজা

রামসিংহের আশ্রয়ে গমন করেন। রামসিংহের পুত্র —যশোমন্ত সিংহ—যশোমন্তের পুত্র—অজিতসিংহ।

অজিত সিংহের তাত যশোমন্ত নরনাথ
রাজা রামসিংহের নন্দন।
সিন্ধ বিদ্য রাজঋষি তাহার সভায় বসি
রচে রাম শিব সঙ্কীর্ত্তন॥

রাজা রামসিংহ কবিকে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদীয় পুত্রের সভাসদরূপে রামেশ্বর—শিবগীতি রচনা করেন—

যশোমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
যে রাজ সভায় হৈল সঙ্গীত প্রকাশ॥

যশোমন্তের একটুকু পরিচয় আছে—

বিদগ্ধ বসুধা পতি—অতি বিলক্ষণ।
শক্রসম সভাশোভা কবে সুধিগণ॥
পণ্ডিত পৃথিবীপাত পণ্ডিতে মণ্ডিত।
গুণপ্রিয় গুণবান গীত বাদ্যরত॥
প্রতাপে পাবকসম সাগর গভীর।
অবিরত ধর্ম্মভীত যেন যুধিষ্ঠির॥
রূপে কাম রণে রাম দানে হরিশ্চন্দ্র।
সকলে সামর্থ্যান্বিত মুখ সদানন্দ॥
নিত্য ব্রত জপ পূজা যজ্ঞদান ব্রত।
পেয়ে প্রসাদ যার পাতকী হৈল পূত॥
জগতে ভারল যার যশঃকীর্ত্তি গানে।
কর্ণপুরে কলিরামে কেবা নাই জানে॥
ভঞ্জ ভূমীশ্বর ভূপ ভুবন বিদিত॥
রিপু গর্ব্ব খর্ব্ব সর্ব্ব গুণ সমন্বিত॥
তিঁহ স্থান দিয়া মান বাড়ালেন যত।
নিরূপিত নহে তাহা নিবেদিব কত॥ (১৬৭)

আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণী দূত ব্রাহ্মণকে রাজ ধর্ম্ম শুনাইতে গিয়া বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দিয়া বিলক্ষণ রাখে।
ভাগ্যবান ভূপ সেই ভাল বাসি তাকে। (৬৩)

তখন মনে হয় উহা কৃষ্ণ উক্তি নহে কবিরই উক্তি। কবি যেন আপন রক্ষকের উদ্দেশে কথাকয়টি বলিতেছেন। পণ্ডিত মণ্ডিত পোষকের পোষকতায় কবির জীবন কাটিয়া গিয়াছিল।

রামেশ্বর বৈষ্ণব। শাক্ত নরপতির সভাসদ হইয়া তাঁহাকে শক্তির মহিমা বর্ণন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শৈব কাব্য লিখিতে যাইয়াও সমসাময়িক—কবিদিগের মতন ইনিও নানা ছলে হরিনাম মাহাত্ম্যের—অবতারনা করিয়াছেন। ধান ভানিতে লোকে শিবের গীত গাহে, কবি রামেশ্বর শিবের গান করিতে গিয়া হরির গান গাহিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা যে কেবল তৎসাময়িক প্রভাবে তাহা নহে কবির তাহা স্বেচ্ছাকৃত। তাই অম্বিকা যখন বলিলেন—

'কহ হরিনামের মহিমা কিছু শুনি'

তখন হরিনামের মহিমা শুনাইতে যাইয়া রামেশ্বর নানা স্থান হইতে আহৃত হরির যে এক বিস্তৃত প্রশংসা পত্র—দান করিয়াছেন তাহার পরিমান সমগ্র কাব্যের এক তৃতীয়াংশ ঐ টুকু বাদ দিলে কাব্যের অঙ্গহানীত হয়হনা বরং সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়।

কবি লিখিয়াছেন "ঘর করিতে হাণ্ডিয়ে হাণ্ডিয়ে হয় ঠেকা ঠেকি।" কথাটা বর্ত্তমান ভাষায় যেন "এক ঘরে ঘর কর্ত্তে গেলে ঝগড়া কি প্রাণ হয় না।" কবি ৭ দুই অর্দ্ধাঙ্গিনীকে আপন অঙ্গ বিভাগ করিয়া দিয়া নিজে অস্তিত্ব হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই বোধ হয় হর-পার্ব্বতীর কোন্দল বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

কবি রসিক রাজ। সমগ্র কাব্যের ভিতর দিয়া এই রসিক রাজের মূর্ত্তিখানা যেন চক্ষুর সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে।

আজ কাল বঙ্গে আত্মীয় ভাগ্য বিশেষতঃ ভ্রাতৃভাগ্য অনেকেরই অদৃষ্টে ঘটে না। কিন্তু—রামেশ্বর ভ্রাতা শম্ভুরামকে বড়ই স্নেহ করিতেন। এমনকি তাঁহার ভাই বলিয়া নিজকে পরিচয় দিতে—"শম্ভুরাম সহোদর" বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিতে তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। কবির দারিদ্র্য ছিল—তাই মহাদেবের নিকট কর-জোড়ে তিনি বলিতেছেন

"দারুণ দারিদ্র্য জ্রম দহে দাবানল সম
দূর কর দাসের কলুষ।

কিন্তু এই দারিদ্র্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ভ্রাতা ও ভগিনী ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী পুত্র, দুইপত্নী ও দুই পুত্রকে লইয়া রসিক কবি কৌশিকী তটে যে আনন্দের হাট বসাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া প্রাচীন বঙ্গের যৌথ পরিবারের উদ্দেশে দুই ফোটা চোখের জল না ফেলিলে প্রাণে আরাম অনুভব করা যায় না।

কবির দুই গুণ তিনি সকলে সহানুভূতিসম্পন্ন ও ভগবানে ভক্তিমান। তাহার সহানুভূতি তাঁহার পাঁচালী দলের প্রতি গায়কে বাদকে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

"গায়কে বাদকে সুখে রাখ মহেশ্বর।"

রামেশ্বর আপন গীতির দোষ গুণ সকলই 'সর্ব্ব সমার্পিতমস্তু' বলিয়া ভবভবানীর চরণতলে অর্পণ করিয়াছেন—

নির্গুণ নির্গুণ জনে কৈল নিয়োজিত।
নির্ম্মল নাথের হৈল নির্ম্মল সঙ্গীত॥
নির্ব্বাচিতে এই গীতে দিতে নাহি দোষ।
হরিহর হৈমবতী সবার সন্তোষ॥
ইহাতে আমার কিছু দোষ গুণ নাই।
ভাল মন্দ সব ভব ভবানীর ঠাঁই॥"

রামেশ্বরের জীবনীর আর বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই। রামেশ্বরের এই গীতি অষ্টাহ মঙ্গল। আট দিন ধরিয়া নিম্নলিখিত ভাবে গান হইত—

কতদিন ধরিয়া কাব্যটি গীত হইত।

প্রথম দিন নিশাকালে স্থাপনা ও বন্দনাসহ ছয়টী অধ্যায় গীত হইত।

২য় দিন—কেবল দিবা পালা—১০ অধ্যায়।
৩য় দিন—দিবাপালা (১৪ অধ্যায়) ও নিশাপালা (১০ অধ্যায়)
৪র্থ দিন— ঐ (১০ অধ্যায়) ও ঐ (১১ অধ্যায়)।
৫ম দিন— ঐ (১৩ অধ্যায়) ও ঐ (১৪ অধ্যায়)।
৬ষ্ঠ দিন— ঐ (১১ অধ্যায়) ও ঐ (১৩ অধ্যায়)।
৭ম দিন— ঐ (১৭ অধ্যায়) নিশাপালা নাই।
৮ম দিন———————জাগরণ (শেষ ৩৭ অধ্যায়)।

এ কাব্যে মোট অধ্যায় বা গান ১৬৭টি। বন্দনা গান ৫টি।

বাঙ্গালী স্বভাব কবি। বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য আসরে অনেক কোটেশানপড়া ভুঁইফোড় সমালোচক পর্য্যন্ত কাব্যের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা, কাব্যের ভাব ও রস বাছিয়া শ্রেষ্ঠতম স্বভাবজাত কবি বৃন্দের ব্রণ খুঁটিয়া বাহির করতঃ আসরে আপনাদের নাম ফুটাইতে চায়। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু ও মাইকেলের ভাগ্যে ইহা ঘটিয়াছিল—হেমচন্দ্র নবীনও বাদ যান নাই। কিন্তু কোথায় আজ সেই অকাল-পক্ক অর্ব্বাচীন সমালোচকবর্গ তাহাদের দুই একজন কেন অনেকে বোধ হয় আজ বার্দ্ধক্যাবস্থায় বসিয়া যাহাদের তাহারা সমালোচনাঘাতে খণ্ডিত করিয়াছিল তাহাদেরই সুখ্যাতি অমরত্বের কথা শুনিয়া কাল দোষের মহিমা প্রচার করিতেছে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল কবিকেই এই সকল কপি কুকুরের দন্ত প্রকাশ সহ্য করিতে হয়। বাঙ্গালীর কলমে কাব্য ছাড়া অন্য বিষয় প্রথমে আসে না। এমন বঙ্গীয় সাহিত্যিক খুব কম যাহারা প্রথমে কাব্য চর্চ্চা করে নাই। এই স্বাভাবিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত বেষ্টনীর মধ্যে যখন কাব্য ফুটিয়া উঠে তখন তাহাতে প্রাণ মন বিগলিত হয়। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামকে তাই Cowell আজ Chaucer ও Crabbe এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তুলনা যে কতদূর উপযুক্ত হইয়াছে বলিতে পারিনা। সেই হিসাবে কবি রামেশ্বরেরও একটা কিছু আখ্যা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার মতে বিজাতীয় একটা কাহারও সঙ্গে উপমিত করিলে জাতীয় কবিকে অপমানিত করা হয়। মুকুন্দরাম যেমন প্রাচীনবঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক কবি, রামেশ্বরকে তেমন কোন পদ দিতে না পারিলেও তাঁহার স্থান বিশেষ নীচে নহে। অনেক স্থলে রামেশ্বর মুকুন্দরামকে ছাড়াইয়াও উঠিয়াছেন। তবে উভয়কে তুলনা করিলে দেখিতে পাই করুণরস ফুটাইতে মুকুন্দ অদ্বিতীয়, রামেশ্বরে এইরসটি তত প্রাণস্পর্শী না হইলেও কৌতুক রসে তিনি মুকুন্দকে পরাজিত করিয়াছেন। যুদ্ধবর্ণনায় রামেশ্বর মুকুন্দকে পরাস্ত করিয়াছেন। মুকুন্দের ব্যাধগৃহের চিত্র মনোরম, আবার রামেশ্বরের চাষী গৃহের চিত্র আরও সুন্দর। মুকুন্দরাম সমাজের নিম্নস্তরের ছবি আঁকিতে নিপুন রামেশ্বর একটু উন্নতস্তরের ছবি আঁকিতে ওস্তাদ।

মুকুন্দরাম ও রামেশ্বর

কবি বলিয়াছেন—

যে কথা নৈমিষারণ্যে দীর্ঘ সত্রে দীর্ঘ পুণ্যে
শোণকাদ্যে শুনাইল সূত ॥
আর বৃদ্ধ পরম্পরা যে কিছু বলেন যাঁরা
তাহার করিয়া সারোদ্ধার।
গাইব সঙ্গীতরসে সীমানা থাকিবে তোষে
অনায়াসে তরিব সংসার ॥

কাব্যের বস্তু সংগ্রহ ও পূর্ব্ব কবিদিগের নিকট ঋণ

ইহা হইতে বুঝা যায় যে কবির মূল অবলম্বন ভাগবত।

ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাষিল ব্যাসের মত
লক্ষ্মণজ শম্ভুসহোদর।

কিন্তু কেবল ভাগবত নহে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তস্থল হইতেও আখ্যানবস্তুসংগ্রহের প্রমান পাওয়া যায়। যথা পদ্মপুরাণ—

জৈমিনিরে ঐমনি বলিলবেদব্যাস।
চতুর্দ্দশাধ্যায় পদ্মপুরাণে প্রকাশ ॥ (৫৯)

পৌরাণিক বিষয়গুলি কবি পুরাণাদি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লইয়াছিলেন। আর অবশিষ্ট প্রচলিত প্রবাদ ও গাথার উপর নির্ভর করিয়া রচিত। কবির কাব্যাদর্শ বৃদ্ধের বচনগুলি হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ও গাথা রচয়িতাগণকে বাদ দিলে অন্যায় হইবে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গের নানা স্থানে শিবের গান গ্রামে গ্রামে অতি সমারোহে গীত হইয়া আসিতেছে। শিবের গাজনগুলিও মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাহাতেও আমরা পাই—

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস ॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচনী পাড়া।
কুচনী পাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া ॥

রামেশ্বরের কাব্যেও কৃষাণ শিবে ইহার পরিচয় আমরা পাই।

বরিশালের একগাজনে বিবাহ আসরে—

"খৈসা পড়্লো মৃগোচর্ম্ম শিব ল্যাঙ্টা হইয়া নাচে।

রামেশ্বরেও—

ছেড়ে ব্যাঘ্র ছাল যদি ছুটিল ভুজঙ্গ।
শাশুড়ী সম্মুখে শিব হইলা উলঙ্গ ॥

তাহার পর গাজনে জামাই নিন্দা করিয়া যখন মেনকা বলিতেছেন—

"নাদিব গৌরীর বিয়া কার বা বাপের ডর
ডক্কা মাইর‍্যা পাগল জামায় বাড়ীই বাইর কর ॥

রামেশ্বর লিখিতেছেন—

"আই মাগো একি লাজ হায় হায় হায়।
বর্ব্বর বেদ্যের বুড়া বেটী দিব তায় ॥

* * * *

ধাক্কা মেরে বার করে দিতে বল বরে ॥

এই গাজনে শিব বিবাহের এয়োগনের যেমন রহস্য বর্ণনা আছে রামেশ্বরের সে বর্ণনা না থাকিলেও নাম আছে।

গাজনে— "শঙ্খ পরিতে গৌরাইর মনে বড় সাধ।
কর যোড়ে কন কথা শিবের সাক্ষ্যাৎ॥

রামেশ্বরে— "দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ তুই বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছুই না চাই ॥

গাজনে শিব যেমন বলিতেছেন—

কুচনী নগরে আছে তোমার বাপ ভাই।
সেই খানে যাইয়া পর শঙ্খ আমার কিছু নাই ॥
বৃদ্ধ হইয়াছি গৌরাই আমি লড়ি ক'রি ভর।
ভিক্ষা মাগি খাই আমি দেশ দুরান্তর ॥

রামেশ্বরের মহাদেবও সক্রোধে বলিতেছেন—

'বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥

* * * *

ভাত নাই ভুবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
মুল খাটি মরে তার মাগী মাগে শাঁখা ॥

শিবায়ণের মতন গাজনেও—নারদ আসিয়া শিবদুর্গা কলহের কাঠি বাজাইতেছেন।

গাজনাদি প্রচীন গীতি ছাড়াও রামেশ্বরের শিব-সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বেরও অনেক কবি শৈবকাব্য রচনা করেন। খৃঃ ১০ম ১১শ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত যে শূন্যপুরান রচনা করেন তাহাতে শিবের যে চরিত্র, রামেশ্বর যেন সেই চিত্রকেই একটু শাস্ত্র পুরাণের অলঙ্কারে সজ্জিত

করিতে চাহিয়া লোক বিরক্তির ভয়ে প্রাচীন চিত্রই রক্ষা করিয়াছেন।

শূণ্য পুরানে যেমন পাই—

আল্কার বচনে গোশাঞি তুহ্মি চষ চাষ।

রামেশ্বরের কাব্যেও তেমনি—

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে উদাসীন হও ছাড় পরিজন॥

রামাই পণ্ডিতের "ভীম খেত্তীক" রামেশ্বরের শিবেরও মজুর করিতেছে। শণ্যপুরাণে শিবের ধান যেমন আগুনে "আড়াই হালি ধান পুড়এ দুয়াদশ বছর," রমেশ্বরের শিব সঙ্কীর্ত্তনেও "আড়াই হালা" ধান "দ্বাদশবৎসর পুড়িয়াছিল। উভয় কাব্যেই বহু ধান্যের নাম আছে তন্মধ্যে—নিম্ন গুলি এক—

দুধরাজ, দুর্গাভোগ, কামোদ, খেজুরথুপী, গয়াবালি গন্ধমালতী, ঝিঙ্গাশালি বাঁকচুর ও সীতাশালী।

কাব্যের ভাষা। কবি সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। রাজা রামসিংহ তাঁহাকে—

স্থাপিয়া কৌশিকা তটে বরিয়া পুরান পাঠে
রচাইল মধুর সংগীত।

পুরাণ পাঠক হিসাবে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক কথাই জানিতেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অনেক স্থলে এই সংস্কৃত সংক্রমণ তাহাতে লাগিলেও সাধারণের ভাবও ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়া ছিলেন। আবার কবি গায়ক ও পাঁচালীকার ছিলেন—তাহাতে তিনি বুঝিতেন কোথায় কোন বর্ণনায় শিক্ষিত শ্রোতা মজিবে, কোথায় বা সাধারণ নর নারী শোক ক্রোধ ও আনন্দে অভিভূত হইবে।

নারায়ণে নমস্কার নমস্কার নরে।
নরোত্তমে নমস্কার করি তার পরে॥
দেবী সরস্বতী প্রতি নতি অতিশয়।
বন্দিব কবিন্দ্র বেদব্যাস পদদ্বয়॥

এই চারি ছত্রে "নারায়ণং নমস্কৃতং" ইত্যাদি মনে করাইয়া দেয়।

পর্ব্বত পুরবরে কৈলাস শিখরে
সকলরত্ন বিভূষিতে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রচুর দেবাসুর
সুসিদ্ধ চারণ সেবিতে॥
অপ্সর বৃন্দাবৃত দুন্দুভি নৃত্যগীত
মহর্ষি মুখে বেদ ধ্বনি।
সকল পুষ্পফল শোভিত সর্ব্বকাল
সেস্থল মহিমা এমনি॥
সুস্থির ছায়া বৃক্ষ আরূঢ় নানাপক্ষ
নানামত নিনাদিতে।
সুন্দর পারিজাত প্রসূন সমুদ্ভূত
দিঙ্মুখ গন্ধ আমোদিত॥

হ্রস্বদীর্ঘ ভেদে উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিলে ইহা খাঁটি সংস্কৃত।

আবার—

নারীর কৌমারে পিতা রক্ষা করে
যৌবনে রক্ষক প্রভু।
বৃদ্ধে পুত্র পালে নারী তিনকালে
স্বতন্তরা নয় কভু॥

* * *

বৃদ্ধ মূর্খ জড় রোগী দুঃখী বড়
দুর্জ্জন দুভাগা পতি।
দেব বুদ্ধে যেবা করে তার সেবা
সে ধনী বলান সতী॥
কার্য্যে দাসী সমা পৃথ্বী সম ক্ষমা
যুক্তে মন্ত্রী কথা মাধবী।
শয়নে স্বৈরিণী ভোজনে জননী
সে ধনী বলায় সাধ্বী॥

ইহা নিম্ন সংস্কৃত বচন গুলির রূপান্তর—

"পিতা রক্ষিত কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে রক্ষেৎ স্ত্রিয়া নাস্তি স্বতন্ত্রতা॥"
"বৃদ্ধো মূর্খশ্চ দরিদ্রো জড়ো রোগ্য ধনোঽপিবা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ণ হাতব্যো লোকে প্সুভির্ন পাতকী॥
"ক্রোধে দাস্যা শয়নেষুবেশ্যা ভজনে জননী সমা।
বিপত্তৌ বুদ্ধিদাত্রী চ সা নারী প্রাণদুর্লভা॥"

তারপর—

"শ্যাম বর্ণ স্বর্ণ রেখা শোভন শরীর।
খলের লক্ষণে থাবে করাবে অস্থির ॥
কানে কানে কুহু কুহু করিয় সম্ভাষ।
পায়ে পড়ি পশ্চাতে পৃষ্ঠের খাবে মাস ॥
তেড়ে দিলে বেড়ে ধর উড়ে নাহি যেয়ো।
ছিদ্র তোক সুস্থ থেকে রক্ত টেনে খেয়ো ॥

ইহা পাঠ করিয়া—হিতোপদেশের—

প্রাগ্‌পাদৌ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসম

ইত্যাদি মনে পড়িয়া যায়।

কাব্যের মঙ্গলাচরণ (১-৫) ও হরিনাম মাহাত্ম্য বর্ণনের (৫৩ ৯৯) মধ্যে কবি সংস্কৃত বিদ্যা অধিক জাহির করিয়াছেন। তবে গ্রাম্য প্রভাবই কাব্য খানির প্রাণ। মাকে ডাকিতে যেমন "অয়ি মাতঃ" বলিতে হইলে হাঁফাইয়া উঠিতে হয়, পুত্রকে আহ্বান করিতে গেলে "রে বৎস।" যেমন পুত্রের ভীতি সঞ্চারক বাঙ্গালী কবির পক্ষে তেমনি অং বং ঝাড়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক বাঙ্গালী কবির ভাষা শুনুন—

পা মেলে পার্ব্বতি কোলে করি বলেছি।
এমন করে বিভা দিব গৌরী হেন ঝি ॥
ঝি সোহাগী মাগি করে ঝিয়ের বড়াই।
চাঁদের গায়ে মলিন আছে বাছার গায়ে নাই ॥

* * *

কাঁদে রাণী কেবল কন্যার মুখচেয়ে।
বেছে বর বাপ এনেছে দুটি চক্ষু খেয়ে ॥

ইহা বুঝিতে নিরক্ষর সাধারণকেও কষ্ট পাইতে হয় না। আবার শুনুন—

শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কি।
কাক উড়ে ভাঙ্গ বিনা ভেকা হয়েছি ॥

কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত মহলে এই ভাষা বলিলে হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

অন্যত্র শুনুন—

ভীমকে বলে ভস্ম লয়ে ঝারে যেটা বেসো।
শিবের হয়ে কোন্দল্ করিস শিব নাকি তোর মেসো ॥
ভীম বলে মুঞি বেসো বটি মামা বটে মোর।
তুই যে শিবের ধান ভাঙ্গিলি ভাতার তোনয় তোর ॥
বাগ্‌দিনী বলে আমার ভাতার বটে যা।
শিব জানে আর আমি জানি তোর বাপের কি তা ॥
ছার কপালে ছিরে বেসো ছার কপাল ছি।
ভীম বলে মর কি বলেরে ভাতার লুঁড়ির ঝি ॥

সাধারণের ভাষা আজিও এত সুন্দর করিয়া ছন্দেত দূরে থাকুক গদ্যেও কেহ বলিতে পারে নাই।

কবিকে "ভাবের মাথায় দিয়ে লাঠি ছন্দে দিয়ে মস্ত টোকা" কাব্য রচিতে হয় নাই বলিয়াই কবির ভাষা সহজ সরল ও সুন্দর হইয়া জনমন মোহিত করিতে পারিত।

কবির ভাষার আর এক গুণ এই যে মুসলমান আমলের শেষ অবস্থায় রচনা হইলেও ইহাতে বিজাতীয় প্রভাব অতি অল্প। মুসলমানের ভাষা তখন দেশের মজ্জাগত, পাশ্চাত্য বনিকবর্গের ভাষাও তখন বঙ্গীয় সাধারণ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু কবি রামেশ্বরের বাক্যে তাহাদের প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। নিম্নলিখিত কয়টিমাত্র বিদেশী শব্দ কবির কাব্যমধ্যে স্থান পাইয়াছে—

বামান, মাফিব, কিফাতি, উমেদ (যাহাহইতে উমেদারী) করজ্ সিক আনি, দুয়ানি, তলব, তলবানা, নিকলে, কিস্তা, জোত, একুন, পাট্ট, তুড়া (উৎপাটন), কিশ্‌কে (সেইটি তোমার তেমন নয় কিশ্‌কে যাব ঘর), নেহাল (তরিয়া যাওয়া), খৎ, তলবার।

প্রধান প্রাকৃত শব্দগুলিরও তালিকা দিতে হইতেছে—

<u>কোলুয়ে</u> <u>নেজ্‌না</u> মুড়ি মুড়ে রাখে <u>আল</u>।
ঈষ ধরে <u>পাশী</u> মেশে পরাইল <u>ফাল</u> ॥
<u>বাঁট</u> দিয়া <u>কোদালে</u> <u>জোয়ালে</u> দিল <u>সলি</u>।
পুরস্কার পেয়ে চলে লয়ে পদধূলি ॥

মোহ মোহ (ভর পুর), দা, উখুন, জাঁতা, ওর (শেষ), ডালা, দড়, ঠেলা, ধাক্কা, ফাঁপান, ভাতার, মাগি, সোহাগী, আচাভুয়া, ঝি, শরা, বাটা, বাড়া (অতিরিক্ত), থুতে (থুইতে), পেতি (পেত্নী), ফোঁটা, সাঁচা (সত্য), খোঁড়া, বোঁচা, ধাঁদা, ঠুটা, দোহারা (দুইজনে), ভেট (দেখা), ছাঁ, লোফা, পেচা, গড় (প্রণাম), বটু, আছিল,

জারা জার', মুচড়িয়া, ধা, হুড়া (তাড়াহুড়া), সুধা (জিজ্ঞাসা), ঢের, ছড়ান, বর্ত্তান (থাকা), পোদ, বাবকরা, গুবাহাজ, হদ্দ, গুমান (গর্ব্ব), আজা (মাতামহ), নেওটু, পাতান (বাপুনেওটু ছেলে আমি নারিব পাতাতে), মামা, মামী, জিউ ভুক্, ত্বপান্তর, হালুয়া (কৃষাণ), কামাই, হাল, সৈ, বিছাতি, গাড় (গর্ত্ত), আলাইয়া, ধুকুড়ি (কুন্দুলের ধুকুড়ি আলাইয়া দিল মুনি), ব্যামোহ, ঢেকে, ঠেঁটা, এঁড়ে, কাঁড়া (চাউল হইতে তুষ পৃথক করা), বুলা (বেতাল), লুণ, কা (কিছু), অপচ, বাকাড়া, বেসো, উড়াতাড়া, কাশ, আম্বা (কামপ্রাবল্য), সাঁগা, সাঙ্গালি (সঙ্গিনা), বিবানা, লাঙ্গ (উপপতি), পেথে, নিকড়ো, সাবাদ' ডাঁটি, দাদ, (শোধ যাহা হইতে দাদন), কিরা, ঝাকাঙ্গে, দর্য্যাথানি, পাবা, পুড়া, মটকামারি, ফুঁক্, ধুঞা, সাঁচা, খোঁচা, বোঁচা, আয়োত, খোঁটা, ডহর, ফেরুয়াস, হঠিলা, পো, এটা, কামলা, বাই (জোড়া), আদুড় (আবরণহীন), মাসি, পিসা, হাউড়বাটড, ঘাটি (অপরাধ), সয়া, লগন, গঁদে সঁদে, নাড়িখুঁড়ি, ঠারি, চায়া, নামস্ক, ডাঁট (শক্ত), চিপ্ দাবুড়ি (ধমক), আঁড়বা (শক্ত), চাকু, হকু, কাছাড়, তাক্ পরোকা, মেঠে, ঝাঁপা, ঝুটা, হালা (পরিমান অর্থে), আড়াই।

বলিয়া রাখা ভাল "বিলক্ষণ" শব্দটি কবির মুদ্রাদোষ। ভাষাতে মৈথিলী অনুকরণও অনেক স্থলে আছে।

কাব্যের ছন্দ। বাঙ্গালার ভট্টনারায়ণাদির বংশধরগণ "ভাষার" কবিদিগকে কবি বলিতে নিতান্ত নারাজ। তবে নিতান্ত কিছু বলিতে হয় বলিয়া অতি অনিচ্ছায় "পদকর্ত্তা বা পাদকার" বলিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংস্কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দের অনুকরণে বাঙ্গালা ছন্দের সৃষ্টি নয়। বাঙ্গার ছন্দ তাহার নিজস্ব। পয়ারের ধীরোদাত্ত পদ বন্ধ ও লাচাড়ীর নৃত্যশীল ছন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনাদের স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। রামেশ্বরের কাব্যে প্রধানতঃ এই পয়ার ও লাচাড়ীর রচিত পাঁচালী, "খনা বা ডাকের বচন বা ছড়ার ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যকে উহাদের জ্ঞানসঙ্কলনের আদর্শকে অতিক্রম করিয়া পরিবার অথবা গার্হস্থ্য জীবনের আটপৌরে গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বঙ্গ কবি যখন বাহিরের দিকে প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন তখন সরস্বতীর অপরহস্তে যে পুস্তক মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল ইহার নাম পাঁচালী।" * কিন্তু রামেশ্বরের কাব্যে যে সকল পয়ার ছন্দ আছে তাহাতে পয়ারের প্রাণ বিরাম যতির (Cesura) মান বজায় রহিলেও তাহা বাস্তবিক লাচারী। যথা—

ত্রিলোচন ত্রিকালজ্ঞ তপস্বীর বেশে।
কৃপা করি কন কথা কুমারীর পাশে॥

যতি এইখানে প্রতি ছত্রের শেষে, ইহাকে নিম্নভাবে লাচাড়ীতেও আনা যায়—

ত্রিলোচন | ত্রিকালজ্ঞ | তপস্বীর বেশে।
কৃপা করি | কন কথা | কুমারীর পাশে॥

আবার—

গলা ভরা | মালা তোমার | কপাল জুড়ি | ফোঁটা।
দিনে হও | ব্রহ্ম চারী | রাত্রে গলা | কাটা॥

অথবা।

বাগ দিনা | বলে আমার | ভাতার বটে | যা।
শিব জানে আর | আমি জানি | তোর বাপের কি | তা।

ইহাকে লাচাড়ী ভিন্ন পয়ার বলা চলে না। কবিকঙ্কন চণ্ডীর পয়ার—

"মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে/বলেন ভবানী।
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠ পুত্র/ভেদিয়া ধরণী॥

ইহা রামেশ্বরের ছন্দ হইতে বিভিন্ন। তবে খাঁটি পয়ার যে রামেশ্বরের রচনায় নাই তাহা বলিতেছিনা—

"জৈমিনীর কথা শুনি/হৃষ্ট হৈলা ব্যাস।
আরম্ভে মঙ্গল কথা/যাতে পাপ নাশ॥

সতীর শরীর শিব বান্ধিয়া গলায়।
সতী জাগ সতী জাগ ডাকিয়া বেড়ায়॥

ইহারা খাঁটি পয়ার।

রামেশ্বরের কাব্য মধ্যে ইহা ছাড়াও নানাবিধ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার এক একটী নমুনা দিব—

* শশাঙ্কমোহন সেন—প্রবাসী আষাঢ়-১৩২১।

১। কমঠ উপরে করিয়া ভর।
ধরনী ধরিল ধরনীধর॥
মহীর মাঝেতে মোহন তনু।
স্বজন করণ রতন সানু॥

২। ক। ব্রাহ্মণ ঠাকুর শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
শিবনাম স্মরিলে সন্তাপ যায় দূর॥

* * *

খ। ত্রিপুরা সুন্দরী শুন ত্রিপুরা সুন্দরী।
সুন্দর সম্পদ মোর ননি চোর হরি॥

* * *

গ। শাঁখারী সুন্দর শুন শাঁখারী সুন্দর
কি নাম তোমার কহ কোন গাঁয়ে ঘর॥

৩। ক। সুমধ্যমানী রূপিনী রুক্মিনী
অদ্ভুত যেন সুর মেয়া।
ধীরা ধীরগণ করে বিমোহন
শোভন সুন্দর কায়া॥

রবিশশী খণ্ডিত কুণ্ডল মণ্ডিত
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
শ্যামা গজগতি কুন্দ বিম্ব দ্যুতি
যদুপতি মনোলোভা॥

৩। খ। গিড়ি গিড়ি ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ ঝাঁ ঝাঁ
সুরনর দুন্দুভি বাজে।
ঘন ঘন হন হন ধর ধর নির্ঘন
রণে রণপণ্ডিত গাজে॥

৪। শুন সদাশিবের কৌতুক।
বানাসুরে বর দিলা প্রভুর অপূর্ব্ব লীলা
শৌনক্যাদ্যে-শুনাইল সুত॥
ছিল বলী বলি নামে রাজা।
যত পুত্র হৈল তার কত নাম লব আর
জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণ মহাতেজা॥

৫।
ভাতার ছেড়ে। ভাতার ধরে। ভাতার নোড়। মেয়ে।
রূপে গুনে। যৌবনে বা। ধন ধান্য। পেয়ে॥
রূপ নাই। যৌবন নাই। ধন নাই। তোর।
বুড়া ভাতার। ধবব কেন। চাড় কেঁদেছে। মোর॥

৬। পরিহার মানি তোরে লো সুন্দরি
পরিহার মানি তোরে।
এ যুবা বয়েস ছাড়িয়া মহেশে
সতীত্ব জানহ মোরে॥
নারীর কৌমারে পিতা রক্ষা করে
যৌবনে রক্ষক প্রভু।
বৃদ্ধে পুত্র পালে নারী কোন কালে
স্বতন্তরা নহে কভু॥

এত যদি ছিল মনে।
তবে তপ করি পতি ত্রিপুরারি
অঙ্গীকার কৈলে কেনে॥

৭। মোর মাতা সীতা সতী পিতা যে লক্ষণ যতি
পতি মোর পতিত পাবন।
আমি পতিব্রতা নারী বরঞ্চ মরিলে মরি
তবু ধর্ম্ম নাকরি লঙ্ঘন॥

রামেশ্বরের উপমা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের আইন মত এই কাব্যে উপমার অভাব নাই—
কোকিল জিনিয়া ভাষা খগেন্দ্র জিনি নাসা
খঞ্জন গঞ্জন দুটি আঁখি॥
জিনিয়া কুন্দের কলি সুন্দর দশন গুলি
চামর নিন্দিয়া চারু কেশ।
নব ঘন জিনি বর্ণ গৃধিনী নিন্দিয়া কর্ণ
কামের কামান জিনি ভুরু॥

অথবা-

রবি শশী খণ্ডিত কুণ্ডল মণ্ডিত
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
শ্যামা গজ গতি কুন্দ বিম্ব দ্যুতি
যদুপতি মনোলোভা॥ ইত্যাদি

আবার মৌলিক উপমা যথেষ্ট আছে যথা—

১। চাঁদের গায়ে মলিন আছে বাছার গায়ে নাই।

২। মেনকার মন ভাল মনোহর বর।
আহামরি জামাইর রূপে আলো কৈল ঘর ॥
নিরন্তর থাকি দেখি নাহি স্বতন্তরা।
হাঁড়ির মুখের মত হয়ে গেল শরা ॥

এই উপমাটি এত সুন্দর এত সরল যে সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্র খানি সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেও ইহার কণামাত্র রূপের কাছে মলিন হইয়া যায়।

৩। অকণ্টক বিদ্ধ কি জানে কাঁটা ফুটা বল্যে ॥
দুঃখী জানে যার দুঃখ দেহে গেছে ফল্যে।

৪। পিতা হৈল পুত্র বশ আমি হলেম মেয়ে।
শৃগাল সে সিংহ বলি নিতে আইল ধেয়ে ॥

৫। মাংস হৈল কর্দ্দম রক্তের বহে নদী।
অস্থি হৈল বালুকা মজ্জার ভাসে দধি ॥

শিব কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তবে—

৬। যেমন সূর্য্যের কর প্রকাশিয়া চরাচর
আপনারে প্রকাশে আপনি।
তেমন তোমার মায়া নির্গুণে ধরিয়া ছায়া
গুনবান করেন গুণিনী ॥

৭। চাষী বিনা চাষের মহিমা কে জানে।
লঙ্কার বানিজ্য বসি বাকুড়ির কোণে ॥

৮। জঠর অনলে যেন জিউ জ্বলে মোর।
তেমন প্রস্তুত খন্দ পুড়িবেক তোর ॥

ঢেঁকীর শোকে—

৯। নারায়ণ কৈল মোরে নারদের হাতী।
কুটে ধান গেল প্রাণ খেয়ে মেয়ের লাথী ॥

উণানির মশার কামড়ে—

১০। সিকি আনি দুয়ানি দাগিল অঙ্গময়।

পার্ব্বতীর বিরহ শোকে—

১১। মহেশ মাধব হৈল মহী মধুপুরী।
কৈলাশ হইল ব্রজ আমি রাধা ঝুরি ॥
শঙ্কর হইল রাম আমি হৈনু সীতা।
পরিত্যাগ দিয়া প্রভু রহিলেন কোথা ॥

পার্ব্বতী যখন শিবকে পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন কবি বলিতেছেন—

১২। রামেশ্বর বলে ঋষি অরে দেখ কি।
পাথার ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি ॥

১৩। জলহীন হৈলে মীন জীয়ে নাহি যেন।
শৈল সুতা বিনা শিব হবে শব সম ॥

অনুপ্রাস। অনুপ্রাসে কবি রামেশ্বর অতি ক্ষিপ্র। মিষ্ট শব্দ প্রয়োগে তিনি অনুপ্রাস গঠন করিয়াছেন। সমগ্র কাব্য খানি অনুপ্রাসের খনি। কয়টি উদাহরণ—

১। চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥

২। মধু ক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রাম সিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥

৩। কিশোরীর কষ্ট দেখি কমনীয় কায়।
বুড়া বামুনের বুক বিদরিয়া যায় ॥

৪। ভার্য্যার বিস্তর ভাগ্য ভাঙ্গি যবে ভর্ত্তা।
মুখ সাট মারে মাগ্ মাগী তার কর্ত্তা ॥

৫। ভাত নাই ভুবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
মূলখাটি মরে তার মাগী মাগে শাঁখা ॥

৬। ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে।

৭। অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ উলঙ্গের ঘটা।
চুম্বনে চলিত হৈল চন্দনের ফোঁটা ॥
অধরে উড়িল কার তাম্বুলের রাগ।
খঞ্জন লোচনে গেল অঞ্জনের দাগ ॥

৮। হেন শূল ভেঙ্গে মূল কোন্ কুল পাব।
শূল মারি ফালকরি হাল ধরি যাব ॥
কত্যায়নী কন কান্ত কাজ নাহি তাতে।
শূলে হতে শূল দাও মূল থাকু কাছে ॥

ভাবানুরূপ ভাষা। কতকগুলি বিষয়ে শব্দ চিত্রনের সঙ্গে কবি ভাবানুযায়ীভাষা প্রদানে পটু। কামার শালের ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে কবির ভাষা কেমন মিলিয়াছে—

"ফোঁস ফোঁস করে জাঁতা ফুকরে আগুন।
* * * *

দশনে অধর চাপি চপ চপ পিটে।
দপ্ দপ্ দাবানল দশদিকে ছুটে॥
দড়বড় তুলে পাড়ে দেয় দুম দাম।
দরদর দেহ বয়ে পড়ে কাল ঘাম॥

যেমন ছবি তেমনি ভাষা। যুদ্ধবর্ণনার ভাষা কেমন স্ফুত—

শিব সেনাগণ করিয়া গর্জ্জন
ছুটিলবজ্রের পারা।
যমদূত উপর বরিখে খরশর
যৈছন জলধর ধারা॥

* * * *

যুদ্ধের মধ্যে দুন্দুভি বাদ্যে
তাণ্ডব জন্মিল হর্ষে।
বধ বধ মথ মথ নিখন অদ্ভুত
পাদব পর্ব্বত বর্ষে॥

অন্যত্র—

রথের গড় গড়ি দণ্ডের কড়মড়ি
চালের খড় খড়ি শব্দ।
মার মার ডাকা ডাকি বাণে ঠেকাঠেকি
ত্রিভুবন হইল স্তব্ধ॥

নিম্নের ছত্র কয়টীতে যে যুদ্ধের বাজানা বাজিতেছে তাহা যেন কাণে লাগিয়া থাকে—

গিড়ি গিড় ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ।
সুরনর দুন্দুভি বাজে।
ঘন ঘন হন হন ধর ধর নিস্বন
রণে রণপণ্ডিত সাজে॥

আবার বিদ্যুৎপাত ও মেঘ গর্জ্জনের ভাষা শুনুন—

চড়কা চড় চড় করি গড় গড়
বড় বড় পাষাণ পড়ে॥
ঘন ঘন গর্জ্জন বজ্র বিসর্জ্জন
বরিষে মুষলের ধারা॥”

(ক্রমশঃ)

দীনের ব্যথা

[শ্রীসরোজকুমার সেন]

দিনের পর দিন চলে যায় নাইকো সুখের আশ,
সমান ভাবেই রৌদ্র জলে খাট্‌ছি বারমাস;
ধনীর তক্ত গড়েই যেগো মোদের রক্ত ক্ষয়,
অত্যাচারের দহন-জ্বালায় নয়ন-ধারা বয়;
রাজার রাজা চাই যে বিচার তোমার কাছে আজ,
আশীষ তব পড়ুক ঝরে দীন-দুখীদের মাঝ।

চল্‌ছে রুদ্র প্রলয় লীলা মত্ত ভুবন মাঝে,
হাহাকারে তপ্ত নিশাস দিগ্বিদিকে রাজে;
দৃপ্ত যারা তৃপ্ত কভু নয়কো আপন বলে,
লুটায় কত ঘৃণ্য জীবন তাদের চরণ তলে;
হলাহলের তীব্র-রোদন জ্বলছে শুধু তায়,
রাজার রাজা তোমার প্রজা বারেক বিচার চায়।

বড়র সদা চিত্ত উদার সত্য কিগো তাই,
মিথ্যা সবই মোদের বেলা দুঃখ দরদ নাই;
চিরন্তনী দুখের গাথা গাইতে শুধু আশা,
মরণ ব্যথায় মর মর নাইকো মুখে ভাষা;
জগৎ-সভায় নিত্য নূতন করবো অভিযান,
জাগ্‌তে মোদের দাও শকতি দয়াল ভগবান!

অন্য জাতির উপর প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব

[শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বাগ্‌চী এম এ]

চৈতন্যের করুণায় যবন হরিদাসই যে প্রথম হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছিলেন তাহা নহে। এই ভারতীয় ধর্ম্মের ইহাই চিরন্তন উদার স্বভাব। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যবন হরিদাসের ন্যায় অনেক বিজাতীয়গণ হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া ধর্ম্ম পিপাসা মিটাইয়াছেন। পর-বর্ত্তী শাস্ত্রকার গণের মধ্যে অনেকে শক যবন ও পহ্লব দিগের নাম করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ সেই শক যবন, পহ্লব দিগের অনেককে যে উদার ভাবে নিজেদের ধর্ম্মে আশ্রয় দিয়া-ছিলেন তাহা তাঁহারা জানিতেন না।

প্রথমতঃ বিজাতীয় আভীরগণের উপরই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আভীরগণ যে ভারতের লোক নহে এবং অন্যত্র হইতে শক যবন দিগের ন্যায় ভারতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে কেহই এপর্য্যন্ত সন্দেহ করেন নাই। এই আভীর-গণ প্রথম অবস্থায় মথুরার সান্নিহিত মধুবন হইতে আনর্ত্ত বা গুজরাটের সন্নিহিত প্রদেশ পর্য্যন্ত স্থান সমূহে বাস করিত। তাহাদের মধ্যে গোপাল কৃষ্ণের ধর্ম্ম খুব প্রবল ছিল।

আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিতে চা'ন যে খৃষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতাব্দীতে আভীরগণ ভারতে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে বালক খৃষ্টের ধর্ম্ম লইয়া আসে। এই বালক খৃষ্টের প্রভাবেই যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গোপাল কৃষ্ণের সৃষ্টি হয় তাহাও তিনি বলিয়াছেন। এই মত যে নিতান্ত অমূলক তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতেই যে আভীরগণ ভারতে বাস করিতেছিল তাহা পাতঞ্জল মহাকাব্য হইতেই বিশেষভাবে জানা গিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরে যে খৃষ্ট ধর্ম্মের কোনই প্রভাব নাই তাহাতে এখন অনেকেই সন্দেহ করেন না।

আমাদের মনেহয় যে আভীরগণ ভারতে আসিবার পর গোপাল কৃষ্ণের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাহাদের ভিতর দিয়া যে খৃষ্টের ধর্ম্মমত ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা আদৌ মনে হয় না। কারণ তাহারা খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বেই ভারতে আসিয়াছিল। গোপাল কৃষ্ণের ধর্ম্ম কালক্রমে ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল।

যবন বা গ্রীক দিগের মধ্যেও অনেকে এমন কি খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। গ্রীক রাজ অন্তলিকিত (Antial Kidas—খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) ভাগভদ্র নামক হিন্দু রাজার সভায় এক দূত প্রেরণ করেন— এই দূত যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাহা তাঁহার খোদিত লিপি হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। এই দূতের নাম হেলিয়োদোরাস্ (Heliodorus)। রাজ-পুতনার অন্তর্গত বেসনগর নামক স্থানে তিনি একটি গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে যে লিপি খোদিত করাইয়া যান তাহা এইরূপ—

"দীয়নের (Dion) পুত্র তক্ষশিলা বাসী—পরম-ভাগবত হেলিয়দোরাস্ কর্ত্তৃক দেবাদিদেব বাসুদেবের উদ্দেশে এই গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ প্রস্তুত করান হইল। ইনি রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষে—মহারাজ অন্তলিকিতের নিকট হইতে যবন দূত হইয়া মহারাজ কাশীপুত্র ভাগভদ্রের সভায় আসেন।

তিনটী অমৃত শিক্ষা— সংযম, দান ও অপ্রমাদ, (ইহার) অধিকারী হইলে স্বর্গ লাভ করা যায়।"

এই লিপি হইতেই নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় হেলিয়োদোরস্ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বাসুদেবকেই তিনি দেবাদিদেব বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং সংযম, দান ও অপ্রমাদকেই তিনি অমৃত শিক্ষা বা immortal precepts বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

হেলিয়োদোরাসই যে তৎকালীন গ্রীক গণের মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব ছিলেন তাহা মনে হয় না। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও যখন তক্ষশীলার গ্রীকরাজ-সভায় উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন তখন গ্রীকরাজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেও যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানিতেন না তাহা বলা যায় না। গ্রীকরাজ গণের প্রাচীন মুদ্রা হইতেই অবগত হওয়া যায় যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের "ধ্রমিয়" বা "ধার্ম্মিক" এই হিন্দু আখ্যায় গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে যে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইযাছিলেন তাহা স্বতঃই মনে হয়।

শক দিগের মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল! এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকিলেও শক রাজ গণের দুই এক জনের নাম দেখিয়াই বোধ হয় যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব ছিলেন! কনিষ্কের বংশধরগণের মধ্যে একজনের নাম বাসুদেব। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়, নতুবা এইরূপ নামের অন্য কোন স্বার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না পরবর্ত্তী শকগণেব মধ্যে যাঁহারা মথুরা প্রদেশে রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সর্পপূজা করিতেন তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত ইহাদের কিছু সংশ্রব ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

মোট কথা, এইরূপ দুই একটী প্রমাণ হইতে এই টুকু বেশ উপলব্ধি হয় যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বিজাতীয় গণের উপর কিছু কিছু পড়িয়াছিল। এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে হিন্দু সমাজের সম্পর্কে আসিয়া তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তৎকালীন হিন্দুধর্ম্মের নেতৃগণ ইহাদের সম্পর্কে আসিতে যে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কালিদাসের জন্মস্থান

[শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ এম-এ]

শত শত বৎসর ধরিয়া যে মহাকবির কাব্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে মুগ্ধ ভারতবাসী তাঁহার কবিত্ব ব্যতীত আর সকল বিষয়ের কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছে, আজ সেই "কবি শুধু" আর কিছু নহে—কালিদাসের বিস্মৃত প্রায় জীবন বৃত্তান্ত জানিবার একটা আগ্রহ শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হায়! অতীতের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সে কাহিনীর অনেকাংশ কতকাল হইল কে জানে মিশিয়া গিয়াছে। সেই গভীর অন্ধকার বিশ্লেষণ করিয়া, সেই নির্লজ্জ বিস্মৃতি ভেদ করিয়া, মহাকবির, জীবন বৃত্তান্ত কখনও আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব কিনা তাহা নিয়তি জানে। তবুও এই দুঃসাহসিক কার্য্যে আমাদিগকে অগ্রসর হইতেই হইবে। কবির জীবনী সম্বন্ধে নানাস্থানে প্রচলিত সত্যমিথ্যা মিশ্রিত জনপ্রবাদগুলি ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া আমাদিগকে ইতিহাসের সত্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

বাল্যকালে গ্রামবৃদ্ধগণের মুখে কালিদাস সম্বন্ধে অনেক

গল্প শুনিতাম। এই সকল গল্প যাহারা বলিত তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে কালিদাস বাঙ্গালী কবি। রাঢ় প্রদেশের যে অঞ্চলে আমার বাসস্থান সেই অঞ্চলের লোকের এখনও ধারণা যে কালিদাস ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালে ঐ প্রকার বিশ্বাস আমারও মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার পর যখন ইতিহাসাদি পাঠে জানিতে পারিলাম যে কালিদাস মালবদেশের উজ্জয়িনী নগরের রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন তখন বাল্যের বিশ্বাসে তেমন আর শ্রদ্ধা রহিল না—তখন মনে করিলাম যে কালিদাসের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে পল্লীর অশিক্ষিত কৃষকটী পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজদেশের লোক বলিয়া দাবি করিতে চাহে;—কালিদাসের অসাধারণ কবিত্ব শক্তিই বোধ হয় তাঁহার নামটীকে এতখানি জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রকার যুক্তিতেই ব্যাপারটাকে এতকাল চাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম। তবুও সময়ে সময়ে এই যুক্তিতে ঠিক সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম না। মনে হইত—আচ্ছা কালিদাসের কবিপ্রতিভাই যদি তাঁহার নামটীকে রাঢ়ের অশিক্ষিত কৃষকের নিকটও সুপরিচিত করিয়া থাকে, তবে অন্যান্য কবির সম্বন্ধেও এই রূপ ব্যাপার হয় নাই কেন? কবিত্ব হিসাবে যাহাই হউক, প্রতিভা ও শক্তি হিসাবে কালিদাস নিশ্চয়ই বাল্মীকি ও ব্যাসের সমকক্ষ নহেন। তবে রাঢ়ের এই অঞ্চলের কৃষকগণ পর্য্যন্তও কালিদাসের নামের সহিত সুপরিচিত, অথচ বাল্মীকি ব্যাস বা ভবভূতির নাম তাহারা কখনও শোনে নাই,—ইহার কারণ কি?

দ্বিতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকগণের নিকট, এমন কি, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকগণের নিকটও কালিদাসের নাম করিয়া দেখিয়াছি—তাহারা সে নামের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কারণে সময়ে সময়ে আমার মনে হইত, হয়ত এই রাঢ় প্রদেশেই কালিদাসের জন্ম হইয়াছিল। যাহা হউক, এতকাল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আমি ইহার অধিক আলোচনা করি নাই। কএক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে তিনি সিংহল দ্বীপ হইতে শুনিয়া আসিয়াছেন যে সে দেশের লোকের বিশ্বাস যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। তাহার পর সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় গত দশবৎসর ধরিয়া কালিদাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি কালিদাসের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া—শব্দ সংগঠন প্রণালী ও বর্ণনা বৈশিষ্ট্য হইতে কতকটা নিঃসন্দেহরূপে প্রমান করিয়াছেন যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন ও রাঢ় প্রদেশে তাঁহার জন্মস্থান ছিল। যেরূপ সতর্কতা ও যুক্তি নৈপুণ্যের সহিত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে হয়—আর তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশ্বাস যে নবদ্বীপের উত্তর পশ্চিমভাগে ও নলাহাটীর দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে—এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোনও এক স্থানে কালিদাসের জন্মভূমি ছিল। বিগত ১৩২১ সালের ৺ শারদীয়া পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়েই তাঁহার নিকট আমি এ সব কথা জানিতে পারি। ঐ সময়ে তিনি আমাকে আরও বলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে আমোদপুর কাটোয়া রেলওয়ে লাইনের কীর্ণাহার ষ্টেশনের নিকট কোথায় কালিদাসের সরস্বতী কুণ্ড এখনও বর্ত্তমান আছে। এ কথা আমি তখন জানিতাম না, সুতরাং পূজার অবকাশে এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিব, এই কথা তাঁহাকে তখন জানাইয়াছিলাম। বিগত শারদীয়া পূজার অবকাশে দেশে গিয়া দেখি, যে কথা দেশের অনেক অশিক্ষিত লোকও বিশেষরূপে অবগত আছে, আমি তাহা এতদিন পর্য্যন্ত জানিতাম না। বৎসরের অধিকাংশকাল আমার বিদেশে অবস্থানই এই অজ্ঞতার প্রধান কারণ। সে যাহা হউক আমি কালিদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে এবার রাঢ় প্রদেশ হইতে যে সকল কথা শুনিয়া আসিয়াছি তাহার কিয়দংশ এ স্থলে বিবৃত হইল।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় "কালীর মোরগ্রাম" নামক দুইটী পরস্পর সংলগ্ন গ্রাম আছে। চলিত কথায় ইহাদিগকে "ক'লো মোর গ্রাম" বলা হয়। আমোদপুর কাটোয়া রেলওয়ের রামজীবনপুর অথবা দাসকল গ্রাম ষ্টেশন হইতে উক্ত গ্রামদ্বয়ের দূরত্ব ২.৩ ক্রোশের অধিক

নহে। উক্ত গ্রাম দুইটীর পার্শ্ব দিয়া "বাদসাহী সরাণ" নামক বিখ্যাত রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। এই "কালীয় মোরগ্রাম"ই কালিদাসের জন্মস্থান—ইহাই এ অঞ্চলে চিরপ্রচলিত প্রবাদ। কালীয় গ্রামই কালিদাসের জন্ম স্থান—বোধ হয় কবির নাম অনুসারেই গ্রামের নাম "কালীয়" হইয়া থাকিবে। তবে, মোরগ্রামের সহিত ও কবির স্মৃতি বিজড়িত—কিরূপে তাহা পরে বলিতেছি। সকলেই জানেন মুর্খ কালিদাস বিদুষী পত্নী কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করেন, পরে সরস্বতীর আরাধনা করিয়া ও সরস্বতী কুণ্ডে স্নান করিয়া বাগ্‌দেবীর কৃপায় অলোক সামান্য কবিত্ব ও মনীষার অধিকারী হন। আমোদপুর কাটোয়া রেলওয়ের কীর্ণাহার ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ৩।৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত "বেলুট" (রঁধান বেলুট) নামক গ্রামে এই সরস্বতী কুণ্ড ও সরস্বতী দেবীর অধিষ্ঠান এখনও বর্ত্তমান আছে। এই বেলুট গ্রাম ই, আই, রেলওয়ের বোলপুর ষ্টেশন হইতে ও উত্তর পূর্ব্ব দিকে ৪।৫ ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। কীর্ণাহার ও বোলপুর এই উভয় ষ্টেশন হইতে এই গ্রাম যাওয়া যায়। এই স্থান বীরভূম জেলার অন্তর্গত। এই সরস্বতী কুণ্ডে আজিও শত শত লোক স্নান করিয়া দেবীর পূজা করিয়া থাকে। আবহমান কাল হইতে এই দেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে—আজিও প্রত্যহই এই সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি বিগত পূজার ছুটিতে এই মহাপীঠ স্থান দেখিতে যাওয়ার অবকাশ করিতে পারি নাই। শুনিলাম কুণ্ডটী এখন আর তেমন গভীর নাই—সংস্কার অভাবে ইহা এখন মজিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। সরস্বতী দেবীরও ইষ্টক নির্ম্মিত কোনও মন্দির এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, তবে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইষ্টকরাশি নিকটেই স্তূপীকৃত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে এখানে কোনও মন্দির ছিল অথবা মন্দির নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে এই ইটগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। স্থানটী স্বচক্ষে না দেখিলে প্রকৃত ব্যাপার কি বলা যায় না।

কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে এ অঞ্চলে একটা প্রবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। তাহা এই। কালিদাস উজানি (ইহার অন্য নাম উজ্জয়িনী—বর্ত্তমান নাম. মঙ্গল কোট, নগরের রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। রাজা ভানুমতীর একটা প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য কোনও সময়ে রাজা এক শিল্পীকে আদেশ করেন। যথাসময়ে মূর্ত্তিটী রাজসভায় আনীত হইল—তাহার সহিত শিল্পীও আসিল। মূর্ত্তিটী এমন সুন্দর হইয়াছিল ও প্রকৃত ভানুমতীর আকৃতির সহিত ইহার সাদৃশ্য এত সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সভাসদ্‌গণ ও রাজার সহিত প্রীতি প্রকাশ করিলেন, কেবলমাত্র কালিদাস বলিলেন যে মূর্ত্তিটী প্রকৃত ভানুমতীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় নাই। এই কথা শুনিয়া শিল্পী ক্রোধে তাহার হস্তস্থিত তুলিকাটী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কালিদাসও অমনি হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, এইবার ঠিক হ'য়েছে।" রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কালিদাসকে তাঁহার এই আকস্মিক মত পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে কালিদাস বলিলেন যে প্রথমে যখন মূর্ত্তিটী রাজ সভায় আনীত হয়, তখন ভানুমতীর উরুদেশে যে একটা তিল আছে তাহা প্রস্তর মূর্ত্তিটীতে অঙ্কিত ছিল না, এক্ষণে চিত্রকরের তুলি নিক্ষিপ্ত মসী বিন্দু প্রস্তর মূর্ত্তিটীর উরুদেশে পতিত হইয়া ঠিক একটা তিলের আকার ধারণ করিয়াছে সুতরাং এক্ষণে আর প্রকৃত ভানুমতীর আকৃতি হইতে এই প্রস্তর নির্ম্মিত ভানুমতীর আকৃতির কোনও প্রভেদ নাই। কালিদাস এই কথা বলিলে লজ্জায় ও ক্রোধে রাজা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তখনি অন্তঃপুরের মধ্য হইতে জানিয়া আসিলেন, বাস্তবিকই ভানুমতীর উরুদেশে একটা তিল আছে। একথা কালিদাস জানিলেন কিরূপে? তবে কি কালিদাস কোনও প্রকার অসদুপায়ে ও গুপ্তভাবে অসাবধানা রাজ্ঞীর উরু প্রদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন? এই চিন্তায় জ্ঞানশূন্য হইয়া রাজা কালিদাসকে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

ইহার কিছু কাল পরে এক দিন রাজা বিক্রমাদিত্য অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া দন্তধাবন করিতেছিলেন। অনেক দাস দাসী সেখানে রাজার আজ্ঞার প্রতিক্ষা করিতেছিল। রঙ্গনাথ নামক একজন দাসকে সম্বোধন করিয়া হঠাৎ রাজা বলিয়া উঠি-

লেন, "যারে রঙ্গা তুই মোরগাঁ।" রাজা আর অধিক কিছু বলিলেন না—কি জন্য মোরগাঁ যাইতে হইবে তাহা রঙ্গনাথ জনিতে পারিল না ; সেও সাহস করিয়া রাজাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিল না—কারণ রাজার নিয়ম ছিল যে তাঁহার আদেশ সম্বন্ধে দাসদাসীগণ কখনও কোন প্রশ্ন করিবে না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রঙ্গনাথ যখন দেখিল যে রাজা আর অধিক কিছু বলিলেন না, তখন সে মোরগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল। মঙ্গল কোট হইতে উত্তর দিকে বোধ হয় ৮।৯ ক্রোশ দূরে মোরগ্রাম। মোরগ্রামে গিয়া রঙ্গনাথ চিন্তিতভাবে সারাদিন পথে কাটাইয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময়ে এক পরিচিত ব্রাহ্মণের বাড়ী উপস্থিত হইল। রঙ্গনাথের দুশ্চিন্তার কারণ জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার এক আত্মীয় বধূ কিছুদিন হইতে বাস করিতেছেন, ঐ বধূটী জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী। রঙ্গনাথকে রাজা কি জন্য মোরগ্রাম পাঠাইয়াছেন তাহা বোধ হয় সেই বধূটী গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারিবে। অবগুণ্ঠনবতী ব্রাহ্মণ বধূকে সমস্ত কথা বলা হইলে তিনি উত্তর দিলেন যে রাজমিস্ত্রী লইয়া যাইবার জন্য রাজা রঙ্গনাথকে মোরগ্রাম পাঠাইয়াছেন। প্রকৃত কথা এই হইতেছে যে, সকল দাসদাসীর মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও বিশ্বাসী বলিয়া এই রঙ্গনাথের খ্যাতি ছিল ; মনে মনে তাহার একটা অহঙ্কারও ছিল যে, যে কার্য্যেরই ভার তাহাকে দেওয়া হউক না কেন, সে কোনও প্রকারে সে কার্য্য সমাধা করিবেই করিবে। একথা রাজা জানিতেন ; সেই জন্য তাহাকে অপ্রতিভ করিবার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি তাহাকে মোরগ্রাম যাইবার অসম্পূর্ণ আদেশটা দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই রাজমিস্ত্রী আনাইবার কথা মনে হওয়াতেই রাজা রঙ্গনাথকে মোরগ্রাম যাইতে বলিয়াছিলেন ; কিন্তু কেন যাইতে হইবে, কি উদ্দেশ্যে যাইতে হইবে, সে কথা তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই তাহাকে বলেন নাই। রাজা মনে করিয়াছিলেন যে রঙ্গনাথ নিশ্চয়ই লজ্জিত হইয়া মোরগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু, তিনি দেখিলেন পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি রাজমিস্ত্রী লইয়া রঙ্গনাথ মঙ্গলকোটে উপস্থিত। রাজাত বিস্ময়ে অবাক্। কিরূপে সে রাজার মনের কথা জানিতে পারিল ? সে কি সর্ব্বজ্ঞ ? রাজার প্রশ্নে রঙ্গনাথ সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তখন অতি সম্মানের সহিত সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার আত্মীয়াবধূটীকে রাজ সভায় আনয়ন করা হইল। অবগুণ্ঠনময়ী ব্রাহ্মণ বধূকে যথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া রাজা সম্মানের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে রাজমিস্ত্রী আনয়নের উদ্দেশ্যেই রঙ্গনাথকে মোরগাঁ যেতে বলেছিলাম, একথা আপনি কি করে' জান্‌লেন ?" ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণ বধূ বলিলেন,

"দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥"

অর্থাৎ—"দেবতা ও গুরুর অনুগ্রহে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বাস করেন। আমি সেই জন্যেই এ কথা জানি ; ভানুমতীর (উরুদেশের) তিলের কথাও আমি এমনি করে'ই জানি। বধূরূপী কালিদাসকে তখন আর চিনিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। রাজা তখন কালিদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সমাদরের সহিত তাঁহাকে রাজসভায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

প্রবাদটীর অবশিষ্টাংশ সেই স শে মি রা' র গল্প। উহা অনেকেই জানেন ; সুতরাং বাহুল্যবোধে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

পরবর্ত্তিকালে উল্লিখিত রঙ্গনাথ রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রিয় পাত্র হইয়াছিল। কালিদাসও তাহাকে নিজের সৌভাগ্যের নিমিত্ত জ্ঞান করিয়া যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। রাজা বিক্রমাদিত্য মঙ্গল কোট হইতে কালিদাসের বাসস্থান কালীয় মোরগ্রাম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কালিদাসের অনুরোধে রঙ্গনাথের নাম অনুসারে ঐ রাস্তার নামকরণ হয়। ঐ রাজপথ "রাজার সরাণ" বা "রেঙ্গার সরাণ" নামে এখনও বর্ত্তমান আছে। আমি নিজে ঐ রাস্তা ও কালীয় মোরগ্রাম দেখিয়া আসিয়াছি। কেহ কেহ বলেন যে রাজা বিক্রমাদিত্য রঙ্গনাথের নাম অনুসারে উত্তরবঙ্গে 'রঙ্গপুর' নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন ও তাহার শাসনভার এই রঙ্গনাথের উপর প্রদান করেন। এই রঙ্গপুর নগরে রাজা বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের সহিত সময়ে সময়ে বাস করিতেন।

ক'ল্যো মোরগাঁ ও বেলুট ব্যতীত অন্য কোনও স্থান এ পর্য্যন্ত কালিদাসের সহিত সম্পর্কের দাবি করিয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই। তাহা যদি না করিয়া থাকে তাহা হইলে আবহমান কাল প্রচলিত উপরি লিখিত স্থানীয় প্রবাদে বোধ হয় আমরা নির্ব্বিঘ্নে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ সকল কথা বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত শিক্ষিত জগতে পৌছায় নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে এ অঞ্চলের ইংরাজি শিক্ষিত ভদ্র লোকগণ দেশের বিশেষ খবর রাখেন না, তাঁহারা অধিকাংশ সময়ই বিদেশে বাস করেন। হয়ত ২।৩ বৎসর অন্তর একবার ২।৪ দিনের জন্য দেশে যান—সে সময়ে এই সব জনপ্রবাদ তাঁহাদের কর্ণে পৌছায়না—পৌছাইলেও তাঁহারা এ সকল গ্রাম্য ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামান না। আমার জন্মভূমি (মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত) এই মোরগাঁ হইতে তিন ক্রোশ ও বেলুট হইতে ৭।৮ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত, অথচ আমি ইহাদের কথা এতদিন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতাম না—ইহা বাস্তবিকই লজ্জার কথা।

কালিদাসের জন্মভূমি ও তাঁহার সরস্বতী কুণ্ড—ভারতের এই মহাতীর্থ দুইটী শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ অনায়াসেই দেখিয়া আসিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

দুঃসহ

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

শ্বশুর আমারে ভালোবাসে মানি, গা'লো খুব পারে সেতো,
মধুর তাহার আদর যেমন শাসন তেমনি তেতো।
সেদিন কিসের চিঠি খানকত এনে দিল মোর কাছে,
ফিরে চেলো যবে— কোথায় বেখেছি আব কি তা মনে আছে ?
কি যে বকুনিটা পেযেছি সেদিন মোব মন তাহা জানে,
অশ্রু খসেছে— দুর্ব্বহ হ'যে তবু তা বাজেনি প্রাণে।

শাশুড়ী আমারে পাড়ে কত গা'ল সীমা শেষ নাহি তার,
পান থেকে যদি চূণ টুকু খসে রক্ষা নাহিক আর।
ক'দিন ভীষণ নেমেছে বাদল—সামলাতে নারি নিজে,
পুরানো পেয়ালা পড়িয়া ভাঙিয়া—কথা সে পেলাম কি যে !
বেদনার তরে 'আহাটি' এলনা পেয়ালা ভেঙেছি তাই
কত কথা হ'ল, অশ্রু খসেছে—দুর্ব্বহ হয় নাই।

বিনা অপরাধে ননদী আমার কত কি যে মোরে বলে,
বাপ মার খোঁটা হৃদয় ভেদিয়া বিঁধে যে মর্ম্ম তলে।

যখন যা' বলে তাই করি তবু সদাই মুখটি ভার,
করি প্রাণ পণ, এত করি তবু মনতো পাইনে তার!
খেতে খেতে যদি বেশী পেটভরে আমারেই ভর্ৎসনা,
বড় বাজে বুকে— দুঃসহ তাহা তবু মনে হয়তো না।

শুধু সেই কোনো কথা কয়েছে কি—কোন খানে যাবে আর?
গুমরিয়া উঠে সারাটা হৃদয়, চোখে জাগে শত ধার।
নিজে কাঁদি আর তাহারে কাঁদাই ঠায় বসে একখানে,
ফাটিয়া টুটিয়া কি যে হয় হিয়া মোর এই মন জানে।
যত অভিমান তারি পরে শুধু যত রোষ তারি পর,
এত ভালবাসে তবু নাহি সহে একটি কথার ভর!

আমাদের চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

[শ্রীপরিমল গোস্বামী বি-এ]

কোন একটা বস্তুর রূপ বর্ণনা করিতে গেলে আমরা ভাষার আশ্রয় লই, কিংবা রেখায় ও বর্ণে ফুটাইয়া তুলি। চোখে যেটুকু দেখি, শুধু সেইটুকুই যদি প্রকাশ করি তাহা হইলে সে প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে রূপ টুকু চোখের নিকট অব্যক্ত অথচ হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্ত সেটুকুর প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিনা। এখন কথা উঠিয়াছে, চিত্রশিল্পে আমরা প্রকৃতি-পন্থী হইব না কল্পনা-পন্থী হইব; যাহা চোখে দেখিতে পাই কেবল তাহাই আঁকিব না কল্পনার রং ফলাইয়া তাহাকে ভিন্ন পথে চালাইব। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—এ সমস্যাটী মোটেই জটিল নহে। চিত্রশিল্পে প্রকৃতির অনুসরণ করার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে, যে, আমাদের অঙ্কিত চিত্র একটী বাস্তব চিত্রতো হইবেই তাহা ছাড়াও কিছু বেশী হইবে। বস্তু বিশুদ্ধ অবস্থায় শুধু দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা যখন মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে যাই তখন আমরা তাহার বিশুদ্ধতা বজায় রাখিতে পারিনা; সঙ্গে কিছু বাহুল্য, কিছু অবান্তর এবং কিছু অলঙ্কার যোগ করিয়াই থাকি। কবি প্রেয়সীর রূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"গোলাপ শেফালী চাঁপা চামেলীর বর্ণ তার,
কোমলতাময় যেন কিশলয় সে দেহ তার।"

এটি বাস্তব চিত্র বলিয়াই আমরা মানিয়া লই—কারণ যদিচ চোখে—ঠিক গোলাপ, শেফালী কিম্বা চামেলীর বর্ণের সঙ্গে উদ্দিষ্টার বর্ণ মিলাইয়া লওয়া সম্ভব না হইতে পারে—কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে অনুভূতি বাজিতেছে তাহার সঙ্গে এই বর্ণনায় কোন বিরোধ পাইনা। চোখে

সৌন্দর্য্যের পরিমাণ যতই হউক—তাহার উপরেও আমারা অলঙ্কার পরাইয়া—বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা জড়িয়া দিতে চাই। এবং চোখের কাছে যেটা পরিপুর্ণ সুন্দর ছিল তাহাকে পরিপূর্ণ না বলিয়া বলি—"অর্দ্ধেক মানবী, তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।"— চিত্রশিল্পেও, এই বাস্তব রূপের উপরে হৃদয়ের অনুভূত রূপটি প্রতিফলিত করিতে না পারিলে তাহা বাস্তব চিত্র হইতে পারে না। চোখে দেখা রূপের বর্ণনা বেশী করিতে হয়না—কারণ চোখে আমরা সামন্য অংশই দেখিতে পাই—কিন্তু অন্তরের চোখে যে টুকু দেখি তাহা অতি বৃহৎ। তাই, শব্দ চিত্রেই হউক, বর্ণ বা রেখা চিত্রেই হউক কল্পনার রূপ যত বেশী দিতে পারিব ততই সে চিত্র সুন্দর বেশী হইবে। ভারতীয় চিত্রশিল্পকে বস্তু-অংশকে ছাঁটিয়া অত্যন্ত ছোট করা হইয়াছে—এবং কল্পনাকেই সেই অতি ক্ষুদ্র বস্তু-অংশের উপরে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যখন চিত্রটাকে বস্তুর ন্যায় উপভোগ করিবার মত মনের অবস্থা থাকে তখন এইরূপ কল্পনার পরিসর দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হই, এবং সেই কল্পনাকে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া প্রচার করি। এরূপ করিবার কারণও আছে। একজন ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে যদি একটী ফুল ধরিয়া বলা যায়— "দেখ কি সুন্দর ফুলটী'—তাহা হইলে সে চটিয়া যাইবে,—বলিবে "ফুলটীর কি আকার তাহাই দেখিতে পাইতেছিনা' তাহার পর আবার রূপবর্ণনা।" আমরা ত বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিবারই চোখ পাই নাই, সুতরাং বস্তুকে অনুভব করিবার ইঙ্গিত যদি কেহ করেন তাহা হইলে আমাদের মনোজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়।

শিল্পে, সাহিত্যে কল্পনা লইয়াই কারবার, সুতরাং শিল্প-সাধনায় আমাদের মনোজগতের অভিব্যক্তির নিয়ম অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত। শিশু প্রথমে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে, তারপর সেই বস্তুর অভিজ্ঞতা অন্য বস্তুতে প্রয়োগ করে, এবং ক্রমশঃ বস্তুকে ছাড়াইয়া গিয়া কল্পনা-রাজ্যে পৌঁছায়। এ নিয়মকে আমরা ব্যতিক্রম করিতে পারিনা। প্রথমতঃ প্রকৃতিকে অনুসরণ না করিয়া উপায় নাই; কিন্তু এটা মনে রাখিতে হইবে—এই যে বস্তু হইতে কল্পনাতে যাওয়া ইহা প্রাণহীন দেহ হইতে দেহহীন প্রাণে পৌঁছান নহে। প্রথমটীতে প্রাণ-অংশ কম, জড় অংশ বেশী, শেষটীতে জড় অংশ কম, প্রাণ অংশ বেশী— এই যা পার্থক্য। শূন্যতাকে পুষ্ট করিয়া পুর্ণতায় পৌঁছিতে পারিনা—বরং অপূর্ণতাকে পুষ্ট করিয়া পুর্ণতায় পৌঁছিতে পারি। কিন্তু আমাদের শিল্প সাধনা কোথায় গিয়া পৌঁছিতেছে?— একবিভাগ প্রাণহীন দেহে— অপর বিভাগ দেহহীন প্রাণে। কতক হইতেছে মৃত ক্যালিব্যান,— আর কতক হইতেছে এরিয়েলের পরমাত্মা।

'প্রকৃতি'কে শীর্ষস্থানে না আনিয়া back groundএ রাখার অভিযোগ দেশী ও বিলাতি সাহিত্যে অনেক শুনিয়াছি। সাহিত্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম চিত্রশিল্পে যেখানে নাকি চিত্রকরের খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি হওয়া ছাড়া উপায় নাই—সেখানেই প্রকৃতিকে অজ্ঞানের দ্বারা অত্যন্ত নির্দয় ভাবে দূরে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে দেখিতে পাই। কয়েক বৎসর হইল "ভারতবর্ষে" রবীন্দ্রনাথের "চন্দ্র কিরণ সুধা সিঞ্চিত অম্বরে"—এই ভাবের একখানি চিত্র দেখিয়াছিলাম। একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন সম্মুখে পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে। এই চিত্রখানি ভাল কি মন্দ তাহা বলা আমার অভিপ্রায় নহে আমি দেখাইতে চাহি এই শ্রেণীর চিত্রকর তাঁহাদের চিত্রে প্রকৃতির জন্য কোন শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত চিত্রখানিতে চাঁদের অবস্থান ঠিক ঐ স্ত্রালোকটীর সম্মুখে, অথচ তাঁহার পশ্চাৎ দিক দিনের মত আলোকিত। একটু ছায়া নাই, অন্ধকার নাই—ঠিক যেন কোন অশরীরী শ্মশানে দাঁড়াইয়া চাঁদ দেখিতেছেন। "চন্দ্রকিরণ সুধা শিঞ্চিত অম্বরে" অবশ্য মনের মধ্যে একখানি সৌন্দর্য্যময় চিত্র জাগাইয়া তুলে কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের আলোকে অবরোধ করিলে কোনরূপ ছায়াপাত হয় না, এরূপ কল্পনা পার্থিব মানুষের কি করিয়া সম্ভব হয় তাহাই ভাবিবার বিষয়। আরও কয়েকখানি চিত্র দৃষ্টিগোচর হইল কোনটাতে চাঁদ পশ্চাতে রহিয়াছে অথচ রাধাকৃষ্ণের মুখের উপর আলো পড়িয়াছে—কোনটাতে চাঁদ আছে কিন্তু আলোছায়ার খেলা নাই। Ruskin বলিয়াছেন— "when once we see clearly enough, There is very little difficulty in drawing what we see." কিন্তু এইখানেই যত গোল

যোগ, আমরা ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই একেবারে ভাবুক চিত্রকর হইয়া বসি। আমাদের মাসিকে প্রকাশিত অধিকাংশ চিত্রই আস্বাভাবিক অথবা perspective এর প্রমাদ পূর্ণ। কতকগুলি মাসিক পত্রিকায় এক শ্রেণীর চিত্রকে ভক্তিরসের দিক দিয়া খুব সম্মান দেখান হইয়া থাকে যেমন রাজিনের "কৃষ্ণকালী" "কলঙ্ক ভঞ্জন," বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কলঙ্ক ভঞ্জন" ইত্যাদি। এগুলির কতক বা ভক্তি তত্ত্বের দিক দিয়া কতক বা রং চং এর আতিশয্যে আমাদের সমঝদারগণ অত্যন্ত পছন্দ করিয়া ফেলেন। আর তাঁহাদের এই ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার জন্য দুঃখ ভোগ এবং লজ্জা পাইয়া থাকেন ঐ সব মাসিকের গ্রাহকগণ। যাহাতে প্রাণের সাড়া নাই, চঞ্চলতার বিকাশ নাই—সংযম নাই, সৌন্দর্য্য নাই—তাহাই হইল আমাদের আর্ট। শুধু রক্ত মাংসের লালসা বাড়াইয়া এক শ্রেণীর দর্শককে মুগ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার মূল্য কতখান? এক শ্রেণীর চিত্রকর আছেন তাঁহারা বিলাতি ছবি হুবহু নকল করিয়া নিজের নামে চালান "ভারতবর্ষে" "দিগম্বর" নামে একখানি দেশী ছবি দেখিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় ঐ ছবিখানি "ভারতবর্ষে" প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ক্যানেডিয়ান আর্টিষ্ট—Paul Peel এর নামে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল ছবিখানির নাম "Life a Misery" এবং উক্ত "দিগম্বর'— Paul Peel এর— the naked little model — who has been posing to the artist for Cupid"

তারপর—

German—Hermann Koch এর "The Flower Oracle."

Italian— I. Spiridon এর "Love Guides Us"

French — Aubert এর "Love Grown Cold"

German—Hom এর "Secrets"

German—C Von B. Hansen এর "Madonna and Child"

French—Leroux এর "School of the Vestal Virgins"

প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রগুলির নকল বাংলা দেশের চিত্রশিল্পে নির্ব্বিবাদে চলিতেছে।

নকলের মজা এই যে উহাতে কোনরূপ দায়িত্ব জ্ঞান থাকেনা সুতরাং— ভ্রম প্রমাদ ঘটিলেও তাহাতে মনকষ্ট হয় না। কবি স্বভাব বর্ণনায় লিখিতেছেন— 'বর্ষাকালে আম্রমুকুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত'— ইত্যাদি। ইহা পড়িলেই আমাদের অভিজ্ঞতার উপরে একটা আঘাত লাগে কিন্তু চিত্রে এই রকম অজ্ঞানতা দোষ এত বেশী দেখিতে পাই — যে মনে হয় আমাদের এ দুর্দ্দিন শীঘ্র কাটিবার নহে। যাঁহারা প্রকৃতি পন্থী বলিয়া গর্ব্ব করেন তাঁহারাই সব চেয়ে অস্বাভাবিকতা এবং মিথ্যাচার দোষ-দুষ্ট। বারান্তরে সেই গুলির প্রত্যেক খানি— ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ দুই এক খানির কথা বলিয়াই শেষ করিব। কথা উঠিতে পারে বড বড় ভাবপূর্ণ চিত্র হইতে ছোট খাটো দোষ বাহির করা হীনতার পরিচায়ক তাহার উত্তরে এই বলিতে চাই— চিত্র শিল্পে perspective এর ল্যাঠা থাকিবে কি চুকিবে— মানুষের দুই খানি হাত সমান হইবে না এক খানি ছোট হইবে—পা উর্দ্ধে থাকিবে কি মাথা উর্দ্ধে থাকিবে— এ সকল এখনও,— স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ— অমুকের বাড়ির বৌ বৃষ্টির মধ্যে ছাতি ব্যবহার করিয়াছিল অতএব তাহার জাতি থাকিল কি গেল— ইত্যাদির মত গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই। সুতরাং এখনও চিত্রশিল্পের আসরে এই সমস্ত প্রতিবাদ লইয়া নিরাপদে উপস্থিত হওয়া যায় বলিয়াই বিশ্বাস। তবে একথা আমাদিগকে মানিতেই হইবে যে অজন্তার চিত্রাবলী বুঝিতে হইলে—অ্যানাটমীর সূত্র, পরিপ্রেক্ষণ প্রভৃতি বাদ দিতে হইবে। কারণ তাহার প্রকাশের ভঙ্গী এত সুন্দর এবং প্রাণের সাড়া এত প্রবল যে তাহা ভিতর হইতে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া বাহিরের কতকগুলি নিয়মের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিতে গেলে অন্যায় করা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমটাই বড় করিয়া দেখিলেও চলিবে না। ব্যতিক্রম হইয়াছে প্রয়োজনের জন্য সুতরাং প্রয়োজনকে বাদ দিয়া কেবল কতকগুলি অর্থহীন রেখা টানিলেই আদর্শচিত্র হইতে পারে না। কেহ কেহ আবার, যেখানে ব্যতিক্রম নাই, পৌরাণিক চিত্র যেখানে নিষ্কলঙ্ক সেই খানে

অস্বাভাবিকতা আনিয়া পৌরাণিক আদর্শে অঙ্কিত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। পার্শ্বে যে কয়েকটী মূর্ত্তি দিলাম তাহার প্রথম তিনটী অজন্তা গুহার আদর্শে অঙ্কিত। আর শেষের দুইটী 'প্রবাসী'তে' প্রকাশিত দুইটী চিত্রের আংশিক নমুনা। এই শেষের দুইটী মূর্ত্তি পৌরাণিক আদর্শে অঙ্কিত অথচ কত অস্বাভাবিক। নাক হইতে চোখের দূরত্ব নাই বলিলেই চলে, ইহাতে সৌন্দর্য্যকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আর্টের যাঁহারা বিরুদ্ধ-পন্থী তাঁহারা খুব সম্ভব এই সৌন্দর্য্য হীনতার জন্যই এই শ্রেণীর শিল্পকে পছন্দ করেন না। আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং আবেগের গতিভঙ্গী যেমন অ্যানাটমির সীমারেখা ডিঙ্গাইয়া যায় তেমনি উহা প্রতি পদে সৌন্দর্য্যকে রক্ষা করিয়াই চলে। যাহা সাধারণ চোখে কুৎসিত বলিয়া মনে হয় তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিয়া দেওয়াই শিল্পীর কাজ সুতরাং সুন্দরকে আহ্বান করিতে যদি বীভৎস আসিয়া পড়ে তবে শিল্পীর অদৃষ্ট মন্দ বলিতে হইবে।

সান্ত্বনা

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

তুমুল বিচার তর্ক হয়ে যাক্ শেষ
ভাল মন্দ যা পেয়েছি সেই মোর বেশ!
মিথ্যাবাদ প্রতিবাদে ফিরে প্রতিদ্বন্দী
দিয়েছ আঘাত যে গো এস করি সন্ধি!
উদাও কল্যান সুরে এ জীবন খানি
মহাকাশ যাত্রাপথে শুনিয়াছে বাণী!
এই শ্যাম শষ্পাবৃত ধরনীর বুকে,
এই সব ছোট মুখে ফল হাস্যে সুখে
আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনি ছুটিছে নিয়ত!
শুষ্ক প্রাণ, শূন্য মন শুনি অবিরত
সীমা হ'তে সীমাহীন রহস্য নিলয়ে
হারায় আপন সত্তা পরম বিস্ময়ে!
ক্ষমা কর অপরাধ যা কিছু আমার,
চূর্ণ হয়ে গেছে মোর সর্ব্ব অহঙ্কার!

বাঙ্গালার সাহিত্যিক

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

একদিন জনৈক শ্রদ্ধেয় সাহিত্যাচার্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন, কেবল মাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিলেই সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রক্ষার দায়ীত্বকেও স্বীকার করিতে হয়। যিনি সব্যসাচীর মত একহস্তে সাহিত্যকে রক্ষা ও অপরহস্তে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কিন্তু সাহিত্য জগতে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রেষ্টত্বলাভ করিবার সৌভাগ্য অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ স্রষ্টা ও রক্ষক এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যিকই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের রক্ষক নাই বলিলেই হয়। এই অভিভাবক হীনতার সুযোগ লইয়াই প্রাপ্ত যৌবনা বাঙ্গালা সাহিত্য বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায়, স্বৈরিণীনারীর মত অভিসারে চলিয়াছে। স্বভাবধর্ম্ম হারাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিজাতীয় পথে আত্মঘাতী যাত্রার ফল, বাঙ্গালার মাসিক পত্রিকাগুলি ও তাহার বিজ্ঞাপনগুলি দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কোন নিয়মিত পাঠক, যিনি অন্ততঃ বিগত দশবৎসরের সাহিত্য সৃষ্টির ধারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই দুঃখের সহিত বলেন, বাঙ্গালা সাহিত্য সমাবনতির মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। অবশ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিক বন্যা-স্ফীত জলরাশির ন্যায় আবর্ত্তসঙ্কুল আবিলতায় বিপুলাকার ধারণ করিলেও, ইহার প্রসারতা যত অধিক গভীরতা ততই স্বল্প। শোথরোগীর অঙ্গ বিশেষের বিসদৃশ স্ফীতিকে কেহই পরিপুষ্ট মাংসপেশী বলিয়া যেমন ভ্রম করেনা, সেইরূপ এই লঘু সাহিত্যের ফেনায়িত বিশালতা, সাহিত্যের স্বাস্থ্যহীনতারই পরিচায়ক। এই যে প্রতিমাসে একরাশি মাসিক পত্রিকা স্তুপাকৃতি আবর্জ্জনা বক্ষে লইয়া আমাদের নিকট হাজির দিতে আসে, শুধু ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রের আবরণে তাহাদের অসারতা ও বিকৃতি তো ঢাকিয়া রাখা যায়না। বিশেষত্বহীন ছোট গল্প, একঘেঁয়ে মামুলী বর্ণনাবহুল উপন্যাস আর তাহাদের পদতল-লুণ্ঠিত 'ছোট্ট কবিতা' ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার হতভাগ্য পাঠকের এইখানেই নিষ্কৃতি নাই, তাহার পর আবার ঐ উপন্যাস ও গল্পগুলি, রেশমী সাড়ী পরিয়া, 'সোনার জলে' রঞ্জিত হইয়া, দোকানদারের আলমারী হইতে উপবাস-ক্লিষ্টা বারবনিতার ক্ষুধিত বিলোলদৃষ্টির মত, প্রত্যেক ক্রেতার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দোকানদারের দ্বারদেশে যুক্তকরে দণ্ডায়মান সাহিত্যের এই কুণ্ঠিত সঙ্কোচ, ব্যাধিগ্রস্থ বুদ্ধির এই অসংযত ব্যভিচারের বিরুদ্ধে একদিন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী লেখনী ধরিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'মলাট সমালোচনা' অধিকাংশ সাহিত্যিকই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার তীব্র ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলেও, গণ্ডারের চর্ম্মে ব্যাহত শরের মত ব্যর্থ হইয়াছে।

এই সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্য ব্যবসায়ী সচরাচর এই একটা কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালার মনীষীগণ যাহাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী পাঠক তাহার সমাদর তো করেনই না, বরং নাসিকাকুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। অধিকাংশ পাঠকের সাহিত্য-পাঠের উদ্দেশ্য একটু আমোদ করা। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পাঠকের রুচির ইন্ধন যোগাইতে হইতেছে। পাঠকের এই আমোদ লিপ্সা যতই বাড়িতেছে, পুস্তক প্রকাশকগণও তেমনি নূতন নূতন আড্ডাখানা খুলিয়া হাঁকিতেছেন, পাঁচসিকা, একটাকা, আটআনা, ছয় আনায় প্রচুর নেশা, একবার ধরিলে ছাড়িতে পারিবেন না, চূড়ান্ত

সস্তায় চূড়ান্ত আমোদ। লেখক ও প্রকাশকের এই মন্তব্য একেবারে ভিত্তিহীন নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিরক্তিকর তাণ্ডবনৃত্যের জন্য লেখক ও প্রকাশক কি পাঠক কে বেশী দায়ী তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একথা যদি সত্য হয় যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য কোন প্রয়োজন পূরণের জন্যই, বড় বড় কারখানা খুলিয়া সাহিত্যিক মিস্ত্রী-গণকে গলদ্‌ঘর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইলে সাহিত্য যে জীবন হারাইয়া যন্ত্র হইয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না।

সাহিত্যের এই শোচনীয় দুর্গতির বিষয় ভাবিবার জন্য আজ দেশের দরবারে, ছোট বড় সকল সাহিত্যিকের ডাক পড়িয়াছে। আজ এই কথাটা বুঝিবার দিন আসিয়াছে যে 'যেমনটী চাহেন তেমনটী' সৃষ্টি করা সাহিত্যিকের পক্ষে লজ্জার ও অগৌরবের বিষয়।

সাহিত্য জাতির ভাবসম্পদ ঐশ্বর্য্য! অন্তদ্রব্য নহে, বা কোনমতে প্রয়োজন পূরণের মত সামগ্রী নহে। যেমন বস্তুজগতে যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনিই ঐশ্বর্য্যশালী, এবং প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া যে অংশ উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য; সেইরূপ মনোরাজ্যে চিন্তালব্ধ ভাবৈশ্বর্য্য যখন মানবহৃদয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া অজস্র প্রাচুর্য্যে উছলিয়া উঠে, তখন সেই বাহুল্য অংশটুকুই সাহিত্য নামে অভিহিত হয়। সাহিত্যিকের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য যখন সে আর একাকী উপভোগ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না, তখন তাহার প্রয়োজনকে পূর্ণ করিয়া সেই অতিরিক্ত ভাবধারা হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে ধাবিত হয়; মানুষের বাহিরের ভেদসত্ত্বেও, অন্তরে অন্তরে একটা গভীর সহ-অনুভূতির পরমাশ্চর্য্য যোগসূত্র স্থাপন করে। মানুষের সহিত মানুষের ভেদকে অস্বীকার করিয়া, সাহিত্য একটা সুনিশ্চিত মিলনকে যখন চিরস্থায়ীরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখনই সাহিত্যের গৌরব, এবং তাহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়।

এই বাঙ্গালাসাহিত্যের বক্ষে বাঙ্গালী হৃদয়ের কত বিচিত্র ভাবস্রোত বহিয়া গিয়াছে। কত জাগরণের উদাত্ত প্রভাতী আহ্বান কত মিলনের ঐক্যের মহত্তম বাণী এই সাহিত্যের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। বেশীদিনের কথা নয়, ঐ বাঙ্গালাসাহিত্য একদিন গণ্ডীর বাঁধন ছিঁড়িয়া, যুক্তিহীন বিধিনিষেধ পদতলে দলিত করিয়া সিংহগর্জ্জনে মুক্তি, স্বদেশসেবা, সামাজিক উন্নয়নের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশ্বসাহিত্য সভা হইতে বিজয়মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া গৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, সেই বাঙ্গালা সাহিত্য আজ নির্লজ্জা নর্ত্তকীর মত বিপনীতে দাঁড়াইয়া খেমটা নাচিতেছে, ইহার প্রতিষেধকল্পে বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ কি উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহা আমি একান্ত বিনীতভাবে জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি।

দেশে কত নূতন ভাবের বন্যা আসিয়াছে; কত নূতন-তর আশা আকাঙ্খায় আজ বাঙ্গালীহৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে, কত ব্যর্থতা, পরাজয়, লাঞ্ছনা, অনাহার অবিচারের মধ্য দিয়া জাতি এক মহত্তম লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে, বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের কি কিছুই করিবার নাই? আমরা কি শুধু তথাকথিত পাঠকগণের আমোদ লালসার খাদ্য যোগাইব না জাতির এই অভিনব উদ্যমকে সফল করিবার জন্য আশার বাণী শুনাইব? এই যে সমস্যার পর সমস্যা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, নবজাগ্রত তরুণ জাতির সম্মুখে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, ইহার মীমাংসা আমরা করিব না রাজনৈতিক বক্তাগণ করিবেন? বাঙ্গালার সাহিত্য সম্রাট না তথাকথিত যদি নবজাগ্রত শুচিস্নাত জাতিকে, জাগরণের প্রথম প্রভাতে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আজ সাহিত্য রাজ্য সে গৌরবান্বিত অধিকারকে গ্রহণ করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবেন! হে দুর্ভাগা সাহিত্যিকগণ, তোমরা জাতির পুরোহিত, পুরো-ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাদিগকেই পথ দেখাইতে হইবে, আর তোমরা কিনা প্রমোদভবনের বিলাসী হওয়াকেই সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছ? এই অন্ধ মূঢ়তায় কেমন করিয়া তোমাদের প্রতিভা আচ্ছন্ন করিল? "আমরা রাজনীতি চর্চ্চা করিব না বলিয়া কবুল জবাব" তোমরা দিয়াছ বটে কিন্তু স্বাদেশিকতা, স্বজাতি প্রেমও কি

রাজনীতি ? এই যে দুঃখের গান, বেদনার আর্ত্তনাদ, অভাবের হাহাকারে কঙ্কালসার জাতির হৃদয় ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তোমাদের 'গণিকাতন্ত্র' সাহিত্যরসের কূপে ডুবিয়াও তো সে এ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না। তোমরা কি সান্ত্বনার বাণী শুনাইবে না? বাঙ্গালার কুঞ্জভবনে বসিয়া কেবল সারেঙ্গ, বীনা আর বাঁশী বাজাইবে? ব্রহ্মরুদ্র তালে ভেরী তুরির গুরু গম্ভীর আহ্বান নিনাদ তুলিবে না? খেয়াল টপ্পা গাহিবে, ধ্রুপদ গাহিবে না? কানাড়া ইমন কল্যাণের মুগ্ধ তান তুলিবে, দীপক, ভৈরব, মেঘ মল্লারের রুদ্র গর্জ্জন শুনাইবে না?

পনেরো বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি রূপে এই মহিমব্রত গ্রহণ করিবার জন্য বাঙ্গালার ছোট বড় সকল সাহিত্যিককে আহ্বান করিতে গিয়াছিলেন, "কুঁড়ি কেন যে বাধা দিয়া স্থল হইয়া ফুটিতে চায়, তাহা ফুলের বিধাতাই জানেন, কিন্তু দক্ষিণ হাওয়া দিলে সাধ্য কি তাহার চুপ করিয়া থাকে? তাহার কোন কৈফিয়ৎ নাই, তাহার এক মাত্র বলিবার কথা, আমি থাকিতে পারিলাম না। বাঙ্গালা দেশের এমনি একটা ক্ষ্যাপা অবস্থায় আজ রাজনৈতিকের দল তাঁহাদের গড়ের বাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছেন, বিদ্যার্থীর দলও কলরবে যাত্রাপথ মুখরিত করিয়াছেন, ছাত্রগণও স্বদেশী ব্যবসায়ের রথের রসি ধরিয়া উঁচুনীচু কাঁকরগুলা দলিয়া পা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন—আর আমরা সাহিত্যিকের দলই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? যজ্ঞে কি আমাদের নিমন্ত্রণ নাই? সে কি কথা? এ যজ্ঞে আমরাই সকলের বেশী মর্য্যাদা দাবী করিব। দেশলক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত হইতে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা আমরাই সকলের আগে দাবী করিয়া ছাড়িব। ইহাতে কেহ ঝগড়া করিতে আসিলে চলিবে না। আমাদের অন্য ভাইরা, যাঁহারা সুদীর্ঘ কাল পশ্চিম মুখে আসন করিয়া পাষাণ দেবতার বধির কানটার কাছে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতে ডান হাতটাকে একেবারেই অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারাই যে আমাদিগকে পিছনে ঠেলিয়া আজ প্রধান হইয়া দাঁড়াইবেন, এ আমরা সহ্য করিব কেন? স্বদেশের মিলন ক্ষেত্রে একদিন যখন কাহারও কোন সাড়া শব্দ ছিল না, যখন ইহাকে শ্মশান বলিয়া ভ্রম হইত, তখন সাহিত্যই কোদাল কাঁধে করিয়া ইহার পথ পরিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছিল।"

সাহিত্যাচার্য্যগণের বহুযত্নে প্রস্তুত এই পথ, বহুদিন পথিকহীন ছিল তার পর একদিন অকস্মাৎ বন্যার জলরাশির মত জনস্রোত এই পথের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে রাত—গভীর রাত্রি, সেই অমানিশার ভীষণ দুর্য্যোগে ও কোন কোন সাহসী পুরুষ এই পথে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। রজনীর পর কালের চক্র ঘুরিয়া আবার দিবস আসিয়াছে, কিন্তু দুর্য্যোগের ঘন ঘটা এখনো আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। মেঘাবরণ ভেদ করিয়া প্রভাত সূর্য্য কিরণ ছড়াইতে পারিতেছেনা। মতিভ্রান্ত জাতি সভয়ে সচকিতে চারিদিকে চাহিতেছে দিবসকে দিবস বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। এ অন্ধকার যে সে অন্ধকার নয় এসো সাহিত্যিক, এ কথা একবার জাতিকে বুঝাইয়া দেও। যদি তুমি কবি হও, তবে বজ্র হইতে ধ্বনি কাড়িয়া লইয়া একটা মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ কর, জাতির দ্বিধা সঙ্কোচ চূর্ণ হইয়া যাক্, অগ্রগামী নিশার সেনাদলের বলদর্পিত পদক্ষেপে পথ মুখরিত হইয়া উঠুক। এসো সাহিত্যিক তুমি কল্যাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই মহান যাত্রাকে প্রকৃত সিদ্ধির পথে চালিত কর। তোমার রুদ্র আহ্বানে বাঙ্গালী যুবকের পঞ্জরের তলে তলে ধৈর্য্য শান্ত দুরাকাঙ্খার বিহ্বল ভাবানন্দ জাগিয়া উঠুক, জাতি সাধনায় উপবিষ্ট হউক, তুমি সিদ্ধিকে ফুটাইয়া তোল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ললাট হইতে চিরপনেয় কলঙ্ক ও লজ্জা অপসারিত হউক। ভবিষ্যবংশীয়গণ যেন তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের সাহিত্য লইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত না করে, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আজ তোমাদের প্রতিভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত কর। সাহিত্যে আমার কল্পনার পুতুলনাচ ও গণিকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অসংযত দৌরাত্ম্যের কদর্য্য অভিনয় কিছু দিনের জন্য না হয় বন্ধ থাক।

গীতা ও ভাগবত

[শ্রীস্মরজিৎ দত্ত, এম-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯। ২৬

ভাগবত শ্রীদাম ব্রাহ্মণের উপাখ্যান দ্বারা ভগবানের এই উক্তিটী বিশেষ ভাবে উদাহৃত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; এই প্রসঙ্গে ভগবান্ এই শ্লোকটীর পুনরাবৃত্তি করিয়া ছিলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের সতীর্থ। উভয়ে সান্দীপনী মুনির নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। সেই প্রথম পরিচয় হইতেই শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কেবল প্রাণের সখা বলিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি যেন তাঁহার জীবনের দেবতা। এইরূপ ভক্তের চক্ষেই শ্রীদাম তাঁহাকে দেখিতেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কাটিয়া গিয়াছে। উভয়ে গভীর মনোবেদনার সহিত পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। বিরহে শ্রীদামের অনুরাগ পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-চিন্তা ও কৃষ্ণলীলা কথা লইয়া থাকিতেন। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ যদুপতি হইয়া দ্বারকাধীশ্বর আর শ্রীদাম ভিক্ষান্নে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু অবস্থার এই পরবর্ত্তনে শ্রীদাম কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন। তিনি পরম ভক্ত, সুতরাং দারিদ্র্যকে ভগবানের অনুগ্রহ মনে করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বিষয়ের তাড়নায় সর্ব্বদা তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত থাকিতে হয় না। তাঁহার প্রাণের সখা—জীবনের ঠাকুরের চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার যথেষ্ট আছে। তিনি আর কিছুই চাহেন না। তাহাতেই তাঁহার আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার পরিতৃপ্তি। শ্রীদামের গৃহিণী কিন্তু এরূপ দার্শনিক শান্তি লইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি নিতান্তই সংসারের জীব। ধর্ম্মপিপাসা অপেক্ষা ক্ষুৎপিপাসাই তাঁহার প্রবল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পাতিব্রত্য পরিত্যাগ করেন নাই। স্বামীর দুঃখে অর্থাৎ সাংসারিক অভাব অসচ্ছলতায় তিনি বড়ই দুঃখিত। কিসে এই ভিক্ষা-জীবিকার অবসান হইবে সর্ব্বদা সেই চিন্তায় রত। তিনি প্রায়ই তাঁহার স্বামীকে বলিতে শুনিতেন দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা এবং বাল্যকালে উভয়ে একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন এই সৌভাগ্যে তিনি ভাগ্যবান। একদিন সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়াও আহার্য্যের সংগ্রহ হইল না দেখিয়া শ্রীদাম কুটীরে ফিরিলেন। গৃহিণী তাঁহাকে বলিলেন—যদি দ্বারকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তোমার সখাই হন তবে কেন তুমি তাঁহার নিকট একবার যাও না। তোমার বাল্যকালের বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিবেন। লোকে তোমার সখার কতই যশঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এ রকম দুঃখকষ্টময় জীবন লইয়া কতদিন থাকিবে। তোমার সমস্তদিন অনাহারে ভিক্ষায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে। তবু ও একমুষ্টি সংগ্রহ করিতে পার নাই। আজও উপবাসী থাকিতে হইবে। তোমার এ কষ্ট যে আমি দেখিতে পারি না। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রিয়তমার অশ্রু এবং প্রাণের দেবতাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা উভয়ে যুগপৎ তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বহুদিন পরে তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন, কি উপহার লইয়া যাইবেন তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। সেই রাজ-রাজেশ্বর যদুপতিকে পথের ভিখারী তিনি কি উপহার দিবেন! গৃহিণীকে বলিলেন—দেখ ত ঘরে কিছু আছে কি না। ব্রাহ্মণী অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন—সে কি! ঘরে কোথায় হইতে কি

থাকিবে! কাল ত কিছুই ভিক্ষায় পাও নাই; তাই ত কাল উপবাসে কাটিয়েছে। তখন শ্রীদাম বলিলেন—দেখই না অবশ্য কিছু না কিছু আছে। তখন অগত্যা ব্রাহ্মণী ঘরে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন একটী পাত্রের তলদেশে একমুষ্টি সতুষ তণ্ডুলকণা পড়িয়া আছে। কম্পিত হস্তে তাহাই বাহির করিয়া আনিলেন। মলিন ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চলে সেই তণ্ডুল কণা বাঁধিতে বাঁধিতে ব্রাহ্মণের দুই নয়ন বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার হৃদয়স্বামী—তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম বন্ধু! যাঁহাকে যে বিশ্বের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ধরিয়া দিলেও তৃপ্ত হয় না! হায়, দুরদৃষ্ট! আজ সেই জীবন সর্ব্বস্বের জন্য তিনি লইয়া যাইতেছেন কি না একমুষ্টি সতুষ তণ্ডুল-কণা। শ্রীদাম এই সর্ব্বপ্রথম নিজকে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া মনে করিলেন। আর সেই দারিদ্র্যের জন্য বড়ই দুঃখানুভব করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বাল্য সখা এবং একান্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীদামকে দেখিয়া কত যত্নে তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া উত্তম পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণী দেবী স্বহস্তে ব্যজন করিয়া তাঁহার পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ অন্নে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেবী উভয়ে তাঁহার পাদসেবন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছুতেই তাঁহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। এতদবসরে উভয় সখা সেই রমণীয় বাল্যকালের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া দুইজনে গুরুদেবের গোরক্ষা, কাষ্ঠ ছেদন এবং কুশ আহরণ করিতেন। সন্দীপান কত যত্ন ও স্নেহ সহকারে তাঁহাদের শিক্ষা দিতেন! কিরূপে ভিক্ষায় বাহির হইয়া গুরুর জন্য ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিতেন—ইত্যাদি নানাবিধ আলাপে হাসি অশ্রুর মধ্যে উভয়ে কতই না আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন—আর রুক্মিণীদেবী সাগ্রহে সেই বচনামৃত পান করিতেছিলেন। ক্রমে বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। সমস্ত দিবসের মধ্যেও ব্রাহ্মণ সেই তণ্ডুল কণা প্রাণ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন নাই। অন্তর্য্যামী ভগবান্ বিদায়ের সময় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল সখে, এতদিন পরে আসিলে, তা বন্ধুর জন্য কিছু উপহার আন নাই? শ্রীদাম বলিলেন—জানই ত আমি দরিদ্র, তোমার উপযুক্ত উপহার আমি কোথা হইতে সংগ্রহ করিব? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তাও কি হয়! তুমি যে রিক্ত হস্তে বন্ধুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ ইহা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না। তুমি কি আনিয়াছ বাহির কর। ব্রাহ্মণ ক্রমে বস্ত্রাঞ্চল-বদ্ধ তণ্ডুল কণা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় চতুর চূড়ামণি বলিয়া উঠিলেন—ওই যে তুমি কি লুকাইতেছ—ও কি বাঁধা রহিয়াছে দেখি, দেখি। শ্রীদাম বড়ই বিপদে পড়িলেন। ও কিছু নয় কিছু নয়—বলিয়া যেমন লুকাইতে যাইবেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। বন্ধন খুলিয়া ভক্তের অশ্রুসিক্ত উপহার সেই তণ্ডুল কণা পরম অমৃত বোধে ভোজন করিতে করিতে গীতোক্ত আপন শ্লোকই পুনর্ব্বার বলিলেন—পত্রং পুষ্পমিত্যাদি।

শ্রীদাম যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহার কিছুই হইল না। নিত্যসুখসিন্ধু-তীরে আসিয়া তুচ্ছ অনিত্য বিষয় সুখ চাহিতে তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই পরমানন্দের স্মৃতি লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন করিয়া তিনি নিজের কুটীর খুঁজিয়া পান নাই।

১২। অপিচেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৯। ৩০

ব্রাহ্মণ নন্দন অজামিল দুর্ব্বৃত্তের জীবন যাপন করিয়া মৃত্যুকালে আপন পুত্র নারায়ণকে ভীতি বিহ্বল প্রাণে ডাকিয়াছিলেন। সেই নামাভাসে বৈষ্ণব সঙ্গে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন তিনি অতীত জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন দেখিয়া তীব্র অনুতাপানলে হৃদয়ের সঞ্চিত পাপ-রাশিকে ভস্মীভূত করিয়া অনুশোচনার অশ্রুপাতে তাহা ধৌত করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই শুদ্ধ নির্ম্মল অন্তঃকরণে বাসুদেবের

শান্তস্মিত মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইল। ইন্দ্রিয়ের দাস দুরাচার অজামিল পরম সাধু হইয়া উঠিলেন।

১৩। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৯।৩১

প্রহ্লাদ ও অম্বরীষের জীবনে ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি ভাগবত বর্ণে বর্ণে প্রতি পালন করাইয়াছেন। শাস্ত্রে আছে :—

জলমগ্নি বিষং সর্পঃ ক্ষুদ্ব্যাধিঃ পতনং গিরেঃ।
নিমিত্তং কিঞ্চিদ সাদ্য দেহী প্রাণৈ বিমুচ্যতে ॥

ভাগবত বলিতেছেন প্রহ্লাদকে মৃত্যুর অতিথি করিবার জন্য এক ব্যাধি ব্যতীত আর সকল গুলিই প্রযুক্ত হইয়াছিল। ব্যাধটী মানুষের ইচ্ছা মাত্রেই আসে না কিনা, তাই অসুররাজ তাহার পরিবর্ত্তে প্রহ্লাদকে মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া ব্যাধির স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হন নাই। ভাগবত আরও দেখাইয়াছেন ভক্তের প্রতি অভিচার বা অনিষ্ট চেষ্টা কেবল মাত্র যে বিফল হয় তাহা নহে পরন্তু তাহা চন্দ্রের প্রতি নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় আপনার উপরেই ফিরিয়া আসে—"সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতে হশিবং।" ভক্তের নাশ চেষ্টায় হিরণ্য-কশিপু আপনিই বিনষ্ট হইলেন।

রাজর্ষি অম্বরীষ সাম্বৎসরিক হরিবাসর ব্রত অবলম্বন করিয়া মধুপুর প্রান্ত বাহিনী যমুনাতটে বাস করিতেছিলেন। বৎসর শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেষ হরিবাসর পালন করিয়া দ্বাদশীর পারণ দ্বারা ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। সে দিন আহুত, অনাহুত এবং রবাহূত অভ্যাগত সকলকে যথারীতি সৎকার করিয়া অম্বরীষ নিজে পারণ করিবেন, এমন সময়ে "অয়মহং ভোঃ" বলিয়া দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত। রাজর্ষি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্যার্ঘ্যদানে ঋষির অভ্যর্থনা করিলেন। পরে তাঁহাকে স্নানার্থ নিবেদন করিলে ঋষিপ্রবর যমুনায় চলিলেন। সেখানে ধ্যানস্থ হইয়া মুনিপুঙ্গব আহারাদির কথা বিস্মৃত হইলেন। এদিকে দ্বাদশী উত্তীর্ণ হয়। দ্বাদশীর মধ্যে পারণ না করিলে দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া যে ব্রত পালন করিয়া আসিলেন তাহা অপূর্ণ হইয়া যাইবে। মহারাজ অম্বরীষ মহাবিপদে পড়িলেন। দুর্ব্বাসা মুনিকে অভুক্ত রাখিয়া নিজে আহার করিতে পারেন না—আবার আহার না করিলেও ব্রত বিফল হইয়া যায়। সমবেত ব্রাহ্মণগণকে তিনি এই ধর্ম্মসঙ্কটে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ বলিলেন—জল আহার এবং অনাহার দুইই বটে। অতএব আপনি সামান্য জল মাত্র পান করিয়া দ্বাদশী রক্ষা করুন, ইহা শাস্ত্র সম্মত। তাঁহাদের অনুমতি লইয়া অম্বরীষ জলমাত্র পান করিয়া ব্রত রক্ষা করিলেন। কতক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে দুর্ব্বাসা স্নানান্তে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বুঝিলেন রাজা তৎপূর্ব্বেই জল গ্রহণ করিয়াছেন। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা, আমাকে অবহেলন! মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের ন্যায় দুর্ব্বাসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। নিজে নির্দ্দোষ হইলেও অম্বরীষ মুনির মন্যু প্রশমনার্থ তৎপাদমূলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। দুর্ব্বাসার ক্রোধ একেবারে দাবানল। তাহাকে নির্ব্বাপিত করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। দুর্ব্বাসা মস্তকস্থ একটী জটা উৎপাটন করিয়া অভিচার মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন এবং ভক্তরাজ অম্বরীষের নিধনার্থ প্রয়োগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই জটা প্রজ্জ্বলিত বহ্নি রূপিনী একটী কৃত্যায় পরিণত হইয়া অম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল। ভগবানে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার সংসারে ভয় করিবার কিছুই নাই। তিনি "অভীঃ" হইয়া থাকেন। অম্বরীষ এখন ভগবানেরই। তাঁহার আত্মরক্ষার জন্য কোনই চেষ্টারই প্রয়োজন নাই। ভগবানের জিনিস, প্রয়োজন হইলে তিনিই রক্ষা করিবেন নতুবা বুঝিতে হইবে তাহার অরক্ষণই তাঁহার অভিপ্রেত।

দুর্ব্বাসার প্রেরিত কৃত্যাকে ধাবিত হইতে দেখিয়া ভগবানের সুদর্শন চক্র কোটি সূর্য্যের তেজে প্রদীপ্ত হইয়া তাহাকে আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া ফেলিল। কৃত্যার পরিণাম দেখিয়া দুর্ব্বাসার ক্রোধ ভীতিতে পরিণত হইল। পরে যখন মুনিপুঙ্গব দেখিলেন সুদর্শন সেইখানে নিরস্ত না হইয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছে তখন তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি প্রাণ ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু ছুটিয়া যাইবেন কোথায়? সুদর্শন অবাধগতি। মুনির দুরবস্থা দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। ছুটিতে ছুটিতে এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া

দেখিতেছেন। আর সেই প্রদীপ্ত চক্রকে দেখিয়া তাঁহার নয়ন অন্ধীভূত হইতেছে তিনি অধিকতর দ্রুত ধাবনের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মনে হইতেছে রথাঙ্গ বুঝি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাঁহার জটা-কলাপ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইতেছে—তাঁহার বল্কল-বাস বায়ুভরে পশ্চাতে উড়িতেছে—বুঝিবা খসিয়া যায়। তাঁহার দুই স্বক্কণী বহিয়া ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছে—বদন পাংশুবর্ণ, নয়ন দুইটী ভীতি বিস্ফারিত এবং দীর্ঘ শ্মশ্রুভার বায়ুভরে মুখের উপর পড়িয়া দৃষ্টি রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

একে একে ইন্দ্র বরুণ যম কুবেরাদি অষ্টলোকপাল, ব্রহ্মা এবং রুদ্র সকলেরই শরণাগত হইলেন। কিন্তু সুদর্শন হইতে রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ হইলেন না দেখিয়া অগত্যা দুর্ব্বাসা বড় আশায় বিষ্ণুর পদতলে আসিয়া পড়িলেন। নারায়ণ বলিলেন—আমি ভক্তাধীন।

"সাধবো হৃদয়ংমহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

তুমি ভক্তের প্রতি অভিচার প্রয়োগ করিয়াছ। যাও সেই অম্বরীষকে প্রসন্ন কর। আমি অম্বরীষের নিকট বিক্রীত হইয়াই আছি। অম্বরীষই আমার প্রভু। হতাশামলিন মুখে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দুর্ব্বাসা গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া অম্বরীষের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং দীননেত্রে আপনার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। অম্বরীষ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—সেকি সেকি, আপনি আমার নিকট ও কি বলিতেছেন। আমার জীবন দিয়াও যদি কাহার কোন উপকার হয় আমি তাহাতে প্রস্তুত। আমি যদি সত্যসত্যই ব্রত পালন করিয়া থাকি, যদি ভগবানে আমার ভক্তির লেশও থাকে তাহা হইলে সুদর্শন আপনাকে নিশ্চিতই পরিত্যাগ করিবে। ভক্তের ইচ্ছায় সুদর্শন নিরস্ত হইল। দুর্ব্বাসা জীবন পাইলেন। অম্বরীষের হরিভক্তির প্রশংসা করিয়া তদীয় আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক মুনিবর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

১৪। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং।
কিং পুন র্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষ স্তথা॥ ৯। ৩২

ভাগবত এক এক করিয়া সকল গুলিরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

প্রথমতঃ—কপীশ্বর হনুমান্, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, গ্রাহগ্রস্ত গজ, নাগেন্দ্র কালীয়, এমন কি জড় বৃক্ষ যমলার্জ্জুন পর্য্যন্ত ভগবৎ-প্রসাদে পরাগতি লাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—কুন্তী, দেবহূতি, দেবকী, ব্রজাঙ্গনাগণ, যজ্ঞ দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের পত্নিগণ এবং অন্যান্য অনেক স্ত্রীগন পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ—নন্দাদি গোপগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তদীয় গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যে বৈশ্য ছিলেন তাহা ভাগবতই বলিয়াছেন। যেন ভগবদুক্তির সমর্থন করিবার জন্যই গোপদিগের বর্ণ তথা কর্ম্ম বিচার করিয়াছেন। ইন্দ্রযজ্ঞনিবারণোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিতেছেন :—

কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাঃ কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা, তত্র বয়ং গোবৃত্তয়ো২নিশম্॥১০।২৪।২১

গীতায় ভগবান্ ইহাই বৈশ্যদিগের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন—

"কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্"।৪৪

সুতরাং নন্দাদি গোপগণ যে বৈশ্য ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চতুর্থতঃ—দাসীপুত্র বিদুর এবং দাসীপুত্র নারদ শূদ্র হইয়াও ভগবানের পরম পদ লাভ করিয়াছেন তাহা ভাগবতই বিশেষরূপে বলিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ—ব্রাহ্মণ কুমার শুকদেবত জীবন-মুক্ত আত্মারাম। তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখাইবার জন্য ভাগবত শুকদেবের পুণ্য জীবনের এক বিচিত্র ঘটনা মহাভারত হইতেই বর্ণনা করিয়াছেন। সকলে জানেন "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" যিনি ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। তিনি হয়ত ব্রাহ্মণ-তনয়—ব্রাহ্মণত নয়। শুকদেবের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ ছিল তাহাই দেখাইবার জন্যই যেন ভাগবত বলিতেছেন :—ব্যাসদেবের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়া শুকদেব অবধূতবেশে প্রব্রজ্যায় চলিলেন। পথিমধ্যে এক সরোবরে অপ্সরোগণ তীরে বসন রাখিয়া জলক্রীড়া করিতে

রহিলেন। দিগ্‌বাসা-যুবক বৈয়াসকিকে দর্শন করিয়া তাঁহারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না—তাঁহারা যথাপূর্ব্ব কেলিসুখরসে মগ্ন রহিলেন। পুত্র প্রব্রজ্যায় চলিলেন দেখিয়া শোকোপহতচেতা মহর্ষি দ্বৈপায়ন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। যে সরোবরতীর দিয়া শুকদেব চলিয়া গিয়াছেন ব্যাসদেব ও সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জলকেলিনিরতা অমরাঙ্গনাগণ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব বসন পরিধান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সত্যবতী নন্দন এই ব্যাপার দর্শনে কৌতূহল-পরবশ হইয়া লাজসঙ্কুচিতা দেববালাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদিগের এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? আমার যুবকপুত্র নগ্নবেশে আপনাদিগের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, আপনারা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না—আর আমি বৃদ্ধ, ভালরকম বসনে আচ্ছাদিত হইলেও আমাকে দেখিয়া এরূপ সম্ভ্রমের কারণ কি? তখন দিব্যাঙ্গনাগণ উত্তর করিলেন—আপনার প্রশ্নই কি ইহার যথেষ্ট উত্তর নহে! না হইলেও বলি শ্রবণ করুন। আপনার পুত্র যুবক এবং উলঙ্গ হইলেও সর্ব্বত্র তাঁহার ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইতেছে। তিনি অভেদ দৃষ্টিতে সকলের প্রতি সমদৃক্। তাঁহার স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান নাই। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ মহর্ষি হইলে কি হইবে—আপনার ভেদজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। আপনি যখন স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক বলিয়াই জানেন তখন আমরা ত্রিদিবললনা হইয়া আপনার উপস্থিতিতে যে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছি তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ব্যাসদেব অপ্রতিভ হইলেন না। তবেই দেখা যাইতেছে ভাগবত শুকদেবকে কিরূপ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মৈত্রেয়, বশিষ্ট, কশ্যপ, কর্দ্দম প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণের কথা ভাগবতে আছে।

ষষ্ঠতঃ—জনক, প্রিয়ব্রত, পৃথু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অখিলাত্মা হরিকে আশ্রয় করিয়া পারমহংস্যগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৃথুর ভগবদ্ভক্তি অতুলনীয়। তিনি বলিয়াছিলেন—

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরং।
স্বধর্ম্মযোগেন যজন্তি মামকা নিরন্তরং ক্ষৌণীতলে দৃঢ়ব্রতাঃ॥

৪।২১।৩৪

অর্থাৎ সভাস্থ সমবেত ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঐ সকল ব্যক্তি আমার প্রতি কতই না অনুগ্রহ বিতরণ করেন। যেহেতু তাঁহারা এই পৃথিবীতে থাকিয়া স্বধর্ম্মযোগে দৃঢ়ব্রত হইয়া সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর সর্ব্বগুরু হরির নিরন্তর ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে নিতান্তই আমার আপনার জন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! ভগবানকে তাঁহারা পূজা করেন তাহাতেই তাঁহাদিগের পৃথুর প্রতি অনুগ্রহ করা হয়! আমি যাহাকে ভালবাসি তাহাকে যদি আর সকলে ভালবাসে বাস্তবিকই তাহারা আমার প্রিয় পাত্র। ভগবানের প্রতি এতাদৃশী ভক্তি কয়জনের হইয়া থাকে?

১৫। মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমে প্রজাঃ॥১০।৬

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাদশ ও বিংশ অধ্যায়ে এই সৃষ্টিরহস্য বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১৬। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥১২

১৮,১৯

যদি এইরূপ ভগবদ্ভক্ত কেহ দেখিতে চাহেন তিনি ভাগবতে বর্ণিত ঋষভ চরিত্র পাঠ করুন।

১৭। উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান-চেতসঃ॥

সংসারে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ কতক্ষণ? জীবন পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ মানব কেন তাহাতে আসক্ত হয়? যাহার সহিত সম্বন্ধ অবশ্যই ছিন্ন হইয়া যাইবে কেন তাহাকে নিতান্ত প্রিয়তম মনে করিয়া দুর্ব্বিসহ অনন্ত শোককে ডাকিয়া আনে? জীব নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করে। পথপার্শ্ববর্ত্তিবটবৃক্ষতলে মিলিত পথিক দলের সম্বন্ধের ন্যায় সংসারের সকলের সম্বন্ধ। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়। শত চেষ্টায়ও তাহাকে আর মুহূর্ত্ত মাত্র ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম যে, সে সকল স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া কেমন করিয়া যে

চলিয়া যায় ইহাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাহার ইচ্ছা না হইলেও নিয়তির বিধানে বাধ্য হইয়া তাহাকে যাইতেই হয়—এমনি কঠোর সে নিয়তি। সুতরাং পার্থিবাসকে যাহারা চির প্রিয় আপনার গৃহ মনে করে তাহারাই দুঃখের পর দুঃখ তরঙ্গে বিপর্য্যস্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। মানুষের এই অকিঞ্চিৎকর সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য ভাগবত এই ভগবদুক্তির বিস্তার করিয়া চিত্রকেতু রাজার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

চিত্রকেতু রাজার কোন অভাবই নাই। সর্ব্বসুখে এবং ঐশ্বর্য্যে তিনি সমৃদ্ধ। কিন্তু একমাত্র অনপত্যতাই লবণহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় তাঁহার সমস্ত রাজসুখকে বিস্বাদ করিয়া দিয়াছিল। রাজার ঘরে পুত্রের হাসি না ফুটিলে তাহার পরিপূর্ণ শ্রী বিকসিত হয় না। তাই রাজা সকল আনন্দের মধ্যে থাকিয়াও নিরানন্দ। দৈবক্রমে সাধুকৃপায় তিনি একটী পুত্র রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। প্রভাত-অরুণের কনক হাসির ন্যায় শিশুর স্বর্গীয় হাসি সমস্ত নিরানন্দকে আনন্দময় করিয়া দিল। রাজা কতই না স্নেহে সেই শিশুকে বুকে ধরিয়া তাহার মুখচন্দ্রে সহস্র চুম্বন দান করেন। প্রতিচুম্বন যেন অযুত বাসনা বিস্তার করিয়া পুনশ্চুম্বনে রাজাকে প্রবর্ত্তিত করে। শিশু যে সত্যই একটী সুকুমার কুসুম। সে যে অরুণের মৃদু উত্তাপেই ম্লান হইয়া যায়। রাজার কুমার রাজার এই অতি স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের উষ্ণস্পর্শেই বুঝি শুকাইয়া গেল। নিয়তির গতি কে বুঝিবে? সপত্নীগণ ঈর্ষাবশে বিষ প্রয়োগে শিশুকে হত্যা করিয়া প্রধানা মহিষীর সকল সুখে আগুন জ্বালাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজার হৃদয়ে দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে কি দুর্ব্বিসহ শোক! চিত্রকেতু তাঁহার সকল সাধনার ধন একমাত্র প্রিয়তম পুত্রকে হারাইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। পরদুঃখ-কাতর নারদ আসিয়া তাঁহার শোকাপনোদন করিতেছেন। কিন্তু পিতার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছেনা। নারদের সকল সান্ত্বনা প্রবল শোক তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। তখন দেবর্ষি এক অভিনব কৌশল করিলেন। তিনি যোগবলে মৃত শিশুর শরীরে জীবাত্মাকে আনয়ন করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন—উঠ বৎস! তোমার পিতা তোমার জননী তোমার শোকে কিরূপ কাতর হইয়াছেন একবার দেখ। নারদের বাক্যে জীব উত্তর করিল—

কস্মিন্ জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্।
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমানস্য দেবতির্য্যঙ্ নৃযোনিষু ॥ ৬।১৬।৩
যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ।
পর্য্যটন্তি নরেষেবং জীবযোনিষু কর্ত্তৃষু ॥ ৫
নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু।
যাবদ্ যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥ ৬

অজ্ঞান-বিমূঢ় চিত্রকেতু উৎক্রমনশীল এই জীবকে দেখিতে পান নাই। তাই তিনি শোকে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টি জ্ঞানচেতা নারদ জীবাত্মার স্বরূপ জানিতেন, তাই চিত্রকেতুকে দেখাইয়া দিলেন। চিত্রকেতু এই ব্যাপার দর্শনে অশোক হইলেন। এই রূপেই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের পুত্র শোক নিবারণ করিয়াছিলেন।

১৮। আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধন-মানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৬।১৭

ভাগবত দক্ষযজ্ঞে এই ভাবটী বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিশ্বসৃট্‌গণের যজ্ঞে ভগবান ভব কর্ত্তৃক বাহ্যত অভিষ্টুত না হওয়ায় ক্রুদ্ধ দক্ষ দম্ভ পূর্ব্বক শাস্ত্র-বিধি-বিবর্জ্জিত যে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাতে যজ্ঞেশ্বর ত আসেন নাই। প্রত্যুত সে যজ্ঞ লণ্ড ভণ্ড হইয়া ছিল এবং স্বয়ং যজ্ঞকর্ত্তা ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গীতার ষোড়শাধ্যায়ে বর্ণিতঅসুর ভাব ভাগবত হিরণ্যাক্ষাদি অসুরজীবনে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

১৯। অশাস্ত্র বিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কার-সংযুক্তাঃ কাম-রাগ-বলান্বিতাঃ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥১৭।৫,৬

ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে এই আসুরী তপস্যা প্রদর্শন জন্য হিরণ্যকশিপুর তপশ্চর্য্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা দুই একটী শ্লোক তুলিয়া তাহার নমুনা দেখাইব।

স তেপে মন্দরদ্রোণ্যাং তপঃ পরমদারুণং।
ঊর্দ্ধবাহুর্নভোদৃষ্টিঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতাচনিঃ ॥ ২

তস্য মূর্দ্ধসমুত্থঃ সধূমো হগ্নি স্তমোময়ঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধোলোকান্ প্রাতপদ্বিষ্বগীরিতঃ॥ ৪
তেন তপ্তা দিবং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মলোকং স্ময়ু যযুঃ॥ ৫

দেবগণ কর্তৃক সনির্ব্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়া হংসবাহন ব্রহ্মা প্রপৌত্র হিরণ্য কশিপুর তপঃ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—

ন দদর্শ প্রতিচ্ছন্নং বল্মীকতৃণকীচকৈঃ।
পিপীলিকাভিরাচীর্ণ-মেদস্ত্বাংসশোনিতং॥ ১২

সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—

অত্রাক্ষমহমেতং তে হৃৎসারং মহদদ্ভুতং।
দংশভক্ষিতদেহস্য প্রাণা অস্থিষু শেরতে॥ ১৪

২০। সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণাং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
১৮। ৬৬

ভগবানের এই সর্ব্বগুহ্যতম ধর্ম্মোপদেশ ভাগবত বলির জীবনে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুধৃত গ্রন্থান্তর বাক্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদির উদাহরণ দেখাইয়া বলিতেছেন।

"সর্ব্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি রেষাং পরং॥"

যথা—শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
অক্রূরস্তদভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যে হর্থ সখ্যে হর্জ্জুনঃ,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি রেষাং পরং॥

ভগবান্ বামনরূপে ত্রিপাদ মাত্র ভূমি ভিক্ষা করিয়া ত্রিবিক্রম রূপে দুই পদে ভূর্লোক ও স্বর্লোক আক্রমণ করিলেন। তৃতীয় পদের স্থান আর বলির অধিকারে নাই। বলি তখন সর্ব্বভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন এবং আপনার মস্তককে তাঁহার তৃতীয় পদ স্থাপন করিতে বলিলেন। উরুক্রমের নাভি হইতে সমুদ্ভূত তৃতীয় পদ বলির মস্তকেই ন্যস্ত হইল। ভগবান্ বলিলেন—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহং।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥৮।২২।২৫
এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি॥৩০
গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ॥ ২৯

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ভূমিদান প্রতিশ্রুতি হইতে বলিকে বিচলিত করিবার জন্য প্রথমে হিতার্থ উপদেশ, পরে তিরস্কার, পরিশেষে অভিশাপ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদের বংশধর সত্য হইতে অণুমাত্র স্খলিত হইলেন না। তাই সর্ব্বান্তঃ করণে শরণাগত ভক্ত বলিকে সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। আর সেই নশ্বর ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে নিজে তাঁহার দ্বারে নিশিদিন প্রেমে বাঁধা রহিলেন।

ভাগবতবর্ণিত পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ হয় আমরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারিয়াছি যে ভাগবত গীতোক্ত ধর্ম্মই বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা ভাগবতকে গীতা হইতে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা এক্ষণে স্বীকার করিবেন যে গীতা ও ভাগবতের মধ্যে বস্তুগত প্রার্থক্যদর্শন আদৌ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক নহে। আমাদের নিকট গীতা ও ভাগবত উভয়ই তুল্য আদরের বস্তু। কাহাকে রাখিয়া কাহাকে অধিক গৌরব প্রদর্শন করিব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে ভাগবতের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ ও ঋণী এই হিসাবে যে ভাগবত আমাদিগকে গীতার্থ সুস্পষ্ঠ ও বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অতঃপর যাহা লইয়া গীতা ও ভাগবতের মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা হয় সেই জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(ক্রমশঃ)

শূন্যগৃহে

[শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল]

প্রিয়ে !

আজিকে প্রভাতে মলিন তরুণ অরুণ-কিরণ রেখা,
বাতায়ন ফাঁকে ডেকে ডেকে ডেকে পায়নি তোমার দেখা
আজি আঙ্গিনার দুঃখ মলিন্ রুক্ষ শুষ্ক সাজ,
লভেনি তোমাব কোমল করের মঙ্গল ছড়া আজ।
শূন্য কলসা গৃহ কোণে পড়ে সার করিয়াছে কাঁদা
তোমার বদ্ধ বাহু বেস্টনে পড়েনি আজিকে বাঁধা।

আঙ্গিনার মাঝে গাঁদা গাছগুলি, মাথা নেড়ে নেড়ে বলে,
তুমি সেথা নাই, প্রভাতা বাতাস কেঁদে তাই যায় চলে।
ঝারায় সিক্ত গোময় লিপ্ত তোমার আপন করে,
গৃহের নিত্য পুণ্যতীর্থ তুলসী বেদীর পরে,
তোমার করের চিহ্ন পাবন, এখনো দেখিতে পাই
এত বেলা হ'লো, তবুও তো প্রিয়ে, তুমি আজ সেথা নাই।

শেফালির মত রক্ত অধরে শুভ্র হাসিটী নিয়ে,
শেফালির তলে ফুল কুড়াইতে আসনি আজিকে প্রিয়ে !
ডাল ধরে তার প্রভাতে আসিয়া দোলাওনি তুমি আজ,
পরাতে পারেনি ঝরা ফুলে তোমা, আজি বনদেবী সাজ,
ফুলগুলি তার চারিদিকে ওই পড়ে আছে অনাদরে,
কূয়ার কিনারে শেফালি তরুটী তাইতে গুমরি মরে।

ওগো পূজারিণি ! সাজি লয়ে হাতে, তুমি আজ আসনাই,
ঘরের পিছনে, ফুলের বাগানে, ফুলদল ম্লান তাই।
অতসী টগর মাধবীর মাথে, আজিকে পড়েছে বাজ,
পায়নি তোমার পুষ্পপেলব প্যাণির পরশ আজ।
তোমার রক্ত অধরের রাগ, লাজ দিতে কাছে নাই
মাথা উঁচু করে, গাছে গাছে গাছে, জবা ফুটে আছে তাই।

বেলা বেড়ে চলে, কলসী কাঁকালে আজতো এলেনা সেথ,
তরু ছায়া ঢাকা পুকুরের ঘাটে, প্রতিদিন প্রিয়ে যেথা
সদ্য সিনানে সলিল সিক্ত বসন আচম্বিতে,
গুপ্ত অযুত অঙ্গ সুষমা, চাহিত বিলায়ে দিতে;
লুটিয়া লইতে সে মাধুরী রাশি, কক্ষে কলসী ছাড়ি
ছল ছল ছল, উছলি উছলি বক্ষে পড়িত বারি।

পূজার কোঠায় পট্টবসনে প্রতিমার মত সাজি,
পঞ্চোপচারে পূজা আয়োজন, করে নাই প্রিয়ে আজি,
গর্ভ কেশর ফেলিয়া দুর্ব্বা অর্ঘ্য রচনি তায়
পুষ্প পাত্রে বিল্বপত্র তুলসী না শোভা পায়।
কঙ্কন ঝন ঝন তালে তালে চন্দন পাটাখানি
উল্লাসে আজি উঠেনি তো নাচি ওগো হৃদয়ের রাণি।

শ্লথ কেশপাশ, তুলিয়া বাঁধিয়া শিরে কিরিটীর মত,
অঞ্চলে কটী বন্ধন করি, যেথা রন্ধনে রত,
অথবা লইয়া অন্নের থালা, অন্নপূর্ণা সাজে,
নিত্য ক্ষুধিতে করিতে তৃপ্ত, গৃহ বারানসী মাঝে,
অতিথি ভিখারী পরিজন আদি সবাকার সেবারতা,
সেথা খুঁজে আজি বারতা তোমার মিলেনা তো পতিরতা!

দিবসের শেষে ম্লান হাসি হেসে, বিদায়ের উপহার
শুভ্র মেঘের সাড়ীর কিনারে উজল সোনালী পাড়
তপন যখন বয়ন করিয়া দিক্ বধূটীরে দিযা,
চক্রবালের আড়ালে অমনি পড়ে প্রিয়ে মুরছিয়া,
আমি বসে ভাবি একটী নিশির বিরহে সে এত ম্লান
কত নিশি পরে ফিরে তোমা পাব, কেমনে থাকিবে প্রাণ?

সন্ধ্যা যে আসে, রোজকার মত ধূসর সাড়ীটি পরি
খুঁজিতে তোমায় তুলসী তলায়, যেথায় নীলাম্বরী—
পরিয়া নিতুই মঙ্গল দীপ অঞ্চলে আবরিয়া,
আপনার হাতে রাখিয়া যাইতে, বারবার প্রণমিয়া,
পিতৃ কিম্বা শ্বশুরের কূলে যারা সব আছে যেথা,
মাগিতে তাদের সবার কুশল—আজি প্রিয়ে নাই সেথা।

সন্ধ্যা গিয়েছে রাত্রি এসেছে মা যে শুয়ে বিছানাতে,
কেউ তো আজিকে, "পুরাণ ঘি" নিয়ে দেয়নি তাঁহার মাথে ;
পায়ের তলায় তেল জল তাঁর মাখে নাই কেহ বসি,
মার চোখে আজ ঘুম নাই তাই আজ যে গো একাদশী।
দুষ্টামী আজ বেড়েছে খুকীর তাবো চোখে নাই ঘুম,
"বৌমা" যে তারে শোয়ায়নি আজ, কোলে করে দিয়ে চুম।

নীরব নিঝুম অর্দ্ধ রজনী, ধরায় এসেছে নামি
সুপ্ত এখন সারাটী জগৎ, জাগ্রত শুধু আমি
আদরের তব "হাস্নুহানাটী" জেগে আছে শুধু আর,
খোলা খিড়কীর ফাঁকে ফাঁকে ওই পল্লবগুলি তার
পাঠায়ে দিয়েছে সন্ধান নিতে, কপাট হেলান দিয়ে,
আগের মতন কোলে তুলে নিতে বসে আছ কিনা প্রিয়ে।

আলমারা মাঝে তোমার হাতের সাজান পুতুল গুলি,
শুধায়—"সাজায়ে রেখে আমাদের কোথায় আছে সে ভুলি ?
দেয়ালের গায় ফটোখানি মোর শুধায়—"বল তো দেখি—
রোজ রোজ আর দিয়ে ফুলহার, সাজাবেনা মোরে সেকি ?"
এ গৃহের প্রতি পরমাণুটারে করে গেছ প্রাণময়,
নীরব কক্ষ মুখর হইয়া এত কথা তাই কয়।

প্রিয়ে আজি মোর শূন্য আগারে তাকাই যাহার পানে
তোমার স্মৃতিটী এমনি করিয়া জাগায়ে তোলে যে প্রাণে।
বুঝিতে আজিকে পারিনা তো প্রিয়ে, বিরহ মিলন দুই,
কারে বলি ভাল কোনটা বা চাই কারে রাখি কারে থুই।
মিলনে তোমারে তখনি তো পাই যখন সমুখে থাকি,
বিরহে তোমায় সবখানে পাই যে দিকে ফিরাই আঁখি।

———

কথা বনাম কাজ

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি-এ]

[উকীল ভবতোষ সাহার বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড ফরাশের উপর আসীন ভবতোষের জনৈক উকীল বন্ধু অনাথ, পাশে উপবিষ্ট সদানন্দ বাবু নূতন সব-ডেপুটী, উভয়ে আলাপ-নিযুক্ত, ফরাশের একপাশে কয়েকটা বাদ্য যন্ত্র। কয়েকটা নূতন গ্লাসকেসে ল রিপোর্ট ও অন্যান্য আইনের বই সাজানো। এক পাশে একটা পাথরের টেবিলে একটা বড় ক্লক্। মাথার উপর গিল্টী করা ফ্রেমে কাপড়ের টানা পাখা দেশী বিদেশী কয়েকখানা ছবি ও ফটো সাজানো]

অনাথ। (একটা পুরানো খবরের কাগজ নাড়িতে নাড়িতে) এলেই পারেন এখানে সন্ধ্যাবেলা বেশ আড্ডা জমে, কাটে ভাল। কি করেন বাড়ীতে বসে ?

সদানন্দবাবু। (মুখের চুরুট নামাইয়া একটা টোকা মারিয়া ছাই ফেলিয়া দিয়া) করি আর কি ? হাই তুলি আর তুড়ি দি, উঠি, বসি, পাশ ফিরি, চাই কি একটা আধটা নভেলও পড়ি, গিন্নির ফুরসুৎ পেলে তাঁকে এনে একটু এসথেটিক কালচার্ করি—এখানে আসে কে ?

অনাথ। তা খুব বাছা বাছা লোকই আসেন, এক-রকম পারমেনেণ্ট মেম্বার সব—জহরলাল মার্চেণ্ট, ডাক্তার সুবোধবাবু, মনোহরবাবু মোক্তার, রজনী মাষ্টার, বরদা-বাবু ডেপুটী, জমাদার দীনেশ রায়, প্রোফেসার হারাধন মুস্তফী এঁরা তো constant quantity এর উপর কাজের অকাজের আরো দু'চার জন রোজই additional মেম্বার তো হয়ই—

সদানন্দ। খুব মজগুল আড্ডা তা হলে—

অনাথ। যা ভাষান্তরে যাকে বলে নরক গুলজার।

সদানন্দ। (হাসিয়া) কি আলোচনা হয় ?

অনাথ। তা আর বলবেন না—এমন বিষয় নেই যা এখানে আলোচনা হয় না; perfect freedom of thought & speech। কোনো restricion নেই—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি, পাড়াপড়শীর চরিত্রনীতি, সবচেয়ে মুখরোচক পরচর্চ্চা, নিটজের সুপারম্যান, বায়স্কোপ, মুকুট থিয়েটারের হরিমতি, নায়িকা কিরণময়ীর সতীত্ব, সবজজ বাবুর দ্বিতীয়পক্ষ, নেংড়াআম, চৌধুরী সাহেবের আরগুমেণ্ট পীরবক্সের কোপ্তা, কেলনারের নূতন ব্রাণ্ড, হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা, মিউনিসিপালিটীর ইলেক্সন, আমীরের বাতের ব্যামো—এক কথায় From the sublime to the ridiculousএর সমস্ত পরদায় আমরা আঙুল না চালিয়ে বাড়ী ফিরিনে—

সদানন্দ। চমৎকার। শুধু কথার ব্যাসাতি তা হলে ? words! words! (উচ্চহাস্য)

অনাথ। আবার কি চান্ ? সভ্যতম জাতের ধর্ম্ম-গ্রন্থে কি লিখছে জানেন ? In the begining there was WORD!

সদানন্দ। বাঙ্গালীর মুখ তাতে খুব দড়! বিশেষ খালি পেটের জাত কি না, Empty vessel sounds much!

অনাথ। সেটী বলবেন না! ভবতোষ বাবুর আড্ডায় আরো substantial জিনিসের আকর্ষণ আছে-Behind the veil থেকে ভবতোষ বাবুর গৃহিণী আমা-দের জন্যে — — চা, লুচি, কচুরী, পান মসলার যে নিত্য আয়োজন করে রাখেন তা না আস্বাদন করলে বুঝবেন না। এইটেই তো এখানকার বিশেষত্ব। এই Solid entertainment এর আকর্ষণ না থাকলে আমরা এত গুলি ক্ষুধিত প্রাণী এত গ্যাস্ তৈরি করে বাজে ব্যয় করতাম না!

সদানন্দ। Host তা হলে খুব দিল-দরিয়া—

অনাথ। খুব! তা না হলে — একটী ghost ও এখানের ছায়া মাড়াতেন না সদানন্দ বাবু!

সদানন্দ। ভবতোষ বাবুর পসার কেমন?

অনাথ। আদালতে dubious তবে বন্ধুমহলে prodigious!

(প্রকাণ্ড একটা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ওড্রদেশ বাসী ভগীরথ বেহারার প্রবেশ)

অনাথ। তোর বাবু কি করছেরে?

ভগীরথ। বাবু হাতোপ ধুই কিড়ি কাপড়ো ছড়িছে।

(কলিকা ঠিক করিয়া বসাইয়া নলটা অনাথ বাবুর হাতে দিয়া ভগীরথ বাহিরে গেল)

সদানন্দ। ভবতোষ বাবুর তা হলে খরচ হয় দিব্বি—

অনাথ। লক্ষ্মীর কৃপায় ভাণ্ডারটীও ভর্ত্তি—ভবতোষের তো এ একরকম সখের practice

সদানন্দ। কি রকম?

অনাথ। এর বাপ পাটের দালালি করে বিস্তর টাকা রোজগার করেন, সেই টাকাকে সুদে খাটিয়ে দিয়ে একটী সম্পত্তি করে গেছেন যাতে করে এখন দশ পুরুষ পায়ে পা দিয়ে ভুঁড়ি বাগিয়ে দিব্বি ভোগ করতে পারে—

সদা। ব্যবসা কারবার কি বন্ধ করেছেন?

অনাথ। অনেক দিন। পিতৃশ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। ভবতোষের এখন (কাণে কাণে) ambition হচ্চে জাতে ওঠা বা gentleman দলে ভর্ত্তি হওয়া;—এই ওকালতিটা তার অছিলা মাত্র। Bar এ এসে ঢুকতে পারলে একেবারে দেশের cultured elite এর মধ্যেই ঢোকা হল নয় কি? এই জন্যেই এই গাড়ী ঘোঁড়া, লোকলস্কর, মুহুরী সরকার, আর এত বড় ভাড়া বাড়ী— তা না হলে আজ ভবতোষ ভায়াকে পৈতৃক ধর্ম্ম বজায় রাখতে গেলে বড়বাজারের পোস্তার গদিতে দালাল মুটের সঙ্গে দিন সার করতে হতো—সে যাক্ আসছেন তো?

সদানন্দ। দেখি—

অনাথ। ওর আর দেখা দেখি কি? company না হলে সময় কাটাবেন কি করে? কোথায় পড়েছিলেন সুন্দরবনের খাড়ীর ধারে— no wine no woman— এটা metaphor ভাবেই নেবেন, তার মানে ফূর্ত্তি company এই আরকি?

সদানন্দ। তা আর বলবেন না; এই তিনটে বছর যেন penal servitude হয়েছিল! একেবারে Hell মশাই!

অনাথ। আর এখানে মহম্মদীয় heaven!

সদানন্দ। সে সব চলে নাকি?

অনাথ। মহাভারত! তাই কি আর! বলিছিতো ডেপুটী বাবু রূপক metaphor! we are a jolly lot এখানে লালপানি ওই লিপটন-নন্দিনী চা! আর woman এর মধ্যে এই—নল-বাহিনী ধূমাবতী! সবই 'কথায় ও কাহিনীতে'!—এসব বিষয়ে আমরা মশাই বস্তুতান্ত্রিক আদৌ নই - ঠিক্ জানবেন—

সদানন্দ। আচ্ছা এখন আসি—

অনাথ। সে কি? ভবতোষ বাবুর সঙ্গে আলাপটা করে যান—ভদ্রলোক শুনলে দুঃখ করবে?

সদানন্দ। (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) excuse me— it is too late—আমার engagement আছে—

অনাথ। এর চেয়ে engaging? (হাস্য)

সদানন্দ। কাল আসবো মাপ করুন—

অনাথ। বলবার কিছুনেই কেননা ধরে বেঁধে পিরীত হয় না কবিই বলেছেন—

সদানন্দ। (হাস্য করিয়া) না না ধরতে বাঁধতে হবেনা—আপনিই ধরা দোবো—বিমলকেও নিয়ে আসবো—Sub Registrar বাবু—

অনাথ। but one in hand is worth two in the bush;—

সদানন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ—well said—না নিশ্চয়ই আসবো—নমস্কার—Good night—

অনাথ। good night! আসবেন কাল; men live by hope—

সদানন্দ। নিশ্চয়ই I leave an apology to ভবতোষ বাবু—good by (প্রস্থান)

(নিত্যানন্দ খুড়োর প্রবেশ—নিত্যানন্দ বা নিতাই পাকড়াশী ভবতোষের সগ্রাম নিবাসী প্রতিবেশী ইহার ছেলে রাই চরণ ভবতোষের মুহুরী—)

অনাথ। খুড়ো যে—এত দেরী ?

নিতাই। (চোখের চশমা জোড়াটী খুলিয়া ছেঁড়া কাগজের খাপে পুরিতে পুরিতে) হাঁ বাবাজী—একটু সবিশেষ কাজে বাজারের দিকে গন্তব্য করিছিলুম—

অনাথ। কি মন্তব্যে—খুড়ো ?

নিতাই। খোরাক ফুরিয়েছিল বাবাজী জানইতো বহুদিনমান্ যাবৎ বাতগ্রস্ত হওয়াতে আপিম ধরিছি তাই আনতে যাওয়া হয়েছিল—ঔষধার্থং সুরা সেবন—রোগের জন্তই এই সব অভ্যাস্ততা করা গেছে নচেৎ বাবাজী তা না হলে এই অপদার্থ কি লোকে সেবন করে ?—

অনাথ। তাতো বটেই তাতে দোষ কি ? কতটা করে খান্ ?

নিতাই। ও অসামান্য ! অকিঞ্চিৎকর বেশী খেলে ধাক্কা সামলাবো কি করে ? এতে আবার ঘৃত দুগ্ধ দরকার হয় কি না—তা বাবাজী এইতো অসামান্য অবস্থা জুটবে কি করে—

অনাথ। কেন খুড়ো অমন ভাইপোর আশ্রয়ে—

নিতাই। হাঁ তার আর অবাচ্য কি বাবাজী। মহৎ আশ্রয়ে আছি ! তবে কি না বার্দ্ধক্য বয়সে সপুত্র সঙ্গে ওঁর ঘাড়ে তোমার গিয়ে—বুঝইতো বাবাজী—

অনাথ। ওটা কি কাগজ খুড়ো ?

নিতাই। হাঁ এটা হচ্ছেন দৈনিক হিতদর্পন—

অনাথ। কি খপর দিচ্ছে—

নিতাই। খপরের জন্তই নীলু পোদ্দারের দোকান থেকে নিয়ে এলুম। শুনছি না কি নোয়াখালি জেলার হাঁলমারী গাঁয়ে এক মুসলমান কোরবানী উপলক্ষে গো হত্যা করতে গিয়ে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে—

অনাথ। কি রকম ?

নিতাই। মুসলমানটা ছুরী তুলে গরুর গলায় বসাতে গেছে এমন সময় মা ভগবতী নাকি মনুষ্য-স্বরে তাকে মিনতি করে বক্তব্য করেন 'আমাকে মেরনা মারলে সবংশ নিধন হবে'—মুসলমান নাকি ভয়ে ছুরি ফেলে ভগবতীর পায়ের ধুলো নিয়ে পালিয়ে যায় ! আশ্চর্য্য বটে বাবাজী কি বলেন ?

অনাথ। অনাশ্চর্য্য নয় ! দেবতার কীর্ত্তি !

নিতাই। বলতো বাবা ! তুমিতো ইংরাজিতে পাশ দিয়েছ ! নীলু পোদ্দার, হরেকৃষ্ণ মোক্তার, যোগীন দারগা এরা বলে গাঁজা-খুরী ? দেব মহিমেতে অসম্ভবতা কিসে ?

অনাথ। কিছু না ওরা সব নাস্তিক যে—

নিতাই। বলতো বাবা ! আমিও তো তাই বলি ছাপার কাগজে মিথ্যা লেখবে ? আর মুসলমানটী হিন্দুর গরুর এই দেবত্ব সপ্রচার করবে কেন ? তার গরজ কি ? বরং তার স্বজাতিরা সব তাকে হাস্যপদ করবে তো ? তবু সে কেন এ কথা নিজস্ব মুখে প্রচার করবে ?

অনাথ। লোকে এই সোজা অকাট্য যুক্তিটা ভেবে দেখেনা—

নিতাই। সবিশেষ তা হলে পড়ে শুনাই একটু মনোযোগ কর—(বলিয়া নিতাই চশমাটী আবার চোখে আঁটীয়া কাগজটী ফরাশে মেলিতে যাইবে এমন সময় হারাণ বাবু, রজনী মাষ্টার, দীনেশ বাবু প্রভৃতির প্রবেশ। অন্ম দিক দিয়া জগা খানসামার ট্রে পূর্ণ চায়ের বাটী লইয়া প্রবেশ, ফরাশের মাঝখানে রাখিয়া প্রস্থান।—সকলে এক এক বাটী লইলেন)

হারাণ বাবু। (জানালার ভিতর দিয়া আকাশ দেখিয়া) না:—বেশীক্ষণ নয় মাষ্টার, যে রকম ঘোর করে এসেছে তাতে দেখছি—

অ। তাতে কি ? ভয়টা কিসের ?

হা। বেরাল-ভিজে করে দেবে—

অ। অত ভাবনা কেন ? এখানে কি মাঠে এসে পড়েছ যে ভিজে যাবে ?

হা। যেরকম জলধরের ঘন ঘোর ঘটা—তাতে অকাল বর্ষণ।

অ। তাইতো চাই হে ! কবি বলেছেন "এমন দিনে তারে বলা যায়—এমন ঘন ঘোর বরিষায়—"

(ভবতোষের প্রবেশ)

ভ। (হাসিয়া) কাকে কি বলা যায় হে এমন দিনে ?

অ। এই বাড়ীওয়ালার গিন্নিকে খিচুড়ী বা পোলাও নিদেনপক্ষে তেললংকা মাখা চাল কড়াই ভাজা—

(সকলের হাস্য)

র। a good proposal, I second—

দী। ' আই থার্ড ইট্—

ভ। ঠিক বলেছ! ব্যবস্থা করা যাক্—কি বল? (উচ্চৈঃস্বরে) ভগা, ভগা—

(নেপথ্যে—'আজ্ঞে যাই')

অ। না হে না তুমি ব্যস্ত হলে যে I am not at all serious—

ব ও দী। কিন্তু আমরা খুব serious—

হা। পেটে খিদে মুখে লাজ—কেন দাদা—

অ। না না অকারণ ভদ্র মহিলাকে এই সান্ধ্যবর্ষায় কেন উদ্ব্যস্ত করা?

দী। অকারণ কিসে? পুরুষ ভ্রাতাদের সেবা করা ত নারী ভগ্নিদের একটা সামাজিক ধর্ম্ম?

অ। নাও হে ভবতোষ তোমার স্বয়ম্ভূত বড় কুটুমের ভগ্নী-ভক্তির পুরস্কার দাও—

(হোঃ হোঃ করিয়া সকলের হাস্য)

(দূরে বসিয়া নিতাই খুড়ো কাগজ পড়িতে পড়িতে আপন মনে—হায় হায় মানুষ আর বাঁচেনা পাপের বাজ্যে—)

হা। কি হলো খুড়ো? কে বাঁচেনা?—

নিতা। (উচ্চৈঃস্বরে প'ড়তে পড়িতে) শোনো বাবাজীরা "অনাহারে আত্মহত্যা—গত—আগষ্টের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ হাবড়া জিলার মাতলী শাকতাইল গ্রামের অধর দলুই ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা দ্বারা সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনার শেষ করিয়াছে"—শুনলে বাবাজী? মা লক্ষ্মীর আসন বাংলা দেশে—সে দেশে না খেতে পেয়ে মানুষ গলায় দড়ি দিচ্ছে!

(সকলে গম্ভীর হইলেন)

হারাণ। বাস্তবিকই কী ভীষণ অবস্থাই দেশের! গরীব চাষা ভূষোরা শেয়াল কুকুরের মত মরছে—

নি। তার আর ভুল নেই বাবাজী—

র। (চা নিঃশেষ করিয়া বাটী রাখিয়া) a bold peasantry is the country's pride—

অনাথ। (ধুম ছাড়িতে ছাড়িতে) and the Bar's pillar!

নি। বাঁঙ্গলাটা কি হল অনাথ বাবু?—

অ। (স্বগতঃ) মুস্কিল বটে—(রজনীকে ডাকিয়া) ওহে মাষ্টার তর্জ্জমা করা তো তোমাদের ব্যবসা—এটার বাংলা করে দাও তো—

র। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) একটী সাহসী কৃষক সম্প্রদায় হয় দেশের অহংকার স্বরূপ!—

অ। (হাসিয়া) এবং—ওকালতির স্তম্ভ!

(সকলের হাস্য—রজনী অপ্রস্তুত,—নিতাই confused)

হা। চমৎকার। মাষ্টার তুমি বুঝি ভূতোদের তর্জ্জমা শিখাও?

র। হ্যাঁ ভূতনাথ আপনার ছেলে? ওযে বেশ তর্জ্জমা শিখেছে।

হা। চমৎকার হাইকোর্টের Translatory চাকরী ওর যাবে কে?

দী। (হাসিয়া) কি রকম?

হা। সেদিন ওর খাতায় দেখি তর্জ্জমা করেছে "এক গাধা এক ধোবার বাড়ীতে চাকুরী করিত!"

অ। ঠিকই লিখেছে যদি ধোবার বাড়ী বলতে এঁদের "মথুর বাবুর ইস্কুল হয়"—সে যা'ক্ বুঝলে খুড়ো। কৃষক সম্প্রদায় হচ্ছে দেশের অহংকার স্বরূপ—

নি। না বাবাজী তা বলতে পারিনা—ওদের আছে কি যে অহংকার কর্বে? সম্বচ্ছর রোগে ভুগে কর্জ্জ করে কোনো মতে টিকে আছে—

অ। তাইতো আমরাও কোনো মতে টীকে আছি—Bar এ উকীলদের অনাহার যখন, তখন বুঝবে দেশের অবস্থায় ভাঁটা পড়েছে—এমন কৃষিমাতৃক ব্যবসা কি আর আছে।

হা। আনমাগীর আন-চিন্তে আর দো মাগীর—কিসের চিন্তে—" কথাই আছে না?

ভ। (উত্তেজিতভাবে) বাস্তবিকই হারাণ বাবু দেশের চাষা ভূষোরা না বাঁচলে আর রক্ষা নাই। আমার মনে হয় এখন রাজ্য শাসনের খেয়াল ছেড়ে দিয়ে দেশের, ধন ধান্য বাড়াবার ব্যবস্থায় মন দিলে ভাল হয়।

অ। হাঁ হে ভাল কথা! তাজহাটের সেই ব্যাপারটার কি হলো?

ভব। কোন ব্যাপারটার কথা বলছ?

অনাথ। উত্তম! খপরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়না কি শুধু? তাজহাটের সেই জমীদার-কীর্ত্তি—

ভব। কি হে হারাণ বাবু?

হারাণ। গত বেস্পতিবার Pabnar Magistrate টুরে বেরিয়ে তাজহাট গ্রামে উপস্থিত হন, ওখানকার লোকরা কমিশনারের কাছে একটা representation করে এই বলে যে মোরাদাবাজারের খালটা ঝালিয়ে না দিলে পাশাপাশি ক'খানা গ্রাম ম্যালেরিয়াতে মরে যায়—এখন খালটা হচ্চে ওখানকার জমিদারের জমিদারির অন্তর্গত। এখন জমিদার পুঙ্গব পাছে তাঁর ঘাড়ে খরচ চাপে এই জন্যে Magistrate কে বোধ হয় খুব একটা বড় মত Dinner টিনার দেয়; Magistrate বলেছেন ও খালের সঙ্গে Health এর কোন সম্বন্ধ নাই! শুনলেন মশাই?

ভবতোষ। এই জমীদার গুলিই হয়েছে আরো ভীষণ পদার্থ, Beg your pardon দীনেশ you are an honourable exception—তুমি একটি আদর্শ জমিদার অবশ্য—হাস্য।

দীনেশ। খোসামুদী হচ্চে বুঝি? (হাসিয়া) a past master in flattery—

রজনী মাষ্টার। না praise undeserved is slander in disguise.

দীনেশ। জমীদাররা ভীষণ জীব কিসে ভায়া?

ভবতোষ। কিসে নয়? এই যে পাড়াগাঁগুল উৎসন্ন যেতে বসেছে এর জন্যে বারোআনা দায়ী তোমরা নয় কি?

দীনেশ। কিসে সেইটে বুঝিয়ে দাও—(সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া)

অনাথ। দেখি মশাই একটা, ওকি Three castle? (দীনেশ একটা ছুড়িয়া দিল)

ভব। তা ছাড়া উনি কি বাজে Staff smoke করেন?

হারাণ। আর এই peasantryর কল্যাণে।

দীনেশ। কিসে বুঝিয়ে দাও হে? তোমরা তো দেখছি এবার জমীদারের পেছনে লাগ্‌লে—

হারাণ। লেগে আর করবো কি দাদা; তোমাদের হল government guarded back!

নিতাই খুড়ো। এর বাঙ্গলাটা কি বাবাজী?

রজনী। সরকার পোষিত পশ্চাৎ (সকলের হাস্য)

অনাথ। (ভবতোষের কাণে কাণে) এর খাঁটী বাঙ্গলা কল্লে ৫ আইনে দাঁড়াবে—(হাস্য)

রজনী। The breath of a King—

দীনেশ। আমরা না থাক্‌লে তোমাদের মত উকীলদের পেট্ ভরাতো কে? শুধু কি আর peasantryতে পারতো?

অনাথ। well said! peasantry কাদের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে আমাদের কাছে আসে?

রজনী। Out of the frying pan into the fire!

দীনেশ। সে যাক এখন বুঝিয়ে দাও কিসে আমরা বারআনা দায়ী—

ভবতোষ। তোমরা দায়ী এই জন্যে যে তোমরা বিলাসিতার লোভে পড়ে পল্লীগ্রাম ছেড়ে সহরে এসে বাস করতে আরম্ভ করেছো। তোমরাই আসলে গ্রামের রক্ষাকর্ত্তা, তোমাদের আশ্রয় থেকেই পল্লীগ্রাম শাসনে ও সুবন্দোবস্তে থাকবে, যা কিছু অভাব অভিযোগ তোমাদেরই কাছে হবে তা না হয়ে তোমরাই সব পল্লীগ্রাম ছেড়ে দিয়ে সহরবাসী হলে! সেকালে জমীদাররাই ছিল গ্রামের আসল রাজা; এখন কি তাই? মাথা না থাকলে যেমন দেহ রক্ষা হয় না তেমনি জমীদার দেশছাড়া হলে আর প্রজার দুর্দ্দশা হবে না? তোমরা এখন virtually আমাদেরই মত British রাজের ধনী প্রজা মাত্র। তোমাদেরও যে শ'দুই বা দেড়শ বছর আগে একটা আস্ত রাজধর্ম্ম ছিল তা তোমরা ভুলে গেছ—

নিতাই খুড়ো। এটা একটা কথা বটে বাবা। প্রকৃতই তাই বাবাজী—

অনাথ প্রভৃতি। Hear, Hear

ভবতোষ। (উহাদের দিকে তাকাইয়া) না ঠাট্টা নয়। আচ্ছা ছিল কিনা বলতো হে রজনী মাষ্টার তুমি তো হিষ্ট্রি পড়াও—

রজনী। (সোৎসাহে)। ছিল বৈ কি লেথব্রীজ মার্শম্যান, এ, মুখার্জ্জি প্রভৃতি সমস্ত বড় বড় হিষ্টোরিয়ানরা একবাক্যে তাই লিখেছেন—মার্শম্যান বলেন—The condition to—

অনাথ। (বিরক্ত হইয়া) থাক্ থাক্ ঐ হবে; কোটেশন আর দরকার নাই—

(রজনী বাধা পাইয়া থামিলেন)

ভব। শুনলে দীনেশ বাবু?

দীনেশ। শুনলুম্ বৈকি array of evidence formidable! তা বেশ! আমরা তো সব দোষী, আর তোমরা বুঝি কোনো দোষেই দোষী নও? তোমরা middle-class যে ঘরবাড়ী তুলে দিয়ে একেবারে—সহরবাসী হয়েছ তার কি? তোমাদের একটা ডিউটী নাই?

অনাথ। একেই বলে কিস্তি দিয়ে কিস্তি সামলানো!

(হাস্য)

ভব। নিশ্চয়ই—আমরা কি আর বলছি—আমাদের কোন দোষ নাই? তবে you are a greater sinner than us! কেননা গামের welfare এর সঙ্গে তোমরা বেশী closely connected

নিতাই। (উৎসুকভাবে মাষ্টারকে) এর বাঙ্গলাটা কি বাবাজী?

রজনী। (চুপি চুপি) ওদের মঙ্গলের সঙ্গে তোমরা বেশী কাছাকাছি ভাবে বদ্ধ।—

অনাথ। রক্ষা কর মাষ্টার আর মাতৃশ্রাদ্ধ করনা—
(সকলের হাস্য)

নিতাই। কারা বুঝলুম না—বদ্ধ কিসে?

রজনী। (চুপে চুপে) এই জমীদার ও কৃষকেরা—

নিতাই। হুঁঃ এ আবার কথা! থাকোনাতো বাবাজী পাড়াগাঁয়ে, জমীদাররা থাকেন এক মুলুকে প্রজারা থাকে কোথা মাঠের ধারে বনে জঙ্গলে পুকুরপাড়ে। কাছা কাছি বদ্ধ কোথা? (সকলের মৃদু হাস্য)

অনাথ। আমার মনে হয় সকলেই সমান ভাবে equally connected.

নিতাই। কি হলো ওটা?

রজনী। (চুপে চুপে) সমান ভাবে সংযুক্ত—

নিতাই। ধেৎ তোর সমান ভাবে! হ্যাঁগা বাবাজীরা আপনারা বুঝি গাঁয়ে কখনো যাননি?

ভবতোষ।—কতকটা তাই বটে।

অনাথ। কতকটা নয় সম্পূর্ণ মাত্রায়। নয় কি?

ভব। নয়ই বা বলি কি করে? জমীদাররা টাকা দিয়ে আর আমরা আইডিয়া দিয়ে সমান উপকারই করতে পারি।

নিতাই। কি দিয়ে মাষ্টার মশাই?

রজনী। ভাব দিয়ে

নিতাই। সে কি জিনিস্ বাবাজী?

রজনী। এই ভাল ভাল idea আর কি!

নিতাই। ভাত বুঝ বাবা ভাব বুঝিনে।

(সকলের মহা হাস্য)

ভব। চাকরি বা ব্যবসার খাতিরে আমরা পাড়াগাঁ ছেড়ে সহরে বাস করেছি বটে কিন্তু বছরে একবারও কেউ কখনো দেশে যাইনি—যদি কেউ যাইতো হয় Health এর ওজরে না হয় অন্য কিছু একটার ওজরে দু'চার দিন পরেই পালিয়ে আসি

হারাণ। কি করি দাদা যে ম্যালেরিয়ার ঠেলা তা ছাড়া ম্যালেরিয়াকে যদিও পার আছে দলাদলির জ্বালায় দু'দিন তিষ্ঠাবার জো নাই—কি বল নিতাই খুড়ো?

নিতাই। তা বটে বাবাজী না বলবার জো নাই তা বাবা তোমরা গিয়ে বাস কল্লে, লোকের সঙ্গে মিললে মিশলে আর ও সব থাকে কি?

ভব। খুবই ঠিক; কাজ কর্ম্ম না থাকলেই নিষ্কর্ম্মাদের দলাদলি ছাড়া আর উপায় কি?

রজনী। An Idle brain is the Devils workshop

নিতাই। ওটার মানে কি বাবাজী?

রজনী। (অনাথের দিকে আড চোখে দেখিয়া চুপি চুপি) অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—

নিতাই। বাবাজীর বাঙ্গলাটি ইংরাজির চেয়ে যে কঠিন দেখছি—

(সকলের হাস্য)

রজনী। (একটু অপ্রস্তুত হইল) ইংরাজির ঠিক বাংলা হয় কি?

হারাণ। সত্যি বটে! হবে কি করে? এই দেখ না ইংরাজি 'A' এর বাংলা হল 'ক'!

(সকলের হাস্য)

দীনেশ। ছেলেরা কি ঐ রকম তর্জ্জমা শেখে নাকি হে মাষ্টার?

ভবতোষ। আসল কথা—পল্লীগ্রামের সংস্কার বুঝলে ভায়া—সহরে থেকে leisure অনুসারে খপরের কাগজে উচ্ছ্বাস লিখে আর সভায় বক্তৃতা করে হবে না—গরীব চাষা ভুষোরা আর এখন স্তোকবাক্যে ভুলবে না তাদের সুখ দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি চাই এ সহানুভূতি সহজে হয় না। ছুটী ছাটাতে গিয়ে মধ্যে-মিশেলে পিঠে হাত থাবড়া দিয়ে এলে তারা ভুলবেনা—কথায় আর চিড়ে ভিজবেনা—তাদের সঙ্গে রীতিমত মিশতে হবে—তারা যে সব কষ্ট ভোগ করে তাদের সঙ্গে এক গাঁয়ে থেকে সেই সব কষ্ট ভোগ করতে হবে—তবে তাদের দুঃখে ঠিক দুঃখ করা চলবে—তাদের সাদাসিধে সরল সুখসাধে প্রাণ দিয়ে মিশতে হবে তবে তারা বুঝবে যে শিক্ষিত বা ধনী সম্প্রদায় সত্যই তাদের হিতাকাঙ্খী তা না হলে দাদা ছুটাটী হবে অমনি নিজের বা ওয়াইফের হেল্‌থের ওজুড়ে দেওঘর দাৰ্জ্জিলিং চলে যাবে দেশের দিকে মুখও ফেরাবে না—দেশের একটা ভাল কাজ কর্ম্মে শুভ অনুষ্ঠানে চাঁদা দিতে হলে তখন হাণ্টান পড়ে, এ সব কি আন্তরিক পল্লী সেবার লক্ষণ? শুধু Fashion, শুধু হুজুক, নামকা ওয়াস্তে সব। কই একটা দেশ-হিতৈষী তো দেখিনি যে সত্যি পল্লীগ্রামে বাস করে চাষা ভুষোদের সঙ্গে সুখ দুঃখ সমান করে তাদের মন পেতে চেষ্টা করেছে বা তাদের ভাল করাবার ইচ্ছে করেছে।

হারাণ। Hear Hear!

ভব। না ঠিক কি না বল?

অনাথ। I quite agree with you—

ভব। (উৎসাহিত হইয়া) বাস্তবিকই—এই সব চেঁচামেচি, লেখা লেখির মধ্যে Hollowness দেখে অবাক হয়ে যাই disgust এসে পড়ে! সেদিন Local village Improvement meetingএ মোহিত ঘোষাল—পল্লী-সংস্কারের এক লম্বা scheme করে ফেল্লেন, এই করতে হবে, ওই করতে হবে, হ্যান ত্যান সে কাণ্ডটা কি? অথচ ওই মোহিত ঘোষাল জন্মে পাড়াগাঁ দেখেনি; জমীদারী দেখতে যেতে হলে—রোগা ভাই ব্যাচারাকে পাঠিয়ে দেয়, নিজে একবারও মাটী মাড়ায়না!

অনাথ। কেন?

ভব। village না কি Hellish! এটা confidential utterance তাঁর—মনে থাকে যেন (হাস্য)

হারাণ। তা ঠিক মনের কথাই বলেছে—

ভব। বলুক না, কে তাকে বারণ করছে? মুখে ওরকম বাহাদুরী করা কেন? যে লোকের ধারণা Village life hellish সে পল্লী সংস্কারক বলে বড়াই করে কেন?

হারাণ। ওই রকম সব হে ভায়া! সব শেয়ালের এক রা।

ভব। না ভাই আমি তা বুঝিনি।

অনাথ। ওহে তোমার জগাইকে বল আর একটা কল্কে আনে -

নিতাই। ওরে জগা, বাবুদের আর একটা কল্কে দিয়ে যা—তা অনাথ বাবু ভব বাবাজী যা বল্লেন তা ঠিক। বড় লোকরা আর লেখাপড়া শেখা বাবুরা আর দেশের দিকে তাকায়ওনা—পড়ে থাকতে আমাদের মত মুখ্যু অন্ন বস্ত্রহীনরা আর গরীব চাষা ভুষোরাই পড়ে আছে এদের দিয়ে বাবাজী পাড়া গাঁয়ের কি হবে বল?

ভব। আমাদের এখন দরকার সে কালের মত সব দেশে গিয়ে বাস করা—বিদেশ শুধু চাকরীস্থলই থাকবে তারপর সমস্ত পল্লীতেই গাঁয়ের সমস্ত শিক্ষিত ধনী লোক যদি বছরে অন্ততঃ দু চার বার এক সঙ্গে মিলে মিশে কিসে দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম বজায় থাকে তার চেষ্টা করা উচিৎ। এই যে অসহায় গরীব অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী এরা কাদের মুখের দিকে তাকায়? কাদের কাছে অভাব অভিযোগ জানাবে? বিপদে আপদে কাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে? কতকগুলো বানর মিলে একটা দুস্তর সাগর শুধু মাটী পাথর দিয়ে বেঁধেছিল আর কতকগুলি মানুষ একটা ছোট গ্রামকে মানুষের মত করতে পারেনা?

দীনেশ। বলেতো ভায়া অনেকে, পথ দেখায় কে?

ভব। ঐটে মস্ত ভুল দীনেশ বাবু? পথ দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলে পথ আর দেখা ঘটবেনা নিজেকেই বেরিয়ে পড়তে হবে নিজেকেই দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে—

অনাথ। তা ঠিক all is very finely said।

হারাণ। what a fine organ this tongue is।

নিতাই। কি হল বাবা? অর্থটা কি?

রজনী। জিহ্বা কি সুন্দর যন্ত্র। (সকলের হাস্য)

(বাহিরে লোকের আগমন পদশব্দ শুনিয়া সকলে নীরব হইয়া, সেই দিকে তাকাইলেন — দেখিতে দেখিতে দুই জন গ্রাম্য ভদ্রলোক ও একজন কৃষকজাতীয় লোক প্রবেশ করিল)

অ। ওঠা যাক হে রাত হয়েছে অনেক

হা। হ্যাঁ আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে চল মাষ্টার—

অ। দীনেশ বাবুর গাড়ী এসেছে নাকি?

দী। হ্যাঁ চলুন না নামিয়ে দিয়ে যাব—

(সকলে উঠিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল)

ভবতোষ আগাইয়া দিতে গেলেন—

নি। খুড়ো কিসে বল হে? দেশ থেকে নাকি? ইনি কে?

ব। ইনি আমাদের গ্রামের স্কুলের নূতন হেডমাষ্টার রামাচরণ বাবু—

নি। ও ভাল ভাল! অনেক দিন গ্রাম ছাড়া খপর তো জানি নি বাবা দা—দেশের খপর কি?

ব। খপর যেমন বরাবর নতুন কি? হ্যাঁ নতুনের মধ্যে আছে বৌক—কুমার পাড়ায় আগুন লেগে ১০।১২ ঘর কুমোর গ্রাম ছাড়া হয়ে পালিয়েছে—

হে মা। বারোয়ারীর কীর্ত্তিটা বলুন?—

ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাটুজ্যে বাড়ীতে বারোয়ারী উপলক্ষ্যে কল্‌কাতা হতে নাকি বাই আসছে; এদিকে চাঁদার আদায় অভাবে স্কুল চলা বন্ধ হতে চলেছে—সেক্রেটারী বাবু মাষ্টারদের মাইনে দিতেই চান্‌না—অথচ বারোয়ারীতে চাঁদা দিয়েছেন ১৫০৲ টাকা।

হে। তার ওপর দলাদলি! সেটাও বল্‌বেন

নি। কাদের সঙ্গে?

ব। চাটুজ্যে বাঁড়ুযোদের মধ্যে—চাটুজ্যেরা একদল হয়ে স্কুল হতে ছেলে ছাড়িয়ে নিয়ে আর একটা স্কুল খুলতে যায়—

(ভবতোষের পুনঃ প্রবেশ)

ভ। কারা স্কুল বল্‌ছ হে?

ব। চাটুজ্যেরা—

ভ। একটাই চল্‌ছে না— আবার একটা।

ব। বুঝুন ব্যাপার।

ভ। দেশের অবস্থাদের উৎসাহ energy দেখছি অকাজে খুব চেগে ওঠে। গড়বার শক্তি নেই, ভাঙ্গতে মজবুত। সে যাক এখন কি মনে করে শুনি?

ব। আপনাকে এই বড় দিনের ছুটীতে একবার দেশে যেতে হবে, মাতব্বর বলে আপনারা, আপনি থেকে এর একটা মীমাংসা করে দিতে হবে—

ভব। এবেই গোল মুস্কিলে ফেল্‌লে। আমি যে এবার কংগ্রেসে যাচ্ছি হে, থাকতে তো পারবোনা—

হেড্। এতো একটা দেশের কাজ, আর ধরতে গেলে আসল কাজ একটা—

ভব। আশ্চর্য্য বুঝি তবে তার মধ্যেও বড় ছোট তো একটা আছে—

হেড্। গ্রাম নিয়ে তো দেশ! আপনারা যদি গ্রামের দিকে নজর না করেন, তা হলে দেশের মঙ্গল কি করে হবে?—খুঁটী না তুললে মাচা বা আটচালা দাঁড়াবে কি করে?

ভব। সে যাক্—আর কিছু না এই শুধু—

বং। আরো আছে আপনার কাছে ৫ মাসের চাঁদা বাকী পাওনা আছে ওটা মিটিয়ে দিতে হবে যে? আজ ৩ মাস হতে স্কুলের মাষ্টারেরা মাইনে পান্‌নি—আর তো ফেলে রাখতে পারা যায় না কতদিন আর কথায় ভুলিয়ে রাখা যাবে—

হেড্। একেইতো অল্প মাইনের চাকরী—ব্যাচারীরা ঘর সংসার চালায় কি করে?

ভব (গম্ভীরভাবে) ভারি হাঙ্গামে ফেল্‌লে যে হে এ মাসে তো পারবই না— Allahabad এ কংগ্রেসে যাবার খরচও তো কম নয়—তা ছাড়া কমাস যাবৎ একটী পয়সা রোজগার নাই, মাহাল হইতেও কিছু আসে নি—আগামী মাসে কিছু দিতে চেষ্টা করবো—

ব। আপনি একথা বল্‌লে অপরে তো দেবেই না

এই চাঁদাতেই তো বেশী নির্ভর স্কুলের। প্রায় ১৫০৲ টাকা বাকী আদায় পড়ে আছে। নেহাৎ অচল বলেই এসেছি।

ভব। একেবারে অসম্ভব বন্ধু—আস্‌ছে মাসে দেখা যাবে—

বন্ধু। অগত্যা। সে যেন হল, একবার যেতে পারলে—

ভব। কংগ্রেস্‌ হতে ফিরে আসি—তার পর এক শনিবার যাওয়া যাবে—রাত্রিতে থাকুবে তো?

বন্ধু। না আমার ভাগিন জামাইএর বাড়ী উঠিছি (চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে) অন্ততঃ দুমাসের টাকাটা পেলেও—

ভব। Believe me এক ফার্দিংও নাইহে—দেনা করে কংগ্রেসের খরচা যোগাড় করতে হবে—really এখানে থেকে খাওয়া দাওয়া করলে হতো না?

বন্ধু। নাঃ একজায়গায় উঠি'ছ, তারা যোগাড় যন্ত্র করেছে যখন—উঠি তা হলে চলুন মাষ্টার মশাই—

হেড। হ্যাঁ চলুন—আসি, নমস্কার

ভব। নমস্কার (বন্ধু ও মাষ্টারের প্রস্থান)

ভব। (কৃষককে সম্বোধন করিয়া) তার পর নবদ্বীপ তোমার কি খপর?

নব। খপর আর কি বাবু! গরীবের মরা বাঁচা দুই-ই সমান!

ভব। হয়েছে কি?

নব। তখন কর্ত্তা ছিলেন, বিপদ আপদ হলে কর্ত্তার কাছে গিয়ে পড়লে গরীবদের একটা কুল কিনেরা হতো কর্ত্তা নেই, এখন আপনারাই আশ্রয় স্থান আর দাঁড়াই কোথায় বলুন?

ভব। বলি হয়েছে কি শুনি?

নব। বাকী খাজনার দায়ে নায়েব মশাইতো ধান আটুকেছেন এখন ছেলে পুলে নিয়ে খাই কি আর যাইই বা কোথায়—হুজুর দয়া না করলে পথে বস্‌তে হয়—

ভব। কথা ভাল! বাকী খাজনার দায় তোমারও যেমন, আমাদেরও তো তেমনি? জমীদারেরও জমীদার আছে বাবু? সরকারের খাজনা সময়ে না দিতে পারলে আমারও তো পথে বসবার পথ সোজা হয়ে আসে—

নব। দোহাই বাবু—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে দুটো ধান কম বেশী হলে কি ভাঁড়ার খালি হয়? গরীবের মা বাপ আপনারা—আমরা যাই কোথা?—এবার রেহাই না দিলে আমার উপায়ান্তর নেই—নিতান্তই যদি রেহাই না দেন এ কিস্তি মাপ করতে আজ্ঞা হয়—আমাদের ভরসা দেবতা আর জমীদার—দেবতা এবার মুখ তুলে চাইলেনা আপনারা মুখ তুলে না চাইলে চাষা ভূষো বাঁচে কি করে?—

ভব। হাজা শুখো, অজন্মা এ-ওজর তো লেগেই আছে তোদের—না, আমি কিছু করতে পারবো না—

নব। (জোড়হাত করিয়া) করতেই হবে কর্ত্তা—এবার আমার বড় বিপদ—বড় ছেলেটা ম্যালেরিয়াতে মরে গেল—ভাইটেকে গোলাবাড়ীতে সাপে কাটলো, চাষাণী তো বাবু মরণ শয্যে নিয়েছে—যমের মোচ্ছব লেগেছে বাবু! আপনি পিতিপালক অন্নদাতা আর কার কাছে দুঃখ জানাব হুজুর? বীজ ধান পর্য্যন্ত বেচ্‌লেও কিনেরা করতে পারবোনা—

ভব। কিনেরা আমরাই কি করতে পারছি? নাঃ—(নিতাইয়ের দিকে তাকাইয়া) আজ দুবছর হতে একটা পয়সা আদায় নেই খুড়ো—বাবনের সংসার চলেই বা কি করে? জমীদারী করা না গুখোরী করা।

নিতাই। তার আর কথা বাবাজী! তবে কিনা সমুদ্দুরের জলে জোয়ার ভাঁটা পড়েনা এই যা—

নব। (আশ্বস্ত হইয়া) বলুন কর্ত্তা—আপনারা তো বোঝেন?

ভব। নাহে না—অন্ততঃ অর্দ্ধেক এবার দিতেই হবে—

ভব। (বিরক্তভাবে) এখন যা,—কাল যা হয় করা যাবে—ঝন্‌ঝট্‌ কি কম! এখানে খাবি তো?

নব। আর কোথা যাব?

ভব। খুড়ো বাড়ীতে খপর দিও—ওকে কাছারী ঘরের দালানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিও।

(নিতাই নবদ্বীপকে লইয়া বাহিরে গেল)

(ধীরে ধীরে পরদা সরাইয়া সন্তর্পণে উঁকি মারিতে মারিতে গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃ। বেশ যা হোক্‌ কাণ্ড!

ভব। অপরাধ ?

গৃ। হাঁড়ী কুঁড়ী উঠে গেল, এখন আবার এত রাতে অতিথ অভ্যাগতকে যেচে খেতে বলা!

ভব। পাপ্ বটে। এখন প্রাচিত্তিরের ব্যবস্থা কি ?

গৃ। ঠাট্টা'তো খুব দেখছি ? পাপ কে বল্লে ?

ভব। matrimonial penal code অনুসারে! বঙ্কিম বাবুর উক্ত পুস্তক পড়েছ তো ? না—

গৃ। বলি পাপ কিসে হল বল্‌লাম ?

ভব। অকালে অসময়ে পত্নী-প্রভুর বিশ্রামে শান্তিভঙ্গ করা—

গৃ। খুব হয়েছে। ঠোঁটের চোট্ তো খুব—পসার হয় না কেন ?

ভব। কেননা পত্নী মাত্রেই হাকিম, কিন্তু হাকিম মাত্রেই পত্নী নয় এই সোজা কারণে—

গৃ। (হাসিয়া) ইয়াব। বলি মনে মনে এই সব মতলব আর বাইরে মিছে কথা দিয়ে ভুলোনো হচ্ছিল খুব কিন্তুন—

ভব। দুনম্বর অভিযোগ। আবার কি ? আর কোন্ ধারা অনুসারে ?

গৃ। কোন ধারা আবার, চিরকেলে ফাঁকি দেওয়ার ধারা। বাবু যাবেন কংগ্রেসে, তাই আমাকে দিদির বাড়ী বেড়াতে যেতে বলা হচ্ছে! কি চালাক্! উঃ

ভব। (কৃত্রিম ব্যাকুলভাব অবলম্বন)

গৃ। চুপ করে রইলে যে ? সত্যি কিনা ? আমার কাছে লুকানো হয়েছিল—কেন আমি যেতে দিতাম না ? নাকি ?

ভব। যেতে দিতে না নয় যেতে চাইতে সঙ্গে—

গৃ। না হয় গেলাম্। তাতে কি সর্ব্বনাশটা হতো ?

ভব। অর্থনাশ, শান্তিনাশ, বাধা, পেছটান্ ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৃ। (কোপতঃ) ও অর্থাৎ আমি এমন লক্ষীছাড়া স্ত্রী যে আমি স্বামীর অর্থনাশ করি, শান্তি নাশ করি, বাধা বিপত্তি ঘটাই! উঃ বল্লে কি করে ? আচ্ছা মানুষ তো!

ভব। বুঝলেনা ঠিক, শাস্ত্রে বলে পথে নারী বিবর্জ্জিতা!

গৃ। তাতো বটেই আমরা তো আধ পথে বিবর্জ্জিতা হয়েই আছি! আমরা রাঁধবো, ছেলে বিয়োবো, পায়ে তেল বুলোবো ঘর ঝাট দেবো বাবুরা দেশ উদ্ধার করবেন হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন, সভা করবেন, মেলা দেখবেন! বেশ বেশ! নিজের বেলায় অর্থনাশ হয় না, আমার একটু তীর্থ ধর্ম্ম করা, দেশ বেড়ানোর বেলায় অর্থ নাশ হয়! আজ তিনমাস হতে নেকলেশটার প্যাটার্ণ বদলাতে বলছি তা আর হয় না! বেশ বেশ বেশ—

ভব। নৈশ বিভ্রাটের উপক্রমণিকাটা বেশ জমছে!

গৃ। কিসের কিটা ?

ভব। না। তা হলে দিদির বাড়ী যাবে না ?

গৃ। কিছুতে না— কোথা কংগরস ?

ভব। এলাহাবাদে—

গৃ। সে কোথা ?

ভব। (চাপাস্বরে) প্রয়া—আ—গে।

গৃ। প্রয়াগ। সে তো তীর্থ স্থান—বেশ হয়েছে আমি তীর্থ করতেই যাবো। কি বল।

ভব। বড্ড খরচ! যে—

গৃ। বাবুর কংগরসে কত হবে ? শ দেড়েক ? শুনিছি ভিতর হতে—ছাপ্‌লে চলবেনা, আমার না হয় তার উপর শ খানেক—তুমি দেশ উদ্ধার কর আমিও একটু তীর্থ ধর্ম্ম করি মন্দ কি ? ইহ পরকাল দুটো দুজনে ভাগ করে নি, ভাল নয় কি ?—চুপ যে ভাবছ কি ?

ভব। রবি বাবুর সেই অমূল্য উপদেশটা—

গৃ। কি শুনি—

ভব। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে!

গৃ। রবিবাবু নারীকবি হলে লিখ্‌তেন সতীর পুণ্যে পতির গতি নহিলে বিপদ বাড়ে। ও সব বুঝিনি আমি যাবই যাব—

ভব। তোমার দিদি যে যেতে লিখেছেন ?

গৃ। ফেরবার পথে হবে—দিদিকেও লিখ্‌ছি, সেও না হয় আমাদের সঙ্গে যাবে। অমন করে তাকাচ্ছ কি ?

ভব। চল না হয় এবার গাঁয়ে যাই! ভারি সুন্দর খোলা হাওয়া, ধানের গন্ধ! দিঘীর জল!

গৃ। হটাৎ পল্লীপ্রেম জেগে উঠলো যে ? আপদ ঘাড়

থেকে এখন ফেল্‌তে পাল্লেই বাঁচ—না? উঃ কি ধড়ীবাজ—ভবি ভোলবার নয়—(হাসিয়া জিভ কাটিল)

ভব। আমার নাম কল্লে! পাপ হবে—

গৃ। সত্যিই তো! পাপ বলে পাপ্ মহাপাপ্ যার নামে নাম, যার পরিচয়ে পরিচয়—যার গরবে গরব তার নাম করা মহাপাপই বটে! প্রয়াগে মাথা মুড়োনো ছাড়া প্রাচিত্তির নেই চল প্রয়াগেই যাই!

ভব! না তুমি অতুলনীয়! চল তাই হবে।

গৃ। বাঁচলাম, খুব ভয় হয়েছিল—

ভব। কেন? কিসে?

গৃ। যে রকম পল্লীর দুঃখে প্রাণ তোমার কেঁদে উঠেছিল, চাষাদের সঙ্গে কোনাকুলির জন্যে যে রকম সবান্ধবে মেতে উঠেছিলে, ভেবেছিলাম আমায় বুঝি সারলে!

সাঁঝের বেলায় শেয়াল ডাকে
দিনের বেলায় পুকুর পাঁকে
মোটা চাল আর কচুর শাকে
সারা হবে জান্!

শুধু তাই?—রংটা কালো করে, পেটে পিলে লিভার নিয়ে ফিরে আস্‌তে হতো! না খুব বাঁচিয়েছ! ভাগ্যিস্ তোমাদের জিভের সঙ্গে হাত পা নন-কো-অপারেশন্ করেছে! তা না হলে গিইছিলাম আর কি! এস গরম গরম খিঁচুড়ী খেয়ে নরম গরম লেপের ভেতর ঢুকে পল্লী সেবার খেয়াল দেখবে।

ভব। চুপ্ কর কে শুনতে পাবে! কি লজ্জা!

(যবনিকা)

"পল্লীব্যথা"

(সমালোচনা)

পঞ্চভূত।

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্নের 'পল্লীব্যথা' দীন বঙ্গসাহিত্যকে নূতন সম্পদে ঋদ্ধ করিয়াছে। দুঃখ শোক রোগ দৈন্য প্রপীড়িত বাংলা দেশের পল্লীভূমির যত প্রকারের বেদনা আছে কবি প্রায় সবগুলিই কারুণ্যমধুর অনাড়ম্বর ভাষা ও ভাবে ছন্দিত করিয়া এই পুস্তকখানিতে গ্রথিত করিয়াছেন।

বঙ্গে কৃষক ও নিঃস্ব পল্লীবাসীগণের জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য, শোক সান্ত্বনার বার্ত্তা ও তাহাদের সংসারে গুহ্যতম রন্ধ্রেরও সংবাদ, সাবিত্রীপ্রসন্নের ন্যায় বঙ্গের আর কোনও কবি এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ঝঙ্কৃত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

দুই একজন ব্যতীত পল্লীবাসীগণের মর্ম্মবাণী এত বেশী দরদের সহিত এত বেশী আন্তরিকতার সহিত আর কোন কবি শুনাইতে পারেন নাই। এইখানেই শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্নের বিশিষ্টতা।

কবি পল্লীর নিদারুণ দৈন্যের বেদনা জানাইছেন চোখের জলে—

সারা বছর ধরে',
ঘরের ধুলো উঠ্‌ছে জমে উঠান গেল আবর্জ্জনায় ভরে,
পায়রা দু'টো কোথায় গেল উড়ে
তুলসী তলায় প্রদীপ শুধু, পুড়ে!
নেপা পোছা পিঁড়েয় ধরে' লোণা
মাঝ উঠানে পড়ছে ভেঙ্গে কোণা,
হাঁস ক'টা আজ খাচ্ছে যেন খাবি

ঝন্‌কাটে রুঁই মরচে পড়া চাবি,
চালের বাতায় ঘুণ ধরেছে—ঘুণ
ছেঁড়া বালিশ মাদুর কেটে ইঁদুরগুলো করলে চতুর্গুণ।

সরস করুণ ভঙ্গিতে পল্লীর রোগ শোকের প্রাবল্য ও সুচিকিৎসকের অভাবের কথা জানাইয়াছেন 'সমাজ সয়তানে'—

কলাবাগান পেরিয়ে গেলে পর
নোনাগাছের বনে ভরা উঠান তারই একটি পাশে
কেষ্ট মালোর ঘর,
মুখুয্যেদের অনেক দিনের প্রজা,
একটী ছেলে নাম ছিল তা'র ভজা;
বউটী তাহার তিনটী দিনের জ্বরে
গেল বছর ভাদ্রে গেছে মরে'
ঔষুধ পথ্য কেউ বা বল দিল
কাঙাল তা'রা বড্ড কাঙাল ছিল,
গাঁয়ের এমনি মজা
নাড়ী দেখার লোক পেলেনা সকল পাড়া
বেড়িয়ে এল ভজা!
গাঁয়ের ত্রিসীমানায়
ডাক্তার কিম্বা বৈদ্য খুঁজে পা'ব বলা যে সহজ একটা দায়!
'ভিজিট' দিয়ে ভিনগাঁ থেকে বটে,
ডাক্তার আনা ধনীর ভাগ্যে ঘটে,
কিন্তু যাদের উদরে নাই অন্ন
নাছোড়-বান্দা হাড়-হাবাতে দৈন্য,
তা'দের শুধু কান্নাকাটিই সার
প্রাণটা নিয়ে বেঁচে থাকাও ভার!
একটী মাত্র কাঁসার ঘটী ছিল
সাবুর পয়সা জুটল না তাই কেষ্ট সেটা বাঁধা দিয়ে দিল।

দেব-মাতৃক দেশের অনাবৃষ্টির দুর্দ্দৈব কিরূপ প্রলয়ঙ্কর তাহা 'খরানী' কবিতায় সুব্যক্ত—

এমন ধানের নধর জ্যাওলা খরানীতে গেল পুড়ে
বড় বাবু ঠিক খাজনার দায়ে বেচে নেবে ভাঙ্গা কুঁড়ে!
এক ফোটা জল দিলেনা দেবতা চাষার কপাল পোড়া,
ধানের ফলন দেখে মরে যাই, যেন গো বাঁশের 'কোঁড়া'।
কোনটীর শিরে শিষ ধরে আছে কোনটীর বুকে ধান,
সব মরে গেল বর্ষা অভাবে তবু ভাল ছিল বান!
'ফুলমুখী' হ'য়ে কোনটী শুকায়, 'দুধে ধান' কারো মাথে,
দিও দিও দেয়া একটী পশলা আজকে আধেক রাতে!
দেহ মাটী করে যে ধান বুনেছি সে ধান মরিয়া যায়,
বুকের রক্ত মুখে তুলে চাষ, চাষা মরে যাবে হায়!
দশ বিঘে ভুঁই শুধু ধান মোর বুক ফেটে যায় দেখে
রোদ্দুরে অই চিক্ চিক্ করে বায়ু ভরে থেকে থেকে;
মোটা ডাঁটা আর লকলকে শিষু 'দাপানে জ্যাওলা' মোর
ছিরি দেখে চোখ ফিরাইতে নারি এযে মুস্কিল ঘোর!
স্যাকরা বাড়ী যে দিয়েছি বায়না পাতানার সাতনলী
ধান বিনে মান রবে না আমার একথা সত্য বলি।
আমরা নাঙলা-চাষা তাই ওগো তোমারে খিইয়ে থাকি
এ ধান খরিয়ে যদি মরে যায় কি আর রইবে বাকী।
দুলুরে বলেছি 'বুলুদেয়া সাড়ী' আশ্বিনে দেব কিনে
মরুক সে সব,—কেমনে পরাণ বাঁচিবে অন্ন বিনে!
মোরা নির্ব্বোধ চাষা তাই বুঝি দেবতা বিমুখ রবে
দেবতা মানুষে এত অবিচার, কেমনে কাঙাল সবে?

অতিবৃষ্টি ও বন্যায় যে বাংলার স্থলে স্থলে কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধন করে তাহাও কবির দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই—

দশ 'খাদা' ভুঁই এমন নধর ধানের 'জ্যাওলা' মোর
বন্যায় গেল ভেসে
'কিস্তিখেলাপ' যদি হ'য়ে যায় 'তলপ' যদিগো পড়ে
উপায় কি হবে শেষে!
গেল বছরের এক কুটো ধান নাইক আমার পুঁজি
প্রাণ যাবে অনাহারে
দেনের দায়ে বিকিয়েছে মাথা, বাস্তভিঁটাও বাঁধা
কেবা ধার দেবে তারে?

বাংলাদেশের যে সকল পল্লীসন্তান বিদ্বান পদস্থ ও আঢ্য হইতেছেন তাঁহারা আপনাদের পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া নগরে চলিয়া যাইতেছেন। পল্লীভূমির তাহাতে কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে কবির লেখনী তাহা বুকের কালী দিয়া লিখিয়াছেন—

আমার পল্লীরাণী,
সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় জ্বলে না প্রদীপখানি।
শূন্য দেউল সাঁঝের আঁধারে,

আধ দেখা যায় ঐ পরপারে,
আরতি বাজনা বাজেনা সেথায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকে নিশিদিন,
পূজা-হোম-যোগ হয়েছে বন্ধ,
দীর্ণহৃদয় নাহি আনন্দ,
অশ্রুধারায় দীপ্তি হারায় আঁখি যুগ তেজোহীন।
আমার পল্লী-রাণী,
সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় জ্বলে না প্রদীপ খানি।

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি রোগ শোক, ঋণ ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস, মামলা মকর্দ্দমার নেশা, শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তি-গণের পল্লীত্যাগ, কুসংস্কার ও দারুণ অজ্ঞতা ইত্যাদির জন্য পল্লীবাসী কৃষকগণ নিঃস্ব রিক্ত দুর্ব্বল আর্ত্ত। তাহার উপর বাকীখাজনার, খাজনার সুদ, সুদের সুদ ও অশেষ প্রকারের আবওয়াবের জন্য জমিদারের নিষ্ঠুর জুলুম। "একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর" মহাজন তাহার পাওনা ও পাওনার তিনগুণ সুদ কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়া গরীব কৃষকের যথা সর্ব্বস্ব নিলামে বেচিয়া লইতেছে। কচি কাঁচা ছেলেপুলে কোলে কাঁখে করিয়া রুগ্না পত্নীকে হাতে ধরিয়া কৃষক গাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল নিদারুণ নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নির্য্যাতন পল্লীসংসারে যে শ্মশান "প্রেতের ছায়া" ঘনাইয়া তুলিতেছে তাহার করুণ কাহিনী কবি জুলুমদার, কাঙাল, আর্জ্জি আসামী, সমনজারী, নিলামের ডাক, সমাজ সয়তান ইত্যাদি কবিতায় বুকের রক্তে চিত্রিত করিয়াছেন—

"গভীর আঁধার-ঘেরা চারিধার, নিঝুম দিবস রাতি
বুকের আড়ালে মিটি মিটি জ্বলে তৈলবিহীন বাতি,
গম্ ধরে' আছে, পাতাটি কাঁপেনা ছম্ ছম্ করে দেহ,
দেবতা-বিহীন দেবালয় আজ জনহীন সব গেহ।
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য রণতাণ্ডব সম,
আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্ম্মম।"

"পোড়া চোখে যদি জল আসে ওগো তাও,
তাও তা'তে কত কথা,
কাঙাল যে আমি কাঙালের কেন এত?
কাঙালের কিসে ব্যথা?
কাঙালের নাকি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নাই
সুখ দুখ হাসি মিছে;
সবার মিলিবে আগে মাঝে নিজ ঠাঁই
কাঙাল রহিবে পিছে।"

"দোহাই তোমার কর্ত্তাবাবু এবার আমায় 'রেয়াৎ' কর
টাকার উপর দ্বিগুণ হবে সুদটা আবার কেন ধর?
প্রতি বছর দিইছি টাকা—যখন যেমন সাধ্যমত—
কিছুতে আর শোধ হোল না?—'জের' বলনা টান্‌ব কত?
বছর বছর বেড়েই যাচ্ছে—দাগ পড়ে না জমার ঘরে,
এমন হ'লে গরীব মানুষ খাজনা দেব কেমন করে?
ইজ্জত যে রইল নাক 'প্যায়দা' ম'শার অত্যাচারে
তুমি যদি শুন্‌বে না সব, আমরা তবে বল্‌ব কারে?
তোমার কাছে কাঁদছি বাবু, তুমি সবি' করতে পার
ধনে মানে হইছি 'হাবাত' প্রাণটাতে আর কেন মার?"

"কাঙালের নাই কাঙাল তা শুধু
মরমে মরমে বুঝে
আর ত বুঝেনা কেহ,
ক্ষুধার কি জ্বালা বুঝিবে কেমন
উপাদেয় রাজ ভোগে
পুষ্ট যাহার দেহ।
আমার দুঃখ আমার ব্যাথার
এত টুকু যদি হায়
বাজিত তা'দের বুকে,
বাক্য জ্বালায়, দহিয়া আমায়
নিজের পাওনা শুধু
চাইত না রাঙা মুখে।"

সেলাম তোমায় পেয়াদা ম'শায়
আবার হেথায় কেন?
তোমায় দেখে বুকটা কাঁপে
হাঁপিয়ে উঠি যেন!
জলে ভিজে ছেলে পিলে
কাঁপছে পড়ে অই
পেটের জ্বালায় কাঁদছে তারা
কেমন করে সই?
হেঁসেল ঘরে ভাঙ্গা হাঁড়ি
কলসী গোটা দুই,
খেজুর পাতের ছেঁড়া চাটাই
সবাই তা'তে শুই।

মাথায় যদি বাড়ি মার
তাও পাবে না খুদ
তবু আমার শুধ্‌তে হ'বে
জমিদারের সুদ ?
"কর্ত্তাবাবু নিদয় কেন হও
মানছি আমার আছে হাজার কসুর,
হাতে এখন নাইযে কানা কড়ি
স'বে না কি একটা দিনের সবুর ?
অন্ন বিনা ছন্নছাড়া প্রাণী
'ভু রাব জাউ'য়ে ক'দিন ছেলে ভোলে
'লক্ষ্মাআড়ি' তাও খেয়েছি 'ভেনে'
একমুটো ধান নাইক আমার 'ডোলে !'

কবির বর্ণনা কুশলতা অনুপম। শুধু কৃষকের সুখ দুঃখের স্নিগ্ধ সজল আলেখ্য নহে, কৃষকের সংসারের অবিকল চিত্র ও পল্লী প্রকৃতির হুবহু চিত্রের অঙ্কনেও কবি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন—

"বিশ্বরাণী শিউ'লি ফুলের কলকা-কাটা আঁচল খানি,
স্মিত-মুখে আজ্‌কে যেন বুকের উপর দিচ্ছে টানি !
নীল-আকাশের ওড়না দিয়ে মাথার উপর ঘোমটা দেছে,
পুণ্য চরণতলে তাহার ফুল দিল কে বেছে বেছে ?
ওই ত কুমুদ অমল ধবল ওই ফুটেছে কমল কলি,
ওই দোপাটী অপরাজিতা সোহাগভরে পড়ছে ঢলি।
ঝুম্‌কোলতা দোদুল দোলে শিশুগাছের শাখার পরে,
আকুল মধুপ মুকুল-বালায় সোহাগভরে আদর করে !
ভোর না হ'তে পূব আকাশে লাজ-নয়নে চাইছে অরুণ;
ঘোমটা হ'তে উষারাণীর সে চাহনী কেমন করুণ।
রাখাল চলে মাঠের পানে, বিহগ গাহে বকুল ডালে,
বুলবুলিটা নাচ্‌ছে কেমন লুকিয়ে তমু বন আড়ালে !
তরু লতায় সবুজ পাতা বিল পুকুরে বান এসেছে,
এমন পূর্ণ বিমল শোভা পল্লীতে আজ কে এনেছে !"
পিঁড়ে আমার নেপা পোঁছা সিঁদুর প'লে যায় গো তোলা
বাতায় গোঁজা দুলছে দেখ খোকামণির সোলার দোলা ;
দাওয়ার কোণে বাঁশের খুঁটি তাতে খানিক 'কোষ্টা' বাঁধা
সকাল থেকে ছালায় বসে দড়ি পাকায় কেষ্টো দাদা,
গোলার কাছে জাবর কাটে চোখ্‌ বুজে ঐ বলদ জোড়া
পাহাড় প্রমাণ 'পলের' গাদায় খামার আমার আধেক জোড়া !
জমীদারের পাওনা দিয়েও সোনার ধানে গোলা ভরা
মুগ মুসুরি কেটে মেদে আছে ঘরে ডাউল করা ;
উঠান ভরা মাচান আছে, লাউ কুমড়ো কতই তাতে
কনকা রাঙা শাক্‌ বুনেছে কনক আমার নিজের হাতে ;
খেতে আছে উচ্ছে পটল আলু বেগুন থরে থরে
সস্তা দরে বেচে আনাজ আনি কত সওদা ক'রে !
পুকুর জলে কৈ মাগুর আর রুই কাতলা কত শত
ছিপ দিয়ে কি "খেপলা" ফেলে ধর আপন ইচ্ছা মত"

কবি কৃষকের সুখদুঃখের বার্ত্তা কৃষকেরই ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন—সেজন্য ভাবের সহিত ভাষার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। কৃষকের ভাষায় এরূপ পর্য্যাপ্ত অধিগতি অন্য কোন কবির কাব্যে আমরা পাই না।—যে সকল কবিতায় কবি সাধুভাষার ব্যবহার করিয়াছেন সে সকল কবিতায় বরং কবির শব্দ চয়ন ও ভাষা বিন্যাস আশানুরূপ সুন্দর ও সরল হয় নাই !

তাঁহার শব্দ চয়নের সরল সৌন্দর্য্যের উদাহরণ—

কাল্‌কে ও ভাই পহর খানেক রাতে
আস্‌ল নেমে জল,
সকাল বেলা,—যা' ভেবেছি তাই
গাঙ- দেয়াড়ে 'ঢল' !
কাল্‌কে ঠিকই আস্‌বে থেমে 'দেয়া'
জমির হ'বে 'জো'
বুনাবুনির লাগ্‌বে রে 'মরসুম'
কাম কাটি খো !
'ছাটার মুনিস' পাওনা আছে আমার
বাগ্দী পাড়ার-কাছে,
এমন দিনে বুনবে তারাও যে
নাই যদি পাই পাছে,—
পূবের পাড়ার 'খাটা মুনিস' নিয়ে
বুন্‌তে হবে ভুঁই,
বিলের জমি ?—ঘরের কৃষাণ ক'জন
তা'দের দিয়েই 'রুই' !

পক্ষান্তরে ভাষার শিথিলতা কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়—
"মায়ের মূর্ত্তি দেখাতে তুমি কি
এসেছ চঞ্চলা

মধুর ভাষিনী কল্পনার দানে
মুক্ত-অঞ্চলা ?”
“পদ্মহস্তে বেদনা সরায়ে
চির-নিরাময়-তিলক পরায়ে”

আজি এ বিরাট অনশন মাঝে বারেক দাঁড়াও এসে।

রসের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কোনো কোনো কবিতায় রসের অল্পতা লক্ষিত হইবে। শুধু অবিকল বর্ণনাতে অনেক সময় রসসৃষ্টি হয় না এবং যাহা রসমধুর করিয়া বলিতে পারা না যাইবে তাহা বর্জন করাই সুকবির কর্তব্য। অনেক স্থলে খুঁটিয়ে নিঃশেষ করিয়া বলিবার লোভে এবং তালিকার আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় কবিতাকে দুর্ব্বল ও নীরস করিয়া ফেলিয়াছেন—যথা

তুলসী তলায় কত মাথা কুটে অশথে ছিটায়ে জল
সন্তান আশে কত আরাধনা চোখ দুটী ছল ছল।
অক্ষয়বটে বাঁধিয়া ঝুলন মানত করিয়া কত
রক্ষা কবচ করিয়া ধারণ,—মাথাটী করিয়া নত
শিবালয়ে দেখি বিল্বপত্র পূজার থালিকা ভ'রে
নিত্য হাজার তুলসী অর্ঘ্য শালগ্রাম পূজা তরে,
কালীবাড়ী দেখি রাঙা জবা শত অমাবস্যায় পূজা
আশ্বিন মাসে কত আশাভরে পূজিয়া ছ দশভুজা,
ছিন্ন ফকিরের ‘দরগা’ তলায় অনেক “ফয়তা” মানি
সত্যপীরের সিন্নি দিয়েছি পড়্শীরে ডেকে আনি।
স্বস্ত্যয়নের হোমের মন্ত্র আজও যে রয়েছে কাণে,
চণ্ডীপাঠের উদাত্ত স্বর কত আশা দিল প্রাণে,
বৈশাখে দিয়ে ব্রাহ্মণ সেবা ফলদানব্রত করি
দেবতার পীঠে সিক্তবসনে কত না ‘ধর্ণা’ ধ'রে,—

কোনো কোনো কবিতার অযথা দীর্ঘতা রসসৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ—সমাজ সয়তান, অকেজো নারী পল্লীবিদায়। বর্ণাত্মক কবিতা সরস হইলে অনেক সময় তাহার দীর্ঘতাও সহনীয় হয় কিন্তু ভাবাত্মক কবিতা রসনির্বিড় না হইলে সাফল্য লাভ করে না। সেই হিসাবে “তুচ্ছের সম্মান” কবিতাটির ভাবটী উপাদেয় হইলেও অযথা দীর্ঘতার জন্য আশানুরূপ সরস হইতে পায় নাই। আর দুই একটী কবিতায় কবি-হৃদয়ের শোণিতের ছাপ না থাকায় রূপদৈন্য বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। এ গুলিতে কতকগুলি নীরস শব্দ ছন্দে গ্রথিত—কোন বিশেষত্ব নাই—যথা—

জননী তোমার বন্দনা-গানে ভুবন গিয়েছে ভরি,
এমন লক্ষ্মী পূর্ণিমা নিশি,
কুসুম গন্ধ ছুটে দশদিশি
ধন্য জীবন মহিমা তোমার আজি কীর্ত্তন করি
এস গো কমলা, অমলা, অতুলা এস গো বঙ্গ-রাণী
তোমার পুণ্য চরণ পরশে
হৃদয়ে শান্তি জাগিবে হরষে
দিকে দিকে হবে বিঘোষিত তব মঙ্গলময়ী বাণী

কয়েকটী কবিতায় স্থানে স্থলে একই ভাব ও ভঙ্গ পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকখানির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শিরা উপশিরা ভরিয়া একটী সহানুভূতিময় স্নিগ্ধ মধুর কারুণ্য রস শোণিত ধারার ন্যায় সঞ্চালিত—

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts"

সেই হিসাবে ভাঙ্গাফোঁটা, বধুর ব্যথা, কয়েদী ও শোকাতুরা কারুণ্য রসমাধুর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্নিগ্ধ ও মেদুর।

কবির Relegious creed টী তুচ্ছের সম্মান কবিতায় প্রকট। কবিতার শেষে বলিয়াছেন

দেবতা ধেয়ায়ি' বসে থাকি মোরা তাই মনে পাই বল
বিশ্বাসে সদা মিলায় বস্তু তর্কে আছে কি ফল।

বাংলার কাঙ্গাল মূঢ় মৌন মূক সরল প্রকৃতি কৃষকের যে ধর্ম্ম কবিরও সেই ধর্ম্ম।

সিক্তবসনে হিন্দুনারী যে নিত্য ঘাটের কূলে
ধারাজল ঢালে আনত আননে অশথ বটের মূলে,
ছোঁয়াইয়া মাটী শিরে
নিজ ঘরে যায় ফিরে,
তোমরা বলিবে “অন্ধ এ প্রথা তোমাদেরি ভাল সাজে
তুচ্ছ গাছ ও পাথরের পূজা দেখে মরে' যাই লাজে!”
উজাড়িয়া ভরা ঝারি
ঢালে পবিত্র বারি
সে যে রমণীর অপূর্ণ সাধ পূর্ণ কলসে রয়
পুণ্য পরশে তীর্থ-সলিল চির গৌরবময়!

"পল্লীবিদায়" "তুচ্ছের সম্মান" ইত্যাদি কয়েকটী কবিতার নামকরণ বিষয়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

"জুলুমদার" কবিতাটিতে জুলুমদার (জমিদার) নিজের খরচের যে হিসাব দিয়াছেন সেটা একটু বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। তবু কবিতায় অর্থপিশাচ প্রজার রক্তশোষক ভোগগৃদ্ধ জমিদারের পৃষ্ঠে কবি যে অন্তরালে রহিয়া চাবুক চালাইয়াছেন তাহা দেখিয়া আনন্দিত না হইয়া থাকা যায় না। 'আসামী' কবিতার সরল প্রকাশ ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়াছি। 'রতন-কুলী' কবিতায় কুলীজীবনের শোণিত রাঙা চিত্রটী বঙ্গসাহিত্যের চিত্রশালায় উজ্জল হইয়া রহিবে। 'গ্রহের ফের' কবিতাটী একেবারে জাতীয় চিত্র ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থাই পাশাপাশি আলিখিত। ভাইফোঁটা কবিতাটি অতি চমৎকার হইলেও এই পল্লীব্যথার অনুপযোগী। 'সুধার ভাগ্য' বৈচিত্র্যহীন চিত্র—কিন্তু রচনাটি বড় ঝক্ ঝকে তক্ তকে। শুধু প্রকাশ নৈপুণ্য ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে কি? 'বধুর ব্যথা' বঙ্গের সামাজিক জীবনের ও শোকাতুরা পারিবারিক জীবনের নিখুত চিত্র

কবির কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র আছে বৈশিষ্ট্য নাই। রবীন্দ্রনাথের নব প্রবর্ত্তিত অসম ছন্দের অনুকরণ মন্দ হয় নাই। 'সমাজ সয়তান' এর ছন্দটির ক্লান্ত ক্লিষ্ট সুর কর্ণকে একটু ব্যথিত করে। ছন্দোরচনায় প্রায় কোনও স্থানে খুঁত নাই। বিষয়োপযোগী ছন্দো নির্ব্বাচনে কবির কুশলতা অপূর্ব্ব।

মিলের দোষ নাই বলিলেই হয়। আবার মিল নির্ব্বাচনে বিশেষ কুশলতাও নাই। অন্য সকল জিনিসের মত মিলের যুগ্মতাও জীর্ণ হইয়া পড়ে। যে সকল মিল পাঠক সাধারণতঃ প্রত্যাশা করে না সেই সকল মিল দিতে পারিলে একটা প্রীতিকর বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় তাহাতে কবিতার মাধুর্য্য ও কলাকুশলতা বাড়িয়া যায়। মিলই অনেক সময় সমগ্র পংক্তির প্রকাশভঙ্গীর সরসতা নিয়ন্ত্রিত করে। রবীন্দ্রনাথের অসম ছন্দের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্যই মিলের অপূর্ব্বতা। "কোজাগরী" কবিতায় মিলের একটু বিশিষ্টতা আছে।

গোয়াল গোলায় চণ্ডীর ঘরে
দিয়েছে আল্পনা
আজি কে বলিবে মেয়েলী শাস্ত্র
আমরা পাল্‌বনা।
*   *   *   *
বুকে বুকে আজ অন্নপূর্ণা
হয়েছে জাগ্রত,
ভূখারে খাওয়াতে ঘরের লক্ষ্মী—
নিয়েছে মার ব্রত;

"বধুর ব্যথা"তেও ১ম ও ৩য়ে মিল দিতে পারিলে সোনায় সোহাগা হইত।

এই শ্রেণীর কবিতায় ভাবের মৌলিকতার অবসর অল্প। ভাবের মৌলিকতা প্রত্যাশা না করিলেও ভঙ্গির নবীনতা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় কোন কবিতাতেই প্রকাশ ভঙ্গির বিশেষ কোনও নবীনতা দেখিলাম না।

অনেক কবিতাতে নবীন কবির অগ্রজ কবির রচনা ভঙ্গির সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। যে পাঠকের মেধা খুব প্রবল নয়, সকল কবিতা পড়িয়া তাঁহার মনে হইবে 'কোথায় যেন' এইরূপ কবিতা পড়িয়াছি। অথচ কোনো কবির কোনও কবিতার সহিত এই কবিতাগুলির ভাবসাদৃশ্য একেবারেই নাই। কবিতা পড়িয়া সধারণ পাঠকের কবিতার সুর বা ঝঙ্কারটাই কর্ণকুহরে অনুরণিত হইতে থাকে। সেজন্য নূতন নূতন সুর দিতে না পারিলে কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিন। কবি এখনো তরুণ আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। একথা আমরা সসাহসে বলিতে পারি-এই কবি অবহিত অনুশীলন করিলে নূতন নূতন সুরে ও ভঙ্গিতে অনেক সঙ্গীত আমাদের শুনাইতে পারিবেন এই কবির রচনায় গভীর আন্তরিকতা আছে হৃদয়ের সরস মাধুর্য্য বিশ্বমানবের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি দেশপ্রাণতা, সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি, ভাষাসম্পদ চিত্রাঙ্কনীপ্রতিভা ছন্দো বৈচিত্র্য ছন্দোরচনায় কুশলতা সমস্তই বিদ্যমান আছে। যে কবি এতদুর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহার ভাবের মৌলিকতা আলঙ্কারিতা ও প্রকাশভঙ্গির নবীনতা অচিরেই অধিগত হইবে।

বিশ্ববাণী

সহজে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

বিলেতের "লিটারারী ডাইজেষ্টে" এক অদ্ভুত ব্যায়াম করিবার পন্থা প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকরণের আবিষ্কর্ত্তা ফরাসী দেশের ডাক্তার গটিয়েজ (Gautiez) তাঁহার বিশ্বাস এই যে বিলাসী ফরাসীরা কোনও রকম শারীরিক ব্যায়াম করাকে সময়ের অপচয় বলিয়া মনে করে তাই সময় সংক্ষেপে যাহাতে শারীরিক ব্যায়াম হয় তিনি তাহাই যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার বিশ্বাস যে পায়ের আঙুলের উপর ভর করিয়া হাটিলে শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে একই সময়ে কার্য্য করায় এই রকম হাঁটিবার পন্থা অবলম্বন করিলে নাকি গতি লীলাময় এবং সুন্দর হয়। প্যারিসের লী মেটিন (Le mat'n) কাগজ ডাক্তারের প্রদর্শিত এই পন্থার এক সমালোচনা বাহির হইয়াছে— তাহার মর্ম্ম এই যে প্রতি ফরাসী পুরুষ রমণীরই তাহাদের শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং কমনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য সময়াভাব প্রযুক্ত অনেকেই শরীরকে নিয়মিত ব্যায়াম দেননা কিন্তু ডাক্তার গটিয়েজের প্রবর্ত্তিত এই পন্থা অনুসরণ করিলে সময় এবং শরীরের প্রতি একই সময়ে দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে। তিনি লিখিতেছেন—হাঁটিবার কালে সকলেই পায়ের গোড়ালীই বিশেষ কাজে লাগান্। ইহা কিন্তু শুধু সভ্যমানুষ দিগেরই রীতি। বিশ্বজগতের জীবজন্তু সকলেই আগপা'কেই হাটিবার কালে অধিক কাজে লাগায়। এখন কথা হইতেছে এইযে গোড়ালীর উপর ভর করিয়া হাটিলে, দেহের মধ্যের কোন স্নায়ুরই স্বাভাবিক গতায়াতের পথের বাধা হয়না কিন্তু দাঁড়াইবার সময় পায়ের আগাকেই বিশেষ কষ্ট দেওয়া হয় বলিয়াই আমাদের শারীরিক পরিশ্রম হয়। আমরা যখন আঙুলের উপর ভর করিয়া দাঁড়াই তখন আমাদের উরু এবং পায়ের মাংসপিণ্ড কুঁচাইয়া পিঠের এবং তল পেটের এবং অন্যান্য সমস্ত স্থানের মাংসপিণ্ডকে ব্যায়ামের সুযোগ দেয়। এইরূপ ভাবে হাটিলে কুঁজো হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসে প্রাণায়ামের কাজও করে—যাহাহউক যখন ইহা সকলেই প্রমাণ করিয়া দেখিতে পাবেন তখন ইহা লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিবার প্রয়োজন নাই। দিনের মধ্যে কয়েক মিনিট সকলেই এইরূপ হাটিয়া দেখিতে পারেন—ইহা ঠিক কি না। দৌড়াইয়াও ব্যায়াম হয় বটে কিন্তু ফুস্ফুস্‌কে অতি কষ্ট দেয় আর দৌড়াইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সক্ষম নন্—অনেকে মনে করিতে পারেন উঁচুগোড়ালীর জুতা পরিলেই এই ব্যায়ামের কাজ হয় বোধ হয় শ্বেতাঙ্গ রমনীদিগের লীলাময়ী গতির উহাই একটী কারণ কিন্তু তাহা সত্য নয় জন্মাবধি চেষ্টার ফলে তাঁহারা উহার অধিকারিণী। এটী সহজ হইলেও ব্যায়াম সকলেই তাহা মনে রাখিবেন।

বিজ্ঞানে ভারত

এইবার আমাদের দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার আদর বাড়িতেছে। লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন (বৈজ্ঞানিক) প্রতিমাসেই আমাদের কাহারও গবেষনাপূর্ণ রচনা বক্ষে করিয়া বাহির হইতেছে। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীযুৎ সত্যেন্দ্র রায়, সি, ভি, রমন্ এবং আশুতোষ দের লেখা বাহির হইয়াছে—ফেব্রুয়ারীতে শ্রীযুৎ ভি, এন্ মল্লিক এবং এ, বী, দাসের, এপ্রিলে শ্রীযুৎ মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মে মাসে শ্রীযুৎ সি, ভি, রমনের লেখা বাহির হইয়াছে। ইহা আমাদের গৌরবের কথা—(বিদেশী কাগজে ইহাঁদের লেখা বাহির হইয়াছে বলিয়া নহে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ এবং প্রফুল্ল দুই মহাত্মার প্রসাদ ফল্যে। 'সায়ান্স্ ও প্রগ্রেস্' কাগজ শ্রীযুৎ সি, ভি, রমনের আবিষ্কারের প্রশংসা করিয়াছেন—তাঁহার আবিষ্কার "the

Science of Violin" আমরা এই বৈজ্ঞানিক সারথিবৃন্দকে—অন্তরের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহারা কেবলমাত্র নামযশের কাঙাল না হইয়া দেশবাসীদিগকে তাঁহাদের কৃতিত্ব গৌরবে উদ্বুদ্ধ করুন। বিজ্ঞানের যুগে দেশবাসী ঘরে বসিয়া কল্পনার রঙিন স্বপ্ন দেখেন ইহা কি তাঁহারা সহিতে পারিবেন?

শিল্পী "দরদী"

প্রায়ই দেখি ও পড়ি যে পাশ্চাত্যদেশের আশ্চর্য্য আবহাওয়ায় রাখালবালক কিংবা ঐ ধরণের কেহ কেহ কালেখ্যাতনামা শিল্পী হইয়া দাঁড়ান্। কারণ বোধহয় জন্মাবধি প্রকৃতিমায়ের কোলে থাকা। কিন্তু সে সব গেল কল্পনা। ১৯২০ সেসন 'সেসন জাতীয় পুরস্কার' যে শিল্পী পাইয়াছেন তাঁহার নাম পল দর্দী (Paul Darde) তিনি নাকি এককালে রাখালবালক (shepherd boy) ছিলেন। তাই বলিয়া তিনি ওস্তাদ্ কম নন্। কেহ কেহ তাঁহাকে বর্ত্তমান রঁডিন্ আখ্যা দিয়াছেন। তিনি নাকি মাইকেল এঞ্জেলোর ধরণের জিনিস দিতেছেন। ১৯১২ সালে, জন্মভূমি য্যাভিনিস্ ছাড়িয়া তিনি প্যারিসের একোলো ডী বোঁ আর্টস্ (Acolo des Beaux Arts) স্কুলের ছাত্র হন্ এবং একবার মাত্র ইটালীতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া রডিনের শিল্পাগারে এক সপ্তাহ কাটান। তাহারপর স্বদেশে ফিরিয়া তিনি চিরন্তন-দুঃখ (D'eternelle Doulleur) নামে এক নারীমূর্ত্তি খোদাই করেন। ইহা নাকি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমাদের দেশে বড় স্থপতিশিল্পের আদর নাই—আর থাকিবেইবা কি করিয়া? পাশ্চাত্য দেশে গুণের আদর আছে আর আমরা? কিন্তু আমাদেরই খোদাই করা মূর্ত্তিসব আমেরিকা ইংলণ্ডে সযত্নে রাখা হইয়াছে। তাই আমাদের সান্ত্বনা।

ভারতের নারী

দিল্লীনিবাসী শ্রীযুৎ সুলতান সিংহের মনস্বিনী পত্নী আমেরিকার বিলাসতুষ্ট রমণী সমাজে একসাড়া আনিয়াছেন। ভারতের নারীত্ব যে কি আমেরিকার স্ত্রীসমাজ তাহা বুঝিয়া অবাক্ হইয়াছেন। এই পূজ্যপাদা রমণী ভূপ্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছেন প্রবাসের শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে তিনি কেবল রুটী এবং দুগ্ধ খাইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তিনি গোঁড়া জৈন-রমণী মাছ মাংস ডিমতো খান্‌না অধিকন্তু, আহার্য্য উদ্ভিদও (যেমন আলু) গ্রহন করেন্‌না। ইহাঁর স্বধর্ম্ম-অনুরাগকে আমরা প্রণাম করি।

পুস্তক সমালোচনা

গ্রামের উন্নতি। শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১৯।৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা।

পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান দুরবস্থা, লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কোথায় কোথায় অধঃপতন হইয়াছে এবং পুনরায় গ্রামসমূহের উন্নতি করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিৎ গ্রন্থকার তাহাই অতি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে সমস্ত অনর্থপাতের জন্য ভারতের তথা বাঙ্গলার মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন পৃথিবীর সর্ব্বদেশ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে গ্রন্থকার তাহার ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—ভবিষ্যৎ নিরাকরণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শীতলি—কবিতা-পুস্তিকা, শ্রীদাহাজী প্রণীত, প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মূল্য দুই আনা।

কতকগুলি কবিতা লইয়া মাঝে মাঝে একটু অনুক্রমণিকার দ্বারা একটা একটানা ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে; আমাদের বিশ্বাস কবিতাগুলি পৃথক থাকিলেই ভাল হইত

কবিতাগুলি কবির প্রাণ দিয়া লেখা—স্থানে স্থানে বেশ নূতনত্ব ও কবিত্ব আছে—উপভোগ করিবার মত বটে।

"উঠানকোণে তুলসীতলায় ঐ যে মোদের
দিব্যি কাঁটাল গাছ,
পাতায় পাতায় কাঁটাল ধরে, জ্যৈষ্ঠি আষাঢ়
শ্রাবণ ভাদ্র মাস"

"কিন্তু ওরে যাদুমণি তোর ওই ক্ষুদ্রত্বের মাঝে,
নিঃশেষ মিলেছি মোরা কি সহজ কি সুন্দর সাজে।"

"তুমি অর্দ্ধকথিত রসের কাহিনী, প্রেমের উপন্যাস
অফুরন্ত তবু শুনিয়া শুনিয়া মিটে না শ্রবন আশ।"

"একদিন শুভক্ষণে, গোধুলির অভ্রয়াণে
আমায় সে শুভশঙ্খ যতনে বাজায়ে
নিয়ে যাবে মরণের দোলায় চড়ায়ে।"

দু'একস্থলে ছন্দঃ পতন আছে—।

"আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে আপনি দিয়েছ দেখা"

রজনী বাবুর অনুকরণ বোধ হয়।

দ্বীপান্তরের কথা—শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রণীত ৪।এ মোহনলাল ষ্ট্রীটস্থ আর্য্যপাবলিশিং হাউস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত—সোল এজেন্ট—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১৸৹ দেড় টাকা—

এই পুস্তকখানিতে বারীন বাবুর দ্বীপান্তর-জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় নিপুণ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। "অকূলেযাত্রা" হইতে আরম্ভ করিয়া 'আত্মকথা' পর্য্যন্ত আগাগোড়া সমান ভাবে উপভোগ্য,—যেমন রচনার ভঙ্গী তেমনি ঘটনার বৈচিত্র্য, পড়িতে পড়িতে শুধু লোভ হয় শ্রান্তি আসেনা। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাগুলি কবিত্বে ভরা। এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার এম-এ। হেমন্তবাবু তথাকথিত পন্থা ত্যাগ করিয়া এই ভূমিকা লিখিবার প্রসঙ্গে অনেক কাজের কথা, খুব সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন

স্বদেশরেণু-ছড়া—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব কলেজষ্ট্রীট মারকেট হইতে শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ নাগ বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য চারিআনা। ছোট ছোট কবিতার মধ্য দিয়া কবি বাংলার ছোট ছেলে মেয়েদের হৃদয়স্পর্শ করিয়াছেন। শিশু জীবনের দৈনন্দিন আদর আবদার খেলাধূলার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব আমরা দেখিতে পাই—ছড়ার আকারে তিনি সেগুলিকে শিশুদিগের উপযোগী করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। এই ছোট ছোট কবিতগুলির পড়িতে শিশুপ্রাণে দেশের প্রতি গভীর মায়া ও স্বজাতির প্রতি একটা আন্তরিকতা আপনিই জাগিয়া উঠিবে। বাংলার ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর হওয়া উচিৎ। এই পুস্তকের ছন্দঃ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে আমাদের আপত্তি আছে চণ্ডী বাবুর ছন্দোজ্ঞান যথেষ্ট আছে—পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ত্রুটীগুলি না থাকিলে—শিশুদিগের কাছে ইহা আরো মনোজ্ঞ হইবে।

ঘর ও পর—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাপ্রচার ভাণ্ডার, বসন্ত কুটীর গোন্দলপাড়া চন্দননগর হইতে প্রকাশিত—মূল্য একটাকা। এই পুস্তকখানিতে ঘরের সহিত পরের কি সম্পর্ক—কার্য্যক্ষেত্রে পর অপরের মধ্যে কি যোগাযোগ আছে মোটামুটি তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজের উচ্চনীচ সর্ব্বজাতিই প্রয়োজনের দিক হইতে বড়! সমাজের হিতাহিত কর্ম্ম লইয়া প্রত্যেকের মূল্য নিরূপিত হয়—শুধু তথাকথিত জাত্যাভিমানকে বড় করিয়া 'ছোট' 'বড়' বলা নীচতা।—জাতি নির্ব্বিশেষে সমদৃষ্টি না হইলে—সমাজের উন্নতি নাই। ছেলে মেয়েরাই আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল। তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। লেখক এসব বিষয়ে বেশ চিন্তা করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন আশাকরি আমাদের সমাজে ইহার আদর করিবে।

রংমশাল—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীচারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত একখানি বার্ষিক

প্রকাশক—শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার—৯০।২ এ হ্যারিসন-রোড্ কলিকাতা। "দাম—ন'সিকে"

ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের নামজাদা চিত্রকরগণ

নানাবর্ণের চিত্রদ্বারা—ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন—লেখকগণের মধ্যেও সকলেইপ্রায় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। চিত্রগুলির মধ্যে—প্রচ্ছদপট আমাদের মনোযোগ আকর্ষন করিলেও মনোহরণ করিতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারীর "পাড়ি," সুরেন্দ্রনাথের মাঠের পথে "কদমতলায় কে" অতি সুন্দর হইয়াছে। হিন্দুর ঘরে ছেলেমেয়েদের মনে ছোটবেলা থেকেই রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ভাবটী জাগিয়া উঠে তাহ ভক্তির ভাব—এই যুগল মূর্ত্তিকে তাহারা যে অবস্থাতেই দেখুক না কেন, নীতি বিবর্হিত কোনও ভাব যে তাহাদের মনে উদয় হইবে না ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। মাঠের পথে ছবিখানি আরো একাধিক স্থানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। "ছেলেখেলা' ও 'পুজোর ফুল" শিশুদের কাছে সম্পূর্ণ অবোধ্য। নন্দলাল বাবুর "হাঁস" ছেলেদের কাছে হাঁসই থাকিবে শুধু চিত্র পরিচয়ে উহার বিশেষ অর্থ দিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। "ছিচকাঁদুনীর" ভাবটী বেশ কিন্তু বিশেষ স্পষ্ট নাই। চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্রের 'খুচরা ছবি' সব কখানিই বেশ উপযুক্ত হইয়াছে।

কবিতাগুলির মধ্যে সত্যেনবাবু প্রথমেই যে কথার 'আশু ম্যাজিক' করিয়াছেন এবং 'বারুদের মাঞ্জা' 'চাঁদের চাঁচ' প্রভৃতি লইয়া যে 'ঠিক ভোজবাজী' দেখাইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই! তবে ম্যাজিক' 'ভোজবাজী' দেখিতেই ভাল—ফুরাইলে আর কিছু থাকে না। তাঁহার 'পেটুকের বর্ণপরিচয়' বেশ ভাল লাগিল। শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুর "ফাজিলের ডিব্‌সেনারী"—শ্রীযুক্ত কিরণধন বাবুর 'কমলালেবুর দেশ' শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রদেবের "কালিআর ঝুল" ছাড়া অন্য সব কবিতার ছন্দ ও ভাব একেবারে "সত্যেণী"—একই ভাবে, একসুরে, দুষ্ট, ছেলের আজ্ঞি পেস করায় অত্যন্ত এক ঘেয়ে লাগিল। শ্রীযুত অবনীন্দ্র বাবুর 'রাণা-কুণ্ড' প্রবন্ধটী খুব মনোজ্ঞ হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাবে বিষয় বৈচিত্র্য থাকিলে বংমশাল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। ছেলেদের হাতে উপহার দেওয়ার পক্ষে ইহা উপাদেয় গ্রন্থ সন্দেহ নাই,—তবে শিশু-সাহিত্যের মধ্যে এই ভাবের পুস্তক সম্পাদন সম্পূর্ণ অভিনব এবং ইহার সম্পাদক লেখক ও চিত্রকর সকলের কাছে আমরা নিখুঁত জিনিসই চাই—তাই এত কথার অবতারণা।

সত্যানুসরণ—১৬৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীঅতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাধনার পথে সাধক যে সব সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাই সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় সাধারণে উপস্থিত করা হইয়াছে।

বাধা বিপত্তি সঙ্কুল জীবনপথে এই সব নীতিবাক্যগুলি বিশেষ কার্য্যকরী হইবে 'সন্দেহ নাই'। সাধক জীবনের মধ্যে এমন একটা অবস্থা মাঝে মাঝে আছে যখন সাধারণ বস্তুজ্ঞান ছাড়াইয়া মানব বর্ত্তমান হইতে দূর ভবিষ্যতের দৃষ্টি পায়, নিজের অন্তরটী তখন সত্যের প্রেরণায় পূর্ণ হইয়া উঠে—এই সব কথাগুলি যে অবস্থার কথা প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানীরই এই ক্ষুদ্র পুস্তকা খানি পড়া উচিৎ।

প্রধাকর্ম্মকার বা কর্ম্মার ক্ষত্রিয়—প্রকাশক শ্রীরাধারমণ রায় বর্ম্মণ। মূল্য এক টাকা।

কর্ম্মকার জাতির ইতিবৃত্ত—উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাপর অবস্থা অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগসমস্যার দিনে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে আত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে এ পুস্তকখানি তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। চাতুর্বর্ণ জাতি বিভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের গুণাবলীর উপর তথাকথিত নিম্নজাতি যে আজ আপনাদের ন্যায্য দাবী সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন ইহা বাস্তবিকই আশাপ্রদ। অনুসন্ধিৎসুমাত্রেই এই পুস্তকে উল্লিখিত জাতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

পারের পথে—(সামাজিক উপন্যাস)। শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত ৫এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা মকদুমী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা।

মুসলমান লেখকগণের মধ্যে শাহাদাৎহোসেনের কবিতা ও গল্প পড়িয়া আসিতেছি। লেখক নবীন হইলেও তাহার নিকট হইতে আশা করিবার যথেষ্ট আছে। বিভিন্ন অবস্থায় বর্দ্ধিত জীবনে আদর্শের প্রকারভেদে মন বিশেষের রঙ্গীন কল্পনার মধ্যে যে বিপর্য্যয় যে চরিত্রের আরোহ অবরোহ পরিলক্ষিত হয়, এই উপন্যাসে গ্রন্থকার কতকগুলি ঘটনার মধ্য দিয়া তাহাই দেখাইতে

চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মোহাবিষ্ট কাসেম বাঙ্গলার সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপনের কথা বিস্মৃত হইয়া আপনার নেশায় আপান ভরপুর থাকিয়া দিনের পর দিন অধঃপাতে যাইতে লাগিল, ওদিকে জোবেদার তৃষিত নারী হৃদয় আকাঙ্খিত বস্তু লাভ করিতে না পারিয়া শুধু বাসনা বিষে দগ্ধ হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করিল। জোবেদার মৃত্যুর পর অলোকা, কাসেম, ও এশ্রাক্ পতিত জীবন হইতে সত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। গ্রন্থকার পতিতা অলোকাকে উদ্ধার করিয়া পতিত তারণ ইস্লাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। জোবেদার মৃত্যু সমাধি হইতে, "কাসম অলোকা ও এসরাককে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।" এই গৃহ জীব সেবায় মহিমান্বিত মানবের কর্ম্ম ক্ষেত্র। হামিদা ও রফিকের ক্ষমাশীল চরিত্র দুইটী সুন্দর হইয়াছে। অন্যান্য চরিত্র চিত্রণ অনেক স্থলে ভাল ফুটে নাই। সামাজিক সমস্যার সঙ্গে মানব জীবনের চিরন্তন মনস্তত্ত্বের বিষয় সম্যক অধিগতি হইলে এই ত্রুটি থাকিবে না আশা করা যায়।

মাসিক কাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

আর্চ্চনা। আষাঢ়—ভারতবর্ষ। হরচন্দ্র দত্তের ইংরেজি কবিতা হইতে অনূদিত। অনুবাদক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। চলন সই।

শাক্য সিংহ। শ্রীসুরেশচন্দ্রভট্টাচার্য্য। বিশেষত্ব শূন্য।

অশ্রুমালা। শ্রীমান যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের জাপানী ঢঙের ক্ষুদ্র সমুচ্চয়। এই নূতন ঢঙের কাব্যকণাগুলি আমাদের ভাল বেশ লাগে। নব্যা কিশোরীটি আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে। অন্যান্যগুলির চতুর্থপংক্তিগুলি তেমন রসমধুর হয় নাই। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পুরাতন" নেহাৎ পুরাতন ঢঙের বিশেষত্বশূন্য কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দঃ সম্বন্দে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। যতীনবাবু ছন্দোবিচার করিতে গিয়া বড় গোলে পড়িয়াছেন। বাংলায় চার প্রকারের ছন্দ চলিতেছে ১ম অক্ষর গণনা দ্বারা নিষ্পন্ন হয়—২য় স্বর-মাত্রিক—৩য় Syllablic অথবা ছড়ায় ছন্দ—৪র্থ প্রত্যেক স্বরে হ্রস্ব দীর্ঘ অনুসারে, সংস্কৃতানুযায়ী।

১ম। পয়ার বা পয়ার হইতে জাত ছন্দ শুধু অক্ষর গণনারদ্বারা নিষ্পন্ন—দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বর যুক্ত বর্ণ ইত্যাদির দ্বারা পক্তির কোনো তারতম্য হয়না। পয়ারে শুধু চোদ্দটী অক্ষর হইলেই হইবে তবে ৮অক্ষরের পর যতি থাকা চাই। পয়ার ভাঙ্গা ত্রিপদী ৮+৮+১০ কিম্বা ৮+৬+৬ কিংবা ৮+৮+১৪। এ ছাড়া ১৮ অক্ষরেরও পংক্তি হইতে পারে। ১৮ অক্ষরের ১৪ অক্ষরের ৬ অক্ষরের এক এক পংক্তির সমবায়ে একটী শ্লোকও হইতে পারে। যেমন উর্ব্বশী কবিতার এক একটি stanza। এ ছন্দে যুক্তাক্ষরকেও একমাত্রা হসন্তান্ত ব্যঞ্জনকেও একমাত্রা ধরা হয় মুড়ি মিছরির সমানদর এবং তাহাতে শ্রুতিকটু হয় না। যথা—

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কারো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি

এখানে ২টী আঠার অক্ষরের পংক্তি। ৮ ও ১২ অক্ষরের পর যতি—এই ছন্দে 'ন্ধ্যা' এক মাত্রা আবার হসন্তান্ত 'স্বর্ণাঞ্চলের' 'ল্' ও এক মাত্রা।

২য়। স্বরমাত্রিক ছন্দ—এই ছন্দের পংক্তির এক এক পাপড়ীতে ৫টী কিম্বা ৬টী কিম্বা ৭টী কিংবা ৮টী করিয়া হ্রস্বস্বর থাকিলেই চলিবে। বাংলায় আ, ঈ, উ, এ, এবং

ও দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না সেজন্য এগুলিও হ্রস্বস্বর। কেবল ঐকার ও ঔকারের দীর্ঘ উচ্চারণ হয় সেজন্য উহাদিগকে দুইটী হ্রস্ব স্বরের তুল্য ধরা হয় ঋকারকে উচ্চারণ ভেদে হ্রস্ব বা দীর্ঘ ধরা হয়। যেখানে ঋকার শব্দের প্রথম অক্ষরে যুক্ত থাকে সেখানে হ্রস্ব স্বরই ধরা হয় যেখানে শব্দের মাঝখানে থাকে এবং "রফলা হ্রস্বই" এর মত উচ্চারিত হয় সেখানে ২টী হ্রস্বস্বরের তুল্য ধরা হয়। যেমন "মাতৃহৃদয়" শব্দটীর "তৃ" এর ঋকারকে ২টী "হৃ"এর ঋকারকে একটী স্বর ধরা হয়। বিসর্গ অনুস্বারের আগের স্বরকে ২টী হ্রস্বস্বরের মত ধরিতে হয়। সংযুক্তবর্ণের আগের স্বরকেও ২টী হ্রস্বস্বরের তুল্য মনে করিতে হইবে। তবে কোন শব্দের প্রথমেই যদি সংযুক্তবর্ণ থাকে তাহা হইলে আগেকার শব্দের শেষঅক্ষরের স্বরকে ২টী হ্রস্বস্বরের তুল্য ধরা হয় না। দুইটী শব্দ সমাসবদ্ধ হইলে শেষের শব্দের প্রথম সংযুক্তবর্ণের হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্ব উচ্চারণের উপর নির্ভর করে। যেমন "ক্ষয় ক্ষতি"—"য়" এর স্বরকে ২মাত্রা ধরা হয় না কিন্তু "বেদব্যাসের" 'দ' এর স্বরকে ২ মাত্রা ধরা হয়। এখন একটা কথা উঠিতে পারে হসন্ত ব্যঞ্জনের বেলায় কি হইবে? হসন্ত ব্যঞ্জনে কোন স্বর না থাকিলেও এই শ্রেণীর কবিতায় হসন্ত ব্যঞ্জনকে একটী হ্রস্বস্বরের তুল্য ধরা হয়। যথা—

পৌষ প্রখর শীত জর্জ্জর ঝিল্লী মুখর রাতি
নিদ্রিত পুরী নির্জ্জন গৃহ নির্ব্বাণ দীপ বাতি।

এই দুটী পংক্তিতে ৬+৬+৬+২ এই ২০টী স্বরের ছন্দ। "পৌ" এর ঔ এর জন্য ২টী, 'ষ' এ ১টী 'প্র' যুক্তবর্ণ হইলেও ষ এর 'অকে' দীর্ঘ করিতেছে না—'প্র' ও 'খ' এ ১+১, 'র' হসন্তরূপে উচ্চারিত হইলে উহাতে ১টী স্বর ধরিতে হইবে এই সর্ব্ব শুদ্ধ ৬টী। "শী" এর ঈকারের জন্য ১টীই ধরিতে হইবে কারণ ঈকারের দীর্ঘ উচ্চারণ আমরা করি না 'জ' এর অকার র্জ্জ এর পূর্ব্বে থাকার জন্য ২টী—"ঝিল্লী-"র ঝি এর ইকার সম্বন্ধেও তাই। এই ছন্দে হসন্ত ব্যঞ্জনগুলির অকারান্ত হইয়া উচ্চারিত হইবার একটা ঝোঁক থাকিয়া যায় সে জন্য পাঠকালে আমরা অনেক সময় অকার যোগ করিয়া পড়ি। ইহা পয়ারেও হয়—

"কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান" এই পংক্তিতে 'ম' ও 'স' অকারান্ত করিয়া পড়িতে শুনা যায়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো কবিতায় সকল শব্দগুলিই স্বরান্ত করিয়াছেন যথা—"যামিনী——মাঝে"। পঞ্চমাত্রিক ছন্দেও ঐরূপ রীতিই অবলম্বিত হয়।

"পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ একি সন্ন্যাসী।" এই পংক্তিতে পূর্ব্বোক্ত হিসাবে স্বরগণনা করিয়া ছন্দঃ ঠিক করিতে হইবে।

এখানে ৫+৫+৫+৪ -'প' 'ভ' ও 'খ' এর অকারকে ২টী করিয়া হ্রস্বমাত্রা ধরিতে হইবে। ৫+৫+৫+৫ ও হইতে পারে যথা—

শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে

এখানে শ্রাবণের 'ণ' গোপনের 'ন' চরণের 'ণ' সবই বাংলায় হসন্ত রূপে উচ্চারিত হইলেও এক একটী হ্রস্বস্বরের তুল্য ধরা হইয়াছে। সঙ্গীতেত অকারের আগমন অনিবার্য্য গানে কোন গোল নাই। পড়িতে গেলেও উড়িয়া ঢঙের অকারান্ত উচ্চারণ আসিয়া পড়ে।

৭ মাত্রায় ঐ প্রকারের ছন্দঃ সম্বন্ধেও ঐ রীতি।

৭+৭+৭+৩ কিম্বা ৭+৭+৭+৫।

আজিকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পরম মিলনের বাসরে

কিংবা

সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো

৩য়। ছড়ায় ছন্দ। ইহাতে অক্ষর গুণিলেও চলিবেনা—স্বর মাত্রায় হিসাবও চলিবে না। ইহাতে Syllable ধরিয়া ঠিক করিতে হইবে। ৪+৪+৪+২, কিংবা ৪+৪+৪+৩, কিংবা ৪+৪+৪+৪ মাত্রায় এক এক পংক্তি সমাপ্ত হইতে পারে। অন্তরা ৪+৪ কিংবা ৪+৪+২, কিংবা ৪+৪+৩ হইতে পারে।

১। ঘুম পাড়ানী মাসীপিসী বর্গী এলো দেশে
২। দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটাপরা ঐ ছায়া
৩। ছোট্ট হাজার মুক্ত অসি জল জ্বলিয়ে কে ঐখোলে।

এ ছন্দে হসন্তের আধিপত্য। কোনো হসন্তকেই স্বরান্ত করিয়া পড়া চলিবে না।

ঘুম্, পা, ড়া, নী—৪, মা, সি, পি, সী ৪,
বর্, গী, এ, লো—৪, দে, শে, ২,

দি, নের, শে, ষে—৪ ঘু, মের, দে, শে, ৪,
ঘোম্, টা, প, রা—৪, ঐ, ছা, য়া ৩,
ছোট্, ট, হা, জার—৪, মুক্, ত, অ, সি, ৪,
জল্, জ, লি, যে—৪, কে, ঐ, গো, লে, ৪

ঘোমটা যদি ঘোমটা, তুলসী যদি তুলসী, পেয়্লা যদি পেয়ালা এইরূপ উচ্চারণ করা যায় তাহা হইলে দুই মাত্রার স্থলে তিন মাত্রা ধরিতে হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে এর উপরেও একজোড়া appeal এর বিচারক আছেন—তাহারা পাঠকের দুটীকর্ণ। যতদুর সম্ভব উপরি-উক্ত নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয় কর্ণের সহিত নিবিবিলি পরামর্শ করিয়া ছড়ার ছন্দের বিচার করা উচিত। কচিৎ কোনো খানে এক মাত্রা বেশী বা এক মাত্রা কম বা আধমাত্রা বেশী হইলে ও শ্রুতি কটু না হইলে চলিতে পারে।

১। ছেলে ঘুমুলো পাড জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে

এক্ষেত্রে প্রথম দুই পাপড়ীতে ৪এর বদলে ৫টী করিয়া মাত্রা আছে তথাপি শ্রুতিকটু নহে।

২। নাম রেখেছি বাবলরাণী একরত্তি মেয়ে এখানে "এক রত্তি" ৪ এর বদলে ৩ মাত্রা হইলেও শ্রুতিকটু নহে।

৩। অটল যেজন দাঁড়িয়ে ছিল অনেক নির্য্যাতনে। এখানে "দাঁড়িয়ে ছিল" উচ্চারণ গুণে ৪ মাত্রা। আধ মাত্রা বেশী তবু শ্রুতি-মধুর—

পক্ষান্তরে ঠিক চারিমাত্র থাকা সত্বেও অনেক স্থলে শ্রুতিকটু হইতে পারে।

"প্রাণ আনচান আজ করছে কেন বুঝতে নাহি পারি"
"দয়াল খোদা রুদ্র বেশে এলেন যদি প্রহ্লাদ দেশে"

এখানে "প্রাণ্, আন্, চান্, আজ্" ইহা চারিমাত্রা "প্রহ, লাদ, দে, শে" ইহাও চারিমাত্রা—তথাপি শ্রুতিমধুর নহে। সেজন্য এছন্দে আমরা শ্রুতির মতামত গ্রহণ করিতে বাধ্য। শ্রুতিই এক্ষেত্রে শ্রুতি বা কোরাণ।

৪র্থ। ঠিক সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণকে মান্য করিয়াও রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বরের সংস্কৃতে যে প্রকার উচ্চারণ সেই প্রকারই ধরা হইয়াছে।

এমনকি বাংলায় যে সকল শব্দকে হসন্তান্ত রূপে উচ্চারণ করা হয় তাহাদিগকেও সংস্কৃত ধরণের উচ্চারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরি ভালে
গাহি বিহঙ্গম পুণ্য সমীরণ নবজীবন রস ঢালে।

এখানে কবি, জয়দেবের "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে" এর ছন্দ বর্ণে বর্ণে অনুসরণ করিয়াছেন। এই ছন্দে জয়দেব প্রতিপংক্তিতে আটটী করিয়া হ্রস্ব স্বর এক এক পাপড়িতে রাখিয়াছেন এবং প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুইটী হ্রস্ব স্বরের সমতুল্য ধরিয়াছেন। রবীন্দ্র নাথও তাহাই ধরিয়াছেন।

ললিত লবঙ্গল	তা পরিশীলন	কোমল মলয় স	মীরে+
রাত্রি প্রভাতিল	উ দল রবিচ্ছবি	পূর্ব্ব উদয় গিরি	ভালে।

রা—২, ত্রি—৩, প্র—১, ভা—২, তিল-২—৮

পুনশ্চ "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী" এবং "কৃষ্ণ'ও কিল কোকিলকুলমুজ্জল কলনাদং" একই ছন্দঃ। সংস্কৃতের ছন্দঃ অক্ষরে অক্ষরে রবীন্দ্র বজায় রাখিয়াছেন। এখানে দেশের একার দুটী হ্রস্ব স্বরের তুল্য এবং সে হিসাবে প্রত্যেক পাপড়িতে ছয়টী করিয়া হ্রস্ব স্বর বর্ত্তমান আছে।

ইহা ছাড়াও আর একপ্রকার ছন্দ চলিতেছে, তাহা বিদ্যাপতির অনুকরণ। ছন্দের সুর ও ভঙ্গি উপরিলিখিত ছন্দেরই মত। বিদ্যাপতি কোন দীর্ঘস্বরকে দুইটী হ্রস্ব স্বরের তুল্য ধরিয়াছেন কোনটিকে বা একটার মতই ধরিয়াছেন কোনো কোনো বঙ্গীয় কবি তাঁহাদের কোনো কোনো কবিতায় এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন

"আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয় রাণী"

এ ক্ষেত্রে "আমার" এর আকারকে একটী হ্রস্ব স্বর ধরা হইয়াছে কিন্তু রাণীর আকারকে দুইটী ধরা হইতেছে। কবি যতীন্দ্রমোহনের "ভারতবর্ষ" নামক কবিতাতেও এইরূপ মিশ্র রীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বাংলার অনেক সঙ্গীতে মাঝে মাঝে কোন কোন দীর্ঘ স্বরকে দুটী হ্রস্ব স্বরের তুল্য ধরা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও কবিতায় শেষের শব্দটী দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বীকৃত হইয়াছে। সে সকল পংক্তির শেষে "রাজে" "বাজে" "জাগে" "রাতি" "মালা" ইত্যাদি দীর্ঘস্বর যুক্ত শব্দ আছে সে গুলিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে ভাল লাগে বলিয়া আমরা দীর্ঘ করিয়াই পড়ি। তবে সে সকল রচনা প্রায়ই গান এবং গান গাহিতে শুনার পর স্বতঃই সে গুলির গানের দীর্ঘ উচ্চারণই পড়িতে গিয়া আ সয়া পড়ে।

আমার শেষ কথা রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে সঙ্গীতের শ্রুতি ও সুর জ্ঞান থাকা চাই শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্য বা গণিত শাস্ত্রের হিসাব লইয়া ছন্দোবিচার করিতে গেলে আম্রমুকুলের পরিবর্ত্তে নিম্বফলই বিদ্যাচুঞ্চুর কঠোর চঞ্চুর ভাগ্যে জুটিবে।

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৬শ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩২৭ | ৮ম সংখ্যা

আলোচনী

পল্লী-স্বরাজ

গ্রাম ও সমাজ-জীবন

আবার বাঙ্গালার তরুণ প্রাণকে স্পন্দিত করিয়া এক নূতন আন্দোলন জাগিতেছে। ১৯০৫-১০ সালের জাতীয় শিক্ষার কথা আবার আমরা শুনিতেছি। বাঙ্গালী যুবকের স্বাধীন শিক্ষা ও জীবিকার কথা শুনিতেছি। সেই পল্লীসেবা ও পল্লীসংস্কার আকাঙ্ক্ষা আবার জাগিতেছে। নিরন্ন কৃষকের সেবার ভার শিক্ষিত সমাজ আবার গ্রহণ করিতেছে। মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা ও মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতির নৈশ-বিদ্যালয় ও শ্রমজীবি-আন্দোলনকে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া এক বিরাটতর অভিযানে বাঙ্গালার যুবক আবার নামিতেছে। পৃথিবীতে যখন যেখানে গ্রাম-প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তখনই তাহা সাহিত্য, সমাজ ও বৈষয়িক জীবনে একটা যুগান্তর আনয়ন করে। জার্ম্মাণীর সেই Aufklarung নব জাগরণের প্রথম পুরোহিত হার্ডার লোক-সাহিত্য ও গ্রাম্য-সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে যে ভাবাত্মক যুগান্তর, Romantic Movement. আনয়ন করিয়াছিলেন সঙ্গে সঙ্গে [illegible] তাহাতে এমন কি শিল্পিশ্রেষ্ঠ গেটের অন্তঃকরণ সাড়া দিয়াছিল। সীলার তাঁহার নাটকগুলিতে জনসমাজের নব-জাগ্রত চৈতন্যকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অচিরে এমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল যাহার ফলে জার্ম্মাণীর সেই War of Liberation, মুক্তির যুদ্ধ, তাহার বিপুল প্রসারের সেই প্রথম চেষ্টা। ঠিক তেমনি ভাবে রুশিয়ায় যখন ডানিলেভস্কি প্রমুখ স্লাভোফিলগণ গ্রাম প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রকাশ করিলেন তখনই সমগ্র সমাজ ব্যাপিয়া একটা ভাবান্তরের সূচনা হইল। হার্জেন প্রচার করিলেন যে পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রের ব্যক্তি সর্ব্বস্বতা ও প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সমূহজ্ঞানের সমন্বয় না হইলে রুশিয়ার উন্নতি অসম্ভব এবং সেই উন্নতিকে রুশিয়ার অসংখ্য স্বাধীন গ্রাম্য-সমাজের ভিত্তিতে সুদৃঢ় করিতে হইবে। তাহার পর হইতে রুশিয়ার প্রায় সমস্ত চিন্তাশীল লোকই গ্রাম্য-সমাজের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িতে চাহিয়াছে।

পুস্কিনের সেই ভাবোন্মত্ত কাব্যধারা ত্যাগ করিয়া, তুর্গনিভের সেই অতিমাত্র শিল্প ও সার্ব্বজনীন বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া, জাগিয়াছে এক নূতন সাহিত্য যাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছে টলষ্টয়ের সেই বিশ্ব বিশ্রুত কৃষক প্রেমে, ডষ্টয়ভেসকির সেই হীনতার ও পাপের মহিমা কীর্ত্তনে, গর্কির সেই মর্ম্মন্তুদ, জ্বালাময় ভ্রাতৃত্ববোধে। আবার আয়র্লণ্ডের আধুনিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, কম্বরীর হোরেশ প্লানকেটের পল্লীসমাজ ব্যাপিয়া সেই বিরাট কৃষি-সমবায় গঠন একদিকে যেমন ঋষিকল্প, জর্জ্জ রাসেলের মিষ্টিক কবিতার ও তত্ত্বদর্শনের উপাদান যোগাইয়াছে, অপর দিকে একটা কেল্টিক জাগরণের সূচনা করিয়া আয়র্লণ্ডীয় সাহিত্য, গীতিকাব্য, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে নববলে বলীয়ান করিয়াছে। আর একদিকে বালকান রাষ্ট্র সম্প্রদায়ে নব্য স্থপতির অভ্যুত্থান সেখানকার লোকসাহিত্যের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

এই যে এখন গ্রামে ফিরিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের আবার জাগিতেছে, তাহাতে আমাদের আবার যে সাহিত্যের সাধনা ও সম্পদ বাড়িবে শুধু তাহা নয়, সমাজের উচ্চ ও অধঃ শ্রেণীর ভাব বিনিময় আমাদের নিকট রাষ্ট্রীয় আদর্শের আরও গভীর ও জলন্তভাবে ফিরাইয়া আনিবে, আমাদের বৈষয়িক জীবনের পরাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচাইয়া দিয়া আমাদিগকে ধনে বলে ঐশ্বর্য্যে বলীয়ান করিবে সন্দেহ নাই।

কৃষকের অধিকার

বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে, এই যে নূতন de... cracy আমরা পাশ্চাত্য জগৎ হইতে পাইলাম তাহা আমাদের বিরাট কৃষক সমাজের সহিত একেবারেই খাপ খায় না। যে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উপর হইতে চাপাইয়া বসান হয়, কৃত্রিম ভাবে রিপোর্ট, কমিশন দ্বারা যাহা সৃষ্ট, অথবা সংস্কৃত, তাহা শ্রেণী বিরোধ না ঘটাইয়া পারে না। এই যে চটুল, কলহপ্রিয় কাউন্সিলগুলি সৃষ্ট হইল তাহাদের বাকবিতণ্ডার মধ্যে নির্ব্বাক কৃষক ও শ্রমজীবি-সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগ স্থান পাইবে না। মধ্যবিত্ত, ধনী ও জমিদারগণই তাঁহাদের বুদ্ধি ও আদর্শ মত আইন কানুন করিবেন। নিরক্ষর কৃষকশ্রেণী সেই তিন বৎসর অন্তর ভোট দিবার সময় একবার হয়ত রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের কথা ভাবিলেও ভাবিতে পারে। কিন্তু বৎসর পর বৎসর তাহাদের সহিত সদস্যগণের কোন সম্বন্ধই থাকিল না এবং সদস্যগণও শুধু খবরের কাগজ হইতে ও সহরের বক্তৃতা হইতে দেশের অভাব ও অভিযোগ মোচনের পন্থা নিরূপণ করিয়া লইবে। এই গেল আমাদের কথা।

প্রজাতন্ত্রের নূতন দিক

অপর দিকে পাশ্চাত্য জগতের প্রজাতন্ত্র এই কয় বৎসরের মধ্যে এক নূতন দিকে বিকাশ লাভ করিতেছে। ভোট হইল, একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইল এবং তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত রাজ্য চালাইলেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলি নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, অপর দিকে বিউরকেসি বা আমলাতন্ত্রের প্রকোপ বাড়িতে বাড়িতে শেষে তাহার চাপ দুর্ব্বহ ও সর্ব্বগ্রাসী হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকায় স্থানীয় রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করিবার আয়োজন চলিতেছে। ফ্রান্সে regionalism মানেই হইতেছে চৌকা চৌকা কৃত্রিম শাসনবিভাগ নীতিকে ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক সমাজ ও ব্যবসায় বিষয়ক বিভাগকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রীয় শক্তির উদ্বোধন ও উৎসাহ-প্রদান।

আর একদিকে যাবতীয় শ্রমজীবী তাহাদের বিভিন্ন কারখানা ও ব্যবসায়ে স্বায়ত্তশাসন চাহে। শ্রমজীবিগণ এইরূপে ব্যবসায় বিষয়ে পরোক্ষ শাসন ও নির্ব্বাচন প্রথা ত্যাগ করিয়া আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে স্বরাজ স্থাপনের প্রয়াসী।

এই সকল আন্দোলনের ফলে, এমন কি ইংলণ্ডেরও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পার্লামেন্টশাসনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রজাতন্ত্রের সংস্কার সাধন করিতে চাহিতেছেন। যাহাতে রাষ্ট্রীয়

জীবন ব্যক্তির নিকট বস্তুতত্ত্বহীন না হইয়া তাহার দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইংলণ্ডের কারখানা অথবা ব্যবসায়ক্ষেত্র ভিন্ন এই ভাবে নির্ব্বাচন-নিরপেক্ষ স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়া পাওয়া অসম্ভব।

আমাদের নীরব প্রজাতন্ত্র

প্রাচ্য-ভূখণ্ডে এইরূপ দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনকে আশ্রয় করিয়া একটা কর্ম্মঠ ও আড়ম্বরবিহীন প্রজাতন্ত্র চলিয়া আসিতেছে যাহাকে ভিত্তি না করিলে সমস্ত শাসন সংস্কার বিফল, এমন কি বিপদসঙ্কুল হইবার কথা। চীন মহাদেশের একান্নবর্ত্তী পরিবার, গোষ্ঠী ও গ্রামমহাজন বিবাদ নিষ্পত্তি, শান্তিরক্ষা, গ্রামপথ রক্ষা ও সংস্কার, আর্ত্তসেবা, তীর্থ ব্যবসায় প্রভৃতির ভার লইয়া এক প্রত্যক্ষ, নিরন্তর উদ্যোগী, অক্ষয় প্রজাতন্ত্রের সাক্ষ্য দিতেছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে কোন দূর শতাব্দী হইতে যে এক স্বাধীন গ্রাম্য সমাজ অব্যাহত ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া আসিতেছে, আমাদের ইতিহাস তাহার বিষয়ে আজও মৌন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সেই বিরাট সাম্রাজ্য শাসন যন্ত্রের মধ্যেও আমাদের সেই গ্রাম্য সমাজ তাহার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয় নাই। গ্রাম্য-সমাজ, কৃষি, শিল্প ও সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের আইন কানুন নিজেরাই তৈয়ারি করিত। তাহা ছাড়া শ্রেণী, পূগ, সমূহ প্রভৃতির স্বাধীনতাও অটুট ছিল। শুক্রনীতি ও যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে অথবা নারদের সূত্রে আমরা গ্রাম্য শাসনের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাই। চোল মহারাজ যখন উড়িষ্যা ও পেগু জয় করিয়াছিলেন, যখন তাঁহার জাহাজ লঙ্কা, আন্দামান, নিকোবার পর্য্যন্ত গৌরবে যাতায়াত করিত, তখনও তিনি তাঞ্জোর, মদুরার গ্রাম্য-শাসন বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডারে এমন কি রাজকোষের অর্থ গচ্ছিত রাখিতেন।

আকবর বাদসাহের খাজনা-সংস্কার গ্রামমণ্ডলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল, পেশোয়াগণের শাসনপ্রণালী দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। যেখানে যে কারণে এই স্বাধীন গ্রাম্য সমাজের কর্ম্মকুশলতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, মোগল জায়গীরদার, শিখ করদার, মারহাট্টা নায়েক, ইংরাজের জমীদার যেখানে সৈন্য সাহায্য অথবা খাজনা আদায়ের অছিলায় মাথা তুলিয়া প্রতাপশালী হইয়াছে, সেইখানেই গ্রাম্য সমাজ উদ্যমহীন, কলহপ্রিয় ও সংস্কারাবদ্ধ।

নূতন সংস্কার

কিন্তু এই বিরাট দেশে আজও বহু স্থানে আমাদের স্বদেশী পল্লীসমাজ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতেছে, সাধারণ ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছে, গ্রাম্য রাস্তা, নদী খালের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, নানা বিচিত্র উপায়ে কর স্থাপন করিয়া যাত্রা, কথকতা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতেছে। সেই গ্রাম্যসমাজ যেখানে অস্ফুট, তাহাকে সেখানে প্রকাশ করিতে হইবে, যেখানে সে নিস্পন্দ সেখানে তাহাকে সদা জাগরূক রাখিতে হইবে। যেখানে সে জাগ্রত ও কর্ম্মঠ সেখানে তাহাকে একগ্রামে দশগ্রামে, শত গ্রামের সমবায়ে এক বিরাট আকার দিতে হইবে। তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া যে কোন শাসনযন্ত্র আমরা সৃষ্টি করি না কেন, তাহার অচিরে শোষণযন্ত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। তাহাকে আশ্রয় করিয়া, সমবায়ের দ্বারা তাহাকে বিরাট বিস্তীর্ণ করিয়া গড়িতে পারিলে, আমরা যে শুধু পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রের কুফল হইতে আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে পারিব তাহা নয়, আমাদের অতীত ক্রমবিকাশের ধারা রক্ষা করিয়া সত্য সত্যই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সহিত জনসমাজের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ পুনরানয়ন করিব। তথাকথিত শাসনসংস্কার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সহিত দেশের সামাজিক ইতিহাসলব্ধ প্রথাপদ্ধতির বিরোধ সৃষ্টি করিয়া একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনের কৃত্রিমতা ঘোষণা করিতেছে অপর দিকে জনসমাজকে আরও অজ্ঞ ও উদাসীন করিয়া রাখিতেছে।

স্বাধীন ও স্বাবলম্বনশীল পল্লীসমাজই আমাদের সেই আসল স্বাভাবিক যুগপরম্পরা-অর্জ্জিত স্বরাজ। এই স্বরাজ নিস্তেজ থাকিলে আমাদের সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা ম্রিয়মাণ। এই স্বরাজের সহিত পাশ্চাত্যের আমদানী,

উপর হইতে স্থাপিত প্রজাতন্ত্রের একটা সমন্বয় না হইলে সে প্রজাতন্ত্র ক্রমাগত বিরোধের পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া শেষে ধ্বংসমূলক সমীকরণবাদে পর্য্যবসিত হইবে। সে সমাজকে পুনরায় ফিরিয়া না পাইলে আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ভাবুকতা ব্যর্থতার অতলে ডুবিয়া যাইবে।

তাই সুখের বিষয় যে, এই নব জাগ্রত ভাবুকতা তাহার সমস্ত অসঙ্গতি ও সরল ঔদাসীন্য সত্ত্বেও গ্রাম প্রত্যাবর্ত্তনকে জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের আধুনিক প্রজাতন্ত্র নিতান্ত কলহপ্রিয়, কারণ তাহার সহিত দেশের নাড়ীর সংযোগ, বিরাট জনসমাজের প্রভূত কল্যাণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, কৃষক প্রজাতন্ত্রের অভ্যুত্থান কেবল সম্ভব, যদি দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও ভাবুকতা কৃষক ও তাহার কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শিল্প-জীবনে নূতন আদর্শ

একদিকে যেমন স্বাধীন পল্লীসমাজকে নূতন প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অপর দিকে পল্লীগ্রামের বৈষয়িক জীবনে আত্মনির্ভর, কৃষি ও শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ এবং পঞ্চায়েতের দ্বারা গ্রামবাসীর সমগ্র কল্যাণকল্পে তাহাদের নিয়োগ,—বৈষয়িক জীবনের বিস্তারের জন্য পরিচালিত করিতে হইবে।

একদিকে যেমন দলবিভাগ নীতিসম্বলিত পার্লামেণ্ট শাসনের ভিতর দিয়া না গিয়া কৃষক-সমাজ গ্রাম্যসমিতি সমুদায়ের সমবায়ের দ্বারা এক কর্ম্মঠ ও প্রত্যক্ষ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে, অপর দিকে পাশ্চাত্য ইয়োরোপের সেই উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) শিল্পের উপর ধনীর একাধিপত্য ও অসংখ্য শ্রমজীবীর নির্যাতনের ধারা অতিক্রম করিয়াও আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিযোগিতার উপযোগী এক নূতন ধরণের শিল্প ও ব্যবসায় প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারি।

বাস্তবিক এই উপায় অবলম্বন করিয়াই আমরা আধুনিক সভ্যতার প্রতিযোগিতা ও নিষ্পেষণ হইতে আমাদিগকে মুক্ত রাখিতে পারিব। দুঃখের বিষয় এই যে, যে সমাজ-গঠন রীতি রাষ্ট্রের দলাদলির চীৎকার এবং ব্যবসায় জীবনে ধনী অথবা শ্রমজীবীর অবাধ আধিপত্যের উৎসাহ দিয়া আসিতেছে, সেই পুরাতন আদর্শ যাহা আজ পাশ্চাত্য ও পশ্চিম ইয়োরোপ ত্যাগ করিতেছে, তাহাই চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে এখনও সমাদৃত।

কলকারখানা

Capitalism অথবা ধন ও কলের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব না আনিলে যে এদেশে শিল্প ও ব্যবসায়ের বিস্তার অসম্ভব তাহা আমি মনে করি না। আমাদের দেশে যেখানেই বড় বড় কারখানা পাশ্চাত্য শিল্প প্রণালীর অনুকরণে জাগিয়া উঠিয়াছে সেইখানেই দেখি একটা ভয়ানক বিরোধ, ঘন অন্ধকারময় ক্ষুদ্র ও পঙ্কিল বস্তির অভ্যন্তরে শ্রমজীবিগণ যেমন তাহাদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র হারাইতেছে, তেমনি কারখানার অভ্যন্তরেও ঘূর্ণায়মান, রক্তচক্ষু ও রক্তদন্ত কলের কবলে তাহারা তাহাদের হাড়মাস সঁপিয়া দিয়াছে।

এটা ঠিক, যেখানে আমাদের মজুর মাতাল হয়, স্বাস্থ্য হারায়, যেখানে কুলি রমণীগণ তাহাদের সতীত্ব বিসর্জ্জন করে, বালকগণ জীবনের প্রারম্ভ হইতেই নির্জ্জিত ও কলুষিত হয়, সেখানে আমরা কি কি বর্ত্তমান শিল্প-শরীরের রোগ ও বীজাণু তাহা অনুধাবন করিতে শিক্ষা করিব। অপর দিকে সমগ্র দেশের আদর্শ ও ইতিহাসের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমান কালে জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠান ও তাহাদের অভাব অভিযোগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নূতন গঠনপ্রণালী অনুসন্ধানের সুযোগ করিয়া লইব।

সমূহ-তন্ত্র

ভারতবর্ষের জনসমাজে সমূহের প্রতিপত্তি এত বেশী যে, কোথাও ধনী যে আপনার সুবিধামত শ্রমজীবিগণকে ব্যবহার ও নিষ্পেষণ করিতে পারে, তাহার উপায় আমাদের পল্লীসমাজের রীতিতে নাই। বহুকাল হইতে

গ্রামবাসিগণের সাধারণ কল্যাণকল্পে পরস্পর সহযোগের নানা অনুষ্ঠান বিকাশ লাভ করিয়াছে,যাহাদিগকে অনুসরণ করিলেই আমরা পাশ্চাত্য সমাজের সেই বিষময় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইব এবং বিস্তার ও সমবায়ের দ্বারা একটা বৃহত্তর জীবন গড়িয়া তুলিব।

শিল্পজীবনে ধনী,বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর প্রতিযোগিতার দ্বারা নহে, পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারা, কাহারও অত্যধিক প্রভাবের দ্বারা নহে, প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধের দ্বারা, কোন বিশেষ শ্রেণীর উপর সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনের গুরুভার ন্যস্ত করিয়া নহে, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর পরস্পরের সদ্ভাবের ও সমবায়ে প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের কল্যাণ বিধানের দ্বারা যে শিল্পপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে তাহার নাম দিয়াছি সমূহ-তন্ত্র (Communalism)। ইহাই আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের অভিলব্ধ ফল। ইহাকে আশ্রয় না করিয়া ভবিষ্যৎ গড়িতে যাইলে ধনীর ও নির্ধনের শক্তি ও সুযোগের বৈষম্য ও তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ধ্বংসমূলক সমীকরণ, Socialism, Bolshevism হইতে আমরা রক্ষা পাইব না।

আমি এই সমূহ-তন্ত্রের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর হইতে আলোচনা করিতেছি। আমার আলোচনা ও লেখার উত্তরে অনেক দেশী ও বিদেশী সমালোচক এই প্রণালীকে দেশের ভবিষ্যৎ শিল্প বিস্তারের সহজ ও জাতীয় উপায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। পল্লী সংস্কার ও গ্রাম্য সভ্যতার পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে ইহার যতটুকু প্রযোজ্য কেবল তাহাই এই ক্ষেত্রে আমি নির্দ্দেশ করিতেছি।

ধর্ম্মগোলা

ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে এখনও ধর্ম্মগোলার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। অনেক মন্দিরে গ্রামের শস্য সংগৃহীত থাকে। তাঞ্জোর জেলায় এইরূপ মন্দিরে সঞ্চিত শস্য হইতে দুর্ভিক্ষের সময় ধান দাদন, অথবা বিতরণ করা হয়। কুর্গের মন্দির হইতে চাষের জন্য বীজ ধান ও বলদও দেওয়া হয়। এই ধর্ম্মগোলাকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে যৌথঋণদানসমিতি গঠন করিতে হইবে।

আধুনিক সমবায় সমিতির দোষ হইতেছে এই যে, তাহারা কেবলমাত্র টাকার লেন-দেন করে। খাদ্য শস্যাদির লেন-দেন, দেবি, বারি ও শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অল্প টাকায় যৌথঋণদানসমিতির কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। জমিদারেরাও ইহাতে লাভবান হইতে পারে। তাহাদের জমির ও আয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া গ্রাম্য ভাণ্ডার হইতে তাহাদিগকে ঋণ অল্প সুদে দেওয়া যাইতে পারে। জমী বন্ধক রাখিয়া এইরূপ লেন-দেন প্রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া ও জাপানে বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে।

পল্লীভাণ্ডার

গ্রামে গ্রামে পল্লীভাণ্ডার স্থাপন করিয়া সমগ্র গ্রাম্য সমাজের অভাব পূর্ব্ব হইতে নিরূপণ করিয়া কাপড়, কেরাসিন তৈল, চিনি প্রভৃতি একযোগে সহর হইতে পাইকারী দরে ক্রয় করিতে হইবে। মাড়োয়ারি অথবা বেণের অমিত লোভ এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। গ্রামবাসিগণ তাহাদের নিত্য-আবশ্যক দ্রব্যাদি ভাণ্ডার হইতে অল্প মূল্যে পাইবে এবং ভাণ্ডারের লভ্যাংশও বৎসরের পর কিছু পাইবে। যেখানে নগদ বিক্রয়ের বিশেষ অসুবিধা সেখানে ভাণ্ডার কৃষক ও শিল্পীর নিকট হইতে শস্য ও দ্রব্যাদি লইবে। ভাণ্ডার একই সঙ্গে ক্রয় বিক্রয়ের কেন্দ্র হইবে। বিভিন্ন গ্রামের ভাণ্ডার গুলি পরস্পরের সমবায়ে জেলার প্রধান ভাণ্ডারের অন্তর্গত হইবে এবং বিভিন্ন জেলার ভাণ্ডারগুলি কলিকাতার একটা বিরাট ভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। তাহা বিদেশী রপ্তানি ও আমদানির প্রধান কেন্দ্র হইবে। বিভিন্ন গ্রামের ও জেলার ভাণ্ডারগুলির দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া অসংখ্য শিক্ষিত যুবক সমাজ-সেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন অন্ন সংস্থানের সুযোগ পাইবে। এই উপায়েই দেশের ব্যবসায় একেবারেই আত্মনির্ভর হইবে।

গাঁতি

গ্রামে গ্রামে এখনও গাঁতি প্রভৃতিতে একযোগে কৃষিকর্ম্মের সুফলের পরিচয় পাই। সকলে মিলিয়া

যাহাতে বীজ হাড়গুড়া খৈল প্রভৃতি সার এবং ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক কল কিনিতে পারে তাহার জন্য কৃষকগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে গঠিত করা প্রয়োজন। আখ মাড়াইবার কল, বীজ রোপন করিবার কল, গভীর চাষ করিবার লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রাদি যাহা একজন কৃষকের পক্ষে ক্রয় করা অসম্ভব তাহা সকলে মিলিয়া ক্রয় করিতে পারিবে।

গৃহ-শিল্প ও ছোট কারখানা

সেইরূপ শিল্পিগণের মধ্যেও যৌথক্রয়সমিতির বিশেষ প্রয়োজন। অল্প সুদে কর্জ্জ পাইলে, সুলভ মূল্যে মাল মশলা সংগ্রহ করিতে পারিলে, সমবেতভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিলে, হস্তশিল্প যে অনায়াসে বড় কারখানার সহিত প্রতিযোগী হইতে পারে তাহা আধুনিক বেলজিয়ম, জার্ম্মাণী ও জাপান সাক্ষ্য দেয়। যেখানে বাজার সঙ্কীর্ণ ও স্থানীয় সেখানে হস্তশিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, সেখানে শিল্পী তাহার ক্ষুদ্র কারখানায় তাহার পরিবারবর্গের সাহায্যে সুলভে দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে পারে।

তাহা ছাড়া অনেকগুলি শিল্পী মিলিয়া ও বড় কারখানা ও কুটির শিল্পের মাঝামাঝি ছোট কারখানা স্থাপন করিয়া অনায়াসে ব্যবসায় চালাইতে পারে। এইরূপ জাতিগত কারখানা আমাদের দেশে কুটির শিল্পের সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া মাথা তুলিয়াছে। কাশ্মীর বয়ন-শিল্প, কৃষ্ণনগরের খেলনা তৈয়ারি, দাঁইহাট ও ঘাটালের পিত্তলের কাজ, ঢাকার শাঁখার কাজ, কটকের সোণারূপার কাজ, সবই ছোট খাট কারখানায় অতিবাহিত হয়। সেখানে অনেকগুলি শিল্পী একজন মিস্ত্রীর দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাহারই অধীনে কাজ করে এবং অনেক সময় তাহার নিকট বেতনও পায়। ঠিক এইরূপেই ফ্লানডার্সে লেস তৈয়ারি, জাপানে খেলনা তৈয়ারি, টাস্কানিতে বেতের কাজ, ইতালির সূক্ষ্ম রেশমের কাজ আজও চলিতেছে। কলিকাতার বহুবাজারে চেয়ার টেবিল তৈয়ারি, অথবা ভবানীপুরে সোণা রূপা কাজের মত আর একটু বড় করিয়া কারখানা যদি কুটির শিল্পকে প্রসারিত করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে হস্তশিল্পের পুনরুদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যুৎ, তৈল কিংবা গ্যাস ইঞ্জিন দ্বারা এইগুলি চালিত হইতে পারে এবং যৌথ প্রণালীতে ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারাও ব্যবসায় বিষয়ে বিশেষ সুবিধাও হইবে।

সাধারণ-ইলেকট্রিক ঘর

গ্রামে গ্রামে আমাদের পুকুর পুষ্করিণী, কূপ ও কৃষি কার্য্যের জন্য খাল সাধারণের সম্পত্তি। গোচারণ ভূমি অথবা গ্রামের জঙ্গলের মত সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রামের পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত। পঞ্জাবের ও মাদ্রাজের অনেকগুলি গ্রাম একত্র মিলিয়া অনেক সময় কৃষির জন্য বহু মাইল দীর্ঘ খাল খনন ও রক্ষা করে। পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডারের নাম "মালবা"। সেইরূপ দাক্ষিণাত্যের সমুদায় সম্পত্তি ও ভাণ্ডার হইতেও গ্রামের সমস্ত সাধারণ বাজের খরচ নির্ব্বাহ হয়। গ্রামের যেমন পাঠশালা, ধর্ম্মশালা, মন্দির, লাঙ্গার, চাবড়ি ও সমূহ-মঠম আছে, এইগুলি যেমন সাধারণ সম্পত্তি, এইগুলির জন্য যেমন জনসমাজ জমি দিয়া রাখিয়াছে অথবা বিচিত্র উপায়ে কর স্থাপন করিয়া তাহাদের ব্যয় ভার বহন করিতেছে, সেইরূপ ঐগুলির পার্শ্বে ইলেকট্রিক ঘর, বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্র ও কল কারখানার স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

ইলেকট্রিক-ঘর হইতে বিদ্যুৎশক্তি গ্রামে, যেখানে শিল্পী বিরলে বসিয়া আপনার তাঁত বুনিতেছে, ছুতর যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি চিরিতেছে, কামারশালায় যেখানে মানুষের হাত দীর্ঘ-ঘন্টার কঠিন পরিশ্রমে অবশ, সেখানে যাইয়া তাহাদের শ্রমশক্তির লাঘব করিবে, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বহুল করিয়া দিবে, দৈনন্দিন অভাব মোচনের উপায় বিধান করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বল ও তাহাদিগের রমণীগণের মনে শান্তি দিবে। এই উপায়ে বালুচর ও কুমিল্লার নষ্টপ্রায় বয়ন-শিল্প, খাগড়া-কাঞ্চননগর ও দাঁইহাটের পিত্তল, লৌহ ও কাঁসার বহু শ্রম-লব্ধ শিল্প-কলা নূতন জীবন লাভ

করিবে, গ্রামের পরিত্যক্ত আম কাঁটাল প্রভৃতিকে বহু কাল খাদ্যোপযোগী করিয়া রক্ষা করা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করা বৈজ্ঞানিক ও সুলভ হইবে। যেখানে গ্রামে অন্ততঃ একটা করিয়া ডাইনামো বসান অসম্ভব সেখানে গ্যাস ইঞ্জিন বা অয়েল ইঞ্জিন সরবরাহ করিয়া গ্রামের কারখানার কাজে লাগাইতে হইবে, অথবা ধান, ময়দা, তৈল আক পেষার কারখানা ঐ সকল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত করিতে হইবে।

গ্রাম্য পাটের কল

ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলায় যেখানে পাটের চাষ হয় অথবা মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যেখানে পাট সরবরাহ হয়, সেখানকার গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কারখানা বসাইয়া পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে। যে প্রভূত অর্থ পাটচাষী এবং পাটের দ্রব্যাদির খরিদদারের মধ্যবর্ত্তী দালাল, পাইকার অথবা কারখানার অধিকারীর কবলে থাকিয়া যায়, সে অর্থ পাটচাষী নিজেই ভোগ করিতে পারিবে। এইরূপ কারখানার সত্ত্বাধিকারী সমস্ত গ্রামেই হইবে, প্রত্যেক শ্রমজীবী এই কারখানার লভ্যাংশ পাইবে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েত মজুরী নিরূপণ, লভ্যাংশ বিতরণ ও শ্রমনিয়োগ সম্বন্ধে যথাযথ রীতি প্রবর্ত্তন করিবে। পরে এই সকল গ্রাম্য কারখানার সমবায়ে পাটজাত দ্রব্যাদির একটা প্রকাণ্ড আড়ৎ হইবে। সেখানে দেশ বিদেশের পাটের দাম বিচার করিয়া বিশেষজ্ঞগণ যথাসময়ে সুবিধামত বিদেশে পাট রপ্তানি করিবে।

পরস্পরের সমবায়ে গ্রাম্য কারখানা তাহাদের মাল-মশলা ও যন্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া অধিক সস্তায় সেইগুলি পাইতে পারে, এবং সকলে মিলিয়া আড়ৎ করিয়া এক যোগে বিক্রয় করিতে পারিলে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম।

গ্রাম্য স্বায়ত্ত কর-স্থাপন

কিন্তু ভারতবর্ষীয় পল্লী-সমাজ চিরকাল বিচিত্র উপায়ে নূতন নূতন অর্থ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করিয়াছে। বৃত্তি, মুষ্টি-ভিক্ষা, মার্চ্চা, কয়ালী প্রভৃতির সহিত আমরা বাংলা দেশে বিশেষ পরিচিত। মস্‌জিদ ও আরবী স্কুল রক্ষণের জন্য মুসলমানের কর-স্থাপন বা জাকাৎ প্রসিদ্ধ। আমি মান্দ্রাজের গ্রামে গ্রামে যাইয়া এরূপ বহু মস্‌জিদ ও আরবী স্কুল দেখিয়াছি যাহা লঙ্কা ও সিঙ্গাপুর বণিকের লভ্যাংশ হইতে পরিচালিত। সে সকল স্কুলে পেনাং মালয় ও সিঙ্গাপুর হইতেও অনাথ বালকগণ আসিয়া পাঠাভ্যাস করে। গ্রামে গ্রামে নিজ নিজ সাধারণ অভাব মোচনের জন্য কর-স্থাপন সমগ্র ভারতবর্ষে বিচিত্র-ভাবে দেখা যায়। ঐ সকল করস্থাপন গবর্ণমেণ্টের খাজনা দেওয়ার অতিরিক্ত। ইহাতে একদিকে যেমন পল্লীবাসীর কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাই অপর দিকে তাহাদের স্বাব-লম্বনের প্রতিও ভক্তি হয়। এইগুলিকে নূতন অভাব ও আদর্শের অনুযায়ী করিয়া ফিরিয়া পাইলে আমাদের গ্রাম-সংস্কার বিষয়ে আর টাকার অভাব হয় না। দাক্ষিণাত্য হইতে আমি কয়েকটী মাত্র করস্থাপন নির্দ্দেশ করিতেছি—

(১) প্রত্যেক বহির্ম্মুখী খড়ের গাড়ীর উপর দুই আনা।

(২) প্রত্যেক বিঘা জমিতে পাঁচ সের করিয়া চাউল।

(৩) প্রত্যেক ভিটার জন্য দুই আনা।

(৪) প্রত্যেক শিল্পীর নিকট চারি আনা।

এই উপায়ে গ্রাম্য সভার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়।

গ্রামের খাল, বিল ও পুষ্করিণী খনন বা সেগুলির উন্নতির জন্য গ্রামবাসিগণের জমির হিসাবানুযায়ী কর ধার্য্য করা হয়।

গ্রাম-সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের অন্যান্য উপায়:—

(১) গ্রামের নিকটস্থ সাধারণ জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ, পশুচারণ, ঘাস কাটা ইত্যাদির জন্য কর ধার্য্য করা হয়।

(২) সাধারণের পুকুরের হাঁস চারণের জন্য কর।

(৩) বাজার-কর (বা তোলা) যথা প্রতি গরুর গাড়ীর পিছু এক আনা, প্রতি ঝাঁকা বা বোঝা এক পয়সা, প্রতি ছাগল এক পয়সা, ইত্যাদি।

(৪) জলাভূমির ঘাসের জন্য কর-স্থাপন।

(৫) সাধারণের জমিতে গাছ রোপণ ও সাধারণের ফলন্ত গাছ জমা দেওয়া ইত্যাদি।

(৬) যে সকল গ্রামে তাঁতি আছে সেখানে প্রত্যেক তাঁত প্রতি কর।

(৭) কসাইএর নিকট হইতে প্রত্যেক ছাগল প্রতি দুই আনা।

(৮) পান, মাছ, ভেড়া ও ছাগলের মাংস বিক্রয় যে জমা লয় তাহার নিকট হইতে কর আদায়।

(৯) গ্রামের খামারের কাছে শস্য মাড়াইএর সময় পান সুপারী, আক কিংবা গুড়ের দোকান যে করে তাহাদের নিকট কর আদায়।

(১০) গৃহস্থের বাড়ী ধানের তোলা তুলিয়া সেই টাকা দ্বারা গ্রাম্য কোন উৎসব, গ্রাম্য ধর্ম্ম-মন্দির বা গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা। এইরূপে গ্রামের আয় অনেক সময় ২০০৲ টাকা হইতে ৫০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। গ্রামের টাকার অভাব নাই। তাহা নিয়োগ করিবার লোক ও পন্থার অভাব।

টাকা জমাইবার টিকিট

এই সকল অনুষ্ঠানের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যাইতেছে। দুই আনা করিয়া সেভিংস্ টিকিট সৃষ্টি করিয়া তাহা হাটে, মেলায়, শ্রাদ্ধাদির সময় বিক্রয় করিয়া দরিদ্র কৃষককে সাধারণ ভাণ্ডারে অর্থ গচ্ছিত রাখিতে ও মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই টিকিটগুলি দুর্দ্দিনে ফিরাইয়া দিয়া তাহারা অর্থ লইতে পারে। অথবা এই টিকিট বিক্রয়ের সঞ্চিত অর্থ জীবনবীমা অথবা গো-মহিষাদির বীমার সূচনা করা যাইতে পারে। গো-জাতির যেরূপ অবনতি হইতেছে তাহাতে এই বিষয়ে কিছু করা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিক আবশ্যক মানুষের ম্যালেরিয়া বা বার্দ্ধক্যজনিত অবসাদ ও অসহায়তার সময় তাহাকে বীমার টাকা হইতে সাহায্য করা। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার জীবনবীমার অথবা লাঙ্গলের গরুর বীমার জন্য কত দিবে তাহার বিচার বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। শস্য বীমার ও প্রচলন এই উপায়ে সম্ভব। শুধু আর্থিক ও বৈষয়িক দিক দিয়া নহে, আমাদের পল্লীগ্রাম আনন্দের লীলাক্ষেত্র হইবে; গ্রাম্যভাণ্ডার হইতেই পূর্ব্বেকার মত এই সকল সাধারণ আনন্দ কৌতুক ক্রীড়ায় উৎসবের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে।

পঞ্চায়েতের আশা

পঞ্চায়েৎ মামলা বিবাদ নিষ্পত্তি করিবে। আজও আমাদের দেশে অনেক স্থানে বিশ-পঞ্চাশ শতগ্রামের পঞ্চায়েতের অধিবেশন হয়। পূর্ব্বে গ্রাম্য সভার হাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার শেষ নিষ্পত্তির ভার অর্পিত ছিল। পঞ্জাবে উত্তরাধিকার ও গ্রাম্য ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গ্রাম্য সভার সম্পূর্ণ অধিকার হাইকোর্ট বিশেষভাবে রক্ষা করিতেছেন। বিভিন্ন গ্রামের পঞ্চায়েত-গুলির সন্নিবেশে পরগণা, থোক, পটি, নাড়ু প্রভৃতির প্রাদেশিক আদালত গঠন করিয়া পল্লী-স্বরাজ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নূতন সমাজ-শাসনের ইহাই বর্ত্তমান কালের উপযোগী প্রকৃষ্ট উপায়। সব দিকেই সমবায়ই প্রাচ্য সমাজের ক্রমোন্নতির ধারা, আর এই ধারা রক্ষা করিতে পারিলেই শুধু যে আমাদের ইতিহাস-লব্ধ অনুষ্ঠানগুলি রক্ষিত হইবে তাহা নহে, সাম্রাজ্য ও শিল্পের মাধ্যাকর্ষক শক্তি হইতে আমরা আমাদের স্বত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব। পল্লীভাণ্ডার গ্রাম-উৎপন্ন শস্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে, বিদেশ হইতে পাইকারী দরে নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সুলভে গ্রামবাসিগণের নিকট বিক্রয় করিবে এবং তাহাদিগকে লভ্যাংশেরও কিছু দিবে। কৃষিকার্য্যের জন্য বলদ, বীজ, সারাদি সমবেতভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডার নানাবিধ গ্রাম্য কর উদ্ভাবনে সদা পূর্ণ থাকিবে। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, গোচারণভূমির পার্শ্বে বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিপরিচালনের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখাইবে। টোলের পার্শ্বে শিল্পবিদ্যালয় জাগিয়া উঠিবে। শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে করিতেই বালকগণ

কিছু কিছু অর্জ্জন করিতে থাকিবে। কাপাস গাছ গৃহস্থের বাগানে আবার রোপিত হইবে। নূতন ধরণের চরকা ও টাকু প্রচলিত হইবে। আবার গৃহিণীগণ সূতা কাটিবেন এবং অবসর মত তাঁতে কাপড়ও বুনিবেন। মন্দিরের পার্শ্বে আমরা দেখিব সাধারণ বিদ্যুতাগার যেখান হইতে গ্রামের তাঁত ও কামারশালার যন্ত্রাদি পরিচালিত হইবে। কর্ম্মশালার পার্শ্বে আমরা দেখিব হাসপাতাল, যেখানে মহামারীর সময় রোগীর পৃথক-করণ ও সেবার ব্যবস্থা হইবে। চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বে আমরা দেখিব নূতন লাইব্রেরী। সেখানে রামায়ণ হইতে মহাভারত, ভূগোল, কৃষি, শিল্প, ধন-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সুলভ সংস্করণগুলি পাঠ করিয়া গ্রামবাসিগণ আবার তাহা পুস্তকাগারে ফিরাইয়া দিতে পারিবে। হাটের পার্শ্বে আমরা দেখিব আবার অভিনব সমবায় ভাণ্ডার, যেখানে অতি অল্প মূল্যে গ্রামের লোক নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি যখন ইচ্ছা পাইতে পারিবে। গ্রামের পাঠশালায় ম্যাজিক লণ্ঠন ও বায়স্কোপের সাহায্যে কৃষি, শিল্প, ভূগোল, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। গ্রামে গ্রামে হরিসভা প্রভৃতিতে আজও যাত্রা, কথকতা হয়। সমবেত ভাবে যাহা কিছু শিক্ষা ও আনন্দদায়ক তাহার উপায় উদ্ভাবন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক দিকেই বিচিত্রভাবে দেখা যায়। কোথায় কথক, কোথায় পৌরাণিক, কোথায় হরিবাসর, কোথায় ভজনওয়ালা নিয়মিতভাবে লোকের শিক্ষা ও আনন্দ-বিধান করিয়া আসিতেছে। সব ক্ষেত্রেই সাধারণ পাঠশালা, মন্দির, উত্তপুর সমূহ মঠ প্রভৃতির ব্যয় ভার পল্লী-সমাজ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। শিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে নূতনভাবে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের আদর্শের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষিপ্রধান দেশে শিক্ষা বিস্তারের ইহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও উৎকৃষ্ট উপায়। এই কথকতার দ্বারাই আজ পর্য্যন্ত চীন ও জাপান তাহাদের সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। ডেনমার্ক ও বেলজিয়মে এই কথকতার প্রণালী কৃষি ও গ্রাম্য-জীবনের উন্নতির প্রধান আশ্রয়। পাঠশালা মন্দির সবই রহিল, শুধু তাহাদের নূতন পুরোহিত চাই, তাহাদের নূতন শিক্ষা ও দীক্ষার মন্ত্র চাই। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি পূর্ব্বের মত ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে তাহাদের আহার্য্য বিধান হয়। গ্রামের কথক রামসীতা, অর্জ্জুন, ভীষ্মের পার্শ্বে ইতিহাস-বিশ্রুত জাতীয় মহাপুরুষগণকে সসম্মানে বসাইবে। রামলীলা, সীতাহরণ, নন্দোৎসব, রাসযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের ইতিহাসের মহিমাময় ঘটনাগুলির অভিনয় বৎসর বৎসর দেখিব। বার মাসের তের পার্ব্বণের সহিত আরও কত আনন্দ উৎসব দেখা দিবে। যে স্কুল শিক্ষা গ্রামবাসিগণকে এক্ষণে সৌখীন ও অকেজো করিয়া তুলিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে গ্রামের আদর্শক্ষেত্রে ও শিল্প-বিদ্যালয়ে স্বাধীন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা দেখিব। যে ধর্ম্ম এখন শুধু আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ তাহা সহজ ও স্বাধীন হইয়া সমাজের অসদ্ভাবের পরিবর্ত্তে মৈত্রী, হিংসার পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা, ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগকে আনিয়া দিবে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গ্রাম্য-জীবনের সমবায়ে এমন একটা পল্লী সভ্যতা জাগিয়া উঠিবে, যাহা আধুনিক নাগরিক সভ্যতার শোষণের পরিবর্ত্তে সহযোগ, অনটনের পরিবর্ত্তে সমৃদ্ধি আনিবে। সামাজিক ও বৈষয়িক বৈষম্য, যাহা বর্ত্তমান সভ্যতার প্রাণ, তাহার পরিবর্ত্তে আসিবে এক নূতন সাম্য যাহা আমাদের সেই ইতিহাসলব্ধ গোষ্ঠী ও সমূহ জীবনকে সঙ্কীর্ণতা হইতে বিস্তারের পথে লইয়া যাইবে। ঘরে, বাহিরে, হাটে, কারখানায়, নগরের সভায়, পঞ্চায়েতের বৈঠকে সব খানেই যে ভয়ঙ্কর বিরোধ আজ মানুষের অন্তর্জ্জীবন ও মানুষের বাহিরের সমাজ-যন্ত্রের সহিত অহরহ জাগিতেছে তাহার সমাধান হইবে এইরূপে,—মানুষ যাহা সৃষ্টি করিবে তাহাই প্রদান করিবে। স্বত্ব ভোগ নয়, লব্ধের বিতরণই লক্ষ্য। ইহা একদিকে যেমন অসংখ্য স্বাধীন কেন্দ্র, স্বাধীন পল্লীসমাজ, স্বাধীন কুটীরশিল্প ও কারখানা, স্বাধীন ধর্ম্ম ও আনন্দ-উৎসব সৃষ্টি করিতে থাকিবে অপর দিকে গোষ্ঠী প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া একটানা রাষ্ট্র ও শিল্পের শোষণ যন্ত্র হইতে মানুষকে রক্ষা করিবে। এই উপায়ে আধুনিক সভ্যতা

বিবিধ প্রণালীতে যে ব্যক্তির সৃজনশক্তিকে বিনাশ করিতেছে তাহার প্রতিবিধান হইবে। প্রাচ্যসমূহতন্ত্রের ইহাই ভবিষ্যদ্বাণী। আর এই সমূহতন্ত্রের কেন্দ্র হইতেছে আমাদের নিদ্রিত পল্লীসমাজ, যেখানে নারায়ণ মন্দিরে মন্দিরে গভীর মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন। সেইখানে তাঁহাকে জাগাইবার জন্য আজ বর্ত্তমান সভ্যতার পরিশ্রান্ত রক্তাভ সন্ধ্যায় তরুণ বাঙ্গালী অমল-ধবল শান্তি-শঙ্খ হস্তে পল্লী-দ্বারে দণ্ডায়মান।

খুকীর একরত্তি হাসি

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

চিক্‌মিকিয়ে মিলিয়ে গেল
ঐ যে ঈষৎ আলোর কণা,—
ঐটুকু যে মাণিক আমার,
দুখের শিরে লক্ষ-ফণা।
থাম্‌লি কেন পাগল মেয়ে?
যাক্ সোনালী ঝর্ণা বেয়ে,—
পাৎলা ঠোঁটের হাসিতে ঐ
আমাকে তুই পাগ্‌লা বনা'!

বাদলধারায় নাইব না আর
দেখ্‌ব বসি' বিজ্‌লী-খেলা,
তিক্ত-নিমের পাঁচন ফেলি'
দিস্‌রে আমায় মিছরি মেলা;
দিস্‌রে আমায় যেচে যেচে,
ফুল তুলে তা'র কাঁটা বেছে,—
উপকরণ ইষ্ট-পূজার
যা'তে হব হৃষ্ট-মনা!

কমলাকান্ত

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত]

যখন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীযোগে পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ-সম্পাতে নর্ম্মনিপুণ তটিনীবক্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠে, অথবা যখন স্ফুট চন্দ্রালোকে পাপিয়ার সুধানিঃস্যন্দী ঝঙ্কারে মাধুর্য্যকণা ক্ষরিতে থাকে, তখন সেই চিত্তগ্রাহী সৌন্দর্য্য, সেই প্রাণোন্মাদী মাধুর্য্য উপভোগ করিতে কয়জন ব্যাকুল অন্তরে ছুটিয়া আসিতে সমর্থ হয়, কয়জনই বা সেই নিত্য নবীন পীযূষধারার আস্বাদনে অধিকারী হয়? যাঁহার চিত্ত সংসারের শোক তাপের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে, জীবনের অনন্ত ঘাত প্রতিঘাতও যাঁহার চিত্তের সরল স্বচ্ছ গতিকে রেখাচ্যুত করিতে পারে না; অনন্ত প্রসারিত তারকাখচিত নভোমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্যে যিনি আত্মবিস্মৃত, অথবা শ্যামল বনবীথিকার শান্তিমঞ্জুল অন্তঃপুর হইতে বনদেবীর মোহন বীণাধ্বনি শুনিয়া যাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়; এমন নির্লিপ্ত সংসারের শোক দুঃখে অচঞ্চল কবি ও ভাবুকের ভাগ্যেই সেই চির-ঈপ্সিত সৌভাগ্যলাভ ঘটিয়া থাকে। তিনি সামান্য বিহগকাকলী হইতে নির্ম্মল নির্ঝরের মধুর কলতান পর্য্যন্ত নৈসর্গিক শোভা সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়া অপরকে শিক্ষা দেন। সেই জন্যই কমলাকান্ত ভাবপ্রবণ কবি, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য পিপাসু রসিক।

হিন্দুর মতে জগতের সমূহ ইষ্টের প্রতিষ্ঠাতা অখণ্ড শিব স্বরূপ ভগবান্ শ্মশানচারী, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার;—চিতাভস্ম ও চন্দনে তাঁহার তুল্য জ্ঞান, সম্মান ও নিন্দায় তাঁহার তুল্য উপেক্ষা, ক্ষতি ও অর্জ্জনে তাঁহার তুল্য অনুভূতি। তাই শ্মশানেশ্বর নেশায় বিভোর থাকিয়া আপনার সুখভোগের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর বহু দূরে, তাই বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণে আপনার সকল স্বার্থ মিশাইয়া বিশ্বের মঙ্গল ধ্যানে চিরমগ্ন। সংসারেও এই মহা আদর্শে গঠিত উন্নত-প্রাণ পুরুষের আবির্ভাব হয়. তাঁহারা নিত্যনৈমিত্তিক স্বার্থসাধনে উদ্গ্রীব হন না, দৈনন্দিন সুখ দুঃখে চঞ্চল হন না, তাঁহাদের হৃদয়ে সমগ্র বিশ্বের মানবতা অনুভূত হয়। সমাজের উন্নতি বিধানে, ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধনে তাঁহারা অমৃতকল্প উপদেশ দিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের প্রত্যেক কথা মহাপ্রাণতায় পরিপূর্ণ, তাঁহাদিগের প্রতি উপদেশ বিশ্বের সার্ব্বজনীন প্রেম সংগীতে উচ্ছ্বসিত, তাঁহারা ব্যক্তি-গত বা সমাজগত যে ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহা বিদ্রূপবহুল হইলেও মোহন কল্যাণতানে হইতে অনুস্যূত। তাঁহাদিগের নেশায় বিভোর থাকাও সেই মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত, যাহাতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্যপথ বিচ্যুত না হন, যাহাতে নিন্দা প্রশংসার বহির্ভূত থাকিয়া জাতীয় উন্নতির দিকে মন প্রাণ সঁপিয়া দিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা শ্মশানেশ্বরের অনুকরণপ্রিয়। এই জন্যই সাধ্যমত সংসারের এতটুকু কল্যাণ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী আফিংখোর, বিবাহবন্ধনহীন নির্লিপ্ত।

ভীষ্মদেব খোসনবীস মহাশয়ের হৃদয়ে দেশহিতৈষিতার ইচ্ছা বড় প্রবল হইয়াছিল, তাই তিনি কমলাকান্তের রচনা-গুলি অগ্নিদেবকে উপহার দেন নাই; যাহারা অনিদ্রা-রোগে পীড়িত তাঁহাদের উপকারার্থে তিনি ইহার প্রচার করিয়াছেন, কারণ তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছিলেন কমলাকান্তের মাথা মুণ্ড লেখা শুনিলেই তাঁহার নিদ্রা আসিত। দুঃখ দারিদ্র্যে বিপর্য্যস্ত মানবের ক্লিষ্ট অন্তরে সুখ চন্দনের আরামপ্রদ শীতল প্রলেপ দিয়া শান্তির বিমল উৎস ছুটাইবার শক্তি যে কমলাকান্তের রচনাগুলির মধ্যে নিহিত ছিল, এতটা জ্ঞান ভীষ্মদেব খোসনবীসের উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 'সংসার-নেমির নির্ম্মম আবর্ত্তে নিষ্পেষিত, স্বার্থপরতার তীব্র আলোকে মোহান্ধ বাঙ্গালীকে সহানুভূতি দেখাইয়া, তাহাকে বিদ্রূপ

করিয়া তাহার সহিত একত্র হাসিয়া, তাহার দুঃখে আপনি কাঁদিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের পথে ফিরাইয়া আনিতে কত উপদেশ দিয়াছে,—তাই কমলাকান্ত বাঙ্গালীর চক্ষে কল্যাণবিধায়ক ঋষিকল্প যোগী।

কমলাকান্তের উপদেশগুলিকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) বিদ্রূপাত্মক, (২) হাস্যরসাত্মক ও (৩) করুণরসাত্মক।

বিদ্রূপাত্মক রচনা—

জননী যেমন পুত্রের দৌরাত্ম্যে ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে শাস্তি দিয়া পরে দুঃখিতান্তঃকরণে নীরবে গৃহকোণে বসিয়া থাকেন, অথবা যেমন সময়ে সময়ে তাঁহার নয়ন যুগলে মুক্তাফল সদৃশ দুই একটি অশ্রুবিন্দু দেখা দেয়, সেইরূপ এইস্থলেও পরের দীনতা ও হীনতাকে বিদ্রূপ করিয়া ব্যঙ্গকর্তা নিজেই বিদ্রূপের সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলেন। ইহাই হইল বিদ্রূপের সর্ব্বোচ্চ স্তর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃতি। কেবল মৃদু তিরস্কারচ্ছলে দোষটুকু দেখাইয়া দেয়, সে নির্দ্দয় ভাবে হুল ফুটাইতে জানে না। আফিঙ্গের মাত্রা চড়াইলে কমলাকান্তের নিকট বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফল বিশেষ মায়াবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতকগুলি অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়, কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়, কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে; কোনটি সুপক্ক হইয়া বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটীতে পড়িয়া থাকে; শৃগালে খায়—তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। আমাদিগের দেশের ধনী ব্যক্তিদিগকে কমলাকান্ত কাটালের সহিত তুলনা করিয়াছেন, কতকগুলি কাঁটাল যেমন ইচোঁড় অবস্থায় নষ্ট হইয়া যায়, পাকিলে হয়ত পাকিতে পারিত, সেইরূপ কতকগুলি ধনী সন্তান অল্প বয়সেই সঙ্গদোষে নষ্ট হইয়া যায়। পাকিয়া আবার উচ্চ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিলে দেওয়ান গোমস্তারূপ শৃগালেরা উদরসাৎ করে। আবার যদি দুই একটি পাকা কাঁটাল ঘরে তোলা গেল ত মাছির ভন্‌ভনানি আর ছাড়ে না—এই মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, ইহাকে কিছু রস দাও, এ মাছিটীর টোলে পোনে চৌদ্দটী ছাত্র, ইহাকে কিছু দাও; এইরূপে রসহীন হইয়া ধনী মহাশয়েরা ভব-নদীতে কাণ্ডারীশূন্য হইয়া পড়েন।

কমলাকান্ত দেখিলেন, যখন বসন্তাগমে মোহন সাজে ধরিত্রীর শোভা সম্পাদন হইল, তখনই মধুর কণ্ঠ পিক আসিয়া সুধাবর্ষণ করিতে থাকিল; যখন সুরভিত কুসুম বাসে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল, মৃদু মলয়ানিল বহিয়া একটা আনন্দের, একটা প্রীতির লহর তুলিয়া দিল, যখন সংসার সুখস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল, তখনই বসন্তের কোকিল আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করিল। তারপর যখন সর্ব্ববিধ্বংসী কঠোর হিমের দিনে তরুবল্লরীর নয়নাভিরাম শ্যামলশ্রী কোন্ ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ড স্পর্শে অপসারিত হইয়া গেল, যখন শ্রাবণের বর্ষণ ধারায় একটা মূর্ত্ত নিরাশ্রয়তা দেখা দিল, তখন বসন্তের কোকিলের দেখা নাই। কারণ সে ত শীত বর্ষার কেহ নয়। কমলাকান্ত দেখিয়া শুনিয়া সংসারের একদল লোককে বসন্তের কোকিলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—যখন বাবুর সৌভাগ্য সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে বিচরণ করিয়া বেশ উজ্জ্বল কিরণ দিতে থাকে, তখন তাহারা বৈঠকখানা জমকাইয়া বসেন, কিন্তু যখন বর্ষার রাত্রে বাবুটির পুত্রের অকালমৃত্যু হইল, বসন্তের কোকিলেরা আসিল কই? কাহারও অসুখ, এজন্য আসিতে পারিল না, কাহারও বড় সুখ, এজন্য আসিতে পারিল না। আসল কথা সেদিন বর্ষা বসন্তের কোকিল আসিবে কেন? বসন্তের কোকিল নিজে কালো, পরান্নপালিত, তাহার চোখে সকলই 'কু', তাই সে পৃথিবীতে কিছু সুন্দর দেখিলে অশোকের ডালে রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে আপনার কালো শরীর লুকাইয়া হিংসা ঈর্ষ্যার উদয়ে ডাকিয়া উঠে—'কু-ও'। যখন গৃহপ্রাঙ্গণে দাড়িম্ব শাখায় বসিয়া বসন্তের কোকিল দেখে গন্ধের দোলনি, গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, বকুলের রূপোচ্ছ্বাস একত্র মিশিয়াছে, তখনই সে গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া উঠে—'কু-উ'। ঐ পঞ্চম স্বরেই কোকিলের জিত। এ সংসারেও একদল লোক আপনাদের মনের সঙ্কীর্ণতা, ভাবের দৈন্য গলাবাজি ও তোষামোদের পত্রচ্ছায়ায় লুকাইয়া জিতিয়া যায়, তাহারাই সংসারে কোকিল আত্মীয়,

কেবল গলাবাজির জোরেই তাহারা সংসারে জিতিয়া যায়।

কমলাকান্ত "ফুলের বিবাহ" দিতেছেন। মল্লিকা ফুলের বিবাহ। কলিকা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল, কন্যার পিতা বড়লোক নহে, আবার অনেকগুলি কন্যার পিতা। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতে লাগিল, উদ্যানরাজ পাত্রটি বড় নির্দ্দোষ, কিন্তু বড় উঁচু, অতদূর নামিলেন না। ঘটক-রাজ ভ্রমর সম্বন্ধ লইয়া উপস্থিত হইল, কন্যা দেখিয়া মনোনীত করিল, তখন পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। এইস্থলে কমলাকান্ত বরপণ লক্ষ্য করিয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ঘটকরাজ ঘটকালী সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল— "ঘরে মধু কত?" গোলাবের সহিত সম্বন্ধ, বড় কুলীন, "ফুল্ল" মেল দরটার যে কম হইবে না, তাহাও ঘটকরাজ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলেন। কৌলীন্যের পক্ষ লইয়া এরূপ দর করাই বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহে একটা প্রধান ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে। কমলাকান্ত যখন এইরূপ বিবাহোৎসব ব্যাপারে অনন্যমনা রহিয়াছেন তখন নসাবাম বাবুর কন্যা কমলাকান্তের ভাব-বিভোরতা ভাঙ্গিয়া দিল, এইস্থলে কবি সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে যে কথা কয়টি বলিয়াছেন, তাহা এই বিদ্রূপ বহুল প্রবন্ধের মধ্যে কেমন একটা করুণভাবের সৃষ্টি করিয়াছে—

"সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল? মনে করিলাম সংসার অনিত্যই বটে, এই আছে, এই নাই। সেই রম্য বাসর কোথায় গেল, সেই হাস্যমুখী পুষ্প সুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র, গ্রহনক্ষত্রাদি গিয়াছে ও যাইবে, সেইখানে—ধ্বংসপুরে। সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?"

কমলাকান্তের চক্ষে সংসার একটি বৃহৎ বাজারমাত্র, সকলেই সেখানেই আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। কমলাকান্ত জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন সম্মুখে ভবের বাজার বিস্তৃত রহিয়াছে, প্রথমেই রূপের দোকান, পৃথিবীর রূপবতী রমণীগণ মৎস্যে পরিণত হইয়া বিক্রীত হইতেছে—। মেছনীরা হাঁকাহাঁকি করিতেছে, কেহ ডাকিতেছে "ফুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়বো, বোঝা বিক্রী হইলেই বাঁচি;" কেহ বা ডাকিতেছে "ওরে আমার সরস পুঁটি, বিক্রী হলেই উঠি, ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, বান্না যাবে চলে।" মাছের দালাল আছে, নাম পুরোহিত। দর জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন—"দর জীবনসর্ব্বস্ব," কিন্তু মাছ নাকি দুই তিন দিন মাত্র থাকিবে। এত দামে নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব ভাবিয়া কমলাকান্ত তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এই স্থলে কমলাকান্তের বিদ্রূপ বাক্যে একটা মহাসত্যের প্রকাশ হইয়াছে। রূপের জন্য মানুষ এতটা উদ্‌ভ্রান্ত হয় কেন? ক্ষণবিধ্বংসী বাহ্যরূপ ত আর চিরকাল নয়নমোহকর থাকিবে না, তৎপরিবর্ত্তে বরং যে হৃদয় সৌন্দর্য্য সংসারের দুঃখবিষাদের মাঝে শান্তির বিমল জ্যোৎস্না ছুটাইয়া দেয়, যে প্রাণের মাধুর্য্য আধিব্যাধিক্লিষ্ট মানবকে সুখের পূত মন্দাকিনী ধারায় পরিস্নাত করে সেই কমনীয় অন্তরের লাবণ্যই একমাত্র কাম্য নয় কি? কমলাকান্ত রূপের হাট হইতে বিদ্যার দোকানে আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি ফোঁটা তিলক কাটা ব্রাহ্মণ ঝুনো নারিকেল বেচিতেছে, ছুলিবার যন্ত্র তাহাদের নাই, কামড়াইয়া ছোবড়া খাইতেছে। অনন্ত সংস্কৃত সাহিত্য তাহাদিগের অধীত এই বলিয়া যাহারা দম্ভপ্রকাশ করে, কিন্তু যাহাদের কেবল পল্লবগ্রাহিত্বমাত্র বিদ্যা, তাহারাই কমলাকান্তের লক্ষ্যস্থল। পাশেই সাহেবদিগের এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকান—কালা মানুষ দেখিলেই এক্সপেরিমেন্ট চালায়, ইহাতে দাঁত উপড়ে মাথা কাটে এবং হাড় ভাঙ্গে, গ্রেভিটেসনের আশ্চর্য্য ব্যাপার নারিকেলের দ্বারা তাহাদের মস্তকে বুঝাইয়া থাকেন। ইংরাজ দোকানীরা আবার ব্রাহ্মণদিগের নারিকেল বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া বিলাতীযন্ত্রে ছেদন করিয়া Asiatic Research বলিয়া চালাইতেছেন। বাস্তবিকই দুই পাতা সংস্কৃত পুঁথি উল্‌টাইয়া সাহেবেরা গবেষণা বাহির করেন, তাহাই আবার প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়া আসিতেছে। একস্থানে

আসিয়া কমলাকান্ত দেখিলেন একপার্শ্বে অলক্ষিত ভাবে পড়িয়া আছে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপক্ক কদলী। নিকটেই একটি তমসাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষ, চন্দ্রালোকে ফলক লিপি পড়িলেন—যশের পণ্যখানা, বিক্রেয়—অনন্ত যশ, বিক্রেতা কাল, মূল্য জীবন। বাস্তবিকই প্রকৃত যশ কেহ জীবিত অবস্থায় লাভ করিতে পারে না। মৃত্যুর পর যখন দেশবাসিগণের হৃদয় মন্দিরে তাঁহার যশের প্রতিমা ভক্তি বিল্বদলে পূজিত হইবে, তখনই বুঝিব, তিনি যথার্থ কীর্ত্তিমান্ পুরুষ, জগজীবী মহাত্মা। কিন্তু বাঙ্গালীর কর্ম্মপরায়ণতা কই? প্রকৃত কর্ম্মের উদ্যোগ তাহাদিগের নাই, কেবল ঘ্যানঘ্যানানিই তাহাদিগের ব্যবসা; তাই কমলাকান্ত শুনিতেছেন, ভৃঙ্গরাজ বলিতেছে, বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিব না ত কি করিব? তোমাদের মধ্যে যারা রাজা মহারাজ কি এমনি একটা মাথায় পাগড়ি 'ভ' হইলেন, তিনি গিয়া বেল্‌ভিডিয়ারে ঘ্যান ঘ্যান আরম্ভ করিলেন। যিনি কেবল একটি চাকরীর উমেদার, তাঁর ঘ্যানঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। কেহ বা মনে করেন, ঘ্যানঘ্যানানিতে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যানঘ্যান করিতে থাকেন। তোমাদিগের ঘ্যানঘ্যানানি আর ভাল লাগে না, কাজের লোক হইতে শিখ, মধু সংগ্রহ করিতে শিখ, ফুল ফুটাইতে শিখ।" ইহাই যে কমলাকান্তের প্রাণের কথা, ভ্রমরের মুখ দিয়া আপনার অন্তরের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বাঙ্গালীর এই অপকৃষ্ট অবস্থা আর ভাল দেখায় না, প্রকৃত কর্ম্মী হইতে হইবে, কেবল পরপদলেহন কিংবা পরের নিকট কৃপাভিক্ষা বড়ই হেয়, উন্নত হইতে হইলে স্বাবলম্বন চাই, আত্মাদর চাই, আত্মসম্মানজ্ঞান চাই, তা না হইলে জাতির প্রকৃত উন্নতি কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

(৯)

যতদিন বাবা ছিলেন ততদিন একটা যেন জোর ছিল। কিন্তু তাঁর প্রবল অস্তিত্বের ছায়া যখন সরে গেল, তখন যেন আমাদের সকলের শক্তিই ক্রমশঃ কমে এল। তিনি যে এই অদ্ভুত সংসারের পক্ষে কি ছিলেন, তা সেই দিনই সকলে বুঝতে পারলে, যেদিন সমস্ত গ্রামখানির হাহাকারের সঙ্গে তাঁর নরদেহ শ্মশানে ছাই হয়ে গেল। তাঁকে যারা ভয় করত তারা সেদিন হ'তে ভক্তি করতে আরম্ভ করলে, যারা ভক্তি করত তারা ভালবাসতে লাগল, আর যারা হিংসা করত তারা সহস্রবার করে এসে মাকে জানিয়ে গেল যে "তাঁর কোন ভয় নেই"।

সংসার তার পরে আবার ঠিকই চলছে, সবই আবার মায়ের চতুর্দ্দিকে সহজেই স্বস্থান অধিকার করেছে। কিন্তু আমার জনক, আমার ঋষি, আমার জগৎগুরু চলে যাওয়াতে আমার যেস্থান শূন্য হয়েছিল তাত কেউ পূর্ণ করতে পারেনি। সেই শূন্য স্থানটীর মধ্যে আমি কেন্দ্রহীন তারার মত ঘুরে মরছি। কবে যে এ ঘোরার শেষ হবে কে জানে?

বাবার মৃত্যুতে আমাদের সংসারে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, তার মধ্যে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটেছিল হাসির। যে বোবা পাগল মানুষটা আমাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল তাকে ধরে রাখিস সেই হাসার

মুখখানি যেন অতি সহজেই বর্ষার দিনের সজল উজ্জ্বল আকাশের মত থম থম করছিল। সেই বোবা মেয়েটী তার কোন পরিচয় দিতে পারে নি, তবু হাসি কি এক অদ্ভুত উপায়ে তার পরিচয় আবিষ্কার করেছিল। মেয়েটী যখন ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে আপনা হ'তে একটু আদটু নড়তে চড়তে আরম্ভ করলে, তখন হাসি, হঠাৎ একদিন বলে উঠলে, "মেয়েটির নাম, ব্যথা"। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে জানলি"? হাসি সে কথার উত্তর না দিয়ে চ'খে জল ভরে কেবলি হাসতে লাগল। আমি বল্লাম, "ব্যথাই বটে,—শরীরের মধ্যে কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটাটাই মূর্ত্তিমান ব্যথা হয়ে দাঁড়ায়। এও তেমনি হয়ে আমাদের মধ্যে আছে"।

মা বল্লেন, "ছি ছি তা কেন, অমন কথা ব'ল না তোমরা; তা হলে যে—দুজনার কাছ থেকে আমরা ওকে পেয়েছি তাঁদের অপমান করা হবে।"

হাসি বল্লে, "কখ্‌খন না—দাঁতে কাঁটা ফুটলে জিব যেমন সেইখানেই লেগে থাকে, ওই পরম দুঃখী মানুষটী আমায় তেমনি করে পিসেমশায়কে মনে করিয়ে দেয়। ওর নাম ব্যথাই বটে।"

মার চক্ষে জল দেখা দিল। তিনি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে চলে গেলেন। হাসিও তার ঘরে ঢুকে ছবি আঁকতে বসে গেল। আমি হাসির পাশে দাঁড়িয়ে সেই ছবিটা দেখতে দেখতে বল্‌লাম—"এ ছবিখানা ব্যথার ছবি।" হাসি মুখ না তুলেই বল্লে, "ব্যথার নয় আশার—দেখছ না মেয়েটীকে আকাশের মাঝখানে দাঁড় করিয়েও ওর হাত দুটো, চোখ দুটো ওপরের দিকে তুলে দিয়েছি? আকাশের ভয়ানক একাকীত্বের গৌরবের শিখরে উঠেও তার আশার শেষ হয়নি।"

আমি বল্লাম, "সেই জন্যই এ ছবি আশার নয় ব্যথার; যখন সে ভয়ানক একাকী তখনই সে ভয়ানক ব্যথিত"।

হাসি তার ছবি হ'তে মুখ তুলে আমার পানে চাইলে, তারপর কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে বল্লে, "ওঃ তাই এই ছবিখানার মুখে তোমার ছায়া পড়েছে। আমি না ইচ্ছে করেও তোমার মুখই এঁকে ফেলেছি।"

তার কথা যেন আমায় মারলে। আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে পালিয়ে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ হাসি এসে বল্লে, "একজন কে সন্ন্যাসী এসেছেন, ধর্ম্মশালায় বসে আছেন। তাঁর সারা শরীর হ'তে জ্যোতিঃ যেন ফুটে পড়ছে—চল না দিদি দেখবে।"

আমি চমকে উঠলাম—সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি আবার বালিশে মুখ গুঁজে বল্লাম—"আজ নয় হাসি আজ নয়—কাল দেখতে যাব।"

পরের দিন স্নান করে পুষ্পচন্দনে সাজি ভরে পট্টবাসে দেহটাকে সাজিয়ে সাধু দর্শনে ধর্ম্মশালায় গেলাম। গিয়ে দেখলাম, কি দেখলাম? কি জানি কি দেখলাম। সেই উন্নত বরবপু, সেই আপৃষ্ঠ লম্বিত শুষ্ক চুলের রাশি, যেন কপিশ কেশর বেষ্টিত মুখ মহাসিংহ অজিনাসনে বসে আছেন। চক্ষে তাঁর অপলক দৃষ্টি, কিন্তু সে দৃষ্টি কাউকে যে দেখছিল তা বলবার জো নেই।

কিন্তু একি সেই? এই এত বৎসর পরে কি সেই আমার পরম যোগী আমারই কাছে ঠিক তেমনি বেশে তেমনি রূপ নিয়ে ধরা দিতে এলেন? একি সেই? আমার মনের মধ্যে যে ছবিখানি এতদিন ধরে চুপ করে বসেছিল, আজকের এই প্রভাতের আলোকে সেই ছবিই কি এমনি ভাবে বাইরে এসেছে? হ্যাঁ, এ সেই বটে—

কিন্তু তবু কেন ভয় হ'ল? এ ভয় এতদিন কোথায় ছিল? এই যে এতদিন ধরে মনে করে এসেছি যে, যে মুহূর্ত্তে তিনি আসবেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলব, "এই যে তোমায় পেলাম, এই যে তোমায় ধরা দিলাম।" কিন্তু কৈ, চিনতে পেরেও ত ধরা দিতে পারছিনে, ধরতেও ত' পারছিনে?

ইনি তিনিই—কিন্তু—

হাসি আমার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "একি সেই।" আমি তার দিকে চেয়ে চক্ষু নত করলাম। সে কি বুঝলে জানি না, কিন্তু ধীরে

ধীরে তাঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করে পুজোপহারগুলি রেখে দিলে। তিনি একবার তার দিকে চাইলেন, তার পর ফিরে সেই দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতেই আমার মুখের পানেও চাইলেন। আমিও প্রণাম করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি মধুর গম্ভীর স্বরে বল্লেন, "তুমি কি ঊর্ম্মিলাদেবী?" আমি নত বদনে বল্লাম, "সেবিকার পিতৃদত্ত নাম জানকী, তবে মা আমায় আগে ঐ নামেই ডাকতেন।"

সন্ন্যাসী হাসির দিকে চেয়ে বল্লেন, "তোমার দিদিতে তোমাতে এত প্রভেদ। তুমি হাসি আর—বস'না তোমরা।"

দাসীর হাত হ'তে কম্বল নিয়ে আমরা দুজনেই বসলাম। তিনি অমনি সাজি হ'তে একটা পদ্মফুল তুলে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বল্লেন, "তোমার পিতা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু যাবার পূর্ব্বে এখানেও স্বর্গ রচনা করে গিয়েছেন দেখছি। ইচ্ছে হচ্ছে দুদিন এখানে থেকে তোমাদের কষ্ট দিই, কি বল?"

কষ্ট! হায় সন্ন্যাসি, তুমি আজন্ম বৈরাগী নইলে এমন নিষ্ঠুরের মত কথা কি বলতে পারতে?

হাসি তাঁর কথা শুনে হেসে বল্লে, "কত দিন কষ্ট দেবেন"?

"কত দিন? তা কেমন করে বলব? যত দিন ইচ্ছাময়ী মায়াময়ী আমায় এখানে ভুলিয়ে রাখবে ততদিন।"

"কত দিন ভুলিয়ে রাখবে?"

"তা কেমন করে বলব?"

"কেন? এর আর শক্তটা কি? দু' মাস কি ছমাস"।

সন্ন্যাসী এতক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তার দিকে ফিরে চাইলেন। এইবার ভাল করে তাঁর চোখ দুটী দেখতে পেলাম—কি উজ্জ্বল গভীর চক্ষু দুটী! কিন্তু সেই চক্ষু দুটীর মধ্যে, যা খুঁজছিলাম তা যেন কিছুতেই পেলাম না। এ সেই—তবু যেন সে নয়।

হাসি হঠাৎ তাঁর দৃষ্টির আঘাতে যেন কেমন জড় সড় হয়ে গেল। লজ্জায় তার সুন্দর মুখখানি লাল হয়ে উঠল, এবং সেই লজ্জার মধ্যে কেমন একটা ভয়চকিত ভাব ফুটে উঠে তাকে চুরি করতে-গিয়ে-ধরা-পড়া-চোরের মত দেখাতে লাগল।

তিনি তার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, "দুদিনও থাকতে পারি, দুবছরও থাকতে পারি—কিন্তু এসে পর্য্যন্ত যে রকম বেশী বেশী সেবা লাগিয়েছ তাতে বেশী দিন টিকতে পারব না বোধ হয়।"

হাসি ব্যস্ত হয়ে আমার দিকে চাইলে, তারপর মৃদুস্বরে বল্লে, "আপনি যে রকম বলবেন ঠিক তেমনি সেবাই যদি হয় তা হ'লে কি থাকতে পারবেন না?"

সন্ন্যাসী এইবার উঠে দাঁড়ালেন, তার পর ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর সুন্দর সুঠাম প্রভাতালোক-স্নাত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে কত কি যে ভাবতে লাগলাম তার ঠিক নেই। কিন্তু হাসির প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আমার মন যেন একটা অজানা আশঙ্কা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। মনে হল, ইনি যদি চিনিই ত বিদেশে ধরা না দিয়ে, পরিচয় না দিয়ে যেতে পারবেন না। কিছুতেই নয়। আমার এত দিনকার সিদ্ধি এত কাছে এসে অসিদ্ধ হয়ে ফিরে যাবে না।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ বাইরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই যেখানে ১০ বছর আগে সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতি প্রভাতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যেখানে দাঁড়িয়ে উষার প্রথম আলোটুকু দুই চক্ষু দিয়ে পান করে উষারই মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন, ইনিও সেইখানে প্রায় তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্মুখেই আমাদের বিস্তৃত পুষ্করিণীটী প্রভাতের আলোকে টল্ টল্ জল জল করছিল। ওপারের ঘাটে গ্রামের মেয়েরা কলসিতে জল ভরে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠছিল। পশ্চিম তীরের শিব মন্দিরের স্বর্ণ-কলস উজ্জ্বল হয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করছিল।

আমি সবই দেখলাম—এবং ঐ সমস্তের মধ্যেই ঐ প্রভাতের আলোকের জমাট দেহখানির দিকে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখছিলাম।

হাসি আবার সেই প্রশ্ন করলে। তিনি চট্ করে ফিরে বল্লেন, "তোমরা যদি চাও তা হলে—" তিনি কি বলতে গিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেমে

গেলেন। বোধ হয় আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, হয়তো আমার বুকের রক্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল—হয়তো আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। তিনি কি দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, "সন্ন্যাসীকে নিয়ে তোমরা কি করবে? তাকে ত' কেউ সহজে চায় না—চাইলেও কেউ পায় না, কারণ সে যে নিজেরই নয়।"

হাসি এইবার জোরে হেসে বল্লে, "অর্থাৎ সে কারুরই নয়, কেবল একমাত্র নিজেরই। যাক, আমরা তাড়িয়ে না দিলে ত' যাবেন না?"

সন্ন্যাসী ফিরিলেন না, কিন্তু তাঁর মধুর স্বর শুনতে পেলাম। তিনি বল্লেন, "সন্ন্যাসীকে কেউ চায়? আশ্চর্য্য!" তিনি আস্তে আস্তে ধর্ম্মশালার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আমি হাসিকে বল্লাম, "ছিঃ কি বেহায়ার মত কথা বলছিস্? উনি কি মনে করবেন?"

"কি আবার মনে করবেন? আর, কিছু মনে করলেই বা; উপায় কি? যেমন করেই হোক ধরে ত' রাখতেই হবে?"

"কেন? যদি উনি—"

আমার কথা শেষ হল না—কারণ যা বলতে যাচ্ছিলাম তা সাহস করে বলতে পারলাম না। হাসি হেসে বল্লে, "ইনিই তিনি। তোমার মুখ বলছে, চোখ বলছে, তবু তুমি সন্দেহ করবে? আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"তুমি ত' কখনো দেখনি।"

"নাই বা দেখলাম, তবু একেই যে তুমি এতদিন ধরে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ তাতে কি আর ভুল আছে। মা কাল দেখে গিয়েছেন—তিনিও চিনতে পেরেছেন। দিদিমাও চিনেছেন। এতগুলো লোক ভুল করবে?"

"দশ বৎসর পরে দেখা, ভুল হতেও ত' পারে?"

"তোমার হ'তে পারে কিন্তু আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

আমি আর কোন কথা বল্লাম না, কিন্তু মন আমার এমন হয়ে গেল কেন? সে যে পাওয়া না-পাওয়ার মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগল, দুলতে লাগল। এর উপায় কি? কত দিন দুলতে হবে—এমনি করে না মরে না বেঁচে থাকতে হবে? কে জানে কতদিন। (ক্রমশঃ)

স্নেহের লীলা

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

প্রভাতে উঠি ধড়া ও চূড়া কদম-ফুল চন্দনে
যতনে সাজায় নন্দরাণী—নন্দ-কুল-নন্দনে
কৃষ্ণ-চূড়ার পরাগ-রাঙা যুগল-কর-পদ্ম রে
স্নেহের পরশ কোন্ যাদুতে ফুটিয়ে দিল সদ্য রে!
শতেক চুমায় গণ্ড ভরি' বাঁধিয়া ভুজ-বন্ধনে
বক্ষে শুধু চাপিয়া ধরে নয়ন-মণি প্রাণ-ধনে
—"যাস্‌নে যাদু পাড়ায় পাড়ায় করিস্‌নে আর দুষ্টামি
খেলার ছলে পাগল করা এও যে বিষম নষ্টামি
ঘরে বসে' খেলরে সোণা, পাড়ার লোকে বকবে যে
"এমন ছেলে দুনিয়া ছাড়া" আমায় এসে বল্‌বে রে
মনে ভাবি পাড়ার লোকের কথার-কথা ধারব না
কাঁদবি কেবল বায়না ধরে, তোরেও আমি পারব না!"

বাজিয়ে নূপুর দুলিয়ে নলক ঘুরিয়ে নধর অঙ্গ রে
চল্‌ছে কানাই কোথায় পাবে শ্রীদাম-সুদাম-সঙ্গ রে !
নন্দরাণী পূজার আশে চল্‌ল দেব-মন্দিরে
ইষ্টদেবে ভাব্‌তে যাবে ?—নন্দ-দুলাল দ্বন্দ্বী রে !
পূজার মন্ত্র পড়তে মুখে, মন ডেকে কা'র নেয় সাড়া
ধ্যানের মাঝে মূর্ত্তি ও কার সে যেন তার কার বাড়া !

দেব দেউলের পৈঁঠা 'পরে জট্‌লা কিসের ? দ্বন্দ্ব না ?
"দুষ্ট-ছেলের নাইক শাসন আদরটা ত মন্দ না !
মাখম ননি ফেল্‌ল কত ভাঙ্গল দধির ভাণ্ডটা
ক্ষির ছড়িয়ে করলে কাদা, দেখসে ছেলের কাণ্ডটা !
বাছুর ছেড়ে 'পিয়াল' গাই উল্লাসে কি লাস্যটা
আখার হাঁড়ি ফুটিয়ে দিয়ে দেখ্‌লে আবার হাস্যটা ?
ওমা, এমন ছেলে রাখবে বেঁধে এইত জানি মায়ের কাজ
পাড়ার লোকের গঞ্জনাতে হয়না'ক কি একটু লাজ ?"

"কানুরে মোর বক্‌তে পারি, মারতে পারি মা হ'য়ে
বাঁধ্‌তে পারি, কাঁদ্‌তে পারি, তাতে লো কার যায় বয়ে ?
পরে এসে বক্‌বে তা'রে মারতে যা'বে হাত তুলে
কেমন করে সইব আমি মায়ের ব্যথা সব ভুলে ?
বাঁধব তা'রে বাঁধন দিয়ে প্রাণের মানা শুনব না
মারব তা'রে যখন তখন কা'রো কথা মানব না !"

ছুট্‌ছে রাণী কানুর পিছে বিড়ম্বনা অল্প না
মন দিয়ে যা'র পায় না ধরা, তা'রে ধরার কল্পনা !
নন্দরাণী ঘেমেই সারা মুহুর্মুহু পড়ছে শ্বাস—
শিথিল-বসন অশ্রু ঝরে তবু কানুর ধরার আশ !

দুঃখ মায়ের কষ্ট মায়ের অশ্রু মায়ের সইল না
ছল ক'রে আর দুষ্টুপনা লীলার মাঝে রইল না
নিজেই এসে দিলেন ধরা, মা যশোদা বাঁধতে চায়
শতেক বাঁধন, গ্রন্থী কোথায় ? শিথিল হয়ে পড়্‌ছে পায় !

নন্দরাণী ভেবেই আকুল মাটীর পানে রয় চেয়ে
বুক ভিতায়ে পড়ছে ধারা পড়ছে সারা গা' বেয়ে
নামিয়ে মাথা চাইবে নীচে শিখার কুসুম কানুর পায়—
—পড়্‌ল যেমন, শিথিল বাঁধন শতেক ছাঁদে ছড়িয়ে যায় !

দুষ্টু ছেলে মিষ্ট হেসে চাইল মায়ের মুখ পানে
স্নেহের নিঝর শতেক ধারে উথ্‌লে ওঠে কোন্ টানে ?

শিব-পরিণয়

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

শিবের সহিত দেবীর একাত্মতা নিরূপনার্থ স্তুতি

শিব নাম 'পরে তব কতই প্রণয় গো
পার্ব্বতী সতী রূপা হোক্ তব জয় গো।
তোমার পূজার ফুল হিম জল পূর্ণ
জননী জননী ওগো আহরিব তূর্ণ।

"অকিন গোমুর" গ্রামে বিরাজিছ তুমি গো
শিব নাম ধরি' করি পরিপূত ভূমি গো
রক্ত বীজেরে নাশি' তোমার উদয় গো
পার্ব্বতী সতীরূপা তব জয় জয় গো।

রক্ত হরিত শ্বেত কত ফুল এনেছি
ইষ্ট দেবতা তোমা' পূজিব গো মেনেছি
আর্ত্তি ক্লান্ত মম শুনহ বিনয় গো
পার্ব্বতী সতীরূপা তব জয় জয় গো।

সে শিব অমর নাথ কৈলাস-গেহ গো
ভস্ম ভূষিত দেহ বরি' তব দেহ গো
মিলাল' আধেক দেহে এমনি প্রণয় গো
পার্ব্বতী সতীরূপা তব জয় জয় গো।

অষ্ট সিদ্ধি তব বিরাজিছে সঙ্গে
বিশ্বে ব্যাপিত হয়ে ধরিয়াছ অঙ্গে
বিনয়-বচনে হও কৃষ্ণে সদয় গো
পর্ব্বতী সতীরূপা তব জয় জয় গো।

নন্দীর কৈলাস গমন—বৃত্তান্ত কথন—বীরভদ্রের উদ্ভব

আছিলেন মহাদেব কৈলাস আলয়
বার্ত্তা দিতে নন্দী সেথা উপস্থিত হয়।
কৈলাস হইতে গিয়া দক্ষের ভবন
ব্যাপার ঘটিল যত কৈল নিবেদন।

দাহ আদি যাহা কিছু আছিল স্মরণে
বর্ণিল নিঃশেষ করি শিবের সদনে।
ধরিল সংহার রূপ রুদ্র ক্রোধভরে
জ্বলিল অনল যেন বিশ্ব গ্রাস তরে।

ক্রোধানল হ'তে বীরভদ্র উপজয়
বার্ত্তা বহি আসে নন্দী কৈলাস আলয়।

বীরভদ্রে মহাদেব বলেন তখন
আমি সেথা যাব কর প্রতিজ্ঞা এখন
কল্পান্তে করিব আমি যথা বিশ্ব নাশ
তেমনি করিবে তুমি গিয়া দক্ষাবাস।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সেথা আছে দেবগণ
বধ করি নিগ্রহিবে সবারে এখন।

সে মহাযজ্ঞের তুমি সাধিবে সংহার

বাহিরিয়া বীরভদ্র আগে ভাগে ধায়
ধ্বংস কার্য্যে রুদ্র দেব অনুসরে তায়।

হেরিয়া সভয়ে কহে যত দেবগণ
কর ক্ষমা রুদ্রদেব না কর নিধন
ক্রোধ মুখ হ'তে করি প্রলয় সংহার
বিশ্ব-হিতে নরকাগ্নি নিবাও আবার।

কালকূট হ'তে শীতলতা দাও দাও
গ্রন্থকার কৃষ্ণ পানে কৃপা চোখে চাও।

বীরভদ্রের আগমন ও যজ্ঞনাশ

সে বীর ভদ্র যত দেব গণে
নিজ পরিচয় করিল দান
নত মস্তকে লুকাল সকলে
ত্রাসে দেবগণ বাঁচাতে প্রাণ।
ধরিয়া তখন দক্ষের শির
কাটিয়া ফেলিল বহ্নি মাঝে
শিখা কেশ বেণী উপাড়ি 'উপাড়ি'
করে লজ্জিত দেব সমাজে।
কাহারে কাহারে পরাণে বধিল
কাহারে অনলে দহিল আর
কাহারে দারুণ নিগ্রহ করি
ঘুচাইল তার অহঙ্কার
কঠিন আঘাত করি শির'পরে
ভূমিতলে দেহ পাড়িল তার।
ব্রহ্মা পড়াল বৈদিক গাথা
অনল কুণ্ডে তারে ডুবায়
সূর্য্যদেবের দন্ত পংক্তি
তরাসে বিষ্ণু জপিতে লাগিল
শিব নাম কহি 'করুণা কর'
দাপটে তাহার যতেক দেবতা
কাতরে ডাকিল হে হর হর!
শুভ্র বরণ চন্দ্র বদন
নিমেষে করিল কালিম ময়
ধৈর্য্য টুটিল বিভীষিকা বশে
কলাচয় শিরে শোষিত হয়।
বিপদে পড়িয়া ডাকে নিরুপায়
ভস্ম ভূষণ করুণা কর
স্তব জাল পড়ে নানাবিধ ছাঁদে
তুষিবারে দেব দিগম্বর।
আছিলেন তথা যে সব দেবতা
হইলা মুষলাঘাতে কাতর
করুণ কণ্ঠে কাঁদিয়া কহিল
ত্রান কর কর আমারে হর।
স্তব করে তাঁর প্রথমে বিষ্ণু
পরে প্রজাপতি দেবতা চয়
এ ক্লেশ হইতে মোদেরে মুক্ত
করহ অচিরে করুণাময়।
মন বাটিকায় ভক্তি কুসুম
আজি থরে থরে ফুটিয়া রয়
কৃষ্ণ তোমারে ধেয়াবে যতনে
হৃদয় মাঝারে করুণাময়
ফুটিয়া উঠেছে যেই ফুল রাজি
সঁপিবে ও পদে সে ফুল চয়।

ব্রহ্মার স্তুতি

ওহে মহাকাল নাশী নাগরাজ হার
এ সংসার হ'তে মোরে কর কর পার
মহারুদ্র দয়াতে হইলে অবতার
উদ্ধার করহ তুমি আত্মায় আমার।

সাধ্য যাহা সিদ্ধ তব নয়ন আলোকে
রূপ তব কালানল সম কি ঝলকে !
রবি শশী অনল তোমার ত্রিনয়ন
জটাধর রূপ তব আশ্চর্য্য কেমন !
ত্রিজগৎপতি ওহে দেব দিগম্বর
তব দেহ ভস্মে মাখা আছে নিরন্তর
উমাপতি জ্ঞানমার্গে করুণা করিয়া
চলহ চলহ প্রভু আমারে লইয়া
কৃষ্ণ যথা মুখে 'শিব' করে উচ্চারণ
ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে তেমন।

ধর্ম্মরাজ কৃত স্তোত্র

তোমার চরণ　　ধেয়ায়ে স্মরণে
　সংসার সবঃ তরিব হে
চরাচর রূপ　　হে গঙ্গাধর
　কল্যাণ রূপ স্মরিব হে
কল্যাণ কর　　কল্যাণ রূপ
　সর্ব্বব্যাপী তুমি হে
হৃদয় মাঝারে　　ধেয়াব তোমারে
　তুমি কল্যাণ-ভূমি হে।

পরমানন্দ　　স্বরূপ তোমার
　শুভদ চরণে সঁপিব কায়
শান্ত হইবে　　পরাণ আমার
　প্রত্যেক পলে নমি' তোমায়
উদ্ধত প্রাণ　　বহন করা যে
　হইবে আমার মরণ প্রায় !

বিনাশ বিহীন　　চেতন স্বরূপ
　শুনহ মোদের বালভাষণ
প্রকাশ বিহীন　　আঁধার মাঝারে
　রবি-শোভা উষা কর প্রেরণ।

পরমেশ্বর !　　কৃপা করি' আজ
　বাসনা মোদের কর পূরণ
তোমার চরণ　　হইতে এ দূরে
　কেন রাখিয়াছ করি' এমন।

পাপ বাসনার　　শরীর মায়ার
　মাঝারে আজিকে মজেছি হে
এ দেহ-বিনাশী　　কাল জাল মাঝে
　পক্ষীর মত পড়েছি হে।
ওহে ভগবান　　দয়াল মহেশ
　কি করিতে ভবে রয়েছি হে
ব্রহ্মা বিষ্ণু　　তুমি যে স্বয়ং
　তুমি দয়াময় মহেশ্বর
তিন ভুবনের　　স্বামী যে হে তুমি
　জয় হোক্ তব নিরন্তর।
শিব শাস্ত্রাদি　　পড়িব যখন
　সম্যক্ জ্ঞান হইবে মোর।

হংস বাহন　　ওহে ব্রহ্মন্
　হে দেব বিষ্ণু গরুড়াসন
কি কহিব আমি　　সকল অংশে
　করিতেছ তুমি সংচরণ।
সবার মাঝারে　　হে শিব আপনি
　রাজিছ যে তুমি অনুক্ষণ !
অন্ত পাইয়া　　তব ইয়ত্তা
　করিতে জগতে আছে কি জন ?
নিয়ত চিত্তে　　আগ্রহ মম
　রব তব সনে সকল ক্ষণ।

নরক হইতে　　উদ্ধারি' মোরে
　দেখাও আমারে গতি আপন
*সঙ্কট ভেদি　　ভস্মভূষণ
　হর হর বলে যেন বদন।

ওঁ নমঃ শিবায়

কৈবল্য হে করিব ধেয়ান
হৃদি মাঝে তব অনুক্ষণ।
নারায়ণ রূপে আপনি তুমি হে
বিরাজ' সর্ব্ব জীবের মাঝে
শুদ্ধ বিমল আত্মার রূপ
একাকী তুমি হে দেব সমাজে।
উপলক্ষ যে করেছ আমারে
প্রচারিব জপ তোমার লাগি'
প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রা হইতে
শান্ত ক্ষণে উঠিব জাগি'।
পূজিব তোমার চরণ যুগল
মন বিরোধিয়া কর্ণ ধ'রে
তোমার লীলার স্তবমালা দেব
পাঠ করিব হে ভক্তি-ভরে
মণি মালা আর মুক্তার হার
দুলাব তোমার কণ্ঠ পরে।
স্মরিব তোমারে প্রাণ মন মম
মিলিবে যতই সঙ্গে তব
নহিলে কি লাগি' এই ভব সবে
অগণিত দিন যাপিতে রব ?

মানস মিলায়ে তোমার সঙ্গে
উদাসীন সম রহিব
মূর্খ জনের দ্বেষ প্রতি দিন
প্রতি পলে আমি সহিব।
মহাকাল রূপ তব সমাবেশে
ঘুচিবে আমার যমের ত্রাস
কু-বাসনা মোর কুসংকল্প
অঙ্কুর সহ পাইবে নাশ।
যখনি হিয়ায় ধেয়াব তোমারে
কুবাসনা রাশি অমনি মম
শুকাবে হৃদয়ে বৃন্তের' পরে
স্ফুটিত সুবাস কুসুম সম।

অসংখ্য রবি হ'তে উদগ্র
ভাস্বর তেজ জ্বলে তোমার
রুধিরে অরুণ হস্তি চর্ম্ম
পরিধানে তব রয়েছে আর।
কৃষ্ণ পক্ষ বিহীন চন্দ্র
নন্দিত করে ও চারু ভাল
তব প্রেমে আসি মিলাব দীপ্ত
চন্দ্রিকা সম সুচির কাল।
তব দর্শন তুষার পুঞ্জে
ফুটিয়া উঠিব পদ্ম যথা
তব দর্শন অমৃত বরষে
বাড়িবে আমার মহাঘতা
মমাহঙ্কার করাতে চিরিয়া
কাটিব বিফল বৃক্ষ যথা।
দিবস তোমার নয়নোন্মেষ
নয়ন নিমেষ রাত্রি তব
দয়াময় ওই দর্শন লাভে
নিরুৎকণ্ঠ হইয়া র'ব।

তুমি যে হে নাথ সাধুর সেবা
কত প্রেম তব কি আর ক'ব ?
নির্ম্মল রূপ না হেরিলে তব
শুষ্ক হইবে জীবন মন
জীর্ণ শীর্ণ মালতীর মত
অচিরে হইবে মম পতন।
পরম আত্মা হে নীলকণ্ঠ
লম্বিত গলে বাসুকী হার
সহচর সহ চরণ যুগলে
আপনা সঁপিব পূজোপহার।
যেথানে রাখিবে যুগল চরণ
সে ঠাঁই স্বর্ণ যোজন দিয়া
আপন নয়নে পরখ করিয়া
পরম যতনে দিব বাঁধিয়া

সকল কলুষ　　　বিনাশ পাইবে
　তব কৃপাবলে স্বামী হে
ভক্তি সেনায়　　　করিব বিজয়
　মোক্ষ প্রদেশ আমি হে।
সন্তোষ বলে　　　ক্রোধেরে বিনাশি,
　মোহ রাজে আমি মোহিব
চরাচর রূপ　　　হে গঙ্গাধর
　কল্যাণ রূপ স্মরিব।
চির কল্যাণ　　　স্বরূপ হে নাথ
　জাগো কৃষ্ণের চেতনায়
প্রসন্ন হও ;　　　গত জীবনের
　পাপ যেন মম দূরে যায়।
দুঃখ পূর্ণ　　　চিরান্ধকার
　এই সংসার মোহের কূপ
শান্ত হইব　　　হে গঙ্গাধর
　মানসে স্মরিয়া তোমারি রূপ।

———

বরুণ কৃত স্তুতি

নিরাকার ওহে দেব ত্রিভুন সার
স্নানতাপে প্রতীক্ষায় রহিব তোমার।
হে ভস্ম মলিন দেহ মোরে অনুকূল
লুটাইব তব ভক্ত স’ধ্ পদ মূল।
ধরিয়া টানিব তব বসনের তল
আমা লাগি তব মন জানি হে চঞ্চল
ভুবন পালন এস নিমন্ত্রণে মম
পিয়াও অমৃত মোরে তব নিরুপম।
সর্ব্বভূত মাঝে আছ ত্রিভুবন-সার
পড়েনা নয়নে রূপ মায়ায় তোমার
ওহে সৎচিদানন্দ হৃদিপদ্ম মাঝে
বেদলভ্য কেবলাত্মা তোমার বিরাজে।
মনোরূপ ফুলবনে ফুটিয়াছে ফুল
লহ দেব অচ্ছ নামে কসুম অতুল।
ভরদ্বাজ জল-পাখী তব গুণ গায়
দিদরেরা শিবনামে ধরণী মাতায়।
হে কৃষ্ণ সরল বাঞ্ছা রাখ শুদ্ধ করি
আপন বুদ্ধিরে কর সত্য সহচরী
সত্য শুন সত্যে মন বাঁধ’ অবিচল
সত্য বৃক্ষে জনমিবে আনন্দের ফল।

———

গন্ধর্ব্বগণ কৃত স্তব

বিল্ব পত্র　　　মাদলী পত্র
　তরুণী পদ্ম কুসুম দল
ওহে মহাদেব　　　হে পরম শিব
　বরষি’ পূজিব ও পদতল।
জটার মুকুট　　　বহিয়া যাঁহার
　ঝর-ঝর-ঝর গঙ্গা ঝরে
ওহে দেব দেব　　　ব্রহ্মা বিষ্ণু
　অঞ্জলী বাঁধে তোমার ডরে
ভক্তির ভাবে ;　　　জয় জয় কার
　হউক তোমার নিরর্গল
বিল্ব পত্র　　　তরুণী পুষ্প
　ঢালিব তোমার চরণ তল।
হে দয়া সাগর　　　তব প্রেম ভাঙে
　মত্ত হইয়া রহেছি মোরা
এস ফুল ময়　　　চেতনা মাঝারে
　ধ্যানের মাঝারে এস গো ত্বরা।
এই সংসার　　　অসার ছলনা
　রবেনা কখনো অচঞ্চল
হে পরম শিব　　　পদ্ম-মৃণাল
　ঢালিয়া পূজিব চরণ তল।
আপনা ও পায়　　　দিবে উপহার
　শিব শঙ্কর এ কিঙ্কর
জাগে অভিলাস　　　হৃদয়ে হার্দ্দি
　হেরিতে তোমারে নিরন্তর।

মোরা নিরুপায় ওহে জগদীশ
প্রসন্ন হও মোদের পরে'
পদ্ম বৃন্ত তরুণী কুসুম
নিবেদিব পদে পূজার তরে।
তব পদ তল পদ্ম কোমল
এস হে তূর্ণ হৃদয় রাজ
প্রাণ মন সহ হৃদয়-কমল
নিবেদিব আমি ও পদে আজ।
তব আগমনে হিয়া সরোবর
ভরিয়া উঠিবে অমৃত জলে
পূজার লাগিয়া দিব হে পদ্ম
তরুণী কুসুম চরণ তলে।
সে অমর নাথ নীল কণ্ঠের
শিরে নিবেদিব কুসুম দল
ও হিয়া মাঝারে হোক্ সঞ্চার
কৃষ্ণে করুণা অচঞ্চল।
তাহারি লাগিয়া শিবের চরণে
অর্পণ করি সকল কাজ
পদ্ম কুসুমে তুলসী বিল্বে
শিব পদ পূজা করিব আজ।

সূর্য্য কৃত স্তুতি

হে বৃষ বাহন গুনের অতীত
দিব পদে অনিবার
প্রেম ফুল আমি তুলিয়া তুলিয়া
ওহে সর্ব্ব গুণাধার।
মণিমালা সম হৃদয়ের ভাব
ঘন ঘন আহরিয়া
তোমার গলায় প্রেম ভরে আমি
দিব দিব পরাইয়া।

হে কৈলাস বাসী পল খুঁজে মরি
পিয়াও আনন্দ অমিয়
স্মরিতেছি তোমা' সর্ব্ববিধপাপ
মোদের হরিও হরিও।
ত্রিভুবন পালি' উমাদেবী যিনি
বিরাজেন মহামায়া
হরিবেন তিনি আমার দুর্গতি
তব সহচরী জায়া।
দ্যুলোক তোমার শিরোরূপে রাজে
শিরা রূপে তরু রাজি
হে গৌরী শঙ্কর তৃণ রাশি আছে
তব কেশ রূপে সাজি'।
সূর্য্য ও শশী যুগল নয়ন
সাধু! তব ধ্যান ধরি'
তারকা নিকর রহিয়াছে ওই
নিশাজাগরণ করি'।
অগ্নি তব মুখ কর্ণ দিকচয়
ভক্তে সমাহিত মন
পাপের এ ভার নামায়ে মোদের
কর কর বিমোচন।
আকাশ তোমার নাভি দেশ পুনঃ
পৃথিবী চরণ দ্বয়
বেদ চারি তব মুখের বচন
উদর জলধি চয়
তথাপি রাজিছ নিরাহারে চির
হে শিব করুণা ময়।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হয়ে বিরাজিছ
বাহু ইন্দ্র দেবগণ
জন্মে তোমা' হতে ব্যবহার যত
আপনি নির্লিপ্ত মন।

বন্ধু তব যত শিখরা পর্ব্বত
পাল' সাধু দয়াময়
সবর জীবে এবে করুণা করিয়া
কব তব বন্ধু চয়।

ওহে মহামুখ তোমার মুখের
জানিনা বর্ণিব কি যে
সহস্র সবিতা একত্রে হইয়া
যেন সদা বিরাজিছে,
তব ক্রোধ রাশি সহসা জগতে
প্রলয়ের কাল সৃজে।
নিত্য আছি বাচি' বিনাশ রহিত
বিশ্ব স্থিত তব হাসি
জয় নিরাকর ওঙ্কার স্বরূপ
দিব পদে ফুল রাশি।

সিদ্ধ সাধুগণ সদা তোষে তোমা'
আপনা সঁপিব পায়
শ্রীগঙ্গা তোমার মাথার উপরি
কল্লোলে উথলি যায়।
সকলে তোমারে অন্বেষিয়া ফিরে
পর্ব্বতে অটবী মাঝে
যোগী ও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ
নিজ নিজ ইষ্ট কাজে।
প্রেমে ক্ষীর সহ শর্করা মিশায়ে
মাখাইব তব গায়
তোমার প্রেমের দুয়ার অর্গল
খুলিয়া দেহ আমায়।
দেব দেব ওহে মহাদেব তুমি,—
ভোজন প্রস্তুত করি'
সম্মুখে তোমার সাজায়ে রাখিব
খেও এই দীনে স্মরি।
দয়া হোক্ তব হে বিচারবান
দিব ফুল পদে ধরি'।

অমাবস্যা রাতে পূর্ণিমা নিশীতে
কাতরে করিব স্তব
মৃত্তিকায় আমি রচি' লিঙ্গরূপ
করিব হে পূজা তব
মুক্তি-দান কারী ওহে গঙ্গাধর
ফুল ঢালি' নব নব।
করিযাছ ক্রোধ দক্ষের উপরে
আমাদেরে রক্ষা কর
মহাভীতি আজি দেবতা অন্তরে
জাগিতেছে নিরন্তর।
ব্রহ্মা তব রূপ স্মরিয়া সতত
কপর্দ্দ গৌরাদি মন্ত্র পড়িছে
ভিত্তি'পরে যত দেবতা নিকর
পৃথক্ হইয়া পুনঃ মিলিছে।
নিখিল ব্যাপক তুমি বিশ্বরূপ
জ্বলিতেছ সদা হৃদয় মাঝ
প্রসন্ন হইয়া দারিদ্র্য মোদের
দাও দূর করি হরিয়া লাজ।
গঙ্গা ও যমুনা বীজিছে তোমায়
ব্রহ্মা বিষ্ণু তব করিছে ধ্যান
ইন্দ্র রাজ সহ দেব ধর্ম্মরাজ
চরণে তোমার সঁপিয়া প্রাণ।
বেত্র হাতে লয়ে নন্দিগণ ধায়
চারিদিকে অনিবার
তব তেজ কভু নির্ণয় করিয়া
তাহারা না পায় পার।
তব নাম স্মরি' পাপ রাক্ষসেরে
করেছি আমি সংহার।
কৃষ্ণ নামে গ্রন্থকার তব পদে অনিবার
জানাইছে দৈন্য আপনার
সঙ্কট হরিয়া সব. দূর কর দূর কর
মানসের দারিদ্র্য তাহার
হে নিত্য কল্যাণময় তোমার চরণ তলে
আপনারে দিব উপহার।

(ক্রমশঃ)

শিব সঙ্কীর্ত্তন

[শ্রীতারানাথ রায়।]

হেঁয়ালীভাষা।

বঙ্গে দ্ব্যার্থ বোধক বাক্য যুক্ত হেঁয়ালী ভাষার উদ্ভব বোধ হয় সন্ধ্যাভাষা হইতে। বঙ্গের প্রাচীন কবি মাত্রেরই ইহাতে হাত না পাকাইলে যেন কবিজন্ম সাথক হইত না। খোকা খুকারাও হেঁয়ালীর কত প্রিয়। "নাই তাই খাচ্ছ থাকৃলে কোথায় পেতে"র মতন শত সহস্র হেঁয়ালী বঙ্গীয় কিশোরদের কৌতূহল চরিতার্থ করে। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার উন্নত কাব্য মধ্যে এই হেঁয়ালীর ভাঁজটুকু যেন গৌরবের সামগ্রী। ইঙ্গিত দিয়া বিশ্বরাজ্যের অর্থ যাচাই করা কবিত্ব হইলে ও হেঁয়ালী। শব্দ যে বুঝিবার নয় তা ঠিক কিন্তু তাহার দোহাই দিয়া উৎকট বাক্য জালে মর্ম্মকোষের ভিতরই ভাব অন্ধ হইয়া ক্রন্দনকরে তাহা হইলে আমরা পাঠক নাচার !

কবির কাব্যকাল নির্দ্দেশক শ্লোকটী ত বুঝিবারই উপায় নাই

> শকে হল্য চন্দ্র কলা রামকল্যকোলে।
> বাম্ হল্য বিধি কান্ত পরিল অনলে।

সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও চিন্তানলে পুড়িতে লাগিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

উমার তপস্যাকালে ব্রাহ্মণবেশী শিব নিন্দাচ্ছলে আপনারই প্রশংসা করিয়াছেন, পূর্ব্ব পর জানা আছে বলিয়াই তাহা সহজ।

ভীমের প্রশ্নোত্তরে যখন

> বাগদিনী বলে আমার জাতার বটে না।
> শিব জানে আর আমি জানি তোর বাপের কি তা।

মোটাবুদ্ধি শ্রীমান ভীম চন্দ্র তখন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে থাকিলেও আমরা বাগ্‌দিনী কন্যার মর্ম্ম-কোষের

আবার মা ভগবতী বাগদিনী বেশে যখন বাবা ভোলা নাথ ক নিজ পরিচয় দিতেছেন—

> বঙ্গদেশে নিবাস শিখরপুরে ঘর,
> স্বামী বুড়া দরিদ্র দোলই দিগম্বর॥
> বাপের নাম হেমু দোলই সেবা যার শৌরি।
> মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী।
> বুড়াটি বিদেশ বনিতায় নাই রুচি।
>
> *　　*　　*
>
> অল্প দিনে দুটি বেটা দিয়েছে গোঁসাই।
> বহিন বিহিন পুত্র কার্ত্তিক গণাই॥

তখন জ্ঞানময় প্রভু নিতান্ত কামাতুর হইয়া অজ্ঞান না হইলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন।

শ্লীলতা।

কবি ভারতচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রে ও যখন রুচ সুস্থ হয় নাই তখন এই খৃঃ ১৭-১৮শ শতাব্দীর কবির নিকট শ্লীলতা দাবীকরা নিতান্ত অন্যায়। আপন সময়ে সাধারণের চক্ষে রামেশ্বর হীন ও অশ্লীল না হইলেও আজ আমাদের চক্ষে তিনি অক্ষত হইয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন না। কবি যেখানে বর্ণনা চাতুর্য্যের ও মনোহারিতার সঙ্গে অশ্লীল ব্যাপার উপস্থাপিত করেন তখন তাহা সম্প্রদায় বিশেষের উপভোগ্য হইলেও সাধারণের পক্ষে বিশেষতঃ মাতা ও ভগিনী বেষ্টিত সমাজের পক্ষে তাহা বিষবৎ ত্যাজ্য। পৃথিবীর সকল বিষয়েই আমরা বাস্তব বাগীশ হইতে পারি না—তাই রামেশ্বর চক্ষু মাথা খাইয়া লিখিলেন—

> "শাশুড়ীর সম্মুখে শিব হইল উলঙ্গ"

তাহতে আবার "নন্দী ছিল মশাল যোগায়ে দিল কাছে"

আর শিব "লেঙটা হয়ে শিঙ্গা বাজায় শাশুড়ীর কাছে"

তখন কবির শ্রোতাদের এক দিকে উৎকট হাস্য ও

লজ্জায় মরিয়া উঠিয়া গেল। ছবি নিখুঁত হইয়াছে বলিয়াই আরও বীভৎস।

আর যখন শিব বগ্দিনীকে কামবাসনা চরিতার্থের জন্য উপদেশ দিতেছেন—

তেজীয়ান পুরুষে পরশ নাই দোষ

তখন তাহা একেবারে

নির্লজ্জ ব্যাপার।

শেষে রামেশ্বর পার্ব্বতী পরমেশ্বরের জনক জননীর যে সম্ভোগে বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে সহস্র সৌন্দর্য্য থাকিলেও কাব্যখানি কলুষিত হইয়াছে। শৈব কাব্য রচয়িতা দিগের মধ্যে এক রামেশ্বর ছাড়া এ কলঙ্ক কাহাকেও স্পর্শ করে নাই।

কবির এমন কতকগুলি ছত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি। নিম্নে দেওয়া গেল—

নিত্য উদ্ধৃত হইবার উপযুক্ত ছত্র।

১। রূপে কাম রণে রাম দানে হরিশ্চন্দ্র।

২। স্বামীর ঘরে কন্যা থাকে ধন্য তার বাপ মাকে
অভাগার ঘরে থাকে ঝি।

৩। জন্ম থাকু আয়োতে জঞ্জাল যাকু দূর
উজ্জ্বল থাকুক সদা কজ্জল সিন্দুর।

৪। ঘর করিতে হাণ্ডিয়ে হাণ্ডিয়ে হয় ঠেকাঠেকি।

৫। অভিমানে উদ্ধত কৌরব গেল মরে।
অতি রূপে সীতাকে রাবনে নিল ধরে॥
অতিদানে বলিবদ্ধ বামণের ঠাঁই।
অতএব অধিক কৌতুকে কাজ নাই॥

৬। ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে।

৭। হাত সুধু জরাকে যৌবন দিবে কেনে।

(বৃদ্ধ তুমি, তোমার সঙ্গে প্রেম। হাতে তোমার কিছু অর্থ থাকিত তাহা হইলে না হয় টাকা পয়সার খাতিরেই বৃদ্ধ যুবা হইত। কিন্তু তোমার না আছে যৌবন না আছে অর্থ শুধু হাতে প্রেম হয় না)

৮। দাঁতে পুতে ভাল চাষ অভাবে সোদর।
অন্যথা হাভাতে হেল্যা বিকায় সত্বর॥

৯। ভিখমেগে খেয়ে আমি বুড়ালাম তবু।

১০। খৎ দিতে যায় যার খুদ নাই হাতে।

১১। লম্ফে লক্ষ যোজন যে জন যায় কেন্দে।
শক্তি খাট হলে হাটু ধ'রে উঠে কেন্দে॥

১২। পুঞ্জি আ'র প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

১৩। চাষ বলে ওরে চাষা আগে তোকে খাব
মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি খেতে হব॥

১৪। গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেলে দিয়া পুরুষ পাসবে সেকি জানে॥

১৫। কাজ ভাল নয় কিন্তু লাজ পেয়ে বই।

১৬। অনর্থের মূল অর্থ মত্ততার ঘর
দেবতা দুর্জ্জন হন ধন পেলে পর॥

১৭। ধর্ম্মের হইলে ধন ধনে কর্ম্ম বাড়ে।
অধর্ম্মের ধন হলে ধর্ম্ম পথ ছাড়ে॥

১৮। দুঃখী জানে যার দুঃখ দেহে গেছে ফলো॥

১৯। হাঁড়ির মুখের মত হয়ে গেল শরা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটা কৌতুক রস সমগ্র কাব্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। স্থানে স্থানে এই রস সামঞ্জস্যতা দোষ কিঞ্চিৎ দুষ্ট হইলেও অনাবিল হাস্য রসের যে অবতরণা নাই তাহা বলা চলে না।

কৌতুক রস

স্ত্রী আচার কালে বরশিব যখন এয়ো দিগের প্রতি সর্প ফেলিয়া দিতেছেন শাশুড়ীর সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া শাশুড়ীকে ঠেলা দিতেছেন তখন এয়ো মহলে হাঁসির সহ ক্রন্দন উঠিলেও পাঠক ও দর্শক না হাসিয়া থাকিতে পারেন না তৎপর শাশুড়ীদের জামাই নিন্দা অতি উপভোগ্য। ইহার কিঞ্চিৎ পরিবেশন না করিলে উদর পরায়ণ আখ্যা পাইতে হইবে—

ছকি বলে আরে মোর ছার কপালে ছি।
অন্ধ বরে বিভা দিনু খুদি হেন ঝি॥
শুয়ে থাকে শয্যায় সুন্দরী করি কোলে।
হাবা তাকে হারাইয়া হাতাড়িয়া বুলে॥
ষোড়শী সুন্দরী নারী সেকি তাকে সাজে।
পানকুড়া পোকা যেন পদ্ম ফুল মাঝে॥
চন্দ্রমুখী চাঁপা কান্দে মল্লিকার মোহে।

বোদণ্ডের মত সে কুণ্ডলারতি কুঁজে।
পুড়া পুটলির প্রায় পড়া থাকে সেজে॥

*   *   *

মাধুনী ধনীর তরে করে মনস্তাপ।
গোদা বরে সেধে এনে বেটী দিল বাপ॥
বারো মাস দারুণ গোদের গন্ধ ছুটে।
নাক ধরে নিকটে বসিতে আঁত উঠে॥
তায় তেল দিতে তনু ত্যাগ হয় ঘ্রাণে।
বিষম জঞ্জালে বাছা বাঁচিবে কেমনে॥

ছবিগুলি একদিকে যেমন করুণ অন্যদিকে তেমনি কৌতুক কর। কবির ছন্দ স্বভাবসুলভ অনুপ্রাস ও সহজ হাস্য রস যুক্ত মনোরম চিত্রগুলি আমাদিগকে না হাঁসাইয়া পারে না।

পিতা পুত্রের ভোজন চিত্রে "তিন জনের বার মুখ পাঁচ হাতে" যে কৌতুক রসের অবতারণা করিয়াছে তাহা জোর করিয়া আনা নহে, স্বাভাবিক। আবার সমস্ত দিনের হলকর্ষণ পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধিত সরল গোঁয়ার ভীমের যখন "ভাবনা হইল ভক্ষণের হেতু" তখন ছবিটি কৌতুককর। ভীম বলিতেছে—

"ক্ষেতে খাটি ক্ষুধা বড খাব কিহে মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু আজি কর ক্ষমা॥
পেটে অগ্নি জ্বলে এখন এত বড় কথা?
শিব বাক্য শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ ও গেল জ্বলে।
ডেকে উঠে ডাকাতে মাইলেক মোরে বলে॥"

পেট ভরে আমাকে ভাত দেও না, মামা মামী যুক্তি করিয়া—

ভুকে মোরে মারিতে এনেছ তপান্তরে।

.শিব কহিলেন—যা বাবা যা বাড়ী থেকে খেয়ে আয়। ভীম বলিল—

বা: বেশ ? "সারা দিন খাটি ক্ষেতে খেতে যাব সেথা?
আচ্ছা বেশ—"মামী জিজ্ঞাসিলে আমি কয়ে দিব ভাল।
কোঁচনীকে লয়ে মামা পলাইয়া গেল॥"

মামা ভাগনের সম্বন্ধ এখানে বড় চমৎকার। দয়াময়ের মনগড়া লাথির কথা মনে না হইলেও দয়াময়ীর ভয়ে ভয়ে বলিলেন—বস বাবা বস। কোথাও যেতে হবে না এখানেই তোমায় খেতে দিচ্ছি।

নারদের ঢেঁকীর আপ্সোস্ ঢেঁকী—জীবনের করুণতা ও রহস্য মিশ্রিত।

নারায়ণ কৈলা মোরে নারদের হাতী।
কুটে ধান গেল প্রাণ পেয়ে মেয়ের লাথি॥
পুরা হৈল পুরাতন আঁকাসলি নড়ে।
মুষলে কুশল নাই পাব পাড়ি গড়ে॥
কত বড দুঃখের কথা বলুন ত?

তারপর বাঙ্গালার মেয়েদের চির পরিচিত নারদের মূর্ত্তিখানি সং সাজিয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান—

বীণাধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মার নন্দন।
কৌতুকী কলহপ্রিয় কার্য্যের কারণ॥
বাম হস্তে বাম চক্ষু বুজিয়া তখন।
বিরোধিনী বলিয়া বাহনে আরোহণ॥
ঢক্ ঢক্ করি ঢেঁকি উঠাইল বাগ
দোকাঠি বাজায়ে চলে বলে লাগ লাগ॥
পাড়াগাঁয়ে পড়ি গেল কুন্দুলের গুঁড়া।
নগরের ভিতরে ফাজিয়া দিল পুড়া॥
ঝটাপটি ঝগড়া বহিয়া যায় ঝড।
চলে যেতে চৌদিকে চালের উডে খড়॥
গুণবান পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া।
বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রী পুরুষে ছাড়া॥
বেনা গাছে ঝুটি বেঁধে করায় কন্দল।
নখে নখে বাদ্য করে হাসে খল খল॥

আমাদিগকেও ইহাতে খল্ খল্ না হাসিতে হইলেও মৃদু মৃদু হাসিতে হয়।

কত উদাহরণ দিব? মশা ডাঁশের ও জোঁকের উৎপাত শিবের লাঙ্গে হাল হওয়া, বাগদিনীর সহিত প্রভুভক্ত ভীমের কলহ ও দোলাচল চিত্তবৃত্তি বিশ্বনাথের মানসিক চাঞ্চল্য শেষে শাঁখারী মাধবের সহিত পার্ব্বতী ও সখীগণের রস রঙ্গ এমন করিয়া কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা কৌতুকের স্বচ্ছ স্রোত প্রবাহিত দেখিতে পাই সঙ্গে পাই বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের বাহ্য ও অন্তর

কবির অন্তর্দৃষ্টি অতি গভীর। কাব্যের বিশ্লেষণ সময়ে আমরা তাহা একে একে দেখাইব। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও কবির চক্ষু হইতে নিস্তার পায় নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের এই অত্যদ্ভুত গুণ বর্ত্তমানে অতি বিরল। এই প্রাচীন পটুয়াদিগের অভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের বহু কথা হয়ত অপরিজ্ঞাত থাকিয়াই যাইত। উৎকট কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া বা সংস্কৃত কাব্যদেশে লেখনী চালন করিয়া যে ইঁহারা দার্শনিকতা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে যান নাই ইহা বাঙ্গালার পরম সৌভাগ্য।

অন্তর্দৃষ্টি

কাব্যের আখ্যান বস্তুটি বলা প্রয়োজন।—প্রথমে দক্ষ যজ্ঞ নাশ বর্ণনা পুরাণের অনুরূপ তাহার পর গৌরীর জন্ম। গৌরীর জন্ম হইতেই কাব্যের প্রকৃত ঘটনা আরম্ভ। তাহাতে পুরাণের প্রথম কাব্যের 'বৃদ্ধ পরম্পরা' বাক্যের অনুসরণ থাকলেও মৌলিকতার অভাব নাই। গৌরী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে নারদের ঘটকালীতে শিবের জন্য তপোরত মহাদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মদনের কৃপায় তাহা যখন ব্যর্থ হইল গৌরী তপস্যায় মন দিলেন। ফলে শিবের সহিত মিলন ও বিবাহ। বিবাহের পর শিব ঘরজামাই থাকিতে অস্বীকার করিয়া "কৈলাসে করিয়া ঘর নগরে মাগিয়া খায় ভিক্ষা" আধুনিক বৈরাগীদের মতন দিনে তিনি ভিক্ষা করেন, মেয়েদের ঔষধ দেন রাত্রে কোঁচনী পাড়ায় যাইয়া উৎপাত করেন। ভিক্ষা অন্ন গৃহে আসিলে ভগবতী পরম যত্নে পতি পুত্রদিগকে রন্ধন করিয়া পরিতোষের সহিত ভোজন করান। দারিদ্র্য হেতু ঘর কন্না লইয়া প্রায়ই কলহ হয়। হঠাৎ একদিন ধূর্জ্জটির ঝুলি ঝাড়িতে "প্রবাল মুকুতা হীরা রজতকাঞ্চন।" তাহা আবার "যত ঝারে তত পড়ে পরিশেষ নাই।" পার্ব্বতী তখন রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলে শিব সুদীর্ঘ আপন তত্ত্ব বলিলেন। বৈষ্ণব কবি এই সুযোগে হরিনাম মাহাত্ম্যের অবতারণা করিয়া পুস্তকের প্রায় একতৃতীয়াংশ ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। তত্ত্ব শুনিয়া গৌরী নিরস্ত হইলেন। এমনি করিয়া দিন যায়। দিন আর চলে না শেষে গিন্নী কর্ত্তাকে বলিলেন—

কাব্যের আখ্যান বস্তু

"পূর্ব্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হৈলে এবে।
আর নাকি ভিখ্ মাগা শোভা করে শিবে।"

ন—চাষ কর—"চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে উদাসীন হও ছাড় পরিজন॥"

বহু কলহের পর স্থির হইল চাষ করিতে হইবে। বিনা বেতনে বিশাই আসিয়া লাঙ্গল জোয়ালি আদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গেল। ইন্দ্র "দেবদেব দিলে লিখে দেবোত্তর পট্টা।" কুবের দিলেন বীজ ধান্য। শিব ভাগিনা ভীমকে লইয়া ক্ষেতে গেলেন। বিরহ আশঙ্কায় গৌরী বলিলেন—"ভাল যদি চাহ আমা লয়ে যাহ সাথে।
বাপ নেংটা ছেলে আমি নারিব পাতাতে।"
ভগবতী কোন প্রাণে ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিবেন, তাই ঐ উক্তি। নিতান্ত অনিচ্ছায় মা শেষে বলিলেন—

"তবে এস গিয়ে প্রভু।
সন্তানের ছলে তত্ত্ব করো কভু কভু॥"

বেশ দিনরাত্রি চাষ চলিতেছে। পার্ব্বতী আর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া নারদের মন্ত্রণায় শিবকে বাড়ী আনিবার জন্য মশা মাছি জোঁকাদি প্রেরণ করিয়াও যখন ফল পাইলেন না, তখন নিজেই বাগ্দিনীরূপে মহেশকে ছলিতে গেলেন। কামুক মহেশ বাগ্দিনীর ফাঁদে পা দিলেন—বাগ্দিনীও অন্তর্হিত হইল। বাগ্দিনী ছলিয়া যখন চলিয়া গেল, শিবও যখন বিস্তর খুঁজিয়া তাহার সন্ধান পাইলেন না—তখন তাঁহার "চঞ্চল হইল চিত্ত চণ্ডিকার তরে। বৃকোদরে বলে বাছা চল যাই ঘরে॥" সবে আসলে পার্ব্বতী পুত্রদিগকে বাপ্দী পিতাকে ছুঁইতে নিষেধ করিলেন। হর গৃহে প্রবেশ করিতেই নেপথ্যে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"বাগ্দির লাজ নাই ঘর ঢুকে মোর।
ছেলে পিলে ছুইলে ছুতুক্ হবে ঘোর॥
ভাল যদি চায় ত এখান হতে যাক্।
যেখানে রাখিয়া আইল বাগ্দিনী মাগ্॥"

ত্রিলোচনের তিন লোচন ত স্থির। যাহা হৌক নারদের কৃপায় কোন মতে মিলন হইলেও তাঁহারই কূটনামীতে আবার কোন্দলের সূত্রপাত হইল। নারদের উপদেশে পার্ব্বতী হরের নিকট শাঁখা চাহিলেন। নারদ মন্ত্রণায়

শিব বলিলেন—আমার পেট নাই ভাত—শাঁখা পাব কোথায়? তোমার জন্য বুড়া ষাঁড়টা বেচিতে পারিব না। বাপ আছে বড় লোক যাও সেখানে তবে শাঁখা পাবে।" অভিমানে গৌরী বাপের বাড়ী চলিলেন। শিবের যত মাথার কিরা ভায়ের কিরা সকলই ব্যর্থ হইল। হায়! হায়! "পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি।" নারদের পরামর্শে শিব একবার বাঘ হইয়া পথ আগুলিলেন—ফল হইল না। তারপর আদেশ দিলেন—

ঝড় বৃষ্টি ঝাটকের ছুট পুরন্দর।
আনাব অম্বিকা যেন ফিরে আসে ঘর॥

ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। কার্ত্তিক গণেশ মাকে বলিলেন দেখ মা—বাবার কথা না শুনিয়া ভাল হয় নাই, চল মা ফিরে যাই। মা দুর্গা এ বিপদে শিব স্মরণ করিতেই সকল বিপদ টুটিয়া গেল। এক অনাদি মণ্ডপে যাইয়া তাঁহারা উঠিলেন। সেখানে শিব বৃদ্ধ জীর্ণ এক ব্রাহ্মণ বেশে পূর্ব্ব হইতেই অন্ধকারে পড়িয়া রহিলেন। গৌরী শিবকে অন্ধকারে মাড়াইয়া গেলেন। বৃদ্ধ ছলে যত কথাই উমাকে জানাইলেন—কোন ফলই হইল না। তারপর শিবের মায়ানদী সৃজন—তাহাতে বৃদ্ধবেশে শিব তরী ঠেকাইলেন। মা বলিলেন পাটুনি কড়ি কি চাস্—

"রাজকন্যা রাজ-রাজেশ্বরী আমি সে।
মোর ঠাঁই কড়ি নাই আশীর্ব্বাদ লেহ॥"

কিন্তু "কর্ণধার ভালবটি নৌকাখানি ভাঙ্গা।" ভাঙ্গা নৌকায় তুফানে পড়িয়া গৌরী নদী গণ্ডূষ করিয়া রক্ষা পাইলেন। তারপর পিতৃগৃহে। মাধব শাখারীর বেশে শঙ্কর আসিয়াছেন। পার্ব্বতীকে "অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্ম-সমর্পণ" বিনিময়ে শঙ্খ পরাইলেন। পুরস্কার লইয়া গণ্ড-গোল হইতেই গৌরী চণ্ডিকাকালী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন—শাঁখারীর বেশ ছাড়িয়া "শিবরূপে পশুপতি পড়িলা কালীর পদতলে।" শ্বশুরবাড়ী সেদিন মহা উৎসব। আবার শিব পুত্রগণের সঙ্গে ভোজনে বসিলেন—আবার "ধরবাদ্যে সুবাদ্যে নর্ত্তকীর" নর্ত্তনের মতন সেবাময়ী পতিপুত্রকে অন্ন বিতরণ করিলেন। মহাদেব আদর করিয়া মহাদেবীর জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া মনোরম কাঁচুলি নির্ম্মান করিয়া দিলেন। শেষে মহামিলন।

চরিত্র চিত্রণ।

চরিত্রের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই নায়ক নায়িকা আসিয়া পড়ে। রামেশ্বরের নায়ক স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব নায়িকা স্বয়ং মাতা ভগবতী। এই হরপার্ব্বতীকে ঘেরিয়া ঘেরিয়াই কবির যত কবিত্ব, যত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। ভারতীয় কলার বিশেষত্ব চিত্র নায়কের অন্তর বর্ণন। বাহ্য জগতের কোন প্রয়োজন নাই। এই অন্তর যিনি যত নিপুণভাবে ফলাইতে পারিবেন তিনি তত বড় কবি—তত বড় চিত্রকর—তত বড় ভাস্কর। গঠন ও অঙ্গসৌষ্ঠবে ভারতীয় কলা অলঙ্কারিক ও শাস্ত্রকারের নাগপাশে বদ্ধ। নাসিকা আঁকিতে ও বর্ণন করিতে তিলফুলের মতনই করিতে হইবে—চক্ষু চাই খঞ্জন গঞ্জন বড় জোর পদ্মপলাশ। যে কলাবিদ্ এই বিধি লঙ্ঘন করিবে সে বিদ্রোহী। কিন্তু কবির লেখনী বা পটুয়ার তুলিকা সদা স্বাধীন—তাহাদের গতি অপ্রতিহত সে মানসিক চিত্রের সহিত বাহিরের ও যথাযথ আলোক চিত্র দান করিবে। তবে মানসিক চিত্র শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ভারতীয় কলা হিসাবে রামেশ্বরের চরিত্র শাস্ত্র সিদ্ধ নয়। তিনি কোন অবাস্তব জগতের ছবি দেন নাই বলিলেই হয়। চরিত্র গুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিব না। নানা প্রসঙ্গে তাহার কতকটা দিয়াছি আরও কতকটা দিব। শিবভবানী ছাড়া রামেশ্বরের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ভীম, নারদ, ও মেনকাই পরিস্ফুট।

প্রাচীন বঙ্গীয় কবির প্রিয় বিষয় বর্ণন।

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের ভিতর কতকগুলি বিষয় বর্ণণ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখা যায় প্রত্যেক মৌলিক, কবিরই ঐ সকল বঙ্গ কাব্যের প্রিয় বিষয় গুলিতে হস্তক্ষেপ করা চাই। অধ্যাপক দীনেশ বাবু এই প্রিয় বিষয় গুলির একটা তালিকা দিয়াছেন তাহার মধ্যে বারমাসী রন্ধন-ব্যাপার, স্ত্রীসজ্জা ও কৃষিই প্রধান। আমরা দেখিব কবি রমেশ্বর ঐ সকল বিষয় বর্ণনায় কতকটা পারদর্শী হইয়াছেন।

বারমাস্যা।

বার মাসীয়া সধারণতঃ হিন্দুললনার বারমাসের সুখ দুঃখ গীতি। সে হিসাবে রামেশ্বরের কোন বারমাসীয়া নাই। ঠিক ঠিক বারমাসের বর্ণনা

তাহার কাব্যে নাই তবে চাষ সম্বন্ধে দুই এক মাসের যে বর্ণন আছে তাহা পরিপাটি। এই বর্ণনার শেষে আষাঢ়ে যখন—

মহামেঘ মাঝে শক্র ধনু দিল দেখা।
শ্যাম শিরে শোভে যেন শিখি পুচ্ছ রেখা
অশনিব শব্দ যেন দামার নিশান।
বিরহী বধিত কাম দেবের প্রয়াণ

*　　*　　*

আর—চলন্ত বৃন্দা গেল নদী নালা আসে বান।
গগন পাণ নায প্রবাসে পার্ব্বতী মোহ যান।
শিব শিব রটে সদা উঠে পরিতাপ।
তাপের নিমিত্ত যেন দাদুরীর বিলাপ॥

এই কয়টি কথায় বারমাস্যার দুঃখের একটু ছায়া পাই। মনসা মঙ্গল গুলির সোনকার রন্ধন নৈপুণ্য বঙ্গ সাহিত্যে রন্ধন বর্ণনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রামেশ্বরের কাব্য রন্ধন বর্ণনার শ্রেষ্ঠত্ব উদাহরণ। রামেশ্বরের কাব্য রন্ধন নৈপুণ্যের নিদর্শন নাই। কবি সংক্ষেপে মাত্র রন্ধনটা সারিয়াছেন—

রন্ধন।

"শৈল সুতা সতী শুনি শঙ্করের ডাক।
চট পট চামুণ্ডা চড়ায়ে দিল পাক॥
শঙ্করীর হুঙ্কারে কিঙ্করী করে ত্রস্ত।
পায়স পর্য্যন্তপুর প্রস্তুত সমস্ত॥
পায়স করিয়া আদি সূপ করি অন্ত।
রাজ রাজেশ্বরী রামা রান্ধেন যাবন্ত॥
চর্ব্বচুষ্য লেহ্য পেয় তিক্ত কষায়ন।
অম্ল মধু চতুর্ব্বিধ ব্যঞ্জনের গণ॥

রন্ধন বর্ণন এই পর্য্যন্ত।

তবে রামেশ্বরের কাব্যে বঙ্গীয় অন্নপূর্ণাদিগের পরিবেশনের যে বর্ণনা, দরিদ্র গৃহের পিতাপুত্রের একত্র ভোজনের যে বর্ণনা, প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রসাদ পাইবার যে বর্ণনা—পরিশেষে বঙ্গীয় গৃহিণীর অপর পুরাঙ্গনাদি বেষ্টিত হইয়া অন্নমুখে উপকথা বলিতে বলিতে বহুক্ষণ ব্যাপি ভোজনের যে বর্ণনা তাহা বোধ হয় বঙ্গ সাহিত্যে দুর্লভ। সে চিত্রে মাতার যে স্নেহ প্রস্রবণ উছলিয়া উঠিয়াছে, পত্নীর যে প্রেম মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়াছে, কুশল বঙ্গ গৃহিণীর পরিশ্রান্ত সদাচঞ্চল চরণের যে নূপুর নিক্কণ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, আলুলায়িতকেশা, বিচ্যুত কাঁচুলী পরিবেশনরতা রাজরাজেশ্বরী অন্নদাত্রী জননীর ইন্দুমুখের মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দুর যে মনোরম শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বঙ্গের গৃহে গৃহে স্বর্ণ পটে স্বর্ণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া অহোরাত্র পূজা করিবার।

অলঙ্কার।

কবি স্ত্রলোকের যে বহুবিধ অলঙ্কার বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে সমসাময়িক প্রচলিত গহনা গুলির একটা তালিকা পাই। যথা—

পায়ে পাশুলি মল, গুলফের উপরে গোটামল, কটিদেশে কিঙ্কিনী, ঘাঘরের উপরে ঘণ্টা, বুকে কর্ণাটী-কাঁচুলি, কণ্ঠে বহুহার, ভুজে স্বর্ণের চুড়ি, তাহার কোলে রজতের কঙ্কন, বাহুমাঝে অঙ্গদবলয়, "আগে সাজে পঁউছি, পশ্চাতে বাজুবন্ধ", পাটখোপায় ঝাঁপা, সকল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী (মরকত চুণি মণি মাণিক্য খচিত), দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দর্পণের ছাব, পদচাকির উপরে বউলি, নাকে স্বর্ণের নথ, তাড়, কানে কুণ্ডল। ইহ ছাড়া

"সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী গর্ব্ব অলঙ্কার পরে।"
শঙ্খ বিনা সেহ কেহ শোভা নাই করে॥"

ছোট লোকের মেয়েরা দুই হাতে দুই গাছি মেঠে পাড়িত, গলায় রসের কাটি দিত, তাহার সঙ্গে দুটি হিঙ্গুলের পলা থাকিত, পায়ে পিতলের ঝুটা দিত অঙ্গুলিতে পিত্তলের অঙ্গুরী পরিত ও নাকে নাকচোনা দিত।

বেশবিন্যাস।

তখনকার বেশবিন্যাসের ছবি শঙ্খ পরিধানকালে গৌরীর সুসজ্জায় বেশ অঙ্কিত।

শঙ্করীকে কিঙ্করী বসায়ে বরাসনে।
বিশেষ করিলা বেশ বিস্তর যতনে॥

*　　*　　*

চিরুণীতে চিরিয়া চিকুর কৈল বন্ধ।
চর্চ্চিত করিয়া চুয়া চন্দন সুগন্ধ॥
বিনোদিয়া বসন পরিলা বিনোদিনী
সজল জলদে যেন দমকে দামিনী॥
কুচযুগে কর্ণাটী কাঁচলি কৈল বন্ধ।

সুন্দর কপালে দিল সিন্দুর বিন্দু।
রবিকে বেড়িয়া যেন রংগিলেন ইন্দু ॥
অভিচার অঞ্জন খঞ্জন আঁখে দিতে।
সম্বরারি বলে মরি সাধ নাহি জীতে ॥

তাহার পর একে একে উপযুক্ত গহণ গুলি অঙ্গে উঠিলা শেষে—

কর্পূর তাম্বুল খাইল এলাচি লবঙ্গ।
বিধুমুখী বিম্বাধরে বাড়াইল রঙ্গ ॥

এমনি বেশ করিয়া পূর্ব্বকালে শঙ্খ পরিতে বসিতে হইত। কারণ

বিধান—"দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার যত আছে তোলা।
সর্ব্বাঙ্গ সাজিবে শঙ্খ পরিবার বেলা ॥

এই প্রসঙ্গে কবি কেমন নিপুন ভাবে শাঁখা পরিবার ছবি দিয়াছেন তাহা আমাদের জননীগণের উপভোগ্য।—

শাঁখারী ও পার্ব্বতী উভয়ে সাম্‌না সাম্‌নি বসিলেন—

স্বর্ণথালে গঙ্গাজলে শঙ্খ তুলে ধুয়ে।
গাছি গাছি গুছাইল চক্ষে চক্ষে থুয়ে ॥
যেখানে যেখানি সেখানে রাখে জানি।
জয় রাম বলি বাম হস্ত নিল টানি ॥

কবির কি সুক্ষ্মদৃষ্টি। পর পর কার্য্যগুলি কতটা বাস্তব। তারপর—

"করে কর চাপিয়া" জোখা লইলেন শেষে বলিলেন ঠিক হইয়াছে। বাম হস্তে বেশ শাঁখা উঠিল, বিমলাবসন দিয়া শাঁখা পরা হাতটি—ঢাকিলেন। অমনি তখন শংখপ্রিয় বঙ্গ অন্তঃপুরের মেয়েদের যেমন স্বভাব—

"কর আনি কোলে টানি কত মেয়ে দেখে।"

মেয়েদের ডান হাতে শাঁখা পরিবার বেলাই কান্নাকাটি। ভবানীর মুখের দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধ শাঁখারী মাধব বলিল—

"দৃঢ় করি তেল জলে দিতে হৈল দলি।"

গৌরী দক্ষিণ ভুজের বসন খসাইয়া রাখিল। মাধব বেশ মর্দ্দিয়া জুখিয়া শাঁখা বাহির করিয়া বলিলেন বড় কষ্ট দিবে। চিপে যাইয়া যেমন সাধারণতঃ শাঁখা বাঁধে সেমনি বাঁধিল—

সেই দুইগাছি শঙ্খ পরিবার কালে।
ভাসিলেন ভগবতী লোচনের জলে ॥

শাঁখারী আশ্বাস দিতেছেন "দণ্ড দুই দুঃখ সয় থাক-গো না ধন।" নাঃ—শাঁখাত যায় না। অম্বিকা শাঁখা পরিতে যাইয়া বঙ্গীয় কুল ললনাদিগের মতন কাঁদিলেন। তারপর যাহা হয়—

ব্যস্ত হয়ে বিধুমুখী হস্ত লন টেনে।
হাটু দুটি আঁটিয়ে আটক করে বেনে ॥

* * *

কোলে করি কন্যাবে জননীরয় বসে।
মাসী পিসী দুপাশে দুজন বসে ঠেসে ॥
চন্দ্র মুখী চক্ষু বুজে ঠেস দিয়া যায়।
বুড়া বলে দেখ বাছা পড় মোর গায় ॥

কন্যার দুঃখে নারিগণ ব্যথিত হইয়া শাঁখারিকে গালা গালি করিতে লাগিলেন –

ইহ নয় শাঁখারী ইহার নয় শাঁখা।
দ্রুত দস্যু দূর কর মারি ধাড ধাকা ॥
সত্বরে শাঁখারী ডাকে শীঘ্র আন ধেয়ে।
হায় হায় হায় চেদে হত্যা হল মেয়ে ॥

প্রথম শঙ্খ পরা কিনা বড় কষ্ট। তাই মেনকা যখন বলিলেন এবয়সে আমি দশ বার জোড় শাঁখা পরিয়াছি কৈ এমন ত দেখি নাই। তখন শাঁখারী বলিতেছেন—

তুমি শংখ পরেছ তোমার হাত ননী।
এত কালে শংখ পরিলেন ইনি।
বারান্তরে ইহাতে গোবিন্দ যদি করে।
ইনিহ উত্তম শংখ পরিবেন পরে ॥

বহু কষ্টে শাঁখা উঠিল—যে শাঁখা পরিতেছিল জলভরা চোখে সে হাসিল—যে শাঁখা পরাইতেছিল সেও হাসিল। মেয়েরা হুলু ধ্বনি দিয়া উঠিল।

তৎকালে শাঁখার দাম বড় বেশী হইলে "বড় টাকা দুই তিন।" শাঁখাও যেলো নয়। তাহার গায়ে নানা চিত্র খোদাই করা থাকিত কবি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শাঁখারীরা ভাল বস্ত্রে শাঁখা বাঁধিয়া পথ পার্শ্বে গাছতলায় খড় বিছাইয়া বসিয়া বিক্রয় করিত। শাঁখারী জাতি পরনারীকে মাতবৎ দেখিত. আজও দেখে।

শাঁখারী জাতির ধর্ম্ম শঙ্খ দিবা যার কর্ম্ম
পর বধূ হয় তার মাতা।

কাঁচুলী তৎকালের এক শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এক একটা কাঁচুলীতে কামিনী আপন নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষ দেখাইত। তাহাতেও নানা চিত্র বুনান থাকিত—পুরাণ শাস্ত্রের নানা ছবি তাহাতে অঙ্কিত থাকিত—

স্বর্ণ সূত্র সূচে চিত্র রচে নানা মত।
মাঝে মাঝে সাজে চুণী মণি মরকত॥

আমরা ভগবতীর শৃঙ্গার বেশের আর বর্ণনা করিলাম না। যাঁহার ইচ্ছা পাঠ করিয়া লইবেন।

কৃষি বর্ণনে রামেশ্বর ওস্তাদ। কৃষি কার্য্যের প্রত্যেক বিবরণ। পদ্ধতি কৃষি শত্রু নিবারণের বহু প্রক্রিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। চাষ সম্বন্ধে কবির ধারণা

চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
লক্ষ্মীর বাণিজ্য বসি বাকুড়ির কোণে॥
পরিজন পোষে চাষী সুখে সাধু রাজ্য।
লক্ষ্মী পোষী চাষী করে সবাকার রাজ্য॥

এই মন্ত্র যদি আমরা হৃদ্‌গত করে রাখিতাম তাহা হইলে বঙ্গপল্লীর পর্ণ কুটির ভেদকরিয়া মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ধ্বনি জাগিয়া উঠিত না, বাঙ্গালার দরিদ্র কুলের অদৃষ্টে অত্যাচার ও উপবাস সহ্য করিতে হইত না।

চাষের অসুবিধাও যে নাই তাহা নহে। কবি একে একে তাহাও দেখাইয়াছেন—

চাষ বলে ওরে চাষী আগে লোকে খাব।
মোরে খাব পশ্চাতে যদ্যপি খেতে হব॥
অনেক আয়াসে চাসে শস্য উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত॥
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
লাভ করে সকল বেচিয়া লয় রাজা॥
ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি খেতে নাহি পায়।
কুতাকাতে কায়েত কি ক্ষতি করে তায়॥

এত বিপদ থাকিতেও বাঙ্গালীর চাষই এক মাত্র উপায়। বাঙ্গালীকে মা ভগবতীর কথায় বলা যায়—

বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমাকে নয়।

—[illegible] "[illegible]"

তাই ভগবতী বলিতেছেন—

ভিক্ষে দুঃখ গেল নাই দেখিলাম আমি।
চাষ বিনা আর কোন কর্ম্ম যোগ্য তুমি॥

আজ বাঙ্গালীকেও এই কথা বার বার শুনাইতে হইবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সে ভিক্ষা করিয়া কাটাইল ফলে অদৃষ্টে কেবল দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা—পরিণামে কেবল উপবাস, উপেক্ষা ও মৃত্যু।

কবি বলিতেছেন কৃষির প্রথম যন্ত্র—যথা লাঙ্গল, জোয়ালি, মই, কোদাল, ফাল, দা, উখুন, পাশী, জলোই ইত্যাদি।

যন্ত্রের পর বীজ সংগ্রহ—শেষে চাষ আরম্ভ—

মনে জানি মঘবান মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘ্য শেষে মেঘরস দিলা॥
দিন সাত বই বাত পাইয়া ঈশানে।
হৈল হল প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে॥
* * *
হাল ছাড়ি দুদণ্ডে হালুয়া আইল ঘরে।
বান্ধ আলি বৈকালে বাঁধিলা এক পরে॥
ছোট হালুয়া হুঙ্কারে চোটায়ে তুলে চাপ।
শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর বাপ॥ ইত্যাদি

এইরূপে হাল চাষ হয়। সময় সময় তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায়—

হাল ছাড়ি হালুয়া যবে করে জল পান।
হেল্যাকে চরান হর হয়ে যত্নবান॥

সময় সময় হাল কামাইও দিতে হয়। তাহা না হইলে "ধরা শস্য হরে ধানে ধরে নানা রোগ।" সেই সকল হাল কামাই দিলেও কাজ আছে—কেন? "গাছিমার হুড়াঝাড় আড়ে ফেল তুলে।" ক্রমে—

চৈত্র গেল চতুর্দ্দশ চাষ হৈল পূর্ণ।
মাঠ করে মৈ দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ॥
উচ্চ নীচ চাষিয়া সমান হৈল সব।
উত্তরাংশ উন্নত দক্ষিণ দিকে প্রব॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল সুলক্ষণ দিনে।
সারবত্তা সারি ভূমি ভূরি বাতে বুনে॥

ব্যর্থ নাহি গেল বীজ বাড়াইল ঘন।
লহ লহ করে পত্র বলাহক যেন॥
সময়ে সড়কা তুলে মারি দিল খড়।
তাতে বাতে পাশ্ট লেগে আইল গড়॥

যখন শ্যাম ধান্য শিশু প্রান্তর মধ্যে বায়ু হিল্লোলে ক্রীড়া করে তখন চাষীর মনের ভাব কেমন হয়—

হর্ষ হয়ে হর ধান্য দেখে অবিশ্রাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নব ঘন শ্যাম॥

আর কেমন ?

হাপুতীর পুত্র যেন নিজ্জনের ধন।

তৎপর নিড়ান—

ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈশ ন দিলা বলে॥
চারিদণ্ডে চৌদিকে চৌরস কৈল চেলে॥
আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥

কি কি আগাছা উঠায় ?

বাবচে বরাটে চেঁচুড়া ঝাড়া উড়ি।
গুলামুখি পাতি মারে পুঁতে যায় নুড়ি॥
দল দুর্ব্বা ষোলা, শ্যামা, ত্রিশিরা কৈস্তুর।
গড় গড় নানা খড উপাড়ে তুর তুর॥
খর খর খুজিয়া খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়।
কুলি ধরি ধাইল ধান্যের ধরি ঝাড়॥

* * *

এইরূপে প্রতিদিন পাইট গুলি করে।
প্রভাতে নিড়াতে যায় আসে দেড় পরে॥

বর্ষায় মাঠে জল দাঁড়াইয়াছে—জল কাটিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইল। তৎপর :—

অর্দ্ধ ভাদ্র পদ মাসে রৌদ্র পাইল ধান॥
পিছু পরিপূর্ণ করি বান্ধিলেন জল।
ডুবে রয় থাড় যেন দেখা যায় জল॥
আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নাহি করে হেলা।
..নাবাতে যোগ মারে ঘায়ে দেই চেলা॥
ডাক সংক্রমণ দিলে ক্ষেতে পুতে নল।
কার্ত্তিকের কতদিনে কেটে দিল জল॥

ধরণী সুধন্যা হৈল ধান্য আইল ফুলে।
ভোলা নাথ রহিলেন ভবানীকে ভুলে॥

শেষে ক্রমে ধান পাকিল। পৌষে বাঙ্গালায় লক্ষ্মীর আসন বিছান হয়। গৃহলক্ষ্মীগণ গৃহে গৃহে ধান্য রাখিবার জন্য আঙ্গিনা লেপন করতঃ আলিপনা দিয়া আসন তৈয়ারী করেন। কবির কাব্যেও আমরা দেখি সেদিন—

প্রণমিয়া বিশ্বনাথে বৃকোদর নামে ক্ষেতে
হাতি লয়ে দশমোণের দাত্র।
নিহড়ি চলিল ধেয়ে দুদণ্ডে নিলেক দায়ে
হইল আড়াই হালা মাত্র॥

হইাই হইল কবির কৃষি বর্ণনের অতি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

যুদ্ধ বর্ণনা। এতৎব্যতীত আর ও অনেক বর্ণনায় কবি সিদ্ধ হস্ত। কবির যুদ্ধের বর্ণনা অতি সুন্দর। কাব্যে ৫টী যুদ্ধ বর্ণনা আছে। যথা—(১) দক্ষ যজ্ঞের যুদ্ধ, (২) বিষ্ণু দূত ও যমদূতে যুদ্ধ, (৩) রুক্মিণী হরণের যুদ্ধ (৪) বাণ রাজার যুদ্ধ, ও (৫) শিবদূতির সহিত যমদূতের যুদ্ধ।

এই সকল বর্ণনায় নিম্ন যুদ্ধাস্ত্র গুলির নাম আছে—সাঙ্গী, শেল, ডাবুষ, পট্টিশ, ঢাঙ্গী, পরশ্বধ, কুঠার, তোমর, তলবার, শূল, কাটার, খট্টাঙ্গ, নারাচ, কুম্ভচক্রচাল, মুদ্গার, খড়্গ ও কামান (দশনে অধর চাপে খোঁচয়া কামান)।

যুদ্ধ বাদ্য যন্ত্র গুলি যথা—ঢাক, ঢোল, করতাল, দামা, খোল, কাড়া, মুখচঙ্গ, জগঝম্প ও বীণা।

সেনা চারিপ্রকার—হয়, হস্তী, রথ ও পত্তি।

বর্ণনা বিশ্লেষণ আর করিলাম না। কারণ নিরসতার আশঙ্কা অত্যধিক।

মৎস্য নাম। রামেশ্বর নিম্ন লিখিত মৎস্য তালিকা দিয়াছেন—

ধরেন পাবদা পুঁঠি পাগশ পাঠীন।
চিথল চিঙ্গুড়ি চেলা চাঁদকুড়া মীন॥
ধান্যছলি, ধোপাঝি, ধরিল ভানকনা।
মৌরলা খলিসা ভোল টেঙ্গরা নয়না॥
তেটেঙ্গরি ধরিল, তেচখ্যা দিল ছেড়ে।
[illegible]

বানি বাটা, খুড়শী রোহিত মহামীন।
কালুবাস কাতলা কমঠ পরবীন॥
ভেকটি ইলিশ আরি মাগুর গাগর।
ফলুই, গড়ুই কই কত জলচর॥

ইহা ব্যতীত পাঁকাল ও চেঙ্গ মাছও আছে।

কোন্দল বর্ণন। প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যে বহু কোন্দল বর্ণন আছে। বামন গঙ্গা ও পার্ব্বতীর কোন্দল, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কোন্দল। শিব দুর্গার কোন্দল ও তেমনি প্রাচীন কবি দিগের একটী বর্ণনার বিষয়। রামেশ্বর যে কোন্দল বর্ণন করিয়াছেন ইহাকে দেবদেবীর কলহ না বলিয়া বঙ্গীয় দরিদ্র হিন্দু গৃহের কর্ত্তা গিন্নীর কলহ বলিলেই শোভন হয়।

হর পার্ব্বতীর মধ্যে গৃহস্থালী লইয়া সদাই কলহ। শিব আলস্য-পরায়ণ নেশাখোর। এমন স্বামী থাকিলে হাজার সেয়ানা হইয়াও গৃহিণী আর কত গৃহরক্ষা করিবেন। জিনিস ব্যয় হইলেই শিব বলিবেন—

কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব।
বাড় ব্যয় কর বুড়া বসে পাছে রয়।
বৃদ্ধ কালে বুলাইয়া বধিবে নিশ্চয়॥

আর কি বলিব ?

দুঃখীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি।
ভিখারীর ভার্য্যা হৈল ভূপতির ঝি॥

দেবী বলিলেন অত কাজ কি, হিসাব লও! শিব আরও রাগিয়া বলিতেন—বেশ! বেশ!

ঠকেছি তোমার ঠাঁই ঠেঙ্গাইয়া মার॥
ক্ষমাকর ক্ষেমঙ্করী খাব নাহি ভাত।
যাব নাই ভিক্ষায় যা করে জগন্নাথ॥

তখন—

পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন যাবে।
চাক্ করে ভাজ এখন পাক্ করিতে কবে॥
এখন বাপের কাছে বসে আছে পো।
ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করী খেতে দেনা গো॥

ইত্যাদি

কবির এই কলহ ছবির ভিতর বঙ্গ মহিলার স্বাভাবিক এক শান্ত স্বভাব কেমন পরিস্ফুট।

পার্ব্বতীর মতন স্ত্রী ছিল বলিয়াই অলস শিবকে চাষ করিতে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিল। আজ বঙ্গে তেমন স্ত্রীর অভাব। কিন্তু যেমন রমণী মাত্রেই আপন স্বামীকে অন্যেতে আশক্ত দেখিলে মনক্ষুন্ন হয়—,পার্ব্বতীও তেমন স্বামীর মন পরীক্ষা করিয়া একটু অভিমানিনী হইয়াছিলেন। উহা স্বাভাবিক।

মশা, মাছি, জোঁক। বিরহ বিধুরা পার্ব্বতী চাষমত্ত স্বামীকে গৃহে আনয়ন করিতে মশা মাছি জোঁক আদি প্রেরণ করেন। এই ব্যাপারে মিশরে ভগবানের অভিশাপ প্রেরণের কথা মনে জাগে। কবি মশার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন—

মধুর মধুর ধ্বনি শুনি মন্দ মন্দ।
কিন্নরের গানে যেন কর্ণের আনন্দ॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শরীর সামর্থ্যে নয় ক্রুটি।
হাতী হেন জন্তুকে হারাতে পারে দুটি।

এনোফিলিসের পূর্ব্ব পুরুষ গণের রূপখানি কেমন ?

লাখে লাখে ধেয়ে পাকে ডাক পন্ পন্॥
উষ্ট্রবৎ চরণ মাতঙ্গ সম মুণ্ড
দুই দিকে দুই দণ্ড মধ্য খানে শুণ্ড॥
সৃষ্টি করি ত্রিপুরা তখনি দিলা বর।
রূপে গুণে চালে শিলে সকলি সুন্দর॥
শ্যাম বর্ণ স্বর্ণ রেখা শোভন শরীর।

পার্ব্বতী বর দিলেন—

খলের লক্ষনে খাবে করাবে অস্থির॥
তেড়ে দিলে বেড়ে ধর উড়ে নাহি যেয়ে।
ছিদ্রতিকে সুস্থথেকে রক্ত টেনে খেয়ে।
নক্ত যোগে রক্ত ভোগে লুপ্ত হবে কত।
বাঁশ বনে বাসৎ করো দিবসের মত॥

স্বয়ং মা ভবানীর মশক আমাদিগকে ধ্বংস করিবে। কুইনাইন খাইয়া কেরোসিনের প্রস্রবন সৃষ্টি করিয়া বড়জোর গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া কি ইহারা সবংশে নির্ব্বংশ হইবার ? মহাদেব কিন্তু

তাহার সাক্ষী আমাদের কর্তাদিগকে 'মেশিন গান্' দাগিতে বলিলে হয় না ?

ডাঁশ মাছিকে দেবী বর দিলেন—

সূর্যের কিরণে দিনে দেখে শুনে খেয়ো।
পুতি গন্ধ পাইলে মাছি পরিতোষ পেয়ো ॥
কাল মাছি কুলীন করিহ তার মান।
মৌলিকের মধ্য ঘরে তার দিহ স্থান ॥
তিঁহো তোমাদের বড় বাড়াবেন ভোগ।
খাওয়াবেন পেটভরি ঘরে করি যোগ ॥
ডাঁশ খেয়ো মাস ভেদী মাছি খেয়ো রস।

দেবীর বর বিভ্রাট করিতে বর্তমান সভ্যতার Fly-paper মহাদেবের বড় কাজে লাগিত। "ঘৃত মাখিয়া ডাঁশ মাছি হইতে সকলের যন্ত্রনা তিনি ঘুচাইয়া ছিলেন।

তার পর জোঁক। "ছোট ছোট ছিনে জোঁক ছুটে বুলে ঘাসে। জলে বুলে হতে জোঁক রুধিরের আসে॥" কিন্তু মহাপ্রয়োগ লুন চুন মহাদেবের মহৌষধ।

উপরোক্ত বিষয় গুলি ভিন্নও কবি নিম্ন বিষয় গুলি বিচক্ষণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন যথা—

শৈশব ক্রীড়াবর্ণন, পতি হারা রমণীর শোক, নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রী বর্ণনা, রূপ বর্ণনা, বর সজ্জা, বর যাত্রা ইত্যাদি এগুলি আর আলোচিত হইল না।

সমসাময়িক সমাজ বর্ণন

এইবার আমরা কবি যে আপন কাব্যে যে সকল সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা একে একে আপনাদিগের সম্মুখে ধরিব—

১। বড় বড় নিমন্ত্রণে ভুরি ভোজনের পর কি করিত ?—

"বড় খেয়ে বাম হস্ত বুলাইয়া পেটে।
অগস্তের নাম করি আঁটু ধরি উঠে ॥

২। কুলীন কন্যাদান করিয়া শ্বাশুড়ী জামাইকে বলিতেন—

কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি।
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি ॥
আঁটু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত।
প্রীতি করো যেমন জানকী রঘুনাথ ॥

৩। আজকাল ঘটকঠাকুরদের অন্ন সংবাদপত্র ওয়ালারাই খাইতেছেন। তাহা হইলেও যে দুই চারিজন বা ঘটক দেখা যায় তাঁহাদের কার্য্য কলাপের সহিত কবির ঘটক চিত্র মিলে। সম্ভবতঃ নারদই ঘটক ঠাকুরদের পেশাগুরু, কারণ তাঁহার ঘটকালির সহিত বর্ত্তমান ঘটকের ঘটকালির তুলনা হয়। নারদ সাধারণ ঘটকদের মতন বলিতেছেন—

বিবাহ জনম মৃত্যু বশ কার নয়।
যাহা হৈতে যখন যেখানে যেই হয় ॥

৪। এই সঙ্গে বিবাহের কথাটাও বলিয়া যাই। নান্দীমুখ বিবাহে তখনও হইত। তখনও এয়োগণ ছাতনাতলা আলো করিতেন। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী আচারও হইত। সেখানে বরকে মেয়েরা ঘিরিয়া ধরিতেন। বরের সাম্‌নে বরণডালা ও ঔষধে ডালা থাকিত। মেয়েরা সাজগোজ করিয়া প্রদীপ হাতে দাঁড়াইতেন। তারপর যিনি বরণ করিবেন তিনি—

দিব্য দধি দিয়া দুটী চরণারবিন্দে।
অঙ্গুলি হেলায় বামা অশেষ প্রবন্ধে॥
পায় হতে মস্তক মস্তক হতে পা।
* * *
তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠে চোখে দুই হস্তে ধরি।
পিছিয়া ফেলিল পান পরিপাটি করি॥
মাথায় মণ্ডল দিয়া জোঁখে সাত বার।
কপালে চন্দন দিয়া গলে দিল হার॥

তারপর অভিচার—তাহাতে "মন্ত্র পড়ে গুড় চালু বক্ষে" ফেলিয়া দিতে হইত। স্ত্রী আচারের পর কন্যা সম্প্রদান।

৫। স্ত্রীলোকেরা তখনও সখীগণকে সঙ্গে করিয়া খাইতে বসিয়া অন্নমুখে উপকথা আরম্ভ করিতেন এবং তাহাতে বহুক্ষণ কর্ত্তন করিতেন।

৬। সহমরণের একটি চিত্র কবি দিয়াছেন। পতীহীনা সতী আম্র শাখা ভাঙ্গিয়া মৃত ভর্ত্তার শিয়রে বসিয়া দেবতাদিগকে ডাকিতেছেন। সকলে শোকাতুর হইয়া চারিদিকে। সকলেরই

চক্ষে জলধারা বহে চাঁর মুখ বেয়ে।

তারপর——মাল্য মলয়জ দিয়া মুখে দেয় মিঠা।
দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ক্ষীর খণ্ড পিঠা॥
সিন্দুর কজ্জল দিল বসন ভূষণ।
কতজন করে পাখা চামর ব্যঞ্জন॥
কত নারী গলে ধরি মরি মরি বলে।
কর্পূর তাম্বুল তার মুখে দেয় তুলে॥
বাদ্যগীত হুলাহুলি করি জয় জয়।
নত হয়ে সতীর আশীষ সবে লয়॥
স্নান দান অর্পণ করেন গঙ্গাজলে।
চিকুরে চিরুনী দিল সিন্দুর কপালে॥
সূর্য্য অর্ঘ দিয়া গিয়া চড়ে চতুর্দ্দোলে।”

শেষে দাহনের ক্রুর চিত্র দানের হস্ত হইতে কবি রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন। তাহার আর অবসর হয় নাই।

৭। লোকে ভিখারীকে ফিরাইত না। সীমন্তিগণই ভিক্ষাদান করিতেন—

কেহ দেয় কড় বাড় কেহ চালু ডালি।
কেহ আমন্ত্রণ করে আই আইস কালি॥

ফকীর সন্ন্যাসী দেখিলে গোয়ালা গব্য দিত, চাষা ক্ষেত্রোৎপন্ন ফল মূল দিত, মোদক লাড়ু, মুড়ি, মুড়কি আদি দিত, তেলী তৈল দিত, ও বণিক বেনেতি দ্রব্য দিত। সন্ন্যাসীও বিনিময়ে সময় সময় ঔষধাদি বিতরণ করিতেন।

৮। নগর রমণীগণ একটু নির্লজ্জই ছিলেন—

নগরের নিতম্বিনী নিলাজিনী বড়।
পর পুরুষের সনে পরিহাসে দড়॥

৯। ঘর জামাইয়ের আদর এখনও যেমন তখনও তেমন।

যথা—গিরিপুরে শিবের সমস্তই সুবিধা ছিল—

সকলেই আনন্দময় সবে মাত্র এক ভয়
শ্বশুরান্নে সদাই ভোজন।
যার জামা তার ভাত ঘোর দুঃখে বিশ্বনাথ॥

তাই কবি শ্বশুর অন্নপ্রত্যাশী জামাতৃ বৃন্দকে কহিতেছেন—

করিয়া শ্যালক সেবা শ্বশুর অন্নে রহে যেবা
তাহার জীবনে শতধিক।

এই ধিক্কার আমরাও আধুনিক বঙ্গের অনেক শ্বশুর পদলেহ যুবককে দান করিতে পারি।

১০। কবি কাব্য মধ্যে রাজ রাজেশ্বরী জননীর যে সেবা পরায়ণ চিত্র দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান মাতৃকুল মধ্যে আমরা আর দেখিতে পাই না। সে আমাদের পরম দুর্ভাগ্য।

১১। তার পর বঙ্গে দুর্গোৎসব চিত্র—

সাদরে শারদ পূজা নগরে নগরে।
নৃত্যগীত অনন্দ দুন্দুভি ঘরে ঘরে॥
* * *
পতাকা তোরণ শোভা সবাকার পুরী।
দ্বার দেশে আলিপনা দিয়া বুলে নারী॥
দুসারি পুরট ঘট ধূপ দীপ জ্বালে।
* * *
সর্ব্ব গৃহে সর্ব্বে দেখে গীত বাদ্য নাট।
যত ঋষি সবে আসি করে চণ্ডী পাঠ॥

১২। ধনি গৃহে যেমন উৎসবাদিতে “গীত বাদ্য নাট” হইত কৃষাণেরাও অবসর মত তাহাদের প্রিয় গীতি গান করিত। কবি কৃষাণদের কৃষ্ণ কীর্ত্তনের একটা চিত্র দিয়াছেন। তাহাতে আছে—উদুখলে গোপালকে মা যশোদা যখন বাঁধিত তখন সকলে কাঁদিয়া আকুল হইত। কীর্ত্তন হরি ধ্বনি করিয়া সমাপ্ত হইত।

১৩। শাশুরীরা অবসর মতন জামাই নিন্দা করিতে ভুলিতেন না। সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

১৪। প্রত্যেক নগরে বা গ্রামে এখানকার মতন গৃহস্থ গৃহের সঙ্গে বেশ্যাগৃহ ছিল না। কোঁচনী পাড়া নগর বা গ্রামের বহির্দ্দেশে থাকিত।

উপরে মোটামোটি আমরা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শৈব কাব্যের পরিচয় প্রদান করিলাম। কাব্য খানি বৃহৎ সম্যক্‌ আলোচনা করিতে বহুকাল ও বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন। এই এক খানি কাব্য উপযুক্ত ভাবে পাঠ করিলেই আমরা খৃষ্টিয় দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যত শৈব্য কাব্য রচিত হইয়াছে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরিচয় পাই। কবির কাব্য সৌন্দর্য্য আমি দেখাইতে পারিলাম না আর সে শক্তিও আমার নাই। কারণ কবিকে বুঝিতে নিজের কবি হওয়া প্রয়োজন। সমান তুলিকা

যাতে কবি আলেখ্যের মতন কত যে বাস্তব চিত্র রচনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলে সুন্দর হয়। তবুও তাহারই দুই একটি নিদর্শন দেখাইয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

১। সতীর শরীর শিব বাঁধিয়া গলায়।
সতী জাগো সতী জাগো ডকিয়া বেড়ায়।

কাব্যসৌন্দর্য্য। ইহা হেমচন্দ্রের 'রে সতি রে সতি' হইতে ও সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী।

২। কান্দি ঘরে গেল রাণি আছাড়িয়া থাল।

৩। সিদ্ধি দল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নড়ে দেবতার রাজা।
মাথা নড়াটি যেন প্রত্যক্ষ।

৪। পরিবেশনরতা গৌরী—
চঞ্চল চরণেতে নুপুর বাজে আর।
রণ রণ কিঙ্কিনী কঙ্কন কনাৎকার ॥
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রম হৈল সজল কোমল কলেবর ॥
ইন্দু মুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে ॥
খর বাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে।
সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে ॥
হর বধু অল্প মধু দিতে আরবার।
খসিল কাঁচুলি হৈল পয়োধর ভার ॥
লাটা পাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।

৫। শার্দ্দুল বাহ্বনে সবে আগুলিল পাত।

ইহা সংস্কৃত এক আইনের অনুকরণ।

৭। মহাদেবকে বিদায় দিলে—
"চলিলা চঞ্চল বৃষ চণ্ডীরণ চেয়ে।
হরষিতে যান হর হরিগুণ গেয়ে ॥

প্রিয় পতিকে বিদায় দিয়া যে নারী প্রিয়কে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছে সে "চণ্ডীরণ চেয়ের" মর্য্যাদা তুলিবে।

৮। কোণে রয় কুল বধূ কথা কয় ছেলে

৯। হেঁসে হেঁসে ঘেঁসে ঘেঁসে ছুঁতে যান অঙ্গ।
বাগদিনী বলে আইমা এ আর কি রঙ্গ ॥

১০। ধোঁকালেক ধূর্জ্জটিকে ধরালেক কটি।
ঈশ্বরে ইঙ্গিত করে কিরাতের বেটি ॥
তোমা হয়ে আমি ধুঁাক করি হাঁই ফাঁই।
তুমি জল সেঁচ সখা দাঁড়াইয়া নেই ॥

১১। পার্ব্বতী রাগিয়া বাপের বাড়ী যাইতেছেন—তখন

ধেয়ে ধেয়ে ধূর্জ্জটি ধরিলা দুটি হাতে।
আড় হয়ে পশুপতি পড়িলেন পথে ॥
যাও যাও যত ভাব জানা গেল বলি।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চলি ॥
চমৎকার চন্দ্রচুড় চারি পানে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায় ॥

কারণ এই বিপদে নারদ ভিন্ন আর কাহার নিকট দুঃখ জানাইবেন। "চমৎকার চন্দ্রচুড় চারি পানে চায়" ইহাতে ভাষার ভিতর দিয়া শেষ সম্বল রক্ষায় অপূর্ণ মনোরথ এবং হতাশা ব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

১২। বাগ্দিনী চিত্র –

দুই হাতে দুগাছি মেঠে কাপড় পরেছে এঁটে
খাট করি হাঁটুর উপর
গলায় বগের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটি
পুঁতি বেড়ে সেজেছে সুন্দর ইত্যাদি।

১৩। চৈতন্য দেবের গৃহত্যাগে শোকের ছবি—

মিশ্র পুরন্দর কাঁদে যেন দশরথ।
কৌশল্যা কাঁদেন যেন শচী সেই মত ॥

১৪। দড়ি ছিঁড়ে মহিষ প্রবেশ কৈল নীরে ॥

হাঁটু পাতি বুড়া এঁড়্যা বসে গেল পাঁকে।
ঠাঁই জানি ঠেঁটা কাক ঠোক্‌রায় তাকে ॥

ভাব্‌বার কথা

কিঃ ধর্ম্ম ?

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

ভারতবর্ষ হাজারের অধিক বৎসর কাল বিদেশী বিজেতার শাসনে আর ধর্ম্মমতের শাসনে দস্তুর মত শাসিত ও মথিত হয়ে এসেছে; কিন্তু সেকন্দর, শক, হুন, যবন আবদালী নাদিরশার উৎপীড়নে যতনা মনুষ্যত্বহীন হয়েছে ধর্ম্মের মতের অত্যাচারে তার শতগুণ বেশী হয়ে পড়েছে। হুন শক যবনের তরবারির ঘা তার গায়ে যে দাগ না বসাতে পেরেছে অযথা বিকৃত অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের মত উপমতে overfed তার মানস দেহ তার চেয়েও নির্বীর্য্য হয়েছিল। আর সেই অজীর্ণ রোগের ফলে এখনো ভারতের আত্মাকে জড় করে রেখেছে।

তত্ত্বের দিক দিয়ে দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ সুন্দর ও নির্ভুল হতে পারে কিন্তু জাতের মানের ওপর এদু'য়ের প্রভাব যে খুব ভাল হয়েছে তা বলা যায় না। মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক তমোভাব শেষকালে দিব্য ভাবের দোহাই দিয়ে, আপত্তিকর এক ছদ্মবেশ পরে বিরাজ করছে। মানুষের সনাতন ভোগ প্রবৃত্তি সব বাধাকে ঠেলে সত্যমতকে বিকৃত করে সোজা সহজ পথেই চলেছে। অদ্বৈতবাদ তার মায়াবাদ প্রচার করে সংসারের মিথ্যাত্ব এমনি ভাবে আমাদের মজ্জাগত করে দিয়েছে যে আমরা অমেরু জীবের শ্রেণী ভুক্ত হয়ে পড়েছি। তার ধাক্কা সম্‌লাতে সাম্‌লাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দাস্য ভাব তৃণাদপি সুনীচ আর তরোরিব সহিষ্ণু হবার দীক্ষা দিয়ে মেরুদণ্ডের কমনীয়তাকে এমনি পরিমাণে নত করে দিয়েছে যে এখন আমরা চরম রকমের অমেরু দণ্ডী হয়ে পড়েছি! তার উপর শাস্ত্র গুরুরা সাত্ত্বিক খাদ্যের ব্যবস্থা চলা ফেরার গণ্ডী টেনে দিয়ে হাঁচি টীকটীকির শাসনে ওঠা বসা বিদেশ যাওয়ার নিষেধ বিধান বেঁধে দিয়ে যেটুকুও vertebrate প্রাণীর লক্ষণ

যে পরকালের জন্য এত সাধ্য সাধনা আর ইহজীবনের কল্যাণ বর্জন সেই পরকালও পাঁকাল মাছের মত হাত পিছলে গেল ইহকাল সিদ্ধি যা হয়েছে তা তো উজ্জ্বল ভাবে প্রত্যক্ষ! এখন কঃ পন্থা? কা গতি? কিং ধর্ম্ম?

এই পন্থা গতি ও ধর্ম্ম ও এক সম্প্রদায় নির্দ্ধারণ করেছিলেন সেও এই দেশে আর এইদেশের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক! সে হচ্চে শক্তিতন্ত্র ও শক্তিসাধনা! শক্তি তন্ত্র নাম শুনেই হয়তো অনেকে কানে আঙ্গুল দেবেন, জিভ্ কাট্‌বেন, ছিঃ ছিঃ করবেন। কেননা তন্ত্র মানেই তো পঞ্চ তত্ত্ব সাধনা! অন্ততঃ সাধারণ লোকের তাই ধারণা! সাত্ত্বিক রুচি সম্পন্ন লোকের কাছে তন্ত্রের অপযশ ও দুর্নাম এই জন্য আর এই জন্যই সাধু সাত্ত্বিকরা এটাকে ধর্ম্মাচার বলে মান্‌তে রাজী নন!

একটু ধৈর্য্য ধ'রে অপক্ষপাত ভাবে যদি এই অযথা কলঙ্কিত ধর্ম্ম মতটীর গূঢ় তত্ত্ব আমরা ধরতে চেষ্টা করি তার আসল শিক্ষনীয় সত্যটী বুঝতে পারি তা হলে দেখবো সত্যিই এই যুগের মেরুমজ্জাহীন এই জাতিটীর শক্তিতন্ত্রই এক মাত্র পন্থা ও এক মাত্র গতি! নান্য পন্থা বিদ্যতে হয় নায়!

ভণ্ড ভ্রান্ত বা স্বার্থ সাধক লোকে যদি নিজ পশু প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যে একটা নির্দ্দোষ মতকে বিকৃত করে নিজের উপযোগী কর্ম্ম পন্থা করে তার জন্যে কি আসল মতটীকে দোষ দেওয়া সুবিচারের কাজ? কোন মত এমনি ভাবে বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হয়নি? যিশু বা চৈতন্য দেবের নিষ্কলুষ প্রেম-ধর্ম্ম এখন কাম-ধর্ম্মের পন্থায় দাঁড়িয়েছে! তথাগত বুদ্ধদেবের সুপবিত্র নীতিধর্ম্ম ভোগ পিপাসু ভণ্ডের হাতে কিরূপই না বিকৃত হয়েছিল?

ধর্ম্ম তারও বিকার যে হয়েছে তা কে অস্বীকার করে?

এখন কথা হতে পারে তা যদি হয়েই থাকে তবে মার্জ্জিত সংস্কৃত করে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা অদ্বৈত মায়াবাদকে আবার গ্রহণ করলেই হয়; তন্ত্র কথিত পঞ্চতত্ত্বপন্থা কেন?

তার কারণ আছে। বলিছিই তো সব ধর্ম্মের চেয়ে শক্তি তন্ত্র ধর্ম্ম healhy, robust, ও practical! আর এই হচ্চে এখনকার যুগোপযোগী ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সাধনা যুক্তি আর মুক্তি এক সঙ্গে দিতে পারে সেই ধর্ম্মই ১৫ আনা সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম হবার যোগ্য সংসারীর ধর্ম্ম কর্ম্মীর ধর্ম্ম, জ্ঞানীর ধর্ম্ম একাধারে—। এখন সব প্রথম চাই এই মৃত্যমান নির্জ্জীব জাতায় দেহে আত্ম শক্তি বোধের চেতনা আর অন্তর্শক্তির উদ্বোধন। তার ফলে পায়ের উপর ভর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নষ্ট মনুষ্যত্বের পুনঃসঞ্চার! মানব জাতির এ অবস্থায় তার স্বভাব ধর্ম্মই হচ্চে বীরাচার। বিশ্ব মানব অসভ্য তমোহত পশু ভাব হতে উত্তীর্ণ হয়ে রজঃ চালিত বীর ভাবে এসেছে; সত্ত্ব ঘটিত দেব ভাব ভবিষ্য মানবের চরম লক্ষ্য হতে পারে; কিন্তু সে অবস্থা আধুনিক কোন মানব জাতের এখনো আসেনি।

বিশ্বমানব এখন বীরাচার পন্থী। সাক্ষ্য তার ইংরাজ জর্ম্মান, ফরাসী, মার্কীন! প্রকৃতির পুরুষ পরাজয়কারী মায়াশক্তির নাগ পাশ কাটিয়ে প্রস্তর যুগের নরপশু এখন অর্দ্ধ মুক্ত বীরমূর্ত্তিতে প্রকট হয়ে এখনো বিমুখশালিনী প্রতিকূলা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে নিরত! ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এখনো মনুষ বাধা বিঘ্নে ব্যস্ত করে রেখেছে! বিশ্ব পুরুষ মায়াবিনীর মোহ আলিঙ্গন থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারছে না! জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী পাশ্চাত্য জাতিরা তাঁদের বিপুল চেষ্টা ও উদ্যম নিয়েও এখনো এই শক্তি সাধনায় রত এখনো তাঁরা প্রবলা প্রকৃতির সঙ্গে জীবন মরণ যুদ্ধে মত্ত; আমাদের তো কথাই নাই! আমরা সেই নিষ্ঠুরা রাক্ষসী শক্তিকে পর কালের মোক্ষদায়িনী ভেবে তাকে শয্যা সঙ্গিনী করে তার মোহে মুগ্ধ হয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছি! তাকে কান্তময়ী [illegible] লীলার সহচরী করে পূজা করছিলাম। মোহ ভেঙ্গে দেখি সেই লীলাময়ী হাড় মাংস চুষে জাতটাকে কি কঙ্কালসার করে ফেলেছে!

আমাদের অন্তর-বিহারী উদাসীন পুরুষ এখন বুঝেছেন কোন্ মায়াবিনীর মন্ত্রে ভুলে শ্মশানে এতকাল শব হয়ে পড়েছিলেন! আসল শক্তি সাধক এই সব পাশ্চাত্যজাতি তাঁরা বুঝেছেন এই মায়াবিনীকে পদানত দাসী করতে হবে! তাকে বুকের উপর উলঙ্গিনী রক্ত লোভাতুরা দানবী রূপে নাচতে দিলে চলবেনা! তাই তাঁরা জীবন মরণ ব্যাপী সাধনার ফলে প্রকৃতিকে জয় করতে উদ্যত ও বিরামহীন!

এই দানবী প্রকৃতির জড়শক্তি আমাদের অজ্ঞানে একটু একটু করে আমাদের নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীব করে দিয়েছে—আজ আমরা পথের কাঙ্গাল, হাতে ভিক্ষা পাত্র করে গলায় হাড়ের মালা পরে, দিগম্বর বেশে বিদেশিনী অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারীর মত দাঁড়াইয়াছি! আমাদের সেই লীলা সঙ্গিনীই আজ আমাদের এই পথেবসা দশা করে ছেড়েছে!

পশ্চিমের ধাক্কাতে চোখ ফুটেছে! এখন পন্থা দেখ্তে হবে! আগে ইহকাল তার পর পরকাল! আগে নির্জ্জীবদেহে প্রাণ শক্তি সঞ্চার তারপর মানস-দেহে আত্মশক্তি তারপর অধ্যাত্মশক্তি এই ত্রিরূপিনী এক শক্তির জাগরণ। এই নূতন শক্তির উদ্বোধন করে প্রকৃতির বন্ধনশক্তিকে হারাতে হবে। অজ্ঞান, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অনশন, এই যে সব প্রকৃতির তমঃশক্তি এদের নষ্ট না করলে পুরুষের চিৎ শক্তি জাগবে না; জগতের রাজসূয় যজ্ঞশালার দ্বারে শূদ্রধর্ম্ম পালন করা ছেড়ে যজ্ঞসভায় নিজের পদোচিৎ আসন করে নিতে হবে!

এর জন্যে চাই সাধনা; যেমন সিদ্ধি সাধনাকেও তদ্রূপ হতে হবে। আত্মনির্ভরতার দ্বারা অন্তঃসুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এক কথায় চিৎ-শক্তির সাধনা চাই। বাহিরের কোন দেব দেবতার শক্তির কাঙ্গাল হওয়া নয়। নিজের মধ্যে সুপ্ত মহাদেবতা যে ব্রহ্ম তার শক্তিকে স্ফুরণ করা। এই ব্রহ্মশক্তি জাগ্লে বাইরের যে প্রতিকূল প্রকৃতি শক্তি তা হার মানবে! এই ব্রহ্ম শক্তি জেগেছে ইংরেজ ফরাসী জর্ম্মান মার্কীন প্রভৃতি জাতিদের; তাই

তাঁরা অজেয়, তাই তাঁদের পায়ের তলায় পড়ে সেই মায়াবিণী প্রকৃতি; যে এতদিন নরমমাটী মেয়ে আমাদের দেশের শ্মশানে তাণ্ডব লীলা করছে। ইংরাজ মার্কিনের বেদ বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র নাই; তবু তাঁরা মহা বৈদান্তিক এবং শক্তি তান্ত্রিক। আমরা পঞ্চ তত্ত্ব সাধনা বুঝিলাম ইন্দ্রিয় ভোগের দোহাই দিয়ে, এসব জাতের পঞ্চতত্ত্ব সাধনা অন্য রকমে। ক্ষিত্যপতেজ মরুদ্ব্যোম এই পাঁচটী প্রকৃতিতত্ত্ব ক এঁরা ঠিক ভাবে সাধনা করেছেন, তাই আজ প্রত্যেক তত্ত্ব তার গুঢ় সত্তাটী, ভিতরের গুপ্ত শক্তিটী এঁদের কাছে ধরে দিয়েছে। আর এঁরা এই পঞ্চতত্ত্বের তত্ত্ব ভেদ করে জগজ্জয়ী হয়ে উঠেছেন!

তাই বলছি—শক্তি সাধনাই এযুগের ধর্ম্ম—আর আমাদেরই বিশেষ ধর্ম্ম আজ দেহে—মনে—আত্মায় বিন্দু মাত্র শক্তি নেই বলে আমাদের এ হেন সোনার মাটী অফলা কুফলা, অমৃতের নদ নদী অজলা কুজলা, তাই আমাদের দেহে রোগ, বুকে অনুদ্যম, চোখে অন্ধকার, তাই আমাদের ঘাড়ে বুদ্ধি বিদ্যা নাই, পরনে বস্ত্র নাই, পেটে ভাত নাই। কোন দেব দে তার খোসামোদ তোষামোদ না করে পাশ্চত্য জাতিরা সকল বরলাভ করেছেন, আর তোমরা তেত্রিশ কোটী দেব দেবতা উপদেবতার ষোড়োশপচারে পা পুজা করেও চির কাঙ্গাল।

যা ধারণ করে তাই ধর্ম্ম। আর যা ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় তাই অধর্ম্ম। আমাদের মায়াবাদ লীলাবাদ তাই এখন আমাদের অধর্ম্মের হেতু, আর ইংরাজ জর্ম্মান ফরাসী মার্কিনের আত্মশক্তি পূজাই আসল ধর্ম্ম। আমরা পরকাল জন্মান্তর বাদী হয়েও মরণে ভীত তাঁরা এ সবে অবিশ্বাসী হয়েও শমন বিজয়ী। মৃত্যুকে খেলার সাথী করে জলে আগুনে প্রাণ বিলিয়ে দেন। আমরা নৌকা পার হবার সময় মেঘ দেখ্‌লে দুর্গানাম জপি, আর তাঁরা আকাশ জয় করবার জন্য প্রাণপণ করে দলে দলে প্রাণ দেন, বন্ধ দ্বারে মাথা ঠুকে প্রাণ বলি দেন! কেন? না এঁরা বুঝেন আত্মশক্তির উপাসনাই খাঁটী ধর্ম্ম।

তাই বলি শক্তিতন্ত্রই একমাত্র আমাদের পন্থা। এ শক্তি মানে দৈহিক পশুশক্তি নয়; বন্দুক কামান তলোয়ার কৃপাণের শক্তি নয়—ভিতরের অধ্যাত্ম শক্তি।

আমাদের তন্ত্র শাস্ত্র বিশেষ রূপে অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্র বলেন "আমি-জীব" ছাড়া অন্য দ্বিতীয় সত্তা নাই। এক মাত্র যে বিশ্বশক্তি (Cosmic Energy ই) ভগবতী বা ঈশ্বর। সেই শক্তি অসংখ্য জীবের ভিতরে খণ্ড ভাবে বর্ত্তমান। আমার জীবশক্তি সেই মহাশক্তিরই অংশ মাত্র। বিশ্ব মহাশক্তির যে omnipotence (সর্ব্বশক্তিমত্তা) তা potentially বা সুপ্ত ভাবে আমাতেও বিদ্যমান। আমি বিরূপে খণ্ড ও সসীম হলেও স্বরূপে অখণ্ড অসীম। আমি আপাতঃ অনু, কিন্তু পরিনামে বিরাট। এই আমি বিন্দুর অনুশক্তিকে—গুহ্য সাধন প্রাণালীতে—বিরাট শক্তিতে—দাঁড় করাতে পারলে "আমি" তখন সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজয়ী হয়ে পড়তে পারি। এটা কল্পনা নয়, ঘোরতর সত্য। প্রমাণ পাশ্চাত্য জাতিরা। প্রমাণ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা, প্রমাণ সব জাতের মহাপুরুষেরা! যে মানুষ হাজার কতক বছর আগে—হিংস্র জন্তু বা বিদ্যুত বজ্রাঘাতের ভয়ে গর্ত্তে লুকিয়ে থাকতো সেই মানুষ আজ প্রকৃতি বিজয়ী বীর! প্রকৃতিরই শানিত অস্ত্র দিয়ে তাকেই বেঁধে দাসত্বে খাটিয়ে নিচ্চে। সেই পশু মানব হতে বুদ্ধ, নিউটন, প্লেটো, শঙ্কর, ঈশা, মুশা উৎপন্ন! এই যে ক্রম বর্দ্ধমান মানব শক্তি, এর পূর্ণচ্ছেদ কোথায় পড়বে কে জানে? আত্মার এই স্বরূপ শক্তিতে যে বিশ্বাস সেইটে আমরা হারিয়েছি; তাই আমাদের এই পশুবৎ দৈন্য দশা; আর পাশ্চাত্য জাতিরা বিশ্বাসবান তাই তাঁরা বিশ্ববিজয়ী ভগবান পদবী লাভ করেছেন।

তন্ত্র বলেন—জীব তুমি স্বরূপে ষড়ৈশ্চর্য্যশালী ভগবান! তুমি বাট নও। তোমার মধ্যে এই বিরাট ঐশ্বরী শক্তি মুখে ল্যাজ পুরে কুণ্ডলায়িত হয়ে সুপ্ত হয়ে রয়েছে—সাধনা করে এই কুণ্ডলিনীকে জাগাও; চক্রের পর চক্র ভেদ করে তাকে সহস্রদল পদ্মবৎ মস্তিষ্ক তুলে দাও, এই মস্তিষ্কে হচ্চে আজ্ঞা চক্র! seat of will and intellect! এই শক্তি এখানে এসে will ও intellect কে যা বলবে আজ্ঞা করবে তারা দাসবৎ তাই করবে। তোমাকে চতুর্বর্গ ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম সব হাতে তুলে দেবে। তোমার ষড়ৈশ্বর্য্য তোমার আজ্ঞাধীন ও করায়ত্ত অজ্ঞানাহত হয়ে আছে! জাননা তাই

মিথ্যা দেব দেবতার কাছে মাথা কুঁড়ে কাঙ্গালপনা করছ! নিজের জিনিস নিজে অর্জ্জন করে রাজ ভোগ কর! এ ভোগে দোষ নাই; নিজস্ব নিজে ভোগ করবে কে দোষ দেবে? তবে জেনে ভোগ কর—এই জেনে ভোগ করাতেই মুক্তি! ভুক্তি আর মুক্তি একাধারে সহজে তোমার প্রাপ্য!

চির কালই মানুষের মন্ত্র এক, কেবল তন্ত্রই আলাদা! যুগ ভেদে অধিকারী ভেদে তন্ত্র আলাদা হবেই। মন্ত্র হচ্চে আত্মোপলব্ধি দ্বারা মুক্তি লাভ; তন্ত্র কিন্তু আলাদা। যে ধর্ম্ম সত্যই ধারণ করে, ধ্বংস করে না তার সাধন পন্থা অধিকারী ভেদে ও যুগ ভেদে আলাদা হইবেই; না হওয়াই ধ্বংস পন্থা! দেহের পুষ্টি সাধন খাদ্যের ধর্ম্ম; কেন না দেহ ধারণ করে, যেমন শিশু যুবা বৃদ্ধ বা রোগী ভোগী সুস্থকায় ভেদে খাদ্য ব্যবস্থা, তেমনি পাত্র ভেদে ধর্ম্ম পন্থা ভেদ। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, তামসিক ও সাত্ত্বিক, সভ্য ও বর্ব্বর এদের এক ধর্ম্মপন্থা হইতে পারে না; ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন এটা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও তেমনি এটা সত্য। তামসিক জাতি রাজসিকজাতি এবং সাত্ত্বিক জাতি জগতে সর্ব্বত্র সব যুগে দেখিতেছি। এদের প্রত্যেকের আলাদা ধর্ম্মপন্থা। কপাল গুণে আজ আমরা তামসিক হয়ে পড়েছি, আমাদের এখন এমন ধর্ম্ম চাই যাতে জাতীয় জীবনে একটু Tone (বল) আসে। একটা Tonic ধর্ম্ম চাই। এ জাতের এখন শ্লেষ্মা প্রধান বাতিক ধাতু; এ ধাতে তৃণাদপি সুনীচ আর তরোরিব সহিষ্ণু হয়ে বৈষ্ণবীয় দাস ভাবাত্মক ধর্ম্ম সাধন আর চলছে না। মেয়েলী ধর্ম্মের চোটে অত্যন্ত মেয়েলি হয়ে পড়া গেচে। আর নয়। ভুড়ী দেবতাদের ধামা চাপা দিয়ে প্রকৃতি সাধনাটা একটু বন্ধ করে একটু অন্তঃস্থ রুদ্র শক্তির উপাসনা চাই। পাশ্চাত্যদের পন্থা ধরে এই অন্তঃস্থ সুপ্ত ব্রহ্মশক্তির উপাসনা করতে হবে। ভিতরের চিৎপুরুষ পড়ে পড়ে প্রকৃতির সঙ্গে শৃঙ্গার বিলাস করবেন, আর ইংরাজ মার্কীন আমাদের টেনে তুলবেন এ নির্লজ্জ আশা কেন করি? নিজেরা পায়ে উঠে না দাঁড়ালে পরে কত টের্নে তুলবে? আর তুলবে কাকে? মড়াকে কে তুলে দাঁড় করাতে পারে?

কাজেই চাই আত্মশক্তির উপাসনা অর্থাৎ শক্তিসাধক তান্ত্রিক হওয়া! তা বলে বলছিনা শ্মশানে গিয়ে পঞ্চমুণ্ডী হয়ে বসে কপোলপাত্রে কারণ ঢেলে বীরাচার করা বা পঞ্চমকারের সাধনা করে পশ্বাচার করা! পাশ্চাত্য তান্ত্রিকের তন্ত্র পন্থা নিতে হবে। ক্ষিত্যপ তেজোমরুদ্ ব্যোম এই যে পঞ্চ-তত্ত্ব এ আমাদের দেশে দূষিত হয়েছে। এই জন্যেই যত মড়ক, রোগ, অযথা লেগে রয়েছে! দেশের জল আব্ হাওয়া সব দুষিত হয়েছে; এসবের শোধন করা হোক্। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে কি উপায়ে এই পঞ্চ-তত্ত্ব শোধন করতে হবে; সেই উপায় কাজে লাগানো হোক্। হলে দেখ্‌বে সকল জল অমৃত স্বাদু হয়েছে, মাটী সুফলা হয়েছে, বাতাস নবজীবন সঞ্চারী হয়ে উঠেছে! যে জড় প্রকৃতি হতে এই জড় দেহ গড়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্চে আর হবে, সেই জড় প্রকৃতি শোধিত ও শাসিত হলে দেহ যন্ত্র শোধিত ও শাসিত হবে; ভিতরের চিৎশক্তি স্বচ্ছ কাচের আবরণের ভিতর দিয়ে আলোর মত সহস্র দ্যুতিতে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠবে। সংসার ত্যাগ করতে হবেনা, বৈরাগ্যের ব্রত নিতে হবেনা; বহিদেবতার উপাসনা করতে হবে না, ভোগের ভিতর দিয়ে জাতীয় আত্মার মুক্তি আসবে! নবযুগের এই নবতন্ত্র। তন্ত্র নূতন হলেও মন্ত্র সেই এক আদি ও সনাতন! আর নব তন্ত্রের দীক্ষাগুরু করতে হবে ইংরাজ ফরাসী মার্কীন প্রভৃতি উন্নত, শক্তিসাধক জাতদের! আর যদিইবা প্রাচীনতন্ত্রকে ফিরে নেওয়া যায় তা'তে দোষ কি?

প্রাচীন তন্ত্রকাররা তন্ত্রের যথার্থ মর্য্যাদা স্পষ্টভাষায় খুলে বলে গিয়েছেন; আমাদের সেই সত্যতত্ত্বটুকু নীর থেকে ক্ষীরের মত বেছে নিতে হবে। শেষ যুগের কদর্য্য বিকৃতিটাকে আসল তন্ত্র শাস্ত্রের সঙ্গে গোল করেই অনেকের মনে এর প্রতি অশ্রদ্ধা হয়েছে! খাঁটী তন্ত্র সাধক যে জঘন্য পঞ্চমকার প্রিয় পশু নয় আসল বীর তার স্পষ্ট নির্দ্দেশ স্পষ্টভাষায় তন্ত্রকার বলে গেছেন—

জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী নিত্যানুষ্ঠান তৎপর;
কামাদি বলিদানশ্চ স বীর ইতি গীয়তে ॥

যে সাধনার সিদ্ধি ফল এই সব গুণ-সম্পন্ন কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি সে শাস্ত্র সে সাধনা কখনই জঘন্য নয়! সৎ-তন্ত্রের তত্ত্ববিৎ যবনপণ্ডিত উডরফ বলেন—

The principles of Shakta doctrine which will vary accoding to race is a regenerating doctrine *giving strength where there is weakness* and where strength exists directing it to right ends.　　page 198

Shakti & Shakta

দুর্ব্বলের দেহমনে বল সঞ্চার এই হল শক্তি সাধনার মূল মন্ত্র। কাজেই এই নির্জীব আধমরা জাতের এখন তন্ত্রই গতি তন্ত্রই মুক্তি 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য !'

এই মূল মন্ত্রটী ধরে যে কোনো পন্থায় মন্ত্রের সাধন করলেই সিদ্ধি হবে। আর যে এই পন্থার সাধক সেই তান্ত্রিক। এই শক্তি সাধনার যুগে সবাই তান্ত্রিক সবাই বীরাচারী কেবল আমরাই তামসিক পশ্বাচারী ! জগতের সবাই নিজের ভিতরের বিরাটকে জাগিয়ে স্বরাট লাভ করেছে, আমরাই নিজের অন্তঃস্থ দেবশক্তিতে বিশ্বাস-বিহীন হয়ে দেবতাদের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব দাবী না করে তাঁদের ও হীন দেশাচারের দাসত্ব করছি ! আর আমাদের মাতৃরূপিণী নারীজাতিকে মহাশক্তির অংশরূপা জেনেও তাঁদের পর্য্যন্ত অন্ধ করে রেখেছি ! নিজেদের আজন্ম সঞ্চিত পাপের ফলে জাত হারিয়ে কল্পিত অদৃষ্টকে অপরাধী করছি আর ললাটে করাঘাত কর্‌ছি !

এ অবস্থায় কি ধর্ম্ম ? না তাই ধর্ম্ম যা দেখায় নিজের মধ্যেই নিজের মুক্তি এবং নিজ পুরুষকারলব্ধ ভোগের ভিতর দিয়ে সেই মুক্তি ! যা শেখায় এ সংসার মিথ্যা ভোজবাজী নয় পরন্তু কঠোর সত্য এই প্রতিকূলা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে শ্রেয় ও প্রেয় লাভ ! যা শেখায় ত্যাগ ও বৈরাগ্য অপদার্থের ধর্ম্ম ও অদৃষ্টে নির্ভর ভীরুর কর্ম্ম ! অলমিতি—

স্বর্গ ও মর্ত্ত

[শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক]

ঊর্দ্ধে আমার দেবতা থাকেন
　　মর্ত্তে সখা দল,
ঊর্দ্ধ লভেন যজ্ঞ পূজা
　　মর্ত্ত আঁখি জল।

ঊর্দ্ধে থাকেন দেবতা, সুখী
　　নিম্নে দীন গণ
প্রণাম লভেন দেবতা,—তারা
　　বুকের আলিঙ্গন।

আশ্বাসেরি স্বর্গ আমার
　　বিশ্বাসেরি স্থল,
নিঃশ্বাসের মর্ত্ত আমার
　　প্রীতির শতদল।

মর্ত্তে আমার প্রাণের ধারা
　　শূন্য করে হায়
মুক্ত হয়ে স্বর্গ যাব
　　শুভ্র মেঘের প্রায়।

পরলোকগত কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন

[শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত]

বঙ্গবাসীর গীতিকুঞ্জে চিরতরে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের বীণা নীরব হইয়াছে। বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ কিঞ্চিদূর্দ্ধ ষাট বৎসর বয়সে তিনি ভবধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্র নাথের যুগে দ্বিজেন্দ্র লাল ব্যতীত যে দুইজন প্রতিভাশালী কবি এই বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য সূর্য্যের প্রভাব সম্পূর্ণ বা অংশতঃ এড়াইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনাদের বিশেষত্বের ছাপ রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের এক জন—'শঙ্খ' ও 'এষার' কবি অক্ষয় কুমার বড়াল গত বৎসর বঙ্গমাতার ক্রোড়শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অপর কবি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গ-ভারতীর কম কণ্ঠে" অশোক" "গোলাপ" "শেফালি" ও "পারিজাত" গুচ্ছের মালা পরাইয়া এবং চরণে তাঁহার হৃদিসঞ্চিত "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" নিবেদন করিয়া "শিশুমঙ্গল" ও "হরিমঙ্গল" গাহিতে গাহিতে অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন।

বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু প্রাণ চির-কাল গীতি কবিতার কোমলকান্ত সঙ্গীতে আপনাকে শত ধারে উচ্ছ্বসিত করিয়া জাতির সাহিত্য ক্ষেত্রকে স্নিগ্ধ শীতল করিয়া রাখিয়াছে। এই সঙ্গীতের সুর কখনও বা নরনারীর প্রেমলীলার শাশ্বত রহস্য ও অসীম মাধুর্য্য ব্যক্ত করিয়াছে, কখনও বা বাঙ্গালীর নিজস্ব দাম্পত্য জীবনের অন্তর্নিহিত সুখ সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে আরও বেশী সুন্দর আরও বেশী উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। এই শেষোক্ত সুরই ছিল দেবেন্দ্র নাথের বিশেষত্ব। এ সুর বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রাণস্পর্শ করে কারণ তাঁহার প্রাণের তারে নিরন্তর যাহা ঝঙ্কৃত হই-তেছে, তাহারই এক সৌন্দর্য্যময় প্রতিধ্বনি সে তাহাতে শুনিতে পায় তাহারই গার্হস্থ্যজীবনের অপূর্ব্ব চিত্র সে প্রভাবের লেশমাত্র নাই, অসংযমের কলুষ কোথাও তাহার পবিত্রতা নষ্ট করে নাই। তাহা স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও পূত স্রোতস্বিনীর ন্যায় তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। বঙ্গবাসী আকণ্ঠ পান করিয়া ধন্য হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভা যে অন্য কোন দিকে আত্ম প্রকাশ করেনাই তাহা নহে। অনেক গীতি পুষ্পে তিনি তাঁহার ইষ্ট দেবতা শ্রীহরিচরণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া-ছেন। সামাজিক কুপ্রথা সমূহ আক্রমণ করিয়াও তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সব কবিতায় তাঁহার শক্তি যেন সম্যক স্ফুরিত হয় নাই, তাঁহার চিত্ত আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য উজাড় করিয়া পাঠকের মানস ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব আনন্দ রাজ্যের সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

কবির অঙ্কিত দাম্পত্য লীলার চিত্র গুলি যে কত সুন্দর ও মধুর প্রথমে তাহারই একটু সামান্য পরিচয় দিতেছি। কবিপ্রিয়া তাঁহার "ছ'মাসের শিশুটিরে বুকে করে ধীরে ধীরে" স্বামীর কোলে দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কবি শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন না। অমনি "জলে বিজু-লিতে ভরা একখানি মেঘ ত্বরা" তাঁহার প্রিয়ার মধুর বয়ান ছাইয়া ফেলিল। অনুতপ্ত স্বামীকে তখন এই রূপে কৈফিয়ৎ দিতে হইল—

সোহাগিনী! ইথে তোর এত অভিমান?
ফুল শিশু আঁখি খুলে তরুশাখে দুলে দুলে
দেখে যবে মুগ্ধ মুখে ঊষার বয়ান,
ভুবন ফিরাতে নারে আপন নয়ান।
তরুকোল শূন্য করি সে তরু দুলালে হরি
আমি কি আনিতে পারি থাকিতে এ প্রাণ?

শখা নাচে ফুল দোলে, চারি ধারে ফল ঝোলে,
পাপিয়া মগন-প্রাণে ধরে নিজ তান,
অবাক অবনী শোনে হইয়া অজ্ঞান।
সে মধু নিকুঞ্জ হ'তে টানি আনি পিঞ্জরেতে
কে যায় শুনিতে বল বাউলের গান ?
মিছামিছি তব রোষ, আমার নহে সে দোষ,
সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান ?

আবার যখন কবি প্রিয়ার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া তাঁহার রোষ ভাজন হইয়াছেন তখন তাঁহার মান ভঙ্গ করিতে কবির প্রাণে কবিত্বের উৎস ছুটিয়াছে।

আমি শুধু ঘোমটাটি দূরে দিনু ঠেল।
ক্ষুদ্র রোষ জেগে উঠে বাঙ্গা তোর গণ্ড পুটে
আরো রাঙ্গাইয়া দিল। করি রঙ্গ কেলি,
কে যেন সিন্দুর দিল লাল পুষ্পে ফেল।
দোহাই তুহার কিরে, অমি কভু জানিনিরে
শরৎ মেঘের কোলে চমকে বিজলি।
মানিনি, সখের মান বল্ কোথা পেলি ?
লাবণ্য কি উথলায় কনক শশীর গায়
জলধর রাশি যবে পড়ে আসি হেলি ?
আমি বড় ভালবাসি মুক্তাকাশে মুক্তশশী
ঢালি দেয় সারা নিশি কনক অঞ্জলি
মানিনি, সখের মান বল্ কোথা পেলি ?

আর একবার কবি এরূপ আরও একটি গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রেয়সী তাঁহার চরণ যুগল অলক্তরাগ রঞ্জিত করিয়াছেন দেখিয়া তিনি চুপে চুপে খোকাকে হাতে জলপূর্ণ পাত্র দিয়া তাহা তাহার মাতার চরণে ঢালিয়া দিতে শিখাইয়া দিয়াছেন। সমস্ত আলতা ধুইয়া মুছিয়া গেল। পুত্রের এই কাণ্ডে মাতা রাগিয়া খুন। তখন নিজ দোষ স্বীকার করিয়া প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

বসন্তে সাজালে কেন শারদীয় ডালি ?
মঞ্জুল যৌবন কুঞ্জে ফুটিল শফালি !
ঝুর ঝুর বহে বায় সৌরভ মিশায় তায় ;
হাতে কেন হে রঙ্গিনী রঞ্জনের থালি ?
দুই চক্ষে লাগে ব্যথা—কমল ফুটিবে কোথা
প্রভাতে ফুটালে তুমি কুমুদী বৈকালী।

আবার যখন খোকা দুষ্টামি করিয়া মাতার খোঁপা খুলিয়া দিয়াছে তখন তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু আনন্দে বিভোর—

দেখ সখি, চুল গুলি শ্রীঅঙ্গে পড়েছে ঝুলি
দোলায়ে অলকাবলি গেলে বায়ু চোর !
ভূমিতে লুটায় আসি, কেশের ঐশ্বর্য্যরাশি
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোর !

এইরূপে কখনও বা প্রিয়ার গহনার বাক্সর চাবি লুকাইয়া রাখিয়া "কষিত কাঞ্চন জিনি তাঁহার তনুয়া খানি" নিরাভরণ দেখিবার সাধ মিটাইয়া লইতেছেন, কখনও বা একটি চুম্বনের উমেদারি করিতে গিয়া তাঁহার কবিত্বভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া বসিতেছেন। আবার কখনও বা প্রিয়ার ডায়মণ্ডকাটা মলের আওয়াজ শুনিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন।—

রুনু রুনু ঝুম ঝুম—ঝুম রুনু রুনু ঝুম
মল বলে "বল ওরে সরে যেতে বল !"
কবি বলে আসে ওই আমার আনন্দময়ী
সরমে শিথিল তনু ভরমে বিকল,
যামিনীতে দেখা হলে সুধাব সোহাগ ছলে,
তরল জ্যোৎস্নাজলে ধুয়ে ধরাতল
শারদীয়া শর্ব্বরী সখি তোর গলা ধরি
এমনি কি গান গায় ? বল সখি বল্ ?
রুণু রুণু ঝুম ঝুম ঝুম রুণু রুণু ঝুম
ওই বাজে মল !

উপরে যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে কবির ভাষার লালিত্য ও চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সম্যক উপলব্ধ হইবে। তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র অতি সুমধুর ও স্বচ্ছন্দ গতি, একটিমাত্র ভাবের ব্যঞ্জনায় চিত্রের পর চিত্র উপমার পর উপমা দিতে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয়। কবি যেন সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া বসেন। সেথায়

কোহিনুরে কোহিনুরে আলো যে উথলি পড়ে,
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরার মুক্তায় !

অন্যান্য কয়েকটি কবিতা হইতে কবির এই অসামান্য

ক্ষমতার উদাহরণ দিতেছি। একটি সনেটে কবি যুবতীর হাসি এরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

হে রূপসি, নিশি শেষে কোন নদী ধারে,
কোন্ স্বপ্নময় পুরে কোন্ কামাখ্যায়
চরণে নূপুর যেন, অম্বর মাঝারে,
বহিয়া সে কুলুধ্বনি, আইলে হেথায় ?
নাগেশ্বর চাঁপা তলে কোন্ অলকায়
দাঁড়াইয়া ছিলে তুমি মদনমোহিনী ?
একরাশি জাতি যূথি, মল্লিকা, কামিনী,
ঝাঁপাইয়া কোলে তব পশিল হিয়ায়।
গান নাহি বোঝা যায় ভাসে শুধু সুর
ফুল নাহি দেখা যায় সৌরভ কেবলি,
প্রাণের গবাক্ষ দিয়া জ্যোৎস্না মধুর
উছলিয়া অধরেতে পড়ে আসি ঢলি।

আবার 'উচ্চ হাসি' কবির প্রাণে কিরূপ ভাবের লহরী তুলিয়াছে, কত না উপমা দিয়া ভাষার তুলিকা দিয়া তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন দেখুন।

মুর্ত্তিমতী রাগিণীর ভুজ মেখলায়
বাজি যেন উঠিয়াছে কঙ্কণ কিঙ্কিণী !
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে বাসন্তী উষায়
জাগি যেন উঠিয়াছে নূপুর শিঞ্জনী।

কবি তাঁহার এই চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন অশোক গুচ্ছের শেষ কবিতা "অশোক তরু" শীর্ষক সনেটটিতে। আমরা তার প্রথম কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হে অশোক, কেন্ রাঙ্গা চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল ?
কোন্ দোল পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্ প্রকৃতি-দুলাল ?
কোন্ চিরসধবার ব্রত উৎযাপনে
পাইলে বাসন্তী শাড়ী সিন্দূর বরণ
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া হাসি করিলি চয়ন ?

বিরাজ করিবে। করুণরস ফুটাইতেও দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধ হস্ত। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিধবা নারীরূপে যে বিষাদ-প্রতিমাও মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা বিরাজ করিতেছে তাহাদের কথাও কবি বিস্মৃত হন নাই। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে এক দিকে যেমন দাম্পত্যলীলার উচ্ছল হাসি রাশি আছে, অপর দিকে তেমনই আবার বালিকা তরুণী বিধবার তপ্ত অশ্রুও তাহারই অন্তরালে নিবন্তর ঝ বহেছে। ইহাদের জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে এবং তিনি তাঁহার মোহিনী তুলিকা-স্পর্শে কয়েকটি কবিতায় বঙ্গ বিধবার যে অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন করুণ তেমনই সুন্দর। সদ্য স্বামিবিয়োগ বিধুরা নারী যখন বিলাপ করিতেছে

সকলি ত হইল স্বপন।
তোমার সহিত নাথ ! ইহজনমের সাধ
চিতায় করিল আরোহণ।
অভাগীর রূপ নাও সিন্দূরের কৌটা নাও
নাও নাও বসন ভূষণ,
অন্ধকার একরাশ নিবিড় এ কেশ পাশ
করিত যা চরণ চুম্বন।

তখন এই বিলাপোক্তি শুনিয়া আমাদের নয়ন বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মধ্যে যে অসীম প্রেম ধৈর্য্য ও আত্ম সমর্পণের ভাব দেখি তাহা কি হৃদয়স্পর্শী !—

দাও দাও স্মৃতিটি তোমার,—
ওই স্মৃতি বুকে লয়ে সারাদিন সারাক্ষণ
করিব ও মূরতি স্মরণ।
হে নাথ কিছু না চাই এই ভিক্ষা তব ঠাঁই
দাও দাও অল্পভোগী তোমার জীবন !

কিন্তু কবির এই করুণাধারা শুধু যে বিধবারই উপর বর্ষিত হইয়া নিঃশেষ হইয়াছে তাহা নয়। হিন্দু সমাজ নারী জাতির উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে বা এখনও করিতেছে তাহা হৃদয়বান কবির হৃদয় বিগলিত না করিয়া থাকিতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথও কৌলীন্য ও পণ প্রথার যূপকাষ্ঠে হিন্দু সমাজে নারী বলি হইয়া থাকে তাহার যথাযথ চিত্র দিয়াছেন। কুলীন যুবতী দীর্ঘকাল

তাহার সেই চির অভীপ্সিত বস্তুটিকে পাইল তখন তাহার তস্করবৎ নৃশংস ব্যাপারে কিরূপে সে

ঘৃণায় ও রোষে
ভালের সিন্দুর বিন্দু ফেলিল মুছিয়া

এবং কিরূপে পরে সে ধীরে ধীরে বিপথে পদার্পণ করিল তাহা "কলঙ্কিনীর আত্ম কাহিনীতে" উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে কৌলীন্যের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। এরূপ চিত্র বোধ হয় আর কোন কবিকে অঙ্কিত করিতে হইবে না। কিন্তু পণ প্রথার শাণিত খড়্গ এখনও বঙ্গবালার মস্তকোপরি উদ্যত রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কখনও শ্লেষ বর্ষণ দ্বারা কখনও বা করুণ রসের উৎস ছুটাইয়া এই প্রথার জঘন্যতা প্রকটিত করিয়াছেন। কবি বিংশ শতাব্দীর বরকে দশহাজার টাকার ভিপি পার্শেলে বিবাহ সভায় পাঠাইয়াছেন, আবার অন্যত্র দেখি কন্যার পিতা প্রতিশ্রুত দশ সহস্র মুদ্রা দিতে না পারায়, 'বাকি পাঁচশত রুপেয়া'র জন্য শ্বশুর গৃহে বন্দিনী কন্যা মনের দুঃখে তিলে তিলে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। হায়!

অকাল হেমন্ত আসি লয়ে পাণ্ডু হিম রাশি
তুষারে ডুবায়ে দিল সে কনক-নলিনী!

নারীর প্রতি এই অনাদরে হিন্দু সমাজ উৎসন্নয় যাইতে বসিয়াছে। কবি তাই তাঁহার দুহিতা মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া বলিতেছেন—

নাহি ঘৃণা, নাহি লজ্জা! ধিক্! ধিক্! অধম বাঙ্গালী!
তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ভস্মে ঘৃত! কি অন্ধ নয়ন!
পুত্র হলে শাঁখ বাজে কন্যা হ'লে আঁধার ভবন।—
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চূন কালি
* * * *
মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়হরা দেবতা রূপিনী,
নারীই শৃঙ্খলা বিশ্বে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য্য আধার!
নারীর মাহাত্ম্য মূঢ় বুঝিলেন না, তাই হাহাকার
আজি বঙ্গে গৃহে গৃহে।

অমলা

[শ্রীমতী নিরুপমা দেবী]

(৯)

রাজেন্দ্রের এ আশা কিন্তু সফল হইবার কোন গতিক সে দেখিতে পাইলনা। রমেন দিনান্তে একবার কিম্বা দুইবার তাহার সঙ্গেই অমলার দিদিমাকে দেখিতে যাইত মাত্র, পূর্ব্বের অপেক্ষাও সে যেন সমস্ত সংযত হইয়া পড়িল। অমলার সঙ্গে সে চোখো চোখি করিয়া পর্য্যন্ত একটা কথা কহিত না। দেখিয়া শুনিয়া রাজেন্দ্র এক দিন তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিল "শুনেছি এ ব্যাপারে লোকে দূতীর শরণ নেয়, তুমি কি শেষে আমাকেই দূত বানিয়ে দ্বিতীয় মেঘদূত কাব্য গড়িয়ে তুলবে?" রমেন বিষণ্ণ ভাবে একটু হাসিল পূর্ব্বের মত আর এক কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল না, মৃদুকণ্ঠে বলিল "কিন্তু এ কাযে এগিয়ে তোমায় ভগ্নদূত আখ্যা নিতে হবে হয়ত দেখো। সে তোমায় নরকের যমদূত বলে না মনে করে তাও ভাবছি।"

"দেখা যাবে। কিন্তু বড় সঙ্গীন্ কেস্ হে জাননাত এরকম ঐতিহাসিক কাণ্ড কোন দেশের ইতিহাসেও আছে কি না সন্দেহ।"

"ঠাট্টা ছাড়, সেযে কুমারী এই টুকুই তাকে জানিয়ে দাও, অন্য কথা ছেড়ে দাও।"

"অর্থাৎ পরের ভার তোমার—না? বেশ তাই সই। আর এ ছাড়া আমি একটা অপরিচিত তৃতীয়ব্যক্তি অন্য কোন্ কথা কইবার অধিকারই বা রাখি! এইটুকুই বল্‌তে ভয় লাগ্‌ছে।"

"কিন্তু তুমিই যখন এর সাক্ষী তখন তোমার এ অধিকার আছে।"

"মানি, কিন্তু সে শেষের কথা। প্রথমেএসংবাদটা তুমি দিলেই ঠিক্ হ'ত।"

রমেন তাহা কিন্তু কোন রকমেই ঘাড়ে লইতে রাজী হইলনা। অগত্যা রাজেন্দ্র বলিল "আচ্ছা দিদিমাকে

শুনিয়েই কথাটা আরম্ভ করব তবে। তাতে কিন্তু একটু লোক জানাজানির ভয় আছে। আসল কথটা না জেনে এ গোলযোগ তোলার—"

"লোক জানাজানিরই যে বিশেষ দরকার ভাই। এর আর আগে পরে কি।"

রাজেন্দ্র চিন্তিত ভাবে চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না, শেষে বলিল "যা করবার একে একে তবে আমিই করব। তুমি ও অমলা ছাড়া আর কোথাও এ বিষয়ের এখন যেন উচ্চবাচ্য করনা।"

"এবিষয়ে সর্ব্বত্রই আমি অপারগ বলে জেনে রেখো। আরম্ভ ও শেষ সবই তোমায় একা করতে হবে জেনো"

"জেনে সুখী হলাম। বেশ এখন দুদিন আমার সঙ্গে যেওনা ওবাড়ী। দুজনকে পাছে ষড়যন্ত্রকারী বলে বদ্‌নাম দেন্ অমলা।"

রমেন ম্লান মুখে বলিল "তোমার কথায় যদি সে বিশ্বাস নাকরে এতেই কি ভাব্‌বে বল্‌তে পারি না। দেখো ভাই মাঝে হতে আমার মুখ দেখাবার পথটাও যেন তাদের কাছে বন্ধ করে দিওনা। সে লজ্জা আমি সহ্য করতে পারব না।"

"নাওহে চোকরা থেমে যাও। লজ্জা দূরে থাক্ চতুর্গুণ নির্লজ্জই না হয়ে পড়েছ শেষে দেখ্‌তে হয়। উঠ্‌লাম আমায় আজ গ্রামান্তরে যেতে হবে এখনি।"

দিনদুই পরে সেদিনও রমেনকে রাজেন্দ্রের সহিত না দেখিয়া অমলার দিদিমা প্রশ্ন করিল "রমেন যে এলনা আজও? ভাল আছে তো?" "আছে।"

"নিজের ক্ষেত খামার দেখ্‌ছে বুঝি? আহা দেখুক দেখুক একটু সংসারে মন দেক্। বিয়ে থা-ও করলনা কি যে হবে ছেলেটার তাই ভাবি।" রাজেন্দ্র গম্ভীর মুখে বলিল "আত্মীয় স্বজনের পক্ষে সত্যই এটা ভাবনার কথা।"

"আহা কে আর তার আত্মীয় স্বজন আছে দাদা—এক তুমি ছাড়া। তুমি এ গাঁ থেকে চলে গেলে ওরই সব চেয়ে বন্ধু বল্‌তে ভাই বল্‌তে সব যাবে। ওকে যে তুমি কি ভালবাস তাতো আমরা দেখছি।"

"আমি ক দিনের বন্ধু দিদিমা?" ওর চিরদিনের সব সুখ দুঃখের আপনারাই অংশী।"

"আমরা? হা পোড়া কপাল আমাদের—দেখতেই তো পাচ্চ দাদা আমরাই বরং ওর ভার। কোন্ আপদ বিপদে ওর দরকার আমাদের নাহচ্চে। এই যে তোমায় এমন করে পেয়েছি এও ওরই বন্ধু বলেই তো।—"

ব্যাটারী প্রয়োগের শক্তি সঞ্চালনের মধ্যে দিদিমার ঘুম আসিত—সেদিন ও ঘুম আসায় তাঁহার কথা জড়াইয়া আসিতেছিল। রাজেন্দ্র তাঁহার কথার সূত্র ধরিয়া বলিল "আপনাদের হাত থেকে সে আঘাতও পেয়েছে অনেকটা—নয় কি? দিদিমা হাই তুলিয়া জড়তার সহিত বলিলেন" "থাক ওকথা দাদা—অমলা রাগ করবে।"

রাজেন্দ্র থমকিয়া গেল। চিন্তিত মুখে বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিল দিদিমা ঘুমাইয়া পড়িলেন। অমলা আসিয়া নিত্যকার মত দিদিমার উপকার হইতেছে কিনা মৃদুস্বরে তাহার একটু আধটু আলোচনা করিয়াই সহসা আজ প্রশ্ন করিল "আপনি কি সত্যই শীগ্‌গীর এগ্রাম থেকে যাচ্চেন?"

আজ অমলার এই অযাচিত অপ্রাসঙ্গিক কথায় রাজেন্দ্র মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে উত্তর দিল "সেই রকমই তো মনে করছি।—"

কুণ্ঠিতভাবে অমলা ধীরে ধীরে বলিল "দিদিমার অসুখের জন্যই আট্‌কে পড়েছেন সেদিন রমেন দাদা বল্লেন শুন্‌লাম।"

"ওটা অবশ্য রমেন বাড়িয়ে বলেছে তবে হাঁ—শীগ্‌গীর যাব এইবার।"

"আপনি যে সেদিন দিদিমাকে বলেছিলেন দেরী আছে!"

"দেরী? না বোধ হচ্চে আর বেশী দেরী করার দরকার হবে না।"

"দিদিমা কি তারমধ্যে একটু ভাল হয়ে উঠ্‌বেন না?"

রাজেন্দ্র নত মস্তকে একটু নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া অমলার পানে চাহিয়া বলিল "যদি দিদিমাকে আমার সাধ্যমত সারিয়ে দিলে আমায় যেতে বলেন তাতে আমি সুখীই হব যে আমি আপনাদের একটু দরকারেও লেগেছি কিন্তু তা আপনি আমায় বলবেন কি?"

অমলা যেন আজ একথার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল "আমি জানি আপনি আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবেন। আমার ব্যবহারে খুড়িমার ব্যারামের সময় একদিন অপমান বোধ করে—"

"আমি কোন দিনই আপনার কোন ব্যবহারে অপমানিত হইনি।"

"ভুলে গেছেন বোধ হয়। সেদিনও আপনি আপনার বারে বারে আসা যেন আমরা সংকরি বিরক্ত নাহই এইকথা বলেছিলেন আর দিদিমার অসুখ দেখেও সেদিন সেই কথা বলেছেন। আমি বুঝেছি আমার অকৃতজ্ঞতাকে মনে করেই আপনি বলেছিলেন।"

"ভুলিনি। আপনাকেই দুদিন একথাটা বলেছি তা স্বীকার করি, কিন্তু আপনি যা বলেন সেজন্য নয়। মাত্র আপনার অনুমতিই চেয়েছিলাম।—"

"কিন্তু কেন? আমাদের বিপদে সর্ব্বপ্রকারে আমাদেরই রক্ষা করবার জন্য এসে আমার—যা বল্‌ছেন আপনি—অনুমতি— এতে কি প্রমাণ হয়না যে আমায় আপনি কত বড় অকৃতজ্ঞ ভেবেছেন"? বলিতে বলিতে অমলার কণ্ঠ সহসা রোধ হইয়া গেল।

রাজেন্দ্র একটু যেন ম্লান হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল "না, আমি তা ভাবিনি। বারে বারে আপনাদের মধ্যে আস্‌তে এক্ষেত্রে আপনার সম্মতির একটু দরকার বোধ হয়েছিল আমার এইমাত্র এর কারণ।"

অমলা এ কৈফিয়তে যেন সন্তুষ্ট না হইয়া রুদ্ধকণ্ঠেই বলিতে লাগিল "এখনি আপনি বল্লেন আমি বল্লে তবে আপনি বুঝবেন যে আপনি আমাদের দরকারে লেগেছেন। যে আপনি খুড়মার ব্যারাম থেকে এ পর্য্যন্ত আমাদের যা করেছেন তা বল্‌বারই আমাদের সাধ্য নেই। এখনো দিদিমার জন্য আপনি বোধ হয় নিজের ক্ষতি করে থাক্‌তে পর্য্যন্ত রাজী হলেন। সেই আপনাকে আমি আমাদের দরকারে লেগেছেন বলেও স্বীকার করতে চাই না, এতটা অন্ধ অজ্ঞানত্ব কোন মানুষে সম্ভব কি? পশুতেও বোধ হয় দুর্ল্লভ।"

রাজেন্দ্র ক্ষণিক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অমলাকে আশ্ব-"আমার ক্ষতি হবে ভাববেন না। দিদিমাকে একটু সুস্থ করে রেখে যেতে অনায়াসেই আমি পারব।"

কিন্তু আপনি এখনো আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। তবুও বল্‌ছি, নিজ হতে আপনি যে মহত্ত্ব দেখাচ্ছেন এর ওপর কি কারও জোর করার অধিকার থাকতে পারে? যিনি দেবতা হন তিনি আপনার স্বভাবেই হন্। সাধারণে তাঁকে অন্য মানুষের মত না দেখে এত বড় দাবী যদি না করতে পেরে ওঠে সে কি তাঁকে অপমান করা হয়?" "আপনি আমার একদিন ও অপমান করেন নি। তবে—স্বীকার কর্‌ছি হয়ত একটু আধটু কষ্ট বোধ ক'রে থাকতে পারি, তার কারণ এ নয় যে আপনি আমায় অসম্মান করেছেন। আপনাদের সঙ্গে যতটাই ঘনিষ্ঠতা হোক আমি আপনাদের যে আত্মীয় নই একথা আপনিও ভোলেননি আমিও মনে রেখেছিলাম। তাই আপনার কানের ফুল দুটি আপনি দেওয়া মাত্রই আমি সম্মানের সঙ্গেই নিয়েছি। তবে মণির গলার জিনিষটা নষ্ট করতে আপত্তি—নিতান্ত পর হলেও মানুষ মাত্রেই বোধহয় করতে পারে। আশাকরি সেটা ফেরৎ দেওয়ায় আপনিও আমার মহত্ত্ব দেখানোর অহঙ্কার ভাবেননি। অনাত্মীয় ব্যক্তির সব বিষয়েই একটা সঙ্কোচ আসা স্বাভাবিক বলেই জান্‌বেন। পরের উপরে জগতে কোন দাবীই তো দাঁড়াতে পারেনা এ কে না জানে। তাই কোন পক্ষেরই জোর সাজে না।"

অমলা ডাক্তারের এভাবের কথার কোন অর্থ বা সদুত্তর না পাইয়া অপ্রস্তুত ভাবে কেবল বলিল "আপনি পর হলেও কোন আত্মীয় আজ আপনা চেয়ে আমাদের বেশী বন্ধু! আপনি—"

ডাক্তার এইবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেইরূপ একটু ম্লান হাস্যের সহিত বলিল 'রমেনের বন্ধু যে আপনাদেরও বন্ধু হবে এতো বেশী কথা নয়। আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার সম্বন্ধে এই কৃতজ্ঞ ভাবটাও যদি সরিয়ে ফেলেন্—বন্ধু জেনেই যদি অকুণ্ঠিত হন—তাহলেই আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ বোধ হবে জানবেন। আমার দাবী এর চেয়ে আর আমি একচুলও বড় করতে চাচ্ছিনা। দিদিমার অনেকটা উপকার হয়েছে বলেই যেন মনে হচ্ছে।

একবার মাথা হেলাইয়া ডাক্তার চলিয়া গেল। সেদিন আর রমেনের সঙ্গে দেখা করিতে তাহার বড় ঢুকিল না।

পরদিনও রমেনকে না দেখিয়া দিদিমা বুড়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সে সাংসারিক কার্য্যে একটু ব্যস্ত আছে রাজেন্দ্রের মুখে একথা শুনিয়াও তিনি আশ্বস্ত হইলেন না। অমলাকে পুনঃ পুনঃ তাহার খোঁজ নিতে অনুরোধ করায় অমলা "আচ্ছা টুনিমণিকে তার কাছে পাঠাচ্ছি" বলিয়া উঠিয়া গেলে রাজেন্দ্র সহসা বৃদ্ধাকে বলিল "রমেনও যে শীগগির চাকরী বাকরীর জন্য সহরে যাবে দিদিমা, নৈলে তার মাতৃশ্রাদ্ধে যে দেনা হয়েছে তাতো শোধ যাবে না। আর পুরুষ মানুষের এমন ভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরে বসে থাকাটাও তো উচিত নয়। তখন আপনাদের বড় মুস্কিলে পড়তে হবে দেখছি। এইতো আপনার অবস্থা এবয়সে আপনি আর কতটা ভাল হ'তেই বা পারবেন। বড়জোর নিজের নড়া চড়া টুকু যদি বশে আসে। বাঁচবেনও যে কতদিন তাও বলা যায় না। তখন এদের কি হবে! একটা অভিভাবক বলে কেউ যদি না থাকে—।"

বৃদ্ধা এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে বাক্যহীনই হইয়া পড়িয়াছিলেন—এইবার প্রায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন "সেইজন্যই বুঝি রমেন ব্যস্ত রয়েছে? তাহ'লে ছেলে মেয়ে দুটো নিয়ে অমলা অকুল সমুদ্রেই পড়বে আর কি! এত দুঃখের জীবনেও এইজন্যে মরার ইচ্ছে তেমন আসেনা, যে তাহলে ওদের একটা অভিভাবক বলে কেউ থাকবেনা। কিন্তু আমিতো একটা সং খাড়া করা মাত্র আছি রমেনের ভরসাই চার-পোয়া করি। সে যদি আর গাঁয়ে না থাকে—"

"কিন্তু ভেবে দেখুন আপনি অবর্ত্তমানে রমেন কি এঁদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতাই রাখতে পারবে? লোক নিন্দের ভয় নেই কি তাতে?"

উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "খুবই আছে, কিযে বাছাদের উপায় হবে জানিনা। ধর্ম্মের কর্ম্ম ন্যাথ দাদা,—আমিই কাশী হ'তে এক উড়ো খবর নিয়ে এসে রমেন আর অমার বিয়ে বন্ধ করি। তাই বোধ হয় সে কাযের ফলভোগ আমিই করতে থাকলাম। মেয়ে আজ ৪।৫ বছরে ওকে যেমন করে বুঝলাম টুনি মনি দুরের কথা নিজের জন্যই কি আমার তাহলে ভাবতে হ'ত! আমিই ওর সর্ব্বনাশ করেছি অথচ মায়ের বাড়া সেবা আমার করে। কি করে আমায় ভাল করবে তার জন্যে প্রাণ পণ যত্ন দেখছ'ত! সময় সময় ওর কাছে মুখ খুলতেও আমার লজ্জা হয় আর রমেনের কাছেতো তার চেয়ে শতগুণ লজ্জা পাবার কথা। ছেলেটা আর বিয়ে পর্য্যন্ত কর্‌লেনা।"

দিদিমা চোখ্ মুছিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল "কিন্তু সে উড়ো খবরের বিষয়ে যদি কেউ ভাল করে খোজ কর্‌তে পার্‌তেন হয়ত তাতে কিছু গলদও বেরিয়ে পড়তো। শুধুমাত্র অমলার বাপের পিসি নিজের আন্দাজের ওপরই ঝোঁক দিয়ে ছিলেন, কোন' প্রমাণ তো দেখাতে পারেননি। এখনো এবিষয়ে যদি তেমন করে সন্ধান নিতে পারা যায় হয়ত ভুল ধরা পড়ে।"

"কি ভুলের কথা বলছ ভাই? অমলার বিয়ে হয়ত হয়নি এই কি বলতে চাও?"

রাজেন্দ্র নত মস্তকে বলিল "হাঁ"।

বৃদ্ধা ব্যগ্র আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল "আহা ভগবান কি এমন কর্‌বেন? এখন সেকথা মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় দাদা। আর যদি ধর ওরকম বিয়ে হয়েই থাকে ওকে কি বিয়ে বলে? যার কথা কেউ জানেনা—অমলারও যার বিন্দু বিসর্গ মনে নেই। আর এরকম "দোপড়া" মেয়ের কথা কত জায়গায় শুনতে পাওয়া যায়। সমাজে ও তারা দিব্য চলছে অথচ এই রকম একটা কানাঘুষো তাদের নামে এক সময়ে চলেছিল। অমলার নামেও নাহয় তাই হত—কিন্তু কালে আবার তা সাম্‌লে যেত। আর আমি এসে এখানে একথা না বল্‌লে কেহই বা জান্‌তে পার্‌ত। তখন একথা আমরা কেহই ভেবে দেখলামনা যে ভবিষ্যতে মেয়েটার কি গতি হবে! তার ফল ভোগ করতে আমিই রইলাম। এই আসন্ন কালে আমার চোখ্ ফুট্‌ল কিন্তু এখন কি এর আর কোন উপায় আছে? এখন অমার বিয়ে হয়নি বল্লে কেউ কি বিশ্বাস করবে? আঠারো উনিশ

আছে, সবাই জেনেছে সে বিয়ে হওয়া মেয়ে। এখন একথা বল্লে কেবল কেলেঙ্কারী মাত্র সার হবে।" সনিশ্বাসে বৃদ্ধা থামিয়া গেলে রাজেন্দ্র একভাবেই বলিল কিন্তু রীতিমত সন্ধান নেওয়া প্রমাণ্য খবরে সকলে কেন বিশ্বাস করবে না? কেলেঙ্কারীই বা কেন হবে?

"এমন সন্ধান কে আমাদের জন্য করবে! তেমন লোকবল জনবল আমাদের কৈ!"

"যদি আপনারা সম্মত হন্ রমেনই খোঁজ নিতে চেষ্টা করবে।"

বৃদ্ধা একটু ভাবিয়া বলিলেন "রমেন যে সেই বিয়ে ভেঙে যাবার পরে একবার পশ্চিমে গিয়েছিল কিছু দিন তা তখন কি এর কোন খোঁজ নেয়নি? আমাদের তো মনে হয় যে নিয়েছিল। কিন্তু ভাল খবর পেলে কিসে চুপ করে থাকৃত? সেই রাগে তো তার মার একরকম অমতেই অমলাকে বিয়ে করবার জেদ্ ধরে মাকে রাজী করিয়েছিল। ফিরে এসে তো কৈ সে কিছু বলেওনি উপরন্তু কোন সন্নিসি নাকি তার কোন ফাঁড়ার কথা বলে তাকে এমনি ভয় দেখিয়েছিল যে সে তার মাকে পর্য্যন্ত বিয়ের নামটি করতে দেয় নি।"

"রমেনের সে খোঁজ ঠিক রকমের হয়নি। সে তখন ছেলে মানুষ কতই বা তার বিদ্যা বুদ্ধি। এখন খোঁজ করলে বোধ হয় ফল পাওয়া যায়।"

"অমলার বাপের পিসিতো মরে গেছে আর কার কাছে খবর পাবে?" "রমেনও তাঁরই কাছে খোজ করেছিল কিন্তু তাঁর কাছে এর সঠিক খবর পাবার কথা নয়। প্রয়াগে যে সব পাণ্ডা থাকে তাদেরই কাছে খোজ করতে হ'ত। অমলার বাপের পাণ্ডাকে খুঁজে বার্ করতে হবে তারই কাছে অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে।"

ঘোরতর নৈরাশ্যের সহিত রাজেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "কে অমার বাপের পাণ্ডা এতকাল পরে কি করে তার খোজ হবে? ধর যদি সে মরেই গিয়ে থাকে। না দাদা এ আর বুঝি সম্ভব নয়। উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আর তো এখন লোকে মানবেনা। তুমি রমেনের যেমন বন্ধু অমাদেরও যে তেমনি। বিনা প্রমাণে আমাদের এ লজ্জায় ফেলোনা।"

"উপযুক্ত প্রমাণই দেওয়া যাবে। কেবল অপনাদের সম্মতি মাত্র জান্‌তে চাই।"

বৃদ্ধা আনন্দে সহসা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। "আমাদের সম্মতি? সেকি আর জিজ্ঞাসার কথা?—কিন্তু এত অসম্ভব কি সম্ভব হবে ভাই? যদি হয় সে তোমারই ক্ষমতায়। তুমিই তাহলে এ স্বপনের অতীত ব্যাপারকেও সত্যি করে দেবে। কিন্তু দাদা মন্দটাই আগে ধরে রাখতে হয়, সন্ধান নি'তে গিয়ে যদি তেমন সুবিধে না হয়ে উঠে একথা আগে থাকতে বাড়িয়ে কাজ নেই। মিছে মিছি একটা "লোক হাসা হাসি না হয়।"

রাজেন্দ্র গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "আপনারা যদি সম্মত থাকেন—এত লোক হাস্যের ভয় করলে চলবেনা। প্রমাণ দেখালেও নিন্দুকের জিহ্বাকে কি কেউ দমন করতে পারে? সেটুকু সাহস আপাদের ধরতে হবে। যাক্ এখন দু চার দিন রটনা না হয় নাই করা গেল কিন্তু আপনারা প্রস্তুত হ'লেই আমাদের প্রস্তুত জানবেন। এর আর দেরী করার দরকার দেখছিনা"।

বৃদ্ধা সবিস্ময়ে রাজেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া বলিল "তোমার কথায় মনে হচ্চে সন্ধান প্রমাণ সব তোমার ঠিক করা হয়ে গেছে। তুমি তবে সব খোঁজ নিয়ে এ কথা পেড়েছ?"

"হাঁ।"

"সত্যিই কি তবে অমার বিয়ে হয়নি? আমি কি মিছেই তাকে এমনি করে এত কাল ধরে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে রেখেছি? ওর বাপ কি সত্যিই বিয়ে দেয়নি? এর ব্যাপার সবই মিথ্যে তবে?" রাজেন্দ্র ধীর ভাবে উত্তর দিল 'যতটা সত্যি তাতে এবিষয়ে কোন বাধাই হ'তে পারে না। আপনি এই সমাজের মধ্যে এই অশিক্ষিত জীবনে এতকাল কাটিয়ে বৃদ্ধকালে এসে পৌছে এই বদ্ধমূল সংস্কারকে ঠেলে যে সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন—জানবেন তার মূল্য আছে। অমলা কুমারী, তার এ বিয়ের কিছুমাত্র বাধা নেই। তবে আপনার নাতিনী এখন সাবালিকা হয়েছেন, তাঁকে ও এখন এসব ভাল করে জানানোও দরকার। আপনি তা জানিয়ে আমায় বলবেন আমি তখন আমার প্রমাণ দেখিয়ে সমাজকে নিশ্চয়ই নিরুত্তর করতে পারব।

এখন তবে আমি যাই। বৃদ্ধার অস্ফুট আশীর্ব্বাদোচ্চারণের মধ্যে রাজেন্দ্র নত শিরে বাহিরে আসিয়া দেখিল অমলা দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া নির্ব্বাক নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছে। সেই ভাবহীন পাণ্ডুরাভাযুক্ত শুভ্র মুখের পানে চাহিয়া রাজেন্দ্রও কয়েক মুহূর্ত্ত যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তারপর সহসা চকিত ভাবে দৃষ্টি নত করিয়া অমলার উদ্দেশে প্রত্যেক দিনের মত মাথাটা সম্মুখে একবার একটু হেলাইয়া রাজেন্দ্র যেন অন্য দিনের অপেক্ষা দ্রুত পদে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

রমেন সেদিনও রাজেন্দ্রের সঙ্গে অমলার দিদিমাকে দেখিতে যাইতে পারিলনা। বলিল তুমি যে কাণ্ড বাধালে, আমায় তোমার আগেই এ গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। যাবার আগে তাঁকে একদিন দেখে যাব তার আগে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

"সেই ভাল। তুমি তাহলে ততক্ষণ তল্পী বাঁধ, আমি নিজের কাজ করে আসি।" "ঠাট্টা নয় অমলা কি না জানি মনে করছে ভেবে কাল থেকে এগ্রামে থাকতেও আমার বিষম লজ্জা বোধ হচ্চে সত্যিই আমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য কোথাও যেতে চাই—ছেড়ে দাও আমায়।"

"আচ্ছা আজ ফিরে এসে এর উত্তর দেব। তখন যেতে চাও—বারণ করব না।"

রাজেন্দ্র যথানিয়মে অমলার দিদিমার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া সেদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করিতে লাগিল যে এই বার তিনি নিজ হইতেই সে কথা তুলিবেন। কিন্তু বুড়ী তাহার দিক দিয়াও গেল না। বাটারি প্রয়োগের পর যখন তিনি প্রতিদিনের মত ঘুমাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন তখন আর রাজেন্দ্রের ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব হইল। সে তখন নিজ হইতেই প্রশ্ন করিল "আপনাদের খবর কি দিদিমা।"

দিদিমা সচকিতে চোখ খুলিয়া হস্তের ইঙ্গিতে রাজেন্দ্রকে সঙ্কেত করিয়া চুপি চুপি বলিলেন "চুপ কর দাদা ওসব কথায় আর কাজ নেই। কাল অমি বড় রাগ করেছে। আমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে নাখেয়ে এক কাণ্ড বাধাবার জোগাড়। বলে ওসব কথা আর বেশী হইলে সে জলে ডুবে মরবে। একেই বলে "যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।" আমরাই কৃত কর্ম্মের শাস্তি ভাই তাকে কি বলব। এ ধারনা তার মনে আমিই তো ঢুকিয়ে দিয়েছি"

রাজেন্দ্র একটু নীরবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল "তিনি কি প্রমাণ না দেখে বিশ্বাস করতে পারছেন না?"

প্রমাণ নেওয়া সে ও সব কথা নাকি কাণে ও শুনবেনা প্রমাণ—অপ্রমানের কথা তো দূরেই থাক্। সে যেমন আছে তেমনি থাকবে কারও কথা সে শুনতে চায় না।"

"আপনার জীবনের অনিশ্চয়তার কথা—ভবিষ্যতের কথা—সব কথা তাঁকে বুঝিয়েছেন?"

"আমি আর কি বোঝাব সেকি আমার চেয়ে ও বেশী বোঝেনা? তবু এত দিন পরে আবার এই কাণ্ডের জন্য লোকে আড়ালে যা হাসি ঠাট্টা করবে—মুখে প্রমাণ বলে মেনে নিয়েও অন্তরে যা হাসবে তা সে সইতে পারবে না।"

"এই জন্য? কি আশ্চর্য্য! এমন একটা অন্যায় কাজ হয়ে রয়েছে, এক জন তৃতীয় ব্যক্তি মাঝে থেকে যদি তার একটা উপায় হয় তাতে লোকলজ্জার কি আছে? এতো রমেন উদ্যোগী হয়ে করছে না, যদিও তা করলেও কোন দোষের কথা হয় না, কেননা এ যে রমেনেরই নিজের কাজ। যাক্ এখন অন্য এক ব্যক্তি সব জানতে পেরে যদি—"

তুমি যে রমেনের বন্ধু দাদা, লোকে বলবে এ রমেনরই কাজ। প্রমাণে হয়ত বিশ্বাসই করবেনা। কেবল লোক লজ্জাই সার হবে।"

"আমি কি বলিনি লোকের যাতে বিশ্বাস হয় তেমন প্রমাণ দেবার ভার আমার রইল? তাঁকে লোক সমাজে লজ্জা না পেতে হলেই তো হল। আমার উপর কি অপনারা এটুকু নির্ভর ও করতে পারেন না! তাঁকে ডাকুন—একথা আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি।"

বৃদ্ধা অমলাকে আহ্বান করিতে লাগিল—কিন্তু সে আসিল না। পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করিয়া ক্লান্তা দিদিমা তখন বলিলেন "মিছে চেষ্টা ভাই যা ওদের বরাতে আছে হবে, তুমি আর হয়রাণ হয়োনা।"

রাজেন্দ্র নিজ কর্ত্তব্য সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া আজ আর অমলাকে দেখিতে পাইল না।

রমেন সমস্ত শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। রাজেন্দ্র প্রশ্ন করিল "এখন কি করবে, তল্পী বাঁধাই কি স্থির?" "নিশ্চয়। এর পরও কি থাকতে বল? কি করে আর মুখ দেখাব? অথচ গ্রামে থাকলে তা অনিবার্য্য তুমি গ্রাম থেকে চলে গেলেই ভেবেছ কি আর তোমায় ধরে আনতে পারব না? আমি কি আমার সঙ্কল্প এত সহজেই ছাড়ব মনে করছ। এইবার আমি নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ার ডিক্লেয়ার করব"—রমেন হাত জোড় করিল "রক্ষা কর ভাই আমার আর সর্ব্বনাশ করনা। এই যা হল যথেষ্ট। কালই আমি যাচ্ছি।"

"দিদিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?"

"না আর তাও পারবনা?"

কিন্তু পর দিন সকালেই যখন টুনি মনি আসিয়া "দিদিমা ডাকছে রমেনদা চল তোমায় এখনি যেতে হবে" বলিয়া দুই জনে দুই হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল তখন আর কোন আপত্তিই টিকিলনা। ধীরে ধীরে গিয়া তাহাকে দিদিমার নিকট বসিতে হইল। দিদিমা যেন কোন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে বলিলেন "এমন সময়ে চাকরীর চেষ্টায় বেরুচ্ছ কেন ভাই, এযে ফসলের সময় নিজের 'ক্ষেতখামার' তদারক করে ঘরে তুললে যাহবে তোমার চাকরীর ঝকমারীতে তাকি এখনি পাবে দাদা? এমন ভুল করছ কেন?

রমেন কুণ্ঠিত ভাবে বলিল দেনা গুলো শোধ—

"তাকি নিজের ক্ষেত ভরা ফসল বরবাদ দিয়ে চাকরী বলে ছুটতে হবে? এখন যে বেরুবার সময় নয় তা ভুলছ কেন? আমাদের ও তুমি ভিন্ন কে দেখে শুনে দেবে! আমার তো এবার একপা বেরিয়ে একটা কথা কইবার উপায় ভগবান রাখেন নি, তুমি না দেখলে যে আমরা মারা যাব ভাই।"

রমেনের চোখে জল ভরিয়া আসিল। কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল "আমায় যে এখনো এ কথা বলবেন আপনারা এ আমি ভাবিনি" "কেন কি হয়েছে? কি করেছ তুমি? এমন ছেলে মানুষ ও তো দেখিনি, চোখে জল কেন দাদা—ছি! তোমরা যে আমাদের ভাবনাতেই এ সব—" দিদিমার কথা আর [illegible] হইতে পাইলনা। তাঁহার পথ্যের বাটী হস্তে অমলা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অম্লান প্রসন্ন মুখে ঠিক আগের মতই অকুণ্ঠিত ভাবে বলিল "রমেন দাদা দিদিমার অনেকটা উপকার হয়েছে দেখেছ? বাঁদিকটা বেশ নাড়তে চাড়তে পারছেন পাশ ফিরতে পারছেন।"

রমেন নিজের মুখ খানাকে লুকাইবার জন্য দিদিমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার দিকেই চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল "হাঁ ডাক্তার তো আশা করেছে একটু আধটু চলৎশক্তিও ফিরে পেতে পারেন।" দিদিমা কৃতজ্ঞ গদগদ কণ্ঠে বলিল এ বয়সে এরোগের হাত থেকে কি কেউ নিস্তার পায়? যা হচ্চে সবই তোমার ডাক্তারের গুনে। তাইতো দাদা তোমাদের এ গ্রাম থেকে যাওয়া শুনে বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে যে এ অনাথা গুলোর তাহলে কি হবে?"

অমলা একেবারে রমেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তুমি আবার কোথায় যাবে? তোমার সম্পত্তি বাড়ী ঘর কে দেখবে তাহলে? ওসব মতলব ছেড়ে দাও, বিদেশে কিসের জন্য যাবে শুনি? রমেনের বাক্যস্ফূর্ত্তী হইলনা। বয়োবৃদ্ধির পর অমলা এমন করিয়া কখনো তাহার সহিত কথা কহে নাই। আজ তাহার একি ভাব—উভয়ের মধ্যের এই কুণ্ঠাকে সরাইবার জন্যই তাহার নিজের উপর আজ এই বল প্রয়োগ কিম্বা এব্যাপারটাকে যে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই ইহা তাহারই লক্ষণ?

একথাটা মনে হইতেই রমেনের বুকের ভিতরটা কে যেন মুঠায় করিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সত্যাই কি অমলা এবিষয়ে এতটাই উদাসীন? আর কিছু না হোক তাহার একটু ভাবান্তর একটু বিষন্নতা কিম্বা মুখচোখে কোন একটু চিন্তার আভাস এটুকুও কি এ ক্ষেত্রে এতই অসঙ্গত? সেই চার পাঁচ বৎসর আগের কথা তাহার কি একটুও মনে নাই? আর কিছু নাহোক সে দিনের কথা মনে পড়িয়া একটু কষ্টও কি হয় নাই রমেনের জীবনের সে বজ্রাঘাত—তাহার গুরুত্ব অনুভব করিয়াও কি অমলা কোন দিন একটু ব্যথা বোধ করে নাই? তা যদি করিত—আজিকার এ ঘটনায় তাহার সেদিনের কথা মনে পড়িয়া মনটা কি একটু ম্লান হইত না?

আর শুধুই কি কেবল সে দিনের কথা? রমেনের দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অতিবাহিত জীবন ইহার বিষয়েও কি অমলা কখনো কোন দিন একটা কথাও ভাবে নাই? তা যদি ভাবিত তাহা হইলে কি সে এঘটনার পর এমন হাসি মুখে তাহার সংগত কথা কহিতে পারিত?

রমেনকে নিরুত্তর দেখিয়া অমলা আবার বলিল "উত্তর দিচ্ছনা যে? তোমার যাওয়া হবেনা বুঝলে?" এইবার প্রায় রুদ্ধ স্বরে রমেন উত্তর দিল "যেতেই হবে।"

"কেন? ধার কর্জ্জ শোধ ও সব কথা ছেড়ে দাও সত্যি কথা বল।" দিদিমা অমলার জেরায় ব্যস্ত হইয়া রমেনকে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টায় বলিয়া উঠিলেন "কি যে বলিস ধার কর্জ্জ কি পুরুষ মানুষের পক্ষে কম ভাবনার জিনিষ" "দিদিমা তুমি চুপকর। পুরুষ মানুষের পক্ষে তা একেবারেই নয় রমেন দা কখনই সেজন্যে চলে যাচ্চোনা এ আমি নিশ্চয় বললাম। নয় কি রমেন দা? সত্যি বল?" রমেন নত মুখেই ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল। তখন অমলা একটু থামিয়া লইয়া যেন নিজের লজ্জা টুকু সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল "কিন্তু তোমার গ্রাম ছেড়ে যাবার কোনই কারণ হয়নি এ জেনে রাখ।"

এইবার রমেন তাহার নত দৃষ্টি অমলার মুখের উপর তুলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে চেষ্টার সঙ্গে বলিল "হয়েছে আমি মুখ দেখাতে পারবনা—"

অমলা রমেনের দৃষ্টি পাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দৃষ্টি নামাইয়া ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল— "কেন পারবেনা? তোমার কোন' দোষ নেই আমরা জানি—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একটু থামিয়া রমেন বলিল "দোষ আছে বৈকি। অন্যের উপর মিথ্যা দোষারোপ ঠিক কি? তার কি স্বার্থ? এ একা আমরই সব— আমি তাই যেতে চাই—।"

অমলা আর কথা কহিতে পারিলনা। নীরবে এবাটী ওবাটীতে তোলা পাড়া করিয়া দিদিমার দুধটুকু জুড়াইয়া দিতে লাগিল।। রমেন ও ক্ষনিক নীরবে থাকিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইতেই অমলা তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বলিল "যাইহোক তার জন্যে তোমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে হবেনা।"

রমেন দিদিমার উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া [illegible] করিয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "আমায় মাপ করো এরপর আর এখানে আমি কিছুতেই থাকতে পারবোনা— এ আমি পারবোনা—" অমলা মাথা নামাইল। দিদিমা বেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন "কেন পারবেনা ভাই, তোমার কিসের লজ্জা? যার জন্যে তুমি নিজের সোনার জীবনটা এমন করে বইয়ে দিলে যে দুঃখে তুমি বিবাগী হয়েই থাকলে, আজ তাকে কুমারী জেনেও--অমলা সজোরে দিদিমাকে ধমক্ দিয়া উঠিল "কি যাতা বকছ দিদিমা, চুপকর বল্‌ছি।" তার পরে রমেনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া শান্ত মৃদুস্বরে বলিল "কিন্তু যে প্রমাণে তোমরা একথা মনে করছ আমি তা মানতে পারছিনা। লোক লজ্জার কথা পরে। আমার বিশ্বাস যা রটেছিল তাতে সত্য আছে।" রমেন উত্তর দিতে পারিতেছেনা দেখিয়া বকুনি খাইয়াও দিদিমা আবার মৃদু মৃদু বলিলেন "রাজেন বলছিল উপযুক্ত প্রমাণ তার হাতে আছে—" "সে প্রমাণ আমি মানিনা।" দিদিমা আর কথা কহিলেন না, কষ্টের সঙ্গেও অন্যদিকে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রমেন ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "এও আমি রাজেন কে বলেছিলাম।"

"কি বলেছিলে?" "সহস্র প্রমাণেও তোমার দিকের বাধা কেউ নরাতে পাড়বেনা।" অমলা উত্তর দিলনা। কিসের একটা গুপ্ত আঘাতে আজ রমেনকে তাহার স্বভাবের বহির্ভূত ভাবে অধীর চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। তাহার চিরদিনের লজ্জার কুণ্ঠা ও সংযম সব যেন আজ এক হইয়া একটা যন্ত্রণাদায়ক বেগের আকারে বাহিরে আসিবার জন্য এমন ঠেলা ঠেলি করিতে লাগিল যে সে বেগকে আজ রুদ্ধ করিবার আর রমেনের শক্তি রহিল না। রমেন বলিয়া ফেলিল "জগতের এই সব বাধার প্রতিকূলেও যুদ্ধ করবার জন্য যে জিনিস বল ধরে উঠে দাঁড়ায় তার সঙ্গে যদি তোমার পরিচয় থাকে অমলা তাহলে তুমি আজ এসংবাদে নিশ্চয় এত বিরক্তি বোধ করিতে না। অন্ততঃ এটির ভিতরে সত্যই কোন ভুল আছে কি না সেটুকু জানতেও কৌতূহল বোধ করতে। আমি জানি—জানি—" "যদি জান তবে কেন এ নিয়ে আর আলোচনা করছ? এ তুচ্ছ কথা ছেড়ে দাও" "তোমার কাছে তুচ্ছ হতে পারে অমলা কিন্তু

ধন্দের এটা জীবন মরণেরই ব্যাপার। সেই চার পাঁচ বছরের আগের কথা—সে দিনের কথা যদি আজ তোমার একটুও মনে থাকে ত—"অমলা এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু বেগের সহিতই বলিল "চার পাঁচ বছর আগের কথা চার পাঁচ বছর আগেই চুকে গেছে। এখন আবার সে কথা কি জন্যে টেনে আনছ? তুমি কি ভুলে যাচ্ছ এই গরীব একটা প্রাণীর সুখ সমস্ত আগ্রহের চেয়েও বড়। তাদের এখন এক [illegible] স্বাভাবিক। হতভাগা তাদের এক জন হতভাগ্য ভাই।"

অমলা আর দাঁড়াইল না। "দুধ টুকু একেবারে জুড়িয়ে গেছে দিদিমা আর একটু গরম করে আনি" বলিয়া দুধের বাটীটা তুলিয়া লইয়া রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আর পাষাণ স্তব্ধ রমেন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনে মনে বোধ হয় ধরণীকে দ্বিধা বিভক্ত হইতেই অনুরোধ করিতে ছিল, যাহা এত দিন অস্পষ্টভাবে সন্দেহের আকারেই তাহার অন্তরের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে কোন সাহসে সে আজ তাহাকে এমন করিয়া সুস্পষ্ট জানিয়া লইতে গেল। অমলা যে তাহাকে এভাবে ভালবাসেনা এযে তাহারও অনেকবার মনে হইয়াছে। তবুও এই জানা কথা জানি-বার এ লজ্জা এ বেদনার অন্ত কোথায়! কি করিয়া আবার সে অমলাকে মুখ দেখাইবে। কিন্তু যে বেদনার জালে তাহার জীবন এমন ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত সে বন্ধন এখন সর্ব্বদেহে মনে দুঃসহ বলিয়া অনুভব করিলেও আর যে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পলাইয়া যাইবারও রমেনের উপায় রহিল না। রাজেন্দ্রের অত্যাচারে অন্তরের বেদনাটা লইয়া কিছু দিন হইতে তাহাদের মধ্যে আলোচনা চলিয়া ছিল সেই শাহার গুহাবাসী তপঃক্লিষ্ট সংযমী প্রেমকে আজ অমলার সমক্ষেই ধূলায় লিপ্ত হইতে হইল বটে কিন্তু অমলার হস্ত নিক্ষিপ্ত সে ধূলি মুষ্ঠ যেন বিভূতিরই নামান্তর। অমলা তাহাকে যেন অপমান করে নাই। সসম্মানে যেন তাহাকে প্রণাম করিয়া নিজে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল অনাথ তাহাদের সেই—ই এক মাত্র আশ্রয়স্থল সর্ব্বোত্তম অন্যায়—অমলার এই নির্ভরত্বকে ঠেলিয়া রমেন এখন নিজের লজ্জা বেদনার বোঝা লইয়া কি করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে এ অবস্থা যতই দুঃসহ হউক সেই অমলারই আদেশে এক এই নির্ভরতা বলেই বুঝি রমেনকে তবুও ইহা সহিতে হইবে।

পুরুৎ-ঠাকুর

[শ্রীকালিদাস রায

শাঁখের সাড়া শুনে, দলে দলে
পাড়ার ছেলে জুটল কোলাহলে,
দুহাত পেতে, ফেল্লে সবাই ঘিরে
মোদের সরল পুরুৎঠাকুরটিরে।
গুড় পাটালী যা'ছিল তাঁর সাথে
বিলিয়ে সব দিলেন হাতে হাতে।
বা'র দরজায় জুটল কতক গুলো
দিলেন তাদের কাঁকুড় কলা মুলো।
পথে যেতে জুটল আরো ছেলে
হাতে তাদের চাউল দিলেন ঢেলে।
শূন্য শেষে নেকড়া খানি ঝাড়ি,

শুধু হাতে ফিরতে তাঁরে দেখে
গৃহিণী তাঁর এলেন রেগে ঝেঁকে
রাঙা শাঁখায় উজল বাহু খানি
তুলে তিনি গর্জ্জে' বলেন, 'জানি
ড্যাক্‌রা বামুন বুদ্ধি তোমার ভোঁতা
চাল কলা সব বিলিয়ে দিলে কোথা?
লক্ষ্মী দেওর পুঁটলী বেঁধে আনে
বেঁচে আছি তাইত প্রাণে প্রাণে।
দেখি যদি কালকে খালি হাত
এ বাড়ীতে বন্ধ তোমার ভাত।
পুরুৎ ঠাকুর মুখটি করে' নীচু

পরের দিনে স্নানটি সারি যবে,
ঠাকুর সেবা করতে যেতে হবে,
পুরুত ভাবেন 'কালকে কতক ছেলে
গুড় পাটালী—একবারে না পেলে।
ভাইত মিঠাই আন্‌ল হাঁড়ী ভরে'
কিছু তাহার আছেই ভাঁড়ার ঘরে।
গিন্নী যখন রান্না ঘরে, চুলো
ধরাচ্ছিলেন নেড়ে নেড়ে কুলো,
ভাঁড়ার ঘরে হাতড়িয়ে সব হাঁড়া
মণ্ডামিঠাই নিলেন তাড়াতাড়ি।
সকল ছেলেই আতব চালের সাথে
সেদিন মিঠাই পেল হাতে হাতে।

গিন্নী যখন আসন খানি পেতে,
দিতে গেলেন দেওরকে জল খেতে,
পেলেন নাক কিছুই হাঁড়া খুঁজে
ব্যাপারটা কি নিলেন সবই বুঝে।
বল্লেন রেগে সামনে পেয়ে চোরে
'এত মিঠাই ফুরালো কি করে?'
চুলকে মাথা পুরুত কহেন "এ—এ
আমি—আমি ফেলেছি সব খেয়ে।"
লালপেড়ে তাঁর আঁচল রাখি গলে
স্বামীর পায়ে' গিন্না আঁখিজলে
বলেন "হে চোর আর কিছু না চাই
জন্ম জন্ম যেন তোমায় পাই।"

বাঙ্গলা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সাহিত্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীসুকুমার দাস গুপ্ত এম—এ

(২)

বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্যের নাট্যবিভাগের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই স্বদেশপ্রাণ দ্বিজেন্দ্র লালের নাট্য প্রতিভার কথা মনে পড়ে। পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মহাসন্ধিস্থলে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। সমগ্র ভারত বর্ষে তখন এক নূতন জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল; আর বঙ্গদেশে এই নবজাগরণের প্রথম কল্লোল-ধ্বনি শ্রুত হয়। বাঙ্গলার ইতিহাসের সেই অধ্যায় বড়ই বৈচিত্র্যময়। জাতীয় জীবনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইলে শিল্পীর প্রাণেও তাহা শতধারায় সঞ্চারিত হইয়া উঠিবে। দেশপ্রিয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তখন ভারতে-তিহাসের কতিপয় গৌরবময়, প্রাণস্পর্শী অতীত চিত্র দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। পঞ্চশত বৎ- অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছিল, রাজপুতনার গিরিকন্দরে যে প্রাণোন্মাদী সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছিল, বাঙ্গালার নবজাগ্রত জীবনে তাহারাই অস্ফুট প্রতিধ্বনি অপূর্ব্ব আবেগে বাজিয়া উঠিল। কিন্তু তীব্র আবেগ চিরদিন ক্ষণস্থায়ী, আঘাতের পর আঘাত না লাগিলে সেই আবেগ মন্দীভূত হইয়া যায়। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যচিত্র সমূহ কেবল সাময়িকরূপে মনোরম। তাঁহার স্বদেশ সঙ্গীত গুলি বাদ দিলে স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে নাটক গুলির মূল্য অতি সাধারণ। তাহাতে আছে উচ্ছ্বাস কিন্তু প্রাণ নাই, ভাষার ঝঙ্কারে তাহা অতুলন কিন্তু ভাব মাধুর্য্যে তাহা আদর্শানুরূপ অনুপম নহে।

তুলনামূলক সমালোচনা সর্ব্বদা সমীচীন না হইলেও এই প্রসঙ্গে বঙ্গের গিরিশচন্দ্রের নামোল্লেখ

"সিরাজদ্দৌলা" ও "মীরকাশীম"—বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অধঃপতনের করুণ কাহিনী। তথাকথিত অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলার অন্তিম কাহিনী অতিশয় বেদনা জড়িত। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাট্যচিত্রে যে প্রাণস্পন্দনের অভাব অনুভূত হয়, গিরিশ চন্দ্রের নাটকদ্বয়ে বিশেষতঃ 'সিরাজদ্দৌলায়' তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন উহার নাট্য বিভাগে গিরিশচন্দ্রের নামও শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিবে।

আমাদের জাতীয় জীবন ব্যাপারে যংগুলি খণ্ড প্রলয় হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর নীলকরগণের নৃশংস লীলা অন্যতম। রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বঙ্গদেশীয় নরনারী এই বৈদেশিক বণিককুলের তাড়নায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে রাজপুরুষগণের কৃপায় তাহারা সংযমিত হয়। আমেরিকায় দাস ব্যবসায় প্রথা রহিত হইবার মূলে "Uncle Tom's Cabin" নামক উপন্যাসের প্রভাব যেরূপ নিতান্ত কম নহে সেইরূপ স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকখানি বঙ্গের নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারের দর্পণ স্বরূপ হইয়া আংশিকভাবে রাজপুরুষ গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। উক্ত নাটকখানি বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য।

বিজেতার কীর্ত্তিকাহিনী শোণিতলিপ্ত হইলেও তাহা ইতিহাসের অতুল সম্পদ, তাই স্বাধীন জাতি ব্যতীত অপর কাহারও প্রকৃত ইতিহাস অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যে জাতি যখন পরাক্রমের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে তখনই তাহার ইতিহাস পঠিত ও আদরণীয় হইবে। কোন লুপ্তগৌরব পরাধীন জাতির অতীত সম্পদ স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ শুষ্ক অস্থিপঞ্জর তুলিয়া হয়তো কোন শ্রদ্ধাবান্ ঐতিহাসিকের অশ্রু ঝরিতে পারে কিন্তু সর্ব্বত্র তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। পরাধীন জাতির ইতিহাস কেবল তাহার বেদনার নিদর্শন; অপর প্রভুত্ব প্রিয় স্বাধীন জাতির নিকটে তাহা ঘৃণা, বিরক্তি ও বিদ্রূপের বস্তু মাত্র। তাই বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্যে ইতিহাস বিভাগের কিছুই নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের সংখ্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। প্রতিবৎসর সহস্রাধিক নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে। তাই ইহাদের মধ্যে 'বাজে মালের' সংখ্যাই বেশী। কয়েকজন শক্তিশালী লেখক ও লেখিকা ব্যতীত অপর কাহারও উপন্যাস সমাদরণীয় হইতেছে না। তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহে বাঙ্গলার সামাজিক জীবনের সুখদুঃখের চিত্র অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেহই আমাদের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকে বিশেষ দৃক্‌পাত করেন নাই। মানবজীবনে বিভিন্নরূপে প্রেমের অভিব্যক্তি তাঁহাদের চরিত্রালোচনায় সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু স্বদেশ প্রেমের উচ্চ আদর্শ কদাচিৎ কেহ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এক হিসাবে, 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস খানি জাতীয় উপন্যাসরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু যেরূপ ভিত্তি ও আদর্শের উপরে আনন্দমঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা কেবল স্বপ্নের মত অলীক ও মনোরম। সন্তানগণের চরিত্রচিত্রণে বৈচিত্র্য নাই—সকলেই কলের পুতুলের ন্যায় এক নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পানে ধাবিত হইয়াছে। উপন্যাসে প্রত্যেক চরিত্র স্বাভাবিক হইবে, কাহাকেও কোন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা রাখিলে চলিবে না। স্বদেশ বা স্বজাতির মঙ্গল সাধন প্রত্যেকের ব্রত হইতে পারে কিন্তু ব্রত সাধনের পন্থা প্রত্যেকের এক নহে। সন্তানগণের চরিত্রে এইরূপ বৈচিত্র্যভাব থাকিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' খানি কেবল কল্পনা সুখকর 'Utopian Scheme'এ পর্য্যবসিত হইত না। 'সুজলাং সুফলাং' সঙ্গীতটী জাতীয় সাহিত্যে গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় চিরদিন পবিত্র থাকিবে কিন্তু সমগ্র উপন্যাসখানি জাতীয়-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বস্তু নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্ত সাজিয়া তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পাগলের ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি হইতে যেরূপ অযত্নরক্ষিত কোন বহুমূল্য বস্তু সহসা বাহির হইয়া পড়ে সেইরূপ বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধপূর্ণ দপ্তরখানি হইতে জাতীয় ভাবোদ্দীপক

অতি সুন্দর দু'একটী প্রবন্ধ আমাদের মন বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রসন্ন গোয়ালিনীকে জোর করিয়া ধরিয়া পাগল কমলাকান্ত "একটী গীত" শুনাইবে। অতীত বেদনার একটী গীত গাহিতে গাহিতে আপন ভোলা পাগল কোন চিরবাঞ্ছিত বস্তুর জন্ম কাঁদিয়া ফেলিয়া পরকে কাঁদাইল। সঙ্গীতটীর সুখস্মৃতি চির-সুন্দর।

জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে উপন্যাস বিভাগে আমাদের কিরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন তাহাই বিচার্য্য বিষয়। Victor Hugo কৃত Les miserables অথবা Mrs Stowe কৃত Uncle Tom's Cabin এর ন্যায় উপন্যাসের আমাদের বড়ই অভাব। প্রথমোক্ত উপন্যাস খানি বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। Jean Valjean এর ন্যায় বন্ধন বিহীন উন্মুক্ত চরিত্র যে কোন জাতির জাতীয় উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে। জীবনের দুর্গম বন্ধুর পথে চলিবার কালে সহস্র বিপত্তি পথরোধ করিবে কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকার লাভের নিমিত্ত প্রয়াসী মানব সে সকল হেলায় পদদলিত করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে। সংস্কারের দাস, গতানুগতিক সাধারণ মানুষ দ্বারা তাহা হইবার নহে। তাই জাতীয় উপন্যাসে ও JeanValjean এর ন্যায় বিদ্রোহী চরিত্রের প্রয়োজন, যাহার চরিত্রচিত্রণে সমগ্র জাতির বেদনা প্রতিফলিত—যে প্রাণ বজ্রকঠোর অথচ কুসুমকোমল,—Bastille কারাগৃহেও যে প্রাণ চিরউদার ও চিরউন্মুক্ত অত্যাচারের কশাঘাতে যাহা নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়না—যে বীরহৃদয় সর্ব্বোপরি ভগবানে সমর্পিত।

বঙ্গের কোন শক্তিমান ঔপন্যাসিক এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিবেন? বর্ত্তমান সময়ে অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ের তথা বঙ্গ সমাজের নিগূঢ় ব্যথা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। সমাজদ্রোহী স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত করিতে তিনি অদ্বিতীয়। চরিত্রহীন সতীশ ও শ্রীকান্ত, উদারচেতা পণ্ডিতমশাই ও রমেশ বিলাত-ফের্ত্তা গ্রাম্য ডাক্তার নরেন্দ্র স্ব স্ব শক্তি ও প্রতিভা লইয়া সামাজিক সাধারণ গণ্ডীর বাহিরে বিস্তৃত জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বীরহৃদয় কর্ম্মী সাজিতে পারিতেন। বহুদিন পূর্ব্বে হয়তো কেহ চিরনির্ভীক ইন্দ্রনাথ বা শ্রীকান্তের প্রতিভা লইয়া ওয়াটারলু সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পণ্ডিতমশাইয়ের হৃদয় লইয়া বিশ্বপ্রেমিক হাওয়ার্ডরূপে কুটীরগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নরেন্দ্রের স্বদেশ-হিতৈষণা প্রবৃত্তি লইয়া হ্যাম্‌ডেন্ রূপে দেশের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান কি হইতে পারে? পার্লামেণ্টে কমন্স সভার Labour Partyর অন্যতম সভ্য ভারতবন্ধু Col Wedgwood এর প্রপিতামহ একখানি ছবি আঁকিয়া পাশ্চাত্য জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সে চিত্রখানির ভাব এই—একজন শৃঙ্খলিত কাফ্রি ক্রীতদাস হতাশভাবে ঊর্দ্ধে চাহিয়া যেন ভগবানের চরণে তাহার প্রাণের বেদনা জানাইতেছে "Am I not a man and a brother?—আমিও কি মানুষ নহি, আমিও কি একজন ভাই নহি? মানব সাধারণের এই ন্যায্য দাবীও অধিকার এবং সমভ্রাতৃত্ববাদ যে সাহিত্য প্রচার করে তাহাই শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্য। ফরাসীবিদ্রোহের রণ হলাহল হইতে তিনটী অমৃত মন্ত্র উঠিয়া য়ুরোপকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল—Equality, Fraterinty, Liberty সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই, সকলেই ভাই ভাই, সকলেরই আপন অধিকার আছে। সকলের সমান ঐশ্বর্য্য সমান শক্তি, সমান প্রতিভা না থাকিতে পারে তথাপি 'A man is a man for all that'—মানুষ চিরদিনই মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরেজকবি ওয়ার্ডস্‌য়ার্থ, শেলি ও বায়রণ—রুসো ভল্‌টেয়ারের আশ্রমে দীক্ষিত হইয়া এই সাম্য ও স্বাধীনতা বাদ প্রচার করেন। ইংরেজী সাহিত্যের সেই যুগ সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বর্ত্তমান যুগে মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত যদি কোন কবি, শেলি ও বায়রণ, রুসো ও ভিক্টরহুগোর মত মানবের স্বাধিকার ও সমভ্রাতৃত্ব বাদ প্রচার করিতে পারিতেন তবে হয়তো পৃথিবীতে অশান্তির অগ্নি নির্ব্বাপিত হইত। বিংশ শতাব্দীর শ্রম ও অর্থপতি (Labour and Capital) সংঘাত অথবা বলসেবকবাদের (Bolshevism) মূলেও মানুষের জন্মগত অধিকার লাভের দুর্দ্দমনীয় প্রয়াস বর্ত্তমান। বিগত

বঙ্গসাহিত্যের গতি

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

বাঙ্গালী শিশুর নিদ্রাকর্ষণের জন্য যে সকল ছড়া ও গান প্রচলিত আছে প্রায় তাহার সকলগুলিতেই শিশুর ভীতি সঞ্চারের প্রয়াস পরিস্ফুট। বর্গীর ভয়, জুজুর ভয়, গলাকাটার ভয় বা ঐরূপ কোনও প্রকার ভয়ে বিহ্বল করিয়া শিশুর মাতা শিশুকে নিদ্রিত করিতে চাহেন। ভীতির মাত্রা একটু বেশী হইলে নিদ্রা যে অসম্ভব তাহা তিনি ভাবেন না। ভাষা-জ্ঞানের অভাবে শিশু সে গানের অর্থ বুঝে না, কেবলমাত্র গানের এক-ঘেয়ে সুরের প্রভাবে ঘুমাইয়া পড়ে। গান না শুনিয়া নদী বা ঝরণার 'ঝর ঝর্' বা 'কুল কুল' শব্দ শুনিলেও শিশু ঘুমাইয়া পড়িত। সুতরাং এরূপ স্থলে অর্থের দিক দিয়া গানের কোনও উপযোগিতাই নাই। তথাপি বঙ্গীয় কবি, কল্পনায় ভীতি-প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের একটা দিক মাত্র চিত্রিত করিয়াছেন। ছড়াগানের কবির মতে ভীতি ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার অনুভাব বাঙ্গালী শিশুর অন্তঃকরণে স্থান পাইতে পারে না। দুর্ব্বলতা ও আলস্যই বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের প্রধান উপাদান। সেখানে বীরত্ব বা উৎসাহের স্থান নাই। ঠিক এইরূপ স্থলেই ইংরাজ কবি ইংরাজ শিশুর নিদ্রাকর্ষণ জন্য যে ছড়াগানের রচনা করিয়াছেন তাহাতে শিশু হৃদয়ে জাতীয় গৌরব অঙ্কুরিত করিয়া দিবার যথেষ্ট প্রয়াস পরিদৃষ্ট হয়। Scott, Tennyson প্রভৃতি কবির lullaby বা ঘুমপাড়ানিয়া ছড়া সমূহে এই ভাব পরিস্ফুট। মাতার সৌন্দর্য্য সম্ভার, পিতার বীরত্ব বিক্রম, বংশের অনিন্দ্য গৌরব, তাঁহাদের সম্পত্তির অপরিসীমতা প্রভৃতি স্তন্যপুষ্ট শিশুকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় জাতীয় চরিত্রের উৎসাহ, অধ্যবসায় ও স্বদেশপ্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যে জাতি উৎসাহী, অধ্যবসায়ী ও জ্ঞানপিপাসু তাহাদের সাহিত্যও তাহাদের এই সকল সদ্‌গুণানুশীলনের সাধনভূত হইয়া থাকে। দশ জনে যাহা চাহিবে সাহিত্য তাহাই সংগ্রহ করিবে, কবি তাহাই কল্পনা করিবে। সকল দেশে এবং সকল যুগেই সাহিত্য লোক-প্রবৃত্তির অনুরূপ হইয়া থাকে। লোকে যাহা অপছন্দ করে, সাহিত্যে তাহার স্থান হয় না। লোকমতের অননুযায়ী কাব্য অচিরকালেই বিস্মৃত হইয়া পড়ে।

আমাদের জাতীয় সাহিত্য অতি প্রাচীন। বেদের যুগ হইতে এই সাহিত্যের আরম্ভ বলিতে হইবে। এত প্রাচীন সাহিত্য আর কোনও জাতির নাই। আমাদের এই এক সাহিত্যই সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী-প্রভৃতি নানা ভাষার ভিতর দিয়া সংগঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই প্রকার বহু যুগ-গঠিত বিরাট্, সাহিত্যে প্রাণ নাই, উৎসাহ নাই, অধ্যবসায়ের উন্মাদনা নাই। আছে কেবল কূর্ম্মবৎ আত্মমধ্যে বিলীন হইয়া আত্ম-তৃপ্তির চেষ্টা। এই বিরাট সাহিত্যে কাব্য আছে, ব্যাকরণ আছে, ভাষাতত্ত্ব আছে, ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, দর্শন আছে, উপন্যাস আছে, আরও কত কি আছে, কিন্তু ইতিহাস নাই, বিজ্ঞান নাই, কোনও কর্ম্মকরী বিদ্যা নাই। সন্তোষ বা আত্মতৃপ্তির ধারাবাহিক উপদেশ আছে, আকাঙ্ক্ষা বা কামনা চিরদিন পরিত্যজ্য হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক সুখের কল্পনায় এই বিরাট সাহিত্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু ঐহিক সমৃদ্ধি উপেক্ষিত ও বিষবৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পর ধর্ম্মসম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছেন, দর্শনে দর্শনে কথা-কাটাকাটি চলিয়াছে, কিন্তু ইতিহাস বা বিজ্ঞান-চর্চ্চা আদৌ হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যে গলাবাজি করিতে বা বাগ্‌বিতণ্ডা ও তর্ক-বিদ্যায় অন্যান্য অনেক জাতিকে পরাভূত করিতে সমর্থ,

সে এই বহুকালব্যাপী বিলাস-বিমুগ্ধ জাতীয় চরিত্রের ফলমাত্র। ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরাতে পূর্ব্বকালে যে সকল কবি বা সাহিত্যিক বাস করিয়াছেন তাঁহারা অভাবক্লিষ্ট হন নাই, বা অভাবকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই জাতীয় চরিত্রে বা জাতীয় সাহিত্যে অভাব মোচনের ভালরূপ চেষ্টা দেখা যায় না। কোনও রূপ অর্থকরী বিদ্যার কল্পনা বা অনুশীলন হয় নাই। ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ চলিয়াছে :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

বর্ত্তমানকালে আমাদের জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এক্ষণে আর আমরা কামনাহীনতায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। দর্শনশাস্ত্র আমাদের দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। বেদান্ত আমাদের বিশেষজ্ঞগণেরই আলোচ্য বিষয়। আমরা চাই বিলাস। অথচ নাই অর্থ। আমাদের গাত্রত্বক্ এত কোমল যে বিনা অঙ্গাবরণে আমরা শীত-গ্রীষ্ম নিবারণে অসমর্থ। চরণ এত কমনীয় যে বিনা কৃত্রিম চর্ম্মাবরণে আমরা চলিতে পারি না। জঠরাগ্নি এত শীতল যে পুরাতন তণ্ডুল সুসিদ্ধ না হইলে আমরা জীর্ণ করিতে পারি না। শরীর এত রোগপ্রবণ যে প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় রোগভোগ করি। সমাজের এত জটিলতা যে পিতৃদায় বা মাতৃদায় অপেক্ষা কন্যাদায়ই আমাদের ভীতিপ্রদ। অথচ এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা অলস, জড়প্রকৃতি ও বিলাসপ্রিয়। জ্ঞান পিপাসা আমাদের নাই। উৎসাহ-অধ্যবসায় আমাদের নাই। কষ্ট নিবারণের চেষ্টা আমাদের নাই। অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলন বা বিজ্ঞানানুশীলন আমাদের নাই। আমরা কেবল শয়ান অবস্থায় পুচ্ছসঞ্চালনে সুদক্ষ।

ইংরাজী সাহিত্যই আমাদের আদর্শ এবং ইংরাজী সাহিত্যের উপকরণেই বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য পরিপুষ্ট। কিন্তু আদর্শের সারগ্রহণ না করিয়া আমরা কেবল তাহার অসার ভাগের সংগ্রহ করিতেছি। চরিত্রের দিক দিয়া দেখিলেও আমরা হ্যাট কোট্ পরিধান, বিলিতি ধরণের হাসি, ফরাসী ধরণের কাসি এবং পা ফাঁক করে' সিগারেট খাওয়া অনুকরণ করিতেছি, অথচ তাঁহাদের অধ্যবসায় বা জ্ঞান পিপাসা আমাদের চিরাভ্যস্ত চরিত্রে খাপ খাইতেছে না।

ইংরাজী সাহিত্য অনুবাদ-সম্পদে সবিশেষ গৌরবান্বিত। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বা গণিত বিষয়ে যে দেশে বা যে ভাষায় যাহা পাওয়া যায়, ইংরাজী-সাহিত্যে তাহার অধিকাংশেরই অনুবাদ আছে। নানা দেশের ভাষার বিবরণ, নানা দেশের লোক-চরিত্র, নানা দেশের পণ্যসামগ্রী বা কৃষিজাত বস্তুর বিবরণ ইংরাজী সাহিত্যে আছে। কি ব্যবসায়-বাণিজ্য, কি কারখানা পরিচালন, কি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সকল বিষয়ের আলোচনাই ইংরাজী সাহিত্যে যথেষ্ট হইয়াছে। বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে না প্রবেশ করিয়া ঘরে বসিয়াই যদি এই সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে যাও, ইংরাজী সাহিত্যের সাহায্যে তাহাই হইবে। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, ইংরাজী-সাহিত্যের সেই সকল বিষয় পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কল্পনাশ্রয় উপন্যাস মাত্র লইয়া আমাদের সাহিত্য গড়িতেছি—তা সে কল্পনা আমাদের জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ হউক আর নাই হউক।

সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন অনুবাদের সাহায্যেই সম্ভবপর। বিভিন্ন সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃ-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন ও শোভাবর্দ্ধন আমাদের সাহিত্যিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমরা যে তাহা বুঝি না তাহা নহে। শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল যে আমাদের দেশে শিক্ষাদান কার্য্য ইংরাজী ভাষার সাহায্যে হইবে কি দেশীয় ভাষার সাহায্যে হইবে, তখন স্থির হইয়াছিল যে দেশীয় ভাষার সম্পদ এমন নহে যে তাহা দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের শিক্ষাদান কার্য্য চলিতে পারে। আবার এই এক শতাব্দী পরে পুনরায় যখন সেই বিষয় উত্থাপিত হইল, তখনও সেই এক কথা—আমাদের সাহিত্যের এমন সম্পদ নাই যে প্রকৃত শিক্ষাদান কার্য্য চলিতে পারে। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমাদের সাহিত্য-পরিষদ বলিলেন, বিজ্ঞান দর্শনাদির অনুবাদ আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ কার্য্য দূরে রাখিয়া তাঁহারা কেবল পারিভাষিক শব্দ রচনা লইয়াই এতকাল কাটাইয়া দিলেন। সেই সকল পারিভাষিক শব্দের কোনও

ব্যবহারই হইল না। অথচ যে দু একজন মহাপুরুষ পারি ভাষিক শব্দের জন্য পরিষদের ব্যবস্থা না হইয়াও কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পারিভাষিক শব্দের অভাবে তাঁহাদের লেখনী অচল হয় নাই। তটস্থ ব্যক্তির সম্বরণ শিক্ষা কি সম্ভবপর ?

অনুবাদ কার্য্যে আমাদের একটা অন্তরায় আছে। বিজ্ঞান দর্শনাদির অনুবাদ করিলে আমাদের সাহিত্যিকের গ্রাসাচ্ছাদনের দুর্ভাবনা ঘুচে না। কেবল তাহাই নহে, অর্থাভাববশতঃ অনুবাদ লোক লোচনের গোচর হইতে না পারিয়া দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয়ে উত্থিত হইয়া সেই স্থানেই বিলীন হয়। কারণ আমাদের জনসাধারণের জ্ঞান পিপাসা নাই। তাঁহারা বিজ্ঞানাদি বুঝিতে চাহেনও না, পারেনও না। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুবাদ না করিয়া উপন্যাস অনুবাদ করিলে তাহা বাজারে বেশ কাটে, কারণ আমাদের জনসাধারণ উপন্যাসাশী। উপন্যাসাস্বাদনে ইহাদের যে প্রকার অস্বাভাবিক স্পৃহা তাহাতে কোন বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী বিশ্বাস করিবে যে ইঁহাদের কোনও প্রকার অভাব অভিযোগ থাকিতে পারে ? অভাব থাকিলে এত আলস্য, এত বিলাসপ্রিয়তা আসে কি প্রকারে ?

বাণী-কমলার সপত্নীত্ব কল্পনায় কবি বহুকালের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যিকগণের প্রায় সকলেই দরিদ্র। তাই অনেকেই দারিদ্র্য তাড়নায় উপন্যাস লিখিয়া দু পয়সা কামাইতেছেন। এবং বাণীকে উপেক্ষা করিয়া কমলার বরপুত্র হইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা বলি যাঁহারা এই অবস্থায় উপন্যাস লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়া গেলেই তাঁহারা যেন প্রকৃত জ্ঞান-গর্ভ বৈদেশিক গ্রন্থের অনুবাদে লেখনী সঞ্চালন করেন, নতুবা তাঁহারা বঙ্গভাষার অপরিপুষ্টি বা বিকৃত পুষ্টির জন্য অপরাধী হইবেন।

আমাদের সাময়িক সাহিত্যের অধিকাংশই অসম্পূর্ণ উপন্যাস ও গল্পে ভরা। প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ বা সমালোচনামূলক প্রবন্ধের স্থান হয় না। কারণ গল্প ও উপন্যাস না থাকিলে মাসিক পত্রিকা চলে না। জনসাধারণের মনঃপূত হয় না। বর্ত্তমান কালের যাবতীয় মাসিকপত্রই অতিরিক্ত পরিমাণে নভেল ও গল্প লেখার অপরাধে অপরাধী।

আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রে লোকপ্রিয় হইবার জন্য যাঁহারা পরকুৎসা গান করেন তাঁহারা সাহিত্যের তথা বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক স্থানীয়। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য জাতিসংগঠন ও সকলের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কুৎসা অবলম্বনে নাটক নভেল রচিত হইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব বাড়িয়া যায়। সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরকুৎসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। সম্প্রতি লিখিত কতিপয় নাটক ও নভেলে বঙ্গবাসীর বা বাঙ্গালী সম্প্রদায় বিশেষের এ প্রকার জঘন্য চিত্র কল্পিত হইয়াছে যে, বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ চরিত্র আমাদের মধ্যে থাকিলে তাহার গোপন বাঞ্ছনীয় হইত। কল্পনায় সাহিত্যে জাতীয় চরিত্রের হীন-চিত্র দেখিতে পারি না। উচ্চ আদর্শের সৃষ্টি করাই সাহিত্যের কার্য্য, জাতীয় গৌরবকে খর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে রমণী-লিখিত কতিপয় উপন্যাস আমাদের জাতীয় সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে।

স্বার্থত্যাগ করিতে কেহ পারে না। কিন্তু যে স্বার্থ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থ। তুমি ব্যক্তিগত ভাবে যে লাভ কর তাহার পরিমাণ অনেক হইলেও তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থ। জাতীয় সাহিত্যের লাভ বা লোকসান পরিমাণে সামান্য হইলেও তাহা সমষ্টিগত বলিয়া তাহা মহান্। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুরোধে মহান্ সমষ্টিগত স্বার্থের অনিষ্ট করা পাপ। সেই হিসাবে যে কেহ জাতীয় গৌরব বা জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অল্প পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ করে, সে সমগ্র জাতির নিকট অপরাধী হবে। ব্যষ্টিগত উন্নতি বা ব্যষ্টিগত লাভ স্থায়ী নহে। সমষ্টিগত উন্নতি বা সমষ্টিগত লাভ স্থায়ী। সমষ্টির নাশ বা অধোগতি হইলে ব্যষ্টির নাশ বা অধোগতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ব্যষ্টির নাশে সমষ্টির নাশ হয় না। সুতরাং সাহিত্যিকগণের সমবেত চেষ্টা এমন হওয়া উচিত যাহাতে সমগ্র বঙ্গসাহিত্য সমুজ্জ্বল হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, ভ্রমণবৃত্তান্ত, দেশ বিদেশের বিবরণ, বাণিজ্যনীতি, শিল্পকলা, বা যে কোনও অর্থকরী-বিদ্যা যেন আমাদের সাহিত্যেই পাওয়া

যায়। রেল, ট্রাম, ষ্টীমার, কাপড়-কাগজ প্রভৃতির কল, বিদ্যুৎ ও বাষ্পের বিবিধ ব্যবহার প্রভৃতি যেন আমাদের সাহিত্য হইতেই লোকে শিখতে পারে। ইহার জন্য আমাদের বংশধরগণকে যেন পরের দ্বারস্থ হইতে না হয়। যখন এই সমস্ত হইয়া যাইবে তখন এরূপ আরও কিছু করিতে হইবে যাহা অন্য কোনও দেশের সাহিত্যে নাই। তাহা হইলে আমাদের সাহিত্য সমগ্র জগতে সমাদৃত হইবে। সমগ্র জগতের জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ আমাদের ভাষা শিখিবে ও আমাদের ভাষার সমাদর করিবে। আপাততঃ এই কার্য্য অসম্ভব বোধ হইলেও বস্তুতঃ ইহা অসম্ভব নহে। ইচ্ছা ও অধ্যবসায় থাকিলে ইহা না হইতে পারিবে কেন? তবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা চাই। সমবেত চেষ্টা চাই। বিদ্বেষভাব ভুলিয়া যাওয়া চাই। মাতৃচরণে অর্ঘ্য স্বরূপে কিঞ্চিৎ স্বার্থ বলিদান চাই।

"পূজারী"

(ছোট গল্প।)

[শ্রীনীহাররঞ্জন রায়]

সে সকাল সন্ধ্যায় প্রকৃতির স্বপ্ন নীরব বাসন্তী কুঞ্জে বসে বীণ্ বাজায়। নিত্য নূতন সুরের নূতন মূর্চ্ছনায় তার আকুল প্রাণের বেদনাটী ছিন্ন বীণার তারে তারে পরশ দিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। বনের পাখী অশোক গাছের ডালে বসে তন্ময় হোয়ে চেয়ে থাকে—মূক মৌন পাখী বুঝেনা কোন নিষ্ফল বাসনার বিরহাক্লিষ্ট তপ্ত হিয়ার গুপ্ত স্পন্দন জেগে উঠে তার ছিন্ন বীণার তারে তারে।

প্রকৃতির কোমল হস্তের সযত্নরক্ষিত ছোট্ট তার কুটীর খানি। ভাঙ্গা কুটীরের মাঝখানে ফুলের বেদী আর তারি মাঝখানে ছোট্ট একখানি ছবি—জীবন্ত একখানি প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিখানি তার আরাধ্যাদেবী—সাধনার ধন—অন্তরের প্রতিমা, বীণার ঝঙ্কার। এই দেবীর পদপ্রান্তে বসে সে রোজ তার অন্তরের ধ্বনি অন্তরের ধনকে জানিয়ে দেয়। আপন মনে আপনি সে তন্ময় হোয়ে যায়। সে ভাবেনা তার সেই আকুল ব্যাকুল কুন্দ নন্দনের সেই দেবীর পুণ্য গন্ধে স্পন্দিত হয়ে উঠে কি না। তবু ইহাই তাহার তৃপ্তি—ইহাতেই তার সুপ্ত হৃদি দীপ্ত হোয়ে উঠে। নদী যেমন বাহিরে যায়—পাথর ভেঙ্গে, প্লাবন দিয়ে, কূল ভাসিয়ে দিয়ে অসীমে তারে 'মিশিয়ে' দেয়, তেম্নি তার বীণার ঝঙ্কার হৃদয়ের শত কামনা ছিন্ন করে, বুকের মাঝে অনেকখানি তোলপাড় করে তার আপনাকে সেই দেবীর চরণে বিলিয়ে দেয়। তাই তার ছিন্ন বীণায় এম্নি সুর বেজে উঠে। এসুর তার কারো তৃপ্তির জন্যে নহে—এ কেবলি তার দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলী; নিভৃত অন্তরের তারে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠা করুণ মিনতি। এ মিনতি এ সংসারের ধার ধারে না, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার, মৃত্যুবিরহের অনেক উপরে। যেখানে সংসারের শেষ, যেখানে অসীম আকাশের অরুণালোক এসে পৌঁছুক, যেখানে সংশয়ের দ্বন্দ্ব, 'যেখানে পাওয়া ও না পাওয়া পূর্ণ হোয়ে সমান হোয়ে রয়েচে' তার সুর, তার গান সেইখানের। তার এই ছিন্ন বীণার দান ঝঙ্কারের মত এত মধুরতা বুঝি কারো স্বর্গ বীণাতেও ছিল না।

সে রাজ্যের রাণী বিজয়মাল্য দান করবেন্। দেশের আনাচে কাণাচে সে বার্ত্তা রটে গিয়েছে। রাজসভায় যে বীণা বাজিয়ে গান গাইয়ে রাণীকে আকুল কর্ত্তে পার্ব্বে রাণী নিজের হাতে বিজয়মালা তাকেই পরিয়ে দেবেন। ক্রমে বার্ত্তা পূজারীর ভাঙ্গা কুটীরের কোণে এসে পৌঁছল। সর্ব্বত্যাগীর লোভ হ'ল সে বিজয়মাল্য নেবে। ভবিষ্যৎ বিজয় গৌরবের আনন্দে তার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি নেচে ওঠ্ল।

পূজারী বিজয়মাল্য পাবে—এ ত স্থির নিশ্চিত। তার মত বাজিয়ে ও গাইয়ে বাণীর রাজ্যে আর ত কেউ ছিল না। কিন্তু কেউ ত আশা করে না যে সংসার বিবাগী এই তাপ-সর্ব্বস্ব সমর্পিত এই সন্ন্যাসী জীবনের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হৃদয় বাণীর বিজয় মাল্যকে তুচ্ছ করে রাজ্যের বাণীর বিজয়মাল্য লাভ কর্ব্বার জন্য চেষ্টা কর্চ্চে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ছিন্ন বীণা ঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলে বাজ্যি খুঁজে পূজারী এক স্বর্ণবীণা কিনে আনলে। স্বর্ণবীণা নিয়ে যখন সে দেবীর সামনে দাঁড়ালে তখন তার অন্তরের দৈন্য বাইরের ঐশ্বর্য্যকে ম্লান করে দিলে। এ নূতন বীণার তারে সে ঝঙ্কার দিলে না, যদি একটী তার ছিঁড়ে যায় বা মলিন হোয়ে যায়—তাই সে তাকে বড় যত্ন করে তুলে রাখ্‌লে। কিন্তু মাল্য লাভের মোহে অন্ধ হোয়ে পূজারী বুঝলেনা যে তার হৃদয়-বীণার একটী তার মলিন হোয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে।

আজ যাবার দিন। খুব ভোরে উঠে পূজারী স্নান করে এসে খুব সুন্দর করে সে তার ছবিটাকে সাজিয়ে দিলে—বড় সাধের স্বর্ণবীণাটী দেবীর পদপ্রান্তে রেখে সে তাকে প্রণাম করলে—কিন্তু মাথা নত করার সঙ্গে সঙ্গে আজ তার মনটি তার চরণ ধূলার তলে নত হ'য়ে পড়ল না। তারপর তার ছিন্ন বীণাটী কোলে করে নিত্যকার মতনই সে তাতে ঝঙ্কার দিলে। আজ সে ঝঙ্কার পূজারীকে বিভোর করে তুল্‌তে পারল না, দেবীর পদতল স্পর্শ করে প্রাণ প্রাণকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারল না। আজ এ ছিন্ন বীণার সুর বড় বেসুরো হয়েই তার কাণে বাজ্‌ছিল। সে কেবল ভাব্‌ছিল তার আশার সাফল্যের কথা—তার স্বর্ণবীণার কথা—সে কেমন করে তার এই বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়ে বাণীকে মোহিত করে দেবে—তারই কথা। আজ এই ছিন্ন বীণার তারে অন্তরের সুরকে ঝঙ্কার দিয়ে হৃদয় রাণীকে মোহিত করবার প্রয়াস তার মোটেই হচ্ছিল না। বীণাখান রেখে সে তাই দেবীর সামনে প্রণত হয়ে বল্লে—"দেবি! আজ আমার বিজয় যাত্রার দিন। আমার এ যাত্রাকে তুমি বিফল করে দিয়ো না দেবি! আমার এ বিজয়মাল্য আন্‌বার প্রয়াস শুধু তোমারই জন্য—আমার যশঃ আমার গৌরব সে ত তোমারি দেবি। এ বিজয়মাল্য এনে তোমার গলায় পরিয়ে দেব—তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখ্‌ব বলেই দেবি। আজ আমার এ বিজয়যাত্রা"-বলেই সে উঠে পড়ল, আর আসল না।

নূতন রাঙা বসনখান প'রে গায়ে একখানি রেশমী চাদর জড়িয়ে বীণাখানি সযত্নে বুকে ধরে সে বেরিয়ে পড়ল বীণার সভায় পৌঁছবার পথে।

সন্ন্যাসীর আজ এ নূতন সংসারীর সাজ দেখে সবাই অবাক হোয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল—"মানসপ্রতিমা কুটীরে রেখে স্বর্ণবীণা বুকে করে ওগো সন্ন্যাসী তুমি কোথায় চলেছ?" গর্ব্বভরে সে উত্তর দিলে—'বাণীর বিজয়মাল্য আনব'। "তাই ত। তোমার এ সৃষ্টিছাড়া সাধ কেন হ'ল সন্ন্যাসী। তুমি গেলে ত আর কেউ বিজয়-মালা পাবে না। জেনে শুনেও কেন তুমি এতগুলো লোককে হতাশ করে দিতে চাও? সংসারকে চিরকাল দূরে রেখে ভবপারের খেয়া নৌকায় পা দিয়ে আজ কেন পিছন ফিরে সংসারের ছার বিজয়মাল্য পাবার জন্য লোভ করছ? তাই বুঝি আজ ভিখারী সন্ন্যাসীর সাজ ফেলে দিয়ে সংসারীর লোভনীয় সাজ নিয়েছ—মহনীয় ছিন্ন বীণা রেখে ঐশ্বর্য্যের ধন স্বর্ণবীণা নিয়েছ—হৃদয়-বাণীর একচ্ছত্র সত্তাকে পিছনে ফেলে রাজ্যের বীণার সভায় একটু স্থান মেগে নিতে এসেছ? এ তোমার কোন্ পরিহাস সন্ন্যাসী?" পূজারী উত্তর দিল—"নয় গো নয়। এ আমার পরিহাস নয়! ওগো! এ বিজয়মাল্য আন্‌ব আমার দেবীর জন্য—এ ত আমার গর্ব্ব নয়। এ যে তাঁরি গর্ব্ব, তাঁরি যশঃ"।

পরদিন প্রাতঃকাল। বীণার সভা বসেছে। রাজ্যের সব জায়গা হতে সবাই তাদের নিজ নিজ গান নিয়ে, যন্ত্র নিয়ে সে সভায় এসে পৌঁছেচে। সবাই ভাবছে—'আমিই বিজয়মাল্য পাব'। শ্রোতারা ভাবছে—মালা পাবে ঐ পূজারী।

বেদীর উপর বসেছেন বাণী—তাঁরি খুব কাছে সোণার থালার উপর রয়েছে সেই মণিমুক্তা হীরকাভরণ বিজয়-মাল্য। প্রভাতের নূতন সূর্য্যের জলন্ত রশ্মি মালার উপর প'ড়ে তার জ্যোতিঃ ঠিকরিয়ে দিয়েছে সেই সভার উপর।

সে জ্যোতিতে সবার চোখ্ ঝল্‌সে গেল—প্রায় অন্ধ হয়ে গেল। সে জ্যোতিঃ পূজারীর অন্তরের জ্যোতিকে ম্লান করে দিলে।

গান বাদন আরম্ভ হলো। একে একে সবাই গেয়ে যেতে লাগ্‌ল। কেউ রাণীর বিজয়মাল্য লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলো না। এক জনের পর আর এক জন আসে আর সে মনে করে—'বিজয়মাল্য পাব আমি'—অন্তরটা তখন পাওয়া ও না পাওয়ার চিন্তায় কেঁপে ওঠে আর তার মাঝখানে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব বেধে যায়। শেষটায় নিরাশাই জয়ী হয়। আশা তার বুকভরা সাধ নিয়ে আর এক জনের কাছে এসে দাঁড়ায়। এম্নি করে—'দিনের আলো নিভে এল—সূর্য্যি ডোবে ডোবে'—। তখন ডাক্ পড়লো সেই পূজারীর। বীণাখানি বুকের সামনে উঁচু করে ধরে পূজারী আসন ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে বেদীর উপর এসে বসল। বীণাখানি সাম্‌নে রেখে চাদর-খানি গলায় জড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে রাজ্যের রাণীকে সে প্রণাম করল কিন্তু মাল্য লাভের আশার আনন্দে সে তার হৃদয়রাণীর কুটীরের দেবীর উদ্দেশ্যে একটা ভক্তিপূর্ণ নীরব নমস্কার জানাতে ভুলে গেল। বীণাখানি কোলে তুলে সে তায় ঝঙ্কার দিল। সভায় হঠাৎ একটা শাড়া পড়ে গেল—তার পর সব চুপ।

বীণা বেজে উঠ্‌ল। সুর ক্রমেই উপরে উঠ্‌তে আরম্ভ হলো। কণ্ঠের সুর, অন্তরের সুর, বীণার ঝঙ্কার, সব একত্রে মিশিয়ে দিয়ে সে তার গান তার হৃদয়রাণী, মানস-প্রতিমার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বিফলপ্রয়াস করলে—কিন্তু তা রাজ্যের রাণীকে আকুল করে তুলবার চেষ্টাকে আশা-তীত সফল করে দিলে। তার প্রতি ঝঙ্কার একটা নিষ্ফল বাসনা, একটা অতৃপ্ত হাহাকার, একটা জীবনব্যাপী ব্যর্থ প্রেমের সুর, ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। পূজারী তন্ময় হয়ে গাইছে—তার গানের সুরে রাণীর হৃদয়ের শুকনো ভাবখানি অভিব্যক্ত হোয়ে পড়েছে। তাই তার গান রাণীকে আকুল করে তুলেছে। কিন্তু আজ তার এই স্বর্ণবীণার সুর এই বিরাট্ সভার ঐশ্বর্য্যের গণ্ডী ভেদ করে দূরে দীনদরিদ্রের সেই ভাঙ্গা কুটীরের রাণীকে আকুল করতে পার্‌লনা। * * *

গান শেষ হ'লো। রাণী পূজারীকে আলিঙ্গন করে বিজয়-মাল্যখানি তার গলায় পরিয়ে দিলেন। সবাই জয়ধ্বনি কর্‌ল। কেবল মাল্যলাভের আশায় এসেছিল যারা কেবল তারাই নিষ্ফল ঈর্ষায় তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এতদিনের সংযমের বাঁধ, গর্ব্বের লোভে, ঐশ্বর্য্যের মোহে আজ ভেঙ্গে গেল। পূজারী মনের দুর্ব্বলতাকে চেপে রাখতে পারল্ না। রাণীর বিজয়মাল্য বক্ষে ধারণ করে সে সগর্ব্বে তার কুটীরে ফিরে এল। তার গর্ব্বটুকু, তার ঐশ্বর্য্যটুকু তার দেবীর চরণে নিবেদন করে দিতে পারল না।

পরদিন সকালবেলা বড় যত্ন করে সে তার দেবীকে সাজিয়ে দিলে। তার পর সে তার স্বর্ণবীণাখানি কোলে করে সে তায় ঝঙ্কার দিল।—সেই ঝঙ্কার যে ঝঙ্কার রাজ্যের রাণীকে আকুল করেছিল কিন্তু আজ তা হৃদয় রাণীকে আকুল করলোনা। পূজারী অবাক্ হয়ে দেবীর দিকে চাইলো। দেখলো দেবীর চোখ্ দুটো দীপ্তিমান্—জলন্ত। পূজারী শুষ্ককণ্ঠে গাইয়ে তার করুণ মিনতিখানি, তার অন্তরের ব্যথাখানি, তার গর্ব্বটুকু, তার ঐশ্বর্য্যটুকু দেবীর চরণে নিবেদন করে দিতে বৃথা চেষ্টা পেলো। তবু পূজারী আশা ছাড়্‌ল না। তার আশা ছিল, বিশ্বাস ছিল, এ বিজয়মাল্য দেবী নেবেন—নিশ্চয় নেবেন।—

* * * তাই সে বিজয়মাল্যখানি দেবীর গলে পরিয়ে দেবার জন্য আসন ছেড়ে ওঠ্‌ল—কিন্তু—একি ?—

মালা হাত থেকে পড়ে গেল। হাঁ তাইত! এমনটা ত কোনদিনই হয়নি। পূজারীর তুচ্ছ পুষ্পাঞ্জলিও ত দেবী কোন দিন প্রত্যাখ্যান করেন নি। তবে আজ এ মণিময় অর্ঘ্য কেন তুচ্ছ করে দিলেন? পূজারী আকুল হয়ে পড়্‌ল। দেবীর চরণে লুটিয়ে পড়ে বল্লে—"দেবি! আজ এ কি করলে? এ যে আমার বড় সাধের জিনিস। এ মাল্য আমার বড় সাধনার ধন—এ যে আমার গৌরব—শুধু তোমার তরে—"

জাগ্রত দেবী বলে উঠলেন—"পূজারি! তুমি ভুল বুঝেছ। কেন তোমার এ ঐশ্বর্য্য, এ হীরকাভরণ, রাণীর বিজয় আশীর্ব্বাদ আমার কাছে নিয়ে এলে? তোমার রাজ্যের রাণীর মণিময় বিজয়মাল্য তোমার হৃদয় রাণীর

পুষ্পমাল্যের কাছে কত মলিন হয়ে পড়ে পূজারি! তা তুমি জানো? তোমার পরিধেয় বস্ত্রের ঐশ্বর্য্য, তোমার স্বর্ণবীণার ঐশ্বর্য্য, তোমার ঐ বিজয়মাল্যের ঐশ্বর্য্য নিয়ে আমার কাছে এসে বড় ভুল করেছ পূজারি! যদি তোমার হৃদয়বাণীকে পেতে চাও, যদি তোমার আরাধ্যা দেবীকে তোমার হৃদয়ের মাঝখানে আসন দিতে চাও, তবে এস পূজারী-- তোমার ছিন্ন বীণাখানি নিয়ে এস; দূরে ফেলে এস ঐ স্বর্ণবীণা—এস পূজারী—তোমার গৈরিক ছিন্ন বসন নিয়ে এস; দূরে ফেলে এস ঐ রতনভূষণ; এস পূজারী—তোমার পুষ্পাভরণ নিয়ে এস—দূরে রেখে এস ঐ হীরকাভরণ; সংসারের সব দুঃখ ও দারিদ্র্য মাথায় করে নিয়ে এস,—পায়ে দলিত করে দিয়ে এস সংসারের সব মিথ্যা ঐশ্বর্য্য।"

সহযোগী সাহিত্য

ভাব-প্রবাহ।

নেপোলিয়ন বলিয়া গিয়াছেন যে, "Imagination rules the world". অর্থাৎ, ভাব-প্রবাহে জগতের লোক-সমাজ শাসিত হইয়া থাকে। যুগে যুগে এক একটা ভাবের ঢেউ উঠিয়া থাকে, সেই ঢেউতে সমাজে উলট্ পালট্ হয়, সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে। যেমন বিরাট জলপ্লাবনে গ্রাম পল্লী বিধৌত হইয়া যায়, জীর্ণবিষাক্ত ভূমির উপর নূতন পলিমাটী পড়িয়া ভূমিতে নবজীবনের সঞ্চার করিয়া দেয়, তেমনই নূতন ভাবের বন্যায় এক একবার সমাজ যেন ভাসিয়া যায়, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে। এই ভাবের কাহিনী জাতির ইতিহাস; এই ভাবের দ্যোতনা যাহার দ্বারা হয়, তাহাই লোকমত। প্রথমে ভাবটা সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর স্তরের ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে; এই গুপ্তভাব লোকবিশেষের মনীষার ও প্রতিভার প্রভাবে বাহ্য আকার ধারণ করে, শেষে সেই পরিস্ফুট ভাব সমাজ গ্রহণ করে, এবং তদনুসারে কার্য্য করে। সমাজের গুপ্তকথা যুগে যুগে এক একটা মানুষে বা দলে প্রথমে প্রকাশ করে। তাহাদের মুখের কথা সমাজ গ্রাহ্য করিয়া লয়। বেকন, লাইব্‌নীজ, গ্রোশিয়স্, রুসো, কবডেন, কাভুর, বিসমার্ক, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি যুগাবতারগণ রাষ্ট্র-নীতির নূতন বাণী ইউরোপকে শিখাইয়া গিয়াছেন। ইউরোপ সেই ভাব লইয়া যুগে যুগে প্রমত্ত হইয়াছে, নিজের সমাজ সময়োপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। যখন জাতি জাগিতে চাহে, তখন এক জন জাগাইবার মানুষও আসিয়া জুটে। এই জাগরণ ও উদ্বোধনের ইতিহাসই জাতির ইতিহাস। এই জাগরণ ও উদ্বোধনের ফলে যে মতের সৃষ্টি হয়, তাহাই লোকমত। যে যুগের যাহা উপযোগী, লোকমতও সেই তন্ত্রের উপযোগী হয়। কখনও বা সামন্ততন্ত্রের প্রভাব হয়, কখনও বা ঐশ্বর্য্যতন্ত্রের প্রাবল্য ঘটে, কখনও বা প্রজাতন্ত্রের প্রাবল্য বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক তন্ত্রের মূলে এক একটা ভাব (Idea) নিহিত থাকে; প্রত্যেক তন্ত্রের এক এক জন ভাবুক প্রতিভাশালী প্রবর্ত্তকও থাকেন। এই হিসাবে মানবজাতির ইতিহাসে সাম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিশাল, সুদূরব্যাপী হিমালয় পর্ব্বত অগণ্য শৃঙ্গের মালাস্বরূপ, তেমনই মানবসমাজের নানা জাতির নানাবিধ ইতিহাস এক পর্ব্বতের নানা শৃঙ্গমাত্র। যে দেখিতে জানে, সে দেখিতে পাবে যেমন এক পর্ব্বতপৃষ্ঠে অগণ্য শৃঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তেমনই মানবতার এক ভাবের উপর নানা জাতির নানা ইতিহাস অজ্ঞের অনন্তকে চুম্বন করিবার জন্য ভাব-আকাশের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ভাব এক; দেশ ও জাতিভেদে উহার অভিব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

সাম্য ও বৈষম্য।

মানবজাতি সকলের মধ্যে মানবতায় সাম্য ও দেশকাল পাত্র অনুসারে উহাদের বৈষম্য ঘটিকা থাকে। যে হেতু পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি, শ্বেত, পীত, কপিল, ধূসর, কৃষ্ণ,- সকল বর্ণের সকল জাতি মনুষ্যসাধারণ-গুণোপেত, সেই হেতু মনুষ্যত্ব জন্য তাহাদের মধ্যে একটা সমতা আছে। এই সমতাজন্য জাতিবিশেষের উত্থান পতনের ভঙ্গী সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে একইরকমের হয়। এই সমতাজন্য পাপপুণ্যের ফলাফল সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির মধ্যে একই প্রণালীবদ্ধ হইয়া পরিস্ফুট হয়। পরন্তু দেশ-প্রভাবে, জলবায়ু অবস্থানপ্রভাবে, জাতির অতীত ইতিহাসের — আচার-ব্যবহার বিধিনিষেধ-নীতিপদ্ধতির প্রভাবে প্রত্যেক জাতির এক একটা বিশিষ্টতা উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহা-কেই ইংরাজিতে National Individualism বা জাতীয় বিশিষ্টতা বলা হইয়াছে। এই বৈষম্যজন্যই জাতিভেদ এবং বর্ণবিচার; এই বৈষম্যজন্যই কোনও জাতি শ্বেত, কোনও জাতি আবার পীত,কোনও জাতি ঘোরতর কৃষ্ণকায়,কোনও জাতি নানাবর্ণের সমবায়মাত্র। কিন্তু ভাবের পরিস্ফুরণ যুগে যুগে প্রায় সকল জাতির মধ্যে সমভাবে হইয়া থাকে। বুদ্ধদেব ভারতে যে ভাবের প্রচার করিয়াছিলেন, যিশুখৃষ্ট সেই ভাবেরই প্রচার ইউরোপে করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাবে সহস্র বৎসরকাল এসিয়া মহাদেশে যে ভাবে সমাজবিন্যাস, সভ্যতার উন্মেষ, মানবতার উদ্ভব, এবং সর্ব্ব-জাতি ও সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় ঘটিয়াছিল; খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে গত সহস্র বৎসরকাল ইউরোপখণ্ডে সেইরূপ ফলোৎপত্তি হইয়াছে। মানবতার সমতার জন্য পরিণতির সমতা ঘটি-য়াছে; পরন্তু দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ফলের পরিস্ফুরণ এসিয়া ও ইউরোপে দুই ভাবে হইয়াছে।

স্থিতি ও উন্নতি।

এইবার স্থিতি ও উন্নতি,এই দুইটা কথা বুঝিতে হইবে। ইউরোপ উন্নতির পক্ষপাতী, এসিয়া, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ স্থিতির উপাসক। ইউরোপ এখনও ভুলিতে পারে নাই যে, এককালে সে অতি বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল। পদার্থ-তত্ত্বের অনুশীলনের প্রভাবে, বিদ্যার অতিপ্রচারে, প্রাকৃত শক্তির উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া, ইউরোপ উন্নতি ও সভ্যতার আরোহণীর উচ্চধাপে উঠিয়া দাঁড়াই-য়াছে। ইউরোপের এখনও এই ধারণা যে, মানবপুরুষ-কারের সম্মুখে অনন্ত উন্নতির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইউ-রোপ স্বাধীন ও স্বাবলম্বনে সিদ্ধ, তাই ইউরোপ উন্নতির প্রয়াসী। ইউরোপের স্মৃতি নাই, আশা আছে। পক্ষা-ন্তরে, এসিয়ার স্মৃতি আছে, আশা নাই বলিলেও হয়। এসিয়ার মনে নাই, কবে সে বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল। এসি-য়ার কিন্তু মনে আছে যে, সে যুগে যুগে জগৎকে নূতন তত্ত্ব শিখাইয়াছে, নিত্যনবীন সভ্যতা দিয়াছে। জোরোয়াস্তার, কণফু, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, সবাই এসিয়ার সন্তান। ইঁহারা সকলেই এসিয়াকে উন্নতি, ঐশ্বর্য্য, শ্লাঘা, অহঙ্কার, সবই দিয়াছিলেন। এসিয়া বুঝিয়াছে যে, বাহ্যপ্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হইলে মানব-পুরুষকারের প্রভাব অসীম নহে, যে পুরুষকারের প্রভাবে মানুষ জগজ্জয়ী হয়, সেই পুরুষ-কারের সম্মোহনে মানুষ বিলাসী ভোগী হইয়া অধঃপতিত হয়। উত্থান পতন, কালধর্ম্ম এবং জাতিধর্ম্ম, উহা মনুষ্যের সাধনার আয়ত্ত নহে। এবং জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে মানুষ কাহারও অপেক্ষা করে না। এই বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে স্থিতির প্রয়াসী হইতেই হইবে। এসিয়ার শ্লাঘা অতীতের গৌরবগরিষ্ঠ স্মৃতি লইয়া, তাই এসিয়া অতীতের সহিত জড়াইয়া থাকিতে চাহে। মুমূর্ষু রোগী হইলে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে চিকিৎসকের বাহাদুরী আছে। এসিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তাই এসিয়া স্থিতিটা বুঝে ভাল। ইউরোপের অতীত নাই, ভবিষ্যৎ আছে; তাই ইউরোপ স্থিতি বুঝে না, উন্নতিই বুঝে। ইউরোপকে কখনই ত মরণের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ইউরোপ স্থিতির মহিমা বুঝিবে কি?

সাহিত্য, ২৩ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

— ——

মাতৃ-পূজা

"উঠ মা—তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বেশ্বরী ; উঠ, উঠ, তুমি উঠিলে সব উঠিবে, তুমি জাগিলে সবাই জাগিবে। কেন না, তোমার জাগরণে আমার জাগরণ। আমি জাগিলে আমার জগৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড জাগিয়া উঠিবে। তাহা হইলে আমার সহিত আমার বিশ্বছবির পরিচয় হইবে ; তখন আমি সদসৎ বিচার করিতে পারিব। সৎকে অবলম্বন করিয়া অসতের পরিহার করিব। উঠ মা, জগজ্জননী, লোকপালনী, সনাতনী। তুমি মা—

"অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্‌।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥"

তুমি সর্ব্বদেবশক্তির সমবায়রূপিণী মহাশক্তি। তাই তুমি অসুরদর্পখর্ব্বকারিণী, মহাভয়বিনাশিনী। তুমিই মা—

"দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয়হিতৈষিণী।"

তাই তোমায় কন্যারূপে আহ্বান করিতেছি। এস মা উমা, তুমি তোমার পিতৃগৃহে আসিয়া উদিত হও। চপলা বিকাশের মতন এক একবার দেখা দিয়া আবার ঘোর নিশার অন্ধকারে লুকাইও না। আমাদের একাদশ গিরিসমন্বিত হিমালয় সদৃশ আমার জীবনের গিরিবালিকা তুমি, সোহাগের মেয়েটির মতন তুমি আমার মনোজ শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলাইয়া বেড়াইও না। তুমি এস, আমার হৃদয়ের হিমানীশীতলীকৃত কন্দরে আসিয়া দশ দিক আলো করিয়া বস। জনকজননী তুমি মা ঈশানী তুমি আমার গৃহে এস। আমার প্রাণের ঘট, স্নেহের মন্দাকিনীসলিলে 'ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ, অত্রৈব সন্নিধিং কুরু।' তুমি মা—

"জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।"

শারদজ্যোৎস্নাধৌতিমালিনী, শারদেন্দুবিকাশিনী, শ্বেতাঙ্গী, শুভ্রবসনা, চন্দ্রিকাধৌতকপালিনী—তুমি শেফালী কুসুমের মতন নিঃশব্দে আমার হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হও। আমার চিত্তের সকল অন্ধকার দূর হউক, দুঃখদারিদ্র্যের সকল স্থবিরতা অপসৃত হউক। জাগো, জাগো মা জননী। তুমি জাগিলে আমার মোহনিদ্রা—মহানিদ্রা সকলই দূর হইবে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।"

প্রেত-তত্ত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

(৯)

প্রেতের ফটোগ্রাফ ঘটিত প্রমাণ

বাস্তবিকই প্রেতাত্মারা যদি চেষ্টাবলে তাঁহার সূক্ষ্মজড় নির্ম্মিত দেহ কোন কোন অবস্থায় ধারণ করিতে পারে সত্য হয়, তাহা হইলে ফটোগ্রাফের সেনসিটিভ প্লেটে উঁহাদের মূর্ত্তি ধরা পড়িবে বলিয়া মনে হয়। যদিও খুব বিরল তথাপি এরূপ আতপ চিত্র যে প্রেতের পাওয়া যায় নাই তাহা নহে। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ আচার্য্য হেনস্লো এইরূপ কয়টী প্রেত-চিত্রের পরিচয় দিয়াছেন। এইসব চিত্র খুব সাবধানতার সহিত বৈজ্ঞানিক কল কৌশলে গৃহীত হইয়াছে। অন্ধকার ঘরে exposed প্লেটের সম্মুখে প্রেতমূর্ত্তি বহুক্ষণ ধরিয়া উপবিষ্ট থাকার ফলে এই চিত্র ধরা পড়ে। আচার্য্য

ক্রনস্লো তাঁহার এক গ্রন্থে উক্ত ফটোগ্রাফলব্ধ ছবির প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া দিয়াছেন।

স্বনামধন্য W. Stead মহোদয় একজন প্রেততত্ত্ববিৎ ছিলেন। এরূপ প্রেতচিত্র তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনে ঘটিয়াছিল। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী তাঁহার নিজ পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা। ১৯০৯ সালের জানুয়ারী সংখ্যক Fortnightly Review পত্রিকায় তিনি এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের নাম "কেমন করিয়া জানিলাম দেহান্তে জীবাত্মা সজ্ঞানে বর্ত্তমান থাকে ও জীবিতদের সহিত আলাপ করে।" এই প্রবন্ধেই উক্ত প্রেতফটোর প্রমাণ আছে। অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

"প্রেতফটোগ্রাফির কথা আমি ইতিপূর্ব্বে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সন্দিগ্ধবাদী পাঠকের কাছে আমি আগেই স্বীকার করিতেছি যে, এ বিষয়ে জাল জুয়াচুরী যোগে লোককে ঠকানো খুব সোজা। একজন পাকা ঐন্দ্রজালিক খুব সাবধানী ও সতর্ক দর্শককেও হাতের কারচুপিতে দিব্য ঠকাইতে পারে। কিন্তু আমার পরীক্ষিত প্রেতফটো ব্যাপারে আমি কারখানা হইতে স্বয়ং চিহ্ন দেওয়া প্লেট আনাইয়া নিজে ছবি তুলিয়া ও ডেভেলপ করিয়া পরীক্ষা করতঃ এরূপ জুয়াচুরির সম্ভাবনা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিয়াছিলাম। কাজেই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিজে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছি। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রেতফটোগ্রাফির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমার অন্যরকম দৃঢ়তর প্রমাণ আছে। এ প্রমাণে পরীক্ষকের প্রবঞ্চিত হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এইরকম চূড়ান্ত প্রমাণের প্রধান দুইটী লক্ষণ এই যে (১) ফটোগ্রাফের প্লেটে যে মৃত ব্যক্তির প্রেতচিত্র উঠিবে তাহাকে ফটোগ্রাফার কস্মিনকালেও চিনিবে না এবং (২) ছবি তোলার সময় ক্যামেরার সম্মুখে কোনো জড়দেহী মূর্ত্তির অস্তিত্ব থাকিবে না।

এই রকম অবস্থায় ও সর্ত্তে আমি এক আধবার নয় বহুবার প্রেতছবি তোলাই। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি যে ফটোগ্রাফারের কথা বলিতেছি, সে নিজে মিডিয়মীশক্তি যুক্ত। সে একজন বৃদ্ধ ও নিরক্ষর লোক। তাহার এই মিডিয়মত্ব তাহার ব্যবসার পক্ষে এক সময় বড় ক্ষতিজনক ও অসুবিধাকর হয়। তার আবার অতীন্দ্রিয় দর্শন ও শ্রবণশক্তি ছিল।

বিগত বুয়র যুদ্ধের সময় আমি এক বন্ধুর সহিত উহার কাছে ছবি তোলাইতে যাই। তখন অনুমানই করিতে পারি নাই কার-না-কার প্রেতমূর্ত্তি প্লেটে ধরা পড়িবে। ফটোগ্রাফারের সম্মুখে বসিবা মাত্র বৃদ্ধ লোকটী বলিল—"আমি সেদিন মশাই বড় ভয় পাইয়াছি। আমার ষ্টুডিওতে এক বুড়া বুয়র বন্দুক ঘাড়ে আসিয়া উপস্থিত। তার কর্কশ ও রূঢ় মূর্ত্তি দেখিয়া আমি তাকে বলিলাম, 'যাও এখান হতে, আমি বন্দুক টন্দুক দেখতে পারি না—' সে তখনতো চলিয়া গেল। এখন আবার এসেছে। আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে ঢুকেছে। এখন তার হাতে বন্দুক নাই; আর চেহারাও তেমনি ভয়ঙ্কর নয়। কি করবো? তাকে থাকতে দেবো?'

আমি উত্তর দিলাম,—'থাকনা কেন। তুমি তার ফটো তুলতে পার?' বৃদ্ধ বলিল, 'কেমন করে বলছি।' আমি ক্যামেরার সম্মুখে বসিলাম। ছবি উঠানো হইল। আমি বা আমার বন্ধু দুজনের কেহই আর কোনো আগন্তুককে দেখিতে পাইলাম না। প্লেটখানা ক্যামেরার সম্মুখ হইতে সরানো হওয়ার আগেই আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেদিন তুমি বুড়া বুয়রটীর সঙ্গে কথা কয়েছিলে, আজ আবার পার?" বৃদ্ধ বলিল,—"হাঁ সে আপনার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ও উত্তর দেবে?" বৃদ্ধ বলিল "বলতে পারিনাতো, চেষ্টা করে দেখছি।" এই বলিয়া সে মনে মনে কি প্রশ্ন করিল। পরে বলিল—"ও বলছে ওর নাম পিট্‌ বোথা।" আমি—"পিট? ফিলিপ, লুই, ক্রীস্‌ এই সব বোথাই শুনিছি' পিট্‌ বোথা নাম তো কখনো শুনিনি?" বৃদ্ধ—"ওতো ওই নামই বলছে।"

তারপর যখন ফটো ডেভেলপ করা হইল আমি বেশ ভাল করিয়া প্লেট পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম আমার ছবির পিছনে একজন দীর্ঘকায় ষণ্ডা গুণ্ডা একজনের লোকের

ছায়া মূর্ত্তি—জাতিতে বুয়র বা মৌজিক যা তা হইতে পারে। আমি কিছু বলিলাম না। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম।

যুদ্ধান্তে সেনাপতি বোথা লণ্ডনে আসিলে, অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুৎ ফিশার মারফৎ আমি সেই ফটো সেনাপতি বোথার কাছে পাঠাইয়া দি। পরদিন ফ্রীষ্টেটের আর একজন ডেলিগেট্, নাম ওয়েসেল্‌স্, আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, ও জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি ও ছবি কোথায় পেলেন? উত্তরে আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলাম। তিনি শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"উহুঁ, সে সব হবেনা ও সব গাঁজাখুরী আমি মানি না; বলুন ও ছবি কোথায় পেলেন? ও লোক তো ষ্টেড্ সাহেবকে চিনিত না, আর ইংলণ্ডেও কখনও সে আসেনি?"

আমি বলিলাম "যা সত্য এবং নিট্ থপর তাই আপনাকে বলছি, বিশ্বাস করেন ভালই, না করেন দরকার নেই। কিন্তু একটা কথা, আপনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন কেন?"

ওয়েসেল্‌স। কেন? তার কারণ লোকটা আমার এক নিকট-আত্মীয় আমার ঘরে তার ছবি টাঙ্গানো আছে।"

আমি। তাই নাকি? উনি কি মারা গিয়েছেন?

ওয়েসেল্‌স। ও এক সেনাপতি ছিল। কিম্বারলী অবরোধ কালে ওই প্রথম মারা যায়।

আমি। ওঁর নাম কি?

ওয়েসেল্‌স। পিট্রাস্ জোহানাস বোথা; কিন্তু ওকে আমরা সংক্ষেপে পিট্ বোথা বলে ডাকতাম।

সে ফটো এখনো আমার কাছে আছে। এর পরে ফ্রীষ্টেটের আরো দুই জন পিট্ বোথাকে চিনিতে পারে। এই যে ব্যাপারটা এটা টেলিপ্যাথী দিয়া ব্যাখ্যাত হয় না। ফাঁকি কারসাজির থিওরিও খাটে না। কেবলমাত্র দৈবযোগেই আমি ফটোগ্রাফারকে বলি দেখতো প্রেত উহার ঐহিক নাম দেয় কি না? সমস্ত ইংলণ্ডে কেহই জানিত না পিট বোথা নামে কোনো বুয়র যোদ্ধা ছিল। এই উপলক্ষে আর একটু খোলসা করিয়া বলিলে পাঠক বুঝিবেন এ ব্যাপারে জাল জুয়োচুরী কিছু হয় নাই। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসিক ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় কিম্বারলী যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষীয় এক কম্যানডাণ্ট বোথার মৃত্যুসংবাদ চিত্রসহ বাহির হয়। সে ছবির সঙ্গে আমার অধিকৃত ফটোর বোথার কোনো সাদৃশ্য নাই। সংবাদপত্রস্থ ছবির নীচে লেখা ছিল কমান্‌ডেণ্ট 'ফানস্ বোথা'।

এই বিস্ময়কর প্রেতচিত্র বিরুদ্ধে কেবল এক আপত্তি সন্দেহবাদীরা করিতে পারেন, উহা ষ্টেডের মিথ্যাকথা বা ফটোগ্রাফারের কারসাজি! উত্তরে আমাদের বক্তব্য মহাত্মা ষ্টেডের মত মনীষী সর্ব্বজনপূজ্য লোক মিথ্যা বলিতে পারেন কি না সুধীজনের বিচার্য্য। ফটোগ্রাফার কর্ত্তৃক তাঁর চখে ধূলা দেওয়া সম্ভব কি না তা বর্ণনা হইতেই বিচার্য্য।

(১০)

(cross correspondence) বা মিশ্রবার্ত্তা বা অসংলগ্ন বার্ত্তা

এ পর্য্যন্ত যত রকম প্রমাণ প্রেতের সত্য অস্তিত্বের অনুকূলে সংগ্রহ হইয়াছে তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ও নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ এই cross correspondence। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ম প্রমুখাৎ একই বার্ত্তার আংশিক প্রকাশ—প্রত্যেক ছিন্নবার্ত্তা···স্বতন্ত্রভাবে অর্থহীন, অসংলগ্ন কিন্তু সমগ্রভাবে সুন্দর অর্থযুক্ত।

একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া ছিন্নবার্ত্তার ধরণটা বুঝান যাইতে পারে। মনে করুন তিনটা পরস্পর হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে ক, খ, গ তিনজন মিডিয়ম আছে; ভর অবস্থায় প্রত্যেকের হাত হইতে অসংলগ্ন বার্ত্তাখণ্ড বাহির হইতেছে। 'ক' এর হাত হইতে বার্ত্তা বাহির হইল 'হ'র প্রতি'; 'খ' এর হাত হইতে লেখা বাহির হইল 'হৈমবতী'; 'গ' এর হাত হইতে লেখা আসিল 'কন প্রিয়ভাষে'। আংশিক ভাবে প্রত্যেক বার্ত্তাটা অর্থহীন, কিন্তু যখন তিনটা একত্র করা হইল তখন একটা মানে বুঝা গেল। বুঝা গেল, একই প্রেতাত্মা নিজের অস্তিত্ব

প্রমাণ করিবার জন্য তিনটী ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়মের ভিতর দিয়া একটা গোটা অর্থযুক্ত বার্তা প্রকাশ করিতেছে। এই উপায় অবলম্বন করাতে টেলিপ্যাথী বা থট্‌ রিডিং (মনপড়া, মংচালা) সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকিতেছে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ ধরণের ভগ্নবার্ত্তা পাঠাইয়া প্রেত-অস্তিত্বের প্রমাণ চেষ্টা জীবিত কোনো গবেষক বা পরীক্ষকের মাথা হইতে বাহির হয় নাই। বাহির হইয়াছে পরলোকগত মায়ার্স ও হজসনের চেষ্টা হইতে।

মায়ার্স জীবিতাবস্থাতেই তাহার পুস্তকে দু এক স্থানে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে চূড়ান্ত প্রমাণের জন্য এইরূপ ভগ্নবার্ত্তা সংগ্রহ করিতে পারিলে বুঝা যায় যে, একই বিদেহ আত্মা সজ্ঞানে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণে বারবার চেষ্টা করিতেছে।

মায়ার্স ইহাও পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন যে, এই যে আত্মার বিদেহাস্তিত্ব প্রমাণ জন্য চিৎতত্ত্ব সভার বা অন্যান্য প্রেততত্ত্ববিদের প্রাণপণ চেষ্টা ইহা হয়ত আসলে জীবমঙ্গলকামী পরলোকবাসী মহাত্মাদের সজ্ঞান কাজ, মিডিয়ম বা পরীক্ষক এবং যন্ত্র এবং উপলক্ষরূপে তাঁহাদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। কাজেই বা ক্রমে উঁহারাই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ফলে আরো ভাল ভাল প্রমাণের পন্থা আবিষ্কার করিবেন। ইঁহাদের সতত এই চেষ্টা হইতেছে কি রকম প্রমাণ পদ্ধতি খাটাইতে পারিলে পৃথিবাবাসী জীবরা এ তত্ত্ব বিশ্বাস করিবে।

উল্লেখ আছে, জীবিত কালেই হজসন ও মায়ার্স এই ধরণে একই বার্ত্তা দুই ভিন্ন মিডিয়ম হইতে পাইবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু উঁহাদের মৃত্যুর পর হইতেই যেন এই সব ভগ্নবার্ত্তার প্রাচুর্য্য অসম্ভব মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। কি সংখ্যায়, কি জটিলতায় এই সব ভগ্ন বা ছিন্ন বার্ত্তাগুলি আত্মার বিদেহ প্রমাণের পক্ষে আশ্চর্য্য রকমের সাহায্য করিতেছে। আর এই সমস্ত ভগ্ন-বার্ত্তা মায়ার্সের আত্মার নিকট হইতেই পাওয়া যাইতেছে। এই সকল বার্ত্তায় যে অগাধ ও অপরিসীম পুরাবস্তার (classic Greek and Latin) পরিচয় দেওয়া হইতেছে তাহাতেই অভ্রান্তভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বার্ত্তা-বাহক মায়ার্স-আত্মা ছাড়া আর কেহই হইতে পারে না। কেন না, মায়ার্সের দার্শনিক ও পুরা-সাহিত্যিক পাণ্ডিত্যের তুলনা ছিল না।

আর একটা কারণে এ সব বার্ত্তা মায়ার্সের প্রেরিত বলিয়া মনে করা যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রেততত্ত্বের আলোচনা সূত্রপাত এই মায়ার্স-হজসন হইতে। মায়ার্স আত্মার বিদেহাস্তিত্ব প্রমাণ চেষ্টাতেই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন। সাইকিকাল সভার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি তাঁহার একমাত্র সাধনা ও ধ্যান জ্ঞান ছিল। শ্রীমতী পাইপারকে যথামত পরীক্ষা করিয়া সভার প্রধান মিডিয়ম ভাবে কাজে লাগাইতে হজসনই প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই দুই জন কর্ম্মবীর না থাকিলে সাইকিক্যাল সভা আজ সুধীজগতে এত সম্মান পাইত না। কাজেই মরণের পর জীবাত্মা যদি সজ্ঞানে থাকেই তবে হজসন-মায়ার্সের আত্মা দুই জন যে দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জীবন ব্রতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন করিবেন ইহা যুক্তিযুক্ত নহে; বরং ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত যে, তাহারা ও-পার হইতে এ-পারের সংযোগ সাধনের জন্য আরো প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীবাসীদের কাছে কি কি যে খাটী প্রমাণ আর পরলোকবাসীদের দ্বারা সেগুলি দেওয়ার পক্ষে কতটা সুবিধা অসুবিধা ইহা হজসন-মায়ার্স আত্মা যেমন বুঝিবেন এমন আর কেহ নয়। প্রেতবাদের বিপক্ষদল অর্থাৎ টেলিপ্যাথীবাদীরা সমস্ত অলৌকিক ঘটনাকে টেলিপ্যাথী মতে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। কিরূপ প্রমাণে ঘটনা ঘটাইতে পারিলে টেলিপ্যাথীর অক্ষমতা ধরা পড়িবে ইহা হজসন-মায়ার্স বেশী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

আজ যদি সেই হজসন ও মায়ার্স মরণের পর পার হইতে সজ্ঞান স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাঁহাদের চিরপ্রিয় সত্যপ্রচার ব্রতের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান তাহা হইলে সেটা কি একটা গর্হিত কাজ বলিয়া মনে হইবে না? অবশ্য পারলৌকিক কোনো বাধা বশতঃ যদি এরূপ যোগাযোগ স্থাপন একেবারেই অসম্ভব হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

সভার অন্যান্য জীবিত সভ্যেরা উঁহাদের মুক্ত আত্মা

দুইএর কাছে এই রকম সাহায্য স্বভাবতঃই আশা করিতেছিলেন, এবং সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। মায়ার্সের দেহান্তের অল্পকাল পরেই এক অভিনব পন্থায় বার্ত্তা আসিতেছে; এ পন্থা এ-পার হইতে কেহ ইঙ্গিতও করেন নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে মায়ার্স-আত্মা কর্তৃক উদ্ভাবিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সব স্বতঃ লিখিত ভগ্ন বার্ত্তাগুলির একটা বিশেষত্ব ইহাদের অশ্লস্ত গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়। আর এই প্রাচীন পাণ্ডিত্য মায়ার্সের ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক। শ্রীমতী পাইপারের মত স্বল্পবিদ্য মিডিয়মতো দূরের কথা সাধারণ সুশিক্ষিত লোক, এমন কি সার অলিভার লজ প্রভৃতির মত পণ্ডিতদেরও পুর-বিদ্যার পরিচয় তত গভীর নহে।

এই জাতীয় প্রাপ্ত ভগ্নবার্ত্তাগুলি এত জটিল ও বৃহৎ যে অর্থ সঙ্গতির হানি না করিয়া তাহার সংক্ষেপ করা অসম্ভব। চিৎতত্ত্বসভার বার্ষিক বিবরণীর ২০।২৫ ভলুমে ইহাদের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে।

দিন দিন এই সব বার্ত্তা ক্রমশঃ জটিল ও কৌশলপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, সঙ্গে তাহাদের প্রামাণিকতা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে। যে সময় মিডিয়মের ভিতর দিয়া এই সব বার্ত্তা আসিতেছে তাঁহারা হইতেছেন মিসেস ভেরাল, কুমারী ভেরাল মিসেস্ টমসন, মিসেস্ হল্যাণ্ড, মিসেস্ ফর্বস ও মিসেস পাইপার। শ্রীমতী এলাইস্ জনসন ও শ্রীযুক্ত পিডিংটন এই সব বার্ত্তাকে একত্র করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান ও অর্থ-সঙ্গতি বাহির করিতেছেন।

(১) দৃষ্টান্ত—দুই দূরবর্ত্তী মিডিয়মের ভিতর দিয়া একই বার্ত্তা ভগ্নাংশে প্রাপ্ত হওয়া।

মিসেস ফর্বসের পুত্র ট্যালবট্ ফর্বস্ একজন সৈনিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধে হত হন। মিসেস্ ফর্বস মিডিয়মধর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার হাত দিয়া স্বতঃলিপি বাহির হইত। ছেলের মৃত্যুর পর একদিন তাঁহার হাত দিয়া স্বতঃলিপি বাহির হইল—লিপির লেখক তাহার পুত্রের প্রেতাত্মা। লেখা হইল—"মা আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছি; বড় ইচ্ছে তুমি আমায় দেখতে পাও; ক্যামব্রিজেও আমি প্রমাণ দিয়িছি" সেই দিনই ক্যামব্রিজে মিসেস্ ভেরালের হাতে লেখা বাহির হইল, লেখার মর্ম্ম ঐ সময়ে মিসেস্ ফর্বস কি করিতেছেন, কোথায় বসিয়া আছেন, কে কাছে আছে ইত্যাদি। লেখার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ভেরাল ছায়ারূপ দেখিলেন, যেন মিসেস ফর্বস্ তাঁহার লণ্ডনের বাড়ীর ড্রয়িংরূমে বসিয়া আছেন, আর তাঁর ছেলে ট্যালবট পাশে দাঁড়াইয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া আছে।

২৯শে জানুয়ারী তারিখে মার্কীন যুক্তরাজ্যের বোস্টন নগরে বসিয়া ডাক্তার হজসন। সম্মুখে শ্রীমতী পাইপার মোহাবস্থায় প্রেতাবিষ্ট। হজসন ভরকারী প্রেতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"ইংলণ্ডে ক্যামব্রিজ নগরে শ্রীমতী ভেরালকে হাতে একটা বর্শা (spear) ধরিয়া ঐই মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পার?" এখন ইংরাজী কথা spear বর্শা ও *sphere* (পিণ্ডাকার গোল বস্তু) একই ধ্বনি যুক্ত শব্দ হওয়াতে প্রেত ভাবিল 'sphere হাতে' বলা হইতেছে। তাই ভাবিয়া প্রেত বলিল sphere (গোলাকার পিণ্ড) হাতে কেন? হজসন প্রেতের বুঝিবার ভুল হইয়াছে দেখিয়া ভালভাবে শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিলেন "স্পিয়ার—স্ফিয়ার নয়"। প্রেত এবার বুঝিল। এবং সপ্তাহ খানেক মধ্যে কার্য্য সমাধা করিবার প্রতিজ্ঞা জানাইল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের বৈঠকে প্রেত আসিয়া বলিল যে সেই ভাবে সে শ্রীমতী ভেরাল্‌কে দেখা দিয়াছে।

৩১ শে জানুয়ারী ক্যামব্রিজ নগরে বসিয়া শ্রীমতী ভেরালের হঠাৎ স্বতঃলিপির ঝোঁক আসিল। তাঁহার হাত হইতে যে লিপি বাহির হইল—তাহার অর্থ হইতেছে "আমি একটা স্ফিয়ার (sphere) দেখিতেছি বোধ হইল।" "সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে লেখা বাহির হইল volatile ferrum 'বায়ুগামী লৌহ'—'ক্ষেপনশীল লৌহ'—কবি ভার্জ্জিল বর্শাকে ঐ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখার পাশে একটা গ্রীক ক্রুশের চিহ্ন আঁকা হয়। শ্রীমতী পাইপারের পূর্ব্ব স্বতঃ লিপিতেও ঐ চিহ্ন ছিল। উক্ত প্রেত যখনই পাইপারের হাত দিয়া বার্ত্তা পাঠাইত সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ক্রুশ চিহ্ন দিয়া সই করিত।

(৩)—পূর্ব্ব এক পরিচ্ছেদে সাইকিকাল সভার প্রতিষ্ঠা বর্ণনা কালে ভগ্নবার্ত্তা বুঝাইবার সময় আর একটা দৃষ্টান্ত

দিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে শ্রীমতী হল্যাণ্ডের হাত হইতে মায়ার্স আত্মা কর্তৃক প্রেরিত সেলউইন্ কলেজের ফটকে খোদিত মটরের বিষয় তাহাতে উল্লেখ করা হয়। শ্রীমতী হল্যাণ্ড কখনো ক্যামব্রিজে আসেন নাই এবং সেই কলেজ দেখেন নাই। কাজেই তাঁহার লিখিত উক্ত ফটকের মটোর অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এ দিকে শ্রীমতী ভেরালের হাত দিয়া ঐ মটোর উল্লেখ স্বতঃ লিপিতে বাহির হইল। ভেরালের পত্র পাইয়া তবে শ্রীমতী হল্যাণ্ড বার্তাটীর সঙ্গতি ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন।

আমরা অতঃপর এই জাতীয় আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। উহাতে যুগপৎ তিন জন মিডিয়মের হাত দিয়া একটী সমগ্র বার্তা ভগ্নভাবে প্রেরিত হয়।

(৪)—৬ই আগষ্ট ১৯০৬ সালে ভারত প্রবাসিনী শ্রীমতী হল্যাণ্ডের হাত হইতে এক দিন একটা লেখা বাহির হইল "ইয়লো"—(পীতবর্ণ)। ৮ই আগষ্ট ক্যামব্রিজে শ্রীমতী ভেরালের হাত হইতে স্বতঃ লিপি বাহির হইল—"আজ রাত্রিতে এ কাজ করা হইয়াছে—'ইয়লো' কথাটী লিখিয়াছি—ইয়লো—ইয়লো—ইয়লো—। সেই দিনই আবার ভেরাল কন্যা কুমারী ভেরালের হাত হইতে ঐ 'ইয়লো' কথা স্বতঃ লিপিতে বাহির হয়।

(৫)—১৯০৭ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারী—শ্রীমতী ভেরালের স্বতঃলিপি বাহির হইল—"আজ আর কিছু নয়—কয়েক দিনই হবে না—"; "আমরা কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারছি না, আমরা যা করছি তার প্রয়োজনীয়তা কত; তারা নিজেরাই চেষ্টা করে শিখবে—যাক, যা হচ্ছে ভালই—পরে সংবাদ বুঝতে পারবে—"

"যা দিচ্ছি সব ভগ্নাংশভাবে—তোমরা সব একত্র করে নিও; অনেক সময় আসল কথাটা ধরতে পার না—কাজেই সব চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাচ্ছে—"

তারপর তিনটী তীরের ছবি আঁকা হইল—তীরগুলার মুখ এক কেন্দ্রের অভিমুখে সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটীন ভাষায় লেখা হইল "Tria Convergantia in unum" অর্থাৎ এক দিকে সবার মুখ।

শ্রীমতী ভেরাল ইহার অর্থ বুঝিলেন না। ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী পাইপারে আবিভূত হইয়া হজসনাত্মা লিখিলেন, $\frac{\text{arrows}}{\text{Hodgson}} = \frac{\text{তীরগুলা}}{\text{হজসন}}$। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত পিডিংটন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এর অর্থ কি?"

হজসনাত্মা বলিলেন, "আমি শ্রীমতী ভেরালের হাত দিয়া তীর—"arrows" বার্তা লিখিয়াছি।

১২ই ফেব্রুয়ারী কুমারী ভেরাল তখন মায়ের কাছ হইতে দূরে অন্য এক স্থানে ছিলেন। হঠাৎ ঐ দিন তাঁহার হাত হইতেও লিপি বাহির হইল একটী তীরের চিত্র পাশে লেখা 'many together' অর্থাৎ অনেকগুলা একসঙ্গে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী আবার শ্রীমতী ভেরালের হাত হইতে কয়টা কথা বাহির হইল—architecture—architechtonic—architave—প্রত্যেকের প্রথম দুই অক্ষর 'ar'।

সেই দিন বেলা ১১।৩০ সময় শ্রীমতী পাইপার বৈঠকে রেক্টার নামধারী আত্মা পিডিংটনকে বলিলেন—"হজসন আত্মা বলছেন, 'arrow'র কথা ভুল না, অপেক্ষা করে দেখ, কথাটা বার হয় কি না"। সে দিনের প্রেতালাপে এই কথা হয়—

হজসনাত্মা। হেলো পিডিংটন, তোমাকে দেখে ভারি খুসী হলাম, কেমন আছ? first rate আশা করি?

পিডিং। হাঁ—ধন্যবাদ। তুমি বলেছিলে যে শ্রীমতী ভেরালের হাত দিয়ে *arrow* কথা বার করবে?

হজসনাত্মা। বলেছি তো, আজ তিন দিন ধরে ভেরালের মনে ঐ কথাটার ভাব ছাপ দিতে চেষ্টা করছি—

পিডিং। তা তো বুঝছি

হজসনাত্মা। কঠিন! *ar* এইটুকু লিখেই থেমে গিয়েছে

পিডিং। যাই হোক চেষ্টা ছেড় না—ঠিক হবে নিশ্চয়ই।

হজসনাত্মা। সে কথা বলতে আমি নাছোড়বান্দা—ভেরাল খুব ভাল মিডিয়ম—তার ভিতর দিয়ে কাজ করে সুখ আছে—পরে খুব কাজের মিডিয়মে দাঁড়াবে—

পরদিন হজসনাত্মা আবার বলিলেন—"শ্রীমতী ভেরাল

ar লিখেছে, আর লিখেছে—'pointed was my own word to suggest *arrow*'—অর্থাৎ (ছুঁচলো জিনিস এই উল্লেখ করে তীরের ভাবটা জাগাতে চেষ্টা করলাম)।

২৫শে তারিখের বৈঠকে হজসনাত্মা খোঁজ করিলেন, "পিডিংটন *arrow* কথা পেয়েছ ?"

পিডিং—না লেখায় কথাটা পাইনি বটে, তবে একটা তীর এঁকেছেন শ্রীমতী ভেরাল—

হজসনাত্মা। বাস্ তা হলেই হলো—আজ কদিন যাবৎ ঐ কথাটা তার মনে জাগাতে কত না নাকাল পেয়েছি!

সুতরাং দেখা গেল, cross-correspondence অর্থাৎ ভগ্ন-বার্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ম দিয়া পাঠাইয়া উহাকে একই আত্মার সজ্ঞানচেষ্টা রূপে প্রমাণিত করিবার জন্য বিদেহ-আত্মারা কিরূপ যত্নপর এবং তাহাতে কতদূর তাঁরা কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

সাইকিক্যাল সভা এই ধরণের প্রাপ্ত ভগ্নবার্ত্তা অধুনা এত বেশী পরিমাণে ও ভাল ভাবে পাইতেছেন যে, তাহা হইতে প্রেতাত্মার বিদেহাবস্থা একরূপ যেন নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এসব ভগ্নবার্ত্তা এত দীর্ঘ ও জটিল যে সংক্ষেপে বর্ণনা অসম্ভব। পাঠক পাঠিকারা উক্ত সভার ২০-২৫ ভলুমগুলিতে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাইবেন। এই সব বিবরণ আনুপূর্ব্বিক সাবধানে পড়িলে প্রেত-প্রমাণের অকাট্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ

[শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী]

আজ অনেক কাল হইল ভারত হইতে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। তাই আজ আমরা হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত ঐ ধর্ম্মের নিকট-সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছি—কবে গৌতম তাঁহার চির ব্যথিত চিত্ত লইয়া দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য ভারতবাসীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। সে শুভদিনের খোঁজের জন্য যাইতে হয় আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকটে। বৌদ্ধধর্ম্মের নাম শুনিলেও আজ আমরা অনেকে আঁৎকাইয়া উঠি, বলিয়া থাকি এমন বেদবিদ্বেষকারীর ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের আবার নিকট সম্বন্ধ! আমরা স্বার্থপর পুরাণকারের দোহাই দিই—বলিয়া থাকি ভগবান দৈত্যদিগকে মিথ্যাধর্ম্ম শিখাইয়া অভিভূত করিবার জন্যই বুদ্ধ সাজিয়াছিলেন। সুদূর চীন জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিপত্তি রহিয়াছে বলিয়া আরও আমরা সেই নিকট সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি—কারণ উপর উপর দেখিতে গেলে চীন জাপানের সহিত আমাদের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এ ভুল ধারণা পোষণ করিবার দিন আর আমাদের নাই। এখন সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে—পিছনে পড়িয়া থাকিলে আর চলিবে না। ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করা আর আমাদের সাজেনা।

হৃদয়ভরা করুণা লইয়া যে দিন বুদ্ধদেব পাপী তাপীকে অমৃতের সন্ধান দিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া ভারতের ঘাটে মাঠে ছুটিয়াছিলেন, সে দিন ভারতের বড় দুর্দ্দশার দিন। দুর্দ্দশার দিন বলিয়াই বোধ হয় তিনি আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার পবিত্র আদর্শকে ডুবাইয়া দিয়া স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, গণ্ডাকে অভেদ্য করিয়া বর্ণ বিভাগের সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে—নিষ্প্রয়োজন তর্ক তুলিয়া ধর্ম্মজীবন-টীকে ভয়াবহ করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে, 'আত্মা আছেন কি নাই' 'ভগবান আছেন, কি নাই'—'সংসার দুঃখময় কি না', বা পরলোক আছে কি না', এই সব বৃথা তর্কই তখন ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন

তাহার বেদ ভুলিয়া গিয়াছে, সত্যের অনুসন্ধান সে তখন নিজেই করিতে অক্ষম—পরকে সে অনুসন্ধানের পথ দেখাইবে কি করিয়া। তাহার বৈদিক যজ্ঞ তখন শুধু নৃশংস পশুবলিতেই পরিণত হইয়াছে—নিরীহের রক্তপাতেই তখন তাহার ধর্ম্ম—তাহার যজ্ঞ, নিজের পশুপ্রবৃত্তি-সমূহকে বলি দিবার নিমিত্ত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেই পশুত্বকে প্রদীপ্ত করাই হইয়াছে তখন সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মের এই অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়াই শাক্যমুনি কতকগুলি সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন—সেই সংস্কারের নাম দিয়াছি আমরা বেদবিদ্বেষ। বস্তুতঃ আদর্শ হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা তিনি কখনও করেন নাই। বৃথা বর্ণবিভাগ সামাজিক উন্নতির অন্তরায় মনে করিয়াই তিনি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে তর্কের কোন মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে—যে তর্কে বরং লোকে বৃথা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে—সে তর্কের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। তিনি বুঝিতেন যে আগুনের ভিতর বসিয়া থাকিয়া আগুনের স্বভাব বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া বরং আগুনের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নিরীহ পশুকে বলি না দিয়া নিজের পশুত্বকে বলি দেওয়াই প্রধান যজ্ঞ। এই সব বিষয়ে কতকগুলি নীচমনা ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার মতের মিল হইত না বলিয়াই তিনি বেদ-বিদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণের নিকট তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণই ছিলেন। আকৌমার তাপস মহা-কশ্যপ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—বারাণসীতে পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের আদর্শকে তিনি কখনও ছোট করিয়া দেখেন নাই। অর্হৎদিগকে তিনি ব্রাহ্মণ নামেই অভিহিত করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরেও তিনি যে গুরুদ্বয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সেই উদ্রক রামপুত্র ও আরাঢ় কালাম ব্রাহ্মণ যোগী ছিলেন। হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্রেও তিনি যে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন তাহা তাঁহার ধর্ম্মালাপ হইতেই বেশ বুঝা যায়। তাঁহার ধর্ম্মমতের উপর হিন্দু দর্শনের প্রভাব বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। নির্ব্বাণ-লাভের পর তিনি বলিয়াছিলেন—

'জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ ভিত্তিচয়।
সংস্কার বিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়॥"

কত জন্ম জন্মান্তরের কঠোর দুঃখভোগের পর যে এই গৃহকারকের সন্ধান মিলে তাহা বুদ্ধই যে নিজে বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকগণও তাহা বুঝিয়াছিলেন। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে বহু জন্মান্তরের দুঃখভোগের পরই তবে চিরসুখের আভাস পাওয়া যায়। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে গৃহকারকের সন্ধান করিয়া গৃহ-স্তম্ভ ও গৃহভিত্তি ধূলিসাৎ না করিলে বাহিরের মুক্তবাতাসের স্পর্শ পাওয়া যাইবে না, সংস্কার নষ্ট হইবে না, তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হইবে না। এ সব জ্ঞান যে বুদ্ধই প্রথম লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। পুণ্য ভারতে রবির প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম্মমতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই প্রথম প্রভাতের দিন হইতেই ভারতবাসী পুনর্জন্মে যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছিল সে বিশ্বাস কৈ বুদ্ধদেব ত কখনও নষ্ট করিতে চাহেন নাই। তাই বলি, বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমতে অহিন্দু কিছুই নাই।

আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়দমন, বাসনাবিসর্জ্জন—এই সকল উপায়ে সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, মৈত্রী ও সদাচার গুণে আত্মোন্নতি সাধন করাই তাঁহার মতে নির্ব্বাণ বা মুক্তি-লাভের অব্যর্থ উপায়। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে যে আত্মোন্নতি সাধন অসম্ভব, এবং নিজেকে সংযত করিতে না পারিলে ও সংসারে অনাসক্ত হইতে না পারিলে যে মুক্তিলাভ অসম্ভব তাহা শুধু বুদ্ধদেব কেন, তাঁহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সেগুলি হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত নিয়মাবলীর সম্যক আলোচনা করিলে ঐ ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়।

সিগালোবাদ সুক্তে বুদ্ধদেব গৃহস্থের যে ধর্ম্ম-নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা তাঁহার নূতন আবিষ্কার নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুগৃহ্যসূত্রকার ও ধর্ম্মসূত্রকারগণ যাহা গৃহীর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম ভারতের চিরন্তন, বুদ্ধদেব তাহাতেই নবজীবন প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সে ধর্ম্মের মধ্যে অহিন্দু কিছুই নাই।

দর্শনের দিক দিয়াও বুদ্ধদেব যাহা করিয়া গেলেন তাহা হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। হিন্দু দর্শনের সহিত পরিচয় না থাকিলে বৌদ্ধ দর্শন বোধগম্য হইতে পারে না। সাংখ্য ও যোগ দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের যে নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, বৌদ্ধদর্শন সাংখ্য ও যোগের নিকট যথেষ্ট ঋণী।

এতদ্দর্শনে স্বতঃই মনে হয় বুদ্ধদেব যে দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা হিন্দুদর্শনেরই অন্যতম শাখা এবং হিন্দুদর্শনের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। হিন্দুদর্শন হইতে তাহাকে পৃথক ভাবে দেখা চলে না।

অতএব, হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ যে অতি নিকট তাহাতে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। ভারতীয় ধর্ম্মসমূহ যে একই ধারায় চলিয়াছে তাহা অতি সত্য।

অবনতি হইতে ভারতীয় ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্যই যে বুদ্ধদেবের প্রধান চেষ্টা এবং ভারতের শাশ্বত ও চিরন্তন ধর্ম্মকেই আবার নূতন ভাবে প্রচার করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহা স্বীকার না করিলে সত্যের অবমাননা করা হইবে বলিয়াই মনে হয়। তিনি সনাতন ধর্ম্মের কখনও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেকের যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা এখন পরিত্যাগ করা উচিত। জয়দেব বুদ্ধকে যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, আমরাও যেন বুদ্ধকে সেই ভাবেই দেখি। আমরাও যেন বলিতে পারি, কেশবই বুদ্ধরূপে আদিম যুগধর্ম্মকে অবনতি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমরাও যেন বলিতে পারি—

"কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

গীতা ও ভাগবত

(৪)

[শ্রীস্মরজিৎ দত্ত]

জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া অনেকে বিবাদ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান বা প্রকৃত ভক্তি যে কি তাহা যেমন কাহারও বিচার করিয়া দেখিবার অবসর নাই, তেমনি অনুভব করিয়া আনন্দ আস্বাদন করিবার সৌভাগ্যও নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতার প্রতিপাদ্য জ্ঞান সাধারণতঃ জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নহে। গীতোক্ত জ্ঞান বলিতে তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে—তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে অভেদ বুদ্ধি ও দৃষ্টি। তাহাই জীবের চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার স্থূলতঃ দুইটী পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে—একটী জ্ঞানের পথ, অপরটী ভক্তির পথ। সাধারণতঃ যে জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া বিবাদ, তাহা এই পথ লইয়াই, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ লইয়া নহে। কেহ কেহ কর্ম্মকে একটী পৃথক মার্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ কর্ম্ম একটী স্বতন্ত্র পথ হইতে পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই দুই মার্গে অগ্রসর হইবার উহা সাধন মাত্র। জ্ঞানপথেই হউক আর ভক্তিপথেই হউক, কর্ম্ম করিতেই হইবে। একথা গীতায় ভগবান্ বারম্বার বলিয়াছেন—"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ", "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে", "যহি

দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ" ইত্যাদি। মোটের উপর নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেহ জ্ঞান বা ভক্তিপথে চলিতে পারে না। "চলা" ক্রিয়াটাই যে একটা কর্ম্ম! আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ বা পরিত্যাগ করি, তাহাও যে একটা কর্ম্ম। সুতরাং দেহধারী জীব কর্ম্ম না করিয়া কিরূপে থাকিতে পারিবে? কর্ম্ম দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সকাম কর্ম্ম এবং তাহাই সংসার-বন্ধনের কারণ। যে কর্ম্মে অনুষ্ঠান-বাসনা বা তৎফলে কোন আকাঙ্ক্ষাই নাই, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। যেমন যন্ত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে যন্ত্রের কোন বাসনা বা কামনা থাকিতে পারে না, যাহা কিছু সবই যন্ত্রীর, সেইরূপ যন্ত্রভূত হইয়া কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান। ইহাই মানুষের সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয় এবং কোন বন্ধনের সুযোগই দেয় না। কিন্তু একেবারে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম প্রথম অবস্থায় ত অসম্ভব। তবে পথে অগ্রসর হইতে হইতে এমন অবস্থায় আসা যায়, যেখানে নিষ্কাম কর্ম্ম শুধু নহে একেবারে নিষ্কর্ম্ম্য আসিয়া থাকে। তাহা সাধক জীবনের চরম সোপানে গিয়া থাকে। তৎপূর্ব্বে শত চেষ্টায়ও নিষ্কাম কর্ম্ম হয় না। কোথা হইতে ফলাকাঙ্ক্ষা বা অহংভাব আসিয়া পড়ে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। "জগদ্ধিতায়" যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহার মধ্যেও কামনা "গেরুয়া" পরিয়া বসিয়া আছে। তাই গীতা ও ভাগবত উভয়ই ভগবৎ প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তবে যে শাস্ত্রে সকাম যজ্ঞাদির উপদেশ আছে, তাহা মানুষকে ধর্ম্মের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই। বস্তুতঃ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে। তবে ধর্ম্মের স্পর্শমণিসদৃশ গুণ আছে। তাহার সংস্পর্শে আসিলেই তন্মুহূর্ত্তে না হইলেও ক্রমে লৌহ এমন কি পাষাণও স্বর্ণে পরিণত হইয়া যায়। ধর্ম্মের নামে কর্ম্ম করিতে করিতে প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। স্বার্থের দাস বদ্ধ জীব এইরূপে সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে ক্রমে তাহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আসে। সকাম হউক আর নিষ্কাম হউক, কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য ব্যবস্থিত—"পাবনানি মনীষিণাং"। রজক যেমন ক্ষার দ্বারা প্রথমতঃ মলিন বস্ত্রগুলি উপর উপর পরিষ্কার করিয়া লয়। পরে সূক্ষ্ম মালিন্য দূর করিবার জন্য অন্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে, সেইরূপ সকাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের 'জমাট বাঁধা' মলরাশি বিধৌত হইয়া আসিলে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তাহার সংস্কারগত মলিনতা সর্ব্বতো ভাবে বিদূরিত হইয়া যায় এবং তাহা শুদ্ধ নির্ম্মল মুকুর সদৃশ হইয়া উঠে। তখন তাহাতে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হইতে পারে।

জ্ঞান ও ভক্তি বিভিন্ন মার্গ হইলেও এক স্থানে তাহারা মিলিত হইয়া একটামাত্র পথে পরিণত হইয়াছে। পথসঙ্গতিই সাধকের চরম গন্তব্য স্থান নহে। সেই সঙ্গম হইতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে তবেই পথপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায়। পথদ্বয়ের এই মিলন স্থানই গীতোক্ত গুণাতীত অবস্থা। এখানেই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া যে বিবাদ তাহা এই স্থানেই মিটিয়া গিয়াছে। এতৎপূর্ব্বের যে জ্ঞান ও ভক্তি তাহা "কাঁচা।" তাহা নিত্যানিত্য বিবেক অথবা ভেদ দৃষ্টিতে পর্য্যবসিত। তাহা সাধন মাত্র। সাধন কখন সাধ্য হইতে পারে না। ইহা জীবের অবিদ্যা নাশের জন্য প্রয়োজন। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে—"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মায়া"র বন্ধন ছেদন করিতে পারিলেই তখন আর ইহাদের প্রয়োজন থাকে না। তখন ইহাদের পরিত্যাগ করিয়া নবজীবনে—গুণাতীত অবস্থায় যাইতে হয়। তাই ভাগবত বলিতেছেন :—

এবং গুরূপাসনৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সংপদ্য চাত্মানমথত্যজাস্ত্রং॥

১১।১২।২১

ইহাই পরমহংসদেবের একটা কাঁটা দ্বারা, বিদ্ধ কাঁটাটী তুলিয়া দুইটা কাঁটাই ফেলিয়া দেওয়া। যাহা হউক, এই গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে সাধক "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" দুই পথেই যে এই স্থানে আসিতে পারা যায়, তাহা গীতা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, যথা :—জ্ঞানমার্গের নির্দ্দেশ করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন :—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

এতৎপূর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত অবস্থা বর্ণনকালে ভক্তিমার্গেও যে এই স্থানে আসিতে পারা যায়, তাহা বলিয়াছেন :—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, দুই মার্গেই গুণাতীত অবস্থা আসিলে পর 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইবার উপযুক্ত হয়। ভাগবতের একাদশ স্কন্দের উনত্রিংশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে ভক্তিযোগ বর্ণনপ্রসঙ্গে এই কথাই বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে যে ভক্তিযোগই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মত উদ্ধৃত করিতেছি

উনবিংশে তু যঃ পূর্ব্বং বিস্তরেণ নিরূপিতঃ।
ভক্তিযোগস্তমেবাহ স্বভক্তায় সমাসতঃ।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ভক্তিযোগ যে সাধককে কোন অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয়, তাহা এতদধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন :—

মর্ত্ত্যো যদাত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় কল্পতে বৈ ॥ ২৯।৩২

শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিতেছেন—"মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায় ইতি যাবৎ। কল্পতে যোগ্যো ভবতি।" অর্থাৎ এই অবস্থায় আসিলে ব্রহ্ম হইবার যোগ্য হইয়া থাকে। আমরাও উপরে গীতোক্তির এইরূপ অর্থ করিয়াছি। যাহা হউক ইহা সিদ্ধাবস্থা মাত্র। পরন্তু চরম অবস্থা নহে। ব্রহ্মে লীন হওয়াই ধর্ম্মজীবনের চরম পরিণতি। এই গুণাতীত বা সিদ্ধ বা ব্রহ্মভূত অবস্থায় আসিলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আরও অগ্রসর হইতে হয়। গীতা বলিতেছেন :—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৭।৩

ভাগবতও ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :—

প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ ৬।১৪।৩
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৪

যাহা হউক এই তত্ত্বজ্ঞান যতদিন স্ফুরিত না হয় ততদিন জীবের সংসার ঘচে না—পুনঃ পুনঃ জীবের সংসারে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। তাই গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—"নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে" ॥ ৯।২৪। আমরা পূর্ব্বে গীতার মর্ম্মার্থ সংগ্রহে বলিয়াছি এবং এক্ষণে আরও একটু স্পষ্ট করিয়া গীতার কথাতেই বলিব—এই ব্রহ্মভূত অবস্থা হইতে কিরূপে ব্রহ্ম বিলয় ঘটে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং। ১৮।৫৪

এখানে "পরা ভক্তি"র স্পষ্ট উল্লেখ হইল। ইহাও শেষ নহে। ইহা ভক্তের পক্ষে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত বা অচিন্ত্য ভেদাভেদের অবস্থা। তত্তাশীয় তত্ত্বং বা সোঽহং এর মধ্যেও দ্বৈতবুদ্ধি। ভক্তি পরাই হউক বা অপরাই হউক, তাহাতে একটু না একটু ভেদ বুদ্ধি থাকিবেই। এখানেও অহংবুদ্ধি একেবারেই যায় না। পরমহংসদেব যেমন বলিয়াছেন—নারিকেল গাছের বালতো খসিয়া গেলেও যেমন তাহার দাগ থাকে, এখানেও সেই অবস্থা। অহংজ্ঞান স্বরূপতঃ না থাকিলেও তাহার দাগ থাকে। তবে এই অবস্থা হইতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকেই আছে:—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥ ১৮।৫৫

অর্থাৎ এই পরা ভক্তির সাহায্যে "মামভিজানাতি" কি না লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারে। ঠিক এই "অভিজানাতি" শব্দ পূর্ব্বোদ্ধৃত ৯।২৪ শ্লোকাংশে আছে। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই, ইহাই জানার নাম অভিজ্ঞান। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তত্ত্বং শব্দের অর্থ তাহার

বিশ্লেষণেই রহিয়াছে—তৎ ত্বং অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই তুমি—ব্রহ্ম ও জীব একই। ভাগবতও বলিতেছেন, ভক্তির সাহায্যেই তত্ত্বজ্ঞান –

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ ১।২।১২

পুনশ্চঃ—এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তি যোগতঃ।

ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥ ১।২।২০

গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের পর ব্রহ্মে প্রবেশ বা ব্রহ্মীভাব। রসোবৈসঃ এই উপনিষদ্বাক্যোপলক্ষিত সচ্চিদানন্দের পূর্ণ রসাস্বাদ।

ভক্তগণ ভগবানের পাদ সেবনই সর্ব্বোচ্চ সুখ—সকল আনন্দের পরাকাষ্ঠা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার তুলনায় মুক্তি বা ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ সেবানন্দ হইতে লঘিষ্ঠ কি গরিষ্ঠ তাহা তাঁহারা কিরূপে অবগত হইলেন? ব্রহ্মানন্দ যে কি সুখ তাহা সে পর্য্যন্ত তাঁহারা আস্বাদন করেন নাই –আরও অগ্রসর হইলে তবে তাঁহারা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং যাহা জানিনা, অনুভব করি নাই, তাহার সম্বন্ধে কিরূপে মতামত প্রকাশ করিতে পারি। অবশ্য ভগবৎ সেবনে যে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ হয় তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ যে তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক নহে তাহা কে বলিবে? হয় ত ভক্তগণ সেবনানন্দেই এতদূর পরিতৃপ্ত যে এতদপেক্ষা অধিকতর সুখদ আর কিছু থাকিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনায় আসে না। তাঁহারা ব্রহ্মানন্দের কথা শুনিয়াছেন বটে তবে তাহা যে কিরূপ তাহা জানেন না। যাহা জানেন তাহাই অতীব সুখদ। অতএব স্বভাবতই তাঁহারা বলিতে পারেন আমরা যাহা ভোগ করিতেছি তদপেক্ষা অধিক কি তত্তুল্য আর কিছুই হইতে পারে না। "অল্পষ্টো যেন কেন চিৎ" যাহাদের স্বভাব তাঁহারা যে এরূপ মনে করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? আর তাঁহারা যে এরূপ অতিশয়োক্তি করিয়া থাকেন তাহাও আমরা জানি। ভগবত সেবনের সহিত মুক্তির তুলনা ত দূরের কথা, তাঁহারা সাধুসঙ্গের সহিতও মুক্তির তুলনা করিতে রাজি নহেন, অথচ তাঁহারাই আবার বলেন, এই সাধুসঙ্গই মুক্তির পথে লইয়া যায়। যাহার সাহায্যে মুক্তিলাভ তাহাকে তাঁহারা মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আকাঙ্খার বস্তুর সহিত সেই বস্তু লাভের উপায়ের তুলনা করিয়া তাঁহারা উপায়কেই বড় মনে করিয়া থাকেন। হয়ত ইহা কৃতজ্ঞতা-দৃষ্টান্তের অতিশয়োক্তি। আমাদের উক্ত অভিমতের প্রমাণ স্বরূপ ভাগবত বাক্যই উদ্ধৃত করিতেছি :—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ১।১৮।১৩

আবার সেই ভাগবতই বলিতেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণা দাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতি উক্তি রণ্‌ ক্রমিষ্যতি॥ ৩।২৫।২২

অতএব দেখা যাইতেছে অতিশয়োক্তির আশ্রয়ে তাঁহারা ব্রহ্মানন্দকে সেবানন্দ অপেক্ষা তুচ্ছ মনে করিতে পারেন বটে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা এখনও দ্বৈতে আছেন। যতদিন দ্বৈতবুদ্ধি ততদিন সান্তভাব। দ্বৈতজ্ঞান লোপ পাইলে তখন অনন্তের উপলব্ধি। তখন সান্ত বা সসীম সুখের তুলনায় অনন্ত সুখকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু বিপদ এইখানেই- -যে সেই অনন্তের আস্বাদ পাইয়াছে, সে আর অনন্ত বড় কি ছোট তাহা বলিতে ফিরিয়া আসে না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়া সমুদ্রেই মিশিয়া যায়, সমুদ্রের সংবাদ আর তার দেওয়া হয় না। তাই পরমহংস দেব বলিয়াছেন---একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই উচ্ছিষ্ট হয় নাই। সে যখন আর ফিরিয়া আসিল না তখন অনুমান দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সে নিশ্চিতই অধিকতর সুখে ডুবিয়াছে, নতুবা সে অবশ্যই ফিরিয়া আসিত।

যাহাতে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় তাহাই আত্যন্তিক সুখের নিদান। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্তিতে দ্বৈতবুদ্ধি থাকে—ভক্ত, ভগবান্। আমি—তুমি এই ভেদজ্ঞান থাকে। "দ্বিতীয়া দ্বৈ ভয়ং ভবতি"। কেন না যেখানে ভেদজ্ঞান সেইখানেই বিচ্ছেদজ্ঞান এবং

বিচ্ছেদের আশঙ্কা। পরন্ত যেখানে এক বই দুই নাই সেখানে বিচ্ছেদ নাই—কে কাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে? নারদ ভক্তিসূত্রে বলিতেছেন—

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

ভক্তিই আনন্দ—ভক্তিই ভক্তের জীবন স্বরূপ। তাহার জন্ম ভগবৎ সেবায়। কিন্তু ভক্ত যদি ভগবৎ সেবন হইতে বিচ্যুত হন! যে হেতু ভক্ত ও ভগবান্ দুইটী রহিয়াছে, চ্যুতির আশঙ্কা যে একেবারে নাই তাহা কেমন করিয়া প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিতে পারি? গোলকধামে গুঁটি উঠিলে তবেই নিশ্চিন্ত নতুবা পতনের আশঙ্কা তার পদে পদে। আবার আশঙ্কা থাকিলেই তাহার সহজাত দুঃখও আছে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ভক্তির আনন্দ যে চরম আনন্দ বা সুখের পরাকাষ্ঠা নহে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এখন কথা হইতে পারে ব্রহ্মানন্দ যখন জীব বুদ্ধির অগোচরে এবং তাহার বিচার জীব দ্বারা হয় না তখন আমরাই বা কি করিয়া তাহার প্রাধান্য স্থাপন করিতে সাহসী হই? আমরা প্রাণ খুলিয়া এবং অভ্রান্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি কি সেবনানন্দ, কি ব্রহ্মানন্দ উভয়ই আমাদের অনাস্বাদিত। তথাপি ঔদরিক যেমন মিষ্টান্ন না খাইলেও তাহার কথা শুনিতে এবং বলিতে ভালবাসে, আমাদের অবস্থাও ঠিক তাহাই। যাহা হউক ব্রহ্মানন্দ আমাদের জানা না থাকিলেও যাঁহার কথা প্রামাণিক বলিয়া ভক্তগণও স্বীকার করিবেন তাঁহারই সাক্ষ্য আমরা দিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাগবত বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। আর যিনি স্বরূপতঃ আনন্দই তিনি যে আনন্দের কথা ঠিক ঠিক বলিতে পারিবেন তাহা আমরা মনে করিতে পারি। সেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন:—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬।২১

ইহা ভক্তের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ নহে—ইহা শব্দাদিবিষয় পঙ্ক হইতে বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয় সেখানে পঁহুছিতে পারে না। সে সুখে অধিষ্ঠিত হইলে আর চ্যুতির আশঙ্কা নাই—যত্রস্থিতো নতত্ত্বতশ্চলতি। পরের শ্লোকে এই সুখের বিষয় আরও স্পষ্ট রূপে বলা হইয়াছে—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥২২

ভক্ত যে ভাবে ব্রহ্মানন্দকে অধিকতর লাভ বলিয়া মনে করেন না, ইহা সেই ভাব নহে। ইহা ভক্তের অনুভূতি প্রসূত নহে। ভক্তের ভগবান্ নিজে বলিতেছেন। ইহাই ব্রহ্মানন্দ—ভক্ত ভগবান্ জীব ব্রহ্ম মিশিয়া এক হইয়া গেলে যে অপূর্ব্ব সুখের অনুভূতি ইহা সেই উচ্চতম সুখ। সেখানে কোন দুঃখের অবকাশ নাই—কোন দুঃখের অধিকার নাই।

ভক্তগণ ভক্তির প্রাধান্য স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিলেও মুক্তিই যে চরম লক্ষ্য তাহা ভাগবতের ভগবান্ই বলিতেছেন। ভক্তের গৌরব দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন বটে:-

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈ কত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥ ৩।২৯।১৩

কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন

তৈর্দ্দর্শনীয়াবয় বৈরুদার বিলাসহাসেক্ষিত বামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃত প্রাণাংশ্চ ভক্তি রনিচ্ছতো মে গতিমন্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে॥৩।২৫।৩১

অর্থাৎ ভক্তগণ অনিচ্ছুক হইলেও মদ্বিষয়িণী ভক্তি তাহাদিগকে আমার অন্বীগতি প্রদান করিয়া থাকে। অন্বীগতি ব্যাপারটা কি? শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন:—"অন্বীং গতিং মুক্তিং প্রযুঙ্‌ক্তে প্রাপয়তি।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভক্তগণের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাদিগকে জোর করিয়া মুক্তি প্রাপিত করা হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, মুক্তি বা ব্রহ্মানন্দ ভক্তি বা সেবানন্দ হইতে যদি গরীয়সী না হইবে—অধিকতর সুখাবহ না হইবে, তবে কেন করুণাময় ভগবান্ জীবের চিরকল্যাণ ও শুভানুধ্যানে নিরত থাকিয়া তাহাদিগকে সবলে এই অন্ধকূপের হীন মুখে পাতিত করেন? ভগবান্ যাহা করেন তাহা যদি সত্যই মঙ্গলের জন্য হয়—অবশ্য ভক্ত মাত্রেই তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য নতুবা বলিতে হইবে

তিনি ভক্ত নামধারী মাত্র—তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুক্তি সেবানন্দ অপেক্ষা অধিকতর সুখপ্রদ। সেই অতীন্দ্রিয় সুখ হইতে ভক্তগণকে বঞ্চিত করিয়া রাখা কখনই ভগবানের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সেই জন্যই তিনি তাঁহাতে নিবেদিতাত্মা এবং তৎ সেবনজাত আনন্দ মাত্রে সন্তুষ্ট ভক্তগণকে 'ঘাড়ে' ধরিয়া ব্রহ্মানন্দ সাগরে ডুবাইয়া দিয়া বলেন—"ওরে মূর্খ কেবল 'পায়স'ই খাইবি, পায়সের পর যে'বাবড়া' আছে তাহা একবার আস্বাদন করিয়া দেখ্।" তুলনাচ্ছলেই আমরা অপার্থিব বস্তুর সহিত তুচ্ছ পার্থিব বস্তুর উপমা দিলাম—শুধু বুঝাইবার জন্যই। অবশ্য আমাদের মূঢ়তা মার্জ্জনীয় হইবে কি না জানি না।

এইরূপে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়াই ভক্ত বুঝিতে পারেন যে, সেবনানন্দ অপেক্ষা অধিকতর কাঙ্ক্ষনীয় বস্তু আছে। এত কাল তাঁহারা যাহা লইয়া মনে করিয়াছিলেন ইহাই বুঝি শেষ, তাহা বাস্তবিকই শেষ নহে তাঁহাদের ভ্রান্তি মাত্র। যাঁহার চরণে তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্ব ভাবে সমর্পণ করিয়াছেন—যাঁহার উপর তাঁহাদের সমস্ত সুখ দুঃখের ভার নিঃসংশয়ে দিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে ভ্রম প্রদর্শন করিয়া নিতান্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর মত, প্রিয়তমের মত সেই চরম সুখাস্বাদনে প্রবর্দ্ধিত করেন। ভগবান্ স্বস্বরূপানন্দ কেবল মাত্র নিজে উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হন না। সামান্য মানুষ কোন একটা সুখের বস্তু বা আনন্দের সংবাদ পর্য্যন্ত মাত্র নিজে সম্ভোগ করিয়া প্রীতি লাভ করে না, তাহার প্রিয়জনকে তাহার অংশভাগী করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হয়, না পারিলে পূর্ণাস্বাদন হয় না। আর কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব ভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে বঞ্চিত করিয়া মাত্র নিজে নিরতিশয় আনন্দ ভোগ করিতে পারেন!

ফলতঃ মুক্তিই যে চরম শ্রেয়ঃ তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন :—

মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎ প্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ং॥
(প্রাপ্নোতীতি শেষেনান্বয়ঃ)—৩।২৭।২৫

নিঃশ্রেয়সং নিরতিশয়ানন্দমিতি শ্রীধর স্বামী।

ভগবানের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা ভক্তের উক্তি হইতেই দেখাইব যে, তাঁহারা মুক্তিই কামনা করিয়া থাকেন। ভাগবত মহাদেবকে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়াছেন—বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভুঃ ১২।১৩।১২। ব্রহ্মা চারি বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তিনি চতুর্ম্মুখ। আর মহাদেব চতুর্ব্বেদ ব্যাখ্যা ত করিয়াছেনই। অধিকন্তু তিনি ভক্তি প্রচার করিয়াছেন সেই জন্যই নাকি তিনি পঞ্চানন। সেই পঞ্চানন বলিতেছেন :—

অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায় ভজাম
দেবং। ১০।৬৩।২৯

ভক্তিমার্গ প্রদর্শক দেবর্ষি নারদ বলিলেন—

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রি যুগলং জনতাপবর্গং॥ ১০।৬৯।১৬

আচ্ছা, দেখা যাউক ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ কি বলিতেছেন। প্রহ্লাদকে ভক্তচূড়ামণি বলিলাম, কারণ স্বয়ং ভক্তবৎসল ভগবান্ই তাঁহাকে বলিয়াছেন—"ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্" অর্থাৎ তুমিই হইতেছ আমার ভক্তদিগের আদর্শ।—৭।১০।২০

সেই আদর্শ ভক্ত প্রহ্লাদ বলিতেছেন :—

ভক্তি প্রয়োগেন সমেত্য ধোক্ষজং * * *
অধোক্ষজালম্ভ মিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসারচক্র
শাতনম্। তদ্ ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্ধুধাঃ ইত্যাদি॥
৭।৭।৩০

পুনশ্চ :—তস্মাদদৃষ্টশ্রুত দূষণং পরং ভক্ত্যোক্তয়োগং ভক্ততামাত্মলব্ধয়ে। ৭।৭।৩৩

পূর্ব্বোক্ত উপদেশ প্রহ্লাদ তাঁহার সহপাঠী অসুর বালকগণকে দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা ও কার্য্যে অসঙ্গতি নাই। তিনি অপরকে একরূপ উপদেশ দিয়া নিজে অন্যরূপ করিবেন তাহা নহে। নৃসিংহ মূর্ত্তি ভগবানের স্তবে তিনি বলিতেছেন—

স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রি মূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদানু। ৭।৯।১৫

অঙ্ঘ্রি মূলের বিশেষণটী দেখুন—"অপবর্গশরণং" অর্থাৎ অপবর্গের আশ্রয় অর্থাৎ যেখানে অপবর্গ বাস করে অর্থাৎ যেখানে যাইলে অপবর্গ লাভ হইবে।

ইহার পূর্ব্বেই এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তি কামাঃ
মৌনং চরন্তি বিজনে, ন পরার্থ নিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একঃ ইত্যাদি

অর্থাৎ প্রহ্লাদ মুক্তিকাম বটেন কিন্তু সাধারণ মুনিগণ যেমন পরের চিন্তা না করিয়া মাত্র নিজেরাই মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেরূপ স্বার্থান্ধ হইয়া মুক্তি চাহেন না। তিনি তাঁহার অনুগত অসুর বালকদিগকে ত্যাগ করিয়া একা বিমুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। যদি সকলকে লইয়া মুক্ত হইতে পারেন ভাল নচেৎ এখানেই পড়িয়া থাকিবেন। কি উদারতা! কি পরার্থপরতা! তাহা না হইলে ভগবান্ তাহাকে সকল ভক্তের প্রতিরূপধৃক্ বলিয়াছেন!

যাক্, পরিশেষে প্রহ্লাদ স্পষ্ট বলিতেছেন যে তিনি মুক্তিরই ইচ্ছা করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়াছেন, অন্য কোন কামনার জন্য নহে।

মামাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈ বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষু স্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥৭।১০।২

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

বিদন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গং ইত্যাদি ১০।৭২।৪

মুচুকুন্দ স্তব করিলেন—

আরাধ্য কল্মাষমপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যবরমাত্ম বন্ধনং।
১০।৫১।৩৭

রুক্মিণী বলিতেছেন—

কাম্ভং শ্রয়েত তব পাদসরোজ গন্ধমাঘ্রায় সন্মুখরিতং
জনতাপবর্গং ১০।৬০।৪০

কুন্তী স্তব করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

বিপদঃ সন্তুতাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব দর্শনং ॥১।৮।২৪

এই আর একটী অদ্ভুত প্রার্থনা! কুন্তী বলিতেছেন আমার যখনই যখনই বিপদ হইয়াছে তখনই তখনই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ তোমার দর্শন আমি লাভ করিয়াছি। অতএব হে ভগবন্, আমার বিপদই যেন চিরকাল থাকে। আমি বিপদকে আমার চির সম্পদ বলিয়া মনে করি।

ভগবান নিজেও যুধিষ্ঠিরকে স্বানুগ্রহের ফল বলিতেছেন—

তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকং।
বিজ্ঞায়াত্ময়া ধীরঃ সংসারাৎ সারমুচ্যতে ॥১০।৮৮।৭

পরে উদ্ধবকে একাদশে বলিতেছেন—

মল্লক্ষণামমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম্মমাস্থিতঃ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থঃ সমুপৈতি মাং ॥১১।২৬।১

অধিক কি—ভক্তগণ যে গোপী প্রেমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন এবং তৎপ্রসঙ্গজাত কান্ত বা মধুর রসই চরম উপভোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই একান্তানুরক্তা ব্রজবল্লরীগণকেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অধ্যাত্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করেন এবং এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন যে মুক্তিই চরম শ্রেয়ঃ। রাগানুগা ভক্তির সাধনে গোপাঙ্গনাগণ তত্ত্বজ্ঞানলাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। ভাগবতের ১০।৮২ অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—

ময়ি ভক্তি হি ভূতানা মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৩১
অহং হি সর্ব্ব ভূতানা মাদি রন্তোঽন্তরং বহিঃ ॥৩২
উভয়ং মব্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥৩৩

শ্রীশুক উবাচ—

অধ্যাত্ম শিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেণ শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণ ধ্বস্ত জীবকোশা স্তমধ্যগন্ ॥৩৪

পরে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া একাদশে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ (গোপ্য ইতি শেষঃ) ১১।১২।১২

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য ও পরম শ্রেয়ঃ। তবে এই মুক্তি লাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট দুইটী পথের মধ্যে ভক্তিমার্গই যে সুগম তাহা যেমন ভাগবত বলিতেছেন তেমনি গীতাও স্বীকার করিয়াছেন। ভাগবৎ বলিতেছেন—

তথাপরে চাত্ম সমাধি যোগবলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাং।
তমেব ধীরাঃ পুরুষা বিশন্তি * তেষাং শ্রমঃস্যান্নতু সেবয়াতে॥
৩।৫।৪ , ৪৫

পুনশ্চ—ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥
৩।২৫।১৮

এ স্থলেও ব্রহ্মসিদ্ধির কথা বলা হইল।

গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—
এবং সতত যুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগ বিত্তমাঃ॥
১২।১

তদুত্তরে ভগবান্ ভক্তিযোগ বর্ণন প্রসঙ্গে বলিতেছেন—
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তেমে যুক্ত তমা মতাঃ॥ ২
ক্লেশোঽধিকতর স্তেষা মব্যক্তাসক্ত চেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহ বদ্ভির বাপ্যতে॥ ৫

তবে আর গীতা ও ভাগবতে প্রভেদ রহিল কোথায়? গীতা আপনার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ভক্তির যথাসম্ভব সূত্র করিয়াছেন। ভাগবত তাহার মহা ভাষ্যরূপে, তাহা বিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ সেই ভক্তিপ্রসঙ্গের আলোচনা আছে বলিয়া ভাগবতকে ভক্তিশাস্ত্রই বলা হইয়া থাকে। গীতোক্ত ভক্তিমার্গের ক্রমনির্দ্দেশাদি করিয়াই ভাগবত ভক্তিগ্রন্থ।

তবে যাঁহারা গীতাতে জ্ঞান প্রসঙ্গ আছে বলিয়াই তাহাকে ভাগবত হইতে নিকৃষ্ট মনে করেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য ভাগবতে জ্ঞানের প্রশংসাব্যঞ্জক কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিব এবং দেখাইব তাহা গীতারই প্রতিধ্বনি। প্রথমেই ভাগবত স্বীকার করিয়াছেন যে, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ উভয়ের একই উদ্দেশ্য, যথা—
জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তি লক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দ লক্ষণঃ॥৩।৩২।৩৭

তৎপরে জ্ঞান যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাই বলিতেছেন—
শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিশ্রেয়সং পরং।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞান নৌ র্ব্যসনার্ণবং॥ ৪।২৪।৭০

গীতার চতুর্থাধ্যায়ের ৩৬ শ্লোক দেখুন।

পরে জ্ঞানী যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক তাহাই ভাগবত বলিতেছেন—
জ্ঞান বিজ্ঞান সন্নদ্ধাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্ম্ম।
জ্ঞানী প্রিয়তমো ইতো মে জ্ঞানে নাসৌ বিভর্ত্তি মে॥
১১।১৯।৩

গীতার সপ্তমাধ্যায়ে ১৭শ ও ১৮শ শ্লোক দেখুন।

তৎপরে জ্ঞান যে পরম পবিত্র তাহাই বুঝাইতেছেন—
তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রানীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং শুদ্ধিং যা জ্ঞান কলয়া কৃতা॥১১।১৯।৪

ইহা কি গীতোক্ত—"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"র ব্যাখ্যা বা বিস্তৃতি নহে?

ক্রমশঃ।

* মনে রাখিবেন 'বিশন্তি', গীতাও বলিয়াছেন 'বিশতে' শ্লোকের শেষাংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সেবা দ্বারাও ঐ "বিশন্তি"। তবে যাঁহারা সেবার পথ অবলম্বন না করেন তাঁহাদের শ্রম স্বীকার করিতে হয়।

ত্রুটী-স্বীকার

ছাপাখানার গোলমালে আমরা হাজার চেষ্টা করিয়াও এবার নিয়মমত পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আগামী মাস হইতে উপাসনার নিজের ছাপাখানা হইবে—

কাজেই আমরা ভরসা করি আর আমাদের কোনও অনিয়ম হইবে না। সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।
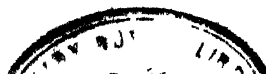
কার্য্যাধ্যক্ষ।

"সমস্ত তিমির
ভেদ করি' দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে।"

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর
'পজিল' স্কেচ হইতে

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৬শ বর্ষ { চৈত্র—১৩২৭ { ৯ম সংখ্যা

সমষ্টি-পুরুষ

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

ব্যক্তির যে একটা নিজস্ব সত্তা ও চেতনা আছে এবং তাহারই প্রকাশ স্বরূপ আছে একটা স্বধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য, এ সত্যটি মানুষের কাছে একরকম স্বতঃসিদ্ধ। এ সত্যটির উপর আমরা জোর দেই বা না দেই, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু মনে মনে ইহাকে বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য হই, ইহার উল্টাটি বিশ্বাস করা অসম্ভব যদি না হয় তবে বড়ই দুঃসাধ্য। মানুষের ব্যক্তিত্বকে আমরা যখন ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করিয়াছি, অথবা যখন পীড়িত দলিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, উভয়ত্রই ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। প্রত্যেক মানুষের যে একটা সজীব আত্ম-সত্তা আছে, প্রাচীন কালে হউক আর আধুনিক কালে হউক, এ কথাটি মানিয়া লইতে কোন দিন বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, বরং না মানিয়া লইতেই যাহা কিছু বেগ পাইতে হইয়াছে।

আধুনিক কালে কিন্তু আর একটা নূতন কথা আমাদিগকে শুনিতে হইতেছে; সেটা এই যে শুধু ব্যক্তির নয়, ব্যক্তির মত ব্যক্তি সংগ্রহের—দলের, গোষ্ঠীর, সমষ্টিরও আছে একটা নিজস্ব সত্তা ও চেতনা, একটা স্বধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য। Group-mind, social consciousness—আজকালকার দর্শনের বিজ্ঞানের একটা মস্ত আবিষ্কার, তর্ক বিতর্কের একটা লোভনীয় ক্ষেত্র। এখন এই যে জিনিষটি সংঘ-বুদ্ধি, গোষ্ঠীর মন, সমাজগত চেতনা প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইতেছে, তাহা কি?

কথাটা এই, যখন দুইটি ব্যক্তি আলাদা আলাদা থাকে তখন তাহারা শুধু এক এক, কিন্তু যখন পরস্পর মিলিত হয়, উভয়ে উভয়ের সহিত আদান প্রদান করে তখন তাহারা একে একে দুই নয়, দুইএর বেশী একটা কিছু। একটা দল দলের অন্তর্গত যতগুলি মানুষ তার যোগফল নয়, যোগফলের চাইতে ঢের বেশী। একজন লোক একা যদি একটি কাজ আট ঘণ্টায় শেষ করিতে পারে, তবে ত্রৈরাশিক অনুসারে আটজন লোকের সে কাজ করিতে এক ঘণ্টা লাগিবে প্রমাণ হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে এক

ঘণ্টা লাগে না, তারও কম লাগে। লোক এক সঙ্গে হইলে জোট বাঁধিলে প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক হিসাবে যে সামর্থ্য যে মূল্য তার চেয়ে তার বেশী সামর্থ্য, বেশী মূল্য হয়। শুধু তাই নয় ব্যক্তির শক্তির মাত্রা যে বাড়িয়া যায় তাই নয়, শক্তির ধরণও অন্য রকম হইতে পারে ও হইয়া যায়। একা আমি যে ধরণের কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, দলের মধ্যে পড়িলে স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও ঠিক সেই কাজ আমি হেলায় করিয়া ফেলিতে পারি।

ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সমাবেশে, সংঘর্ষে, আদানে-প্রদানে সংঘ জিনিষটি গড়িয়া উঠে, সুতরাং ব্যক্তিই অর্থাৎ ব্যক্তিরাই সংঘকে সৃষ্টি করিতেছে বলিতে হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ব্যক্তিরা যখন সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা নিজে নিজে থাকে তখন কিছু নয়, কিন্তু যখনই পরস্পরের সংস্পর্শে সম্বন্ধে আসিয়াছে, তখনই এই সংস্পর্শ এই সম্বন্ধ একটা পৃথক নিজস্ব সত্তা পাইয়াছে, একটা বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, আর ব্যক্তিকে ব্যক্তকে নিয়ন্ত্রিত গঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যক্তিই প্রথমে সংঘকে সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্ট হইবামাত্র এই সংঘই আবার ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিকে মানুষই সমাজকে বানাইয়াছে, আর এক দিকে কিন্তু সমাজও মানুষকে বানাইতেছে।

একটা ব্যাপার হয়ত অনেকেরই চোখে লাগিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই সমাজের একটি নিয়ম ব্যক্তিগত হিসাবে কেহই মানেন না বা মানিতে চাহেন না, কিন্তু সমষ্টিগত হিসাবে না মানিয়া উপায় নাই, প্রত্যেকেই অপর সকলের দোহাই দিতেছেন, প্রত্যেকেই বলিতেছেন আর পাঁচ জনে যদি করে তবে আমি করিব, কেহই যেন এই পাঁচ জনের অন্তর্ভুক্ত নয়—এই পাঁচ জন যেন কি একটা অশরীরী জিনিষ। কিন্তু বাস্তবিকই এই পাঁচজনের সমষ্টি বা পঞ্চায়েৎ একটা আলাদা বস্তু, পাঁচ জনকে শুধু এক সাথে করিলেই তাহাকে পাওয়া যায় না, তাহা অশরীরী বটে কিন্তু সে একটা বাস্তব জিনিষ, তাহার আছে একটা সত্তা, একটা শক্তি। সচরাচর এই জিনিষটিকে অভ্যাস বা সংস্কার নাম দিয়া সমাজসংস্কারকেরা উড়াইয়া দিতে চাহেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেই দেখেন আলাদা আলাদা ভাবে লইলে কোন ব্যক্তির মধ্যে যে জিনিষটির শিকড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, মোটের উপর সে জিনিষটি কোথা হইতে একটা দুর্নিবার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। এই ব্যাপারের কারণ আর কিছুই নয়, আমরা যেমন বলিয়াছি ইহাতে প্রমাণ হয় যে, ব্যষ্টি ছাড়া সমষ্টিরও আছে একটা জীবন্ত সত্তা—তাহারই হাতে ব্যষ্টি চলিয়াছে কলের পুতুলের মত।

আরও এক কথা—বিজ্ঞানে বলিতেছে, ঘটনাতেও সপ্রমাণিত হইতেছে যে, এই সমষ্টিগত সত্তা একটা অচেতন জড় পদার্থ নয় ইহার শক্তিও অন্ধ নয়; সমষ্টিগত সত্তার আছে জীবনের একটা বিশেষ ধারা, একটা লক্ষ্য, একটা শৃঙ্খলা। ব্যষ্টি যেমন একটা উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া, সেই অনুযায়ী পথ খুঁজিয়া চলে, সমষ্টিও সেই রকম একটা সার্থকতার জন্য উপায় বাহির করিয়া চলে। সমষ্টিও যেন একটা সচেতন সজ্ঞান জীব বা পুরুষ। ব্যষ্টি আত্মা হইতেছে এই বিরাট আত্মার, এই মহা পুরুষের এক একটি অঙ্গ। আমাদের স্মরণে পড়িতে পারে বেদের সেই 'সহস্রশীর্ষ সহস্রপাদ' পুরুষের কথা, অথবা গীতার সেই ঐশ্বর রূপের কথা। প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যে নিহিত আছে একটা সমষ্টিগত চেতনা, প্রত্যেক ব্যষ্টিই এই সমষ্টিগত চেতনার এক একটি মুখ। এই সমষ্টিগত চেতনাকে ব্যষ্টি সজ্ঞানে জানিতে না পারে, তাতে কিছু আসে যায় না, কার্য্যতঃ ব্যষ্টি সমষ্টির ধর্ম্ম অনুসারেই চলিয়াছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত পথ নাই। এক চেতনা বা এক মন কি রকম ভাবে একটা দলের প্রতি ব্যক্তির মধ্য দিয়া কাজ করে তাহা জনতার ভীড়ের হাটের হুজুগের কার্য্যকলাপ দেখিলেই বুঝিতে পারি। তা ছাড়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার একটি বড় সুন্দর প্রমাণ যোগাড় করিয়াছে। দেখা যায়, কোন পালের একটি ঘোড়াকে কোন বিশেষ একটা বিদ্যা বা কৌশল শিখাইয়া দিলে, অন্যান্য সব ঘোড়া খুব সহজে কেমন আপনা হইতেই সেটি পরে শিখিয়া ফেলে। আর এ জন্যে পালের জন্তুদিগকে একসঙ্গে একই জায়গায় থাকিতে হইবে এমনও কোন প্রয়োজন নাই; ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকিলেও ফল প্রায় একই হয়, বড় জোর অল্প সময়ের জন্য একসাথে রাখিলেই চলে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আজকাল বেশ জোরের সহিত বলা হইতেছে যে, সমষ্টি বাঁধিলেই তাহার জাগে চেতনা ও শক্তি লইয়া একটা পৃথক সত্তা; অথবা মানুষ যে দল বাঁধে, সমাজ গড়ে তাহার কারণই হইতেছে এই রকম একটা সমষ্টিগত জাগ্রত সত্তার চাপ। এই সমষ্টিরও আছে আবার নানা স্তর আর নানা মূর্ত্তি। সমগ্র মানবজাতি লইয়া যে সমষ্টি তাহার আছে এই রকম একটা সত্তা। "কম্‌ৎ"এর Religion of Humanity মাঝে কবি-কল্পনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, আজ আবার তাহাকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়া লোকে সত্য বলিয়াই মানিবার উপক্রম করিয়াছে। মানবজাতি বলিয়া একটা জীবন্ত সত্তা আছে—তাহার আছে একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, একটা চিন্ময় শক্তি প্রত্যেক মানুষকে ধরিয়া ধরিয়া যে কাজ করিতেছে, মোটের উপর সমস্ত মানুষকে লইয়া চলিয়াছে একটা বিশেষ সাধনা, একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে। তার পর মানবজাতির মধ্যে আছে যে আবার দেশ-ভেদ, প্রত্যেক দেশেরও আছে সেই রকম একটা অন্তরাত্মা, একটা অন্তর্যামী পুরুষ। ম্যাটসিনীর উপলব্ধিও ভাবুকের ভাব-প্রবণতা নয়, তাহা ব্যষ্টিরই সাক্ষাৎ দৃষ্টি। এমন কি দেশের মধ্যেও যে নানা সংঘ, মণ্ডলী, সমবায়, সমিতি সহজেই গড়িয়া উঠে তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে একটা অখণ্ড সজীব সত্তা (Personality)। আজকাল সমষ্টি-তন্ত্রের (socialism) সব চেয়ে আধুনিক যে সব পরিণতি দেখিতেছি, তাহাদের সকলেরই মূলমন্ত্র হইতেছে দলের ব্যক্তিত্ব* (group-persons).

সুতরাং মোটের উপর দাঁড়াইল এই যে, প্রত্যেক ব্যষ্টির যেমন আছে ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আত্মা বা অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামী পুরুষ, ঠিক সেই রকম সকল প্রকার সমষ্টিরও আছে আপন আপন ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আত্মা বা অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামী পুরুষ। এখন একটি প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে। তবে কি Individual soul বা person যে ধরণের যে স্তরের সত্য, Group-soul বা Group-personও ঠিক সেই ধরণের সেই স্তরের সত্য? উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। Group-soul তৈয়ারী করা জিনিষ সুতরাং কৃত্রিম, individual soulরা মিলিয়া তাহাকে তৈয়ার করিয়াছে। Individual soul তৈয়ার করা জিনিষ নয়, সেটা পাওয়া জিনিষ, স্বাভাবিক, নৈসর্গিক, শাশ্বত, সনাতন; সমষ্টি কিন্তু আজ নাই কাল আছে, পরশু হয়ত থাকিবে না, নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। কলেজ বা "ট্রেড ইউনিয়নে"র কথা ছাড়িয়া দিলাম, একটা দেশের কথাই ধার না কেন; ভারতবর্ষ বলিয়া এক কালে কিছুই ছিল না, ভারতবর্ষের ভূখণ্ডও ছিল না, ভারতবাসীও ছিল না, ভূখণ্ড সৃষ্ট হইলে অনেক পরে মানুষ আসিয়াছে, মানুষ আসিলেও তাহাদের মধ্যে লেনা-দেনা হইলেও সে সমষ্টিগত চেতনা গড়ে নাই, সেটা অনেক পরের কথা; ভবিষ্যতেও এই সমষ্টি যে চুর চুর হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে না, ধ্বংস পাইবে না তাহারই ঠিক কি? পক্ষান্তরে, জীবাত্মা ব্যষ্টি-পুরুষ ত—নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। কিন্তু এ কথার অর্থ কি? মানুষ, জীবও কি পৃথিবীতে চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকিবে কি? বিজ্ঞান ত সে কথা স্পষ্টাক্ষরে না বলিতেছে। যদি বল জীব-আত্মা ছিল ও থাকিবে এক ভাবে না এক ভাবে প্রকাশে না হউক, অপ্রকাশে সেই অনন্ত চেতনার সেই মহা-সত্তার মধ্যে; আর প্রকাশেও মানুষ রূপে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধরিতে পারে আর একটা বিগ্রহ। ঠিক কথা, কিন্তু সমষ্টি-আত্মার সম্বন্ধেও সেই একই সত্য প্রযোজ্য। জীবাত্মা ক্রমবিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে আকার বদলাইয়া বদলাইয়া আসিতেছে, তবুও জীবাত্মা জীবাত্মাই আছে; সেই রকম সমষ্টি-আত্মার ক্রমে রূপ বদলাইয়া বদলাইয়া আসিতেছে; নেশন রূপ এক সময় ছিল না, ছিল গোষ্ঠী কুল (clan, tribe) তাহারও আগে ছিল পরিবার—ব্যষ্টি-আত্মার মতই সমষ্টি-আত্মার অসদ্ভাব হয় নাই, কখন হইবেও

* "There is a college mind, just as there is a Trade Union mind, or even a "public mind" of the whole community; and we are all conscious of such a mind as something that exists in and along with the separate minds of the members, and over and above any sum of those minds created by mere addition."

—Political Thought in England, Vol. II. Home University.

না। আর সমষ্টি যদি ধ্বংস পায় তার অর্থ জীবাত্মার মত তাহাও পর-ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। অধিকন্তু, কোন বিশেষ সমষ্টি—যেমন কোন বিশেষ দেশ—চিরদিনের নয়, বিশেষ ব্যক্তিও সেই হিসাবেই চিরদিনের নয়। প্লেটো আজ নাই, কিন্তু প্লেটোর প্রভাব (spirit) আছে ; সেই একম গ্রীস নাই কিন্তু গ্রীসের প্রভাব আছে। যদি পুনর্জন্ম মানি ও বলি প্লেটো আর একটি মানুষ হইয়া আজ জগতে আছেন, সেই রকম বলিতে পারি না কি গ্রীসের অন্তরাত্মাও অন্যভাবে অন্যরূপে আজও বর্ত্তমান ? প্লেটোর আত্মা যে হিসাবে নিত্য সনাতন,প্লেটোর ব্যক্তিত্ব (personality) সে হিসাবে নিত্য সনাতন নয় ; তুলনায় আমরা বলিতে পারি না কি গ্রীসের ব্যক্তিত্ব (personality) লয় পাইলেও, তাহার আত্মাটি আছেই ? ফলতঃ, জীবের জন্ম মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধে গীতা যে বলিয়াছেন—

> অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
> অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

সমষ্টির জন্ম, মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে।

তার পর, ব্যক্তি হইতেছে স্বাভাবিক মুখ্য আদি বস্তু, আর সমষ্টি হইতেছে কৃত্রিম গৌণ ও পরবর্ত্তী ; ব্যক্তিই গোড়ায় সমষ্টিকে গড়িয়াছে, সমষ্টি যদি ব্যক্তিকে গড়িয়া থাকে তবে তাহা শেষে—এ সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, সমষ্টি-বিশেষের গোড়া পত্তনের দিন ও ক্ষণ আবিষ্কার করা গেলেও, সমষ্টি জিনিষটার উৎপত্তি কবে হইল তাহা ব্যক্তির উৎপত্তি নির্ণয় করার মতই দুঃসাধ্য। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সংস্পর্শে সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে, সত্য কথা ; কিন্তু সংস্পর্শ আদৌ আরম্ভ হইল কবে ? ফলতঃ ব্যষ্টি সমাজের ঐতিহাসিক কারণ ততখানি নয়, যতখানি ওটি হইতেছে একটা সিদ্ধান্তের পূর্ব্বপক্ষ (logical antecedent)। ব্যষ্টি সমষ্টিকে তৈয়ার বা সৃষ্টি করিয়াছে, এক দিক দিয়া দেখিলে এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে আমরা বলিতে পারি, ব্যষ্টি সমষ্টিকে তৈয়ার বা সৃষ্টি করে নাই, সমষ্টি জিনিষটা পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহার প্রকাশের প্রণালী ফুটাইয়া দিয়াছে ব্যষ্টি ; অথবা, সমষ্টি জিনিষটা যেন বিদেহী, সূক্ষ্ম অবয়বাত্মক, ব্যষ্টির মধ্য দিয়া ব্যষ্টির স্পর্শে তাহা জাগ্রত শরীর স্থূল-দেহ পাইয়াছে। সমষ্টি যে কৃত্রিম তাহা নয়, ব্যষ্টির মতই তাহা স্বাভাবিক।

তবে এটা সত্য যে ব্যবহারিক জগতে ব্যষ্টির উপরই আমাদিগকে বেশী জোর দিতে হয়, কারণ ব্যষ্টি এমন একটা জিনিষ যাহাকে সহজে ধরা ছোঁয়া চলে ; ব্যষ্টিকে ধরা ছোঁয়া সহজে চলে, তাহার উপর বেশী জোর দিতে হয় আবার ঠিক এই জন্যই যে ব্যষ্টি হইতেছে সমষ্টিরই মুখপাত্র, ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক বা শত্রুভাবাপন্ন নয়, উভয়ে একই জিনিষের দুই দিক—একটি স্থূল আর একটি সূক্ষ্ম, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর একটি অন্তরগ্রাহ্য, একটি কেন্দ্র আর একটি সেই কেন্দ্রকে ধরিয়া টানা হইয়াছে অথবা কেন্দ্রের চারিদিকে আছে যে বৃত্ত। সমষ্টিকে ধরিতে গেলে ব্যষ্টির হাত দিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মজীবনের এই লেনা-দেনার দিক দিয়া দেখিলে আমরা ব্যষ্টিকে মুখ্য প্রথম আর সমষ্টি গৌণ অপর জিনিষ বলিতে পারি, কিন্তু সেটা আমার বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গীর কথা, আসল সত্যের কিছু ইতর বিশেষ তাহাতে হয় না। সমান ভাবে দেখিলে দুই-ই মুখ্য, দুই-ই প্রথম।

আধুনিক যুগের লক্ষ্য ও সাধনা ব্যষ্টির মধ্যে আছে যে সমষ্টির চেতনা তাহাকে জাগাইয়া তাহার সহিত এক হইয়া তবে ব্যষ্টি নিজ নিজ জীবন চালাইয়া লইবে। ইহাতে ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব যে কিছু খর্ব্ব হইবে এমন কোন কথা নাই। ফলতঃ, আমরা যদি সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা একটু করি, তবে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে গোড়ায় মানুষ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের একটা সহজ সম্মিলন ও সামঞ্জস্য দিয়াই সমাজকে চালাইয়াছে। আদি ও আদিম সমাজে সমষ্টির প্রেরণায় ও প্রয়োজনে ওতপ্রোত হইয়াই ব্যষ্টি তাহার নিজের প্রেরণা ও প্রয়োজনের সার্থকতা পাইয়াছে। তবে সেটি হইতেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক খেলার ফল। মানুষের মধ্যে তখন সমষ্টির চেতনা যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, মানুষ যে সজ্ঞানে সমষ্টির সার্থকতার মধ্যে নিজের ব্যষ্টিগত সার্থকতা পাইয়াছে বা নিজের ব্যষ্টিগত সার্থকতা সমষ্টির সার্থকতার

মধ্যে ফলাইয়া ধরিয়াছে, তাহা নয়। মানুষ চলিয়াছে স্বভাবের সহজ সংস্কারের বশে, প্রকৃতি তাহাকে যে ভাবে যে পথে লইয়া গিয়াছে—তাহাতেই আসিয়াছে এই নৈসর্গিক সম্মিলন ও সামঞ্জস্য। সমাজে ব্যষ্টি স্বাতন্ত্র্য, সমাজ হইতে আলাদা নিজের একটা সত্তা ও সার্থকতা মানুষ চাহিয়াছে পরে, যখন জীবন শুধু আদি ও আদিমস্তরে শুধু গ্রাসাচ্ছাদন ও তদনুযায়ী প্রতিষ্ঠান ও শৃঙ্খলার মধ্যে আর থাকিতে চাহে নাই, যখন সে চাহিয়াছে বৃহত্তর উন্নততর জীবন, প্রাণের প্রেরণায় না চলিয়া যখন সে চলিতে চাহিয়াছে জ্ঞানের বুদ্ধির বিচারের আলোকে। একান্ত ব্যষ্টিবাদ অথবা একান্ত সমষ্টিবাদ অর্থাৎ ব্যষ্টির ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হইতেছে এই যুগের কথা। জীবনকে যখন শুধু চালিয়া যাইতে চাই না, কিন্তু চালাইতে চাই সজাগ বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা, কর্ত্তৃত্ববোধের দ্বারা, প্রকৃতির যন্ত্র মাত্র হইয়া যখন আর তৃপ্তি হয় না, মনে জাগে প্রকৃতির প্রভু হইয়া তাহাকে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা, তখন প্রথম ফুটিয়া উঠে একটা ভেদ, একটা অসামঞ্জস্য—কর্ত্তৃত্ববোধকে বাড়াইতে চাই, হয় ব্যষ্টিকে সমষ্টির বিরুদ্ধে লাগাইয়া সমষ্টিকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়া আর না হয় সমষ্টিকেই বাড়াইয়া ইচ্ছামত কল্পনামত বিচারমত এই সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত করিয়া। কিন্তু মাঝ-পথের এই চেষ্টা হইতেছে সেই আদি ও আদিমস্তরের সহজ সম্মিলন ও সামঞ্জস্যকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য—তবে আগের সম্মিলন ও সামঞ্জস্য ছিল অজ্ঞানের বা অর্দ্ধজ্ঞানের সংস্কারের সঙ্কীর্ণ জিনিষ আর এখন তাহা হইবে সজ্ঞানের নিবিড় বৃহৎ পূর্ণ। প্রথমে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য (thesis) ছিল তাহা ছিল Instinctএর, মাঝে যে ভেদ (antithesis) হইল তাহা Reasonএর, পরে যে সামঞ্জস্য (synthesis) হইবে তাহা হইতেছে Intuitionএর দিব্য দৃষ্টির।

সমাজ শুধু একটা ব্যবস্থা নয়, কতকগুলি আইন কানুন নয়, একটা যন্ত্রও নয়—সমাজ হইতেছে একটা সজীব পুরুষ। এই সমষ্টি-পুরুষের প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ব্যষ্টি-পুরুষের অন্তরাত্মায় মণিকোটায়; ব্যষ্টি পুরুষ সমষ্টি পুরুষের অস্তিত্ব বুদ্ধিতে অস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু জীবনে কর্ম্মে তাহার হাত এড়াইতে পারে না। তাই বুঝিতে হইবে উভয়ের মধ্যে আছে একটা নিবিড় সম্বন্ধ, একটা অটুট সামঞ্জস্য। নিজের একান্ত ব্যষ্টিগত সত্তাটুকু ব্যষ্টির আসল সত্তার একটি অংশ মাত্র, অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত; অহং বুদ্ধি জীবের স্বারাজ্য পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেছে মাত্র। ব্যষ্টির চেতনা যদি আরও উপরে আরও গভীরে বসিয়া যায়, তবে সে দেখে তাহার অহং আর আর অহংএর সহিত ওতপ্রোতঃ মিশিয়া আছে, সব অহং মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে একটা বিরাট পুরুষের মধ্যে—ব্যষ্টির জীবের তখনই হয় সাম্রাজ্য সিদ্ধি, ব্যষ্টিগত স্বধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়া সে তখন ফলাইয়া ফুটাইয়া তোলে সমষ্টিগত একটা স্বধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য।

সমষ্টির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কেবল সর্ব্ব সাধারণ নয়, ব্যষ্টির ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুসারে তাহা ছোট বড় নানা কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে একটা বিশেষ ধর্ম্ম বিশেষ কর্ম্ম খেলাইয়া তুলিয়াছে। মানুষ যেমন মানুষের সাথে শুধু একভাবের—মানুষ-ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করে না, পিতা মাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু জনে জনে পৃথক পৃথক সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেই রকম মানুষ যে দল বাঁধে তাহাও নানা রকম সমবেত চেতনা ও সত্তা ফুটাইয়া ধরিবার জন্য। মানব-জাতিই (humanity) কেবল সমষ্টিগত সত্তা নয়, দেশ সমাজ পরিবার আরও কত কত রকমের সমষ্টি-সত্তা আছে। তবে কথা এই, ভিন্ন ভিন্ন যুগে অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি-সত্তার লীলা হইতে পারে; সেই সেই সমষ্টি সত্তাই কৃত্রিম হইয়া পড়ে যখন তাহার লীলা কাল ফুরাইয়া গিয়াছে, মানুষ শুধু তাহাকে ধরিয়া থাকিতে চায় অভ্যাসের বশে, আইন কানুনের জোর জবরদস্তির সহায়ে—যেন প্রয়োজন সেই সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া নূতন যে সমষ্টি আবির্ভূত হইতে চাহিতেছে তাহার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, বস্তুতঃ নূতন সমষ্টি যে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে তাহা ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখিয়াই ধরা যায়। ব্যষ্টিগত পুরুষের বিবর্ত্তনের সাথে সাথে সমষ্টিগত পুরুষেরও রূপভেদ হইতেছে, অথবা অন্য দিক দিয়া দেখিলে বলিব, সমষ্টিগত পুরুষের প্রয়োজনের সাথে সাথে ব্যষ্টিগত পুরুষেরও বিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তবে

ব্যষ্টিগত পরিবর্ত্তনটা হয় ক্ষিপ্র, তাহা আগে সহজে চোখে পড়ে; আর সমষ্টিগত পরিবর্ত্তনটা হয় কিছু ধীরে, পরে, তাই ব্যষ্টি যেখানে অনেকখানি আগাইয়া দিয়াছে, দেখা যায়, সমষ্টি তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। এই অসামঞ্জস্যটা যখন অতিমাত্র বেশী হইয়া পড়ে তখনই আসে বিপ্লবের ওলট পালটের যুগ।

স্বাভাবিক নৈসর্গিক জন-সংহতি বা সমষ্টি ছাড়া কৃত্রিম অস্বাভাবিক জনসংহতি বা সমষ্টিও যে হইতে পারে না তাহা নহে। যে দল গড়া হয় কেবল বিধিব্যবস্থা আইন কানুন দিয়া, কেবল বাহিরের একটা চাপের ফলে, যাহার ভিতরে একটা একাত্মতা নাই, মানুষের অন্তরাত্মায় যাহার প্রতিষ্ঠা নাই, সেই দলই কৃত্রিম অস্বাভাবিক ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণেকের নিমিত্ত, বাহিরের চাপেরই ফলে সেই দলে একটা একত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে, একটা জীবনস্পন্দনই দেখা যাইতে পারে কিন্তু সে একত্বে পৃথক সত্তা জন্মায় না, তাহা নির্ভর করে একান্ত সেই চাপেরই উপর, চাপ সরাইবামাত্র তাহা বসিয়া পড়ে, আর সে জীবন-স্পন্দন প্রকৃত প্রাণের খেলা নয় তাহা হইতেছে জড়ের সাড়া বা প্রতিক্রিয়া মাত্র। মানুষ যখন কেবল বিচার বুদ্ধি দিয়া চলে, তখনই সে এই রকম অনেক কৃত্রিম সমষ্টি গঠন করে, যাহার সহিত জীবনের একটা নাড়ীর সহজ অব্যর্থ সংযোগ হয় না। কিন্তু তর্ক বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া সে যখন উঠিয়া দাঁড়ায় জ্ঞানের দৃষ্টির স্তরে—অন্তরাত্মার সত্যে ও ঋতে—তখন সে একদিকে যেমন পায় নিজের শাশ্বত সনাতন ব্যষ্টি সত্তা, অন্য দিকে তেমনি চক্রাকারে ফুটাইয়া তোলে শাশ্বত সনাতন সমষ্টি সত্তা—একদিকে স্বারাজ্য আর একদিকে সাম্রাজ্য।

প্রীতির প্রভাতী

[শ্রীসত্যরঞ্জন বসু]

'এই যে আমি'—বলিয়া অনেক কষ্টে বেচারা ঘাড় উঁচু করিয়া পেছন দিকে চাহিতে চেষ্টা করল।

শরতের সন্ধ্যা! ঘরের ভিতরে অন্ধকার জমিয়া আসিতেছে অথচ বাইরে তখনও সূর্য্যের শেষ আভায় পশ্চিমাকাশ উজ্জ্বল! অন্তরের সহিত বাহিরের যে মিল রক্ষা করিয়া চলা তা' প্রীতির ভাগ্যে অনেক কাল হয় নাই! কিন্তু আজ এই শরত সন্ধ্যায় সে সেটা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাই একটু জোর করিয়া আরাম-কেদারার উপর ভর দিয়া উঠিতেছিল।

অশোকা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'না না, তুমি অমন করে হঠাৎ উঠলে যে, পড়ে যাবে।—আমই তোমার কাছে আসছি,—ব্যস্ত হয়োনা!'

এতক্ষণ সে তার নিজের অতীত ভুলিয়া গিয়াছিল—সে নিজকে নূতন মানুষ ভাবিয়া নূতন ভাবে নিজকে জাগাইয়া তুলিতেছিল—কিন্তু হঠাৎ বাধা পাইয়া আবার চেয়ারের মধ্যে নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া রহিল। সে জানিত না যে জীবনের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহা প্রধান জিনিষ তা তার এক রকম শেষ হইতে চলিয়াছে। সে জানিত না যে প্রতিদিনকার সুন্দর যাহা তার মধ্যে তার অংশ গ্রহণ করার শক্তি ক্রমশঃ সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে জানিত না যে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে নবীনতা যাহা জীবনকে নূতন পথ দেখায় তা তার আর পাওয়ার সময় নেই!

কিন্তু মন মানে কই? সে জানে যে তার জীবনও যে বাইরে টবের ভিতরকার গোলাপটির মত নূতন বাতাসে, নূতন স্পর্শে নূতন দল মেলিয়া পৃথিবীর জীবের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। এই অনুভূতিই যে তার ভিতর সব চেয়ে প্রধান! তাই সে বাইরের দিকে আজ অমন নিশ্চেষ্ট

তাবে চাহিয়া রহিয়াছে। বাহিরে কে পাড়ায় বাঁশী বাজাইতেছে—সে ভাবিতেছে ঐ বাঁশীই তার আপন জনের ডাক্। তার সঙ্গে সুর মিলাইতে আজ সে ব্যস্ত।

*   *   *   *

অশোকার কথায় কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া অশোকা খুব কাছে আসিয়া খুব আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—'আমি কি তোমায় কোনও রকমে কষ্ট দিলাম?'

সে কেবল বলিল—'ওই শোন বাঁশী কেমন গাইছে—আমি কি এখন নিশ্চল ভাবে আর থাক্‌তে পারি? মানুষেব যা ক'ববাব কিম্বা বুঝবার থাকে সে কবে যায়, কিন্তু যখন ভিতবের সুর বাহিবেব টানা সুরেব সহিত মিশতে চায় তখন কি কেহ ঠিক থাকৃতে পাবে? এই যে শবত সন্ধ্যা, আকাশের দিকে চেয়ে দেখ কেমন আভা—অথচ মাঝে মাঝে সাদামেঘেব খেলায় আমাদেব কেমন পথ ভুলিয়ে দূবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই মেঘেব খেলা দেখে আমাব এই জরা জীর্ণ শীর্ণ দেহেও নবীনতার যে স্পন্দন এসেছে তাকে বোধ করবাব ক্ষমতা আমাব কই? চেষ্টা কবছি মানুষেব মত সহ্য কবতে, কিন্তু শবতের পাগলা হাওয়া যখন পাকা ধানেব ক্ষেতেব উপব দিয়ে নাচ্‌তে থাকে তখন ধানেব শীষ্‌গুলিকে আপনা থেকেই নোয়াতে হয়। আমারও তাই, তাই আমাকে নুইয়ে ফেল্‌ছে—আমাকে ওবা টেনে নিচ্ছে, আমি নূতন জীবনেব পথে—'

হঠাৎ সে চুপ কবিয়া গেল।

চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিবাজ করিতেছে। ঘরের ভিতর ঘড়িব শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। নিস্তব্ধতাই যেন অশোকাকে বেশী করিয়া পাইয়া বসিল! প্রীতি আবার বলিতে আবম্ভ করিল—'আমাব কথা, আমার জীবন—তা সবই আমার কিন্তু—এব ভিতর পৃথিবীর কিম্বা সংসারের কিছুই নেই। তাই তুমি কেন আমাকে ব্যথা দেবে? আমি নিজেই ব্যথার আগার।'

*   *   *

ছোটবেলা হইতে সমস্ত প্রকাব সুখাতিশয্যেব মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও যখন জীবনটা ভাববাগী হইয়া উঠিল তখন হইতেই প্রীতির সাংসারিক জীবনের উপর একটা অশ্রদ্ধা এবং অসম্বদ্ধ রকম ঘৃণা আসিয়া হাজির হইল। অশোকা ছিল তাহার সঙ্গী—সে ছিল তাহার আপনার জন। বয়সে যদিও ছোট তথাপি অশোকার ভিতরে এমন একটা জিনিষ ছিল যা' প্রীতিব প্রাণে খুব নিজের বলিয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু সংসার এবং জীবনের গতিতে দুই জনের দেখা বৎসরেব মধ্যে খুবই কম ঘটিত। তাই আজ বোগযন্ত্রণায় অস্থিব হইয়াও প্রীতি আপনার মনেব ভিতরকাব সব ঢালিয়া দিল ঐ অশোকার নীরব সহানুভূতিতে। সে সহ্য কবিত নীববতায়—সে কথায় বলিত কম, কিন্তু অনুভব করিত অনেক। কিন্তু আজিকার এই সন্ধ্যায় অশোকা নিজেকে সামলাইতে পারিল না। সে বিছানাব উপব মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সন্ধ্যা উতরিয়া গিয়াছে। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব ছিল। ঝি আসিয়া কখন যে আলো জ্বালিয়া কমাইয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও জানা ছিল না। কিন্তু প্রীতি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'অশোকা তুমিও কি আজ আমাকে ছাড়বাব জন্য মন বাঁধছো? আমি যে যার ছিলাম—না না আমি তো কারও নয়—।' প্রীতি নীরব! অশোকা আস্তে আস্তে বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া সুমুখেব দবজাটা বন্ধ কবিয়া দিয়া প্রীতিব কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেব ফোঁপাইতে লাগিল।

*   *   *

ক্ষীণ আলোকে যাহা ফুটিয়া উঠিল তাহা উভয়েরই স্পষ্ট অনুভব হইল। প্রীতিব বুকেব ভিতর হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহিব হইয়া সমগ্র নিস্তব্ধতাকে যেন সজীব করিয়া তুলিল। দেওয়ালেব গায়ে একখানা ছবি টাঙানো ছিল - ছবিখানার চারিদিকে নিখুঁত ছুচেব কাজ করা! ছবিখানাব দিকে আকাঙ্ক্ষার একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবাব চুপ করিয়া চেয়ারেব ভিতব বসিয়া পড়িল। অশোকা তবুও নিশ্চল। শুধু একবার বলিল, 'প্রীতি দিদি। ওষুধটুকু খেয়ে নাও।'—প্রীতি পাশেব টেবিলের উপর কি যেন হাতড়াইয়া খুঁজিতেছিল। কিছুক্ষণ বাদে বলিল—'আমাব ওষুধ খেয়ে কোনও ফল হবে না। তুমি

তা জান ! তবে কেন বৃথা আমার কষ্ট দাও !'—অশোকার গণ্ড বাহিয়া নীরবে কয়েক ফোঁটা জল পড়িল !

* * *

রাত্রিতে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে। অশোকা শিয়রে বসিয়া কতই না কি ভাবিতেছে ! জীবনটা ঘোর নিরাশার বোঝা লইয়া কাটিয়া গেল—তার প্রভাত হইবে কি করিয়া !

অনেক কথাই প্রলাপের ভিতর বলিয়াছিল, কিন্তু প্রাণে বাজিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল সেই অশোকাই ! সমস্ত রাত্রি সেই একভাবেই কাটিয়া গেল !

ভোর হইতেছে ! পাশের বাগানের ভিতর হইতে চাঁপা ফুলের গন্ধ আসিয়া ঘরকে আমোদিত করিয়াছে ! 'আমি চম্পারি সৌরভ' বলিয়া যে ফুলটী ঘাড় বাহির করিয়া জানালার উপর দিয়া উঁকি মারিতে প্রয়াস পাইতেছিল তাহাকে হঠাৎ কে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিল !

চারিদিকে বেশ আলো ফুটিয়াছে ! মানুষের আনাগোনা তখনও আরম্ভ হয় নাই ! অশোকার একটু তন্দ্রা আসিতেছিল—হঠাৎ প্রীতির কথায় চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল সে এলাইয়া পড়িয়াছে ! আর বলিতেছে, এই তো আমার 'জীবন প্রভাতী' !

* * *

বুকের ভিতরে ছিল তার একখানা চিঠি ! সেখানা অমরের ! অশোকার দাদা ! সে চলিয়া গিয়াছে আজ অনেক দিন।

চিরদিন

জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন ;—
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে ;—শুভ চেষ্টা যত
কোন বাধা নাহি মানে কোন শক্তি হতে ;
আত্মা যেন দিবারাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমা পানে
সর্ব্ব বন্ধ টুটি' ! সদা লেখা থাকে প্রাণে
"তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার !"

মন্থন-দণ্ড মন্দার পর্ব্বত

[শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার]

কথিত আছে, সমুদ্র-মন্থন-কালে মন্দার পর্ব্বত মন্থন দণ্ড হইয়াছিল। ১৩২১ সালের "ভারতবর্ষে"র কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী M. A. মহাশয় "সমুদ্র মন্থনের ঐতিহাসিক সত্তা" বিশদ ভাবে আলোচনা পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, এটী বাণিজ্য-ব্যাপার। উপসংহারে তিনি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৫২ অধ্যায় হইতে ২১।২২।২৩।২৪ শ্লোক তুলিয়া দেখাইতেছেন যে, মলয়দ্বীপে "মন্দর" নামে একটি পর্ব্বত আছে ও অনুমান করিতেছেন যে, ইউরোপীয় বণিকরা যেমন ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে মূল কার্য্যস্থান (মসলা বাণিজ্যের জন্য) নির্ব্বাচন করেন, তেমনি তাঁহারা মলয়দ্বীপকে মূল কার্য্যস্থল ও মন্দর পর্ব্বতকে প্রধান লক্ষ্যস্থান করিয়া ভারত সমুদ্রের সকল দিকে বাণিজ্য কর্ম্ম চালাইতেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, এই অনুমান ঠিক নহে। ভাগলপুরের নিকটস্থ "মন্দার পর্ব্বত" সমুদ্র মন্থনে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুজনসাধারণের বহু কালের বিশ্বাস। ইহার স্বপক্ষে আমাদের যুক্তি এইরূপ :—

(১) জন সাধারণের বিশ্বাস, এই "মন্দার"ই সেই পুরাণোক্ত মন্থন দণ্ড। মন্দারের নির্দ্দেশ লইয়া জনসাধারণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। বেহুলা-স্থান ও এইরূপ অনেক স্থান লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যেরূপ টানাটানি করে, মন্থন-দণ্ড মন্দারের নির্দ্দেশ লইয়া সেরূপ কোন গোলযোগ দেখি না। এখন যদি দেখি যে প্রতিষ্ঠিত তথ্য ইহার বিরুদ্ধে যাইতেছে না বরং অনুকূলে রহিয়াছে, তাহা হইলে ইহাও একটী প্রমাণ স্বরূপ দাঁড়াইবে।

(২) তাঁহার মতে, মন্দার পর্ব্বত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের মন্থন-দণ্ড বা কেন্দ্রস্থল ছিল। সুতরাং 'মন্দার' ভারতের বাহিরে অবস্থিত না হইয়া ব: ইহার মধ্যেও সমুদ্রতটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করাই যুক্তি-সঙ্গত। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গণনায় হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। শুদ্ধ তটভাগ কেন, বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে মন্দারও যে এককালে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সমগ্র বাংলাদেশ ও বিহারের অধিকাংশ পলিদ্বারা গঠিত ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। "আনুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র রাজমহল পাহাড়ের নিকটে ছিল, তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়" (Census Report of India 1901, Vol. VII. Part I. History of Calcutta by Mr. A. K. Roy.) (পল্লীবাণী)।

(৩) মন্দার একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত বলিয়া, তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মেগাস্থিনিসের ভারত বৃত্তান্তে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার চারি পার্শ্বে যে একটী সহর বর্ত্তমান ছিল তাহার চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। যথা—"For a mile or two around its base are to be seen numerous tanks, several old buildings, some stone figures, and a few large wells—which attest the remains of a great city that has long since ceased to exist. (Statistical account of Bhagalpur District, পৃঃ ৯৬).

(৪) শীতলবাবু দেখাইয়াছেন, "সুর" অর্থাৎ আর্য্যদের হাতে অন্তর্বাণিজ্য এবং "অসুর" অর্থাৎ আর্য্যেতর দ্রাবিড়দের হাতে বহির্বাণিজ্য ছিল। এখন দেখা যাউক, এদিকে দ্রাবিড়েরা কোন কালে বাস করিত কিনা। প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই যে বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী ছিল, তাহা পূজনীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশদ

ভাবে দেখাইয়াছেন (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩)। এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, মন্দার পর্ব্বতের চারিপার্শ্বে দ্রাবিড়েরা নিঃসন্দেহে বাস করিত ও তাহাদের সহিত এই মন্দার পর্ব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

"বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় অতি পূর্ব্বকালে পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতি বাস করিত; ইহা এক প্রকার অবধারিত" (৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস", পৃঃ ৫)। এই পাহাড়িয়ারা দ্রাবিড় জাতীয়। বঙ্কিমবাবু রাজমহলের পাহাড়িয়াদের দ্রাবিড়বংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (বাঙ্গালীর উৎপত্তি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। লেৎব্রিজ সাহেব লিখিয়াছেন যে "রাজমহলের পাহাড়িয়ারা দ্রাবিড়িয়ান্ বিভাগের অন্তর্গত" (History and Geography of Bengal, পৃঃ ৯)। রাজমহলের পাহাড়িয়াদের পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব-ঘটিত বিশ্বাস ও উপাখ্যান 'মন্দার' পর্ব্বতকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে,—"সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীর অধিকাংশ জলময় ছিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ অবতরণ করিয়া মন্দার নামক পর্ব্বতে ক্রীড়াদি করিতেন। এককালে ভগবান সপ্ত ভ্রাতাকে মন্দার পর্ব্বতে পাঠাইয়া দেন। ঐ সপ্ত ভ্রাতা মন্দারে বসিয়া, ভবিষ্যৎ বিবাদ নিবারণ-কল্পে স্ব স্ব বাসোপযোগী বিভিন্ন স্থান মনোনয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া একটী ভোজের ব্যবস্থা করিল এবং স্থির হইল, যে ভ্রাতা যেরূপ খাদ্য বাছিয়া লইবে সে সেই দ্রব্য-সুলভ স্থানে বাস করিবে। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসুস্থতাবশতঃ স্থানান্তরে যাইতে অক্ষম হওয়ায়, অন্য ভ্রাতারা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে স্ব স্ব মনোনীত দ্রব্যের কিয়দংশ দিয়াছিল। তাই সে পবিত্র অপবিত্র সর্ব্ববিধ খাদ্য গ্রহণ করিয়া মন্দার পর্ব্বতেই রহিয়া গেল। পাহাড়িয়ারা এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশধর (পার্ব্বত্য কাহিনী, পৃঃ ৮)। এখন ভাবিবার বিষয় এই যে, তাহারা এক্ষণে সুবিস্তৃত রাজমহলের পর্ব্বতমালায় বসবাস করিতেছে অথচ তাহাদের আদিযুগ-সম্পর্কীয় উপাখ্যান ক্ষুদ্র মন্দার পর্ব্বতকে অবলম্বন করিয়াছে ও তাহাদের বিশ্বাস যে তাহাদের আদি পিতা মন্দার পর্ব্বতে বাস করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে ইহাই অনুমান করা স্বাভাবিক যে, এই রাজমহলের পাহাড়িয়ারা অতি প্রাচীন কালে মন্দার পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে বাস করিত ও মন্দারের সহিত তাহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

এইরূপ মনে করিবার আরও কারণ দেখাইতেছি। রাজমহলের পর্ব্বতমালা মন্দারের নিকটবর্ত্তী রাজমহলের পাহাড়িয়াদের 'মাল' পাহাড়িয়াও বলে। মেগাস্থিনিস তাহাদের 'মালী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে, মালী জাতি প্রাসী (মগধ ও বেহার) এবং গঙ্গারিডির (নিম্নবঙ্গের) অধিবাসী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাস করিত। গ্রীক পরিব্রাজকের মতে, মালীদের দেশে 'মলিয়স' পর্ব্বত বর্ত্তমান ও ইহার এক সীমা গঙ্গা (মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ, শ্রীরজনীকান্ত গুহ, পৃঃ ৯০-৯১, ১০৬)। সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ক্যানিংহামের মতে, এই মলিয়স্ পর্ব্বত আমাদের আলোচ্য মন্দার পাহাড়। এই মলিয়স পর্ব্বত হইতেই কি ইহারা 'মাল পাহাড়ি' নাম পাইয়াছে ?

(৫) মন্থন রজ্জু দ্রাবিড়-রাজ বাসুকি দাক্ষিণাত্য-বাসী ছিলেন। এখন দেখি, দাক্ষিণাত্যের সহিত মন্দারের কোন প্রাচীন সম্পর্ক সূত্র খুঁজিয়া পাই কি না। Chola coast প্রাচীনকালে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। (V. Smith's History of Ancient India, পৃঃ ৪১৫) চোলারা বঙ্গোপসাগর দিয়া গঙ্গার মোহনাতেও যাতায়াত করিত। চোলারা দ্রাবিড় ছিল। 'Statistical Account of the District of Bhagalpur" নামক পুস্তকে, মন্দার সম্পর্কে এক 'রাজা চোলার' উল্লেখ দেখি (পৃঃ ৯৬ ৯৮)। এই রাজা চোলা কে ? লোকেরা মন্দারস্থিত একটী প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকাকে 'রাজা চোলা' কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কথিত আছে, কাঞ্চিপুর-রাজ চোলার কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। তিনি নানা তীর্থে ঘুরিলেন, কিন্তু রোগমুক্ত হইলেন না। অবশেষে তিনি মন্দারে আসিয়া মনোহর কুণ্ড বা পাপহারিণীতে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইলেন। তদবধি এখানে প্রতি বৎসরে ১৫ দিন ব্যাপী একটী মেলা হয়। তিনি এখানে রাজধানী স্থাপনা করিয়াছিলেন ও

মন্দারের উন্নতি কল্পে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই সুদূর মন্দারে দাক্ষিণাত্যবাসী চোলারাজের কথা কোথা হইতে আসিল? আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দাক্ষিণাত্যের চোলা-রাজন্যবর্গের রাজধানী ছিল—কাঞ্চিপুরে। মন্দারের এই চোলা কাঞ্চিপুররাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

(৬) তিনি বলিয়াছেন, সমুদ্রমন্থনে বিষ্ণুর প্রাধান্য দেখা যায়। মন্দার একটি প্রাচীন ও প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ।

(৭) শীতলবাবু প্রবন্ধের একাংশে লিখিয়াছেন যে, সমুদ্রমন্থনে প্রথমেই তরুলতা, গুল্ম প্রভৃতি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় ও ইতিহাসে ভারতীয় বস্ত্র বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। বস্ত্র বৃক্ষজাত; তাই ভারতীয় সমুদ্র বাণিজ্যের সহিত প্রথম বৃক্ষের সম্বন্ধ মিলিতেছে।

এখন দেখা যাউক, এতদঞ্চলের বস্ত্রবাণিজ্য সুপ্রাচীন কিনা। বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন,—চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় বাংলাদেশে খৃষ্টের ৩১৪ শত বর্ষ পূর্ব্বে রেশমের চাষ খুব হইত। রেশমের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ"। এই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত,—মগধে, সুবর্ণকুড্যে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে ও বাক্সমহলে এবং পৌণ্ড্র দেশে। সুতরাং বাংলা বিহারের বস্ত্রশিল্প সুপ্রাচীন। মন্দার হইতে এই সকল সংগ্রহ করা সহজ। ভাগলপুর জেলা রেশম ও তসরের জন্য বিখ্যাত ছিল ও এখনও আছে।

অর্থ-বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত]

ক্রেডিট বা ধার

১ম অধ্যায়—সংজ্ঞা

ভবিষ্যতের সম্ভাবিত কোন উৎপন্ন সামগ্রী হইতে মূল্য পরিশোধিত হইবে, এই বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের উপরে বর্ত্তমানের কোন নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর স্বত্বাধিকার অন্যের অনুকূলে পরিত্যাগ করাকে ধার বা ধারে বিনিময় বা Credit transaction কহে। যাঁহার অধিকারে কোন পণ্য সামগ্রী আছে, কোন উপায়ে তাহার মূল্য নগদ না পাইয়া ও ভবিষ্যতে পাওয়ার প্রত্যাশায় উহার অধিকার ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে প্ররোচিত করিতে না পারিলে, ধারে বিনিময় কার্য্য হয় না ও হওয়া স্বাভাবিক নহে। যে শক্তি প্রভাবে ক্রেতা বিক্রেতাকে ধারে মাল বিক্রয় করিতে স্বীকৃত ও প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হন, তাহাকে তাহার ঋণশক্তি বা ধারশক্তি কহে। উহা ঋণগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির গুণবোধক শক্তি। এ শক্তি যাঁহার নাই, যিনি অপর কাহাকেও ধারে কোন পণ্য দ্রব্য বা কোন সম্পত্তির অধিকার ছাড়িয়া দিতে সম্মত ও স্বীকৃত করিতে অসমর্থ তাঁহার সে শক্তি আছে বলিয়া কল্পিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে যাঁহার সে শক্তি আছে, তাঁহার পক্ষেও উহা একটা সামান্য ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাবোধক গুণ নহে। পণ্যদ্রব্যের চাহিদার (demandএর) ন্যায় উহা কার্য্যকরী (effective) হওয়া চাই। যাঁহার ঋণ করিবার অবস্থা ও সামর্থ্য আছে, ইচ্ছা করিলেই ঋণ পাইতে পারেন, অথচ সেরূপ কোন চেষ্টা নাই, তাঁহার সে শক্তি কার্য্যকরী নহে বলিয়া উহা আমাদের বিবেচ্য বা সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। যে শক্তি কার্য্যকরী হয় ও হইতেছে, তাহাই বিজ্ঞানের আলোচ্য। যাহার কোন কার্য্যকারিতা বা ব্যবহার নাই, তাহার অস্তিত্ব থাকা না থাকা দুই সমান। তদ্রূপ যাঁহাদের ধারে কোন সামগ্রী লইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা অপর কাহাকেও কোন প্রকার ঋণ

দানে সম্মত করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহাদেরও এ শক্তি আছে বলিয়া বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে যিনি ঋণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ও আকাঙ্ক্ষিত এবং অন্যের উপরেও আয়প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে সেই ঋণ দানে সম্মত করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহার পক্ষেই এই শক্তি আছে বলিয়া স্বীকৃত হয়।

সাধারণতঃ বিনিময় কার্য্য পরিচালন সময়েই ব্যক্তি বিশেষের এই শক্তির প্রকৃত বিকাশ ও প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন যিনি যে পণ্য সামগ্রী বা অপর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে কিম্বা সেবা কি পরিচর্য্যা করিবার জন্য আপনার শ্রম নিয়োগ করিতে প্রস্তাব করেন, তখন যাঁহারা ভবিষ্যতে মূল্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তাঁহাকে সে বস্তুর অধিকার পরিত্যাগ বা শ্রম নিয়োগ করিতে প্রবোচিত ও প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহাদের এই শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কার্য্যক্ষেত্রে ভিন্ন তাহার প্রকৃত কোন অভিব্যক্তি হয় না। ধারে বিনিময় করার সময়েই উহা প্রকট হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান সমাজ ব্যবহার অনুসারে এই ধারের প্রাপ্য মূল্য কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা পরিশোধ করার অভিপ্রায় থাকে। বিনিময়ের সুবিধার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী না দিয়া অর্থ দেওয়ার সর্ত্ত থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে যাহা দেওয়া হয় তাহা ধন, অর্থ নহে। অর্থ দ্বারা ভবিষ্যতের উৎপন্ন সামগ্রী হইতে এই মূল্যের অনির্দ্দিষ্ট সামগ্রী পাওয়ার অধিকার প্রদত্ত হয়। তেমন কেহ ঋণ স্বরূপ নগদ অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রকৃতপক্ষে যাহা পরিগৃহীত হয়, তাহা অর্থ নহে, সেই অর্থের বিনিময়ে যে সকল পণ্য বস্তু বা অপর কোন সম্পত্তি কিম্বা সেবা বা পরিচর্য্যা লাভ করা যায়, তাহা লাভ করিবার অধিকার ঋণ স্বরূপে গৃহীত হয়। কাহারও ধারে মাল লইবার প্রয়োজন বা চাহিদা আছে বলিলে, আমরা কি বুঝিব? যদি কেহ তাঁহার প্রতিবাসী হইতে হাজার মণ পাট ধারে লইতে চান, তবে বুঝিতে হয় যে তাঁহার হাজার মণ পাট ও তৎসঙ্গে তাহার মূল্য পরিমাণ অর্থ এতদুভয়ের যুগপৎ অভাব বর্ত্তমান আছে। লোকের ধারশক্তির প্রভাবে যে চাহিদার অভ্যুদয় হয় তাহা মুখ্যভাবে অর্থের জন্য হয় না, পণ্যদ্রব্য সহ অর্থের জন্য সে টানের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমানে তিনি যে সামগ্রী পাইতে চান এবং তাহার মূল্য স্বরূপে ভবিষ্যতে তাঁহাকে যাহা দিতে হইবে, এই উভয় সামগ্রীরই অভাব বা টান আছে, বুঝা যায়। অর্থ দ্বারা তাহার মূল্য পরিমাণ অনিশ্চিত বস্তুর অধিকার প্রদত্ত হইবে, এই মাত্র বুঝা যায়। অর্থের বিনিময়ে যদৃচ্ছা পণ্য দ্রব্য কি সম্পত্তি বা সেবা লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া, তাহার অধিকারে পরোক্ষভাবে ঐ সকলের উপরেই অধিকার লাভ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ টাকা কর্জ্জ করিয়া বাজার হইতে মালামাল ক্রয় করিয়া আনিলে, বুঝিতে হয় যে ক্রেতা সাক্ষাৎভাবে বিক্রেতার উপরে তাহার ঋণ-শক্তি প্রয়োগ না করিয়া, তৃতীয় ব্যক্তির উপরে সে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেই তৃতীয় ব্যক্তিও ক্রেতার ঋণ শক্তির দায়িত্ব বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। তদ্রূপ কোন ব্যাঙ্কের উপরে টাকা দেওয়ার বরাত দিলে, ক্রেতার ঋণশক্তির দায়িত্ব বিভক্ত ও সম্প্রসারিত হয়; তখন ক্রেতা ও ব্যাঙ্কের যৌথ দায়িত্বে ধারে মাল সহসা পরিত্যক্ত হয়।

ইংরেজী Credit শব্দের ধাত্বর্থের (Credio = I believe) সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ইহার অনুবাদ করিতে হইলে, প্রত্যয়যোগ্যতা বিশ্বস্ততা কিম্বা তাহাদের অনুরূপ অপর আর কোন শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ইংরেজী বিজ্ঞান গ্রন্থে উহা পারিভাষিক ভাবে বিনিময়ের প্রকার ভেদ এবং ঋণকারীর গুণবোধক সম্ভ্রম বা মাতব্বরী উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। "A Credit transaction is one kind of exchange"—Dr. Kenley's Money p. 201. "Credit is protracted exchange, that is to say, exchange which is not complete until a certain period of time has elapsed"—Gide's Prin. of Pol. Economy p. 35। ফলতঃ ধারের কার্য্যে ক্রেতার ঋণশক্তি এবং বিক্রেতার প্রত্যয় বা বিশ্বাস, এই দুই প্রতিযোগী শক্তির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া নিষ্পন্ন হয়। লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়াই ঋণকারীর ধার গ্রহণ করিবার শক্তির

প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থকতা সম্পাদিত হয়। তাহার সততা, স্বচ্ছলতা প্রভৃতি দ্বারা লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবার কারণ থাকার দ্যোতনা করে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে না পারিলে, উহা কার্য্যকরী হয় না। সমাজে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের আর্থিক বিশেষ স্বচ্ছলতা থাকা সত্বেও একমাত্র ব্যবহারের দোষে লোকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যাঁহাদের তেমন কোন আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই, তাঁহারাও ব্যবহারের গুণে সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম লাভ করিতে সমর্থ হন। আর লোকে সমভাবে সকলকে বিশ্বাস করেন না। যিনি যাঁহাকে যে পরিমাণ সামগ্রী ধারে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, তাঁহার নিকট সে ব্যক্তির সেই পরিমাণে credit বা সম্ভ্রম আছে, বলা যায়। বিশ্বাসের আশ্রয়ে এই সম্ভ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রত্যয় দাতায়, গ্রহীতায় নহে। যে কারণেই হউক, বিক্রেতা ক্রেতাকে বিশ্বাস করিলেই ধারের কার্য্য হইতে পারে। তবে ইহা কার্য্যকরী হওয়া চাই। মানসিক বিশ্বাস মাত্র যথেষ্ট নহে। বিশ্বাস করিয়া মালও ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদিকে যেমন ধারেচ্ছু ব্যক্তিকে মহাজন বা বিক্রেতার চিত্তের প্রত্যয় ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আপনার অনুকূলে ধারণ করিতে হয়, তদ্রূপ অন্য পক্ষে মহাজন বা বিক্রেতাকে ধারিকের সততা ও আর্থিক সচ্ছলতা প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়া আপনার প্রত্যয়ের ভিত্তি বা মাতব্বরী স্বরূপে গ্রহণ কিংবা যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করিয়া লওয়া আবশ্যক। যে ভাবেই হউক, বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করিতে না পারিলে, উহা কার্য্যকরী হয় না। বিশ্বাসের ভিত্তি, ঋণপ্রার্থীর সততা ও স্বচ্ছলতা প্রভৃতি প্রকৃত কিম্বা কল্পিত গুণ হইতে উদ্ভূত হয়। মহাজন বা বিক্রেতা ঋণপ্রার্থীর সততা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিলেই ধারের কার্য্য হইতে পারে। প্রার্থীর এই কল্পিত বা প্রকৃত বিশ্বাস যোগ্যতাই তাহার সম্ভ্রম বা মাতব্বরী। ইহাই তাহার ক্রেডিট। মহাজন বা বিক্রেতার প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া উহাকে credit বা মাতব্বরী বলা হয়। এই মাতব্বরী বা সম্ভ্রমই ব্যক্তি-বিশেষের ঋণশক্তি। কিন্তু বিনিময় অর্থে credit বলিতে ধারকার্য্য বুঝায়। একদিকে বিশ্বাস ও অপরদিকে সম্ভ্রম, এই দুই পরস্পর পরস্পরকে ধারণ ও আশ্রয় করিয়া যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই ধার বলা যায়। আমরা ক্রেডিট শব্দের পারিভাষিক বিনিময়-বোধক অর্থে ধার শব্দ ব্যবহার করিব। আর ধারগ্রহীতার গুণবোধক শক্তিরূপে সম্ভ্রম, বাজার সম্ভ্রম, মাতব্বরী, ঋণশক্তি, ধার-শক্তি, বিশ্বস্ততা বা প্রত্যয়যোগ্যতা, পদ-পরিচয়, প্রভৃতি সাধু বা অসাধু অনেক শব্দ ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু ক্রেডিটের পারিভাষিক বিনিময় অর্থে ইহাদের কোন একটীও ব্যবহার করা চলে না।

আমাদের ঋণ শব্দ ধারের একার্থবোধক; কিন্তু ইহা সচরাচর কিছু সঙ্কীর্ণার্থে ব্যবহৃত হয়। কোন মালামাল ধারে ক্রয় করাকে আমরা "ঋণ করা" বলিতে চাই না; অন্ততঃ সচরাচর এইরূপ প্রচলিত নাই। ধারের একার্থ-বোধক রূপে ইহা ব্যবহার করিলে, সময়ে সময়ে দুর্বোধ্য হইবে। যথা "ঋণে বিনিময়" ভাষায় চলিবে না। সুতরাং সাধারণ ভাবে বিনিময় জ্ঞাপন জন্য ধার শব্দই আমরা ব্যবহার করিব। ইংরেজী Loan শব্দের পরিবর্ত্তে ঋণ শব্দ যদৃচ্ছা ব্যবহৃত হইবে। পারিপার্শ্বিক বাক্যপরম্পরা অর্থ প্রতিপত্তির বিঘ্ন না ঘটিলে, ধার অর্থে ঋণ শব্দও ব্যবহৃত হইবে।

সাক্ষাৎ ও ধারে বিনিময়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাক্ষাৎ বিনিময়ে সময়ের উপরে কোন নির্ভর থাকে না; যে মুহূর্ত্তে বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই মুহূর্ত্তেই পরস্পরের দেনা-পাওনা পরিশোধিত হইয়া যায়। সাক্ষাৎ বিনিময়ে ধনে ধনে ও বদলবদল হইয়া কিম্বা মুদ্রার মধ্যবর্ত্তিতার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; ক্রেতা কিম্বা বিক্রেতা কাহারও কোন দাবী অপরিশোধিত থাকে না। কিন্তু ধারের বেলায় কোন নির্দ্দিষ্ট ও পরিচিহ্নিত বস্তুর উপরে বিক্রেতার স্বত্ব কিম্বা স্বত্ব স্বামিত্ব ও অধিকার বিলুপ্ত ও পরিত্যক্ত হইয়া তাহা নিব্যূঢ় স্বত্ব ক্রেতাতে পর্য্যাপ্ত হয়; তাহার সমপরিমিত মূল্য দাবী করিয়া লওয়ার অধিকার মাত্র বিক্রেতার থাকিয়া যায়।

বিক্রেতা ধারে বিক্রীত সামগ্রীর উপরে অন্য কোন স্বত্বাধিকার পরিচালন করিতে পারেন না। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিবার দায়িত্ব ক্রেতাকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। তবে এই বিনিময় কার্য্যকরী ও বাধ্যকর হইতে হইলে, উভয় পক্ষ স্বতঃ পরতঃ ও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অভিমত ও সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন কিনা তাহা দেখা আবশ্যক। কাহারও উপরে কোন প্রকার অবহিত প্রতিপত্তি বা জোর জুলুম ব্যবহৃত হইলে, উহা বহিতযোগ্য হইয়া পড়ে। সর্ব্বাবস্থায়ই ক্রেতার প্রতি আইনানুযায়ী স্বত্ব পর্য্যাপ্ত ও বিক্রেতার উপর মূল্য দাবী করিয়া লওয়ার অধিকার জন্মা আবশ্যক।

কলকজা, ঘর, বাড়ী প্রভৃতির ভাড়ার সহিত ধারের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যে বৈষম্য আছে, তদ্দ্বারাই তাহাদিগকে পৃথক করিয়া লওয়া যায়। ভাড়ার বেলায়ও সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকে, কিন্তু ধারের বেলায় বস্তুর অধিকার সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ভাড়ার বেলায় তাহা হয় না, সম্পূর্ণ স্বত্বই মালিকের থাকিয়া যায়। ভাড়াগ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভাড়ার সামগ্রী দখল মাত্র করিতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট সময় গতে ভাড়াকৃত সম্পত্তির ব্যবহারজনিত ক্ষয় বাদে, উহা প্রত্যর্পিত হওয়ার উদ্দেশ্য ও প্রতিপ্রায় থাকে; কিন্তু ধারে বিক্রীত সামগ্রী প্রত্যর্পিত হয় না এবং হওয়ার কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় থাকে না। এমন কি প্রত্যর্পিত হইলেও মালিক সেই বিক্রীত বস্তু পুনঃ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। বাড়ীর মালিক ভাড়া দেওয়ার সময়ে জানেন যে, এই ভাড়ার সময়ের মধ্যে উহা একদা নষ্ট হইবে না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষত থাকিয়া যায়। তেমন কলকজা ও যন্ত্রাদির সাময়িক ব্যবহারে তাহার তেমন কোন ক্ষতি হয় না; তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া দিলে কিছু ক্ষতি হওয়াই সম্ভব। তথাপি মেরামতাদি হইয়া ব্যবহারযোগ্যাবস্থায়ই প্রত্যর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু ধারের সামগ্রীগুলি নষ্ট করিবার জন্যই গৃহীত হয় এবং যদি উহা উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহার করিয়া নষ্ট করা না হয়, তবে যে কেবল দায়েকই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা নহে, সমাজও এই মূলধনের ব্যবহারে যে উপকার পাইতে পারিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। ধারের সামগ্রী অনুৎপাদক কার্য্যে ব্যবহৃত হইলে, অন্য কোন উপায়ে অর্জ্জন করিয়া তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। ধারলব্ধ মূলধন কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইলেও অজন্মা বা আকস্মিক অন্য কোন কারণে ফসল নষ্ট হইলে, তাহা অন্যভাবে অর্জ্জন করিয়া পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু শিল্পকার্য্যে যে মূলধন নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা সহসা নষ্ট হয় না, অনেকটা নিরাপদ থাকে। যে সকল দেশে শিল্পকলার উন্নতি ও প্রসার সাধিত হয় নাই সেই সকল দেশে ধারের ক্ষেত্রের আত্মবিস্তৃতি নিয়তই বিপদসঙ্কুল। কিন্তু ভাড়ার ব্যাপারে এই সকল দায়িত্ব নাই। ভাড়ার বস্তু সাময়িকভাবে কোন উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহৃত না হইলেও, তদ্দ্বারা সাময়িক আয় হ্রাস ভিন্ন মূলধন একদা নষ্ট হয় না।

ক্রমশঃ।

মনের রীতি

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

মন, যে তুমি কেমন মানুষ—
চেনা তোমায় যায় না ছাই!
আকেলে যে অবাক্ কর,
ধরা দেবার নামটি নাই!

পাঁচ বছরের মেয়ের মতন
কোমর বাঁধ সকলটায়,
ক'নে বৌয়ের মতন কেন
ঘোমটা টান—শেষ বেলায়

আকাঙ্ক্ষা সে বড়ই বেশী—
পার হ'তে পা'য় সমুদ্দুর,
সঙ্কোচ ও যে চরণ-তলে
ফোটায় শত কুশাঙ্কুর!
যৌবনের এ আগল হিয়া
পাগল তোমার পাগ্‌লামোয়,
কোন্ কুহকী মন্ত্র পড়ে'
চোখ দুটোতে হাত বুলোয়!

পড়েছিল কুঞ্জে সেদিন
পুষ্প-রথের চাকার দাগ,
বন-তোষিণীর অন্তরে গো
নতুন ফোটা ফুলের যাগ!
কোন্ পথে যে প্রণয় এল—
নাইক তাহার কিছুই ঠিক,
চারটি চোখের মিলন নিয়ে
কোন বিজুলীর কোন্ ঝিমিক্!
মোর হৃদয়ের কোন্ দেবতা?—
কে ক'বে তা'র গোপন নাম!
পুছিলা তা' প্রিয়ম্বদা
এই অভাগীর মনস্কাম।
মনস্কামে কামনা নাই,
লজ্জাহীনা, থাম্ রে আজ,—
মন, তোমারে চিন্‌তে জুয়ায়,
পড়ল্ মাথে অমনি বাজ!

বকুল ফুলের গন্ধে ছুটে
পুষ্প-ধনুর তীক্ষ্ণ শর,
এলিয়ে পড়ে চুলের বেণী
শিথিল হ'য়ে পিঠের 'পর;
মন বলে, আয়, ফুলের কুঁড়ি
ফুঁ দিয়ে ভাই, আয় ফোটাই,
কারো চোখের আড়-কিনারে
দৃষ্টিটুকু আয় লোটাই!
কয় যদি সে একটি কথা,
চোখ মেলে চায় চোখ দুটোয়,
ছড়িয়ে দেব প্রাণখানিকে
ফাগের মত এক মুঠোয়।
কোন্ অতিথি এল গৃহে?—
'চোখ-গেল' ওই উঠ্‌ছে সুর—
কুঞ্জভূমির দিথিদিকে
কাছ কানাচে—অনেক দূর।

সেদিন ছিল কুঞ্জবনে
দখিন হাওয়ার আকুল গান,
ভেঙেছিল বন তোষিণীর
অভিমানীর গুমর খান!
রাজার ছিল হাতে ধনুক,
চক্ষে ছিল দীপ্ত শর,
বক্ষে আমার একটি কথা
জাগ্‌তেছিল নিরন্তর!
মন কহিল, রাজায় যদি
একলাটি পাই একটিবার
কল্পনারি মাল্যখানি
দিই যে পা'য়ে অর্ঘ্য তাঁর।
হরিণ-শিশু নিয়ে সখী
দিতে গেল মায়ের কাছ,
'তাইত সখি, চল্‌লে' বলি'
কর্‌লিরে তুই কতই কাচ!

পূবে হাওয়ায় মেঘ্‌লা খেলা,—
হেলা ফেলার নয় সে' দিন,
অথির মনের মুখর কথা
কেবল করে ঝিনিক্ ঝিন্!

মাধবী সেই আঁকড়ে ছিল
ছায়া-নিবিড় শাল, পিয়াল,
পরশখানি সরস বড়—
খাম-খেয়ালির খোস-খেয়াল!
ভূতল হ'তে কুড়িয়ে নিয়ে
তুমস্ত ফুল-বলয়
পরিয়ে দিতে কর দুটিতে—
রক্ত হ'ল গণ্ডদ্বয়!
ছি-ছি-তে মন পূর্ণ হ'ল,
অন্ধ হ'ল চক্ষু দুই!
কোন্ হেঁয়ালার মানসী—মন,
কোন্ খেয়ালীর কন্যা তুই!

ওই বুঝি কোন্ রাজার মেয়ে—
খেয়াল ভরে পা' ফেলিস্,
তর্জ্জনীটি হেলিয়ে শুধু
হৃদয় নিয়ে তুই খেলিস্!
ইসারা তোর বেসুরা নয়—
সব দিকেতে তাল বাজায়,
চোখ টিপুনির শাসনটুকু
তোর চোখেতেই বেশ মানায়।
কুরুবকে আঁচল বাধে,
চক্ষে পড়ে ছাই পরাগ,
আঁচল ছাড়ে, পরাগ উড়ে,
গণ্ড যে হয় অরুণ-রাগ!
যৌবনের এ আগল হিয়া
পাগল রে তোর পাগ্‌লামোয়,
কোন্ কুটোটি পড়্‌ল উড়ে'
আমার পোড়া চোখ দুটোয়!

মাতৃপূজা

তুমি মা চেতনা-দেবী, চৈতন্যরূপিণী। তোমার শক্তি উদ্বোধিতা হইলে বিষ্ণুমায়া থাকিবে না।

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"

তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিলে আমার আমিত্বের অরুণোদয় হইবে। তাই তোমাকে মা বলিয়া কন্যা বলিয়া ডাকিতেছি। অভাবে পড়িয়াছি বলিয়াই ডাকিতেছি; অতি দরিদ্র অতি ক্ষুদ্র হইয়াছি বলিয়াই ডাকিতেছি। বাঞ্ছাকল্পলতিকে! আমার আমিত্বের ক্ষুদ্রতা দূর কর, আমার সর্ব্বস্ব আমাতেই লীন করিয়া দাও। তাই আমার মাতৃপূজা সকাম পূজা। আমার কিছু নাই, আমি সব চাই। যাহা পাইলে আর কিছু চাহিবার থাকে না, আমি সেই সব চাই। দাও মা! রামপ্রসাদ তাই বড় ক্ষোভেই বলিয়াছেন,—

"আমি ঐ খেদে খেদ করি,
ঐ যে, তুমি মা থাকিতে আমার—
জাগা ঘরে চুরি গো চুরি।"

ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা। আমি জানি, আমি আছি; আমি জানি, বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই। তুমি আমাতে আছ, বাহিরেও আছ। সব জানি, সব বুঝি—তবু কে জানে কেন—আমার জাগা ঘরে হয় গো চুরি! এই চুরি নিবারণ করিবার জন্য রামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

"যে দেশে রজনী নাই মা,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
* * *
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

ঘুমেরে ঘুম পাড়াইতে না পারিলে মায়ে পোয়ে ত ভাব হবে না। তাই তোমায় জাগাইতে চাই। ইহাই আমার মাতৃপূজা, ইহাই বাঙ্গালার দুর্গোৎসব। একবার বুঝিয়া দেখিবে কি? রামপ্রসাদই ত বলিয়াছেন,—

"ডুব দে রে মন কালী ব'লে,
হৃদ্-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

একবার ডুব দিয়া দেখ না! তোমার আমিত্বের মধ্যে ডুব দাও, জাতির আমিত্বের সাগরে ডুব দাও। দেখিবে, সে অগাধ জলে দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, সিংহবাহিনী মা দশদিক্ আলো করিয়া রহিয়াছেন। একবার দেখ—গুপ্ত আনন্দধামের লীলা একবার দেখ—তোমার মুকুরে তোমাকে দেখ, আপনাকে চিন। তোমার বাঙ্গালী-জন্ম সার্থক হইবে। শক্তিময়ীর সন্তান তুমি, শক্তিধর-রূপে প্রকট হইবে। এই শুভদিনে শুভক্ষণে একবার দেখ!

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য—কার্ত্তিক, ১৩২৯।

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়ব্রতের কথা

১

হিতোপদেশের সেই মূষিক-সিংহের গল্পটা আজ মনে পড়ছে। ঋষি তাঁর পোষা ইঁদুরটিকে বেড়াল করলেন, বাঘ করলেন, সিংহ করলেন, কিন্তু তার তা সইল না। শেষে যে ইঁদুর সেই ইঁদুরই তাকে হ'তে হল। কেন? কেউ বলবেন নিয়তি, কেউ বলবেন বোকামী, কেউ বলবেন দুর্ভাগ্য, কেউ বলবেন দুষ্কর্ম। কিন্তু আমি বলব, ওসবের কিছুই নয়, ইঁদুরের পরম সৌভাগ্য যে সে আবার ইঁদুর হতে পেয়েছিল। যা মিথ্যে, যা সে নয়, সে যে তা থাকতে পায়নি এ তার পক্ষে শাপ নয়, বর। মুনিবর তাকে পুন-র্মূষিক করে পরম নিস্ফলতা হ'তে বাঁচিয়েছিলেন। সত্যি-কার সিংহের পক্ষে মূষিক হওয়াটা যেমন দুর্ঘটনা সত্যিকার মূষিকের পক্ষে সিংহ হওয়াও তেমনি দুর্ঘটনা। যা সহজে হয়েছি, আমার যা সহজগতি তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে যে দিকেই চালাও না—তা' সে স্বর্গের দিকেই হ'ক আর নরকের দিকেই হ'ক, সে গতিতে মঙ্গল নেই, স্বস্তি নেই, আনন্দ নেই।

এ কথা কেউ মানবে না, তা জানি। এই অসহজের গুরুভার ধার্ম্মিকের জগতে সে কথা মানাতে যাওয়া যা, আর আমার মত বীরের পক্ষে, গন্ধমাদন তুলতে যাওয়াও তাই। বোঝাতে পারব না তা জানি, তবু বলতে হবে, কারণ সেটাও আমার স্বভাব। এতদিন ধরে বনে-বাদাড়ে, অনাহারে অনিদ্রায় যে সত্যকে জীবনের মধ্যে ধরতে পেরেছি, তাকে না প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমি সহজের উপাসক, সহজের মন্ত্রদ্রষ্টা, সহজের ঋষি এবং সহজের কবি।

এই যে কথাটা রোদে পুড়ে, আগুনে ভাজা হয়ে, জলে গলে, শীতে জমাট হয়ে প্রাণের মধ্যে সত্য বলে ধরা দিয়েছে এ কথা আমার বলতেই হবে, নইলে আমার অস্তিত্বের কোন অর্থ থাকবে না। কেউ নিরর্থক হ'তে চায় না, পারেও না—আমিও চাই না, পারবও না।

আমার বলবার কথা কি? আমি এই বলতে চাই যে, যে ফুল গাঁদাই হবে তাকে গাঁদা না হতে দিয়ে গোলাপ করে তুলতে চেষ্টা করলে, সে ফুল গোলাপ ত' হ'তে পারেই না কিন্তু ভাল গাঁদা হবার যে আশাটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। মঙ্গলেচ্ছু মানুষকে তাই আপনার অন্তরে প্রবেশ করে দেখতে হবে যে কি কারণে এবং কি হবার জন্য সে জন্মেছে। আত্মানং বিদ্ধি, এইটাই হচ্চে চরম উপদেশ। আগে আপনাকে জান যে তুমি কি হতে জন্মেছ, এবং কোন্ দিকে তোমার সহজ গতি। তার পর সেই গতিকে ঠিক করে জেনে, সেই গতি যাতে বাড়ে, যাতে সুন্দর এবং সুস্পষ্ট হয় তাই কর, তাহ'লেই তোমার পরমার্থ লাভ হবে, কারণ তখনি তুমি সার্থকতার দিকে চলতে পারবে। এই স্বরূপা-ভিমুখী গতিতেই আনন্দ,—এবং এই গতিকে বাধা দেওয়াই দুঃখ। অন্য যত দুঃখ আছে সেগুলা এর তুলনায় দুঃখই নয়। সেগুলা সুখের অপর পীঠ। সত্যি দুঃখ হচ্চে অজ্ঞান।

আত্মার এই অবাধগতিকে বাধা দেওয়াই মানুষের পরম অজ্ঞান। সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, লোভ, অহঙ্কার এই সমস্ত বড় বড় বাধা এই অবাধগতিকে ফেনিলোচ্ছল করে তুলছে। তাই মনে হচ্ছে যে মানুষ দুঃখ পাচ্ছে—নইলে অস্তিত্বই যে আনন্দের, তাতে সুখ-দুঃখ আসবে কোথা

হ'তে? সুখও যেমন একটা তৈরী বস্তু, দুঃখও একটা তেমনি তৈরী জিনিষ। সে হয়ত পরমার্থতঃ কোথাও নেই, কোথাও সে কখনও ছিল না। কিন্তু হয়ত দিক্‌ভ্রমের মত কি এক অজ্ঞাত কারণে তাকে জগতের মধ্যে মানুষই জন্ম দিয়েছে। সে নৈলে তার চলে না, কারণ সুখ পেতে হলেই দুঃখ চাই।

বহু পূর্ব্বে একবার একজনের কাছে লিখে দিয়েছিলাম যে আমি দুঃখের লোভেই সংসার হতে বেরিয়ে পড়েছিলাম সুখের লোভে নয়। কিন্তু সংসারের বাইরে বেরিয়ে কেবল আনন্দকেই দেখতে পেয়েছি, দুঃখ কোথাও নেই। দুঃখ কেবল আছে মানুষের মনে। সে বাইরে কোথাও নেই এবং কেউ তাকে খুঁজে পায় না। যদি তাকে পেতে হয় ত' সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির বাইরে গিয়ে সৃষ্টি করা যায় না—তাই যা সৃষ্টির জায়গা যাকে মানুষ সংসার বলে বা জগৎ বলে, তারই মধ্যে না ঢুকলে দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া যায় না বলে সংসারেই ফিরতে হ'ল। এই দুঃখকে না চিনলে না পেলে সুখকেও পাবার জো নেই। এবং সুখ-দুঃখ না থাকলে এমন কি চৈতন্যই থাকে কিনা সন্দেহ—তাই আবার সেই দুঃখের লোভেই সংসারে ফিরে এলাম।

কিন্তু একথা লোককে বিশ্বাস করান কঠিন যে,সে-লোক ১৫-১৬ বৎসর গহন গিরিগুহায় স্বচ্ছন্দ অটনের পরম সুখ অনুভব করেছে, সে কি লোভে আবার সংসারে ফিরে এল? সংসারে লোভের বস্তু কি আছে, অন্ততঃ আমার মত স্বাধীনতার সুখ যে অনুভব করেছে তার সংসারে ফিরে আসা নিশ্চয়ই বোকামী, নিশ্চয়ই অধঃপতন। অধঃপতন? তা হবে।—কিন্তু না এসেও যে আমি পারলাম না, আমার চুলের মুঠি ধরে যে নিয়ে এল। যাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দই যে বল্লে, "এই যা একলা হয়ে দেখলি তাই শেষ নয়, এর পরেও আছে।"

এর পর কি আছে? আপনাকে কুড়িয়ে গুটিয়ে আনার আনন্দের পর আপনাকে ছড়ানর আনন্দ আছে—আপনাকে পরের মধ্যে অনুভব করার আনন্দ আছে। এবং তার পরে যা আছে সে হচ্ছে পরকে আপনার মধ্যে অনুভব। এই তিনটাই হচ্ছে এই মানুষের দেহ ধারণের ত্রিবিধ আনন্দ। এর পরে কি আছে জানিনে—কিন্তু মানুষের জীবনকে স্বীকার করে আত্মা এই ত্রিবিধ আনন্দ অনুভব না করলে বুঝতে হবে পূর্ণ আনন্দ এ জীবনে পেল না, অন্ততঃ আমি এইটুকু সত্য ধরতে পেরেছি। আমি ধরতে পেরেছি যে আনন্দই আমাকে চুপ করে থাকতে দেবে না। আমাকে ঠেলে নিয়ে সে একবার গুহাহিত করবে, আবার যখন তার দরকার হবে তখনি আমায় সেই গুহা হ'তে বার করে হাটের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেবে।

জানি যে, পরের মধ্যে আপনাকে, এবং আপনার মধ্যে পরকে অনুভবের সঙ্গে জগতে যাকে দুঃখ বলে, ত্রিবিধ তাপ বলে, তাই আছে। কিন্তু আনন্দকে যখন পেতেই হবে, আনন্দই যখন আমার স্বরূপ তখন সেই আনন্দের জন্য যা আসবে তাকেই নিতে হবে। না নিয়ে যে উপায় নেই, কারণ এই সুখ আর দুঃখের ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের পাপ এবং পুণ্যের, জ্ঞান এবং অজ্ঞানের দোলায় সব রকম দ্বন্দ্বের দোলাতেই আনন্দ দুলছেন এবং সেই দুলে দুলেই আপনাকে অনুভব করছেন। মানুষের দৈনিক জীবনেও এই সত্য চির পরিস্ফুট;—সে দিনের বেলায় নানা কাজে নানা সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে ছড়াচ্ছে, তার পর রাত্রি হলেই আপনাকে গুটিয়ে নিদ্রার মধ্যে গুহাহিত হচ্ছে। এই দোলাই তার স্বরূপ। এই দোলাই সেই পরম দোলের ছায়া—যে দোলে পরমাত্মা একবার অহরাগমে বহু হয়ে বিকাশ লাভ করছেন, এবং রাত্র্যাগমে সমস্ত বহুত্ব নিজের মধ্যে লয় করে গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ হচ্ছেন। আনন্দ স্বরূপ আত্মার ইহাই দোললীলা। সুখ দুঃখ একা একা সত্য নয়—কেবল আনন্দের দুই পীঠ বলে দুই দিক তারই সত্যের মধ্যে সত্য।

আমিও ত' আত্মাই, আমি কি করে নিজের স্বরূপকে উল্টে দেব? আমার সব রকম সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতেই হবে। কেউ যদি বলে যে জগতে সুখ একটা মিথ্যা সৃষ্টি, আমিও তা হলে বলবো যে দুঃখও তা হ'লে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা সৃষ্টি। যদি বল সুখ মানুষকে টানে, আমি বলব দুঃখও তা হ'লে মানুষকে টানে, কারণ দুঃখ ছাড়া সুখ নেই, সুখ ছাড়া দুঃখ নেই।

হয়তো কেউ এ কথা মানবে না, কিন্তু আমার কথা যে

সত্য তার প্রকাণ্ড প্রমাণ এবং উদাহরণ আমি নিজে। নইলে সেই কত বৎসর আগে যখন নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে এনে হিমালয়ের গুহার মধ্যে সমাধিস্থ করে এনেছিলাম, যখন মনে হয়েছিল যে আর আমার কোনো বাসনা নেই, কোনো সুখ নেই, কোনো দুঃখ নেই, আমি কেবল আমারি আর কারু নই, ঠিক সেই সময়ই মানুষ মানুষ করে ছুটে বেরিয়ে ছিলাম কেন? ঠিক সেই সময় মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করবার জন্য কুম্ভ মেলার হাটের মধ্যে—সেই ত্রিবেণীর মোহনায় উপস্থিত হয়েছিলাম কেন? আবার আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য, একটী নির্দ্দোষ নির্ব্বোধ মানুষকে বিবাহ করলামই বা কেন?

আমার ত' কিছুরই প্রয়োজন ছিল না, তবে কেন সেদিনকার সেই পরম অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছিলাম? কে বাধ্য করলে? কে আমার চিরদিনের মুক্তিলোভী প্রাণকে বন্ধনলোভী করে দিয়েছিল? কে আমার প্রাণে ঐ অত বড় একটা ভয়ঙ্কর জনসংঘের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার লোভ জন্মিয়ে দিলে? সে যদি আমার নিজেরই আনন্দ না হবে ত' কে? আপনাকে ভুলে পরকে অনুভব করার মধ্যে যে প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে তা যে আমার নিজেরই আকর্ষণ, নইলে কেন সেই ভুল আমার হল? সেই ভুল করা সেই মায়াকে স্বীকার করাও আত্মার সহজ ভাব, নইলে এ ভুল হ'ত না। ভুল? আচ্ছা, বেশ ভুলই, কিন্তু এ ভুল করতেই হবে, নইলে আনন্দই নেই।

আর এই ভুল করতে হবে বলেই দুঃখকে স্বীকার করতে হবে, তাই মানুষ আমায় টেনেছে, মানুষের সংসার আমায় ডেকেছে, মানুষের দুঃখ নূতন মূর্ত্তিতে আবার আমায় আকর্ষণ করেছে। দুঃখকে অনুভব করতে আবার আমি ফিরলাম, কারণ সে যদি বা আমায় ছাড়তে চায় আমি যে তাকে ছাড়তে পারি না। ছাড়লে বুঝি আমার অস্তিত্বই থাকবে না।

তাই সব রকম দুঃখকে স্বীকার করে পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সব রকম দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে আমি আবার এলাম। কারণ আনন্দ এই দ্বন্দ্বকে বাদ দিয়ে অন্ততঃ আমার কাছে নিজেকে জানাতে পারলেন না। আমি মানুষকে চাই, তা' সে যতই ছোট হোক, যতই অজ্ঞানে দুঃখে মোহে ডুবে থাক, তাকে চাই। নইলে আমার এই একাকীত্বের হাহাকার থামছে না। আমি এক তাই আমার মধ্যে অপরকে চাই, বহুকে চাই, সর্ব্বকে চাই। কে আমার এই পথের গুরু হবে তাকেই খুঁজতে আবার বেরুলাম। এ পথের গুরু এ দিকে নেই, কারণ এ দিক একের দিক। যে পথে আমি বহু হয়ে বিশ্ব হয়ে ক্রমাগত বিকাশ পাচ্ছি, সেই পথে সেই জগৎপথে, চঞ্চলের পথে, গতির পথে চলবার জন্য ফিরে এলাম। দেখি গুরু মেলে কি না, সঙ্গী মেলে কি না।

২

কেন ফিরেছি তা যতটা পারি বল্লাম, কিন্তু কি করে ফিরলাম তাও কি বলতে হবে? সে তো অতি সামান্য একটা কথা, কিন্তু সেটাও কি বলার দরকার? বেশ ভাই তাও বলছি। ঘটনা সামান্য বটে, কিন্তু আমার পক্ষে ত' সামান্য নয়, তাই সে কথা বলাই উচিত।

ঘটনাটা এই,—দশ বৎসর ধরে আপনার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, অর্থাৎ যে কাজটা ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছিলাম তারই স্মৃতি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। কিন্তু এই ভয়ের হাত হতে কিছুতেই নিস্তার পাই নি; কৃচ্ছ্রে নয়, ব্রতে ধ্যানে নয়, সমাধিতেও নয় কারণ এ যে আমার একেবারে অন্তরের অন্তরে স্থান নিয়েছিল, আমার অস্তিত্বের পীঠে পীঠ ঠেকিয়ে বসেছিল। এর হাত হতে ত্রাণ পাব কি করে? কিন্তু এই ভয়ের হাত হতে তখনি নিস্তার পেলাম যখন একে সত্য বলে স্বীকার করলাম। যখন সেই ভয়ঙ্ক অভয়ের মধ্যে টেনে এনে ফেল্লাম তখনি বাঁচলাম। যখন বুঝলাম যে আমি কেবল আমার নই, যাকে পর বলে তারও বটে, তখনি আমার এই ভয় হ'তে মুক্তিলাভ হল। তখন ওঁ পরতত্ত্বায় স্বাহা বলে বেরিয়ে পড়লাম। অন্তর হ'তে আবার বাইরের দিকে হারানো পথ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘটনাটা অতি ছোট,—একদিন সমস্ত দিন না খেয়ে না দেখে সমাহিত হয়ে এক গাছতলায় বসে আছি, সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ তাল পাকিয়ে একটা জমাট বর্ত্তমান হয়ে

বসে আছি। বহুদিনের অনাহার অনিদ্রা যখন আমার প্রাণকে প্রায় শুকিয়ে ধুনির আঙ্‌রার মত করছে, যখন সমস্ত দেহটা চিমটের মত কেবল ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ করছিল, সমস্ত জগৎটা একটা সাহারার মত চক চকে একত্বে পরিণত হয়ে ধূ ধূ করছিল, ঠিক সেই সময়ে একটী ছোট্ট রোগা শিশু আমার অজ্ঞাতে ধুনির কাছে এসে বসেছিল। কতক্ষণ বসেছিল জানি না, কিন্তু যখন তাকে দেখতে পেলাম তখন অবজ্ঞায় তার দিকে চেয়েও চাইলাম না।—সে কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে আমার দিকে চাইলে, শেষে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ সুরে বল্‌লে "মহারাজ, ময় ভুখাহুঁ।" মহারাজ! আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আওয়াজটা যে আমার কোথায় গিয়ে পৌঁছল তা জানি নে, কিন্তু হঠাৎ মনে হল যেন আমার মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে। এক নিমেষে সাহারায় সিরক্কো উঠল—বালি উড়ল, আঁধার হয়ে এল, সমস্ত অস্তিত্বটা হঠাৎ এমন ঝাঁকানি খেয়ে উল্টে পাল্টে গেল যে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্ষিদে? আমার ক্ষিদে পেয়েছে? তাইত, এযে বিশ্বগ্রাসী ক্ষিদে। আমি যে অগস্তের মত সারা সমুদ্রটাই একটানে পান করে ফেলতে পারি, আমার এমনি তেষ্টা পেয়েছে। গরুড়ের মত গ্রাম নগর গিলে ফেলতে পারি এমনি ক্ষিদে পেয়েছে!

কিন্তু ওসে আমায় ডাকলে মহারাজ বলে!—মহারাজ!—আমি মহারাজ? আর একটা ছোট শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির মত একটুকরো রুটীও আমার ঝুলিতে নেই? তবে আমি কিসের মহারাজ?

আমি চট্ করে উঠে ছেলেটাকে দুহাতে জাপটে তুলে ছুটলাম। ছুটে ছুটে একদল সন্ন্যাসীর আশ্রমে পৌঁছে ছেলেটীকে নামিয়ে বল্লাম—

"ময় ভুখা হুঁ।" তারা আমায় খেতে দিলে, কিন্তু সে আহার্য্য আমি ছেলেটীকে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলাম। সন্ন্যাসীরা কিন্তু হাসতে লাগল, বল্লে "মায়া—মায়া, তুম্ মায়ামে গির গিয়ে হো!" মায়ায় পড়েছি? হবে—কিন্তু ওরে—এ মায়ায় এত আনন্দ! এ ভ্রমে এত সুখ! শিশু খাচ্ছে আর তার প্রতি গ্রাসের সঙ্গে আমার অনুভব হচ্ছিল "আমি তৃপ্ত হলাম—আমি আনন্দ পেলাম—আমি বাঁচলাম।" এই কি ভ্রম? একেই আমার এত ভয়!

যাক, শিশু কতদিন বুভুক্ষিত ছিল তা জানিনে, কিন্তু সে এত খেয়ে ফেল্লে যে তার পর দিনই তার অসুখ করলে। তার সেবা করতে করতে কত দিন কেটে গেল, কিন্তু সে যত কষ্ট যত দুঃখ ভোগ করতে লাগল ততই যেন আমার মনে হল যে ঐ শিশু দেহে আমিই সব দুঃখ ভোগ করছি। তার সমস্ত দুঃখের মধ্যে আমি আমাকে অনুভব করে ভয়ঙ্কর সুখের সঙ্গে মধুর ভীষণ দুঃখকে ভোগ করতে লাগলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, আমি এই মরণোন্মুখ শিশুর মধ্যেই বেঁচে গেলাম, এর কষ্টের মধ্যেই আমি বেঁচে গেলাম, এর কাতর ক্রন্দনের মধ্যেই আমি বেঁচে গেলাম।

শিশু বাঁচলে না—কিন্তু তার প্রাণ দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে গেল। আমিও ছুটে পালিয়ে এলাম—আমায় বাঁচতেই হবে, দুঃখকে প্রাণের মধ্যে স্থান দিয়ে আমায় বাঁচতেই হবে। ওগো ভ্রম, ওরে অজ্ঞান, ওরে আমার চিরন্তন ভুল, তোকে কোন এক অকাল বসন্তের দিনে আমার তৃতীয় চক্ষের আগুনে ভষ্ম করেছিলাম মনে নেই। কিন্তু কে জানত যে সেই ভষ্ম আমার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে গায়েই ছিল। তারপর কোন সকাল বসন্তোদয়ে সেই ছাই হতে আবার তুই মরুরপাখী ফিংসের মত জেগে উঠেছিস্। শিশুর নবপ্রাণ আমার শুষ্ক আত্মাকে রসে রসিয়ে, ফুলে ফুটিয়ে, অশ্রুতে ভিজিয়ে বাঁচিয়ে দিলে। আমি পালিয়ে এলাম। মরণাধিক মরণ-সাগর হ'তে জন্মমৃত্যুর কোমল দোলায়মান রসসাগরের তীরে আবার এলাম। তোমরা ভাই গাল দাও আর জটা মুকুট মুড়িয়েই দাও—আমি তবু বলব, আমি তোমাদেরই ভাই, তোমাদেরই।

৩

'বৈরাগ যোগ কঠিন উধ অব না করব হো।' সমস্ত সংসার গেয়ে উঠছে। আমি গাইব না?—আমিও প্রাণপণে গাইতে গাইতে, কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে পালিয়ে এলাম, কিন্তু কোথায়? সেই যেখান থেকে বেরিয়ে

ছিলাম, সেই আমার আদি স্থানে—জন্ম স্থানে। সেই যেখান হতে কোন এক বসন্ত প্রভাতে বসন্তের গৈরিক বসন ধারণ করে বেরিয়ে পড়ে মনে করেছিলাম জীবনে ফাগুন চৈত্রের শেষ হল, এইবার বৈশাখের প্রচণ্ড আলো ফুটে উঠবে, সেই আমার গ্রামে সেই আমার জীবনের আরম্ভ স্থানেই পৌছিলাম। যেখানে পরম মায়াবিনার কাছে বিদ্রোহ করি সেই খানেই প্রায়শ্চিত্ত করতে ছুটে এলাম। আমি ত' জানতাম না যে সেইদিনকার সেই বৈরাগ্যের বসনের লাল রংটার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত আমার পাছু নিয়েছিল, পলাশ শিমূল কিংশুক আমার গায়ে লেগে গিয়েছিল, আশোক গোপনে গোপনে আমার প্রাণের তলাটা রাঙিয়ে রেখেছিল। পদ্ম আমার হৃদয়দহরে একেবারে শত পাপ্‌ড়িতে ফুটে চুপচাপ বসেছিল! তাদের দেখেও দেখিনি, অবজ্ঞা করে অবহেলা করে কেবলি পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি; কিন্তু আজ তারা সময় পেয়ে একেবারে অন্তর হতে বেরিয়ে আমার সারা পথটা টিটকারী দিতে দিতে ছুয়ো ছুয়ো করতে করতে এসেছে। আমি গ্রামে ঢুকলাম, সেই রকম এক বসন্ত প্রভাতে, তেমনি এক উষার মধুর আলোকে, তেমনি এক "পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা" পথ দিয়ে।

গ্রামে ঢুকলাম, কিন্তু হায় সবই চেনা তবু এমনি অচেনা হয়ে গেছে যে, সবাই সত্যানন্দ সন্ন্যাসীকেই প্রণাম করলে, আসন দিলে তবু তাদের প্রিয়ব্রতকে ডেকে নিলে না। সন্ন্যাসী আদর পেলে পূজা পেলে, কিন্তু তাদের বাল্যের প্রিয়ব্রত বুভুক্ষিতই থেকে গেল। গ্রামে বন্ধুদের কাছ থেকে মায়ের কাছে গেলাম। গিয়ে কি দেখলাম? দেখলাম মাও আমার অচেনা হয়ে গিয়েছেন, নতুন সংসার পেতে নতুন মানুষদের নিয়ে নতুন হয়ে বসে আছেন। যে তাঁর দেহ হতে দেহ, প্রাণ হতে প্রাণ নিয়ে তাঁরই কোলে বড় হয়েছিল সে আজ তাঁর কেউ নয়। আর যাঁরা কেউ নয় তাঁরাই আজ তাঁর সব। তিনি তাদের নিয়ে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছেন। আমি পরিচয় দিলাম, কিন্তু সে পরিচয় তাঁর চোখ দেখে বুঝলাম বিশ্বাস হল না মনে করলেন, কে বুঝি তাঁকে ঠকাতে এসেছে।

কিন্তু আমি ত' ঠকাতে আসিনি, তাই দু'দিন তাঁর কাছে রইলাম। তিনিও কি জানি কেন আমায় ধরে রাখলেন, কিন্তু তাতে যাঁরা আমার সেই পরিত্যক্ত বিষয় ভোগ করছিলেন, তাঁদের ভয় হল। তাঁরা শত্রুতা আরম্ভ করলেন। এবং সেই সঙ্গে সংসারের চিরন্তন সুখ আরম্ভ হল।

এতে কার দোষ দেব? কারু নয়, তাঁদেরও নয়, আমারও নয়। তবে কার? কার জানিনে, তবু এই সংসার। এবং একেই ভক্তির সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে—কারণ এই এর স্বরূপের এক দিক। কিন্তু আর দিকও আছে। কি? তাও বলছি।

আমার আত্মীয়েরা যখন দেখলেন যে বেটা ভক্ত বিটলে সন্ন্যাসী কিছুতেই যায় না, দুবেলা বসে ভাতের কাঁড়ী ধ্বংসছে এবং মাও যেন একটু তার দিকে ঢলে পড়বার মত হয়েছেন, তখন গালিগালাজ হ'তে লাঠি সোটা পর্য্যন্ত বেরুল। মা তখন ব্যস্ত হয়ে আমায় পাখা দিয়ে আগলাতে লাগলেন।

কিন্তু আমিও নাছোড়বন্দা—স্থাণুর ন্যায় অচল হয়ে বসে, বল্লাম, "আমি কিছু চাই নে, শুধু এই বারান্দাটায় পড়ে থাকতে চাই, তাও কি তোমরা দেবেনা?" কিন্তু আত্মীয় স্বজন থেকে আরম্ভ করে পাড়াপড়সীরা পর্য্যন্ত এমন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, মা শেষে ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "বাছা, তুমি যাও। তোমায় দেখে বড্ড মায়া হচ্ছে, কিন্তু মায়া হচ্ছে বলে ত' তোমায় মরতে দিতে পারব না, তুমি যাও।"

আমি বল্লাম, "আমি তোমার প্রিয়ব্রত!" মা কেঁদে বল্লেন, "আমার তা বিশ্বাস হচ্ছে বাবা, কিন্তু এরা যে তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

আমি কেঁদে বল্লাম, "আমি ত' কিছু চাইনে, শুধু তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকতে চাই।"

মা বল্লেন, "এরা যে তা বিশ্বাস করছে না বাবা।"

আমি বল্লাম, "তুমি ত' বিশ্বাস করেছ মা—তোমায় এত দিনকার এত কথা বল্লাম, যে সব কথা কেউ জানতে পারে না জানেও না তাও বল্লাম, তবু কি তুমি আমায় ছেলে বলে

মানবে না—বিশ্বাস করে কোলে স্থান দেবে না?" মা বল্লেন, "ওরা যে বলে তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মনের কথা জানতে পার। তুমি আমায় ভুলিয়ে এই বিষয় আশয় ভোগ করবার জন্য এই সব বলছ।"

হায় রে! আমার সন্ন্যাসীত্বই আমার চিরবিরোধী। যে স্থান আমার সহজ ছিল, সেই স্থানই আমার পক্ষে এত অসহজ এত দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ওগো লীলাময়ী, এ তোর কি লীলা গো।

যাক, আমি তবুও উঠলাম না, কেবল কাতর ভাবে জানিয়ে দিলাম আমি প্রিয়ব্রত। কিন্তু কি জানি কেন কেউ সে কথা কিছুতেই মানলে না। শেষে একদিন তারা পরামর্শ করে আমার জটা মুড়িয়ে দিলে, গেরুয়া কেড়ে নিলে, চিমটে ভেঙ্গে দিয়ে একটা ছেঁড়া কাঁথা ঘাড়ে দিয়ে মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বল্লে, "চেয়ে দেখুন দেখি এ কি আপনার সেই প্রিয়ব্রত।"

মা চেয়ে চেয়ে বল্লেন—"সে ত' এত ফর্সা ছিল না—তার মুখ ত' এত চকচকে ছিল না। তার কালো কালো কোঁকড়া চুল ছিল। কিন্তু কপালের ঐ দাগটা ওটা যেন—"

মাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমার আত্মীয়গণ আমার গলা টিপে বাড়ীর বার করে দিলেন।

আমি বাইরে এসে শুনলাম, মা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে বলছেন, "ওরে তোরা ওকে কিছু বলিসনে, ও যে আমার প্রিয়র নাম নিয়ে এসেছে। ওরে তোরা মারিসনে—"

আমার প্রাণ ফেটে শব্দ উঠল "মা—মা—মা"। মাও আমার ছুটে বেরিয়ে এসে সেই আত্মীয়দের হাত ছাড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে, সেই আত্মীয়দের বল্লাম, "তোমরা সব নাও—কিন্তু মাকে দাও। আমি আর কিছু চাইনে।"

আমার এই কথার উত্তরে যা শুনলাম, তা আর বলে কি করব? এই ত সংসার! এই ত সুখে-দুঃখে, ন্যায় অন্যায়ে ভরা সংসার। এই দুঃখে না পড়লে কি মাকে পেতাম, মাকে বুঝতাম। মা তাঁর ছেলের নামটুকুকেও এত ভালবাসেন যে সেই নামটুকুর জন্যে আমার সঙ্গে চলে আসতে চাইলেন। তিনি বল্লেন, "চল বাবা তোমার সঙ্গে কাশী গয়া বৃন্দাবন করিগে। তুমি যেই হও, আমি তোমায় আমার প্রিয়ব্রতই বলে জানলাম।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বল্লাম, "মা, বুঝলাম তুমি এখনও আমায় বিশ্বাস করনি—জটা গেরুয়াতে যেমন আমায় চিনতে দেয়নি, তেমনি এই নেড়া মাথা আর ছেঁড়া কাঁথাতেও চিনতে দিলে না। যাই হোক, আবার আমি আসব, তার পর দেখব কেমন আমার মা আমায় না নেয়।"

৪

হয় ত তোমরা জিজ্ঞাসা করবে যে যখন আমার আপনার জনেরা আমায় অমনি করে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলে তখন আমার দুঃখ হয়েছিল, কি না? এবং তোমরা আশা করবে, যে আমি বলব—

"মেরেছ কলসির কাণা
তা বলে কি প্রেম দিব না।"

না গো, না, আমি কি আর সন্ন্যাসী আছি, যে অমন করে বলব, "হে পিতঃ এই পাপীদের ক্ষমা কর, এরা জানে না যে এরা কি করছে।"

যাঁরা সে কথা বলেছিলেন তাঁরা জগদ্গুরু। তাঁরা আমার মাথায় থাকুন। আমি সহজ মানুষ—তাই মার খেয়ে কাঁদলাম। তাই এই পরম দুঃখকে দুঃখ বলেই স্বীকার করলাম। কিন্তু তবু তাদের আশীর্ব্বাদ করতে ভুললাম না—কারণ তাদের মার-ধরের মধ্যে আমি আমার মাকে পেলাম, তাঁদেরও পেলাম, এবং এই দু'য়ের মধ্যে আমাকেও পেলাম। তাতে যে আমারই পরম লাভ হল। আমায় কাঁদিয়ে তাঁরা আমায় জাগালেন—আমি যে কাঁদতে ভুলে গিয়ে বৈশাখের আকাশের মত ফাঁকা শুকনো প্রকাণ্ড একটা কি হয়ে গিয়েছিলাম। সেই আকাশে যে আষাঢ়ের জলদোদয়ের প্রয়োজন ছিল। তাই এই অশ্রু মেঘের সঞ্চারকে পেয়ে আমার আত্মা অন্যথা বৃত্তি-চেতঃ হয়ে বেঁচে উঠল। বসন্তকে ত্যাগ করে গ্রীষ্মে এতদিন কেটেছে, এইবার বর্ষায় উদয় হয়েছে! আমিও কেঁদে বেঁচেছি। আমি যে সবাইকে শুদ্ধ আপনাকে পেয়ে বেঁচেছি। তাঁদের আশীর্ব্বাদ করব না?

তার পর কি হল? যা হবার তাই হল। সংসারের এক দরজায়—স্বার্থের দরজায় প্রবেশ পেলাম না বলেই কি, অন্য দরজাতেও প্রবেশ নিষেধ হবে? আর, যে সংসারকে আমি অপমান করে ত্যাগ করে গিয়েছিলাম, সে যে আমায় সহজে প্রবেশ করতে দিলে না, সেটা কি খুবই অন্যায় করেছে? কখনই না। আঘাতের প্রতিঘাত না পেলে যে আমার আদর পাওয়াই হত—দুঃখ পাওয়া যে হ'ত না। তাই সেই পুনঃ প্রবেশের প্রথম ক'দিন, যে, সংসারের সিংহদ্বারে আমার মাথা ঠুকে গিয়েছিল, সে তো ঠিকই হয়েছে।

কিন্তু তার পরে আর এক দরজা দিয়ে সেই মা, সেই পরম মায়াবিনী জননী সংসার আমায় ডেকে নিলেন। কলকাতায় এক উকিল বন্ধু অবিনাশের কাছে, কিছু দিন পরে, গিয়ে উপস্থিত হতেই সে আদর করে ডেকে নিয়ে বল্লে, "আরে এ কে! প্রিয়! তুমি এই বেশে! তোমার লোটা কম্বল গেরুয়া জটা কৈ হে?"

আমি বল্লাম, "সব কেড়ে নিয়েছে ভাই, এমন কি জায়গাটুকু পর্য্যন্ত। এখন একটু জায়গা দেবে? নইলে যে আমি উবে যাই।"

সে তো হেসেই আকুল, বল্লে, "ব্যেঙ্ থেকে কেঁচে আবার ব্যাঙাচী হলে ভাই! সেই হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের কথাগুলো মনে আছে? তখন যে সব লম্বা লম্বা বাত্ ঝেড়েছিলে, সে সব কি হল?"

আমি বল্লাম, "সব ঝেড়ে ফেলেছি ভাই, এখন তুমি আমায় ঝেড়ে ফেল না, এইটুকু প্রার্থনা।"

বন্ধু আমার সব কথা শুনে বল্লে, "এঁ, মাও তোমায় চিনলেন না? আশ্চর্য্য!"

আমি জীব কেটে বল্লাম, "ছি ছি, ও কথা বল না, মা ঠিকই চিনেছেন। তবে সবাই মিলে তাকে চিনতে দিলে না যে! যাক, ও কথা আর নয়, যখন দিন পাব তখন দেখো আমার মা মাত আছেন। এখন আমার একটা ব্যবস্থা কর।"

বন্ধু অবিনাশের কাছে কিছু দিন থাকার পর, ব্যবস্থা আপনিই হল; বন্ধু তাঁর—গ্রামের এক মক্কেলের এষ্টেটের ম্যানেজার করে আমায় চাপকান চোগা পরিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বলে দিলে যে, সম্পত্তির মালিকরা মেয়েমানুষ, এবং তাঁদের না কি সন্ন্যিসী ফকিরে ভারী ভক্তি। আমি যখন জীবনের এতটা কাল সন্ন্যিসীগিরী করিছি, তখন তাদের সঙ্গে খুব পোষাবে।

কিন্তু গ্রামের আর এষ্টেটের মৃত মালিকদের নাম শুনেই আমার যেন কেমন একটা চমক লাগল। এ যেন চেনা নাম! এ যেন কবে, কোথায় শুনিছি, তা যেন কিছুতেই ভাল করে সাহস করে স্মরণে আনতে পারলাম না। কেমন ভয় মিশ্রিত আশায় আমার প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি একদিনও দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম। পথে আসতে আসতে কেবলি ভাবছিলাম, এ নাম কোথায় শুনিছি? আমার সমস্ত স্মৃতিটা তালপাকিয়ে জটপাকিয়ে মনের মাথার ওপর বসেছিল—কিছুতেই সে জটা ছিঁড়ে সেই স্মৃতির ধারাকে বইয়ে বাইরে আনতে পারলাম না! কিন্তু সমস্ত অস্তিত্ব হ'তে ধ্বনি উঠতে লাগল—কোথায়—ওরে কোথায়?

বাঁশী ও অসি

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

বাঁশীর খেলা খেল্‌তে এসে
অসির ঝননি
মন ডেকে কয় মনের কাণে
তাও কি শোননি ?
আমার বাঁশীর সুরে সুরে
আকাশ বাতাস উঠ্‌ল পুরে
হঠাৎ কাণে লাগ্‌ল যেন
অশ্বপদের ধ্বনি
হাতের বাঁশী রইল হাতে
অবাক প্রমাদ গণি'—
ওই সুদূরে পথের শেষে সারা আকাশময়
খুরের ধূলো আঁধার করে' জাগিয়ে দিল ভয় !

ঘুম পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে
অশ্বহ্রেষা বজ্র ডাকে
বাঁশীর সাধা সুরের মাঝে
জাগিয়ে গেল সাড়া
পাঁজর মাঝে হাড়গুলো সব
কে যায় দিয়ে নাড়া ?
নিথর হ'ল রক্ত চলা বুকের কাঁপনি
নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'ল হঠাৎ আপনি ।

নয়ন মেলে দেখনু চেয়ে
রাজার ঘোড়া আস্‌ছে ধেয়ে
জরির পোষাক ঝক্‌মকিয়ে
সূর্য্য কিরণে

আমার বাঁশীর রব শুনে কে
এল কি রণে ?
সোয়ার এসে থামল যখন নদীর কিনারায়
চোখ ফেটে মোর প্রাণটা তখন বেরিয়ে বুঝি যায়।

বাঁশী তখন ধুলোর মাঝে
ভয় ভাবনায় মরছে লাজে
বাতাস বেয়ে তখনও সুর
বইছে আকাশে
অ-গাওয়া-গান তখন মনে
মরছে হতাশে
জীবন দিয়ে গান গেয়ে যার পাইনি দরশন
সে আজ কোথা ? বিফল গাওয়া আসল যে মরণ।

শঙ্কামরণ মগন করে'
আসলে তুমি কেমন করে
তোমার হাতের তরবারা
উঠল ঝলসি
তখন　　নদীর জলে কি কলরোল
চলল উলসি।
লতায় পাতায় কমল ফুলে জাগল শিহরণ
তখনও মন ভাবছে আমার এল কি মরণ ?

তোমার অসি উঠলে জ্বলে
আলোর খেলা জলে স্থলে
হাত ধরে' মোর অভয় দিয়ে
বক্ষে নিলে টানি
অবাক আমি মুগ্ধ তখন
নাইক মুখে বাণী—
অবশ দেহ অলস হয়ে লুটিয়ে প'ল বুকে
অভয় আলোর বিমল আভা ফুটল তোমার মুখে।

তোমার পরশ অঙ্গে মম
চির পরিচিতের সম
গোপন মনের অবুঝ ব্যথা
জানিয়ে গেল বাঁশী
মরণ ভয়ে লজ্জা এল
মলিন মুখে হাসি।
কিরণ মাখা রক্ত-অসির ক্ষণিক ঝলকে
প্রাণের মাণিক পেলাম আজি চোখের পলকে।

গীতা ও ভাগবত

(৫)

[শ্রীস্মরজিৎ দত্ত]

পরিশেষে ভাগবত বর্ণিত বিষয় সংগ্রহাবসরে বলিতেছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণ মমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং।
যস্মিন পারমহংস্যমেক মমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে
১২।১৩।১৭

অধিকার বিচারেও জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন
নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনা মিহ কর্ম্মসু।
তেষ নির্ব্বিণ্ণ চিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥
যদৃচ্ছয়া মৎ কথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তি যোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।
১১।২০।৭,৮

এখানে নিতান্ত বদ্ধজীবদিগের পক্ষে সকাম কর্ম্মযোগ, অনাসক্ত বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসীর পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং মধ্যাবস্থাপন্ন মানবগণের পক্ষে ভক্তিযোগ প্রশস্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু সংসারে এই মধ্যাবস্থাপন্ন লোকই অধিক, সেই জন্যই এই ভক্তিযোগের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তিযোগেই হউক আর জ্ঞানযোগেই হউক, তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই যে জীবনের একমাত্র প্রয়োজন তাহা ভাগবতই বলিতেছেন

জীবস্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ। ১।২।১০

অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা জীবের অন্য কোন প্রয়োজন নাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের আরম্ভেই "ধর্ম্মস্যহ্যাপবর্গস্য" আছে। এতদ্দ্বারা বুঝান হইতেছে ধর্ম্মের পরিণাম অপবর্গ বা মুক্তিলাভ।

তত্ত্ব কি, তাহা ভাগবত পরেই বলিয়াছেন —

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ং।১।২।১১

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম ভাগবতও জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানের বিচারও যথেষ্ট করিয়াছেন। তবে জ্ঞান সাধারণের পক্ষে, বিশেষতঃ, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনায়, দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়াই জীবনের সার্থকতা। যদি জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে—সে সংশয়ের মধ্যে যাওয়া নিশ্চিতই অবিবেচকের কার্য্য। তাই, যাহাতে নিঃসংশয়ে

অথচ প্রগাঢ় এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল আনন্দের সঙ্গে জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হইতে পারা যায় সেই জন্যই ভক্তির এত প্রয়োজনীয়তা।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে জ্ঞানের প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহারও এই একই কারণ। ভক্তিপথে প্রতি পাদক্ষেপে রসাস্বাদ—যতই অগ্রসর হইবে ততই রসপুষ্টি। কিন্তু জ্ঞানপথ বিঘ্নবিষম ও নীরস। সেই পথে চলিতে চলিতে সাধকের ধৈর্য্য ও উৎসাহ শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ সৃষ্ট্যন্তর্গত জীব প্রথমেই নিরাকার অদ্বৈত অব্যক্তে চিত্ত স্থির করিবে কেমন করিয়া—তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকিলে যথাসময়ে অদ্বৈত জ্ঞান আপনা হইতেই স্ফুরিত হইবে। সুতরাং প্রথমেই অদ্বৈতবাদী হইয়া "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" যাহাতে না হইতে হয় সেই জন্যই এইরূপ দৃঢ়ভাবে ভক্তিপথেরই সৌগম্য ও প্রাধান্য সমর্থন ও প্রচার করিয়াছেন। পরমহংসদেব বলিয়াছেন—"বৈদ্য তিন প্রকার—অধম, মধ্যম ও উত্তম। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ অধম বৈদ্য যাঁহারা তাঁহারা রোগীকে দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বলিয়া যান "খেও হে।" খাইল কি না তাহার আর খোঁজ নেন না। যাহারা মধ্যম তাঁহারা রোগীকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া, নানা উপদেশ দিয়া, ঔষধের উপকারিতা দেখাইয়া রোগীকে তাহা সেবন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আর যাঁহারা শেষ শ্রেণীর অর্থাৎ উত্তম বৈদ্য—তাঁহারা রোগীর মতামতের অপেক্ষা করেন না। তাহার কোন আপত্তিই শুনেন না। যদি রোগী ঔষধ সেবনে পরাঙ্মুখ হয় তবে তাহার বুকে হাঁটু দিয়া বল প্রয়োগে ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া থাকেন।" শ্রীচৈতন্যদেব পাপ রোগাশ্রিত জীবের পক্ষে এই উত্তম শ্রেণীর বৈদ্য। শিবসুন্দর তুষার শুভ্র গৌরী শঙ্কর শৃঙ্গে উঠিতে হইবে। হিমাদ্রির পাদদেশে দাঁড়াইয়া সেই গগন-স্পর্শী হিমকূটের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে তাহার কটি সংলগ্ন অভ্রাবরণে প্রহত হইয়াই দৃষ্টি আর চলিতে পারে না—মাথা আপনিই ঘুরিয়া আসে, তখন স্বতই নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয়কে বলহীন করিয়া দেয় মেঘান্তরালবর্ত্তী অম্বরে বিলীয়মান গিরিশিখরকে নয়ন কেমন করিয়া দেখিবে। তাই নিরুৎসাহতা আসিয়া আমাদের শৃঙ্গ সন্দর্শনাশা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান করিতে চেষ্টা করে। সেই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ পর্ব্বত চূড়ার প্রতিই প্রথম দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ভূধরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়া যাও—পারিবে কি না সে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। চলিতে চলিতে দেখিবে—পাষাণ ফাটিয়া অমৃতের প্রস্রবণ অনাদিকাল হইতে পার্ব্বত্য প্রকৃতিতে জীবন সঞ্চার করিয়া কত শত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের পিপাসা মিটাইয়া মিলনের মধুময়ী গীতি গাহিয়া চলিয়াছে। প্রেমে পাগল হইয়া অত্যুচ্চ হইতে স্খলিয়া পাষাণের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে—সম্মুখস্থ স্তূপাকৃত বিঘ্নরাশি ভাসাইয়া লইয়া সেই অনন্তের দিকে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছে—দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, অবসাদ নাই—কি যেন এক আনন্দের নেশায় মাতোয়ারা হইয়া ছুটিয়াছে। পার্ব্বত্য শ্যাম বন রাজি অমনি বিচিত্র কুসুম সম্ভারে অর্ঘ্য সাজাইয়া সেই দেবতারই অর্চনা করিতেছে। তরুদল ধ্যানস্তিমিত ঋষিদিগের ন্যায় তপঃফলে অবনত হইয়া সেই সব সাধনার সারের চিন্তায় যেন তন্ময় হইয়া রহিয়াছে। অদ্রিকটিদেশে নীরদ পটলের বিচিত্র লীলায় সেই চিরসুন্দরের অজস্র সৌন্দর্য্য বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। নানা বর্ণের বনবিহঙ্গমগণ প্রাণের অবিমিশ্র আনন্দে সেই আনন্দময়ের বন্দনা-গীতি গাহিতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে তোমারও চিত্ত নির্ম্মল আনন্দধারায় পরিস্নাত হইয়া যাইবে—তুমি পথশ্রান্তি জানিতে পারিবে না। প্রতি পাদক্ষেপে নূতন আনন্দরসে প্রাণে নূতন বলের, নূতন আশার সঞ্চার করিয়া তোমাকে আরও অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। ক্রমে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অভ্রযবনিকা আপনা হইতে সরিয়া যাইবে। বালার্ক কনক কিরণ সমুদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময় শৃঙ্গ তোমার চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়নপথে প্রকাশিত হইবে। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের নিগূঢ় অর্থ। এতাবতায় বোধ হয় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি গীতা ও ভাগবতের প্রভেদ কোথায়। এক্ষণে যিনি গীতা ও ভাগবত এতদু

ভবের মূল জ্ঞান ও ভক্তি যাঁহাতে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, যিনি—

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞান সারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ বেদসারং।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্য বর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসজ্ঞং নতোঽস্মি॥

সমাপ্ত।

পরলোকগত কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন

[শ্রীরসিকবিহারী গুপ্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এ পর্য্যন্ত আমরা দেবেন্দ্রনাথের একখানি মাত্র কাব্য-গ্রন্থ—'অশোকগুচ্ছ' লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি। কারণ এইখানিই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ, এবং ইহাই তাঁহার নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। এই পুস্তকখানি প্রকাশের বহু বৎসর পরে, ১৩১৯ সালে, শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে তিনি এক সঙ্গে 'গোলাপগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য', 'অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল' ও 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' এই ছয়খানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। বিভিন্ন মাসিকপত্রে বহুকাল ধরিয়া যে সকল কবিতা ছড়াইয়া রহিয়াছিল, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়াই তিনি এই কয়খানি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই কবিতারাশির সর্ব্বত্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষত্ব জাজ্বল্যমান; কিন্তু তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, অশোকগুচ্ছের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির ন্যায় অনবদ্য কবিতা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বড় বেশী নাই। সেই দাম্পত্য লীলার চিত্র, সেই কুপ্রথাপীড়িতা হিন্দুনারীর করুণ কাহিনী, সেই নিছক সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস—এ সমস্তই এ গ্রন্থগুলিতে আছে, কিন্তু তথাপি যেন প্রায়ই মনে হয় কবির সে শক্তি আর নাই। এমন কি অনেকগুলি কবিতা ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে অতীত যুগের মহাকবি মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবেন্দ্রনাথ আমাদের নিকট বলিতেন যে, এই দুই জনকেই তিনি তাঁহার কাব্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহাদের 'স্কুলের'ই কবি। তাঁহার 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রারম্ভে তিনি মাইকেলের উদ্দেশে বলিয়াছেন

হে গুরু, কখনও তোমা দেখিনি নয়নে,
কিন্তু দেব! দ্রোণশিষ্য একলব্য সম
মানসে গড়িয়া তব মূর্ত্তি নিরুপম,
শিখিয়াছি ধনুর্ব্বিদ্যা তোমারি সদনে।

কিন্তু আমরা এই গুরু শিষ্য সম্পর্ক মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। কারণ হেমচন্দ্রের বীর রস কিংবা মাইকেলের জলদনির্ঘোষ দেবেন্দ্রনাথে কুত্রাপি নাই। তাঁহার বৃহত্তর রচনাগুলি প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথের যাহা বিশেষত্ব—তাঁহার মাধুর্য্য লালিত্য ও চিত্র প্রাচুর্য্য—হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র মধ্যে খুব বেশী পাওয়া যায় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা-কাব্য বাঙ্গালার গীতিকাব্য সাহিত্যে অতুলনীয়। সুতরাং আধুনিক যুগের নবীন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কালিদাস রায় বিশেষরূপে প্রভাবিত হইলেও যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুকারী বা তাঁহার কাব্যশিষ্য নহেন, তেমনই দেবেন্দ্র-নাথও নিজেকে মধুসূদন হেমচন্দ্রের সাকরেদ বলিয়া প্রচার করিলেও তাঁহার কাব্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাই।

সে যাহা হউক, আমরা এখন তাঁহার শেষ কয়খানি পুস্তকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। অশোকগুচ্ছের পরই 'গোলাপগুচ্ছে'র স্থান। ইহার প্রথম কবিতা

এবে গোলাপে গোলাপে ছাইয়ে ফেলেছে
এ মধু কানন দেশ,

সখি, তুমিও আইস গোলাপী অধরে
ধরিয়া গোলাপী বেশ !

অতি চমৎকার ! কবি যে ইহার পরেই অন্য একটি কবিতায় বলিতেছেন—

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারি আমি
রূপের পূজারি

তাহা শুধু অশোকগুচ্ছে নয়, এই শ্রেণীর সকল কবিতাতেও যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। কবির 'প্রাণ বাতায়নে ভাবগুলি সব গোলাপী নেশায় চুর।' তাই কখনও তিনি 'মধুর জ্যোৎস্না'রূপিণী শ্যামাঙ্গী সুন্দরীকে

আধ আলো আধ ছায়া বনরাজি গায়

বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। আবার কখনও বালার্ককিরণসন্নিভা গৌরাঙ্গীর

রূপ রৌদ্রে দুনয়নে ধাঁধা লেগে যায়।

মধুর দাম্পত্য চিত্রের অভাবও এ গ্রন্থে নাই।

যখন 'আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন',
তখন কুহরিয়া উঠে পিক, শিহরিয়া উঠে দিক,
ভরে যায় ফলে ফুলে শ্যামল যৌবন।

আর মুগ্ধ কবি ভাবিয়া আকুল

কি জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি,
প্রথম চুম্বন !

আবার সদ্যপত্নীবিয়োগব্যথিতের 'শেষ চুম্বন' কামনা

দাও দাও বিদায়-চুম্বন !
জীবনের রত্নাগার একেবারে করি খালি
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে মরণে দিতেছ ডালি !
লয়ে ও হীরার কুচি চক্ষের সলিল মুছি
দরিদ্র করিবে সখি, জীবন যাপন।

অশোকগুচ্ছের বিধবার ক্রন্দন-স্মৃতি আনিয়া দেয়। এই কারুণ্যধারা 'বিরাগীর আক্ষেপ', 'উন্মাদিনীর কাহিনী' প্রভৃতি কবিতারও ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত হইয়াছে। 'বাকি পাঁচ শত রূপেয়া'র উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কদম্বসুন্দরী' নামক সুদীর্ঘ কবিতাটি নির্দ্দোষ না হইলেও নানা রসের সমাবেশে বেশ উপভোগ্য।

'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' ও 'অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল' ব্যক্তিগত কবিতার সমষ্টি—প্রথমখানি কবির বন্ধুবান্ধব এবং তাঁহার পরিচিত কবি ও সাহিত্যিকদের স্তুতিবাদে পূর্ণ, এবং অপর খানিতে কবি শিশুদের সম্বন্ধে রচিত নানা কবিতার মালা গ্রথিত করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সকল গ্রন্থ 'অপূর্ব্ব' হইল কি প্রকারে? ইহার উত্তরে কবি তাঁহার গ্রন্থাবলীর স্বলিখিত ভূমিকায় 'করযোড়ে নিবেদন' করিতেছেন—'এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে।' এই সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ একদিন বর্ত্তমান লেখককে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেন—আমি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া অনেক কবিতা রচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু লোকে সেগুলি নিছক ব্যক্তিগত বলিয়া লয় কেন? আমি যে সকল মহিলা কি বালিকার স্তুতিবাদ করিয়াছি, তাঁহারাই আমার কবিতার মুখ্য বিষয় মনে করা ভুল। আমি তাঁহাদের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দিক হইতে একটা ideal womanhood—নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ—অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য এই সকল কবিতাতেও মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিকতা আসিয়া পড়িয়াছে; কারণ নারী জাতিকে আমি জগন্মাতার অংশরূপিণী, ভগবানের সৌন্দর্য্যবিকাশ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। আমার শিশু সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিও এই senseএ ব্যক্তিগত হইয়াও সার্ব্বজনীন। এখানেও, আমি শিশুচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন ভাবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একটা আদর্শ শিশুজীবন, যাহার বিকাশ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক,—ইহাই আমার শিশু-কবিতাগুলির বিষয়। শিশুদের মধ্যে এই অভিন্নতা স্মরণ করিয়াই ত লিখিয়াছিলাম,—

'ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে,
ওরে, ছেলেদের কি জাত আছে?'

সুতরাং এই 'অপূর্ব্ব' কবিতাগুলি কোন্ অর্থে 'শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে রচিত' তাহা দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি হইতে বোঝা যাইবে। কবিবর তাঁহার 'জগাই ডাকাত' নামক কবিতার শেষ ভাগে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

জগাই অর্থাৎ জগন্নাথ একটি তিন বছরের শিশু। এই শিশুতে তিনি জগন্নাথকেই মুর্ত্তিমান্‌রূপে দেখিতেছেন :—

অমৃতের মহা সিন্ধু অপূর্ব্ব হিল্লোলে
আমার এ কবিচিত্তে বহিছে কল্লোলে।
তারি বেলাভূমে আমি রচেছি সুন্দর
সৌন্দর্য্যের জগন্নাথপুরী মনোহর।
সুন্দর দেউল রচি করেছি স্থাপন
রে সুন্দর! তোর ওই মূরতিমোহন।
প্রসারি অন্তর দৃষ্টি হের এ অমর সৃষ্টি
এ নহে কল্পনা কথা এ নহে স্বপন,
শিশুই মানববেশে দেব নারায়ণ।

এই আধ্যাত্মিকতা অনেক স্থলে কবির প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে। তাই দেখি যখন তিনি এই সর্ব্বগ্রাসিনী আধ্যাত্মিকতার হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহার কবিতাও খুব সুন্দর হইয়াছে। দু একটা উদাহরণ দিই। শিশুকন্যা জন্মের পূর্ব্বে যে কি ছিল এবং কোথায় ছিল কবি তাহার এইরূপে পরিচয় দিতেছেন :—

এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে?
সুধাংশুমণ্ডলে তুই ছিলি কি আনন্দময়ি,
চকোরেরা উড়ে যথা সুধাকর চেয়ে?
জ্যোৎস্না কিরণ সাথে তুইও তাদের সাথে
খেলাতে মগন ছিলি গান গেয়ে গেয়ে?
অপ্সরার কণ্ঠে যথা আবক্ষ অপরাজিতা
পারিজাত লতাগুলি উঠে বেয়ে বেয়ে,
তুইও ইন্দ্রাণী গলে হেলে দুলে কুতূহলে
ছিলি লগ্ন, মগ্ন দেবী তোর স্পর্শ পেয়ে।
এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে?

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের প্রথম কবিতা 'খোকার জন্ম' তুলনা করা যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা নিছক সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, আর রবীন্দ্রনাথে সৌন্দর্য্যের সহিত সত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়।

আর একটি ছোট মেয়ে দেখিয়া কবির দশভুজাকে মনে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা শুধু তাহার রূপের জন্ম

দেখ্ রে দেখ্ চেয়ে মোহিনী রাঙা মেয়ে
ভুবন আলো-করা মোহন রূপ।
আয় রে করি পূজা এসেছে দশভুজা,
বাজারে শাঁখ তোরা জ্বালা রে ধূপ।
যেন রে মুখ দিয়া অমিয়া উথলিয়া
পড়িছে মার মোর! এ কি রে রূপ।
জোছনা পড়ে খসি, হের রে মুখশশী।
আলোকে ভরি গেল মানস কূপ।
কোথা সে সারি সারি গোকুলে গোপনারী,
কাঁকণ ভুজে বাজে, চরণে মল,—
গলেতে বনমালা, (যেন রে বনবালা)
চুলেতে থাকে থাকে বকুলদল,—
তাদেরো জারিজুরি, তাদেরো ভারিভুরি
মোর মায়ের কাছে কেবলি ছল।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে এই সব কবিতার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

'শেফালিগুচ্ছ' ও 'পারিজাতগুচ্ছ' নামক গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' মাইকেলের অনুকরণে রচিত, কিন্তু অনুকরণ হইলেও সুললিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এই 'পত্র'গুলি পড়িতে বেশ লাগে। এতদ্ব্যতীত 'হরিমঙ্গল' নামে একখানি গ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কবিদেরও কয়েকটি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। কাব্য হিসাবে পুস্তকখানি য খুব উৎকৃষ্ট তাহা আমরা বলিতে পারি না।

গদ্য রচনাতেও দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যদিও তাঁহার হাস্যরসাত্মক 'দগ্ধকচু' ব্যতীত অন্য কোন গদ্য রচনা আমরা পাই নাই, তথাপি ইহা হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গী ও হাস্যরস উৎপাদনে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। শ্বশুরালয়ে শ্যালিকারা মিলিয়া কবিকে দগ্ধ কচু খাওয়াইয়া কিরূপ লাঞ্ছিত করিয়াছিল এবং অতঃপর তিনি নিজে তাহার কিরূপ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, ইহাই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। ইহার ছত্রে ছত্রে চটুল হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। লেখাটি প্রথমে 'ভারতী'তে মেঘনাদশত্রু এই বেনামীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

আজ এইখানেই শেষ করি। দেবেন্দ্রনাথের কাব্য সাধনা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। তাঁহার জীবন কথাও আজ কিছু বলা হইল না। বারান্তরে সে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আজ তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজনবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। তাই আজ এই শোকসভায় শুধু দু' একটি কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশের সময় বোধ হয় এখনও উপস্থিত হয় নাই। *

প্রেততত্ত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা যে সব আলোচনা করিলাম তাহাতে পাওয়া গেল এই যে, মানুষ তাহার পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়-জগতের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও সময়ে সময়ে অজ্ঞেয় উপায়ে একটা অতীন্দ্রিয় বৃহত্তর জগতের পরিচয় পায়। এই অলৌকিক নানা ধরণে মানুষের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া আসিয়াছে এবং এখনও দিতেছে। মানুষ এক সময়ে তাহাকে মানিয়া লইয়াছিল, তারপর জড় বিজ্ঞানের শাসন প্রভাবে তাহাকে আবার মিথ্যা বা মতিভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেয়; কিন্তু শশক হরিণ চোখ বুজিলে যেমন শিকারীর তাড়াকরাটা মিথ্যা হয় না, অলৌকিকও তেমনি না-মানা সত্ত্বেও ঘটিতে থাকে, তার পর এতদিন পরে সেই নাস্তিকবাদী বিজ্ঞানই তাহাকে মানিয়া লইয়াছে।

বিজ্ঞানের সতর্ক তদন্ত-তল্লাসে, পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ ফলে অলৌকিকের আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান মানিয়া লইয়াছে যে, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগতের অন্তরালে একটা বৃহত্তর অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জগৎ আছে, সেখান হইতে অভিনব অথচ অজ্ঞাত উপায়ে বহু বহস্য তত্ত্ব মানুষের জাগ্রত চৈতন্যে ধরা দেয় মানুষ অনেক সময় অনেক অবস্থায় জ্ঞানের জন্য তাহার পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে না।

পরীক্ষা যোগে বিজ্ঞান অলৌকিকের আত্মপ্রকাশের নানা ধারা আবিষ্কার করিয়াছে। যথা:-

(১) টেলিপ্যাথী—অতীন্দ্রিয় উপায়ে এক মানুষ অপর মানুষের চিত্তের ভাব জানিতে পারে, বা নিজ ভাব তাহার চিত্তে জাগাইতে পারে। (Thought reading, thought transferring)

(২) মোহ বিদ্যা বা হিপ্‌নটিজম—প্রক্রিয়া বিশেষে মানুষকে মোহ মুগ্ধ করিয়া তাহার অব্যক্ত চৈতন্যকে নানা শক্তিতে ফুটাইয়া তোলা যায়—এবং মোহকারীর ইঙ্গিতে বা ইচ্ছায় সে নানা ভাব ভাবিতে পারে এবং তদনুসারে কাজ করিতে পারে, পরে সহজ চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তাহা মনে রাখে না।

(৩) অব্যক্ত সুপ্ত চৈতন্য (Subliminal consciousness)- মানুষের জাগ্রত সহজ চৈতন্যই তাহার সমস্ত সত্তা নয়। ইহার অতিরিক্ত আরো এক বৃহত্তর চৈতন্য তাহার মধ্যে সুপ্ত ও অব্যক্ত ভাবে থাকিয়া কাজ করে। জাগ্রত

* ভাগলপুর সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

চৈতন্যটা সমগ্রের একটা সামান্য অংশ মাত্র। অপিচ এই অব্যক্ত চৈতন্য একরূপ সর্ব্বশক্তিমান ও অন্তর্য্যামী রূপী। এ সম্বন্ধে পরে আরো বক্তব্য রহিল।

(৪) **অতীন্দ্রিয় দর্শন, শ্রবণ ও মনন**—মানুষ অবস্থা বিশেষে দূরবর্ত্তী অদৃশ্য, অনুপস্থিত লোক, দৃশ্য বা ঘটনার অনুভূতি বিনা ইন্দ্রিয় সাহায্যে পায়। (clairvoyance clairaudience, unconscious cerebration, psychometry, precognition etc)

(৫) **মায়াবীরূপ দর্শন** বা ছায়ারূপদর্শন (Veridical Hallucination)—আসন্ন মৃত্যু বা মৃত লোকের প্রেতমূর্ত্তি দূরস্থ কোনো প্রিয়জনের সম্মুখে দেখা দেয় বা কথা শুনায়। বাড়ী বিশেষ অধিকার করিয়া প্রেত বাস করে বা উপদ্রব করে।

(৬) **প্রেতালাপ** (Spirit communication) আবিষ্ট ব্যক্তির দেহে ভর করিয়া, স্বতঃ কথনে বা স্বতঃ লিখনে বিদেহ আত্মারা আত্মপরিচয় দেয়।

বৈজ্ঞানিকেরা কোনো নূতন ঘটনার পরিচয় পাইলে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রথমে নানা পদ্ধতিতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। প্রমাণ ও সাক্ষ্য বলে ঘটনার সত্যতা প্রতিপন্ন হইলে বৈজ্ঞানিক তখন কারণ নির্ণয়ে যত্নপর হন। আধুনিক চিৎতত্ত্বসভা (S. P. R) অসংখ্য ঘটনা সংগ্রহ করিয়া বা পরীক্ষা বলে বার বার ঘটাইয়া তর্ক যুক্তি ও প্রমাণ বলে স্থির নিশ্চয় হইয়াছেন যে, অলৌকিকের কাজ মিথ্যা, মতিভ্রম, কুসংস্কার বা জুয়াচুরী প্রবঞ্চনা নহে। সন্দেহবাদী যে কেহ সভা প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিলে স্বচক্ষে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

এখন কর্ত্তব্য ইহাদের কারণ ব্যাখ্যা। চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সভা আসলে সত্যপিপাসু বড় বড় বৈজ্ঞানিকের যত্নে ও কর্ত্তৃত্বে গঠিত। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান অনুমোদিত পথের পথিক। কেন না, বিজ্ঞানের প্রধান কাজই হইতেছে প্রাকৃতিক রাজ্যের খাপছাড়া, উদ্ভট ঘটনাগুলিকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীনে আনা, পরিচিত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ও তদন্তর্গত ঘটনাগুলার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা প্রাচীন যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, তাই তাহারা নানা কাল্পনিক গল্পে ও কাহিনীতে নিজ নিজ মনের মত করিয়া ব্যাখ্যা করিত। বিজ্ঞান আসিয়া এই সব আপাতঃ বিযুক্ত রাজ্যের মধ্যে ঐক্য ও যোগ স্থাপন করে। কতকগুলা অভ্রান্ত নিয়মেরই বিচিত্র খেলা বলিয়া প্রকৃতির কার্য্যকলাপগুলিকে বুঝাইয়া দেয়। এতকাল পরে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির বাহিরে যে একটা বিশাল অব্যক্ত অংশ আছে তাহার প্রমাণ পাইয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায় বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলি তাহার প্রমাণ। বিজ্ঞানবিদ্‌দের দৃঢ় ধারণা যে, এই যে অব্যক্ত রাজ্য ইহাও ব্যক্ত ও আবিষ্কৃত রাজ্যের একটা অংশ, কেবল এ পর্য্যন্ত অজানিত অপরিচিত। ইহারও কার্য্যকলাপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটিতেছে, তবে সে সব নিয়ম মানবের বোধগত নয়। সুতরাং তাহাদের এখন কাজ হইতেছে, ইহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাকে, এক মহা কারণ সূত্রে গ্রথিত করিয়া বহুকে একে পরিণত করিয়া তোলা।

বৈজ্ঞানিকের কারণ নির্ণয় পদ্ধতিটা খুব সহজ, সরল ও বিচার-বুদ্ধি-সম্মত। ঘটনা মাত্রেই অধিকাংশ স্থলে ব্যক্ত, কারণ অব্যক্ত। এই অব্যক্ত কারণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখিলেই সাধারণ মানুষ ইহার কারণ জানিতে ব্যস্ত হয়, জানিতে না পারিলে একটা অনুমান বা আন্দাজ করে। দুচার জনে দুচারটা অনুমান করে। যার অনুমানটী সব চেয়ে সঙ্গত স্বাভাবিক ও সম্ভবপর, সেইটাই সাধারণতঃ গ্রাহ্য হয়। বৈজ্ঞানিকদেরও এই পথ। তাহারাও প্রথমে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া কারণ অনুমান করেন। দুচার জন বৈজ্ঞানিক দুচারটী অনুমান করেন। এই অনুমানকে Hypothesis বলে। কোন্‌টী গ্রাহ্য হইবে? সাধারণতঃ যেটী জানিত উপায়ে বেশী ভাগ নূতন ঘটনার সম্ভবপর ব্যাখ্যা করিতে পারিবে তাহাই গ্রাহ্য

হইবে। এইরূপ অনুমান একটা না করিলে বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে পারেন না। অনুমানটা যদি সত্যই হয় তাহা হইলে একটা কল্পিত ঘটনা ইচ্ছানুযায়ী ফল প্রসব করিতে পারিবে। যদি ঘটনাটা সেই ফল প্রসবই করে তবে বুঝা গেল 'অনুমান'টা কতকটা সত্য বটে। এইরূপ অনুমানকে working hypothesis বলে। কালে যদি এমন ঘটনা ঘটে যা এই অনুমান দিয়া ব্যাখ্যাত হয় না, আর অব্যাখ্যাত ঘটনার সংখ্যা ব্যাখ্যাত ঘটনার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী দাঁড়ায়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক নির্ম্মম ভাবে তাঁর প্রিয় অনুমানটীকে বর্জ্জন করেন। জড় বিজ্ঞান রাজ্যে এরূপ প্রিয় অনুমান বর্জ্জন অনেক বার ঘটিয়াছে। Newton এর Corpuscular Theory of light মনে করুন।

নানা ব্যাখ্যা লইয়া চিৎতত্ত্ব সভার সভ্যগণ প্রধানতঃ তিনটী দলে বিভক্ত। একদল বলেন—'সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারই টেলিপ্যাথী ও অব্যক্ত চৈতন্য (Subliminal self) দিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ভূত প্রেতের এ সবে কোন হাত নাই, থাকারও কোনো দরকার দেখা যায় না।" Frank Podmore প্রভৃতি এই দলের অগ্রণী। দ্বিতীয় দল বলেন "সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারের মূলে বিদেহ জীবাত্মার ইচ্ছা ও চেষ্টা টেলিপ্যাথী শরীরী আত্মারই জ্ঞানলাভ পন্থা; টেলিপ্যাথী মূল কারণ নয়, একটা কার্য্যপদ্ধতি মাত্র।" বিবর্ত্তনবাদী ডারুইনের স্বনাম ধন্য সহযোগী Sir A. R. Wallace এই দলের অগ্রণী। তৃতীয় দল বলেন—"দুই-ই সত্য; কতকগুলা অলৌকিক ব্যাপার জীবন্ত ব্যক্তিরই টেলিপ্যাথী বলে ঘটে, বাকীগুলা বিদেহাত্মার টেলিপ্যাথী বা সাক্ষাৎ সংযোগে ঘটে। অতীন্দ্রিয়দর্শন বা ছায়াদর্শন (সজ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক) জীবন্ত ব্যক্তির টেলিপ্যাথী শক্তি বলে ঘটে। কিন্তু মৃতব্যক্তির প্রেতদর্শন বা প্রেতালাপ, এ সব প্রেতেরই কাজ, হইতে পারে প্রেত পরলোক হইতে টেলিপ্যাথী বলে মিডিয়মে এই সব জ্ঞান সঞ্চার করে; হইতেও পারে প্রেত আবিষ্ট মিডিয়মের দেহযন্ত্র অধিকার করিয়া নিজে বলে বা লেখে। টেলিপ্যাথী বলিলেই যে প্রেতের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় তাহা নহে। জীব-আত্মার কতকটা জ্ঞানলাভ দেহীর ইন্দ্রিয় সাহায্যে হয়; কতকটা বা অতীন্দ্রিয় উপায়ে হয়। ফলে টেলিপ্যাথী আত্মারই একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় উপায়। মৃত ব্যক্তির আত্মা ও জীবিত ব্যক্তির আত্মা একই জিনিস। একাবস্থায় দেহরূপ যানবাসী; অপর অবস্থায় স্থূল দেহহীন হইলেও সূক্ষ্মদেহরূপ যানবাসী। দেহাবস্থায় আত্মা দরকার হইলে এই সুপ্ত টেলিপ্যাথী শক্তির প্রয়োগ করে মাত্র।" Sir Oliver Lodge, F. W. H. Myers, প্রভৃতি এই দলের অগ্রণী।

প্রেতবাদীরা বলেন স্বতঃকথন ও স্বতঃভাষণের ব্যাপারগুলি ও প্রেতপ্রাপ্ত অন্যবার্ত্তাগুলি (cross correspondence) নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে প্রেতের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে একরূপ নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। বেশ বুঝা যায় যে, আবিষ্ট দেহে একটা অন্য চৈতন্য অধিকার করিয়া বার্ত্তা দিতেছে।

এই চৈতন্যের স্বরূপ বিচার করিতে গেলে নিম্নলিখিত পাঁচটী অনুমান মনে আসে:—

(ক) হয়তো উক্ত চৈতন্যটী মিডিয়মের নিকটবর্ত্তী অন্য কোনো লোকের মনোযোগ অথবা গুপ্তচৈতন্য; অতীন্দ্রিয় উপায়ে মিডিয়মের দেহে তাহা নিজের মনোগত ভাবের প্রতিধ্বনি তুলিতেছে (Telepathy)

(খ) হয়তো উক্ত চৈতন্যটা মিডিয়মেরই অব্যক্ত আত্মচৈতন্য। ক্ষমতা বলে উপস্থিত অনুপস্থিত কাহারো মন হইতে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহ করিতেছে (ইহাও টেলিপ্যাথী), বা মিডিয়মের সুপ্ত বিস্মৃত জ্ঞান মোহাবস্থায় জাগিয়া উঠিতেছে —

(গ) হয়তো উক্ত চৈতন্যটা পরলোকবাসী অমানব কোনো সূক্ষ্মদেহী স্বতন্ত্র জীবের—সর্ব্বজ্ঞতাগুণে নরদেহীর মন হইতে সংবাদ যোগাড় করিয়া মিডিয়ম-মুখে প্রকাশ করিতেছে।

(ঘ) হয়তো মিডিয়ম চৈতন্য অনন্ত চিদাকাশপট হইতে মৃত জীবের জীবনকালে ভাবিত ভাবনার ছাপ পাড়িয়া সংবাদ

যোগাড় করিতেছে। Astral আকাশে এরূপ চিত্তবৃত্তির thought form ভাবরূপ থাকিতেও পারে। গ্রামোফনের রেকর্ডে যেমন স্বরের ছাপ থাকে।

(ঙ) হয়তো বা উক্ত চৈতন্য সত্তাই পরিচারকারী মৃত মানুষেরই আত্মা আবিষ্টের জড়দেহকে অবলম্বন করিয়া জড়জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে।

ইহাদের মধ্যে সত্য কোন্ চৈতন্যটী তাহাই মীমাংসার বিষয়। মীমাংসা করা অসম্ভব না হইলেও খুব কঠিন ব্যাপার। কঠিন এই জন্য যে, এই চার প্রকারের অনুমানের সবগুলাই কম বেশী কতক মাত্রায় সঙ্গত ও সম্ভব।

পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রে কারণ নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি আছে। যদি একটা কার্য্যের ৫টা সম্ভব কারণ অনুমান করা হয়, কোন্টা তার মধ্যে ঠিক কারণ? ক, খ, গ, ঘ, ঙ, এই পাঁচটী অনুমিত কারণ। যদি যুক্তিবলে দেখান যায়, ক, অবর্ত্তমান, খ, অসম্ভব, 'গ' এর ফল অন্যরূপ, 'ঘ' অক্ষম, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত যে 'ঙ' হইতেছে কারণ। এ ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করাই উচিত।

(১) টেলিপ্যাথী

টেলিপ্যাথীতে দেখা যায় এক সজ্ঞান সচেষ্টচিত্ত অতীন্দ্রিয় উপায়ে অন্য চিত্তে নিজ ভাবিত চিন্তা বা কল্পিত মূর্ত্তি জাগাইতে পারে। প্রেতবৈঠকে এমন আলাপের বিবরণ পাওয়া যায়, যাহাতে বুঝা যায়, মিডিয়ম এমন সব খবর দেয় যাহা উপস্থিত জনবর্গ ঘুণাক্ষরে কিছু জানিতেন না, বা সামান্য পরিমাণেও যা জানিতেন তাহা বহুকাল হইল তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন, সে সময়ে সে সব চিন্তা করা তো দূরের কথা। মিডিয়মও জীবনে কখনো সে সব কথা জানিতেন না বা জানিবারও সম্ভব ছিল না। যাহাতে টেলিপ্যাথীর কোনো রকম গন্ধ ছিলনা এমন সব ঘটনা অতি সাবধানতার সহিত এই সব পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা হইয়াছিল, তথাপি প্রদত্ত সংবাদগুলা আশ্চর্য্য রকমে puzzling. তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য। R. -mondএর ফটোর কথা যখন প্রথমে V Peter, কর্ত্তৃক বৈঠকে তোলে তখন সে ফটোর ডেভেলপ্ করা হয় নাই, নেগেটিভ অবস্থায় ক্লাস্কে পড়িয়া ছিল; পরবর্ত্তী বৈঠকে যখন ফটোর বিশেষ বিবরণ Raymondএর প্রেত কর্ত্তৃক দেওয়া হয়, তখনও উহার অস্তিত্বের কথা ইংলণ্ডে কেহ জানিত না। (উক্ত অধ্যায়ের তৃতীয় দৃষ্টান্তটীও এই ধরণের। ডাক্তার থবনটন, তাঁহার কন্যা মে, এবং তাঁহার পত্নী কেহই জানিতেন না যে তেনবি বেনস্ (প্রেত) আর্জেন্টিনায় গিয়া বিষাক্ত সড়কিতে নিহত হন) এ সব ঘটনায় টেলিপ্যাথীর স্থান কোথা? পাঠক যদি কষ্ট করিয়া সাইকিক্যাল সোসাইটীর প্রকাশক বিবরণগুলি পড়েন তবে এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাইবেন। অথবা সার অলিভার লজের রেমণ্ড বা হিল সাহেবের Psychical Investigations বা New Evidences in P R. পড়েন তাহা হইলেও যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন।—

আর যদিই এমন হয় যে উপস্থিত জনবর্গের কারো না কারো প্রদত্ত সংবাদগুলি জানা ছিল তাহা হইলেই বা কি? তাঁহারা একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, সে সব কথা তাঁহারা বহুদিন হইল বিস্মৃত হইয়াছিলেন বা অন্ততঃ সেই সময়ে কেহ সে সব কথা মনে ভাবেন নাই। পরীক্ষিত টেলিপ্যাথীতে দেখা গিয়াছে, ভাবচালক কেবল সজ্ঞানে ও সচেষ্ট ভাবেই ভাব চালাইতে পারিয়াছিলেন। এই সব বৈঠকে সেরূপ সজ্ঞানে চেষ্টা করিয়া ভাব চালনা করেন নাই। তা ছাড়া যখন তাঁহারা স্থির নিশ্চিতভাবে বলিয়াছেন যে তাঁহারা প্রদত্ত খবরগুলির সম্বন্ধে আদৌ বিদিত নন তখন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিলে (না করাটা অবৈজ্ঞানিক, কেন না, গণ্যমান্য পণ্ডিতেরা জ্ঞানতঃ সত্য নির্ণয়ে বদ্ধপরিকর) টেলিপ্যাথী দাঁড়ায় কোথা?

অবশ্য টেলিপ্যাথী যোগে এ সব সংবাদ সংগ্রহ অসম্ভব নহে, যেখানে প্রদত্ত সংবাদগুলা পরীক্ষকদের চিত্তগত সেখানে টেলিপ্যাথী দিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত; তবে ...দের জ্ঞাত বিষয় বলিয়া সেগুলা যে প্রেত প্রেরিত ...নয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে; কথা এই, প্রেতের বিদেহাস্তিত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া কেহ সেগুলা গণ্য না করিতে পারেন।

(২) জীবন্ত কাহারও সুপ্তচৈতন্য কি এই সব করে ?

মিডিয়মের সুপ্ত চৈতন্য হইতে কি এই সংবাদগুলি আসিতে পারেনা ? পারে - যদি এমন হয় যে কোন এক অতীত সময়ে মিডিয়মের সুপ্ত চৈতন্যে ইহারা প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কিন্তু যদি অনুসন্ধানে স্থিরভাবে নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, মিডিয়ম সে সব কিছু জানিতেন না, এমন কি জানবার কোনো পার্থিব সম্ভাবনা না থাকে ? প্রতিপন্ন হইয়াছে কি ? উত্তরে বলিতে পারি হইয়াছে। মায়ার্স, হজসন, লজ প্রভৃতি তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরা প্রেতের আত্মত্ব (Identity) স্থাপনে বদ্ধপরিকর—তাঁহারা স্বভাবতই এমন চেষ্টা করিতেন যে যাহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে মিডিয়ম সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে এরূপ করা খুব সহজ, মিডিয়মরা মানুষ বটেতো। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান নিশ্চয়ই নহে। এমন সব সংবাদ বহন করানো যাইতে পারে যা মিডিয়ম কখনো তা জানিত না : ধরুন আমার এক আত্মীয় ছিলেন, তাঁহার জীবিতকালে তাঁর সাতে কোনো দূরদেশে থাকা কালে আমার এক অভিজ্ঞতা ঘটে ; জগতে তিনি আর আমি ছাড়া সে বিষয় আর কেহ জানিত না, তাঁহার প্রেত আসিয়া আমায় সে কথা জানাইল, মনে করিয়া দিল। অথবা ধরুন, জীবিতকালে উক্ত প্রেতের সহিত আমার এক প্রতিবেশীর মারামারি হয়, আমি সে কথা আদৌ শুনি নাই ; প্রেত সেই কথার উল্লেখ করিল, আমি পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং গিয়া তদন্তফলে তার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইলাম। এরকম স্থানে মিডিয়মের সুপ্ত চৈতন্যের ক্রিয়া সম্ভাবনা কোথায় ? মিঃ থরণটনের পূর্ব্বকথিত পরীক্ষায় ইহার দৃষ্টান্ত (৩।৩) পাওয়া যায়। তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম দৃষ্টান্ত দেখুন।

মোট কথা বহু দৃষ্টান্তেই দেখা যায় যাহাতে মিডিয়মের সুপ্ত চৈতন্যের কোনো হাত-ই নাই। একমাত্র দেহ মুক্ত সচেতন জীবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছাড়া উহাদের কোনো ব্যাখ্যাই হয় না।

(৩) লোকান্তরবাসী কোনো অশরীরী অমানবাত্মার চৈতন্য কি ?

এরূপ অন্যলোকবাসী সূক্ষ্ম শরীরী জীব থাকিতে পারে কি পারে না, তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। থাকিতে পারে, আমাদের অতীন্দ্রিয় এরূপ কোনো জগৎ বা তাহার তদুপযোগী বাসিন্দার অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব নহে ; সাদৃশ্য-ঘটিত (analogy) অনুমান ছাড়াও কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে এরূপ জীব বা জগতের অস্তিত্ব বুদ্ধিতে ধরা যায়, আচার্য্য হক্সলি তাঁহার Essays on some controverted questionsএ এক স্থানে বলিয়াছেন :—"Without stepping beyond the analogy of what is known, it is easy to people the cosmos with entities, in ascending scale until we reach something practically indistinguishable from omnipresence, omnipotence and omniscience" (page 36)।

ধরা গেল এমন জীব আছে ; কিন্তু তাহারা যে আমাদের planeএ জড়লোকে আসিয়া ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিবে তাহার কোনো প্রমাণ নাই ; আর অমানুষিক শক্তি সামর্থ্য বলে যদি তাহা পারে তাহা হইলে কথিত মৃত ব্যক্তির পার্থিব জীবনের খুঁটী নাটী ঘটনা তারা কেমন করিয়া জানিবে ? পরের ঘরে সর্দ্দারী করা বা অনধিকার চর্চ্চা যদি তাহাদের ব্যবসা হয় ত সে আলাদা কথা। তার পর এমন অশরীরী বা সূক্ষ্ম শরীরী জীবই যদি থাকিতে পারে এবং মর্ত্ত্যবাসী মিডিয়মের দেহ-যন্ত্র অধিকার করিতে পারে তা হইলে মানুষ মরণান্তে ঐরূপ দেহেও থাকিতে পারিবে না কেন ? খুবই সঙ্গত।

(৪) মিডিয়ম আকাশপটে অঙ্কিত (astral world) চিত্ত-বৃত্তির ছাপ ধরিয়া সংবাদ আনে কি ?

কেহ কেহ কল্পনা করেন যে, জীবিতকালে আমাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তির ছাপ আকাশপটে অমরলিপি রচনা করে (Theosophy) ; মিডিয়ম মুগ্ধাবস্থায় আসিলে তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির অস্বাভাবিক প্রাখর্য্যলাভ ঘটে। এই

অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে সে যে কোনো মৃতের জীবিতকালীন চিত্তবৃত্তিগুলি পাঠ করিতে পারে; স্বতঃকথনে ও স্বতঃলিখনের দ্বারা সেই সকল বৃত্তির ছাপ পড়িয়া সে সংবাদ দেয়; এবং দিবার সময় মৃত ব্যক্তির আত্মার মুখ দিয়া তাহারি ধরণে ও সুরে বা লেখার ভঙ্গীতে প্রকাশ করে। ফনোগ্রাফে যেমন সুরের ছাপ থাকে; পরে তাহার উপর দিয়া কাঁটা চলিলে সুরের সঠিক নকল ওঠে, এও তেমনি।

হইতে পারে। বিশ্বব্যাপারে অসম্ভব কিছুই নয়, কিন্তু কথা হইতেছে, কোনো কি এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, আকাশপটে এমন ভাবে চিত্তবৃত্তির ছাপ থাকিতে পারে? আর মানুষ চৈতন্য তাহা অবস্থা বিশেষে পড়িতে পারে? দ্বিতীয় কথা অসম্ভব হিসাবে এই ব্যাপার সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য তাহা, যদি চিদাকাশপটে চিন্তার ছাপ থাকিতে পারে তাহা হইলে মানুষের আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারিবে না কেন? তারপর আর এক কথা, যদি ধরা যায় যে astral আকাশে মৃত্যের অতীত জীবনের রেকর্ড পড়িয়া মিডিয়ম সংবাদ দেয় তাহা হইলে আত্মার নাম দিয়া, তার সুর, ধরণ, ও হাতের লেখার অনুকরণ করিয়া এমন অভিনয় করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহা কি জুয়াচুরীর কাজ নহে? মিডিয়ম কি ইচ্ছা করিয়া জ্ঞানতঃ এই প্রবঞ্চনা করে? মুগ্ধাবস্থায় মিডিয়মের ব্যক্তচৈতন্য লোপ পায়, তবে কে এ প্রবঞ্চনা জুয়াচুরী করে? কেনই বা তাহা করে? মজা বা রগড় করাই কি উদ্দেশ্য? শোককাতর পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু, পুত্র, কন্যা প্রিয়জনের মৃতাত্মা ভাবিয়া বিশ্বাস করিয়া শান্তি সান্ত্বনার আশায় আসিতেছে, তাহাদের সহিত কে সহজচিত্তে এমন প্রবঞ্চনা অভ্যাস করিতে পারে? সমস্ত মিডিয়মই কি এইরূপ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর জুয়াচোর? —অবশ্য এমন ধরণের মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বা 'একটু রগড় করা যাক' ধরণের ভূত আছে, না থাকিবে কেন? মানুষই তো দেহান্তে ভূত? ভূত হইলেই যে সাধু পরমহংস হইয়া যাইবে তার প্রমাণ কি? পৃথিবীতে অসাধু লোক পোষাক ছাড়িলেই কি সাধু হয়? পেঁয়াজের খোসা গেলে পেঁয়াজত্ব যায় কি? এই ধরণের লোক ওপারে গেলেও এই ধরণেরই থাকিবে। কিন্তু সকলেই তো তা নয়। পাঠক বোধ হয় জানেন, চিৎ-তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির প্রথম ও প্রধান উদ্যোগীদের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর Hodgson, Myers, Prof. Sidgwick ও James পরলোকবাসী হইয়াছেন; তাঁহারা সেখান হইতেও সমিতির সেবা ব্রত চালাইতেছেন, Sir O. Lodge প্রভৃতির সহিত আলাপ করিতেছেন, আর প্রমাণ দিতেছেন যে, তাঁহাদের আত্মা সত্যই সজ্ঞানে অবস্থান করিতেছে। এই সব সত্যানুসন্ধি, জ্ঞানবীর ইঁহারাও কি জুয়াচুরী করিতেছেন?

কদাপি না। একটা সহজ, সরল সঙ্গত ও সম্ভব ব্যাখ্যা থাকিতে, অপর একটা অসম্ভব, অবোধ্য অজ্ঞেয় মতের আশ্রয়গ্রহণ ন্যায়ানুমোদিত নহে।

( ) দেহমুক্ত জীবাত্মা চৈতন্য কি?

এ পর্য্যন্ত যত সাক্ষ্য ও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিডিয়মে আবির্ভূত চৈতন্য কথিত গতাসু ব্যক্তিরই আত্মা।

মিডিয়ম আবিষ্ট বা 'ভরযুক্ত' হইলেই জিজ্ঞাসা করা হয় 'তুমি কে?' উত্তরে কারো না কারো নাম শুনা যায়।

অবৈজ্ঞানিক বা private বৈঠকে প্রায়ই লোকে সন্দেহ করে না, প্রেতের সত্যতা মানিয়া লয়, তার কারণ বৈঠকে প্রায়ই এমন লোক যায় যাহার কেহ না কেহ প্রিয় বা আত্মীয়জন মারা গিয়াছে, এ সব শোককাতর লোক বিশ্বাস লইয়াই যায় যে প্রিয়জন স্বর্গে আছে, ডাকিলেই আসিবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে চালিত যার উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয়—এমন বৈঠকের, ধরণ অন্যরূপ, তথায় উপস্থিত থাকেন প্রায়ই যাঁহারা নির্ভীক, তত্ত্বপিপাসু, সত্যানুরাগী, বৈজ্ঞানিক। ইঁহাদের কেহ কেহ শোকপ্রাপ্ত হইলেও শোকমুগ্ধ নহেন, ইঁহাদের কাছে প্রিয়জনের সজ্ঞান অস্তিত্ব অপেক্ষা সত্যের অস্তিত্ব বেশী আদরণীয় ও বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে পাঠক Sir O. Lodge-এর Raymond পুস্তক পাঠ করিলে আমার কথার যাথার্থ্য বুঝিবেন। Sir. Lodge Raymond আত্মাপ্রেরিত সংবাদ পাইয়া এবং সর্ব্বরকমে তার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাইয়া চরিতার্থ ও আনন্দিত কেন? পুত্র স্বর্গে সুখে আছেন বলিয়া? না

—তবে কেন? জীবাত্মা মরণান্তে সজ্ঞানে থাকে বলিয়া? না—তবে কিসের জন্য? তিনি সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। আত্মার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব তাঁহার কাছে হীনমূল্য, উহার যে-কোনোটার সত্যত্বই তার কাছে মূল্যবান।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারীরা খোলসা মন (open mind) লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হন। কোনো একটা প্রিয় মতের উপর আসক্তি বা পক্ষপাতিত্ব দেখান না। প্রমাণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত জন আরথার হিল্ (Psychical Investigationএর গ্রন্থকর্ত্তা) এই শ্রেণীর একজন। তিনি প্রথমে Telepathy ও সুপ্তচৈতন্যবাদী ছিলেন, কিন্তু এগারো বৎসর অক্লান্ত পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণের ফলে প্রেতবাদের সত্যতা বিশ্বাস করেন।

থাক্ অবান্তর কথা। মিডিয়মে প্রেত আবির্ভাব হইলেই জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কে? প্রেত উত্তর দেয় 'আমি অমুক।' পরীক্ষকের এই স্থানে প্রথম কাজ হয় সঠিক প্রমাণ সংগ্রহ করা প্রেত যে সত্যই অমুক ব্যক্তির তার প্রমাণ কি? প্রেত তখন নানা রূপে আত্ম পরিচয় দেয়; নাম ধাম, জাতি গোত্র, ব্যবসা, আত্মীয়স্বজন আলাপী বন্ধু বান্ধবের নাম, কথা কাহিনী, ঘটনা বর্ণনা ইত্যাদি। পরীক্ষকরা দেখেন এ সব কথা বা সংবাদ উপস্থিত কাহারো জ্ঞানগোচরে আছে বা ছিল কি না। যদি থাকে তবে তাহা টেলিপ্যাথী যোগে প্রাপ্ত বলিয়া মঞ্জুর করেন। মিডিয়মেরও সুপ্ত বা জাগ্রত জ্ঞানে ছিল বা আছে কি না তাহাও নিঃসংশয়ে স্থির করা হয়। সব দিক দিয়া যখন দেখা যায়, উপস্থিত জনবর্গের বা মিডিয়মের কিছু না কিছু জানিবার উপায় আছে, তখন প্রেতকে বলা হয় "তুমি এমন প্রমাণ দিতে পার যাহাতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, এ আত্মা তোমারি?" তখন প্রেত নিজ স্মৃতি ভাণ্ডার খুঁজিয়া পাতিয়া সময়ে সময়ে এমন ধরণের প্রশ্ন করে বা গুপ্ত কথার ইঙ্গিত দেয়, যাহাতে উহার আত্মত্ব (Identity) সম্বন্ধে সন্দেহ করা অত্যন্ত মাত্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। তৃতীয় অধ্যায়ে স্বতঃকথন-ভাষণের যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ইহার সত্যতা বুঝা যাইবে; এইরূপ হাজার দৃষ্টান্ত মধ্যে আমি দু' দশটী দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিয়াছি মাত্র, তাহার কারণ গ্রন্থের অযথা কলেবর বৃদ্ধির ভয়। প্রেতের আত্মত্ব (Identity) স্থাপনের জন্য পরীক্ষকরা নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি ঠিক করিয়াছেন:—

(১) প্রেতকে এমন একটা পার্থিব জীবন-ঘটনার উল্লেখ করিতে হইবে যাহা উপস্থিত কাহারও জ্ঞান-গোচরে থাকিবে না।

(২) প্রেতের হাতের লেখা ও গলার স্বর পরিচিত তদ্রূপ কি না।

(৩) প্রেতের পার্থিব জীবনের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কোনো বিশেষ লক্ষণ বা ধরণ (মুদ্রা-দোষ) মিডিয়মের ভিতর দিয়া ধরা পড়ে কি না।

(৪) মিডিয়ম 'অধিকারী' প্রেতকে সজ্ঞানে ফটো দেখিয়া চিনিতে পারে কি না—

পাঠককে যে পুস্তকগুলি পড়িতে অনুরোধ করিয়াছি; তাহা পড়িলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখিবেন এই কয়টী প্রকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম দৃষ্টান্তে রেমণ্ড আত্মা কর্ত্তৃক যে ফটোর উল্লেখ হয় তাহা বৈঠকের কেহই জানিতেন না। স্বতঃলিখনে যে হাতের লেখা পাওয়া যায় তাহা যে মিডিয়মের নয়, অধিকারী আত্মার তাহার প্রমাণ হইয়াছে। বিখ্যাত মিডিয়ম Stainton Mosesএর আবেশ অবস্থায় Blanche Abercombey নাম্নী এক নারীর প্রেতাত্মার ভর হয়; আত্মা মিডিয়মের হাত যোগে এই কয়েকটী কথা লেখে:—

"আপনার সহিত আরো আলাপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি অনুমতি পাইতেছি না; আপনি পবিত্র গূঢ় সত্যের অধিকারী; আমি এখনও (এখানকার) কিছুই জানিনা। এখনো আমার শিখিবার অনেক আছে—অনেক!—এই আমার হস্তাক্ষর আপনার কাছে একটা প্রমাণের কাজ করিবে।

ইতি ব্লান্স এবারকমি।"

মায়ার্স বহুকষ্টে ও যত্নে উক্ত রমণীর হাতের লেখা সংগ্রহ করিয়া মিলাইয়া দেখিয়াছেন, যে সত্যই দুই লিখির হস্তাক্ষর একই (Survival of man p. 182 O. Lodge)

উক্ত পুস্তকের ১৩২ পৃষ্ঠায় এই ধরণের আর একটী দৃষ্টান্ত আছে। St. Moses এর হাত দিয়া এক প্রেতাত্মা লিখিতেছিল; হঠাৎ তার পরিবর্ত্তে আর একজন আরম্ভ করিল; অমনি সঙ্গে সঙ্গে হস্তাক্ষরও বদলাইল। (তৃতীয় অধ্যায় ২য় দৃষ্টান্ত)।

স্বতঃকথনকালে গলার সুরটাও যে অনেক ক্ষেত্রে আলাপকারী প্রেতাত্মারই মত হয়, তাহার উল্লেখ Lodge কৃত Raymond গ্রন্থে পাওয়া যায়।

(Raymond জীবিতকালে 'Good-bye Good Luck' এই কথাগুলি বিদায় বাণী স্বরূপ ব্যবহার করিতেন, প্রেত-বৈঠকেও আলাপান্তে তিনি ঐ কথা বলিয়া বিদায় লইতেন। মিডিয়ম অবশ্য অপরিচিতা নারী, তিনি লজগোষ্ঠীর কাহাকেও জানিতেন না।)

মিডিয়মের ভিতর দিয়া প্রেতাত্মা নিজ ব্যক্তিজীবনের বাচনিক বা মানসিক বিশেষ ধরণ ধারণ প্রতিফলিত করে, তার দৃষ্টান্ত তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তে পাইবেন। Lodge কৃত তাহার উপর মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। কায়িক বিশেষত্ব অনেক সময় স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে। Raymond গ্রন্থে উহার উদাহরণ আছে। জীবিতাবস্থায় Raymond এর একটা বিশেষত্ব ছিল, ভাইদের সঙ্গে দেখা হইলে বা আলাপচারি করিয়া সন্তুষ্ট হইলে ফূর্ত্তি বশতঃ ঘাড়ে চাপড় দিত; কয়েকটী বৈঠকে Raymondএর বড় ভাই Lionel বা Alec উপস্থিত ছিলেন, Raymond আত্মা আলাপ করিতে আবির্ভাব হয়; মিডিয়ম অধিকার (Control) করে ফেডা নাম্নী বালিকা আত্মা; ফেডা সংবাদবাহিনী; Raymond আত্মা Lionelএর পিঠ চাপড়াইতে থাকে; অবশ্য Lionel তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

কায়িক লক্ষণ ধরিয়া প্রেতের আত্মত্ব প্রমাণের আর একটী দৃষ্টান্ত আরথার হিলের Psychical Investigation গ্রন্থে পাওয়া যায়। হিল্ সাহেবের মিডিয়ম সজ্ঞানে দিব্যদর্শন বলে (clairvoyance) প্রেতলোকের পরিচয় পাইতেন। একটা বৈঠকে মিডিয়ম কতকগুলি প্রেতাত্মার পরিচয়; প্রত্যেকের নাম, আকার প্রকার, ধরণ, কথা কহিবার হাসিবার ভঙ্গী ইত্যাদি। সবই ঠিক মিলিয়া যায়। উঁহারা হজসন, মায়ার্স, সেজউইক, গর্নি প্রভৃতি সাইকিক্যাল সোসাইটীর স্থাপনকর্ত্তা ছিলেন। হজসন সম্বন্ধে মিডিয়ম নাম না করিয়া বলে—"আর একজন এদের সঙ্গে আছেন; খুব হাসেন, এখনো হাসছেন আর কথা কচ্ছেন, হাসবার সময় মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দেন।" আরথার বুঝিতে পারেন তিনি হজসন্। তাঁহার ঐটী বিশেষ ধরণের লক্ষণ ছিল; হাসিবার সময় মাথাটা পিছন দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত।

এ পর্য্যন্ত সমিতির (S. P. R.) সভ্যেরা মিসেস্ পাইপার প্রভৃতি মিডিয়ম যোগে Myers আত্মার সহিত যত আলাপ করিয়াছেন, তাহা স্থিরভাবে আলোচনা করিয়া Sir O. Lodge নিম্নলিখিত মন্তব্যটী প্রকাশ করিয়াছেন:—"Whatever else they are, they are eminently communications from a man of letters, to be interpreted by scholars and they are full of obscure classical allusions. * * * Such as exhibit a range of study far beyond that of ordinary people—beyond my own for instance—and beyond that of any one present at the time." (Survival p. 324) অর্থাৎ মায়ার্স আলাপের অন্য মূল্য যাই হোক, এটা ঠিক যে এ সবের বক্তা যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি তার আর ভুল নাই; তাঁর উক্তিতে এমন সব প্রাচীন বিদ্যার উল্লেখ আছে যা বুঝতে বা বুঝাইতে প্রাচীন সাহিত্যে পণ্ডিত লোক দরকার হয়—এত নানাবিষয়ক শাস্ত্রের জ্ঞান যা সাধারণে পাওয়া যায় না, আমিও অতদূর পণ্ডিত নই, বৈঠকে উপস্থিত জীবিতদের মধ্যে কেউ যে ততদূর পণ্ডিত তাও আমি জানি না।

তা ছাড়া প্রামাণিক যত প্রেতালাপ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া এই কায়িক মানসিক ও বাচনিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া Sir O. L. বলেন—"The peculiarities, the attitudes, the little touches of manner are often more or less faithfully reproduced, although the medium may have

known nothing of the person concerned."
—Raymond, Part III. p. 360.

বৈঠক শেষে যখন মিডিয়ম আত্মস্থ হয় অর্থাৎ মোহাবস্থা হইতে সজাগ অবস্থায় ফিরিয়া আসে, তখন তাহা হঠাৎ হয় না; ঘুম ভাঙ্গিলেই মানুষ পূর্ণ চেতন হয় না, কয়েক মুহূর্ত তার 'ঘোর' থাকে; সেটা আধ ঘুম আধ জাগরণের অবস্থা। মিডিয়মদেরও পূর্ণ সজাগ হইবার আগে ঐরূপ একটা 'ঘোর' লাগা অবস্থা থাকে, Dr Hodgson এই অবস্থাটীকে Subliminal Stage (মোহের ঘোর) বলেন এই অবস্থায় মিডিয়ম অধিকারী প্রেতাত্মাদের চলিয়া যাইবার অবস্থায় দেখেন; কখনো কখনো পূর্ণ সজাগ অবস্থায় এইরূপ দৃষ্ট প্রেতদের চেহারা স্মরণ করিতে পারে; দেরী হইয়া গেলে আর মনে থাকে না।

সার অলিভার লজ বলেন, ১৯০৬ সনের ৩রা ডিসেম্বরের বৈঠক শেষে তিনি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, অধিকারী আত্মার জীবিতকালীন ফটো দেখাইলে মিসেস্ পাইপার চিনিতে পারিবেন কি না। উক্ত বৈঠকে Mr. Marble নামক এক মৃত ব্যক্তির আত্মা তাহার উপর আবিভূর্ত হয়, সে ক্ষেত্রে সংবাদ গ্রাহক ছিল Mrs. Grove; Mr. Marble উক্ত Mrs. Groveএর এক বন্ধু। মিডিয়ম Mrs. Piper জীবনে কখনো এই Marbleকে চেনেন নাই ও দেখেন নাই। মিডিয়মের মোহান্তে ঘোর অবস্থায় সার্ লজ্ মৃত মার্ব্বেল সাহেবের একটা ফটো লইয়া আর দশবিশ খানা ফটোর সঙ্গে মিশাইয়া উহাকে দেখান, এবং জিজ্ঞাসা করেন, "ইহাদের মধ্যে কাহাকেও তুমি এইমাত্র দেখিয়াছ কি না?" মিসেস্ পাইপার মনোযোগের সহিত সবগুলি নাড়া চাড়া করিয়া মার্ব্বেলের ফটোখানা হাতে করিয়া বলেন, "একে যেন কোথায় দেখিয়াছি, মনে পড়িতেছে না কোথায়।" দ্বিতীয় দিন অন্য কতকগুলা ফটোর সঙ্গে সেইটিকে মিশাইয়া আবার দেখিতে দেন। মিসেস্ পাইপার পুনরায় মার্ব্বেলের ফটোখানাকে ইঙ্গিত করেন। মোহভঙ্গের ১॥০ ঘণ্টার মধ্যে ইহা ঘটে। মিসেস্ পাইপারের কথা "That is the man I saw I saw him. That is the man I saw Mr. Hodgson pushed him up to the front"

প্রেতের আত্মত্ব প্রমাণ করিতে যা কিছু কলকৌশল অবলম্বন দরকার তা করা হইয়াছে, এবং সব কৌশলই সার্থক হইয়াছে। তথাপি আর এক অভিনব উপায় অবলম্বিত হইয়াছে; অতঃপর ইহার পরিচয় দিব। এই নূতন উপায়কে Cross correspondence (ভগ্নবার্ত্তা) বলে। জিনিসটা এই:—তিন চার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বৈঠক করিয়া প্রেতকে অনুরোধ করা প্রত্যেক স্থানের মিডিয়মের ভিতর দিয়া যুগপৎ এমনভাবে এমন এক বার্ত্তা পাঠানো যাহাতে প্রত্যেক স্থানের পরীক্ষক প্রাপ্ত বার্ত্তার মর্ম্ম বুঝিতে না পারে, কিন্তু সমস্ত বার্ত্তাগুলি একসঙ্গে যোগ করিলে তখন একটা গোটা মানে হয়। একটা কল্পিত দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝানো যাউক। ধরুন—ঢাকা, দিল্লি, বম্বে ও ভাগলপুর চার জায়গায় চারটী বৈঠক হইয়াছে,—দিল্লির বৈঠকে একটা বার্ত্তা আসিল, 'মধু সুখেই আছে।' ভাগলপুরের বৈঠকে—বার্ত্তা আসিল 'বিপিনকে নিশ্চিন্ত হতে বলো।' বম্বের বৈঠকে বার্ত্তা আসিল 'যার জন্যে শোক করছে সেই।' ঢাকাতে বার্ত্তা আসিল—'এতে তার অনিষ্ট হচ্ছে।'.... ঢাকার বৈঠকে নবীন নামে এক লোক তাঁর পিতার প্রেতআত্মার নিকট হইতে মধুনামক মৃত ভাইপোর সংবাদ জানিতে আসিয়াছেন; বিপিন তাঁহার ভ্রাতা। মিডিয়ম প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন, 'এতে তার অনিষ্ট হচ্ছে।' আর কিছু না। ইহার মানে বুঝা গেল না। এইরূপ প্রত্যেক বৈঠকে প্রাপ্ত সংবাদটা আংশিকভাবে অর্থহীন। তারপর সমস্ত অংশগুলা সমিতির আপিসে পৌছিল; এইরূপ ভগ্নবার্ত্তার অর্থ উদ্ধার করা যাঁর কাজ তিনি সব গুলি যোগ করিয়া ঠিক অর্থ বাহির করিলেন। দাঁড়াইল—'বিপিনকে নিশ্চিন্ত হতে বলো, যার জন্যে শোক করছে সেই মধু সুখেই আছে; এতে তার অনিষ্ট হচ্ছে।' এই পাঠোদ্ধার ব্যাপার বড় শক্ত ও জটীল, বার্ত্তার দৈর্ঘ্য ও জটীলতা অনুসারে অর্থোদ্ধার কাজ শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ফল হিসাবে এই শ্রম ও কালব্যয় সার্থক। এরূপ ভগ্নবার্ত্তা প্রেরণ প্রেতের পক্ষে সজ্ঞান চেষ্টার ফল। আত্মত্বের প্রমাণ দিয়া সমিতির কাজে সাহায্য করার নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বশতঃই প্রেতরা এই প্রণালীতে বার্ত্তা

পাঠাইতে রাজী হয়। এরূপ মতলব না থাকিলে উহাদের এরূপ বাজে খাটুনিতে মন উঠে না। সুতরাং কোন্ শ্রেণীর মুক্তাত্মা এইরূপে বার্ত্তা পাঠাইতে চেষ্টা করিবে? নিশ্চয়ই যাঁহারা জীবিতকালে এই সমিতির সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রেততত্ত্বের প্রধান Myers জীবিতকালে তাঁহার বিখ্যাত (Human personality) গ্রন্থে এইরূপ ভাবে প্রাপ্ত বার্ত্তার প্রামাণিক মূল্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

সমিতির মৃত সভ্যরাও এই উপায়ে প্রেতের ঐহিক ব্যক্তিত্বের (terrestrial Individuality and its Identity) ও আত্মত্বের প্রমাণ হইতে পারে বলিয়া যেন বুঝিয়াছেন। ফলে সিজউইক, হজসন ও Myersএর পরলোক গমনের পর হইতেই এই ধরণের ভগ্নবার্ত্তা নিয়মমাপিকভাবে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে (১৯০০-০৬) সমিতির বার্ষিক বিবরণীর ২০ সংখ্যক ভলুমের ২০৭—২৭৫ পৃষ্ঠায় এই জাতীয় অতি-প্রামাণিক এক বার্ত্তা লিপিবদ্ধ আছে। সমিতির অন্যতম সভ্য মিঃ পিডিংটন ভগ্নবার্ত্তা প্রেরণের এক উন্নত ও অধিক মাত্রায় প্রামাণিক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

মৃত সভ্যদিগের মুক্তাত্মা কর্ত্তৃক ভগ্নবার্ত্তা প্রেরণের সজ্ঞান চেষ্টায় বেশ বোঝা যাইতেছে যে, দেহান্তে জীবাত্মার সজ্ঞান-অস্তিত্ব সম্বন্ধে মর্ত্ত্যবাসী সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য ইহ ও পরলোকবাসীদের মধ্যে একটা সমবেত চেষ্টা হইতেছে। এই গ্রন্থে 'চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির ইতিহাস' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে 'ভগ্নবার্ত্তা'র একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

মিসেস্ ফরবেশ ও মিসেস্ ভেরাল দুইজনেই মিডিয়ম-ধর্ম্মী; ইহাদের মধ্য দিয়া একদিন একটা ভগ্নবার্ত্তা আসে। ১৯০৪ সাল, ১৬ই অক্টোবর, উভয়েই পরস্পর হইতে অনেক দূরে; কে যে কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহা কেহই জানিতেন না; এই অবস্থায় উক্ত তারিখে দুইজনের হাত হইতে মোহাবস্থায় স্বতঃলিখন বাহির হয়। বার্ত্তা লেখক মিসেস্ ফরবেশের পুত্র। মিসেস্ ফরবেসের লেখার মর্ম্ম—'মা আমি তোমার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, আমার বড় সাধ তুমি আমাকে দেখিতে পাও।' Cambridgeএ অন্যত্র আমি ইহার প্রমাণ দিয়াছি।' মিসেস্ ভেরালের হস্তের স্বতঃলিপি—'আমি মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি বড় সাধ মা আমাকে দেখিতে পায়।' পরমুহূর্ত্তেই মিসেস্ ভেরাল দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলেন মিসেস্ ফরবেস্ তার ড্রয়িং রুমে বসিয়া তার ছেলে Talbot Forbes সম্মুখে দাঁড়াইয়া। উভয় লেখা একই দিনে বাহির হয়। মিসেস্ ভেরাল তখন কেম্ব্রিজে নিজ বাড়ীতে।

আর একবার এই দুই মিডিয়মের মধ্যেই এইরূপ এক ভগ্নবার্ত্তা প্রচারিত হয়। বার্ত্তাপ্রেরক ফরবেস্ পুত্র টেলবট্ ফরবেস্। মায়ের স্বতঃলিপি শেষে এই কথা বাহির হইল 'আমি চলিলাম, আর একজন মিডিয়ম খুঁজিয়া তার হাত দিয়া সংবাদ দিব, তোমার লেখার মানে আরো পরিষ্কার হইবে—'। সেইদিন Cambridgeএ মিসেস্ ভেরালের হাত হইতে টেলবট ফরবেস্ কর্ত্তৃক লিপি বাহির হইল, তাহাতে নিজেদের বাগানের একটা ফার্ গাছের উল্লেখ থাকে; যেখানে লিপির সই হয় সেখানে একটা তরবারি ও শিঙ্গার ছবি অঙ্কিত হইল। বার্ত্তা দুইটী মিলাইয়া পাঠ করা হয়, এবং একটা সঙ্গত অর্থ বুঝা গেল। টেলবট একজন সৈনিক ছিলেন, তাঁহার দলের ব্যাজ ছিল তরবারী ও উপরে ঝুলান একটা শিঙ্গা (bugle) মিসেস ফরবেসের বাগানে একটা Fir গাছ ছিল। ঐ গাছ টেলবট কর্ত্তৃক প্রেরিত বীজ হইতে উৎপন্ন।

এইরূপ Cross-correspondence বা ভগ্ন বার্ত্তার প্রামাণিক মূল্য যে খুবই বেশী তা সহজেই অনুমান হয়। বার্ত্তাপ্রেরক প্রেত ও বার্ত্তাগ্রাহক মানুষের মধ্যে এ যে একটা পরস্পর বুঝাপড়ার সজ্ঞান চেষ্টা তার কোনো ভুল নাই। একটী অজ্ঞাত বার্ত্তার অংশ এখানে, অংশ ওখানে এবং আর এক অংশ অন্যত্র দেখা দিতেছে—যাহাদের অংশগত অর্থ হয় না, অথচ সমগ্রের অর্থ হয়—ইহাতে সিদ্ধান্তবৎ মনে হয় যে 'Intelligent co-operation between other than embodied human minds and our own to prove continued existence has become possible.' (Lodge, Survival of Man, p 333)

ক্ষ্যাপার ডাক

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

ঐ যেখানে নীলের মাঝে সুরের হাওয়া সন্তরে
সবুজ ঘাসে পুষ্প ফোটে মৌমাছিদের মন্তরে
বিলিয়ে দি তোর মনপ্রাণে
রসধারার চিরতরুণ সেই মাধুরীর মাঝখানে।

মাঠের মাঝে ঐখানেতে আনন্দেরি সঙ্গীতে
বেণুর রবে ধেনু চবে রাখালদেরি ইঙ্গিতে
ধেনুব সাথে চরে' বেড়ায় নিত্য গো
ঐখানেতেই চিররাখাল সুন্দরেরি চিত্ত গো।

ঐখানেতেই পাখী ওঠে খোস্‌খেয়ালে গুণ্‌গুণি
নদীব ধারে ছুটে চলে কলতানের আল্‌বুনি
মৌন মেঘের অঞ্চলে
আলোর মালা খোলা হাওয়ার হিন্দোলাতে সঞ্চলে।

পরিশ্রমের আনন্দেরে মূর্ত্তি দিয়ে বাঞ্ছিত
প্রাণের বেগে গাহে হোথায় কৃষক চিরলাঞ্ছিত
আপন মনে দেয় ধরা
সেই গানেরি মূর্চ্ছনাতে সফলতার অপ্সরা।

ওরে ক্ষ্যাপা ওরে পাগল রসের মাতাল আন্‌মনা
ঐ মাঠেরি মিঠে সুরে প্রাণের দুটো গান শোনা
ভুল যদিই হয় ছন্দ রে
তবু তাতে রবেই প্রাণের প্রচুরতার সুন্দরে।

কমলাকান্ত

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হাস্যরসাত্মক রচনা

কবিবর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন —বঙ্গভাষায় 'শুভ্র নির্ম্মল সংযত হাসি' সর্ব্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই আনয়ন করেন, তিনিই দেখাইয়াছেন অশ্লীলতার বহুদূরে থাকিয়াও হাস্যরসের বিমল উৎস উৎসারিত করা যাইতে পারে। কিন্তু কমলাকান্তের হাস্য রসাত্মক রচনা আরও উচ্চাঙ্গের, শুধু হাস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার বলিয়াই উহা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, উহার ভিতর যে জ্ঞানশিক্ষা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যে সমাজহিতৈষণা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার জন্যই ইহার সমধিক প্রতিপত্তি। কবি বাহ্য হাস্যের আবরণে করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি চাপিয়া রাখিয়াছেন, পাঠকও প্রথমে হাসিয়া লইবে, কিন্তু যখন অভিনিবেশের দর্পণে সেই হাস্যধারার মধ্য দিয়া ক্রন্দনের লহরী ওতপ্রোত ভাবে বহিতে দেখিবে, তখন তাহারও নয়নযুগল অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিবে। এই হাসিকান্নার গঙ্গা যমুনার ধারা সেচনে হৃদয়ে যে মধুর ভাবতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে তাহাই দুঃখ-বিষাদবেলা প্রহত করিয়া পাঠককে শান্তির অভিনব কূলে তুলিয়া দিতে সাহায্য করিবে। 'উদর দর্শন' হইতে 'বাঙ্গালীর পলিটিক্স' সব কয়টী হাস্য-রসাত্মক রচনাতেই একই সুর ধ্বনিত হইতেছে, সে সুর ক্রন্দনের, হাস্যের নহে। যে স্থানে কমলাকান্ত পুরুষার্থের উপায় সম্বন্ধে পরিশ্রম ও বলের কথা বলিতেছেন, সেখানেও তিনি কান্না চাপিয়া মৌখিক হাস্যের চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। যথা—পরিশ্রম, উপযুক্ত সময়ে উদরস্থ অন্ন-ব্যঞ্জন, তৎপরে নিদ্রা তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের নাম পরিশ্রম; অথবা বল ষড়বিধ—মৌখিক, অভিসম্পাত গালি নিন্দা প্রভৃতি, হস্তে কিল চড় প্রদর্শন, পাদ—পলায়নাদি, চাক্ষুষ—রোদন, ত্বাচ—প্রহার সহিষ্ণুতা, মানস—দ্বেষ হিংসা। তাই কমলাকান্ত হাস্যের আবরণে কান্না চাপিয়া বলিতেছেন—পরিশ্রমে যদি উদরপূর্ত্তি হয়, তবে বাঙ্গালী বাবুরা কেরাণী কেন? বলে যদি আত্মোন্নতি হয়, তবে তাহারা পড়িয়া মার খায় কেন?

যখন মির্জ্জার প্রবন্ধের সহিত সরস বাক্যালাপের পর একটি পতিত আত্মাকে আলোকে আনিয়াছি, এই ভাবিয়া কমলাকান্ত আনন্দ অনুভব করিলেন, তখন তিনি ভাবেন নাই তাঁহার এই হাস্যমধুর রচনায় চেষ্টা করিলে কত অধমাত্মা আলোকে আসিতে সমর্থ হইবে। বিচারের কূটতর্ক হাস্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিবার অসামান্য ক্ষমতা ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। কমলাকান্তের নিকট ঢেঁকির মাহাত্ম্য অপরিজ্ঞেয়, ঢেঁকি আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী, তাই অনুসন্ধান করিতে ঢেঁকিশালে গিয়া দেখিলেন—ঢেঁকি বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি থানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই; ভাবিলেন, মুহুর্ম্মুহু থানায় পড়াই কি ইহার মাহাত্ম্য? এইপ্রকার গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-পরম্পরা তাঁহার চক্ষে প্রখর সূর্য্য কিরণে প্রভাসিত হইল, দেখিলেন রমণীর পাদপদ্মই ঢেঁকির পিঠে পড়িয়া তাহাকে পরোপকার ব্রতে ব্রতী করিয়াছে, তাই মুগ্ধ কমলাকান্ত সেই সর্ব্বমঙ্গলবিধাত্রী রমণীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিলেন—'এস মেয়ে মনুষ্যের শ্রীচরণ। তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়। কি করিব? কাঁসার মল পরাই!' এই যে কৃতজ্ঞতার বশে চমৎকৃত হইয়া কাঁসার মল পরাণ ইহাতে কমলাকান্ত বাঙ্গালার জাতিগত এক ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। বুঝি বা এমনি করিয়াই আমরা দেশের সেবক সাহিত্যের

ধুরন্ধরদিগের অপরিশোধ্য ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করি ; আমাদিগের মধ্যে পরার্থে আত্মত্যাগীর সম্যক্ আদর কই, মহাকবির আদর কই, তাই বুঝি ইঙ্গিতচ্ছলে কমলাকান্ত এই মল-পরাণ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসারও এক প্রকাণ্ড ঢেঁকিশালা—কোথাও জমিদার রূপ ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপণ্ড পিশিয়া নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছে। কোথাও বিচারক ঢেঁকি আইন কানুন গড়ে পিশিয়া বাহির করিতেছেন দারিদ্র্য কারাবাস,—ধনীর ধনান্ত, ভাল মানুষের দেহান্ত। আর বাবু ঢেঁকি বোতল গড়ে পিতৃধন পিশিয়া বাহির করিতেছেন পিলে যকৃত।

একদিন কমলাকান্ত জুতা কিনিতে গিয়া জুতাবান্ধা কাগজটীতে 'কমলাকান্তের দপ্তর' লেখা রহিয়াছে দেখিয়া বঙ্গদর্শনের নাম অবগত হইলেন। তার পর বহু অনুসন্ধানের পর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলেন—'মহাশয়, আমার নসীবাবু শ্রীশ্রী৺ বিলান হইয়াছেন বলিয়া অহিফেনের কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে, আপনি আমাকে আফিঙ্গ পাঠাইলে আমি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারি। রচনার বিষয় গুরু, লঘু যে প্রকার বলেন সেই প্রকারই পাঠাইব, আপনি যদি কোটেশন বা ফুটনোট ভালবাসেন, তাহা হইলে লিখিবেন কোন্ ভাষায় দিব ; ইউরোপ ও আসিয়ার সকল ভাষা হইতেই কোটেশ্যান্ সংগ্রহ আছে, আফ্রিকার ও আমেরিকার কতিপয় ভাষার সন্ধান পাই নাই, সেই সকল ভাষার কোটেশ্যানও অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, চিন্তিত হইবেন না। জুনিয়ার খোসনবীশ মহাশয় পেনি ম্যাগাজিন্ হইতে অনেক প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা চাই কি ?' বঙ্গসাহিত্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া কমলাকান্তের হৃদয়-তন্ত্রীতে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহাই এই রচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমের পূর্ব্বযুগে বাঙ্গালা রচনা যে কেবল কোটেশ্যান্ ও ফুটনোটে পরিপূর্ণ থাকিত, প্রাসঙ্গিক হউক অপ্রাসঙ্গিক হউক, অর্থযুক্ত হউক বা অর্থবিহীন হউক, কোটেশ্যান্ হইলেই রচনার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইল এইরূপ ধারণা বঙ্কিমের সমসাময়িক লেখকদিগেরও কাহার কাহার ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এ ধারণা সাহিত্যমহল হইতে এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নিকট হইতে পলিটিক্স লিখিবার জন্য কমলাকান্তের নিকট অনুরোধ আসিল, অহিফেন-প্রসাদপ্রসন্ন চিত্তে লোকের পলিটিক্স-প্রিয়তা চিন্তা করিতে কমলাকান্ত শর্ম্মার জ্ঞাননেত্র ফুটিল ; তিনি লিখিতেছেন —'আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স, কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনাকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্র দর্শন লালসার মত হাস্যাস্পদ করিবার নহে ; হে পলিটিক্স-ওয়ালারা! পিয়াদার শ্বশুরবাটী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছে, তাহাদের পলিটিক্স নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তাহাদের পলিটিক্স। এই পত্র লিখিবার সময় হাস্যরস ফুটাইতে গিয়া লেখকের প্রাণে মর্ম্মন্তুদ কান্নার সুরই ধ্বনিত হইয়াছিল। বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস আবহমান কাল হইতে বঙ্গজাতির কি কলঙ্ককথা বহন করিয়া ফিরিতেছে, কেহ তাহার সত্যতার সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতেও তৎপর নয়। সকলেই বিদেশবাসি কর্ত্তৃক অর্পিত কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতেছে। তাই বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই কলঙ্কের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য দেশবাসিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে, তাঁহারই পদানুসরণে বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণ দেখাইতে সমর্থ হইলেন যে, ঐ সপ্তদশ সৈন্যদ্বারা বঙ্গ বিজয়বার্ত্তা একটা উপকথা মাত্র। তাই বলিতেছিলাম, এই নির্ম্মল পূত হাস্যধারার মধ্য দিয়া দেশের দুর্দ্দশার জন্য আপনি কাঁদিয়া কমলাকান্ত আমাদিগকে দেশের মঙ্গল সাধনে যে উপদেশ আদেশ ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পৃক্ ও কল্যাণবিধায়ক।

করুণরসাত্মক ও দেশাত্মবোধক রচনা

এই বিশ্বসংসারের মহাশিল্পীর অপরূপ কৌশলে সৃষ্টির মধ্যে কত বৈচিত্র্য দেখিতে পাই, কি অপার্থিব প্রেমপ্রবণতা, কি অচিন্ত্য সখ্যতার সূত্রে জীব মনুষ্যকে অচ্ছেদ্য প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। কবি এই প্রেম-যজ্ঞের পুরোহিত ; মানবের দুঃখে, মানবের শোকদারিদ্র্যে

তাঁহার হৃদয়ে যে সহানুভূতির করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠে, বিশ্বের প্রেমে তাঁহার অন্তর যে অদ্ভুত রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা অলোকসামান্য। সাধারণে সে মহিমা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কেবল আনন্দে উদ্বেলচিত্ত হইয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রয়, তাহারা ভাবিতে পারে না এই নির্ম্মল প্রেমোচ্ছ্বাস, এই নিঃস্বার্থ কারুণ্য কোথা হইতে আসিল, তাহারা বুঝিতে পারে না, এই অনিন্দ্য মাধুর্য্যমণ্ডিত হৃদয়খানি কি স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত। কমলাকান্তের কবি-হৃদয়ও ঠিক এমনি ভাবেই প্রেমকারুণ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। পতঙ্গ ভাবিয়া পায় না কেন এই শরীর, ইহা লইয়া সে কি করিবে? নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করে, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করে, কিন্তু তাহাতে সুখ কোথায়? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা; বৈচিত্র্য কই, সুখ কই? তাই সে বহ্নিতে প্রবেশ করিতে চায়; বহ্নি তাহার কে তাহা সে জানে না, কেবল এইমাত্র জানে সে তাহার বাসনার বস্তু, জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, জীবনের আশা, মরণের আশ্রয়। কমলাকান্ত জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন, দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন, মনুষ্যও যে পতঙ্গের মত; নিত্য নবীন পৃথিবীতে সে সুখ খুঁজিয়া পায় না, বহ্নিতে প্রবেশ করিতে যায়; কেহ মরে, কেহ কাঁচে বাধিয়া ফিরিয়া আইসে। সংসার ত বহ্নিময়, কিন্তু আবার কাঁচময়; কাঁচ না থাকিলে সংসার পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত—ভোগবহ্নি, রূপবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নিতে শত শত লোক পুড়িয়া মরিতেছে। এই বাহ্নি কি, মানুষ জানে না, বিজ্ঞান দর্শন বলিতে পারে না, তথাপি সেই অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ঘুরে। এ সংসারে আমরা মন বাঁধা দিতে আসি, যদি চিরকালই স্বার্থ লইয়াই থাকি, যদি সংসারকে নিঃস্বার্থতার পীযুষ ধারায় সিক্ত করিয়া সৌরভময় করিয়া না তুলি, তাহা হইলে মনের সুখ থাকিবে কি করিয়া? যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয় তাহারাও বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্ম সমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। পরের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনও উপায় নাই; ধন যশঃ ইন্দ্রিয়াদি সুখলব্ধ সুখ কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তিদায়ক হইলেও চিরস্থায়ী হয় না; সলিলে অঙ্কিত রেখার ন্যায় অল্পক্ষণ মাত্র থাকিয়া আবার সেই জলস্রোতে মিশিয়া যায়। এ সকল সুখ থাকে না, কিন্তু পরিণামে সুখকর বস্তুর অভাবে ও অপরিতোষণীয় আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান হইয়া উঠে। তবে আমরা যশঃ মানরূপ অর্থের দিকে ছুটিয়া জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই কেন? কমলাকান্ত বলিতেছেন, ইহা কেবল কুশিক্ষার ফলে, মাতৃস্তন পানাদির সহিত ধনমানাদির সারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে থাকে। তাই দুঃখের সহিত মানবহিতাকাঙ্ক্ষী কমলাকান্ত উপদেশ দিতেছেন—কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র উৎস অনুসন্ধান করিয়া বুঝিবে, পরের সুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল নাই। কথাটা প্রাচীন, তথাপি আমরা বুঝিতে পারি না, আত্মাদরের ইন্দ্রিয়জাল কাটাইয়া উঠিতে পারি না বলিয়া বুঝিতে পারি না। নিজের জন্য এত ব্যস্ত থাকি যে পরের কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। এই জন্যই সব হারাইয়া বসি। বিবাহ করিয়া অনেকে পরের সুখের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা করে, কিন্তু যাহারা পারিবারিক স্নেহের গুণে নিজের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত করিতে না পারে, যদি বিবাহ করিয়া নিজের চিত্ত সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিতে না পারে, যদি আত্ম-পরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্য জাতিকে মনুষ্যত্বকে ভালবাসিতে না শিখে, তবে তাহাদের বিবাহই মিথ্যা। জীবনের উদ্দেশ্যই

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনেই জীবনের সার্থকতা, প্রীতিশিক্ষার জন্যই সংসারক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র মাঝে পরিচিত; যেমন অগ্নিতে খাদিকাভাগ লোপ পাইলে স্বর্ণের

নিজস্ব পবিত্রতা ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ সংসারের ঘাত প্রতি-ঘাতের নিষ্পেষণে মনের নিকৃষ্ট ভাগ দূর হইলে মহত্ত্বের উন্মেষে বিশ্বসংসারকে আপন করিয়া লওয়াই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব।

কমলাকান্ত সংসারে একা, তাই মধুমাসে জ্যোৎস্না-ময়ী রাত্রিতে পথিকের মধুর কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীতধ্বনি বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; নদী সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছিল, চারিদিকে একটা বিমল আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছিল, এই সময়ে কেবল কমলাকান্তই একা নিরানন্দ, তাই, ঐ সঙ্গীত বহুতন্ত্রী-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিল। কারণ ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে ত কাহারও একা থাকিবার অধিকার নাই; বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, সেই আনন্দতরঙ্গ তাড়িত সাগর মধ্যে সকলকেই বুদ্বুদ হইয়া মিশিতে হইবে। তাই কমলাকান্ত করুণ কণ্ঠে বলিতেছেন--'কেহ একা থাকিও না, পুষ্প সুগন্ধি কিন্তু ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিলে পুষ্প সুগন্ধি হইত না, পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না।' বাস্তবিক কাহারও একা থাকিবার সামর্থ্য নাই, সঙ্গী হীন বার্দ্ধক্য ক্লেশকর ও যন্ত্রণাদায়ক; যৌবনে পৃথিবী সুন্দরী অনুভূত হয়, প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ আঘ্রাত হয়, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শ্রুত হয়, নির্ঝরিণীর মোহন কলতান শুনিয়া বিহ্বল হইতে হয়; কিন্তু বার্দ্ধক্য যখন ঐ সকল নৈসর্গিক শোভাসৌন্দর্য্য আর প্রীতিপ্রদ হইবে না, তখন সঙ্গী না থাকিলে জীবন মরুভূমি মনে হইবে, কেবলই দুঃখের তপ্ত বালুকাপূর্ণ, শান্তির ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীও তাহাতে থাকিবে না। কিন্তু সঙ্গী নাই বলিয়া একা থাকিলে চলিবে কেন? কেবল সংসার-সঙ্গীত শুনিবার জন্য আকুল হইতে হইবে, প্রীতি ও প্রেমের ললিত মূর্চ্ছনা শুনিয়া মনকে প্রফুল্ল রাখা ত সকলেরই আয়ত্ত। তাই কমলাকান্ত বলিয়াছেন—যদি মনুষ্যজাতির উপর আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না। কত উচ্চ হৃদ্যতা ও মহাপ্রাণতার কথা! স্বার্থজড়িত মানবের পক্ষে ইহা কি সামান্য শিক্ষা—অন্য সুখ, অন্য তৃপ্তি চাই না, কেবল পরোপকারজনিত যে প্রীতি তাহাই একমাত্র সুখের নিদান! কমলাকান্ত এই একই কথা একটি পত্রে বলিয়াছেন—যখন বয়শ্চোর আসিয়া দেহে প্রবেশ করে, দেহকে প্রাচীন করিয়া তোলে, যখন প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, ও নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা তেমন সুন্দর মনে হয় না; যখন, যে কুসুমদাম জীব-নোদ্যান আলো করিত তাহা খসিয়া পড়ে, তখন সেই প্রাচীনতার বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সংসারে মুনিবৃত্তির অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়। কারণ, কাজ কাহারও শেষ হয় না; যৌবনে যাহা করা হয়, তাহা আপনার স্বার্থের জন্য; তার পর যৌবন গেলে সকল কাজই পরের জন্য করিতে হয়। কেহ হয়ত বলিবেন, আমরা আপনার কাজ সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারি নাই, পরের কার্য্য করিব কখন? তাহাদিগকে কমলাকান্ত পরামর্শ দিতেছেন, মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইলেও আপনার কার্য্যের শেষ হয় না, মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই, অন্ত নাই; বার্দ্ধক্যে আপনার কার্য্য ফুরাইয়াছে এই ভাবিয়া পরহিতের জন্য আপনার সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। ইহাই বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, সর্ব্বোচ্চ স্তরের শ্রেষ্ঠ মুনিবৃত্তি। কিন্তু এই পরহিত-ব্রত সাধনের সহিত আর একটি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, যাহাতে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর ও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে; ঈশ্বর-চিন্তা সকল সময়ে, সকল কর্ম্মে একটা দৈনন্দিন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যরূপে পরিগণিত থাকিবে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে সকল অবস্থায়ই ঈশ্বরে আত্মনির্ভরতা ও ঈশ্বরে প্রীতি কল্যাণবিধায়ক ও শান্তিপ্রদ; কিন্তু যখন বৈতরণী পারের কড়ি সংগ্রহের সময় হইয়া আসিবে, তখন ঈশ্বর-চিন্তা সকল কর্ম্মের উপরে, মর্ম্মে মর্ম্মে, শিরায় শিরায় মিশিয়া থাকিবে; ইহাই প্রকৃষ্ট জীবন যাপন; আদর্শ মানবত্বের বিকাশ-সাধন।

কমলাকান্ত স্বদেশপ্রেমিক; দেশমাতৃকার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি। কমলাকান্ত যে দেশের দুঃখে আপনি কাঁদিয়া দেশের লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ

করিয়াছেন শুধু এমন নয়,তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এই সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা, ত্রিদিব জ্যোৎস্নামণ্ডিতা, মন্দার-মালাবিলম্বিতা মন্দাকিনী সলিলশীকরসিক্তা অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি যাহার প্রতি পদক্ষেপে মাধুর্য্য, কমনীয়তা, স্নেহ-প্রবণতা ক্ষরিয়া পড়িতেছে, ইহা বঙ্গমাতার প্রাচীন মূর্ত্তি; আর তাহারই পরে যখন কালের দর্পণতলে মাতার সকল গর্ব্বের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গেল, ঘোর অন্ধকারে বিমল জ্যোৎস্নালোক প্লাবিত হইল, তখনকার এই দীনা চির-দুঃখিতা চির বিষাদখিন্না মাতৃমূর্ত্তি। তার পর কমলাকান্ত ধ্যাননিমগ্ন চিত্তে দিব্যনেত্রে দেখিতেছেন—'সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল, দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ হইল, তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপর সুবর্ণমণ্ডিতা শারদীয় প্রতিমা। এই ত জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নবিভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।' এই সুবর্ণময়ী দেবী প্রতিমাই আমাদিগের বঙ্গজননী, আমাদিগের সর্ব্বার্থ সাধিকা সর্ব্ব-কল্যাণদাত্রী বঙ্গজননী। কিন্তু এক্ষণে সেই লাবণ্য জ্যোতিঃ কই, অধরে সেই বাৎসল্যের স্মিতরেখা কই? কালের ঝঞ্ঝাবাতে সব মিশাইয়াছে; আর ত মাতা আনন্দদীপ্ত বদনে সন্তানের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন না। কমলাকান্ত বলিতেছেন, আমরা দুর্বৃত্ত অধম তনয়; মাতার দুঃখ, মাতার ক্লেশ বুঝি নাই, তাই জননী বিমুখ হইয়াছেন, তাই অনন্ত কাল সমুদ্রে সেই অনিন্দ্য মাতৃ-প্রতিমা ডুবিয়াছেন। এই স্থানে কমলাকান্ত নিজে কাঁদিয়া আমাদিগকে কাঁদাইয়া জগজ্জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'উঠ মা, এবার আমরা সুসন্তান হইব, এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—উঠ মা, ছয় কোটি সন্তানে একত্র দ্বাদশ কোটি করযোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব।' জননী ত উঠিলেন না, তাই কবি আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন—আইস, মাতৃহীনের জীবনের প্রয়োজন কি? আইস, "জয় জগদ্ধাত্রী" বলিয়া প্রতিমা তুলিয়া আনি। তারপর দেশজননীর সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যমূর্ত্তি, দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া যাই—"দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, দক্ষিণে লক্ষ্মীভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা।"

কমলাকান্তের আনন্দ উপভোগ, সঙ্গীত সকলই সেই স্বদেশপ্রেমিকতা ও বিশ্বপ্রাণতায় ভরপুর। সেই মহাবাক্য Love is heaven and heaven is love অর্থাৎ প্রেমই স্বর্গ এবং স্বর্গই প্রেম, তাহা কমলাকান্তের রচনায় সার্থক হইয়াছে। তাহা কবিতার মিলের মত সুরের মধ্য দিয়া গীতের মধ্য দিয়া পর পর গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। গীতের প্রতি মূর্চ্ছনায়, "এসো এসো বঁধু এসো" এই ছন্দের পদে তালে বিশ্বপ্রেমেরই রাগিণী মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার হৃদয়ে মধুরার রব তুলিয়াছে, তাই কমলাকান্ত বুঝিতেছেন মনুষ্য মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, ইহাই মনুষ্য জীবনের পরম সুখ, ইহজীবনে মনুষ্য হৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্য হৃদয় কামনা। মহাত্মা পলের সেই মহাবাক্য আমাদের স্মরণ আইসে "Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep" অর্থাৎ পরের সুখে সুখী হও আর পরের দুঃখে কাঁদ। তাই কমলাকান্ত এই তৃণশস্পাচ্ছন্ন কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসার মধ্যে প্রিয় বাঞ্ছিতকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"আধ আঁচরে বসো" হৃদয়ের অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া বসো, তোমারে 'নয়ন ভরিয়া দেখি'; অনেক দিন দেখেন নাই বলিয়া দেখিবার দিন গণিতেছেন। এই দিন গণনার কথায় কমলাকান্তের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; বিবাহ বন্ধনহীন কমলাকান্ত কেন দিন গণিবেন? তাঁহার ত বিরহ বিচ্ছেদ নাই, তবু তাঁহার দিন গণিবার প্রয়োজন আছে। যে দিন হইতে বঙ্গে হিন্দু নাম লুপ্ত হইয়াছে, যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছে, সে দিন হইতে আমরা দিন গণিয়া আসিতেছি। মনুষ্যত্ব আর মিলিল

কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? আর কি তাহা মিলিবে না? এই স্থলে কমলাকান্তের হৃদয়ের সুপ্ত দেশপ্রেমিকতা জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—'বঙ্গভূমি! তুমি কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তাহা হইলে ত যবন আমার বক্ষে পদাঘাত না করিলে তোমায় পদানত করিতে পারিত না।' তাই ত বাঙ্গালীর সুখের কথায় অধিকার নাই, মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ খেলিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়ে সুখ কই? বাঙ্গালীর কেবল সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন নাই, ইতিহাস নাই, জীবন চরিত নাই, কীর্ত্তিস্তম্ভ নাই—সুখ গিয়াছে, সুখের চিহ্নও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে? দুঃখের আবেগে, শোকের ঝঞ্ঝাবাতে কমলাকান্তের হৃদয়ের বাঁশী ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে কমলাকান্তের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠি, মগ্ন চৈতন্য প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। করুণরসে উচ্ছ্বসিত প্রাণে কমলাকান্ত বলিয়া উঠিলেন—'চাহিবার এক শ্মশান ভূমি আছে নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বঙ্গ জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে হইলে সেই শ্মশানভূমির দিকে চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তরতর রবে চলিয়াছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? সেই রূপ, সেই ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? * * * মনে মনে সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি—কালপূর্ণ দেখিয়া যখন সহসা বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পাখিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূর-কণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। গাঢ়তর গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল, আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজপথ, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীর ভূমি নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে আঁধার আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইল।' কমলাকান্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কমলাকান্ত বিদায় লইলেন। সে বিদায় বর্ণনা কি মর্ম্মন্তুদ, কি কাতরতাব্যঞ্জক, কি নৈরাশ্যক্লিষ্ট—যেন দুঃখের প্রবল আক্রমণে জর্জ্জরিত মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ—আমি একা, একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মিসম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী, তাহার এত বন্ধন কেন? ঘর পুড়িয়া গেল আগুন নিভে না কেন? পুকুর শুকাইয়া গেল এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ভালবাসা গিয়াছে এখনও যত্ন কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিয়াছিল, কোকিলের সঙ্গে গাহিত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে আবার ঋ গ ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে ভাই, আর কান্না কেন? এই স্থলে বর্ণনার চরম হইল; একটা শোকের মূর্চ্ছনা বাজিয়া উঠিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া যেন একটা মধুর অবসাদের সুর ধ্বনিত হইতে লাগিল; যেন চিরশান্ত প্রেমসাগরে একটা দুঃখের ঢেউ খেলিয়া গেল, যেন একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা আসিয়া জীবনের নশ্বরতা বুঝাইয়া দিয়া গেল।

কমলাকান্ত বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর বরেণ্য উপদেষ্টা। যখন হর্ষবিক্ষোভের আবেগকম্পনে আত্মহারা হইয়া পড়ি, অথবা যখন সুখ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গদ্বারা প্রহত হইয়া আপন ভুলিয়া যাই, তখন কমলাকান্তের সেই জলদনির্ঘোষ বাণী গর্জ্জিয়া উঠিবে—"উঠ, জাগ,

মায়ের কাজে আত্মসমর্পণ কর।" এই কমলাকান্তের বচনাই "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উহাই ওঙ্কার ধ্বনি। এই কমলাকান্তের বাণীই আজ জাতীয় মহাসমিতির মধ্যে প্রাণ পাইয়া আমাদিগকে শিখাইয়াছে—

"আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,—
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য-প্রেমের বাতাসে।"

এই জাতীয় ভাব মেঘনির্মুক্ত ইন্দুর মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে আমাদিগের জীবন উদ্ভাসিত করিয়া দিবে, তখন গৃহে গৃহে গীত হইবে,—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

শান্তি

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

তুমি চলে গেলে শেষে কি হবে উপায়,
তোমারে ছাড়িয়ে আমি দাঁড়াব কোথায়!
এতদিন চলেছিনু তব মুখ চেয়ে
পথে পথে ফিরি শুধু তব গান গেয়ে!
পরিত্যক্ত প্রেম আজি বহু ভয়ে লাজে
কি নিয়ে দাঁড়াবে, দেবি, জগতের মাঝে!
বীতরাগে অকরুণ তোমার হৃদয়,
পরিণাম অশ্রুজলে মোর পরাজয়!
রিক্ততার অবসাদে পড়িলাম নুয়ে,
কে তুমি সোণার কাঠি দিলে শেষ ছুঁয়ে!
কোন্ স্বর্গ হ'তে এলে ধূলি মাঝে নেমে
চিরতৃষ্ণা মিটাইতে সুমধুর প্রেমে।
ব্যথাক্ষতঃ প্রাণ মোর ভয়ে ওঠে কেঁপে,
শান্ত কর সুপ্রসন্ন শান্তির প্রলেপে!

মাসিককাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

ভারতী। কার্ত্তিক। আলোর পাথার। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রবাবু এই শ্রেণীর কবিতায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সে সকল শব্দের সহিত আমাদের তেমন পরিচয় নাই তাছাড়া বিদ্যানিধি মহোদয়ের বাংলা অভিধানেও এ সকল শব্দ নাই। শব্দগুলি আমাদের সুপরিচিত না হইলেও কবিতাটি বুঝিবার তেমন অসুবিধা হইত না যদি শব্দগুলির অপূর্ব্ব সমবায়ের একটা অর্থোদ্ধার করিতে পারা যাইত। কবিতাটির যে মেরুদণ্ডটা কোথা তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা, ভাবেরও পৌর্ব্বাপর্য্য বোঝা গেলনা। "মরালের মগজটা দোলন চাঁপার নিথর মোহে" কিরূপ ভরে' আছে তাহা আমাদের দুর্ব্বোধ্য। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির সার্থকতা ও কবিত্ব আমরা উপভোগ করিতে পারিলাম না—

"ভদ্দা কাঠির গম্বুজেতে ময়না জেগে স্বপ্ন দেখে
শিউলিফুলি হাওয়ায় ভেসে ঘাসের ফুলে ফাড়িং ঠেকে"
"পতর আঁটা গতর নিয়ে চলছে গেতে বোঝাই ভরা
মাঝাই বেলার গোড়েন সুরে গোড় দিয়েছে নেহক স্তবা"

*   *   *   *   *

সত্যেন্দ্রবাবুর রচনা বলিয়াই আমরা এ সকল হেঁয়ালীর সমাধান করিতে চেষ্টা করি, নতুবা বরযাত্রীর সভার জন্যই রাখিয়া দিতাম। কবির রচনাভঙ্গি দিন দিন বড়ই দুর্ভেদ্য ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে আমাদের বিদ্যায় আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার ফল ক্রমেই প্রাংশুলভ্য হইয়া উঠিল দেখিয়া আমরা হতাশ। "মান্‌জা আলোয় সাজন সাজে বিজন গেছে যুদ্ধযোগে বাজন বাজে বুকের তালে আয়নাতে মুখ দেখছে ওকে?" এই সকল পংক্তি পড়িয়া কবির অনুপ্রাসকে অনুপ্রাস বলিব না অনুপ্রয়াস বলিব ভাবিয়া পাই না।

কবিতাটির যে সকল অংশ বুঝিতে পারিয়াছি সে সকল অংশ ভাল লাগে নাই এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি আমাদের ভালই লাগিয়াছে—

"দূর কিনারায় পাঁজরখোলা মেরামতের নৌকাখানা
'পড়ে' 'পড়ে' খেয়াল দেখে রঙ্গাদিনের প্রলয় হানা"
"গাছের গোড়া গোলটি করে নিবিয়ে ছায়া স্বায় নিভৃতে
সেই চাতালে রাখাল আসে একটুকু গা গড়িয়ে নিতে"
"আসমানে আর পরাণে আজ সোনার পোড়েন সোনার টানা
শুক্তিধবল মেঘের মেলায় হংসমিথুন মিলায় ডানা"

"আলোর আতর" "আতর ভরা চাউনি" "চাঁপাই আলো" "রূপের সৌরভ" ইত্যাদি শব্দবিন্যাসের পরিমল টুকু বেশ উপভোগ্য। রূপের সহিত গন্ধের মধুর মিলন সত্যেন্দ্রের কাব্যে একটী নূতন সৃষ্টি।

নবকুমার কবিরত্নের "ভোমরার গান" মন্দ হয় নাই। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের গান।" "এযে বাপ চেয়ে কঞ্চি দড়" নকল আসলকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, কবি প্রচুর কুহেলিকার দ্বারা যে প্রহেলিকার সৃজন করিয়াছেন তাহার সমাধান করিবার অবসর আমাদের নাই। কবিতার ১ম কয়েক পংক্তি পড়িলেই 'তাইত তাইত' বলিয়া মাথা চুলকাইতে হইবে। যথা—

"কাজল আঁখির রূপালি সূতার বুনে বুনে পথখানি"

ইত্যাদি

কবি চন্দনচূয়ার জন্য কচুরপাতের ও সোনার পোলকের জন্য চাষীর শরণাপন্ন। কবি বলিয়াছেন "তরু বীথিকার ফাঁকে দেখা যায় টুকরো আকাশখানি" তাঁহার কাব্যরচনের মায়া-অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে টুকুরো আকাশের মত নির্দ্দোষ কবিত্ব ও মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে কঠোর চেষ্টা সত্বেও

কবি মাঝে মাঝে তাঁহার স্বভাব সুলভ কবিত্ব গোপন করিতে পারেন নাই, যথা—

ঝুমকো জবার বেলোয়ারী ঝাড় স্নিগ্ধ আলোর ঝারা?
গন্ধ তৈলে বনের মিছিলে জ্বালায়ে রেখেছে কারা?
কালিচন্দ্রের খালি বুকখানি তিমিরে হারায় দিক্।
এরি মাঝ দিয়ে চুপিচুপি সে গো চলে গেছে ঠিক- ঠিক।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর "এ ধরণী" সুন্দর প্রসাদগুণোপেত কবিতা। কবিতাটি পড়িয়া Tennyson এর Tithonus ও রবীন্দ্রনাথের "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটি মনে পড়ে। ধরণীর আনন্দগুলি শোভাসুষমাগুলি সবই ভঙ্গুর ও নশ্বর। ভঙ্গুর ও নশ্বর বলিয়াই তাহা রমণীর এত প্রিয়। ধরণীর দানে তাই আমাদের একই উল্লাস ধরণীর করুণা লাভে তাই আমাদের এত উৎসব আবার ক্ষতিক্ষয়ে এত হাহাকার। স্বর্গের দান অক্ষয় অম্লান ও অনন্ত তাই তাহার ভোগে উল্লাস নাই লাভে উৎসব নাই যাহা কখনো হারায়না তাহার উপভোগে আগ্রহ ও নাই, যে ধনকে শুধু হারাই হারাই ভাবিয়া বুকে করিয়া রাখিতে হয় তাহার তুল্য অমূল্য আর কি আছে? "দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এই খানেই প্রেমের চরম। যে প্রেমে বিচ্ছেদ ভয় নাই সে প্রেম এ ধরণীর নহে—সে প্রেম অপ্সরীর প্রেম সে প্রেম হৃদয়হীন স্বর্গের তাহা মমতা ভরা অশ্রুশ্যামল মর্ত্তের নহে।

"হায় স্বর্গে অনন্ত জীবন
অম্লান আলোক ভয়ে আসেনা স্বপন,
নয়ন নিমিষহীন ঝরে নাক ফুল,
বসন্তের আয়োজনে নাই কোন ভুল,
প্রেম থাকে চিরবন্দী হয়ে;
মায়াহীন যৌবনের অসীম আলয়ে।

সওগাত। কার্ত্তিক। মোহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত ষড়ঋতু। কবিতায় বিশেষত্ব কিছু নাই। "উষ্ণ দিবা গতে," "স্নিগ্ধ কুঞ্জবন" "নিত্য বারিপাতে" "রাঙ্গাশশী" "শস্যকনবিত" "দীর্ঘ রজনীর একক শয়নে" ইত্যাদি ভাষা বিন্যাস যেমন পুষ্ট নহে তেমনি সরস ও নহে।

সাথী। মোহম্মদ হোসেন। কবিতাটির শেষ শ্লোকটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে—

"দৃষ্টি কোমল শান্ত লো" ও "লহর লীলায় বইছে লো" এই "লো" এবং "লো" মিল নহে। এরূপ স্থলে 'লো' এর আগেকার শব্দ দুইটীর মিল থাকা উচিতছিল "স্বপ্ন দেশের রত্ন কাহারো সাধনে মর্ত্তে" আসিতে পারে না।

"কল্পবনের কমল কলি স্বর্ণজলের হিল্লোলে
আজ চকিতে উঠল ফুটি আলোক বাণীর অঞ্চলে"

এই দুই পংক্তিতে কবি যে সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আদৌ ফুটে নাই আলাঙ্কারিকতার দোষই ফুটিয়াছে। একই কবিতায় "তুমি" ও "তুই" দুইই ব্যবহার না করাই ভাল। "মুসলমান।" সাহাদাৎ হোসেন—কবি বিশ্বজাতির যাত্রাপথে মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছেন। কবির আহ্বান বড়ই ক্ষীণ। "মহান বাণী' অচল। "আলিঙ্গন।" ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী। শেষ দুটী পংক্তি সুন্দর

স্মৃতির বিলয় ভূমি আনন্দ অপার
সীমার ভিতরে তুমি অসীমের স্বাদ।

মোসলেম ভারত। কার্ত্তিক। মহাত্মা গান্ধি। শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী কবিতাটিতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলে ও মহাত্মার প্রতি কবির ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভক্তির অর্ঘ্য সম্বন্ধে আর বিচার কি আছে?

শরৎ। বসন্ত বাবুর গান।

"পিককুল সুললিত প্রভাতের পদতল"
"বেদনাবৃন্তরাঙ্গা কামনা শেফালিদল"
"নির্ম্মল নীল বিভা মর্ম্ম নীলিমাখানি"
"সুরভি স্থাপন রস" "পিপাসীপুরের ছায়া"

ইত্যাদি অনেক সুললিত পদ সুবলিত হইলেও গানটি শুধু অর্থহীন ঝঙ্কার ছাড়া কিছুই নহে।

স্বপ্ন। শেখ ফজলল করিম নীতিভূষণ। নীতিভূষণ মহোদয়ের নৈতিক নৈরাশ্য স্বপ্নে ছন্দিত ও ঝঙ্কৃত।

পত্র। সৈনিক কবির প্রতি। শ্রীসুধা কান্ত রায় চৌধুরী। কবির প্রতি কবির ছন্দঃ সম্ভাষণ। কবি ছন্দঃ সম্বন্ধে তেমন সতর্ক নহেন। সৌহাদ্যের আন্তরিকতাটুকু ভাল রূপে ফুটে নাই।

আবদুর রউফ "পথের বাধা" কবিতায় যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সরস করিয়া বলিতে পারেন নাই।

ওমার খৈয়াম। শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ। ওমার কবিকে কান্তিচন্দ্র বাবু কি যেন ওমারী ঢঙে বলিয়াছেন ঠিক বুঝিলাম না। ঘুঘুর কণ্ঠে মৌনাসঁজের উদাস তানটীর মত একটা করুণসুর কানে বাজিতেছে।

স্মৃতি। সাজেদা খাতুন। কবিতাটিতে একটা সরল মাধুর্য্য আছে।

দিলদার। মোহিতলাল। সুন্দর সরস সুমধুর।

প্রবাস জ্যোতি। আশ্বিন। ভূমিভূমা। কবি অথর্ব্ববেদ হইতে কবিত্বের মাল মসলা সংগ্রহ করিতেছেন পাণ্ডিত্য আছে বটে। অনুবাদ ভাল লাগিল না ভাষা গদ্যাত্মক ছন্দে মাধুর্য্য নাই। নমুনা—

ওগো ভূমিশিলা পাষাণ ও ধূলা ধাত্রী
চিরহিরণ্য গর্ভা পৃথিবী নমোনমো নমঃ
ওগো বিশ্বের মাতৃ ধরা।

বাঙ্গালা ভাষা। শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন। গানটি বড়ই মধুর ও হৃদয় গ্রাহী।

প্রবাস জ্যোতিঃ। শ্রীকুমুদ রঞ্জন। নিশ্চয়ই এ কবিতা ফরমায়েসী। তাহার প্রমাণ রচনায়—

"শোকের নিকট যাদের পরে চকিতে
শান্তিবারি সান্ত্বনা দেয় কেমনে
পাইনে তাহার করটি কেবল লখিতে
পরশ তাহার পেলাম জনমে জনেমে।"

সুপ্রভাত। শ্রীমানকুমারী বসু। রসনিবিড় রচনা।

খেয়াযাত্রীর ভাবনা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। নারীহৃদয়ের মমতাকারুণ্য ভরা স্নিগ্ধসরস সুন্দর কবিতা।

মানসীবধূ। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। বহুদিন পরে সুকবি দেবকুমারের সহিত মাসিক পত্রে সাক্ষাৎ।

সেই সরস সুন্দর সুললিত ভঙ্গি—সেই ছন্দোলীলায় দোদুললাস্য সেই চিরপরিচিত চটুল রচনাচাতুর্য্য আবার শ্রুতিবিনোদন করিল।

কানায়ের বৈরাগ্য। শ্রীনন্দি শর্ম্মা। ব্যঙ্গ কবিতা ব্যঙ্গ অর্থে অপরকে উপহাস করিবার জন্য নিজের অঙ্গ বিকৃত করা। সেই হিসাবে এই কবিতাকে প্রকৃত ব্যঙ্গ কবিতা বলা যায়। এই দীর্ঘ কাব্যটাতে কোনো রস জমে নাই—অরসিকের স্থূল হস্তাবলেপ স্থলে স্থলে পীড়া স্থলে স্থলে বীড়ার উদয় করিয়াছে মাত্র। ভাঁড়ের গালের চূণ কালী লেপনের ন্যায় চিত্রগুলি আরো বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে।

'বঙ্গের আবাহন'। শ্রীকালিদাস রায়। বাঙ্গালী সুরে মোহিনী সেন গুপ্তা রচিত স্বরলিপি সহ প্রকাশিত। বিশেষত্ব কিছু নাই। বোধহয় বরাতী।

ভারতবর্ষ। কার্ত্তিক। আবাহন। শ্রীগিরিজা কুমার বসু। কবি গিরিজা কুমার জগজ্জননীকে—"অভয়া অম্বিকা অম্বা জগদ্ধাত্রী জগদম্বা, নবদুর্গা, শিবজায়া 'হৈমবতী তেনকায়, আয় মা গিরিজা" ইত্যাদি বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। কবি সম্বোধনগুলিকেও কবিত্ব ময় করিতে পারেন নাই। কবির বোধন সঙ্গীতে ঢোল ও সানাইয়ের সঙ্গে একখানা ভাঙ্গাকাঁসী বড় গোলমাল করিয়াছে। স্থলে স্থলে প্রকাশ ভঙ্গি অত্যন্ত নীরস—

পদতরী দেমা ভক্তে ক্ষেমে, তার হৃদি বক্ষে
করেদে প্রতিষ্ঠা চির প্রেম প্রতিমায়।"

সুরের নেশা। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। কবি বলিয়াছেন—"তোমারি সন্ধানে ওগো অজানা আবেগে অতিদ্রুত, দুরন্তর তুরঙ্গের বেগে" "দেহরুদ্ধ প্রাণ মোর ছুটে যেতে চায়" ইত্যাদি এই অজানার উদ্দেশে অজানা আবেগে তুরঙ্গের বেগে প্রাণের উদ্ধশ্বাসে ছোটাছুটি আমাদেরও অজানা থাকিলেই ভাল হইত।

ভারতী। অগ্রহায়ণ। চাঁদের আলোয়। শ্রীকিরণ ধন চট্টোপাধ্যায়। লঘুতরল লীলায়িত ছন্দে চারু চটুল ভঙ্গিতে কিরণ ধনের চাঁদের আলোয় সঙ্গীত। ছন্দটা একটু বেশীরকম মাজা দুলিয়ে চলেছে। ভারতীর মন্দিরে খেমটা ঢঙের গানেরই একটু আদর বেশী। কিরণ বাবুর রচনা পারিপাট্য ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ব্যঞ্জনা এত চমৎকার নেহাৎ হালকা পলকা বলিয়া তাঁহার কবিতাগুলিকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। কবিতাটিকে আমূল তুলিয়া দেওয়ায় লোভ হয়।

সরযূজোর। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—। কবিতাটিকে ভাল করিয়া বুঝিতে না দেওয়ার জন্য কবি চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।

উপলঘায়ে রোদন ভরে
বিবহেরি টনক নড়ে
জাগায় ব্যথা স্মৃতিব অলপ্নেয়ে

রীতিমত হেঁয়ালী নয় কি?

মৌনতারি নিঝুম পুরে
একটী কথা বেড়ায় ঘুরে
উপত্যকায় তাকায় মিছে আশা
দিন দুপুরের ঝিলিক আলো
অন্ধকারে মুখ ফিরালো
গুমরে মরে অবুঝ ভালবাসা।

একি abstraction এব অত্যন্ত বাড়াবাড়ি নহে? অতিরিক্ত ভাবাত্মকতাব ভান অনেক সময় প্রবঞ্চনাব নামান্তর। "অন্তঃশীলা (?) ব্যথায় আবেগ ভরে উছলে ওঠা," "ক্ষুদ্রনামের 'ক্ষুদ্র স্নেহকণা" "পায়ে নিপীয়মান মায়াব আলিপনা" "ব্যথাব বেশে গাঁথা পবাণী" "সুখখেয়ালাব শেষ তলানি" "আগ কৌটা পিছ কৌটা" ইত্যাদি ভাষাবিন্যাসেব Ethereal সৌন্দর্য্য আমাদেব কল্পবুদ্ধিব অনধিগম্য। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু একটু ধরাতলে অবতরণ করুন—তাঁহাব সহিত আমাদেব একটু আলাপ হোক্।

সওগাত। অগ্রহায়ণ। তির্য্যক পরিবার কবি কুমুদ রঞ্জন রচিত তির্য্যক পবিবাবেব মধ্যে তিনটী পক্ষীর বিষয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে—

বাকীগুলি তেমন সবস হয় নাই।

ঘুমের সাথী। সাহাদাৎ হোসেন। স্বপ্ন তরঙ্গে শফরী লীলা। কবিতাটিতে কিরণ ধনের সবস কবিত্ব ও রচনা শিল্প নাই—কিন্তু তাঁহাব ভঙ্গিব তারল্য ও চটুলতা টলটল কবিতেছে। অনেকস্থলে শুধু নিরর্থক ঝঙ্কার ও বেতালা নৃত্য। একঘেয়ে টলমলানিতে মাথাও ঘুলাইয়া যায়। কবি নিজেই বলিয়াছেন—"স্বপন গানে ভুল ভরা"

ভুজঙ্গ বাবুর "আঁধারের প্রতি" কবিতা সুরচিত। কবি বলিয়াছেন—

ঘটাও মোহন গোপন মিলন প্রেমের দোসর তুমি
লোকের লোচন কর আবরণ বঁধুরে যখন চুমি,
* * *
ক্ষণিক আঁধাব মিলায় তাহারে নিমেষের তরে যদি
সুচিব আঁধাব বঁধুরে আমার মিলাইবে নিববধি,

দণ্ড ও দয়া—শ্রীকালিদাস রায়

কবি বলিতেছেন—প্রভু দণ্ড তোমার ধর্ম্ম নহে দয়া তোমাব ধর্ম্ম—তুমি দণ্ড দিতে গেলে দয়াবশতঃ সমুচিত দণ্ড তুমি দিতে পাবিবে না। দণ্ড বা পীডন আমাব ধর্ম্ম আমি নির্দ্দয় ভাবে আমাকে দণ্ডিত কবিব—"তোমার যা যোগ্য, মোব কর সে বিধান"—আমি দয়াব ভিখারী আমাকে দয়া কর।

কবিতাব ভাবটি এই কিন্তু কবিতায় উহা সবলভাবে ফুটেনাই।

মানসী ও মর্ম্মবাণী। কার্ত্তিক। 'অ'গমন' কবি কুমুদবঞ্জন। কবিতাব ভাবটি শেষ চাবি পংক্তিতেই নিবদ্ধ। কবিতার বাকী ৫টী শোকে ঐ ভাবই পুনরুক্ত। ভঙ্গিব সবসতা থাকিলে পুনরুক্তি সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধনই কবিত। কুমুদ বাবু ভাষাব প্রতি মাঝে মাঝে বড ঔদাসীন্য প্রদর্শন কবেন। "আঁধার করে দাঁড়াও আমার আঁখি" পংক্তিতে আঁধাব ও আঁখিব মধ্যে ব্যবধানটা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। "তোমরা আমায় জোব করিয়ে টেনে—কাস্তেখানা দেবেই দেবে হাতে" ইহাকে সুবচিত পংক্তি বলা যায় না। "শ্যামায় শিষের শিবে" কি?

'কবিব প্রতি'—শ্রীপবিমল কুমাব ঘোষ। লেখক, কবিকে জগতেব মহাযজ্ঞেব উদ্গাতা হইবাব জন্য আহ্বান কবিতেছেন। এখন আর নয়নের জলে মেঘবলাকায় স্বপ্নমায়া রচনার দিন নাই—সলিল রেখায় মর্ম্মপটে কল্পনাব ছবি চিত্রনেব দিন নাই—ছোট খাটো হাসি অশ্রু অন্তরের ব্যথা, প্রণয় কাকলী, মান অভিমান অভিসার ইত্যাদি লইয়া বিলাস মূর্চ্ছনার দিন নাই—আজ নিখিল জগৎ পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছে কবির কণ্ঠে বিশ্বপ্রাণী আপনা-দের মর্ম্মবাণী ধ্বনিত করিতে চাহিতেছে। কবির আজ দায়িত্ব বিরাট—তাহার পার্শ্বে আজ শঙ্কিত অভয় চায়, ব্যথিত আশ্বাস চায়, অন্ধ দৃক্‌শক্তি চায়, মূক ভাষা চায়, অক্ষম বল চায়, দিগ্‌ভ্রান্ত পথের সন্ধান চায়, বিধবার অশ্রু, পুত্রহীনা জননীর মৌন হাহাকার ক্ষুধিতের আর্ত্তস্বর, পীড়িতের ব্যথা

নির্য্যাতিত অন্তাগার ব্যর্থ ব্যাকুলতা কবির নিকট অন্তর প্রার্থনা করিতেছে।”

কবি পরিমলকে আমরা বলি—“কবি, তোমার আহ্বান তোমার অন্তর পুরুষকে শুনাইতে পারিয়াছ কি? তোমার নিজের আহ্বান যেদিন তোমার অন্তরের দেবতাকে শুনাইয়া তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিবে সেদিন তোমার আহ্বানে সকল কবিই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে। জাননা বন্ধু, অন্নাভাবে হস্তে পক্ষাঘাত, লৌকিকতার বন্ধনে কণ্ঠ রুদ্ধ, জঠরের অনল হৃদয় পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া সকল আকাঙ্ক্ষা সকল বাসনা সকল কল্পনাকে ভস্মশেষ করিয়া দিতেছে। কে কাহাকে জাগাইবে ভাই? অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তোমার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া জিজ্ঞাসা করি “কে জাগাবে প্রাণ মৃতের কঙ্কাল মাঝে।”

নিমন্ত্রণের উল্লাস। শিশুহৃদয়ের আশা আনন্দ উদ্বেগ নৈরাশ্যের একটী চিত্র। আভিজাত্য ধনগৌরব জাতির অহঙ্কার মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করে তাহা শিশুর অজ্ঞাত—সকলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সকলের উপরে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠান সে কি ভীষণ শাস্তি তাহা শিশুই জানে—প্রচুরের মধ্যেই সুখের নিবাস—অপর্য্যাপ্তির মধ্যেই পরম আনন্দ আর অভাব ও দৈন্যের মধ্যে দুঃখের প্রাবল্য, এ সত্য শিশুর দর্শন বিজ্ঞানে নাই। এসব কথা আলোচনা করিতে গেলে Wordsworth কে মনে পড়ে। যে কবিতাটীর আলোচনা হইতেছে উহা একটী দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটীর শেষে কবি তাঁহার উচ্ছ্বাস সংযত করিতে পারেন নাই বলিয়া অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। মোটামুটি কবিতাটি—

নিমন্ত্রণ বোসেদের বাড়া
যদু যায় মধু যায় ও পাড়ায় যদু যায়
রাধু বিধু শশী নসু ছোটে তাড়াতাড়ি
* * *
পাড়ায় সকলে আজি চলেছে যথায়
হায় হায় কি দোষেতে সেখানে পাবেনা যেতে ও
ননীয়ে তাহার কিছু বুঝিয়া না পায়।

খাইয়া আপন ঘরে নিত্য বটে পেট ভরে
কোনো দিন মিলেনা যে বুকভরা সুখ
সেথা চেয়ে চেয়ে খাওয়া না চাহিতে বহু পাওয়া
চেয়ে না পাওয়ার মাঝে কতযে কৌতুক।
* * *
কানে গুঁজি দুটিপান বড়ই দয়ার দান
এলানোকোঁচাটি তার বামহাতে ধরে'
পুকুরে আঁচান হায় কত যে উল্লাস তায়
ভোজের বাড়ীর গল্প মার কোলে চড়ে'।
একটী দিনের তরে বসিয়া ধূলির পরে
আভিজাত্য ধনগর্ব্ব করি পরিহার
পাড়ায় সবার সঙ্গে মহোৎসবে মহারঙ্গে
নিজেরে ভাবিতে পারা সমান সবার
[illegible] উল্লাসে নাচে বুক
এখন [illegible] তাহা স্বপনের মত
সে কথাটি বুঝিবার শকতি নাহিক আর
সুখের শৈশব তার বহু দিন গত।

পূজার বাশী। শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ। করুণ মর্ম্মস্পর্শী রচনা। কবিতাটি এতই আন্তরিকতা সহানুভূতি ও মমতার সহিত রচিত যে পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এতদিনপরে শ্রীপতি বাবুর কবি হৃদয়ের আমরা পরিচয় লাভ করিলাম।

শ্রীঅতুল প্রসাদ সেনের ‘গান’—মন্দ নহে।

প্রভাতী। শ্রীনির্ব্বিবালা দেবী—কবিতার ১ম পংক্তিটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ১৪টী পংক্তিতে ও সর্ব্বত্র মিল নাই।

নারায়ণ। অগ্রহায়ণ। বোঝা। শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী। কবিতার রসটি তেমন জমে নাই—বোধহয় ভাষার দোষেই। ‘কঙ্কালের বোঝা” বেশ কিন্তু “জ্বালার বোঝা” দুষ্টালঙ্কার।

“নামিয়ে দেব সোজা” রুচিকর নহে।
“পারের উপায় সোজা” ও তাই।
“সৌরভে তার ক্লিষ্ট হৃদি পাবে নবীনবল।”

সৌরভে বল লাভ করার কল্পনা উপাদেয় নহে। “জীবন-ভরা সকল জ্বালায়, গ্রন্থি দেব কমল মালায়” এদুইপংক্তিতে

লেখিকা যাহা বলিতে পাইয়াছেন তাহা ঠিক বলা হয় নাই। জ্বালার সহিত সূত্রের উপমাও সুন্দর নহে। 'মাথার বোঝা ফুটছে পায়ে কুসুম সুকোমল'—ব্যাকরণ দুষ্ট। সুন্দর হইয়াছে শেষের কয়পংক্তি—

"আঁখি জলের এ উৎসবে
তোমার কৃপার ফুল ফুটাবে
'কাঁদতে গিয়ে' ঐ পরশে আসল হয়ে যাই।

ভঙ্গি বা ভাবের কোন বিশেষত্ব বা নূতনত্ব নাই।

পূজা। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। গানটি নেহাত নিরস না হইলেও নিস্তেজ হইয়াছে স্থলে স্থলে ভাষা গদ্যাত্মক কোন কোন মাত্রায় ওজন কম পড়িয়া গিয়াছে।

মোড় ফিরাও। ঐ। এই সঙ্গীতটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। কবিতার নামটিতে আমাদের আপত্তি আছে —নামটিতে যে আলঙ্কারিকতা আছে তাহা সুরুচিকর নহে।

তোর—দিনে দিনে বেড়ে গেল
পাওয়ায় চেয়ে ধাওয়ার নেশা
ত্রাসে—পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে
ধাওয়াই যে তোর হলো পেশা
বাড়ী—ফেরার পথও গেলি ভুলে
তুই—সব খেয়ালি লাভে মূলে
এক নিয়ে তুই বেরিয়েছিলি
শৃঙ্খলি এসে সাতে পাঁচে॥

একয়টি পংক্তিতে একটী গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সহজ সরল ভাবে অভিব্যক্ত।

তার মন কথা। শ্রীবারীন্দ্র কুমার। অদ্ভুত নামকরণ। কবিতার ভাবটি গভীর। কিন্তু গভীরতার সহিত স্বচ্ছতা কই? বারীন্দ্র কুমারের কবিতা ভাবসমৃদ্ধ কিন্তু বড় অস্পষ্ট।

চির অভিসার।' শ্রীকালিদাস রায়। ভঙ্গিতে বিশেষত্ব নাই—ভাবে নূতনত্ব নাই

"অভ্যাস করি পিছলে চলিতে
আঙিনায় জল ঢাবি"

বৈষ্ণব কবিতার পাঠকের ইহা চিরপরিচিত কথা।

তোমার হাসি। নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল। নিস্তেজ রচনা।

একটী রাতের পরিচয়। শ্রীসুবোধ কর। রচনা সুন্দর কিন্তু ভাব অস্পষ্ট।

"ফিরিও না মুখ"—না—"ফিরা'ওনা মুখ"?

"অচিন" শব্দটির আজকাল বড় অপব্যবহার হইতেছে।

কে আসে—দরবেশ। সুরচিত। রুদ্র ও প্রসন্নের অপূর্ব্ব হরিহর মিলনের আবাহন গান।

একহাতে দণ্ড নির্মম
অন্যহাতে ভাণ্ড করুণার,
মধুর ও ভীষণে সঙ্গম
জাহ্নবীতে অসি বরুণার,
কে আসে।

সুন্দর।

অক্ষয় দান। শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন। রচনায় লালিত্য ও মাধুর্য্য আছে। শ্রীপতি বাবুর হাতে কারুণ্যের চিত্র বেশ ফুটিতেছে।

"অযতনে পড়া ছাড়াবাড়া সম জড়তা করেছে বাসা" সবদিক হইতেই অচল।

গান। কাজীনজরুল ইসলাম।

"সুর কারুর সইতে নারি
কণ্ঠ ছিঁড়ে কান্না আসে
ওষ্ঠ চেপে যাতনা বাথা
রূপ যে তোমার চক্ষে ভাসে।"

সুন্দর। কিন্তু—

"হারলো স্নেহ বাঁধন হারার
বাধতে গিয়ে তোরস্বজনে।"

সুরচিত নহে।

মর্ম্ম ও বেদনা। প্রসাদ। মন্দ নহে। সিদ্ধি। লীলা দেবী। Epigrammatic রচনা চলনসই কিন্তু "স্তন্যে (?) ঝরিবে ক্ষীর" চলিবে না।

প্রবাসী। কার্ত্তিক। "মূকের ভাষা।" শ্রীরাধা চরণ চক্রবর্ত্তী। শ্লোকটী সুন্দর।

"কণ্ঠ তারে পায়না নাগাল
দাঁড়ালনা সে বীণার তারে

শব্দসাগর স্তম্ভিত তায়
স্তব্ধতারি সিংহদ্বারে।
তর্জ্জনী তার ওষ্ঠ পুটে
তার কাননে পুষ্প ফুটে
ছড়িয়ে পড়ে চারিধারে।”

চলনসই।

শরৎ প্রভাত। ঐ। আরো সুন্দর।

“শরৎ প্রভাত সোণার স্বপন
আকাশেরি নীল পাথারে
ভেসে বেড়ায় হাল্‌কা মেঘের ভেলায়
কল্পপুরীর প্রজাপতি
অপরাজিতায় নীলকান্তে
পল্‌কা পাখা পুলকভরে খেলায়।’

রাধাচরণ বাবু কবিত্বের কারুকলা বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পানে চাহিয়া আছি।

ইনসাফ। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। সুরচিত গাথা। কবি “বাদশায় বজ্রকঠোর স্বরে” সার্ব্বজনীন সত্যের ঘোষণা করিয়াছেন। সম্পূর্ণ যুগোপযোগী বলিয়া তুলিয়া দিলাম।

“রাজপুরুষেরা প্রজারে বাঁচাবে
চোর ডাকাতের হাতে,
কে বলো প্রজারে রক্ষিবে রাজ
পুরুষের উৎপাতে।
রক্ষক যদি ভক্ষক হয়
কে দিবে তাহারে সাজা?
রাজপুরুষের রাক্ষুধা হতে
প্রজারে বাঁচাবে? রাজা।
গরীবের প্রাণ আমীরের প্রাণ
সমান যে জন জানে
সর্দ্দারী তারি সুলতানী তারি
দুনিয়ার মাঝখানে।
* * *
বেইমানী সনে রফা করে চলা
জানেনা মুসলমান
কাজে আজ করে সে কথা প্রমাণ
দুনিয়ায় বুলবান্।”

সমগ্র রচনায় স্থলে স্থলে প্রচুর কবিত্ব আছে। কবিতায় সত্যেন্দ্র নাথের স্বাভাবিক স্বেচ্ছাচারী ভাষা বিন্যাস নাই।

রাজা কবিগর। ঐ। সুন্দর কবিতা আমরা সবাইকে পড়িতে বলি।

অর্চ্চনা। মাঘ—এসংখ্যায় একটীমাত্র কবিতা আছে তাহা আবার Longfellow হইতে অনুদিত ১২ পংক্তিতে সমাপ্ত—সে আবার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের। কবিতাটি—অনুবাদের উপযোগী নয়—পাকাহাতে পড়লে মিঠে হইতে পারিত। এসংখ্যায় কবিতার অভাব পূরণ করিয়াছেন সম্পাদক মহাশয়। “পল্লীব্যথার” সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘পল্লীবিদায়’ কবিতাটিকে আদ্যোপান্ত উদ্ধরণ করিয়া।

যমুনা। মাঘ। “বিশ্বনাথ” শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়। একই কবিতায় একই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া এক-পংক্তিতে ‘তুই’ অন্য পংক্তিতে ‘তুমি’ এবং এই রীতিরই বারবার পুনরাবৃত্তি শক্তির মত’ নহে—পরন্তু সমগ্র কবিতা-রই রসভঙ্গ করে। কবিতাটিতে আগাগোড়া ভাবের সামঞ্জস্য ও নাই। অকাজের দাবন—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সুন্দর সুরচিত কবিতা।

“আজ বুঝিয়াছি এতকাল আমি সবেতে খুঁজেছি কারে
না পেয়ে পেয়েছি ভাবিতাম তাই হারাতাম বারেবারে।
* * *
আজ সে সকল মিথ্যা নকল সে মোর দাঁড়ায়ে পাশে
মোদের জগতে তারা আজ শুধু উপমায় অভিলাষে
প্রাণের প্রেমের পরশ না পেলে জগৎই অর্থহীন
বাহুতে বেঁধেছি যারে তারি কাছে জগৎ করিছে ঋণ।
রসনিবিড় রচনা।

কবিবর দেবেন্দ্র নাথ। শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী। মহাকবির তিরোধানে ভক্ত কবি ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। আমরা কবি যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে মস্তক নত করিয়া অমর লোক যাত্রী মহাকবির আত্মার পরামুক্তি প্রার্থনা করি। আমরা কবি দেবেন্দ্র নাথের কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশ করিলাম। কবি যতীন্দ্র মোহনের কবিতাটি প্রথম শ্রেণীর না হইলেও রচনা ভঙ্গি

গুণে সুরচিত হইয়াছে। "আকাশের গুচ্ছ" নিশ্চয়ই "অশোকের গুচ্ছের" প্রমাদ মুদ্রন। দোষি' (দোষ দেহ অর্থে)—না—দূষি?

"ঘরে ঘরে কোণে কোণে ভাঁড়াবে ভঁড়াবে চঞ্চল সংক্ত।

'কে নায়ক কল্পনা কুশল" আপত্তিজনক।

"বিধবার আসি দেখি কার চক্ষে জল নাহি ফুটে

স্থালীয় পায়ের মলে রক্ষ কার নেচে নাহি উঠে"

এই দুই পংক্তি negative ভাবে প্রকাশ না করিয়া positive ভাবে প্রকাশ করিলে ভাল হইত। "মধুডাক' সুষ্ঠু নহে।

মালঞ্চ। পৌষ। প্রতিষ্ঠা। উপেন্দ্র সিংহ। সচল অষ্ট পদী কবিতা। "হৈমন্তী"—শ্রীপতিপ্রসন্ন। কবিতার শেষ কয়পংক্তি বেশ হইয়াছে। 'মন ভরে বীজন করা' বাংলা নয়। "তপ্ত সাথে শৈত্য" শোভন নহে। একটী বিশেষ্য অন্যটী বিশেষণ, যেমন বলিয়া প্রেম (?) হইবে?

"যক্ষ পুরীর রত্নশালা লুট করে' কি আসলে গো

জ্যোছনাধারে ফিনকি পড়ে মুক্তো ভুবন বক্ষে গো।

এই দুই পংক্তি একেবারেই মিলে নাই—তা ছাড়া এত 'জ্যোছনা'তেও ভাব অস্পষ্ট থাকিয়া গিয়াছে ভাষাও স্বচ্ছ হয় নাই।

শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবীর "পল্লীপথে।' কবিতায় বিশেষত্ব কিছু নাই। রচনা ভঙ্গিটি কিন্তু সুন্দর।

"কালোজলে নিদাঘ তাপিত তৃপ্তিভরে তরুণ তপন

খেলাছলে উল্লসিতচিত করিতেছে স্বতনুগোপন।"

ভাবটি বেশ। 'বাসারগুণ্ঠিতা' 'নৈদাঘজ্বালা' ইত্যাদি ভাষার গুরুভারে কবিতাটি স্থলে স্থলে ক্লিষ্ট ও কাতর।

"আলোটুকু আলোছায়াকারে জালে ঢাকি যেন আঁখিছলে' বোঝা গেল না। "স্মিত হাস্যস্বনন' অচল। "শিশির সরসাবালা' কি প্রকার!

শ্রীমতী কালিদাসী দেবী ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধে একটু অবহিতা হইলে তাঁহার 'উদ্বোধন' কবিতাকে উপাদেয় করিতে পারিতেন 'গাণ্ডীব' 'পাঞ্চজন্য' ইত্যাদি থাকা সত্বেও লেখিকা জয়লাভ করিতে পারেন নাই।

কথক কবি হেমচন্দ্রের 'উপেক্ষিতা' ব্যর্থ রচনা। কি ভাষা কি ভঙ্গি কি ভাবসৌষ্ঠব কোন দিক হইতে 'উপেক্ষিতা' সমাদৃতা হইবার যোগ্য হয় নাই। বিশেষতঃ—

কতশত কুমারের নয়ন ভরিয়া

রূপের বিজয়ধ্বনি চিত্রিত করিয়া

রব উঠিল তখন। একেবারেই অসহ্য।

কবি বলিয়াছেন—

"ঘরে বীর এলো ফিরে চিনিতে নারিল

হত শোভা পরিত্যক্তা মরিয়া বাঁচিল।

আমরাও বাঁচিলাম—যেহেতু কবিতাটা শেষ হইল।

মাঘ। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবীর "শূন্য গোকুলে কবিতাটিতে ও রূপ্য আছে। রচনাভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র নবীনতা নাই। ১৪পংক্তি তুলিয়া দিলেই পাঠক গণ বুঝিতে পারিবেন অপমতি বিস্তরেন।

উছল নীল যমুনা জলে

লহরলীলা আর না চলে

শীকরবারী সমীরে ভাসি

আসেনা শুধু হাসিটি আর।"

শ্রীমতী চারুবালা দত্ত গুপ্তার 'দাও গো' নামক একটি কবিতা এ সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। লেখিকাকে এখনো বহুদিন নীরবে নিভৃতে সাধনা করিতে হইবে। মাসিক পত্রে কবিতা প্রকাশের জন্য চঞ্চলা হইলে চলিবেনা।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের' ২১৪টি পংক্তি ছাড়া সবই অশ্রাব্য। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্র নাথ গুহ মহাশয়ের বারারাণী কবিতাটি মুদ্রাকরকৃত প্রমাদে কণ্টকিত। কবিতায় কণ্টক আছে কিন্তু মধু নাই। ছন্দ মিল ভাব ভাষা কোন অনুষ্ঠানেই কবির নিষ্ঠা নাই। "করমের আশা মিলাইয়া আজ মরমে ধরম বাজে" এত অনুপ্রাস সত্বেও পংক্তিটি নিরর্থক ও নীরস। এখনো কবিকে একরীম কাগজে মক্স করিতে হইবে।

কাশফুল। শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত। রচনা কবির উপযুক্ত হয় নাই। 'ভাসানিনা' কি চলিবে? অসমাপিকা ক্রিয়ার "ইয়া"র মিল যে মিলই নয় তাহা কি জীবেন্দ্র বাবুকেও বলিয়া দিতে হইবে?

বাণীবন্দনা। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ। শ্রীপতিপ্রসন্ন বাবু ছন্দের ঝঙ্কার বেশ অধিগত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য সরস্বতীর শ্রীচরণের মঞ্জীরনিক্কন শ্রোত্ররম্। কিন্তু ছন্দো-ঝঙ্কারেই কবিতা সার্থক হয়না। ভাব চাই, নূতন ভঙ্গি চাই, ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চাই—ভাষায় জ্ঞান চাই শব্দ সম্পদ্ চাই এমন কি ব্যাকরণের জ্ঞানও চাই। শ্রীমানের রচনায় এখনো আলঙ্কারিকতার সৌষ্ঠব ও রসনিবিড়তা আমরা লক্ষ্য করি নাই, এ সকল আয়ত্ত না হইলে কবি পদবী লাভ করিতে পারিবেন না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ পালের 'পৃথিবী' রীতিমত Geological কবিতা। কবিতায় ভাবের পারিপাট্য আছে—ভঙ্গিটি অর্ব্বাচীন। ষড়ঋতুর সহিত ষড়াননের উপমার প্রশংসা করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু মনে পড়িয়া গেল আর এক কবির একটি সুরচিত কবিতা। তাহাতে এই উপমাটি অতি শোভনভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

মহাকবি রবীন্দ্র নাথের কোনো প্রসিদ্ধ কবিতার ছন্দানুকরণে (?) লিখিত 'নীহার', শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অপদার্থ রচনা। ভাষা মাঝে মাঝে গদ্যাত্মক। "তৃণ নাগর" কি? "তৃপিত" নূতন সৃষ্টি। "শুভ্র কোমল বর্ণ" অপূর্ব্ব। "বিচারি বড় লাজ"—অচল। "আপন দিতে পাগল নাগরে" প্রকাশ ভঙ্গির অক্ষমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উত্তরাধিকারী। শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক। এটি একটী কাহিনীকবিতা। উপাখ্যানাংশের পরিকল্পনাটি বেশ। কিন্তু রচনা রসনিবিড় হয় নাই। মাঝে মাঝে পাকাহাতের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ পংক্তি অনবধানতায় শিথিল। মুদ্রাকরকৃত প্রমাদে মাঝে মাঝে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে। কবিতায় মুদ্রন প্রমাদ ঘটিলে রচনার কি যে সর্ব্বনাশ হয় তাহা প্রবীণ সম্পাদককে কি বুঝাইয়া বলিতে হইবে?

সওগাত। আষাঢ় হইতে আশ্বিন। "মনির স্বপ্ন"—কবি কুমুদরঞ্জন। রচনা অনিন্দ্য না হইলেও উল্লেখ যোগ্য। কবির লেখনীতে পুরাতন মিশরের গার্হস্থ্য জীবনটি বেশ ফুটিয়াছে। কবির মস্তিষ্কে বেশ সুন্দর কল্পনাটি আসিয়াছিল—কবি সাবধানে রচনা করিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারিতেন। এ কল্পনাটি সত্যেন্দ্র নাথের লেখনীতে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরিতে পারিত।

চাঁদিনী রাতে। সাহাদাৎ হোসেন। ছন্দটি ঝঙ্কার ময়। কিন্তু ভাষা এলোমেলো। "তালে তালে প্রাণ জাগান" কি প্রকার? "মহাবিষমাখানি" কি ভাষা? "জীবনের মহাপথ"—সর্ব্বনাশ! "যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহাচ্ছন্দঃ ন দীয়তে।" সে পথে গেলেত কেহ ফিরে আসে না। 'কনকিত' কি প্রকারে সিদ্ধ?

> "আধখোলা বুকবাস কাঁপে তার মাঝেতে
> প্রস্ফুট পঙ্কজ আলসে ও লালসে।"

এত লালসা ভাল নয়। চাঁদিনী রাত বলেই কি কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত হতে হবে? "নিরালা মল্লিকা" কিরূপ? "নয়নে চন্দ্রকিরণ লেখা ফুটাইয়া তামসী নিশীথিনীকে ডাকিয়া আনা" বঙ্গ সাহিত্যে নূতন। কবি চাঁদিনী রাতে রীতিমত moonstruck হইয়া পড়িয়াছেন নতুবা কি লেখেন—

> "আজি এ চাঁদিনী রাতে কুঞ্জের বিতানে
> যাপিব লো তোরে লয়ে উল্লাসে জাগিয়া
> মিশে যাব দোঁহে আজি আপনারে ভুলিয়া
> অধরে অধর রাখি মোহময় আবেশে
> শিথিলিত তনু দুটী পড়িবে লো ঢলিয়া
> ফুলের বিছানা পরে তিরপিত আলসে।"

কবি তাঁহার মধুময়ীর সঙ্গে নিবিড় মিলনের জন্য ব্যাকুল কিন্তু কবিতায় পংক্তিতে পংক্তিতে মিল দিতে পারেন নাই। কবি সাহাদাৎ হোসেন ত ছিলেন ভাল—ভুজঙ্গ বাবু 'কামনা' কবিতায় তাঁহাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন—কবি বলছেন—

> তোমার নীবিবন্ধে আমারে কর বন্ধ
> তোমার তনুগন্ধে হৃদয় কর অন্ধ। ইত্যাদি

ভুজঙ্গ বাবু নির্ম্মোক মোচন করিয়া আবার বিলোল যৌবনে ফিরিয়া আসিতে চান? ভাল।

বিশ্বরহস্য। শ্রীকালিদাস রায়। William Watson এর কোনো কবিতা হইতে অনূদিত।

নারায়ণ। দুখিনীর ধন। শ্রীসরলা বালা দাসী।

কবিতাটি অযথা দীর্ঘ না হইলে রস নিবিড় হইত। স্থলে স্থলে বেশ মাধুর্য্য ফুটিয়াছে। দরবেশ রচিত—'তিলেক যদি টান হতো' বলিয়া কবি দুঃখ করিয়াছেন—কিন্তু কবিতায় ত টানের অভাব দেখিনা। কিসে টান দিয়া কবি যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। কবি বলিতেছেন—

ওগো আমার তিলেক যদি
তোমার পানে টান হতো
কভু লয়ে মদের বোতল
হাটের বাটে বাধাতেম গোল
রঙ্গিনীদের ধরে আঁচল
মাতাল আঁখি ঢুলিত।

গণিকার সিদ্ধি—রাখীন্দ্র কুমার ঘোষ। ২।৩ বার পড়িয়া কবিতার অর্থবোধ করিতে পারিলাম না—এর বেশী মাথা ঘামানর অবসর আমাদের নাই। গণিকার সহিত যমুনা বাধাবাধা, কীর্ত্তন ছাঁদ ইত্যাদি জড়াইয়া কি যেন কি একটা লিখিয়াছেন বোধ হয় my-tic কিছু হবে।

আমি পথহারা কার সৃজন মাধুরী
তারি অলস আঁধারে পথে পথে ঘুরি
অনুভবি তায়
তারি জয় গায়
কীর্ত্তন রূপ ছাঁদেতে।

ভিতরে ঢুকিতে পারিলাম না।

"গ্রামবিরহে" গ্রামবিরহের কবি কালিদাস রায়।

যমুনা। ফাল্গুন। মণিকর্ণিকা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়। কবিতাটিতে গুরুগম্ভীর শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও ভাবের ঐশ্বর্য্য তেমন নাই। শব্দমন্ত্রে প্রথমটা চমকাইয়া যাইতে হয় তারপর একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ভিতরে পদার্থ বিশেষ কিছু নাই। ছন্দোবন্ধ অনিন্দ্য, শব্দ বিন্যাসে চাতুর্য্য আছে। কবির সোণার ভুবনের স্থলে সোণার ভারত লিখিবার সাহস হয় নাই।

দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে কবি যতীন্দ্রমোহন ত্যাগবীরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছেন।

পশ্চিমের একচক্ষু শক্তিলুব্ধ শিক্ষাতন্ত্র ভারতের নহে
দীপ্তি চেয়ে দাহ তার দরিদ্রের দেহ মনে দশগুণ দহে।
তুমি বুঝিয়াছ স্থির সুগম্ভীর সেই সত্য বুঝাইলে তাই
বিশ্বজিৎ দানযজ্ঞে আগ্নেয় উৎকর্ষ ভিন্ন অন্য গতি নাই।

ইহা পরম সত্য।

কবি বৃন্দাবনের উপমাটি লইয়া বড় বেশী টানাটানি করিয়াছেন—"নিন্দা ঐরাবত" সুষ্ঠু অলঙ্কার নহে। 'অত্যাচার শত্রুদার' সুষ্ঠু প্রয়োগ নহে।

মোহ বোম [illegible]। পৌষ। আবির্ভাব। শ্রীমোহিত লাল মজুমদার।

আঁধারেরী কৃষ্ণার কালো কলঙ্কহীন জলরাশি
[illegible] দেহে শুধু কুহ্বায় কবি কাঁদিছে শ্মশানবাসী
[illegible] শবের বসার মাঝারে নির্বাণিয়া নিশাচরে
কোনোমতে [illegible] প্রাণটি ধরিয়া রেখেছে দেহের ঘরে।

ঘোর অন্ধকার—আকাশে একটীও প্রদীপ জ্বলে না—"[illegible] [illegible]", "[illegible] শিশিরহারা। [illegible] [illegible] অবস্থা। আর পশ্চিম [illegible] দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় যাহাতে আলোক নাই শুধু উত্তাপ, কবি যতীন্দ্রমোহনের কথায় 'দীপ্তি চেয়ে দাহ বেশী' [illegible] অনাদি হিমালয় পর্যান্ত দ্রবীভূত [illegible] চলিয়াছে—তাহার অগ্নি বাষ্প ও [illegible] গগনে [illegible] ভরিয়া গিয়াছে। দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সেই সমুদ্র মন্থনের অভিনয় পুনরাবৃত্ত হইতেছে আমার সকল কালকূট কণ্ঠে ধারণ করিয়া শিবশঙ্কর অমৃত বিতরণের সময় আসন্ন।

এই সেই দেশ যেখানে—

পিতার আদেশে মৃত্যুসদনে সত্যের সন্ধানে
পশিল বালক ব্রাহ্মণ সেই চির নির্ভয় প্রাণে
রাজা আর ঋষি ধ্রুবের সন্ধি ঘটিল একের নামে
গোলোক নিবাসী রাজা হলো আসি কমলারে লয়ে বামে
এই সেই দধীচি নচিকেতা, রাজর্ষি জনকের দেশ

এ দেশের সে দেবলীলা আজ কোথা মানবের মনোগুহাহিত নটনাথের সে অভিনয় কোথা? আজ

নাটকের শেষে চলে প্রহসন নাম তার বিভীষিকা।
দেবতাদমন মানব মহিমা এই তার পরিণাম

অন্ধকারায় সভয়ে জপিছে প্রেত পিশাচের নাম
বুকে হেঁটে আর লালাপাঁক ঘেঁটে
কোনোমতে বেঁচে থাকা
মুখে মুখ দেয় পথের কুকুর—তাও যেন সুধা মাখা
আঁধারে হাতাড়ি হাত বরাবরি টলিছে এ ওর গায়
পিপাসা মিটায় নয়নের জলে তবু না মরিতে চায়।

এমন সময় তিমির গগন ভেদ করিয়া শাঁখ। ওকি আবাহন গান উদ্গীরিত ও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—ঐ সেই ভারতের চির পুরাতন 'আবিরাবির্ম এধি' ধ্বনি?—

কাহার কণ্ঠে কুমারী উষার বোধন মন্ত্র বাণী
বাণের মতন প্রাণ কোদণ্ডে ভীমটঙ্কার হানি'
ক্রৌঞ্চশোকে পশি ফিরিয়া আসি। আলোকের সন্ধান
চেতন দুয়ারে দাঁড়ি করাঘাতে হলো খান খান।

ঐ নবযুগ বন্দনা উষার অলোকনিন্দ্য গানের দোলা আড়ষ্টদেহ পঙ্কনিমগ্ন শীর্ণপ্রাণটি নাড়াইয়া দিয়াছে—অহিফেনের ধূমে মোহগ্রস্ত ভারতবাসী সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া অমৃতসাগরের স্নানে নামিতেছে।

কোন পানচারী ঋষিদেহক উচ্চারণ করিয়া আজি নামিয়া আসিল। অঙ্গে নরনারায়ণের পদরজ মাখিয়া বিশ্বের দান মাথায় গ্রহণ করিয়া সন্তানের নিখিল দুঃখ আপনার বক্ষে গ্রহণ করিয়া ভৈরবীর বন্দনাকে সঙ্গ দান করিল।

শুষ্কহৃদয় তমসার তীরে সর্ব্বপ্রাণের জাগা
সাগর পারের যাত্রী সাথী। আঁখি দিল প্রণামি।

নবজীবনের অরুণের সারথি হইয়া বলিয়া কত দাম্ভিক বিদ্যাভিমানী আত্মশক্তিহীন তপোহীন আঁধার বিলাসী পিশাচসিদ্ধের দল উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল, মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে মিথ্যা আশ্বাস দান করিতেছিল—তাহাদের কণ্ঠে মেঘমন্দ্র গর্জ্জন ছিল—মস্তিষ্কে পাটোয়ারী বুদ্ধি ছিল তর্কের কূটনীতি তাহাদের অধিগত ছিল—অভিনায়কের অভিনয়ও করিতেছিল—কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? তাহারা জগতকে জাগাইবে কি করিয়া? নিজেই তাহারা ঘুমে ঢুলিতেছে। তাহাদের ত ভারতীয় সাধনা কিছুই ছিল না—ত্যাগ সংযম তিতিক্ষা দাক্ষিণ্য ঔদার্য্য কিছুইত তাহাদের ছিল না। মৃতদেহকে পুনর্জ্জীবন দান ছলে তাহারা শকুনির সঙ্গে ভাগাভাগির বফা বন্দোবস্ত করিয়াছিল—আজ তাহারা কোথায়? যাহা তাহাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই একচন্দ্রের কৌমুদীতে তাহা সম্ভব হইয়াছে। শাবস্তি জেরুসালেমের দৈবীশক্তি লইয়া কে ঐ তপঃশীর্ণ নগ্নগাত্র পিঙ্গলজট মহাপুরুষ যাহার তর্জ্জনী হেলনে ও নীরববাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কোটি কোটি শির অবনত হইয়া পড়িল? সেত উদ্ধত ধ্বজপটে নিজের নাম লেখে না—সেত সিংহগর্জ্জনে সভামঞ্চ কম্পিত করিতে পারেনা সেত বাহ্বাস্ফোটনে ব্যর্থ চাঞ্চল্য আনেনা তার আগে পিছে ডঙ্কাদুন্দুভি বাজেনা।

কোন্ যাদু জানে এ নব পন্থী?
অনলদগ্ধ শুদ্ধ চরিত—উদ্দাম ধায় আশা।

আবার ভারতে মহামন্ত্র ধ্বনিত হইল—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"

অন্যতর পত্রগণের মন্ত্রগুরু হইবার যোগ্য ইনিই।

ক্ষীণতনু শুধু বঙ্গে কথিতে ঝাড়তে বাঁধিতে জানে
উদ্ধত যথা কালীয় তাহার বাঁশীর শাসন মানে।

দুটী আঁখি—রচনায় মাধুর্য্য আছে।

আলো যখন উঠবে ভেসে
ফুরিয়ে যাবে সকল কথা
সেইখানে মোর ফুটবে ধীরে
সব ব্যথার সার্থকতা।
কুড়িয়ে পাওয়া ওগো বঁধু
ওগো প্রিয়া হারিয়ে যাওয়া
তোমার আমার হৃদিতারে
কবে হবে এ গান গাওয়া।

কামনা। শেখ হবিবর রহমান। কবিতাটির সূচনা বেশ হইয়াছিল কিন্তু যখন

'চন্দ্রসূর্য্য তারা হয়ে আত্মহারা,
ভাবাবেশে যথা নাগিনী'

আসিয়া পড়িল তখনই চমক ভাঙিল। একা নাগিনীতে রক্ষা নাই তারপর আগুনও জ্বলিল।

"সুরের আগুনে হাসিয়া
উঠিল তিমির অমনি"

রবিবাবু সুরের আগুন জ্বালিয়ে মহাবিপদ করিয়াছেন। সুরের আগুনের তাতে এবং ততোধিক ধোঁয়ায় সাহিত্য ক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়নের উপক্রম করিতে হইয়াছে।

ব্যথিত। শ্রীবনলতা দেবী। লেখিকার ব্যথায় আমাদের সহানুভূতি আছে—কবিতাটির তেমন প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

'তেনার কথা'—শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবীশের নকল কবিতায় রসের নিবিড়তা নাই। আমরা আনন্দও পাইলাম না। কবি নকলে এখনো নবীন হইতে পারেন নাই এখনো novice—কবি লিখিয়াছেন—

সেথা—গিয়াছেন তিনি সে মহানরকে
জুড়াইতে সব জ্বালা
সেথা—হয়তো ফিরিতে লভিয়া রম্ভা
হয়তো মরিতে হইয়া লম্বা"

ইহাতে হাস্য অপেক্ষা বীভৎস রসের অধিক প্রাচুর্য্য।

কেবল একটী পংক্তি আমাদের ভাল—লাগিয়াছে তাহা

"ঘর্ম্মে চর্ম্মে সুরধুনী বয়"

কাজী নজরুলের দীওয়ান-ই-হাফিজ গজল গান। হাফেজের ছন্দের সার্থক অনুকরণ। কাজী পারস্য ছন্দো-বৈচিত্র্য বঙ্গসাহিত্যে বিনিয়োগ করিয়া বঙ্গ কাব্য সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিতেছেন।

প্রবর্ত্তক—'সন্ন্যাসীর প্রতি।' লেখকের নাম নাই। ৪টী সনেটে সমাপ্ত।

প্রথম সনেটটীর ভাব রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

যার খুসী রুদ্ধ চক্ষে কর বসি ধ্যান
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান,
আমি ততক্ষণ বসি নির্নিমেষ চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

দ্বিতীয়টির বক্তব্য :—

নয়, নয়, নয়,
এই দেহ এই প্রাণ নহে পরাজয়
এ যে অতি মানুষের চরম গৌরব
স্বর্গ আর মর্ত্ত্য দুঁহু মিলিত বৈভব।

তৃতীয়ে :—

আমার হৃদয়
নহে শুধু আপনার একেলার ধন
যদি তাহে নাহি ওঠে বিশ্বের স্থাপন
বিশ্বের ক্রন্দন যদি নাহি তাহে ফোটে
বিশ্বের আনন্দ যদি নাহি তাহে জোটে
মৃত্যুর মন্দির তবে মম মর্ম্মতলে
পাবে নিজ প্রতিষ্ঠান।

চতুর্থে :—

হে সন্ন্যাসী জ্ঞানী * *
তব অস্বীকার
কভু না থামাবে এই কৌতুক ঝঙ্কার
মহাকবি হস্তে যেই মহান্ (?) বীণায়
বাজে অহর্নিশ ; এ বিশ্বের প্রতি রেণুকায়
যে স্পন্দন যে ক্রন্দন নিয়েছে আশ্রয়
যুগযুগান্তরে তার নাহি পরাজয়।"

যমুনা। চৈত্র। বসন্তে যমুনা। শ্রীমতী লীলা দেবী। কবিতার ভাবটি মন্দ নয়। ছন্দ ও ভাষা বিন্যাস অনবদ্য নয় বলিয়া কবিতাটি উৎরাইতে পারে নাই।

"তাইত এ হিয়া উচ্ছসিয়া এ আবেগ উদ্দাম"
"বীচিতলে আশার লহর উগলে রাখাল রাজ"

ইত্যাদি পংক্তিতে রীতিমত ছন্দঃ পতন। লেখিকা মিলের জন্য রাধাকে 'বাধে' করিয়াছেন—অথচ সম্বোধন নয়। 'সুরভি সুবাস' পুনরুক্তি। প্রবাল অর্থে কিসলয়। কিসলয়ের মর্ম্মর ধ্বনি অদ্ভুত নয় কি ?

ব্যথার আলো। শ্রীসুশীলকুমার বাগচী। বিশেষত্ব শূন্য।

"মনের ধাঁধাঁ পড়ুক বাঁধা
মনের জালে।"

শ্রুতিমধুর বটে কিন্তু অর্থ কি ?

অবগুণ্ঠন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বহু সাধ্য সাধনা করিলাম কিন্তু অবগুণ্ঠনের অন্তরালের ধনের সাক্ষাৎ কার লাভ করিতে পারিলাম না।

কবিভাগ্য। শ্রীমোহিতলাল মজুদার। এ সংখ্যায় মোহিত বাবু এই ধাঁধাঁটি সমাধানের জন্য দিয়াছেন—সমাধান করিলে বোধ হয় পরসংখ্যায় নাম প্রকাশিত হইবে।

নয়নের আলো আমি, আমার নয়ন নাহি
আমা দিয়ে দেখে সবে, আমি কোন্ দিকে চাহি
গান আর নাম মোর এক হয়ে' যায় শেষে
আমি যত ডুবে যাই গান তত উঠে ভেসে।

বল্ দেখি—আমি কে?

বাঁধ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়। কবি কি কবি কালিদাসের ব্রজবেণু পাঠ করিয়াছেন? বোধ হয় করেন নাই—করিলে কবিতাটি নিশ্চয়ই লিখিতেন না।

সিন্ধুবুকে। শ্রীআশুতোষ রায়। কবিতাটিকে একটী সম্পূর্ণ নিখিল বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় কবি একটী কবিতা লিখিতে বসিয়া সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই—যে কটী পংক্তি রচিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা যমুনার কালো আথরের জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।

নারায়ণ। চৈত্র। টঙ, দবরেশ। কবি বলিয়াছেন—

এইবার তুই আসমানেতে বেঁধে নিয়ে টঙ
চুপটি করে দেখনা বসে দুনিয়ার কি ঢঙ
আমরা বলি
কবি দিচ্ছ একি সঙ
রচে নারায়ণের টঙ
বলিহারি মরি মরি কি লেখারি ঢঙ।

পেটের দায়। শ্রীকালিদাস রায়। কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছেন—

বলেছিলাম, তোমার ছেলে অকলঙ্ক সোনার চাঁদ
মিথ্যেকথা! গোবরগণেশ আহা কিবা রূপের ছাঁদ
বলেছিলাম মেয়ে গুনো লক্ষ্মী যেন—সত্য নয়
রক্ষাকালীর বাচ্চা তারা—ঠিক তাহাদের পরিচয়
রূপে তুমি মদনমোহন বলেছিলাম কতবার
সত্য তুমি যমের বাহন এমনি তুমি কদাকার
আয়নাতে মুখ দেখলে পরে থাকবেনা সন্দেহ তায়
সে সব কথা বলেছিলাম কেন জান পেটের দায়।

আহ্বান। জ্যোতির্ম্ময়ী রচিত। কবিতায় নৈতিক উপদেশ।

বঁধু দরশনে। শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী। সরস মধুর রচনা—বৈষ্ণব কবির ভাবভঙ্গি অবলম্বনে রচিত।

মরমের মোর এক বন্ধন নয়নের মোর চিরনন্দন
বঁধুয়ে
উন্মুখ মম চাতক শ্রবণ
অবিরল ধারে কবি সিঞ্চন
বেণু জলধর বিগলিতস্বর
মধুতে
পিপাসিত মম চকোর নয়ন
কবি অবিরত হরস মগন
চন্দ্রবদন বক্ষিত (ক্ষরিত?) কিরণ
পুঞ্জে
হতেছে উদয় আমার হৃদয়

কবিতাটিতে ভুজঙ্গ বাবুর ভনিতার বিশেষত্ব আছে—
"ভুজঙ্গ দোলায়ে ফণা করুক নর্ত্তন।"

ভুজঙ্গবাবু ভক্ত কবি—ভুজঙ্গবাবুর কবিতায় আমরা ভক্ত হৃদয়ের রস মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

নিরুদ্দেশের যাত্রী। (বাউল, কাশ্মীরী খেমটা) দৈনিক কবি। ছন্দের ললিত ঝঙ্কার শ্রুতি মধুর।

পুস্তক সমালোচনা

আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর—শ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। বেঙ্গলবুক কোম্পানী, ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য দুই টাকা।

সাহিত্য-পরিষদের একান্তমনা কর্ম্মী ও উদ্যোগী পুরুষ নলিনী বাবু, সাহিত্য-পরিষদের প্রাণসম আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দরের জীবন-কথা যে লিপিবদ্ধ আকারে সাধারণে প্রকাশ করিলেন—ইহা খুবই শোভন হইয়াছে। নলিনী বাবু ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতনামা লেখক ও স্বনাম-ধন্য পুরুষের দ্বারা এই জীবনী খানি লিখাইয়াছেন—। একটী চরিত্রকে নানা জনে নানা ভাবে দেখিলেও সকলেই রামেন্দ্র সুন্দরের সুন্দর চারিত্র্য-মাহাত্ম্য ও বিদ্যাবুদ্ধির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

"তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক, তিনি সাহিত্যিক" ছিলেন, তাঁহার কর্ম্ম জীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। * * * সেই বিশেষত্বের দ্বারাই তিনি বাঙ্গলার হৃদয় জয় করিয়া ছিলেন। সে বিশেষত্ব তাঁহার দেশাত্ম-বোধ। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। "দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন" সাহিত্য পরিষৎই রামেন্দ্র সুন্দরের জড় মূর্ত্তি।" "যতদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থাকিবে, ততদিন রামেন্দ্র সুন্দরের স্মৃতি বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালীর হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া বিরাজিত হইবে।"

"রামেন্দ্র সুন্দর যে অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার কথা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই সাধনা রামেন্দ্র সুন্দরের জীবনে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ—ইউরোপের বিজ্ঞান প্রচারের ভাগ। এই কার্য্যটি করিতে যাইয়া রামেন্দ্র সুন্দর বাঙ্গালায় গদ্যের ব্যাপ্তি এবং ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।"

"দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তিনি ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে আমাদের ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র ও রসায়নাদি কষিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন।" তৃতীয় পর্য্যায়ে রামেন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।" মণীষার এই বিকাশের সঙ্গে তিনি আমাদের যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। "দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী, ও সাহিত্যের যমুনা—মানব চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র সঙ্গমে মুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত সাধনার ত্রিবেণী সঙ্গম চিরদিন বাঙ্গালীর তীর্থ হইয়া থাকিবে।' আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র কথা এই জীবনী খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দেশের সকল চিন্তাশীল লেখকের এমন কি [illegible] অধ্যাপক বিমল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন। এই পুস্তকে ১২ খানি ছবি আছে। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মনে হইল নলিনীবাবুর এই ভাবে জীবনী সংগ্রহ বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। আমাদের মনে হয় যে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। প্রতি ঘরে এই পুস্তকের আদর হইবে আশা করা যায়।

রাজনীতি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত। প্রকাশক- সরস্বতী লাইব্রেরী ৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ভারতীয় অন্য ভাষার খবর রাখি না কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার রাজনীতির পুস্তক একেবারেই ছিল না। স্বামিজী এই দান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান সম্পদ বলিয়া চিরদিন আদৃত হইবে।

গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য রাজনীতির সহিত তুলনা করিয়া প্রাচীন ভারতের রাজনীতির বিশেষত্ব টুকু তুলিয়া ধরিয়াছেন। সে নীতি যে কতটা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ, কতটা যে সমাজের শান্তি ও স্বাস্থ্যের অনুকূল তাহাই তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইউরোপের প্রধান রাজনীতি-বিদগণের মত আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন কোথায় তাহাদের ভ্রম, কোথায় বা তাহারা ভারতীয় ভাবের সহিত একমত। কোথায় Comte, Hegel ভারতের সুর গাহিয়াছেন, কোথায় Plato, Aristotle আর্য্যনীতির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন স্বামিজী তাহা সুন্দর ভাবে দেখাইয়া দিয়া স্বাতন্ত্র্যবাদের বিশেষত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। শেষে ভারতীয় রাজনীতির সাধারণ নিয়মগুলি দিতেও তিনি ভুলেন নাই। কিন্তু কোনও স্থানেই, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে পণ্ডিত হইয়াও, গ্রন্থকার কেবল বুলিই কপচান নাই, নীরস কঠিন হইলেও সহজ ভাষায় বিচারের অবতারণা করিয়া পাঠককে স্বাধীন চিন্তা করিবার অবসর দিতে তিনি ভুলেন নাই, পাশ্চাত্য রাজনীতির শব্দগুলির পরিভাষা অতি সুন্দর ও উপযুক্ত হইয়াছে। ইংরাজী শব্দের সুসঙ্গত প্রতিশব্দ অনেক স্থানেই তিনি দিয়াছেন তবে বাঙ্গালা শব্দগুলি একটু কটমট হইয়াছে তাহা বলিয়াত উপায় নাই। একটা কথা, policyর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি ঠিকমত কিছুই হয় না ?

কিন্তু গ্রন্থকার যেমন দেশী বিদেশী বুধমণ্ডলীর ভাব গাঁথিয়া ভারতীয় আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনি তিনি যদি সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক জগতের সুদক্ষ ও সিদ্ধ রাজনৈতিক, শাসন কর্ত্তা ও শাসন সম্প্রদায়ের ভাব ও ক্রিয়ার সহিত ভারতীয় আদর্শ মিলাইয়া দেখাইতেন, কিরূপে তাঁহারা শাসন ক্রিয়া সুনির্ব্বাহ করিতে যাইয়া ভারতেরই মতের পোষকতা করিয়াছেন তাহা যদি দেখাইতেন তাহা হইলে গ্রন্থখানির মর্য্যাদা আমাদের মতে একটু বেশী হইত। গ্রন্থ ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় যে ভারতেও চুক্তি-বাদের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন, আমাদেরও তাহা ঠিক মনে হয়। পুরাণ শাস্ত্রের দোহাই দিতে পারিব না তবে ঐতিহাসিক একটা নিদর্শন দিব।

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য ভারতীয় রাজ্যশাসন পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে মাৎস্য ন্যায়ের পর গৌড়-মণ্ডলের প্রকৃতিপুঞ্জ গোপাল দেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করে। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি এই নির্ব্বাচন পদ্ধতি অটুট রাখেন কিন্তু যখন ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল তখন কৈবর্ত্ত ভীমের নায়কত্বে প্রকৃতি পুঞ্জ তাহাদের চুক্তির জন্য প্রাণ দিতে দ্বিধা করে নাই।

আবার যখন প্রজাগণ রুগ্ন বনিষ্ককে লেপ চাপা দিয়া হত্যা করিল তখনও একটু চুক্তির গন্ধ পাই। তবে এটা ঠিক যে ইউরোপের মতন এতটা "নাছোড়বান্দা" ভাব নাই।

গ্রন্থকার ভারতীয় গণ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানদিগের কথা বলেন নাই। বৃজি, মালব, ক্ষুদ্রক জাতিদের রাজা ছিল না অথচ স্বদেশ রক্ষা করিতে যাইয়া তাহারা একত্রে প্রাণ দিতে পারিত—ইহা কোন নীতির প্রেরণায় তাহার আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শঙ্কর নারায় ভারতে যে Republican system of Government ছিল তাহা সপ্রমানিত করিয়াছেন। স্বামিজী আমাদের নিকট মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান পরিচালিত স্বাভাবিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিতে চান প্রাচীন ভারতের শাসনতন্ত্রগুলি Paternal despotism limited by an oligarchy of presbyters. এ আদর্শ আমরা ভারতীয় শাস্ত্র পুরাণে পাইলেও ঐতিহাসিক যুগে সর্ব্বত্র দেখি না। অশোক, হর্ষ, সমুদ্র-গুপ্তের শাসন যেমন একদিকে শাস্ত্র সমর্থক অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, কণিষ্কের স্বেচ্ছাশাসনও অনেকটা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

ঐতিহাসিক যুগে দেখিতে পাই "the agricultural land as being crown property" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"প্রাণিগণই (প্রজাগণই) ভূমির নিবাসী ও ভূমিতে তাহাদেরই অধিকার।" ঐতিহাসিক ও বর্ত্তমান গ্রন্থ-কারের কথার সামঞ্জস্য কোথায় ? তবে স্বামিজীর আদর্শ যে সুন্দর তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতেও যে টিকটিকীর টকটকে অমঙ্গলেরই সূচনা করিত তাহার প্রমাণ—আমরা ইতিহাসে পাই। মৌর্য্যশাসনে "The statements of Strabo concer-

ning the utilization of courtesans as informers are supported by the existence of a series of regulations on the subject. The government placed great reliance on espionage, and spies might lawfully practise any villainy in the furtherance of purposes of state." কালিদাসের শকুন্তলাতেও নগরপালের অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণের যে ইঙ্গিত আছে হিন্দু শাসন নীতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায়?

প্রাচীন হিন্দু রাজস্ব বর্ণনায় ঐতিহাসিক লিখিতেছেন—"In most cases, the state took half the gross produce of irrigated land. * * * The variety of dues levied regularly by the crown under diverse names and pretexts was very great." তাহার পর আমদানী রপ্তানীর উপরও যে বেশ শুল্ক ছিল তাহার প্রমাণ আছে। উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ যাহা শাস্ত্রে রাজার প্রাপ্য বলিয়া লিখিত ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু রাজারা তাহা সময় সময় যে অতিক্রম করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। দণ্ড সম্বন্ধে ভারতীয় বিধানে কোন কোন স্থলে মনুষ্যত্বের পরিচয় থাকিলেও ঐতিহাসিক যুগে আমরা দেখিতে পাই হিন্দু রাজারা সামান্য অপরাধে হাত পা, নাক কান কাটিতেছেন। Hiuen-Tsang লিখিয়াছেন রাজারাণীর জন্য তখন কারাদণ্ড ছিল, কিন্তু কয়েদীগণ "are simply left to live or die, and are not counted among men."

এইরূপ অনেক স্থলেই স্বামিজী হিন্দু বিধানের কেবল thoretical দিকটাই দেখাইয়াছেন—আর্য্য পাণ্ডতগণ যে রাজনীতি সম্বন্ধে কত সুন্দর নিখুঁত আদর্শ রচনা করিতে পারেন তাহাই দেখাইয়াছেন, তাহার কার্য্যে পরিণতির প্রমাণ কোন কোন স্থলে কেবলমাত্র পুরাণের দৃষ্টান্ত উঠাইয়া দেখাইয়াছেন কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক যুগে যে কেমন করিয়া উহা অবলম্বিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা দেখান নাই। আর একটা কথা, প্রবন্ধকার রাজনীতির সূচিগুলি বুঝাইতে যাইয়া ভারতীয় রাজতন্ত্রের (monarchy) কথাই উঠাইয়াছেন, ভারতীয় রাজনীতির সকল প্রতিষ্ঠানের আলোচনা তিনি করেন নাই। যেমন পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠান। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে নগর শাসনের জন্য যে সকল পরিষদ প্রচলিত ছিল কালের ঘাত প্রতিঘাতে আজও তাহা লুপ্ত নহে। ইতিহাস বলিতেছে—"These Boards may be regarded as an official development of the ordinay non-official Panchayat or Committee of five members, by which every caste and trade in India has been accustomed to regulate its internal affairs from time immemorial."

লেখক শশাঙ্ক ও নরেন্দ্র গুপ্তকে পৃথক ব্যক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। শশাঙ্কের নামই নরেন্দ্র গুপ্ত। ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে বৌদ্ধসংঘের ষড়যন্ত্রের কথা দুই একখানা উপন্যাসে লিখিত হইলেও ইতিহাসে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তবে ইহা ঠিক যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের অবনতির একটি শ্রেষ্ঠ কারণ, আবার ইহাও ঠিক যে বুদ্ধদেবের সময় ও পূর্ব্বেও ভারতীয় পুরাণ প্রমাণ ধরিলে আমরা দেখিতে পাই ভারত ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। সুতরাং বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম অবনতির পথে বাধা না দিয়া সহায়ক হইলেও অবনতির সম্পূর্ণ দায় বেচারী বুদ্ধদেবের স্কন্ধে আরোপ করাটা ঠিক নয়। পুরাণ শাস্ত্রে আসমুদ্র হিমাচল সম্রাটের নাম অজস্র থাকিলেও বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হইতেই একচ্ছত্র রাজার ছত্রতল হইতে ভারত ছত্রভঙ্গ। সুতরাং "বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল আর অহিংসা মন্ত্রের প্রভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল" ইহা কেবল গায়ের জোরে বলা। নন্দদের সময়েও বৌদ্ধধর্ম্ম তত প্রচারিত ও প্রসারিত নহে, তবে কেন ভারতে ক্ষুদ্র রাজ্যের বিকাশ হইয়াছিল, কেনই বা গ্রীক্ রাজকে তক্ষশিলা অভিসার বরণ করিয়া লইয়াছিল? বৌদ্ধধর্ম্ম-ভারতের অবনতির অন্যতম কারণ হইলেও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বা পূর্ব্বস্থিত গলিত বৈদিক ধর্ম্ম ও দেশের ভরাডুবাইতে কম সহায়ক হয় নাই।

স্বামিজীর নিকট এই চমৎকার পুস্তকের জন্য বঙ্গীয় চিন্তাশীল পাঠক ঋণী। পুস্তকখানিতে মধ্যে মধ্যে এমন সব সুন্দর সুন্দর কথা আছে যাহা বারংবার শুনিতে ও শুনাইতে ইচ্ছা হয়।

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৬শ বর্ষ	বৈশাখ—১৩২৮	১০ম সংখ্যা

নব-বর্ষের আহ্বান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

বিধাতা আজ আমাদের দ্বারে দ্বারে নববর্ষের আহ্বান পাঠিয়েছেন—এ আহ্বান এনেছে তাঁর অমোঘ আশীর্ব্বাদ ত্যাগের বাণী, ধ্বংসের সৌন্দর্য্য আর সৃষ্টির মাধুর্য্য! আজ বিশ্বসন্ন্যাসী তাঁর পিঙ্গল জটাজাল সমস্ত আকাশময় এলিয়ে দিয়ে পদ্মাসনে বসেছেন,—তাঁর দীপ্তচক্ষুর সম্মুখে মহাশ্মশানের প্রধূমিত চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে,—তিনি তাঁর মুখে করাল পিনাক তুলে আমাদিগকে আহ্বান করচেন,—

"ওরে সুপ্ত, ওরে জড়চৈতন্য—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এক হাতে তাঁর ধ্বংসের লীলা মহাকালের অলঙ্ঘ্য শক্তিকে বিকাশ করছে, আর এক হাতে তাঁর সৃষ্টির মহানন্দ পর্য্যাপ্ত হয়ে উপ্‌ছে পড়ছে।

হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান!
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।

আকাশ আজ তার সমস্ত অদৃশ্যলিপি খুলে আমাদের সামনে ধরেছে, বাতাস এই নববর্ষের নবীন প্রভাতে পুলকের আমেজ দিয়ে বলে গেল—

"সাতে ভাই চম্পা জাগো"—

কুঁড়ির মধ্যে যে বিকাশের বাসনা ছিল—কিশলয়ের মধ্যে যে শ্যামশোভার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য ছিল আজ তা শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আজ তিনি তপস্যানিরত মহাযোগী সন্ন্যাসীর মত আপনার সর্ব্বশূন্যতার মধ্যে মানুষকে আহ্বান করে বলছেন,—

ত্যাগেন ভুঞ্জিথা।—

তিনি আজ রুদ্র আহ্বানে মানুষকে জরা ও মরণ জন্ম ও জীবনের মধ্যে আকর্ষণ করে বলছেন—

ওরে আত্মানং বিদ্ধি—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

নববর্ষের নবীন প্রভাতে, তাঁর যে আহ্বান আজ আমাদের কাছে পৌচেছে তাকে উপেক্ষা করার সাধ্য আমাদের নাই।—আজ আত্মভোলা ভোলানাথের ডাক যে একেবারে মনকে ভুলিয়ে দিয়েছে—। যে মহাদেব আজ তরুণকে ঘরছাড়ার গান শুনিয়ে পথের পথিক করেছেন, সেই রুদ্র দেবতাই আজ বজ্রনির্ঘোষে আত্মসাবধানীদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন! কে আজ ওই প্রভাত পাখীর সঙ্গে তান মিলিয়ে গান গেয়ে উঠল!—কে আজ ওই অপূর্ণ, ফুলে কিশলয়ে পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দিল?

মহামানবের যে তৃষ্ণা আজ ধরিত্রীর বিশুষ্ক কণ্ঠে প্রবল

হয়ে উঠেছে—তার পরিতৃপ্তি করবে গঙ্গাধরের ওই জটা-নিবদ্ধ উৎসটী! যে বক্রচক্ষুর মুহুর্মুহুঃ কটাক্ষে ধরিত্রীর বক্ষপঞ্জর অবধি কম্পিত হয়ে উঠছে,—সেই দৃপ্ত চক্ষুই ত মানব মনের মোহবেদনায় করুণ সজল হয়ে উঠবে। বর্ষশেষের ধ্বংস লীলার মধ্যে শূলীশম্ভুর যে ত্রিশূল আজ উদ্যত হয়ে উঠেছে তাই যে আমাদের সকল বিপদ, সব বিপর্য্যয় থেকে রক্ষা করবে। কালবৈচিত্র্য ও শক্তি সংশ্রয়ের মধ্যে এই হাড়মালীর প্রত্যেক হাড়খানি যে লীলাকমল হয়ে ফুটে উঠবে—বিভূতিভূষণের বিভূতি-রাশিই যে অনাবিল মাধুর্য্য কণায় নগ্ন ধরিত্রীকে প্রসাধিত করে তুলবে। ত্রিকালদর্শীর তৃতীয় নেত্র হইতে যে বিদ্যুৎস্ফুরণ হবে তাতে সংসারের সংশয়-অন্ধকার হ'তে সংসারী ত্রাণ পাবে—ফণীভূষণের সহস্র ফণীমালা বন্ধন দশার মধ্যে মানুষের চরম মুক্তি ও পরম আনন্দ এনে দেবে—নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-হলাহল সে দিন আমাদেরকে অমৃত দিয়ে অমৃত করবে। তখন আমরা দেখব বিশ্বের পরিত্যক্ত ভস্মসার তুচ্ছ সামগ্রী সমস্ত সাধনার সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

নববর্ষের দেবতার এই মহা আহ্বানে আমরা জাগ্রত হয়ে উঠছি—বুঝেছি— যেখানে ধ্বংস সেইখানেই সৃষ্টি। কালের পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে বিচিত্র সম্ভাবনা আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে—এইটে আমাদের একটা বিশেষ শিক্ষা। কালকে অতিক্রম করে আমাদের কোনও চিন্তা বা চেষ্টা কোনও সাধনা বা কর্ম্মকে আমরা বাঁচিয়ে তুলতে পারি না—বিগত বর্ষের শেষ সীমানায় দাঁড়াইয়া আসন্ন বর্ষের অনাগত দিনগুলির নবারম্ভের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি—অতীতের মধ্যে আমি আমার কর্ম্ম ধ্যান ও ধারণা লইয়া বাঁচিয়া আছি, সুতরাং অতীতের জগৎটী আমার কাছে অপ্রত্যক্ষ হলেও জাগ্রত,—আবার বর্ত্তমানের মধ্যে আমি সমগ্রভাবে আপনাকে দেখিতেছি—আমি আমার সমস্ত আমিত্বটুকু দিয়ে এই অপ্রত্যক্ষ অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগ বিধান করছি—এখানেও আমি এবং আমার জগৎ প্রত্যক্ষভাবে সত্য - বর্ত্তমানের আমি, এই মুহূর্ত্তে এইখানে দাঁড়াইয়া সুদূর ভবিষ্যতের মধ্যে আপনাকে কত না বিচিত্রভাবে সৃষ্টি করিতেছে—আমার ভবিষ্যতের আমিটী আমার কাছে কল্পনা ও ভাবনার মধ্যে জাগ্রত হইয়া আছে—সুতরাং ভবিষ্যতের জগতও ত আছে। এই যে তিন কাল লইয়া আমি আছি—ইহা লইয়াই ত আমার সত্তা। তবু আমি কালপ্রভাবের অধীন—কাল বৈচিত্র্য গুণে সম্ভব ও অসম্ভবের কোনও মূল্য নাই। মানুষ যে সময়ের দাস--বিশ্ববিকাশের বীজ যে কালের গর্ভে লুক্কায়িত আছে, কে জানে এই কালের সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, আত্মনির্ভরতা ও ত্যাগ সঙ্কল্পের মহিমায় আমাদের আজকার ভারতবর্ষ কাল তরুণ হয়ে উঠবে—ভারতবর্ষ তার নব জীবনের সাফল্যকে ভাগ করে দেবে নিখিল বিশ্বে, তাই আশায় বসে আছি। তাই বলছি হে নবীন সন্ন্যাসী, নববর্ষের তরুণ প্রভাতের দেবতা, –

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্থলে,—বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা—লক্ষ কোটি নরনারী হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

আকিঞ্চন

[শ্রীসরযূবালা সেন]

দীন অগতির স্বামী,
তোমার দুয়ারে রিক্ত হৃদয়ে
ভিখারী দাঁড়ায়ে আমি।

মণিকাঞ্চনে নাহি প্রয়োজন,
আমার দীনতা বিশ্বশরণ,
লভিতে প্রসাদ তব,
আমি আঁধার জীবন করিতে বহন
শুধু কি জীবিত রব?

এই শুধু দাও মোরে,
ভগ্ন হৃদয় জুড়াক যাতনা
বাঁধি তোমা প্রেমডোরে।

হৃদয়ের মাঝে হও পরকাশ,
প্রাণের হীনতা কর হে বিনাশ
পবিত্র কর মন,
কাঠের এ তরী হোক স্বর্ণ
লভি তব পরশন।

আলোচনা

নারী শিক্ষা *

জাতীয় আদর্শ আবার নূতন করে বুঝবার দিনে আজ যে নারী-শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে এটা খুব সুখের বিষয়। কিন্তু এটা ঠিক এ সব সম্বন্ধে খুব মুষ্টিমেয় লোক ভাবছেন ও কাজ করছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমুদায়ের উন্মেষ করা। অধুনিক ইউরোপে একটা দল পুরুষ ও নারীর মনের ও সমাজগত বিশিষ্টতাকে শুধু আবেষ্টনের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন, কিন্তু শিশুতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব ও পশুর প্রবৃত্তি সমুদায়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে স্পষ্ট বুঝা যায় ও বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণও হয়েছে, যে গোড়া হতে মূলতঃ প্রবৃত্তিমূলক একটা প্রভেদকে স্বীকার করতেই হবে। এটা ঠিক যে বিভিন্ন দেশে ও যুগে সমাজ বিন্যাস ও সভ্যতার ধারা নানা দিক হ'তে স্ত্রীজাতির বিশিষ্টতাকে এমন কি খর্বতাকে উৎসাহ দিচ্ছে, কিন্তু পুরুষ ও নারীর একটা দেহগত ও মনোগত বিশিষ্টতা গোড়া হতেই লক্ষিত হয়। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য শক্তি রক্ষা করা—ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে শক্তি সমর্পণ করা। এইজন্য প্রত্যেক সভ্যতায় স্ত্রীজাতির মধ্যে একটা সহানুভূতি ও করুণাধর্ম্মের আধিপত্য লক্ষিত হয়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত সমাজ জীবনের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়—আর এইটাকেই মূল ভিত্তি করে'—নারী-শিক্ষা গঠন করে তুলতে হবে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে ভারতীয় সভ্যতার সমাজ বিন্যাস ও আদর্শের ক্রমবিকাশের ফলে নারী তার পরিবার ও গোষ্ঠীজীবনে সত্য সত্যই ব্যক্তিজীবনের সহিত সমাজ ধর্ম্মের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য আনতে পেরেছে। ভারতীয় নারীর নূতন শিক্ষার এই সামঞ্জস্য আরও নূতন করে বিস্তৃত করে আনতে হবে। এদেশে পুরুষের শিক্ষায় আমরা দেখি একটা প্রকাণ্ড বিরোধ, জাতির আদর্শের সঙ্গে শিক্ষার বিচ্ছেদ, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনা

* নারী শিক্ষা সমিতির সভায় রামমোহন লাইব্রেরীতে কথিত।

আমাদের ঐতিহাসলব্ধ আদর্শ শিক্ষার প্রণালীতে স্থান পায় না, তা ছাড়া বিস্তালয়ে শিক্ষার ঠিক পরের কর্মজীবনে কর্মকুশলতাকে উৎসাহ না দিয়ে বিস্তালয়গুলি সত্য সত্যই আমাদেরকে জীবন সংগ্রামে অকেজো, অপটু ও দুর্বল করে ফেলেছে। তার ফলেই এখন দেখিতেছি নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযান ও আন্দোলন। নারী শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের পুরুষের শিক্ষার সব দোষগুলি যে বর্তমান শুধু তা নয় শুধু যে ইহা জাতীয় শিক্ষা নহে তাহা নহে, ইহা একই প্রকারে বিজাতীয় প্রণালী অবলম্বন করে' ভারতীয় সভ্যতা এতকাল ধরে স্ত্রী জাতির মধ্যে যে সেবা-প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে রেখেছে তার ক্রমবিকাশ করছে না, তাই অনেক সময়ে যা স্বাভাবিক তার প্রতিরোধের ফলে বিদ্রোহ ও আত্মদ্রোহটা পুরুষের শিক্ষার ক্ষেত্র অপেক্ষা এ ক্ষেত্রেই বেশ দেখা যাচ্ছে। আর তার প্রকাশটাও হচ্ছে নিতান্ত নিদারুণ, কারণ প্রতিক্রিয়াটা খুব [illegible]। ভারতের পুরাতন নারী শিক্ষায় আবার যে স্ত্রীলোকের আদর্শটা বাহির হতে আদান প্রদান বন্ধ করে একবারে অচলায়তনের মধ্যে স্ত্রীলোককে পঙ্গু করে ফেলেছে এটা ভারতের সেই মধ্য-যুগের অবনতির ফল—পুরাণ [illegible] সাহিত্যে গল্পে ছড়ায় যেন প্রবৃত্তির সেই উৎসাহ দানটাও জাতীয় দুর্বলতা ও পরাধীনতার দিকেই জেগে উঠেছিল। যা পুরাতন, যা মধ্যযুগের (mediaval) তার সঙ্গে বর্তমান জীবনের বিরোধের জন্য দেখছি হিন্দুসমাজে এত স্নায়বিক বিকার এত আত্মহত্যা। এ রীতিকে একবারেই বিসর্জ্জন দিতে হবে—বস্তু গঠন যা করতে হবে তা নারীর সেই স্বাভাবিক জাতির রক্ষা ও সেবাধর্মকে আশ্রয় করে'। শিক্ষা প্রণালীতে তাই রোগ, অস্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা নিবারণ ও প্রতিকারের জন্য স্বাস্থ্য, ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা চাই ও পারিবারিক জীবনে কর্ম্ম-কুশলতা ও অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হস্ত ও গৃহশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। চাই বিজ্ঞান শিক্ষা কিন্তু বিজ্ঞানকে সেবার কাজে লাগাবার ব্যবস্থাও চাই। চাই পাশ্চাত্য আদর্শ কিন্তু তাকে আপনার করে নিতে হলে প্রাচ্য আদর্শের ভেতর দিয়েই নিতে হবে, জিল বার্ককে রাজপুত বীররমণীর পাশে বসাতে হবে, চাই ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের সেবাধর্ম্ম, আমাদের নারীগণকে সমাজের নূতন মঙ্গল (Social welfare) কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করতে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাসে যে আত্মবলিদানের পরিচয় পাই, অথবা প্রাদেশিক কাব্য বেহুলা-ফুল্লরার উপাখ্যান বা কনকা মনিমেখলার কাব্যে যে প্রেম ও ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শকে ফুটাইয়াছে তা এই সমাজের দুঃখ, রোগ, অনশন, পাপের মধ্যে আরও বিস্তৃত ভাবে পাওয়া চাই। আর তা পেতে হলে শিক্ষাপ্রণালী যাহাতে কর্ম্মঠ সেবা-ভাবনের উপর [illegible] যোগাতে পারে তাহার জন্য আর্ত্তসেবা, দরিদ্র সেবা, নৈশবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের অঙ্গ করতে হবে। নারী যে সংসারের রক্ষাশক্তি, দেশের বর্তমান দুঃখ নিরাশা অসম্পূর্ণতার মধ্যে নারী আপনার শক্তি নিয়োগ করুক, বাহিরের ঝঞ্ঝা ও তাড়নের মধ্যে [illegible] একটা মঙ্গল সুর বাজাতে থাক, সমাজের যেখানে পাপ ও হীনতা সেখানে তার উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা সমস্ত কালিমা মুছে ফেলুক। যেখানে সমাজের সমস্ত দুঃখ শোক সঞ্চিত সেখানে সে তার ধৈর্য্য, তার সেবা, তার মাতৃত্বের স্নেহপ্রলেপে সমস্ত দুঃখ শোক নিবারণ করুক। এই বহু দুঃখ পীড়িত সমাজই নারীর কৈশোরের অযোধ্যা, তার যৌবনের পঞ্চবটি, তার সংসারের অগ্নি পরীক্ষা, আবার তার আশ্রমের পাতাল প্রবেশ দ্বার। যাঁরা নারী শিক্ষার ভার নিয়েছেন তাঁরা সত্য সত্যই জাতির নবজাগরণের নূতন রামায়ণ রচনা করছেন।

ওমর খৈয়াম

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

প্রভাত আজি ঢিল ছুড়েছে রাতের আকাশে-
জাগো ওগো—তারার দল পালায় তরাসে.
পূব গগনের শীকারী সে আলোর জালে গো
ঘিরিয়া নেছে সুলতানেরি সৌধ নিবাসে।

উষার বাহু 'রাশ' ধরেছে ভোরের বিমানে,
'সরায়ে' কে হাঁক্‌ছে আমার স্বপন শয়ানে,—
"জাগো সাকি, ভরিয়া দেহ মদের পেয়ালা—
জীবন-সুরা শুকিয়ে যাবে কখন কে জানে!"

কাকের ডাকে ভোর হয়েছে—পথের দুধারে
লোক জমেছে পানশালাটার রুদ্ধ দুয়ারে,
কইছে ডেকে—দুয়ার খোলো—মেয়াদ ফুরালো-
গেলে আবার ফির্‌ব কিনা বল্‌তে কে পারে?

৪

নওরোজে সব সাবেক আশা দিচ্ছেরে সাড়া,
সেই নির্জনে ভাবুক জনের চিত্তটা হারা,
ধূলো যাহার পুণ্য হ'ল যিশুর নিশাসে,
মুশার পরশ কর্‌ল শ্যামল যাহার সাহারা।

৫

ইরাম গেছে—গেছে তাহার গোলাপ গরিমা,
কোথায় আজি জম্‌সেদের সে ধনের মহিমা,
ফুল বাগিচা আজো জাগে নদীর বাঁকে গো,
দ্রাক্ষা রসে আজো খ'সে মণির শোণিমা।

৬

কবি দায়ুদ মৌন কবে—বনের পাখীতে
জংলা সুরে আজো আছে তেম্‌নি হাঁকিতে;
সুরা—ওরে রঙিন সুরা—হলুদ গ্রীবাটি,
গোলাপেরি রক্ত রাগে চায় সে রাঙিতে।

ভর্‌ পেয়ালা আয়রে সাকি,—ফাগুন শিখাতে
মনস্তাপের জীর্ণ খাতা থাকুক মিলাতে।
আয়ু পাখীর পথ সে নহে বহু দূরের গো—
পাখী তাহার ভর দিয়েছে তরুণ ডানাতে।

বগ্‌দাদে কি বাল্‌কে তুমি যেথায় থাকোনা,
পাত্র যদি পূর্ণ থাকে—কিসের ভাবনা?—
জীবন-সুরা ফোটে ফোটে পড়্‌ছে গড়ায়ে,
প্রাণের পাতা খস্‌ছে দ্রুত—যায় যে তা গোণা

৯

হাজার চাঁপা বরণ করে পথের ধূলোকে,
হাজার আবার নয়ন মেলে ভোরের আলোকে।
জম্‌সেদ্‌ ও কৈকবাদের স্মৃতির ব্যথাটি—
পড়্‌বে ঢাকা ফাগুন দিনের ফুলের পুলকে!

১০

কৈকবাদে ছাড়িয়া দেহ ভাগ্যেরি হাতে,
কৈখস্‌রু পড়ুক ঢাকা ভুলের শিলাতে;
রস্তম ও হাতেমতায়ের ভাবনা মিছেগো—
আয়রে সাকি কবির সাথে কণ্ঠ মিলাতে!

১১

শস্পে ঢাকা পথটি আমার হৃদয় জুড়ানো,
বাঁয়ে মরু ডাইনে কুসুম নয়ন লোভানো,
বাদ্‌সা কে যে কেইবা নফর—কেউ তা' জানেনা,
মামুদসাবো মুকুট সেথা জীর্ণ পুরানো।

১২

নিবিড় ঘন গাছের ছায়া, মদেব পেয়ালা,
মুখে রুটি কাব্য পড়ে' কাঁবার দুবেলা,
সুরের হাওয়ায় কণ্ঠে তোমার ছন্দ নাচে গো
স্বর্গ ছেড়ে যাচি তবে বনের নিরালা।

১৩

নন্দনেরি স্বপ্নে কেন গোঁয়াও জীবনে ?
আমি জানি সুরার জুড়ি নেইকো ভুবনে।
স্বপ্ন রেখে বর্ত্তমানে বরিয়া লহ গো—
দূরের ধ্বনি চির দিন(ই) মধুর শ্রবণে।

১৪

ঐ শোন গো গোলাপ কহে ধরার বুকেতে,
মর্ম্ম আমার বিকশিছে গভীর সুখে যে,
এক নিমিষে দীর্ণ করি' রেশমী পাঁপড়ি—
বিত্ত আমার বিলিয়ে দেবো বায়ুর মুখে রে।

১৫

সোনার ফসল গোলায় যারা জমায় হুতাশে,
যারা তাদের ধারার মত ছড়ায় বাতাসে,
দুজনারি ভাগ্য তাদের সমান জেনো গো—
কবর হ'তে ফিরে কেহ মর্ত্ত্যে না আসে।

১৬

চিত্তে কত কি-হনা লেখে আশার লেখনা,
কোথায়ও সে সফল কোথা নিরেট স্বপনি।
মরু-বালুর বুকের পরে তুষার রাশি গো—
দণ্ড দু'য়েক জ্বল্ জ্বলিয়ে নিলায় অমনি।

১৭

জীর্ণ পচা সবাইখানা এই যে ধরণী,
গুণে দু'টি দুয়ার তাহার—দিবস রজনী,—
তাই গলায়ে রাজার পরে আস্‌ছে রাজা গো,
দণ্ড দু'য়েক,—পথের পরেই আবার তখনি।

১৮

জম্‌সেদ্ যেথা মদ খেয়েছে সোনার গেলাসে
খেক্‌শেয়াল ও সিংহ আজি বেড়ায় উলাসে।
সব শীকারীর সেরা বেবাম—তারি মাথা গো,
গাধা গুঁড়োয়—স্তব্ধ সে আজ নিদ্রা আলসে।

১৯

ঐ যে গোলাপ ফুটে আছে বনের নিভৃতে,
কে জানে ও রাঙা সে কোন রাজার শোণিতে ?
উঠ্‌ল গড়ে বল্‌বে কে ঐ অপরাজিতারা,
কোন্ সে রাণীর মুকুট খসা মাথার মণিতে ?

২০

এই যে ঘন দুব্বাদলের কোমল বিছানা,
সবুজ হ'য়ে ছুঁয়েছে (যা) নদীর সীমানা,
আল্‌গোছে রাখ্ অঙ্গ সখা—বল্‌তে পাবে কে
নয় এ কোনো রাঙা ঠোঁঠের চুমোর নিশানা !

২১

খোস্ মেজাজে ভর সাকি, পানের পেয়ালা,
মিশুক আগে পাছের ভীতি—আগের যে জ্বালা।
কা'লের কথা ?—কালকে আমার হয়তো বাজাবে
সপ্তশত গত কা'লের নীরব বেহালা।

২২

বুকে যাদের টেনেছিলাম গভীর আদরে,
ভাগ্য নিজে পিইলো সুধা যাদের অধরে,
এক চুমুকে প্রাণ পেয়ালার মন্ত শুষিয়া,
মরণ ঘুমে তারাও আজি ঘুমোয় অঘোরে।

২৩

সেই ঘরেতেই ফূর্ত্তি মোরা লুটছি গরবে,
ফাগুন ওঠে আগুন হ'য়ে রূপের বিভবে।
ঐ ধূলোতে আমাদেরো শয্যা হবে গো—
শয্যা হব—কাহার লাগি কেই বা তা ক'বে ?

২৪

মেয়াদ যদি ফুরায়নিকো—কিসের ভাবনা ?
ফূর্ত্তি ক'রে দণ্ডগুলো করবে যাপনা।—
ধূলো'র পরে মিশবে ধূলো—কোথা সমাপ্তি,—
গাওয়ার সাকি,—পানের সুরা সেথায় পাবনা।

২৫

আজ্‌কে ভাবি যাদের নাহি সোয়াস্তি প্রাণে,—
অধীর আঁখি চাইছে যারা কাল্‌কেরি পানে,
'ময়জ্জিনে'র কণ্ঠ আসে আঁধার ভেদিয়া
বেকুব তোদের কাম্য নাহি—যাও সে যেখানে।

২৬

জ্ঞানী যারা গড়েছিলেন তর্ক সড়কে,
পৃথক ক'রে কথার ছাঁদে স্বর্গ নরকে,
আজ তাদেরো তীব্র ভাষা ধূলোয় ঠাসা গো,
মূঢ়ের সাথে মর্‌চে তারাও একই মড়কে।

২৭

ছেলে বেলায় কম ঘুরিনি জ্ঞানীদের দ্বারে,
কাঁচা মাথা পাকিয়েছিলাম তর্কেরি ভারে,
তর্ক ধাঁধায় যে পথটারে যাওয়ার ভেবিছি,
সেই পথেই তো ফিরেছি গো গভীর আঁধারে।

২৮

তাদের সাথেই করেছিলাম বীজের বুনোনী,
চাষ করেছি দুঃখটারে দুঃখ না গণি।
জ্ঞানের চারা আজ দিয়েছে ফসল আমা'রে—
"স্রোতে এলাম ভেসে যাব স্রোতের মতনি"

২৯

কোথা হ'তে কেন এলাম বিশ্বেরি বুকে,
আবর্ত্তিত জলের মত চল্‌ছি সম্মুখে,
মরু বুকের এলোমেলো ঝড়ের মত গো।
জানিনে সে পড়্‌ব আবার কোথায় বা ঝুঁকে!

৩০

কার খেয়ালে কোথা হ'তে এলাম ভূতলে—
কারে শুধাই সেই কথাটা—কেই বা তা বলে?
পেয়ালা পরে উড়িয়ে দে রে মদের পেয়ালা,
ব্যথা ডুবুক রাঙা মদের নিবিড় অতলে।

৩১

মনের পাখা উধাও হয়ে যায় তো বেড়াতে,
পেরিয়ে ঐ সাত মহলা গ্রহের পাড়াতে;
কত ধাঁধার বাধা কাটে মনের খাঁড়া গো—
কেবল নারে ভাগ্য দেবীর বাঁধন এড়াতে!

৩২

তার দোরেরি চাবিটারি পাইনি নিশানা,
ঐ পর্দ্দারি পিছনটারে হয়নি গো জানা,
দু'দিন শুধু তোমার আমার নামটি রহে গো—
তার পরেতেই নিবিড় ফাঁকা—গভীর অজানা।

৩৩

ধরণী সে ছায় না জবাব—বঁধুর বিরহে,
উথলে ওঠা ঐ যে সাগর—প্রশ্ন না সহে।
গড়িয়ে পড়া আকাশখানি দিবস রজনী
ব্যক্তটারে গুপ্ত করেই মৌন সে রহে!

৩৪

কাঁদিয়া শুধাই মাথার পরের নিঠুর গগনে
ভাগ্যটারে যায় গো জানা কোন্ সে কিরণে?—
যাত্রীরা সব মূর্চ্ছে পড়ে আঁধার পথে গো—
আকাশ কহে—"অন্ধ নিয়ম চালায় ভুবনে।"

৩৫

মৃৎ পেয়ালা অমনি চাপি অধর দুয়ারে,
জীবন রসের রহস্যটা শুধাই তাহারে।
অধর 'পরে অধর কহে—য'দিন বাঁচ গো
পান ক'রে নাও—জীবন নাহি মরার ওপারে

৩৬

ঐ যে গেলাস কইছে কথা আমায় নিরালা,
উড়িয়েছে সে হয়তো কতই মদের পিয়ালা।
পাৎলা ঠোঁঠের হাজার চুমো এরই অধরে
ফুল ফুটিয়ে ঝরে গেছে হয়তো দুবেলা।

৩৭

পথে যেতে সেদিন দেখি—মাটির পাঁজারে
ঠাস্‌ছে কুমোর পায়ের তলায়—চাপ্‌ছে মিছারে।
"ধীরে বন্ধু একটু ধীরে"—কইছে পাঁজাটি—
কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ ভেজা অশ্রুরি ভারে।

৩৮

সবাই জানে—মাটির তালে মানুষ গড়িয়া
দুনিয়াতে আপনি ধাতা দেছেন ছাড়িয়া।
কথা এনয় নূতন কিছু—আদিম ভোবে গো
জন্ম লভি' আজো আছে হৃদয় জুড়িয়া।

৩৯

পাত্র হ'তে যে মদটুকু গড়ায় ভূতলে,
সপ্ত তালে যায় সে ভেদি' ধরার অতলে,—
সেইখানে সে ভিজিয়ে তোলে অধর খানি গো
জ্বল্‌ছে বাহা অরুণ মদের তৃষার অনলে।

৪০

ফাগুন বনে ফুলটি চাহে যেমন হরষে,
পেয়ালাটাবে সরস কর অধর পরশে।
তরুণ সাকি পাও যদি গো বক্ষে টানিও,
মাথার 'পরে উল্টে আকাশ কখন্ বা খসে!

৪১

গড়িস্‌নে রে মন্দ ভালোর মিথ্যে হেঁয়ালী,
কালের কথা দাও বাতাসে নিঃশেষে ঢালি।
ঐ যে সাকি আন্‌ছে ব'য়ে মদের পেয়ালা,
জ্বল্‌ছে ও রি কালো চুলে আলোর দীপালী।

৪২

ঐ পেয়ালা—এই যে অধর সবার সমানি,
ওরাও যদি হয় রে ফাঁকি দুঃখ না মানি।
শূন্য ফাঁকা তুইটা ওরে ফাঁকিই রহিবি—
এতটুকু কম্‌তি কোথায় পড়্‌বে না জানি!

৪৩

নদীর বাঁকে য'দিন আছে গোলাপ ফুটিয়া,
কবির সাথে দ্রাক্ষা সুরা নে তুই বাঁটিয়া।
মৃত্যু সাকি আন্‌বে যখন আরেক সুরা গো—
পান্ ক'রে নিস এক চুমুকে—যাস্‌নে হটিয়া!

৪৪

ধরার ধুলো ঝেড়ে ফেলে আত্মা যদি রে,
পেরিয়ে যেতে পারে ঐ মেঘের নদী রে—
কর্দ্দমেরি পিঞ্জরেতে অঙ্গ খানি গো,
রাখবে ঘিরে কোন্ সে লাজে—কিসের খাতিরে।

৪৫

রাজা যখন আসে ধরার মৃত্যু নিবাসে
এই তাঁবুটাই তারে টানে বক্ষেরি পাশে।
রাজা যখন চলে যাবে রইবে পড়ে ও—
রইবে সে কোন নূতন রাজার আসার দুরাশে।

৪৬

হিসাব নিকাশ চুকিয়ে গেলেই আমরা দু'জনে,
কেউ হেথা আর আস্‌বে নাকো—ভাবিস্‌নে মনে।
চির সাকির পাত্র হ'তে মোদের মতনি,
বুদ্‌বুদেরি রাশি কত ঝর্‌ছে পবনে।

(ক্রমশঃ)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

সার সিদ্ধান্ত

ও

আপত্তি বিচার

অতঃপর পূর্ব্বালোচনা ফলে দেখা যাইতেছে যে—আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অলৌকিক ঘটনাবলীর ইঙ্গিত ধরিয়া অতিপ্রাকৃতের রাজ্যে ঢুকিয়া তিনটী অতি অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথম—টেলিপ্যাথী বা অতীন্দ্রিয় উপায়ে এক চিত্ত হইতে অপর চিত্তে ভাব-সঞ্চালন। ইহা এখন সর্ব্ববাদীসম্মত বৈজ্ঞানিক সত্য। মহা সন্দেহবাদীও বাধ্য হইয়া এই নূতন শক্তিকে মানিতেছেন। দ্বিতীয়—মানুষের অন্তরের অন্তরালে লুক্কায়িত একটা বৃহত্তর সুপ্তচৈতন্য—যাহার শক্তি জাগ্রত চৈতন্য শক্তি অপেক্ষা বহু গুণে বেশী এবং যাহার ক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় অভ্রান্ত। সন্দেহবাদীরা ইহাকেও দায়ে পড়িয়া মানিয়া লইয়াছেন; না মানিলে উপায় নাই। তৃতীয়—মানুষের মৃত্যুর পর তার জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে, এবং এই অবস্থা হইতে অলৌকিক উপায়ে সজ্ঞানে ও সচেষ্টায় মর্ত্ত্যবাসীদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে; বিজ্ঞান যত রকম কৌশলে ও উপায়ে সম্ভব হইতে পারে এই তত্ত্বটীকে বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত করিয়াছে। স্বতঃকথন ও স্বতঃলিখন ব্যাপারটী যে মুক্তাত্মার ইচ্ছাকৃত আত্মপরিচয় দিবার সজ্ঞান চেষ্টা ইহা আর কোনো অপক্ষপাতী পণ্ডিত অস্বীকার করেন না। স্যার অলিভার লজ্ বলেন :—

"The Hypothesis of surviving intelligence and personality—not only surviving but anxious and able with difficulty to communicate—is the simplest and most straightforward and the only one that fits all the facts." (Survival of Man. p. 321)

দীর্ঘজীবনব্যাপী সহস্র সহস্র পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে Dr. Hodgson বলিতেছেন—"I have no hesitation in affirming with the most absolute assurance that the spirit Hypothesis is justified by its fruits and the other Hypothesis (telepathy) is not."

(S. P. R. Proceedings, Vol XIII. 1898)

সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত Arthur Hill প্রথমে টেলিপ্যাথীবাদী ছিলেন; পরে প্রায় এগারো বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণের ফলে বলিতে বাধ্য হন "If I am now biassed in favour of the belief in personal life after death, it is objective fact, not subjective preference that has brought it about, and my judgments have not been hasty. I have worked at the subject for over eleven years."

এতদিন যে পরলোকতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব রূপে অন্ধকার গুহায় নিহিত ছিল; বিদ্যাভিমানীর সমাজে যা ঘোর কুসংস্কার রূপে হেয় ও হাস্যাস্পদ ছিল; বৈজ্ঞানিক যাহাকে grand mother's tale ঠাকুরমার ঝুলি বলিতেন, তাহাই এখন সেই বৈজ্ঞানিকের পূজনীয় Settled fact রূপে শিরোধার্য্য!

কিন্তু তথাপি...এখনো অনেক এমন আছেন যাঁহারা

ঘটনাগুলির অলৌকিকত্ব মানেন কিন্তু প্রেতাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধ মানিতে চাহিতেছেন না; তাঁহারা Telepathyর জীর্ণ খুঁটী ধরিয়া থাকিতে চাহেন; অথচ Telepathy দিয়া কি করিয়া যে সংবাদদাতা অশরীরী চৈতন্যের কায়-মন-বাক্য-ভঙ্গী, ভগ্ন বার্তা (cross correspondence) বা অজ্ঞানা ভাবের উদ্বোধন ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহার কোন সন্তোষকর কৈফিয়ৎ দিতে পারিতেছেন না। টেলি-প্যাথীর সুতা বুনিয়া ধুনিয়া লম্বা করিতে গিয়া যে তাহা factএর ভার সহিতে পারিতেছেনা তাহা মানিতে চাহেন না। তার পর এক কথা, শুধু টেলিপ্যাথী বলিলে তো চলিবে না, কেন না মুক্তাত্মা কর্তৃক ভাবসঞ্চালনও উহার মধ্যে পড়ে। সে স্থলে মুক্তাত্মার দেহ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিতেই হইবে। যদি বলেন কোন না কোনো জীবিত ব্যক্তির মন হইতেই এই সব ভাব আসিতেছে, তাহাও হইতে পারে না; কেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিতেছি এমন সব কথা ওপার হইতে আসিতেছে যাহার অস্তিত্ব বৈঠকে উপস্থিত কাহারো মানসপটে বিদ্যমান নহে। তা ছাড়া হাতের লেখা, গলার সুর, বলিবার ভঙ্গী, সজ্ঞান চেষ্টা, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক নাটকীয় ধরণ; বুদ্ধিবিচার পূর্ব্বক প্রমাণ দিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ—এ সব টেলিপ্যাথীর দ্বারা কি রূপে প্রকাশমান হইতে পারে অতি কূট বুদ্ধিরও অগম্য! এ সত্ত্বেও যদি অবিশ্বাসী সন্দেহবাদী উহাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহেন তবে বলিতে হইবে তার মনের কথা হইতেছে, 'আমি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব মানিব না'। এ কথা বলিলে আর তর্ক নাই।

উঁহারা আরো গুটীকয়েক ছোটো খাটো আপত্তি তুলেন। সেগুলি এই; যথাঃ—(১) "যদি সত্যই মুক্তাত্মার কাজ হয় তবে তাহারা অতি তুচ্ছ কথা বার্তা লইয়াই ব্যস্ত কেন?"। (২) "উহাদের অনেক সময় ভুল ভ্রান্তি হয় কেন?"। (৩) 'উহারা অনেক ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে কেন?"

অনুসন্ধানকারী পরীক্ষকেরা এ সব স্বীকার করেন; ও তাহার সন্তোষজনক উত্তর দেন। তাহার সঙ্গতি ও যুক্তিবত্তা বুঝিবার আগে মিডিয়ম দেহে প্রেতের আবির্ভাব ব্যাপার ও বৈঠক-রহস্যটী ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। পর অধ্যায়ে তাহার একটু আভাস দিয়া আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টা করিব।

আলাপ পদ্ধতি

বৈঠক (seance) করিয়া পরলোকবাসী মুক্তাত্মার সহিত আলাপ করিতে হইলে একজন মিডিয়ম চাই। মিডিয়ম মানে 'মধ্যস্থ'; ইহারই দেহ-যন্ত্র অধিকার করিয়া মুক্তাত্মা দেহীদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করে। সহজে ও স্বভাবে অতি অভিভূতিশীল (Sensitive) ব্যক্তিই মিডিয়ম হইতে পারে; আপনা হইতে বা কৃত্রিম উপায়ে উহার মোহ (Trance) হয়; সেই অবস্থায় তাহার জাগ্রত চৈতন্য নিষ্ক্রিয় ও রুদ্ধ হয়; এবং তাহার সুপ্ত চৈতন্য সজাগ ও ক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে। মুক্তাত্মা এই সুপ্ত চৈতন্যের উপর নিজ চৈতন্যের প্রভাব চালায়, এবং তাহার বাক্‌যন্ত্র বা হাত লইয়া নিজ মনোভাব ভাষায় বা লেখায় প্রকাশ করে।

(১) অনেক মিডিয়ম আছেন যাঁহাদের মোহ হয় না, সজাগ অবস্থায় থাকেন; এই অবস্থায় প্রেতাত্মা তাহার হাত লইয়া নিজ হস্তাক্ষরে সংবাদ লিখিয়া দেয়; মিডিয়ম এই স্বতঃলিপি পড়িয়া নিজেই প্রশ্ন করেন; উত্তর যাহা আসে তাহা তাঁহার জ্ঞানাতীত এবং ইচ্ছাতীত। উত্তর লিখিবার সময় যে হস্ত চালনা তাহা মিডিয়মের সজ্ঞান-শক্তিতে নহে। অনেকটা আমাদের দেশের রোজাদের 'হাত চালা' ধরণের। এই শ্রেণীর মিডিয়মরা প্লানচেট বা টেবিল সহযোগে আলাপ করেন।

(২) আর এক শ্রেণীর মিডিয়ম আছেন যাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই মোহমুগ্ধ হন। এই অবস্থায় উহার সহজ চৈতন্য লোপ পায়; দেহযন্ত্র অসাড় হইয়া পড়ে, তাহার উপর স্বীয় প্রভাব থাকে না।

এই অবস্থায় আলাপ উৎসুক কোনো মুক্তাত্মা আসিয়া তাহার দেহযন্ত্র অধিকার করিয়া বসে, এবং ইচ্ছামত বাকযন্ত্র বা হাত লইয়া ব্যবহার করে। মিডিয়মের নিজ ব্যক্তিত্ব (individuality) লোপ পায় বা ক্ষণকালের

জন্য রুদ্ধ থাকে; কথিত আত্মার পূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব মিডিয়ম দেহে ফুটিয়া উঠে, গলার স্বর, চোখের চাহনি, কথার ভঙ্গী, ধরণ ধারণ, মুদ্রাদোষ সমস্তই হুবহু ফুটিয়া উঠে, দেখিয়া মনে হয় যেন মৃত ব্যক্তি নূতন দেহ ধরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে। এই মুক্তাত্মাকে ইংরাজীতে Control বলে, অর্থাৎ 'অধিকারী' বা 'ভরদাতা'। এই অধিকারী প্রেতই যে আহূত সংবাদদাতা (real communicator) সব ক্ষেত্রে তাহা নয় অনেক সময় 'অধিকারী' শুধু মুখপাত্রের কাজ করে। আহূত প্রেত—যাহার সহিত আলাপের জন্য তাঁর আত্মীয় বন্ধু বান্ধব উপস্থিত সে নিকটেই থাকে। তবে সে নিজে মিডিয়মের দেহযন্ত্র চালাইতে পায় না বা পারে না বলিয়া তার একজন 'কথক' চাই; control বা 'অধিকারী' আত্মা এই কথকের কাজ করে। প্রেতদিগের কথায় প্রকাশ, সকলেই নাকি মিডিয়ম-দেহ ব্যবহার করিতে পারে না, সেই জন্য ও-পারের দক্ষ মুরুব্বীরা যাকে তাকে অধিকারী-পদ দেন না। এই অধিকারী আত্মা সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ বলেন, 'উহা মিডিয়মেরই সুপ্ত চৈতন্য—কোনো একটা সত্য বা কাল্পনিক মুক্তাত্মার part play করে মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে উহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অপর কেহ বলেন, উহা মিডিয়মেরই দ্বৈত চৈতন্য (Dual personality); অপরের মতে উহা সত্যই একজন স্বতন্ত্র মুক্তাত্মা স্বয়মিচ্ছু হইয়া অপটু অর্ব্বাচীন মুক্তাত্মার কথক' স্থানীয় হয়। যাই হোক, তবে সংবাদপ্রেরক যে আত্মা তার যদি স্বতন্ত্র সত্তা মানি, তবে 'অধিকারী' আত্মার স্বতন্ত্র-সত্তা অসম্ভব কিসে বুঝি না।

সে যাই হউক—এ পারে অর্থাৎ আমাদের দিকে একজন জীবিত ব্যক্তি sitter বা সংবাদগ্রাহকের কাজ করেন। তিনি প্রায়ই মুক্তাত্মার পরিচিত আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব; বা পরীক্ষক কেহ, এ ছাড়া একজন লিপিকর থাকেন; বৈঠক-বিবরণী তিনি যথাযথ কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।

Control বা অধিকারী মুক্তাত্মা যখন মিডিয়ম-দেহে ভর করেন তখন কিরূপ ব্যাপার ঘটে তাহা প্রেতদিগের প্রদত্ত বর্ণনায় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত জনসন সাহেব তাহার যে বিবরণ লিপিজাত করিয়াছেন তাহাই তুলিয়া দিতেছি (অবশ্য অনুবাদযোগে),—

মানুষের আসল দেহটা অতি সূক্ষ্ম ভাস্বর ইথরে (Luminiferous Ether) নির্ম্মিত; ইহা তাহার স্থূল জড় দেহের ভিতর বদ্ধ, দেহ মুক্ত প্রেতাত্মারা যে লোকে বাস করে তাহাও এই সূক্ষ্ম ইথরে গঠিত ও পূর্ণ; (আমরা যেমন জড় দেহ লইয়া জড় জগতে বাস করি; উহারাও তেমনি ইথর দেহ লইয়া ইথর জগতে বাস করে—থিওসফির আস্ত্রাল (astral) জগত)। মিডিয়মের সূক্ষ্ম ইথর দেহটা সময়ে সময়ে অজ্ঞাত কোনো কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলে ভাস্বর তেজে পূর্ণ (radio-active energy ?) হইয়া উঠে, তখন উহা ইথর শরীরী প্রেতদের চোখে পড়ে, উহারা তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসে, তখন তাহারা মিডিয়মের সূক্ষ্ম দেহটাকে তাহার স্থূল দেহ হইতে পৃথক করিয়া দেন, ফলে স্থূল দেহটা একটা আলোকপূর্ণ শূন্য খোল বা খোসার মত পড়িয়া থাকে, এই অবসরে প্রেতরা তাহার দেহস্থ আলোকটার সঙ্গে নিজেদের সংযোগ ঘটায়; একই সময়ে একাধিক প্রেত এই আলোকের সহিত সংযোগ ঘটাইতে পারে। মিসেস্ পাইপারের দেহে দুইটা বিশেষ স্থান আছে যেথায় এই আলোকটা একটু বেশী উজ্জ্বল; তাহার মাথা ও দক্ষিণ হাত; সম্প্রতি মাথার আলোর অপেক্ষা এই হাতের আলো যেন আরো উজ্জ্বলতর হইয়াছে। আলাপ ইচ্ছুক প্রেত এই আলোর সংযোগে আসিয়া চিন্তা করিলেই সেই চিন্তা হাতের দ্বারা লেখায় প্রকাশ হইবে; মাথার আলোর সঙ্গে অন্য কোনো প্রেত যোগাযোগ স্থাপন করিলে তার মনের ভাব মিডিয়মের বাক্‌যন্ত্র দিয়া বাহির হইবে।

(ক্রমশঃ)

"বহ্নি-বাসর"

[শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য]

জীবন-কাহিনী বলিতে চাহিনি তোমাদের দরবারে
আজি একান্ত হয়েছি শ্রান্ত গুমোট ব্যথার ভারে
তাই দুটো কথা মরমের ব্যথা চাহিনাক প্রতিকার
যদি পাও লাজ ভয় কি ? সমাজ আছে তোমা সবাকার
এ যে ঘোর ব্যাধি নাই ঔষধি সারা দেহ ব্যাপি ক্ষত
তাতেও সমাজ দাঁড়িয়ে দরাজ সীমারক্ষণে রত।
পোড়ামুখী মেয়ে মোর পানে চেয়ে, বলেন পরস্পরে—
ঝড়ের মতন কি জানি কখন এসেছি তাঁদের ঘরে!
কুলীনের নাকি মেয়ে পোড়ামুখী বাঁচিতে তাহার নাই
খেলা ধূলা ?—সে ত ধনীদের বেলা গরীবের কোথা ঠাঁই
পূজা উৎসবে থাকিতাম যবে বাল্যখেলায় রত
মা বলেন শুনি বিপদ বাখানি সকলে মর্ম্মাহত
জননী ভিন্ন সকলে ক্ষুণ্ণ দেখিতে পারে না কেউ
পরের বচনে মায়ের নয়নে বহে কান্নার ঢেউ।
কাল কভু কারো ধারেনাক ধার তাইতে হইনু বড়
বয়সের দোষ জনকের রোষ অবিরত খরতর;
আমি যে অবলা যায়নাক বলা বাবা! আমিও যে ছেলে
কৃষ্ণ-বরণা কুলীন-কন্যা হতভাগ্যেরই মেলে—
হায়রে কপাল! আমি জঞ্জাল দীনের কুটীর পাশে
ধনীর তনয়া অধীর হইয়া কালামুখী ব'লে হাসে,
নাক বসা ব'লে কিছু উঁচু হলে বলে কেউ হ'ত ভাল
কেউবা—যেমন রূপের গড়ন তেমনই রঙটী কাল,
বিপুল দুঃখ বিদরে বক্ষ দারুণ বেদনা গ্লানি
সুন্দর মুখে ধনীদের বুকে কি সুধা আছে না জানি।
বাড়িল বয়স পড়িল ষোড়শ যৌবন রোষে রাঙা
ত্রস্ত শরীর সভয়ে নদীর দু'তীর দেখিল ভাঙা,

সমাজ সখার গণ্ডীর তার কেটে দিয়ে গ্যাছে কাল
ঋষির আইনে গেরো গুণে গুণে বুনছে সে আজ জাল,
কত গুরুভার দেখিবার তার নাই কোন প্রয়োজন
কন্যার বিয়ে দেবে না এ কি এ ? সমাজ যে মহাজন ?
ত্বরা শোধ' ধার নইলে আবার ঋণ বহা হবে ভার
ভিটে মাটী ছাড়া সমাজের ক্ষুধা মেটে না কিছুতে আর ;
কুলীন পাত্র শুনিবামাত্র পিতা ত্বরা সেথা যান
মোটে দু'হাজার 'জামাতার মান' সকলেই শুনি চান ;
দিন দুই আগে সভা পুরোভাগে মত দিয়াছেন যিনি
পুত্রের বিয়ে পাশ হ'লে বি এ, বলে বসিলেন তিনি,
তিনি মহা ধনী, পরে কানাকানি হইল পরস্পরে
অমুক বাবুর পুত্র, হাবুর বিবাহ জজের ঘরে,
অনেক অর্থ পাইবে পাত্র, বিস্তর আরও দান—
শ্মশান বিহনে এ পোড়া জীবনে কোথায় আমার স্থান ?
ভাবিয়া অনেক সুযুক্তি এক বুক ফেটে বাহিরায়
সেই সুযুক্তি বাবার মুক্তি বাধা বিপত্তি সায়।
এই দেখ সোজা কেরোসানে ভেজা লজ্জাবরণখানি
সমাজ-সিদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ বপুতে ব্যাপিনু আমি
প্রদীপের শিখা কপালের লিখা অঞ্চল মোর ধ'রে
দারুণ ক্ষুধায় পেয়ে অসহায় ডাকিছে বাসরঘরে,
সাক্ষী তোমরা সম্পদহারা পিতাকে আমার ব'লো
আর নাই বাধা সমাজের ক্ষুধা কিছু নিবৃত্ত হ'লো।

"জাতিগঠনের বাধা—ভিতরের ও বাহিরের"

[শ্রীসত্যরঞ্জন বসু]

আলোচনা

গত চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় 'জাতি গঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রবন্ধটা পড়ে আমার মনে কয়েকটা কথায় দ্বন্দ্ব বেধেছে, তাই আমি এ সামান্য কয়েক লাইন লিখ্ছি।

শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয় সম্বন্ধে আমার স্বীয় জ্ঞান ও মতামত লইয়া যদি আমি কিছু বলি তবে সে আমার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা যা বলবো সবই আমাদের বিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার—তা নাহলে লোকে মান্‌বে কেন?

সকল কাজেই বাধা বিপত্তি আছে এবং থাক্‌বেই, সেটা বাইরের দিক থেকেও যেমন, ভিতরের দিক থেকেও সেই রকম। কি ছার 'জাতি গঠনের'!!

আমার দেশ 'জাতি' বল্‌তে এতকাল কিছু বুঝতো কিনা এবং কি বুঝতো তা আমাদের ভেদনীতি থেকেই স্পষ্ট অনুমিত হয়। মানুষ এবং জাতি এ খুবই খাঁটি থাকবে যত দিন এই মানব-জগৎ বর্ত্তমান আছে। তবে তার ভিতর জাতির 'মানসিক জগৎ' আর মানুষের 'ব্যবহারিক জগৎ' এই যা পার্থক্য থাক্‌বে। কিন্তু জাতি যদি গঠনের ভিতর দিয়েই 'মানুষ' হ'তে পারে তবে সে দুটো জগৎকে এক করে ফেলবে; তবে এর কোনও রকম নিদর্শন পৃথিবীতে আছে কিনা আমার জানা নেই।

শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয় যাকে আমাদের স্বখাদ সলিলে ডুবে মরবার কথা বলছেন সেটা যে কালের কষ্টি পাথরেই তাকে কষিয়ে তার খাদ ধরে দেবে। এত দিনে এটাই আমাদের বুঝে উঠবার সুযোগ হয়েছে।

কারণ নবজাগরণের বন্যাই বলুন আর নবজীবনের সাড়াই বলুন আজ আমাদের যে আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে পেয়ে বসেছে এটা অস্বীকার করলে চল্‌বে না। সেটা বরণ করে নিতে হবে—তাকে সমালোচকের মাপ-কাটিতে মাপলে চল্‌বে না—তার ভিতর নিজকে এক করে নেওয়াই হচ্ছে জাতীয়তার নিকষমণি। স্বাদেশিকতার পরাকাষ্ঠা! এই আন্দোলন রাজনৈতিক কি সামাজিক সেদিকে নজর না করে কেবল জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী মাল মসলা জোগাড় করে দেওয়াই আমাদের আসল কাজ। কিন্তু মানুষের কতকগুলি দুর্ব্বলতা আছে যার প্রভাব সহ্য করা সকলের সাধ্য নয়, তাই তারা মাঝে মাঝে নিজের মানসিক ঔৎসুক্য এবং ইচ্ছাকে প্রবলতম বাহ্যিক কার্য্যকলাপে লোপ করে দেওয়ার চেষ্টা দেখে। এই জন্য 'আমি যেরকম আছি—তাই বা ক'দিন। কে যায় দুজ্জোতিতে!' কিন্তু সে তখন দেখেনা যে ভগবান তাকে যে এক স্বীয় উন্নতি সাধনের জন্যই বিশিষ্ট গুণ বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি কিম্বা চিন্তা করিবার ক্ষমতা দিয়েছেন তা নয়। যখন সে তার মত আরও পাঁচজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলবে তখনই তার জীবনের গতি সার্থক হবে। হৃদয়ের এবং বাহিরের সামঞ্জস্য হচ্ছে এই। এ ছাড়া দেশাত্মবোধ আর কি?

স্বদেশী আন্দোলনের নিষ্ফলতা লক্ষ্য করে অনেকে আমাদের এই বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের উপর কটাক্ষ করেন। কিন্তু সেই আন্দোলন বঙ্গে যে সময় বহিয়াছিল বলিয়াই আজ সারা ভারতময় এই শুভানুষ্ঠানের দিকে সকলে ভাল মন্দ বিচার ছেড়ে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯০৬ সালের আন্দোলন বিফল হয়েছিল কাজেই আমাদের কোনও

রকম আন্দোলন করা ঠিক নয়, এ কোনও যুক্তির কথা নয়। দেশে এমন সময় হয়েছিল যখন লোকে 'আত্ম-বিশ্বাস' বলে' যে কিছু আছে তাই ভুল্‌তে বসেছিল, কিন্তু সে ধারণাটা এখন আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে। এখন স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা লোকে উপলব্ধি করছে। তাই আজ দেশময় সকলে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বজা তুল্‌তে ব্যস্ত।

আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠাই স্বাধীনতা। সেই স্বদেশী আমলে আত্মবিশ্বাস ছিল না বলেই আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু যার ছিল সে জাগলো!—বোম্বাই! সেও তো আমার দেশ! সমগ্র ভারতকে এক করে নেওয়ার যে চেষ্টা সেটাই হচ্ছে আমাদের স্বাদেশিকতার মূল সাধনা। এবং এইটাই হচ্ছে জাতীয়তা লাভের প্রথম সোপান। এই একীকরণ মন্ত্রে অবস্থা ভেদে কর্ম্মের রীতি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। আর যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরাই তার কর্ম্মকর্ত্তা। এর ভিতর সমালোচক হয়ে এক কোণে সরে থাক্‌লে ভগবানের কাছে যেমন দোষী হ'তে হবে তেমনি দেশমাতৃকার সেবায়ও যে তিনি অবহেলা করছেন এটা তাঁর নিজের মনে অবশ্য বেজে উঠবে! শক্তি যার যতটুকু, সামর্থ্য যার যতখানি সেই অনুযায়ীই তার কাজ করতে হবে, তার বেশী আর সে কি করে করবে। নীরবে সাধনা করা দু' একজন সাধক ছাড়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে—যাঁরা বহির্জগতে কর্ম্ম করেন তাঁরা এই নীরব কর্ম্মীদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে জগতে তা বিলাতে চেষ্টা করেন।

আমরা উত্তমহীন, অলস ও আরামপ্রিয়,—এটা খুবই খাঁটি সত্য! কিন্তু এটাও অস্বীকার করা চলে না যে আধুনিক চেষ্টায় আমাদের বদনামটা অনেক পরিমাণে কমেছে। এবং আজ যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা-ওয়ালা যুবক দেশের কাজের জন্য অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা অন্ততঃ চাকুরীর মোহে দেশ উদ্ধার করতে অগ্রসর হন নি এটা ঠিক। তবে ত্যাগের কথা বল্‌লে বল্‌তে হয় ত্যাগস্বীকার বাধ্য হয়ে করতে হবে—কারণ বেশী পায় কোথায়? ছাত্রদের ত্যাগস্বীকার সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু ছাত্রেরা যাঁদের কথা বেদবাক্য বলে মেনে চলে তাঁরা ত্যাগকে ভোগের বাড়া করেই চলেছেন। এইটেই যা আমাদের দুঃখ! আমার শক্তি আছে,—আমার বুক ভরা আশা আছে—আমার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তবুও আমার মোহ ছাড়তে পারছি নে। একেই বলে কপালের লেখা! আর একেই বলে অতীতের মোহ! বাপ দাদা আমাদের চাকর করবার মানসে যে সমস্ত শিক্ষা দিয়েছে তারই পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছি আমরা, তাদের স্নেহের পুত্তলি সব। কারণ তা ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই। এটা গোলদীঘির ধারের হেঁয়ালি নয় কিম্বা অর্থনীতি কিম্বা রাজনৈতিক আলোচনার অঙ্গ নয়—এটা নিতান্ত সত্য! নেহাৎ কাঠাখোট্টা ভাবে বলা!

বোম্বাই এবং বাঙ্গালা!—এই দুইয়ের যে ব্যবধান হবেই হবে!—কারণ ভৌগলিক অবস্থিতি! এই জন্যই বোম্বাই সহর কলকাতা সহর থেকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। আরও ঐ যা আমাদের 'আরামপ্রিয়' বলা হয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের বাঙলার জমিতে সোণা ফলে। এই জন্যই অল্প আয়াসে লোকে এক মুঠো পেলেই শান্তিলাভ করতে ইচ্ছে করে! আর এক কথা—বণিক না হলেই যে বাঙলা বাঁচবে না—এ কথা বিশ্বাস করতে একটুও ইচ্ছা করে না। কারণ আমি জানি বাঙলায় এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে অধিকাংশ গরীব লোকই আমের সময় আম খেয়েই দিন গুজরান করে। আমাদের এই ব্যবসাবুদ্ধি হয়েছে পাশ্চাত্য বণিকসংস্পর্শ দোষে! মুষ্টিমেয় ইংলণ্ডবাসী আজ অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর এই ব্যবসার সাহায্যে! কাজেই আমাদেরও সেই অনুসরণ করতে হবে! কিন্তু আমরা দেখ্‌ছি না যে আমাদের ভারতলক্ষ্মী সোণার কমল হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের দেবার জন্য! এই কমলাকে খুঁজতে হবে আমাদের ঐ কৃষক ভাইদের ঘরে—ধনী ব্যবসাদারের ঘরে নয়;—যাঁরা কেবল অর্থের লোভে তামসিক সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছেন! কলিকাতা সহরে তো অনেক ধনীই আছেন যাঁরা ব্যবসায় মাতব্বর হয়েছেন, কিন্তু কয়জনা ক'টি গরীবকে অন্নদান করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন? কিন্তু এখনও আমাদের গ্রামের ঐ ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতর এমন বহু লোক আছে যারা নিজের

পেট ভরার চাইতে অন্ত একটা দুঃখী নিঃস্বকে এক বেলা খাইয়ে নিজকে তৃপ্ত বোধ করে। এই জন্যই বলছিলাম জোয়াচ ব্যবসায়ী—আর আমরা বাঙালী কৃষিজীবি! আমাদের তাই চৌরঙ্গীতে ঠাঁই নেই! আমাদের শ্রেষ্ঠতম বাসস্থল হচ্ছে গ্রামে! কিন্তু বর্তমান শিক্ষা এবং অনুকরণপ্রিয়তায় এতই পটু হয়ে পড়েছি যে আমরা গ্রাম ছেড়ে সব হঠাৎ সহুরে হয়ে পড়ছি! কৃষি এবং কুটীর শিল্প ছেড়ে—বড় বড় কলকারখানা এবং তারই সব বড় বড় মূলধনের চিন্তায় দিনপাত করছি। যেখান থেকে আমাদের দৈনিক খাওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে তাকে দিন দিন শ্মশানে পরিণত করবার জন্য পাশ্চাত্য রীতিনীতিতে আমাদের গ্রামের উন্নতির চেষ্টায় চেষ্টিত রয়েছি!

সেদিন 'বিজলী'তে বেশ ক'টি লাইন পড়েছি!—"যে মহাদেশের একদিকে হিমাচল আর প্রায় তিন দিকে সিন্ধু, তার প্রাণ হলো কৃষি; এত জল এত আলো এত সুখে ভরা উর্ব্বর জমি আর কোন্ দেশে আছে? আমাদের জমিই মায়ের স্তন, ঐ স্তনের ধাবায় মানুষ না হয়ে 'ব্যবসা করে' বেনে হবার বুদ্ধি সাত কাহন করলে চলবে না। সমুদ্রে ঘেরা বরফে ঢাকা এক ছটাক দেশ ইংলণ্ড ধনের কাঙাল হয়ে মুদী বেনে গেছে বলেই আমরাও তাই হব—এটা ভাবের গোলামী। বাণিজ্য আমাদের গৌণ জিনিষ, কৃষিই সাত কাহন। চাষা হও, যে এই ভাতের কাঙাল, কাপড়ের কাঙাল, আনন্দের কাঙাল দেশে চাষ করে মায়ের দুধ শত ধারে মায়ের সন্তানদের পান করাবে, সেই এ যুগের ব্রাহ্মণ! দশ দশ বিঘে জমি নিয়ে বসে যাও, তোমার বুদ্ধির জোরে, দেশপ্রেমের জোরে ও তপস্যার তাতেই সোণা ফলাও, বঙ্গের বীর শিশুরা আজ লাখে লাখে হলধর বিগ্রহে অবতীর্ণ হও। মরা দেশ বাঁচুক।"

এই তো আমাদের আপনার কথা, এই তো আমাদের জীবনের খাঁটি পথ। কেবল পথ-ভুলে ঘুরে বেড়ালেই আমাদের জীবন গড়ে উঠবে না, বরং নষ্ট হবারই সম্ভাবনা বেশী!

তবে শুনুন, কথা হচ্ছে ছেলেরা যে সব মেতেছে 'ব্যবসা করবো'; এবং এমন ব্যবসা যাতে রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া যায়!—এটা আমাদের ছেলেদের দোষ মোটেই নয়—সে দোষ হচ্ছে শিক্ষাদাতা গুরুদের! ছেলেদের শিখিয়েছেন নোট মুখস্থ করে রাতারাতি 1st class পেতে; তারা কি আর কেউ এখন সেই কষ্ট করে মাথার ঘাম পা'য় ফেলে টাকা রোজগার করতে চায়? তারা চায় অন্ততঃ মোটরে দৌড়ে টাকা রোজগার করতে! এই জন্যই তো আজ দেশময় একটা রব উঠেছে vocational education দাও। যে রকম শিক্ষা পেলে আমরা কিছু করে খেতে পারি! সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ সভায় লাটসাহেব যে বক্তৃতা করেছেন, তিনিও এ বিষয় উল্লেখ না করে পারেন নি! আজ আমরা আমাদের যে কি অভাব সেটা বুঝতে চেষ্টা করছি; কাজেই কর্তারাও সঙ্গে সঙ্গে হুঁসিয়ার হয়েছেন।

তার পর "ব্যবসা এবং শিক্ষায় বিরোধ নেই—একেবারেই নেই।" এটা খুবই সত্য! কিন্তু শিশুকে ডাল ভাত দিয়ে মানুষ করতে আরম্ভ করে হঠাৎ পোলাও কোরমার ভিতর ফেলে দিলে সে যেমন সেগুলো ঠিক হজম করে উঠতে পারে না; সেই রকম আমাদের ছেলেদের শিক্ষা কিম্বা অ-শিক্ষার ভিতরে অন্য কোনও রকম জিনিষ এনে দিলে তারা সেগুলোকে ঠিক গ্রহণ করে নিতে পারে না! তাই তাদের না হয় শিক্ষা না হয় ঐ কি বলে ব্যবসায়! দু'য়ে একটা খিচুড়ী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু লেখক মহাশয় দানের কথা যা বলেছেন সে বিষয়ে আমি ঠিক মেনে নিতে পারলুম না।

সব মানুষের ভিতরেই একটা জিনিষের ঐক্য আছে। এবং তারই প্রেরণায় মানুষ জাগতিক বিভাগ এবং ধর্ম্মের বৈষম্য ভুলে সকলে এক হ'তে চেষ্টা করে। সেটা হচ্চে নিজের দেশকে ভালবাসবার ক্ষমতা। দেশের মাটিতে নিজের মা'টিকে খুঁজে বার করা। এই দেশাত্মবোধ থেকেই মানুষ মানুষকে আপন করে নেয়। তাই আজ বাঙলায় হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি সম্ভবপর হয়েচে। কিন্তু এর ভিতর যা একটু আধটু পার্থক্য এখনও লক্ষিত হচ্ছে—আশা করা যায় সময়ে সেটা নষ্ট হবেই হবে! তা কেউ বন্ধ করে রাখতে পারবে না!

এই জন্যই জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন। এবং এই জন্যই প্রত্যেক ধর্মের বিশিষ্টতা রক্ষা করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে!—সে মোসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান সকলকার জন্যই—এটা ঠিক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডির ভিতর পড়ে কি না,জানি না। কিন্তু সেই জন্য বিবেকানন্দ কিম্বা দয়ানন্দকে টেনে আনা কেন? যতদূর জানি বিবেকানন্দ কখনও সঙ্কীর্ণতা কিম্বা অ-সার্ব্বভৌমিকতার প্রশ্রয় দেন নাই।

মোসলমান হিন্দুর জল ছুঁলেই সেটা খারাপ হয়ে যায় কিম্বা তার পাশাপাশি হিন্দু কেল্‌নারের দোকানে বসে চা খাচ্ছে, এগুলো আজকাল কি রকম ভাবে হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করবার জিনিষ। আগেকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সত্যই প্রতীতি হয় যে বর্ত্তমান বাঙলার ছেলেরা সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখেছে। এখন আর লুকোচুরির ভিতর নেই! আর যা-ও আছে তা কালের কষ্টিপাথরে ঠিক ধরা পড়ে যাবে। সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। একদিনে কখনও সমস্ত ময়লা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সবই সংস্কৃত করে তোলা সম্ভবপর নয়। সময়ের দরকার। এর ভিতর অন্য কোনও রকম ভাবলে চলবে না। মনীষিরা বলে দেবেন এবং নিজেদের জীবনে দেখাবেন কোন্ পথে গেলে সমাজ এবং মানুষ উভয়ই বেঁচে যেতে পারে।

ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে এইটুকু বল্‌লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে ইংরেজী আমাদের পেয়ে বসেছে। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি—যে সামান্য বিদ্যা যা অর্জ্জন করেছি—(ঠিক অর্জ্জন নয় শিক্ষার দিক থেকে বিসর্জ্জনই বল্‌তে হবে)—তাতেই এমন হয়েছে যে একটা লাইন বাংলা বল্‌তে কিম্বা লিখ্‌তে গেলে তার ভিতর অর্দ্ধেকের বেশী ইংরেজীর সাহায্য নিতে হয়। এই তো গেল ইংরেজীর পেয়ে-বসার কথা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাও আমাদের ছেড়ে যেতে বসেছে! প্রত্যেক বাঙালীর এটা কর্ত্তব্য নয় কি মাতৃভাষায় নিজের ভাব ব্যক্ত করা? "তবে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের শিক্ষা করবার অনেক জিনিষ এখনও আছে"; এটা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে, দেশে এমন ইংরেজী শিক্ষিত অনেক আছেন যাঁরা ইচ্ছা করলে বৈদেশিক শিক্ষণীয় জিনিষগুলি আমাদের মাতৃভাষায় প্রকাশ করে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারেন। কিন্তু করে কে? ঠিক এই কারণেই জাতীয় শিক্ষার প্রধান কথা হচ্ছে মাতৃভাষার প্রকৃত অনুশীলন। কিন্তু রামমোহনের কালে আজকালকার শিক্ষিত সমাজ বলে' যাদের বলা যায়, সে সমাজ মোটেই ছিল না; এমন কি বাঙালা লেখা পড়া জানা লোকই খুব কম ছিল। এই জন্যই রামমোহন ইংরাজী শিক্ষার জন্য এতটা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টার ফল যে এ রকম ভাবে ফল্‌বে সেটা বুঝতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই ইংরাজী শিক্ষা থেকে বিরত থাকতেন। কারণ তিনি কখনও ভাবেন নি যে জ্ঞানার্জ্জনের নামে শেষ পর্য্যন্ত অ-জ্ঞানই অর্জ্জন করা বাঙালীর কাজ হয়ে দাঁড়াবে। যা সত্য তা কখনও কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ইংরাজী শিক্ষা সম্পর্কেও তাই। ইংরেজীকে বাদ দিয়ে সংস্কৃত কিম্বা পারসী শিক্ষা দেওয়া জাতীয় শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকাও কোন কাজের কথা নয়। আমাদের যে নিজেদের ভাষা আছে এবং তা যে জগতের অন্যান্য ভাষার চেয়ে কোন অংশেও খর্ব্ব নয় সেদিকে নজর কেউ দিচ্ছেন বলে তো মনে হয় না। এক রবীন্দ্রনাথ এ যুগে জন্মে ছিলেন বলে পৃথিবী'ত জান্‌লো যে বাঙলা সাহিত্যে এমন কিছু আছে যা অন্য কোন দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু দর্শন কি বিজ্ঞান সম্বন্ধে তা খাটে কৈ?

ছেলেদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা'তে তারা প্রথমতঃ ডিগ্রি এবং দ্বিতীয়তঃ কেরাণীগিরির দিকে লক্ষ্য রেখেই চলতে থাকে। কারণ দেখা যায় বিজ্ঞান কিম্বা দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে কলম পেশা ছাড়া তারা অন্য কিছু করে না। করে না কি—অন্য কিছু করবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে লেখক মহাশয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'কে বাদ করুন না কেন, আমাদের মেয়েরা বর্ত্তমানে যে শিক্ষালাভ করছেন সেটা শিক্ষা কিম্বা অ-শিক্ষার কোনটাই নয়—সেটা পুরা দস্তুর কুশিক্ষা। শিক্ষার নাম দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ

মাতৃজাতিকে কি বিপথেই টেনে নেওয়া হচ্ছে তা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট।

ভারত এখনও মাতৃজাতির গর্ব্বেই গর্ব্বিত। কিন্তু তাদের যদি প্রকৃত মাতা হওয়ার পথে সাহায্য না করা হয় তবে সে শিক্ষায় লাভ কি? কেবল কতকগুলি বই পড়া জ্ঞান হলেই আমাদের এই দরিদ্রের দেশের মেয়েদের চলবে না। তার সঙ্গে চাই সাংসারিক শিক্ষা এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান শক্তি অর্জ্জন।

সেদিন এখানকার কোনও সঙ্গীত সম্মিলনের অধিবেশনে মেয়েদের সাজ পোষাক দেখে বস্তুতঃ অনেকেই আমার মত অবাক হ'তে বাধ্য হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, যে দেশের লোকে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পায় না, সে দেশে মাতৃজাতি কি করে বিলাস এবং অপর্য্যাপ্তির মধ্যে গা ঢালিয়া দেন? এই কি ভারতের স্ত্রীজাতির আদর্শ? জানি না বাংলা দেশে কয়টী বিবাহিতা মেয়ে সেতার এবং এস্রাজ বাজিয়ে স্বামীর ঘর করতে সময় পান। অনেকে হয় ত আর্টের দোহাই দেবেন। কিন্তু আর্টের চেয়ে যে সংসারে বেঁচে থাকার দ্বন্দ্ব অনেক বেশী। সেটার দিকে নজর দিলে কর্ত্তারা দেশের উপকারই করবেন—অপকার নয়। আমাদের দেশ এবং সমাজের এখনও এমন সময় হয় নি যা'তে আমরা আমাদের মেয়েদের পাশ্চাত্য রমণীদের মত শিক্ষা দিয়ে তুলতে পারবো। তার প্রধান কারণই হচ্ছে Materialism এবং Spiritualism এর ভিতর যে তফাৎ।

'সাধারণ জন' কিম্বা 'জনসাধারণ' যে যাই বলুন, লেখক যা বলেছেন তা খুব খাঁটী। দেশে যে অজ্ঞতা এদের ভিতর বিরাজ করছে তা থেকে মুক্ত করার যে চেষ্টা আজকাল চলছে তা হয়ত লেখক মহাশয় জ্ঞাত আছেন। তাই সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তারা যে এই পৃথিবী জুড়ে নব জাগরণের সাড়া পায়নি এটা নিতান্ত ভুল। কারণ তারা নিজেদের যে ভাবে বর্ত্তমান আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে নিচ্ছে তাতে মনে হয় যে তাঁরা তাদের ঠিক চালিয়েই নিতে পারবে।

আজ আর বাংলা কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিকে তাকিয়ে নেই। বাংলা আজ আর কোন বিশিষ্ট ধনী, কিম্বা শিক্ষাভিমানী সন্তানের দিকে তাকিয়ে নেই; আজ তাঁর বহুকালের অজ্ঞ, অজ্ঞান ও অশিক্ষিত—যা'রা মুক্তকণ্ঠে 'মা' বলে ডাকতে জানে সে সব সন্তান জেগেছে। তাই মা আজ তাঁর হাসিভরা মুখ ও হাতে শান্তি নিয়ে এই দরিদ্র ও কাঙালের মধ্যে বিচরণ করছেন।

তুমি সন্তান—মা'কে বরণ কর, পূজা কর। দূরে সরে দাঁড়িয়োনা—এই নিবেদন।

খাণ্ডবদাহন

[শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী]

চিরদীপ্ত কি প্রবল
দীনের জঠরানল
কহ ওগো কেবা আজি করিবে নির্ব্বাণ,
দরিদ্রের আর্ত্তনাদে
কহ কার প্রাণ কাঁদে
কেবা আছ সরবস্ব দিবে আজি দান।

জগত্র খাণ্ডবন
ভোগ করি অনুক্ষণ
শান্ত করে দরিদ্রের জঠর অনল
কে আজি অর্জ্জুন প্রায়
দরিদ্রেরে দিবে হায়!
জগতের ক্ষুধাহারী সুধাময় ফল।

অলসে বিলাসে কভু
এককণা শস্য তবু
অপব্যয় বৃথা যদি হয় অকারণ
দরিদ্রের তীব্র ক্ষুধা
ঘুচাতে নারিবে সুধা
দৃঢ়চিত্তে চাই পূর্ণ খাণ্ডবদাহন।
বিশাল ভারত মাঝ
কেবা আছ'কেহ আজ
আর্য্যবীর অর্জ্জুনের যোগ্য বংশধর,

কর আজি প্রাণপণ
তৃপ্ত করি হুতাশন
নাশিতে দীনের ক্ষুধা প্রবল প্রখর।
চারুময় সিংহাসন
বৃথা ভিক্ষা অকারণ
কোথায় অস্তিত্ব তার আজি ধূলিময়
মানবের হৃদাসন
পুরস্কার চিরন্তন,
পাবে তুমি যোগ্যতম সুযশ অক্ষয়।

নারীর অধিকার

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

(১)

পুণ্যসলিলা অলকানন্দার তীরে শ্যাম অরণ্যানী সুশোভিত ক্ষুদ্র 'ঘাড়োয়াল' রাজ্যের রাজধানী পুষ্পপুর। চির সুন্দর, চির শীতল দেশের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই নির্ভীক স্বাধীনচেতা প্রকৃতি-মায়ের আনন্দ-দুলাল ঘাড়োয়ালী। তাহাদের গৃহে গৃহে হর্ষ পুলকোচ্ছ্বাস, মাঠে মাঠে শস্য সম্ভার। দেহে অটুট স্বাস্থ্য, হৃদয়ে উল্লাসময়ী শক্তি। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নাই।

সেবার নিদারুণ হিমানীসঙ্কুল কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন শীতের প্রারম্ভে কোন অজ্ঞাত সুদূর হইতে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের লোলুপ দৃষ্টি এই সোণার দেশে নিপতিত হইল। হাস্যোজ্জ্বল বসন্তে চির আনন্দময় রাজ্যের কৃষকদের গৃহে 'হোলী'র আনন্দোৎসবের পরিবর্ত্তে ক্ষুধিতের হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া উঠিল। বসন্তের অবসানে নিদাঘ আসিল, কিন্তু দেবতার স্নিগ্ধ করুণাধারার মত বৃষ্টিধারা তাপিত বসুন্ধরার বক্ষে ঝরিয়া পড়িল না। নিরন্নের আশা ভরসার স্থল ধান্যক্ষেত্র শুষ্ক সাহারায় পরিণত হইল। বৃক্ষ বল্লরী পত্র পুষ্পহীন। প্রকৃতি মাধুর্য্য বর্জ্জিতা। সারা দেশ ব্যাপিয়া ক্রন্দন কোলাহল, আর সুতীব্র দুর্ব্বিষহ উত্তাপ।

এ দুর্দ্দিনে বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের নিয়মানুসারে রাজ কর্ম্মচারিগণ অন্নহীন দীন প্রজাদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। শোকে তাপে মর্ম্মাহত, ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট কৃষকেরা দলে দলে রাজা বিক্রমসিংহের প্রাসাদ তোরণে উপস্থিত হইয়া রাজোদ্দেশে নিজেদের মর্ম্মান্তিক মর্ম্মোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুরুষদের ভ্রুকুটী করাল কটাক্ষ ও তর্জ্জন গর্জ্জন ব্যতীত হতভাগ্যদের ভাগ্যে করুণার এক কণাও মিলিল না।

প্রাসাদ শিখর হইতে প্রজাপুঞ্জের কাতর মলিন মুখচ্ছবি দেখিয়া রাণী নর্ম্মদার মাতৃ-হৃদয় দুঃখে বেদনায় বিগলিত হইতে লাগিল। বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রবাসগত একমাত্র পুত্র কুমার অজয়সিংহের তরুণ কোমল মুখের প্রতিচ্ছায়া আজ যেন রাণী তাঁহার অনাহারে শীর্ণ, কঙ্কাল-

সার প্রজাদের অবয়বে সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

নিভৃতে বিশ্রাম-কক্ষে স্বামীর পদতলে বসিয়া সজল নয়নে কাতর কণ্ঠে রাণী কহিলেন, "দুর্ভিক্ষের বছরে দুঃখী প্রজাদের রাজকর মাপ কর মহারাজ, যাদের পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, তারা কেমন করে 'কর' দেবে?" ব্যথিতদের ব্যথার কাহিনী বলিতে গিয়া রাণীর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল। বিজয়সিংহ সাদরে পত্নীর হাতখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি লোক দিয়ে সন্ধান নিয়েছি, দেশের এখনও এমন অবস্থা হয়নি যাতে কর মাপ কোরতে হবে। রাণি, তুমি কোমলহৃদয়া স্ত্রীজাতি, তাই মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ দেখেই ব্যথা পেয়েছ। আমার বিচক্ষণ কর্ম্মচারীদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সূক্ষ্ম দৃষ্টি তোমার চেয়ে অনেক বেশী, কাজেই তাদের সদযুক্তিই আমাকে গ্রহণ কোরতে হবে।" স্বামীর কথায় একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া রাণী সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

(২)

নর্ম্মদার দূর সম্পর্কীয় দুইটি আত্মীয় বহুকালাবধি রাজসরকারে বেতনভোগী হইয়া কাজ করিতেন, তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া রাণী তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কার পূর্ণ অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত গজদন্ত নির্ম্মিত বাক্সটি তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া ধীর সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "সাত দিনের মধ্যে এই গহনাগুলো তোমাদিগকে সহর থেকে বিক্রী করে আসতে হবে। এই গহনা বিক্রির টাকা দুঃখী প্রজাদের ঘরে ঘরে রাজকর দেবার জন্যে তোমাদিগকে বিতরণ কোরতে হবে।" দেশের হিতে, দশের হিতে রাণীর কমনীয় অঙ্গে অলঙ্কারের চিহ্নও রহিল না। শুধু রহিল বংশপরম্পরাগত একমাত্র মহারাজ কিংবা মহারাণীরই প্রাপ্য শুভ্র স্বচ্ছ এক গাছা মুক্তার মালা।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সমস্ত রাজকর আদায়ের পর, প্রসন্নস্মিত-হাস্যে রাজা রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কর মাপ কোরতে বলেছিলে রাণি, এই ত দেখ সকলেই বিনা বাক্য ব্যয়ে কর দিয়ে গেছে। সেদিন ব্যাটারা বজ্জাতী করে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে এসেছিল, এখন সবারি পরনে নতুন কাপড়।" রাণীর সমস্ত ভূষণের পরিবর্ত্তে বস্ত্রহীনের বস্ত্র জুটিয়াছে। অন্নহীন রাজকর দিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা বিজয়সিংহের জানা ছিল না। তিনি মলিন-বদনা রাণীকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় বলিলেন, "নর্ম্মদা, এবার পূজোর আগেই তোমাকে বড় বড় হীরা দিয়া এক গাছা মালা তৈরি করে দেব, যা এ দেশের কোন রাজার রাণীরই নাই, তেমনি একটি মালা।" আহত স্থানে ব্যথা লাগিলে মানুষ যেমন গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, রাণী তেমনি স্বরেই কহিলেন, "না মহারাজ, তুমি ঐটি শুধু কোরো না। আর যা বল, আমি সমস্তই পারব, কিন্তু সন্তানের বুকের রক্ত জমিয়ে গহনা প'রতে পারব না।" রাজা অপ্রতিভ অপ্রস্তুত ভাবে রাণীর আভরণশূন্য শুষ্ক ম্লান মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া স্নেহ-জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা নতুন হার নাইবা হ'ল, কিন্তু পুরোণ গহনাগুলো তোমার কি অপরাধ করেছে রাণি, তা পরনা কেন? আর ঝি চাকরদের মধ্যে বলাবলি কোরতে শুনেছি, তুমি নাকি এক বেলা সামান্য কিছু ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ—এর কারণ কি?"

"কারণ আছে বৈকি মহারাজ, মা অন্নহীন সন্তানকে পথে বসিয়ে রাজভোগ খেতে পারে না। পিতা বোধ হয় পারে, কিন্তু মাতা পারে না। তাই দেশের দুর্ভিক্ষ না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি এর বেশী খাবো না স্থির করেছি। গহনার কথা বোলছ, সে সব মার দীন সন্তানদের রাজকর যোগাইতেই শেষ হয়ে গেছে।"

বিজয়সিংহ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীর ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু মহিমায় উদ্ভাসিত, করুণায় বিগলিত রাণীর দিকে চাহিয়া আর কোন প্রশ্ন করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

(৩)

ওরে এসেছে রে, এসেছে। নিদাঘ দগ্ধ শুষ্ক শীর্ণ ধরণীর বক্ষে প্রাণোন্মাদিনী স্নিগ্ধ "শ্যাম বরণী" বরষা এসেছে, অবিরল বৃষ্টিধারা কলহাস্য সহকারে পুষ্পপুঞ্জের উপর দিয়া স্নেহ প্রস্রবণ সৃষ্টি করিতেছে, বৃক্ষ ব্রততী আবার নূতন জীবন পাইয়া শ্যাম শোভায় সজ্জিত হইতেছে।

অলকানন্দার তীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রীর মধ্যে আবার বিহগ স্বরলহরী ঝঙ্কৃত হইতেছে। কৃষকেরা আশায় বুক বাঁধিয়া মাঠে মাঠে বীজ বপন আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের তমসাচ্ছন্ন আননে হাসির অরুণালোক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্পপুরের ভাগ্যাকাশ হইতে প্রলয়ের সংহারিণী মূর্ত্তি অপসৃত হইয়াছে। বাসন্তী পূর্ণিমার স্বচ্ছ কৌমুদী রাশিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। কিন্তু অনির্ব্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও কালবৈশাখীর এক-টুকু ক্ষীণ মেঘ রেখা মুছিয়া যায় নাই। সে মেঘটুকু নির্ভীক গাড়োয়াল যুবকের রাজদ্রোহিতা। দুর্ভিক্ষ প্রারম্ভে রাজকর রদ করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ কয়েকটি তরুণ হৃদয়ে যে জ্বালাময়ী অগ্নি জ্বলিয়াছিল আজও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই। রাজনিষ্পীড়নে সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজদ্রোহীদের ধরিবার জন্য রাজা বিজয়সিংহ সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছেন। অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হতভাগ্যদের পরিণাম স্মরণ করিয়া রাণী নর্ম্মদার হৃদয় নিরতিশয় উদ্বেগে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রমণী করুণাময়ী। রাণী আজ জননী সাজিয়াছেন।

(৪)

শরতের প্রফুল্ল মধুর প্রভাতে সদ্যঃস্নাতা কৌষেয় বসন পরিধানা রাণী পূজামন্দিরে বসিয়া সুবর্ণের পুষ্প-পাত্রে সাজি হইতে শিশিরসিক্ত সেফালিকাগুলি বাছিয়া বাছিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের পূজোপকরণ সজ্জিত করিতে-ছিলেন। ম্লানমুখে পরিচারিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আজ সৈন্যদল রাজদ্রোহীদের নিয়ে ফিরে এসেছে রাণীমা, মহারাজ কাল এক প্রহরের সময় তাদের প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।" রাণীর হাত হইতে ফুলের সাজিটি মাটিতে পড়িয়া গেল। ফুলে ফুলে পূজামন্দিরের শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যতল সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তিনি বিশাল নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া নতজানু হইয়া বদ্ধাঞ্জলিতে দেবতার পাষাণ মূর্ত্তির সম্মুখে পাষাণ প্রতিমার মত বসিয়া রহিলেন। আর তাঁহার পূজোপকরণ সজ্জিত করা হইল না। আর তাঁহার সুগন্ধি কুসুমে দেবার্চ্চনা হইল না। হৃদয়ের ভক্তিকুসুম চয়ন করিয়া অর্ঘ্যাঞ্জলি দেবতার চরণে নিবেদন করিলেন। সংসার ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া তিনি একাগ্রমনে বিগ্রহের চরণপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার প্রাকালে পরিচারিকা পূজামন্দিরে প্রবেশ করিয়া সভয়ে রাজার আহ্বান তাঁহাকে জানাইয়া গেল। রাণীর চমক ভাঙ্গিল। ত্বরিতপদে স্বামীর নিকটে উপনীত হইয়া করজোড়ে কাতরহৃদয়ে তাঁহার পায়ের কাছে উপবেশন করিয়া রাণী বলিলেন, "মহারাজ! বন্দীদের প্রাণ আজ আমায় ভিক্ষে দিতে হবে। অবুঝ, অবোধ তারা, তুমি তাদের স্নেহের শাসনে ভাল কর। তাদের প্রাণ নিয়ো না। ভগবানের দত্ত প্রাণ নষ্ট করবার কারও অধিকার নাই। বল মহারাজ, তুমি তোমার অবাধ্য সন্তানদের ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালাবে না?" রাণীর কাতর মিনতিতে বিজয়সিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি পদতল হইতে রাণীকে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "রাজদ্রোহীদের প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্য দণ্ড নাই রাণি। স্নেহের শাসনের কথা বোলছ, ওরা কোন শাসনেরই বশীভূত নয়। আমি ওদের বিশ্বাস করতে পারি না।" কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আজ সমস্ত দিন তোমার খাওয়া হয়নি, রাণি, তুমি শান্ত হও। এ রাজকাজ—এ রাজবিচার, এ বিষয়ে কথা বলা তোমার উচিত হয় না। এ সব নিয়ে আলোচনা করা সামান্য নারীর অধিকারের বাহিরে।" নিমেষের মধ্যে নর্ম্মদা স্বামীর পদতল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অধরোষ্ঠ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন, "আমি রাজান্তঃ-পুরের সামান্য নারী নই মহারাজ! পুষ্পপুরের মহারাজ যে অধিকারে প্রজাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন, পুষ্পপুরের ভাবী রাজেশ্বরের জননী পুষ্পপুরের মহারাণী সেই অধিকারে অধিকারিণী হ'য়ে রাজাজ্ঞা প্রত্যাহার কোরতে প্রার্থনা কোরছে। এ আমার অনধিকার চর্চ্চা নয় মহারাজ, বন্দীদের সম্বন্ধে আমারও অধিকার আছে।" সেই পূজিকাবেশধারিণী, জগদ্ধাত্রী-রূপিণী, মহিমময়ী নারী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে

বিজয়সিংহের অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ধীরস্বরে কহিলেন, "নর্ম্মদা, তুমি যথার্থ কথাই বলেছ। কিন্তু এক কথা, তোমা হ'তে বন্দীরা মুক্ত হ'য়ে আবার যদি রাজদ্রোহিতা আচরণ করে, তখন সাধারণের কাছে তোমার কি বিচার হ'বে বল ত"? রাণী অবজ্ঞাভরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "বন্দীরা পুনরায় রাজদ্রোহী হ'লে তাদের সঙ্গে রাণী নর্ম্মদা প্রাণ দিতে কাতর হ'বে না মহারাজ।"

(৫)

"প্রহরী, কারাগারের দুয়ার খুলিয়া বন্দীদের মুক্ত কর।" রজনীর শেষ যামে জ্যোৎস্নাবিধৌত কারাপ্রাঙ্গণে পরিচারিকা পরিবেষ্টিতা রাণী স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "প্রহরী, কারাগারের দুয়ার খুলিয়া বন্দীদের মুক্ত কর"। বিস্ফারিত নয়নে কারারক্ষী দেবীপ্রতিমার পদতলে লুটাইয়া কম্পিত স্বরে কহিল, "মহারাণী মা, এ অধমের উপর মহারাজের হুকুম—" দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর হইল, "জানি প্রহরী, মহারাণীর হুকুম, দুয়ার খুলিয়া বন্দীদের মুক্ত কর"।

অন্ধকার কারাগারের কঠিন ভূমিশয্যায় বসিয়া বন্দীরা আসন্নমৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতেছিল। শস্যশ্যামলা শান্তশ্রী-বিভূষিতা এই রূপ-জলময়ী দেশমাতার স্নেহের ক্রোড় হইতে এত শীঘ্র বিদায় লইতে তরুণ হৃদয় কয়েকটি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাই তাহাদের নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়গুলি স্বপ্নের অতীত অভাবিত ভীতি-বিষাদ মিশ্রিত শোক ক্ষোভে নিষ্পেষিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রহরী কর্ত্তৃক মুক্ত বন্ধন হইয়া হতাশ জীবনের শেষ অঙ্কের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কারাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সম্মুখেই দেখিল অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা। তখন ঊষা সমাগমে পূর্ব্বাকাশ লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্র তাহার শেষ কিরণ-রশ্মি ধরাবক্ষে প্রসারিত করিয়া বৃক্ষান্তরালে ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিলেন। শরতের প্রস্ফুটিত পুষ্পকাননে শিশিরবিন্দু সুধাবর্ষণ করিতেছিল। শিশিরসিক্ত পুষ্প পরিমল গায়ে মাখিয়া প্রভাত পবন বহিয়া যাইতেছিল। শাখাপত্র-ভূষিত বকুল বীথির কুঞ্জছায়ায় লুকাইয়া বিহগ করুণ স্বরের মূর্চ্ছনা তুলিতেছিল।

বন্দীদের ম্লান মুখের উপর স্নেহভরা সমবেদনা নয়ন দুইটি মেলিয়া মধুরস্বরে রাণী কহিলেন, "আমার হতভাগ্য সন্তানগণ, তোদের প্রাণ বিনিময়ে তার নিজের প্রাণ "জামিন" রেখে পুষ্পপুরের রাণী আজ তোদের মুক্ত করতে এসেছে। তোরা ভবিষ্যতের জন্যে মাতৃহত্যার পাপ কি বরণ কোরতে চাস?" বিস্ময়ের পর প্রকৃত ঘটনা উপলব্ধি করিয়া বন্দিগণ আনন্দে রোমাঞ্চিত কায়ে রাণীর পদতলে লুটাইয়া পুলকপূরিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মা, মা, মা আমাদের দয়াময়ী মা"। রাণী কণ্ঠ হইতে সেই শুভ্র স্বচ্ছ মুক্তার মালাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া অঞ্চল হইতে দেবতার নির্ম্মাল্য ও একটি করিয়া মুক্তা বন্দীদের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "আমার সন্তানগণ, পুষ্পপুরের মহারাজ কিম্বা মহারাণী ব্যতীত এ মুক্তা অন্য কাহারও পরিবার অধিকার নাই। আজ বংশাবলির সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে তোদের সঙ্গে আমি সন্তান সম্বন্ধ স্থাপন কোরলাম। অজয়সিংহ হ'তে আজ আর তোরা এত টুকুও পৃথক ন'স্। তোদের মাতৃস্তনদুগ্ধে অভিসিক্ত এই মুক্তা আর দেবতার নির্ম্মাল্য তোদের সমস্ত দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ থেকে রক্ষা কোরবে। তোরা মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যা' বাবা"। স্বচ্ছ মুক্তার সহিত দেবতার পবিত্র নির্ম্মাল্য মাথায় লইয়া রাণীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বন্দীদের কণ্ঠে প্রভাতের বিহঙ্গ কলরব অতিক্রম করিয়া ধ্বনি উঠিল, "জয় জননীর জয়, জয় জননীর জয়"। অলকানন্দার কূলে কূলে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, "জয় জননীর জয় জয় জননীর জয়"।

বড় গাঙে

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

সকালবেলা মিঠেন-রোদে
মখ্‌মলী-ঢেউ ভাঙে,—
সবল-পেশী যুবকগুলি
পৌঁছে গো এই গাঙে।
তারা তোমার গাঙ-জেলে,
জাল বোনে আর জাল ফেলে,
দেয় সঁপি' মন তোমার ডাকে
তোমায় তারা মাঙে!

দুপুরবেলা তপ্ত-রোদে
ঝল্‌মলি' ঢেউ ভাঙে,—
আপন কাজে রয় যে মেতে
গাঙ-জেলে এই গাঙে।
দু'হাত দিয়ে ঘাম ঠেলে'
ঘুরিয়ে তারা জাল ফেলে,
দেয় সঁপি' মন তোমার কাজে
তোমায় তারা মাঙে!

সন্ধ্যাবেলা পড়ন-রোদে
আম্‌রুলী-ঢেউ ভাঙে,—
স্বভাবদুলাল ফিরে তোমার
আপন কুঁড়ে'য় গাঙে।
দিনের যত শ্রম ভুলে'
নিজের নিজের জাল তুলে',
দেয় সঁপি' মন তোমার পায়ে
তোমায় তাবা মাঙে!

কালিদাসের জন্মস্থান

"উপাসনা"র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, জ্যোতি-ভূষণ মহাশয়ের ঐ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বর্ত্তমান বর্ষেব মাঘ মাসের 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হয়। তাহার এক সংখ্যা দয়া করিয়া আপনারা আমা'ক চৈত্র মাসে পাঠাইয়া দেন। তাহা পাইবা মাত্র, আমি ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্নে আহামোদপুর কাটোয়া রেল পথের কীর্ণাহার ষ্টেসনে নামিয়া, রায়াল বেলুটি নামক স্থানের সারস্বত পীঠের নিকট উপস্থিত হইলাম। কীর্ণাহার হইতে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জন্ম স্থান, "নান্নুর" দক্ষিণে বাঁধা পথে ২ ক্রোশ ব্যবধান। সেখান হইতে "বেলুটি" বাঁধা পথে ১৷৷ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ই ৷ আই রেলের বোলপুর ষ্টেসন হইতেও ঐ বেলুটি ৪৷৷ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিকে হইবে। এই পথও বাঁধা রাস্তা। কীর্ণাহার হইতে মাঠে মাঠে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যাইলে বেলুটি ২৷৷ ক্রোশ দূরে হইবে।

এই সারস্বত পীঠের তথ্য গ্রামবাসীদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—কাটোয়া মঙ্গলকোট থানার অধীন উজানীর রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা, কালিদাসকে পণ্ডিত ভ্রমে বরমাল্য দিয়া, পরে তাহাকে মূর্খ জানিয়া বিতাড়িত করেন। কালিদাস উজানী হইতে এখানকার ঝিরবাটিকায় আসিলে মা সরস্বতী তাহাকে এই কুণ্ডে স্নান করিতে বলেন। কালিদাস এই কুণ্ডে স্নান করিয়া জগদ্বিখ্যাত কবি হইলেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বোলপুর কাটোয়া রাস্তা এই সারস্বত পীঠকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। রাস্তার উত্তর

দিকে প্রাচীন ইষ্টক স্তূপ। জনপ্রবাদ ইহাই কালিদাসের টোল বাড়ি। রাস্তার দক্ষিণে তমাল বীথির তল দেশে ভগ্ন ইষ্টকের দেওয়ালের মধ্যে ৺ সরস্বতী দেবী ভগ্নাবস্থায় শয়ানা আছেন। সেই দেওয়ালের মধ্যে দুইখানি পাথর শয়ান আছেন। বহুদিন অনাবৃত স্থানে থাকিয়া, রৌদ্র জল ও বৃষ্টি সহ্য করায়, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই নাই। প্রস্তর দুইটি কি মূর্ত্তি তাহা বুঝিবারও উপায় নাই। ইটগুলি সব প্রাচীন ইটের ছুড়ি, একখানাও আস্ত দেখিলাম না। একখানি খুড়ি স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ আনিয়াছি। কুণ্ডের কোনও চিহ্নই নাই। মজিয়া গিয়াছে। জনপ্রবাদ অনুযায়ী তাহাকেই কুণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিলাম। দোল পূর্ণিমায় পুণ্যাহ দিনে প্রাতঃকালে এই সারস্বত কুণ্ডে ডুব দিব মনে করিয়া ছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে সেখানকার একটু ধূলি মাথায় মাখিলাম।

আমি বেলুটির অধিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ অধিকারী কথক মহাশয়ের বাটিতে "অতিথি" বলিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি এবং গ্রামের সমুদয় লোকে মিলিয়া এই সারস্বত পীঠের নানা তথ্য বলিলেন।

১০ই ও ১১ই চৈত্র এই দুই দিন ধরিয়া ভূদেব বাবুর লিখিত কালোমোর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী পুরুলিয়া, শ্রীপুর, গড্ডা ও জাতশালা এই চারি গ্রামে কালিদাস তথ্য অনুসন্ধান করিয়া ১২ই চৈত্র শুক্রবার (Good Friday) প্রাতে মোরগ্রামে প্রবেশ করিয়া, কালিদাস তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে মোরগ্রামের ৺কালী বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ইনি এখানকার জাগ্রত দেবতা। ইহার দ্বারে অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে রাঢ়ের অনেক লোকেই আসিয়া থাকেন।

মোরগ্রামের কালীবাড়ি—একখানি উঁচু পোতা চার চালা খড়ের ক্ষুদ্র ঘর। তাহাতে ৺ কালী-প্রতিমার বিসর্জ্জিত কাঠামের খড়ের ঠাট ডাকের সাজ দিয়া সুসজ্জিত অবস্থায় বর্ত্তমান। এই কাঠামরই নিত্য পূজা হয়। কার্ত্তিকী অমাবস্যায় নূতন প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয়। তদ্ বিসর্জ্জনান্তে এইরূপে কাঠাম পূজা হয়।

এইরূপ আমার সিদ্ধান্ত—এই মোরগ্রামের ৺ কালী বাড়ি রঘুবংশাদি কাব্যত্রয়ের প্রণেতা,—ত্রিকাণ্ড শেষ নামক অভিধানে যাঁহার নাম "রঘুকার কালিদাস" রাজ তরঙ্গিণীতে যাঁহার নাম "মাতৃ গুপ্ত" কুমার সম্ভবে যিনি নিজে "উমাদাস" বা "মাতৃগুপ্ত কালিদাস" মেঘদূতেও যিনি "মাতৃ গুপ্ত" সেই মহা কবি কালিদাসের জন্ম স্থান বা বাস্তুভিটা। খৃঃ ২৯০ অব্দ নাগাইত এই কালিদাসের জন্ম হইয়াছিল। তাহার পর ষোল শত বর্ষের আবর্ত্তন সহ্য করিয়া, সেই বাস্তুভিটাই এক্ষণে এইরূপ কালীবাড়িতে পরিণত হইয়া, মহা কবি কালিদাসের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার ভূদেব বাবু সমস্তই বলিয়াছেন, যাঁহাদের অতিরিক্ত কিছু জানিবার উৎসাহ আছে বা যাঁহারা প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহারা দয়া করিয়া আমার নিকট অনুসন্ধান করিবেন। নিবেদক

শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য

বিশ্বসৃষ্টি

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত]

(ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল—১২৯ সূক্ত)

না ছিল তখন অসতের ভাব
সতের বিকাশ কিবা,
না ছিল তখন রজের প্রকাশ
সুদূর ব্যোমের বিভা।

কোথায় কি ছিল কে করে ধারণ
কাঁহার শরণ তলে ?
ছিল কি মগ্ন কোথা কোন ঠাঁই
গহন গভীর জলে ?

ছিল না তখন মৃত্যুর লীলা
অমৃতের পরকাশ,
ছিল না তখন রবি ইন্দুর
তীব্র মধুর হাস।
ছিল শুধু এক অবাত আত্মা
আপন শক্তি 'পরে
বিনা সেই এক ছিল না কিছুই
সুদূর দূরান্তরে।
অগ্রে কেবল আঁধারে গুপ্ত
ছিল অখণ্ড তম,
বিশ্ব তখন সলিলে মগন
অটুট ভ্রান্তি সম।
সৃষ্টি ছিল সে শূন্যে পূরিত
প্রথম বিকাশ কালে
সেই এক শুধু আত্মা জাগিল
তপের মহিমা বলে।
কামনা তখন জাগিল অগ্রে
সে একের অন্তরে
কামনা ছিল সে প্রথম প্রসূত
সৃষ্টির বিস্তারে।

কবি সুধীজন বিচারি হৃদয়ে
আপন মনীষা বলে,
অসতের সাথে সতের বাঁধন
জানিলেন সেই কালে।
কে জানে উহার প্রকৃত তত্ত্ব
কে করিবে বর্ণন,
কোথা হ'তে হ'ল ইহার জনম
সৃষ্টির কি কারণ ?
বিশ্ব প্রথমে হইল সৃষ্ট
দেবতা জাগিল পরে,
কে জানিবে তবে ইহার জনম
সৃষ্ট কেমন করে ?
কোথা হ'তে হ'ল বিশ্বসৃষ্টি
উদ্ভূত কোন্ ঠাঁই,
আছেন কেহ কি ইহার বিধাতা
অথবা কেহই নাই;
হয়ত জানেন সেই প্রভু যাঁর
বসতি পরম স্থানে,
অথবা হয়ত না জানেন তিনি,
কে তবে এ কথা জানে ?

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

[শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার]

১ম স্তবক

নীলাচল শ্রীগৌরাঙ্গের লীলানিকেতন। পুণ্যভূমি নীলাচল গৌরাঙ্গ লীলার গৌরব চিহ্ন সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া অতীতের মধুর স্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন। জগন্নাথ ক্ষেত্র হিন্দুর মহাতীর্থ। গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব ও নীলাচলে তাঁহার একাদিক্রমে অষ্টাদশ বর্ষ অধিষ্ঠান ও গৌরগত-প্রাণ ভক্তবৃন্দের নিত্য সমাগমে সে পুণ্য ক্ষেত্র আরও উজ্জ্বলরূপে ধর্ম্মকামী হিন্দুর মানস নয়নে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাগীরথী তীরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাঢ়দেশ দিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন।

তথা হইতে মুহ্যমান ভক্তমণ্ডলীর কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন জন্ত নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুর অদ্বৈত ভবনে লইয়া আসেন।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত ভবনে পুনরাগমনের শুভ বার্ত্তা লইয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপে গমন করিলে নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা একবার তাঁহার দর্শনাভিলাষে শান্তিপুর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। পুত্রশোকাতুরা শচীমাতাও তাঁহার নিমাইকে একবার দেখিবার জন্ত অদ্বৈত ভবনে আগমন করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মাতা-পুত্রের এই প্রথম সাক্ষাৎ—সে মিলনের দৃশ্য বড় শোকাবহ!

"শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবত হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে করিয়া॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

মহাপ্রভু মাতৃভক্তের শিরোমণি। জীবের কল্যাণ কামনায় যে মহান ভাবাবেশ তাঁহাকে সন্ন্যাসের পথে লইয়া গিয়াছিল তাহার বিরাট গাম্ভীর্য্যের সম্মুখে দীনা মাতৃভক্তি নতশীর্ষ হইয়া সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে তীব্র আবেগের বিশ্বপ্লাবী উচ্ছ্বাস বাধা দিতে, অসমর্থ হইয়া আত্ম বলিদানে জগতে অচিন্ত্যপূর্ব্ব প্রেম প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সে ঐকান্তিকী মাতৃভক্তি পুণ্যতোয়া নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় সর্ব্বদা স্বচ্ছ পরিপূর্ণ ও টলটলায়মান থাকিত। মহাপ্রভুর মাতৃভক্তির তুলনা নাই। তাহা জীবনের আদর্শ—পরম শিক্ষার স্থল। অদ্বৈতভবনে তিনি শচীমাতাকে বলিলেন, "মা আমি না বুঝিয়া সন্ন্যাস করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে যে স্থানে থাকিতে বল আমি সেই স্থানেই বাস করিব—আমি তোমার প্রতি কখনও উদাসী থাকিব না।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইহা যে কত বড় কথা—মাতার প্রতি এই নির্ভরতা কতদূর শক্তির পরিচায়ক তাহা সহজেই বোধগম্য। মহাপ্রভু জননীকে জানিতেন, তাই জীবনের এই সমস্যা কালেও অবলীলাক্রমে জননীর প্রতি এমন করিয়া নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর এই কথায় সকল ভক্তই বিশেষ আশান্বিত হইলেন। শোকক্লিষ্ট জীবনের একমাত্র শেষ অবলম্বন নিমাইকে যে শচীমাতা দূরে অবস্থান করিতে উপদেশ দিবেন না তাহা সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রভুর কথায় উৎফুল্ল-চিত্ত আচার্য্যাদি ভক্তবৃন্দ বড় আশা করিয়া শচীমাতা-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার একটী কথার উপর যে মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ জীবনের গতি—ম্রিয়মাণ নবদ্বীপের চিরকালের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে তাহা শচীমাতার বুঝিবার বাকী রহিল না। নিমাইকে দূরদেশে বিদায় দিলে তাঁহার নিজের কি দশা হইবে, এই কয়েক দিবসের অদর্শনেই তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে তাহা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিলেন।

বিরহ-বিহ্বলা কনকপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার ভবিষ্যৎ তাঁহার মনে উদিত না হইতেছিল তাহা নহে। কিন্তু শচীমাতা যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহা মহাপ্রভুর জননী হইতেই সম্ভব আর কোন মাতা তাহা পারিতেন না। তিনি বলিলেন,—

"তোঁহো যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যবে দুই কার্য্য হয়॥
আপনার সুখ দুঃখ তাহা নাহি গণি।
তার যেই সুখ সেই নিজ করি মানি॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

এই অভাবনীয় স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে ভক্তবৃন্দ কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শচীমাতা নবদ্বীপের বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের উল্লেখমাত্র না করিয়া সেই সুদূর নীলাচল মহাপ্রভুর স্থায়ী রঙ্গভূমি নির্ব্বাচন করিবেন—ইহা কেহ ধারণা করিতে পারেন নাই। শচীমাতার এই মহা বাণী শ্রবণে ভক্তবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥"

ইহা কে লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইবে? আর মহা-

প্রভুকে যাইতে দিবে না। মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলেই বাস করিতে সংকল্প করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত এই স্থানে শচীমাতাকে জগন্মাতা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক এমন মাতা না হইলে মহাপ্রভু তাঁহার গর্ভে জন্ম লইবেন কেন ?

মাতৃ আজ্ঞা পাইয়া ভক্তগণের দৈন্য ও কাতর অনুরোধে মহাপ্রভু কয়েক দিবস অদ্বৈত ভবনে অবস্থান করেন। কীর্ত্তনানন্দে অহঃরহ ভক্তগণের সমাগমে অদ্বৈত ভবন সর্ব্বদা মুখরিত থাকে।

"দিনে কৃষ্ণকথা রস ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
আনন্দিত হইয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করেন প্রভু লঞা ভক্তগণ॥"

ক্রমে এ আনন্দের দিন অবসান হইয়া আসিল। প্রাণ-প্রতিম ভক্তগণের মায়া-রজ্জু ছিন্ন করিয়া জননীকে প্রবোধ দিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ মহাপ্রভু নীলাচল পথে "শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, পণ্ডিত দামোদর ও মুকুন্দ এই চারিজন মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন।

(ক্রমশঃ)

হাসির উৎস

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

তার হাসিমুখের হাসিটার উৎস কোথায় ছিল—সে যে দিন চেলি পরে' ঘোমটা দিয়ে এ বাড়ীতে এল, সেই দিন থেকে ঐ হাসিটার বিষয় আমি ভেবে আসছি ; কিন্তু কোথা হ'তে যে এই হাসির আলোটুকু তার মুখে এসে চিরদিনের জন্য জেগেই রয়েছে তা ত' কিছুতেই খুঁজে পেলাম না।

তার একটা মাত্র ছেলে এবং সেটা জন্ম ইস্তক ভুগছে। তার খাশুড়ীটী খিটখিটে—ননদ ভাজেদেরও মেজাজের ঠিক নেই—কেউ বা ঝগড়াটে, কেউ বা হিংসুটে, কেউ বা কুঁড়ের বাদশা। তার দেওরদাও বড় লোকের ছেলে এবং পুরুষ মানুষ, অতএব তাঁদের পান থেকে চুণটুকু পর্য্যন্ত খসবার যো নেই। খসলেই ঐ অত বড় বাড়ীটা প্রত্যেক মহাবীরই মাথার তুলতে সক্ষম !

আর তার স্বামীটী—তাঁর বিষয় কিছুই বলবার যো নেই। কেউ বলে পাগলা, কেউ বলে মাতাল, কেউ বলে গোঁয়ার, কেউ বলে ধাপ্পাবাজ, কেউ বলে ভোলানাথ ! কিন্তু সে বলে, এবং কাজে দেখাবার চেষ্টা করে, যে সে একজন পটুয়া, অর্থাৎ চিত্রকর।

এ বাড়ীর মুনিবরাই যখন ঐ রকমের তখন চাকর দাসী, বামুন বামনী, গোমস্তা দেওয়ান, পাইক বরকন্দাজ সবই যেন কেমন এক ধরণের। সমস্ত সংসারটাই যেন বর্ষার আকাশ—এই মেঘ, এই রৌদ্র, এই আলো, এই আঁধার, এই ডাক হাঁক, এই চুপ চাপ, এই ঝুপ ঝাপ, এই দুম্ দাম্ !

কিন্তু মেঘলা সংসারের মধ্যে তার হাসি-মুখখানি চাঁদের মত ভেসে বেড়ায়—লক্ষ মেঘেও সে হাসিটুকু ঢাকল না।

এ হাসিটুকু আসে কোথা হ'তে ? তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে কেবল মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করলে, কেউ বা তাকে গাল দেয়, কেউ বা তার নিন্দে করে, কেউ বা গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু কেউই তার হাসিটার উত্তরে হাসে না। সমস্ত বাড়ীটায় যেন রাত দিন সন্ধি বিগ্রহ লেগেই আছে,—দারওয়ান হ'তে আরম্ভ করে কর্ত্তা গিন্নিরা পর্য্যন্ত রাত দিন বক বকম্ আর ফোঁস্ ফোঁসানি নিয়েই আছে, অথচ সে যে কি করে এবং কেন হাসি মুখে ঘুরে মরছে সে দিকে কারুরই দৃষ্টি নেই।

আশ্চর্য্য!

আবার সব চাইতে আশ্চর্য্য—আমিই বা কেন ঐ সামান্য একটা অলক্ষ্য বস্তুকে লক্ষ্য করে বসেছি আর বৎসরের পর বৎসর ধরে তাই নিয়ে চিন্তা করছি? যে দিন হ'তে ঐ হাসিটা আমার লক্ষ্যের মধ্যে এসেছে সেদিন হ'তে ওটা আর কিছুতেই আমার চোখ হতে সরতে চাইছে না যে!

চোখ চাইলেই দেখা যায়, এটা সবাই জানে। কিন্তু চোখ থাকলেই যে দেখা যায় তাও ত' বলা যায় না, নইলে ঐ অত বড় বাড়ীর অতগুলো লোক আমার শান্তির বিষয়ে চোখের মাথা খেয়ে বসে রইল আর আমিই কেবল তাকে দেখতে পেলাম কেন? আবার দেখতেই যখন পেলাম তখন তার সবটুকুই বা দেখতে পেলাম না কেন? সে তার আত্মীয়দের পক্ষেও যেমন অবোধ্য রয়ে গিয়েছে আমার পক্ষেও বা কেন তাই রয়ে গেল?

* * * *

সেদিন বিকেল বেলায় একটা মস্ত ফুলের তোড়া হাতে ক'রে শান্তির ঘরে ঢুকলাম। শান্তি তখন কি কাজে নীচে গিয়েছিল,—তার রুগ্ন ছেলেটা একখান ইজি চেয়ারে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। আমাকে দেখেই সে একটু নড়ে চড়ে হেসে বল্লে, "মা এখুনি নীচে গেলেন—আজকে কি কি ফুল দিয়ে তোড়া করেছেন, ভিনু পিশি?"

"আজ গোলাপ পাইনি বাবা, আজ শুধু গাঁদা আর এই সব বিলিতি ফুল দিয়ে তোড়াটা তৈরী হয়েছে।"

"গোলাপগুলো কি হল?"

"পূজুরী ঠাকুররা একটাও রাখে নি! সব তুলে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোমার মা ত অনেকগুলো গোলাপ তোমায় দিয়েছে দেখছি, শিবু? আমার কাছ থেকে আজ গাঁদাই নাও না কেন?"

"ওগুলোর যে গন্ধ নেই পিশিমা,—আমার গন্ধওয়ালা ফুল না হলে ভাল লাগেনা যে। মা যখন ফুল আনেন তখন প্রায় সেগুলো শুকনো হয়, পূজোর পর বিকেলে পাওয়া যায় কি না, তাই।"

"তোমার বাবাকে বলনা কেন শিবু, তিনি মালীদের বলে দেবেন, রোজ তোমার টাট্‌কা ফুলের বড় বড় তোড়া তারা দিয়ে যাবে।"

শিবু এই কথায় এমন একটা মৃদু হাসি হাসলে যা দেখে আমার চ'খে জল ভরে এল। আমি তার খাটের ওপর বসে বল্লাম, "শিবু, চল ছাতে যাই।" শিবু অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে একবার বাইরের দিকে চাইলে, তারপর বল্লে, "আজ জ্বরটা আবার বেড়েছে, ভিনু পিশি, মা তাই ছাতে নিয়ে গেলেন না—এইখানেই বসিয়ে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু আমার বড্ড ছাতে যেতে ইচ্ছে করছে।"

আমি একবার তার ঘরটার চারদিক চেয়ে দেখলাম।—দেখলাম রোজ যেমন নানা জাতীয় ফুলগাছে সামনের বারান্দাটা ভরা থাকে, আজও তাই আছে; রোজ যেমন ঘরটার মধ্যেও বাইরের গাছ পালার শোভা গন্ধকে আদর করে ডেকে আনা হয়, আজও প্রায় তাই করা হয়েছে। তবু যেন মনে হল এই রোগীচর্য্যার কক্ষে প্রতিদিন যে বেদনার সঙ্গে সুখের সংযোগ থাকে আজ যেন তা নেই। শান্তির এই চির সেবার কক্ষে যে চির শান্তিটী বিরাজ করত আজ যেন সেই শান্তিটীরই অভাব ঘটেছে। শিশিগুলি শিয়রের আলমারীর মধ্যে লুকান থাকত—আজ সেগুলি টেবিলের উপর সাজান। ওষুধ খাবার গেলাসটী, জল গরমের ষ্টোভটী, শেক দেবার ফ্লানেল সবই যেন আজ এমন ভাবে রোগীর খাটের সামনে রাখা হয়েছে যাতে ঘরে ঢুকেই মনে হয় এটা রোগীর ঘর। যে স্থানটা ফুল পাতার শোভা আর সজীবতা দিয়ে ঢাকা থাকত সেই স্থানটার ওপরেই যেন কে জোর করে ব্যাধির বিজ্ঞাপন এঁটে দিয়ে গিয়েছে।

আমি আস্তে আস্তে উঠে শিশিগুলোকে সরিয়ে রাখতে আরম্ভ করলাম। শিবু তখন মৃদুস্বরে বল্লে, "ওগুলো ঐখানেই থাক, বাবা নিজে এসে রেখে দিয়ে গিয়েছেন।"

"কেন?"

"আজ ওষুধ খাওয়াতে একবার নাকি উল্টোপাল্টা হয়েছে, তাই—"

"তাই—কি?"

"তাই—বাবা শিশি-টিশীগুলো ঠিক মত সাজিয়ে দরে গিয়েছেন। আর—"

"আর কি ?"

"আর কিছু নয়, বাবা বোধ হয় ফুলটুল ভালবাসেন না, তাই ওসব এঘরে যত কম আনা হয় ততই ভাল, এই বলে-ছেন। হ্যাঁ তিনু পিশি, জ্বর হলে কি ফুল নিতে নেই ?"

"কেন থাকবেনা বাবা, তোমার ডাক্তার কাকা ত বারণ করেন নি ?"

"ডাক্তার কাকাত বল্লেন, ফুল পেলে যদি আমি খুসী হই তা হ'লে নিতে পারি বৈ কি। কিন্তু বাবা কি বল্লেন ভাল বুঝতে পারলাম না—যেন অসুখকে ফুল দিয়ে পূজো করা হচ্চে না কি করা হচ্ছে—এইরকম কি একটা কথা বল্লেন।" আমি শিবুর কথা বুঝতে না পেরে কি বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তার মা, ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত করে সেই ঘরে প্রবেশ করলে। শিবু তার দিকে ফিরে বল্লে, "মা, রুগীর ঘরে ফুল দিতে নেই, ধূনো দিতে আছে ত ?"

শান্তি তার হাতের ধূপুচীটী একটী কুলুঙ্গীতে রেখে জোড় হাতে প্রণাম করলে। তারপর আমার দিকে ফিরে তার চিরদিনের সেই অপরূপ হাসিটী হেসে বল্লে, "রুগীর কথায় রাগ করলে কি চলে ?"

আমি তার কথাটাও বুঝতে পারলাম না, কেবল অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। অজ্ঞাতে আমার হাতখানা বোধ হয় একটা শিশি তুলে নিয়েছিল। শান্তি আমার হাত হতে সেই শিশিটা নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলে, তারপর তার মহা-ভারতখানা আলমারী হ'তে পেড়ে বল্লে, "আধঘণ্টা মাত্র সময় হাতে আছে; আর দেরী নয় ঠাকুরঝি, আজ নলোপাখ্যানটা শেষ করতেই হবে।"

আমি বইখানা নিয়ে বল্লাম, "তা ত করতে হবে, কিন্তু তার আগে আজ মণিদার সঙ্গে কি ব্যাপার হয়েছে তা বলতেও হবে।"

"সে কথা আজ নাইবা হল। আর এমনই বা কি কথা যে শুনতেই হবে।"

"যেমনই হোক বলেই ফেলনা।"

"উনি বলছিলেন যে রুগীর মনের সেবা করতে গিয়ে তার দেহের সেবাটায় ত্রুটী ঘটছে। এ কথাটার ঠিক মানে কি, তা এখনো বুঝতে পারিনি ঠাকুরঝি—কিন্তু তিনি যখন এই ঘর থেকে ফুলের টবগুলোকে বার করে দিলেন, তখন আমার বড্ড কষ্ট হল। তারপর কি বল্লেন জান ? বল্লেন, যে, এমনি করে যদি ফুল চন্দন দিয়ে রোগের পূজো করি, তাতে রোগ আরও জোর করে আসন-গেড়ে বসবে। এরকম কথা কি সহজলোকে বলতে পারে ? আমি জানি, উনিও এক রকমের রুগী, তাই ওঁর ওপর রাগ করতে পারিনি, কিন্তু কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছি। আর কেউ ওকথা বল্লে ত কিছুই হয়ত মনে হ'ত না, কিন্তু উনি ত আর কেউ নন যে এক কথায় মন থেকে ওঁর কথাটা তাড়িয়ে দেব। যাক এখন সব ত শুনলে ? এইবার বইটা আরম্ভ কর।"

আমি আর কোনো কথা না বলে, 'অমৃত সমান মহাভারতের কথা' পড়তে আরম্ভ করলাম বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে যেতে লাগল। কাশীরাম দাসের কথা হতে মনটা ছুটে ছুটে কেবলি শান্তির শেষ কথাগুলোর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তারপর যখন নলের সঙ্গে দময়ন্তীর মিলন করে দিয়ে চোখের জল মুছে বইখানা বন্ধ করলাম, তখন শান্তি বইখানার সঙ্গে আমাকেও প্রণাম করে বল্লে, "দেখলে, ঠাকুরঝি, সাধে কি রোগ শোককে পূজো করি ? কে বলতে পারে যে মানুষের যত রোগ হয় সবই এক এক জন দেবতার দয়া নয়, তাঁদের আবির্ভাব নয় ? ভগবান এক এক রূপে মানুষকে দয়া করেন,—কলিরূপে নল-দময়ন্তীকে যে দয়া করেছিলেন, তারই ফলে আজও তাঁরা দুজনেই আমাদের কত আদরের হয়ে রয়েছেন। কলি আর দ্বাপর দয়া না করলে কে নলকে বৈদেহীকে পুণ্যশ্লোক পুণ্যশ্লোকা বলত ? রোগ শোকের পূজো করা ভুল নয়—কি বল ? কথা কইছ না যে ?"

কি কথা কইব ! কি আমি জানি ! কাণে শুনলে, বইয়ে পড়লে কি জানা হয় ? তা যদি হ'ত তা হলে জগৎ এত দিন নলদময়ন্তী, শ্রীবৎস চিন্তা, হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাতে ভরে উঠত।

আমি কি উত্তর দেব খুঁজে না পেয়ে একবার শান্তির মুখের দিকে চাইলাম। তারপর চোখ ফিরিয়ে শিবুর দিকে চাইতেই সেই শিশুর মুখেও তার মায়ের সেই অপরূপ হাসিটী দেখতে পেয়ে বল্লাম, "তোমার বোকাই সার্থক বৌ, তোমার পুজোই সত্যিকার, আমরা কেবল মনের সঙ্গে ছলনা করি মাত্র।"

* * *

আমি এদের কেউ নই কিন্তু এরা আমার আপনার, কারণ এদেরই মধ্যে আমার শান্তি আছে। সংসারের নানান ঝঞ্ঝাটে দিন কাটিয়ে দিনের যে সময়টুকু শান্তির ঘরে কাটাই সেইটুকুই আমার শান্তি। সে তার ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত, শাশুড়ী ননদ নিয়ে ব্যস্ত, বিশেষতঃ তার স্বামীটাকে নিয়ে মহা ব্যস্ত, তবু সে শান্তি, নামেও বটে কাজেও বটে। আর আমার অশান্ত হবার বিশেষ কোনো কারণ নেই—তবু আমার নিজের গড়া অশান্তিতে নিজেই অশান্ত।

কিন্তু আমি বাইরে হ'তে এসে যেখানে শান্তি পাই সেই ঘরটায় থেকে শান্তির স্বামীটা এত অশান্ত কেন? সে শান্তির বুকের মধ্যে থেকেই বা এত দুর্দান্ত কেন? চঞ্চল কেন? অসন্তুষ্ট কেন?

এতবড় দুষ্ট, স্বার্থপর বদমেজাজী লোকই বা শান্তির ভাগ্য-বিধাতা হলো কেন? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে যে এই রকম দুটী বিভিন্ন জগতের প্রাণীর বা এমন ভয়ঙ্কর মিলন ঘটল কেন? কথায় বলে, জলে তেলে মেলেনা, কিন্তু তবু যে মিলনের মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু নেই। কিন্তু এ যে জলের সঙ্গে আগুনের নিত্য মিলন হচ্ছে, অথচ আগুনও নিবছে না জলও ফুটছে না! এ কি রকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার!

শান্তি সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারে না, কিন্তু তার ব্যবহার দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে সে তার এই ভয়ঙ্কর স্বামীকেও ভয়ঙ্কর ভালবাসে। এই মানুষটা যে কি প্রকৃতির তা এই একটী মাত্র ব্যাপারেই বুঝতে পারা যাবে যে, তার ছেলে যে অসুখে পড়ে শান্তির কাছ থেকে সেবা আদায় করছে এটুকুও সে সইতে পারে না। ঐ রোগা ছেলেটারও সে বাপ হয়ে হিংসা করে।

আর আমাকে? আমাকে ত' সে বোধ হয় একচোপে পেলে দুচোপের অপেক্ষা করতে চায় না। আমার অপরাধ যে আমি এসে দু'দশ মিনিটের জন্ত তার স্ত্রীর মনের উপর ভাগ বসাই। এ দেখে প্রথমটা আমারই ভ্রম হয়েছিল বুঝি সে তার স্ত্রীকে এত ভালবাসে যে তাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া করতে চায় না। কিন্তু তার পরেই বুঝতে পারলাম যে তা মোটেই নয়। সে নিজের অহংকারটাকে এত ভালবাসে যে তার কাছে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সবই বলি দিতে পারে।

ঘটনাটা এই;—

সে দিনও চিরদিনকার মত বেলা তিনটের পর শান্তির ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি ছেলেটা জ্বরে ছটফট করছে, এবং মাঝে মাঝে অতি মৃদুস্বরে কাতরতা জানাচ্ছে। আমি গিয়ে তার মাথায় হাত দিলাম, গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি একলা আছ শিবুমণি? তোমার মা কৈ?"

শিবু একবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। তার মুখ দেখে বুঝলাম তার খুবই যন্ত্রণা হচ্চে। একটা জলপটী তৈরী করে তার মাথায় দিয়ে বাতাস করতে করতে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "শিবু, বাবা, খুব কষ্ট হচ্ছে? তোমার মাকে ডেকে আনব?"

শিবু মাথা নেড়ে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে তার পাশের ঘরটার দিকে দেখিয়ে দিলে। বুঝলাম তার বাপের ঘরে তার মা আছে। আমি পাখাখানা রেখে পাশের ঘরের দরজায় শব্দ করলাম। অমনি শুনতে পেলাম কে যেন বাঘের মত গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। তার পর চট্‌করে দরজা খুলে মজিদাদা বেরিয়ে এসে বল্লেন, "তোমার জ্বালায় কি এক মিনিটও ওকে নিয়ে সুস্থির হয়ে কাজ করতে পাব না? কেমনধারা মানুষ তুমি?"

আমি চট্‌করে আপনাকে সামলে নিয়ে বল্লাম, "কি এমন কাজ যার জন্ত পেটের ছেলেটা জ্বরে ধোঁকাচ্ছে, তবু সে তোমার কাছে বসে আছে?" আমার কথায়

দুই হাত মুঠো করে সেই অদ্ভুত মানুষটা এমন ভাবে চাইলে যেন এখনই সে আমায় মেরেই বসবে। তার পর চট্‌করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে বল্লে, "এখন ও আসতে পাবে না। আমি ওর চোখদুটো আঁকছি। চোখদুটোতে যে ভাব ফুটিয়ে রাখতে বলেছি, তুমি এসেই সে ভাবটা কেটে গিয়েছে। আধ ঘণ্টা ওকে ঐ ভাবে থাকতে হবে, তারপর তোমার কাছে আসবে। খবরদার এখন ডাকাডাকি কোর না।"

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। হায় ললিত কলা! হায় চারুশিল্প! তুমি যে পাত্রভেদে এত বড় নিষ্ঠুর নির্ম্মম হয়ে উঠতে পার তা ত' জানতাম না। তোমার দৌরাত্ম্যে মাকে তার রোগাতুর পুত্রকে ছেড়ে নিদয় শিল্পীর তাঁবেদারী করতে হচ্ছে। এবং সেই শিল্পী আর কেউ নয় তারই স্বামী এবং তারই রোগী ছেলেটার বাপ। শিবু, আমার, তার এই ভয়ঙ্কর চিত্রকর পিতার ভয়ে চিত্রপুত্তলিকার মত,—বলতে কি, ঠিক মড়ার মত চুপ করে পড়ে ছিল। এবং আমি অনুমান করতে পারছিলাম না যে তার স্নেহময়ী জননী মা না জানি কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সহ্য করে চুপ করে ঐ ময়দানবের সম্মুখে বসে ছিল। আমি ভাবতে পারছিলাম না, কি ভাব তার চোখে তখন ফুটে উঠেছিল। যা দেখে তার ঐ দানব শিল্পী মাঝে মাঝে গর্জ্জন করে বলছিল, "ও হচ্ছে না"—"ও হল না।"

আধঘণ্টা আমি শান্তির অপেক্ষায় শিবুর মাথার শিয়রে বসে রইলাম। আধঘণ্টা পরে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না—সে এতক্ষণ স্বর্গে ছিল কি নরকে ছিল, জলে ছিল কি আগুনে ছিল। কারণ তার মুখে ভাসছিল সেই তার অপরূপ হাসিটী এবং চোখে ছিল এমন একটা দীপ্তি যা কখনই নরক যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাওয়ার চিহ্ন নয়। কিন্তু দেখতে দেখতে তার মুখে ভয়ঙ্কর বেদনার ভাব জেগে উঠ্‌ল, যা দেখে বুঝলাম যে কি ভাবকে চেপে সে এতক্ষণ চুপ করে কতকটা যেন রোগগ্রস্ত হয়ে বসেছিল। তবু আমি রুদ্ধস্বরে বল্লাম, "শান্তি! তোমার কপালে এমন একটা দুঃখ আছে যা তুমি ভাবতেই পারবেনা।"

"কি দুঃখ?"

"তোমার এই দুর্দ্দান্ত স্বামীটী একদিন তোমায় গলাটিপে মেরে নিজে গলায় দড়ি দেবেন।"

আমার কথাগুলো শেষ হতে না হতে, সেই নরদৈত্যটা ঘরে ঢুকে অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগল। এরকম হাসি আর কাউকে কখনো হাসতে দেখিনি। কেবল দেখেছি একেই—চিরদিন ধরে এই মানুষটাই এই রকম হাসতে পারে। লোকটা হাসছে কিন্তু সে হাসিতে শব্দ নেই অথচ তার সমস্ত শরীরটা, বিশেষতঃ তার কাঁধদুটো খুব দুলছে। এ যেন মস্ত একটা বাঘ মুখ ফাঁক করে শিকারের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

হাসি শেষ করে শান্তির স্বামী-ব্যাঘ্র আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "ঠিক বলেছ তিনু, এক একদিন আমার তাই ইচ্ছে হয় বটে। কিন্তু আমি যদি গলায় দড়ি দিই ত' সেটা ঠিক ওথেলোর মত হবে না বলে গলায় দড়িটা দিতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে শান্তি যদি ডেস্‌ডিমনার মত মরতে পারে ত' সেটা ছবিতে বেশ আঁকতেও পারব।"

"এবং বেশ মারতেও পারব, সেটা কেন বললে না মণিদা?"

"মারতে মায়া করে যে, নইলে এক একদিন ইচ্ছে হয় বৈকি।"

"তা হলে আগে হ'তে হাত পাকিয়ে নাওনা কেন? ছেলেটা হ'তে আরম্ভ কর।"

এই কথায় ঐ ভয়ঙ্কর মানুষটার চোখ কি ভয়ঙ্কর ভাবে শিবুর দিকে চাইলে তা বলতে পারব না। শিকারকে মুখের কাছে পেয়েও না খেতে পারলে হিংস্র জন্তুর মুখে বোধ হয় ঠিক এমনি ভাবটা ফুটে উঠে। আমি মণিদার মুখ হতে চোখ ফিরিয়ে শান্তির দিকে চাইলাম। অমনি আমার সমস্ত আগুন নিবে গেল।

মণিদা চলে গেলে আমি বল্লাম, "বৌ, ঐ দৈত্যের মত মানুষটার মধ্যে কি পেয়েছ যে তারই জন্যে এত অত্যাচার সহ্য কর? হ'লই বা স্বামী, তাই বলে এমনি করে সমস্ত অত্যাচারই কি সইতে হবে?"

শান্তি কিছু বল্লে না, কেবল মৃদু হেসে, তার ছেলেটীর

পথ্য তৈরী করতে বসে গেল। শিবু একবার মৃদুস্বরে ডাকলে, "মা।" মা অমনি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তুলে বল্লে, "শিবু! ধন আমার! এই যে এসেছি।"

* *

সব দেবতারই একটী করে বাহন থাকে, আমার শান্তি-মনীর মন দেবতার বাহন হয়েছে ঐ তার সিংহের মত স্বামীটা। তাই শান্তিকে ভাবতে গেলে আগেই মনে পড়ে ঐ দুর্দ্দান্ত বাহনটীকে। দেবতাটী একেবারে ঠাণ্ডা, এক-বারেই যেন মা, তাই তার বাহনটী হয়েছে ভয়ঙ্কর নখদন্তী! এই দেবতাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য, সবারই চোখের সামনে ধরবার জন্ম যেন এমনি দুর্দ্দান্ত বাহনই চাই। যেন এমন বাহন না হলে শান্তির মনের দেবতা আপনাকেই জানতে পারতেন না।

শান্তিকে একদিন এই সব কথা বলেছিলাম। সে শুনে হেসে বলেছিল, "অনেক দূর এগিয়েছ, যখন বাহন পর্য্যন্ত দেখতে পেয়েছ তখন একদিন না একদিন দেবতাকেও দেখতে পাবে। আশা করে থাক, দেখতে পাবেই পাবে।"

দেবতার কথা মিথ্যা হয় না, শান্তির কথাও মিথ্যা হল না—এই ভয়ঙ্কর দৈত্যের স্কন্ধে হঠাৎ একদিন যেন একটী দেবতার আভাষ বিদ্যুতের মত চমক মেরে আবার মিলিয়ে গেল।

সে দিন একটা চিরস্মরণীয় দিন, যেদিন শিবুর রক্তা-ল্পতার দরুণ ডাক্তারেরা ব্যবস্থা দিলে যে একজনের শরীর হতে রক্ত নিয়ে ওর শরীরে দিতে হবে। শান্তি অবশ্য নিজেই দেবে ঠিক করলে, কিন্তু কার্য্য কালে এক ভয়ঙ্কর গোল উঠল। বড় বড় ডাক্তার এসে বসে আছে, লোক-জনে শান্তির ঘর ভরে উঠেছে, আমিও ভয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করছি, এমন সময় একটা দো-নলা বন্দুক হাতে করে মণি দাদা রক্তবর্ণ মুখে ঘরে ঢুকে চীৎকার করে বল্লে, "আজ সবাইকে খুন করব। খবরদার কেউ যদি শান্তির গায়ে হাত দিয়েছ ত' মরেছ। রক্ত দিতে হবে? কেন? রক্ত কি আর কেউ দিতে পারবে না? এত লোকে এত দিন ধরে এ বাড়ীর রক্ত শুষছে, তারা কেউ দিতে পারে না? বেরোও তোমরা, ছেলে বাঁচুক আর নাই বাঁচুক, শান্তির এক ফোঁটা রক্ত কেউ পাবে না।"

ঘর শুদ্ধ লোক ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল, অনেকে পালিয়ে গেল। মণিদার মা পর্য্যন্ত ভয়ে এক কোণে লুকুলেন। ডাক্তারেরাও বিরক্ত হয়ে কিম্বা ভয়ে সবে পড়বার যোগাড় করলেন। শান্তি ক্লোরোফর্ম্মে মড়ার মত শুয়ে আছে; আর সেই ভীষণ মানুষটা এমন ভাবে শান্তির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যা দেখে কারু সাহস হল না যে একটা কথা বলে।

হঠাৎ শান্তি নড়ে চড়ে উঠে বল্লে, "হয়েছে? শিবু—কৈ শিবু কৈ?"

আমি আর থাকতে পারলাম না; আমার ঘাড়েও যেন ভূত চাপল। আমি হঠাৎ মণিদাদার সামনে গিয়ে বল্লাম, "তা হলে তোমাকেই রক্ত দিতে হবে, তোমার ঐ রাক্ষসের দেহে অত রক্ত থাকার কোনো দরকার নেই।"

মণিদা একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর চট্ করে বন্দুকটা আমার হাতে দিয়ে বল্লে, "বহুত আচ্ছা, আমিই দেব, যদি না দিতে পারি ত' ঐ বন্দুকটা গুলিভরা আছে, এক গুলি বসিয়ে দিও। আসুন আপনারা, আমিই দেব।"

ডাক্তাররা কি করবেন ঠিক করতে না পেরে, এদিক ওদিক চাইছিলেন, কিন্তু মণিদার ভঙ্গী দেখে কারো নড়-বারও সাধ্য হচ্ছিল না। মণিদা তার সুস্থ সবল দেহটা বার করে বল্লে—"কেন তোমরা দেরী করছ?"

শান্তি এদিকে আস্তে আস্তে জেগে উঠে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। তার ক্লোরোফর্ম্মের ঘোর কেটে আসছিল, কিন্তু তার পাংশুবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে তার স্বামী বলে উঠল, "আপনারা আমার চাইতেও ভয়ঙ্কর; ঐ মানুষটার মুখের দিকে চেয়েও রক্ত নিতে যাচ্ছিলেন? আপনারা ডাক্তার নন—ডাকাত।"

ডাক্তাররা তখন বল্লে, "তাহ'লে ক্লোরোফর্ম্ম ত নিতে হবে, আপনি শোন।" মণিদা তার হাত দুখানা এগিয়ে দিয়ে বল্লে, "সে দিন তরোয়ালে হাত কেটে দেড় ঘটী রক্ত বেরিয়েছিল, আমি কি কাউকে বলতে গিয়েছিলাম,

না, মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম ? আমি এই দাঁড়িয়ে রইলাম, তোমরা যত ইচ্ছে রক্ত নাও—কিন্তু খবরদার শান্তির শরীর হ'তে রক্ত নিয়ে যদি আমার অমন জ্যান্ত ছবিটী মাটী করে দাও ত' তোমাদের ডাক্তারী করা ঘুচিয়ে দেব।"

কিন্তু অনেক সাধ্য সাধনার পর ঐ ভয়ঙ্কর মানুষটা, দয়া করেই যেন, একটা চেয়ারে বসল, আর তার শরীর হ'তে যতখানি প্রয়োজন ততখানি রক্ত বের করে নিয়ে নিলে। কিন্তু ঐ মানুষটার মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই নি।

কিন্তু সেদিন ঐ মানুষটাব মুখে কি দেখেছিলাম ? দেবতা না দৈত্য ? পশু না পশুপতি ? কাকে দেখেছিলাম ?

সে প্রায় হাসতে হাসতে অতখানি যন্ত্রণা সহ্য করলে, কিন্তু কার জন্য ? কিসেব জন্য ? সে বল্লে, ছবির জন্য, কিন্তু শান্তি কি ছবি ? শুধু ছবি ? এমন জীবন্ত মানুষটা যদি ছবি হয় তা হ'লে না জানি ছবি জিনিষটা কি !

আর মানুষের মধ্যে যদি ছবিত্বই থাকে ত' সে ছবিত্ব মণিদার মত খুণে মানুষের চোখেই বা দেখা দেয় কি করে ? আমি মণিদাব আঁকা ছবিগুলো দেখিছি, কি যে বিশেষত্ব তাতে আছে তা জানি নে। অবশ্য আমি ছবি আঁকতেও জানি না, বোধ হয় দেখতেও জানি না। কিন্তু আমার চোখে সেগুলো রংএর আঁচাড-মাচড় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তাতে না থাকে ফুল না থাকে পাতা, না থাকে শোভা, না থাকে আলো, না থাকে সুখ না থাকে দুঃখ। মনে হয় যেন কে কেবলি ভেংচাচ্ছে। তবে একটা ভাব বেশ ঐ ছবিগুলো হ'তে বুঝতে পারা যায় যে, একটা কি অচেনা জিনিষ খুব বিশ্রী আবরণ ভেদ করে বেরুবার যেন চেষ্টা করছে। জানিনা, হয় তো এ ভাবটা আমার কল্পনা, হয় তো মণিদার চরিত্রকে তার ছবির ওপর আরোপ করে ফেলি তাই ঐ রকম মনে হয়, তবু আমার সময় সময় মনে হয় যে মণিদা যা আঁকতে চায় তা যেন পারে না। তাই তুলি হেরে গিয়ে যা-তা কতকগুলো ইঁদুর বাঁদর পেঁচার মুখে মানুষেব ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে। নইলে পেঁচার মুখে ভালবাসা বা ভক্তি ফুটিয়ে তুলতে যাওয়া, বাঁদরের চোখে প্রেম ফোটাতে যাওয়া, বাঘের মুখে স্নেহ ফুটুতে যাওয়ার চেষ্টা সে করত না। বিশেষতঃ এইটেই আশ্চর্য্য যে, যার আঁকার বিষয় এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার, সে শান্তিকে সামনে নিয়ে কি করে ?

* * *

আমি তাই আর একদিন, সাহস করে, ওরা দু'জনেই ঘরে থাকতে থাকতেই ওদের ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে যা দেখলাম তা ভাল করে বর্ণনা করা অসাধ্য। তবু বলতেই হবে, নইলে আমার রক্ষে নেই, কারণ ঐ মণিদা বলে গিয়েছে যে সে ভূত হয়ে এসে আমার ঘাড় মটকাবে।

আমি ঘবে ঢুকে দেখি, শান্তি তার রুগ্ন কোলে কবে বসে আছে। শিবু বেঁচে আছে কি মরে গিয়েছে তাই প্রথমটা বুঝতে পারলাম না, কারণ তার হাত পাগুলো এলিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো বোজা—এবং তাব মুখে মৃত্যুব সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে। আর শান্তি সেই মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। তার মুখে কি ভাব ছিল তা আমি জানিনা,—বুঝতে পারিনি,—বুঝতে চেষ্টাও করিনি। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর চিত্রকর মানুষটা, তুলি নিয়ে তার পটের ওপর হাত রেখে একদম কাঠের মত হয়ে শান্তির দিকে চেয়ে ছিল। কি দেখছিল সে ? মরণোন্মুখ পুত্র কোলে নিয়ে যে মা বসে আছে—সেই মায়ের মুখে সে কি দেখছিল ?

আমি তাড়াতাড়ি শান্তির কাছে গিয়ে বল্লাম, "শান্তি কি কবছ ? এ কি হয়েছে ?" আরও কি কথা যে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মনে নেই, কিন্তু কোনো উত্তরই পেলাম না ; তখন মণিদাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম, "মণি-দা, কি কবছ তোমরা ? শীগ্‌গির ওঠো, ডাক্তার ডাকতে যাও, শিবু যে কেমন করছে।" আব মণিদা ! কে উত্তর দেবে ?

আমি তখনই বাইরে এসে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠালাম, মণিদার মাকে ডাকলাম। লোক জোটালাম, কান্নাকাটী সুরু করলাম, তবু এদের চৈতন্য হ'ল না। তারপর জলের ছাট, পাখাব বাতাস দিতে দিতে, শান্তি

নিশ্বাস ফেললে, শিবুও একটু নড়ে-চড়ে উঠল। কিন্তু মণিদার সেই কাঠের মত ভাব ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত ভাঙেনি। কিন্তু সে যখন জাগলে তখন বাঘের মতই জাগল, হুঙ্কার দিয়ে গর্জ্জন করে লাফিয়ে উঠে বল্লে, "এইও,বেরোও সব, আমি ছবি আঁকব,—বেরোও নইলে খুন করব। মরা ছেলে কোলে করা মায়ের মুখ কি সহজে পাওয়া যায়? বেরোও বলছি?"

কিন্তু কেউ বেরুল না—পাগলকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সেই আঘাতেই শিবু রাতের মধ্যেই মারা গেল। এবং তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই শুনলাম, মণিদাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সে নাকি নিজে গিয়ে খবর দিয়েছে, যে সে গলাটিপে শিবুকে মেরে ফেলেছে।

* * *

তারপর যা' ঘটল তা বিশেষ কিছুই নয়, কারণ ওরকম লোকের ঐ রকম শেষই হবার কথা। পাগল বলে সরকার বাহাদুর তাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু সে তো আপনাকে ছাড়তে পারে না; তাই একদিন সে বিষ খেয়ে মরল। মরবার কিছুদিন আগে আমায় বলেছিল, "শোনো ভিনু, তুমি আমাদের চিরদিনের আপনার লোক, তাই তোমার ওপর ভার দিচ্ছি। আমি মরব, কিছুতেই তোমরা আমায় রাখতে পারবে না, তা সে যতই বন্দুক সরাও আর শান্তিকে পাহারা রেখে দাও, আর তুমি এসে বক্তৃতা খরচ কর। যে দিন ছাড়া পাব সেই দিনই আমি মরব। কিন্তু আমি মলে আমার ছবিগুলো নিয়ে তুমি তোমার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখো, পুড়িয়ে ফেলো না। আর আমার কথাগুলো বেশ করে সবাইকে বুঝিয়ে দিও—যদি না দাও ত' ভূত হয়ে এসে তোমার ঘাড় ভাঙ্গব।"

আমি তাকে অনেক বোঝালাম, কিন্তু সেই গণ্ডার মানুষকে ফেরানো কি আমার কাজ? তাই সে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একদিন বিষ খেয়ে মরে গেল। ঝি চাকরেরা অনেক বেলায় তাদের ঘরে ঢুকে দেখে মণিদা শান্তিকে জড়িয়ে ধরে মরে রয়েছে। সেই মরণালিঙ্গন ছাড়াতে আমার ডাক পড়েছিল।

আমি সেই মৃতের আলিঙ্গনের মধ্যে শান্তিকে অনেক-ক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলাম। ডাক্তার বল্লে যে, শান্তি এখনো বেঁচে আছে, মরেনি, কারণ তার মুখে সেই অপরূপ জীবন্ত হাসিটী লেগেই আছে। মৃত স্বামীকে জড়িয়ে ধরে সে মৃত্যুর কোলেও অমৃতকে পেয়েই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।

* * *

সে আলিঙ্গনপাশ খুল্ল, কিন্তু সেই শেষ হাসিটী শান্তির মুখ হ'তে আর মিলাল না। চিরজীবন সে যেন ঐ শান্ত মধুর হাসিটী দিয়ে তার ঐ নরকবাসযোগ্য স্বামীটীকে আনন্দস্বর্গে তুলে রেখে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, "ছিঃ কাঁদব কেন? কাঁদলে সে কাঁদবে যে—তার ছবি খারাপ হবে যে!"

তাই আমি আজও ভাবি, এবং হয়তো চিরদিনই ভাবতে হবে যে শান্তির ঐ অপরূপ হাসিটীর উৎস কোথায়? ছেলে হারিয়ে স্বামী হারিয়েও সে ঐ হাসিটী হারাল না কেন?

অমলা

[শ্রীমতী নিরুপমা দেবী]

১১

রমেশ ব্যথিত ভাবে প্রশ্ন করিল, 'সত্যিই কি তুমি শীগ্‌গির এ গ্রাম থেকে চলে যাবে?'

রাজেন্দ্র হাসিয়া উত্তর দিল, 'কথাটাকে তোমার মিথ্যে বলে মনে হ'ল কেন?'

'কি জানি কেন, চলে যাবার মত উদ্যোগও করছ আস্তে আস্তে, তাও বুঝতে পারছি। তবু কেন যে মনে হয় যেতে পারবে না,—আমাদের ফেলে চলে যাবে না,—এ বুঝ্‌তে পারি না।'

রাজেন্দ্র ম্লান মুখ, কাতর দৃষ্টি বন্ধুর হাতখানা ধরিয়া

একটা উদ্দাম স্নেহের সহিত সজোরে নাড়িয়া দিল,—তার পর বলিল, 'এখনো দেরী আছে হে! যে দু'চারটে বড় রকম রোগী হাতে আছে এদের সাম্‌লে তুলি—কিম্বা সেরে ফেলি—পরে সে কথা।'

'যাই হোক্ সে কথা একদিন না একদিন সত্য হবে ত? এটুকুর অপেক্ষায় কত দেরীই বা লাগবে?'

'আঃ রমেন তুমি যে জগতে সকলকে চিরস্থায়ীই করতে চাও দেখ্‌ছি। তোমাদের দেশের একজন তত্ত্বজ্ঞানী রাজা লিখে গেছেন, 'তুমি কার কে তোমার * * * নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশীথে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে তারা দশ দিকে ধায়! * * তেমতি জানিবে সব অমাত্য বন্ধু বান্ধব, সময়ে পালাবে তারা কে করে বারণ।'—বুঝ্‌লে? আমাদের কবি মাইকেল সাহেবও বলেছেন, 'চির স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে

রমেন ম্লানভাবেই একটু হাসিয়া বলিল, 'আমি ত কোন তত্ত্ব কথা জান্‌তে চাইনি যে তাই আমাদের তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির ও তোমাদের কবির ছড়া শু'নিয়ে দিলে 'এ আমার তোমার ভাগ করাটুকুও বেশ উপভোগ্য! কিন্তু সে আলোচনারও আমার এখন সময় নেই। আমি কেবল জান্‌তে চাই—'

'কে বল্লে সময় নেই? আমার এখন তো 'সাঙ্গ হয়েছে রণ।' রোগী ক'টিকে আজকের মত দেখা শোনা হয়ে গেছে। এখন কেদারায় ঠ্যাং ছড়িয়ে দুটো সাহিত্যালোচনা করবারও অবকাশ যদি না পাব তা হলে তো জীবনই বৃথা। নিঃশঙ্কে ঢিলটি ছুঁড়ে যে পাশ কাটাবে তা হচ্চে না।'

'আমি যে ঐ দুটি পূজনীয় ও মাননীয় ব্যক্তিকে 'তোমার' 'আমার' বলে ভাগ করে দিলাম, এতে আমার কোন্ খানটায় ভুল হল দেখাও আগে পরে অন্য কথা কইতে দেব।'

রমেন হাসিয়া অনিচ্ছার সহিতও প্রশ্ন করিল, 'মাইকেল তোমার হলেন কিসে? অর্থাৎ পশ্চিমের?'

'নামে, কর্ম্মে, জীবনে, সব বিষয়েই। কেবল কাব্যে মাত্র তোমাদের, এই না?'

'কি আশ্চর্য্য! কবির কাব্য ছাড়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কে মানে? সেইই তাঁর কর্ম্ম, সেইই তাঁর জীবন। ব্যবহারিক জীবনে তিনি সাহেবই হোন্ আর যে নামই নেন্! তিনি আমাদের বাংলার মধুসূদন, তিনি মেঘনাদ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনার কবি,—এইমাত্র তাঁর পরিচয়। তোমাদের পশ্চিমের তিনি কেউই নন্।'

বলিতে বলিতে রমেন একটু রাগিয়া উঠিয়াছিল,—সহসা চাহিয়া দেখিল, তাহার রাগ দেখিয়া রাজেন্দ্র টিপি টিপি হাসিতেছে। তখন অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া রমেন বলিল, 'আমি কি জানি না আমায় রাগাবার জন্যই তোমার এ সব বাক্‌চাতুরী! কিন্তু যখন কথা তুলেছ তখন তোমায় আমি এক কথায় ছাড়ছি না। এই যে আমি আর তুমি, এর প্রভেদটাই বা কোন্‌খানে দেখিয়ে দাও দেখি। তুমি না বারো তেরো বছর বয়স থেকে বাপের সঙ্গে য়ুরোপে ঘুরে বেড়িয়েছ! উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছ—আমেরিকায় গিয়ে বড় ডাক্তার হয়েছ! তবু কেন এই আমাদের মত অশিক্ষিতদের সঙ্গে মিশে এই বাংলার সেবা করতে এসেছ? কোন্‌খানে এই সুখ সম্পদহীন রোগক্লিষ্ট অনাহার জীর্ণ দুর্ভাগ্য দেশের সঙ্গে তোমার যোগ আছে মনে কর? কই এত সৌভাগ্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েও তো এর রক্তের টান্‌কে ছাড়িয়ে যেতে পার নি! যে দেশকে নিজের ব'লে সর্ব্বদা ব্যঙ্গ কর—সে দেশ যে তোমার নয়,—তুমি যে আমাদেরই—একি আজও আমার জান্‌তে বাকী আছে! এত অসম মিল হলেও তোমায় যে লোকে আমার বন্ধু বলে!' কোন্‌খানে আমি তোমার বন্ধু? বিদ্যায় না জ্ঞানে না চরিত্রে না অবস্থায়—কোথায়? এই এক বাংলার নাড়ীতে, বাংলার রক্তেই নয় কি?'

রাজেন্দ্র উত্তেজনারক্ত রমেনের পীঠ মৃদু মৃদু চাপড়াইতে চাপড়াইতে শান্ত গম্ভীর মুখে বলিল, 'থাম থাম, হে ছোক্‌রা! আর নয়, আমার ঘাট্ হয়েছে! কিন্তু তবুও বল্‌ছি যতখানি যা আমায় দিলে এর উপযুক্তও আমি নই। আমি শুধু দেশসেবা করতেই ফিরি নি। 'রক্তের টানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুখ স্বস্তির টান্‌ও আমায় বারো বৎসর পরে দেশে ফিরিয়ে এনেছে।'

'এই দেশেই যে তোমার সুখ স্বস্তি আছে এ তোমায়

কে বল্‌লে? যে সৌভাগ্যশালী দেশের অধিবাসী তুমি হয়েছিলে, জীবনকে যে ভাবে শিক্ষা দীক্ষার উচ্চ সোপানে তুল্‌তে অবকাশ পেয়েছিলে, এতে এ দেশের সঙ্গে এ যোগ অনুভব করবার কি এমন কারণ ছিল? তোমায় বাপ তোমায় অর্থও তো বড় কম দিয়ে যান্‌নি। অনায়াসেই তুমি কি জন্মভূমির এ বন্ধন ছিঁড়তে পার্‌তে না?'

'অনায়াসের কথা ছেড়ে দাও, আয়াসের সঙ্গেও তা পারবার উপায় হ'ল না। জন্মভূমি সেই বারো তেরো বছরের মধ্যেই আমায় এমনি বাঁধনে বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু জন্মভূমি হ'লেও এর এই তপোবনের ধাত আমার সইছে না, এ নিশ্চয়। সে দেশের রক্ত আমার রক্তে অনেকখানি মিশে গেছে জেনো। এই নাহক্ শুখিয়ে মরা,—মিথ্যার পেছনে এক একটা জীবনের অপঘাত,—পাছে নিজের ঘাড়েও এর কোন দায়িত্ব, কোন পাপ পৌঁছে যায় এ ভয় বরাবরই আমার মনে ছিল। তাই আমায় ফিরে আস্‌তে হয়েছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এসে রূপান্তরিত তপস্যা দেখে আরও চমকে গেলাম।'

'আবার ভাই! মাপ্ কর—আর না! আর আমায় অসংযত করে তুল না, দোহাই তোমার। আমায় অমলার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার পাত্রও অন্ততঃ থাক্‌তে দাও। কিন্তু তুমি নিজের কথা কি বলছিলে? তোমার ওপরেও কিসের দায়িত্ব, আর কি জন্য তুমি দেশে ফিরেছ? কোন জীবনের অপঘাত মৃত্যুর ভয় ছিল তোমার এসব কি বলছিলে? নিজের কথা কখনো যদি ভাল করে একটু গল্প করলে।'

'বলছি সে কথা পরে, আগে প্রথম কথাটা শোন। অমলার কাছে নিজের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের জায়গাটি অটুট রাখ্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ কিন্তু আমার জায়গাটি যে কোথায় দাঁড়াল তা কি একবারও ভাব্‌ছ না স্বার্থপর? আর কিছুরি দাবী না রাখলেও এই শ্রদ্ধা জিনিষটি যে মানুষ মাত্রেরই মানুষের কাছে দাবী করবার বস্তু। যে কথাটা আমি তুলেছি এর ন্যায্য কারণগুলি তাঁর কাছে দাখিল করে না দিলে—তপস্বী তোমাদের কাছে মাঝে হ'তে আমি চিরদিন কি হয়ে থাক্‌ব তা একটু ভাব দেখি।'

রমেন সলজ্জে বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিল, 'তোমাদের ব'ল না, আমার কাছে কৈফিয়তের কি আছে তোমার। তবে অমলার কাছে? কি ন্যায্য কারণ দেখাবে শুনি! বন্ধুর জন্যে বন্ধুকৃত এতো প্রমাণ হয়েই গেছে। তুমি যে সাহেব দেশের লোক, একে অধর্ম্ম ব'লে মনে কর না, সেই জোরেই এ কাজ করতে গেছ, এও ওঁরা বুঝেছে। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ দেশের লোকের মুখ বন্ধ কর্‌বার প্রমাণও তোমার হাতে আছে সেইটা যে কি, কি কি প্রমাণে তুমি অমলার বিয়ে হয়নি আন্দাজ করেছ, কোন্ সূত্রে অমলার বাপের পাণ্ডার সঙ্গে তোমার জানা শোনা হয়, তাকে জান্‌বার আগে তার জীবনের রহস্য কি করে জানতে পার—সেইগুলো আমার এখনো যে শোনা হয়নি। সে দিনের সে খবরে, তুমি জান, এই কথাটুকুতেই আমার কাল প্রাণ এমনি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে এসব প্রশ্ন করবারও আমার এ পর্য্যন্ত অবসরই হয়নি। আজ ওবিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে—'

'তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছ কিন্তু আমি এখনো হইনি; সেটুকু হয়ে নিয়ে বসে বসে তোমার সঙ্গে এ গল্প করব। তোমার পকেট এডিসনের ডিস্পেনসরী রৈল, যত খুসী ডাক্তারি আর কম্পাউণ্ডারি চালাও, আমার দরকারী কাজ একটা সেরে আসি। কাল ভোরে ন'পাড়া যেতে হবে—ফিরতে বেলা হবে কি রাবে তা বলা যায় না'—

'এই এক মজার লোক! আধখানা ক'রে কথা কওয়ার এমন বদ্ অভ্যাস, একি তোমার পাশ্চাত্য সভ্যতারই অঙ্গ? কবে যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে দু'দণ্ড গল্প করবে তা জানি না। এদানি যদি পনেরো মিনিটও তোমায় স্থিরভাবে পাই!'

রাজেন্দ্র হাসিয়া বিদায় লইল। সন্ধ্যার একটু পরে অমলা যখন মণি টুনিকে নিকটে লইয়া তাহাদের ঘুম পাড়াইবার রসায়ন স্বরূপ বিহঙ্গম বিহঙ্গমার গল্প বলিতেছিল, তখন সহসা প্রদীপের ক্ষীণালোকে চাহিয়া দেখিল ডাক্তার আসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছে। অমলা বিস্মিত হইয়া চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সে দৃষ্টির উত্তর দিল, 'টুনি মনি—তোমরা এমন মন দিয়ে গল্প শুনছ যে আমার ডাক্‌ও শুনতে পেলেনা?'

অমলা মৃদুস্বরে বলিল, 'টুনি ঘুমিয়েছে, শুনতে পাইনি বটে আমরা।'

'কাল সকালে একটু দূরে যেতে হবে, ফিরতে কত দেরী হবে বলা যায় না। দিদিমাকে—'

'কিন্তু দিদিমা যে ঘুমুচ্ছেন'।

'ঘুমুচ্ছেন ? এখন কি ওঁর ঘুম ভাঙবার সম্ভাবনা নেই ?'

'আছে, আর একটু পরেই হয়ত জাগবেন—তখন দুধ দেব'।

'আমি ততক্ষণ একটু বসছি তবে' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ডাক্তার একটা মোড়া টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। অমলা কি করিয়া উঠিয়া পড়িবে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে ডাক্তার বলিল, 'মণির গল্প শোনা হয়ে গেছে বোধ হয় ? এইবার আমার একটা গল্প শুনতে হবে আপনাকে, উঠলে চলবে না। যে কথাটা আমি দিদিমার কাছে সেদিন বলেছিলাম তার প্রমাণ ও কৈফিয়ত এখনো আপনারা আমার কাছে নেননি'।'

অমলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আমাদের তার দরকার নেই বলেই নেওয়া হয়নি'।

'কিন্তু আমার দেবার দরকার আছে, নৈলে যে আমি অন্ততঃ আপনাদের বিশ্বাসের কাছে নিতান্ত পশু ব'নে যাই। এটা নিশ্চয়ই জানেন যে এ ধারণাটা জগতের কারও পক্ষেই শান্তিদায়ক নয়।'

'আমরা যদি বলি যে, আপনাকে আমরা তা ভাবিনি, তাতেও কি নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন না' ?

'না'।

'তবে বলুন। কিন্তু রমেনদাদাও কি ইচ্ছা করেন আমার এই কথাগুলার চর্চ্চা হয় ?'

'রমেন জানেও না যে একথা আমি আপনাকে আবার বলতে এসেছি। একটা কথা বিশ্বাস করুন, রমেন প্রথম থেকেই এ বিষয়ে সকলের কাছেই চর্চ্চা করতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ ক'রে এসেছে। আমিই তার বারণ শুনিনি।'

'কেন শোনেন্ নি' ? শোনা আপনার উচিত ছিল।'

'আমার ধারণা ও বিশ্বাস আমাকে এ আমার উচিত নয় বলেই বুঝিয়েছে। কেবলমাত্র আমি বন্ধুর জন্যই একথা তুলেছি ভাববেন না। অনেক কারণই আছে, যাতে আমার একথা আপনাদের বুঝিয়ে না দেওয়া পাপ বলে মনে হয়েছিল।'

'আপনি কাকে পাপ কাকে পুণ্য বলেন তা অবশ্য আমরা জানি না, কিন্তু আপনার অনেক কারণের মধ্যে এই একটা আমরাও আন্দাজ করতে পারি যে আমাদের অভিভাবকহীন নিরাশ্রয় দেখেও এই কথাটা আপনার মনে এসেছে।' কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন্ না যে পাড়াগাঁয়ের গরীবের ঘরের মেয়েরা আমার মত অবস্থায় পড়লে সচ্ছন্দে নিজেদের ভার নিজেরা মাথায় ক'রে নিতে পারে। তারা দিনপাত করতে জানে,—ভগবানের দেশের ও দশের ওপর তাদের নির্ভর আছে। তাদের জন্য আপনি অত ব্যস্ত হবেন্ না।'

অমলার সসম্মান অথচ সতেজ কথাগুলিতে রাজেন্দ্রকে ক্ষণেক স্তব্ধ করিয়া রাখিল। কিন্তু একটু পরেই সে ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া রাজেন্দ্র উত্তর দিল, 'যখন আমার পাপ পুণ্যের কথা কর্ত্তব্যের কথা আপনি জানেন না তখন আমার এ কথায় আপনার ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। আপনার উপযুক্ত কথাই আপনি বলেছেন কিন্তু আমিও আমার আরব্ধ কাজটুকু শেষ ক'রে যেতে চাই। যখন আমার আত্মপ্রত্যয় আপনাকে কুমারী বলেই জানে তখন সে-টুকুও আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে আমি বাধ্য। তারপরে আপনারা যা ইচ্ছা করবেন, তার ওপরে আর কারও কথা চলবেনা।'

'আচ্ছা আপনিই বা এটা জানাতে কিসে নিজেকে এত বাধ্য মনে করলেন ? জগতে এত লোক থাকতে আপনারই হাতেই বা এ ভার কে দিল ? বলছেন রমেনদাদা দেননি, আমিও দিইনি, তবে কিসের জন্য আপনি এই পাপ পুণ্যের কথা তুলছেন ?'

রাজেন্দ্র আবার একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, 'আমি যখন জানি এবং মানি, তখন নিজেকে এ বিষয়ে বাধ্য বলেই আমার ধারণা।'

'আপনি নিজের ধারণা নিয়েই কি জগত চালাতে চান্ ?'

'না, কিন্তু এটুকু স্বীকার করছি যে,আপনাদের চালাতে চাই। কেন না রমেন আমার ছোট ভাইয়ের মত বন্ধু, আর আপনাদেরও আমি বন্ধু বলে গণ্য হবার দাবী রাখি।'

অমলা একটু অধোমুখে থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'কিন্তু এক্ষেত্রেও এ দাবী চল্‌তে পারে কি?'

'পারে বলেই প্রস্তাব করেছি জানবেন। কিন্তু আপনি যে শুনতেই রাজী হচ্চেন না।'

'আচ্ছা, প্রথমে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেন, আপনি এ কথা কি করে জানলেন?'

'যেমন ক'রে লোকে জানে। খোঁজ নিয়ে।'

'কার কাছে খোঁজ পেয়েছেন? আমার বাবার পাণ্ডার কাছে? কে তিনি? তাঁর নাম কি?'

'প্রয়াগের একজন ধ্বজাধারী পাণ্ডা—নাম শিউশরণ; দারাগঞ্জে তাঁর বাড়ী।'

'এখনো তিনি বেঁচে আছেন?'

'না, কিছুদিন হ'ল মারা গেছেন।'

'তিনি কি ক'রে জানলেন যে—এ কথা সত্য কিম্বা মিথ্যা?'

'তিনি কেন জানবেন না? সেই যে বড় লোক—যিনি দৌহিত্রের সঙ্গে আপনার বাবাকে কন্যাদানে সম্মত করেন, যাঁর সঙ্গে তাঁদের দেশে বিবাহ দিতে গিয়ে পাত্রের পিতার সঙ্গে বচসা হয়ে আপনার বাবা কন্যা নিয়ে ফিরে আসেন; সেই জমিদারের পাণ্ডাও ঐ শিউশরণ, কাজেই তিনি সবই জানতেন।'

'এসব আপনি তাঁর নিজের মুখে শুনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কত দিন মারা গেছেন?'

'প্রায় বছরখানেকই হবে।'

'আপনি তা হ'লে এ গ্রামে আসার আগেই এ খবর জানেন বলুন? রমেন দাদার মার মুখে শুনেছি, কাকা মারা যাবার সময় আপনি এ গ্রামে এসেছেন। এ ছয় মাস আপনি যে স্থানান্তরে গিয়েছেন এ তো শুনি নি। আমাদের চিনবার আগেই আপনি এ খবর তা হ'লে জানতেন?'

সহসা একটু যেন চমক খাইয়া যেন অগত্যার অসাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পড়িয়া রমেন্দ্র উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এটা কি আশ্চর্য্যের কথা নয় যে আমাদের না চিনে ও আমাদের এমন কথা যা কোথাও কেউ জানে না তা আপনিই কেবল জানলেন। সেদিন যখন দিদিমার কাছে আপনি এ কথা জোর দিয়ে বল্‌ছিলেন তখনি আমার মনে হয়েছে আপনি যে জানবেন বল্‌ছেন ওটা মিথ্যে, আপনি জানেন। কিন্তু এ যে কি করে সম্ভব হ'ল তাই-ই আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'সেই পাণ্ডা আমাদেরও পাণ্ডা, তাঁর কাছে এই রহস্যময় গল্পটা আমার শোনা ছিল। আপনার বাপের নাম—তারপরে তিনি যে সেই ক্ষোভে কন্যা নিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে কোথায় চলে যান্—এটুকুও শুনি। বাঙালীদের ব্যবহারের নিন্দা করতে করতে তিনি খুব মজ্‌গুল্‌ভাবেই এ গল্পটা আমাদেব কাছে করেন। তারপরে দৈবক্রমে এ গ্রামে এসে প'ড়ে রমেন কে জেনে সেই গল্পের সূত্র ধরতে পেলাম। এতে এমন অসম্ভব আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?'

আপনি তা হ'লে এলাহাবাদের লোক? সেইখান থেকে দৈবক্রমে এই এত দূরে, বাংলার এই ঘোর পাড়াগাঁয়ে এসে পড়লেন! এ যদি দৈবের কথা হয় তো সে দৈবের চেয়ে আশ্চর্য্য জগতে কিছুই নেই।'

'দৈব এই রকমই আশ্চর্য্য জানবেন। আমি এলাহাবাদের লোক নই। বছর খানেক আগে মাত্র আমি ভারতবর্ষেই এসেছি। আমার জাত নেই, আমি সাহেবদের দেশেই মানুষ তা জানেন ত? একটা দরকারে এলাহাবাদে গিয়ে এ গল্পটা অল্পদিনই শুনেছিলাম, তাই খুব ভাল করেই মনে ছিল। নৈলে আপনার বাবার নামটী ভুলে গেলে আর কিছুই ধরতে পারতাম না।'

'এই-ই যে আপনি কি করে ধরলেন আমায় আর একটু বুঝিয়ে দেন। এ গল্পে মনোযোগ দেবার মত এমন কি পেয়েছিলেন আপনি? থাকৃত' যদি শুনতেন যে বিয়ে হয়েও তারপরে বড় মানুষ কুটুম্বদের অপমানে আমার বাবা মেয়ে নিয়ে অভিমান ক'রে পালিয়ে এসেছিলেন। আপনি

যেটুকু পর্য্যন্ত বল্‌ছেন ওটুকু তো মনে রাখার মত গল্পই নয়। এমনও যদি আপনার জানা থাকত’ যে সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলে রটনা হয়েছে অথচ সে কুমারী হয়েও এই ভাবে আছে তা হলেও বা আপনার এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পারি।’

‘আমার কথা আপনি তা হলে কতকটাও অন্ততঃ বিশ্বাস কর্‌ছেন? কোন্ পর্য্যন্ত বিশ্বাস কর্‌ছেন জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি? আপনি তো এটা মনে কর্‌ছেন না যে আমি কিছুই জানিনা—সমস্তই আমার মিথ্যা রচনা। বন্ধু রমেনের ভগ্ন অন্তর জুড়ে দিতে আমার এ সব আগাগোড়া কারসাজি মাত্র?’

‘না, কিছু আপনি নিশ্চয়ই জানেন এ আমিও বুঝেছি, কিন্তু সবটা জানেন কি না এইটাই সন্দেহ হচ্চে। আর নয় ত সবই জানেন, কিন্তু কিছু রেখে ঢেকে বল্‌ছেন। সব বলতে চান্ না।’

‘কোথায় আপনার সন্দেহ হচ্চে বলুন আমি খণ্ডন ক’রে দিতে পারি কি না চেষ্টা ক’রে দেখি।’

‘আপনি একটা কথা মাত্র সত্য ক’রে বলুন—তা হ’লেই আর কিছু বলবার দরকার হবে না। কিন্তু আমার এ বিশ্বাসের মূল্য আপনি রাখ্‌বেন, সত্য বল্‌বেন। বলুন আপনি যা আমাদের বোঝাতে চান্ একি সত্য?’

‘হ্যাঁ, আমার ধারণায় বিদ্যা বুদ্ধিতে আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনি কুমারী। রমেন ভিন্ন জগতে আপনার—’

‘এত কথা আপনি কেন বল্‌ছেন? হয়ত আপনার ধারণা আর আমাদের ধারণা এক নয়। বলুন আমি আমার ধর্ম্মের কাছে, সমাজের কাছে, সকলের কাছেই কি তাই? রমেন দাদার কথা আপনি বারে বারে বল্‌ছেন তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু যখন জানা গেল আমার একজন স্বামী আছেন তখন তিনি আমার ভাইয়ের মতই দুঃখে দুর্দ্দিনে আমাদের সাহায্য করে থাকেন। তাঁর নাম আপনি এভাবে আমার কাছে করবেন না। কেবল সত্য করে বলুন যিনি আছেন বলে আমার এই পাঁচ বৎসরের ধারণা, তিনি আছেন কি না? এখন যদি তিনি বেঁচেও না থাকেন একদিন ছিলেন কি না।—এই মাত্র আমি জান্‌তে চাই, আর কিছু না।’

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অমলা আবার বলিল, ‘আমার সন্দেহটাও আপনাকে তবে আমি বলে নিই। দিদিমার কাছে যেদিন আপনি একথা বল্‌ছিলেন আমার সেইদিন থেকেই সন্দেহ হয়েছে আপনি তাঁকে জানেন। আপনি হয়ত তাঁরই কোন আত্মজন। সব জেনে শুনেই আপনি এ গ্রামে এসেছেন। এত কথা তাঁদেরই আত্মজন ভিন্ন অন্য কারও জানার সম্ভাবনা কখনই নেই। তা যদি থাক্‌ত’ আমার বাবার পিসি, রমেন দাদা এরা নিশ্চয়ই তত্ত্ব পেত। বাবা যা লুকিয়ে রেখে গেছেন তা তাঁরা ভিন্ন কেউ খুলতে পারেনা। বলুন আপনি, আমার এ সন্দেহ কি মিথ্যা?’

অমলার অচঞ্চল কুণ্ঠাশূন্য অমলিন দৃষ্টির আলোকের নিকট নিজের দৃষ্টি নত করিয়া রাজেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে উত্তর দিল, ‘আপনার কাছে যখন আর অস্বীকার করার উপায়ই নেই তখন স্বীকার কর্‌ছি হ্যাঁ আমি সেই গর্ব্বিত বংশেরই একজন বটে। আপনাদের ওপর যা অন্যায় হ’য়ে গেছে তারই সংশোধনের জন্য আপনার সন্ধানেই আমি এ গ্রামে এসেছি, এ কথা সত্য। যার সঙ্গে আপনার অন্তরে বাহ্যে কোন সম্বন্ধ কোন দিন স্থাপন হয়নি তারই উদ্দেশ্যে আপনার ওপর সমাজের এ অন্যায় অত্যাচার—’

‘কিন্তু তাই বা আপনারা কি করে জান্‌লেন? একজন গরীব আপনাদের বংশে মেয়ে দেবার উচ্চ আকাঙ্খা নিয়ে গিয়েছিল, তারপর অপমানিত হয়ে যদি ফিরে থাকে এ আর এমন কি কথা!—সে মেয়েকেও সে গরীব কুমারী বলেই সকলকে জানিয়েছিল। তারপরে আবার তার কপালে এমন বিড়ম্বনা ঘটেছে—আপনাদের বংশে তার বিয়ে না হ’য়েও সে সেই মিথ্যা সম্বন্ধেই জড়িয়ে আছে এ আপনারা কি করে জান্‌লেন? আপনাদের বংশে যথার্থ জড়িত না থাক্‌লে তার খোঁজে এত খোঁজ নিয়ে আপনি এই গ্রামে এসেছেন, এও কি আমায় বিশ্বাস কর্‌তে বলেন?’

রাজেন্দ্র নিঃশব্দে কেবল অমলার পানে চাহিয়া রহিল মাত্র, কোন উত্তর দিতে পারিল না। অমলাও একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল 'আমি আবারও বল্‌ছি আপনি জানেন অথচ বল্‌ছেন না।'

'স্বীকার তো করেছি, আমি সেই বংশেরই একজন।'

'আপনাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ না থাক্‌লে কখনই আপনি এ খোঁজ কর্‌তে বেরোন্‌নি। কিন্তু এমন অবস্থায় তা আমি জান্‌তে পার্‌লাম যে লজ্জা কর্‌বারও আমার অবকাশ নেই। প্রণাম কর্‌তে পারি কি আপনাকে?'

রাজেন্দ্র বাধা দিয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'একি কর্‌ছ অমলা—আপনি এ কি করছেন? কোন্ সম্বন্ধকে আপনি এমন করে স্বীকার কর্‌ছেন তা কি বুঝতে পারছেন? যাকে আপনি কখনো জানেন না, চেনেন না, অতি ছোটতে অজ্ঞানে বলির পশুর মত সমাজের হাড়িকাঠে আপনার বাবা যদি আপনাকে সেখানে উৎসর্গ করেই থাকেন সে সম্বন্ধও কি আপনার স্বীকার কর্‌বার? আপনার কেউ নয়—কিছু নয়। আর যাকে আপনার অন্তর জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে স্নেহ ভালবাসা আদান প্রদানের দিনে স্বীকার করেছে তাকেই আপনি নিজের মনের কাছেও অস্বীকার করে এ আপনি কি কর্‌ছেন?'

'আমি তাঁকেই মাত্র স্বীকার করেছি যিনি আমার স্বামী। যিনি তিনি না হ'তে পেরেছেন তিনি আমার আত্মীয় হ'তে পারেন কিন্তু তার বেশী আর কিছু নন। আপনারা আমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার না করুন ক্ষতি নেই, আপনার পরিচয় আমি চাই না। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন তিনি আমার সর্ব্বপ্রকারেই স্বীকারের। আশা করি এর পর আর আমায় ও সব কথা বল্‌বেন না। যদি বলেন, আর আমি আপনার সামনে বেরুবনা। আপনার পরিচয় অকলকে দিয়ে আমি আপনার অসম্মান করব এ ভয়ও করবেন না। রাত হয়ে যাচ্ছে আপনি, তাহলে আসুন, এত রাত্রে কি দিদিমাকে আর ব্যাটারী দেবেন?'

রাজেন্দ্র শুষ্কনেত্র অমলার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল 'তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারে আমার অসম্মান অমল! না, বরং সম্মান। কিন্তু কি পরিচয় আমি দিতে পারি আজ তোমার কাছে?'

'যা সত্য। অসম্মান বোধ যদি না কর্‌ছেন তবে কেন এতদিন তা লুকিয়ে রেখেছেন? কেনই বা এ সব কাণ্ড করলেন? আমায় এত লজ্জা দিলেন—'।

'কেন কর্‌লাম তা আজ আর তোমায় বুঝুতে পারবনা। যা পুরুষ হ'য়েও রমেন ধরতে পারলে না, একদিনও সন্দেহ করলেনা, তা যে এমন করে—এ আমি স্বপ্নেও আশঙ্কা করিনি। লজ্জা তোমার নয় অমলা এ লজ্জা আমারই একা। এ ভয় আমার একেবারেই ছিল না, আমায় তোমরা একেবারেই চিনবেনা জানি বলেই ইচ্ছা করে ছিলাম যদি তোমরা পরস্পরকে চাও তাহলে আমিই তোমাদের যুক্ত করে দেব। আমার পরিচয়েও আজ আমার যে কতটা লজ্জা—'

'পরিচয়ে আপনার লজ্জা! ভয়! কেন? আপনি—কে?' অমলার শুষ্করুদ্ধ কণ্ঠ হইতে তাহার অজ্ঞাতেই প্রায় শব্দ কয়টা বাহির হইয়া গেল। তারপরে নিঃশব্দে পরস্পর কেবল উভয়ের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই অমলার ক্রোড়ের উপর রক্ষিত মণির মাথাটী গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং অমলা সহসা দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। তাহার পরে ধপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল, কে যেন সমস্ত দেহ ছাড়িয়া দিয়া সবেগে শুইয়া পড়িল কিম্বা পড়িয়াই গেল। মাথাটা কেমন উপাধানচ্যুত হওয়ায় মণিও বাহিরে জাগিয়া উঠিয়া 'দিদি দিদি' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। টুনিও জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ধরিল 'ও দিদি তুমি কোথায় গেলে? ও দিদি!' ঘরের ভিতরে দিদিমা বুড়ী 'অমা—অমন করে শুলি কেন? ওরে অমা ওঠনা' বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কাহাকেও ভূতের ভয় দেখাইয়া যেমন করিয়া লোকে নিঃশব্দে পলায় তেমনি করিয়া রাজেন্দ্র অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া পলাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট]

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়ব্রতের কথা

৫

কাজটা নিয়েই আমার দু'রকমের ভয় হয়েছিল। একটা হচ্ছে, একাজ পারব কি না। আর একটা ভয় হয়েছিল যে কিসের, তা প্রথমটা খুব খোলসা করে ধরতে পারিনি। কিন্তু যখন ধরতে পারলাম, কিসের ভয়, তখন ভয়ের কারণ ও পালিয়েছে। ব্যাপার দুটোর প্রথমটা এই :—

কাজটা ঘাড়ে নিয়ে, ভয়ে ভয়ে সাবদাপুরের রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছিতেই দেখি, আমার জন্তে জমিদারের গাড়ী এসে উপস্থিত এবং এমনি আদর করে কর্ম্মচারীরা আমায় ডেকে নিলে, যে জমিদার মহাশয়ের বৈঠকখানা পৌঁছুতেই আমার অর্দ্ধেক ভয় কেটে গেল। মন বল্লে "না: এদের ভয় করবার কিছু নেই।"

তারপর দু চার দিন সুস্থ হয়ে বাসায় বসতে না বসতেই, মালিকরা আমায় ডেকে পাঠালেন, এবং এমন অদ্ভুত ভাবে পর্দ্দার আড়াল হতে আমার ওপর হুকুম জারির সঙ্গে উপদেশ এমন কি মৃদু তিরস্কার পর্য্যন্ত বেরিয়ে এল যে আমার প্রথম ভয়টা এক নিমেষেই লজ্জায় পালিয়ে গেল। আর এটাও ত' সত্য যে জলের মাছ জলে পড়লেই সাঁতার দিতে আরম্ভ করে অবশ্য যদি সে একেবারে না মরে গিয়ে থাকে। আমি মরিনি তাই এই অনভ্যস্ত কাজেও প্রথম দিন হতেই হারিনি।

যাক, আমি যখন সদর কাছারির পেছনকার ঘরের পর্দ্দার সুমুখে এসে দাঁড়ালাম, অমনি ভেতর হতে মধুর স্বরে হুকুম এল, "ঐ চেয়ার খানায় বসুন।"

আওয়াজ শুনেই কাণ জুড়িয়ে গেল, ইচ্ছে হল পর্দ্দাটার নীচে একটা প্রণাম ঠুকি, কিন্তু পারলাম না। বোধহয় অনভ্যাসে, কিম্বা হয়ত সঙ্কোচে, অথবা হয়তো তখনো এই চাপকান চোগার অন্তরালে সন্ন্যাসীটা লুকিয়ে বসে ছিল।

যে কারণেই হ'ক নমস্কার করা হলনা। কিন্তু ভেতর হতে শব্দ হল, "আপনি ব্রাহ্মণ শুনিছি আমাদেরই স্বজাতি আপনাকে নমস্কার করছি। আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমি চটকরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, "আশীর্ব্বাদ করব কি বলে আশীর্ব্বাদ করব?"

ভিতর হতে একটা মৃদু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর শব্দ শুনলাম, "আশীর্ব্বাদ করতেও জানেন না? তা হলে এতবড় এষ্টেট চালাবেন কি করে?"

আমি মাথা চুলকিয়ে বল্লাম, "দেওয়ানজী বলেছেন চালিয়ে নেবেন, তাই সাহস হয়েছে, পারব। ভুল হয় আপনারা দয়া করে শুধরে দেবেন।"

"তা হলে, প্রথম থেকেই ভুল শুধরে দিতে হবে দেখছি— আপনি একলা এসেছেন কেন? ঐ অত বড় বাড়িটা কি আপনাকে একলা থাকবার জন্ত দেওয়া হয়েছে? কেবল চাকর বামুনের হাতে আপনাকে আমরা ফেলে রাখব কি করে? উর্ম্মিলা দিদি পিসীমা দুজনেই বলে দিয়েছেন যে আপনি যদি আপনার ছেলে মেয়েদের না নিয়ে আসেন তা হলে এ বিদেশে আপনার মন টিকবে কি করে? মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম করবেন কি করে? চুপ করে রৈলেন যে? একলা এই বিদেশে আসা কি আপনার ভুল হয়নি?"

একলা! বিদেশে! ওগো অপরিচিতা, ওগো অন্তরাল বাসিনী! তুমি যদি জানতে যে তোমাদের এই আশ্রয় প্রার্থিটী কতখানি একলা! আর তার স্বদেশকে পাবার জন্ত

তার মধ্যে যে কত হাহাকার তা কি অনুভব করতে পারবে ?

যাক, আমি অবাক হয়ে এই অপারিচিতার পরিচয়ের সঙ্গে এই অদ্ভুৎ সম্ভাষণের ভঙ্গীর মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলাম। তাই তিনি যখন বল্লেন, "চুপ করে আছেন কেন ?" তখন আমি চমকে উঠে বল্লাম, "ছেলে মেয়ে আমার কেউ নেই, এক আছেন মা, —"

"কেউ নেই। ছি ছি শীগগির মাকে আনতে পাঠান। আজই চিঠি লিখেদেন, না হয় নিজে যান। না— এমন করে আপনার থাকা হবে না।"

আহা। কেগো করুণাময়ী, এই অপরিচিতাকে অন্তরালে থেকে এমনি করে সহজেই আপনার করে নিলে। কেগো এমনি করে আমায় আমার স্ব কৃত মরুভূমী হতে এক নিমেষে অনায়াসলব্ধ ওয়েশিষে পৌছে দিলে। ওগো তোমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করব ? তুমি যেখানে আছ সে স্থান বুঝি একেবারে কমলালয়, একেবারে পূর্ণের দেশ। ওগো অন্তরাল বাসিনী, তুমি অন্তরালেই থাক, আর যেখা-নেই থাক, তবু তোমায় না জেনেই জানলাম, না চিনেই চিনলাম, না, দেখেই দেখলাম।

আমি কোনো উত্তর করলাম না বলেই বোধ হয় পর্দ্দাখানি নড়ে উঠল, এবং দুখানি চরণ কমল পর্দ্দার নীচে দেখা গেল। বোধ হল যেন পর্দ্দাভেদ করে সেই অপরিচিতা আমার পরিচয় নেবার চেষ্টা করছেন। তারপর আবার মধুর স্বরে হুকুম এল, "আপনি মাকে চিঠি লিখবেন ত ? দেরী করবেন না ত'।"

না দেরী না, দেরী করা আর হবে না। কি করে দেরী করব ? এমন স্থানে এমন আদরের মধ্যে মাকে যে আমার আর না হলেই নয়। মাকে আর দূরে রাখব কি করে ?

আমি বল্লাম, "আমি আজই পত্র লিখে দিচ্ছি, কিন্তু তিনি—"

"তিনি আসবেন না ? ছেলে ফেলে দূরে থাকবেন ? তা কি কখন হয় ?"

"গঙ্গাহীন দেশে—

"গঙ্গাহীন দেশ—হলই বা গঙ্গাহীন দেশ কিন্তু ছেলেকে ফেলে কি করে তিনি থাকবেন ? ছেলের চেয়ে গঙ্গা বড়। না—না সে হবে না, আপনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসুন, নইলে যা শুনিছি তাতে বুঝছি যে আপনি এ রকম করে থাকলে বাঁচবেন না—অন্ততঃ বেশীদিন এখানে টিকতে পারবেন না।"

আশ্চর্য্য ! এই অদ্ভুৎ মানুষটী অন্তরাল হতে আমার কতখানি লক্ষ্য করেছে। না জানি এর দৃষ্টি কতদূর যায়।

আমি অবাক হয়ে সেই কাঠের চেয়ার খানার ওপর কাঠের মত বসে রৈলাম। তারপর দেখলাম পা দু'খানি হঠাৎ সরে গেল অনুভব হল যেন কে আর একজন ঐ ঘরে এলেন। তিনি এসেই বল্লেন, "বাবা, তোমায় আমাদের বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে ডাকিনি, কারণ সে বিষয়ে দেওয়ান-জীই তোমায় সব বুঝিয়ে দেবেন। আর তুমি শুনিছি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান, জ্ঞানী মানুষ অবিনাশ বাবু উকিল তোমার বিনয় অনেক কথাই লিখেছেন। তাই বিষয় সম্বন্ধে আর কি বলব ? কিন্তু, বাবা, আমরা মেয়ে মানুষ আমাদের আগে চোখ পড়ে যারা আমাদের কাছে এসে পড়েছে তারা কষ্ট পাচ্ছে কিনা সেই দিকে। আমি শুনলাম, তুমি নিজে হাতে সব কর, চাকর বামুনদের কিছু করতে দাও না। তারা মুস্কিলে পড়ে আমার কাছে এসে জানিয়েছে। এ রকম করলে ত চলবে না বাবা। কেন ওদের কাজ করতে দাও না ?"

আমি হেসে ফেল্লাম, কিছু বল্লাম না—অমনি সেই আর একটী মধুর স্বরের মানুষটীর রাগের সুরে শব্দ হল, "না পিসীমা, ও রকম মানুষ নিয়ে চলবে না, ওঁর মা আছেন, হয় তাঁকে উনি নিয়ে আসুন—না হয় আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে এসে রোজ প্রসাদ পেয়ে যান। অমন করে উপবাসী হয়ে থাকবার কারো অধিকার নেই তাতে গেরস্তর অকল্যান হবে যে !"

মা বল্লেন,—মা ! হ্যা মাইত—মা বল্লেন "কেন বাবা, তোমার চাকর বামুনদের খাটতে দাওনা ? বিছনায় শোওনা—খাওনা দাওনা, কেবল চুপ করে কি ভাব ?"

এ কথার কি উত্তর দেব? আমি এসিছি সন্ন্যাসী-মহারাজগিরি ছেড়ে চাকর হতে, আমার আবার চাকর। কিন্তু এ কথা কি এরা বুঝবে? আর সে কথা বলেই বা কি হবে? তাই মৃদুস্বরে বল্লাম, "আমি সামান্য মানুষ—আমার কিই বা কাজ আছে যে ওরা করবে?"

কিন্তু একথা হতে নানা কথা, নানা অনুরোধ উপরোধ দেখাদিল। এবং তারফলে কিছুদিনের মধ্যেই আমার মা স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। কি করে? অতি সহজে। বন্ধু অবিনাশ এবং আরও কে কে গিয়ে মাকে যখন বুঝিয়ে দিলে তখন আর কি তিনি থাকতে পারেন? তিনি সব ফেলে চলে এলেন। আমিও মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম—

"বেশ হবে; মা—ছেলের চাইতে কি বিষয় বড়? ওরা চাচ্ছে তাই নেক গিয়ে, তুমি ছেলে চাচ্ছ তাই নাও।"

মাও কেঁদে কেটে আদর আব্দারে আমায় ডুবিয়ে এই এত বছরের বিরহের দুঃখ এক মুহূর্ত্তে মুছে ফেললেন। আমিও তাঁর কোলে মাথা রেখে কত কাল পড়ে ঘুমুলাম। আঃ সে কি ঘুম! হাজার বছরের জমাট নিদ্রা আমার প্রাণের ওপর যেন চেপে বসল—আমি কাজ কর্ম্ম কর্ত্তব্য সব ভুলে মায়ের কোল আঁকড়ে পড়ে রৈলাম। যে ঘুমকে ঘুম পাড়িয়ে ছিলাম সে আজ প্রতিশোধ নিলে—আমিও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম যেন আমি এতটুকু হয়ে মার কোল জুড়ে অতি সহজেই পড়ে আছি।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন অনুভব হল, মা আমার মাথাটা কোলে নিয়েহ বসে আছেন এবং মৃদু স্বরে কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমার উঠতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু তবু উঠতে হল; কারণ এমন ভাবে পড়ে থাকা ত' সহজ অবস্থায় যায় না, বিশেষতঃ অপরের সামনে। তাই উঠে বসতেই হল। কিন্তু উঠে দেখি, এ কি মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি বুঝি এমনি করে ঘুম থেকে উঠেই দেখবার! এ মূর্ত্তি দেখাই বুঝি ঘুম ভাঙ্গার সার্থকতা! মায়ের অভাবে যে মূর্ত্তি পরদার আড়ালে ছিল, মায়ের মাঝে সেই মূর্ত্তি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

মূর্ত্তি অপরূপ হাসি হেসে বল্লেন, "আমি, মা এসেছেন শুনেই, দেখতে আসছিলাম, পিসীমা বারণ করলেন। কিন্তু আপনি যে এখনো এত শিশু তা জানলে হয়ত অন্ততঃ মাস খানেক দেরী করে আসতাম!"

মা আমার হাসতে হাসতে বল্লেন, "ও আমার চির-দিনের শিশু—ওযে কি শিশু তা তোমাদের একদিন বলব মা। তবে প্রিয়, তুই কাছারী যাবিনে? তোর পেয়াদা যে এসে বসে আছে, কাছারীতে না কি কে সাহেব এসেছে, তোকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, "মা তোমায় যে কথা বলেছি তা যেন ভুলে যেওনা—কথার ঝোঁকে যাতা বলে এঁদের ব্যস্ত ক'র না। আমি আসার পর হতেই এঁরা আমায় নিয়ে যে রকম ব্যস্ত হয়েছিলেন তাতেই বলছি যে ছেলের আদর বাড়াবার জন্যে যাতা কতকগুলি কথার ঝুড়ি এদের শুনিয়ে কাজ নাই।"

আমার কথার ভঙ্গীতেই বোধ হয় হাসি দেবীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে তিনি একবার আমার দিকে চেয়ে তারপর মার দিকে ফিরে বল্লেন "এঁর বিষয় গোপন করবার কি কিছু আছে?" মা বল্লেন, "কি জানি মা, ও আমায় ওর বিষয় কোনো কথা বলতে মানা করে দিয়েছে। যাক, ভয় নেই মা, ও যা বলতে বারণ করেছে তাতে এমন কিছু নেই যা তোমাদের ভয় পাবার কারণ হবে।"

হাসি দেবী তবু হাসলেন না। আমিও বেরিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু এই হাস্যবর্ণা হাসিদেবীর ভীত মুখ যেন আমাকেও একটু অস্বস্তি এনে দিলে। মন কেবলি বলতে লাগল—ওগো হাস্যময়ি তুমি হাস! যে হাসি হতে কেউ বঞ্চিত হয় না, সে হাসি হতে আমি যেন বঞ্চিত না হই।

৬

এইবার আমার দ্বিতীয় ভয়টা কি এবং কি করে সেটা গেল সেই কথাটা বলব। কিন্তু একথাগুলো বলতে কেমন যেন লজ্জা করছে! লজ্জা! হাঁ লজ্জাইত—আমি যে একেবারে সহজ মানুষ হয়ে গিয়েছি আমার লজ্জা করবে না?

কিন্তু কিসের লজ্জা! লজ্জা এই, যে আমি যাঁর দাসত্ব করতে ফিরে এসিছি, এখানে দুদিন থেকেই বুঝলাম তিনিই আমার এই মালিক—একদিন এক অপূর্ব্ব দিনে অপূর্ব্ব অবস্থায় এঁকেই আজকের এই অন্তরালবর্ত্তিনীকেই চিরন্তরালের বাইরে রাণীরূপেই পেয়েছিলাম। বিশ্বমায়াময়ীর অপূর্ব্ব মায়ায় আজ আমি না জেনে না ইচ্ছে করে সেই ইচ্ছাময়ীর (আমারই প্রতিষ্ঠিত) প্রতীকের সেবা করতে এসে পড়িছি। জগতের চিরন্তনী ইচ্ছাময়ী যে কি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তাই দেখতে পেয়ে ভয়ে লজ্জায় আনন্দে আমি একেবারে এতটুকু হয়ে, এই আমার মন্দিরের দ্বারে এসে পৌচেছি। কিন্তু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-প্রতীক এখন গোপনতার অন্তরালে লুকিয়েছেন, আমি এখন এই মন্দিরের গোপুরমে দাঁড়িয়ে আঁধার মন্দিরের গোপনতার দিকে চেয়ে আছি। মনে আশা—মন্দিরের দরজা কি খুলবে না—দেখতে কি আর পাব না? তিরস্কারিণীর আবরণ কি সরবে না?

নাই বা সরল, তবু জানছি যে তুমি আছ সেই যে যথেষ্ট! গোপন হয়ে আমার মধ্যে আশা জাগিয়ে, ব্যথা জাগিয়ে, আমার সব জাগিয়ে আছ—আছ, এই যে আমার পরম লাভ! একেবারে সমস্ত অন্তরাল লোপ করে তোমায় পেলে যে সব দুঃখ লোপ পেত জড় হয়ে যেতাম, না না—তা চাই না। ওগো দয়াময়ি, তোমার এই দুঃখ দেওয়াই যে পরম সুখ দেওয়া। এই ধরা না দিয়ে ধরা দেওয়াই যে পরম আনন্দ দেওয়া। একেবারে মুখোমুখি দেখার ভয়ঙ্কর সুখ আর চাই না—আমি চাই না। এখন ভুল করতেই শেখাও। সত্যিকে একভাবে খুব দেখে নিয়েছি ভয়ঙ্কর নিয়েছি—সে যে সুখ দুঃখের বাইরে। ওগো, সে সত্যকে নিয়ে আনন্দ নেই। যে আনন্দের অভাবে আনন্দের তাড়নে একদিন জগৎসৃষ্টি হয়েছিল সেই আদি ভুলে ভুলে থাকতে চাই যে। ভুল? আচ্ছা ভুলই সই, তবু তাকেই চাই।

কি বলতে গিয়ে কি সব বাজে কথা লিখে ফেল্লাম। এ সব সহজ মানুষের কথা নয় যে। ওকথা আর বলব না—এই কাণ মলছি! ওগো ক্ষমা কর—আর কথনো বলব না।

আমি বলছিলাম, যে, আমার ভয় হয়েছিল, যে কোন দিন বুঝি ধরা পড়ে যাব; আমার এই লুকোচুরী বুঝি কোন দিন এঁদের কাছে একেবারে খোলসা হয়ে যাবে, আর আমার এই অপরূপ দাসত্বের খেলা ফুরিয়ে যাবে! কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, যে না—সে ভয় নেই—কারণ যাকে গর্ভধারিণীই চিনতে পারে নি তাকে কি করে এঁরা চিনবেন?—বিশেষতঃ এই অত্যন্ত সহজ বেশে। প্রথম যখন এঁদের কাছে এসেছিলাম, তখন অকেবারে সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানাশ্রয়ী সন্ন্যাসী মানুষ। তাঁরা সেই অসহজ মানুষকে এই সহজ মানুষের মধ্যে ধরতে পারবেন কি করে? তখন ছিল গেরুয়া এখন হয়েছে পেণ্টুলান, না হয় ধুতি চাদর, তখন মাথায় ছিল জটা এখন মাথায় আছে টেরী, তখন শরীরে ছিল দীপ্তি আর শক্তি, এখন সেইখানে এসে জুটেছে কান্তি আর পুষ্টি! এ দেহের মধ্যে তাকে কোথায় পাবে যাকে পাবার জন্যে শুনিছি এই এত বড় সংসারটা সমস্ত ভারতবর্ষের বৈরাগ্য-লোকের ধ্রুবলোকের দিকে চেয়ে বসে আছে। যাকে পাবার জন্য ঐ অত বড় একটা ধর্ম্মশালা হয়েছে—অন্ততঃ যাতে একটী সন্ন্যাসীও যেন দিনান্তে একবার এঁদের চোখে পড়েন। এবং আরও শুনেছি নাকি কে একজন স্বামীজী আজ কত দিন হতে এঁদের ঐ পুকুরটার দক্ষিণ বাগানের মধ্যে ষোড়শোপচারে পূজা পাচ্ছেন। তিনি যে কে এখন পর্য্যন্ত তা কেউ জানে না, কেবল একটা সন্দেহ, কেবল একটা 'হলেও হতে পারে' এই আশঙ্কার জোরে তিনি ঠাকুরের মত পূজা পাচ্ছেন। কে তিনি তা জানিনে, জানতে চেষ্টাও করিনি, কারণ সহজ মানুষ অসহজ মানুষের কাছে যেতে ভয় পাবে না কি? আমি চাকরী করতে এসেছি, দাসের কি স্বামীর কাছে অতি কাছে যাওয়া ভাল দেখায়?

আমি স্বামীজীকে দেখতে যাই নি, তার নানা কারণের মধ্যে বড় কারণটা যে কি তা বলব কি? আচ্ছা বলছি, ভাই, কিছু গোপন করব না।

এই যে অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে এসে পড়িছি এটার মধ্যে ভারি একটা লোভের জিনিষ পেয়েছিলাম। এই যে

লুকোচুরী এই যে গোপনতা, এইটাই যেন ভারি একটা লাভ বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই যে প্রভু হবার জায়গায় জেনে শুনে দাস হতে পেয়েছি এইটেই যে মায়ের আমার পরম দয়া, পরম স্নেহ দেখান। এ অবস্থা কি সহজে ছাড়া যায়—এই সহজ হবার মধ্যে এসে একটু অসহজ হওয়া এও যে আনন্দের জিনিষ, এও লোভের জিনিষ। আমি যে এখন বড্ড লোভী হয়ে উঠেছি! আমি চিরদিন অসহজকে অভ্যাস করে করে এসিছি কিনা, তাই এখানে এসেও সে আমার অজ্ঞাতে আমায় পেয়ে বসেছে, আমার এই দোষটুকু ক্ষমা কর ভাই। যেটা 'আপসে আতা হায়' তাকে আসতে দিলে কি খুবই দোষ হবে?

আর দোষই বা কি? এখন যদি চট করে বলে বসি, যে তোমরা আমাকেই খুঁজছ—যাকে খুঁজছ সে আর কেউ নয় এই চাপকান চোগা টেরী ছড়ী ধারী আমি। ঐ গেরুয়া জটা চিমটে ধারীর মধ্যে তোমাদের সেই খোঁজার বস্তু নেই, যার মধ্যে আছে তাকে তোমরা ধরেও ধরতে পারনি, পেয়েও পাবে না। একথা এখন বল্লে এঁরা কি তা বিশ্বাস করবেন? না করাই ত' সহজ, বিশ্বাস করাই ত' অসহজ। আমি সহজের সেবক হয়ে কি করে সে কাজ করতে দেব এঁদের? আর করতে বল্লেই বা তা এঁরা করবেন কেন? হয় ত বলতে গেলে ফলে আমার এই যে লুকতে পাওয়া মস্ত আনন্দ টুকু ভোগ করবার উপায় হচ্ছে তাও যে চলে যাবার সম্ভাবনা। না না, আমি বড্ড লোভী ভাই, আমি এ আনন্দের লোভ ছাড়তে পারব না এই সুখ দুঃখের এই আশা নিরাশার দোলে দোলার আনন্দ হতে তোমরা বঞ্চিত হতে বলনা। আমি পারব না, কিছুতেই না। যো আপ্‌সে আয়া উসকো আনে দিয়া—আনে দেও ভাইরা আনে দেও। আওর ইসমে জো কসুর হায় উসকো ভি জানে দেও।

বাধা দেওয়া হবে না, জোর করা হবে না। বাপ্‌রে! আবার জোরা জোরী—এই জোরা জোরীতে পড়ে এই ১৫।১৬ বছরটা কোন দিক দিয়ে চলে গেল তার হিসেবই নাই। এই ক'বছরের যে লোকসান হয়েছে তারই ঠেলা কি করে সামলাব। আবার বাধা দেওয়া? গতির বিরুদ্ধে উজান টানা? না ভাই আর নয়। এখন গা ভাসান দিয়েছি, ভাসতে শিখেছি, আর ভয় কি—এখন ভেসে চলব। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় ভাসছি এ বোধ হতে ত' এ আনন্দ হতে ত' কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারবে না। বাস্ তা হলেই হল। থাকা নিয়েই কথা যখন আছি, তখন আছি বলেই থেকে গেলাম—বাস্ আউর কেয়া?

যাক, যে কথা বলছিলাম তাই বলি, এরা আমায় কেউ চিনলে না, আমিও বেঁচে গেলাম, মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের দুঃখ আকণ্ঠ পান করতে আরম্ভ করলাম। যাঁর দাসত্ব করতে এসেছি মুক্তভাবে তাঁর দাসত্ব করতে আরম্ভ করলাম। তিনি দেখলেন না—তিনি জানলেন না তবু তাঁর কাছে তাঁর না চাওয়া পূজা পৌঁছে দিয়ে আমি বড় আনন্দে আছি ভাই। এই যে প্রতিপদে ব্যথা পাচ্ছি, প্রতিপদে মনে হচ্ছে বলি, একবার, ওগো অন্তরালবাসিনী কৃপা করে এই দীনের পূজোপহারের দিকে চেয়ে তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে সেই পরম মায়াবিনীর চোখের সুমুখে আমার নৈবেদ্যগুলো পৌঁছে দাও—কিন্তু প্রতিবারে বাধা পেয়ে ফিরে আসছি এতে কি আনন্দ কি মুক্তি! কি বেদনা কি বন্ধন! ওগো এই বেদনার বন্ধন আমার অক্ষয় হোক, তোমরা এই পরম লোভীকে পরম কামুককে এই আশীর্ব্বাদ কর!

অমর

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

শব্দ সেত অনন্ত তার বিনাশ কভু নাই
দ্রব্য দেহ শেষ হলে ও রইবে সে যে তাই।

অমর সে যে বাণীর বাণী নূতন চিরদিন
বিপুল কালের আতপ জলে হয় না কভু ক্ষীণ।
'গন্ধ' সেত অমৃতভুক্, অমর সুনিশ্চয়,
অনন্তেরি আভাষ আনে, দূরের কথা কয়।
'রূপ' যে স্বয়ং মোহিনী গো, অমর সে কি আজ
অমৃতেরি পরিবেশন করাই তাহার কাজ।

'রস' ত অমর হরির স্বরূপ নিত্য রসময়
নীরস ধরা এখনো তাঁই সরল হয়ে রয়।
'স্পর্শ' সেত অমর যাতে পাষাণ নারী হয়
শুষ্ক তরু মুঞ্জুরে যে তার কি আছে লয়?
আনন্দ সে, অনন্ত সে আকাঙ্খিত সুখ,
যুগ যুগান্ত প্রমাণ তাহার দেয় যে মানব বুক

অর্থবিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকা নাথ দত্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ক্রেডিট বা ধার

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রেডিট বা ধারের কার্য্য একান্ত আধুনিক বস্তু নহে। অতি প্রাচীন কালেও এইরূপ একটা প্রথা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বলিয়া নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে কখন যে কি ভাবে বিভিন্ন সমাজে তাহার প্রাথমিক অভ্যুদয় ঘটে, তাহার কোন প্রামাণ্য বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। আমাদের সাহিত্য ও স্মৃতি-পুরাণাদিতে ঋণদান ও বৃদ্ধি-ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। সুদের বা বৃদ্ধির উপরে যাহাদের উপজীবিকা ছিল, তাঁহাদিগকে বৃদ্ধি-জীবী, বার্দ্ধুষি বার্দ্ধুষিক বলা হইত। বৃদ্ধির অপর নাম কুসীদ। সুতরাং বৃদ্ধি-জীবীকে কুসীদজীবী বলিয়াও অভিহিত করা হইত। ঋণের নামান্তর উদ্ধার। ঋণ-দানকে অর্থ প্রয়োগ বলা যায়। উহা সমাজে এক অন্যতম বৃত্তি বা বার্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অদ্যাপি অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। যথা শুক্রনীতিতে আছে যে "কুসীদ-

কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষা বার্ত্তয়ে চ্যতে"। ধর্ম্মশাস্ত্রেও বৃদ্ধি ব্যবসায় এবং সুদের হার সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা থাকা পরিলক্ষিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার যে সকল জটিল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যে কখনও কোন প্রাচীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয় না।

অতি প্রাচীন সময়ে অন্যান্য দেশেও কোন না কোন প্রকার ধারের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কোন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতরে তাহা প্রচলিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। কেন না, সমাজের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইলে, দূরদেশবাসী লোকের সহিতও একটা আদান প্রদানের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই অতীত যুগে সেরূপ কোন উন্নতি বিহিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে ঐতিহাসিক বলে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, এইরূপ বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গ্রীকদিগের মধ্যেই ইহার কিছু বিশিষ্টতা সম্পাদিত হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান ঋণদান সমিতির ন্যায় এক প্রকার প্রতিষ্ঠান তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে যে টাকা আসিয়া আমানত হইত, তাহার কোন ঋণদানে বাহির করার প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রয়োজন মত যাহাতে আমানতকারিগণ যদৃচ্ছা অর্থ উঠাইয়া লইতে পারেন, তাহার ও বিধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়।

ইয়োরোপের মধ্য যুগে ইহুদীরাই বৃদ্ধিব্যবসায় পরিচালন করিতেন। কথিত আছে ৮০৮ খৃঃ ইটালী দেশে ল্যাম্বার্দী ইহুদী সম্প্রদায় এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। কালক্রমে তাহাদের উত্তর পুরুষগণ লণ্ডন সহরের ল্যাম্বার্দী ষ্ট্রীটে যাইয়া অভিনিবেশ স্থাপন করেন এবং তাহাদেরই প্রযত্নে তথায় ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান স্থানিক বিশিষ্টতা সম্পাদিত হইয়াছে।

১১৫৭ খৃঃ ভিনিসিয়া দেশে এক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই ইয়োরোপের আদি ব্যাঙ্ক বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আকস্মিক রাষ্ট্র প্রয়োজনে অর্থের অনটন হওয়ায় ১১৫৬ খৃঃ রাষ্ট্র শক্তি প্রভাবে এক প্রকার বল পূর্ব্বক জনসাধারণ হইতে অর্থ সংগৃহীত হয়; কিন্তু যে সুদ দেওয়ায় প্রতিশ্রুতিতে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছিল, তাহা সর্ত্তমত পরিশোধিত হইতেছে দেখিয়া লোকে সেই জোর জুলুম ভুলিয়া যায়। ক্রমে এই সুদত একটা স্থায়ী আয়ের উৎকৃষ্ট সুযোগ বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করে। এই আয় লাভ করিবার জন্য লোকের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। প্রাপকগণের যে একটা নামওয়ারী লিষ্টি বা রেজিষ্টরি হিসাব ছিল, তাহা এই ব্যাঙ্কের হাতে অর্পিত হইয়া লোকের দেনা পাওনার হিসাব রক্ষা ও হস্তান্তরের নিদর্শন ইত্যাদি লিপি করার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হয়। রাষ্ট্র বিধি করিয়া এই ঋণকেই একটা স্থায়ী আকার প্রদান করা হয়। সুতরাং সেই সঙ্গে এই সুদ ও নোটটী বা স্থায়ী আয় স্বরূপ মর্য্যাদা লাভ করে। কালক্রমে এই ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতি-পত্র সমূহ বর্ত্তমান নোটের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে। ১৪৮০ খৃঃ এবং ১৫১০ খৃঃ এই দুই সনে আরও দুইবার অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিয়া উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের কার্য্যক্ষেত্র ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফরাসীজাতির সহিত সন্ধি বিগ্রহের ফলে, ১৭৯৭ খৃঃ এই ব্যাঙ্কের ধ্বংশ এবং সেই সঙ্গে এক বিপুল অর্থ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অধ্যাপক ম্যাকক্লিউডের মতে ফ্লোরেন্স দেশীয় বৃদ্ধিজীবিগণই বর্ত্তমান যুগের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শক। তন্মধ্যে ব্যার্দ্দী, প্যারুজি, পিটি এবং ম্যাডিসি এই চারিটী সম্প্রদায় বিশেষ অগ্রণী। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড (Edward III) ব্যার্দ্দী ও প্যারুজি সম্প্রদায় হইতে ১,৫০০,০০০ ফ্লোরিণ (=১॥) কর্জ্জ গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং তাহারাও আমানতকারীদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এই ভাবে এই দুই সম্প্রদায় নিঃস্ব হইয়া পড়েন।

১৬০৯ খৃঃ আমেষ্টার্ডাম সহরে এক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে ওলান্দাজ জাতিই বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা দেশ দেশান্তর হইতে নানাজাতীয় মুদ্রা আনিয়া

ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা করিয়া দিতেন আমানতকারীদিগের মধ্যে যখন যাহার যে জাতীয় মুদ্রার প্রয়োজন হইত তখন তিনি তাহাই লইতে পারিতেন। দেশের প্রচলিত মুদ্রার আদর্শে সকল জাতীয় মুদ্রার মূল্য সমতা নির্দ্ধারিত ছিল। তাহার ব্যতিক্রমে কাহাকেও কোন মূল্য দেওয়া হইত না। দেশী কিম্বা বিদেশীয় মহাজন বা বণিকদিগের কিম্বা জনসাধারণের মধ্যে যাহার যে জাতীয় মুদ্রা ভাঙ্গাইয়া অপর জাতীয় মুদ্রা লইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইত, তিনি ব্যাঙ্কে যাইয়া উপস্থিত হইলেই ঐ নির্দ্দিষ্ট হারে তাহা বিনিময় করিয়া লইতে পারিতেন। এইভাবে উহা ব্যবসায় জগতে মুদ্রার কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে ইহারই অনুকরণে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়া কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান ব্যাঙ্কের গঠন ও কার্য্য প্রণালীই আমাদের বিশেষ আলোচ্য।

বর্ত্তমান যুগের ব্যাঙ্ক

বর্ত্তমান যুগে মুখ্য ভাবে বাণিজ্যের প্রয়োজনে মূলধন যোগাইবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। ধার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কার্য্যের একত্র সমাবেশ করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিচিত্র উপায় সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক সমূহ একাধারে ঋণদাতা ও ঋণ-গৃহীতা। জন-সাধারণ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া, তাহাই পুনরায় ঋণদানে বাহির করিয়া দেন। কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঋণ গ্রহণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক। ব্যাঙ্কের তহবিলে টাকা আমানত করিলে, উহা সুদসহ উঠিয়া আসিবে, এইরূপ বিশ্বাস না জন্মিলে কাহারও পক্ষে টাকা জমা দেওয়া স্বাভাবিক নহে। সুতরাং ব্যাঙ্ক গঠনের মূল কথা ধারের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন। এই ভিত্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত অনুষ্ঠাতাগণ একটা ব্যক্ত মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অধিকাংশ ব্যাঙ্কই সীমাবিশিষ্ট দায়যুক্ত যৌথ কোম্পানীর নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠাপিত। বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত মাতব্বরীর আশ্রয়ে ব্যাঙ্কের অভ্যুদয় একান্ত বিরল না হইলেও ইহাদের সংখ্যা এমন কম যে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া যৌথ কোম্পানীর নিয়মানুসারে সংস্থাপিত ব্যাঙ্কই সাধারণ নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ব্যক্তিগত দায়িত্বে স্থাপিত ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালন পদ্ধতি সহ যৌথ কোম্পানীর নিয়মে সংস্থাপিত ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর কোন পার্থক্য নাই। মাত্র তাহাদের গঠন পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত ব্যাঙ্কের মাতব্বরী সেই ব্যক্তির অবস্থা ও সততার উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করে। কিন্তু যৌথ কোম্পানীর নিয়মে যে সকল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয় তাহাদের ব্যক্ত মূলধন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অংশে বিভক্ত হইয়া তাহার একাংশ অনুষ্ঠাতাগণ স্বয়ং ক্রয় করেন এবং অবশিষ্ট অংশ সমূহ জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হয়। প্রত্যেক অংশের ব্যক্ত মূল্যের একাংশ মাত্র অংশীদারগণ হইতে নগদ গ্রহণ করা হয়, অবশিষ্ট অংশ অপরিশোধিত থাকিয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে তাহা নহে। প্রত্যেক অংশের ব্যক্ত মূল্যকে তার face value বা ব্যক্ত মূল্য এবং পরিশোধিত মূল্যকে paid up value বা আদায়ী মূল্য বলা হয়। বিক্রীত অংশ সমূহের মূল্যকে subscribed capital স্বাক্ষরিত মূলধন বলা হয়। ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য অংশীদারগণ হইতে একটা অতিরিক্ত ফিস লইয়া কোম্পানীর রেজিষ্টরী খরচ অংশ বিক্রয় ব্যয় ইত্যাদি নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু পরিশোধিত মূলধনের কোন অংশ এই সকল আকস্মিক ব্যয়াদি নির্ব্বাহ জন্য ব্যয়িত হয় না। স্থায়ী বাড়ী ও গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য ইহার একাংশ ব্যয়িত হইলেও উহা ক্রমে তুলিয়া লওয়া হয়। অংশীদারগণের প্রদত্ত মূলধন কোন নিরাপদ স্থানে স্থায়ীভাবে নিক্ষেপ করিয়া রাখাই নিয়ম। তাহার সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট কাগজ, রেল বা অন্য কোন নিরাপদ কোম্পানীর সেয়ার (share) ডক, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি সরকারী অর্দ্ধসরকারীর প্রবর্ত্তিত বণ্ড (bond), ডিভাঞ্চার প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তাহা স্থায়ী ভাবে নিক্ষেপ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু তাহার কোন অংশ স্থাবর সম্প্রত্তি ক্রয় করিয়া আবদ্ধ করার নিয়ম নাই এবং করা হয় না। যাহা নিরাপদ অথচ সহসা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায়, কেবল এরূপ ভাবে ও ক্ষেত্রে এই

মূলধন নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই ব্যাঙ্কের ঋণশক্তির মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি নষ্ট না করিয়া ইহার কোন অংশও জনসাধারণের নিকট ঋণদানে বাহির করিয়া দেওয়া যায় না। ইহারই মাতব্বরীতে লোকে ব্যাঙ্কে আনিয়া টাকা আমানত করেন।

অংশীদারগণ হইতে ব্যাঙ্ক সমস্ত টাকা গ্রহণ না করায় দুইটী অতি গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। লিমিটেড কোম্পানীর অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ। কোন কারণে ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ হইলে তাহার ঋণের জন্য অংশীদারগণকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা যায় না। তিনি যে পরিমাণ অংশ ক্রয় করেন, তাহার মূল্যের জন্য তিনি দায়ী। অপরিশোধিত মূলধন পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকে, তাহার উপরে তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। সুতরাং ব্যাঙ্কের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার, আকস্মিক অভাব ও বিপদ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আর নগদ মূলধন উঠাইবার প্রয়োজন পড়িলে এই অপরিশোধিত মূলধন আদায় করিয়া ঐ সকল প্রয়োজন নির্ব্বাহ হয়, সে সুবিধা না থাকিলে অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ এই অপরিশোধিত মূলধনের প্রভাবে ব্যাঙ্কের সম্ভ্রম বা ক্রেডিট বৃদ্ধি হয়। ব্যাঙ্কের ঋণের জন্য অংশীদারগণের পরিশোধিত ও অপরিশোধিত উভয় টাকাই সমভাবে দায়ী থাকায় এতগুলি অংশীদারগণের অপরিশোধিত টাকা ও ব্যাঙ্কের মাতব্বরীর ভিত্তিরূপে কার্য্য করিয়া তাহার ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহাকে ব্যাঙ্কের ঋণশক্তির দ্বিতীয় ভিত্তিরূপে গণ্য করা যায়। এই দুই প্রত্যয় ভিত্তির আশ্রয়ে ব্যাঙ্কের এই ঋণশক্তির অসম্ভব পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট কাগজ ও অন্যান্য সেয়ারাদিতে যে পরিশোধিত মূলধন নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহার সাহায্যে বিদেশে সোণা প্রেরণের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়, সে কথা যথাস্থানে হইবে। বর্ত্তমানে ইহাই বক্তব্য যে এই মূলধনই ব্যাঙ্কের ঋণশক্তির স্থায়ী ভিত্তি। সুতরাং এই স্থায়িত্ব নষ্ট না করিয়া যেমন উহা ঋণদানে বাহির করা যায় না তেমন অংশীদারগণকে উঠাইয়া দেওয়া চলে না। ফলতঃ ব্যাঙ্কের দায়িত্বকাল মধ্যে অংশীদারগণ তাহাদের পরিশোধিত টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ উঠাইয়া আনিতে পারেন না; তবে তাহারা ইচ্ছা করিলে উহা বাজারেই বিক্রয় করিতে পারেন। এই ভাবে তাহার স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাঙ্কের ঋণদান তহবিল

সমাজে নিজের কিম্বা পৈত্রিক সঞ্চিত অর্থের সাহায্যেই লোক তাহাদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধি ব্যবসায় পরিচালন করেন। কদাচিৎ কেহ কম সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া বেশী সুদে কর্জ্জ দিয়া আয় বৃদ্ধির চেষ্টা না করেন তাহা নহে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ এত কম যে উহা উপেক্ষা করিয়া, ব্যক্তিগত কারবার নিজের কিম্বা পৈত্রিক অর্থে পরিচালিত হয় বলিয়া নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায়। কিন্তু ব্যাঙ্কের অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যাঙ্ক তাহার মূলধন স্থায়ী কোন মাতব্বরীতে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার বিশ্বাসে জনসাধারণ হইতে যে আমানত গ্রহণ করেন, তাহাই কেবল ঋণদানে বাহির করিয়া দিয়া এই লগ্নির কারবার পরিচালন করেন। সুতরাং তাহার প্রত্যয় ভিত্তির স্থায়িত্ব ও দক্ষ পরিচালকগণের সততা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও কর্ম্মতৎপরতার উপরে এই আমানতের পরিমাণ ও ব্যাঙ্কের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি নির্ভর করিতেছে। ব্যাঙ্কের কার্য্য-পরিচালনের উপরে লোকের যত শ্রদ্ধা জন্মে, ততই আমানত পাইবার অবসর ঘটে। এই আমানতই ব্যাঙ্কের বিশেষ উপজীব্য।

জনসাধারণের মধ্যে নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক এই আমানত প্রদান করেন। তন্মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য লোকের হাতে যে টাকা থাকে, তাহা খাটাইয়া কিছু সুদ বা আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশা কেহই প্রায় করেন না। এই ব্যয়মুখী টাকা ব্যয়ের জন্যই হাতে রাখা হয়। তথাপি ক্রমে ব্যয় করিতে করিতে যে কাল হাতে থাকিয়া যায়, ঐ সময়ের জন্যও উহা নিরাপদে ও হাতের কাছে রাখিবার মত সুবিধা ও সুযোগ সকলেই খুঁজিয়া থাকেন। নিজের হাতে টাকা রাখিবার একটা

অশান্তি ও আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা আছে। উহা যে কতভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। চুরি, ডাকাতী, প্রভৃতি নানা কারণে অর্থসহ নিজের জীবনও বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। ব্যাঙ্কের তহবিলে উহা গচ্ছিত করিয়া রাখিলে একদিকে যেমন উহা নিরাপদ হয়, অন্যদিকে প্রয়োজন সময়ে যদৃচ্ছা উঠাইয়া লওয়া যায়; এমন কি সাক্ষাৎ ভাবে উহা গ্রহণ না করিয়াও ব্যাঙ্কের যোগে উহা ব্যয় করা যায়। এই সকল সুবিধা ও সুযোগ লাভ করিবার নিমিত্ত লোকে বায়মণী টাকা আনিয়া ব্যাঙ্কে আমানত করিয়া দেন। আর কোন সুদ দেওয়ার নিয়ম থাকিলে এই সাময়িক কালের জন্যও অপ্রত্যাশিত কিছু সুদ পাওয়া যায়।

অর্থ প্রয়োগের সুবিধা ও সুযোগ সকলের থাকে না। তন্মধ্যে যাঁহারা অন্যভাবে টাকা খাটাইয়া আয় বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে কিছু সুদ লইয়া ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া উৎকৃষ্ট উপায়। এই সুদটা তাঁহাদের বড় প্রলোভন। আর যাঁহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বাহিরে বাহিরে দিন যাপন করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ অসম্ভব, কাহারও কাহারও পক্ষে বা নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ কর্ম্মচারী এবং অভিভাবকশূন্য অনাথ বালক বালিকা এবং বিধবার পক্ষে ব্যাঙ্কই একমাত্র নিরাপদ স্থান। বালক বালিকা এবং বিধবাদের পক্ষে টাকা রক্ষা করাই অতি গুরুতর ব্যাপার। সুতরাং উহা রক্ষা ও নিরাপদ করাই তাহাদের জন্য একটা বড় প্রলোভন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে কিছু সুদও পাওয়া যায়। এই সকল লোকের টাকা ব্যাঙ্কে আসিয়া জমা হইতে থাকে।

পক্ষান্তরে ব্যবসায়ীদিগের হাতে নিয়তই বহু অর্থের সমাগম হয়। একদিকে যেমন তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় হইয়া আসিতেছে, অন্যদিকে তেমনই দেয় দায় পরিশোধিত হইতেছে। একটা জল প্রবাহের মত একদিকে আমদানী ও অন্যদিকে ব্যয় হইয়া যাইতেছে। এইরূপ বহু অর্থের আদান প্রদান শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ব্যাঙ্কের মধ্যবর্ত্তিতায় এই কার্য্য পরিচালন করিলে অতি কম সময়ে ও অনায়াসে লক্ষ লক্ষ টাকার কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়। এই সুবিধা ও সুযোগ লাভ করা কম প্রলোভনের বিষয় নহে। ব্যবসায়ীদিগের এই দৈনন্দিন আমদানী রপ্তানীর টাকাই ব্যাঙ্কের বিশেষ উপজীব্য। দৈনিক আয় হইতে ব্যয় যাইয়া কিছু না কিছু প্রায় নিয়তই সকলের হাতে জমা থাকিয়া যায়। এই টাকাই ব্যাঙ্কের তহবিলে যাইয়া জমা হওয়ায় এক বিরাট তহবিলের সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্কের মধ্যবর্ত্তিতায় কাজ করিলে, দৈনিক কার্য্যের পর যাহা ব্যবসায়ীদের হাতে জমা থাকিত তাহাই ব্যাঙ্কে তহবিলে যাইয়া জমা হইয়া পড়ে। বিশেষ ব্যবসায়ীদিগের দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য একটা তহবিল নিয়তই হাতে রাখিতে হয়। বহু লোকের নগণ্য অর্থও এক স্থানে জমা হইলে, একটা বিরাট তহবিলের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

এই আলোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে সমাজে যে টাকা অকর্ম্মণ্যাবস্থায় পড়িয়া থাকিত, তাহাই ব্যাঙ্কের হাতে যাইয়া তাহার ঋণ-দান-তহবিলের সৃষ্টি হয়।

শ্রেণী বিভাগ

এই তহবিলের টাকাকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে তাহার হিসাব পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষিত হয়। প্রথমতঃ অস্থির আমানত। দাবী করা মাত্র টাকা দিতে হইবে। সর্ত্তে যাঁহারা টাকা আমানত করেন, তাহাদের নামীয় হিসাবকে অস্থির আমানতী হিসাব বা floating account কহে। এইরূপ আমানতী টাকার জন্য প্রায়শঃ কোন সুদ দেওয়া হয় না। নূতন কোন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলে, আমানত আকর্ষণ করার নিমিত্ত এই শ্রেণীর আমানতির জন্যও কিছু কিছু সুদ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু একবার সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, সুদ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যখনই কোন ব্যাঙ্কের প্রত্যয়-ভিত্তির দৃঢ়তা, পরিচালক ও কর্ম্ম কর্ত্তাগণের সততা এবং কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও কর্ম্মতৎপরতার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তাহারা বিনা সুদেও টাকা আনিয়া আমানত করিতে থাকেন। চাওয়া মাত্র

টাকা উঠাইয়া দেওয়া হইবে, অথবা কাহাকেও টাকা দেওয়ার জন্য বরাত বা আদেশ করিলে, উপস্থিত মত তাঁহাকে টাকা দেওয়া হইবে, এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইলেই লোকে আমানত করিতে আর দ্বিধা বোধ করে না। ব্যয়মুখী সমস্ত টাকা এই হিসাবেই জমা হয়। বিনা সুদে ব্যাঙ্ক এই টাকা খাটাইতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ মেয়াদী আমানত (Deposits for a fixed period)। কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া টাকা উঠাইবার সর্ত্তে এই শ্রেণীর আমানত গৃহীত ও প্রদত্ত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য নোটিশ না দিয়া টাকা উঠাইয়া লওয়া যায় না, ব্যাঙ্ক ও তাহা উঠাইয়া দিতে বাধ্য নহেন। নোটিশের সময়ের ব্যাপকতা ভেদে সুদের হারের ইতর বিশেষ হয় এবং তদনুসারে তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণীর আমানতের উপর সর্ব্বত্র সুদ দেওয়ার নিয়ম আছে। তবে এই সুদের হার সকল ব্যাঙ্কে সমান নহে। যে ব্যাঙ্কের উপরে লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যত বেশী সেই ব্যাঙ্কের সুদের হার তত কম।

এই শ্রেণীর আমানতী টাকার মধ্যে যেগুলি প্রায় ব্যয়মুখী, যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পরে ব্যয় করিতে হইবে, সেইগুলি ব্যয় কালের তারতম্যানুসারে কম বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়ার সর্ত্তে আমানত করা হয়। আর যেগুলি সহসা ব্যয়ের জন্য টান পড়িবে না, তাহাই কেবল দীর্ঘ সময় পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়ার নিয়মে আমানত করা হইয়া থাকে। এক সপ্তাহ, এক মাস, তিন মাস, ছয় মাস এমন কি এক কিম্বা দুই বৎসর মেয়াদে নোটিশ দেওয়ারও নিয়ম অবধারিত আছে। দীর্ঘ মেয়াদী টাকা সহসা উঠাইয়া নেওয়া হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে স্থায়ী আমানত বা Permanent deposits বলা হয়। এই স্থায়ী অর্থে চিরস্থায়ী নহে; তবে উঠাইবার জন্য নোটিশ না দেওয়া পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী ভাবেই আমানত থাকিয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে এই স্থায়ী সংজ্ঞা দেওয়া হয়। নোটিশের পর কোনটী কোন তারিখে উঠাইয়া নেওয়া হইবে, তাহার স্থিরতা ও নিশ্চয়তা না থাকায়, তাহাদিগকে স্থির বা স্থায়ী সংজ্ঞক বলা যায়। ইহাকেও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইলে, নোটিশের সময় ধরিয়া শ্রেণী বিভাগ করা যায় এবং করা হইয়াও থাকে।

ঋণদান-সীমা

এই তহবিলের সম্যক ঋণদানে বাহির করা যায় কিনা, এ প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়। ব্যয়মুখী টাকার সম্যক ঋণদানে বাহির করা যায় না, একথা সহজেই মনে আসে। যাহারা নিরাপদে টাকা রাখিবার এবং ব্যয়ের সুবিধার নিমিত্ত ব্যাঙ্কের তহবিলে টাকা গচ্ছিত করিয়া রাখেন, তাঁহাদের সম্যক টাকা ঋণে বাহির করিয়া দিলে চলিবে কেন? কিন্তু আমানতের টাকা বাহির করিতে বাধা কি? দৃশ্যতঃ বাধা না থাকিলেও কার্য্যতঃ গুরুতর বাধা আছে। নোটিশ না দেওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী আমানতী টাকা ব্যাঙ্কের হাতেই থাকিয়া যায়, সুতরাং তাহা বাহির করিতে কোন প্রতিবন্ধক নাই, কিন্তু কখন যে কে নোটিশ দিয়া টাকা পাইবার দাবী করিবেন তাহার ত কোন নিশ্চয়তা নাই। নোটিশের লিখিত মেয়াদান্তে টাকা উঠাইয়া দিতেই হইবে। সুতরাং তখন কোন টাকার অভাব না হয়, তজ্জন্য কতক টাকা নিয়তই হাতে রাখিতে হয়। আর ব্যয়মুখী টাকা উঠাইবার প্রয়োজন নিয়তই উপস্থিত হয়। সুতরাং লোকের এই প্রয়োজন পূরণ জন্যও কতক টাকা হাতে রাখিতে হয়। এখন প্রশ্ন এই কত টাকা হাতে রাখিয়া কি পরিমাণ লগ্নিতে বাহির করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর লোকের আমানত করার অভ্যাস ও উঠানের উপরে নির্ভর করে। এক দিকে যেমন লোকে তাহাদের পূর্ব্ব আমানতী টাকা উঠাইয়া লইতেছে, অন্য দিকে তেমনই নূতন আমানত আসিয়া জমা হইতে থাকে। একটা জলাশয়ের মধ্যে এক দিকে জল প্রবেশ করিয়া অন্য দিক দিয়া নির্গত হইয়া গেলে, জলাশয়ের গভীরতা অনুসারে যেমন একটা পরিমিত জল নিয়তই থাকিয়া যায় তেমন এই অর্থ প্রবাহের মধ্যেও আমানতী তহবিলের একটা বড় অংশ ব্যাঙ্কের হাতে জমা থাকিয়া যায়। কারণ যাঁহারা আসন্ন ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত টাকা জমা দেন,

তাহাদেরও সকলের প্রয়োজন এক সঙ্গে উপস্থিত হয় না। এক দিকে যেমন একদল লোক টাকা উঠাইয়া লইতেছেন, অন্য দিকে আর একদল লোক আনিয়া জমা করিয়া দিতেছেন। বিশেষ কাহারও সকল টাকার এক সঙ্গে প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে কাহারও প্রায় হিসাবের টাকা একদা নিঃশেষিত হয়, তথাপি নূতন আমানত-কারীর অভ্যুদয়ে তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। আর ব্যয়মুখী টাকা এক দিকে যেমন ব্যয় হইয়া যাইতেছে, অন্য দিকে ব্যয়ের জন্য নূতন টাকা আসিয়া জমা হইতেছে। পক্ষান্তরে যে গুলি স্থায়ী সঞ্চয়, তাহাদের প্রয়োজন এক সঙ্গে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক নহে ও হয় না। কোন কোন আমানত অতি দীর্ঘ সময়েই উঠাইয়া নেওয়া হয় না। এই সকল বহু অস্থিরতার ভিতরে আমানতের একটা বড় অংশ নিয়তই ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা থাকিয়া যায়। এই টাকাই কেবল, ঋণ দানে বাহির করা যায়।

ইহারাও একটা উর্দ্ধ ও নিম্ন সীমা আছে বলিয়াছি, ব্যবসায়ীদিগের অর্থেই এই তহবিলের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। সুতরাং তাঁহারা যখন মালামাল খরিদ করিয়া গোলাজাত করিতে আরম্ভ করেন, তখন টাকা উঠাইবার জন্য ভিড় হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই তহবিলও সঙ্কুচিত হইতে থাকে। পুনরায় যখন দেশ বিদেশে পণ্য সামগ্রী চালান করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন তখন, টাকা আসিয়া জমা হইতে থাকে। খরিদের মরশুমের সময়ে তহবিল নিম্নসীমায় চলিয়া যায়, এবং বিক্রয়ের মরশুমে উর্দ্ধ সীমায় উঠিয়া পড়ে। এই দুই সীমার মধ্যে থাকিয়া তাহার তহবিলের টাকা লগ্নি করা যায়। খরিদ-মরশুমের পূর্ব্বে যাহাতে লগ্নির টাকা উঠিয়া আসে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া টাকা লগ্নি করিতে হয়।

দৈনিক ও আকস্মিক টান পূর্ণ করিবার জন্য একটা পরিমিত টাকা নিয়তই নগদ জমা রাখিয়া দিতে হয়। এই নগদ মজুতকে Bank Reserve কহে। এই তহবিল রক্ষা না করিলে ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালন অসম্ভব হয়। ইহাকে cash reserve বা নগদ মজুত ও বলা হয়। আমরা ইহাকে যদৃচ্ছা ব্যাংক মজুত বা নগদ মজুত বলিব। নিত্যনৈমিত্তিক ও দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য আমানতকারীদিগকে দাবী মত টাকা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য এই মজুত রক্ষা করা হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহার পরিমাণ আমানতীর টাকায় শত করা ৫১ টাকা হইতে ৩৫১ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরোও আলোচনা পরে হইবে।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চামৃত

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ

ঢাকা হইতে দাস রপ্তানীর ব্যবসায়

দাসত্ব প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালেও বিদ্যমান ছিল সত্য কিন্তু মধ্য এসিয়ার খিবার হাটে বা আফ্রিকার কাইরোর বাজারে যেরূপ করিয়া পশুপক্ষীর মত মনুষ্য দাস ক্রয় বিক্রয় হইত তেমনতর ক্রয় বিক্রয় প্রচলিত থাকার কোন বিবরণ প্রাচীন ভারতের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ বা কাব্য সাহিত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমাদের এই শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশের ভাগ্যে এমনই একটা দুঃসময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যখন এই দেশের হাটে বাজারে পর্য্যন্ত মানুষ পেটের দায়ে মানুষ বিক্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিবার উপায় খুঁজিতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সোণার বাঙ্গালাকে মহা শ্মশানে পরিণত করিয়া গিয়াছিল; সে শ্মশানে বিচরণ করিয়া বাঙ্গালী মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল—আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিয়া উদর সর্ব্বস্ব হইয়াছিল; নিরন্ন প্রতিবাসী দিগের ক্ষুদিত ও নিরাশ্রয় শিশু সন্তানদিগকে নির্দ্দয়ভাবে তাহাদের মৃতপ্রায় পিতামাতার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়া পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতেছিল। পর্ত্তুগীজ বণিকেরাও এই সুযোগে একটী অতি লাভজনক ব্যবসা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

ইতিহাস পাঠকের নিকট অবশ্য ইহা অবিদিত নহে যে এমনি ভাবে বাঙ্গলা মায়ের একটী দুর্ভাগ্য শিশু পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের ব্যবসায়ে সওদা লইয়া হস্তান্তরিত হইতে হইতে কালক্রমে যাইয়া ফরাসীর রাজা লুইর সিংহাসন সান্নিধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল এবং ভীষণ ফরাসী বিপ্লবের সময় নিজ অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কেবল ফরাসী দেশে নহে পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে আমেরিকার আদিম অধিবাসী ও আফ্রিকার নিগ্রো দিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীও যে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত ছিল তাহা ঢাকা জেলার তদানিন্তন কালেক্টর বা চিফ্ মিঃ এম, ডের লিখিত ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখের একখানা চিঠির মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম।

মিঃ এম্, ডে, (M. Day) রেভিনিউ কমিটির তদানিন্তন একটিং সেক্রেটারী মিঃ উইলিয়ম কাউপারকে ঢাকা জেলার এই শোচনীয় দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দিবার জন্য জরুরী উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন :—

"নিম্ন শ্রেণীর পর্ত্তুগীজেরা এই জেলার বহু নিঃস্ব পরিবারের শিশুদিগকে কলিকাতা, চুচুড়া ও অন্যান্য বৈদেশিক উপনিবেশ সমূহে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া যে একটা ব্যবসায় চালাইয়াছে—এই শোচনীয় সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমি নিম্নে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা যাহাতে এই মনুষ্য রপ্তানীর ব্যবসা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অচিরাৎ করিবেন। ইহা না করিতে পারিলে আমাদের শাসন ব্যবস্থার পঙ্গুত্ব প্রমাণিত হইবে।

এ জেলার—দীর্ঘকাল দুর্ভিক্ষ থাকায় ও জলপ্লাবনে শস্য হানী জন্য—শোচনীয় অবস্থা নিবন্ধন জেলার নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসীগণ উদরান্নের সংস্থান করিবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের সন্তানগুলিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছে এবং এইরূপ শত শত মনুষ্য বিক্রীত ও হস্তান্তরিত হইয়া স্থানান্তরে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। এই শোচনীয় সংবাদ পাইয়া আমি মফঃস্বলে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া অবগত হইলাম—মফঃস্বল হইতে নিম্ন শ্রেণীর পর্ত্তুগীজেরা নৌকা বোঝাই করিয়া শিশু বালক বালিকা (Children of all ages) দিগকে সুন্দর বনের পথে এ জেলা হইতে কলিকাতায় লইয়া গিয়া জাহাজে তুলিয়া দিতেছে এবং সেই জাহাজ সেই হতভাগ্য নির্ব্বাসিত দিগকে লইয়া বিদেশীয় উপনিবেশ সমূহে চলিয়া যাইতেছে। মাননীয় মিঃ লিগুসে গত শুক্রবার ঢাকা আসিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন—তাহার আগমন পথে তিনি এইরূপ শত শত হতভাগ্যের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এই ব্যবসায় নিরোধ করা এবং এইরূপ হতভাগ্য নিরুপায় দিগকে দেশ-বহিষ্কার (transportation) হইতে এবং দাসত্ব বন্ধন হইতে রক্ষাকরা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এই ব্যবসায় বন্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে—আমাদের শুল্ক আদায়ী কর্ম্মচারীদিগের (Custom Masters) প্রতি আদেশ প্রচার করিয়া এইরূপ লোক পূর্ণ নৌকা গুলিকে আটক করিয়া ফেলা এবং এই উপায়ে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। আমি নিজের এলাকায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম। জেলার প্রতি নৌকা চলাচলের পথে উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিলাম এবং তাহাদিগকে ঐরূপ নৌকা আটক করিয়া সদরে আনয়ন করিতে আদেশ করিলাম। মফঃস্বলের

হাটে বাজারে এবং পল্লির নিভৃত স্থান সমূহেও অনুসন্ধান জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আমার এই অনুসন্ধান ব্যর্থ হয় নাই। অন্য প্রান্তে—২ বৎসর হইতে উর্দ্ধ ৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক—৪২টী শিশুকে বিক্রেতো সহ ধৃত করিয়া আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে; আমি বিক্রেতা দিগকে আপনাদের আদেশ প্রাপ্ত হইবার সাপক্ষ কাল পর্য্যন্ত আটক থাকিতে বাধ্য করিয়াছি। শিশুগুলি প্রাণ হীন প্রায়—যে পর্য্যন্ত না তাহাদিগের পিতা মাতার খোঁজ পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি। তৎপর আপনার বোর্ড যেরূপ সাহায্য তাহাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন—সেইরূপ সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের আত্মীয়গণের নিকট প্রেরণ করা যাইবে।"

সহৃদয় মিঃ ডে এই স্থানেই চিঠি শেষ করেন নাই। এই শোচনীয় ব্যবসায়ের উচ্ছেদ জন্য উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া শেষে দেশের তৎকালীন ভীষণ দুরবস্থার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"——এই উপলক্ষ্যে এইরূপ শোচনীয় ও ত্রাশ জনক আর একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া আপনাদিকের কমিটিকে বিরক্ত করিতেছি।

দীর্ঘকাল ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও শস্যের মূল্যাধিক্য হেতু এই জেলার—বিশেষতঃ জেলার পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের শত শত—শত শত কেন বলি—সহস্র সহস্র নিরন্ন অসহায় হতভাগ্য ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে—কেহ মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে, কেহ বা পথিকের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া অসহায় ভাবে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া শরীরের শেষ শক্তিটুকুও ব্যয় করিতেছে। পথিকের অবস্থাও এমন যে এ শোচনীয় দৃশ্যও তাহাদের হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক করিতেছে না। চাউলের মূল্য ঐ অঞ্চলে ২০ সের হইতে ২৫ সের টাকায় (?)। দীর্ঘ কালের অনসন ক্লেশে ইহারা মজুরীও করিতে পারিতেছেনা, সুতরাং অন্নও সংগ্রহ হইতেছে না। আমি আপাততঃ কিছু চাউল ঐ অঞ্চলে পাঠাইলাম—দেশের ধনবান লোকেও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছে—আপনাদের কমিটিও আশা করি আমাকে আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।"

দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় সংজ্ঞা হীন পিতা মাতার ক্রোড় হইতে অপেক্ষাকৃত বলবান পুরুষেরা যে মৃতপ্রায় শিশুদিগকে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া নিজ নিজ উদরান্নের ব্যবস্থা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিত—ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। এইরূপ অবস্থায় নিজ নিজ সন্তানকেও পিতা-মাতা হস্তান্তরিত করিয়া দিয়া দায়িত্ব মুক্ত হইয়াছে। এরূপ হস্তান্তরিত বালক বালিকা সংগ্রহ করিয়াই পর্ত্তুগীজেরা ব্যবসায় চালাইয়া ছিল।

সহৃদয় ডে সাহেবের চিঠির ফলে বে-আইনি মনুষ্য বিক্রয় ব্যবসায়ের উচ্ছেদ হইলেও দাস ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা এ অঞ্চল হইতে তখন একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় নাই। দেশ প্রচলিত প্রথায় ইহার পূর্ব্বে যেমন দাস বিক্রয় হইত ইহার পরেও সেই প্রথা তেমনি বিদ্যমান ছিল—এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বৃটীশ বিচারাদালতে তাহা আইন সঙ্গত প্রথা বলিয়া গ্রাহ্য হইত।

মনুষ্য বিক্রয়ের কারণ ও দাস দাসীর মূল্য

সে কালে মনুষ্য বিক্রয় কার্য্য সাদা কাগজে একখানা দলিল সম্পাদন করিয়া হইত। মনুষ্য বিক্রয়ের যে সকল প্রাচীন দলিল পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে সে সকল দলিল পত্রের আলোচনায় দেখা যায় যে কেবল দুর্ভিক্ষে পড়িয়াই লোক আত্ম বিক্রয় ও আত্মীয় বিক্রয় করিত না। নানা কারণেই এই শ্রেণীর লোক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া পরের দাসত্ব গ্রহণ সমীচীন বলিয়া মনে করিত; সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোক পূর্ব্ব বাঙ্গালায় শূদ্র বলিয়া অভিহিত। যুগ যুগান্তরের দাসত্ব ভাব মজ্জাগত থাকিয়া এই শ্রেণীর লোককে এই ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল কিনা সমাজতত্ত্বজ্ঞেরাই তাহা আলোচনা করিবেন।

যে যে কারণে সে কালের লোক দাসত্ব-খত লিখিয়া দিয়া আত্মবিক্রয় ও আত্মীয় বিক্রয় করিত নিম্নলিখিত

কয়েকটী কারণই ছিল তাহার মধ্যে প্রধান। (১) অন্ন সংস্থান, (২) মহাজনের ঋণ পরিশোধ এবং (৩) আশ্রয় গ্রহণ।

ভীষণ দুর্ভিক্ষে অন্ন সংস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া যে সকল লোক দাসত্ব খত সম্পাদন করিত তাহারা স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া একত্রে কোনও গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিত। এক গৃহে সমস্ত গোষ্ঠীর স্থান করিতে না পারিলে স্তন্যপায়ী শিশুকে ও কন্যাকে লইয়া মাতা এক স্থানে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ক লইয়া পিতা অন্য স্থানে আশ্রয় লইত। এইরূপ স্থলে দাস দাসীর মূল্য আশ্রয়দাতার ইচ্ছামত সামান্য কিছু ধার্য্য হইত।

ঋণগ্রস্থ হইয়া তাহা পরিশোধের অন্য উপায় নাই দেখিয়া যাহারা আত্ম বিক্রয়-কবচ সম্পাদন করিত তাহাদের মূল্য ঋণের মুদ্রার সমান ধার্য্য হইত।

আত্মীয় পরিজন শূন্য নিঃসঙ্গী ব্যক্তির পক্ষে সং গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ সমীচীন বলিয়াও অনেক দাস ... গ্রহণ করিত। এরূপ স্থলে ক্রয় বিক্রয়ের দলিলে ... সামান্য মূল্য লিখা থাকিত। কেননা মূল্য সামান্যই হউক আর বেশী হউক তাহার আদান প্রদান না হইলে আদালতে সেই দাস বা তাহার বংশধরগণ ক্রীতদাস বলিয়া প্রমাণিত হইত না।

নিম্নে ২২৫ বৎসরের প্রাচীন একখান আত্ম বিক্রয় দলিলের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল। এই দলিলের দলিলদাত্রী দাসী মাত্র নয় আনা মূল্য লইয়া নিজকে পুরুষানুক্রমের জন্য দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছিল।

"ইয়াদিকির্দ্দ সকল মঙ্গল আলয়

শ্রীজগদীশ নন্দী সদাশয়েষু শ্রীমতি আভঙ্গী ... শিবরাম এস কন্য আত্মবিক্রী পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চ আগে তোমার স্থানে ॥/০ নওয়ানা পাইয়া বিক্রয় হইলাম। তোমার দাস্যতা করিবাম পুরুষি ক্রমে বহন বাহন করিতে এত ইতি সন ১১০২। ৩ তিন আশ্বিন মোকাম দৌলতপুর।"

(দলিলে সাক্ষীগণের নাম ও উভয় পক্ষের স্বাক্ষর আছে)

এই তৃতীয় কারণে অধিকাংশই নিরাশ্রয় বৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং যৌবনগত বিধবা স্ত্রী লোকেরা আত্ম বিক্রীত হইত।

ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীরা সে কালে আশ্রয় দাতা গৃহস্থের পরিবারভুক্ত স্ত্রী পুত্র কন্যার ন্যায় ছিল; তাহারা আশ্রয় দাতা গৃহস্থের পুত্র কন্যার উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব করিতে পারিত বটে কিন্তু নিজের ছেলে মেয়েদিগকে নিজের ইচ্ছায় হস্তান্তরিত করিতে, ছেলেকে অন্যত্র চাকুরী করিয়া দিতে বা মেয়েকে বিবাহ দিতে পারিত না। ক্রীত দাসদাসীর ছেলে মেয়েরা আশ্রয় দাতা গৃহস্থের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। দাসী পুত্রের বিবাহের জন্য কন্যা ক্রয়ের মুদ্রা ও দাসী কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার খরচ কন্যা পণ এ উভয় খরচের ব্যয় ও আয় আশ্রয় দাতা গৃহস্থের হইত। নিম্নে যে দলিলের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল তাহা এই উক্তি প্রমাণ করিবে।

"শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস সদাশয়েষু—

পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চ আগে আমার পৈত্রিক মনষ্য পরাণ ভাণ্ডারীর কন্যা শ্রীসুবস্তি দাসীকে তোমার নফর শ্রীমেঘু ভাণ্ডারির স্থানে বিবাহ দিবার পাচ রূপেয়া নগদ পাইয়া সত্ব ত্যাগ করিয়া দিলাম ইমনুষ্য ও ইহার সন্তানাদি হয় ইহাতে আমরা কাহারো সত্ব নাই সত্ব পরিত্যাগ করিয়া দিলাম ওন্যত্র কেহ দাওয়া করে আমি নিশাদাহি করিবাম এতদার্থে লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১১৬১ সন তিং ৭ অগ্রহায়ণ।"

এই দলিল শ্রীসুবস্তি দাসীর আশ্রয় দাতা শ্রীরাম শর্ম্মা ও শিবরাম শর্ম্মা কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস বরাবরের সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। দলিলে সাক্ষিগণের স্বাক্ষর আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্রীত দাসের পুত্র কন্যাগণ আশ্রয় দাতা গৃহস্থের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। গৃহস্থ নিজ ঋণ পরিশোধের জন্য যেমন থালা ঘটি বাটি বা গো মেষ-মহিষ বিক্রয় করিতে পারিত তেমন তাহার গৃহের দাসদাসী বা তাহাদের পুত্র কন্যা গণকেও বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে ঋণ পরিশোধ অথবা সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। নিম্নে যে দলিলের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল

তাহা আমাদের এই বর্ণণার উক্তি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবে। দলিলদাতা শ্রীশান্তরাম ঘোষ নামক অধমর্ণ রামবল্লভ নামক তাঁহার দাসকে নিজ উত্তমর্ণ শ্রীরাম নারায়ণ ভট্টাচার্য্য নিকট বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিয়া অতিরিক্ত সপ্তদশ রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই দলিলের মুন্সিয়ানা ভাষা ও ঐতিহাসিক নামাবলী বিশেষ আলোচনার বিষয় বটে।

"সস্তি সমস্ত সুপ্রশস্ত্যলঙ্কৃত সম্বিরাজমান শ্রীশ্রীযুক্তা মুদ সাহাবাদ সাহা পাদপদ্মানামভ্যুদয়িনী গৌড়রাজ্যে তন্নিযুক্ত শ্রীশ্রীমাহামুদ জঙ্গ নবাব সাহেব দত্ত প্রভুত্ব শ্রীযুক্ত হাজি মাহাম্মদ হুষেণ সাহেব নিয়োযিত শ্রীক্ত সমসেরগাজি সাহেব প্রতিপাল্য মান রোষণাবাদাকর্ষণ সুরনগর দেশীয় দক্ষিণসাহাপুরাখ্যগ্রামে শ্রীবসুদেব চক্রবর্ত্তীণঃ সভায়ামনেক মুসলমান দ্বিজসজ্জনাধিষ্ঠিতায়াং সপ্তসপ্তত্যধিক ষোড়শ শততম শকাব্দী আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যস্য সকাশাদ্রাজতীয় সপ্তদশ মুদ্রাঃসমাদায় শ্রীশান্তরাম ঘোষ নামা স্বঋণান্মোপহত্যা শ্রীরামবল্লভ নামান্মদাস মুপবিলিখিত বিক্রদাতারি সেচ্ছয়া বিক্রীতবানিতি।

শ্রীশান্তরাম ঘোষস্য।

শ্রীরামবল্লভ দাসং। উভয়নুমত্যা লিখিতং—

শ্রীকৃপারাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যেণ।

অত্র পত্রার্থে সাক্ষিণ :—

মুষলমানাঃ দ্বিজাঃ সজ্জনাঃ

(বাহুল্য ভয়ে সাক্ষিগণের নাম উদ্ধৃত করা গেল না।)

এইরূপ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের এই সুজলা সুফলা বাঙ্গালা মায়ের একশ্রেণীর সন্তানদিগের অবস্থা।

বিদ্রোহী দাসের বিচার

আশ্রয় দাতা গৃহস্থের অবস্থার উপর ক্রীত দাস দাসীগণের অবস্থা নির্ভর করিত। অবস্থার সমতা বা উন্নতি হেতু যাহাদের একই আশ্রয়ে এক পুরুষ বা দুই পুরুষ থাকিবার সৌভাগ্য ঘটিত তাহারা ততদিন সুবিধা থাকিলে আশ্রয় দাতার সহিত এক পরিবারেই থাকিত; অসুবিধা হইলে পৃথক বাড়ীতে বাস করিবার অধিকার পাইত। এরূপ স্থলে আশ্রয় দাতার খানা-বাড়ীর সন্নিকটেই তাহার গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইত, তাহাকে তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সংসার প্রতিপালনোপযোগী জমি বিনা খাজনায় দেওয়া হইত এবং বিবাহ করাইয়া দিয়া পৃথক অন্ন করিয়া দেওয়া হইত। এই স্বাধীন অবস্থাতেও তাহাদিগকে বা তাহাদের পরপুরুষগণকে আশ্রয় দাতার বা তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণের ডাকে হাঁকে উপস্থিত থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে হইত। এই ব্যবস্থা অন্যথা হইবার উপায় ছিল না। যদি কেহ তাহা অন্যথা করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইয়া স্থানান্তরে আশ্রয় লইত কোম্পানীর আইন তাহার প্রতিকারে পরাঙ্মুখ হইত না। পূর্ব্ব আশ্রয় দাতা বৃটিশ আদালতের সাহায্যে ঐ নানকার ক্রীতদাসকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করাইতে বাধ্য করিত।

নিম্নে যে দরখাস্তের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কন্যা বিক্রয় পত্রের মেঘু ভাণ্ডারী ও স্বস্তি দাসীর সন্তানগণ বিরুদ্ধে তাহাদের পৈত্রিক মনিব কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসের পুত্রবধূ ও পুত্রগণ ময়মনসিংহের দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইয়া সেই দাস সন্তান দিগের বিরুদ্ধে যে প্রতিকার চাহিয়াছেন তাহা প্রমাণিত হইবে।

"আরজি শ্রীমহেশ্বরী দাস্যা জওজে স্বরূপ চন্দ্র দেব মোক্তফা ও শ্রীযাদবরাম দেব ও শ্রীরামচন্দ্র দেব ও শ্রীরাম জীবন দেব সাকিন বোরগাঁও পরগণে নসিরুজিয়াল আরজ এহি আমার দিগের পৈত্রিক নফর মেঘু শিকদারের পুত্র আনন্দী রাম শিকদার ও ফকিরচন্দ্র শিকদার মজকুর ও তাহার শ্রীপুত্র কন্যা এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকট থাকিয়া কার খেদমত করিতেছিল ফকিরচন্দ্র শিকদার মজকুর ও তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা এখন পর্য্যন্ত আমারদিগের নিকট হাজির থাকিয়া কারখেদ মত করিতেছে আনন্দীরাম মজকুর বিদেশগামী নিরুদ্দেশ হইয়াছে এবং আনন্দীরাম মজকুরের স্ত্রী আদরী দাসী ফৌত হইয়াছে।

আনন্দীরাম মজুকুরের পুত্র জগৎরাম ভাণ্ডারী আমার-দিগের সরকারে কারখেদমত করিয়া সন ১২২৪ সনের শ্রাবণ মাসে তপে হাজরাদি সাকিন সিকান্দর নগর ভাগিয়া গিয়া বসত করিতেছে কিন্তু আমারদিগের যখন যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তখন হাজির হইয়া কারখেদমত করিয়াছে এহাতে তপে হাজরাদি সাকিন সিকন্দরনগরের নাথু শিকদার কালু শিকদার ও নালু শিকদার ও জয়া শিকদার ও জুগল শিকদার ও টকা শিকদার ও সুবল শিকদার ও কৃষ্ণরাম সরকার ও গঙ্গারাম শিকদার ও আরাধন শিকদার ও মাগন শিকদার ও বদন শিকদার ও কেবল শিকদার ও হাল সাকিন তথাকার সুবল শিকদার ও ধনা শিকদার ওরফে কেঙ্গু শিকদার ইহারা পানা দেহি ও বদশলাতে সন ১২৩২ সন ইস্তক কারখেদমত করে না এবং আমার দিগের এক্তারে আইসে না। আমারদিগের কার-খেদমতে হাজির না থাকাতে তাহার লোকসানি শালিয়ানা মবলক ৪৫৲ টাকা সিক্কা লোকসান হয় অতএব উমেদবার উপরের লিখা আসামী জগতরাম ভাণ্ডারী ও তাহার স্ত্রী চন্দ্রা দাসী ও পানা দেহেন্দা আসামী আনকে হুজুর তলপ দিয়া সাবুদ লইয়া তজবিজ করিয়া সাবেক বদস্তুর আমারদিগের কারখেদমতে হাজির করাইয়া দিতে হুকুম হয়। ইতি সন ১২৩৪ সন ৩০ কার্ত্তিক।

সদর উকীল গোপীনাথ রায়	কাজির বাড়ীর উকীল
দাখিলা ৩ অগ্রাণ	জগন্নাথ মজুমদার
সফর্দ্দ কাজি সদর আমিন।	দয়ানন্দ রায়।

এই মোকদ্দমা কাজি সদর আমিনের নিকট বিচার জন্য সোপর্দ্দ হইয়াছিল, কেননা ইহার বিষয়টী ছিল মুসলমান শাসনকালের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিচার্য্য।

বলা বাহুল্য ময়মনসিংহের কাজি সদর আমিনের বিচারে এই মোকদ্দমা বাদীর পক্ষে ডিক্রি হইয়াছিল।

এই মোকদ্দমা ডিক্রি হওয়ার কিছুকাল পরেই ১৮৪৫ সালে এই জঘন্য দাসত্ব প্রথা বৃটিশ ভারত হইতে আইন বলে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

ক্রীতদাসের মুক্তি

ক্রীতদাসের বংশধরগণ যে সেকালে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিত না, তাহা নহে; আশ্রয়দাতাকে যথোপ-যুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলে ক্রীতদাসের সন্তানগণও পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিত। পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার আসামী জগৎরাম ও চন্দ্রাদাসী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পর পূর্ব্ব আশ্রয়দাতাগণের নিকট হইতে আসিয়া ৪৫ (সিক্কা) টাকা দিয়া একখানা স্বাধীনতার ফারখতি লইয়া গিয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

সৌরভ—ফাল্গুন, ১৩২৭

সূচীপত্র।

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৬শ বর্ষ { জ্যৈষ্ঠ—১৩২৮ { ১১শ সংখ্যা

নিম্ন জাতি সমস্যা

ভারতবর্ষের সমাজে উচ্চ নীচ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, আচরণীয় অনাচরণীয় লইয়া বিচার যে অনুদারতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অতি শোচনীয় বিষয়। এই বিচারের ভিত্তিতে যে সামাজিক কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা নহে অথবা হিন্দুশাস্ত্রের নিত্যসিদ্ধ বিধি নহে। অথচ এই নিয়ম ও পাতিত্য আমাদের সমাজে লৌকিক ব্যবহারের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। তাই একজন পাশ্চাত্য মনীষী ভারতবর্ষের মানুষকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জীব বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন—homo dissidens, সে শুধু আপনাকে পরস্পর হইতে তফাৎ রাখিতেই ব্যস্ত—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বিভেদনীতি এতই প্রবল। সমস্যাটা কিরূপ ভয়াবহ তাহা এই একটা কথা বলিলেই বুঝা যাইবে, যে বাংলার অর্দ্ধেক সংখ্যায় হিন্দু অপর অর্দ্ধকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না।

এটা ঠিক সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় স্তরবিভাগ অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্র ও সভ্যতা গঠনের একটা প্রধান উপকরণ জেতা ও বিজিত জাতির বৈষম্য। আর এই বৈষম্য যে ভারতবর্ষের অতীতযুগের ইতিহাসে জাতিবিভাগের মূল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবাগত শুক্লবর্ণ আর্য্য ও আদিম কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যের বিরোধই আহার বিহার ও যৌন সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইউরোপীয় জগতে রাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া সেখানে জেতা জাতি বিজিত সমাজ হইতে আপনাকে চিরকালই পৃথক রাখিয়াছে। মধ্যযুগের chivalryর উৎপত্তি এইখানে, আর এই সামরিক শ্রেণীর নীতি ও প্রথার সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগের জীবন ও চিন্তা কিরূপ জড়িত তাহা যে ইতিহাস সমালোচনা করে সেই জানে।

আজও অভিজাতবর্গ ও জনসাধারণের বৈষম্য আমেরিকার প্রজাতন্ত্রে মাথা তুলিয়া রাখিয়াছে। সেখানে নিগ্রোদিগের প্রতি নির্ম্মম সামাজিক নিগ্রহ প্রজাতন্ত্রের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। জার্ম্মাণীতে মধ্যযুগে knights, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কৃষকের যে শ্রেণীবিভাগ ছিল তাহা এমন একটা অসামঞ্জস্য সমাজে জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহার ফলে এই আধুনিক শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে জার্ম্মাণীতে Karl Marxর এত প্রভাব। শ্রেণী-চৈতন্য সেখানে ইউরোপের অন্য দেশের বহু পূর্ব্বে জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং আজও তাহা ইউরোপের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত রাখিয়াছে। আর

রুশিয়ায় এই অসামঞ্জস্য এমনই অসহ্য হইয়াছিল যাহার ফলে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব। রুশবিপ্লব এখনও চলিতেছে, সামাজিক অসামঞ্জস্য দূর হইয়া কিরূপে আবার নূতন সমাজ বিন্যাস দেখা যাইবে তাহা নিরূপণ করিবার এখন উপায় নাই। সমগ্র ইউরোপেই এখন ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, ব্যবসায়ী ও ধনীর প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে শ্রমজীবীর প্রভুত্ব ইউরোপের সমাজ-গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

চীন ও ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা তত বেশী নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তাই যুদ্ধের ক্রীতদাস আমাদের সমাজে তত পরিচিত নহে। পরিবার, কুল, জাতি, গ্রাম ও শ্রেণীর প্রসার ও সমবায়ে প্রাচ্য সভ্যতায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ বলিয়া এখানে আর এক ভাবে শ্রেণীবিভাগ বিকাশ লাভ করিয়াছে। কর্ম্ম, ক্রিয়া ও ব্যবসায় হিসাবে শ্রেণীবিভাগ তাই আদিম বর্ণবিভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে এবং যুগযুগান্তব্যাপী শান্তিপূর্ণ কৃষিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে একদিকে যেমন শাস্ত্রবক্তা ব্রাহ্মণ জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অপর দিকে অগণন অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছিল—ইহারা কৃষিকর্ম্মের নিম্নস্তরের কাজ চালাইয়া আসিতেছে, যেমন চামার, নমঃশূদ্র, জালিক, ভূঁইমালী, ঈড়ভ, পুলেয়া, মাহার প্রভৃতি। চীনদেশে আমাদের ব্রাহ্মণ জাতির মত মাণ্ডারিণদিগের উচ্চতা স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু এদেশের মত সেখানে এত শতধাবিভাগ নাই, বিবাহ-বিচার নাই, অন্ন-বিচার নাই, সামাজিক নির্য্যাতন নাই। যে কেহ শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া মাণ্ডারীণ হইতে পারে; ব্রাহ্মণত্ব লাভের অনুরূপ অধিকার ভারতবর্ষ হইতে বহুকাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে অন্ন বিচারে ভ্রান্তবিশ্বাস অনেক সময় যে কিরূপ অযৌক্তিকতার প্রশ্রয় দেয় তাহা এখন না ভাবিয়া দেখিলে সত্য এ দেশে টিকিয়া থাকিবে কি না সন্দেহ। বিবাহ বিচার অনেক সময়ে বংশবিশেষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকিলেও জাতিবিশেষে যৌনসম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া যে দৈহিক দুর্ব্বলতা আনিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বংশমালা সংগ্রহ করিয়া অভিজাত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এই বিষয় সম্বন্ধে সমাজ-সংস্কারকের এখন আলোচনা করা প্রধান কর্ত্তব্য। কৌলীন্য কাহাকে বলে তাহাও জীব ও সমাজ বিজ্ঞানের দ্বারা বিচার করিয়া লইয়া কৌলীন্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা খেদের বিষয় পাতিত্য প্রথা। নিম্নশ্রেণীর যে অশুচি ও অসভ্যতা ভারতবর্ষের সামাজিক নিন্দা ও ঘৃণার মূল তাহা নিতান্ত অপরিহার্য্যভাবে দেশে থাকিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ মালাবারে ইহা কি নিদারুণ সামাজিক নিগ্রহের কারণ হইয়াছে তাহা বহু লেখক করুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—এ বর্ণনা পড়িয়া কোন্ হিন্দুর না লজ্জায় বেদনায় মাথা হেঁট হইয়া যায়?

হিন্দু সমাজ নিম্ন ও পতিত জাতির উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল—বর্ণব্রাহ্মণ ও পুরোহিত উঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার ভার লইয়াছে, শিব ও শক্তিপূজা তাহাদের আদিম গাছ, পাথর ও সূর্য্য পূজাকে রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, নিম্নজাতির নেতাকে রাজবংশী ও ক্ষত্রিয় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, পুরাতন totemএর পরিবর্ত্তে গোত্রের প্রভাব ও বিবাহ বিচার দেখা গিয়াছে। এইরূপে নানা উপায়ে নূতন বিধি নিষেধের বলে যে কত নিম্ন জাতি শৌচাচার লাভ করিয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে সহজে অতর্কিত ভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুধর্ম্ম ডঙ্কা না বাজাইয়া এইরূপে আপনাকে প্রচার করিয়াছে।

তাই এইটাই আরও দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুসমাজের এই কল্যাণকর অনাড়ম্বর প্রচার ও প্রসার কাজ আর সেরূপ চলিতেছে না। যাহা অস্ফুট, যাহা প্রতিরুদ্ধ, তাহাকে জাতীয়তার নূতন আদর্শের প্রেরণায় স্পষ্ট ও প্রখর করিয়া তুলা আমাদের সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। মহাত্মা গান্ধী আবেগাতিশয্যের ভিতর দিয়া সমাজপতিগণকে এই কর্ত্তব্যের দিকে আহ্বান করিয়াছেন। সেদিন ত তিনি সোজা-সুজি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, নিম্ন ও পতিত জাতির উন্নয়ন না করিয়া স্বরাজ লাভ অসম্ভব।

ভাল করিয়া নূতন করিয়া এই জাতিভেদ প্রথা গড়িয়া তুলিতে পারিলে আধুনিক সভ্যতার নানা কুফল হইতে

আমরা আমাদেরকে রক্ষা করিতে পারিব সন্দেহ নাই। এটা নিশ্চিত যে পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র নূতন আকারে দেখা গিয়াছে। পুরাতন প্রজাতন্ত্র যে আমলাতন্ত্রের রূপান্তর হইয়া শোষণ ও অত্যধিক শাসনের ব্যবস্থা আনিয়াছে তাহাতে মানুষের স্বাধীনতা ও কর্ম্মকুশলতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। নূতন প্রজাতন্ত্র ছোট ছোট সংঘ ও শ্রেণীকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে। পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবের ইহাই শিখাইবার জিনিষ।

আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতি পঞ্চায়েত যে তাহার স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি, শৌচাচার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, বৃত্তি ও কর স্থাপন করিয়া নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ও দারিদ্র্য নিবারণের ভার লইয়াছে, ইহা আমাদের জনসমাজের সজীবতার চিহ্ন। এবং ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যদি কখনও আপনার ভাবে আপনার প্রজাতন্ত্র গড়িবার সুযোগ পায় তবে এটা নিশ্চিত যে, জাতি পঞ্চায়েতগুলিকে সে তাহার প্রজাতন্ত্রের নিম্নতম স্তরে একটা অধিকার দেবেই।

মান্দ্রাজের জেলায় জেলায় নানা গ্রামে ভ্রমণ করিয়া আমি দেখিয়া আসিয়াছি যে, উৎকট ভেদনীতির প্রভাব সত্ত্বেও সেখানে গ্রাম্য পঞ্চায়েত নিম্ন শ্রেণীর লোকও বিচার করিবার অধিকার পায়, গ্রাম্য উন্নতির জন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহাতে নিম্নশ্রেণীরা চাঁদা দিয়া থাকে, নিম্নশ্রেণীর ভগবতী পুজায় মহিষের দামের জন্য ব্রাহ্মণগণও কিছু চাঁদা দেয়, এবং গ্রামের দেবতাও মাসিক 'যাত্রা'র সময়ে শূদ্রপল্লীও ঘুরিয়া আসে। জাতি পঞ্চায়েত যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ নীচ জাতির আত্মরক্ষা, তেমন গ্রাম-পঞ্চায়েতে বিভিন্ন জাতির ক্রিয়া ও স্বার্থের সমবায়। কুপ্রথা ও কুরীতি এই সমবায়কে যে লাঞ্ছনা করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু এই সমবায়ই আমাদের সনাতন প্রথা, আমাদের নিত্যসিদ্ধ রীতি। এই সমবায়কে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে এই সমবায় যাহাতে শুধু বারোয়ারী পূজায় নহে, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষণোপযোগী নৈশবিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, কৃষি ও শিল্প সমবায়ের অনুষ্ঠানে নূতন আকারে দেখা যায় তাহার জন্য নূতন করিয়া সেবা ও সাম্যের বার্ত্তা প্রচার করিতে হইবে। উচ্চ ও নীচ জাতির সদ্ভাবে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ পল্লীগ্রামে যদি প্রজাতন্ত্র আমরা না গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে দেশে ভূম্যধিকারী ও মধ্যবিত্তের শাসন প্রজাতন্ত্রের নাম ভাঁড়াইয়া টিকিয়া যাবে এবং কৃষিপ্রধান দেশে তাহার অত্যাচার অপেক্ষা আধুনিক পাশ্চাত্য ইউরোপের আমলাতন্ত্রের অত্যাচার আরও অকল্যাণকর হইবে।

পুরাতন কাটামকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই। কিন্তু দেবী প্রতিমায় নানা আবর্জনা আসিয়াছে। আমাদের মহামায়ার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য যে সভ্যতার যত বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য তাঁহার বিরাট স্নেহময় ক্রোড়ে আসিয়া স্থান পাইয়াছে। কবে কোন্ অতীত যুগে প্রথম রবির কিরণপাতের সঙ্গে তপোবনে ভারতের ভাগ্য-বিধাত্রী ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে করিতে যে সাম্যমন্ত্র শুনিয়াছিলেন তাহা এখনও তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে। তিনি সেই মন্ত্রের দ্বারা বৈষম্যের মধ্যে ঔদার্য্য, অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয় আনিবেন। যুগে যুগে ইতিহাস সে মন্ত্রকে হীনবল করিয়া দিয়াছে—পাঠান, মোগল বিদেশীর শাসনে তিনি হৃত-গৌরব হইয়া বিদেশী হইতে আত্মরক্ষা কল্পে আপনাকে কঠোর বিধানে বিধি-নিষেধের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছেন। তখন তিনি জাতীয় বিশুদ্ধি রক্ষা নিবন্ধন ক্রিয়া ও কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া জন্মাধিকারকে জাতিবিভাগের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যখন বামাচারের বন্যায় দেশ প্লাবিত এবং নানা বিদেশীর আচার ব্যবহারে ও মহাজন বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্নীতির প্রকোপে দেশ জর্জ্জরিত তখন তিনি বিবাহ-বিচার করিয়া সমাজস্থিতি রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মুসলমান কালাপাহাড় যখন দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে তৎপর তখন তিনি ধর্ম্মমন্দিরের পাহারাওয়ালার কাজ প্রবর্ত্তন করিলেন, ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে তিনি ভগবানকে পর্য্যন্ত পঞ্চগব্য দিয়া শোধনের ব্যবস্থা করিলেন। কত যুগ অতীত হইয়াছে, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বুদ্ধ, কখনও রামানুজ, কখনও কবীর চৈতন্য প্রেমের দ্বারা এই অধিকারভেদকে খর্ব্ব করিয়াছেন, প্রীতির দ্বারা সামাজিক বৈষম্য দূর

করিয়াছেন। তাহার পরও আর কত যুগ অতীত হইয়াছে, শ্রমের অধিকার আজ তাঁহার কর্ণে নির্ঘোষিত হইয়াছে, পাশ্চাত্যের বায়ু তাঁহার অপর কর্ণে ক্রমাগত শ্রেণীবিরোধ ও অত্যাচার-পীড়িত মানবের করুণ আর্তনাদ শুনাইতেছে। শূদ্রশক্তি পরশুরামের বীর্য্য লইয়া প্রকাণ্ড হাতল ঘুরাইতে ঘুরাইতে আজ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য শক্তিকে সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। বিশ্বজগতের শ্রম এই আশার বাণী প্রচার করিয়াছে যে তাহার গরম হাতলের ধূমকেতু জ্বালা পৃথিবীর জন্য মঙ্গলের মালা গাঁথিবে। কিন্তু জগৎ শ্রমের আস্ফালনে ভীত, চকিত। বিশ্বজগতের ভাঙ্গা-গড়ার বিক্ষোভের মধ্যে ভারতের শ্রেণী-গঠন ও সমবায়-প্রণালী সমাজ বিন্যাসের নূতন উপকরণ জোগাইতে পারে সন্দেহ নাই।

এইবার ভারতের ব্রহ্মবিদ্যার বেদান্তজ্ঞানের শেষ পরীক্ষা হইবে, বর্ত্তমান যুগের অসামঞ্জস্যের নিদারুণ লীলার মধ্যে আমাদের মহামায়ার ঔদার্য্য ও বিশ্বপ্রেমিকতা এমন একটি সমাজ-শরীর সৃষ্টি করিবে যেখানে এখনকার সমস্ত শতধা ভিন্ন বিপর্য্যস্ত জাতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে পরস্পরের সমবায় অনুভব করিবে। হিন্দুসমাজ তাঁহারই সেই পবিত্র শরীর, এবং ভারত-ভাগ্য-বিধাত্রীর মন্ত্রই সেই বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র।

শাস্ত্র ও স্বাধীনতা

আমরা মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির দিকটা, তার স্বাধীনতার দিকটা যতদূর সম্ভব প্রশস্ত করে' দিতে চাই—সমাজ সঙ্ঘকে অসম্ভব করে' না তুলে। কেননা সঙ্ঘেরই যে শক্তি, তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু কোন্ সঙ্ঘ শক্তিমান?—সেই সঙ্ঘ যে সঙ্ঘের প্রত্যেক অংশটি সামর্থ্যবান। অর্থাৎ—সমাজের যে শক্তি তা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উচ্ছেদে নয়, তা হচ্চে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও তাদেরই মিলনে, অর্থাৎ—প্রত্যেক ব্যষ্টির annihilation-এ নয়, সমস্ত ব্যষ্টির co-operation-এ।

এই কথাটাই আমরা ভুলে যাই যে মাতৃভূমির মূর্ত্তি গড়িয়ে পুজোই করি আর যাই করি, যেমন দেশের লোকের শক্তি ছাড়া আর কোথায়ও শক্তি নেই, তেমনি সমাজের গায়ে যত তেল সিঁদুরই লেপি না কেন সেই সমাজের সভ্যদের অন্তরে ব্যতীত আর কোনোখানে দেবতা নেই। সেই দেবতাদের শক্তিই শক্তি এবং সেই শক্তির মিলনই আসল শক্তি-ভাণ্ডার। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সমাজের এই দেবতা জাগ্রত হবে না যদি না তার মুক্তির দিক থাকে। সুতরাং এই মুক্তির দিকটাকেও আজ মুক্ত করতে হবে।

এতে সমাজপতিদের ভয় করবার কিছু নেই। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিকটা যত প্রশস্তও হোক না কেন, তারা দলবদ্ধ হবেই, সমাজ তাদের মধ্যে গড়ে' উঠবেই, কেননা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করবার ইচ্ছা মানুষের এমনি একটা সত্য যা শাস্ত্রের শ্লোকে শ্লোকে গড়ে' ওঠে নি। সুতরাং ব্যক্তিগত মুক্তির দিক প্রশস্ততর করার মানেই যে সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়া তা নয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সমাজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই এ-সত্য ধরা পড়ে।

সকল প্রকার শাস্ত্রের মোহভার থেকে আমরা মানুষকে মুক্ত করতে চাই, কেননা একাল পর্য্যন্ত কি কর্ম্ম-জগতে কি ধর্ম্ম-জগতে মানুষের যে সম্পদ জন্মেছে তা মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির দিক খোলা ছিল বলে'। হিসেব নিলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতি তাদের যা কিছু নিয়ে আজ গৌরব করছে তার অধিকাংশই লব্ধ হয়েছে দশজনের পরামর্শ সভা বসিয়ে নয়—কিন্তু এক এক

জনের আনন্দের ভিতর দিয়ে, যে আনন্দ কোনো শাস্ত্রীয় শ্লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। এই বাঙলা দেশেই আজ আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে তিন জনকে নিয়ে সবার চাইতে বেশী গৌরব করি—মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিন জনাই তাঁদের কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত মনের মুক্তির দিক দিয়ে। তা যদি না হ'ত তাঁরা যদি পদে পদে বাঙলা গদ্য পদ্যের শাস্ত্র মেনে চলতেন তবে আজ বাঙলা সাহিত্য তাঁদের বিচিত্র সৃষ্টি দিয়ে যে সম্পদশালী হয়ে চলত না তা নিশ্চয়। বাঙলা পদ্যের পয়ারের বেড়ী যদি রবীন্দ্রনাথের মনের কঠিন শৃঙ্খল হ'য়ে থাকত তবে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দান আজ কি দাঁড়াত কে জানে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর মনের মুক্তির দিকটা তাঁর পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল।

প্রত্যেক সমাজে তিন রকমের লোক আছেন। এক যাঁরা অসাধারণ, যাঁদের সাক্ষাৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ মেলে। আর এক রকম অতিসাধারণ, যারা হাজার বক্তৃতা হাজার উৎসাহ হাজার উদ্দীপনার মাঝেও বাঁধা পথে পাকা হয়েই থাকবেন। শালগ্রামের মত এঁদের শোয়া বসা সমান। তমের টানই এঁদের মধ্যে প্রবল। আর এই অসাধারণ ও অতিসাধারণের মাঝে আর এক রকমের লোক আছেন যাঁরা এমনি একটা আলগা সাম্য অবস্থায় এমনি একটা equilibrium অবস্থায় আছেন যে এঁদের একটু ঠেলে দিলে উপরে উঠতে পারেন আবার একটু টিপে দিলে নীচে নেমে পড়বেন। এঁরা একটা কিছু হলেও হতে পারেন, একটা কিছু করলেও করতে পারেন—যদি থাকে তাঁদের পিছনে সমস্ত সমাজের অনুমতি সমস্ত সমাজের উৎসাহ ও উদ্যম। এঁদের জন্যেই চাই সকল অতীতের শাসন-ভীতি থেকে, শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল থেকে সমাজের মাঝে মুক্তির বাতাস, কেননা অসাধারণরা যদি সমাজের মাথা হন তবে এঁরাই হচ্ছেন তার মেরুদণ্ড। মাথা যে সম্ভারই ব'য়ে আনুক মেরুদণ্ডের যদি তা গ্রহণ করবার ও বহন করবার শক্তি ও প্রবৃত্তি না থাকে তবে সে অসাধারণের দানের মূল্য সমাজের কাছে হ'য়ে থাকবে কেবল শূন্য।

তাই আজ আমাদের স্পষ্ট করে' বলতেই হবে যে—চাই মুক্তি। মুক্তি—সকল প্রকার বন্ধন থেকে, অর্থাৎ—সকল প্রকার মিথ্যা থেকে। কেননা মিথ্যাই বন্ধন। চাই মুক্তি সেই শাস্ত্র থেকে যে শাস্ত্রে আমাদের মনের ছাপ নেই, প্রাণের ছাপ নেই, বুদ্ধির ছাপ নেই, আমাদের কালের ছাপ নেই। আমরা আমাদের একালের জীবনকে মুক্ত করতে চাই সেকালের শাস্ত্র থেকে। কেননা জীবন হচ্ছে কাব্য আর শাস্ত্র হচ্ছে ব্যাকরণ। কিন্তু আজ আমাদের মুখের বাঙলা ভাষার গায়ে সংস্কৃতের স্পর্শ থাকলেও যেমন তা সংস্কৃত নয়, তেমনি আমরা সে কালের লোকের বংশধর হলেও আমাদের মন ঠিক তাঁদের মন নয়। সুতরাং আমাদের মন তাঁদের শাস্ত্র দিয়ে একেবারে প্রতি পদে চালিত হতে পারে না। আমরা যেন আজ মনে করতে পারি যে আমরা গরুও নই গাধাও নই—আমরা মানুষ। এই নতুন কালের মাঝে নতুন অবস্থা নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নতুন প্রশ্ন নতুন সমস্যার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে জীবনকে মঙ্গলের পথে জয়ের পথে গৌরবের পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের স্বাধীনতার মধ্যেই আছে, অতীতের শাস্ত্রের মধ্যে নেই।

—সবুজ পত্র, বৈশাখ, ১৩২৭।

মৌন প্রেম

[অধ্যাপক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

কেন মুখ পানে চেয়ে রও ?
তোমার মনের কি গোপন কথা
চোখে চোখে তুমি কও !
কত সাধ যেন হৃদয়ে তোমার,
কত আশা যেন প্রাণে
শত সাধনার গভীর মন্ত্র
শুনালে তোমার গানে !
আমারে দেখিয়া কেন
আয়ত আঁখির পাতায় পাতায়
ব্যথার অশ্রু হেন ?
দু'হাতে তোমারে আনি আগুলিয়া
বক্ষে আমার ধরি'
লাজ-গুণ্ঠনে আবরি বয়ান
দূরে চলে যাও সরি !
কথা কও একবার
লো মোর মৌন মানস প্রতিমা
সকল হৃদয়-সার !
বিনয় বচনে প্রবোধ মান না
অভিমানে পাও ব্যথা

নয়ন মুছাতে নয়নের জল—
তবু নাই মুখে কথা ?
তোমার দীরঘশ্বাসে
পরাণ-আমার ফেটে যায় ওগো
অন্তরে গ্লানি আসে।
একবার তুমি মুখ ফুটে বল
কি চাই আমার কাছে—
তুমি যা' নিয়েছ তা'র বাড়া আরও
আমার কিছু কি আছে ?
কোনও দিন অজানিতে
স্বপনের ঘোরে মোহের মায়ায়
বেদনা দিয়েছি চিতে ?
মৌন প্রেমের মধুর মহিমা
ভুলায় পাগল মন,
অকথিত বাণী কত কাল আর
নীরব র'বে এমন ?
সহিতে পারি না আর
আমারে লুকায়ে হৃদয়ে তোমার
রুধিয়া দিলে কি দ্বার ?

ভাগ্যের বিদ্রূপ

১। হরিষে বিষাদ

বিগত যুদ্ধের সময়ের ঘটনা।

বৃদ্ধ লেফ্‌টেনান্ট রেনাল্ডের বাড়ী সান্ধ্যভোজ উপলক্ষে অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছে। বিখ্যাত সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা মিঃ—ছুটীতে বাড়ী আসায় তাঁরও নিমন্ত্রণ হয়েছে।

বাড়ীর গৃহিণী তাঁকে বল্লেন,—'মিঃ ই—আপনার ফটোগ্রাফের খাতা আনুন, যুদ্ধস্থলের নূতন কি ছবি তুলেছেন আমার নিমন্ত্রিত বন্ধুদের দেখান—এঁদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন, কাজেই এঁদের ছবি দেখে আনন্দ হ'তে পারে—'

মিঃ ই—তাই করিলেন। চারিদিকে গৃহিণীর মহিলা

বন্ধুরা ঘিরে বসলেন। মিঃ ই—ছবি দেখাতে লাগলেন। একটা ছবি তিনি কিছুতেই দেখাবেন না,—পাতা উল্টে গেলেন। দর্শকেরা বল্লেন,—'কেন মিঃ—এটা দেখালেন না?'

মিঃ—না, ওটা দেখে কাজনি।

দঃ—কেন? বাধা কি?

মিঃ—ওটা গত যুদ্ধের পর ক্ষেত্রের ছবি; কত মৃত সৈনিকের ছবি আছে, দৃশ্য বড় কষ্টকর—আজ আনন্দের দিনে দেখে কাজনি।

দঃ—না না, তা হবেনা, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি কখনো দেখিনি, দেখাতেই হবে।

মিঃ—কিন্তু···আপনারা হয়তো পছন্দ করবেন না।

দঃ—খুব করবো।

নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে তিনি দেখালেন। দেখেই একটী যুবতী চীৎকার করে উঠে, মূর্চ্ছা গেলেন। ছবিতে তাঁর নববিবাহিত স্বামীর মৃতদেহের চিত্র ছিল। অভাগিনী এখনো এ খবর পায় নাই।

২। ভাবে এক ঘটে আর

ভদ্রলোক সেদিন খুব মনের ফুর্ত্তিতেই ছিল। মকদ্দমায় প্রায় ৩০ হাজার টাকা জিতেছে। মনে বেশ শান্তি ও আনন্দ। রাত্রি প্রায় ২ টার সময় হোটেলের খিড়কি-বাগান দিয়ে বেরিয়ে বাড়ী যাবে বলে চলেছে। হঠাৎ অন্ধকারে বাগানে পথের পাশে পায়ে কি একটা ঠেকে—আলো জ্বেলে দেখে সেদিন হোটেলে জুয়াখেলায় যে হেরেছে তারই মৃতদেহ—পাশেই একটা পিস্তল পড়ে আছে। ব্যাপার স্পষ্ট। লোকটা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে সে খেলায়। বুকের জামায় একটা পত্র আলপিনে গাঁথা। তাতে লেখা—'প্রিয়তমে ও প্রিয় বৎসগণ! আমায় ক্ষমা করো, আমি তোমাদের পথে বসালাম, ভগবান মুখ চাইবেন তোমাদের—আমি অযোগ্য—'

ভদ্রলোক পত্রটী পড়ে' এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কত কথাই মনে পড়লো। 'কারো পৌষমাস কারো সর্ব্বনাশ।' 'কারো দুধে চিনি কারো শাগে বালি!' এ কি ভগবানের খেলা! ভাবতে ভাবতে—

হঠাৎ তিনি পকেট হ'তে একখানি ৫০০৲ টাকার নোট্ মৃতের পকেটে গুঁজে দিলেন। তাতে লিখলেন—'স্ত্রী ও ছেলেদের জন্যে'—যখন নোটটা গুঁজে দিচ্ছেন ঠিক সেই সময়েই দুজন কনষ্টেবল তাঁকে দুদিক হতে ধরে ফেল্লে—'খুন ও লুঠ এক সঙ্গে—উঃ কি ডাকাত!'

আদালতে ভদ্রলোক আত্ম সমর্থন করে সব কথা খুলে বল্লেন। জজ রেগে বলে উঠলেন—'উঃ! কি ধড়ীবাজ, খুন লুঠ করে আশ মিটেনি, আবার বাচাবার নামে বদনাম। ছিঃ—ছিঃ—এমন মহাপাতকী তুমি?' (আদালতে জজের প্রতি সবব সাধুবাদ। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—শাস্তি!)

৩। মারে কৃষ্ণ রাখে কে!

একমাত্র ছেলে যুদ্ধে গিয়েছে। বুড়ী বিধবা মা মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর বুকের ব্যামো। ডাক্তার বলেছে, সামান্য একটা ধাক্কায় প্রাণহানি হ'তে পারে। তাঁর মেয়ে সেই জন্যে যুদ্ধের সংবাদ যাতে আছে এমন খবরের কাগজ তাঁকে পড়তে দিতেন না।

কিন্তু মায়ের মন। তিনি চাকর দিয়ে লুকিয়ে পাড়া হতে কাগজ এনে মেয়ের অনুপস্থিতিতে পড়তেন। Casualty List দেখবার সময় হাত কাঁপতো, বুক ধড়ফড় করতো, পাছে পরের নামটাই ছেলের হয়।

এমনি করে দিন যায়। হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, বুড়ী চেয়ারে কাত হয়ে মরে পড়ে আছেন। পায়ের তলায় খবরের কাগজ একখানা।

দেখা গেল খবরের কাগজে Casualty List বেরিয়েছে, এবং তাতে বৃদ্ধার ছেলের নাম—কিন্তু যে থাকে সে নাম তার হেডিং হচ্চে—'Officers returning Home.'

৪। চোরার মন

লোকটা বসে পার্কের ভিতর গাছতলায় একটা বেঞ্চের উপর। বদখদ্ চেহারা, চোখদুটো লাল, ধারে কালিপড়া; চুল উস্কো খুস্কো, নাখেতে-পাওয়া মূর্ত্তি।

বাইরে ধারের ফুটপাথ দিয়ে একটা ছোকরা খবরের কাগজ ফিরি করে চলেছে। লোকটা লাফিয়ে উঠে ডাক দিল, 'এই কাগজওলা'—কাগজওলা এল। লোকটা একটা কাগজ নিলে; দাম দিতে হবে এক আনা, সঙ্গে আছে সিকি; ছোকরার কাছেও ভাঙ্গানি নেই। লোকটা অধৈর্য্য হয়ে বল্লে, change নেই হ্যায়! আচ্ছা নেই মাঙ্তা, যাও—সিকি দিয়েই কাগজ কিনলো।—কম্পিত হাতে কম্পিত বুকে বেঞ্চিতে ফিরে গিয়ে বসে আতিপাতি কি খবর খুঁজতে লাগলো। খানিক প'র হঠাৎ উত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো, 'ধন্য ভগবান, খুব রক্ষে করেছ, তোমার দয়া—করোনারের verdict আত্মহত্যা। বাঁচলাম, ধন্য ভগবান খুব রক্ষা করেছ।'—

তার পরেই মূর্চ্ছা!

ব্যাপার এই—লোকটা খুন করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

৫। অতিভাবনা

সে ছিল কলেজের ছাত্র। গরীবের ছেলে, বড়লোকের মেয়েকে ভালবাসে। অনেক দিনের ভালবাসা; কিন্তু মেয়ের বাপ বলেছে পাশ না হলে বিয়ে দেবেনা। এইবার শেষ chance; দুবার ফেল হয়েছিল। এবারের উপর জীবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ.আশা আকাঙ্খা নির্ভর করছে। ছেলের বাপও বলেছে, 'পাশ না হলে এই পর্য্যন্ত, নিজে করে খেও—'

একজামিন্ চল্‌ছে। রোজ সন্ধ্যা বেলা দুজনে দেখা হয়। প্রণয়িনী জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন হল আজ?' সে বলে 'সুবিধে নয়।' একজামিন শেষ হল। সে জিজ্ঞেস করলে ব্যাকুল হয়ে, 'কেমন হল মোটের উপর? এবার হবে তো?'

উঃ—নাঃ, সবচেয়ে খারাপ—কোনো আশা নেই। যুবতী আর্দ্র চোখে, মৃদুকণ্ঠে কানে কানে বল্‌ল—'না এবার হবেই—অত ভেঙ্গে পড়না, খবর না বেরোনো পর্য্যন্ত মনটাকে সুস্থ রাখ—'

সে শুধু ম্লান হাসি হাস্‌লো! ফেলের বিভীষিকায় তখন তার অন্তর-আত্মা শিউরে উঠছিলো। ভয়মাত্রা এমনি বেড়ে উঠ্‌লো যে সে হঠাৎ একরাত্রি নিজেকে গুলি মেরে দিলে।

যথাকালে পরীক্ষার সম্বাদ বেরুলো। সে এবার পাশ হয়েছিল।

৬। কে ভাঙ্গে আর কে গড়ে

খুড়োর ছেলেপিলে ছিল না; ভাইপো উত্তরাধিকারী, ভাইপো কিন্তু খেয়ালী, নিজের জিদে চলে। সে চিত্রবিদ্যা শিখতে চায়; খুড়ো বলে ব্যবসা করো—সে রাজী নয়। এই নিয়ে ঝগড়া।

খুড়ো ডেকে পাঠালেন; ভাইপো এলে বল্লেন, 'ও সব হবে না—যদি নিজের জিদে চলো তবে এক পয়সা দেবোনা, পুষ্যিপুত্তুর নেবো—'

ভাইপো—'তা বেশ, আমি কিন্তু ব্যবসা করবোনা, ও আমার ভাল লাগে না—পারি ছবি এঁকে করে খাবো—না পারি চাইনি—'

খুড়ো—'তবে রে বজ্জাৎ ছেলে! ছুঁচো ব্যাটা—দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা—'

বলেই খুড়ো উঠ্‌লেন। উইল বার করে এনে বদলাবেন। বার করাও হলো—

'তা হলে এই কথাই ঠিক্?'

ভাইপো—হ্যাঁ, আমি আমার পথ ছাড়বোনা, আপনার বিষয় চাইনি—

খুড়ো রেগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ধপ্ করে পড়ে গেলেন। Appoplexyর আঘাতে মারা গেলেন। উইল বদলানো হলনা; ভাইপোই বিষয়ের মালিক থেকে গেল।

কে ভাঙ্গে আর কে গড়ে!

অমলা

অনুরূপা দেবী

(১১)

দুইদিন পরে রাজেন্দ্র-ডাক্তারের আবাসের সম্মুখের অঙ্গন যখন তাহার ঘোড়ার পায়ের শব্দে এবং হ্রেষারবে সচকিত হইয়া উঠিল তখন দুইদিন পরে গৃহাগত প্রভুর পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্তসমস্ত ডাক্তারের পরিচারক ব্যগ্রভাবে বাহিরে আসিয়া দেখিল রমেনবাবু তাহার অগ্রেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া প্রভুর [illegible] লইয়াছেন। প্রভু ঘোড়া হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িলেন এবং সহিসের হাতে ঘোড়া ও চাবুকের ভার দিয়া উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ঘরের দিকে চলিলেন দেখিয়া ভৃত্যপ্রবর তখন তাড়াতাড়ি সহিসের হস্তচ্যুত ঔষধের বাক্সটা তুলিয়া লইয়া উভয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

তাহার সাহায্যে ধড়া চূড়া ত্যাগ করিতে করিতে রাজেন্দ্র দুই এক কথায় তাহার ও পরের কুশল জানিয়া লইয়া রমেনের পানে চাহিয়া বলিল "তারপর? গ্রামের কি খবর?"

"এদিক্ সব ভাল, কিন্তু নিজের খবর আগে দাও দেখি। নপাড়া তো মোটে ক্রোশ তিনেকের পাল্লা—সেখানে গিয়ে গোটা গোটা দুদিন কেটে গেল, এর অর্থ কি?"

"অর্থমনর্থং—অর্থই অনর্থের মূল জাননা! ওখান থেকে গোবিন্দপুরের একটা বড় রকম ডাক পাওয়া গেল। মোটারকমের পাওনা, কাজেই আবার ক্রোশ কতক গমনাগমনের পাল্লাতেই পড়া গিয়েছিল।"

"গোবিন্দপুর? আঃ—খাঁটি সাত ক্রোশ এখান থেকে। এই বিশ্রী সময়ে মাঠে মাঠে চষাজমির আল ভেঙে নালা ডোবার উপরে এই ঘোড়দৌড়? তারপর স্নান আহারের অনিয়ম—"

"পথের কথা যা বলছ বরং নিজেদের দেশ ব'লে অনেকটা ঢেকে ঢেকেই বলছ, কিন্তু স্নানাহার?—না মশায় শত্রুকেও তোমাদের এই সব গ্রামের সে অপবাদ দিতে পারবে না। জামাই আদরেই এ দুদিন কাটান গেছে। নৈলে অন্ততঃ কাল সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুতে পারতাম। তোমাদের এদিকে বড় ডাক্তার কি ইন্‌স্পেক্টর যার বাড়ী [illegible] করেন তিনি নিজেকে রাজসম্মানিত বলেই যে মনে করেন। রোগীর কথা তলায় প'ড়ে রইল কাল পাঁঠা পোলাওয়ের ধুম কি?"

"আর সেই পাঁঠা পোলাওয়ের লোভেই বুঝি দিন-রাত্তির কাটিয়ে এসেছ বোঝাতে চাও আমায়? রোগীটি কেমন? আর ছুটতে হবেনাত ফিষ্টের লোভে?"

"দিন দুই বাদে আর একবার হয়ত ডাক পড়তেও পারে, তবে সামলে গেছে বলেই মনে করি। যাক্ দিদিমা কেমন? জুনিয়র ডাক্তার সাহেব এ দুদিন—"

"একেবারে ভেড়াকান্ত ব'নে গেছেন। অমাবস্যার পালায় আবার তাঁর জ্বর দেখা দিয়েছে। সর্ব্বাঙ্গে বাতের ব্যথা বিষম আঁটিয়ে উঠেছে। তবে বাঁ দিকটাতেও সে ব্যথা তিনি অনুভব করছেন।"

"পক্ষাঘাতের পক্ষে এটা শুভলক্ষণই বলতে হবে। হয়ত এ আগন্তুক রোগটা তাঁর এ বয়সে যতটা সারাতে পারা সম্ভব ততটা সের যাবে, কিন্তু অন্যান্য অবস্থায় বেশীদিন যে বাঁচবেন এমন মনে হয় না। যাক্—কি ব্যবস্থা করেছ?"

"বাতের ও জ্বরের যা দাওয়া চলে মোটামুটি ভাবে তাই, আর ব্যাটারী বন্ধ রেখেছি।"

"ভালই। এইবার স্নানাহার সেরে নিদ্রার উদ্যোগ

দেখি। পরের বাড়ীতে আহারটা একরকম চল্‌লেও নিদ্রাটা ভাল চলেনা হে। ত রাত্রিকে পুষিয়ে নিতে হবে।"

"নাও ভাই, বিকেলে ওঁকে দেখ্‌তে যেও একবার। আমারও কিছু কথা আছে।"

"সব কাল, আজ আর কিছুনা।"

পরদিন অনেকটা বেলা হওয়ার পরে রমেন একটু ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল "এখনো যাওনি ?"

রাজেন্দ্র আলস্য ত্যাগ করিয়া বলিল "এইতো সবে শয্যাশ্রয় ত্যাগ কর্‌লাম। চাটি পান না করলে চরণদ্বয় একেবারে অচল, শরীরটিতত্তোধিক।" হাতমুখ ধুইয়া মাত্র চায়ের পেয়ালায় তাহাকে চুমুক দিতে দেখিয়া রমেন বলিল "ওকি—কিছু খেলেনা ?"

"খিদে একেবারে নেই, দুখানা বিস্কুটও খেতে ইচ্ছে হচ্ছেনা।"

"পরশুদিনের পাঁঠা পোলাওয়ের জের নাকি ?"

"হ'তে পারে। সর্ব্বাঙ্গে এমন ব্যথা বোধ হচ্চে, দাওত হে একটু কুইনাইন আর ষ্টিমুল্যাণ্ট ফোঁটাকতক।"

রমেন উঠিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে করিতে বলিল "ঘোড়সওয়ারের অশেষ দুর্গতি। চোদ্দ পনেরো ক্রোশ চলা—একটু আধটু ব্যথা বোধ হবে বৈকি।"

"চল এইবার বেরুনো যাক্। দিদিমাকে দেখে রায়দের ওখানে একবার যেতে হবে, ডেকে গেছে।"

অমলার দিদিমার জ্বর তখনো ত্যাগ হয় নাই। মালিশ ও ফোমেণ্টেশনের পর তিনি হাতে পায়ে ফ্লানেল জড়ানো অবস্থায় শুইয়াছিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া একটু দুঃখের সহিত হাসিয়া বলিলেন "এ ভাঙা ছাত আর কত মেরামত ক'রে খাড়া রাখবে দাদা তোমরা ? রমেনকে এত বল্‌ছি ওরে আর ওষুধ দিতে হবেনা, তা শুনছেনা। তোমারও হাতে ধরে বলছি আরনা, নিজেরাও এইবার রেহাই নাও আমায়ও দাও ভাই।"

সে কথা কানে না করিয়া রাজেন্দ্র দিদিমার জ্বর পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং অন্যান্য শারীরিক অবস্থার কথা রমেনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লাগিল। শেষে ব্যবস্থার কথা বলিতে গেলে দিদিমা দার্ঢ্যতার সহিত বলিলেন "না দাদা আর আমি তোমাদের ওষুধ খেতে পারিনা, দুদিন একটু টোট্‌কাটাটকি খেয়ে দেখে ভগবানের নাম নিয়ে প'ড়ে থাকব [illegible] তোমাদের কথা আর শুনব না।"

রাজেন্দ্র তখন প্রতিবাদ করিয়া বলিল "তাহলে এতদিনের চেষ্টা সবই মিথ্যা হয়ে যাবে জানবেন। ওষুধ আপনাকে খেতেই হবে আরও কিছুকাল।" রমেনও তাহার কথা অনুমোদন করিতে যাইবামাত্র দিদিমা জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন "না ভাই, তুমি আর আমাদের জন্যে এমন করে নিজের কাজ ক্ষতি ক'রনা। পরের জন্য পরে দিন [illegible] এমন ব্যস্ত থাকলে লোকে কি বল্‌বে! [illegible] দিদিমাই বল আর যা-ই কর দাদা পর [illegible] আপন বলবেনা।"

রাজেন্দ্র একটু বিস্মিতভাবে রমেনের মুখের পানে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র রমেন শুষ্ক মুখে মাথা হেঁট করিল। রাজেন্দ্র বুঝিল ইতিমধ্যে কিছু একটা হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে কি তাহা আন্দাজ করা শক্ত। যাহা মনে করা চলে তাহাতে বেচারা রমেনের উপর ইহাদের এ চাপ দেওয়া কেন ? তবে কি প্রকারান্তরে রাজেন্দ্রই ইহাদের লক্ষ্য ? রমেনকে উদ্দেশ করিয়া রাজেন্দ্রকেই একথা জানানো হইতেছে যে পরের অধিক আত্মীয়তায় তাহাদের সম্ভ্রম হানি হইতেছে। এ বাটীর ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে কেহ কোথাও একেবারে লুকাইয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব বেশ জানা যায়, কিন্তু আজ অমলা তাহার আসিবার পূর্ব্বেই এমনভাবে সরিয়াছে যে তাহার যেন উদ্দেশই নাই। কিন্তু বেচারা রমেন! নির্দ্দোষীর উপরে এ দৌরাত্ম্য কেন ?

রাজেন্দ্র শুষ্কভাবে একটু হাসিয়া বলিল "আচ্ছা রমেনের সঙ্গেই নাহয় আপনার আড়ি হয়েছে দিদিমা আমার সঙ্গে তো হয়নি। ডাক্তার তো কখনো আপন বা পর হয়না। আমার ওষুধ খেতে আপনার তো এ বাধা নেই।"

দিদিমা গম্ভীর মুখে বলিলেন "তোমায় তো আমরা

ডাক্তার বলে মনে করিনা রমেনের বড় ভাই বলেই জানি। তাই এত দৌরাত্ম্য, এত আবদার করি দাদা। সেই রমেনকেও যখন পর মনে করে চল্‌তে হ'ল আমাদের তখন তোমার ওপরেও আর কিসের জোর? ঠাট্টা নয় দাদা আর আমি ওষুধ খাবনা। মাঝে মাঝে এক এক বার খবর নিও তাহ'লেই আমাদের ঢের হবে।"

"কিন্তু আপনি রোগী, জ্বরের উচ্ছাস এখনো আপনার মাথার মধ্যে রয়েছে। আপনার কথাতো ডাক্তারের মানলে চলেনা, আপনি ওকে একবার ডাকুন। ওর মতটা জেনে যাওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।"

দিদিমা সবেগে বলিয়া উঠিলেন "ও আবার কি বল্‌বে ওর মত আমার মত কি ভিন্ন। আমি আর ওষুধ খাবনা।"

রাজেন্দ্র ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল "আচ্ছা তাহলে আমরা আজ যাই, দরকার বুঝলেই ডেকে পাঠাবেন।" বলিয়া উঠিয়া পড়িতেই রমেনও শুষ্কমুখে সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। উভয়ে গৃহের বাহিরে আসিয়া অঙ্গনে পা দিতেই দেখিল পার্শ্বের ঘর হইতে অমলা বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় বন্ধুর চলৎশক্তি যেন রোধ হইয়া গেল। অমলাকে এমন বেশে কেহই কখনো বোধ হয় দেখে নাই। সে পাড়ওলা কাপড়ও পরিত এবং হাতে কাঁচের চুড়ীও ছিল বটে—কিন্তু সেগুলা যেন নিজের কুণ্ঠায় নিজেরাই অমলার সঙ্গে মিশিয়া থাকিত। তাহার মলিন বস্ত্রের সে পাড় বুঝি কাহারো চোখেও পড়িত না। আজ সে একটী পরিষ্কার চওড়া লাল পাড়ের কাপড় পরিয়াছে। সদ্য স্নান সিক্ত সুরুক্ষ কেশ রাশির উপরে সে পাড়টী বেড়িয়া আসিয়া মাঝখানে দ্বিধা বিভক্ত সূক্ষ্ম সিথার উপরের উজ্জ্বল সিন্দুর রেখাটিকে যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কপালেও একটা সিঁদুরের বড় টিপ্। অমলা সিঁদুর পরিত কিনা তাহা বোধহয় গ্রামের লোক এপর্য্যন্ত কেহই জানিত না। রাজেন্দ্র ও রমেন নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিল অমলা তাহাদের নিকটে আসিয়া সহসা নতমুখ হইল। চারিদিকের আরক্ত রাগের মাঝখানে তাহার অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ পেলব মুখ ও অর্দ্ধনিমিলিত সুদীর্ঘ নয়নের ম্লান দৃষ্টি একবার যেন রঙে রঙ্ মিলাইল। প্রথমে রাজেন্দ্রকে পরে রমেনকে এক একটী প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া আর সে কিছু দাঁড়াইল না। কাহাকেও একটি কথা কহিবার পর্য্যন্ত অবকাশ না দিয়া একেবারে দিদিমার ঘরে গিয়া ঢুকিল। কথা কেহ বোধ হয় কহিতেও পারিত না, কেননা রাজেন ও রমেন উভয়েই শেষ পর্য্যন্ত একেবারে নিস্পন্দ ভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল।

রায়েদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া রাজেন্দ্র দেখিল রমেন তাহারই বসিবার স্থানে বসিয়া আছে। রাজেন্দ্রও আসনের একদিকে বসিয়া বলিল "বাড়ী যাবেনা?"

"যাব একটু পরে।"

"নাওয়া খাওয়ার সময় হল যে, তোমার চাল নিতে বলি বামুন ঠাকরুণকে?"

"বল।"

"তাহলে স্নান ক'রে নাও।"

"নিচ্ছি একটু পরে।"

রাজেন্দ্র ক্ষণেক তাহার পানে চাহিয়া বলিল "এই দুদিনের মধ্যে কিছু কি ঘটেছে বল্‌তে পার?"

"দেখতেই তো পেলে।"

"কি দেখ্‌তে পেলাম? দিদিমার অদ্ভুত ব্যবহার?"

"ওর একটী কারণ আছে, বল্‌ছি সে কথা। আর কিছু দেখ্‌লেনা কি? অমলাকে দেখ্‌লে না?"

"ওর প্রণাম করার কথা বলছ?"

"সেতো বিদায়ের প্রণাম। আমাদের মতের ও প্রমাণের বিরুদ্ধে তার নিজের যুদ্ধ সাজ লক্ষ্য করলে নাকি? আমাদের সে বুঝিয়ে দিলে না কি যে সে কুমারী নয় সে সধবা। তাকে আমরা সেসব কথা বলে অপমান করেছি, পাপ করেছি।"

রাজেন্দ্র নীরবেই রহিল। একটু পরে যন্ত্রণা বিদ্ধ স্বরে রমেন বলিল 'কিন্তু কেন আর এ তিরস্কার? না বুঝে না হয় একটা ভুল করে ফেলেছি তার কি ক্ষমা নেই? আমিতো এ কথা ভাল করে বুঝতে পারার পরে—সেদিনের পরে—আরতো কিছু করিনি।

কোন প্রসঙ্গগুনা। যে টুকু অধিকার সে স্বেচ্ছায় দিয়েছে সেই টুকুর মাত্র আমি উপযুক্ত থাকতে চাই। তাতেও কেন এত আপত্তি? দিদিমা এই ক'দিন ক্রমাগত আমার বিয়ে করবার জন্ত অনুরোধ করছেন। এনাহ'লে তাঁরা নাকি সুস্থ হতে পারবেন না। তোমায় কন্যা সন্ধানের জন্ত লাগাবেন বলছিলেন। এত বেশী ক'রে ধরলেন যে শেষে আমার আপত্তি জানাতে বাধ্য হতে হল। সেই ক্ষোভে দিদিমা আজ পর বলে আমায় এ তিরস্কার গুলো করছেন। তোমারও "চোরা গাহয়ের অপরাধে কপিলার বন্ধন।' আমার বন্ধু বলে তোমার ওপরও তার ধাক্কা পড়ল।"

রাজেন্দ্র একটু চিন্তিতভাবে নীরস স্বরে বলিল "শুধু কি এই? আমরা সর্ব্বদা ওদের বাড়ী যা'ই বেশী রকম আত্মীয়তা জানাই এতে বোধ হয় পাড়ার লোকের কাছে ওদের কোন কথা শুনতে হয়েছে। আমিও এই রকম তুমিও অবিবাহিত বিশেষ অমলারই সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ায় তুমি যে এমন ভাবে আছ এসত্য লোকের চোখে এখন পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতায় নিশ্চয় তাঁদের লজ্জায় পড়তে হচ্চে। আমার কথা ছেড়ে দাও, যেতে না বললেই আমার কর্ত্তব্য ফুরালো, আমার সঙ্গে তাদের আর কোন সম্বন্ধই থাকবেনা জানেন। কিন্তু তোমায় ওরা আত্মীয়ের মত চিরদিনই পেতে চান্, তাই তোমার বিবাহের জন্ত এ জেদ্ ধরছেন, বুঝলে? তোমার বিবাহ হলে কেউতো আর কিছু বলতে পারবে না।"

রমেন সবেগে বলিয়া উঠিল "তাইই যদি কেবল হবে তাহলে অমলার এরকম বেশের অর্থ কি? সেকি আমার এই অপরাধের দণ্ড স্বরূপই আমার এ শাস্তির ব্যবস্থা করছেনা? তাকে আমি এই চোখে দেখেছিলাম— এইভাবে পেতে চেয়েছিলাম তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমায় বিবাহ করতে হবে এবং সে যে আমার মনের দ্বারাও অস্পর্শা এই কথা আমার জানাবার জন্ত বুঝিয়ে দিচ্চে সে সধবা, তার স্বামী আছে।"

রাজেন্দ্র জড়িত স্বরে বলিল "তার অন্ত কারণও তো থাকতে পারে। একটু একটু শীত করছে গায়ের কাপড়টা দাওতো জরই আসবে নাকি?"

রমেন গাত্রবস্ত্রটা রাজেন্দ্রের গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল "অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে আমায় বোঝাও। আমি বিবাহ না করলে আর সে আমার এ আত্মীয়তা টুকুও সহ্য করতে পারবে না এই তার হুকুম এত বড় অন্যায়— এতখানি অত্যাচার করবার আগে একবার ভেবে দেখ লেনা যে—"

রমেনের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাজেন্দ্রও নিঃশব্দে গায়েরকাপড়টা গায়ে জড়াইয়া চেয়ারের উপরে মাথা রাখিয়া মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক উঃ আঃ শব্দ করিতে লাগিল।

ক্ষণপরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া রমেন বলিল "আচ্ছা তুমি বলবে বলেছিলে তোমার কথার উপরই নির্ভর করে যে লজ্জায় আমি পড়লাম সে কথা যে তুমি কি প্রমাণে বলেছ সে সব কথা এখনো আমায় খুঁটিয়ে বলনি। নিজের আবেগে অন্ধ আমার তোমার কাছ থেকে তা ভাল ক'রে জেনে নেবার ধৈর্য্যও থাকেনি। তুমি জান অমলা কুমারী এই কথা টুকুতেই আমার অন্তরের সব বাধা উড়ে গিয়েছিল। জগতের আর কিছুই আমার ভেবে দেখ্‌বার কথা মনে হয়নি, আমি এমনি মূর্খ। বল এখন আমায় কি প্রমাণে তুমি সে সব বলেছ। আর সে প্রমাণ কি সূত্রেই বা তুমি আবিষ্কার করতে গিয়েছ? এখানে আসার আগেই—আমাদের জানবার আগেই কি তুমি এ সব জানতে? কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব হবে?"

রাজেন্দ্র শীতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহার কথার প্রতি ধ্বনি করিল "কি করে তা সম্ভব হবে?"

"কিন্তু তুমি যে বলেছ সে পাগুা মরে গেছে, তার সঙ্গে তোমার এক বৎসর পূর্ব্বে মুখোমুখি কথা হয়েছিল। অথচ তুমি মাস সাতেক তো এইখানেই—"

রাজেন্দ্র সেই অবস্থার মধ্যেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "এই এতদিনে এন্‌কোয়ারিতে বেরুচ্ছ বন্ধু? হায়রে অন্ধ প্রেমিক। কিন্তু টু-লেট—টু-লেট্। ইতিমধ্যেই ত যথাস্থানের দারোগার হাতে ধরা পড়ে গেছে।"

"ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল, স্পষ্ট করে বল? কে কোথায় ধরা পড়লে—কিসে—"

"আজ আর নয় এবারে। এর পরে একদিন—"

রমেন প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল "যে দিনই একথা শুনতে চাই সেই দিনই তুমি "আজ নয় আজনয় করে ওঠ। আজ আর তোমায় ছাড়ছিনা বলতেই হবে সব--

রাজেন্দ্র হাতছানি দিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া শান্তস্বরে বলিল "পাগল, মাথায় হাত দিয়ে দ্যাখো দেখি কথা কি আর কইতে পারছি —"

রমেশের তখন যেন অপহৃত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। লাফাইয়া উঠিয়া রাজেন্দ্রের ললাট স্পর্শ করিল।

"উঃ। এযে ভয়ানক গরম এতখানি জ্বর এনে ফেললে?"

"তাইতো বলছি, বড় ভাল ঠেকছেনা। বিছানায় এই বেলা পেড়ে ফ্যালো নৈলে তুমিও মুস্কিলে পড়বে।"

আস্তে ব্যস্তে রমেন রাজেন্দ্রকে প্রায় টানিয়া লইয়া গিয়া শয্যায় ফেলিল এবং দেখিতে দেখিতে রাজেন্দ্র জ্বরের ঘোরে অভিভূত অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

(১৩)

একান্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভাবে রাজেন্দ্রের কতক্ষণ বা কয়দিন কিরূপে কাটিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণে নাই কিন্তু নিজেকে অনুভব করিবার শক্তি পাইবামাত্র সে জড়িত-কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "রমেন—রমেন।"

রমেন নিকটেই ছিল, তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উত্তর দিল।

"কই, কোথায় তুমি" বলিয়া হস্তপ্রসারণ করিয়া রাজেন্দ্র তাহাকে স্পর্শ করিল? তেমনি জড়িতকণ্ঠে অস্থিরভাবে বলিল "বড়যন্ত্রণা—মাথায়—সর্ব্বশরীরে, এ বোধহচ্চে টাইফয়েড—না?"

রমেন একটু নিরুত্তর থাকিয়া গলা ঝাড়িয়া যেন নিজেকে দমন করিয়া লইয়া বলিল "না, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক।

দেবগ্রাম থেকে মহেশবাবুকে আনাচ্চি। তিনি বলছেন হাই ফিবারমাত্র। কোন ভয় নেই।"

অর্দ্ধ অজ্ঞান রাজেন্দ্র সেই অবস্থাতেই খানিক হাসিয়া কেলিয়া বলিল আমায় কি ছেলে মানুষ পেলে? বড় কষ্ট পাচ্চ তোমরা আমায় নিয়ে। এখনো কতদিন কে জানে--"

"তুমি এসব কিছু ভেবোনা, নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোও" বলিয়া রমেন সস্নেহে তাহার মস্তক স্পর্শ করিল। কিন্তু রোগী নিশ্চিন্ত হইল না। সহসা উদ্বিগ্নভাবে মাথা চালিয়া যেন এদিক ওদিক দেখার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিল "একা আছ তুমি? তুমি কি একা—?"

যেন এই অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন অবস্থাতেও সে কাহারো আগমনের প্রত্যাশা করিয়াছিল। নিজেকে অনুভব ক'রবার শক্তি অল্পমাত্রায় পাইবামাত্রই সেই কথা তাহার মনে পড়িয়াছে, এবং তাহার উপস্থিতির বিষয়ে সহসা সন্দিহান হইয়া সে কেমন যেন বেশী রকম অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। রমেন তাহার কথার উত্তরে কেবল তাহাকে সুস্থির ভাবে শুইয়া থাকিতেই অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন রাজেন্দ্র সহসা প্রশ্ন করিয়া উঠিল" "আমায় কি কেউ দেখতে আসেনি কেউনা?"

"কেন আসবেন। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই তুমি কেমন আছ জানতে বাড়ীটাকে ভরিয়ে ফেলছিল কদিন। ডাক্তারের গোলমাল করা বারণ বলেই তাঁদের খোঁজ নেওয়ার ধাক্কা আমায় সামলাতে হয়েছে।"

"গ্রামের লোকেরামাত্র? আর কেউ আসেনি আর কেউ না?"

"আর কে আসবে? কার কথা বলছ?"

রাজেন্দ্র বিমূঢ়ভাবে "দিদিমা—ওরা" এইরূপ উচ্চারণ করিতেছে শুনিয়া রমেন উত্তর দিল "দিদিমার কি চলৎশক্তি আছে! সে কথা কি ভুলে যাচ্ছ? তিনি টুনিকে পাঠিয়ে এক একবার খোঁজ নিচ্ছেন বৈকি। এর বেশী আর তাঁরা কি করবেন?"

রাজেন্দ্র ক্ষণিক নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা রমেনের হাত চাপিয়া রোগের পূর্ণ উত্তেজনার মধ্যে বিভ্রান্ত ভাবে উচ্চারণ করিল।

"কিন্তু—সে—সে—"

"কে, কার কথা বলছ ভাই?—এইযে দিদিমা টুনমণিকে তুমি কেমন আছ জানতে পাঠিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ ওদের?"

রাজেন্দ্র সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলিল "অমলা—অমলা" রমেন স্থগিত হস্তে তাহার কপালের জলপটিটার উপরে স্নিগ্ধজল কয়েক ফোঁটা দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতে করিতে বলিল "স্থির হয়ে থাক;—বেশী কথা কয়োনা ডাক্তার বারণ করেছে। ওসব ভাবনা এখন ছেড়ে দাও। এই ডাক্তারখানায় তিনি কি করে আসবেন?"

"ও:"—বলিয়া রাজেন্দ্র নীরব হইল। একটু পরেই আবার তাহার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

আবার কয়ঘণ্টা বা কয়দিন পরে যে রাজেন্দ্র চক্ষু মেলিল তাহার তাহা অনুভবে আসিল না। সে চোখ্ মেলিয়াই ক্ষীণস্বরে ডাকিল "রমেন্"। উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিতেই অতি নিকট হইতে উত্তর আসিল "তিনি ওষুধ ঠিক ক[illegible] আন্তে গেছেন, একটু [illegible] আসবেন।"

রাজেন্দ্র ক্ষণেক স্তব্ধ হই। থাকিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে পাশ্ ফিরিবার চেষ্টা করিতেই কেহ তাহার স্কন্ধ ও বক্ষ স্পর্শ করিয়া সে বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিল।

"আপনি এসেছেন? কতক্ষণ? ভাল আছেন?"

"হঁ্যা" বলিয়া অমলা রাজেন্দ্রের অপলক দৃষ্টির সম্মুখে মাথা নামাইল। কিছুক্ষণ তাহার সেই দর্পনোজ্জ্বল ললাটের উপরে দ্বিধা বিভক্ত কৃষ্ণচুলের চাপের মধ্যের সেদিনের সেই রক্তিমোজ্জ্বল সিন্দুর রাগের পানে চাহিয়া চাহিয়া সহসা রাজেন্দ্র বলিয়া উঠিল "কেমন করে এলে? কেউ নিন্দা করবে না?"

"করবে।"

"তবে কেন এলে?"

"আপনি যে আসতে অনুমতি দিয়েছিলেন।"

"অনুমতি? আমি? অমলা—"

"আমার বলার ভুল হয়েছে। অসুখের ঝোঁকে আমার নাম করেছিলেন। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন্ না, রমেন দাদা এলেই আমি এখনি যাব।"

বলিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "কোথায় যাচ্চ—যেওনা, এখনি যেওনা, এখনো আমি ভাল হইনি" সঙ্গে সঙ্গে অমলার দেহমনও বাত্যান্দোলিত কদলী পত্রের মত যেন কাঁপিয়া উঠিল সে বস্তে আপনাকে সম্বরণ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "ডাক্তারে বলেছে আর ভয় নেই, এইবারে সেরে উঠবেন।" বলিতে বলিতে অমলা ঈষৎ চেষ্টা প্রকাশ করিতেই রাজেন্দ্র তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল "ডাক্তারে বললেও কেনো এখনো ভয় আছে টাইফয়েড প্রায়ই ঘুরে ফিরে ধরে। একটু অযত্ন একটু অবহেলায়—' রাজেন্দ্র আবার থামিল। "এখনো কি তবে রোগের উত্তেজনা মাথার মধ্যে আছে? তাহারই বশে কি এসব?" অমলা কম্পিত কণ্ঠে কহিল "আপনি নিশ্চিন্ত হন্, রমেনদাদা থাকতে আপনার কোন অযত্ন হবে না। তিনি [illegible] করছেন। আমি কেবল এই ক'দিন সকালে একবার করে আপনাকে দেখতে আসি মাত্র।"

রাজেন্দ্র ক্ষণিক অপলক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু বলিল "শুধু তাই কি? আমার যেন মনে হচ্চে—হঁ্যা—আমার এখন একটু একটু মনে পড়ছে। সমস্তদিন ধরে কে আমার কাছে—সে কে? আমি কত সময় যন্ত্রণার দায়ে মাথাটা কার কোলে—" বলিতে বলিতে রাজেন্দ্র অমলার মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেল। সে আরক্ত মুখ যেন কেমন বিবর্ণ রক্তহীন হইয়া পড়িতেছিল। সেই বিবর্ণ মুখ নত করিয়া অমলা উত্তর দিল "মাথার গোলে আপনার ভুল হয়েছিল বোধ হয়। রমেন দাদা দেরী করছেন কেন, দিদিমা অশক্ত মানুষ আমাকে এখনি যেতে হবে।"

"আর একটু থাক,—অন্ততঃ রমেন আসুক। তুমি কি আর তবে আসবেনা? আমি যে এখনো ভাল হইনি অমলা, আমি অজ্ঞানে খুঁজেছিলাম বলে যদি লোকলজ্জা ভুলতে পেরে থাক তাহ'লে আমার এই

সজ্ঞানের—" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বাসে রাজেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক রোগী যেন এ উত্তেজনা সহ্য করিতে না পারিয়া চোখ বুজিয়া আবার অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িল। অমলা রাজেন্দ্রের নিকটে আসিয়া মুখে চোখে মাথায় স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়া বাতাস করিতে করিতে ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল "রমেন দাদা।"

রমেন নিকটে আসিয়া ধীর হস্তে রোগীর ওষ্ঠে বলকারক পানীয় সিঞ্চন করিতে লাগিল কেন এমন হইল বা কোন কথাই অমলাকে জিজ্ঞাসা করিল না। লজ্জিতা অমলা যেন তাহার কাছে কৈফিয়ৎ দিবার মত করিয়াই বলিল "বারণ করা সত্ত্বেও বেশী কথা কয়ে বোধহয় এরকম হল। তোমাকেই খুঁজেছিলেন প্রথমে। রমেন কোন উত্তর দিলনা।

রাজেন্দ্রকে একটু প্রকৃতিস্থ বোধ করিয়া রমেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আর ভয় নেই, এমন একটু শান্তভাবে কথাবার্ত্তা করলে না ঘুমালেই ভাল থাকবেন। ক'দিন বাড়ী যাইনি একটা বিশেষ দরকার পড়েছে একবার বাড়ী থেকে আসি। তুমি ততক্ষণ এর কাছে থাক।"

অমলা বিপন্নভাবে বলিল "আজকে কিন্তু ইনি একটু সুস্থ হয়েছেন, যদি কিছুর দরকার হয়?"

"এখন আর কিছুরই দরকার পড়বেনা বলেই যাচ্ছি। ওষুধ পথ্যের সময়ের এখনো দেরী আছে।"

"কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে, আমার যে এখন যেতেই হবে। মনি অনেকক্ষণ নিতে এসেছে।"

"তাহোক আর একটু সুস্থ ক'রে দেখে যাও। তুমি গেলেই বরং এখনি আবার হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াও চকিতে অমলা রমেনের পানে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণ নিজেকে সম্বরণ করিতেই সে ব্যস্ত ছিল এইবার রমেনের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল তাহার মুখ একেবারে মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একটা ঔষধের শিশি ও মেজার গ্লাস অমলার নিকটে আগাইয়া দিতে গিয়া রমেনের কম্পিতহস্ত হইতে গ্লাসটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল সেদিকে লক্ষ্য মাত্রও না করিয়া রমেন রুদ্ধস্বরে "যদি আবার অজ্ঞান হন এইটা ফোঁটা-কতক একটু খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে একটু একটু করে দিও—" বলিয়া সে একরকম ছুটিয়াই সেঘর হইতে পলাইয়া গেল। বিস্মিতা স্তম্ভিতা অমলা বসিয়া বসিয়া ও ঘর্ম্মে আপ্লুতা হইয়া উঠিল। রমেনের সে যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুবিবর্ণমুখ তাহার নব নির্ম্মিত সুখবিহ্বল চরাচরকেও যেন মুহূর্ত্তে বিষক্রিয়ায় নীলবর্ণ করিয়া তুলিল। অমলার প্রতি রাজেন্দ্রের এই ভাবান্তর প্রকাশ রোগের ঝোঁকের মধ্যে তাহা প্রকাশ পাইলেও ইহার প্রতিক্রিয়ার ফল কোথায় যাইবে। অমলার চির নিস্তরঙ্গ মনও ইহাতে আশার শত তরঙ্গে যে উথাল পাথাল হইয়া উঠিতেছিল। রাজেন্দ্রের তাহাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার—সকলের সমক্ষে সে রহস্য রাজেন্দ্রের উদ্ঘাটন সবই যেন এই কয় মুহূর্ত্তে সম্ভব বলিয়া অমলার মনে হইতেছিল। স্বামী তাহাকে জানিয়া তাহার সন্ধানের জন্য সে গ্রামে আসিয়াও যখন এতদিন তাহাদের সম্বন্ধ সকলের নিকটে এবং অমলার নিকটেও একথা লুকাইয়া রাখিয়াছেন তখন তিনি যে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এ সম্ভাবনার যে আশার কিছুমাত্র সান্ত্বনা অমলার মনে ধরিবার কথা নয়। তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে তিনি এখনও অমলাকে লইয়া সেই বিশ্রী চেষ্টাটাই বা কেন করিবেন। অমলাকে তিনি স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতেই যখন সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন তখন অমলার তাঁহাকে সে বিপদে ফেলার কোনই অধিকার নাই। তাই তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়াছে বুঝিবামাত্র অমলা চলিয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পাছে তিনি মনে করেন তাঁহার এই ব্যারামের মধ্যের মাথার গোলমালের কাজটাকে অমলা নিজের সুবিধায় লাগাইয়া নিজের সত্ত্ব স্বাব্যস্ত করিতে বসিয়া যায়। তাঁহার সে মাথার গোলমালই হয়ত এখনো দূর হয় নাই নয়ত তিনি বুঝি মত পরিবর্ত্তনই করিয়াছেন। বুঝি এখন সবই সম্ভব। কিন্তু এ কাহার বিবর্ণ—যেন মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর মুখ অমলার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল? একি হইল। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সেই পুকুর ধারে এমনি আর একটী সন্ধ্যার কথাও নিমিষে অমলার মনে ছবির মত আঁকিয়া

উঠিল। সেদিনের সেই আকস্মিক সংবাদ যাহাতে রমেনকে চিরজীবনের মত সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে সেদিনের সেই সংবাদ অমলার কাছে শুনিয়াও রমেন বুঝি এমনি হইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখটা এমনি হইয়া উঠিয়াছিল আর আজ হয়ত বা অমলা ও রাজেন্দ্রের পরস্পরের গূঢ় কথা না জানিয়া রমেন বুঝি উভয়ের সম্বন্ধে কি একটা সন্দেহ করিয়াই এমন করিয়া চলিয়া গেল।

অমলা ধীরে ধীরে মাথা নামাইল।

রাজেন্দ্র আবার তাহারপানে চাহিয়া চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল "চলে যাওনি?"

"না।"

"আর যাবে না?"

এইবার মাথা তুলিয়া অমলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ— রমেন দাদা ফিরে এলেই যাব। আপনার চাকরকে তাঁকে ডাকতে বলেছি।"

"অমলা সুস্থ সবলতার দিনে যা পেরেছি আজ যদি তা না পারি তাকি এত অন্যায় হবে?"

"কিন্তু এই দুর্ব্বলতার দিনে যা ক'রে ফেলবেন—সুস্থ হ'য়ে তার জন্য হয়ত অনুতাপ করতে হবে, কেননা সুস্থতার মধ্যে লোকে যা করে তাহাই ঠিক অসুস্থ মানুষকে বেঠিক্ই করে।"

"না, অসুখই মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে, তখনি তাদের ঠিক্ পরিচয় হয়। সবলতার অহঙ্কারটা চির দুর্ব্বল মানুষের নিজের ওপর অত্যাচার আর বীরত্বের ভাণমাত্র। মানুষ যে কতবড় দুর্ব্বল তা এই রোগের সময়েই ধরা পড়ে।"

"আপনি আবার বেশী কথা কইছেন। রাত্রি হয়ে যায়—আমি যাই। আপনি একা আছেন শুনলে রমেনদাদা এখনি এসে পড়বেন।"

"অমলা আমায় তো তুমি স্বীকার করেছ। আমি তোমার যত অপরিচিতই হই তবুতো তুমি"

"হ্যাঁ—আপনি আমায় চিরদিনেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু আপনি যখন আমায় চিনেও এতদিন স্বীকার করেননি তখন এখন আপনার এ স্বীকারের কোন দরকার দেখছিনা। অনর্থক আপনি আমায় লজ্জায় ফেলবেন না। এর কিছুমাত্র দরকার নেই জানবেন। আমি যেমন আছি চিরদিন এমনি থাকতেই চাই।"

রাজেন্দ্রকে আর উত্তরের অবকাশমাত্র না দিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরে বাটীর পাচিকাকে সেইখানে ডাকিয়া দিয়া মণির সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রমেন আসিয়া রাজেন্দ্রকে ঔষধ পথ্য সেবন করাইল রাজেন্দ্র ম্লান হাসিয়া রমেনকে বলিল "তোমাদের বড় শ্রান্ত করে ফেলেছি দেখছি। ঋণের বোঝা বড্ড বাড়িয়ে ফেল্লাম হে। এখনো কতদিন বিছানায় থাকব বুঝতে পারছিনা, কি উপায় করা যায় বলত?"

রমেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কেবল বলিল "তুমি সুস্থ হও তা'হলে [illegible]"

"সেইটার দরকার হচ্ছে বটে, মাথাটা আবার কেমন কচ্ছে। সরে এস—একটু হাত দাও মাথাটায়।"

রমেন সরিয়া আসিয়া রাজেন্দ্রর ললাটের উপরে হাত রাখিল। রাজেন্দ্র বলিয়া উঠিল "আঃ—বরফের অভাবই এইখানে মিটিল রমেন—হাত দুখানি এত ঠাণ্ডা কি করে করলে?"

রমেন উত্তর দিলনা। নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া যাইতে লাগিল। রাজেন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল—

"এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে?"

"বাড়ী।"

"বাড়ী? আমায় একা ফেলে রেখে হটাৎ বাড়ী?"

রমেন নতমস্তকে মৃদুস্বরে বলিল "একা তো রেখে যাইনি।"

রাজেন্দ্র গম্ভীর বিষণ্ণমুখে ক্ষণিক থাকিয়া বলিল "কিন্তু সে বড় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। আর হয়ত কাল থেকে সে আসতে পারবেনা তাঁকে কি তুমি ডেকে এনেছিলে রমেন?"

"না—তিনি—নিজেই—এসেছিলেন।"

কেন তবে এলেন? লোকে যে নিন্দা করবে।"

রমেন একথার আর কোন উত্তর দিল না নিঃশব্দেই

রহিল। ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে থাকিয়া রাজেন্দ্র সহসা রমেনের পানে চাহিয়া বলিল "কিহে যে কদিন বিছানায় প'ড়ে থাক্‌ব—তুমিতো আছ?—না তুমিও পেরে উঠবেনা আর?"

"যতদিন না তাড়িয়ে দাও ততদিন আছি বলেই তো মনে করি এবং পেরে উঠ্‌ব বলে ভরসা রাখি।"

"বাস্ তাহলেই হল।"

তারপরে সহসা রমেনের হাতটা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া রাজেন্দ্র উদ্বেল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "রমেন—রমেন্ বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি—না? আমার সে জোর কোথায় গেল?—আমি কি আর তেমন হবনা?"

রমেন্ তাহার এ কাতর প্রশ্নের কোন উত্তরও করিল না কোন রকম ভরসাও দিল না, কেবল মাটীর পানে চাহিয়া কাঠের মতন বসিয়া রহিল।

১৪

রাজেন্দ্রের ব্যাধি আর বৃদ্ধির দিকে গেল না বটে কিন্তু উপশমের দিকেও তেমন দ্রুতভাবে অগ্রসর হইল না। অগত্যা কিছুদিন রাজেন্দ্রকে রোগ শয্যাতেই পড়িয়া থাকিতে হইল।

রোগী এবং শুশ্রূষাকারী উভয়েরই ক্লান্তিকর এই দিন গুলাতে কেবলমাত্র রমেন্‌ই রাজেন্দ্রের সহায় রহিল। রাজেন্দ্র লক্ষ্য করিত যেমন তাহারও দিনরাত্রি গুলা দণ্ড প্রহর গুলা তাহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ প্রত্যেক পল বিপলকে টিপিয়া টিপিয়া গুণিয়া গুণিয়া তাহার সম্মুখ হইতে অপসৃত করিতেছে তেমনি যেন রমেনের পক্ষেও দিনরাত্রি গুলা মারাত্মক ভাবেই কাটিয়া চলিয়াছে। দেখিয়া বুঝিয়া ত্যক্তবিরক্তচিত্তে রাজেন্দ্র সহসা একদিন বলিয়া উঠিল "আর পারা যায় না।"

রোগীর এ আক্ষেপে অভ্যস্ত রমেন কোন উত্তরই দিল না নিঃশব্দে নিজ কার্য্যেই দৃষ্টি ও হস্ত রাখিয়া বসিয়া রহিল।

রাজেন্দ্র তাহার এই অবিচলিত ভাবে অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিল "কিহে শুনতে পাচ্চনা নাকি?"

রমেন একইভাবে মৃদুস্বরে কেবল উত্তর দিল "পাচ্চি"।

"তবে যে চুপ্ ক'রে আছ"?

"কি করবো?"

"আর কিছু না পার, একখানা নৌক' ঠিক্ করে দিতেও তো পার।"

"নৌক' কি হবে? কল্‌কাতায় যাবার জন্যে?"

রাজেন্দ্র প্রায় খিঁচাইয়া উত্তর দিল "তা নাত' নৌ-বিহার ক'রে বেড়াতে?"

রমেন একইভাবে উত্তর দিল "তারও এখনো সময় হয়নি। উপযুক্ত সময় হ'লেই নৌক' দুর্লভ হবেনা।"

"রেখে দাওতো তোমার সময় আর অসময় যদি কাল তুমি আমায় কল্‌কাতা যাবার সব ঠিক্ ক'রে না দেবে—দেখে নিও আমি নিজেই যা পারি ক'রে নেব।"

"এখনো তোমার ততখানি ক্ষমতা আসেনি।"

"বটে?"

"এখনো তোমার ততখানি ক্ষমতা আসেনি।"

"বটে?"

রাজেন্দ্র সবেগে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল "সহিস্‌কে আমার ঘোড়া ঠিক ক'রে আন্‌তে বল দেখি। একবার কোন রকমে উঠিয়ে দিয়ে দ্যাখ আমি ক্রোশের পর ক্রোশ এখনো পাড়ি দিতে পারি কিনা।"

এতক্ষণে রমেন্ একটুমাত্র হাসিয়া বলিল "কিন্তু সহিস্‌কেও একজনকে ডেকে দিতে হবে এবং দু চারজন মিলে ঘোড়ায় উঠিয়ে জিনের সঙ্গে বেঁধে দিতেও হবে ত?"

ক্রুদ্ধ রাজেন্দ্র আর কোন কথা না বলিয়া নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেই রমেন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। জোরের সঙ্গে বিছানায় পড়িয়া ফেলিয়া তিরস্কারের সহিত বলিল "একেবারে পাঁচ বছরের খোকা হয়ে গেছ? এতদিন সয়ে আর দু পাঁচ দিন সইতে পারছ না?"

"না, আমার আর একটা দিনও সইবেনা। হয় তুমি আমায় যেতে দাও—নয় তুমিই আমায় ফেলে রেখে নিজের কাজে চলে যাও। দুটো প্রাণীর এমন দুরবস্থা এ আর আমার সহ্য হচ্ছেনা।"

রমেন আবার নিঃশব্দে নিজ কার্য্যে মন দিল।

রাজেন্দ্র বলিয়া চলিল "আমি কি জানিনা যে তীব্র রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার একটা তীব্র উত্তেজনাও আছে, তাতে যদি মানুষ রোগের কাছে হেরে যায় সেও ভাল। কিন্তু এই যে রোগী মরেও না অথচ শীঘ্র বাঁচেওনা এর চেয়ে বিরক্তিজনক অবস্থা কি রোগী কি তার শুশ্রূষাকারীর দুজনের পক্ষেই আর নেই। এ ব্যাপারে উভয়তঃই ধৈর্য্য রাখা কঠিন।"

এতবড় অপবাদের উত্তরেও রমেন একটা প্রতিবাদ করিল না—বা চোখ্ তুলিয়া একবার রাজেন্দ্রের পানে চাহিল না। তাহার অচল গাম্ভীর্য্যের পানে চাহিয়া চাহিয়া উত্তেজিত রোগী ক্রমে শ্রান্তির অবসাদে ভাঙিয়া পড়িল।

শুষ্ককণ্ঠে রাজেন্দ্র বলিল "একটু জল দাও,—উঃ—বড় কষ্ট।"

রমেন এইবার ব্যস্ততার সহিত রাজেন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাহার বিশুষ্ক অধরে পানীয় খাদ্য তুলিয়া ধরিয়া পরে মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। রাজেন্দ্র নিঃশব্দে চোখ্ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে রোগীর মাথার শিয়রে একটা টাইমপিস ঘড়ি কেবল টিক্‌টিক্ করিয়া প্রত্যেক পল বিপলকে তাহাদের নিকটে শব্দায়মান করিয়া তুলিতেছিল।

সহসা রমেন মৃদুস্বরে বলিল "আমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

রাজেন্দ্র সচকিতে চোখ্ খুলিয়া বলিল—"কাকে?—অমলাকে?"

"হ্যাঁ।"

একটুক্ষণ নিস্তেজ থাকিয়া যেন প্রশ্নটাকে বহু চেষ্টায়ও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া শেষে হতাশভাবে রাজেন্দ্র তাহার মুখ-বিবর হইতে যেন ভাষাটাকে ছাড়িয়া দিল—

"কি বলেছে সে?"

"ডাক্তারখানায় কি করে রোজ রোজ যাব, লোকে নিন্দা করবে। আর—"

অধীর ভাবে রাজেন্দ্র বলিল "আর কি?"

"আর তিনি তো এখন ভাল হয়েই উঠছেন।"

"ঠিকই বলেছে। মানুষ যদি মরতে পারে তবেই তার জন্য এই বাধাগুলো ঠেল্‌তে পারা যায়। যে দিন দিন বেঁচেই উঠছে তার জন্য মানুষের আবার কর্ত্তব্য কি।"

রমেন নিঃশব্দে রহিল। একটু পরে রাজেন্দ্র আবার বলিল "কিন্তু তুমি কেন তার উল্টো করছ রমেন। আমি দেখছি তুমি পেরে উঠছ না তবু তো আমার কাছ ছাড়চ না। বলেছিলে আমায় তাড়িয়ে না দিলে তুমি আমাকে ফেলে যাবে না। এখন তো আমি তাড়িয়েও দিচ্চি তবু কেন নড়চ না?" রমেন ঈষৎ মাত্র হাসিয়া মুখ নত করিয়া বলিল "যাব আর দিন চোর পরেই।"

"অর্থাৎ পথ্য পেলে? ন আর তোমায় সেকথা স্বীকার করতে হবে না। আমিই তার আগে দুপায়ে ভর দিতে পারলেই তোমায় মুক্তি দেব।"

"কিন্তু নিজে মুক্তি পাবে কি?"

"তার অর্থ?"

"অর্থাৎ এ গ্রাম ছেড়ে যেতে পারবে কি?"

সন্দেহাকুল নেত্রে রমেনের পানে চাহিয়া রাজেন্দ্র রূপা কণ্ঠে বলিল, "তারই বা অর্থ কি? এ গ্রাম ছেড়ে আমি যেতে পারব না? কেন কিসের জন্য?"

ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রের পানে দৃষ্টি তুলিয়া রমেন গাঢ় স্বরে বলিল "এখনো কি তুমি আমায় প্রতারণা করতে চাও? এখনো আমায় বুঝ্‌তে দিতে চাও না যে কে তুমি কি জন্য এ গ্রামে তুমি এসেছ? কিসের বন্ধন এ গ্রামে তোমার?"

রাজেন্দ্র স্তব্ধ নির্ব্বাক ভাবে রমেনের পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি যেন সম্পূর্ণ বোধশক্তি হীন বালকের দৃষ্টি। রমেন বলিয়া চলিল "আমি অন্ধ আমি নির্ব্বোধ স্বীকার করছি তবু তোমাতে এতখানি আমি প্রত্যাশা করিনি। উঃ আমায় নিয়ে তুমি কি খেলা না করেছ! একেবারে জানোয়ার বানিয়ে বাঁদর নাচ নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ।"

রমেন দুই হাতে মুখ ঢাকিল। সেই অবস্থায়ই থাকিতে থাকিতে অনুভব করিল একটা শীতল মৃদুকম্পিত হস্ত

তাহার হস্ত দুইটাকে স্পর্শ করিয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে ডাকিতেছে "রমেন—রমেন!"

রমেন দুই হাতের অঙ্গুলীতে এবার নিজের দুই কর্ণ বিবরও রোধ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "আর না, তোমার ছলনাতে আর ভুলতে চাইনা, একটি কথাও কয়োনা তুমি।"

"রমেন, বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর—"

"না।" রমেন্ উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, আর অশক্ত দুর্বল-মস্তিষ্ক রোগীর চোখের সম্মুখে একরাশ অন্ধকার যেন একটা কালো পর্দ্দার মত হঠাৎ ঝুলিয়া নামিয়া আসিল।"

কতক্ষণ কয় দণ্ড পরে রাজেন্দ্র যে "রমেন বড় শীত—উঃ বড় তেষ্টা" বলিয়া পাশ ফিরিল তাহা সে নিজেই জানেনা। চোখ চাহিয়া দেখিল ঘরে আলো জ্বলিতেছে বটে কিন্তু ঘরটে কেহই নাই। আবার সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ডাক দিল "রমেন।" কোন উত্তর আসিল না।

তখন ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে রাজেন্দ্রের সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। রমেন যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই।

সে তাহাকে ঘোরতর অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য রাজেন্দ্র যাহা করিয়াছে তাহা ছলনা বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াছ, এই বিশ্বাস লইয়া রমেন চলিয়া গেল। রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

তাহাকে ফিরাইতেই হইবে। সবকথা তাহাকে বুঝাইয়া দিতেই হইবে ইহাতে তাহার প্রাণ যায় আর থাকে। অন্তিম বল প্রয়োগ করিয়া রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ক্রমশঃ এক পা এক পা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কেমন করিয়া কতক্ষণে কোথায় সে সে উপস্থিত হইল তাহা জানেনা কেবল অনুভব করিল একটা পরিচিত গৃহদ্বার, সে যেখানে উপস্থিত হইতে চায় সেখানে সে পঁহুছিয়াছে। তাহার পরে তাহার অন্তিম শক্তির শেষ স্ফুলিঙ্গ কেবল মাত্র একটা ডাক্ ছাড়িয়া সেই দ্বারের কাছেই তাহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিয়া দিল। "রমেন" শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কালো পর্দ্দাটা আবার সমস্ত অন্ধকার করিয়া রাজেন্দ্রের মস্তিষ্কের মধ্যে আসন পাতিল।

এবার যখন তাহার জ্ঞান ফিরিল তখন তরুণ অরুণালোকে সমস্ত জগৎ হাসিতেছে! একটা গৃহে নূতন শয্যার সে শুইয়া আছে দেখিতে পাইল। বিভ্রান্তের মত সে উচ্চারণ করিল "আমি কোথায়?" অতি নিকট হইতেই শব্দ হইল "রমেন দাদার বাড়ী।"

সচকিতে মুখ ফিরাইয়া রাজেন্দ্র দেখিল শুশ্রূষাকারিণী রূপে নিকটে অমলা। নব প্রাণ নব আনন্দের জ্যোতি একবার মুহূর্ত্ত মাত্র রোগীর মুখে চোখে খেলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কালিমা আসিয়া আবার সে স্থানকে অধিকার করিল। "রমেন সে কই?" "তিনি মহেশ বাবু ডাক্তারকে আন্‌তে দেবগ্রাম গেছেন"।

"আবার তাঁকে কেন, আমি তো ভাল হয়ে উঠেছি"।

"আমরাও তাই জানতাম কিন্তু কৈ আর ভাল হয়েছেন। উঃ কি কাণ্ডই করেছেন যদি পথের মধ্যে এই রকম হয়ে পড়ে থাক্‌তেন"!

বলিতে বলিতে অমলা শিহরিয়া উঠিল। রাজেন্দ্র তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল "তোমায় কে খবর দিলে"!

"রমেন্ দাদাই কাল রাত্রে এমন করে গিয়ে পড়্‌লেন যে আমরা এটুকু পথও যেন এসে উঠ্‌তে পারি না। দিদিমা ও লাঠি ধরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একরকম ক'রে এসে উপস্থিত হয়েছেন দেখুন না ঘরের বাইরে পড়ে তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন"।

রাজেন্দ্র একটা অতর্কিত আনন্দ সংবাদে যেন উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "সত্যিনাকি! তবেত একটা উপকারই হয়েছে। মনের উত্তেজনায় অবশ শরীরেও সাড়া ফিরে এসেছে তিনি বুঝি ভেবেছিলেন আমি বিকারের ঝোঁকেই এখানে এসে পড়েছি"!

"সকলেই তাই ভেবেছিল"।

অমলার আনত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া রাজেন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল "কিন্তু তা নয় অমলা। আমি সুস্থ সজ্ঞানেই এখানে এসেছি কেবল দৌর্ব্বল্যে এমন হয়ে পড়েছিলাম"।

"সুস্থ সজ্ঞানে ও এই অবস্থায় এমন ক'রে কেন এসে ছিলেন? বোঝেন্নি কি এতে কতটা বিপদ হ'তে পার্‌ত! এখনো তো আপনার বেশ জ্বর রয়েছে"।

"এ জ্বরও দেহ মনের উত্তেজনাতেই, ভয়ের কিছু নেই। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমি এখন সম্পূর্ণ নিরাময়"।

"কিন্তু কেন এসেছিলেন এমন করে! এ খেয়াল আপনার কেন হ'ল?

"খেয়াল? রমেনকে যে আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে। সে যে মনে করেছে আমি তাকে লজ্জিত অপদস্থ কর্‌বার জন্যেই তোমাদের এত ছলনা করেছি। তোমাদের নিয়ে একটা খেলা কর্‌বার মত্‌লবেই আমি—"

ক্লান্তিতে হাঁপাইয়া উঠিয়া রাজেন্দ্র অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল। অমলা বাধা দিল "থাক এখন এসব কথা আগে একটু সুস্থ হোন্"।

রাজেন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তাকে কাছে না পেয়ে সুস্থ যে হতে পার্‌ছিনা। সে কেন ডাক্তার আন্‌তে গেল! কেন অন্য কারুকে পাঠালোনা"!

"অন্য কেউ গেলে যদি ডাক্তার দেরী করে তাই নিজেই গেলেন। তিনি কি—" "হাঁ—সে ওসব জান্‌তে পেরেছে অমলা, কিন্তু কি করে জান্‌লে জানি না! আমিই কি অজ্ঞানের মধ্যে এমন কোন কথা তোমায় বলেছিলাম—যাতে সে—"অজ্ঞানে নয় সজ্ঞানেই আপনি সেদিন তাঁকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি"।

"আমি? সজ্ঞানে ওঃ সেইদিন যে দিন তুমি চলে এসে আর যাওনি, সেই দিনের কথায়? কিন্তু অমলা তুমি ও কি তাকে অনেকটা বুঝিয়ে দাওনি— সেই সিন্দুর পরে সে দিন দুজনকে প্রণাম করে"।

"সেটুকু তাঁকে জানানো উচিত বলেই আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনি যে কথা লুকিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিলেন সেকথা তাতে প্রকাশ হবার সম্ভাবনা ছিল না"।

"আমি কি জন্য একথা লুকিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিলাম সে কি তুমিও বুঝ্‌বে না অমলা? তুমিও কি রমেনের মতই বুঝ্‌লে যে আমি—"হতাশাক্লান্ত মস্তিষ্কে রাজেন্দ্র থামিয়া গেল।

অমলা তাহার মাথায় বাতাস করিতে করিতে বলিল "রমেন দাদাও কখনই আপনাকে ভুল বুঝ্‌বেনা। আপনি একটু শান্ত হোন্ আমি পথ্য করে' আনি। টুনিকে ডাকি আপনার কাছে বস্‌তে।"

"আর একটু বোস আর একটু। কিন্তু তুমিও তো আমার ত্যাগ করে এসেছ অমলা তুমিও তো আর চাওনা যে একথা লোকে জানে। সেদিন তো তাই বলে এলে, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক্‌তে চাও। আমার অপরাধের দণ্ড দিতে তুমিও তো—"

"ডাক্তার বাবু আসছেন এ সব কথা আর না—শান্ত হোন, নৈলে ডাক্তার অবস্থাটা বুঝে নিতে পারবেন না।"

(ক্রমশঃ)

নীলপরি

(কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম)

ওই সর্‌ষেফুলে লুটলো কার
হলুদ্‌রাঙা উত্তরী
উত্তরী বায় গো
ঐ আকাশ গাঙে পাল তুলে যায়
নীল সে-পরীর দূত তরী।

তার অবুঝ বীণের সবুজসুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে
ঐ গহনবনের পথটি ঘুরে
বাজিয়ে বাঁশী আস্‌চে দূরে
কচিপাতা দূত ওবি

মাঠঘাট তার উদাস চাওয়ায়
হতাশকাঁদে গগন মগন,
বেণুর বনে কাঁপ্‌চে গো তার
দীঘলশ্বাসের বেশ্‌টি সঘন।

তার বেতসলতায় লুটায় তনু
দিগ্বলয়ে ভুরুর ধনু
ওসে পাকাধানের হীরকরেণু
নীলনলিনীর নীলিম অণু
মেখেছে মুখ্‌ বুক্‌ ভরি

কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ গুপ্ত]

ভারতীর পূজামন্দিরে শত পূজারির আরতিবন্দনার মধ্যে কেবল দুই একজন ভক্তবীরের আকুল আহ্বান দেবীর রাতুল চরণপ্রান্তে পৌছিবার অধিকার পায় এবং সেই নির্ব্বাচিত ভক্তমণ্ডলীই শ্বেতম্বরা নারায়নীর প্রসাদ বলে যশোভাজন হইয়া থাকেন; কিন্তু প্রসাদবঞ্চিত সাধকশ্রেণীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, আরাধ্যা জননীর এই পক্ষপাতিত্ব ভক্তসন্তানের শ্রদ্ধাবনতহৃদয়ে বিরক্তি বা বিষাদের ভাববিপর্য্যয় সংঘটন করিতে সমর্থ হয় না; তাঁহারা স্ব স্ব নীরব সাধনা লইয়া বীণাপাণির পুণ্যনিকেতনে চির অনাদৃত ও চিরলাঞ্ছিত থাকিয়া ও মহাপ্রসাদ লাভের আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়নিহিত ভক্তিবীণা কাহার পেলব অঙ্গুলীর মোহনস্পর্শে ধ্বনিত হইয়া স্বর্গীয় ঝঙ্কার ফুটাইয়া তুলে, ওগো দেবি!

"যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
এখন আমারে লহ করুণা করে।" (রবি)

যখন শেষোক্ত কবি সম্প্রদায় জীবনের নিয়ত দুঃখ জ্বালার মধ্যে সুখ ও শান্তির একটা করুণ জ্যোতি ফুটাইয় তুলিতে বৃথা প্রয়াস করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন, যখন জীবনের তমোব্যাপ্ত ম্লানচ্ছায়ার উপর সান্ত্বনা ও প্রীতির আশোক রেখা আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়েন, তখনই তাঁহারা "দুঃখের কবি" এই আখ্যা পাইয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন' তখনই তাঁহারা বাগ্‌দেবীর মধুর বীণার মোহময় ঝঙ্কার শ্রবণে লালায়িত হইয়া দোদুল সুরে দুঃখের গান গাহিয়া বেড়ান। তাঁহাদের অনাদরে ক্লেশ নাই, লাঞ্ছনায় ক্ষোভ নাই; তাঁহারা বিদ্রোহী চিত্তকে এই বলিয়া দমন করিয়া থাকেন—

"কবিরা যে গাহে গান, নিরাশ্রয় ধরণীর
দুঃখ দেখে করে যে রোদন,
সে কি শুধু খ্যাতি আশে? সে কি শুধু শুনিবারে
প্রশংসার অমিয় বচন?
সুখ্যাতি পাবার তরে
নটে যথা নৃত্য করে,
তেমনি কি গেঁথে গেঁথে মিষ্টকথাচয়
হাসি আর রোদনের করে অভিনয়।"

তাঁহার তখন এক স্বর্গীয় আলোকদর্শনে পুলকিত হইয়া উঠেন; তাঁহারা লালসার পারতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া আলেয়ার আলোয় ভুলিয়া যান না, তাঁহারা যে ত্রিবিধ জ্যোৎস্নার ক্ষণিকস্ফুরণ দেখিয়া থাকেন তাহাতেই তাঁহাদের মানসী প্রতিমা মহিমদৃপ্তা হইয়া উঠে এবং তাহাতেই

তাঁহারা আপনার ব্যাকুল হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকেন।

"নিদ্রিত বিহঙ্গ যবে উষার অরুণবাণে
উঠে জাগি স্বপন ভাঙ্গিয়া,
অমনি সে ডেকে উঠে অমনি হৃদয় তার
আনন্দেতে উঠে উথলিয়া।
অসহ্য হইলে নীর
নদী ভেঙ্গে ফেলে তীর ;—
সে কি মুহূর্ত্তের তরে করে আলোচনা
সে বেগ দেখিতে কেউ এলো কি এলোনা।'

তখন কবির সেই মহিমান্বিত হৃদয়ক্ষেত্র হইতে এক অশরীরী বাণী উত্থিত হইয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিতে সাধনার মার্গ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিবে—

"কবিবর! ক্ষতি নাই ; প্রভাতী প্রবাহ তব
সন্ধ্যাতটে হউক বিলীন,
তথাপি উচ্ছ্বাস হ'লে সঙ্গীতে ঢালিতে তায়
বিস্মৃত হয়োনা একদিন,
স্বধর্ম্ম তেয়াগি হায়,
যশের কাঙ্গালী প্রায়
সংসারের পথে পথে সুকরুণ সুরে
ভিক্ষা মাগি কভু তুমি মরিও না ঘুরে।"

তারপর মরণের শেষে ত্রিদিবের কুসুমাস্তরণের উপর শয্যাবিস্তার করিয়া কবির স্বর্গীয় আত্মা যখন দেখিবেন যে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি ভক্তিবিল্বদলে স্বদেশবাসীর হৃদয়-মন্দিরে পূজিত হইতেছে যখন তিনি দেখিবেন যে তাঁহার গীতিমালার বিম্বগুলি এখনও ধরার স্রোতে ভাসিতেছে, তখনই তিনি পূর্ব্বের দুঃখ কথঞ্চিৎ ভুলিয়া সুখের ক্ষণিক-শিখাদর্শনে সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু বহু কবির ভাগ্যদোষে বিধাতার কঠিন হস্তলিখিত প্রাক্তন অনুরূপ, করাল মৃত্যুর সহিত বিস্মৃতির ঘনান্ধকার আসিয়া তাঁহাদিগের ক্ষীণস্মৃতি বিলুপ্ত করিয়া দেয় বিস্মৃতির কুহক আসিয়া তাঁহাদিগের প্রাণের আকুলতা তাঁহাদিগের আজন্ম সাধনা সকলই স্বদেশবাসিগণের হৃদয়পট হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। এই শ্রেণীর কবিদের জন্যই আমাদিগের নয়নযুগল সহানুভূতির তপ্তাশ্রুবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইয়া আইসে, একটা বেদনার ক্ষীণসুর জাগিয়া উঠে। আমাদের আলোচ্য কবি ৺নিত্যকৃষ্ণ বসু উক্ত শ্রেণীর একজন।

নিত্যকৃষ্ণ বসু মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে ইংরাজি সাহিত্যে এম্-এ উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি কোন্নগর ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সাহিত্যপরে প্রকাশিত "সাহিত্যসেবকের ডায়েরী' হইতে তাঁহার বিশাল সাহিত্য-জ্ঞান ও অসাধারণ সাহিত্য সমালোচনার শক্তির পরিচয় পাই। তাঁহার "সাহিত্যসেবকের ডায়েরী' বাঙ্গালা ভাষায় সমালোচনার আদর্শ, সাহিত্যের মূল্যবান্ সামগ্রী। নিত্য-কৃষ্ণ আজীবন কাব্যসাহিত্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র দুঃখময় জীবন যেন একখানি ছোট বিয়োগান্তক নাটক। বংসজীবন আরম্ভের অল্পদিন পরেই তাঁহার পত্নী দুইটি শিশুসন্তান রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। পত্নী বিয়োগের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক মাত্র শিশু-পুত্রকে দুঃখনিপীড়িত বক্ষে বাঁধিয়া কোনও প্রকারে কাব্যসাহিত্যের আলোচনায় কিছু শান্তি পাইতেন। তাঁহার জমাট বাঁধা দুঃখের ঘনান্ধকারে উহা' ছিল শান্তির ক্ষণিক বিদ্যুৎস্ফুরণ। এই দুঃখের জ্বালা কিন্তু তাঁহাকে অধিকদিন সহ্য করিতে হয় নাই। কাব্যসাহিত্যে একটা দুঃখের করুণ রাগিণী ফুটাইতে ফুটাইতে আমাদের দুঃখের কবি ১৩০৭ সালের ২৯শে আষাঢ় প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার চিরপ্রার্থিত নিবৃত্তিলোকে প্রস্থান করেন।

নিত্যকৃষ্ণের সাহিত্যিক বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সে কালে স্বর্গীয় সাহিত্য-সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির গৃহে সাহিত্যের আসর নামে সাহিত্যের বৈঠক বসিত। নিত্যকৃষ্ণ সে বৈঠকে একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। সে সাহিত্যের আসর কবির বীণাঝঙ্কারে, দার্শনিকের গভীর আলোচনায়

এবং সাহিত্যিকগণের সাহিত্যালাপনে মুখরিত থাকিত। উহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন স্বর্গীয় কবি অক্ষয় কুমার বড়াল, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক হেমেন্দ্র প্রসাদ প্রবীণ সাহিত্যিক জলধর সেন প্রভৃতি বঙ্গবাণীর বিশিষ্ট সাধকগণ। নিত্যকৃষ্ণের সাহিত্যসেবকের ডায়েরী হইতে আমরা সেই সাহিত্যের বৈঠকের অনেক সংবাদই অবগত হই। নিত্যকৃষ্ণ এই আসরের প্রাণ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই আসরও ভাঙ্গিয়া যায়।

কবির স্মৃতি, কবির গৌরব, কবির জীবন অবধি তাঁহার কবিতায় তাঁহার খণ্ডকাব্যে নিহিত। বীর বলিয়া কবির যশোগান ঘোষিত হয় নাই, কর্ম্মী বলিয়া কবি কীর্ত্তিলাভের অধিকারী হন নাই—দোদুলছন্দে প্রাণের কথা ব্যক্ত করাই কবির জীবনের কামনা, তাহাই কবির সাধনা, উহাই কবির জীবনের মূলমন্ত্র। কবি আর কিছুই নহেন, কেবলই দরিদ্র কবি—

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর
নহে কোন কর্ম্মী, গর্ব্বোন্নত শির
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদে কাঁদে জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি। (অক্ষয়)

নিত্যকৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বর্গীয় সাহিত্যসম্পাদক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন মধ্যগগনে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সেই প্রতিভারবি অস্তমিত হইয়াছে, ইহা আজ আক্ষেপের বিষয় নহে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সেই প্রতিভাশালী কবির সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কাহারও অবকাশ হইল না, ইহা কি অধিকতর আক্ষেপের বিষয় নহে? তাঁহার সেই দুঃখের রাগিণী দূরাগত বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় প্রতিধ্বনির আকারে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে থামিয়া গিয়াছে, তাঁহার সেই ললিত মূর্চ্ছনা ধীরে ধীরে দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে; ভগ্নহৃদয় হতাশ্বাস পিকবর বাণীকুঞ্জ হইতে চিরবিদায় লইয়া গেল—

"কেউ তারে চিনিল না, আপনি গাহিয়া
আপনি সে ফেলিল নিশ্বাস।
প্রভাতে সে উড়ে গেছে হয়েছে স্বাধীন :
কথাটি ও যায়নি বলিয়া ;
কোথা হ'তে এক রশ্মি আলো এনেছিল
তাই শুধু গিয়াছে রাখিয়া।"

আমরা এক্ষণে সেই রশ্মির বিশ্লেষণ করিয়া কবির ভাবচ্ছটার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

নিত্যকৃষ্ণ দুঃখের কবি; তাঁহার খণ্ডকবিতাগুলির অধিকাংশে একটা একটানা দুঃখস্রোত বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই দুঃখ-ধারার মধ্যে একটা নূতনত্ব দেখিতে পাই; উহা প্রলয় বিষাণ শ্রবণে মৃত্যুভয় জনিত চঞ্চল দুঃখভার নহে, উহাতে জীবনে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলে না, সেই দুঃখের করুণ রাগিণী সংশয়বাদিত্ব জাগাইয়া দাম্ভিকতা ও নাস্তিকতার প্রশ্রয় দান করে না: উহা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে কল্যাণী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া ঈশ্বরে নির্ভরতা সুদৃঢ় করিয়া দেয় আর সর্ব্বশেষে জীবনের ম্লানিমার মাঝে একটা বিমল জ্যোৎস্না জাগাইয়া এই বলিতে শিক্ষা দেয়——

"আর বৃথা পরিতাপে কি হইবে ভাই
আকুল পাথারে এবে যা করে গোঁসাই।"

তাঁহার খণ্ডকবিতা সমূহে আর একটি সৌন্দর্য্যরেখা পাঠকের নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হয়; তাহাতে কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসপুষ্পের অর্ঘ্য দিয়াছেন, কোন্ শরতের উজ্জ্বল উষায় দীনবেশী দেবীমূর্ত্তির উপেক্ষা করিয়া তাঁহারই অন্তর্ধানে কবি আক্ষেপ করিতেছেন।

"কেমনে জানিব হায় পরিহরি অলকায়
মায়াকরি মানবের মূরতি ধরিয়া,
দীনা ভীখারিণী বেশে ধরার কুটীরে এসে
অলকার লক্ষ্মী মোরে যাবে যে ছলিয়া;
* * * *
স্বর্গের সম্পদে তাই উপেক্ষা করেছি ভাই
ভেঙ্গেছি মঙ্গলঘট চরণে ঠেলিয়া।"

মূলতঃ এই উভয় সৌন্দর্য্য তাঁহারা কাব্যে উচ্চ আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বলিতে পারি না কোন্ ঐন্দ্রজালিকের

মোহজালে আমাদিগের নয়নসম্মুখ হইতে সেই সুষমা অপহৃত হইয়াছে।

নিত্যকৃষ্ণের কবিতাগুলি উজ্জ্বল মুক্তাখণ্ডের ন্যায় সেই সময়কার প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে ছড়াইয়া আছে; সে গুলিকে একত্র গাঁথিয়া একটা গোটা মালার রচনা এখন পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। সাহিত্য, প্রদীপ, সাধনা প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাঁহার যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সকল হইতেই আমরা তাঁহার কাব্যশক্তির পরিচয় পাই। নিত্যকৃষ্ণের প্রধান গুণ এই সকল সাহিত্যের দিনে তাঁহার মধ্যে অনুকরণের লেশ দেখি না। তিনি পুরাতন সুরে আপনার দুঃখের গান গাহেন নাই, জীর্ণ ব্যবহৃত কুসুম আহরণ করিয়া তিনি কাব্যসুন্দরীর পূজা সম্পাদন করেন নাই; তাঁহার গীতিরাগিণী যেমন অপূর্ব্ব ও অভিনব, তেমনি তাঁহার কবিতাপুষ্পাঞ্জলি সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুসুমদামে গ্রথিত। অনেক কবিই কৃষ্ণের বংশী-বাদন সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, নিত্যকৃষ্ণ ও সেই বাঁশী লইয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন; কিন্তু নিত্য-কৃষ্ণের কবিতায় পূর্ব্বকবিগণের ভাবের ছায়ামাত্র পড়ে নাই; দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার বাঁশী কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম—তিনি বাঁশীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কবে তুমি বেজেছিলে বিশ্ববৃন্দাবনে
হে বিশ্ববেদনাভরা বাঁশী? কালিন্দীর
কালোবুকে সে দিন কি তরঙ্গ অধীর
প্রথম পড়িল লুটি তটের চরণে?
রোমাঞ্চ কি দিল দেখা প্রেমের স্বপনে
কদম্বকুসুমরূপে স্তব্ধ বনানীর?
সুনীল অঞ্চলে ধরা ঢাকি' অশ্রুনীর
ফেলিল কি তপ্তশ্বাস সুপ্ত সমীরণে?
কিশোরী সে ধরিত্রীর কোমল হৃদয়ে
প্রথম সে পূর্ব্বরাগ, কি অন্ধ আগ্রহে
কি গূঢ় যৌবনভরে উঠেছিল জাগি?
কি উচ্ছ্বাসে মরমের গোপন নিলয়ে
কেঁদেছিল আদিমাতা সর্ব্বস্ব তেয়াগি
অপূর্ব্ব সুন্দর লাগি অপূর্ব্ব বিরহে?"

নিত্যকৃষ্ণের সনেটগুলি বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে হীরক খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, বস্তুতঃ তাহাদিগের দীপ্তিচ্ছটা প্রতি কবিতার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; কঠোর নিয়মের মধ্যে উহাদের সচ্ছন্দগতি ও সুন্দর ভাব বিশেষ প্রশংসনীয়। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার "জীবনসংগ্রাম" শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম—

"নিতান্ত কি হে দেবতা এ দুরন্ত রণে
পরাজয় হবে মোর? আসিবে মুদিয়া
স্পন্দহীন আঁখিপাতা, পড়িবে ঝরিয়া
আশার কুসুম রাজি হৃদিফুলবনে?—
কিন্তু ভীত নহি আমি,—মন্ত্রের সাধনে
মৃত্যুভয় ভাবি কবি মরে কি ডরিয়া?
আলোক প্রদানে দীপ যদি বা নিবিয়া
যায়, যাক্, কবি তাতে দুঃখ নাহি গণে!
জানি আমি যথাশক্তি যুঝি যে সংসারে
ত্যজে প্রাণ সেও জয়ী; তারো যশোগান
গাহে লোক বীরবৃন্দমাঝে। ভবালয়ে
এইরূপ চক্রবৎ আলো অন্ধকার,
কারও না বিজয়ে আর কারও অভ্যুদয়ে
সিদ্ধ হয় বিধাতার উদ্দেশ্য মহান।"

তারপর নিত্যকৃষ্ণের অনুবাদ কবিতাগুলিও বেশ সুন্দর! অনুবাদের মধ্যে কতকটা নূতনত্ব আনাই উহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার "জীবনভার" নামক অনুবাদ কবিতায়

"গেছে সুখনিশা স্বভাব চপল
আর ফিরে তার পাবনা দেখা?
উষা না আসিতে পোহাল যামিনী
অন্ধকারে রাখি ফেলিয়া একা।"

এই কয়ছত্র পাঠ করিতে করিতে আমরা ভুলিয়া যাই যে ইহা অনুবাদ। তখন মনে হয় ইহাই যে কবির প্রাণের কথা, দুঃখের কবির হৃদয়নিহিত করুণসুরের অভিব্যক্তি মাত্র।

নিত্যকৃষ্ণের কাব্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্টতা তাঁহার পদ্যগদ্যগুলি অম্লা, উষা ও শোভাময়ী। তাঁহার মধুর ছন্দোবদ্ধ উন্নত ভাবের সহিত মিলিয়া উহাদিগকে একটা

অভিনব কান্ত সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। "অম্বা" শীর্ষক পদ্যগল্পটি মহাভারতের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত,—কাশীরাজদুহিতা মদ্ররাজের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট বাগ্‌দত্তা হইলেন, তারপর স্বয়ম্বরস্থলে অম্বা ভগিনীগণের সহিত বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীত্বে বৃত হইবার জন্য ভীষ্মকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃত হইলেন, তথায় শান্তনুতনয়ের নিকট আপনার বাগ্‌দানের কথা বলিয়া অম্বা মুক্তিলাভ করিলেন এবং মদ্ররাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিলেন। কিন্তু শল্য তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন অম্বা যমুনার নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করিলেন—এই লইয়াই গল্পটি লিখিত। তাহার উষা শীর্ষক আখ্যানটি উদ্দাম যৌবন চাপল্যের উদ্‌ভ্রান্ত একটি যুবকের আত্মকাহিনীমাত্র। উহাও তাঁহার ভাষা এরূপ সরল ও মধুর যে নবীন প্রভাতের অনাবিল নগ্ন সৌন্দর্য্যে শোভাময়ী বনদেবীর ন্যায় তাঁহার উষারাণীর প্রতিমাখানি পাঠকের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়।

নিত্যকৃষ্ণের কবিতার মূল সাধনা দুঃখবাদ, তা ছাড়া কতকগুলি কবিতাতে তাঁহার করুণস্বর ফুটিয়া উঠিয়াছে আর কয়েকটিতে তিনি নারীর মহত্ত্বকীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "ফুলধনু" ও "বিরহী" শীর্ষক দুইটি কবিতায় আমরা তার একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই—সেই সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয় বল হইতে উদ্ভূত। রতির পতিনাশে মিলনের বর্ণনায়,—

"বেড়িয়া উভয়ে উভয় গ্রীবায়
প্রাসাদে তখন পশিলা আসি"

এই বর্ণনায় বেশ একটু সংযমের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার বিরহীর বিরহেও সেইভাব। সে বিরহে শান্ত চিন্তাশীলতার মধ্যে দুঃখের করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিরহী তখন প্রেয়সীর স্বপ্নমঞ্জুল প্রেম প্রতিভার কথা ভাবিতেছে—

"মনে করে মুখখানি
একবার মনে আনি
ক্ষণতরে হেরিতে নয়নে,—
গান যেন মনে আছে,
সুর তার ভুলে গেছে,
পড়ে পড়ে পড়েনা স্মরণে।"

নিত্যকৃষ্ণের করুণ কবিতাগুলির মধ্যে "চৈতন্যের দেহত্যাগ," "কাবুলির জয়" ও "স্নেহের শাসন" উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণপ্রেমিক গৌরানন্দ একদিন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চন্দ্রমাচুম্বিত সরোবরসলিলে কৃষ্ণের অঙ্গ লাবণ্যের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া সেই নীলকোকনদশোভিত জল প্রবাহে অবগাহন করিতে করিতে ক্রন্দনসুরে গাহিতে লাগিলেন—

"হা কৃষ্ণ! কপট সুচতুর!
দয়া তব হ'লো কি নিঠুর।
এতদিন পরে হায়
এই সেই যমুনায়
দেখা আসি দিলে কি ঠাকুর?"

তারপর দেখিতে দেখিতে

"প্রাণপদ্ম উঠিল বিকশি
অস্ত গেলা নদীয়ার শশী।"

"স্নেহের শাসন" কবিতাটি মাতাপুত্রের আপার্থিব স্নেহসিক্ত একটি করুণ চিত্র। চারি বছরের শিশু, তরুণ তাপসীর স্নেহপুত্তলী, আপনার দুরন্তপনায় নিয়তই মাতার মনে ব্যথার উৎপাদন করিত, অবশেষে একদিন জননী বড় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

"দূর হ' ছাই! পারি নাক আর
পোড়া ছেলে সুখ ঘুচালে আমার;
রে দুরন্ত! তোর এ মন ব্যাভার!
কেবলি জ্বালাবি হায়?

*   *   *   *

এবে ভাল করে তোরে শিখাইব,
ঘুমাইবি যবে তোরে ফাঁকি দিব,
হেথা আর আসিব না!"

তখন শিশুমুখে রোষের অরুণ দীপ্তি প্রকাশ পাইল, সে কিছু বুঝিতে পারিল না, আহ্লাদের আবেগভরে বলিয়া উঠিল—

"চুল তোর ফেলিব ছিড়িয়া
দুই চড়ে গাল দিবরে ভাঙ্গিয়া
কাপড় ছিড়িব দাঁতে !
ঘুম পেলে যবে শুবি বিছানায়,
আরসুলা ধরে ছেড়ে দিব গায়,
মাছ ফেলে দিব ভাতে !"

সেই সময়ে তনয়ের ব্যবহারে ক্ষুব্ধা তাপসী দুঃখভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন—

"মাগো কোথা যাই
মোর কি মরণ নাই।"

তখন সেই মরণের কথায় শিশুর মানস সম্মুখে একটা বিভীষিকা দেখা দিল, সে সকল দুরন্তপনা ভুলিয়া মায়ের অঞ্চলপ্রান্তে মুখ ঢাকিয়া নয়নলোরে গৃহতল ভিজাইতে লাগিল।

নিত্যকৃষ্ণের "কাবুলীর জয়" শীর্ষক কবিতাটি বড়ই উপভোগ্য। রেলে বসিয়া কাবুলীযাত্রীর বহিঃপ্রকৃতি সমালোচনায় নিরত কবির সম্মুখে এক দীন বালক আসিয়া বলিল—

মহাশয় কৃপা যদি হয়,
বিপদে করহ পার।
বাস রাখি তীরে গঙ্গার নীরে
আনমনে করি স্নান,
চোর কোথা ছিল সুযোগ পাইল
হরিল টিকিট খান।
বিপদে এমন কে তরে এখন
কে বুঝিবে ব্যথা মোর
যার কাছে যাই তাড়ায় সবাই
বলে—"বেটা জুয়াচোর !"

তখন অকস্মাৎ কাবুলীর ব্যবহার দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়া গেলেন, তিনি দেখিলেন—

"কপোলে তাহার . ওকি বহে ধার ?
মুখে ওকি ক্রোধ ঢালা !
বলে,—রাম ! রাম ! খারাবি এ কাম
করেছে সে কোন্ শালা !"

এত বলি তবে যে হাতে আহবে
নাশে সে নরের প্রাণ
সেই হাতে খুলি মুদ্রার গুলি
দিল সে করুণা দান।"

এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে কবি মার্জ্জনা চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"বৃথা এই সব বিলাস বিভব
তুমিই জিনিলে ভাই।"

এই প্রসঙ্গে নিত্যকৃষ্ণের "বঙ্গের গৃহাস্থলী" শীর্ষক কবিতাটির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন; এই কবিতায় নিত্যকৃষ্ণ আমাদের বাঙ্গালী ঘরের একটি সুন্দর মোহময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমাদের সেই চিরাদৃত গৃহ—

"যথা জননীর কোলে
সুকুমার শিশু দোলে,
* * * *
যথা পিতা মাতা আর
জায়া পুত্র পরিবার,
ভাই ভগ্নী এক ঠাঁই
বিচ্ছেদ বৈষম্য নাই ;"

আর কিরূপ—

যেথায় একাসনে গৃহপ্রান্তে বসিয়া বঙ্গবধূ আনন ঘোমটা টানিয়া সুখ ভবিষ্যের নন্দন উদ্যানে স্বপ্ন ফুলমালা গাঁথিতেছেন, আর যেথায় অতি নির্জ্জনে প্রেয়সীর সহিত মিলিয়া স্বভাব-কবি-প্রেমিক স্বর্গের ছবি আঁকিতেছেন

আর,—

যথা মূর্ত্তিমান্ সাজে
বিশ্বের দেবতা রাজে,
জগতে তুলনা যার
কোথা নাহি মিলে আর
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
ত্রিলোকের তীর্থস্থল,—
ভুবন ভ্রমিয়া যেথা ছুটে আসি ফের !
মোহময় গৃহ সেই গৃহ আমাদের !"

নিত্যকৃষ্ণ কয়েকটি কবিতায় নারীর পুত্রবাৎসল্য ও পতিপ্রেমের চিত্র আঁকিয়াছেন। "প্রসূতির পূর্ব্বরাগ" কবিতায় তিনি দেখাইতেছেন যে সন্তানের গর্ভবাসকালেও প্রসূতির তাহার প্রতি একটা অপূর্ব্ব বাৎসল্য আসিয়া পড়ে, সন্তানের হাস্যোজ্জ্বল সারল্যময় বদনখানি দেখিবার জন্য জননী আকুল হইয়া উঠেন; তিনি ভাবিতে থাকেন—সন্তানের শিরীষ কুসুম তুল্য কোমল মুখখানি, নীল কমলসদৃশ নয়নযুগল, বাঁকা বাঁকা কুঞ্চিত কেশদাম, রক্তাভ কোমল বিম্বোষ্ঠ, নবনীত লাবণ্যময়ী দেহযষ্টি, আর অর্থহীন অস্ফুট মধুরবাণী। তারপর আরও চিন্তাস্রোত ভবিষ্যৎ জননীর মানসক্ষেত্রে ওতপ্রোত ভাবে বহিতে থাকে—

"বুঝি সে ফুলের মত ফুটিবে বিজন বাসে
সৌরভেতে ভরিবে কানন;
চুমো খেয়ে গান গেয়ে দোলন দিবার আশে
আসে ওই মলয় পবন।
না-না। সে নন্দন বায়ু, বসন্ত রাগিণী তুলি
মেঘপথে আসিবে ভাসিয়া
সরল স্নেহের ছলে মন্দার কুসুম গুলি
যাব বুকে দিবে বিকশিয়া।"

এই সন্তান বাৎসল্যের পার্শ্বে কবির কোমল হস্তাঙ্কিত নারীর পতিপ্রেমের চিত্রটি স্থাপন করি! স্বামীর বিরহে পতিপ্রেমোচ্ছ্বসিতা সতীর বেদনাব্যঞ্জক উচ্ছ্বাস, তাহার ধীর ও শান্ত করুণোক্তি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—হে চিরপ্রিয়, তুমি যেথায়ই থাক, বিদেশে বিদেশিনী পাশে থাক, তুমি আমারই হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান, যেথায় যাই তোমারই কথা মনে জাগিয়া থাকে, কাননের তরুলতা আমাদের সেই পূর্ব্বের মিলন স্মৃতি জাগাইয়া তুলে, আর বনবীথিকার কুসুমগুলি তোমার হস্তরচিত পুষ্পমাল্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; সর্ব্বশেষে প্রেমিকার শেষ কথা—

"কে পারে তোমারে লইতে কাড়িয়া
যদিও মুরতি হৃদয়ে জাগে।"

এই স্থলে "বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রার্থনা" শীর্ষক কবিতাটি হইতে নারীর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। যখন স্বামীর পাদুকামাত্র লাভে বিষ্ণুপ্রিয়া রাজরাজেশ্বরীর ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, তখনই বুঝি রমণীর কত মহত্ব। আর এক স্থলে কবি নারীর দেবীত্বের আভাস দিয়াছেন, "উমা" গল্পটির যে স্থানে উচ্ছৃঙ্খল যুবক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাহার যোগিনী উষারাণীকে অন্নদান ব্রতে নিযুক্তা দেখিল, সেই স্থলে কবি অনুতপ্ত যুবকের মুখ দিয়া রমণীর মহত্ব প্রচার করিয়াছেন—

"পুণ্যব্রত তব দেবী! ভাঙ্গিব না আর
শুধু ভিক্ষা, পাতকীর নিজ পুণ্য বলে
করিয়া উদ্ধার চিরপুণ্য লোকে গিয়া
প্রেম মাল্য খানি পুন পরাইয়ো গলে।"

যেন পতির সবটুকু পাপ মুছিয়া দিবার জন্যই নারী পুণ্যব্রত ধারণ করে, আর সেই অর্জ্জিত সুকৃত রাশি পতির যত কিছু কালিমা ধুইয়া মুছিয়া দেয়।

এইবার আমরা নিত্যকৃষ্ণের জীবনের মূল সাধনা দুঃখ বাদের আলোচনা করিব। প্রথমেই তাঁহার বিলাপ কবিতায় দেখিতে পাই, কি করুণ বেদনা, কি আকুল প্রার্থনা তাঁহার অন্তঃস্থল হইতে দেবতার চরণে গিয়া পৌঁছিয়াছে—

"সংসারের সুধাভরা সমুদ্রের মাঝে
আমারে কি এক ফোঁটা ফেলেছ গরল?
* * * *
স্বাধীনতা অভিমানী শ্রেষ্ঠ নর আমি
আমি শুধু যাব কিগো কাঁদিতে কাঁদিতে?
এ চির বসন্তে আমি—হায় দুরদশা।
আমি কি পুষিব প্রাণে অনন্ত বরষা?"

তারপর সান্ত্বনা ভরে মনকে বলিতেছেন—

"আর বৃথা পরিতাপে কি হইবে ভাই
আকুল পাথারে এবে যা করে গোঁসাই!"

সারা জগতে যখন বসন্তের লাবণ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে নিত্যকৃষ্ণ গাহিলেন—

"শত বুকে শত সুখ করিয়া বিকাশ
ধরণী রাণীর মুখে ধরে নাক হাসি।
আমিই বঞ্চিত শুধু সুখ নাহি পাই,
বুকভরা ব্যথা নিয়ে শূন্যে আসি যাই।

ধরার বসন্ত ফিরে আসে বার বার
প্রাণের বসন্ত কিরে আসিবে না আর?"

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে কবি যখন নয়ন পুত্তলী জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে হারাইয়া শোকে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি দ্বিতীয় পুত্রটিকে ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তে সমর্পণ করিয়া দিতেছেন—

"সেই মৃত্যু বিজয়িনী শক্তি সঞ্চারিণী
দাও রক্ষা লিপিখান বাঁধিয়া এ গলে।"

"প্রত্যাগত" কবিতায় কবি জীবনের দুঃখ-নিশার কথা বলিতেছেন—

"অবশেষে হায়—
অতর্কিতে একদিন যৌবন আকাশে
ঘনাইল কাল মেঘ মৃত্যু দূতী প্রায়
আইল ঝটিকা গরজিয়া,"

আর তখনি

"হারানু আমি সাধের তরণী।"

তখন তিনি অশ্রুভরা আঁখি ও জীর্ণ হৃদয় লইয়া প্রকৃতি জননীর কোলে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—

"প্রকৃতি জননি আমি এসেছি ফিরিয়া!"

এই শোক দুঃখের প্রবল বাত্যায় অভিভূত কবি তখন প্রার্থনা করিতেছেন—

"দুঃখ যাহা, সুখ তারে শিখাও ভাবিতে।"

"ভুল" নামক কবিতায় নিত্যকৃষ্ণ পত্নী বিয়োগে আত্মহারা হইয়া কাঁদিয়াছেন, অকালে সুবর্ণ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়াছেন, তারপর ক্রন্দনের শেষ সুর যখন থামিয়া গেল তখনও তিনি ভাবিতেছেন—

"প্রাণ দিলে প্রাণের সর্ব্বস্ব দিলে
আর কি মেলেনা সেই ত্রিদিবের ফুল?"—

"বৃথা আকিঞ্চন" কবিতায় কবি আবার সেই সুর ধরিয়াছেন,—যখন দেখিলেন বৃথা ক্রন্দন, বৃথা পরিতাপ তখন বলিতেছেন—

"বিদায় বিদায় তবে
বিদায় প্রেয়সী মোর!
এ জগতে বৃথা আকিঞ্চন?"

পরিশেষে "জীর্ণতরু" কবিতায় দুঃখের কবির যে হৃদয় বিদারক করুণ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পাঠ করিবার সময় সহৃদয় পাঠকমাত্র অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। তাহার শেষ দুই ছত্র—

"গেল উষা, গেল পাখী গেল গীত গান
কেন নাহি গেল এ জীবন।"

এই দুই ছত্র পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয়ে দুঃখের কবির বিষাদমাখা মুখখানি জাগিয়া উঠে।

নিত্যকৃষ্ণ যে কাব্যযশঃ প্রার্থী হইয়া কবিতা রচনা করিতেন না, তাঁহার theory ছিল যে "I wish to be regarded as a teacher or as nothing" তাহা তাঁহার "নীরব সাধনা" শীর্ষক কবিতা হইতে প্রতীয়মান হইবে, যখন তাহার মনে হইল যে তাঁহার জীবনের বক্তব্য এখনও জগতের কাছে খুলিয়া বলা হয় নাই, তখনই তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—

"ওরে মূঢ়! এত দুই গাঁথিলি কবিতা
এত ভাব ঢালিলি সঙ্গীতে,
তবুও যাহার লাগি যত্ন আজীবন
তাই তুই নারিলি বলিতে।
অতীতের অতি মৃদু স্মৃতির মতন,
অদৃষ্টের স্বপনের প্রায়,
জীবনের যে ছবি খানি জাগিছে হৃদয়ে
তাই আঁকা হ'ল নারে হায়!"

তারপর আপনাকে একটু সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

"জানিনা এ জগতেরে বুঝাব কেমনে,
তাই আমি মানি পরাজয়;—
মৌন মোর ভাবরাশি, শূন্য অলঙ্কার,
ম্রিয়মান ইন্দ্রিয় নিচয়।
কথা না বলিলে এরা পায়না শুনিতে
না দেখালে দেখিতে জানেনা;
আলোকের পরপারে জাগে যে আলোক
সে আলোক বুঝিতে পারে না।"

ইহাতেও কবি সান্ত্বনা পাইলেন না, তবে কি তাঁহার জীবনের সাধ পূর্ণ হইবে না—

"তবে কি কিছুই আর নাহিক উপায়
বৃথা মোর বৃথা এ জীবন?
একটু যে আলো লয়ে উঠিনু ফুটিয়া
তাও মোর যাবে অকারণ?"

আবার কবি আপনাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন-

"আজ তুই পুনর্ব্বার কর প্রাণপণ;
আশা সাধ ডেকে নে সকলে।
বাক্য তোর হেরে গেছে, হেরেছে সঙ্গীত,
আজ শুধু ঢাল অশ্রুজলে।"

তাই কবি আমাদের কাছে দুঃখের গান গাহিয়া চলিয়া গেলেন। সেই করুণ রাগিণী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় সহানুভূতি পূর্ণ হইয়া আসিলে আমরা বড়াল কবির ভাষার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি যাও কবি—

"নবীন প্রভাতে ল'য়ে, নব জাগরণ!
মাথায়ে দু'খানি পাখা পরাগে শিশিরে—
বাঁধিয়া নয়নে স্বপ্ন, মুখে গুঞ্জরণ।
বাণীর চরণ পদ্ম ঘিরে ঘিরে ঘিরে—
করিতে জীবন গীত পূর্ণ সমাপন।"

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার]

মহাপ্রভু যে পথে নীলাচল গিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ত্তমান অখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নহে। পদব্রজে সুদীর্ঘকাল নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া তখন নীলাচল যাওয়া বড়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য ছিল। মহাপ্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে সঙ্গীগণ সহ মহাকুতুহলে ছত্রভোগ আসিলেন। এইখানে গঙ্গা শতমুখী। প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে—স্নান করিলেন।

"স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে॥
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥"

(চৈঃ ভাগবতঃ)

দৈবক্রমে তথায় গ্রামের অধিকারী রামচন্দ্র খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাপ্রভু সম্মুখে দণ্ডবত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু প্রভুর প্রেমানন্দে বাহ্যাপেক্ষা নাই।

"হা-হা জগন্নাথ" প্রভু বোলে ঘন ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ঘন করয়ে ক্রন্দন॥

(চৈঃ ভাগবতঃ)

কিছু স্থির হইয়া প্রভু রামচন্দ্র খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" রামচন্দ্র নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন।

"প্রভু বোলে তুমি অধিকারী ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমত সকাল॥
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচল চন্দ্র বলি পড়িলা ভূমিতে॥"

পথ বিপদ সঙ্কুল বলিয়া রামচন্দ্র খাঁ ছত্রভোগ হইতে মহাপ্রভুর নৌকাযোগে যাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন।

নৌকাযোগে মহাপ্রভু উৎকল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নৌকা প্রয়াগ ঘাটে পৌছিল এবং প্রভু নিজগণ সহ তীরে উঠিলেন। তথা হইতে পদব্রজে অগ্রসর হইয়া সুবর্ণ

রেখা তীরে উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণ রেখায় স্নানাদি করিয়া ক্রমে জলেশ্বরে এবং তথা হইতে রেমুনাতে আসিলেন। রেমুনা বর্ত্তমান বালেশ্বর ষ্টেসনের নিকট যা মাত্র আড়াই ক্রোশ ব্যবধান। এখানে পরম মোহন গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন দেবহনীতে এবং তাহার সেবা পূজা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাপ্রভু গোপীনাথ সম্মুখে আনন্দে কীর্ত্তনাদি করিয়া সঙ্গীয় ভক্তগণের নিকট মাধবেন্দ্র পুরীর বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী বৈষ্ণব জগতের উজ্জল জ্যোতিষ্ক। কৃষ্ণ-প্রেম যে কি বস্তু তাহা তিনই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম বিহ্বল মাধবেন্দ্রের নবজলধর দর্শনে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত। মাধবেন্দ্র গোবর্দ্ধনের সন্নিকট অন্নকুট গ্রামে গোপালদেবের এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালের আদেশে নীলাচল হইতে চন্দন আহরণ জন্য রওনা হইয়া তিনি এক দিবস প্রদোষকালে রেমুনায় আসিয়া উপস্থিত হ'ন। গোপীনাথের সেবার সৌষ্ঠব দেখিয়া তিনি পরম আনন্দিত হইলেন কখন কি প্রকার ভোগ ঠাকুরকে দেওয়া হয় সেবকগণকে জিজ্ঞসা করিয়া জানিতে পারেন যে সন্ধ্যাকালে "অমৃতকেলি" নামক দ্বাদশ মৃৎভাণ্ডে এক অপূর্ব্ব আস্বাদ্য ক্ষীর ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে—

"পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর,"

মাধবেন্দ্র মনে ভাবিলেন যদি এই ক্ষীর ভোগের' যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া আস্বাদ জানিতে পারিতেন তবে সেইরূপ ভোগ গোপালকে দিতেন। প্রসাদ পাইবার লোভ মনে উদিত হওয়ায় বৈষ্ণব চুড়ামনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র নিতান্ত লজ্জিত হইয়া অপরাধী জ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেন।

"অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥"

অযাচিত বৃত্তি ভোগ লালসা বর্জ্জিত সেই মহাপ্রেমিকের আহার সংগ্রহের কোন যত্ন ছিল না—কাহারও নিকট আহার্য্য যাচ্ঞাও করিতেন না।

যদি কেহ কৃপা করিয়া আহার্য্য কিছু দিত গ্রহণ করিতেন নতুবা উপবাস। অতুক্ত পুরী গোস্বামীকে ভগবান স্বয়ং এক দিবস গোপ বালক বেশে আসিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। গ্রামবাস্তা ভয়ে তাঁহার দ্বিতীয় সাক্ষ্য কেহ ছিল না। অহর্নিশি কৃষ্ণনামামৃত সিঞ্চিত, প্রসাদ পাইবার সাধ মনে উদিত হওয়ায় নিজকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া মন্দির হইতে নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া গ্রামের শূন্য হাটে গিয়া কীর্ত্তনে নিশি যাপন করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রের মনের ভাব গোপীনাথের সেবকগণের কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না। কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট তাহা অবিদিত রহিল না। পূজারী সান্ধ্য ভোগাদি অন্তে ঠাকুর শয়ন করাইয়া নিদ্রিত। নিশিথ রাত্রিতে জন সমাগমের চিহ্ন নাই, এমন সময় পূজারী স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন—

"উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥
ধরার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ নিয়া॥"

(চৈঃ চরিত)

পূজারী ত্রাস্তে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ঠাকুরের ধরার অঞ্চলে প্রকৃতই ক্ষীরের এক মৃতভাণ্ড প্রাপ্ত হইলেন এবং ভাগ্যবান মাধবপুরীকে হাটে যাইয়া তাহা প্রদান করিলেন। পুরী গোস্বামীর অন্যান্য প্রস্তাব বিবৃত করিয়া যে শ্লোক পড়িতে পড়িতে তাঁহার নির্য্যাস প্রাপ্তি হইয়াছিল—

"অয়ি দীনদয়াদ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোক কাতরং।
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

সেই শ্লোক বলিতে বলিতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"অয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বলে বার বার।
কণ্ঠে না উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বিবর্ণ।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥

(চৈঃ চরিত)

রেমুনা হইতে মহাপ্রভু যাজপুরে এবং তথা হইতে কটকে আসিলেন, কটকে তৎকালে সাক্ষীগোপালের বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন। সাক্ষীগোপাল অতি সুন্দর দ্বিভুজ মুরলি ধর। এই বিগ্রহের নাম কেন সাক্ষীগোপাল হইল—কেমন করিয়া বৃন্দাবন স্থিত শ্রীগোপালদেব একনিষ্ঠ এক ভাগবত ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য প্রতিমা মূর্ত্তিতে কটক আসিয়াছিলন তাহার চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রভু সঙ্গীগণ সহ নিত্যানন্দের নিকট শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হন। কটক হইতে ভুবনেশ্বর এবং তথা হইতে কমলপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কমলপুর পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেই—

"জগন্নাথ মন্দির প্রভু দেখিল আচম্বিতে।"
"চন্দ্রের কিরণ যিনি উজ্জ্বল দেউল।
পবন চালিত তাথে পতাকা রাতুল॥
নীলগিরী মাঝে হরি মন্দির সুন্দর।
কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল॥"

(চৈঃ মঙ্গল মধ্য)

প্রভু দেখিতে পাইবেন—

"অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠান।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥
স-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু করে পরণাম॥
ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক শম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত॥"

(চৈঃ মঙ্গল)

কিঞ্চিৎপর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সহসা উঠিয়া বিহ্বল চিত্তে প্রভু অগ্রসর হইতে লাগিলেন—

সঙ্গীগণকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে॥
"নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার।
ত্রৈলোক্য মোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥"

চৈঃ মঙ্গল)

তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রভুর মূর্চ্ছা হইবার আশঙ্কায় কিছু দৃষ্টিপথে না পড়িলেও বলিলেন "হাঁ দেখিতেছি" প্রভু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"দেউল ধ্বজায় দেখ বালক সুন্দর।
প্রসন্ন বদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ॥
আলোক অঙ্গুলি করতল অপরূপ॥
আমারে ডাকয়ে কর কমল-লাবণ্য।
বাম করে বেণু শোভে ত্রি জগৎ ধন্য॥

(চৈঃ মঙ্গল)

মহাপ্রভু নীলচলদিকে অগ্রসর হইতেছেন—সে কি বিচিত্র দৃশ্য।

"জগন্নাথ মন্দির দেখি গোবারয়।
পুনঃ পুনঃ পরণাম করি চলি কয়॥
নয়নে গলয়ে জল অবিরল ধারে।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে॥
পুনরপি জগন্নাথ মন্দির দেখিয়া।
পুন পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥
অঘোর ঝরয়ে দুই নয়নের নীর।
বিহ্বল হইয়া কান্দে আবড়ী-গভীর॥"

(চৈঃ মঙ্গল)

জগন্নাথ প্রাসাদের দিকে ব্যাকুলিত-নিবদ্ধ দৃষ্টি মহাপ্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রেমে টলিতে টলিতে চলিয়াছেন—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মের বক্তারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিত সুবদনো বাল গোপাল মূর্ত্তি॥"

নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দণ্ড ছিল। নিত্যানন্দ ভাবাবেশে ভার্গী নদী তীরে সেই দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করায় মহাপ্রভু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু দণ্ডভঙ্গজনিত অপরাধে সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী উর্দ্ধশ্বাসে জগন্নাথমন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

"হেনকালে গৌরচন্দ্র জগতজীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥

লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিগে ছোটে সব নয়নের জল॥
অনেকে পড়িলা হই আনন্দে মুর্চ্ছিত।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥

(চৈঃ ভাগবতঃ অন্ত)

প্রেম বিহ্বল তনু মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া মন্দিরতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের দ্বার পণ্ডিত প্রথিতযশা পণ্ডিত প্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব ভট্টাচার্য্য নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত তৎকালে কেহ ছিলেন না। তাঁহার আদি নিবাস নবদ্বীপ হইলেও তিনি নীলাচলেই স্থায়ী বাসভূমি করিয়া শত শত শিষ্যকে ন্যায় শিক্ষা দিতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতাপ ও সম্মানে তাদৃশ লোক উৎকলরাজ্যে সে সময় খুব অল্পই ছিলেন। প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু যখন জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে দ্রুত ধাবিত হইতেছিলেন জগন্নাথ সেবকগণ এই আকস্মিক ব্যাপারে সন্ত্রস্ত ও তাঁহার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া মহাপ্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম ঠাকুর তখন নিজ শরীর আচ্ছাদনে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত নিবারণ করিয়া সেবকগণকে ভুবপণেয় কলঙ্ক ও অপরাধ হইতে রক্ষা করেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রেমের বিকার দর্শনে মনে মনে বিচার করিলেন—

"এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার
সুদ্দীপ্ত সাত্বিক এই নাম যে প্রণয়।
নিত্য সিদ্ধ ভক্তে যে সুদ্দিপ্ত ভাব হয়॥
অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখে বড় চমৎকার॥

(চৈঃ চরিত)

সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত মহাপ্রভুকে আপন ভবনে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন—

"সার্ব্বভৌম বলে ভাই পড়িহারীগণ।
সভে তুলি লহ এই পুরুষ রতন॥"
পাণ্ডুবিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সভে প্রভু কোলে করি করিলা গমণ॥"

সর্ব্বভৌম সযতনে প্রভুকে নিজ গৃহে এক অতি পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দাদি মহাপ্রভুর সঙ্গীগণ সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া এক প্রেমিক সন্যাসীর সংজ্ঞাহীন হওয়ার বিবরণ জানিয়া অবিলম্বে সার্ব্বভৌম গৃহ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দৈবাৎ তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত নবদ্বীপবাসী সার্ব্বভৌমের ভগ্নিপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উচ্চ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতনা হইল।

"হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম নেন পদ ধূলি॥"

সার্ব্বভৌম ভগ্নিপতি গোপীনাথের নিকট প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম ও পরিচয় জানিতে পারিলেন। পূর্ব্বাশ্রম জানিবার পূর্ব্বে এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রতি সার্ব্বভৌমের যে একপ্রকার অব্যক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতেছিল নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও স্বীয় পিতৃদেবের সতীর্থ নিলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র জানিয়া তাহার কিছু খর্ব্বতা হইল। ইহা মনের প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অজানিত বস্তুর বৈচিত্র্য মানব মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

(ক্রমশঃ)

বর্ণ-সংগ্রাম

[শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভাষার রাজ্যে বর্ণোচ্চারণ লইয়া আবহমানকাল একটা সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। বর্ণোচ্চারণ যন্ত্রটি সব মানুষেরই সমান, তবুও দেখা যায় একজন 'ক' উচ্চারণ করিলে অন্যে শুনিয়া থাকে 'খ', 'প' উচ্চারণ করিলে শুনিয়া থাকে 'ফ', কানের দোষই হউক বা জিহ্বা অনভ্যস্তই হউক, শ্রোতা 'ক', 'প' শুনিয়া 'খ', 'ফ' উচ্চারণ করিয়া ভাবেন 'আমি ঠিক শুনিয়াছি ও ঠিক উচ্চারণও করিয়াছি।' একজন ইংরাজ দশ মিনিট ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গালা 'উত্থিত' শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারেন না। তিনি অতি সাবধানে শুনিলেও, শেষে বলিয়া বসেন 'উঠ্‌ঠথ'। ল্যাটিন বলে 'pater', গ্রীক বলে 'প্যাটিথার', বাঙ্গালা ও সংস্কৃত 'পিতৃ' কিন্তু ইংরাজি ভাষায় এই 'প'টি 'ফ' হইয়া যায়, যেমন — ফাদার' (father).

'দেখো তুম্‌ উধার মাৎ যাও' ইংরাজ উহার প্রতিধ্বনি করিলেন, 'ডেখো টুম্‌ উডার মাট্‌ জাও।' 'নিশির শিশির পড়ে পাতায় পাতায়' মানভূমবাসী হাসিতে হাসিতে আবৃত্তি করিলেন, 'নিসির সিসির পড়ে পাতায় পাতায়।' এ ত তবু ভিন্ন ভাষা নয়, এক বাঙ্গালা ভাষার মধ্যেই এত ঝগড়া। ভিন্ন ভাষাতে ত হইতেই পারে।

কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই এখন আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃত যুগের তিনটে 'শ' কারের ঝগড়া এ সব অঞ্চলে আজকাল একরকম মিটিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র যে কোন 'স' কারের স্থানে তালব্য 'শ' এর ব্যবহার দেখা যায়। যদি এ দেশের কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা যায়, 'কি গো কতক্ষণ?' তিনি উত্তর করিবেন, এই আশ্‌ছি (আসছি নয়)।'

'খবর কি হে?'

'সে কথা আর বল কেন ভাই, এখানকার শবই উল্টো' ইত্যাদি 'সব' কথাটি মরিয়া এখন 'শব' হইয়া গিয়াছে।

এখন এই এক তালব্য 'শ'এর দ্বারা সমস্ত 'শ' এর কাজ চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে দন্ত্য স টিই রহিয়াছে। তালব্য 'শ' কি মূর্দ্ধণ্য 'ষ' এর সঙ্গে তাহাদের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত নাই। সংস্কৃতের তিনটি 'শ'ই বাঙ্গালা ভাষার বর্ণপরিচয়ে দেখিতে পাই, কিন্তু উচ্চারণ একটিরই করিয়া থাকি। বাঙ্গালা বানান করিবার সময় তিনটি 'শ'ই বজায় রাখিয়া চলেন। এই তিন 'শ' কারের সংগ্রামে তালব্য 'শ'টিই জয়লাভ করিয়াছে, অপর দুইটি ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। বাঙ্গালার বাহিরে স্থানে স্থানে তালব্য 'শ'টি আত্মগোপন করিয়াছে, দন্ত্য 'স'টি সেই সকল স্থানে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে মূর্দ্ধণ্য 'ষ'টি ত একেবারে 'জাহান্নমে' গিয়াছে; তাহার আর মাথা তুলিবার শক্তি নাই।

বাঙ্গালা ত অনেক পরের ভাষা। ইহাতে একটা মাত্র 'শ' কারের উচ্চারণ আর বেশী বিচিত্র কি? বাঙ্গালার বর্ণমালাতে যে এখনও তিন তিনটে 'শ'কার স্থান পাইতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

পালি বা প্রাকৃত ভাষায় এক দন্ত্য 'স' ছাড়া আর 'শ'কারই নাই। আর দুইটীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিরাপদে সম্পাদিত হইয়াছে। এই ভাষায় 'ঈষৎ' লিখিতেও দন্ত্য 'স' আর বংশ লিখিতেও দন্ত্য 'স' (ঈষৎ = ঈসা বা ঈস; বংশ = বংস)। সংস্কৃত বলেন 'শশি খণ্ড মণ্ডনয়োঃ' প্রাকৃত তাহার প্রতিধ্বনি করেন 'সসি খণ্ডমণ্ডণানং'। এও ত দেখি অনেকটা মানভূমের মত—'ও সসি, সুনো না।". পালি মরিয়া গেলেও কখনও 'শিষ্যস্য' উচ্চারণ করিবে না; সে বলিবে,—"সিস্‌সস্‌স' 'শ' কারের বিভ্রাট ইংরাজি ও পার্শী ভাষাতেও কতকটা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন 'sound' 'shall' 'confusion' 'temptation'

ইত্যাদি। পার্শী—শাম (সন্ধ্যা), শুন (্শান) ধাবিত (প্রমাণ) সুরত (আকৃতি) ইত্যাদি।

'ন'কারটি লইয়াও এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। বাঙ্গালাতে 'ন'কারের উচ্চারণের ভেদ রাখা হয় না। বানান কিন্তু সংস্কৃতের অনুকরণেই করা হয়।

প্রাকৃত ভাষাতে কেবল মূর্দ্ধণ্য 'ণ' টিই রহিয়াছে, দন্ত্য 'ন'টির অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়াছে। এই ভাষায় 'শূন্য' লিখিতে 'সুণ্ণ", 'ন' লিখিতে 'ণ' লেখা হয়। ইংরাজীতেও এক 'N'ই সমস্ত 'ন' কারের কার্য্য করিয়া থাকে। পালিতে কিন্তু দন্ত্য 'ন' ও মূর্দ্ধণ্য 'ণ' এই দুই বর্ণই দেখা যায়। যেমন জানতো, ব্রাহ্মণো ইত্যাদি। এই ভাষায় অনেক স্থলে 'ন'কার নিজের রূপটী হারাইয়া ফেলিয়া 'ঞ'র আকার ধারণ করে। (প্রায় সংযুক্তবর্ণ স্থলেই এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়) যেমন 'শূন্যম্' এই সংস্কৃত পদটিকে পালিতে উচ্চারণ করে, "সুঞ্ঞং"। পালি ও প্রাকৃতের ছাত্রগণের পক্ষে ইহা একটা মহা আশ্বাসের বিষয়।

অবেস্তা ভাষায় 'শ'কার ও 'ন'কার সকলরূপেই আপন আপন কার্য্য করিতেছে, কেহ কাহাকেও হটাইয়া দিতে পারে নাই। যে যাহার আপন আপন প্রাধান্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। দুই একটা উদাহরণ, ইঁষ্ঠতি = হিশত ইতি ; মর্ত্ত্য = মষ্য . অস্তি = অস্তি ইত্যাদি।

বিসর্গ (:) সংস্কৃত ভাষাতে তাহার বিজয় পতাকা উড়াইয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালাও স্থানে স্থানে 'পরের ধনে পোদ্দারি' করিতেছে। বিসর্গের ভয় শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নয়, পালি ও প্রাকৃতও অতি বুদ্ধিমানের মত "দুইজনে দূরে পরিহার" করিয়া ভুলিয়াও বিসর্গের নাম উচ্চারণ করে না। গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষাতেও ঐ জিনিষটা একেবারেই স্থান পায় নাই। অবেস্তা বিসর্গটাকে দুইটি হংসডিম্ব মনে করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

সংস্কৃতের 'র' ফলা ও রেফ্‌টিও পালি ও প্রাকৃতের রাজ্যে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বুদ্ধিমানের মত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। পালি, প্রাকৃত ভুলিয়াও কখন সংস্কৃতের ঐ তিনটে বিদকুটে জিনিষের পাশ ঘেঁসিয়াও চলে না। সংস্কৃত ভাষার 'পুরুষাঃ' পালি ভাষায় ভয়ে 'পুরিসো' হইয়া গিয়াছে ; বিসর্গ ভয়ে গোলে পড়িয়া 'ও' কার হইয়া আত্মগোপন করিয়াছে। প্রাকৃতও তাই, বিসর্গ কিছুতেই উচ্চারণ করিবে না (পাছে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়)। সংস্কৃত 'পারগঃ' প্রাকৃত 'পারও', পালিতে আবার সংস্কৃত 'গঃ'টি 'গূ' হইয়া যায়। যথা পারগূ। 'ব্রাহ্মণঃ' এত বড় কঠিন কথা উচ্চারণ করিতে প্রাকৃত একেবারেই নারাজ, প্রাকৃত 'ব্রাহ্মণঃ' না বলিয়া "বম্‌হণো" বলিবে, তবু 'র' ফলা উচ্চারণ করিবে না। পালি 'দরিদ্র' না বলিয়া, 'দলিদ্দ' বলিবে ; আবার 'র'টিকেও ধীরে ধীরে ললিয়ে গলিয়ে 'ল' করিয়া লইবে. 'র'এর উপর এমনিই একটা ইহাদের জাতিগত বিদ্বেষ। 'রেফ্'এর অবস্থাও তাই বেচারি 'রেফ' এই দুই ভাষার তীব্র শাসনে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতেছে, যেমন 'ধর্ম্ম' = 'ধম্ম', 'কর্ম্ম' = 'কম্ম', সর্ব্বে = সব্বে ইত্যাদি। পালিতে কোন কোন স্থলে 'র' ফলা দেখা যায়, যেমন— 'ব্রাহ্মণো', 'ভদ্রং' ইত্যাদি।

'ঋ'কারটি লইয়াও একটি ছোটখাট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পালি ও প্রাকৃত 'ঋ'কারটিকে কোন মতে আপন গৃহে স্থান দিবে না, রাশি রাশি বর্ণ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তাহাকে দূর করিয়া দিবে, কিন্তু তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আপনাদের মধ্যে একটা civil war বাধাইয়া ফেলে। যদি কোথাও 'ঋ'কারটাকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ স্থানে 'অ'কার তাহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, তবে তাহার ঐখানেই শেষ তাহাকে আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে হয় না, 'ই'কার 'উ'কার ও 'ক'কার প্রভৃতি বর্ণ আসিয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিয়া দেয়। দু একটা দৃষ্টান্ত দেখিলে ব্যাপারটার সম্যক উপলব্ধি হইবে, যেমন কৃত = কত, মৃত = মত ; কৃষি = কসি, ঋষি = ইসি, ঋণ = ইণ, ঋতু = উতু, মৃদু = মুদু, গৃহ = গেহ ইত্যাদি। বড়র কাছে কিন্তু কেহই অগ্রসর হইতে পারে না, তাহার দৃষ্টান্ত 'বৃহৎ' শব্দ, এস্থলে 'বৃহৎ' বা 'বহৎ' কিছু না হইয়া 'ব্রহা' হইয়া যায়। প্রাকৃতেও দেখি 'পাউদ' (প্রাবৃত), নচ্চ (নৃত্য), সক্কিয় (সংস্কৃত) ইত্যাদি।

বাঙ্গালা কিন্তু লক্ষ্মীছেলের মত সবগুলিকেই আপনার

ঘরে স্থান দিয়াছে। এ সকল বিষয়ে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার ভাবটা কিছু বেশী দেখা যায়। আবার পালি, প্রাকৃত, ইহারা দুইটী যেন যমজ ভাই, দুইটি যেন হবিহব আত্মা।

বিজ্ঞান বলেন, প্রত্যেক দ্রব্যেই দুই ভিন্ন জাতীয় পরমাণু আছে। তাহাদের কার্য্য আকর্ষণ ও বিকর্ষণ (attraction and repulsion)। ঐ দুই ভিন্ন জাতীয় পরমাণু পরস্পর টানাটানি ও ঠেলাঠেলি করিতেছে। Indo-Germanic ভাষার মধ্যে এ রকম একটা লীলার অভিনয় দেখিতে পাই। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যুগ যুগান্তর ধরিয়া একটা আদান প্রদান ও বর্জ্জন চলিতেছে। কেউ কিছু লইতেছে, কেউ বা কিছু ফেলিয়া দিতেছে। পরের পর ভাষার যেমন সৃষ্টি পুষ্টি হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের কিছু কিছু লইতেছে, কিছু কিছু ত্যাগ করিয়াছে আবার অনেক কিছু নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া তাহার শরীর পুষ্ট করিয়াছে।

মাগধা প্রভৃতি অঞ্চলে কি বানান, কি উচ্চারণ, উভয় স্থলেই, এই 'শ'কার বৈচিত্র্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু 'ষ'টি কিঞ্চিৎ বেকায়দায় পড়িয়া গিয়াছে। তাহার মুখে পড়িয়া 'ষ'টি 'খ' হইয়া গিয়াছে, তাহারা বিষ না বলিয়া বিখ বলিবে, নবেষু না বলিয়া নবেখু বলিবে, 'ষ'টি তাহাদের কণ্ঠ অধিকার করিয়া নূতনরূপে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু চক্ষুস্ উচ্চারণ করিতে গিয়া 'চখ্‌খুস' উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু পালি ও প্রাকৃতে এই 'ষ'টি যুক্তবর্ণের সঙ্গে পড়িয়া, দুই বর্ণে মিলিয়া খিচুড়ি হইয়া যায়, যেমন—দৃষ্টি = দিট্‌ঠি। 'স'টির অবস্থাও তাই; যেমন প্রস্থাপিত—পট্ঠাবিদ ইত্যাদি।

পালি ও প্রাকৃত সংস্কৃত 'য'ফলাটার অস্থি চর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, 'অস্য' বলিতে 'অস্‌স' বলিয়া থাকে। পালিতে কিন্তু স্থানে স্থানে 'য' ফলা দেখা যায়। যেমন—ভাষেয্য, বিহিং সেয্য ইত্যাদি।

অকার ও ওকারের ঝগড়ায় আমরা 'ও'কারেরই বল বেশী দেখিতে পাই। কারণ ওকার স্বস্থান অধিকার করিয়াও সুযোগ পাইলেই অকারের ঘাড়ে চড়িয়া বসে। তাহার উদাহরণ, হবি, অদ্য, অস্থি, অক্ষি, অস্তি, অথি ইত্যাদি, কিন্তু আবার অঙ্গ, বঙ্গ, ভঙ্গ, বক্র, শক্ত, বক্তৃ ইত্যাদি স্থলে অ কারেরই উচ্চারণ হইয়া থাকে। ভঙ্গ শব্দে আমরা স্পষ্টই অকারের উচ্চারণ দেখিতে পাই, কিন্তু যখন 'ভঙ্গিমা' উচ্চারণ করি তখন আবার সেই ওকার অকারকে হটাইয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অকারাদি বর্ণগুলি নানাভাষায় নানারূপে বিচরণ করিতেছে। নিম্নে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। বাঙ্গালা—আছে, সংস্কৃত-অস্তি, অবেস্তা—অস্তি, পালি—অত্থি, প্রাকৃত—অত্থি, গ্রীক—এষ্টি, ল্যাটিন—est, ইংরাজী -is. বা—অশ্ব, সং—অশ্ব, অ—aspas, গ্রীক -হিপ্পস। সংস্কৃত—শতম্, ল্যাটিন -centum (কেন্টুম্) অবেস্ত সতম। সং—অবি, গ্রীক—অইস (ois), ল্যাটিন ovis), ইং—ewe সং -অষ্টৌ; গ্রীক—অক্‌টস্ লা—octo. সং—দ্বারম্, অ দ্বরেম্, গ্রীক—থুরা, লা—fores, ইং -d or সং—পাদ, গ্রী -পডস্, লা—pedis, ইং—foot

সং -দ্বৌ, গ্রী —ডুও, লা—duo, ইং -two.

সং—স্থিতম্, অ —স্তাত, ইং—stood,

সং—দীর্ঘম্, অ—দরেঘেম্।

সং—স্তুত, অ—স্তুত।

সং—দ্রুম, গ্রী—দ্রুস্, ইং—tree.

সং—ম্লেচ্ছ, পালি —মিলখ্‌খ।

সং—নাম, লা—nomen, ইং—name.

ইত্যাদি দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বর্ণগুলি ফৌজের মত দেশ, বিদেশ জয় করিয়া বেড়াইতেছে, কখনও স্বরূপে, কখনও বা রূপটী একেবারে বদলাইয়া দিয়া। উপরে দুই একটা মাত্র উদাহরণ দেখাইলাম, তাহা হইতেই বর্ণ সমূহের কার্য্য বেশ বুঝা যাইবে।

সৃষ্টজীব জাতের মধ্যে যেমন একটা জাতিগত ভেদ থাকে, ভাষাতেও উচ্চারণ বিষয়ে সেই রকম অসংখ্য ভেদ দেখা যায়। কিন্তু এই অনন্ত ভেদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলাও আছে, সেই নিয়মটা Indo-Germanic ভাষার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক group এর বিভিন্ন

ভাষার মধ্যে অধিকাংশ শব্দেরই অত্যধিক সাদৃশ্য দেখা যায়; তথাপি যে শব্দগুলি কোন কোন অংশে পরস্পর অসদৃশ বলিয়া মনে হয় তাহাদেরও মধ্যে, একটা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম আছে; সেই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের (phonetic laws) প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে এইরূপ বর্ণব্যত্যয় (phonetic laws) প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে এইরূপ বর্ণব্যত্যয় (phonetic change) ঘটিয়া থাকে। Grimm, Verner প্রভৃতি সুগৃহীতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ এই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা।

সংস্কৃত 'ভূ' ধাতুর 'ভবতি', 'অভবৎ', 'ভূত্বা' ইত্যাদি যাবতীয় ভেদের, 'ভ'কারের কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় 'হ' কারের দ্বারা সম্পাদিত হয়, যেমন হইতেছে, হয়, হইয়াছিল, হইয়া ইত্যাদি। ইংরাজিতে been শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ('ভ'টা 'ব' হইয়া যায়) এইরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত birch সংস্কৃতে ভূর্জ, এইরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও এইরূপ স্থলে হোতি ইত্যাদির প্রয়োগ দেখা যায়। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে দ্বৌ প্রভৃতির দকার স্থানে ইংরাজিতে 'ট'কারের অভিনয় দেখা যায়। যথা দ্বৌ—দুই—two; দ্রুম tree ইত্যাদি।

সংস্কৃত ঘ, ভ, থ, ধ, প, দ, ব, দ, গ; প, ত, ক; ল্যাটিন ভাষায় h f f, f b d g, p t k, Low German ভাষায় b d g; p t k, f th h, ইত্যাদি পরিণতি দেখা যায়। প্রায় দেখা যায় ইংরাজি ভাষায় খ, ঘ, থ, ধ, ও ভ এর জায়গায় গ, ব, দ হইয়া যায়। Low German ভাষায় যেরূপ বর্ণব্যত্যয়ের নিয়ম উপরে দেখান হইল, ইংরাজি ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই সেই নিয়মের অনুসরণ করে। সংস্কৃতের 'ত্রয়' পদটি ইংরাজিতে 'three' হইয়া যায়। Low German ভাষাতেও ঐরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। উক্ত ভাষায় ঐ পদটির উচ্চারণ threis. 'ক' এই সংস্কৃত পদটি গ্রীকভাষায় KOS. Latin ভাষায় quo, ইংরাজি ভাষায় who; এখানে 'ক' এর উচ্চারণ 'হ' কারের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে।

ভিন্ন ভাষায় নূতন সৃষ্ট শব্দের মধ্যেই, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত 'স্ফুরন্তি' শব্দের প্রাকৃত পর্য্যায় 'ছোল্লন্তি', এই শব্দটী সংস্কৃত স্ফুরন্তি শব্দ হইতে উৎপন্ন নয়। ইংরাজি ভাষায় is ভবতির পর্য্যায় শব্দ হইলেও ইহা একটি নূতন সৃষ্ট শব্দ; ইহা প্রচলিত বর্ণ বৈপরীত্য নিয়মে নিষ্পন্ন নয়। Been শব্দটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ভূ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দের অনুরূপ এবং উভয়ই একই মূল হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। প্রাকৃতে নিথাম (মন্দ), তল্লায় (আর্দ্র), ছুমেই (পরিতাপে) প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃতের সহিত কোনরূপ সাদৃশ্য নাই, এ সমস্তই নূতন সৃষ্ট শব্দের উদাহরণ।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের মধ্যে আমরা সাধারণতঃ যে সকল বর্ণব্যত্যয় সম্বন্ধীয় নিয়ম দেখিতে পাই, তাহাদের দুই একটি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) সংস্কৃত ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ এবং খ, ছ, ঠ, থ ফ প্রভৃতি বর্ণের স্থানে 'হ' কারের প্রয়োগ, যথা মেঘ = মেহ মধুর = মহুর, তথা = তহা ইত্যাদি।

(২) সংস্কৃত ক, চ, ট, ত, প বর্ণের স্থানে অকার, ইকার, উকার প্রভৃতির প্রয়োগ, যথা রোচন = রোঅণ চতুর্বেদ = চউবেদ, কারক = কারঅ ইত্যাদি।

(৩) যকার স্থানে জকার প্রয়োগ, যথা ভার্য্যা ভজ্জ; কার্য্য = কজ্জ; আর্য্য = অজ্জ; কাব্য কব্ব, ইত্যাদি।

(৪) বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণের প্রয়োগ। যথা, স্থিত = ঠিদ; পরিণতে = পরিণদে ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় 'এ' কার সমস্যা। সংস্কৃতের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বত্রই 'এ' কারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এবং তদনুকরণে উচ্চারণও করিয়া থাকি। একটি, একদা, এবং ইত্যাদি স্থলে 'এ' কারেরই উচ্চারণ করি, আবার অনেক স্থলেই 'এ' কার উচ্চারণ না করিয়া 'এ্যা' উচ্চারণ করি যেমন, এক, একা, দেখা ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালায় 'এ্যা' উচ্চারণকারী একটা বর্ণের অভাব দেখা যায়, কিন্তু বর্ণমালায় এই রকম একটি বর্ণ থাকুক আর নাই থাকুক, বাঙ্গালীর মুখ শব্দোচ্চারণ কালে বর্ণমালার খাতির রাখে না। বাঙ্গালী তাহার চিরকালের

অভ্যাস মত বলিয়া ফেলে 'এ্যাত দিন কোথা ছিলে?' নিরঙ্কুশ উচ্চারণযন্ত্র বর্ণমালার অ, আ, ক, খ' র পাতা উল্টাইয়া দেখে না।

মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলে 'য' কারের উচ্চারণ করিয়া থাকে 'ইয়'। আমরা উচ্চারণ করি যন্মে, ঐ কথাটাই মিথিলার লোক উচ্চারণ করিবে 'ইয়ন্মে'। বাঙ্গালা দেশের লোক 'যোগ্য' উচ্চারণ না করিয়া 'যোগগ' উচ্চারণ করে; এইরূপ ভোগ্য—ভোগগ, পাঠ্য=পাঠঠ ইত্যাদি। পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও 'য' ফলার অবস্থা স—সে—মি—রা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহারা কিছুতেই অস্য বা পুরুষস্য উচ্চারণ করিবে না বরং অসস বা পুরিসসস উচ্চারণ করিবে তথাপি য কারের নাম মুখে আনিবে না।

ওমর খৈয়াম

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

৪৭

তোমায় আমায় ফেলে দিয়ে পর্দ্দা আড়ালে
ধরণী এ চল্‌ছে ছুটে নিজের খেয়ালে।
আমাদের এই যাওয়া আসা কেই বা গণে গো
সাগর কূলের সামুক করে' মোদের বানালে!

৪৮

মরণের আর বাকী আছে একটা নিমেষি,
প্রাণ বেলাতে সময় নাহি দণ্ডেরো বেশী।
খস্‌ছে তারা—জীবন ছোটে ধ্বংস পথে গো,
এক চুমুকে শেষ করে নে—জন্ম বিদেশী।

৪৯

কোথায় আছে রহস্যেরি গোপন সে চাবি,
তাই খুঁজে কি জলস্থলে এই জীবন গোঁয়াবি?
একটি চুলের তফাৎ শুধু সত্য মিছাতে—
প্রাণ-প্রবাহ কোথায়—কারে তাই বা শুধাবি?

৫০

একটি চুলের তফাৎ শুধু সত্য মিছাতে,
একটি কথা পারে সকল বিরোধ মিটাতে।
খুঁজে যদি সেই কথাটা জান্‌তে পার গো
দীন দুনিয়ার মালেক পাবি হাতের মুঠাতে

৫১

মালেক আছেন—তোমার ব্যথার দুঃখ গণিয়া
পারার মত চপল তিনি ঘোরেন দুনিয়া।
সব জীবেরি মূর্ত্তি ধরেন—জীব সে মরে গো—
অমর তিনি খেলেন শুধু মৃত্যুরে নিয়া।

৫২

জীবন-নাটক চল্‌ছে ছুটে দিবস রজনী,
পুতুলগুলো খেল্‌ছে খেলা—আঁধার সরণী।
চিরন্তনের প্রীতির লাগি নাটক গড়া গো,—
সেই গড়েছে—দেখেই আবার ভাঙছে তখনি।

৫৩

ধরার গুমর আজকে যদি পার্‌তে ভাঙিতে,
মরার পরে স্বর্গটারে হয় তো জানিতে।
পার্‌লে না যা' যখন তুমি—তুমিই রয়েছ
পার্‌বে কি আর—যখন কিছু রইবে না নিতে।

৫৪

বয়ে' নিয়ে চিরদিনের তর্ক'রাশি রে,
আর কত কাল এই অসীমের পর্‌বি ফাঁসী রে?
হয় মিছে নয় তেতোর পাছে ছোটার চেয়ে গো
অনেক ভালো রাঙা মদের মাতাল হাসি যে।

৫৫

সেই যে সেকি গণ্ডগোল আমার ভবনে—
বন্ধু তোরা জানিস্ নাকি—নেই কি স্মরণে।
সেই দিনতো যুক্তি বধূ তালাক দিয়ে গো
দিইচি ধরা সুরা বধূর মধুর বাঁধনে।

৫৬

সত্য মিথ্যা ভেদ করেছি তর্কেরে দিয়ে,
জোয়ার ভাটার হিসাব সারা খাতায় খতিয়ে।
এই জ্ঞানেরি বড়াই করে মানুষগুলো গো
মাতাল হয়ে' সুখে আছি মদোরে পিয়ে।

৫৭

লোকে জানে—বিদ্যা আমার গভীর কত না,
তাই বছরের দিনগুলো ঠিক যাচ্ছে গো গোণা।
আমি দেখি পাঁজির পরে কেবল রয়েছে—
বিগত ও অনাগত কা'লের ভাবনা।

৫৮

সেদিন এল সাঁঝের হুরী দুয়ার গলায়ে,
এল আমার পান শালাটায় আঁচল দুলায়ে,
গভীর স্নেহে অধর পরে রাখ্‌ল পেয়ালা—
চেখে দেখি মদ্ এনেছে ফেণায় ফুলায়ে।

৫৯

আঙুর ওরে এই আঙুরের যুক্তি শাসনে
মিল্‌ল হাজার ভিন্ন জাতি মনের মিলনে,
বৈজ্ঞানিকের আল্‌কেমিয়া— জীবন লোহা গো
আঙুর রসের স্পর্শে ধরে সোণার বরণে।

৬০

মামুদ্ সারি মত সে যে অজেয় রণেতে,
ভানের মোহ ভেদ করেছে পরাণ পণেতে,
চিত্তেরে সে মুক্ত রাখে খড়গ ধরিয়া,
দুঃখ শোকের সেনা যখন গর্জ্জে মনেতে।

৬১

মাতাল আমি সে কথাটা ঢাকৃতে চাহি না,
দীনের মালেক সে আমারে কর্‌বেনা ঘৃণা।
মাতাল করে' আমারে যে সেই গড়েছে গো,
তার কথারে ব্যর্থ করে—কারেও জানি না।

৬২

পরে আমার কি-ই যে হবে ভাব্‌না কুড়ায়ে,
সুরার চুমো—তারে বল কে দ্যায় ফিরায়ে।
স্বর্গে আমার নেই কামনা পানের পেয়ালা,
ভরিয়া লহ—কখন যাব ধূলোয় গুঁড়ায়ে।

৬৩

মস্জিদমত পণ্ডিতেরা থাকুন বকিতে,
স্মরণ রেখো জীবন সখি, মিলায় চকিতে।
সত্য শুধু এই কথাটা আর যা মিছে গো
ঝরার কথাই লেখা আছে ফুলের কুঁড়িতে।

৬৪

নিত্য চলে এ পথ দিয়া পথিক হাজারো,
চল্‌ছে দ'লে পথের বাধা গভীর আঁধারো।
ফির্‌তি পথের যাত্রা শুধু পাইনি খুঁজিয়া
এই পথেইতো যেতে হবে তোমার আমারো।

৬৫

পণ্ডিতেরি সেরা যারা জ্ঞানের জলধি,
আলোর প্রদীপ ধর্‌লো যারা সংশয়ে মথি'।
পথের কথা কয় যা তারা মনের গড়া সে,
দৃষ্টি তাদের ঐ ঘুমেরি প্রান্ত অবধি।

৬৬

আত্মারে তো পাঠিয়ে ছিলাম যায়না যা দেখা,
সেই খবরটা পড়ার লাগি—ভাগ্যেরি লেখা।
আত্মা আমার ফিরে এলো খবর নিয়ে গো
স্বর্গ নরক সে তো তোমার মনের এলেকা।

৬৭

আমাদেরি দুখের বোঝায় আকাশ নোয়ানো,
'জিহন' নদী চোখের জলের ঝর্ণা ঝরানো,
নেহস্ত সে আনন্দেরি দণ্ডগুলো গো,
মনের নরক দুঃখেরি সে শিখায় জ্বালানো।

৬৮

উর্দ্ধে নীচে সাম্নে পিছে পড়চে যা চোখে,
বাজির পুতুল নাচছে সবে নাচনারি ঝোঁকে,
যাওয়া আসার মালিক মোরা—ছায়ার ছবি গো
আসরটাবে জমিয়ে রাখি দিনের আলোকে।

৬৯

রাত্রিদিনের বর্ণে আঁকা ছক্‌টি মেলিয়ে,
মানুষ নিয়ে ভাগ্যদেবী পাশাই খেলিছে;
পড়ছে গুটি, মিলছে হেথা, মর্‌ছে ওখানে
খেলার শেষে বাক্সেরি ফের পার্শ্বে ঠেলিছে।

৭০

মর্জ্জি কিছু নেই তো গুঁটির—বাঁয়েই কি ডানে,
চলছে তারা খেলয়াড়ের খেলার বিধানে;
খেলার গুটি যে করেছে—মানুষগুলোরে
সেইতো জানে সকল কথা—সেই শুধু জানে।

৭১

ভাগ্যদেবী লিখ্‌ছে লেখা—অমোঘ লেখনী,
চল্‌ছে ছুটে গুণ গরিমা—কিচ্ছু না গণি।
আধ লাইনো মুছ্‌বে না ও ঢেলে দিলেও গো,
শূন্য ক'রে দেহের শোণিত—বুকের ধমনী।

৭২

উপুড় করা ঐ পেয়ালা—স্বর্গ তোদেরি,
যার জঠরে মরা বাঁচা চল্‌ছে দুয়েরি,
যুক্ত বাহু তাহার কাছে মিছেই যাচনা—
ওরও পায়ে বাঁধা যে রে ভাগ্যেরি বেড়ী।

৭৩

যেমন হ'ল কাদার তালে মানুষ গড়া গো,
অম্‌নি ভাবি ফলের বীজ বোনাও সারা গো,
সৃজন দিনের প্রথম ভোরে সাঙ্গ যে লেখা,
প্রলয় দিনের ভোরে হবে সেইটে পড়া গো।

৭৪

গত কা'লের খেয়ালেতে জন্ম আজেরি,
কা'লের হাসি কান্না আবার আজের তৈয়েরী।
পান করে নাও—কেন এলে কেউ তা জানে না,
কেউ জানে না যাত্রী তুমি কোন্ সে দেশেরি!

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

[শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী]

ঘটনাক্রমে সে দিন আশ্বিন মাসের "উপাসনা" দেখিতে পাইলাম। উহাতে "গীতা ও ভাগবত" প্রবন্ধটী দেখিয়া প্রথমতঃ আনন্দ লাভ করিলাম, কারণ—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণ মমলং যদ্ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং

শ্রীভাগবতে ১২।১৩।১৮

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ১৭৪ অধ্যায়ে (পুনর্মুদ্রিত)

সেই ভাগবত; কিন্তু বৈষ্ণব মর্ম্মন্তুদ কতকগুলি বাক্য কলাপ বিন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, তজ্জন্য সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি—

লেখক মহোদয় লিখিয়াছেন যে "শ্রীধর স্বামী প্রাক্ কল্পগত পিত্রভিপ্রায়েণ প্রোক্তং, নিতান্ত জোর করিয়া" কহিয়াছেন ইহা বড়ই সাহসের কথা, কারণ মহাপ্রভু শ্রীধর

স্বামীকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, কারণ তিনি কহিয়াছেন—

"প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে জেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে

কল্পভেদ অনেক স্থানে মানিতে হয়, নচেৎ গত্যন্তর নাই। শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় করিয়া মহাপ্রভু পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করিয়াছিলেন. (১) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যিনি গোবিন্দজীর আদেশে এবং যিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনুসরণ করিয়া শ্রীচরিতামৃত রচনা করিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আগমন করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় করিয়াছিলেন (২) তাহা হইলে 'কল্পভেদ" স্বীকার না করিলে কাহার কথা অগ্রাহ্য করিব? আমরা লেখক মহোদয়ের ন্যায় সদম্ভ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না যে কবিরাজ গোস্বামী ঘুমের ঘোরে লিখিয়াছিলেন। লেখক মহোদয় পুনরায় এক স্থানে লিখিয়াছেন যে—

"শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যদি ভারত বিখ্যাত কবি দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত তথা প্রেম ভক্তির প্রবল তরঙ্গে ভারত প্লাবিত করিয়া থাকেন।"

মহাপ্রভু কি "শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ" ভিন্ন কিছুই জানিতেন না? যিনি ভগবান তাঁহার কি অজ্ঞাত কিছু থাকিতে পারে?

"বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশ।"

চৈতন্য ভাগবতে ১৷৯ অধ্যায়ে

অন্যত্র—

"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা?"

ঐ ১৷১০।

কবির পরাজয়ের পর রাত্রে, কবি সরস্বতী আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সরস্বতী তাঁহাকে কহেন যে যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ তিনি ঈশ্বর—

"সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল॥"

চৈঃ চঃ ১৷১৬।

অধিক দূরের কথা নহে, পরমহংস দেব নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু তিনি বেদান্তের জটীল বিষয় অতি সরল ভাবে বুঝাইয়া দিয়া কত নাস্তিককেও যে পরম ভক্ত করিয়াছিলেন। লেখক মহোদয় আবার "যদি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন! যেন এ ঘটনা সত্যই নহে! যেন ইহা কাল্পনিক! ধন্য তাঁহার বিশ্বাস! শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মহাপ্রভুর বরং ক্ষমতা অধিক, কারণ শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ব্যবহারে শত্রু পরাজয় করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু বাক্যে, বনের ব্যাঘ্রকেও হরিনাম বলাইয়াছিলেন, বাক্যের ক্ষমতা অধিক, বাক্য ব্রহ্ম—

"বাগ্ বৈব্রহ্মেতি"

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।১।২

ইহাতেও কি লেখক মহোদয় মহাপ্রভুতে ঈশ্বরত্ব দেখিতে পাইলেন না! হায়, দুর্ভাগ্য!

ভাগবত শুকদেবকে যে "দ্ব্যষ্ট বর্ষং সুকুমার পাদং" কহিয়াছেন তাহাও অসম্ভব নহে, কারণ—

যং প্রব্রজন্ত মনুপেত মপেত কৃত্যং।
দ্বৈপায়নো বিরহ কাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময় তয়া তরবোহ ভিনেদুঃ।

শ্রীভাগবতে ১।২।২

সুতরাং যোগীর কিছুই অসম্ভব নহে।

লেখক মহোদয় লিখিয়াছেন যে

"প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিলেন যে ভগবন্নিন্দাজনিত মহাপাপ হইতে তাঁহার পিতা যেন মুক্ত হন"।

এ মুক্তি ত সাযুজ্য মুক্তির কথা বলেন নাই; দ্বিতীয়তঃ জয়বিজয় যাঁহারা হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ত "সাযুজ্য" মুক্তের থাকেন নাই; তাঁহারা ত "সামীপ্য" মুক্তের ভগবৎ পার্ষদরূপে ছিলেন।

লেখক মহোদয় মহাভারতের ও ভাগবতের রচনার বা ভাষার তারতম্যে ভাগবত বেদব্যাসের লেখা বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু যে ব্যাসদেব সপ্তদশ অবতার ছিলেন—

---

(১) আদিখণ্ডে ১১৷১২ অধ্যায়।

(২) আদিলীলা ১৬ পরিচ্ছেদে।

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বাপুংসোঽল্পমেধসঃ॥
শ্রীভাগবতে ১। ৩। ২১

তাঁহার পক্ষে ইহাও অসম্ভব নহে। অন্যান্য পুরাণ, মহাভারতের ভাষা অপেক্ষা বেদান্ত দর্শনের ভাষা কঠিন নহে কি? তদ্ভিন্ন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বেদান্ত দর্শনে ১। ১। ২ সূত্র লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবত আরম্ভ।

মহর্ষি নারদও ব্যাসদেবের লেখাকে দোষ দিয়া অন্যায় করেন নাই—আর দোষ হইলে ব্যাসদেবও সে দোষ প্রক্ষালনার্থ কোন কথা না কহিয়া দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; কারণ মনুষ্যের মন সতত কাম্য কর্ম্মে লোলুপ তজ্জন্য তাহার প্ররোচনায় কাম্য কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা ঐ সকল পুস্তকে বর্ণনা করেন নাই। প্রবৃত্তি মার্গ হইতে নিবৃত্তি মার্গ শ্রেষ্ঠ—

নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। মনুঃ ৫। ৫৬।

নিবৃত্তি মার্গে মনুষ্যের লোভ হইবে বলিয়াই প্রবৃত্তি মার্গকে দোষ দিয়া নারদ ঋষি নিবৃত্তিমূলক ভাগবত রচনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; ইহাতে মহর্ষি নারদ কি দোষ করিলেন বুঝা গেল না। বিষ্ঠা ঘৃণিত পদার্থ, মেথর তাহাকে অনায়াসে কোন ঘৃণা না করিয়া উঠাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু তাহা বলিয়া কি বিষ্ঠাকে কেহ ঘৃণা করেন না?

ভাগবত যে মহর্ষি ব্যাসদেবের রচিত তাহা স্বামিপাদ কহিয়াছেন। ভাগবতের লক্ষণ যথা—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্ম বিস্তরঃ।
বৃত্রাসুর বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥
—মৎস্য পুরাণ ৫৩ অধ্যায়ে।

পুরাণান্তরে চ।

গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রো দ্বাদশ স্কন্ধসম্মিতঃ।
হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা॥
গায়ত্র্যাচ সমারম্ভ স্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে এ সমুদায় আছে—দেবী ভাগবতে তাহা নাই।

আরও লিখিয়াছেন—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠাব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥
পদ্মপুরাণে অম্বরীষং প্রতি গৌতমবচনম্।

তজ্জন্য তিনি কহিয়াছেন—

"অতএব ভাগবতং নানাস্থিত্যপি নাশবচনীয়ম্"
—শ্রীভাগবতে ১। ১। ১ টীকায়াং স্বামিপাদঃ।

আরও মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের রাসাধ্যায়ের শ্লোক শ্রবণ করিয়াই আবেশ হইতেন দেখা ভাগবতের শ্লোক শ্রবণে আবিষ্ট হন নাই। আবেশ বারণে, যে উড়িষ্যাধিপতিকে বিষয়ী বলিয়া তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই, তাঁহার মুখে "জয়তিতেঽধিকং" শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কোল দিয়াছিলেন।

লেখক মহোদয় ভাগবতে "রাধা"নাম খুঁজিয়া পান নাই যেন তাহা সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ কহিয়াছেন। সনাতন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ রাধার লীলা মানসচক্ষে দর্শন করিয়া হাস্য করিতেন, যাহাকে মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন তাহার কথা অবিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। তিনি কহিয়াছেন—

গোপীনাং বিততাদ্ভুত স্ফুটতর প্রেমানলার্চ্চিশ্ছটা—
দগ্ধানাং কিল নামকীর্ত্তন কৃতাৎ তাসাং বিশেষাৎ স্মৃতেঃ।
তৎতীক্ষ্ণ জ্বলনোচ্ছিখাগ্র কণিকা স্পর্শেন সদ্যো মহা-
বৈকল্যং সভজন্ কদাপি ন মুখে নামানি কর্ত্তুং প্রভুঃ॥
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ১। ৭। ১৫৬।

আবার শুকদেব কৃষ্ণরসে নিমগ্ন হইয়া কৃষ্ণের এবং তাঁহার প্রিয়তমা রুক্মিণ্যাদির নাম সকল সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; কিন্তু অতি বিস্তৃত, অদ্ভুত, প্রকাশ্য প্রেমানল শিখার তাপে দগ্ধীকৃত গোপীগণের নাম কীর্ত্তন করিলে, তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করা বশতঃ তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ অনলোত্থিত শিখাগ্র কণিকার স্পর্শে মহা বৈকল্য উদয় হয় বলিয়া, তিনি কখনও তাঁহাদিগের নাম মুখে আনিতে পারেন নাই। রাসাধ্যায়ে শুকদেব কোন গোপীর নাম করিতে পারেন নাই, তিনি "কোন গোপী" "কোন গোপী" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেহঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দন ভূষিতম্॥
কাচিদঞ্জলিনা গৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বূল চর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ॥

ইত্যাদি শ্রীভাগবতে ১০। ২।৪-৫।

গোপললনাগণের লীলা বর্ণন করিতে করিতে সাত্বিক ভাবের উদয় হওয়াতে শুকদেবের দেহে কখন স্বেদ কখন কম্প, কখন পুলক, কখন গদ্‌গদ বাক্য, কখন অশ্রুতে পূর্ণ হইতেছিলেন, তিনি অতিকষ্টে গোপাঙ্গনাগণের লীলা বর্ণন করিয়াছিলেন কিন্তু নাম উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন নাই। আমাদের শ্রীরাধা আর কেহই নহেন, তিনি গোপাঙ্গনাগণের শিরোমণি

"মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখানি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥"

শ্রীচরিতামৃতে ১। ৪

লেখক মহোদয়ের এ ভাবটা কতকটা হৃদয়ে ধারণা হইল কি? কি বিড়ম্বনা! শ্রীচরিতামৃতে মহাপ্রভু রামানন্দকে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সাধ্য সাধন বিষয়ে গোপীভাবই চরম সীমা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সে ভাব কি পাশ্চাত্য বিদ্যায় হয়? পাশ্চাত্য বিদ্যার মস্তকে আরোহণ করিলেও সে ভাবকে স্পর্শও করিতে পারা যায় না।

ব্যাসদেব "স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং" দেখাইয়াছেন, লেখক মহোদয়ের মতে তাহা অন্যায় করিয়াছেন; কিন্তু গোপাঙ্গনাগণের তাহা দোষের থাকে নাই। শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তি দুই-ই এক এবং একেই দুই—

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥

*   *   *

হ্লাদিনা করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

শ্রীচরিতামৃতে ১। ৪।

মনুষ্য যদি নিজ দন্তদ্বারা জিহ্বাকে দংশন করে তাহা হইলে তিনি কাহার প্রতি কোপ করিবেন?

জিহ্বাং কচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিঃ।
তদ্ বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥

শ্রীভাগবতে ১১। ২৩। ৫০

আরও শ্রীরাধার মানাদি ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্টই হইতেন কখনও বিরক্ত হইতেন না—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥"

চৈ, চ, ১। ৪।

ইহা কাম নহে প্রেম—কাম ও প্রেমের তারতম্য যথা—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

*   *   *

অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

শ্রীচরিতামৃতে ১। ৪।

পাশ্চাত্য অমর কবিও এই কামের দুর্গন্ধ পাইয়াছিলেন, তিনিও কাম ও প্রেমের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন—

"Love comforteth, like sun-shine after rain
But lust's effect is tempest after sun:
Love's gentle spring doth always fresh remain,
Lust's winter comes ere summer half be done.
Love surfeits not; lust like a glutton dies:
Love is all truth, lust full of forged lies."

-- *Shak's. Venus and Adonis.*

কাম, নরকের সম্পত্তি কিন্তু প্রেম, স্বর্গের—

"Call it not love, for love to heaven is fled
Since sweating Lust on earth usurps his name."

—*Ibid.*

কবি জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ও প্রেম সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

"জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়
সে আমার সুখে থাক নাহি সাধ অন্য কোন।"
অশ্রুমতী।

অন্য কোন গীত রচনাকারী যথা—

"যাতনা জানাও না তায়।
মম দুঃখ শুনি পাছে যাতনা সে পায়। ইত্যাদি

যে রমণী এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার প্রিয়তমকে ভালবাসিতে পারিবেন, নচেৎ নহে।

কোন পাশ্চাত্য কবি ইহাকে বর্ণনা করিয়াছেন—

"And love is still an emptier sound,
The modern fair one's jest:
On earth unseen—"
— *Goldsmith—Hermit*

কামের গতি সোজা—স্বার্থের হানি হইলেই গোলমাল, কিন্তু প্রেমের গতি বক্র—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥
উজ্জ্বল নীলমণৌ শৃঙ্গারাখ্য প্রকরণে ৪২।

এই ভাবকে অমর কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"The course of true love never did run smooth."
— *Shak's. Mid Summer Night's Dream Act I. Sc. I.*

এ পাঞ্চভৌতিক দেহে শ্রীরাধার ভাব বুঝা দুরূহ। সিদ্ধ দেহ ভিন্ন সে ভাব হৃদয়ে ধারণা হয় না; তজ্জন্য নরোত্তম ঠাকুর সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

হরি হরি। আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাব॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুহুঁ রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নব রত্ন জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥
সে না রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥

লেখক মহোদয় পৌরাণিক গোপীগণের প্রেমকে অশ্লীলতা দোষ হইতে নিষ্কৃতি দান নাই। হায়! আমরা কামের দাস, আমরা গোপীলীলা বা রাধার লীলা কি বুঝিব?

(ক্রমশঃ)

শেষ দাবী

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া সুরেশচন্দ্র বাড়ী ফিরিতেই হারু খবর দিয়া গেল, 'দাদাবাবু, একজন স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল—'স্ত্রীলোক কিরে?'

'আজ্ঞে কে তা জানিনে; আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' বলিয়া আদেশের জন্য হারু প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র যথেষ্ট কৌতূহলী হইয়াছিল। একে স্ত্রীলোক তাহাতে এই অসময়ে এমন কে থাকিতে পারে যে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন? হারুকে লক্ষ্য করিয়া

সে শুধু বলিল—'যাও, তাঁকে খবর দাও। তিনি ইচ্ছে করেন ত আস্‌তে পাবেন।'

রমণীমূর্ত্তি যখন তাহার কক্ষে প্রবেশ লাভ করিল, সুরেশ চমকাইয়া উঠিল—'হাঁ, সেই ত বটে!' যাহা অসম্ভব তাহাকে প্রত্যক্ষ নিজের সামনে দাঁড়াইতে দেখিয়া শুধু অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল—'তুমি—তুমি এখানে?' বুঝি বা তাহার স্বরে বেদনা ছিল। বিস্মৃত দিনের অতীত ইতিহাসধারা যে জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা রহিয়া গিয়াছে—সে যে এমন করিয়া আবার তাহার সামনে দাঁড়াইবে, এও কি কখনও হয়!

আগন্তুক রমণীও সব বুঝিলেন—সুরেশের সমস্ত প্রাণটা কতদূর নাড়া পাইয়াছে, ইহা তাঁহার কাছে অজ্ঞাত রহিল না।

উভয়েই ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ রহিলেন।

সুরেশ নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া ধীরে প্রশ্ন করিল—

'আমার কাছে আজ কি জন্যে এসেছ, মায়া?'

'সেইটে তুমি কোন মতেই ঠাহর করতে পারছ না বলেই, তোমার মন তোলপাড় করছে—কেমন নয় কি?'

'হাঁ, কতকটা তাই বটে। কিন্তু তাতে কি আমাকে খুব দোষ দেওয়া চলে? আমার মায়ার-খেলা তুমিই ত শেষ করে দিয়েছ। মায়া, আজ এ আবার কি?'

'একটা কোন বিশেষ দরকারেই তোমার কাছে এসেছি।'

'কিন্তু আমি যে আর তোমার কোন দরকারে থাকতে চাইনে মায়া! আমায় মাপ কর। আমার দ্বারা—'

'তবে বলেই আজ যে আমি তোমার কাছে এসেছি।' বলিয়া মায়া চুপ করিল। তার কথাগুলো ঠিক যেন আদেশের মতন সুরেশচন্দ্রের কানে বিঁধিল।

সুরেশ একটু হাসিল মাত্র—কোন প্রতিবাদ করিল না। একটা কড়া রকমের উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু মায়া যে স্ত্রীলোক এবং তাঁহারই অতিথি, তাই চুপ করিয়া রহিল।

মায়া ধীরকণ্ঠে কহিল—'চুপ করে রইলে যে?'

'কি দরকার সেটা না জানলে কি উত্তর দেব বল।'

'তোমার খাওয়া হয়েছে?'

'না, এই ত বেড়িয়ে এলাম।'

'তা হলে খাওয়া দাওয়া শেষ কর, তার পরে বলছি।'

'পরে খাব'খন। তুমি আর কতক্ষণ থাকবে বল?'

'কেন, তাড়াতে চাও না কি? আমি এখন যাচ্ছিনে। আজ তোমাকে নিজের হাতে খাইয়ে যাব কিন্তু। খাবার তৈরী হয়েছে ত?'

'হাঁ, হারু সে সব ঠিক করেই রাখে।'

'তা হ'লে ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

'পেটে আগুন জ্বলে সেইখানে গেলেই গরম হয়ে ওঠে।'

'এত কথাও জান। আহা! ভাবি ত কষ্ট, দেখবার শোনবার কেউ নেই।'

'দেখবার শোনবার যে হ'তে পারত সেই যখন দেখলে না—যাক্, মায়া এ নিরন্নদেশে আমার যাহোক দুমুঠো ঠাণ্ডাও জোটে, এই আমার যথেষ্ট, এর বেশী আমার আর কিছু চাই না। তাছাড়া, হারু আমার জন্যে খুবই করে, আমার যদি খাবার সময় ঠিক থাকত তাহলে আমাকে ঠাণ্ডা খেতে হ'ত না। ঠাণ্ডা খাই আমার দোষে, হারুর দোষে নয়।'

সুরেশচন্দ্র হারুকে ডাকিল। হারু আসিলে মায়া তাহাকে বলিল—'বাবুর খাবার কোথায় আছে, আমাকে দেখিয়ে দেবে চল। উনুনে আঁচ আছে কি?'

বিস্ময়াবিষ্ট হারু কহিল—'বোধ হয় আছে।'

মায়া খাবার ঠাঁই করিতে লাগিল। তারপরে হারুকে লইয়া নীচে নামিয়া গেল। খাবারগুলি গরম করিয়া লইয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া সুরেশের সামনে ধরিল। খাইবার পূর্ব্বে সুরেশ শুধু একবার কহিল—'আমার বাড়ীতে তুমি যে অতিথি, মায়া। তুমি অভুক্ত চলে গেলে আমার যে অপরাধ হবে।'

'না, আমি এখন আর কিছু খাবনা। আমি খেয়ে এসেছি।'

আহার শেষ হইয়া গেল। একটা টেবিলে দুইখানা চেয়ারে সুরেশ ও মায়া সামনা সামনি বসিল। সুরেশই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল—'মায়া, আমার কাছে কি দরকারে এসেছ ?'

মায়া বলিতে লাগিল—'আমার স্বামী রোগশয্যায় অনেক দিন হ'ল পড়ে আছেন। কখনও একটু ভাল থাকেন, আবার কখনও এমন রোগ বাড়ে যে একেবারে যায় যায় হয়ে পড়েন। অষুধের দোকান শেষে ফেলেছেন বল্লেই হয়, ডাক্তার বদ্যি সবই দেখালাম, কিছুতেই কিছু হচ্চে না। তুমি যদি একবার দয়া করে আমাদের ওখানে যাও'

তার অসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়া সুরেশ কহিল—'তা বেশ মায়া, আমি তাঁকে দেখে আসব কিন্তু আমি ত' ডাক্তার নই।'

'তা আমি জানি। আমি চাই তুমি তাঁকে একটি-বার দেখে প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করে আসবে।'

'প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করবার জন্য যারা ব্যগ্র হবে ঘুরে বেড়ান, সে রকম লোকেরও অভাব ব্রাহ্মসমাজে নেই, তাদের কাউকে নিয়ে গেলেই ত ভাল হয়। যে দুটো জিনিষ তুমি আমার কাছে চাইতে এসেছ, তা দেবার যে আমার ক্ষমতা নেই মায়া।'

'ভগবান আমাকে স্বপ্নে বলে গেছেন যে তোমার আশীর্ব্বাদেই ফল হবে।'

'কিন্তু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার ক্ষমতা যে তিনি আমাকে দেন নাই মায়া।

মায়া শিহরিয়া উঠিল। সুরেশ তাহা লক্ষ্য করিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে সে কহিতে লাগিল, 'মায়া আমি তোমায় কখনও অভিসম্পাত করি নাই কিন্তু তাই বলে এখন আর আমি আশীর্ব্বাদ করতে পারি না। যাঁর আশীর্ব্বাদ সব চেয়ে বড়, মায়া তাঁর আশীর্ব্বাদ চাইতে শেখ।'

'তিনিই আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে গেছেন যে তোমার আশীর্ব্বাদ চাই।'

'সে ত আমার মুখের কথা হবে, প্রাণের আশীর্ব্বাদ ত হবে না। তাই যদি চাও, তাহলে সেটা নিজের ঘর থেকেই দিতে পার্ব্ব। যাবার কি কোন দরকার আছে ?'

'হাঁ, তাঁর মাথায় হাত রেখে তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে হবে।'

'তা হলেই তিনি সারবেন বিশ্বাস কর ?'

'হাঁ, আমি তা বিশ্বাস করি।'

'আমি যে তা মোটেই বিশ্বাস করি না। পাদ্রী হিক্‌সন হয় ত faith cure করতে পারেন, কেন না তাঁর ধর্ম্মবল আছে। আমার বিশ্বাস যে হাওয়াতে কাঁপে, মায়া, আজ আমাকে আবার এ কি নতুন ছলনায় ভোলাতে এলে!'

'একবার আমাকে বিশ্বাস কর, আমার ধ্রুব বিশ্বাস সত্যিকার তুমি তাঁকে ছুঁলেই তাঁর মঙ্গল হবে। তুমি মুখে যাই বলনা কেন, আমার এও বিশ্বাস যে তুমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করতেও পারবে।'

স্থিরদৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া সুরেশ বেদনাপূর্ণ আবেগের সহিত কহিতে লাগিল—'আমার ওপর তোমার আজও এত বিশ্বাস। তা যদি ছিল মায়া তবে কেন—যাক। আমায় মাপ কর। আচ্ছা তাহলে কাল আমি যাব'খন। অনেক রাত হ'ল, চল তোমায় রেখে আসি।'

হরকে গাড়ী ডাকিতে বলিয়া, সুরেশচন্দ্র গা হাত পা ধুইতে নামিয়া গেল। রাত্রে আহারের পরেই ইহা তাহার নিত্য কর্ম্ম ছিল।

গাড়ী আসিল। সুরেশকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মায়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—তুমি আর কষ্ট করে বেরে আস্‌বে কেন, হারুই সঙ্গে যাক। সে-ত বাড়ী চেনে তোমাকে খবর দিতে পারে। ভুলনা, কাল এস কিন্তু।'

গাড়ী চলিয়া গেল—গাড়ীখানা দৃষ্টির বাহিরে গেলে, সুরেশ ফিরিল। বহুদিন পরে যেখানে তার গভীর বেদনা, সেখানটায় আবার নূতন বেদনা অনুভব করিয়া, চক্ষুদুটি তার অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। অনন্ত শূন্যের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া তার ব্যথিত হৃদয় এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

'হা, ভগবান, কোন্ অপরাধে —' হা হা করিয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ঠিক এই সময়ে বহিয়া গেল।

(২)

সুরেশ শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল—এ আবার কি? অদৃষ্টের এ আবার কি খেলা? হাঁ, এ সেই মায়া। যে তার সমস্ত সুখের স্বপ্নকে চূর্ণ করিয়া দিয়া, আপনার সুখের ইমারৎ খাড়া করিয়াছে, সে আবার এ ভাবে দেখা দিবে, এই বা কি? মায়া এবং সে, এ দুয়ের মাঝখানে যে একটা ঘন কাল পর্দ্দা পড়িয়া গিয়াছে, মায়াই ত তার জন্ম সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সব যায়, স্মৃতির ব্যথা বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকে কেন? সে ভাবিত যদি আর কখনও মায়ার সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে ঘৃণাভরেই সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিবে। কোনদিন তাহাকে ক্ষমা করিবে না। আর সত্যিই যখন সে আজ তাহার কাছে আসিল, তখন তার কাছে ইহাই প্রমাণ হইল যে সমস্ত বেদনার মাঝখান দিয়া এখনও তার মায়ার প্রতি ভালবাসা তেমি অক্ষুন্ন আছে। কত বড় একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া সে যে কতদূর পর হইয়া গেছে, তাহাও সে জানে। এই যে সে আসিয়াছিল—এ'ত সে তার কাছে আসে নাই। তার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য, তার স্বামীর মঙ্গলের জন্যই সে আমার কাছে আসিয়াছিল। এই দরকারটুকু ছিল বলিয়াই আমার কাছে আসার প্রয়োজন, নৈলে সে আসিত না। কিন্তু—হাঁ কিন্তুই বটে—কোন্ অপরাধে আমার ওপর সে এতদূর অবিচার করিল? তাই যদি করিয়াছিল—ব্যস্, কিন্তু যখন দায়ে পড়িয়াছে, তখন আবার এ কি? ভগবান—ভগবান শক্তি দাও, আমার সাধ্যাতীত যা, সে আজ তারই ভিখারিণী। আশীর্ব্বাদ করেই যেন আমি প্রতিশোধ তুলিতে পারি, ক্ষমার মধ্য দিয়াই আমি যেন তাকে দণ্ড দিতে পারি, এই তোমার চরণে ভিক্ষা। মূর্ত্তিরূপে যাহাকে জীবনে পেলাম না, মন্ত্ররূপে তাহাকে আজ গ্রহণ করিয়াছি।

(৩)

বহুদিনের কথা। সুরেশ মায়াকে ভালবাসিত। মায়াও সুরেশকে ভালবাসিত। এই রকম একটা আঁচ মায়ার পিতা মাতাও করিতেন, তাই সুরেশকে তাঁহাদের বিরক্তি বাক্যে না হউক, ব্যবহারে তাঁহারা জানাইতেন। সুরেশ তাহা উপলব্ধি করিত, কিন্তু মায়ার আহ্বানকে সে যে কোনমতেই তুচ্ছ করিতে পারিত না। সুরেশ তখন দরিদ্র যুবক, সে আপনার দারিদ্র্যকে সম্মান করিত, অথচ এই দারিদ্র্যের জন্য ঠিক সেই জায়গায় অপমান যেখানে সে ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছে, ইহা ক্রমে তার অসহ্য হইয়া পড়িতেছিল। মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা যাঁরা শুধু টাকার মাপে করিয়া থাকেন, বাস্তবিকই সে যে তাহাদের ঘৃণা করে। একই পরিবারের একদিকে ভালবাসা অপরদিকে ঘৃণা, এই লইয়াই তার আসা-যাওয়া চলিতেছিল।

সেদিন মায়াদের বাড়ীতে কেউ ছিল না। কোথায় সকলের নিমন্ত্রণ ছিল—মায়ার শরীর ভাল ছিল না, তাই সে একা বাড়ীতেই ছিল।

সুরেশ সেদিন মায়াকে একেলা পাইল। মন খুলিয়া দুজনে কথাবার্ত্তা কহিল। উভয়ে এতদিন ধরিয়া মনে মনে যাহা পোষণ করিয়া আসিতেছিল, এতদিন পরে উভয়ের নিকট তাহা প্রকাশ পাইল অনাবিল আনন্দে দুটি তরুণ প্রাণের সুখের চিত্রখানা সেদিন উভয়ের নিকট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল—উভয়ের মিলনের পথে কত দুরূহ বাধা যে ছিল, সে কথাটা তখন মনেই হয় নাই। বাস্তবের প্রচণ্ড আঘাত কল্পনার বর্ণময়ী চিত্রখানাকে নিমেষে মসীময় করিয়া অন্ধকার করিয়া তুলিতে পারে, এ কথা তখন কে জানিত?

আট বৎসর কাটিয়া গেল। সুরেশ প্রথমে যেদিন মায়ার বিবাহের কথা শুনিয়াছিল, মোটেই সে কথা বিশ্বাস করে নাই, কেননা মনের মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া বারবার তার সেই কথাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল, যে কথার উপর নির্ভর করিয়া সে শুধু এতদিন ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মায়া বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, ইহা সে যে কোনমতেই ভাবিতে পারে না। প্রথমে যাহা বিশ্বাস করে নাই, পরে অবিশ্বাস করিবার যখন আর কিছুই রহিল না, তখন তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছিল। আট বৎসর ধরিয়া অন্তরতম দেশে সুরেশচন্দ্র যাহা সঞ্চয় করিয়া আসিতেছিল, একটা ফুৎকারে লঘুতম বস্তুর ন্যায় তাহা

কোন্ শূন্যে উড়িয়া গেল? একে একে সব কথাই মনে পড়িল—মনের মধ্যে গোলমাল বাধিয়া গেল। শুধু তার বিশ্বাস ভাঙ্গিল তা নয়—বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

মায়ার বিবাহ? স্বেচ্ছায় আজ সে চিরজীবনের মতন কাহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, সুরেশ তাহা জানে না, কিন্তু ইহা যে সে খুব ভাল রকমই জানে একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে মায়া অগ্নি সাক্ষী করিয়াই তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যিনি শুধু সর্ব্বসাক্ষী তাঁহাকেই ত সেদিন মায়া সাক্ষী মানিয়াছিল। আজ সুরেশের মনে এই প্রশ্নই জোর করিয়া ঠেলা দিতে লাগিল যে সে তার অন্তর্যামীকে কি বলিয়া জবাবদিহি করিবে? আচার্য্য উপদেশ দিবেন যে দুইটি জীবনে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে চলিল, ইত্যাদি। সভাস্থ সকলে স্বস্তি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন—শুধু সর্ব্বসাক্ষী জানিবেন, ধর্ম্মের নামে এই আড়ম্বর অথবা এই আয়োজন কত বড় একটা ফাঁকি। জ্ঞানকৃত অপরাধে সমাজের আশীর্ব্বাদ লাভ করা একটা নূতন ব্যাপার নহে, কিন্তু উপাসনার মধ্য দিয়া সর্ব্বোপরি যাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হইবে, তাহা যে ভণ্ডামির নামান্তর মাত্র, একথা মায়া ত জানিবে। যে সমাজ কথায় কথায় জীবনে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেখেন, সেখানেই যে তাঁহার ইচ্ছা চিরদিন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। আপনার ইচ্ছাটাকে তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া চালাইয়া মানুষ এমনি করিয়াই খোদার উপর খোদগিরি করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের নামে অত্যাচার ধর্ম্মরাজ চিরদিনই চুপ করিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছেন।

যে জিনিষটাকে সত্য বলিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া সুরেশ এতদিন ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল, আজ তার ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া তার জীবনটা শূন্য হইয়া গেল। মেরুদণ্ডহীন ভালবাসা পঙ্গু হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল! বিগত দিনের অতীতকাহিনী বিদ্রূপের ন্যায় তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। সমস্ত জীবনের উপর দিয়া যে চূড়ান্ত একটা অভিনয় হইয়া গেল, তার দৃশ্যপটগুলি পহেলিকার ন্যায় এখন তাহার নিকট দুর্বোধ হইয়া পড়িল। জীবনে এত বড় পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া যে হইতে পারে ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া সত্যই সে হতবুদ্ধি হইল। মায়ার পরিবর্ত্তন—মতের না মনের? আজ অনেক কথা তাহার জানিবার ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু কোন কথা যে আর জানিবার উপায় নাই। চোখের আড়ালে যে পড়িয়াছে মায়া তাহাকে মনে রাখিতে পারে নাই, তাই চোখের সামনে যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই সে গ্রহণ করিয়াছে? তার এই গ্রহণের মধ্যেই আর একটা প্রাণের বিপুল বিসর্জ্জনের চিরশূন্য পরিণাম, তার জন্য যে মায়া কতদূর দায়ী একথা ভাবিবার—এখন তার অবসর অথবা শক্তি নাই কি? হায় রে সংসার।

(৪)

সকাল বেলা। সুরেশ চা পান করিতেছিল। মায়ার এই হঠাৎ আবির্ভাবের কথাটাই তখনও তাহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। সে যে দাবী করিয়া গেছে সে দাবী মিটান যে সুরেশের পক্ষে এক রকম অসাধ্য ব্যাপার—খুবই কঠিন বটে। কিন্তু যতই কঠিন হৌক ভালবাসার জের টানিয়া তার এই শেষ দাবিটুকু মিটাইতে হইবে। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, অভিশাপ দিলে সে ত আর মায়াকে ফিরিয়া পাইবে না। সে যদি আজ তার মনের গ্লানিটুকু মুছিয়া ফেলিয়া সত্যই মায়াকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারে, তাহা হইলে অন্ততঃ তার বুকের বোঝা নামিয়া গিয়া হালকা হইয়া যাইবে। বিষটুকু পান করিয়া নীলকণ্ঠ মহাদেবই হইয়াছিলেন। শরশয্যায় ভীষ্মদেব ইচ্ছা করিয়াই শুইয়াছিলেন। শক্তির পূর্ণতা আঘাতের দ্বারা প্রমাণিত হয় না, আঘাত সহ্য করাতেই তার প্রমাণ। সুরেশের জীবনে এত কঠিন পরীক্ষা কোন দিন সমুপস্থিত হইবে, তাহা সে ভাবে নাই—যাহা কখনও ভাবে নাই, আজ সেই ভাবনাই তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

মায়ার বিবাহের খবর পাইয়া সুরেশের ব্যথিত হৃদয় হইতে প্রার্থনাই উঠিয়াছিল, "হা ভগবান সংসারে বিচার নেই, তোমার কাছেও কি বিচার নেই প্রভো? তা না হ'লে এত অন্যায় চারিদিকে মাথা তুলে রয়েছে কেন?" কিন্তু আজ যখন অন্যায়কারী নিজে আসিয়া তাহার স্বামীর

মঙ্গলকামনাই ভিক্ষা চাহিয়া গিয়াছে, আজ বিমুখ করিয়া সত্যই কি তাহাকে সে নিষ্ফল করিবে? না, বিদীর্ণ বক্ষের তলদেশ হইতে আজ নিজেকে নিষ্ফল করিয়া স্নেহাশীর্বাদের অক্ষয় কবচখানি দুই হাত তুলিয়া তাহারই হাতে তুলিয়া দিয়া কঠোর কর্তব্যের দায়ে সম্পূর্ণ আত্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে! সে আর প্রতিশোধ চাহে না, বিচারপ্রার্থী হইয়া সে আজ তার আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহে না। মায়া দিয়া চাহিয়া গিয়াছে, বিচারের দ্বারা সে তাহাকে কোন মতেই বিমুখ করিতে পারিবে না।

চারু আসিয়া ডাকিল—'দাদাবাবু।' সুরেশের চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। সে একখানা চিঠি দিয়া চলিয়া গেল। চিঠিখানা হাতে করিতেই সুরেশের হাত একটু কাঁপিয়া উঠিল। চিঠি খুলিয়া সে পড়িতে লাগিল। চিঠিতে লেখা আছে —

কলিকাতা,
১৬শে চৈত্র—২৬।

আমি তোমাকে আসতে বলেছিলাম, আবার আমিই তোমাকে বারণ করে পাঠাচ্ছি। আমাদের বাড়ীর সকলে আজ এসে পৌঁছেচেন। দুই একদিনের মধ্যেই আমরা পশ্চিমে চলে যাচ্ছি।

তুমি এলে অবিশ্যি ভাল হ'ত, কিন্তু তা হল না। আমার গোটা কয়েক কথা বলবার ছিল, যাক্ সে সুযোগ এখন আর হল না, তাই লিখ্‌ছি।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে তুমি আমার স্বপ্নের কথা শুনে একটু হেসেছিলে। আমি নিজে যে স্বপ্ন বিশ্বাস করি তা নয়, তবে ঠেকলে কে যে কি বিশ্বাস করে এবং কি যে বিশ্বাস করে না, না ঠেকলে সেটা ঠাহর করা খুবই কঠিন। স্বপ্ন নয় এটা খুবই সত্যি যে তুমি যদি সত্যিই আমাকে ক্ষমা না কর তাহলে যে, বিধাতা আমাকে কোন মতেই ক্ষমা করবেন না। তাই আজ তোমার ক্ষমা চাই-ই। আজ কি জন্য পশ্চিমে যাচ্ছি তা তোমার অজানা নেই—ডাক্তার কিম্বা হাওয়া বদলানতে অসুখ সেরে যাবে সবাই মনে করছেন। শুধু আমার মন আমাকে বলে দিয়েছে যে তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে সবই পণ্ড হবে।

তুমি ভাবছ যে আমি কি ভয়ানক স্বার্থপর! সবচেয়ে অন্যায় যেখানটা করেছি বলেই ত ক্ষমা চাইবার সব চেয়ে সেখানটায় সাহস পাচ্ছি। যেটুকু তুমি জান, আর যেটুকু তুমি জাননা, তার মধ্য দিয়ে এমন একটা জিনিস এসে পড়েছে, তাতে তোমার মনের মধ্যে আজ যে কি বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে, তা যে আমি জানিনে, তা নয়—শুধু তাই কি তোমার বিশ্বাস এমন জায়গায় ঘা খেয়েছে, যা' সহ্য করে সংসারকে বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়েছে। যেটুকু কথা আমার তোমার সঙ্গে হয়েছিল সেটুকুই আজ আমার খুব মনে পড়েছে, তাই সাহস করে তোমাকে আজ আমি লিখছি। আমার ভয় ছিল আমাকে দেখে তুমি মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিন্তু তুমি তা কর নাই, তোমার যোগ্যই হয়েছে। তোমার বেদনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু মনে ঘৃণা নেই, রাগের লেশ মাত্র নাই। সমস্তটা যদি তুমি জেনে এরূপ করতে, তা'হলে আমি ততটা আশ্চর্য্য হতাম না। অন্যের পক্ষে যেটা একেবারে অসম্ভব হ'ত, তোমার পক্ষে সেটা হওয়া এইজন্যে সম্ভব যে তুমি সত্য পথের যাত্রী — যে ধর্ম্মকে রক্ষা করে চলে, ধর্ম্ম তাকে এমনি করেই বুঝি রক্ষা করে? আমার কাছে তুমিই তার প্রমাণ।

তবু আজ আট বছর পরে তোমার সঙ্গে সেই যদি আমার দেখা হ'ল, ভেবেছিলাম অনেক কথা তোমাকে বল্‌ব। কাল পারি নাই, আমার এখানে এলে বলব মনে করেছিলাম, কিন্তু তারও অবসর হ'ল না।

ইহকালকে তুচ্ছ করে পরকালের দিকে যে তাকিয়ে ছিল, আমি তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা আড়ালের সৃষ্টি করেছিলাম। আমার নিজের দিকটাই আমি তখন দেখে-ছিলাম, তাই তোমাকে চেয়েছিলাম। আমি ত এক রকম জোর করেই তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েছিলাম, আমি নিজে সেটা কেন ভাঙ্গলাম, তার ইতিহাস তোমাকে বলতে চাই না, বলার দরকারও নেই। ভালবাসা দিয়ে তোমার প্রতি অন্যায় করতেই চেয়েছিলাম, আজ ভক্তি দিয়ে তার শুধবে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। যে তোমার ব্রত, ভঙ্গ করবার জন্য একদিন তোমার কাছে এসেছিল,

সে আজ তোমার ব্রত রক্ষার জন্যেই দূরে সরে গেছে। সামান্য যা ভেঙেছি, তার চেয়ে মস্ত বড় জিনিস রক্ষা করেছি। যদি শুধু অপরাধই করতাম, তাহ'লে তোমার কাছে সত্যিই আর মুখ দেখাতে পারতাম না। এখন সব জানলে—আমায় ক্ষমা কর্বেনা? রুগ্ন স্বামী সেরে উঠলেই জানব যে সে তোমার আশীর্ব্বাদে - তখন সত্যিই বুঝব যে তুমি আমায় ক্ষমা করেছ। ইতি।

মায়া।

চিঠিখানা পড়িয়া সুরেশ চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল। তারপরে সহসা আপনার মনে বলিয়া উঠিল—'তবে তাই হোক্, মায়া! আমি তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব। ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তোমরা সুখী হও।'

হারু চায়ের টেবিল সাফ করিতে আসিয়া প্রশ্ন করিল—'চিঠিখানার জবাব দাদাবাবু!'

'কেন, লোকটা তারি জন্যে বুঝি দাঁড়িয়ে আছে?'

'আজ্ঞে না, সে ত চলে গেছে। আমি আছি।'

'না, হারু, জবাব দেবার কিছু নেই' —বলিয়া সুরেশ আবার তেম্নি ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হারু চলিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—দাদাবাবুর হ'ল কি?

অর্থ বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায়

ধারপত্র

মানব সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ক্ষেত্রে যতগুলি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী ও পরিচালন-পদ্ধতি অতি জটিল; তথাপি উহাকে অতি সুব্যবস্থিত ও সুবিন্যস্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। ব্যাঙ্ক একাধারে দায়ক ও মহাজন। আমানতী টাকার জন্য ব্যাঙ্ক দায়কের স্থান অধিকার করেন এবং তাহাই যখন ঋণদানে বাহির করিয়া দেন তখন মহাজনের স্থান অধিকার করিয়া বসেন। এইরূপে ঋণ গ্রহণ ও ঋণদান করিতে যাইয়া কতগুলি ধারপত্র (Credit Instrumentsএর) অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। আমরা নিত্য ব্যবহার্য্য ও অতি প্রয়োজনীয় কতগুলি পত্রের পরিচয় ও ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

১। পাশ বা রসিদ বহি (Pass-book)—যখন যে শ্রেণীর আমানতে টাকা আসিয়া জমা হয়, তাহা ব্যাঙ্কের হিসাবে লিখিত হইয়া, তাহা প্রাপ্তির নিদর্শনসূচক একখানা পাশ বা রসিদ বহি আমানতকারীকে দেওয়া হয়। আর এই আমানতী টাকা হইতে যখন যাহা উঠাইয়া নেওয়া হয়, তাহাও ব্যাঙ্কের হিসাবে খরচা লিখিয়া পাশ-বহি উপস্থিত করিলে, তাহাতে আদায়ের ঘরে লিখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময় গতে আমানতী টাকার কোন সুদ প্রাপ্ত হইলে তাহা ব্যাঙ্কের হিসাবে আমানতকারীর নামে জমা করিয়া পাশ-বহিতে লিখিয়া দেওয়া হয়। এই রসিদ বহিই ব্যাঙ্কের ঋণ-গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র। এতদ্ভিন্ন তাহার নিজ হিসাবও স্বীকৃতির কার্য্য করিয়া থাকে। এই স্বীকৃতি পত্রের উপরেই ব্যাঙ্ক হইতে সুদ সহ টাকা দাবী করিয়া লওয়া যায়। বিশেষ এই পাশ-বহি দৃষ্টেই যখন যে টাকা আমানত ও উঠাইয়া নেওয়া হয়, তাহারও পরীক্ষা করার সুবিধা হয়। পাশ-বহি উপস্থিত করিলেই এই সকল

লিখিয়া দেওয়া হয় এবং এইরূপ লিখিয়া দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কও কিছুকাল পর পর তাহা তলব করিয়া লেন।

এতদ্ভিন্ন ব্যাঙ্কের এই আমানতী হিসাবের দ্বারাই আর একটী গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে খাতায় হিসাব লিখাইয়া ধারে পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা চিরপ্রসিদ্ধ। এই জন্য ব্যবসায়ীর মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমভাবে চলিতে থাকিলে, তাঁহারা নিজ নিজ দেনা পাওনার হিসাব রক্ষা করেন এবং নিকাশ আমলে অথবা কিছুকাল পর পর পরস্পরের হিসাব পরীক্ষা করিয়া, যাঁহার কিছু দেনা দাঁড়ায় তাহাই মাত্র নগদ পরিশোধিত হইয়া থাকে। আর এক পক্ষ ক্রয় ও অপর পক্ষ বিক্রয় করিলেও হিসাবে বাকি লিখিয়া ধারে মাল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মূল্য পরিশোধ করিলেই সেই দেনা আদায় হইয়া যায়। ইহাকে book credit বা খাতায় বাকি বলে। এই হিসাবের নকল দায়িককে দিলে, তাহাকে "পরথাই" বলে। এই "পরথাই" ব্যাঙ্কের পাশ বহিরই স্থলাভিসিক্ত। কিন্তু ব্যাঙ্কের মধ্যবর্ত্তিতায় কার্য্য করিলে, এইরূপ দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ ও "পরথাই" লিখিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। টাকা দিয়া নগদ ক্রয় করাও ব্যয় ও শ্রমসাধ্য। ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া ধারে মাল ক্রয় করিলেও টাকা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। ধারে মাল ক্রয় করিয়া, তাহার মূল্য দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট বরাত চিঠি বা আদেশ-পত্র লিখিয়া দিলে ব্যাঙ্ক এই আদেশ-পত্রের লিখিত টাকা ব্যয় লিখিয়া আদিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়া দেন অথবা তাহার নামে হিসাব থাকিলে জমা করিয়া লন। সুতরাং মূল্যের টাকা পরিশোধ করার হিসাব ব্যাঙ্কই রক্ষা করেন, ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অন্য কোন হিসাবপত্র রাখা নিষ্প্রয়োজন হয়। সর্ব্বপ্রকার দেনা ব্যাঙ্কের যোগে পরিশোধ করা যায়; অথচ স্বয়ং কোন টাকা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

২। এই আমানতী টাকা উঠাইয়া দেওয়ার আদেশ-পত্রকে চেক (cheque) কহে। একমাত্র আমানতী টাকার উপরে এই চেকের প্রতিষ্ঠা হয়। আমানতকারী ভিন্ন অপর কাহারও চেক লিখিয়া ব্যাঙ্কের উপর আদেশ করার অধিকার নাই। ব্যবসায়ের দেনা পাওনা আদায় উসল করিবার নিমিত্তই এই চেকের অভ্যুদয়। এই আদেশ তিন ভাবে প্রদত্ত হইতে পারে এবং তদনুসারে চেক সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

প্রথমতঃ, স্বয়ং আমানতকারী কিম্বা অপর কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে টাকা দেওয়ার আদেশ। চেকের সাহায্য ভিন্ন আমানতকারী স্বয়ংও টাকা উঠাইতে পারেন না। সুতরাং স্বয়ং টাকা উঠাইতে হইলেও চেক লিখিয়া টাকা উঠাইয়া দেওয়ার আদেশ দিতে হয়। এই চেকই টাকা উঠাইয়া দেওয়ার দাবী সূচক নিদর্শক পত্র। স্বয়ং আমানতকারী অথবা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া টাকা লইলেই, আমানতী হিসাবে ব্যয় পড়িয়া এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হিসাব থাকিলে তাহাতে জমা দেওয়া হয় কি নূতন হিসাব লিখিয়া জমা করিয়া লওয়া হয়। ইচ্ছা করিলে নগদ টাকাও লইতে পারেন। নগদ না লইলে টাকা একদা ব্যবহৃত না হইয়া এক আমানতী হিসাব হইতে অপর আমানতী হিসাবে মাত্র পরিবর্ত্তিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাহার আদিষ্ট অপর কোন ব্যক্তিকে টাকা দেওয়ার আদেশ। প্রথম শ্রেণীর চেকে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেও টাকা দেওয়ার নির্দ্দেশ বা বরাত থাকে না। কিন্তু এই শ্রেণীর চেকে ঐ আদেশ থাকায় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি চেকের পৃষ্ঠে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া অপর কাহারও নাম করিয়া দিতে পারেন। তখন এই তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া টাকা লইতে বা আপন হিসাবে জমা করাইয়া দিতে পারেন। এই রূপে পর পর ভাবে পৃষ্ঠলিপি দ্বারা ইহা এক হাত হইতে অপর হাতে যাইতে যাইতে যখন শেষ ব্যক্তি উহা লইয়া উপস্থিত হন তখন তাঁহাকে টাকা দেওয়া হয়। শেষ ব্যক্তিকে টাকা দেওয়ার পরই কেবল আমানতকারীর হিসাবে এই টাকা খরচা পড়ে। এই সকল চেককে "to order" চেক বলা হয়।

তৃতীয়তঃ, উপস্থিতকারীকে টাকা দেওয়ার আম হুকুম যুক্ত আদেশ। যে কোন ব্যক্তি এই শ্রেণীর চেক লইয়া ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হন, তাঁহাকেই চেকের লিখিত টাকা দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর চেককে সত্ত্ব

ব Conditional এবং এই শ্রেণীর চেককে আম বা অসর্ত্তীয় Unconditional cheque বলা হয়। এই শ্রেণীর চেকের টাকা দেওয়ার সময়ে উপস্থিতকারীর কোন পরিচয় লইতে হয় না। কিন্তু অপর দুই শ্রেণীর চেকে উপস্থিতকারী প্রকৃত ব্যক্তি কি না, তাহার পরিচয় লইয়া তবে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সকল শ্রেণীর চেকেই লিখকের স্বাক্ষর প্রকৃত কি না, তাহা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক আমানতকারীর স্বাক্ষরের আদর্শ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত থাকে; তাহার সহিত চেকের স্বাক্ষরের সামান্য অনৈক্য হইলেও চেকের টাকা দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নির্দ্দিষ্ট চেক আছে। সেই চেক ভিন্ন টাকা উঠাইয়া লওয়া যায় না। মূল্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চেক ক্রয় করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেকখানা চেক দুই অংশে বিভক্ত। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চেক নম্বরযুক্ত বহি আকারে প্রস্তুত করা থাকে। উহার কতক অংশ ছাপন ও কতকাংশ লিখকের উদ্দেশ্য মত পূর্ণ করিবার জন্য সাদা থাকে। প্রত্যেক চেকের দক্ষিণাংশ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কাটিয়া চেক-গ্রহীতাকে দেওয়া হয় এবং বামাংশ লিখকের প্রয়োজনে ও হিসাব মিল করার জন্য তাহার হাতে থাকিয়া যায়। নূতন বহি আনিতে হইলে, পূর্ব্ব বহির এই অংশ ব্যাঙ্কে ফেরত দিতে হয়। ইতিমধ্যে পাশ-বহিতে হিসাব লিখাইয়া আনিয়া ইহার সহিত ঐক্য করিয়া ফেরত দেওয়া হয়।

যিনি চেক লিখিয়া ও কাটিয়া স্বাক্ষর করেন তাঁহাকে Drawer বা লিখক বা স্বাক্ষরকারী বলা যায়; যাহাকে টাকা দেওয়ার বরাত বা আদেশ দেওয়া যায় তাহাকে "Payee" বা প্রাপক এবং যাহার উপরে টাকা দেওয়ার আদেশ বা বরাত দেওয়া যায়, তাহাকে drawee বা দায়িক বা দায়ক বলা হয়। প্রথম শ্রেণীর চেককে to bill or to cheque, দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'to order' এবং তৃতীয় শ্রেণীকে 'to bearer' চেক বলা যায়। শ্রেণীবিভাগে দায়িত্বের ও কার্য্যের পার্থক্য প্রদর্শন জন্য এই সকল নামকরণ হইয়াছে।

চেকে কোন সময়ের উল্লেখ থাকে না। উপস্থিত হইয়া দাবী করা মাত্র দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। আমাদের এদেশে চেকের টাকা উপস্থিত হইয়া দাবী করা মাত্র দেওয়ার নিয়ম রাষ্ট্র বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যদি কোন কারণে ব্যাঙ্ক টাকা দিতে অস্বীকার করেন তবে, তাহাকে ব্যাঙ্কের পরিভাষায় dishonour বা অগ্রাহ্য করা বলে। এইরূপে কাহারও উপস্থিত করা চেক 'অগ্রাহ্য' করা হইলে, তিনি লিখক এবং চেকের পৃষ্ঠে কাহারও স্বাক্ষর থাকিলে, তাহাদের সকলকে জড়িত করিয়া নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না। লিখক ও পৃষ্ঠলিপিকারকগণ যৌথভাবে দায়ী হইলেও প্রকৃত ও শেষ দায় লিখকেই থাকিয়া যায়। পৃষ্ঠ লিখক মধ্যে কাহারও নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইলে, তিনি পুনরায় লিখক হইতে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। এইরূপে লিখকই মূল দায়িক বলিয়া গণ্য। শেষ গ্রহীতার নিকট মাত্র পৃষ্ঠ লিখকগণের দায়িত্বের উদ্ভব হয়। এইভাবে চেক-গ্রহীতা নিরাপদ হন। রাষ্ট্র বিধি এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রথা-নিয়ম (customs and usages) অনুসারে এই সকল বিভিন্ন দায়িত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে।

আমানতকারী ভিন্ন অপর কাহারও চেক কাটিয়া ব্যাঙ্কের উপর টাকা দেওয়ার আদেশ করার অধিকার নাই। ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কের উপরে টাকা দেওয়ার আদেশ প্রদান করার অধিকার লাভ করায় একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে। এতদ্ভিন্ন কাহাকেও কোন নগদ টাকা কিম্বা খরিদা মালের মূল্য পরিশোধ করার আবশ্যক হইলে, নগদ আদায় করার শ্রম স্বীকার না করিয়াও একখানা চেকের সাহায্যে তাহা পরিশোধ করা যায়। আর উহা দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর চেক হইলে, এক হাত হইতে অপর হাতে যাইয়া মুদ্রার ন্যায় পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তিতা করিতে সমর্থ হয়। তদ্দ্বারা ধারের ক্ষিপ্রতা সাধিত হয়। ইহার প্রকৃত ফলাফল কি, তাহার আলোচনা পরে হইবে। সম্প্রতি ইহাই বক্তব্য, চেকের প্রভাবে ব্যাঙ্কের মাতব্বরীর আশ্রয়ে লিখকের ব্যবসায় সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় এবং

ধারের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন ব্যাঙ্কে আমানত করিয়া হিসাব খোলার অন্য সার্থকতাও আছে। ব্যাঙ্কে যাঁহার নামে হিসাব আছে, তিনি অপর হইতে যখন যে চেক প্রাপ্ত হন, তাঁহার লিখিত টাকা আদায় করিয়া তাঁহার হিসাবে জমা দেওয়ার জন্য নিজ ব্যাঙ্কের নিকট উহা প্রেরণ করিয়া দিতে পারেন এবং ব্যাঙ্কও এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদি একই ব্যাঙ্কে উভয়ের হিসাব থাকে, তবে তাঁহাদের পরস্পরের হিসাবে জমা ও খরচা লিখিয়া লইলেই হইল। আর যদি অন্য কোন ব্যাঙ্কের উপরে টাকা দেওয়ার আদেশ থাকে, তবে সেই আদিষ্ট ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনাইয়া জমা করিয়া লওয়া হয়। এই সকল সুবিধা সুযোগ লাভ করিবার জন্য বড় বড় উৎপাদক ও বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ কোন না কোন ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব খোলা রাখেন। এই সকল কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্ক কোন পারিশ্রমিক দাবী করেন না; আমানতকারীদিগের সুবিধার জন্য বিনা পারিশ্রমিকে তাহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

ক্লিয়ারিং হাউস

এই ভাবে ব্যাঙ্কের মধ্যবর্ত্তিতায় চেকের লিখিত টাকা এক আমানত হিসাব হইতে উঠিয়া অপর আমানত হিসাবে যাইয়া জমা হয়। দৈনন্দিন হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে জমার জন্য যে সকল চেক আসিয়া জড় হয়, তাহার একভাগ তাহার নিজের উপর টাকা দেওয়ার আদেশ, এবং অপর ভাগ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উপরে ঐরূপ আদেশ, যাহা আদায় করিয়া আনিয়া জমা করিতে হইবে। এই দ্বিতীয় ভাগের প্রভাবে এক ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা উঠিয়া যাইয়া অপর ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা হয়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে কোন ব্যাঙ্ককেই নগদ বেশী টাকা বাহির করিয়া দিতে হয় না, কেবল বাদ কাটাকাটি করিয়া পরস্পরের দেনা পাওনা নির্দ্ধারণ করার পর যাদ কাহারও কিছু দেনা হয়, তাহাই মাত্র নগদ পরিশোধিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পরস্পরের দেনা পাওনা নির্দ্ধারণ জন্য বড় বড় কেন্দ্রে একপ্রকার প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছে, ইহাকে ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing house) কহে। ইহাও এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক। ইহার সহিত অন্যান্য ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা থাকে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক হইতে কিছু কিছু টাকা ইহাতে আমানত করিয়া, ইহার মধ্যবর্ত্তিতায় এই বাদ কাটাকাটির কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। উহা অন্যান্য ব্যাঙ্কের মধ্যে মধ্যবর্ত্তিতার কার্য্য করেন। সকল ব্যাঙ্কের চেক যাইয়া উহাতে জমা হয়, এবং বাদ কাটাকাটির পর যাহার যে দেনা হয়, তাহাও তাহার নামীয় আমানতী হিসাবে খরচা লিখিয়া প্রাপক ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা করিয়া কিম্বা নগদ আদায় করাইয়া দেন। এই ভাবে দৈনিক ব্যাঙ্ক সমূহের দেনা পাওনা পরিষ্কার হইয়া যায়।

বর্ত্তমান যুগের ইহা একটা বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান। ১৭৭৫ খৃঃ পূর্ব্ব পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার অনুরূপ কোন অনুষ্ঠানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক তাহার কোন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়া অপর ব্যাঙ্কের সহিত চেকের দেনা পাওনার হিসাব পরিষ্কার করিতেন। এই ভাবে লোক প্রেরণ ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ দেখিয়া এই সনে লণ্ডন সহরে বর্ত্তমান ক্লিয়ারিং হাউস বা বাদ কাটাকাটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৫ খৃঃ উহার যে হিসাব প্রকাশ হয়, তাহাতে দেখা যায়, দৈনিক বাদ কাটাকাটির পর গড়ে শতকরা পাঁচ মুদ্রার বেশী নগদ আদান প্রদান করার আবশ্যক হয় নাই। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের সহিত অন্যান্য সকল ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা আছে। ইহারই কর্তৃত্বাধীনে এই ক্লিয়ারিং হাউসের যোগে চেকের হিসাব পরিষ্কার হয়। পৃথিবীর সকল ব্যাঙ্কের সহিতই প্রায় এই হাউসের সম্বন্ধ আছে। ইহা পৃথিবীর কেন্দ্র হাউস্ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহাতে বার্ষিক প্রায় তের হাজার কোটী টাকা মূল্যের চেকের বাদ কাটাকাটি যাইয়া থাকে; অথচ নগদ মুদ্রা অতি সামান্যই ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্কের ক্লিয়ারিং হাউস ইহার তুলনায়।

৩। ড্রাফট্ (Draft)—ইহাও এক প্রকার চেক। জন সাধারণ ও ব্যবসায়ীদিগের আমানতী টাকার উপরে, চেকের প্রতিষ্ঠা হয়। যেমন এক ব্যাঙ্কের টাকা অপর ব্যাঙ্কে জমা থাকিলে, তাহা উঠাইয়া নেওয়ার জন্য যে চেক

কাটা হয়, তাহাকে চেক না বলিয়া ড্রাফ্‌স্‌ বলা হয়। লিখকের পার্থক্য পরিজ্ঞানের জন্য ইহার এই বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে। জন-সাধারণ কিম্বা ব্যবসায়িগণ তাহাদের আমানতী টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের উপরে যে আদেশ দেন, তাহাকে চেক এবং এক ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ককে তাহার আমানত উঠাইয়া দেওয়ার যে আদেশ দেন তাহাকে ড্রাফ্‌ট্‌ বলা হয়।

তবে এই ড্রাফ্‌ট্‌ সমূহের অন্য কিছু উপযোগিতাও আছে। কাহাকেও বিদেশ যাইতে হইলে, তিনি দেশস্থ কোন সম্রান্ত ব্যাঙ্ক হইতে সেই বিদেশস্থ ব্যাঙ্কের উপর টাকা দেওয়ার আদেশসূচক একখানা ড্রাফ্‌ট্‌ লইয়া গেলে, সেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া কিম্বা নিজ নামে আমানত হিসাব লিখাইয়া তাহার যোগে বিদেশের টাকার প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এই ভাবে বিনা খরচায় একস্থান হইতে অপর স্থানে টাকা প্রেরণ করা যায়। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, দূরদেশে টাকা লইয়া যাওয়ার মধ্যে যে বিপদপাতের আশঙ্কা ও ব্যয় বাহুল্য আছে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জর্ম্মণীতে এই কার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তথায় যে কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া ড্রাফ্‌ট্‌ লইলে, তাহার সাহায্যে দেশের যে কোন স্থানে যে কোন পরিমিত টাকা বিনা ব্যয়ে প্রেরণ করা যায়। বিদেশ হইতে নগদ মূল্যে মালামাল ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ব্যবসায়িগণ এইরূপ ড্রাফ্‌ট্‌ লইয়া যান। (ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব

[শ্রীরাধাবল্লভ নাগ]

সূর্য্য ওঠেনি তবু চারদিক ফর্সা।
শরতের বায়ু বহে—নয় এত বর্ষা।
আঁধারের ঘোর নাই—তেজ নাই আলোকের
চারদিক সাদা শুধু বলাকার পালকের।

এ যেন রে শিশুহাসি দাঁতহীন অধরে
গোলমাল নেই কিছু অন্দরে সদরে।
বিধাতার সাদা খাতা দাগ নাই আঁচরের
কাটা নেই কোটা নেই কিছু নেই পোঁচরের।

এ সময়ে সকলেই পরাণের সখা যে!
কেটে যায় দিন রাত হাসি খেলা অকাজে!
বৃথা রোষ, বৃথা রাগ, বৃথা মান অভিমান
নিমেষেই টুটে গিয়ে জেগে ওঠে হাসি গান।

থাক্‌ তবে এমনই, রবি যেন ওঠে না—
কুঁড়ি ধরে থাক্‌ শুধু, ফুল যেন ফোটে না।
যত জ্বালা জেগে ওঠে ছুটিলেই গন্ধ
ব্যথা সব ধেয়ে আসে টুটিলেই বন্ধ।

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

কিন্তু আমার এই বিফল পূজার পূর্ণ ফলও যে একজন নিজে বয়ে এনে দিচ্ছে, তার কথা যেন বলতে না ভুলি। সে কে? সে দয়াময়ী হাসিদেবী—বিশ্বের হাসির প্রতীক নয়, একেবারে জমাট প্রতিমা, বিশ্বলক্ষ্মীর মূর্ত্তি বিগ্রহ! এ যে কেন এমনি ভাবে আমার মায়ের আড়াল হতে আমাকে ঘিরে ফেললে তা যে বুঝতে পারছি নে! তা কি কেউ তোমরা বুঝিয়ে দেবে? আমার স্বর্গগত মালিকের মহা বৈরাগীর সংসারে এমন লক্ষ্মীর পদ্মাধারটী কি করে ফুটল? কে ফোটালে? কার জন্যে ফোটালে?

কার জন্যে ফোটালে? আমারি জন্যে—আমারই জন্যে যার আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেই ফোটালে, যার বিশ্বমানসে প্রত্যেকের জন্য সবের, সবারই জন্যে প্রত্যেকের জন্ম হয় তারই এই কারসাজী। কিন্তু কারসাজা ধরা পড়ে যাচ্ছে। এইটেই সেই চিরগুনা বোকা মেয়ে বুঝি বুঝছে না।

বুঝছে না? তাই বা কেমন করে হবে? সে যদি না বোঝে ত' এই হাসিই বা কি করে সব বুঝে ফেলে। আমার কি চাই, কোন্ সময় কোন্ মুহূর্ত্তে কি দরকার তা সবই কি করে এ বুঝলে? আমার ঘরখানা কি করে ঠিক এমনি ভাবে মন ভুলান হয়ে উঠ্‌ল। এমন সব ছবি—এমন ফুলের অর্ঘ্য, এমন বিচিত্র মালা, এমন সব রঙ্গিন খেলনায় কেন আমার ঘরখানা ভরে উঠ্‌ল!

আবার ঐ অত শোভার সম্ভারের মাঝখানে এমন একটা ভিখারীর ছবিকে এমনি ভাবে শ্বেত পাথরের হোয়াট্‌নটের ওপর গোলাপ আর পদ্মের মালার ফ্রেমে কেন সে বসিয়ে দিয়েছে? এই এত রূপের, এত আলোর মাঝখানে ঐ ভিক্ষাপাত্র হাতে জগদেক-ভিখারী বুদ্ধদেবকে কেন সে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে? সে কি প্রায় প্রথম দর্শন হতেই টের পায়নি? সে কি না জেনেও জানে নি? যে অমনি করে তাদেরই দ্বারে এই হতভাগা কামুকটা পতিত মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে?

সে টের পেয়েছে ভাই, অনেক আগেই টের পেয়েছে, কারণ সে সবারই সব খোঁজ রাখে যার কাছে কিছুই হারায় না সে সর্ব্বনাশী সর্ব্বলোলুপাই যে এই মানুষটার প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে ঢুকে এর অন্তর বাহির সবটুকুকে তাতিয়ে রাঙ্গিয়ে ভরিয়ে তুলছে।

কিন্তু আমি কবে এবং কি করে এ কথা জানতে পারলাম? সে একটা গোপন কথা—তবু বলতে হবে? আচ্ছা বলছি। আমার মধ্যে যে একটুও আড়াল রাখতে দেবেনা তোমরা তা জানি, আমার সব অহংকার যে তোমরা ধূলোয় মিশিয়ে দেবে তা আগেই বুঝতে পেরেছি। তবে শোনো—

আমার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল, ঠিক আমার নয় আমাদের তিন জনের। আমার যিনি সেই যোগীগুরু—মন্ত্রগুরু জ্ঞানগুরু তিনি, আর সেই আমার হিমালয়ের সেই বন্ধু সাথী সখা এবং কর্ম্মগুরু সেই ভূরিয়ানন্দ স্বামী আর এই অধম মানুষটার তখনকার চেহারার ফটোগ্রাফ আমার গুরুদেবের এক শিষ্য তুলে আমাদের তিন জনকে দিয়েছিলেন। আমি তা যত্ন করে ঝোলায় রেখেছিলাম, এবং এখনো ওটা রেখেছি। কেন? তা কি বলতে হবে? এই শরীরটার ওপর, এই বিকশিত আমিটার ওপর চিরদিনই আমার বোধ হয় লোভ ছিল! তাই রেখেছিলাম—ফেলিনি।

কিন্তু ফটোগ্রাফখানা বেরুল কি করে, তা ঠিক

বুঝতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমার জিনিষপত্র ঘাঁটা মার যেমন একটা কাজ হয়েছিল, বোধ হয় হাসিদেবীরও একটা কাজ হয়েছিল। আমি যখন চৌটর কাজে বাইরে থাকতাম, তখন এই দুটী নারী-হৃদয় আমাকে নিয়ে কি যে করত তার সঠিক খবর আমি দিতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে মা আমার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া যা কিছু বলবার সবই বলে ফেলেছিলেন। এবং সেই আমার যেটুকু অংশ ধরা পড়েছিল তা নিশ্চয়ই এই অদ্ভুত নারীর মনে এমন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল যাতে এই সেবাপরায়ণাকে আমার জন্য অনেক সময়েই ভাবিয়ে তুলত।

সেই ভাবনাকে মূল করে এই ফটোখানার ওপর সেদিন মার সঙ্গে তাঁর তর্ক হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র কাছারী হ'তে ফিরে মার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে দেখে তাঁদের তর্ক থেমে গেল। হাসি তাড়াতাড়ি ফটোখানি লুকালে। মা কিন্তু সে লুকোচুরী রাখতে দিলেন না—ফটোখানা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'প্রিয়, তোর বাক্সে এ কাদের ফটো রে?'

আমি চমকে বল্লাম, 'কৈ দেখি।' ফটোখানা হাতে পেয়েই আমার হাত কাঁপতে লাগল—আমি বল্লাম, 'কেন বল ত? এদের কি তোমরা চেন নাকি?'

মা বল্লেন, 'আমি ত' একজনকেও চিনতে পারছি নে, তবে এই মানুষটার মুখ যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

'কার মত মনে হচ্ছে?'

'যেন তোরই মত।'

আমার মুখটা তখন কি রকম হয়েছিল বলতে পারি না, কিন্তু বুকের মধ্যে যে একটা তোলপাড় চলছিল সেটা গোপন করব না। আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, 'হলেই বা আমার মত, আমিই যে তা ত জোর করে বলতে পার না।'

মা দেখে দেখে বল্লেন, 'না, তা ঠিক বলা যায় না।'

আমি হাঁফ ছেড়ে বল্লাম, 'ও আমার তিনটি চেনা লোকের ছবি। কিন্তু এটা তোমরা পেলে কোথায়?'

মা এইবার ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, 'তোর বাক্সর মধ্যেই পেয়েছি। বাক্স গোছাতে গিয়ে—'

আমি একবার হাসির মুখের দিকে চাইলাম তারপর বল্লাম, 'তা বেশ করেছ, তাতে আর এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন? এখন দাও ওখানা রেখে দিই—ওদের তোমরা চেন না; কি করে চিনবে?'

এইবার হাসি কথা কইলে, বল্লে, 'আমি কিন্তু ওর মধ্যে দু জনকে অন্ততঃ ধরতে পেরেছি বলে মনে হয়।'

আমি প্রাণপণ বলে জোর করে বল্লাম, 'আপনি ত' আর কালিদাস নন যে বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী ভানুমতীর তিলটী হ'তে বনের বাঘ ভালুকের কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবেন। আপনাদের বাড়ীতে বহুদিন হ'তে সন্ন্যাসী মহারাজরা যাতায়াত করছেন, হয়তো কারুর সঙ্গে এদের মুখের সাদৃশ্য আছে। তাই বলে এরাই যে তারা তার কোনো মানে নেই, অন্ততঃ একটীর বিষয় আমি ঠিক জানি যে কখনো তাকে দেখেন নি।'

হাসি বল্লে, 'কোন্‌টীর বিষয় শুনি?' আমি আমার চেহারাটা দেখিয়ে বল্লাম 'অন্ততঃ একে কখনো দেখেন নি।'

'কি করে জানলেন?' আমি জেরায় পড়ে জব্দ হবার মত হলাম, তবু সাহসে ভর করে বল্লাম 'আমার ইনি খুব চেনা লোক, ইনি কখনো এখানে আসেন নি তা জানি।'

হাসি হাসিহীন মুখে উজ্জ্বল চোখে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর বল্লে, 'ঠিক জানেন আসেন নি?'

আমি বল্লাম, 'ঠিক জানি, ইনি, ঠিক ইনিই কখনো আসেন নি। আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না—'

আমার কথা শেষ হ'তে না দিয়ে হাসি বল্লে, 'বিশ্বাস করা না করা ত' আমার হাত নয়। যাক, ও নিয়ে তর্ক করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই আর একটী লোককে যে আমি দেখেছি এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, 'সে কি! কবে দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন?'

'এইখানে, ঘণ্টা দুই আগে।'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। হাতের ফটোখানা যে কি জোরে কাঁপতে লাগল তা বলতে পারিনে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলে নিয়ে বল্লাম, 'ইনি এইখানেই আছেন, তার আমি জানি নে! আশ্চর্য্য!'

হাসি এইবার হেসে উঠলেন, কিন্তু সে হাসিটা যে ঠিক হাসির মত শুনিয়েছিল তা যেন মনে হল না। হাসি বল্লে, 'আপনি অনেক খোঁজই রাখেন না, যাক আপনার এক বন্ধুর খোঁজ দিলাম যদি দেখা করতে চান ত' বড় বাগানে গিয়ে দেখা করে আসবেন।'

মা এতক্ষণ চুপ করে এই প্রগল্‌ভা রমণীর কথা শুনছিলেন। কি যে তাঁর মনে হচ্ছিল জানি না, কিন্তু আমি যে খুব একটা মুস্কিলে পড়েছি তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি বল্লেন, 'সাধু দর্শন! সে তো খুব ভালকথা, আজই আমায় নিয়ে চল না মা আমি দেখে আসি। প্রিয় যখন সময় পাবে যাবে অখন, এখন ওর জলখাবারটা এনে দিই তুমি দাঁড়াও।'

হাসি কিন্তু দাঁড়াল না—বল্লে, 'না মা এখন নয়, দিদি হয়ত আমায় খুঁজছে, তার সন্ধিসা পূজোর সময় উত্তীর্ণ হচ্ছে, আমি যাই, কাল আপনাকে নিয়ে যাব।'

হাসি চলে গেল—মাও বেরিয়ে গেলেন, আমি কেবল অবাক হয়ে যে পথে ঐ অপূর্ব্ব মায়ামূর্ত্তি অন্তর্ধান করলে সে দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম। (ক্রমশঃ)

প্রেত তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

অতি অল্প প্রেতই মিডিয়মের মুখ দিয়া কথা বাহির করিতে পারে; কিন্তু সকলেই তাহার হাত দিয়া লেখা চালাইতে পারে। এই আলোকের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে প্রেরিত বার্ত্তার গুণাগুণ নির্ভর করে। মিসেস্ পাইপার যখন পীড়িত বা অসুস্থ হন তখন এই 'আলোর' জ্যোতি কমিয়া যায়; বাহিত বার্ত্তাগুলিও তেমন সুবিধা মত হয় না। একটা বৈঠকের সময়ের মধ্যেই এই আলো' খরচ হইয়া যাইতে পারে; এবং যেমন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে বার্ত্তাগুলার অর্থ সঙ্গতিও কমিতে থাকে; অধিকারী প্রেত খুব দক্ষ ও বুদ্ধিমান আলাপকারী হইলেও এই আলোক ঘটিত অসুবিধা দূর করিতে পারেন না। সব ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে প্রেত এই আলোক সংযোগে আসিলেই ভ্যাবা-চ্যাকা লাগিয়া যায়; এবং এই সংযোগ বহুক্ষণব্যাপী হইলে আলোটা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসে, এবং আলাপকারী প্রেতের চৈতন্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। পার্থিব আকর্ষণ বলে প্রেত যখন এইরূপে মিডিয়ম দেহে আবির্ভূত হয়, তখন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কাছে নিজেকে উপস্থিত দেখিয়া তাহার চিত্তটা নানাভাবের (সুখ, আনন্দ, ভালবাসা, স্নেহ) প্রবল বন্যায় যেন ভরিয়া উঠে; পার্থিব জীবনে যে সব চিন্তা বা ভাব তাহাকে বেশী আকুল করিত তাহাই এ সময়ে পুনরায় জাগিয়া উঠে; আত্মীয় স্বজনকে উপদেশ, পরামর্শ বা সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে; এদিকে sitter (সংবাদ বা বার্ত্তা-গ্রাহক) তাহার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে অপ্রাসঙ্গিক যা' তা' একটা প্রশ্ন করিয়া বসে, প্রেত বেচারী ঘাবড়াইয়া যায়; কোন উত্তর দিতে পারেনা, মূঢ়ের মত চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে আলোর সংযোগ হারাইয়া ফেলে ও ছাড়িয়া যায়, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে –

পৃথিবীর সহিত আলাপ করিবার সুবিধা সুযোগ পাইলেই দলে দলে বিরহী মুক্তাত্মা আকর্ষণ কেন্দ্রে আসিয়া জোটে; সকলেই নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের সহিত আলাপ করিতে ব্যস্ত হয়; অথচ আলাপ করিবার উপযোগী ক্ষমতা সকলের থাকে না—এইজন্য তাহাদিগকে একজন অধিকারী প্রেতের সাহায্য লইতে হয়। এই অধিকারী প্রেত অনেক সময় নিজে আলাপ করিতে আসে না, অনুগ্রহবশতঃ, অক্ষম অথচ আলাপ ইচ্ছুক প্রেতদের মুখপাত্র হইয়া আসে। যে প্রেতাত্মার সহিত আলাপ করিবার জন্য বৈঠক হয়, বা যাহার সহিত প্রধানতঃ আলাপ হয়—তাহাকে মুখ্য আলাপকারী বলে (Direct communicator); এ ছাড়া আলাপ-উৎসুক, পরিচিত-অপরিচিত অনেক আত্মাই মিডিয়মের কাছে ভিড় করিয়া থাকে; সকলেরই নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা; ইহারা গৌণ আলাপকারী (Indirect communicator)। অধিকারী অনেক সময় ইহাদের লইয়া ব্যতিব্যস্ত হয়; একজনের বার্ত্তা পাঠাইতে গিয়া অপরের বার্ত্তা পাঠাইয়া দেয়; অনেক সময় পরস্পরের কথা বা মনোভাব বুঝিতে পারে না। কাজেই অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়া যায়। এ পারে পরীক্ষকদিগের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হইয়া পড়ে। এইজন্য সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষের এই কার্য্যে সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে ইদানীং অনেক ক্ষমতাশালী দক্ষ মুক্তাত্মা (সমিতির মৃত সভাগণ) স্বয়ম্ভিচ্ছু হইয়া অধিকারীর কাজ করেন, তাঁহাদের প্রভাবে গৌণ আলাপকারী প্রেতের দল অকারণ গোলমাল বা বাধা দিতে পারে না।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ছোটখাটো আপত্তির কথা উঠিয়াছিল তাহার বিচার করা যাউক।

প্রথম আপত্তি—প্রেতেরা গম্ভীর বা উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলে না, অতীত জীবনের বাজে, অনাবশ্যক অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটী লইয়া আলোচনা করে। এ আপত্তির কোন মূল্য নাই। আপত্তিকারী যদি চিৎ-তত্ত্ব সমিতির উদ্দেশ্য বুঝিতেন তাহা হইলে একথা বলিতেন না। পরকালের খবরাখবর, ধর্ম্ম বা দর্শন তত্ত্বের বক্তৃতা প্রেতেরা যে দেয় না তা নয়, এরূপ পুস্তক অনেক আছে যাহাতে সেরূপ সংবাদ রাশি রাশি লিপিবদ্ধ আছে। Stead সাহেবের After death; Stainton Moses-এর Spirit Teachings, প্রভৃতি বহু বহু এই জাতীয় পুস্তকে এই ধরণের সংবাদ আছে। কিন্তু চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির উদ্দেশ্য পরজীবন সম্বন্ধে খাঁটী বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া, ধর্ম্ম বা দর্শনতত্ত্ব শিক্ষা নহে। মরণান্তে জীবাত্মা যে সত্যই স্বতন্ত্র ভাবে বিদ্যমান থাকে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই, মিডিয়মে ভরগ্রস্ত প্রেতাত্মা সে সত্যই অমুক ব্যক্তির আত্মা তার প্রমাণ কি? তার কথা কে বিশ্বাস করিবে? কাজেই প্রমাণের ভার তাহার উপর। এরূপ স্থলে প্রেত যদি এমন কোনো সংবাদ দিতে পারে যা অতি গোপনীয়, অর্থাৎ যা জীবিত দু একজন ছাড়া আর কেহ জানে না, এবং সে দু একজনও, মিডিয়মের জানিত নহে এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, তাহা হইলেই প্রমাণটা বলবৎ ও বিশ্বাস্য হয় না কি? পরলোকের অবস্থা বা দৃশ্য বর্ণনা করিলে, তাহা মিলাইয়া লইবার উপায় কি? সে যে সত্য বলিতেছে তাহার প্রমাণ কোথায়? উহা মিডিয়মের পাঠ বা শ্রুতিলব্ধ জ্ঞান হইতে পারে সুপ্ত চৈতন্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। কাজেই ছোট খাট তুচ্ছ অপরের অজানিত নিজ জীবন-স্মৃতির দ্বারাই প্রেতের আত্মত্ব বা স্বদিৎত্ব (identity) উত্তম ভাবেই প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি—প্রেতাত্মাদের বাহিত বার্ত্তাগুলিতে এত ভুল হয় কেন?—হওয়াটাই স্বাভাবিক নয় কি? প্রেতাত্মারা মানুষেরই আত্মা তো? মানুষে আর প্রেতে তফাৎ কি? মানুষের স্থূলদেহ আছে, প্রেতের স্থূল দেহ নাই। মানুষ হইল দেহকারাবাসী অমর আত্মা, প্রেত হইল দেহকারামুক্ত অমর আত্মা। আসলে দুই সমান, আবরণে যা ভেদ। স্থূলদেহ নাশ হইলেই জীবাত্মা যে অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান হইয়া যাইবে তাহার কিছু মানে আছে কি? পৃথিবীতে থাকিলেই ভুল করিবে, পৃথিবী ছাড়িলেই যে ভুল করিবে না ইহা ঠিক নয়। মানসিক শক্তি, চরিত্র, স্বভাব, রীতিনীতি সমস্তই প্রেতের বজায় থাকে, থাকেনা স্থূল দেহটা। কতকটা জড়ত্বাদ্

মুক্ত হয় বলিয়া এবং জড় ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হয় বলিয়া সূক্ষ্ম জগতের অনেক সুবিধা ভোগ করিতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া শক্তির সীমা বশতঃ অজ্ঞানতা বা অক্ষমতার হাত হইতে নিস্তার পায় না। ভুল ভ্রান্তি বা বুদ্ধিভ্রংশ হইবার নিম্নলিখিত কারণগুলি বিবেচ্য ঃ—

(ক) প্রেত যে আলাপকালে অপরের দেহ যন্ত্র ব্যবহার করে, তাহাই একটা বাধা। নিজ অভ্যস্ত যন্ত্র নাই, অনভ্যস্ত একটা পরের যন্ত্র লইয়া কাজ করার একটা অসুবিধা আছেই।

(খ) অন্য দেহযন্ত্র ব্যবহার করিবার মত কৌশল বা দক্ষতা সব আত্মার থাকে না, কাজেই ভুল ভ্রান্তি অনিবার্য্য।

(গ) নানা লক্ষণে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে পরলোকে আত্মার অবস্থা অনেকটা স্বপ্নাবস্থার মত, তন্দ্রাভিভূতের চৈতন্য যে অবস্থায় তেমনি; অন্ততঃ জড় planeএ আসিয়া পড়িলে সেইরূপ হয়, স্থলচরের জলে, বা জলচরের স্থলে পড়িলে যা যা হয় সেইরূপ।

(ঘ) মিডিয়মে ভর করিবার পর পৃথিবীর নৈকট্য-বশতঃ প্রিয় আত্মীয় স্বজনের ভাবাবেগে তাহাদেরও ভাব চাঞ্চল্য ঘটে ও হঠাৎ বন্যার মত নানা ভাব, চিন্তা, মনের মধ্যে ভিড় করিয়া উঠে, সে অবস্থায় এপার হইতে হঠাৎ একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন গিয়া পড়িলে ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইবার মত হইতে পারে না কি? বহুকাল পরে পিতা বাড়ী আসিয়াছেন, অদর্শনকাতর ছেলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া গিয়া বাপের আদর সোহাগ চাহিবে এমন সময় বাপ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন--Euclidএর পঞ্চম প্রতিজ্ঞার সংজ্ঞা বলতো দেখি? ছেলে একটা ছোট খাটো Laplace Newton হইলে কি করে জানি না, তবে সাধারণ ছেলে যে ঘাবড়াইয়া যাইবে তার আশ্চর্য্য কি?

(ঙ) মৃত্যুর কঠিন আঘাতে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম দেহের বিচ্ছেদ হওয়ার পর, একটা শারীর-প্রতিক্রিয়া হয়; সূক্ষ্ম শরীর ও পূর্ব্বস্মৃতি শক্তি তাহার কতকটা ফল ভোগ করিবেই, তা ছাড়া স্মৃতির সে পুরাতন যন্ত্র যাহা তাহার অভ্যস্ত ছিল তাহা আর এখন নাই, এরূপ ক্ষেত্রে স্মৃতি-ভ্রংশ ঘটে না কি?

(চ) ইহলোক হইতে পরলোকের একটা দৃশ্যগত বা অবস্থান ও অবস্থাগত তারতম্য আছেই, হঠাৎ ঘন অন্ধকার হইতে নূতন দেশের আলোর ঝলকে গিয়া পড়িলে একটু ধাঁধাঁ লাগিবার মত হয়; এই ধাঁধাঁ ভাবটা কিছুদিন ধরিয়াই থাকে। এ অবস্থার মধ্যে প্রশ্ন করিলে উত্তরে একটু গোলমাল হইবেই।

(ছ) জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিতে পারে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিষয় বোধ বা ধারণা বদলাইতে পারে।

(গ) প্রেতরা অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে; এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নহে। এরূপ মিথ্যা কথনের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এখানে গোটা দুই উল্লেখ করিব।

ডিন্ কনার নামে এক মার্কিন যুবা ১৮৯৪ সালে মেক্সিকো নগরে চাকরী করিতে গিয়া টাইফয়েড জ্বরে মারা যান। ১৮৯৫ সালে তথাকার কনসল্ উহার মৃত্যুবার্ত্তা প্রচার করেন। কনারের পিতা কয় মাস পরে স্বপ্ন দেখেন পুত্র আসিয়া বলিতেছে "আমি মরি নাই, মেক্সিকো নগরে বন্দী হইয়া আছি, জরিমানা দিয়া ছাড়াইতে হইবে।" কনারের আত্মীয়গণ মিসেস্ পাইপারের শরণাপন্ন হয়। স্পর্শ দৃষ্টি যোগে (rapport clairvoyance) * মিসেস্ পাইপার বলেন—"কনারের কথা সত্য, সে মরে নাই, পিউএবলা নগরে অমুক স্থানে বন্দী আছে, এমন বাড়ী, পাহারা এমন লোক, এই নাম ইত্যাদি।" আত্মীয়েরা অনুসন্ধানে বাহির হন। ফিলপট নামে একজন তদন্তে জানিতে পারেন কনসলের কথা সত্য; আমেরিকান হাঁসপাতালে টাইফয়েড জ্বরে তার মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে সেবাকারিণী nurseএর মুখেও তাহা শুনা গেল।

মিস্ কার্টিস্ নাম্নী এক মহিলা Planchette যোগে প্রেতালাপ করিতেন; একদা এক প্রেতাত্মা তাঁহাকে বলে "তুমি এই বৎসরই আমাদের কাছে চলিয়া আসিবে।" মিস্ কার্টিস্ অত্যন্ত ভীতা হন। অল্পবয়সে সংসার ছাড়িয়া

* অনুপস্থিত বা মৃতের ব্যবহৃত কোনো জিনিষ ছুঁইয়া মিডিয়ম কর্ত্তৃক তার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে পারাকে rapport clairvoyance বা Psychometry বলে।

যাইতে হইবে জানিতে পারিলে কার না ভয় ভাবনা হয়? মিস্ কার্টিস্ বিলক্ষণ ভাবনায় কাল কাটান; বছর ঘুরিয়া গেলে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বলা বাহুল্য প্রেতের ভবিষ্যৎ কথন মিথ্যা হইয়াছিল।

প্রেতেরা এইরূপ ভাবে মিথ্যা বলে কেন? ইহারা কি ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বলে না ভুল বলে? কনারের প্রেত এবং মিস্ কার্টিসের সংবাদদাতা প্রেত—এরা কি প্রবঞ্চনা করিয়াছিল, না না-বুঝিয়া ভুল করিয়াছিল? তিনরূপ সম্ভাবনা হইতে পারে;—

(ক) যদি সংবাদদাতা প্রেতই হয় তাহা হইলে হয় ভুল করিয়াছিল—কি কি কারণে ভুল হইতে পারে তাহা (খ) আপত্তি বিচার কালে দেখা গিয়াছে।

(খ) প্রেত হয় তো ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বলিয়াছিল প্রবঞ্চনা বা রগড় করিতে। হইতে পারে; মানুষ প্রবঞ্চক বা মজাদার থাকিলে প্রেতদের মধ্যে এরূপ দুষ্ট প্রেত থাকিতে পারে। মিঃ কনারের প্রেত নিশ্চয়ই বাপের সঙ্গে মজা বা প্রবঞ্চনা করিবে না; উহার ভুল হওয়াই সম্ভব। টাইফয়েড রোগে মারা যায়; মৃত্যুকালে বিকারের ঝোঁকে ঐ মনে হইয়াছিল; মরণান্ত অবস্থায় সেই ঝোঁকটা তখনো ছিল। মিস্ কার্টিসের প্রেত খুব সম্ভব ঠকাইয়াছিল। তাঁহার অন্য এক বন্ধু এই অনিষ্টকর বার্ত্তা শুনিয়া, নিজ ইষ্টকামী মুক্তাত্মার কাছ হইতে বার্ত্তা পাইলেন "তোমার বন্ধু মিস্ কারটিস্‌কে কোন দুষ্ট প্রেত ঠকাইয়াছে, মিস্ কারটিস্ নিজের ইষ্টকামী মুক্তাত্মার দ্বারা চালিত হয় নাই; তাহাকে প্রেতালাপ করিতে বারণ করিয়া—সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

আশ্চর্য্যের বিষয় মিস্ কারটিস্‌কে এ কথা আগেই জানানো হইয়াছিল; যে সময় মৃত্যু হইবে কথিত হয় তার বহু আগেও মিস্ কারটিসের বন্ধু এই আশ্বাস বার্ত্তা সংগ্রহ করেন। আশ্বাস পাইয়াও মিস কারটিস খুব সুস্থ হইতে পারেন নাই।

(গ) তৃতীয়তঃ মিস কারটিস বা কনারের পিতার বা মিসেস্ পাইপারের সুপ্ত চৈতন্যের কার-চুপি। সুষুপ্তি স্বপ্ন ("Concoction of a subliminal stratum of the automatists own mind analogous to the baseless fabrics of which dreams are built up") এইরূপ মিথ্যা (অথচ কারণহীন মিথ্যা) ব্যাপারগুলি লইয়া Mrs. Sidgwick গভীর ও দীর্ঘ আলোচনা করেন; তাঁহার মত এই যে, মিডিয়মদের মোহাবস্থায় যে সব 'অধিকারী' আত্মা মুখপাত্র হইয়া আলাপ চালায় (ফিনিট্, রেকটার, পেলহাম্ নেলি, ফেডা ইত্যাদি) এরা আর কেহ নয় মিডিয়মের সুষুপ্তি চৈতন্যের একটা মনগড়া কাল্পনিক actor; উহাদের বাস্তব সত্তা পৃথিবীতে কোনো কালে ছিল না; কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাকিতে পারে যেমন পাইপার control পেলহামের পার্থিব ব্যক্তিত্ব ছিল একজন। এই কাল্পনিক বক্তা সত্ত্বেও একজন মুখ্য আলাপকারী প্রেত থাকে সেই-ই real communicator; মুখপাত্র স্বরূপ এই অধিকারী এ মিথ্যা। যদি কোনো প্রেতালাপে দেখা যায় বার্ত্তাটা খোদ real communicator হইতে আসিতেছে তবে সেটা সম্ভবতঃ প্রেতলব্ধ, যেখানে কেবল মাত্র এই অধিকারী আত্মাই (control) বক্তা, সেখানে বুঝিতে হইবে মিডিয়মের সুষুপ্তি চৈতন্যের কারচুপি; মিথ্যা হওয়াই সম্ভব। শ্রীযুক্ত Arthur Hill বলেন, মুখ্য আলাপকারী (real com.) যদি সত্য হইতে পারে, অধিকারী আত্মার অস্তিত্বও সত্য হইবেনা কেন? তবে হইতে পারে কখনো কখনো এই Controlling spirit বা "অধিকারী" স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় বার্ত্তা বলিয়াছে। মুখ্য আলাপকারী বা মিডিয়ম উভয়েই তো একরূপ স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় সংবাদ আদান প্রদান করে; অধিকারী আত্মাই বা পূর্ণ-সজাগ থাকিবে কেন?

মোট কথা মুক্তাত্মারা এক সময়ে মানুষ ছিল, এখনো মানুষের দেহ না থাকিলেও মানুষধর্ম্মী মানুষী শক্তি তাহার ঘুচে নাই; কাজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা বা ভুল করিলে তাহাকে এত নির্ম্মম ভাবে বিচার করা উচিত কি? ভুলভ্রান্তি বাদ দিয়া সত্য যা বলে তাহাই আমাদের গ্রাহ্য, তাহারই মূল্য ধরিয়া আমরা প্রমাণ বিচার করিব; আমাদের প্রয়োজন এমন সব অভ্রান্ত প্রমাণ যাহাতে

নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে মানবাত্মা দেহমুক্ত হইয়াও সজ্ঞান অবস্থায় পরলোকে বিদ্যমান থাকিতে পারে আর পার্থিব জীবনের সমস্ত স্মৃতি স্নেহ প্রেম ভালবাসা প্রায় মাত্রায় বজায় থাকে এবং তাহারা পরিত্যক্ত প্রিয়জনদের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিতে ব্যস্ত ও সমুৎসুক।

অপক্ষপাত ভাবে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আলোচনা করিলে এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার স্থান থাকে না।

মাসিক কাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

নারায়ণ, চৈত্র।—গুরু ও শিষ্য। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী। ভাষার পারিপাট্যের অভাবে ব্যর্থ। শুধু উদ্ধরণ চিহ্ন দিলেই উক্তি সূচিত হয় না।

শিষ্য আসি দাঁড়াল নমি "গুরুজী মহারাজ"

এস্থলে—

শিষ্য নমি দাঁড়াল বলি 'গুরুজী মহারাজ' বলিলে অর্থের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। 'ভক্তি লতা' অঙ্কুরিতা—অঙ্কুরিতা—না—মঞ্জরিতা ?

যাত্রী। সাহাদাৎ হোসেন। ছন্দে লালিত্য আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র সুর মাঝে মাঝে বাজিতেছে। কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন, ঠিক বোঝা গেল না। অযথা দীর্ঘতা অনর্থক পীড়া দিতেছে। 'মনোরথে' চলিবে না 'চাহিয়া' 'আসিয়া' ও 'উঠিছে' 'নাচিছে' মিল নহে।

উন্মাদিনী বাই। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যো। 'উন্মাদিনী'তে উন্মাদনা নাই।

মিলন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়। ভাবে বিশেষত্ব আছে—কিন্তু রচনা রস-মধুর নহে। 'শিরোপরে' —চলিবে কি ?

বিরহে। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। শৈলেন্দ্র বাবুর 'বিরহে' ভঙ্গিতে সঙ্গীত আছে—বিশিষ্টতার ইঙ্গিত নাই। বর্ষার প্রভাবে সেই মামুলী হা হুতাশ।

রূপ কথা। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সুরচিত।

দিবস রাত্রি তোমার বুকে'
যে সব উঠে তরঙ্গ
কি চায় তারা ? কি গায় তারা গান ?
দিবস রাতি পরাণ মেলি
নভের গায়ে অনন্ত
কি পায় তারা ? কি চায় তারা দান ?
হায়রে কবে আমার মতো
সবাই হবে পাগল রে
পাগল যেমন তোমার বুকে তরঙ্গ
দিবস রাতি তোমার বুকে
বাজবে না আর আগল রে
আগল বিহীন যেমন বনের বিহঙ্গ।

নিকুঞ্জে। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক। অক্ষমতার চরম নিদর্শন যথা—

শুবে—আজ কি সজনি দুখ অবসান!
আজ কিলো এলো -
ন (হি) লে—হেন যে মাধুরী নিরানন্দ গেহে
কিহেতু উদয় হেল!

সন্দেশ। পৌষ।—আহ্লাদে পুতুল—বেশ সরস রচনা।

বল কিবল হাবলা পাগল
আবোল তাবোল কানখেঁষে
ফোকলা গদাই যা বলবি তাই
ছাপিয়ে পাঠাই সন্দেশে।

অর্চ্চনা। ফাল্গুন।—বিশুদ্ধি। শ্রীকুমুদরঞ্জন। কবিতাটীর আগাগোড়া রস না জমিলেও এরূপ কবিতার প্রয়োজনীয়তা আছে। আধুনিক স্বেচ্ছাচারী উপন্যাস লেখকদের পড়িতে অনুরোধ করি।

আকাঙ্খার এ খাণ্ডবেরে
পুড়াও ঝরাও ঝাপটে
স্বেচ্ছাচারের কলা গৃহ
অগ্নিবাণের দাপটে।
মসীর গড়া অলক্ষ্মীরে
গালার মত গলাও ধীরে
মরুক মরুক বীজাণু সব
সব্যসাচীর শরেতে।

কবি ভাবের ঘরে সাপের বাসা দেখিয়া, গঙ্গাতীরে শুঁড়ির দোকান দেখিয়া, তুলসীবনে কুকুরের উৎপাত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সাহিত্যের সতোম গোমরাকে ধ্বংস করিবার জন্য Fire brimstone বৃষ্টি প্রার্থনা করিয়াছেন। পম্পিয়াইয়ের রঙ্গীন আবর্জ্জনা দহনের জন্য ভিসুভিয়াসকে জাগিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

যে সকল সাহিত্যিক সস্তা হাততালি লোভে বাণীকে বানরী করিয়া সভায় নাচাইতেছেন—যাঁহারা প্রতিভার কুণট বৃত্তির দ্বারা অন্ন উপার্জ্জন করিতেছেন—যাঁহারা পাপের চিত্রকে মধুর করিয়া অঙ্কন করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালীর সমাজ ও সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, যাঁহারা গণিকাসাহিত্য রচনা করিয়া পাঠকের নীচ পঙ্কিল প্রবৃত্তির আহার্য্য যোগাইতেছেন, যাঁহারা নীচ কুলটাকে কুললক্ষ্মীর রত্নাসনে বসাইতেছেন—সতী সাবিত্রীগণকে অবহেলা করিয়া যাঁহারা গণিকাগণকে দেবীত্বের পদবী দান করিতেছেন, যাঁহারা ভোগবিলাসকেই মানব জীবনের চরম সার্থক ও ত্যাগ সংযমকে দুর্ব্বলতা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, যাঁহাদের চোখে এ বিপুল বিশ্বে নারীজীবনের ভোগের চরিতার্থতার অভাবকেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা বঙ্গের এই জাতীয় কবির সঙ্গীতটি পাঠ করুন।

হোলিখেলায়—কবি গুণাকর মহাশয় রাধার নাম দিয়ে কতকটা উশৃঙ্খলার প্রচার করিয়াছেন।

প্রশস্তি—বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি। শ্রীরসময় লাহা। মামুলী প্রশস্তি যেমন হয় তেমনি।

শীতশেষ। শ্রীবীণাপাণি দেবী। অপরিপক্ক হস্তের রচনা।

"বৃদ্ধশীত জরাগ্রস্ত আজি ভেঙ্গেছে পঞ্জর অস্থি" একেবারে গদ্য।

"শীতের প্রভাতে নবীন কুয়াসা ধরারে করিল স্বর্গ।" নবীন কুয়াসা ধরারে স্বর্গ করিল—একথা অদ্ভুত নয় কি?

ভারতী মাঘ।—সরযূ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ। রচনাটির অনেকাংশই বেশ সুরচিত। সরযুর পূর্ব্ব গৌরব বর্ণনায় কবি মান্ধাতা, ভগীরথ, ইক্ষ্বাকু, রঘু, রামচন্দ্র, সীতার কথা বলিয়াছেন। সুরাসক্ত বাবরের প্রসঙ্গ ইহাতে সুছন্দিত হইয়াছে—

"যে বাবরের কন্মীগরব ডুবে গেছে
রাঙামদের হ্রদে
সেই গড়েছে ভজনশালা ভিতের পাথর
ভিজিয়ে দেমাক মদে।"

সরযূতীরবাসী নরনারীর আজ কি দশা হইয়াছে তাহা কবির ২টী পংক্তিতেই সুস্পষ্ট।—

রঘুকুলের ক্ষত্রিয়েরা একাগাড়ীর করছে
গাড়োয়ানী
বাবর সাহের খান্দানীরা আজকে শুনি
রেঙ্গুনে দপ্তরী।

যদি সে—শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়। ভাষায় ভাবে ভঙ্গিতে কবিতাটি অতুলনীয়। অশ্রুসজল কারুণ্যগুণে কবিতাটী অরুণোজ্জল নীহার স্নিগ্ধ কুসুমের মত সুন্দর ফুটিয়াছে। পড়িতে পড়িতে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে, প্রাণটা ছম ছম করিয়া উঠে—হাত হ'তে ভারতী খানি খসিয়া পড়িয়া যায়। 'ছগাছি চুড়ির' নিক্কণ পংক্তিতে পংক্তিতে কাঁদিয়া ঘুরিতেছে—এলো চুলের বাসী সুবাসে ভাষা স্থলে স্থলে মূৰ্চ্ছিত।

'বৃথা এ মন আশা। সে জন কি ফিরে আসা।
পিপাসা পড়ে রবে খালি
মলিন চিন্তাধুমে কঠিন মরুভূমে
কেবলি বালি আর বালি
পাখী না গাহে গান চাঁদের আলো ম্লান
কুসুমে পরিমল নাই
দখিন বাতাসেতে আর না উঠি মেতে
উড়িছে ছাই আর ছাই।'

কিরণধনের কবিতার বিশেষত্ব এই যে, কবিতাগুলিতে পংক্তিগত ও সমষ্টিগত দুই প্রকার সৌন্দর্য্যই পাওয়া যায়, আর একটী বৈচিত্র্য এই যে, প্রত্যেক রচনার প্রত্যেক পংক্তিটা আমরা বুঝিতে পারি। কিরণবাবু ভারতীতে কবিতা লেখেন অথচ দুর্ব্বোধ্য করিয়া রচনা করিবার জন্ম একটুও চেষ্টা করেন না।

ঘুমতী নদী।—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ। চমৎকার কবিতা। ফুলেল নদীর ফুলেল বর্ণনা বড়ই উপাদেয়। সুন্দর সূচনা—

ঘুরে ঘুরে ঘুমতী নদী, ঠুমরী তালে ঢেউ তোলে
বেল চামেলির চুমকি চুলে ফুলেল হাওয়ায়
চোখ ঢোলে।

ফুলের ফসলের কবি ফুলের অর্ঘ্যে কুসুম সরিৎকে ভরিয়া দিয়াছেন—

শনের ফুলে ছিটিয়ে সোনা শরৎ তারে সাজিয়ে যায়
তিতি ফুলের কনক জবা তার নিকষে যাচিয়ে যায়
কাজরী যখন গায় মেয়েরা বাদল মেঘে থির কাজল
অচেল কেয়ার পরাগ মেখে তুই হয়ে যাস্ কেওড়া জল
খোসবায়ে তোর খুসীর হাওয়া সোঁতের পিছন সঞ্চরে
ফুলগুলো ধায় ফড়িং হয়ে উড়ন্ ফুলের রূপ ধরে
ঘুরে ঘুরে ঘুমতী চলিস্ ঝুমকো ফুলের বন দিয়ে
ঢেউ ঝিলিকে মাণিক জেলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে।

কোনো নেতার প্রতি। শ্রীনবকুমার কবিরত্ন। বিদেশীর দরজায় উঞ্ছ উচ্ছিষ্টের কণা পাইয়া কাহার তুণ্ডপুটে সিংহের গর্জ্জন থামিয়া গেল, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই।

জীয়ন্তে জালিয়াঁবাগে পুঁতে ফেলে ভারত মাতার
শ্রাদ্ধে দেব স্বর্ণধেনু। অগ্রাহ্য সে অমানুষ দান
ভাটেরা আসুক ছুটে, দলে দলে ক্ষতি নাহি তায়
তুমি যে ভিড়েছ সঙ্গে এই দাগ। এই অপমান
চাবুকাতে রক্তচিহ্ন, না শুকাতে নয়নের পানি
প্রবীণ স্বদেশভক্ত। যেচে গিয়ে হলে অগ্রদানী।

মোহিতবাবুর "তারকা ও ফুল" সুবোধ্য হইলে অনবদ্য হইত।

মানসী মর্ম্মবাণী।—ফাল্গুন। মুক্তির ডাক—শ্রীঅমিয়া দেবী। ফাগুন হাওয়া, দখিন হাওয়া, চাঁদের আলোর ঢেউ, প্রভৃতির সমবায়ে বিশেষত্বহীন কবিতা।

দুর্ব্বোধ—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ের দুর্ব্বোধ কবিতা। মাঝে মাঝে কবিত্ব আছে। 'বিথারি'র সহিত 'কাতবি'র মিল একেবারেই অচল।

ভিখারী—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেনের গান। চলন-সই।

ফুলের তোড়া—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ। ফার্সী কবিতার অনুবাদ—অনুবাদ হইলেও কবিতাটী উপভোগ্য হইয়াছে।

চৈত্র।

পরিশোধ—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

তবুও কি তোর না-পাওয়ার ক্ষুধা
কিছুতে মেটেনা ওরে!

এই পংক্তিতে মহারাজ-কবির কোন একটী কবিতার কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। এই কবি আজ কাল প্রায় অনেক মাসিকেই লিখিতেছেন। তাঁহার অনেক কবিতায় আমরা কবিত্বের নিদর্শন পাইয়াছি। আধুনিক মাসিক সাহিত্যের এই একঘেয়ে কবিতায় নূতন কিছু দিবার চেষ্টা করুন।

মধু মাধবী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতাটী মন্দ হয় নাই কিন্তু সত্যেনবাবু এই কবিতাটীতে অবোধ্য ভাষা প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে যেমন 'অসথ' পাতা, 'বোঁটার' বাঁধন এড়িয়ে যেতে চায় তেমনি 'শ্যাম-গুলো'র 'শ্যাম্পেনে' বাতাস বুঁদ হইয়া থাকুক আর নাই থাকুক অর্থবোধ করিতে পাঠককে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। কবিতাটীর মধ্যে ভাব জমে নাই। কবি শুধু কথা ও ছন্দ দিয়া দৃশ্যগত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

দুর্দ্দিনে—শ্রীকালিদাস রায়। কবির কবিত্বেরও দুর্দ্দিন আসিয়াছে, তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

আঁধার আজি কুঞ্জ-ভবন
কাঁদার সময় এল এখন ;
সকল কণ্ঠ কুণ্ঠিত আজ
হাস্ত-কল আর উঠেনা।
শুকাল সব রসের ধারা,
কল্পতরু লক্ষ্মীহারা,
কূজন-কলরবোৎসবে
ভাবের আবেগ আর ছুটেনা।

সত্যই আর ছুটেনা। পূর্ব্বে মাসিক পত্রের প্রকাশিত প্রত্যেক কবিতাই ভাবে রসে ও ছন্দে উপভোগ্য হইত, এখন সত্যই কবির 'হৃদয় বাগান বনে' কুসুম কলি আর ফোটেনা।

ভারতবর্ষ—মাঘ। পাষাণী—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। সবল ভাষা, ভাব ও বিষয় বিন্যাসে উত্তম সুন্দর গাথা।

মরণের পথিক। শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত। ভ্রান্ত জীবন বা Antinatal existence এবং মর্ত্ত্য জীবনের তুলনার কথা কবি ছন্দে গাহিয়াছেন।

'ওপারের শুভাশীষ মৃত্যু আনে নিয়ত বহিয়া','ও'দণ্ডের পান্থশালা' প্রভৃতি পড়িয়া Wordsworthএর—"We come from heaven who is home" এবং "Traveller between life and death" মনে পড়ে।

মিলন। শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ। এ কবিতা না লিখিলেও চলিত।

ফুলচোর। শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেনের গান—অতি সুন্দর—

রাতারাতি কিরুকে ভরা বাগান ফাঁকা
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা
তোলা ফুলের খালি বোঁটায় ছোঁয়ার গন্ধ মাখা।

চৈত্র।—বসন্তের চিঠি। শ্রীকালিদাস রায়। এটী কালিদাস বাবুর ব্যঙ্গ কবিতা—এই ভাবের কবিতা আগে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কবি কি এবার বঙ্গ-ব্যঙ্গে নামলেন—কবিতাটী বেশ সুন্দর হইয়াছে।—

বন্ধু,
বাংলা দেশের বসন্তে হায়,
কোনোরূপে বেঁচে আছি।
হেথা কোকিল এবং ভোমরা চেয়ে
অনেক বেশী মশা মাছি।

* * *

কাব্য কলা আজকে শুকায়
কল্প বনের কচি মোচায়
ভাবছি কোথা গিয়ে বাঁচি
সাকচি পুরী কিংবা রাঁচী।

বুঝিতে দিও—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেনের গান। ভাল হয় নাই।

বধূ।—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কবিতাটীর ভাবটী সুন্দর হইলেও নূতন নয়। স্থানে স্থানে কবি-প্রাণের মধুর স্পর্শ আছে তবে প্রকাশ ভঙ্গিতে তেমন অনাবিল গতি নাই—কবিতাটী যেন অযথা দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উড়ো জাহাজ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যেন বাবুর স্বভাবসুলভ লিপিচাতুর্য্যে কবিতাটী সুন্দর হইয়াছে—সত্যেনবাবুর কোনও সাময়িক কবিতাই মন্দ হয় না—

চোখ জুড়াইতে নীলাকাশ ছিল বাকী
তারেও কুশ্রী করিলে টীনের পাখী

* * * *

ওরে ভূতে পাওয়া! ওরে ও সাগর পারী!
দেশে দেশে তুমি অচিরে ছড়াবে মারী

* * * *

পেট পুরে পুরে পেটরোল খালি নিয়ে,
দেমাকে বেড়াও মাথার উপর দিয়ে;
ঘর বলে কিছু রাখিলেনা গরীবের
বেপর্দ্দা আজ কোনটি ইজ্জতের
লাজ ঢেকে ছিল কুঁড়ের গরীব মেয়ে
তুমি এলে তার আবরুর মাথা খেয়ে।
ঘর বলে কিছু রহিল না ঢাকাচুকি
পরের দৃষ্টি সেখানেও দেবে উঁকি।

* * *

ভারতের যদি ঝাঁটুলটা পাই আমি
বাঁদর না মেরে শুধু মারি ঝাঁদরামি।

পুস্তক সমালোচনা।

(স, র, ব)

ত্রয়ী—মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন চরিত। শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা ও শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত। প্রকাশক—দি মডার্ন পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মারকেট, কলিকাতা। দাম আট আনা। ৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

প্রকাশচন্দ্র তাঁর মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা মহম্মদআলির জীবন-কথাতে মাঝে মাঝে এক একটি প্রসঙ্গকে এমন হঠাৎ শেষ করিয়াছেন যে তাহাতে আমাদের মনে হয় মূল প্রবন্ধটির অনেকটা অঙ্গহানি হইয়াছে। তবে সম্ভবতঃ লেখককে প্রকাশক ছাপা ও কাগজ খরচ হইতে বাঁচাইবার জন্যই এই প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ আর একটু একটু বড় হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা বলিবার আছে। কর্ম্মী যাঁরা, যাঁদের জীবনই কেবল পরকে লইয়া তাহাদের সহধর্ম্মিণীদের গৌণ জীবন কর্ম্মীদের প্রাণে এবং কর্ম্মে কতটা মুখ্য হইয়া উঠে, সে বিষয়ে লেখক কিছু বলেন নাই! প্রকাশচন্দ্রের বলিবার ভঙ্গী খুব চমৎকার এবং কথাগুলি খুবই জোরাল।

মহিলা-লেখিকা চিত্তরঞ্জন জীবনী লিখিয়াছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা খুব খুসী হইতে পারি নাই; তাহার কারণ এই যে, তিনি চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-চর্চ্চা ও তাঁহার ধর্ম্ম লইয়াই প্রবন্ধটি এক প্রকার শেষ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান কর্ম্মজীবন বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। মলাটে লাল রঙের একখানা ব্লক। ছবিখানা আঁকিয়াছেন শিল্পি চারু রায়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত।—তদীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক—দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩৷৷০ টাকা। প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। কাহারও জীবনী যদি তাঁহার আপনার জনের দ্বারা লিখিত হয় তাহা হইলে তাহা যেমন বিশদ হয় সেই প্রকার হৃদয়গ্রাহীও হইয়া থাকে। এস্থলে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিদুষী জ্যেষ্ঠা কন্যাই সে ভার গ্রহণ করিয়া পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে মোটেই অপরিচিতা নহেন।

শিবনাথের যাহা সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল তাহা তাঁহার আত্মবিশ্বাস ও সত্যনিষ্ঠা। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই তিনি নিজ জীবনকে সার্থক করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জীবনে এই 'আত্মবিশ্বাসে'র অভাব বলিয়াই এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত! শিবনাথ স্বয়ং যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেন তাহা হইতে তাঁহাকে বিরত করা কাহারও সাধ্য ছিল না। এই বিষয় তাঁহার কতিপয় চিঠি হইতে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার প্রকাশ্যে উপাসনা করা এবং পরিশেষে উপবীত ত্যাগ এ দুই-ই তিনি তাঁহার প্রাণের প্রেরণায় করিয়াছিলেন। ইহা লোক দেখানো কিম্বা বাহাদুরী নহে। কারণ শিবনাথ লিখিতেছেন—"সেই আমার প্রথম অবাধ্যতা। আমার আজিও মনে আছে, বাবা সেদিন মনে কি ক্ষোভ পাইয়াছিলেন ও কাঁদিয়াছিলেন। যে পুত্র এত বাধ্য ছিল, যে দাঁড়াইয়া মার খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত, তথাপি একবারও পলাইবার চেষ্টা করিত না, যে পুত্র এত বাধ্য ছিল, যে তাঁহার অনুরোধে মস্তকে চিরজীবনের যন্ত্রণা (দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা) লইতে কুণ্ঠিত হইল না, সেই পুত্রের অবাধ্যতা নিশ্চয় বাবার প্রাণে সেদিন বড় লাগিয়াছিল।" ধর্ম্মই যাঁহাদের জীবনের সার তাঁহাদের সাংসারিকতার কোন দিনই পদ-স্খলন করিতে পারে নাই। সেইজন্যই শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনীকে ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তারপর তাঁহার সমগ্র ভারতব্যাপী প্রচার কার্য্য! এই কার্য্যে শিবনাথ যে প্রকার বাগ্মীতা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। লেখিকা শাস্ত্রীমহাশয়ের ঘটনাবহুল জীবন এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্য বস্তুটিকে পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। বিশেষতঃ শিবনাথের পারিবারিক জীবনের অধ্যায় গুলি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য হইয়াছে! আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় জীবনী লেখকদের কোন পুস্তক হইতে নিকৃষ্ট হয় নাই।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে দু'এক জায়গায় ভাষার জড়তা আসিয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ প্রথম দুই অধ্যায়েই বেশী। পুস্তকখানির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তৃতীয় লাইনে "ইতর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত। কারণ ইতর শব্দটি বর্ত্তমানে অত্যন্ত ঘৃণা এবং সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক।

বইখানির ছাপা কাগজ উভয়ই ভাল।

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশ্‌ [illegible] লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৬শ বর্ষ | আষাঢ়—১৩২৮ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনী

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

কবিবর রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সম্বন্ধে

মে মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'তে কবিবর রবীন্দ্রনাথের তিনখানা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। পত্র তিনখানা বিলাত হতে পাঠানো। পত্রে তাঁর বক্তব্য বিষয় বর্ত্তমান নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন সম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ।

তিনখানা পত্রেরই আসল বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি এই আন্দোলনের পক্ষপাতী নন। তিনি দুঃখ করেছেন যে ঠিক যে সময়ে তিনি নানা জাতি ও সভ্যতার সমন্বয়ে বিশ্ব-মানবের একতা সম্পাদনের জন্য সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা সমস্ত সভ্যজগতকে বোঝাচ্ছেন সেই সময়ে ভারত-বর্ষে তার প্রতিরোধী অসহযোগীতা আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়ে তাঁর সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বিশ্বমানবের ঐক্য সাধনের পথে সর্ব্বজাতি সমন্বয়ের দরকার; সদ্ভাব ও মিলনের মধ্যে তা হবে; কাজেই তীব্র ভেদনীতি এ সময়ে তার মূলে কুঠারাঘাত করবে।

কবির এই যে দুর্লভ আশা মহাকবিরই উদার কল্পনা-যোগ্য। জ্ঞানজগতের অধিবাসীর কাছে এর আদর বেশী। কিন্তু বাস্তবজগতে এখন সে আশা পূর্ণ হবার মত অবস্থা বা সুযোগ হয়েছে কি না জানি না। এখনো তথাকথিত সভ্যজাতদের মধ্যে দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত ও পরাস্ত করে প্রবলের শক্তি প্রতিষ্ঠার নেশা পুরা মাত্রায় প্রবল। ভারত-বর্ষ এই দুর্ব্বলেরই একজন। জগতের যজ্ঞশালায় সে এখনো অপাংক্তেয়; তার দৈন্য ও হীনতা তাকে শূদ্রধর্ম্মী করে রেখেছে। তার কৌলীন্য ও মর্য্যাদা বলে কিছু নেই। তার প্রাচীন সভ্যতাশক্তি মান-মর্য্যাদা এখন প্রত্নতত্ত্বের আলোচ্য মাত্র। সে পুরাণো খাতিরে তার সভ্যজগতে কোনো লাভই হচ্ছেনা। দাসজাতি বলে অন্যান্য জাতির চোখে সে কৃপা ও ঘৃণার পাত্র। এ রকম অবস্থায় ভারতবর্ষ তার প্রাচীন গৌরবের দোহাই দিয়ে পরের দ্বারে মান কাড়তে পাচ্ছেনা। ভারত যতদিন না আধুনিক শাক্ত-পন্থায় বা বৈষ্ণব-পন্থায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পাচ্চে ততদিন তার কথা শক্তিমদমত্তদের কাছে হেয়। পাশ্চাত্য জাতিদের বিচারক সভায় ভারত সভ্যতা অনেক দিন হতেই নানা মনীষীদের দ্বারা ঘোষিত হয়ে আসছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন জাতি কি সেই খাতিরে ভারতের অধী-

নতা হীনতা দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে? দু'চারজন ভাবুক সাহিত্যিক ভারতবর্ষকে স্নেহের চোখে দেখতে পারেন, দেখেও এসেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার জন্যে সে সব দেশের রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতারা কি ভারতবর্ষের প্রতি কৃপাপরবশ হয়েছেন? জাপানও তো একটা প্রাচীন সভ্য জাতি ছিল, কিন্তু সে সভ্যতার খাতিরে পাশ্চাত্য জগৎ তার কতটুকু ভয় খাতির করেছিল? সেই জাপান যখন ওদেরই বিদ্যায় ওদেরই সমকক্ষ হয়ে উঠলো তখন যত মান খাতির। ভারতবর্ষকেও গণ্যমান্য হতে গেলে তাকে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা আগে করতে হবে; অর্থাৎ তাকে আগে জাতে উঠতে হবে। বর্ত্তমান যুগের শক্তিমন্ত্রের সাধনে নিজেকে জগতের দরবারে পাঁচ জনের একজন করে তুলতে হবে।

যতদিন না আমরা ওদেরই মত গুণে জ্ঞানে সমকক্ষ হতে পারছি ততদিন বিশ্বমানবের ঐক্য পরিণতি ঘটানোতে আমাদের হাত থাকবে না। এই যে জগতের শান্তিরক্ষার জন্য একটা League of nations হলো এতে ভারতের কোনো স্থান আছে? কেউ তাকে ডেকে পরামর্শ করবার যোগ্য বলে মনে করেছে? নিজের বলে ও নিজের তেজে এই অধিকার লাভ করতে হবে।

শূদ্রের ব্রাহ্মণাধিকার না জন্মালে তার যজ্ঞ সভাতে কোনো অধিকার নাই।

একথা সকলেই বোঝেন ও বিশ্বাস করেন। এই শক্তি ও মানমর্য্যাদা লাভ করবার জন্যেই ভারতের এই প্রাণপণ চেষ্টা। নিজের অধীনতা না ঘুচলে এ হীনতা ঘুচবেনা। এই অধীনতা দূর করে স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব লাভ করবার দুটী পন্থা দেখছি। এক, বিজেতার কৃপা সাহায্যে এই স্বাধীনতা লাভ; দ্বিতীয়, আত্ম সাহায্যে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ। একথা সকলেই বেশ ভাল করে বুঝেছেন যে গায়ের জোরে আমরা এদের সমকক্ষ নই, এবং সে উপায়ে আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারব না; হাতে পায়ে ধরে ভিক্ষে করে কেঁদে কেটেও ওদের রাজী করতে পারবোনা আমাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে; কাজেই শেষ উপায় দুর্ব্বলের একমাত্র পন্থা অসহযোগীতা অবলম্বন আর নিরুপদ্রব অসহযোগীতা। এ ছাড়া অন্য অস্ত্র আমাদের যে আর নাই। আমাদের সমগ্র জাতটার এখন প্রাণের দায়; কোনো মতে প্রবলের iron-grip হতে টুঁটী ছাড়িয়ে শ্বাস রক্ষে করা; কাজেই অন্য যে-কোনো অহিংস্র উপায় অবলম্বন আর্ত্তের পক্ষে সমীচীন। এ উপায় অর্থাৎ অসহযোগীতা কৃতকার্য্য হবে কিনা তা ভাববার সময় নেই; যার প্রাণ সংকটাপন্ন সে যে-কোনো পন্থা চেষ্টা করে দেখে। সভ্য-জগতের সঙ্গে এর ফলে সদ্ভাব থাকবে কি না; বিশ্ব মানবের মহামিলনের দিন এর কুফলে পিছিয়ে পড়বে কি না, তা ভাববার আমাদের সময় নেই। কবি যে ভয় করছেন যে এতে করে নিজেকে সভ্য পাঁচজন হতে ভিন্ন করে বা একঘরে করে রাখা হবে, বা একটা অপ্রেম ও ঈর্ষ্যার দেওয়াল মধ্যে তুলে দেওয়া হবে, সে ভয়ের কোনো হেতু দেখা যায় না। নিজের অধিকার সীমানা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত বেড়া দিয়ে স্বত্বরক্ষা করা অবিবেচনার কাজ নয়; সেটা একবার ঠিক হয়ে পাঁচজনের গ্রাহ্য হলে তারপর বেড়া ভেঙ্গে তার উপর পাঁচজনের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিজেদের জাতীয় অস্তিত্বকে একবার সর্ব্বরকমে স্বতন্ত্রভাবে খাড়া করে তুলে, পাঁচজনের কাছে গণ্যমান্য করে তুলতে পারলে তার পর যথাকালে প্রতিবেশী সবার সঙ্গে ভাবের কারবার করা যেতে পারে; যেমন জাপান করেছে ও পেরেছে।

আমার তো মনে হয় না আধুনিক কোনো পাশ্চাত্য জাতির রাষ্ট্রশক্তি আমাদের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে; দু' একজন কবি ভাবুক মনীষী আমাদের একটা রামমোহন, বিবেকানন্দ, জে, সি, বসু ও রবীন্দ্রনাথ দেখে ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভারতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে —তাও প্রাচীন ভারতের গৌরবস্মৃতিরই পূজাচ্ছলে; বর্ত্তমান দাস ভারতকে নয়। এই দু একজন বিদেশী ভক্তের প্রেম গদ্ গদ্ শ্রদ্ধাবাণীর এমন শক্তি নাই যে তাকে করে ভারতের দাসত্বের বোঝা হতে একটা তৃণভার সরে! ম্যাক্সমূলারের, সোপেনহরের বা কুঁজার তলুস তলুস ভারত-প্রীতিতে ভারতের কালা আদমির একটা প্লীহা রক্ষা করতে পারে নাই, কিন্তু লরেড্ কর্জ্জ, মণ্টেও মহাপ্রির একটী

নেক্-নজরের চাউনিতে বা একটা কড়ে আঙুলের ইযারায় বড় বড় বোঝাও নেমে যেতে পারে! ভাব জগতে ভাবের ভারত ভাব কেড়েছে অনেক; কিন্তু রাষ্ট্রজগতে রাষ্ট্রীয় ভারত অভাবের কাদা ধুলায় লুটাপুটি খাচ্ছে!

এই যে শক্তিপুঞ্জের শক্তি খর্ব্বের জন্য ইয়ুরোপব্যাপী Disarmament মন্তব্য চল্‌ছে, মহাশক্তিমান উইল্‌সন যার পুরোহিত ছিলেন, তিনি বিপুল অর্থ ও শক্তি নিয়ে চোখ্ রাঙ্গিয়েও কাকে রাজী করাতে পারলেন অস্ত্র সংগ্রহ কমাতে বা পঞ্চাইতে ঝগড়া মেটাইতে? সামান্য ঝগড়াঝাটী বন্ধ করতেই বড় বড় রাজনৈতিক হাতি ডুবে গেল, আর এই পদানত ভারতের কেহ যে বিশ্বজগতের দরবারে শুধু কথার ফাঁদে মহামানবের প্রেমের মিলন ঘটাবেন, সেটা দুরাশা! কে এ দীনহীন নগণ্য ক্ষুদ্র ভারতের খাতির রাখ্‌বে? এ যেন কাকে-না-কাকে ধর্ম্মের কাহিনী শোনাতে যাওয়া!

অন্যান্য সভ্যশক্তি যে আমাদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক উন্নতির খাতিরে আমাদের বেড়ী কেটে দেবে, এ আশা আর কেহ করতে পারেন, আমরা পারি না। তাই Irelandএর আর্ত্তনাদ শুনে শক্তিমান মার্কিন বন্ধু বল্লেন, "বন্ধু তোমাদের দুঃখ দেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে, আমরা সমবেদনা দেখাচ্ছি—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হোক, এর বেশী আমরা আর কি পারি?" আমাদের বেলায় কি বল্‌বে 'কোন্ শক্তি তা' বুঝ লোক যে জান সন্ধান'।

অনেকে সুর ধরেছেন উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কিছু হবে না; কেবল শক্তিক্ষয় হয়। কিন্তু উত্তেজনাটা যে একেবারে অকেজো [illegible] না। অসাড় পঙ্গু অঙ্গ দিয়ে কাজ করাতে হলে তাকে কৃত্রিম ভাবেও উত্তেজিত করতে হয়। বিশেষ যেখানে কাজটা দৈহিকের চেয়ে মানসিক বেশী সেখানে ভাবের উত্তেজনা আপনা হতেই আসে। আর বলছে কি, গত স্বদেশীর চেয়ে এবারের অসহযোগীতা আন্দোলনে উত্তেজনা খুবই কম। একটা বিরাট অসাড় দেহ নড়ে ওঠে যখন—তখন স্থানে স্থানে একটু বেশী নড়ে যদি তার কারণ সে বায়গাটা তত অসাড় হয় নি। উপস্থিত ব্যাপারে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ছেলেদের মধ্যে, তার কারণ জাতীর ঐ অঙ্গটা এখনো একেবারে অসাড় প্রাণহীন হয়নি বলে।

মোট কথা কবির ভয়ের কোনো হেতু নাই। এই অসহযোগীতার আন্দোলন যে মহা মনীষীর মাথা হতে বেরিয়েছে তিনি এর সবচেয়ে বড় বিচারক; তাঁর দূরদর্শিতা এত বেশী, অন্তর্দৃষ্টি এত গভীর, যে এ হতে কোনো ভয়েরই কারণ নেই।

ছেলের সর্পদষ্ট আঙুলটাকে কেটে ফেল্‌লে যদি সমগ্র দেহটা বাঁচে তখন ডাক্তার কি এই ভেবে নিরস্ত হন যে ছেলেটা বের সময় আংটী তা হলে পরবে কি করে, বা বড় হলে দড়ি পাকাবে কি করে? অসহযোগীতার যদি উপস্থিত আমাদের জাতীয় মুক্তি সাধন হয় ও অস্তিত্ব বজায় থাকে তা হলে ভাব্‌লে চলবেনা লক্ষ বছর পরে মহামানবের মিলন যজ্ঞ এর ফলে কতটুকু বিলম্ব বা অসুবিধা ভোগ করবে। শিকল পায়ে পরে চোখ বুজে মুক্ত আকাশে ঝাঁকের সঙ্গে উড়ে বেড়ানোর স্বপন দেখায় সুখ আছে স্বীকার করি, কিন্তু দেখ্‌লে চলবেনা, উপস্থিত শিকলটার আলিঙ্গন হতে চরণ রক্ষার চিন্তা দরকার।

মহাত্মা গান্ধী বরাবরই ভক্ত প্রজার স্বভাবানুসারে সহযোগিতাকে মুক্তিলাভের পন্থা বলে ভেবে এসেছিলেন; গত মহাযুদ্ধে তিনি তার অনেক প্রমাণ দিয়েছেন; আজ যে এ হেন রাজবন্ধু বেঁকে দাঁড়িয়ে অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করবেন, এর গভীর হেতু আছে।

ছেলেদের লেখাপড়া ছাড়া ব্যাপার নিয়ে কবিবর মত প্রকাশ করেছেন যে উনি এর সমর্থন করেন না; অকস্মাৎ একটা উগ্র উত্তেজনার ফলে এতে ছেলেদের ইষ্ট না হয়ে অনিষ্ট হবে। আমাদের মনে হয় মহাত্মার এমন কোনো উদ্দেশ্য নয় যে ছেলেরা জন্মের মত লেখাপড়া ছেড়ে দেয়; তাঁর মূল বক্তব্য এই যে, জাতীয় দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটে প্রত্যেক সম্প্রদায় সরকারের সহিত তাহার সংযোগচ্ছেদ করে সেই পর্য্যন্ত, যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী সরকার কর্ত্তৃক বিধিনিষেধ বলে শিক্ষা ব্যবস্থা কুফল প্রসব করছে। সুতরাং যে শিক্ষা

ছেলেদের মানুষ না করে তাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে তা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী যে আমাদের কোনো কাজে আস্‌ছেনা তা কবিবর নিজে কথায় না বলে কাজে সমর্থন করেন নাই কি? তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও চালিত বোলপুর বিদ্যা প্রতিষ্ঠান কি জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা নহে? তা ছাড়া ধর্ম্মঘট ধর্ম্মঘট। একটা বিশেষ রকমের ফলের আশা করে লোকে ধর্ম্মঘট করে, সেই ফল না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত ক্ষতি সত্ত্বেও তা বজায় রাখা হয়। দেশের মঙ্গল কামনা করে কোনো আন্দোলন ঘটালে তাতে ছেলেরাও কেন যোগ না দিবে?

আর কবিবর নিজেই তাঁর টাইটেল্‌ প্রত্যাহার দ্বারা দেখিয়েছেন—যে নিগ্রহকারীর হাতে সম্মান লাভ কেবল স্বজাতির অসম্মানের বৃদ্ধি করে। অসহযোগিতার একটা অঙ্গ হচ্ছে সরকার-দত্ত পদ পদবী না গ্রহণ করা এবং তদ্দ্বারা বুঝানো যে শাসক সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর আমরা আর নির্ভর করি না। তাঁর এই পদবী প্রত্যাহার তিনি নিজেও ভাল বুঝেছেন ও তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন। তিনি এতদ্দ্বারা নিজেকে অসহযোগী বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এবং ভালই করেছেন।

কাজেই সব দিক দিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে, এই অসহযোগীতার আন্দোলন আমাদের উপস্থিত অবস্থায় দেশের একমাত্র উদ্ধার-পন্থা। এ ছাড়া গত্যন্তর নাই। সদ্ভাবের দ্বারা বিশ্ব মৈত্রী স্থাপন সুদূরপরাহত; আমাদের মত অসহায় অপদস্থ অমানী অক্ষম জাতির এখন কাংস্য পাত্রের সহিত সহযোগিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে। তারপর স্বচেষ্টায় মৃণ্ময়ত্ব ঘুচিয়ে ধাতুধর্ম্ম লাভ করে তখন সাম্য-মৈত্রীর পতাকা বহন করে রাষ্ট্রজগতের সদর সড়কে—পাঁচজনের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কীর্ত্তন করতে ভরসা করা যাবে; উপস্থিত কথামালার মৃণ্ময় পাত্র যা করেছিলো আমাদের তাহাই কর্ত্তব্য, অর্থাৎ নন্‌-কো-ব্রত সাধন দ্বারা আত্মরক্ষা।

আমার বোধ হয় এই নন্‌-কো—আন্দোলনের বিরুদ্ধে কবির এই বিরোধ ও অপ্রীতির কারণ হচ্ছে তাঁর এ আন্দোলনটাকে ঠিক ভাবে না বুঝতে পারা, কবিবর তাঁর তৃতীয় পত্রে বলেছেন "Our struggle to alienate our heart from that of the west is an attempt of spiritual suicide." অন্যত্র—"It hurts me deeply when the cry of rejection rings with the clamour that western education can only injure us."

কবি গোড়া হতেই ধরে নিয়েছেন যে এই নন্‌-কো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও Culture এর বিরুদ্ধে—কিন্তু আসলে তা নয়। এই নন্‌-কো আন্দোলন হচ্ছে ভারতের স্বার্থপর ইংরাজী আমলা-তন্ত্রের কৃত নিপীড়নের বিরুদ্ধে; এবং এই ভারত-পোষ্য ইং আমলা-তন্ত্র ও অর্থলোভী বণিকদল ভারতকে নির্বীর্য্য ও পঙ্গু করে রাখবার মতলবে যে স্বকার্য সভ্যতার বিলাস বিষ ও অকর্ম্মণ্যকারী অপশিক্ষার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করছে, এই আন্দোলন সেই বিষ ও শিক্ষাকে বর্জ্জন করতে চায়। যে উপকারী হিতজনক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিদ্যা মানুষকে মানুষ করে, এ আন্দোলন তার বিরুদ্ধে নয়। মহাত্মা তো স্পষ্ট বলেছেন, "আমি পাশ্চাত্য সভ্যতা বা জ্ঞান বিদ্যার বিরোধী নই, তবে তার অনিষ্টকর প্রভাবটা এড়াতে চাই।" এতো ঠিক কথা। তবে যদি পাশ্চাত্য Cultureএর বিরুদ্ধে কেহ মত প্রকাশ করে থাকেন তবে সেটা ভুল হয়েছে বটে। কবি আশা করেছেন যে "Let India stand for the Co-operation of all people of the world" এ ভাল আশা; কিন্তু বর্ত্তমান প[illegible] অপমানিত শূদ্রধর্ম্মী ভারত জগতের এই Co-ope[illegible]onএ সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। কেন না Co-operation করা বলতেই নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সাহায্য [illegible] বুঝি; আমরা যে জ্ঞানে অজ্ঞানে ইংরাজ-শাসনকে সাহায্য করছি তা কি স্বইচ্ছায়?—না বাধ্য হয়ে দায়ে পড়ে পেটের ও প্রাণের দায়ে? শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবু ঠিক বলেছেন যে, আমরা নন-কো-অপারেট করতেই পারি না, কথাটা ভুল; নন-কো-অপারেট যে করবে সে যে কো-অপারেট করছিল আগে এই বুঝতে হবে, কিন্তু আমরা কোন কালে ইংরাজের সঙ্গে স্বইচ্ছায়, স্বাধীন ভাবে কো-অপারেট করিনি,

আমাদের তারা ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে Co-operate করিয়ে দেয় অর্থাৎ খাটিয়ে সেবা করিয়ে কাজ উদ্ধার করিয়ে নেয়। আমাদের কি অসাধ জগতের পাঁচজনের সঙ্গে একধর্ম্মী এককর্ম্মী হয়ে বিশ্ব সভ্যতা গড়ে না তুলি? ভারত যতদিন মানুষের মত মানুষ ছিল ততদিন সে বিশ্ব সভ্যতাকে ভাব বিলিয়ে বড় করে এনেছে; অশোক, শিলাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন তার সাক্ষী। যজ্ঞশালার ঝাড়ুদারের সাধ হয় না কি যজ্ঞের হোতা বা ঋত্বিকের একজন না হই? তা কপালে যে মেরে রেখেছে। এই non-co. হচ্ছে সেই পদমর্য্যাদা লাভ করবার চেষ্টা। ইংরেজের কাছ হতে নিজের চেষ্টায় স্বাধীন জাতের সেই birth right উদ্ধার করা এখন হয়েছে সব-প্রথম কাজ। অলমিতি বিস্তরেন।

তেজারতি

[শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়]

পূর্ব্বদুয়ারি ঘরের দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়ে যখন নির্ম্মলা তার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, 'ভেব আর ভেবে কি করবে?' তখন নরেন আস্তে আস্তে মাথা তুলে একবার আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবলে, তারপর নির্ম্মলার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা নিশ্বাস ফেললে; মনে হ'ল যেন তার বুকের ভিতরটা খালি হ'য়ে গেছে।

গুড় গুড়, গুম গুম ক'রে গ্রামের শেষে মাঠের ধারে একটা কি শব্দ হ'ল। নির্ম্মলা রান্নাঘর থেকে ছোট তেলের বাটিটি এনে স্বামীর সামনে রেখে বল্লে, 'বেলা হ'য়েছে, নেয়ে এস।'

পায়ে পিঠে মাথায় একটু তেল মেখে, গামছাটা কাঁধে ফেলে মাথা নুইয়ে কি ভাবতে ভাবতে নরেন নাইতে গেল।

পল্লী পথের আশে পাশে আবর্জ্জনাপূর্ণ পচা ডোবা, খেলতে গিয়ে ভোলা সেই ডোবায় পড়ে গিয়ে এক গা কাদা মেখে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল; তার চোখ দুটি ছল ছল, জলে ভেজা পদ্মের মত চল চল।

মা বল্লে,—'করেছিস্ কি বাছা? এমনও দুষ্টু ছেলে!'

'আমি দুষ্টু নই—'

'তুইই দুষ্টু, এবার তোকে বেঁধে রাখব।'

'আমি ত পা ধুতে গেছলুম।'

তার যে কোন দোষ নাই, সে যে দুষ্টু ছেলে নয়, তা সে শেষের একটি কথাতেই মাকে বুঝিয়ে দিলে।

মায়ের সাত রাজার ধন একটি মাণিক, হেলতে দুলতে মার কোলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল; মা যে তাকে বেঁধে রাখবার ভয় দেখিয়েছে, তার সে কথা মনেই নাই। ছেলের পা, হাত, মুখ ধুইয়ে পুঁছিয়ে কোলে নিয়ে একটা খৈয়ের নাড়ু তার হাতে দিয়ে বল্লে, 'যা ঐ সামনের দাওয়ায় ব'সে ব'সে খেগে।'

শেষের কথা কটা তার কাণে পৌছল কি না জানি না; তার ষোল আনা মন তখন খৈ নাড়ুতে।

ভাতে ভাত আর তেউটির ডাল আজ এইই রাঁধবার ব্যবস্থা। প্রাচীরের দাওয়ায় চাঁপা ন'টের শাক, তাই দুটো কেটে এনে চচ্চড়ি হ'য়েছে। রান্না অনেকক্ষণই হ'য়ে গেছে। তবে নির্ম্মলা গেরস্তের মেয়ে, গেরস্তের বউ, তার কি আর কাজের শেষ আছে? না সাত পাঁচ ভাববার সময় আছে? রান্নাঘরের শিকলটি টেনে দিয়ে, গাইটির মুখে দুটি ঘাস দিয়ে, তার দেড় মাসের একনা বাছুরটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তারপর গোয়াল থেকে বেরিয়ে উঠনের মাঝে শিউলি বেলা গাছের গোড়ার আগাছাগুলি মাথা নুইয়ে তুলে ফেলতে লাগল—মাথার চুল এলিয়ে গেছে, অরুণগণ্ডের

পাশ দিয়ে দুই এক গাছা মাটির উপর পড়েছে। বাছুরটিও পেছু পেছু ছুটে এসে দুধে মুখে গৃহলক্ষ্মীর কাপড়ের ঝুঁপি ধরে টানতে সুরু ক'রে দিয়েছে। কোথায় ছিল ভোলা তার তখন নাড়ু খাওয়া শেষ হয়েছে, সে অমনি ছুটে এসে বাছুরের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে হু হু হুর ক'রে একটা শব্দ ক'রে হাততালি দিতে লাগল। আর বাছুরটিও অমনি টলতে টলতে উঠনের চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

লক্ষ্মীর উঠন তখন শিশুর কোমল কণ্ঠরবে মুখর হ'য়ে উঠেছে; একা ভোলা আজ পল্লীবালার সুমার্জ্জিত আঙ্গিনায় শত হৃদয়ের আনন্দ চাঞ্চল্য ছুটিয়ে দিয়েছে।

মেয়ে আসতে এখনো দেরী আছে ভেবে নির্ম্মলা দুপাঁজ তুলো নিয়ে দাওয়ার কোণে চরখা কাটতে বসে গেল। আর মাঝে মাঝে এক একবার স্নিগ্ধ কোমল চাহনিতে বার দরজার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

সাঁজের হাওয়া—ঝির ঝির করে বইছে,—চাঁদের আলোয় শিউলী গাছের সারা অঙ্গে রতন ভূষণ ফুটে উঠেছে। তারই তলায় একটি মাদুর বিছিয়ে কাত হ'য়ে নরেন শুয়ে, আর ভোলা মাথার কাছে ব'সে ব'সে একটা হলদে রঙের চাদর নিয়ে তার বাবার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিচ্ছে, একবার বাঁধছে একবার খুলছে; এমন সময় বার দরজায় একটা স্বর শোনা গেল।

'ও নরেন, বাড়ীতে আছিস রে বাবা?'

'আজ্ঞে এই যে আছি' ব'লে নরেন ঘোষেদের বড়কর্ত্তাকে আস্তে আস্তে মাদুরের উপর বসিয়ে নিজেও তার একটি পাশে বসল। ভোলা বেগতিক দেখে বড়-কর্ত্তার লাঠিটি নিয়ে রান্নাঘরে তার মার কাছে প্রস্থান করেছে।

বড়কর্ত্তা বল্লেন—'তাইত হে বড় বেশী টাকা, কোত্থেকে পাবে, কেমন করে দেবে? কিছুই ত ঠিক করতে পারছি না। এক শ নয় আধ্ শ নয়, পাঁচ পাঁচ শ টাকা; তোমার বাবা কত টাকা নিয়েছিলেন?'

'তা ত আমি জানি না,—আমি তখন সাত বছরের, শুনি নাকি দেড়শ টাকা, সুদে আসলে পাঁচশ হয়েছে।'

'দলিল-টলিল কিছু আছে কি?'

নরেন বল্লে—'দলিল কোথা, চাটুজ্যে মশাই ত বলেন দলিল নাই, তিনি মুখের কথাতেই আমার বাবাকে টাকা দিয়েছেন, সুদতে না পারলে আট বিঘে জমি তাকে ছেড়ে দিতে হবে, এই ত শুনি।'

'সাক্ষী-টাক্ষী কি আছে?'

'তাই বা কৈ? আর যদি থাকে ত সে কথা আপনারাই জানেন, আমাদের যা কিছু কাজ তা আপনি ত জানেনই, সব আপনারই পরামর্শ মত হয়।'

'না বাবা, আমি ত এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।'

'শুনি নাকি সন্ধ্যের পর গোপনে বাড়ীতে এসে টাকা দিয়ে গেছেন। চাটুজ্যে মশাই বলেন, 'হরদয়াল মুখুজ্যেকে (নরেনের পিতা) টাকা দেব, তার আবার দলিলই বা কি, সাক্ষীই বা কি?' বাবা যে টাকা নিয়েছেন একথা সত্য, আর পিতৃঋণ যে কোনও উপায়েই হোক শুধতেও হবে। দলিল নাই, সাক্ষী নাই বলে ফাঁকিয়ে দিতে পারব না।'

বড়কর্ত্তা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লেন—'বেঁচে থাক বাবা, বাপের নাম উজ্জ্বল কর, আজ আমার ৭০ বছর বয়েস, আমাদের গ্রামে টাকা কড়ির লেন-দেন ঢের হয়েছে, আমার জীবনে কখনও দলিল বা সাক্ষীর নাম শুনিনি, কেও কাউকে ফাঁকিও দেয় নি।'

'আমিও দোব না, আশীর্ব্বাদ করুন যেন অধর্ম্মে মতি না হয়। বসুন একটু তামাক সেজে আনি; ওগো জ্যেঠামশাইকে পান টান দাও।'

'থাক্ থাক্, পান আর চাইনে দাঁতের গোড়া একেবারে আল্‌গা হ'য়ে গেছে, সুপরি চিবুতে দাঁতে লাগে।'

'তবে তামাকই আনি' বলে নরেন সেখান থেকে উঠে গেল। বড়কর্ত্তা ব'সে ব'সে নিজের মনে মনেই বলতে লাগলেন, 'তাই ত ছেলেটার জন্যে মহা ভাবনায় পড়লুম! এত টাকা কোত্থেকে জোটাবে? হায় হায়!'

এদিকে নরেন ভাবা হুঁকোর উপর কলকের ফুঁ দিতে

দিকে হুঁকোটা বড়কর্ত্তার হাতে দিল। বড়কর্ত্তা হুঁকোয় একটা টান দিয়ে বল্লেন, 'টাকার কি যোগাড় করতে পারবে ?'

'একটি পয়সাও ত হাতে নাই, একটি শ টাকা ছিল, তা ত বাবার শ্রাদ্ধেই খরচ হয়েছে। এখন ঐ মরাইয়ের ধান কটিই সম্বল। আপনার কাছে গোপন কি ? নুন তেল কেনবার পয়সাও নাই। মনে করছি ছোট মরাইএর ধানগুলি বেচে এবছরের মত সংসারের খরচটা চালিয়ে নেব। তার উপর আবার যদি ঐ আট বিঘে জমিও যায় ত কাল আমায় পথের ভিখারী হ'তে হবে। শেষ পর্য্যন্ত দেখছি পরের বাড়ী চাকর থেকে পেটের ভাত জুটতে হবে ! নারায়ণ জানেন অদৃষ্টে কি আছে।'

পাশের ঘরের দাওয়ায় ব'সে নির্ম্মলা ছেলের কাঁথা শেলাই করছিল, শেষের কথা ক'টি শেলের মত তার বুকে গিয়ে বিঁধল

বস্ত্রাঞ্চলে এক ফোঁটা চোখের জল মুছে শিশিরসিক্ত পদ্মের মত মুখটি নুইয়ে আবার তেমনি সেলাই করতে লাগল ; ভোলা মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বড়কর্ত্তারও মনটা টলে গিয়েছিল—তিনি অতি ধীর স্বরে বল্লেন, 'আচ্ছা আজ ত যাই, কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করো।'

'যে আজ্ঞে' ব'লে নরেনও বড়কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল।

'কৈ রে আমার লাঠিটে কৈ ? দেখ, ভাইরা আমার বুঝি বুড়োদাদার সঙ্গে একটু রসিকতা করেছে।'

'এই যে আমি এনে দিচ্ছি' বলে নরেন ছড়িটি এনে বড়কর্ত্তার হাতে দিলে ; বড়কর্ত্তাও লাঠির উপর বার্দ্ধক্যের ভর দিয়ে গলাখেকরি দিতে দিতে দরজা পার হয়ে গেলেন।

৩

প্রাচীরের গায়ে একটা পেঁপে গাছ, সূর্য্যদেব সেই পেঁপে গাছের উপর উঠতে না উঠতেই নির্ম্মলা স্নান ক'রে এসেছে। হলুদে রঙের একটা মোটা কেটের কাপড় পরে গলবস্ত্র হয়ে নির্ম্মলা তুলসী তলায় জোড় হাত করে দাঁড়াল ; পল্লীবালার সেই ভক্তিমতী মূর্ত্তি, তার জীবনের সমস্ত নিবেদন নিয়ে গৃহস্থের ইহপরকালের ইষ্ট যেখানে গৃহীর জন্য আশীর্ব্বাদ নিয়ে বিরাজ করছেন সেই তুলসীর চরণে প্রণত। ভক্তি-গদ-গদ চিত্তে স্বামী, পুত্রের কল্যাণ কামনা ক'রে, নির্ম্মলা উঠে দাঁড়াল . আপনার কথা তার মনে নাই, স্বামী ও পুত্রের সুখের জন্য পল্লীর গৃহলক্ষ্মী তার সমস্ত জীবনটি উৎসর্গ করে দিয়েছে। বসন্ত শোভার মত অঞ্জন উচ্ছলিত ক'রে রক্তাভ করপুটে 'সূর্য্যপ্রণাম' করে গৃহের কাজে সারা মনটি সঁপে দিলে।

ভোলা নাচ-দুয়োরে খেল্‌ছিল, সে ছুটে গিয়ে মাকে বল্লে—'মা মা, মাতী মা এতেতে, এই দেখনা, মা মাতিমা তোর মত তুন্দল।'

'বা রে ছেলে' বলে মাসীমা আস্তে আস্তে তার ফুট্‌ফুটে কান দুটি ম'লে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে।

'আয় বোন, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, আজ কদিনই হল তোর সঙ্গে একবার দেখা করবার কথা ভাবছিলুম।' এই বলেই নির্ম্মলা তার ছেলেবেলার সইকে বসবার জন্যে একটি আসন দিয়ে বল্লে, এইটেতে ব'স্।

বড়কর্ত্তার পুত্রবধূ মনোরমা নির্ম্মলার বাল্য সখী, তাদের এক গ্রামেই বাপের বাড়ী, তাদের শ্বশুরবাড়ীও হয়েছে এক গ্রামে। দুজনে বড় ভাব।

মনোরমা খুঁটির উপর হেলান দিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর ব'সে পড়ল। তারপর নির্ম্মলার মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে চেয়ে বল্লে,—'দেখ্ বোন, আজ আমি একটা কথা বলবার জন্যে এসেছি।'

'কি কথা ? বলনা শুনি।'

'কথা আর কিছুই নয়, বাড়ীতে শুনলুম, চাটুজ্যে মশাইএর দেনার জন্যে তাঁকে আট বিঘে জমি ছেড়ে দিতে হবে ; সত্যি নাকি ?'

'হাঁ', এই ছোট উত্তরটি দিয়ে নির্ম্মলা মুখ নীচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

'তা দেখ্ ভাই আমার একটা কথা রাখবি ?'

'বুঝেছি, তুই আমায় সাহায্য করতে চাস ? তা তা আমি কি—'

মনোরমা সইএর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে,

'আমি কি টামি কি নয়, যা বলি শোন; এই আট বিঘে জমি গেলে আর থাকবে কি? সংসার চলবে কেমন ক'রে? শত্তুরমুখে ছাই দিয়ে যে মাণিক পেয়েছ তার কি হবে?'

'তা ত জানি' শেষের কথাক'টি শুনে নির্ম্মলার বুক ভেঙে গেল। নির্ম্মলা কাতর দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, দুই এক ফোঁটা জল তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

'আমার দু'সেট গয়না আছে, তার এক সেট আমি ভোলাকে দিচ্ছি, সেই গয়না বেচে ও আপদ ঋণ শোধ ক'রে ফেল, আমার মাথা খাস যদি কথা না রাখিস।'

'ছি মনি, বলিস কি? তা আমি জীবন থাকতে পারব না।'

'আমায় কিছু ব'লনা, আমায় বাধা দিও না, না নিলে আমি বড় দুঃখিত হব; এই সেই গয়না এনেছি এই বলে পেটের কাপড়ের ভেতরে লুকান গয়নার পুটলিটি নির্ম্মলার সামনে রেখে দিলে।

'এ আবার কি? ভগবান্ এ কি করলে?' বলে নির্ম্মলা কাপড়ে মুখ লুকিয়ে ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগল।

সইএর হাত দুটি ধরে নিজের কাপড়ে নির্ম্মলার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লে, 'দেখ্ বোন আমাকেও আর কাঁদাস্নে।'

মনোরমাও তখন অঝরঝরে কাঁদছে, তার কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে এসেছে। সে ঝাঁ করে দাঁড়িয়ে উঠে 'আয় রে ভোলা, আয় বেড়িয়ে আসি', বলে ভোলাকে কোলে নিয়ে হন হন করে চ'লে গেল।

নির্ম্মলা নীরব, মৃণ্ময়ী দেবীর মত ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের কোণে যেন কি খুঁজতে লাগল।

ভোলা পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা কাটি নিয়ে তার বাবার কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আর একটা ছেঁড়া কম্বলের উপর ব'সে নরেন নির্ম্মলার মুখের দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে।

নির্ম্মলা বল্লে—'আবার ভাবছ কি?'

'ভাবছি ও গয়নাগুলি থাক্, দিন কতক যাক্ সময় মত বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে দেবে। এ দেবীর অলঙ্কার! ও ভোগের নয়, আমি কিছুতেই নোব না।'

নির্ম্মলা বল্লে,—'আমায় ফিরিয়ে দেবার সময় দিলে না, বিদ্যুতের মত আমার চোখ দুটো ঝল্সে দিয়ে চ'লে গেল। এত দিন তোমার মুখ চেয়ে, ভোলার মুখ চেয়ে দুঃখের মাত্রা বুঝতে পারিনি। আজ এই সইএর কাণ্ডকারখানা দেখে আমার বুক অন্ধকারে ভরে গেছে, এত দুঃখুকেও আমি দু'হাত দিয়ে ঠেলে রেখেছিলুম, কিন্তু আজ আমি মুষড়ে পড়েছি, আমার বুকের পাঁজরা ক'টা খসে গেছে।'

নির্ম্মলা বালিকার মত কাঁদতে লাগল; তার সমস্ত উৎসাহ, আশা ভরসা সব লুকিয়ে গেছে, তার জীবন্ত ভাবটী মরণের আলিঙ্গনে রুদ্ধ হয়েছে।

'দেবি! করলে কি? তোমার এই রত্ন ফিরিয়ে নাও, দরিদ্র গৃহস্থের বুকের বোঝা নামিয়ে দাও।'

নরেন ক্ষিপ্তের মত কি বলতে বলতে বাড়ীর বাইরে চলে গেল।

নির্ম্মলা মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

বেচারি ভোলা চুপটি ক'রে মাএর মাথাটি ধরে তার দিকে মুখ তুলে চাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

পথে চাটুজ্যে মশাইএর সঙ্গে নরেনের দেখা; দুঃখে দৈন্যে তখন তার মনটা পাথরের মত ভারি।

চাটুজ্যে মশাই বল্লেন,—'দেখ বাবা নরেন, তোমায় আর কি বলব, অনেক দিন হয়ে গেল, একটা কিছু বিহিত করে ফেল বাবা।'

'যে আজ্ঞে, সবই ঠিক, আপনি দয়া করে নিলেই হয়।'

চাটুজ্যে মশাই একটু ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন,—'টাকার কি যোগাড় করেছ? তা বেশ, তবে আর কেন? ও আপদটা মিটিয়ে ফেলাই ভাল।'

'টাকা নয়, টাকা পাব কোথা? ঐ আট বিঘে জমি নিয়ে আমায় মুক্তি দিন।'

নরেনের স্বর ধীর গম্ভীর।

চাটুজ্যে মশাই বল্লেন—'এ্যাঁ, সে কি! জমি, জমি

তা বাবা, নয় আরও দুমাস সময় নাও, জমিটে হাত-ছাড়া করবে? খাবে কি?'

'এ জীবনেও অত টাকা যোগাড় করতে পারব না। দুমাস আর কটা দিন? আপনি জমি নিন, পিতৃঋণ হ'তে আমায় মুক্তি দিন, আমায় বাঁচান।' অতি দ্রুত স্বরে নরেন কথাক'টি বলে উত্তরের আশায় চাটুজ্যেমশাইএর দিকে চেয়ে রইল।

দৃষ্টি শূন্য, তাতে চিন্তার রেখাটি পর্য্যন্ত নাই।

চাটুজ্যে মশাইএর ইচ্ছা নয় কাউকে পীড়ন করেন। তিনি বল্লেন, 'না থাক, এখন থাক, যা হয় পরে দেখা যাবে। বড় ব্যস্ত বাবা, একটু দক্ষিণ পাড়ার দিকে যাচ্ছি একটা বড় জরুরি কাজ আছে; যাহ'ক হবে, তুমি ভেব না বাবা।' এই বলে নাকে একটিপ নস্য নিয়ে, একটি ছোট ছাতা মাথায় দিয়ে চলতে লাগলেন—ছাতাটি বোধ হয় তাঁর পৌত্রের উপনয়নের।

নরেন ভাবলে, 'সবাই কি দেবতা।'

৫

তার পর চার মাস কেটে গেছে। গরীব গেরস্তের জীবন সম্বল সেই আট বিঘে জমি এখন চাটুজ্যে মশাইএর দখলে।

গয়নাগুলি নির্ম্মলা তার সইকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সইএর সমস্ত জিদ নিষ্ফল হয়েছে।

আবার তেমনি বুকে হাঁটু দিয়ে নির্ম্মলা সংসারের কাজে লেগে গেছে। তার নিজের সুখ দুঃখ ভুলে স্বামী পুত্রের জন্যে তার নিজের জীবন ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু কি নিয়ে খাটবে, কি নিয়ে বুকের ভিতর উৎসাহ বাঁধবে? ছেলের শুকনো মুখ দেখে তার বুক ভেঙ্গে চৌচির হ'য়ে যায়। স্বামীর দিকে চাইতে তার ভয়ে বুক কেঁপে উঠে।

সূর্য্যদেব সকাল হ'লেই তেমনই তার পেঁপে গাছের মাথার উপর ঝিকমিকিয়ে উঠে তেমনিই তার সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় চাঁপানটের শ্যামল লাবণ্যে ঢেউ খেলে যায়। বেল ফুল, শিউলি ফুল তেমনিই ফোটে; তেমনিই তার আঙ্গিনায় চাঁদের আলো হাসে। সবই তেমনি, কেবল তিনটি প্রাণী দৈন্যের কর্কশ আঘাতে মুচড়ে পড়েছে।

আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নির্ম্মলা স্নেহের আঁচল দিয়ে তার বক্ষদীপটিকে ঘিরে ঘিরে রাখতে লাগল। এক একটি দিন যায়, নির্ম্মলার এক একটি পাঁজর খসে পড়ে।

'মা, সইমাদের বাড়ীতে আজ লক্ষ্মীপুজো, আমাদের করবি না?'

'করব বৈকি বাবা' এই বলে নির্ম্মলা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ছেলেকে বুকের উপর তুলে নিলে।

নরেন কি চাকরি করতে গেছে? তার এই স্নেহের বক্ষ দুটি কার হাতে সঁপে দিয়ে যাবে? হাত পা যে তার বাঁধা।

দেখতে দেখতে আরো একটি বছর কেটে গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে অনেক দুঃখের ঘটনাই ঘটে গেছে। উঠতে বসতে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নরেনের মন ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছে।

শ্রাবণ মাস; সারা রাত্রি টুপ টাপ, ঝুপ ঝাপ্ বৃষ্টি পড়েছে, পথে কাদা, ঘরের বাইরে কাদা, মানুষের পথ চলা ভার। ভোলার আজ পাঁচ দিন ভারি জ্বর, চোখ চেয়ে একটি কথাও সে বলতে পারছে না; মাঝে মাঝে হাত পা নাড়ছে, মুখ চোখ রক্তবর্ণ, ঘন ঘন ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে, ঠোঁট নেড়েই জল চাইছে।

মাএর আহার নাই, নিদ্রা নাই, নির্ম্মলার বুকের ধন আজ মরণের কোলে শুয়ে; স্থির চোখ দুটি ছেলের মুখের উপর রেখে স্নেহের আঁচল দিয়ে তাকে ঘিরে রাখবার জন্যে আজ তিন দিন ধরে যমের সঙ্গে যুঝছে।

নরেন পুরুষ, তার কঠোর প্রাণ, সে প্রাণও আজ গলে গেছে; ভোলার বিছানার এক পাশে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে এক এক ফোঁটা চোখের জল ফেলছে।

খাওয়া দাওয়া তাদের গেছে, তারা বড়লোক না গরীব, সে কথা আর তাদের মনে নাই। আজ সকাল থেকে ভোলার 'মাসী মা' এসেছে, সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখছে, রোগীর জন্য জলটা-আসটা দিচ্ছে।

দুপুরের পর থেকে রোগ বেড়ে উঠল, আর বুঝি ভোলা বাঁচে না। নির্ম্মলার প্রাণের আলো, তার ঘরের আলো বুঝি নিভে যায়!

ডাক্তার? কোথা ডাক্তার? গরীবের ছেলের জ্বর হলে কি আবার ডাক্তার ডাকতে হয়? গ্রামে ডাক্তার নাই, এক হাতুড়ে বৈদ্য আছে, তার ওষুধ খাওয়া না খাওয়া সমান।

৬ মাইল দূরে ডাক্তার আছে, তাঁর পাল্কীভাড়া, ভিজিট ইত্যাদি নিয়ে ১২৲ টাকা। অত টাকা নরেন এখন পাবে কোথায়?

নরেন অনেকক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভারি ভারি গলায় বল্লে—'ডাক্তার! ভগবান! দেখবে বাবা, আমি তোর কেমন বাবা! তুলসীতলার মাটিই আমার ডাক্তার, আমার ভোলার ওষুধ। দাও বাবার মুখে আমার এক বিন্দু তুলসীতলার মাটি দাও।'

নির্ম্মলা প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, স্থির, ধীর, চক্ষে পলক নাই।

মনোরমা ছুটে গিয়ে তুলসীর মাটি এনে ভোলার মুখে মাথায় মাখিয়ে দিলে; ভোলা একটু চাইল, একটু ঠোঁট নাড়ল, মনোরমা দুফোঁটা জল মুখে দিলে।

এমন সময় খটাস ক'রে বাইরে দরজায় একটা শব্দ হ'ল। নির্ম্মলার চৈতন্য নাই, নরেন স্তব্ধ—নীরব।

মনোরমা মুখ ফিরিয়ে দেখলে চাটুজ্যে মশাই, আর সেই সঙ্গে ডাক্তার বাবু যার ১২৲ টাকা ফি।

'দেখুন ত ডাক্তার বাবু ছেলেটির এখন অবস্থা কেমন?' এই বলে চাটুজ্যে মশাই নরেনের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধ'রে রোগীর পরীক্ষা করে বল্লেন—'কোন ওষুধ দেওয়া হ'য়েছে কি?' মনোরমা পাশ থেকে বল্লে—'না, একটু তুলসীতলার মাটি দিয়েছিলুম।'

ডাক্তার পুনরায় বলতে লাগলেন—রোগ খুব কঠিনই হ'য়েছিল বটে, কিন্তু রোগীর এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লক্ষণ দেখছি।

চাটুজ্যে মশাই ডাক্তারের কথায় অনেকটা শান্ত হ'য়ে বল্লেন—'বাবা নরেন, আর ভয় নাই। বৌমা, আর ভয় কি? তোমার ছেলের আর কোন ভয় নাই।'

তারপর নরেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন—'দেখ বাবা, তোমার ঋণের টাকা আমি যোগাড় করেছি। এই যে দেখছ টাকার তোড়াটি এতে ৫০০৲ টাকা আছে, আর এই ক'বছরের সুদ ৭৫৲ টাকাও আছে।'

নরেন পাগলের মত চাটুজ্যে মশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তবে শোন, তোমার আট বিঘে জমির সমস্ত আয় আলাদা করে রেখেছিলুম, তার একটি কড়িও খরচ করি নাই, আজকের দিন পর্য্যন্ত হিসেব ক'রে তার আয় হয়েছে ৬০০৲ ছশ টাকা, আজকের দিন পর্য্যন্ত সুদে আসলে আমার পাওনাও হয়েছে ৫৩৫৲ টাকা, বাবা এই তেজারতি করেই ত আমি খাই, পাওনা টাকা ছাড়ি কেমন করে, তাই ৫০০৲ টাকার ওপর ঐ সুদের ৩৫৲ টাকাও কেটে নিয়েছি। ঐ টাকাটি আমার প্রাপ্য, ঐটি আমার হাতে তুলে দাও, আর বাকী ৬৫৲ টাকা তোমার পাওনা তা তুমি নাও, আর জমি, সে ত তোমারই রইল। চাষবাসও কতক যেমন করেছি তার খরচাও অবিশ্যি আমি নিয়েছি। এখন আমার টাকা আমি বুঝে পেয়েছি, তুমি তোমার জমি বুঝে নাও।'

'ডাক্তারবাবু, তবে চলুন; বাবা নরেন, ঐ টাকা থেকে ১২৲ টা টাকা ডাক্তার বাবুকে দাও।'

নরেন মন্ত্রমুগ্ধের মত আদেশ পালন করে চাটুজ্যে মশাইএর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লে—

'আপনি কি দেবতা?'

অর্থ বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঋণদান ও ধারপত্র

ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে কর্জ্জ দিয়া মূলধনের অভাব নিবারণ করা। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই অকাতরে আমানত স্বরূপে ঋণ গ্রহণ করা হয়। এই ঋণ গ্রহণ ও তাহা পরিশোধ করা ব্যপদেশে জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদিগের যে সকল সুবিধা সুযোগের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহার ফলে যে সকল ধার-পত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রধান কর্ম্ম যে ঋণদান তৎসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। আমরা সম্প্রতি সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

সমাজে ব্যক্তিগত ভাবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে যে সকল কর্জ্জ-লগ্নির কারবার চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রাপ্য দাবী নিরাপদ করিবার জন্য রাষ্ট্রবিধি ও সামাজিক প্রথা নিয়ম প্রভৃতি নানা কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল বুদ্ধি ব্যবসায়িগণ দায়িকের ব্যক্তিগত দায়িত্বে কিম্বা অপর কোন সম্ভ্রান্ত লোককে প্রতিভূ স্বরূপে রাখিয়া অথবা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা রেহান রাখিয়া টাকা লগ্নি করিয়া থাকেন। দায়িক ও মহাজনের মধ্যে এবং বন্ধক বা রেহানী সম্পত্তির উপর তাহাদের স্বত্বাস্বত্ব ও দাবী দাওয়া সম্বন্ধে জটিল রাষ্ট্রবিধি ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কও ইচ্ছা করিলে এই সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া, তাহাদের তহবিলের টাকা ঋণদানে বাহির করিয়া দিতে পারেন এবং সময়ে সময়ে দিয়াও থাকেন। এই ভাবে যে সকল টাকা বাহির করা হয়, তাহা প্রায় দীর্ঘ সময়ের জন্যই পরিগৃহীত হয়। বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রায়শঃ দীর্ঘ সময়ের জন্য টাকা কর্জ্জের প্রয়োজন হয় না; বিশেষ ব্যাঙ্কও সচরাচর দীর্ঘ সময়ের জন্য টাকা বাহির করিয়া দেন না। বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকা লইতে হইলে তাহা সহজে ও সুলভে পাওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিবিশেষের টাকা যে ভাবে লগ্নি হয়, তাহার দলিলাদি লিখন, সম্পাদন ও রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে জটিল নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে; তাহার আশ্রয়ে ব্যাঙ্কের টাকা লগ্নি করিতে হইলে, সহসা কাহারও পক্ষে টাকা পাওয়া সম্ভবপর নহে। একটা স্থাবর সম্পত্তি রেহান রাখিয়া এক শত কি তদূর্দ্ধ টাকা দিতে হইলে, সেই দলিলে অন্ততঃ দুই জন নিরপেক্ষ সাক্ষী থাকা ও তাহাদের সাক্ষাতে ও দেখাতে দায়িককে স্বাক্ষর করা চাই এবং তৎপর উহা রেজিষ্টরী করিয়া দিলে, তবে সে রেহান সিদ্ধ ও বলবৎ হয়। ব্যক্তিগত দায়িত্বে একটা সামান্য খত লইয়া টাকা কর্জ্জ দিলেও উহাতেও বিশ্বস্ত ও পরিচিত লোক আনিয়া সাক্ষী করা চাই। এ সকলই সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ। সুতরাং এই সকল পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্যাঙ্কের এই বিপুল লগ্নির কারবার চলে না। ব্যাঙ্কের কার্য্য সৌকর্য্যার্থ যে সকল অভিনব কৌশল ও ধারপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার পরিচয় ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। আমরা ব্যাঙ্কের দিক ধরিয়াই আলোচনা করিব। সাধারণ লগ্নি আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য নহে।

১। চেকের সাহায্যে লগ্নি—আমানতকারিগণ তাঁহাদের নিজের গচ্ছিত টাকাই চেকের সাহায্যে উঠাইয়া লন। তাঁহাদের আমানতী টাকার বাহিরে কোন টাকা দেওয়ার জন্য চেক কাটিয়া আদেশ দিলে ব্যাঙ্ক তাঁহাদের সে আদেশ মান্য করিতে বাধ্য নহেন ও করেন না। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত অথচ ব্যাঙ্কের নিকট

সুপরিচিত, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্কের সম্মতি লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ভাবে চেক কাটিয়া উঠাইয়া লইতে পারেন। এই অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে over draw করা বলে। যখন যে পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়, তাহার উপরে নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ চলিতে থাকে এবং তাঁহার হিসাবে আসিয়া যখনই টাকা জমা হয়, তাহা কর্ত্তন যাইয়া দেনা পরিশোধিত হইয়া যায়। এই ভাবে আমানতকারীর হিসাবে কখনও জমা বেশী হয়, আবার কখনও খরচা বেশী দেখা যায়। খরচার ঘরে যখন যাহা অতিরিক্ত হয়, তাহাই তাঁহার দেনা। নির্দ্ধারিত পরিমাণের মধ্যে এই দেনা-পাওনা চলিতে থাকে, তাহার বাহিরে অতিরিক্ত গ্রহণ করা চলে না। এই রূপে চেকের সাহায্যে কতক টাকা লগ্নি হইয়া পরিশোধিত হইয়া যায়।

২। ব্যাঙ্কের নিকটে যাঁহাদের অতিরিক্ত গ্রহণ করার সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা আছে, এবং যাঁহারা অতি বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত, তেমন লোকের জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিভূ স্বরূপেও কার্য্য করেন। তেমন লোক ব্যবসায়-ব্যপদেশে কিম্বা পরিভ্রমণ জন্য বাহির হইলে, এইরূপ পরিচিত ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহার বিশ্বস্ততার নিদর্শনস্বরূপে বিদেশস্থ ব্যাঙ্কের নিকট পরিচয়-পত্র লইয়া যাইতে পারেন। এই পত্র দ্বারা বিদেশস্থ ব্যাঙ্ককে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পর্য্যন্ত ধার দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। এই পত্র দ্বারা ব্যাঙ্ক আপনাকে তাঁহার প্রতিভূ স্বরূপে দায়ী করেন। সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কের পত্র লইয়া পৃথিবীর যে কোন ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে, এই পত্রের লিখিত পরিমাণ পর্য্যন্ত টাকা ধার পাওয়া যায়। যখন যে ব্যাঙ্ক যত টাকা ধার দেন ও প্রাপ্ত হন, তাহা এই পত্রে লিপি করিয়া দেন। তবে এই পত্রে যে সকল ব্যাঙ্কের নাম থাকে কেবল সেই সকল ব্যাঙ্ক হইতেই টাকা লওয়া যায়, অন্য ব্যাঙ্ক হইতে পাওয়া যায় না। এই সকল পত্রকে letters of credit বা প্রত্যয়-পত্র বলা যায়। যদি এইরূপ পত্রে টাকার সীমা নির্দ্দেশ করা না থাকে তবে তাহাকে letters of unlimited credit কহে। যখন যে ব্যাঙ্ক হইতে যত টাকা গ্রহণ করা হয়, সেই টাকার উপরে সুদ চলে। এই ভাবেও কতক টাকা লগ্নি হইয়া যায়। ব্যাঙ্কে অগ্রে জমা করিয়া পত্র নিলেও উহা দ্বারা লগ্নির সাহায্য হয়।

৩। স্কটলণ্ড দেশের কোন কোন ব্যাঙ্কে আর এক প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কর্জ্জ দেওয়ার স্বীকৃতিতে প্রস্তাব-কারীর নামে অস্থির আমানতে ঐ টাকার জন্য হিসাব খোলা হয়, এবং চেকের সাহায্যে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ হিসাবে অন্ততঃ দুই জনের নাম থাকা চাই। ইহাকে cash credit বা নগদ ধার বলা হয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্কেই এই পন্থা অনুসৃত হয় না। টাকা জমা না দিলে কাহারও নামে কোন নূতন হিসাব খোলা হয় না। একবার যাঁহার নামে হিসাব খোলা হইয়াছে, তাঁহাকে নগদ টাকা দিতে হইলে, অতিরিক্ত টাকার জন্য চেক কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। এই over draw পদ্ধতিই সাধারণ নিয়ম।

৪। ধারে পণ্য সামগ্রী বিক্রয় সময়ে এক প্রকার ধার-পত্রের অভ্যুদয় হয়, তাহার মাতব্বরীতে টাকা লগ্নি করার এক প্রকার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার উপরেই ব্যাঙ্কের অধিকাংশ টাকা লগ্নি হয়। সুতরাং এই সকল দলিলের কার্য্য-প্রণালী সহ ব্যাঙ্কের কার্য্যের এক-যোগে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮

তার পর একদিন এক সময়েই আমার দুই গুরুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—একজন আমার আত্মতত্ত্বের গুরু, আর একজন আমার পরতত্ত্বের গুরু। একজন আমার পরম একত্বের আস্বাদ পাইয়ে দিয়েছে—আর একজন আমার পরানন্দের জন্য ডাক দিয়েছে এবং এখানে নিয়ে এসেছে। আমি আবার এক সঙ্গে এই দুই তত্ত্বের দুই গুরুকেই একই নিমেষে কাছে পেলাম। কেমন করে? বলছি—

আমি হাসির কথা শুনে সেই রাত্রেই বড় বাগানে যাব মনে করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। তাই খুব সকালে উঠেই, মুখ হাত ধুয়ে সাধু দর্শনের উপযুক্ত বেশে বড় বাগানে চলে গেলাম। আশা ছিল এত ভোরে নিশ্চয়ই আর কেউ সেখানে যায় নি। আমি বাগানের গেট্ ঠেলে প্রবেশ করে আগে দেখে নিলাম, যে দিক থেকে মেয়েদের আসার সম্ভাবনা সে দিকটায় কাউকে দেখা যাচ্ছে কিনা। কাউকে দেখতে পেলাম না—ভরসা হল কেউ নেই। সাহসে ভর করে এগুতে লাগলাম। কিন্তু বেশী দূর যেতে না যেতেই দেখি বাগানের মধ্যেই সন্ন্যাসী ঠাকুর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন—যেন পাথরের মূর্ত্তি। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে—কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! বৈরাগ্য কি এত সুন্দর! ব্রহ্মচর্য্য কি এত জ্যোতিষ্মান!

এরই মধ্যে কি আমায় খুঁজছে কেউ? এই এমন আগুনের মধ্যে কি আমার মত পতঙ্গের অস্তিত্ব থাকতে পারে? যিনি এর মধ্যে আমায় খুঁজছেন তাঁর না জানি কিসের চোখ! তিনি না জানি আমায় কি চোখে দেখেছিলেন!

আমি দেখতে দেখতে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সন্ন্যাসী ফিরেও চাইলেন না—তখন ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের কাছে গোটাদুই ফুল রেখে প্রণাম করতেই তিনি ফিরে না চেয়েই বল্লেন, 'কোন্ হো বাচ্ছা?' কি জানি কেন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ময় ভুখা হুঁ!' সন্ন্যাসী দূর আকাশ হতে চমকে চোখ নামিয়ে বল্লেন, 'ক্যা বোলা?'

'একি! কে তুমি? তুমি সত্যানন্দ না? তুমি এখানে এ বেশে?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বন্ধু আমায় অমনি জড়িয়ে ধরলেন। অমনি আমার ভক্তির বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে প্রেমের জোয়ার ঠেলে এল। আমি কেঁদে ফেল্লাম! তুরিয়ানন্দও কেঁদে ফেল্লেন,—তাঁর সন্ন্যাসীগিরির একটুও অবশিষ্ট রইল না।

তখন আমরা দু'জনে বাগানের এক কোণে পালিয়ে গেলাম—পাছে এই মিলন আর কেউ দেখে। যেখানে দুটো কামিনী গাছে আর জুঁই গাছে জড়াজড়ি করে ফুলে ফুল, রঙে রঙ, গন্ধে গন্ধ মিশিয়ে ঊষার বাতাসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তাদেরই আড়ালে বসে কত কথাই না কইতে লাগলাম। কি কথা? নাহবা তা বল্লাম, তাতে তোমাদের কিছু আসবে যাবে না। তবে এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, আমরা দুজনে অনেক কথা বল্লাম বটে, কিন্তু আমি যে এখানকার কে কেবল সেই কথাটাই এঁর কাছে ভাঙ্গলাম না। কেন জান? এইজন্যে, যে আমার তুরিয়ানন্দ যেন আর সেই তুরিয়তে নেই বলে মনে হয়েছিল। তাই ভাঙ্গতে পারলাম না। দেখলাম আমার পরম-মায়াবিনী যেন তাঁর কোমল মায়ায় এই পরম সন্ন্যাসীর মনটাকেও বেশ আচ্ছন্ন করে এনেছেন। যেন এই মহাত্যাগীর বৈশাখী আকাশে আষাঢ়ের প্রথম মেঘ সঞ্চার

হয়েছে। আমি তাই সানন্দে বল্লাম, 'দেখলে ভাই, এই রসের দেশে রসের আকাশ বাতাসের মধ্যে এসে পড়ে তোমারও মনটা ভিজে উঠেছে।'

তুরিয়ানন্দ চমকে উঠে বল্লেন, 'তাই নাকি? তা হবে, বিষয়ের সংস্পর্শে এলে বিষয়ের ছাপ পড়বে বৈ কি। কিন্তু ভাই এইটাই কি তোমার ধারণা হয়েছে যে সন্ন্যাসীর মনটা একেবারে সাহারার মত শুষ্কই? যারা সর্ব্বদা রসের সাগরে ডুবে থাকে তাদের মন বাইরে বজ্রের মত কঠোর মনে হলেও আসলে ফুলের চেয়ে নরম।'

আমি হেসে বল্লাম, 'তাই নাকি। এ মত পরিবর্ত্তন কবে হ'তে হ'ল? যাক ভাই, আর তর্ক নয়, এখন দুটো নিজের কথা বল শুনি।'

তুরিয়ানন্দ খুব জোরে হেসে উঠলেন, 'আমার আবার কথা! কোনো কথা নেই ভাই, তার চেয়ে তোমার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা আরও বল—আমি তাই শুনি। তুমি এখানে কেন, তাই আবার ভাল করে বুঝিয়ে বল।'

আমি কথা আরম্ভ করেছি, এমন সময় হঠাৎ তুরিয়ানন্দকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আমিও চমকে ফিরে চাইলাম। তারপর কি দেখলাম। সেই প্রভাতের সমস্ত জমাট শোভা আমাদের পাশে ফুলের থালা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কি দেখলাম। মানুষ এত সুন্দর! ধন্য আমি যে এই রূপরাশি দেখতে পেলাম! ধন্য আলো। ধন্য বায়ু। ধন্য আকাশ! আর ধন্য সেই ফুলের বনের মধুর গন্ধ। সবাই তাকে ঘিরে ধন্য হল।

মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সেই ফুলের থালাটী সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে, নতজানু হয়ে বসল। তার পর ধীরে ধীরে একটা ফুল নিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে দিয়ে প্রণাম করলে। ওই সন্ন্যাসী ছাড়া জগতে আর কেউ যে থাকতে পারে, তাই যেন তার মনে হয়নি। সন্ন্যাসী কোনো কথা কইলেন না। মূর্ত্তি শেষে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, 'আপনি এখানে, আমি অনেকক্ষণ আপনার আসনের কাছে অপেক্ষা করছিলাম।'

সমস্ত প্রভাতের আকাশটা যেন গানের সুরের মত বেজে উঠল। আমি সেই স্বররাশি দুই কান দিয়ে পান করলাম, উঠে সম্মান দেখাবার সময়ই পেলাম না। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম, যেন সমস্ত জগতের যত রূপ, যত মাধুর্য্য ছিল, যত মন্ত্র-তন্ত্র, যপ-তপ ছিল, সমস্তই ভক্তি হয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নেমে এসেছে। যেন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত পূজাই আবার দিকে দিকে, লোকে লোকে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী বল্লেন, 'এই এঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। ইনি আমার অনেক দিনের বন্ধু।'

উর্ম্মিলা দেবী এইবার চমকে উঠে আমার দিকে চাহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বৃক্ষান্তরালে সরে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম, 'স্বামীজী, এখন আমি তবে যাই, এঁরা যে এখন আসবেন তা জানতাম না। আমি যাই।'

তুরিয়ানন্দ শান্ত হয়ে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন, 'না না—তুমি যাবে কেন? উনি উর্ম্মিলা দেবী, ওঁকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই। আর তুমিও একে দেখে লজ্জিত হয়ো না—ইনি আমারই স্বজন।'

উর্ম্মিলাদেবী এগিয়ে এসে আমাকেও প্রণাম করলেন. একখানা শরৎ-প্রভাতের পথভোলা মেঘ হঠাৎ ভুলে বুঝি আমার কাছে নুয়ে এল, ছুঁয়ে গেল.—বিন্দু বিন্দু বর্ষেও বুঝি গেল। আমি সে প্রণামের মধ্যে ঢুকে কোথায় কোন দ্যুলোকের আলোকের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

উর্ম্মিলাদেবী নত বদনে বল্লেন, 'আমি ওঁকে চিনি, উনি আমাদের প্রিয়বাবু ম্যানেজার। আসুন আপনারা, আসন পেতে রেখেছি, এখনি এঁর মা আসবেন, হাসি আসবে, আমার মাও আসবেন।'

আমি আর দাড়াতে পারলাম না, বল্লাম, 'এখন আমি যাই, আর এক সময় আসব। তখন সব কথা হবে।'

সন্ন্যাসী তবু আমার হাত ছাড়লেন না।

উর্ম্মিলাদেবী তখন রাণীর মত গৌরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'সাধুর ইচ্ছার কাছে সংসারের কর্ত্তব্য অনেক ছোটো, আপনার এখন যাওয়া হবে না।'

আঃ বাঁচালে! দেবি, সাধুর ইচ্ছাই হোক, আর

যারই ইচ্ছা হোক, তোমার ইচ্ছাই আমার সব। আমার সমস্ত অস্তিত্বই যে এখন তোমার। এই যে এঁর ইচ্ছাকে অবলম্বন করে আমাকে তুমি চাইলে, এই আমার পরম লাভ! তুমি এতদিন পরে তোমার ইচ্ছা আমায় নিজমুখে জানিয়েছ—আমি ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম! তোমার এই ইচ্ছাটুকুর জন্যই যে আমি এই এতকাল ধরে বেঁচে আছি।

সন্ন্যাসী আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর আসনেই বসাতে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি মাটীতে বসলাম। তুরিয়ানন্দ বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বল্লেন, 'ভাই, এমনি করেই কি আজ হ'তে তোমায় আমায় পার্থক্য রেখে চলতে হবে?'

আমি বল্লাম, 'যার যেখানে স্থান তার পক্ষে সেই স্থানই শ্রেষ্ঠ। সেই স্থানের অপমান করলে তার নিজেরই অপমান হয়। আমার মাটীতেই স্থান, আমি এই মাটীর অপমান করতে পারব না।'

সন্ন্যাসী নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। উর্ম্মিলা দেবী তাঁর ফুলের সাজি হতে ফলগুলি তুলে আসনের সামনে সাজিয়ে রেখে দিয়ে, আবার একবার প্রণাম করলেন। তারপর বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বুঝলাম আমার উপর তাঁর সঙ্কোচ ভাব দূর হয় নি। তাই এই অবসরে মৃদুস্বরে বল্লাম,—'ভাই, আমি এখন এঁদের চাকর! এঁদের সামনে বেশী সম্মান দেখালে আমাকেও বিপদে ফেলবে, এঁদেরও মুস্কিলে ফেলবে। আর একটা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমার সম্বন্ধে কোনো কথা এদের বল না। কেন একথা বলছি তা পরে বলব, এখন নয়। তুমি কেবল এইটুকু অনুরোধ রেখো যে, এই যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর কথা বলে আজন্ম সাধুসেবিকা এঁদের মনে অকারণে আমার ওপর একটা ঘৃণা জন্মিয়ে দিও না। এঁদের চাকরী করি, তবু চাকরের যা সম্মান তা হ'তে এঁরা আমায় বঞ্চিত করেন নি। কিন্তু আমার পূর্ব্বের কথা শুনলে এঁরা হয়ত ঘৃণা করবেন। সে ঘৃণা সহ্য করা কঠিন হবে।'

তুরিয়ানন্দ বল্লেন, 'যোগভ্রষ্ট! কে বল্লে তুমি যোগভ্রষ্ট! তুমি আপন যোগে ত' ঠিকই আছ। তোমার মধ্যে সেই প্রথম দর্শনের সময়ও যে নারীত্বের আভাষ পেয়েছিলাম, তাই ত' এখন পূর্ণত্বের দিকে চলেছে দেখছি। আমার দিকটাই যে একমাত্র যোগের দিক তা যে আর মানতে পারছি না। মনে হচ্ছে তোমার দিকটাও ত হ'তে পারে।'

আমি কথা শেষ করবার জন্য বল্লাম, 'তা যা হয় হোক, এখন তুমি কিছু বলতে পাবে না। আমি চল্লাম। দেখো তুমি এখন আমার বিষয় সম্পূর্ণ নীরব থেকো। আমার এই অনুরোধটী রেখো ভাই, দোহাই।'

আমি চলে এলাম—কিন্তু কেমন যেন হয়ে এলাম। পাগল হয়ে? হবে। (ক্রমশঃ)

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মন্দির প্রাঙ্গণে সেই তেজঃপুঞ্জ যুবক সন্ন্যাসীর প্রেমোচ্ছ্বাস দর্শনে তাঁহাকে নিজ হইতে উচ্চ স্তরের জ্ঞান করিয়া সার্ব্বভৌম হৃদয়ে যে আন্তরিক ভক্তির বিকাশ হইতেছিল, গোপীনাথের নিকট সন্ন্যাসীর নবদ্বীপের সম্বন্ধ অবগত হইয়া তাহার সাহজিক স্রোত ক্রমে রুদ্ধ হইয়া তৎস্থলে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি হইল। তরুণ বয়স্কের প্রতি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও জ্ঞানবৃদ্ধের যে এক প্রকার স্নেহ কোমল ভাব লক্ষিত হয় মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনজনিত সার্ব্বভৌম ঠাকুরের আন্তরিক শ্রদ্ধা বা ভক্তি তদ্রূপ এক নূতন বৃত্তিতে পরিণত হইল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম পরম পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যাভিমান এ যাবৎ তাঁহাকে অহর্নিশি এক কঠোর আবরণে আবদ্ধ রাখিয়া বহির্জগত হইতে কতকটা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল।

তাঁহার সমকক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ তৎকালে কেহ না থাকায় সার্ব্বভৌমের আত্মম্ভরিতা কখনও আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। কালে তাহা প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবে নিরুদ্বেগে বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া লোক-সমাজে নিজ একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সার্ব্বভৌমের প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছু মহাপ্রভু প্রথমতঃ তাঁহার সে প্রাধান্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইলেন। সার্ব্বভৌম ঠাকুরের মানসিক ভাব-বৈলক্ষণ্য মহাপ্রভুর অবিদিত ছিল না। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—

"তুমি জগৎ গুরু সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি॥
তোমার সহ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে তুমি আমারে পালন॥"

(চৈঃ চরিত)

ইহাতে সার্ব্বভৌমের অভিমান আরও স্ফীত হইল। বয়োঃকনিষ্ঠ স্নেহভাজনের প্রতি সচরাচর যে প্রকার উপদেশ স্বাভাবিক হইয়া থাকে, তিনিও মহাপ্রভুকে তদ্রূপ উপদেশাদি দিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমেই সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে এত কোমল বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য বিস্তর অনুযোগ দিলেন।

"পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥"

(চৈঃ ভাগবত)

সন্ন্যাস লইলে যে'অহঙ্কার-পাশে'বদ্ধ হইতে হয়, বয়োবৃদ্ধ পূজনীয় সংসারাশ্রমীর নিকটও নমস্কার গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যাহা সর্ব্বজীবে ভগবৎ অধিষ্ঠান জ্ঞানে আচণ্ডালে সম্মান করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয়, সার্ব্বভৌম তাহা শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞ লোক যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে তজ্জন্য সার্ব্বভৌম গভীর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি মহাজনগণ পূর্ব্বে সন্ন্যাস লইয়াছেন সত্য, কিন্তু—

"সে সব মহান্তগণ তৃতীয় ভাগ বয়সে।
গ্রাম্য রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥
যৌবন প্রবেশমাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার॥
—কেন করিয়াছ এমত প্রমাদ॥"

(চৈঃ ভাগবত)

প্রভুও রসিক শেখর। সার্ব্বভৌমের এই মোহ অল্পে ভাঙ্গিতে দিলেন না। সাধারণ সরল মানুষের ন্যায় এই উপদেশাবলি শুনিয়া গেলেন, এবং বালকের মত বলিলেন—

"—শুন, সার্ব্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয়॥

* * * * *

সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥" *

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে একা জগন্নাথ দর্শনে যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং জগন্নাথ মন্দিরে গরুড়ের সন্নিধানে থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন বিধেয় বলিয়া উপদেশ দিলেন।

তিনি যখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই প্রকার মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন, সেই সময় এক দিবস ভগ্নিপতি গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিলেন—

"প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি হয় ইহার উপর॥
কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন॥"

উত্তরে গোপীনাথ বলিলেন—ইঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' এবং 'গুরু ইঁহার কেশব ভারতী মহাধন্য।'

ভারতী সম্প্রদায় সন্ন্যাসীগণ মধ্যে সর্ব্ব নিম্ন। গিরী, পুরী, সরস্বতী প্রভৃতি উচ্চ কোন সম্প্রদায় হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করাতে সার্ব্বভৌম কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে গোপীনাথকে বলিলেন—

* সর্ব্ব উপদেশ মোর কহ আমারার।
তোমারি যে আমি ইহা জানি সর্ব্বথায়॥

(চৈঃ ভাগবত)

"—ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব।
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। তিনি মহাপ্রভুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। ভট্টাচার্য্যের এই গুরু গম্ভীর উক্তি তিনি বড় ধৃষ্টতাব্যঞ্জক মনে করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—

"ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা॥"

গোপীনাথের এই স্পষ্টবাদিতায় সার্ব্বভৌমের সমবেত শিষ্যগণ কলরব করিয়া উঠিলেন—উঠিবারই তো কথা, তাঁহারা যাঁহাকে সাধারণ মানব বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, যদি কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যিনি এই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতেছেন তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, শিষ্যগণের পূজনীয় অধ্যাপকের ভগ্নিপতি। শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ প্রমাণের বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলা যাইতে পারে? আচার্য্য বলিলেন, লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান হয় না। ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানে অনুমান প্রমাণ নহে।

"কৃষ্ণ বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।"

পরে সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, যদিও তুমি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত, শাস্ত্রে তোমার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরের কৃপালেশও তোমাতে নাই, কাজেই এ তত্ত্ব তুমি জানিতে পারিতেছ না। তুমি স্বয়ং ইঁহার দেব শরীরে মহা প্রেমাবেশ দেখিয়াছ; তবু ঐশ্বরিক মায়ায় তাঁহার স্বরূপত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছ। সার্ব্বভৌম গোপীনাথে কলিকালে ঈশ্বরাবতার শাস্ত্রানুমোদিত কিনা ইহা লইয়া নানা প্রকার বাদানুবাদ হইল। গোপীনাথ শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিলেন। পরিশেষে সার্ব্বভৌমকে এই বলিয়া বিদায় লইলেন—

"তোমার আগে এই কথার নাহি প্রয়োজন।
উষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ॥
তোমার উপরে যবে কৃপা তাঁর হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিই করিবে॥"

ভট্টাচার্য্যও তাঁহাকে শ্লেষপূর্ণ কথা বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে আঘাত করিতে ত্রুটী করিলেন না।

সার্ব্বভৌমের মন্তব্যে ক্ষুব্ধমনে গোপীনাথও মুকুন্দ মহাপ্রভুর সকাশে এই সব বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন, তাহাতে প্রভু বলিলেন, আমার প্রতি ভট্টাচার্য্যের অন্যায় আছে। তিনি বাৎসল্যে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন, ইহাতে দোষ কি?

কিয়দ্দিবস পর একদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম সঙ্গে আনন্দে জগন্নাথ দর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে আসিলেন এবং প্রভুকে আসন দিয়া বলিলেন, বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তুমি আমার নিকট বেদান্ত শ্রবণ কর। প্রভুও অতি ধীর ভাবে সরল শিশুর মত উত্তরে বলিলেন—

'তুমি যাহা বল আমার তাহাই কর্ত্তব্য।'

সার্ব্বভৌম বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন, আর মহাপ্রভু তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যে পবিত্র শুভ মুহূর্ত্তে জগন্নাথ মন্দিরে এই বেদান্ত পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা হিন্দুর ধর্ম্ম জগতের এক চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনই বেদান্তের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রচার হইবার সূত্রপাত হইল—সূত্র ও ভাষ্যের দ্বন্দ্ব নিরাকৃত হইয়া বেদান্তের স্বরূপ প্রতিপাদ্য জীব-জগতে প্রকাশ হইল।

সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম অতি যতনে বেদান্ত পাঠ করিতেছেন, আর মহাপ্রভু নির্ব্বাক হইয়া অবিচলিত ভাবে তাহা শ্রবণ করিতেছেন।

এই সাত দিন মধ্যে তিনি একটি কথাও বলেন নাই, কিম্বা বাহ্যিক কোন ভাবও প্রকাশ করেন নাই। অষ্টম দিবসের প্রারম্ভে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বলিলেন—

"সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।"
"ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি॥"

প্রভু বিনীত ভাবে বলিলেন— আমি মূর্খ,আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই। তুমি বলিয়াছ বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম তাই শুনিতেছি, তুমি যে অর্থ কর তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না।

সার্ব্বভৌম কিছু বিরক্তির ভাবে বলিলেন, যে বুঝিতে না পারে সে তো জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা করে। তুমি মৌন হইয়া থাক, তোমার হৃদয়ে কি আছে না আছে তাহা বুঝিতে পারি না।

এইবার মহাপ্রভুর মুখে কথা ফুটিল।

বিস্মিত সার্ব্বভৌমকে বিচলিত করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিসৃত বেদান্তের গূঢ় অর্থের যে পূত মন্দাকিনী ধারা জগন্নাথ মন্দির প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল, তাহার সম্মুখে সার্ব্বভৌম ঠাকুরের জ্ঞানগর্ব্ব পাণ্ডিত্যাভিমান সমস্তই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন—

"—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥"

শ্রীমন্দির কম্পান্বিত করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে প্রভু বলিতে লাগিলেন—

"ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্র পরমাণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য—পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার।
ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভু চিচ্ছক্তি বিলাশ।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ জীবে ঈশ্বরে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ করহ অভেদ॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে মায়াবাদ, পরিণামবাদ, ব্যাসসূত্রের সহ তাহার সম্বন্ধ, বিবর্ত্তবাদ, প্রণব, জগৎ উৎপত্তি, তত্ত্বমসি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে একজন প্রেমিক সন্ন্যাসী বলিয়াই জানিয়াছেন তিনি যে পণ্ডিত শিরোমণি—তাঁহার অপ্রমেয় অগাধ পাণ্ডিত্যের যে তুলনাই ছিল না, তাহা সার্ব্বভৌম জানিতেন না। কাজেই এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ভট্টাচার্য্য এই আলোচনা কালে পূর্ব্বপক্ষ অনেক করিলেন, তর্ক, বিতণ্ডা অনেক উঠাইলেন, নিজ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য সাধ্যমত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু—

"সব খণ্ডি প্রভু নিজমত সে স্থাপিল।"

মহাপ্রভুর এই পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের উজ্জ্বলালোকে সার্ব্বভৌমের বিদ্যা গৌরব একবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

"শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥"

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমের মোহ কাটে নাই। তিনি এই অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ও হৃতগর্ব্ব হইলেন বটে,কিন্তু মহাপ্রভুকে মানুষ ব্যতীত ঈশ্বরত্বে আরূঢ় করিতে এখনও সন্দিহান। তিনি এক গভীর সংশয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন; এই প্রতিভা, এই জ্ঞান, এই প্রেম, এই তেজ যে অমানুষী তাহা মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন, কিন্তু যে স্বভাবজাত সরল বিশ্বাসের আতিশয্যে সাধারণ মানব মহাপ্রভুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, তদ্রূপ বিশ্বাসের অভাব থাকায় সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না।

এই সন্দেহসঙ্কুল অবস্থা হইতে মহাপ্রভু তাঁহাকে

অচিরাৎ উদ্ধার করিলেন। সার্ব্বভৌমকে কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, 'ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইও না। ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। ভগবানের গুণাবলি এমন অচিন্তনীয় যে, সমস্ত বন্ধনমুক্ত আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত ভগবানে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন' এই বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিলেন -

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হেতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ॥"

(১১শ অধ্যায়)

এই শ্লোক শুনিয়া সার্ব্বভৌম অতি বিনীত ভাবে বলিলেন—'মহাশয়, এই শ্লোকের অর্থ আপনার নিকট শুনিতে বাসনা হইয়াছে।' সার্ব্বভৌমের আমূল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষাদাতা গুরুর উচ্চ আসন হইতে তিনি স্বেচ্ছায় শিক্ষার্থীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সম্মুখে আর নিজের সে পাণ্ডিত্যাভিমান নাই - যে স্নেহ করুণাপরায়ন চিত্তবৃত্তির আধিক্যে তিনি এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবার এবং পুনরায় যোগপট্টা দিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া সংস্কার করিয়া লইবার সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এমন মহাপণ্ডিত মহা প্রেমিকের প্রতি নিজ আত্মম্ভরিতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন।

প্রভু বলিলেন, তুমি প্রথমতঃ শ্লোকের ব্যাখ্যা কর, পরে আমি যাহা কিছু জানি ব্যাখ্যা করিব। সার্ব্বভৌম তর্ক-শাস্ত্রমত জ্ঞানচর্চ্চায় শ্লোকটীর যতদূর বিশ্লেষণ সম্ভব তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি নবম প্রকারে এই শ্লোকের অর্থ করিলেন। ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন— 'ভট্টাচার্য্য, তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, তোমার ন্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। কিন্তু তুমি পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছ। তদ্ব্যতীত ও শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে।' ভট্টাচার্য্য প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিতে প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌমকৃত নববিধ ব্যাখ্যা স্পর্শও করিলেন না। আত্মারামাদি শ্লোকের একাদশ পদ পৃথক পৃথক্ পদের অর্থ নিশ্চয় করিয়া অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। এই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাখ্যা চৈতন্য চরিতামৃতের পূত কলেবর অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। সে যে কি গভীর তত্ত্বের স্ফুরণ তাহা মাদৃশ অনধিকারীর ক্ষীণা লেখনীতে কি ব্যক্ত হইবে ?

ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ঠাকুরের সমস্ত সন্দেহের আবরণ মুহূর্ত্তমধ্যে ছিন্ন হইয়া দিব্যালোকে তাঁহার নয়ন উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল।

"শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হইল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার॥
ইঁহো তো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া॥"

আত্মনিন্দা করিয়া সার্ব্বভৌম প্রভুর শরণ লইলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া স্বকীয় রূপ দেখাইলেন।

"দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥"

মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সার্ব্বভৌম প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

"অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক ভরে থরথরি।
নাচে, গায়, কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥"

জ্ঞান প্রেমে, নীরসতা কোমলতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা ভগবৎ প্রেমিকের একান্ত নির্ভরপরায়ণতায় পরিণত হইল। বস্তুতঃ সার্ব্বভৌমের পরিবর্ত্তন এত আকস্মিক যে সহসা ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে। জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র প্রেম বন্যার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন আকস্মিক হইলেও তাঁহার জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক।

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব চূড়ামণিগণের মধ্যে গণ্য হইলেন। প্রভুর কৃপায় তিনি অচিরাৎ বেদাবাক্য নিত্য ক্রিয়া কলাপজনিত বৈধীভক্তির রাজ্য হইতে রাগভক্তির রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া জন্মজীবন সার্থক করিলেন।

সাধনভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা।

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্র গায়॥"

মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষাদান কালে বৈধীভক্তির লক্ষণাবলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা গুরুর চেতন।
সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা, পৃচ্ছা সাধুমার্গানু গমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥"

প্রভৃতি বৈধীভক্তির চতুঃষষ্ঠী অঙ্গ বর্ণনা করিয়া তাহার পঞ্চ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বিবৃত করেন।

"সাধু সঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধার সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

রাগভক্তি ও বৈধীভক্তি মধ্যে অনেক প্রভেদ। রাগভক্তির অধিকারী কেবল ব্রজবাসীজন। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া ভগবানকে নিজজন স্বরূপে যে ভজন তাহাই 'রাগ ভজন।'

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।" ব্রজবাসীর ভগবানের প্রতি যে টান তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া যদি কোন ভাগ্যবান লুব্ধান্তঃকরণে তাঁহাদের কোন ভাব আশ্রয় করতঃ ভগবৎ ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহা রাগ ভজন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাগ ভজনে ভগবানের সহিত দাস, সখা প্রভৃতি কোন একটী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়।

"দাস, সখা পিত্রাদি প্রেয়সীগণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
বাহ্য, অন্তর ইহার দুই তো সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

এই রাগভজন ও তজ্জনিত ভক্তি যে কত বড় উচ্চ অধিকারীর কথা তাহা সহজেই অনুমেয়। জন্মজন্মান্তর বিধিমার্গের ভজন দ্বারাও রাগ ভজনের অধিকারী হওয়া যায় না। ইহার প্রধান লক্ষণ ভগবানকে পাইবার লালসা। তাঁহার প্রতি টান না জন্মিলে রাগভক্তি লাভ করা সুদুর্লভ।

রায় রামানন্দ নিজ কৃত শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তি রস ভাবিতামতি।
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে॥
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকং।
জন্মকোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

এই "লৌল্যং" বা লালসাই রাগভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। শাক্ত ভক্তের মাতৃভাবে সাধনাও রাগভজনের অন্যতম প্রকার বিশেষ। সাধক নিজকে সন্তান জ্ঞানে ভগবানকে যে মাতৃভাবে ভজনা করিয়া থাকেন তাহার মধ্যেও সেই "লৌল্যং" পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনীতে এইরূপ ভজনই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

রাগভক্তির আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, রাগভক্ত শাস্ত্রযুক্তি মানিয়া চলেন না। তাঁহার কার্য্যকলাপ শাস্ত্রবিধির পরে। সার্ব্বভৌম শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়ী ক্রিয়াকলাপে তিনি আজন্ম অভ্যস্ত। তাহা লঙ্ঘন করা তাঁহার পক্ষে অতীব দোষাবহ। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপালাভে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। তিনি রাগভজনের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। একদিবস মহাপ্রভু অরুণোদয় কালে মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌমগৃহে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সার্ব্বভৌম "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া জাগরিত হইলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন এবং সার্ব্বভৌম প্রাতঃকৃত্য সমাপন না করিয়া দ্বিধাবিহীন চিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

"প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন।
কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিলা ভক্ষণ॥
সন্ধ্যা, স্নান, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল।
চৈতন্য প্রসাদে মনের জাড্য সব গেল॥"

ভট্টাচার্য্য কর পাতিয়া ভক্তিসহকারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ

করিলেন। এই শ্লোক পড়িয়া তাহা তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন,—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেন ভক্তব্যং নাত্র কার্য্য বিচরণঃ॥"

পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে এই ঐকান্তিক বিশ্বাস দেখিয়া মহাপ্রভু আনন্দে অধীর হইলেন। সার্ব্বভৌম এবিষয়ে মহাপ্রভুকে একমাত্র উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম্নী সুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই নয় নাম॥" *

(চৈঃ চরিতামৃত।)

এক দিবস সার্ব্বভৌম এক তালপত্রে দুইটী শ্লোক লিখিয়া মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত ও পার্ষদ মুকুন্দের হস্তে দিলেন, প্রভু তাহা পাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু মুকুন্দ শ্লোক দুইটী ভিত্তি গাত্রে পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং ভক্তবৃন্দ তৎদৃষ্টে শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন। শ্লোক দুইটী ভক্ত কণ্ঠমণিহার। ইহা হইতেই সার্ব্বভৌমের গৌর-ভক্তি দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। শ্লোক দুইটী উদ্ধৃত না করিলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকে,—

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ
শিক্ষার্থমেক পুরুষ পুরাণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী।
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"
"কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং নীয়তং চিত্ত ভৃঙ্গ॥"

(ক্রমশঃ)

---

* "প্রভুরে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
মুঞি অধমেরে প্রভু। কর দৃষ্টিপাত॥"
(চৈঃ ভাগবত)

ওমর খৈয়াম

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

৭৫

শোনই তবে—সেদিন যবে সূর্য্যেরি রথে,
ভাগ্যদেবীর কেনা নফর—খ'স্‌নু জগতে,—
কেমন ক'রে কি জানি গো—আঙুর লতাটি
জড়িয়ে গেল আমারি এই দেহের পরতে।

৭৬

আঙুর লতা রয় যদি এ মর্ম্মেরি সাথে—
শুফির শাপা—আমি তারে চাইনে ডরাতে।
যে দরজার বহিরে বসে চেঁচায় তারা গো,
চাবিটা তার হয়তো আছে আমারি হাতে।

৭৭

আমি শুধু এইটি বুঝি—সত্যেরি শিখা,
—প্রেমে জ্বলুক কিম্বা লিখুক দুঃখেরি লিখা,—
পানশালাটার দোরে যদি দেয় সে দেখা গো,
কিসের লাগি পেরবো ঐ মঠের পরিখা।

৭৮

জীবন বিহীন মাটির তালে মানুষ গড়ায়ে
তারি কাছে যুদ্ধ জয়ের শক্তি কে চাহে ?
দুষ্ট রিপু রুখ্‌তে যদি নাই সে পারে গো,
তারি লাগি ভাস্‌তে হবে দুঃখ-প্রবাহে!

৭৯

ঝুটোমোতি তাই পেয়েছে মানুষগুলি যে,
খাঁটির লাগি কেন তবে ফ্যাসাদ বাধিছে ?
ঋণের লাগি আপনি হাকিম চালায় মামলা,
এ হাকিমের হুকুম পরে আপিল নাহি যে।

৮০

তুমিই প্রভু এমন করে আমার সরণী,
মোহের জালে মায়ার খালে ভরলে আপনি ;
ভাগ্যেরি এ বাগুরাটা এমনি রাখিয়া—
বল্‌বে তুমিই—পতন আমার পাপের কারণি !

৮১

পাপের ধূলোয় গড়েছ যে মানুষ তুমি গো,
লোভের সাপে ভরে দিলে সুখের ভূমিও,
কালো পাপে ঢাক্‌লে ধরা—তাহার লাগিয়া
মানুষ তোমায় কর্‌ছে ক্ষমা—তাদের ক্ষমিও !

৮২

* * * *

রোমজানেরি শেষে সে এক সন্ধ্যারি পানে
শুন্‌ছ সাকি, দাঁড়িয়েছিলাম কুমোর দোকানে,
তখনো নাই চাঁদের দেখা গগন কোনে গো,
চৌদিকে মোর কাদার মানুষ এখান ওখানে।

৮৩

মজার ব্যাপার—সাজানো সেই পিণ্ডেরি স্তূপে
কেউবা কথা কইছে, কেহ শুন্‌ছে গো চুপে।
জোরে হঠাৎ কেউ তাদেরি উঠ্‌ল গাহিয়া—
"কুমোর কেবা—কে-ইবা মোরা কুম্ভেরি রূপে ?"

৮৪

কেউবা কহে—"এমনি ক'রে মৃত্তিকা দিয়া
নানান ছাঁদে মোদেরে যে তুল্‌ছে গড়িয়া,
অমনি কি আর গড়্‌ছে সে গো—আদিম মাটিতে
আজকে না হয় যেতেই হবে কাল্‌কে ফিরিয়া।"

৮৫

সায় দিয়ে কয় আর একজনা "বেকুব হেন কে ?
পেয়ালাটা ভাঙেও নাতো অবোধ বালকে।
শিল্পি যিনি গড়ে তোলেন পরম স্নেহে গো,
ধ্বংস তিনিই এনে দিবেন খেয়ালের ঝোঁকে ?"

৮৬

ক্ষণেক তরে থাম্‌ল কথা—জেরটা টানিয়া
বিশ্রী বাঁকা পেয়ালাটা কইছে কাঁদিয়া—
"বাঁকা ব'লে সইনা কত হাসির ছুরি গো,
আমার বেলাই গেল কি তার হাতটা কাঁপিয়া।"

৮৭

কইছে আরেক—"বলে তারে মাতাল অনেকে,
নরকেরি ধূলোয় কেহ দিচ্ছে বা এঁকে ;
বিচার মোদের হবে নাকি তারি কাছে গো—
লোক তো সে নয় মন্দ তারে না-ইবা চেনে কে ?"

৮৮

আর একজনা কইছে ছাড়ি দুখের নিশাসে,—
"শোণিত আমার শুষ্ক প্রাণের দীর্ঘ উপাসে,
রাঙা মদের রসে তারে ভিজাও যদি গো,
জীবন বুঝি ফিরে আসে জীর্ণ আবাসে।"

৮৯

এমনি ক'রে যখন তারা মত্ত কথাতে
আধখানি চাঁদ পড়্‌ল ধরা চক্ষেরি পাতে ;
হুড়োহুড়ি—কার ঘাড়ে কে—কইল হাঁকিয়া—
"দ্যাখ্‌ মজা ভাই মুটেগুলোর মদ্যেরি হাতে।"

৯০

* * * *

মরণ কালে অধর আমার মদ্যে ভিজায়ো
মরণ শেষে দেহটারে সুরায় ধোয়ায়ো,
চাদর দিও দ্রাক্ষা লতার পাতায় গড়িয়া,
গোলব বাগে কবরেরি বক্ষে শোয়ায়ো।

৯১

কবরের সেই ভস্ম আমার গন্ধ ছড়িয়ে,
খোস্‌বায়েরি জালে বাতাস রাখ্‌বে জড়িয়ে।
ভক্ত কেহ এপথ দিয়ে চল্‌বে যেমনি,
মদের জালে ফেলব তারে অমনি জড়িয়ে।

৯২

মুরৎগুলো—কাট্‌ল জীবন যাদের স্বপনে,
মেষে তারাই ঢাক্‌ল আমার যশের গগনে।
পাত্‌লা মদের পেয়ালাতেই সুনাম ডুবেছে,
খ্যাতির মধু বিকালো ঐ গানের চরণে।

৯৩

শপথ নেছি অনুত'পের—সত্য কথা সে,
মগজ তখন ঠিক ছিল যে—সন্দেহ আসে!
তার পরেতেই ফাগুন এল পুষ্প পানি গো,
পরিতাপের জীর্ণ কাঁথা উড়্‌ল বাতাসে।

৯৪

মদা কাফের কম সে দাগা দেয়নি আমারে,
জবান আমার খেলাপ—ঈমান থাক্‌ল না হারে!
তবু ভাবি কিসের লোভে সুরার ব্যাপারী,
অমন বেসাদ বিকিয়ে যায় পথের মাঝারে।

৯৫

গোলাপেরি ঝরাদলে ফাগুন শুকাবে,
যৌবনেরি খোস্‌বো খাতা সেও মিলাবে,
পাতার ফাঁকে সুরের মাতাল ঐ যে পাপিয়া,
কেই বা জানে কবে তাহার মেয়াদ ফুরাবে।

৯৬

এই সাহারার ঝর্ণাটারে যায় না জানা কি,
বারেক দেখা—হোক্‌না তা সে দণ্ডেরি লাগি!
শ্রান্ত পথিক মরুর পথে মূর্চ্ছে পড়ে গো—
ফাগুন ফেরে প্রাণ ফাগুনের ফিরতে বাধা কি?

৯৭

ললাট'পরে ভাগ্যদেবীর স্বহস্তে টানা,
ঐ যে হরপ—ও সবারি সমান অজানা!
নাইকি কেহ কাড়িয়া নিয়া পরম খেয়ালী
কলমটারে ভেঙে করে সটান দু'খানা।

৯৮

হায়রে সাকি, ভাগ্য যদি মোদের দু'জনে,
বিশ্ব রহস্যতে বারেক নে যায় গোপনে,
ধুলোর মত আবার তারে চূর্ণ করিয়া
গ'ড়ে তুলি মনের মত নূতন বরণে।

* * * *

৯৯

হৃদ্ গগনের চন্দ্র আমার দেখরে চাহিয়া,
আরেক চাঁদের ধারায় গেছে আকাশ ভিজিয়া,
খেলা আমার টুট্‌বে যবে—গোলাব বাগেতে,
এম্‌নি করেই লুট্‌বে ওকি আমায় খুঁজিয়া!

১০০

রাঙা দু'টি চরণ ফেলে স্ফূর্ত্তিরি টানে,
পান্থদলে ডাক্‌বি যখন ঘাসের শয়ানে,
এই ভূমিটাই তবে সাকি, বাছিয়া নিয়ো গো,
শূন্য গেলাসটারে রেখো উল্টে এখানে!

বন্দীর বনে

[শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল]

ক

রাজার মেয়ে সে,—বিশ্বের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের সবটুকু সুষমা নিংড়ে যেন সেই মেয়েটীকে গড়ে বিধাতা জালন্ধর রাজের গৃহ উজ্জ্বল করতে পাঠিয়েছিলেন।

পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র কন্যা, ভ্রাতাদের স্নেহের সামগ্রী! বড়ই আদরে রাজ অন্তঃপুর আলো করে' মূর্ত্তিমতী কমলার মত এই অনিন্দ্যকান্তি হৈমপ্রতিমাখানি বেড়ে উঠেছিল। তার কলহাস্যে অন্তঃপুর মুখরিত হয়ে থাকত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ভুবনভোলান রূপরাশির সৌরভ রাজ্যের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছিল। জালন্ধর রাজকন্যার রূপরাশি, সে কালের রাজবংশীয় যুবকদের মধ্যে যেন একটা যুগান্তর এনে দিয়েছিল, তার রূপরাশির খ্যাতি যেন তাদের একটা দৈনন্দিন চর্চ্চার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। কে জানে কোন্ রাজ্যের কোন রাজকুমার সৌভাগ্যের পশরা নিয়ে সেই দেবতার নির্ম্মাল্যটীকে বরণ করে মাথায় তুলে নেবে!

পূর্ব্ব হতেই রাজকুমারী মেহেরার পাণিপ্রার্থী বহু উচ্চ রাজবংশীয় যুবকের দরখাস্ত জালন্ধর রাজদরবারে পেশ হ'তে সুরু হ'য়েছিল। কিন্তু হায়! বুঝি তাদের সমস্ত আশার প্রাসাদগুলিকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বহুদিন পরে রাজকুমারীর চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল'—তাদের মৃত দেওয়ানের পুত্র অনঙ্গর সম্মোহন রূপরাশি! শৈশবে মেহেরা তা'দের দেওয়ানের জীবিতাবস্থায় বহু বারই অনঙ্গকে দেখেছিল, কিন্তু সে যখন অধ্যয়ন শেষ করে' বহু দিন পরে তার অনুপম দেহকান্তির উপর যৌবনের সাঁজোয়া এঁটে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, ঠিক্ মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গেরই মত, রাজকুমারী মেহেরার চোখের পল্লব পড়লনা, তার ইন্দিবরতুল্য নয়ন দুটী পল্লবগুণ্ঠনের মধ্য হ'তে সেই প্রতিভা উজ্জ্বল, স্বর্ণকান্তি মুখের উপর নিবাত, নিষ্কম্প শিখাটীর মত অচঞ্চল স্থির হ'য়ে রৈল। তার নারী-জীবনের সঞ্চিত স্নেহ অনুরাগ সমস্ত যেন লুটিয়ে পড়তে লাগল, তার সেই দেবতার চরণতলে—একটা রাগিণীর মূর্চ্ছনার মত।

...এম্‌নি কখন, কি ভাবে, কোন্ স্বপ্নময় সুপ্তির মাঝখান দিয়ে যে এই দুটী তরুণহৃদয় পরস্পরের কাছাকাছি হ'য়ে একটা অচ্ছেদ্য রঙ্গিন ডোরে বাঁধা পড়েছিল তা তারা নিজেরাই বুঝে উঠ্‌তো না।

প্রভাতে যখন রাজকুমারী মেহেরা গগনস্পর্শী প্রাসাদের উন্মুক্ত ছাদের প্রান্তভাগে ব'সে তার সেতারটিতে ঝঙ্কার তুলে দিত, অদূরে নীচে একখানি ছোট্ট বাড়ীর একটী ঘরে ব'সে অনঙ্গকুমার সেই ঝঙ্কারের মধ্যে তার হাল্কা নবীন জীবনখানিকে ডুবিয়ে দিয়ে সেই উচ্চ প্রাসাদের পানে অনুরাগদীপ্ত চোখে চেয়ে থাকত,—তার হাতের উপর উন্মুক্ত বইখানি হতাদরে পড়ে থাকত। রাজকুমারীর সেতার মুখর হ'য়ে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে ফেলত, তার রেশটুকু প্রভাত বায়ুহিল্লোলে কাঁপতে কাঁপতে মুগ্ধ দেওয়ানপুত্রের মর্ম্মের মাঝে কেঁদে আছড়ে পড়ত।... মধ্যাহ্নে অনঙ্গ যখন রাজকার্য্যে বহির্গত হ'য়ে প্রাসাদের পাশের রাস্তাটার উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেত—সেই চারখানি ক্ষুরের শব্দ ব্যাপৃত মেহেরার কার্য্যের ধারাটীকে ওলোট পালোট করে দিয়ে তাকে উন্মুক্ত, বাতায়নপথে টেনে নিয়ে যেত। সেই বাদামী রঙের উষ্ণীষের নীচে সেই দেবোপম মুখখানির দর্শন আশায় তার পিপাসু চোখ দুটী ব্যাকুল হ'য়ে উঠত।

অনঙ্গ দেখত মুক্ত বাতায়নপথে একজোড়া দুর্ল্লভ কালো চোখ দেবতার আশীর্ব্বাদী ফুলের মত কেমন করে' তার দৈনন্দিন কার্য্যের প্রারম্ভটীকে মঙ্গলময় করে তোলে।

সেই মিলিত মুগ্ধদৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রাণ পান ক'রে তারা যেন নেশার ঘোরে কোন্ স্বপ্নরাজ্যে উড়ে যেত। সন্ধ্যায় আবার তেমি সেই বাতায়নপথ হ'তে রাজকুমারীর শুভেচ্ছার ধারাটুকু বহন করে অনঙ্গ ঘরে ফিরত। অনঙ্গকে বহন করে নিয়ে যখন তার ঘোড়াটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেত'—রাজকুমারী অশ্রুসজল চোখে আকাশের সেই ম্লান রক্তচ্ছটার পানে চেয়ে বসে থাকত।

অনঙ্গকুমার পীড়িত; নিতান্ত নিরালা সে তার নির্জ্জন কক্ষে শয্যার উপর শুয়েছিল। কক্ষের বদ্ধ বায়ুতে তার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল, দীর্ঘ তিনটি দিন সে সেই ঈপ্সিত বাতায়ন তল দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়নি। তিনটী দিন যেন তার প্রাণের মাঝে দীর্ঘ তিনটী যুগের ব্যর্থতা জড় করে দিয়েছিল। সে তার চোখ দুটী মুদে তন্দ্রার ঘোরে ধ্যান করছিল,—দুটী ইন্দিবর তুল্য নয়নের জ্যোতি, দুখানি রাজীব রক্ত চরণের নূপুরনিক্কণ!

সহসা বড় মধুর, বড় কোমল কণ্ঠে কে ডাকলে,—"দেওয়ানপুত্র!"—স্বর বড় করুণ! বড় স্নেহার্দ্র। যেন দূরাগত একটা করুণ রাগিণীর মূর্চ্ছনা।

আজ তার সমস্ত সাধনা সফল করে দিতে কোন্ স্বপ্নরাজ্য হতে নেমে এল' এই বিশ্ববিজয়িনী আনন্দময়ী প্রতিমা! তার দেহ ঘিরে একটা রূপের হিল্লোল ঠিকরে পড়ে সেই দীন দেওয়ানপুত্রের কক্ষখানি যেন আলোকিত করে দিলে। অসুস্থ অনঙ্গ ধ্যানস্তিমিত নেত্র দুটী উন্মীলিত করে অভিভূতের মত সেই অপূর্ব্ব রাজেশ্বরী মূর্ত্তির পানে চেয়ে রইল!

'কেমন আছ তুমি?' বলতে বলতে রাজকুমারী স্নেহের বালিকাসুলভ চপলতায় অনঙ্গর শয্যাপ্রান্তে বসে পড়ল। অনঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে ত্রস্তে শয্যার উপর উঠে বসল।

'রাজকুমারি?'—অনঙ্গর শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তার হৃদয়দোলায় কে সঘনে দোল দিয়ে গেল,—দেহের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হ'য়ে মাথার পানে ঠেলে উঠল, দেহ মনে একটা প্রলয়ের ঝড় বয়ে গেল। অনঙ্গ ভাবছিল 'সফল তার সাধনা, তার বাঞ্ছিতের রাতুল চরণরেণুতে আজ তার দীন কুটীর পবিত্র,—সে ধন্য!'—এমনি বলবার তার অনেক ছিল,—তার চিরবাঞ্ছিত রাণীকে অভ্যর্থনা করবার মত উচ্ছ্বাসও তার হৃদয়ে যথেষ্ট ছিল—ছিল না, শুধু কণ্ঠে ভাষা! উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ অন্তঃস্থলে উত্থিত দীর্ঘশ্বাসে পর্য্যবসিত হ'য়ে গেল।

'কেমন আছ তুমি?' সহসা রাজকুমারী অনঙ্গর উত্তপ্ত ললাটে শীতল স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন আছ তুমি?'

সেই একটী স্নেহস্পর্শে যেন অনঙ্গর জন্মজন্মান্তরের সমস্ত বালাই মুছে দিল। সেই একটী স্নেহপ্রশ্নে তার মর্ম্মের গোপনতম প্রদেশটা সাড়া দিয়ে উঠল। পুঞ্জীভূত প্রেমাশ্রু তার নয়নকোণে উথলে উঠল, সে সজোরে দুহাতে বুকখানা চেপে ধরে শয্যার উপর লুটিয়ে পড়ল।

খ

নক্ষত্ররাজ্যের বুক হ'তে যখন ঈষদম্লান পাণ্ডুটে রংয়ের যবনিকাখানি ধীরে ধীরে গুটিয়ে যেত'—রাজকুমারী 'রত্নমঞ্জীলের' হ্রদতীরে মর্ম্মরবেদীর উপর প্রতীক্ষায় ব'সে থাকত। মৌন সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার উদ্ভাসিত করে তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে একটা সৌন্দর্য্যহিল্লোল ছড়িয়ে পড়ত। অম্লান শতদলের মত রাজকুমারীর সুন্দর মুখখানির প্রতিচ্ছবি বুকে ধরে হ্রদবক্ষোত্থিত টুকরো তরঙ্গগুলো যেন হাসতে হাসতে লুটিয়ে আছড়ে পড়ত। রাজকুমারী বিভোর হ'য়ে সেই নক্ষত্রখচিত হ্রদের বুকে সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল রচনা দেখত'—আবার কখন এক রাশ তাজা ফোটা ফুলের গন্ধ বুকে নিয়ে একটা দমকা বাতাস তার ইন্দ্রিয়গুলোকে জাগিয়ে সচেতন করে তুলতো। রাজকুমারী কার মৃদু চরণপাতের আশায় উৎকর্ণ হ'য়ে থাকত। আশার সম্মোহন ছবি আঁকতে আঁকতে সৌন্দর্য্যের রাজ্যে বসে সৌন্দর্য্যের রাণী যখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে পড়ত,—সহসা কার পুষ্পমধুর আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত হ'য়ে আবার সচেতন হ'য়ে উঠত। রাজকুমারীর ফুলের মত দেহখানি সেই উন্নত বক্ষের মাঝে অবশ হ'য়ে লুটিয়ে পড়ত, তার চোখদুটী দুখানি সুকোমল করপল্লবের নীচে

আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকত—তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মোহময় তড়িৎ প্রবাহ ঠিকরে পড়ত।

'রাজকুমারী আলিঙ্গনের নীচে হ'তে সলজ্জ কৌতুকে ডাকৃত'—'বেলা

বেতসকুঞ্জের অশ্বশাল হ'তে অনঙ্গর ঘোড়াটা হ্রেষা রবে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলত। অনঙ্গ হাসতে হাসতে তার বাহুপাশ মুক্ত করে দিত।

* * * * * *

এমনি প্রতি সন্ধ্যায় এই তরুণ-তরুণী দুটী রত্নমঞ্জীলের মর্ম্মরবেদীর উপর পরস্পরের প্রাণ পান করতে করতে সান্ধ্যবায়ুহিল্লোলে গা ভাসিয়ে দিয়ে যেন এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করত। হিল্লোলে হ্রদের বুকটা ফুলে উঠে তাদের পায়ের নীচে, মর্ম্মরবেদীর গায়ে লুটিয়ে পড়ে এক অজানা করুণ রাগিণী সৃষ্টি করত,—আর সেই বেদীর উপর তারা পরস্পরকে সামনে রেখে শুধু পরস্পরের পানে বিভোর হয়ে চেয়ে থাকত। চোখে পলক পড়ত না—যেন প্রাণহীন পাষাণ মূর্ত্তি!—যেন সুনিপুণ ভাস্করখোদিত প্রস্তরময় প্রণয়ীযুগল!—রত্নমঞ্জীলের হ্রদসোপানে জালন্ধর-রাজের সযত্ন-প্রতিষ্ঠিত, পাষাণনির্ম্মিত গ্রীসের প্রণয়দেবতা—'ভিনাস্-কিউপিড্'।

* * * * *

সুবর্ণমণ্ডিত পর্য্যঙ্কশয্যায় চিন্তাকুল রাজা গোবিন্দসিংহ অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় রাজভ্রাতা ও সেনাপতি অজয়সিংহের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি রেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তা হলে এখন উপায় কি অজয়? ধাইমার মুখে যা শুনছি তাতে তো আমার মাটীর মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

সেনাপতি অজয়সিংহ তার আয়ত চক্ষু দুটো বিস্ফারিত ক'রে উত্তর দিলে, দাদা! ভাববার সময় নেই, শীঘ্রই এর একটা মীমাংসা, একটা নিষ্পত্তি করতেই হবে। এ জালন্ধরের সৌভাগ্য, এ জালন্ধররাজের সৌভাগ্য, ভগ্নী মেহেরার সৌভাগ্য যে ভারতের শত শত নৃপতি তার অনুকম্পাভিখারী হয়ে তার মুখের একটা উত্তরের আশায় এখন অপেক্ষায় চেয়ে আছে। কিন্তু আর কতদিন?—কতদিন আর তাদের এমনি মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে রাখবেন? তার ওপর সামান্য একটা হাওয়ার ভরে যদি মিথ্যার মুখোস খসে পড়ে ভিতরকার সমস্ত সত্যটা তাদের সামনে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তখন,—ভেবে দেখছেন কি? তখন এ প্রকাণ্ড বিশ্বে মহামান্য জালন্ধররাজের সে লজ্জাটুকু ঢেকে মাথা রাখবার এতটুকু স্থান থাকবে না-

ঐশ্বর্য্য-মদ-দৃপ্ত রাজা গোবিন্দসিংহের মুখখানা সহসা হ'য়ে উঠে ধীরে ধীরে মাথাটী নুয়ে পড়ল—তার প্রধূমিত বুকখানা দু'হাতে চেপে ধরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে,—'সত্য কথা অজয়! এ কলঙ্ক প্রকাশ হ'বার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়, - জালন্ধরের রাজসিংহাসন অতলে ডুবে যায়।'

অজয়সিংহ অনুশোচনার তীব্রকণ্ঠে বলতে লাগল,—'ছিঃ ছিঃ! লজ্জা! লজ্জা! একটা ভৃত্য, একটা দীনহীন নিঃস্ব যুবক, জালন্ধরের রাজকুমারী অসামান্য সুন্দরী রাজভগ্নী মেহেরার মনোনীত স্বামী! যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে শত শত নৃপতি উন্মত্ত, সেই মেহেরার প্রণয়ী কিনা পথের কুকুর দেওয়ানপুত্র অনঙ্গ! মহারাজ! কঠোর হোন্। যেমন করে হোক এ আবর্জ্জনাকে মেহেরার পথ হতে সরাতেই হবে।'

অজয়সিংহের প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে তার হৃদয়ের জিঘাংসা প্রবৃত্তি দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠল। রাজা তার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অন্তরে কেঁপে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলতে লাগল, 'কঠোর হতে হবে? কঠোর হয়েছি অজয় সেই দিন, যে দিন রাজদণ্ড হাতে নিয়ে এই ন্যায়ের সিংহাসনে বসেছি। কিন্তু অজয়! সত্যের অপলাপ করব না; শৈশবে পিতৃ-মাতৃহারা ছোট বোনটীকে নিজের কন্যার অধিক স্নেহে পালন করেছি,তাই বোধ হয় যখনি কঠোর হ'য়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে যাই, তখনি তার ব্যথিত স্নেহসজল চোখ দুটী মনের মাঝে ভেসে উঠে আমায় পাথর করে দিয়ে যায়।'—তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, আয়ত চোখ দুটী ধীরে ধীরে নিমীলিত হয়ে গেল, অবসন্নের মত নিম্নস্বরে বলতে লাগল,—'কিন্তু কঠোর হতে হবে, উপায় নেই।'

অজয়সিংহ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো,—'নিশ্চয়!

কঠোর হ'য়ে দুহাতে তার পথ হতে অমঙ্গল সরিয়ে দিতে হবে। মেহেরা নারী—বালিকাবুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে সে যদি নিজের মুখে বিষ তুলে দেয়, আমাদের কর্ত্তব্য দুহাত প্রসারিত করে তাকে রক্ষা করা।'

সত্য বটে অনঙ্গর রূপ আছে,—কিন্তু রূপের দোহাই দিয়ে দুনিয়া চলে না—তার মূল্য শুধু কবির চোখে। এ একটা ক্ষণিক মোহ। চোখের আড় হ'য়ে গেলেই দুদণ্ডে নেশা ছুটে যাবে।'

গোবিন্দসিংহের উন্নত ললাটদেশ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো—চোখে একটা অস্বাভাবিক চাহনি ফুটে উঠলো; নিতান্ত অন্য মনে বল্‌তে লাগল,—'সত্য কথা! সত্য কথা!'

গ

সবে মাত্র যখন উষার স্নিগ্ধ আলোটুকু শান্ত বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় সজ্জিত দেওয়ানপুত্র অনঙ্গ অতি সন্তর্পণে রাজপ্রাসাদের মর্ম্মর সোপান বেয়ে উপরে উঠছিল। ধীরে ধীরে, মৃদু চরণক্ষেপে এক একটি সোপান উঠছিল, সহসা স্তব্ধ হ'য়ে সলজ্জদৃষ্টিতে অন্তঃপুরের পানে তাকাচ্ছিল—আবার উঠছিল। এমনি করে অনঙ্গ যখন অন্তঃপুরের দোরে এসে পৌঁছিল, সেই সময়ে বৃদ্ধা ধাত্রী তার সামনে এসে দাঁড়াল। অনঙ্গর মুখখানা রাঙ্গা হ'য়ে উঠল, সে কম্পিত প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করলে, 'ধাই মা রাজকুমারী!—'

বৃদ্ধা ধাত্রী সস্নেহে অভ্যর্থনা জানিয়ে উত্তর দিলে, 'রাজকুমারী পরিচ্ছদাগারে।'

মেহেরা অনঙ্গর কণ্ঠস্বর শুনে ত্রস্তে বাহিরে এসে তার সামনে দাঁড়াল—প্রভাতের শিশিরে ধোয়া তাজা ফুলটীর মত। ....অনঙ্গ সস্নেহে ডাকলে, 'রাজকুমারি!'

মেহেরা অনুযোগের স্বরে বলে উঠলো,—'কেন? মেহেরা বল'—

'ক্ষমা কর মেহেরা!' অনঙ্গ তার হাতখানা ধরে তার মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রৈল। মেহেরার হাসিতে ছোপান অম্লান মুখখানি প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো—সে সকৌতুক প্রশ্ন করলে, 'এত প্রত্যূষে! আজ আমার সুপ্রভাত!'

'মেহেরা! আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।'

'বিদায়? কেন?' মেহেরার মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকু সহসা নিভে গিয়ে একটা ম্লানিমা ফুটে উঠল।

অনঙ্গ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'শুধু এই আজকের দিনটী মেহেরা! আমায় রাজার সঙ্গে মৃগয়ায় যেতে হবে, যদি সন্ধ্যায় ফিরি রত্নমঞ্জীলে দেখা হবে।'

মেহেরার মুখের স্বচ্ছ হাসিটুকু আবার ফুটে উঠলো, যেন শরতের আকাশে মেঘের ও রৌদ্রের চকিত ক্রীড়া। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে মেহেরা বল্লে, 'তাই ভালো'—পরে নিতান্ত বালিকার মত বড় মিহি সুরে প্রশ্ন করলে, 'তুমি মৃগয়ায় যাবে? তবে কই সাঁজোয়া পর নি, অস্ত্র নাও নি?'

অনঙ্গ অপ্রতিভ হ'য়ে উঠল সংযত হয়ে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে,—'প্রয়োজন নেই, জিঘাংসা প্রবৃত্তিটা আমার মধ্যে বড় কম মেহেরা! যদিও ক্ষত্রিয় রক্তেই আমার জন্ম, কিন্তু কি করব! রাজার ভৃত্য—রাজার আমন্ত্রণ ত' অগ্রাহ্য করতে পারি না।'

* * * *

তিন জনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিল। প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে রাজকুমারী নিষ্পলক নেত্রে তাদের পানে চেয়েছিল। প্রথমে তার ভ্রাতা রাজা গোবিন্দসিংহ, মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেনাপতি অজয়সিংহ, পশ্চাতে তার উপাস্য দেবতা অনঙ্গ। হাতে বর্শা, মাথায় সেই বাদামী রঙ্গের উষ্ণীষ। প্রতিভামণ্ডিত সুগৌর মুখখানি প্রেমোজ্জ্বল, চোখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। দূরে, বহুদূরে, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষান্তরালের মধ্য দিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিল, গাছের মাথায় মাথায় প্রভাতের সোনালি রোদটুকু ঝরে ঝরে পড়ছিল, রাজকুমারী অনিমেষে চেয়েছিল, পিছনের সেই বাদামী উষ্ণীষটীর পানে! দূরে, আরও দূরে ঐ তারা বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা যায় না। সহসা যেন রাজকুমারীর চোখের সামনে দিনের আলো

নিভে গেল, তার প্রাণটা আর্ত্তনাদ করে উঠলো, সে দুহাতে মুখখানা চেপে সেইখানে বসে পড়ল।

* * * *

রাজধানী হ'তে বহুদূরে, রাজ্যের সীমাপ্রান্তে বন্তীর বন। সাঁঝের আঁধার বনভূমির বুকে জমাট হ'য়ে নেমে আসছিল। কালো পাহাড়ের গা ধুইয়ে দিয়ে একটা শীর্ণ নদী পাহাড়ের পাদদেশে উচ্ছল হ'য়ে ছুটে ছিল—একটা পৈশাচিক আতঙ্কে থেকে থেকে যেন তার বুকটা সঘনে কেঁপে উঠছিল। মৌন বনভূমি স্তব্ধ হ'য়ে চেয়েছিল। রাজা গোবিন্দসিংহ ও সেনাপতি অজয়সিংহ অনঙ্গর শোণিতে রঞ্জিত তরবারি দুখানা নদীজলে ডুবিয়ে তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোবিন্দসিংহের চোখের সামনে অনঙ্গর শেষ রক্তটুকু ধুয়ে নিয়ে নদীর জলটা রাঙ্গা হ'য়ে উঠল। সেই ঝাপসা সাঁঝের আলোয় রাজার মুখখানা কালো হয়ে উঠল।

'কি করলুম অজয়?' কম্পিত প্রশ্নে রাজা অজয়ের মুখের পানে চেয়ে রইল। অজয়ের মুখে হিংস্র সর্প শিশুর অস্বাভাবিক কুটীল দীপ্তি, চোখদুটোতে লোলুপ চাহনি, বেশ সহজ স্বরেই সে উত্তর দিলে, 'কিছু না দাদা! জালন্ধরের পবিত্র রাজবংশে কালী পড়তে বসেছিল, প্রারম্ভের মুখেই সে কালী মুছে ফেললুম।'

'হুঁ! কিন্তু এ হত্যা! তার অপরাধ কোথায় অজয়?' অজয় উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠল, 'অপরাধ? তার অপরাধ সে ভালবেসেছিল, জালন্ধরের রাজকুমারীকে ভালবেসেছিল—'

পায়ের নীচে তার স্বরের প্রতিধ্বনি করে নদীর জল পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল। অজয় গোবিন্দের হাতখানি ধরে বললে, 'চল দাদা, রাজধানীতে ফিরি।'

গোবিন্দর চোখের সামনে যেন তার স্নেহময়ী ভগিনীটীর শুভ্র সন্থ বৈধব্য মূর্ত্তিখানি ভেসে উঠল—ফেরবার পথে কেবলই তার মনে হতে লাগল, 'এ হত্যা! হত্যা!' পাহাড়ের পথে ঘোড়া ছুটেছিল, তাদের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি স্তব্ধ বনভূমিকে প্রকম্পিত করে আর্ত্তনাদ করছিল, 'হত্যা! এ হত্যা!' বনভূমি যেন সহসা মুখর হ'য়ে কেঁদে উঠল—'হত্যা! হত্যা!'

ঘ

আশায় বুক বেঁধে মেহেরা অনঙ্গর অপেক্ষা করত, সে জানত' অনঙ্গ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে সহসা প্রবাসে গেছে, জানত' না যে তার ভাগ্যাকাশ হ'তে সুখের তারাটী চিরদিনের মত নিভে গেছে, শুধু তার সামনে সুদূর ভবিষ্যতে ঘন আঁধার জমাট হ'য়ে আছে। অবোধ বালিকা তার বিরহ কাতর বুকখানাকে সেই শুভদিনটীর অপেক্ষায় বেঁধে রাখত। প্রতিদিন, প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সে অনঙ্গর প্রত্যাগমন আশা করত, সন্ধ্যায় তেমনি রত্নমঞ্জীলের হ্রদতীরে মর্ম্মর বেদীটীর উপর তার প্রতীক্ষায় বসে থাকত। প্রত্যেক শব্দটীতে তার মনে হ'ত ঐ বুঝি সে আসছে, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে বৃক্ষান্তরালের প্রত্যেক ছায়াটীকে মনে ভাবত ঐ বুঝি সে দাঁড়িয়ে হাসছে। সে উৎকল হয়ে শুনত হাত দুখানি প্রসারণ করে তাকে আলিঙ্গন দিতে যেত। যখন তার ভুল ভেঙ্গে যেত, একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সে মর্ম্মর বেদীর উপর লুটিয়ে পড়ত, যেন তার বুকের মাঝে হঠাৎ একখানা কে ছুরী বসিয়ে দিয়েছে। তার পায়ের নীচে হ্রদের জল উছলে উঠে একটা বিলাপের রাগিণী সৃজন করত। অনঙ্গ ফিরল না, উদ্বেগ, আশঙ্কায় রাজকুমারী অস্থির হয়ে উঠলো, আতপদগ্ধ স্বর্ণলতাটীর মত সে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল, দেহের সোনার বর্ণ মলিন হ'য়ে গেল, গণ্ডের প্রস্ফুটিত গোলাপ শুকিয়ে ঝরে পড়ল।

'কেন তুমি এখন ফিরলে না? আজও কি তোমার কাজ শেষ হয়নি? রাজাধিরাজ! মেহেরার জীবনসর্ব্বস্ব! আর কতদিন? আর কতদিন এ নৈবেদ্যের ডালা নিয়ে মন্দিরের দোরে ব'সে থাকব? দেবতা আমার! বাঞ্ছিত আমার! ওগো আমার চির উপাস্য! এমন কি অপরাধ করেছি যে তুমিও দুর্লভ হ'য়ে পড়লে!' এমনি একটা ব্যাকুলতা তার হৃদয়ের মাঝে সদাই গুমরে ফুঁপিয়ে উঠত; একটা মর্ম্মান্তিক যাতনায় তার প্রাণটা হাহাকারে ভরে উঠত। ফুটফুটে চাঁদিনীর মত তার মুখের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হাসিটুকু যেন মেঘে ঢেকে ফেলেছিল, তার মৌন, শান্তোজ্জ্বল চোখ দুটীতে অবসাদের কালী ছড়িয়ে দিয়েছিল।

সে আহার নিদ্রা ভুলে নিজের চিন্তার আবর্ত্তে মগ্ন হয়ে দিনরাত শূন্যপ্রেক্ষণে চেয়ে থাকত—যেন বর্ষার ভরা নদী অকালে শুকিয়ে পড়ে আছে, একখানা মালঞ্চ জ্বলে পুড়ে গিয়েছে, একটা বিরাট উৎসব মণ্ডপ ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে!

গভীর রাত্রে নক্ষত্রগুলো যখন জ্বলে জ্বলে একটার পর একটা নিভে আসত তখনও রাজকুমারী খোলা জানলার ধারে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকত, একটী পরিচিত অশ্বের পায়ের শব্দ শোনবার আশায়! উদ্বেগ, অবসাদ, অনিদ্রায় রাত্রিশেষে যখন তার অবসন্ন দেহখানা তন্দ্রায় ঢুলে পড়ত, সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে মেঝের বিস্তৃত মখমলের উপর লুটিয়ে পড়ত, তন্দ্রার ঘোরেও মাঝে মাঝে সে আর্ত্তনাদ করে উঠত,—'কোথায়? কোথায়? ওগো! কোথায় তুমি?'

সে একটা স্বপ্ন। যেন কোন বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ দিয়ে রাজকুমারী নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছিল। সেখানে কেবল আঁধার—আঁধারের বিরাট রাজ্য। আশে পাশে কালো পাহাড়, পাহাড়ের বুকে জমাট আঁধার, মেহেরার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। সে স্তব্ধ হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে সেই আঁধারের পানে চেয়েছিল। আতঙ্কে সমস্ত শরীরখানা শিউরে উঠল, তার ভারি কান্না এল। অকস্মাৎ যেন যাদুস্পর্শে একটা পর্ব্বত বক্ষ হ'তে একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি বেরুতে লাগল, মেহেরা বিস্মিত আতঙ্কে সেই আলোকরশ্মির পানে চেয়ে রইল। আলোকরশ্মি উজ্জ্বল হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল, বনভূমি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। মেহেরা সহ্য করতে পারলে না, তার চোখ ঝল্‌সে গেল। সে দুহাতে চোখ-দুখানা ঢেকে থর্ থর করে কাঁপতে লাগল। মুহূর্ত্ত পরে আবার চোখ দুটী উন্মীলিত করে দেখলে, চতুষ্পার্শে কালো আঁধার, মধ্যে উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত অপূর্ব্ব বনস্থলী। অদূরে একটা ছোট নদী, তীরে পুষ্পিত বনলতা। আশে পাশে ছোট বড় নানারকমের গাছ। নদীর জল, গাছের পাতা, মৃদু-বায়ুহিল্লোলে কাঁপছে। একটা বড় কদম গাছের নীচে একখানা শিলাখণ্ডের উপর ঈষদস্পষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তি উপবিষ্ট। বুকের উপর মাথাটী ঝুলে পড়েছে, মুখখানা ভাল দেখা যায় না। মেহেরা মন্ত্রাচ্ছন্নের মত সেই মনুষ্য মূর্ত্তির পানে চেয়ে রইল। তার মনে হল, লোকটা বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। ধীরে ধীরে মনুষ্যমূর্ত্তি মুখখানি তুলে মেহেরার মুখের পানে চেয়ে রইল। তুষার শুভ্র দেহ, চোখে স্থির নিষ্প্রভ দৃষ্টি, গণ্ডে অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা। সহসা তার চোখ দুটী ঝকমক্ করে জ্বলে উঠলো প্রভাতের রৌদ্রদীপ্ত শিশির বিন্দুর মত। মেহেরার বিবর্ণ মুখে রক্ত ফিরে এল, সে উৎফুল্ল হ'য়ে একেবারে তার কাছে গিয়ে বলে উঠলো, 'এঁ্যা তুমি? তুমি? রাজাধিরাজ আমার! এত দিন পরে!'

আলিঙ্গনোদ্যত মেহেরাকে ইঙ্গিতে থামতে বলে, অনঙ্গ মনুষ্যকণ্ঠে বলতে লাগল, 'মেহেরা! আমি এখন তোমার আলিঙ্গনের, তোমার স্পর্শের অতীত, এ আমার ছায়ামূর্ত্তি।' তার অধরে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। রাজকুমারীর ক্ষুব্ধ, ব্যথিত হৃদয়খানা সে স্বরের ঝঙ্কারে ডুবে গেল। ছায়ামূর্ত্তি বলতে লাগল, 'এসেছ তুমি রাণী আমার! এস মাঝে মাঝে এমি দেখা দিয়ে তোমার অনাবিল অশ্রুজলে এই শিলাখণ্ড সিক্ত করে দিও, আমার অতৃপ্ত বাসনার বোঝা ধুয়ে দিও। তোমার অমৃতময় স্পর্শে দীনের এই শেষ শয্যাটীকেও পবিত্র, মঙ্গল-ময় করে দিও। যেমন সেই প্রথম দিনটিতে তোমার রাতুল চরণরেণুতে আমার সেই দীন কুটীরখানি পবিত্র হ'য়ে উঠেছিল। তোমার ফুলের মত রূপের আলোয়—কিন্তু মেহেরা! আলো ম্লান হয়ে এসেছে, তোমার গণ্ডের বিকসিত ফুল ঝরে গিয়েছে। মেহেরা! রাণী আমার! তুমিও আসচ? এস! আর অপেক্ষা করতে পারি না। ওঃ! কি যন্ত্রণা! কি নিৰ্জ্জনতা! একা এই লোকালয়ে, ওঃ! কত দিন! কত দিন!'

অনঙ্গর ছায়ামূর্ত্তি দুহাতে তার বুকখানা চেপে ধরলে, মাথাটী তার ধীরে ধ'রে বুকের উপর ঝুলে পড়ল। মেহেরা আর্ত্তনাদ করে উঠল—ওগো! কোথায়? কোথায়? কোথায় গেলে তোমার দেখা পাব?—

'বন্তীর বনে,—এইখানে—'

'কেন ? তুমি ওখানে কেন ? তোমার কেন ?' ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে শ্বেত শুভ্রবস্ত্রাচ্ছাদিত দেহখানি উন্মুক্ত করলে। সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত, তুষারশুভ্র দেহে রক্তবন্যা ! মেহেরা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল।

* * * * * *

ধাইমা, স্বপ্ন কি সত্য হয় ? প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেই রাজকুমারী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে। ধাত্রী রাজকুমারীর অসংযত চুলের রাশ নাড়তে নাড়তে সান্ত্বনার স্বরে বললে, 'হয় বই কি মা, সময়ে সময়ে হয় বই কি।' 'তবে, তবে এ স্বপ্ন নয় ? সত্য !' রাজকুমারী দুহাতে নিজের বুকখানা চেপে ধরে আর্ত্তনাদ করে ধাত্রীর কোলে লুটিয়ে পড়ল।

৬

মাথার উপর তখন একটা নক্ষত্র জ্বলছিল। ঊষার ম্লান আলোয় রাজকুমারী অশ্বপৃষ্ঠে বনভূমি অতিক্রম করে চলেছিল। মুখে তার উদ্বেগ, আশঙ্কা, অনিদ্রাজনিত শ্রান্তি, ললাটে মুক্তার মত ছোট ছোট স্বেদবিন্দু। পার্ব্বত্য বনস্থলীর বুক কাঁপিয়ে তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটেছিল, দূরে, সে কোন্ অজানা দেশে। ……সহসা একখানা উঁচু শিলাখণ্ডের উপর উঠে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে চকিতদৃষ্টিতে কি দেখতে লাগল। রাজকুমারী বিস্মিত আতঙ্কে চারিদিকে চেয়ে ঘোড়াকে জোরে কশাঘাত করলে। ঘোড়াটা নড়ল না, শুধু চীৎকার করে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে অদূরে যেন আর একটা ঘোড়া তার স্বরের প্রতিধ্বনি করে উঠলো, স্বর যেন পরিচিত। রাজকুমারী উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগল। আবার ! রাজকুমারী সহসা উচ্চকণ্ঠে ডাকলে, 'বেলা ! বেলা !'

একটা ঘন লতামণ্ডপ ভেদ করে উন্মত্তের মত বেলা তার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজকুমারী আতঙ্কের মত তার পানে চেয়ে রইল,—তার কথা সরল না, কণ্ঠ শুকিয়ে এল। বেলা তার মুখের পরে তার দৃষ্টি রেখে ঘন ঘন হ্রেষারবে বনভূমি কাঁপিয়ে তুললে। সহসা রাজকুমারী বেলার কণ্ঠ আলিঙ্গনে বদ্ধ করে আর্ত্তনাদ করে উঠলো,—'বেলা ! কই ? কই ?'

বনভূমির বুকে সে স্বরের প্রতিধ্বনি আছড়ে পড়ল,—'কই ? কই ?'

বেলা পাশের বনভূমির পানে গ্রীবা হেলিয়ে চীৎকার সুরু করলে। রাজকুমারী তিল বিলম্ব না করে বেলার পৃষ্ঠে আরোহণ করলে, বেলা তীব্রবেগে ছুটলো। রাজকুমারী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখতে লাগল।

সহসা বেলার গতি মন্দীভূত হ'য়ে এল একখানা ছোট শিলাখণ্ডের পাশে,—তার পায়ের নীচে ছোট নদীর বুকে প্রভাতের সোনালি রোদটুকু ঝিকমিকিয়ে উঠছিল। অদূরে একটা কদমগাছের নুয়ে-পড়া ডালগুলো হাওয়ায় দুলছিল। রাজকুমারীর মুখখানা সহসা মৃতের মত পাংশু হয়ে গেল, যেন কে সজোরে তার পিঠে চাবুক মেরে গেল। সে বজ্রাহতের মতই সেই বনস্থলীর পানে চেয়ে রইল—এযে তার সেই স্বপ্নে গড়া বনভূমি—সেই নক্ষত্রের বন। কি আশ্চর্য্য সংঘটন ! তার মনে হল যেন একটা ঘূর্ণীঝঞ্ঝার প্রবল টানে তাকে রাজপ্রাসাদ হতে এই বনভূমিতে টেনে এনে ফেলেছে। সে বেলার পিঠের উপর পাথর হয়ে গেল। তার চেতনা ফিরে এল বেলার আর্ত্তনাদে। মূকের সে কি বুকফাটা আর্ত্তনাদ ! রাজকুমারীর বুকখানা সঘনে দুলে উঠল,—সমস্ত দেহখানা তার থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল, একটা বুকভাঙ্গা হাহাকার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য ! বড় ক্ষণিকের সে ব্যাকুলতা !

কদমগাছের নীচে সেই উঁচু ঢিবিটার কাছে বেলা ব্যাকুল ভাবে যেন কি খুঁজছিল, তার চোখ দুটো যেন মেহেরাকে বলতে চাচ্ছিল, 'ওগো, এইখানে ! এইখানে !'

রাজকুমারীর চোখে পলক ছিল না, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সেই শিলাখণ্ডের পাশে উঁচু ঢিবিটার পানে। কদমের শুকনো ঝরা ফুলে তার বুকটা ভরে গিয়েছিল। মেহেরা তার বক্ষাবরণের মধ্য হতে একখানা ভাঙ্গা ছোরা বের করে, লুব্ধনেত্রে একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে সেই ঢিবিটা খুঁড়তে লাগল, অতি সন্তর্পণে, যেমন করে কৃপণ তার প্রোথিত ধনরত্ন দেখবার আশায় নিরালায় নির্দ্দিষ্ট স্থানটী খনন করে।

রাজকুমারী নিরুদ্দেশ। প্রভাত হতেই প্রাসাদে এক সোরগোল পড়ে গেল। একটা অজানা আতঙ্কে রাজা গোবিন্দসিংহের বুকখানা থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। বৃদ্ধা ধাত্রীর আর্ত্তনাদে প্রাসাদ ভরে গিয়েছিল। তার মুখে মেহেরা-বর্ণিত অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা শুনে রাজার মুখখানা একেবারে পাংশু হয়ে গেল,—তার চোখের সামনে বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য্য কালো হয়ে গেল।

চারিদিকে লোক ছুটেছিল রাজকুমারীর অনুসন্ধানে। রাজা গোবিন্দসিংহ ও ভ্রাতা অজয়সিংহও গোপনে তার অনুসন্ধানে বের হয়েছিল, একটা প্রবল আকর্ষণে তাদের টেনে নিয়ে চলেছিল, তাদের হত্যার লীলাভূমি বস্তীর দিকে। ... ...ম্লান গোধূলির রক্তাম্বরের নীচে হত্যাকারী জালন্ধরের রাজকুমারদ্বয় নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়িয়ে দেখছিল,—সেই বস্তীর বনে, সেই খানে, একটা অর্দ্ধপ্রোথিত নরকঙ্কালকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে একরাশ ঝরা ফুলের মত লুটিয়ে পড়ে আছে,—তাদের ভগ্নীর প্রাণহীন দেহখানা—সেই রাজার মেয়ে।

পরিচয়

[শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ফুটল যদি আলগা প্রেমে
　　　　ফুলের ছোট
গোপন কথা প্রকাশ ক'রে—
　　　　কিসের লুকোচুরি!
　　হাসিখানি তোমার ঠোঁটে
　　রৌদ্র উজল কখন লোটে,
তা'রই ছায়া দুখের মত
　　　　পড়ে পিয়াল বনে;
　　গানের ধারে—আকাশ হ'তে
　　নদীর কল-কল স্রোতে
ফেনিয়ে উঠে যেই কথাটি
　　　　চাপ্‌ছ তুমি মনে!
বল্‌তে কি হয় কে এসেছে
　　　　আজকে মথুরায়?—
ফুটল কলি কি জানাতে
　　　　কাহার ইসারায়!

লো দরদি, আজ শুনেছি
　　　　তোমার মুখের ভাষা,
আজ চিনেছি, কুহকিনি,
　　　　তোমার ভালবাসা!

　　দুঃখ যখন সজল হ'য়ে
　　ঝরে আমার চক্ষু ব'য়ে
তুমিই তখন মুছাও আঁখি
　　　　সান্ত্বনা দাও বুকে;
　　জুড়ে দাও এ হৃদয়খানি
　　যখন এরে ভেঙে আনি'
সংসারেরি দুখের শোকের
　　　　জ্বালার শিলায় ঠুকে';
নির্জ্জনেতে বাজাও প্রেমের
　　　　মধুর মৃদঙ্গ,
কোন মতেই ছাড়্‌বনাক
　　　　তোমার এ সঙ্গ।

হাত ধরে' মোর ডেকে নিও
　　　　দখিণ হাওয়ার দিনে,
ডুবিয়ে দিও পুষ্প রেণুর—
　　　　গন্ধ, গানের ঋণে!
　　হাসিটুকুন্ কুসুম হ'য়ে
　　ফুটবে যখন র'য়ে র'য়ে,
বিশ্ব ছেয়ে ছড়িয়ে যাবে
　　　　তোমার মুখের মায়া,

পিকের মুখে প্রথম বাণী—
শুন্‌ব তোমার কণ্ঠখানি,
বস্‌ব যেথা শাদা মেঘের
পড়্‌বে শাদা ছায়া ;
খোঁপা হ'তে শুকিয়ে যখন
খস্‌বে ফুলদল—
পার্‌বনাক রাখ্‌তে চেপে'
পোড়া চ'খের জল !

কাঁদ্‌ব তোমার গলা ধরে
শ্রাবণ গহন রাতে,
ঝর্‌বে যখন দু'টি নয়ন
নরের বেদনাতে !
জলে ভেজা তরুণ ঘাসে
কেয়া ফুলের আকুল বাসে
উঠ্‌বে তোমার এলো চুলের
গন্ধটুকু মিঠে ;
তড়িৎ লতার ঝিলিক্ হানি'
আবার তখন হাসবে রাণি,
অশ্রু হাসির পড়্‌বে মুখে
সচন্দনের ছিটে ;—
তখন তুমি ছড়িয়ে যেও
সারা ভুবনময় ;
থাক্‌ব আমি শূন্যে চেয়ে
রহস্যে তন্ময় !

শরৎ এলে দাঁড়িও এসে
সরোবরের তীরে,
লাখো কমল ফুট্‌বে তোমার
চরণ ঘিরে' ঘিরে' !
পঙ্ক হ'তে পঙ্ক জিনি'
ফুট্‌বে চারু পঙ্কজিনী,—
হাসিখানি ফুট্‌বে যেন
জমাট আঁখি-নীরে ;
শস্য ক্ষেতের আলের পথে
বেড়িও তুমি স্বর্ণ রথে,
দেখ্‌ব চেয়ে তফাৎ হ'তে
নম্র নত শিরে ;

ধানের শীষে মন্দ বাতাস
লাগ্‌বে ফুর্ ফুর্,
তোমার হাতের কাঁকন দু'টি
বাজ্‌বে সুমধুর !

গাছের পাকা পত্রগুলি
অশ্রুজলের মত
ঝর্‌বে যখন—নবাঙ্কুরে
স্ফুর্‌বে হাসি কত !
তখন আমি নির্নিমিখে
রইব চেয়ে তোমার দিকে,
দেখ্‌ব ঠোঁটে হাসি কিবা
চক্ষুতে জল আসে ;
যেই হাওয়াতে মুকুল ফুটে
সেই হাওয়াতে পত্র টুটে,
এক কারণে কেউ বা কাঁদে,
কেউ বা আবার হাসে ;
মিথ্যা হাসি, কান্না মিছা,
মিথ্যা যে সুখ-দুখ,—
মিনি সূতার জাল বুনুনী—
পরম এ কৌতুক !

মন ভুলালে এমন ক'রে
কে গো আমার তুমি,
সজল দু'টি চ'খের পাতা
বারেক নিলে চুমি' !
সোণার বরণ গোধূলিতে
নিত্য এস আমার চিতে,
সুপ্রভাতের বনশ্রীতে
ভুলিয়ে মোরে রাখো,
এমনতর ভালবাসা
আশাহতের সফল আশা
বিশ্ব খুঁজে কোন খানে
আর ত দেখিনাক ;
যেদিকে চাই—তোমার মায়া
ব্যাপ্ত চারিদিক,
গতিবিহীন, স্তব্ধ আমি,
নয়ন অনিমিখ !

অমলা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

ডাক্তার আসিল এবং ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিতে উপদেশ দিয়া গেল। অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার হার্ট এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। বেশী উত্তেজনা পাইলে সবই সম্ভব।

ডাক্তার যথারীতি প্রস্থান করিলে [illegible] চলিয়া গেল, রাজেন্দ্র ম্লানমুখে অমলাকে বলিল "আমি বুঝতে পেরেছি যে আর আমার বাঁচবার [illegible]।

অমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল "তিনি যদি এমন অবস্থায় না থাকেন [illegible] আপত্তি [illegible] জন্য [illegible]।

রাজেন্দ্র অনেকক্ষণ আর কথা কহিল না, তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল "কিন্তু তুমি [illegible] আমাকে লোকে কি নিন্দা করবে না?"

"করবে বৈকি"

"তবে? তুমিও যাও"

"সময় বুঝলেই যাব, আপনি এখন ব্যস্ত হচ্ছেন? ডাক্তার আপনাকে সুস্থির হয়ে থাকতে বলে গেলেন শুনলেন না কি?"

"কিসের জন্য এ নিন্দা সহ্য করবে তুমি অমলা? আমি তো তোমার কেউ নই।"

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া অমলা মৃদুকণ্ঠে বলিল "নিন্দা যা হবার তা রটে গেছে নতুন করে আর কি হবে।"

"না:—আমায় শীগগির সুস্থ করে দাও। আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিই তুমি আমার কে।"

"এখন আর তা হয়না। এখন লোকে তা বিশ্বাস করবে কেন?"

"এমন প্রমাণ আমার কাছে আছে শুনলে [illegible] পরেও লোকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। সেজন্য আমার ভাবনা নেই। চাই কেবল তোমার অনুমতি। তুমি বল—"

"না,"

"না?"

রাজেন্দ্রের মুখ ও দৃষ্টি মানবের ন্যায় বিবর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল।

"তুমি আমায় চাওনা অমলা? তুমি চাওনা যে লোকে জানুক আমি তোমার স্বামী?"

অমলা নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিল দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে ভগ্নকণ্ঠে রাজেন্দ্র বলিল "বুঝলাম চাওনা,—কিন্তু কেন? কেন তা আর চাওনা তাও কি আমায় বলবে না?"

তথাপি অমলা উত্তর দিতে পারিতেছে না দেখিয়া আবার সে বলিতে লাগিল "যদি এ স্বীকার করতে তোমার এতই আপত্তি তবে কেন আমায় আমার আবরণ ত্যাগ করালে, যার জন্য আজ রমেন পর্যন্ত আমায় কপট মনে করে ছেড়ে চলে গেল? আমি এ গ্রামে কর্তব্য বোধে তোমায় খুঁজতে এসেছিলাম কিন্তু এসে মার ও দিদিমার মুখে তোমাদের শৈশবের কথা শুনে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গেইত নিজের মিথ্যাদাবী ত্যাগ করে তোমাদের মিলাতে গিয়েছিলাম। তখন তাও তুমি স্বীকার করলে না—"

এইবার সহসা রাজেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া অমলা বলিয়া উঠিল "তাই তার ফলভোগও করতে হচ্ছে আপনাকে। অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে করতে গেলেও অন্যায় অন্যায়ই থাকে। আপনার কাছে যেটা মিথ্যা,

আমায় কাছে সেইটাই যে আমার সত্য আমার আমিত্তো আমার নিজের কাছে মিথ্যা নয়।"

অপলক নেত্রে অমলার পানে চাহিয়া চাহিয়া রাজেন্দ্র বলিল "তাই সেই ভুলের সেই পাপের আমার এই শাস্তি বিধান করছ যে এখন আমি আর তোমায় চেয়েও পাবনা—না ?"

অমলা নতনেত্রে জড়িতকণ্ঠে বলিল "তা নয়"।

"তা নয় তবে কি ? বল অমল একটু স্পষ্ট করে বল।"

বলিতে বলিতে রাজেন্দ্র হস্তপ্রসারণ করিয়া অমলার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। নিজের ক্ষীণশক্তির সবটুকু প্রয়োগ করিয়া সেটাকে দুই হস্তের মধ্যে চাপিয়া বলিল "বল"।

"আপনি আমার কলঙ্কের দায়ে লোকলজ্জা থেকে আমায় উদ্ধার করবার জন্য নিজেকে একটুও বিব্রত করবেন না। আপনিতো আমায় চাননি,—এখন আমার অবস্থা দেখে দয়া করে'—"

"দয়া করে' ? নির্দ্দয়—নির্দ্দয়—নির্দ্দয়!'—উন্মাদের মত রাজেন্দ্র সবলে অমলাকে একেবারে নিজের নিকটে এমন করিয়া টানিয়া লইল যে অমলার আর বাধা দিবার সাধ্য হইল না। নিজেও সে তখন কাঁপিতে ছিল। উন্মত্তের আবেগে রাজেন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল "তোমায় দয়া করে' তাই এখন আমি তোমায় চাচ্ছি ? আজ এই এক মাসে আমার সবশক্তি সব বল যে ধীরে ধীরে কোথায় উড়ে চলে যাচ্ছে একি তুমি এখনো বোঝনি নিষ্ঠুর ? বুঝেছ, বুঝেও আমায় কৃতকর্ম্মের দণ্ড দিচ্ছ এসব। তোমাকে ভাল করে' জানার সঙ্গে সঙ্গে আমার যে কত পরিবর্ত্তন এল তা আজ আমার কি তোমায় বোঝাবার সাধ্য আছে অমলা ? যখন প্রথম তোমার খোঁজে এ গ্রামে আসি তখন সে এক আমি। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু সে একলোক। কি করে তোমায় দেখ্ব জানব একটা সুযোগের প্রত্যাশায় থাকতে থাকতে যেদিন প্রথম তোমায় দেখি—ওঃ—সেদিন এখনো যেন আমার চোখের ওপর জ্বল জ্বল করছে। অন্ধকারের মধ্যে যেটা যেন জ্বল জ্বল করে' শুকতারার উদয়। কর্ত্তব্যের কঠিন দায়িত্বের মধ্যে সেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। সেই তোমার কাণের ফুল দুটি, সে দুটি হাতে পেয়ে তা আর তোমাকেও ফিরিয়ে দেবার আমার সাধ্য হ'লনা। তার পরেই আমি দিদিমার কথায় তুমি ও রমেন অন্তরে অন্তরে দুজনে দুজনার কাছে আবদ্ধ বলেই সন্দেহ করতে লাগ্লাম। সেকি সুধা বিষে মেশা দিন ও ঘটনাগুলো আমার জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অমলা। তোমায় দেখি তোমার পরিচিত হই তত তুমি আমার অথচ আমার নও—এই দুটো ধাক্কার বেগ সহ্য করতে অপারক হয়ে উঠি। নিজের ভিতরের এই যুদ্ধে তোমার ওপরে দাবী ত্যাগ [illegible] বিষম দুঃখের দিনে কতদিন রুদ্ধ অভিমানে তোমাদেরও আঘাত করতে গেছি। সেসব ব্যথার দিন গেছে আমার অমলা। এমন সমস্যায় পড়ে জানলে কি তোমার খোঁজে [illegible] [illegible] হ'য়ে ছুটে আসি। আমার জ্ঞানের মধ্যে বিধাতা আমার অপূর্ব্ব বস্তু দান করেছিলেন তখন আমার নিজ [illegible] তাকে অনধিকারের বস্তু বলেই মনে হ'ল। যার তাকে জানা অধিকার বলে আমার মনে হল তাকে সেই জিনিষ আমিই উদ্যোগী হ'য়ে হাতে তুলে দিতে গেলাম। সেটা পরীক্ষা। কিন্তু তোমায় এত অপূর্ব্ব দেখেছিলাম এবং ভালবেসেছিলাম বলেই এ কাজ পেরেছিলাম অমলা। তোমার সুখের কাছে প্রাণের বন্ধু রমেনের দাবীর কাছে নিজের সমস্তকে যে এত খর্ব্ব করে আন্তে পেরেছিলাম সে কেবল তোমায় আমি এমন করে জেনেছিলাম তুমি আমার অন্তরে এমন হয়ে উঠেছিলে বলে'। অমল স্বাধিকার প্রাপ্তা স্ত্রীকে তো এমন আকাশের বিদ্যুৎ কল্পনার স্বপ্ন বলে' মনে হ'তে পারে না। তোমাকে অধিকারে না পাবার বেদনাতেই আমার অন্তর বুঝি তোমায় এমন করে' নিয়ে ছিল। কি জ্বালা তোমায় রমেন বেসেছে—অমলা ? আমার এই ব্যথায় ভরা—এই আমার হ'য়েও আমার নও এই যে বেদনাভরা বুকের রক্ত মাখা ভালবাসা এমন বুঝি তোমায় রমেনও—"

এইবার দুইহাতে রাজেন্দ্রের মুখ চাপিয়া ধরিয়া অমলা

বলিয়া উঠিল "তোমার পায়ে পড়ি চুপ্ কর—ওকথা আর ব'লনা—চুপ্ কর।"

"আর একটু বল্‌তে দাও—আর একটু। তারপরে সেই তোমার ততোধিক অপূর্ব্ব আত্মপ্রকাশ। সে আলোর কাছে মুহূর্ত্তে আমার সব ক্ষমতার দম্ভ কোথায় মিলিয়ে গেল। নিজের ধারণা জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার সব উল্‌টে পাল্‌টে গেল। নিজে তোমার কাছেও ধরা পড়ে গেলাম, সেই বা আমার কি দিন। নিজের গম্ভীর লজ্জা আর একটা অচিন্ত্য সুখের সঙ্গে তোমার মহিমার কাছে শুতেও কত ভয় কত সঙ্কোচ। কিন্তু তারপরে এ আবার কোন্ মূর্ত্তি দেখ্‌ছি তোমার অমলা? আমারই রাজ্যে আমি যে আজ কতদিন ভিক্ষুকের মত ফিরছি, আর কত দণ্ড দেবে নিষ্ঠুর? এখনো ব'লতে চাও আমি তোমার জন্য তোমায় চাচ্চি? দাও আমায় ফিরে দাও আমার কল্পনারও অতীত অধিকারকে। আমিই ভিক্ষা চাচ্ছি—দয়া চাচ্চি তোমার অমল।"

অমলা আবার কাঁপিতে কাঁপিতে যেন সংজ্ঞাশূন্যভাবে রাজেন্দ্রের বুকে মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রহিল। শেষে সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল "কিন্তু রমেন দাদা?"

"একটু বল পেলেই তাকে যেখান থেকে পাই ধরে আনব। তাকে না পেলে আমারই যে শান্তি নেই অমল"

"তবে আগে তাকে আন পরে এ কথা সকলকে জানিও"

"এই কি তোমার ইচ্ছা?"

"হ্যাঁ—"

"কিন্তু যতদিন তাকে না পাব ততদিন যে তোমার নিন্দা দূর হবে না। এই ব্যাপারে নিন্দাটা যে বেশী জোর পাবে আমিই বুঝ্‌তে পারছি। এমন কি দিদিমাও হয়ত তোমায়—"

"তাহোক—আমি তা সহ্য করতে পারব—আপনি আগে রমেনকে ফিরিয়ে আনুন। তাকে আগে বুঝিয়ে পরে সব কথা"।

রাজেন্দ্র ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "কিন্তু যদি আর তাকে না পাই অমলা?"

"পাবেন্‌না? না-না—তাও কি হয়? নিশ্চয়ই পাবেন"।

রাজেন্দ্র যেন নিজ মনেই উত্তর দিল "না-ই যদি পাই—চিরদিন ধরেই খুঁজব,—তাই বা কি! তুমিতো আমার প্রতীক্ষায় থাকবে অমলা? এবারতো আমি আর তোমার ধর্ম্মমাত্র নই—সংস্কারমাত্র নই—এবার যে জীবন্ত আমি! যে আমি তোমায় জেনেছি। যে আমি তোমার।"—

অমলার মস্তক আবার রাজেন্দ্রের বুকে নত হইয়া পড়িতেছিল, সহসা দিদিমার কর্কশ আহ্বানে তাহার সে বিহ্বলতা দূর হইয়া গেল। অমলা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে রাজেন্দ্র মূঢ়ের ন্যায় কেবল তাহার গমন পথের পানেই চাহিয়া রহিল। তখনো যেন সে নিজের অবস্থাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

* * * *

রাজেন্দ্র অপেক্ষাকৃত সবলতা লাভ করিয়াই অমলার নিকটে বিদায়ের প্রস্তাব করিল। অমলা ম্লানমুখে বলিল "আর দিনকতক পরে যাবেন, এখনো আপনি দুর্ব্বল।"

"না অমলা তোমার এ বিড়ম্বনা আর আমি সইতে পারছি না। দিদিমা পর্য্যন্ত আর আমার মুখ দেখেন্ না। গ্রামের লোকের শত চক্ষুর ওপর দিয়ে আমার জন্য তোমার এ বাড়ী আনাগোনা আর সকলের মুখ টেপা হাসি এ আমার আর সহ্য হচ্চে না।"

"আমিতো টুনি মণিকেই আপনার কাছে রেখেছি। তারাইতো বেশীর ভাগ—"

"তাহলে কি হবে তবু লোকে যা ভাব্‌বার ভাব্‌ছে। আমি রমেনকে খুঁজতে যাই অমলা কিন্তু তার আগে তোমার আমার কি সম্বন্ধ এটাও সকলকে জানিয়ে দিয়ে যাই, তুমি অনুমতি দাও।"

"না।"

রাজেন্দ্র আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিঃশব্দে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া অমলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আজই তবে যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

ক্ষণ পরে আজ অমলাই প্রশ্ন করিল "কিন্তু সত্যই যদি রমেনদাকে খুঁজে না পান্?"

"তবুও চিরজীবন ধ'রে খুঁজতেই হবে।"

"অনেকদিন খোঁজার পরও যদি না পান্—তাহলে কি তখনো ফিরবেন না?"

"কি জানি—আজ সে কথাতো বলা যায় না অমলা।"

অমলা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "না তখন ফিরতেই হবে।"

রাজেন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া অমলার একখানি হাত হাতের উপর তুলিয়া লইয়া দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে সেখানিকে নামাইয়া দিয়া সনিশ্বাসে বলিল, "কিন্তু রমেন্ যদি না ফেরে তাহলে কি আমরা সুখী হ'তে পারব?"

"সুখের জন্য নয়, আমার মরবার আগে এসে একবার সকলকে তখন একথা জানিয়ে দিয়ে কলঙ্ক মুক্ত ক'রতে হবে নিজেকে তোমার। তার আগে যখন তোমায় আমায় আবার ত্যাগ করেই যেতে হচ্ছে তখন সকলকে সেকথা জানিয়ে গেলে কি এ কলঙ্ক বৃদ্ধিই হবে না? সকলে কি ভাববে না স্বামী তাকে খুঁজে পেয়েও ত্যাগ করলে কেন আবার। আর রমেন দাদার এই রকমে চলে' যাওয়া এতে কি সকলে সে সন্দেহ বৃদ্ধির সুযোগই পাবেনা? চিরজীবন তোমায় পাইনি এ আমার বরং সয়ে' যাচ্চে কিন্তু এমন ক'রে' তুমি আবার আমায় ত্যাগ করে গেছ একথা আমার এ মিথ্যা কলঙ্কের চেয়েও বড় হবে।"

"বুঝেছি তবে তাই হোক। তোমার বা আমার শেষ দিনের আগে সেই যে আমরা একত্র হ'ব তখন আর ছাড়াছাড়ি হ'বে না। তখন আর রমেনের কাছেও সঙ্কোচ থাকবে না যে তাকে আমরা অপমান করে ব্যথা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা সুখ ভোগ করেছি। সেই দিনের প্রতীক্ষায়—"

"আমি পথ চেয়ে থাকব! যেমন ক'রে হঠাৎ তুমি এসেছিলে তেমনি করে হঠাৎ একদিন আমার শিয়রে এসে তুমি দাঁড়াবে—'

রাজেন্দ্র অভিভূতের মত ধীরে ধরে উচ্চারণ করিল "তাইই যদি বিধাতার মনে থাকে তাই হবে। এই নাও তোমার আমার জীবন রহস্যের প্রমাণ তোমার বাপের আর পাওয়ার স্বাক্ষরিত কাগজ পত্র আমারও পরিচয়ের অসংখ্য প্রমাণ এ সব নিয়ে আর আমি কি করব? তোমারই কাছে থাক—"

অমলা দুই হাতে অঞ্জলী করিয়া সেগুলা গ্রহণ করিল। প্রথমে মাথায় ও পরে বুকের উপর সেগুলা চাপিয়া ধরিতেই মুহূর্ত্তে সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

১৬

নিন্দিতা ঘৃণিতা ক্ষীণা অমলার জীবনের উপর দিয়া দীর্ঘ দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে যে দেখিয়াছে তাহার আজ আর সাধ্য নাই যে সেই অমলা বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করে। দিদিমা বুড়ী এখনো বাঁচিয়া আছেন কিন্তু অমলাকে আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের চ'খে দেখেন না। টুনির ক্রমে বিবাহ যোগ্য বয়স হইতেছে কিন্তু অমলার কলঙ্কে আর যে তাহাকেও কোন ভদ্র পরিবারে গ্রহণ করিবে দিদিমার সে আশাও নাই! এজন্য তিনি সর্ব্বদাই অমলাকে লাঞ্ছনা দেন। আবার এক এক সময়ে বুড়ীর মনে হয় অমলার জীবনের এই দুর্গতি তাঁহার দ্বারাই ঘটিয়াছে, সেইজন্য টুনিকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধাতা ভোগ করাইবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তখন বুড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে হতজ্ঞান হইয়া অমলারই পায়ে মাথা কুটিতে যায়। পরম ধৈর্য্যে অমলাই তখন আবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দেয়। রাজেন্দ্র ও রমেনকেও বুড়ী অভিসম্পাত দিতে ক্রটী করে করে না। তাহারা যে তাহার অশেষবিধ শত্রুতা সাধনের মধ্যে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিয়াই সবচেয়ে শত্রুতা করিয়া গিয়াছে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

সেদিন অমলা তখন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা, টুনিও যদি একটা অতি প্রয়োজনীয় দরকারে পাড়ার মধ্যে গিয়াছিল দিদিমা বুড়ী বাহিরের দাওয়ায় পড়িয়া রোদ পোহাইতে ছিলেন। সহসা অমলা বুঝিল টুনি যদি ফিরিয়া আসিয়াছে

এবং কি একটা খবরে দিদিমাকে বিষম চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দিদিমার মুখ হইতে দুএকটা অতি পরিচিত নাম ঘন ঘন উচ্চারিত হইয়া অমলার হস্ত হইতে তাহার আরব্ধ কর্ম্ম ধীরে ধীরে খসাইয়া দিল। অমলা শুনিল দিদিমা তাহাকেই আহ্বান করিতে করিতে বলিতেছেন "একি সম্ভব? ওরে একি আমি স্বপন দেখছি? ডাক্তার রাজেন্—সবাই এই কথা বলছে। অমা ওলো পোড়ামুখি এদিকে আয়—বল আমায় একি সত্যি? তুই কি জানতিস তাহ'লে? এতদিন পরে এমন কথা কে প্রকাশ ক'রলে গাঁয়ের লোকের কাছে? রমেন যদি জানে তবে সে এমন করে' পালিয়ে গেল? কেন আমাদের এই কলঙ্কের মধ্যে ফেলে গেল তবে? ডাক্তার এখন রয়েছে কোথায়? তা কেউ জানে না। তবে কি হবে? অমা হতভাগী শুনতে পাচ্ছিস্? কানের মাথা কি খেয়ে বসেছিস?"

লাঠি ধরিয়া দিদিমাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অমলা আবার নিজ কার্য্য হস্তে তুলিয়া লইল। দিদিমা আসিয়া লাঠিটা হেলাইয়া দিয়া তাহার নিকটে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িলেন। গম্ভীর মুখে বলিলেন "তুই জেনে শুনে এমন কথা কেমন করে' লুকিয়ে রেখেছিলি?"

অমলা মৃদুকণ্ঠে বলিল "যিনি প্রকাশ ক'রবার তিনি না ক'রলে আমি কি ক'রব?"

"আমার কাছেও তো বলতে পারতিস? ওরে তা'হলে যে তোকেও আমি এত দুঃখ দিতাম না।"

"তুমি আমায় কোন দুঃখই দাওনি দিদিমা। কিন্তু আজ এতদিন পরে একথা কে প্রকাশ ক'রলে? রমেন দাদাই কি তবে ফিরেছে?"

"তাতো ওরা বলতে পারছে না—সবাই বলছে তাই মাত্র টুনি শুনে এল। বল্ একথা সত্যি? রমেনও একথা জানত?"

"এখন একথা থাক্ দিদিমা, ইঁদের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।"

"কাদের ফিরে আসার অপেক্ষা? ডাক্তারের আর রমেনের? তুই বলিস্ কি অমা? একথা কি একদিনও চেপে রাখতে আছে? তারা যে এতদিন আমাদের এত বই দিল এইই তাদের অন্যায়। রাজেনের যদি ফিরে আসতে দেরী হয় কিম্বা তার যেরকম ধরণ দেখছি ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাল যখন কিছুই জ্ঞান নেই যদি সে আর তোকে নিতে নাই আসে তাই বলে' কি তুই এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েই ম'রবি?"

"না তখন সবাইকে জানিয়ে দেবার কথা আছে, কিন্তু সে দিনের যে এখনো দেরী দেখছি দিদিমা তাই তিনি আসেন নি। রমেন দাদাকে না নিয়ে তিনি তো ফিরবেন না। তারা না এলে এ খবর প্রকাশে কি হবে?"

বৃদ্ধা উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন "বটে? কলঙ্কটা বুঝি তুচ্ছ?"

"কলঙ্কের কথা ছেড়েই দাও, মিথ্যানিন্দায় ক্ষতি কিসের?"

আমি যাই একবার গ্রামের মধ্যে।"

অমলা দিদিমার লাঠি কাড়িয়া লইয়া বলিল "না, যাঁরা একথা জানেন তাঁদেরই কেউ নিশ্চয় একথা রটিয়েছেন। তাঁরা যদি কেউ গ্রামে এসে থাকেন দরকার বুঝলে তাঁরাই আসবেন, তুমি যেতে পাবে না।"

অগত্যা দিদিমা ঘরবার করিতে লাগিলেন। কেহই আসিল না কিন্তু গ্রামের নরনারীরা দলে দলে আসিয়া তাহাদের উদ্ব্যস্ত করিয়াই তুলিল। এমন কি গ্রামের প্রধান সমাজপতিও সদলে আসিয়া অমলার দিদিমাকে জেরায় ফেলিলেন "এ খবর কেন তোমরা লুকিয়ে রেখেছিলে এতদিন? ডাক্তারের মত একটা মহৎ লোক যে গ্রামের অশেষ উপকার করে' শেষে নিন্দা টিট্‌কারীর মধ্যে নিঃশব্দে চলে' গেছেন এ আমাদের গাঁয়ের পক্ষেও বিষম লজ্জার কথা। বল তোমরা কি প্রমাণে বুঝেছিলে তিনিই অমলার স্বামী?"

বৃদ্ধা বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিলেন "আমি কিছু জানি না, অমা জানে।"

"সে যা জানে যে প্রমাণ সে পেয়েছে আমাদের কাছে তা বলুক।"

অমলা কিন্তু কিছুই বলিল না বা কোন প্রমাণই দিল না। ঘর হইতে সে বাহিরই হইল না। দিদিমার

ক্রন্দনের দায়ে অগত্যা কেবল তাঁহাকে বলিল যিনি প্রধান প্রমাণ তিনি ফিরে না এলে সে কিছুই বলিবে না।

অগত্যা গ্রাম্য বর্ষীবৃন্দ রণে ভঙ্গ দিয়া যে এ সংবাদ রটাইয়াছে তাহারই উপর হানা দিতে চলিলেন। কি প্রমাণে সে এ কথা রটায়! কিন্তু সেখানেও বোধ হয় তাঁহাদের নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল। মাত্র মুখের কথা ছাড়া সেখানেও অন্য কোন প্রমাণ নাই। কলঙ্ক মোচনের জন্য এ সমস্তই অমলার কারসাজি স্থির হইয়া তাহার নিন্দায় গ্রামখানি নূতন করিয়া আবার মথরিত হইয়া উঠিল।

দিদিমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া অমলাকে লুকাইয়া রমেনের বা রাজেন্দ্রের উদ্দেশে তাহাদের বাড়ী গেলেন, কিন্তু কাহারো কোন উদ্দেশই তিনি করিতে পারিলেন না। তাহারা কেহ যে গ্রামে আসিয়াছিল একথার কোন প্রমাণই তিনি পাইলেন না। ফলে ঘর ও বাহির অমলার পক্ষে সমান শরশয্যা হইয়া দাঁড়াইল।

অমলার ক্ষীণ শরীরে সেদিন জ্বরের আক্রমণটা প্রচণ্ডই হইয়াছিল তবুও সিক্ত বসনে দিদিমার জন্য কলসীতে জল ভরিয়া লইয়া সে একবার সেই কালীসাগরের অতল জল পানে চাহিল। সে দীঘিও তাহার নিকটস্থ দেবীর সেই বেদীপীঠ সমভাবেই আছে কিন্তু তাহার জীবনেই কত না পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এমন কি আর কাহারো হয়? দীর্ঘ সাত বৎসর পূর্ব্বের তাহার বাল্যজীবনের কয়েকদিনের ইতিহাস এই দীঘিকার কুলেই যে লেখা আছে। এমনি একটা সন্ধ্যায় সেই ব্যথিতা ক্ষুব্ধা বালিকার কয়েক ফোঁটা চোখের জলও বুঝি এই কালীসাগরের সুনীল জলে মাখা আছে। একটা সুখ বা আনন্দের প্রলোভন পূর্ণ খেলাকে কেহ ভাঙিয়া দিলে, ভাল খেলানা কিম্বা একখানা গহনা হারাইলে বালক বালিকা যেমন অপ্রত্যাশিত দুঃখে কাঁদিয়া ঘরে যায় তেমনি করিয়া একটা সন্ধ্যায় সে এইখান হইতে ঘরে ফিরিয়াছিল। সেই ঘটনা হইতেই যে ধীরে ধীরে সে নিজের অজ্ঞাতেই বয়সের অপেক্ষা বিজ্ঞা হইয়া পড়ে। বালিকা বিধবা যেমন জ্ঞানোন্মেষ ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত ভোগ সুখ ও বেশ ভূষা আহার বিহার প্রভৃতির সম্বন্ধে নিজের মনের ইচ্ছাটুকু জাগিতে দেয় না, এ সব তাহার পাইতে নাই লইতে নাই চাহিতে নাই, এ কথা যেমন তাহার অন্তরে ধারে ধীরে সুদৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া সে সকল বিষয়ে তাহার ইচ্ছা উন্মেষের শক্তিটুকুকে পর্য্যন্ত নাশ করিয়া দেয়, তেমনি ভাবে অমলার অন্তরও কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার নূতন জীবনের মধ্যে এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে রমেনের সঙ্গে তাহার কখনো বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল একথা কেহ বলিলেও সে লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। সে কথা যেন কানে শোনাও তাহার দোষ। সে যে বিবাহিতা তাহার হয়ত স্বামী আছেন। কিম্বা সে বিধবা। রমেন যে বিবাহ করে নাই এ কথাটার কারণও সে বোধ হয় কখনো মনের মধ্যে অনুসন্ধান করে নাই, যেমন সকলে জানিত তেমনি সেও জানিত নানা বিঘ্নেই তাহা ঘটে নাই। বর্ষীয়সীদের মুখে নানারূপ অচিন্ত্য কাহিনীর সফলতার গল্প শুনিয়া নিজের অনুদ্দিষ্ট স্বামীর আগমনের বিষয়ে বা তাঁহার কথা হয়তো কখনো অজ্ঞাতে আশা করিতে গিয়া সে অসম্ভব আশারও সম্ভাবনা মাত্রে সেদিক হইতেও অমলার নিজের মনকে তাহার ফিরাইতে হইয়াছে। এও কি সম্ভব? যুগ যুগান্তরের সে সব অদ্ভুত কাহিনীর অপেক্ষাও যে তাহার জীবনের এ কাহিনী অধিকতর বিচিত্র। স্বামী যদি বাঁচিয়াও থাকেন কে তাহাদের উভয়কে উভয়ের নিকটে পরিচয় করিয়া দিবে। বিধাতা ভিন্ন এ সাধ্য মানুষের কাহারো নাই।

তাহার পরে—নানারূপ বিপদাপদের মধ্যে রমেন আবার যখন ভ্রাতার মতই তাহাদের সংসারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন একজন মহাপুরুষের বেশে এ কাহার আবির্ভাব হইল; যাঁহাকে অমলার কৃতজ্ঞহৃদয় দেবতার মত মহাপ্রাণরূপে দেখিয়া শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আনত হইতেছিল তাঁহার সহসা একি রূপান্তর ধারণ? সেই অতীত যুগের বালক বালিকাদের দুদিনের ক্ষুদ্র খেলার সুখ দুঃখকে বড় করিয়া ধরিয়া তাহাদেরই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার মুখে অমলারই জীবনের সেই

বিচিত্র কাহিনীর আভাষ যে প্রকাশ পাইয়া উঠিল ইনিই বুঝি সেই বিধাতা যিনি অমলাকে জানাইয়া দিতে পারেন চিনাইয়া দিতে পারেন—কে তাহার স্বামী। তিনি আছেন কিনা। কিন্তু তাহার গভীর অভিজ্ঞতার মধ্যে এটুকু তাঁহার মনে কেন হয় নাই যে অমলা রমেনকে চাহিয়াছিল। তখন যে সে জানিত রমেনই তাহার স্বামী হইবে। যতদিন হইতে সে জানিয়াছে তাহার একজন স্বামী আছেন তখন হইতেই যে সে ধীরে ধীরে নিজের চিত্তকে তাঁহারি দিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছে। মাত্র তাহার স্বামীকে সে জানিতে চাহে। পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষাও নাই কেবল চিনিবার। অমলা যখন বুঝিল তাহার সেই স্বামীকে একমাত্র ইনিই জানেন, তখন অমলা নিজের লজ্জাসঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে খানিক উৎক্ষিপ্ত করিতেই—একি? চমকিয়া উঠিল কে ইনি? ইনিই তবে তিনি? কার স্বামী? ওগো এও কি জগতে সম্ভব হয়, তিনি কেবল মহাপুরুষ নন্—দেবতা নন—মহাপ্রাণ নন ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র নন তিনি স্বামী—স্বামী—স্বামী। অমলার স্পর্শের বাহিরের একখানি উঁচু তিনি—তবুও তার স্বামী।

কিন্তু সে তিনি যখন সেই সম্মুখে যখন তাহার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন তিনি যখন অমলাকে চাহিলেন তখন অমলার আর তাঁহার পায়ে নিজেকে ডুবাইয়া দিবার সাধ্য হইল না। একবার মাত্রও মুখ তাহার চোখের উপরে ভাসিতেছে না এই রমেন যে একদিন তাহার দুয়ারের কাছেই ছিল, কৈ তাহার কথা তাহার ব্যথা এমন করিয়াতো কখনো অমলাকে স্পর্শ করে নাই। যেদিন সে নিজের জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়া তাহার কল্পনার ও অচিন্ত্য সুখস্বপ্ন দেখিতে মাত্র আরম্ভ করিয়াছে অমনি কার আর্দ্রকণ্ঠে তাহার সে সুখবিহ্বলতা কে মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল। এ জীবনে হয়ত রমেন আর ফিরিবে না—আর—আর ফিরিবে না তাহার সেই চির অপ্রাপ্য যিনি। তাঁহাকে পাওয়ার সে ক'দিনের কথা—কল্পনা মাত্র সে অমলার,—মায়া মরীচিকা। লোকমুখে কলঙ্কের মসিতে গঞ্জনার তুলিতে কেবল তাঁহার সহিত অমলার যা সংযোগ রহিল, তার বেশী আর কিছুই সে এজীবনে পাইবে না।

"অমলা!"

চমকিয়া মুখ তুলিয়া অমলা দেখিল তাহার অদূরে একজন অতি নিকটে দাঁড়াইয়া একজন যুবা বিস্মিত চক্ষে বলিতেছে "একি অমলা—একি?"

মুহূর্ত্তে অমলার অশক্ত শীর্ণ বাহুবন্ধন হইতে কলসীটা খসিয়া গড়াইয়া দীঘির জলে পড়িয়া গেল।

রাজেন্দ্র অমলার কানে ফুল দুটি পরাইয়া দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। অতীত কথা স্মরণ করিয়া দুইজনের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। তার পরে ধীরে ধীরে রাজেন্দ্র বলিল "এই ক'দিনেই শরীরটা একটু সেরেছে!"

অমলা নতমুখে আবার হাসিল।

"ওঃ রমেনকে পাওয়ার আনন্দের সঙ্গেই সে আমায় যে ভয় দেখিয়েছিল! তোমায় এসে দেখতে পাব কি না সন্দেহ। মনে হয় বিদায়ের সময়ের কথাটা বুঝি সত্যই ফলে যায়। হয়ে ছিলও প্রায় তাই। "ভাগ্যে রমেন চুপি চুপি একবার—"

অমলা তেমনি হাসিমুখে উত্তর দিল "কিছুই হ'ত না। গায়ে এসেছিল নৈলে আমি জানতাম তোমরা ফিরবেই। তাই কিছুতেই আমার দুঃখ ছিল না। শত নিরাশার মধ্যেও কে যেন লুকিয়ে ব'লত একথা।"

রাজেন্দ্র মুগ্ধ মনে স্ত্রীর কথাগুলি শুনিয়া গেল। সহসা বলিল "দিদিমা তাঁর কাশী যাবার ইচ্ছেটা ছেড়েছেন তো?"

"কোথায়? টুনুর বিয়ে দিয়ে তিনি নাকি আর একদিনও থাকবেন না।"

"আমার ওপর তাঁর রাগটা গিয়েও যাচ্চে না দেখছি। কি ভাগ্যি রমেনের ওপর গিয়েছে। কিন্তু টুনির সঙ্গে রমেনের বিয়ে দেবার চেষ্টাটা তার না ক'রলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।"

"কেন, তুমি তো বলেছ' রমেন যা বিয়ে ক'রবে বলেছে। এতে একেবারে যথার্থ আপন হ'য়ে যাবে। টুনুও তো মন্দ মেয়ে নয়।"

"মন্দ মেয়ের কথা হচ্ছে না—আমার কেমন যেন ভাল লাগ্‌ছেনা তাই বল্‌ছি।'

"রমেন দা কিছু বলেছে ?'

"না।"

"তবে আর তুমি দিদিমার সাধে বাদ্ করো না।"

"তা বটে এ বাড়ীর এ সাধটায় এর আগেও বড়ই বাদ পড়েছে এবং আমিই একমাত্র তার হেতু।"

"বেশ, সেইটি মনে রেখে শুভকর্ম্মে যোগ দাও। টুনুর বিয়ের পর আমাদেরও তো যেতে হবে ?"

"কোথায় অমলা ?"

"কেন আমার নিজের বাড়ী—শ্বশুর বাড়ী।'

রাজেন্দ্র অমলার নিকটস্থ হইয়া তাহার হাত আপন হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল "এ যেন স্বপ্নের ঘটনা না ?

অমলা নত নেত্র তুলিয়া পূর্ণ চক্ষে স্বামীর পানে চাহিয়া ইহাপেক্ষাও যে অনেক বেশী কথা বলিয়া লইতেছে রাজেন্দ্র তাহা বুঝিয়াও নিজের এই স্বপ্ন মোহকে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

পরদিন রাজেন্দ্র শুষ্কমুখে অমলার হস্তে একখানি পত্র দিল। অমলা বলিল "একি ?"

"পড়, যা ভয় করেছিলাম।"

অমলা পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

ভাই, আবার আমায় তোমাদের ক্ষমা করিতে হইবে। টুনুর বিবাহের জন্য আমি মোটেই ভাবিতেছি না, কেননা বেশ জানি একটি সুপাত্রে তাকে সমর্পণ করা তোমার পক্ষে এত বেশী শক্ত হইবে না। আমি ভাবিতেছি আমার নিজের কথা। আমায় তোমরা আবার কত না অকৃতজ্ঞ ভাবিবে। এতদিন তো তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই দুই বৎসর তোমাদের কি না দুরবস্থায় ফেলিয়াছিলাম। তোমার হাত হইতে পলাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ভাগ্যে গ্রামে একবার আসিয়াছিলাম। তাই না তোমাদের এমন করিয়া আবার আজ চিনিয়া লইতে পারিয়াছি এবং অমলাকেও বাঁচাইতে পারা গিয়াছে। কিন্তু আবার এই যে কাজটা করিতেছি এর জন্য না জানি তোমরা আমায় কি ভাবিবে! আমি পলাইলাম।

অন্য কিছু ভাবিও না কেবল একটু নূতনত্ব চাই। পুরাতন লজ্জাটা এখনো বুকের মধ্যে খোঁচা মারে যে মাঝে মাঝে। তাহাকে নূতন কোন কিছুর মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে ডুবাইয়া দিতে চাই। টুনু মেয়েটা—লজ্জাই লাগিতেছে এখানে। একটি ভাল বর বিবাহ দিও তার—আশীর্ব্বাদ দিতেছি তাহাকে। বঙ্গদেশের মধ্যে আমার মত পাত্রেরও বিবাহযোগ্যা কন্যা বেশী দুর্লভ হইবেনা তাহাতো জান। প্রথম যেখানে গিয়া কিছুদিন আড্ডা গাড়িয়াছিলাম (তুমি সন্ধানে সেদিন আসিয়াছ জানিয়া সেখান হইতে পলাই) সেইখানেই এক ভদ্রলোকের বিবাহ যোগ্যা দুইটি কন্যা আছে (কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী বুঝি) মেয়ে দুটি সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। [illegible] আমাদের স্বশ্রেণী। সেখানেই বিবাহ করি যদি [illegible] কি [illegible] নূতনের মধ্যে পুরাতন লজ্জার কথা আর সর্ব্বদা [illegible] পড়িবে না।

কিন্তু তুমি তাই বলিয়া টিকটিকি সাজিয়া এখন যেন আমার পিছনে আবার লাগিও না। তাহা হইলে আবার আমি লুকাইয়া পড়িব। টুনুর বিবাহ দাও [illegible] পড়ার ব্যবস্থা কর দিদিমাকে নিশ্চিন্ত কর, এবং নিজেরা একটু নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মন দাও। চন্দ্র সূর্য্যে [illegible] এখন তো আর সে [illegible] কালিমা নাই, এইবার ঘর সংসার পাত। হঠাৎ একদিন হয়ত দেখিবে আমি একেবারে নূতন হইয়া তোমাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সে একেবারে—

সকল অভ্যাস-ছাড়া সদ্য শিশু হেন।

নূতন জীবন আরম্ভ করার আগে আমায় একটু স্বাধীন ভাবে চলিতে দাও দোহাই তোমার।

কিছুদিনের মত আসি ভাই। এইবার যেদিন দেখা হইবে সেদিন আমায় তোমরা নতুন দেখিবে আশা রাখিতেছি। আনন্দের মধ্যে আমারও এ আনন্দ প্রাপ্তির উদ্দেশের যাত্রা আনন্দ বলিয়াই গণ্য করিও। প্রণাম নিও দিদিমাকে প্রণাম দিও—অমলাকে আশীর্ব্বাদ ও শুভাকাঙ্ক্ষা। আমায়ও আশীর্ব্বাদ কর তোমাদের স্নেহ আর তোমাকে যেন না ভুলি। ইতি—

তোমার রমেন

দিদিমা কাশীবাস করিতেছিলেন। রমেনের প্রতি কথাই সত্য হইয়াছে। টুনুর রাঙা বরে বিবাহ হইয়াছে। মণি রাজেন্দ্র ও অমলার নিকটে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতেছে। রাজেন্দ্র অমলাকে লইয়া নিজের দেশে গিয়াছে। দিদিমা তাঁহার বহুদিনের ঈপ্সিত কাশীবাস করিতে পাইয়া কথঞ্চিত মনের সুখে আছেন। সুসময়ে লোকেরও অভাব হয় না, তাঁহার এক অনাথা ভাইঝিও তাঁহার সেবার্থে পাওয়া গিয়াছে। তাই অমলা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে। রমেনকে অগত্যা এখন প্রায় সকলেই ভুলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দিদিমা তাঁর ইচ্ছানুরূপ দর্শনাদি তো করিতে পারেন না, কেবল যোগ যাগের দিন ভাইঝির সাহায্যে কোনরূপে কোন দিন গঙ্গা স্নানটা করিয়া আসেন বা নিকটস্থ দেবতাদি দর্শন করেন এবং রাজেন্দ্র ও রমেনের উদ্দেশে কিছুবা আশীর্ব্বাদ কিছুবা অনুযোগ বর্ষণ করেন। আশীর্ব্বাদ এইজন্য যে তাঁহার এটুকু ক্ষমতাও নাতিদেরই অকাতর চিকিৎসা ও যত্নের জন্যই তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং সেই দাংপিটে নির্ব্বোধ ছোঁড়া দুটাই যে তাঁহার এতদিন এই দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বহিবার একমাত্র হেতু সেজন্যও তাহারা অনুযোগের পাত্র হইয়া পড়ে।

দশাশ্বমেধের ঘাটটিই তাঁহার পক্ষে কষ্টে সৃষ্টেও অবতরণ সাধ্য তাই তাহার নিকটেই দিদিমা বাস করিতেন। সেদিন স্নানান্তে তিনি ঘাটোয়ালদের অধিকৃত চৌকীর উপর জপে বসিতেছেন তাঁহার ভাইঝি জলমধ্যে স্নানাহ্নিকে নিযুক্তা—এমন সময়ে তিনি 'দিদিমা' ডাকে আপন মস্তকে শিহরিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন উবুড় হইয়া কে তাঁহার পদধূলি লইতেছে। জপ ফেলিয়া বৃদ্ধা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

"কে বাছা, তুমি কে?"

"চিনতেও পারলেনা দিদিমা।"

"রমেন? তুমি রমেন? ওরে সত্যি কি তুই রমেন?"

"কেন দিদিমা তোমার তো চোখ একটুও খারাপ হয়নি! দিব্যি তো দেখতে পাচ্ছ।"

"হাঁরে তুই কি সত্যিই সেই রমেন? একি বেশ তোর? তুই কি কনেষ্টবল্ না জমাদার হয়েছিস?"

"হ্যাঁ দিদিমা তবে জমাদার নয় হাবিলদার।"

"তা সে একই কথা, হাঁরে তুই কিনা শেষে পুলিস্ হলি? তুই যে—"

"না দিদিমা পুলিস্ নয় ফুলিস। যাক সেকথা একটু সব বসি। তোমার জপ এখন আর হচ্ছে না। সবাই কে কেমন আছে বল। টুনি মনি অমলা রাজেনদা—"

"এখানে কোথায় বসবি দাদা বাসায় চল? হ্যাঁরে আবার কি তোকে দেখ্‌তে পেলাম? তুই কি এতদিন পরে আবার ঘরে ফিরলি রমেন?"

বৃদ্ধার ম্লান চক্ষু অশ্রুতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে রমেনের হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া গেল—নত মস্তকে সে গাঢ় কণ্ঠে বলিল "ঘরে? না—এই কেবল তোমার সঙ্গেই হটাৎ দেখা দিদিমা—অনেকদিন দেশ ছাড়া ছিলাম।"

"কোথায় ছিলি? শ্বশুর বাড়ী? হারে বৌ কেমন হ'য়েছে একবার দেখালিওনা?"

সহসা উচ্ছ্বসিত হাস্যে রমেন্ লুটাইয়া পড়িল "হ্যাঁ দিদিমা শ্বশুর বাড়ীই বটে—ওঃ—"

"কেনরে এত হাসি কিসের। কার যে সুন্দরী মেয়ের কথা লিখেছিলি টুনিকে যেজন্য পছন্দ করতে পারলিনা,—সে মেয়েকেই তো বিয়ে করেছিস? কদ্দিন হল—এইতো কাশীই এসেছি আমি তিন বছর, তার দেড় বছর আগের কথা তা এতদিনে ছেলে মেয়ে হয়েছে তো দু একটী? বৌ কোথায়? কেমন সুন্দরী বৌ দেখালিওনা একবার? দেখতাম সে আমাদের টুনুর চেয়ে কতখানি সুন্দর—"

রমেন দিদিমার কথায় আবার একচোট্ হাসিতে ফাটিয়া পড়িত কিন্তু দিদিমার ব্যথাটা কোথায় বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে হাসি শুকাইয়া গেল। ব্যথিত কণ্ঠে সে বলিল "তোমরা কি তাই বুঝেছ দিদিমা? টুনুকে আমি পছন্দ করিনি বলেই? সে যে আমার ছোট বোনটি।"

"সে কথা যেতে দে ভাই, বল এখন বৌ কোথায়—কবে দেখাবি ?"

"কি দেখ্‌বে দিদিমা? আমি যে আজ চার বছরের ওপর যুদ্ধে চলে গিয়েছিলাম। এই মাসখানেক মাত্র ফিরে এসেছি।"

"তুই কি তবে বিয়েই করিস্‌নি রমেন? যুদ্ধে গিয়েছিলি? সে কিরে? তবে ওরা বলেছিল—সবই কি ফাঁকি রমেন? এমনি ক'রে আমাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে তুই পালিয়েছিস্?" চোরের মত কুণ্ঠিত মুখে রমেন্ নিঃশব্দে রহিল। দিদিমার ব্যথা মুছাইতে গিয়া আবার সে কি করিয়া বসিল দেখিয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া গেল। দিদিমা তখন তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "চল্ দাদা বাসায় চল্—"

"যাব দিদিমা কিন্তু তার আগে একটি কথা, একটি প্রতিশ্রুতি আমায় দেবে তবে আমি বহুকাল পরে তোমার পাতের দুটি প্রসাদ খাব—" বলিতে বলিতে রমেনের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল—

"কি দাদা। আবার কি কথা—কি প্রতিশ্রুতি চাস তুই ?"

"এই কাশীধামে গঙ্গাতীরে আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর দিদিমা যে একথা তুমি রাজেন দাদা বিম্বা অমলাকে কারুকে বল্‌বেনা ?"

ব্যথিতভাবে দিদিমা ধীরে ধীরে বলিলেন "কেন ভাই? তোরজন্য তারা যে প্রতীক্ষা করে আছে কবে তুই নতুন জীবন নিয়ে তাদের কাছে যাবি? কেন তাদের চিরদিনই ফাঁকি দিতে চাস্?"

"না দিয়ে আমার উপায় কি দিদিমা! জানি তারা আমার জন্য ব্যথিত কিন্তু এফাঁকি না দিয়ে সত্যিটা ধরে দিলে যে তারা আরও ব্যথা পাবে। আমার রাজেন দাদা অমলা তাদের মহৎ অন্তরে আমার এছাপ্ যে আমি দিতে পার্‌বনা। তার চেয়ে চিরদিন তাদের ফাঁকি দিয়েই কাটাব। তারা যে আমি নতুন সংসার পেতে কোথাও সুখী হয়েছি ভেবে স্বস্তিতে আছে তাদের আনন্দের মধ্যে আমার চিন্তার একটুও ছায়া আসেনি এই আমার পরম সুখ। জানত তারা দুজনে আমার জন্য কি ত্যাগ জীবন পন করেছিল। কি কাণ্ড না করেছিল। এখনো ভাবতে আমার হৃৎকম্প হয়। তুমি দিব্যি কর দিদিমা।"

"দিব্যি করি না করি একই কথা। তুইই যখন তাদের সুখের জন্য এই করলি আমি আর কেন তাদের অস্বস্তি দিই নূতন করে—"

তুমি দিব্যি কর। ঘুণাক্ষরে কারও কাছে একথা কখনো উচ্চারণ করবেনা :—

"তাই হবে চল্ দাদা দুদিন আমার কাছে চল্।"

সমাপ্ত

পথের প্রান্তে

ফুল

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

বিলাসপথের বিষাদপ্রসূন দমকাতে দলমল্
গহন-ছায়ায় দুল্‌চে ব্যথার বোঝা,
দুখ্‌বিবরে শ্রীহীন-সুষম্ মেলচে বা কেউ দল
পিছল-পথে পড়্‌তে ঝরে সোজা।
রইল কোথা প্রেমের দেউল? নেই সুরভি পুঁজি।
তোদের কথা স্মরণ হ'লে কাঁদি, নয়ন মুছি'

ভাগ্যে কা'রো দেখ্‌চি লেখা অশ্রুরি গৌরব
জন্ম থেকেই পড়্‌তে গো সাধ ঝ'রে,
মিলচেনাক আলোকরেখা নেই নিজ-বৈভব
আশাহত নিরাশ-কুসুম ওরে!
ফুল জীবন ব্যর্থ যে হয়, বাড়চে হৃদয়জ্বালা—
আয়রে আমি তোদের দিয়ে গাঁথি পূজার মালা।

মল্লিকা জুঁই গোলাপ বেলা টগর গন্ধরাজ
নেই বা হ'লি তাইতে বা দুঃখ কিসে?
প্রেমময়ের পূজার তরে সাজ্‌বে তোরা সাজ্‌
লজ্জা ছাড়ি পরাণ না হয় দিসে।
পথের ধারের ফুল তোরা আয়, আয়রে পূজার ঠাঁই
হৃদয়খানি মুক্ত ক'রে তাঁর করুণা চাই।

উপন্যাস ও গল্প

আলোচনা

(শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার)

বাঙ্গলা দেশে সকল দিক দিয়াই একটা নবযুগ আসিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আধ্যাত্মিক রাজ্যে তো নবযুগাবতার ও যুগধর্ম্মের ভীড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। নন্‌-কো-অপারেশান লইয়া ভারতব্যাপী যে তুমুল আলোড়ন চলিতেছে, তাহাতে রাজনৈতিক জগতের নবযুগ সম্বন্ধের তো কোন সন্দেহই নাই। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যেও নাকি একটা নবযুগ আসিয়াছে। আজকালকার সাহিত্যরসিকগণ প্রায় সকলেই সমস্বরে বলিয়া থাকেন এটা উপন্যাসের যুগ গল্পের যুগ! এই যুগটা একদিনে অকস্মাৎ ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে নাই। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারাও এই যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগটা যে কি ছিল তাহা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, কাজেই তুলনা করিয়া দেখিবার উপায় নাই। আমাদের মনে হয় পূর্ব্বেও লোকে উপন্যাস ও গল্প পড়িত, এখনও পড়ে; তবে লেখাপড়া বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গল্পপ্রিয় পাঠক পাঠিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র। গল্প ছাড়া আর যা' কিছু তা' সাধারণ পাঠক কোন দেশেই পড়ে না, বাঙ্গালা দেশেও তাই। তবে কালের পরিবর্ত্তনে পাঠক ও লেখকের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, উপন্যাসেরও ঢং বদলিয়া যাইতেছে ও গিয়াছে। অসম্ভব ঘটনাবহুল অ-বাস্তব কাহিনী পড়িয়া আজকাল কেহ বড় আনন্দানুভব করেন না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কাহিনী প্রবৃত্তি ও রুচির স্বাতন্ত্র্য, গুণের তারতম্যানুসারে নরনারীর চরিত্রে যে স্বাভাবিক বিকাশ সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই সমস্ত ঘটনা লইয়া লিখিত গল্প ও উপন্যাসই আধুনিক পাঠক পাঠিকাগণ অধিকতর সমাদর করিয়া থাকেন। এ শ্রেণীর উপন্যাস ও গল্প রচনায় শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র নাথের কথা ছাড়িয়া দিলে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়জন ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক প্রশংসনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই সমস্ত উপন্যাস ও গল্পের পরিধি মানুষের জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহার মধ্যে অলৌকিক ঘটনাবলীর একান্ত অভাব। শত প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি সুরক্ষিতা অপরূপ সুন্দরী নায়িকার সহিত অপরিমিত দৈহিক বলশালী, অমানব প্রতিভাবান সর্ব্বগুণান্বিত নায়কের পদে পদে জীবন বিপন্ন করিয়া অপূর্ব্ব প্রণয়লীলা, অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য সন্ন্যাসী ও যোগবলের অপরি-

হার্য্য প্রয়োজন, অমানুষ মানবের উশৃঙ্খল ও উদ্দাম প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক স্বেচ্ছাচার, যুদ্ধ, হত্যা, অলৌকিক অন্তর্দ্ধান, অসম্ভব আবির্ভাব ইত্যাদি রোমাঞ্চকর কৌতুককাহিনীর অভাব সত্ত্বেও ঐ সমস্ত উপন্যাস পাঠকের কৌতুহল ও আনন্দ লিপ্সা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু একথাও সত্য যে ঐ সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবহুল উপন্যাসের পাঠকসংখ্যাও একান্ত কম নহে। শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি পাঠকসমাজে এখনো এগুলির যথেষ্ট প্রতিপত্তি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আদর্শবাদী এবং স্বভাববাদী এই উভয় শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নিরূপণের জন্য তুলনামূলক বিচার করিব না। আমরা এতদুভয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

আদর্শবাদী উপন্যাস লিখিতে হইলে লেখকের দুইটী জিনিষের একান্ত প্রয়োজন, করায়ত্ত ভাষাসম্পদ এবং উদ্দাম কল্পনা। মানুষের জীবন নিপুনভাবে পর্য্যবেক্ষণ, দেশ কাল প্রকৃতির সহিত উহার সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় তাঁহারা লক্ষ্য করেন না, কেবলমাত্র বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গী সহকারে স্ব স্ব আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া যান, তাহা স্বাভাবিকই হউক, আর অস্বাভাবিকই হউক। কল্পনা ও প্রতিভাব তারতম্যানুসারে কখনো বা এই সমস্ত উপন্যাস পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয় কখনো বা বিরক্ত হইয়া পুঁথি বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

যাহা হউক একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে স্বভাববাদী উপন্যাস ও গল্প লেখা অধিকতর সুকঠিন। ইহার মধ্যে কল্পনার প্রচুর অবসর থাকিলেও, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে সংযত ও সংহত। আধুনিক ঔপন্যাসিকগণের দায়িত্ব অতি গভীর ও বিঘ্নবহুল। প্রথমতঃ মনস্তত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র এবং বাহ্যপ্রকৃতির স্বভাবধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। নির্জ্জনে বসিয়া থাকিলে তিনি একেবারেই বিফলকাম হইবেন। তাঁহাকে কর্ম্মময় জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সাক্ষীর মত মানবজীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক ঘটনাটী নিপুনভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবল বাহিরের ব্যক্ত ঘটনাটী দেখিলেই চলিবে না। উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য অন্তর রাজ্যের বৈচিত্র্যময় আলোড়নের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। যেমন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা, কল্পিত চিত্র অঙ্কিত করা বহুলপরিমাণে সহজ, তেমনি স্বভাববাদী উপন্যাস লেখা অপেক্ষা আদর্শবাদী উপন্যাস লেখা এক হিসাবে অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য।

তথাপি এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের পক্ষে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি স্বাভাবিক বা স্বভাবের অনুকারী হইল কি না, নিপুণভাবে সাবধানতার সহিত কেবলমাত্র ঐটুকু লক্ষ্য করাই চরমকথা নয়। তাঁহাদের এইকথাটুকু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে তরল ও চপলমতি বালক, যুবক যুবতী, অৰ্দ্ধশিক্ষিত ও অলস ইহারাই এই শ্রেণীর উপন্যাস ও গল্প সাধারণতঃ পাঠ করিয়া থাকে, এবং মানবজীবনের আচার, ব্যবহার, রুচি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তাহারা এই সমস্ত উপন্যাস হইতে শিক্ষা করিয়া থাকে। অপরিণত মনের উপর কল্পিত চরিত্রের ছাপ অতি সহজেই বসিয়া যায়, জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, কখনো বা ঐ সমস্ত চরিত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া, ঐগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে।

এই সমস্ত সরল ও সংসারানভিজ্ঞ যুবক যুবতীর অমলিন চিত্ত ও তরুণ মনের প্রতি ঔপন্যাসিকগণের অসীম শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। কোনপ্রকার অশ্লীল ও ভদ্ররুচি বিগর্হিত চিত্র যাহাতে তাহাদের সম্মুখে না পড়ে তজ্জন্য সম্ভ্রমপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নীতিকারগণ এ সম্বন্ধে যে ভাবে যে পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করিবার উপদেশ দেন, ঔপন্যাসিকের পক্ষে ঠিক সেই পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বনীয় না হইলেও, কথিত নীতিবাদীগণের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এমন কোন চিত্র তাঁহারা উদঘাটন করিবেন না যাহা হইতে পাঠক অন্যায় ধারণা, অপকৃষ্ট কল্পনা এবং সর্ব্বোপরি প্রবৃত্তির চাপল্যে অনুষ্ঠিত গর্হিত কার্য্যগুলিকে সমর্থন করিবার মত মোহময় যুক্তিচাতুরী সংগ্রহ করিতে পারে।

প্রণয় সম্পর্কিত ব্যাপার বা লালসার তাড়নায় নরনারীর

উৎকট আচরণের চিত্র আদর্শবাদী উপন্যাসে যতটা উদ্ঘাটন করিয়া দেখান যাইতে পারে, স্বভাববাদী উপন্যাসে তাহা চলে না। একস্থলে যাহা দূষনীয় অপরস্থলে তাহা মার্জ্জনীয় হইবার মূলে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। কেননা ঐ সমস্ত চরিত্র বর্ত্তমানযুগে আমাদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী কেহ হাতে কলমে অনুষ্ঠান করিবার জন্য কোন কৌতূহল অনুভব করে না। ঐ সমস্ত উপন্যাসের সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্য উভয়ই অস্বাভাবিক ও অননুকরণীয়। আমাদের বর্ত্তমান সমাজবিন্যাসের মধ্যে উহা অনুষ্ঠান করিবার উপায় নাই। সেই সব অদ্ভুত দয়া, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, অপরূপ প্রণয়লীলা, অসাধারণ আত্মত্যাগ ইত্যাদি আমাদিগকে অনেক সময় ভাববিহ্বল করিয়া তুলিলেও, ঐগুলির পরিকল্পনা করিতে গেলেই আমাদিগকে সর্ব্বাংশে বাস্তবজগত বিস্মৃত হইয়া এক কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বাস্তব জগতে সম্ভব এমন কোন চরিত্র চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সে অধিকতর কৌতূহলের সহিত তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করে, যেপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ঐ চরিত্রটী যে সকল বিশেষ উদ্যম ও প্রচেষ্টা সহায়ে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজের আচার ব্যবহার নিয়মিত করিতে প্রয়াসী হয় এবং ঐ প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পতিত হইলে, ঠিক ঐ কল্পিত চরিত্রটীর মতই ব্যবহার করিবে, ইহা মনে মনে কল্পনা করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে।

এই কারণে নিছক নীতিশাস্ত্র অথবা সুরুচি সম্বন্ধীয় গম্ভীর উপদেশবাণী অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের জীবনেতিহাসের দৃষ্টান্তগুলি অধিকতর শিক্ষাপ্রদ; এবং বহুস্থলেই ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে নীতিশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সূত্রগুলি অপেক্ষা দৃষ্টান্তই অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী এবং ভালমন্দ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের সমধিক অনুকূল। যদি একথা কেহ স্বীকার করেন, তবে তিনি একথাও স্বীকার করিবেন যে, মানব চরিত্র গঠনের জন্য, এমন সমস্ত দৃষ্টান্ত, কল্পিতই হউক, আর বাস্তবই হউক পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, যাহা নিশ্চিতরূপে অথচ মনোরাজ্যে কোনপ্রকার অস্বাভাবিক বিপ্লব আনয়ন না করিয়াও ভালমন্দ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবে, সন্দেহ সঙ্কুল অনিশ্চয়তার সংশয়ে তরুণ মনকে পীড়িত বা বিকৃত করিবে না।

আশঙ্কা ও সাবধানতার কথা আমরা যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম। এইবার স্বভাববাদী ঔপন্যাসিকগণের সুবিধার বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইলেও প্রশস্ত। তাঁহারা ইচ্ছামত নবনব চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু চরিত্রনির্ব্বাচনে তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা আছে। যেমন হীরক তৈয়ারী করিতে না পারিলেও নিপুণ জহুরী শত শত সাধারণ প্রস্তরের মধ্য হইতে অপরিস্কৃত হীরকখণ্ড বাছিয়া লইয়া সুকৌশলে সুসংস্কৃত করিয়া উহাকে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রদান করে, তেমনি এই বিচিত্র মানব সমষ্টির মধ্য হইতেই তাঁহাকে বিচার করিয়া এবং যথেষ্ট সাবধানতার সহিত চিত্রাঙ্কণের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, যে সৃষ্টি স্বভাবের অনুকারী নয় তাহার কোন প্রশংসা নাই। কিন্তু প্রকৃতির অনুকরণ করিতে গিয়া চিত্রকর ও ভাস্কর যেমন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যময় আদর্শ বাছিয়া লয়। ঔপন্যাসিকও তেমনি মানব জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার জন্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলিই গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন, যাহা স্বাভাবিক, তাহাইতো আর সঙ্গত নহে। এবং এইটী মনে রাখিয়া সাবধানে ও সংযত ভাবে লেখনী চালনা করিবেন। কেননা, জীবনের রহস্য অতীব জটিল, শক্তিশালী জীবনের উদ্দাম বিকাশ দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল। অতিসহজেই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানব চরিত্র আকস্মিক বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং উশৃঙ্খল ব্যাভিচারে সম্পূর্ণ রূপে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে সকল প্রকার চরিত্রই অঙ্কনযোগ্য নহে। অবশ্য নিন্দিত চরিত্রগুলি যে উপন্যাস হইতে বাদ দিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, বরং ঐ শ্রেণীর চরিত্রগুলির গতি ও প্রকৃতি সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনুধাবন করিবার বিষয়। কিন্তু অধিকাংসস্থলেই ঔপন্যাসিকের অক্ষমতার ত্রুটীতে ঐ চরিত্রগুলি মনুষ্যকে ভাল না করিয়া ধূর্ত্ত করিয়া তোলে। ইহা

নিবারণ করে, ঐ সমস্ত চরিত্রের মোহজাল ছিন্ন করিয়া কেমন করিয়া উহাদের কদর্য্য আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিতে হয়, তাহারও দৃষ্টান্ত পাশাপাশি থাকা আবশ্যক। ভাল ও মন্দের এই কল্পিত দ্বন্দসংঘর্ষের মধ্য হইতে যাহাতে একান্ত স্থূলবুদ্ধি পাঠকও স্বীয় স্বাধীন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া, স্বীয় নৈতিকচরিত্রও উন্নততর ছাঁচ গঠন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কতিপয় লেখক স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়া তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে ভাল ও মন্দ এতদুভয় উপাদানেই গঠন করিয়া থাকেন, যাহার মধ্যে ভাল ও মন্দের সীমারেখা নির্দ্দেশ সহজে করা যায় না। অনেকস্থলেই লিপিচাতুর্য্যে এই চরিত্রগুলি এত মনোহর রূপ ধারণ করে যে আমরা বিহ্বল ও মুগ্ধ হইয়া যাই, তাহাদের অমার্জ্জনীয় দোষগুলিকে ভর্ৎসনা করিবার কথা আমাদের মনেও উদয় হয় না বরং উপন্যাস পাঠের আনন্দ লাভের ব্যাঘাত হয় না বলিয়াই উহাদের প্রতি আমাদের একটা রহস্যময়ী মমতা ও করুণার উদ্রেক হয়। অবশ্য একথাও সত্য যে এইরূপ চরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকগণের নিছক কল্পনা নহে। অনেকে ইহার দুইটী হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ—আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বর্ত্তমান সমাজে একশ্রেণীর অভিনব দুষ্টপ্রকৃতির নরনারী দেখা দিয়াছে। একান্ত বর্ব্বরোচিত জঘন্য কার্য্যগুলিও ইহারা রমণীয় ভাবে অনুষ্ঠান করে। ইহাদের আচার ব্যবহার রহস্যজটীল প্রহেলিকার মত বোধ হয়। এই সমস্ত সদালাপী চতুর, বুদ্ধিমান, সভ্যপশুর চিত্রাঙ্কন অতীব সুকঠিন। কিন্তু এটা ঠিক যে পাপ কুৎসিত ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, আর অপেক্ষাকৃত কোমল ও রমণীয় ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, পাপ—পাপ। যেমন সতীনারীকে বলপূর্ব্বক লাঞ্ছিত ও ও অপমানিত করিয়া পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা এবং তাহাকে নানাপ্রকার মিষ্টবাক্য উদার মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রলোভিত ও প্রতারিত করিয়া ঘরের বাহির করা একই প্রকার অপরাধ। নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা, এবং অজ্ঞাতসারে বেদনা না দিয়া হত্যা করা, একই কথা। অতএব বর্ব্বরোচিত কার্য্যগুলি অনেক সময় লেখকের লিপিচাতুর্য্যে যদি পাঠকের ঘৃণা ও বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া বরং সহানুভূতি আকর্ষণ করে, তবে ঐ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

উপরোক্ত বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোন কোন লেখক মনে করেন যে ভাল ও মন্দ একই চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি স্বাভাবিক মানুষের আকার ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এইখানেই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। কেননা, ঐ সমস্ত চরিত্রের মধ্যে ভাল ও মন্দ একই বর্ণে রঞ্জিত হওয়ায় সাধারণ পাঠকের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া উঠে ভালমন্দের সীমা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া সে মন্দকেও ভাল বলিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়তঃ—অনেকে বলেন, ইউরোপে ঐ প্রকার উপন্যাসের আদর অধিক। অতএব ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকগণ যাহা আরম্ভ করিয়াছেন, আমাদের সেই প্রথা অবলম্বন করিতে বিলম্ব করা উচিৎ নহে। ইউরোপের উপন্যাস ধ্বনি ও বাঙ্গালার উপন্যাস যদি তাহার প্রতিধ্বনি হয়, তবে ইহার উত্তরে বিশেষ কিছুই বলিবার থাকে না। অনুচীকির্ষাপ্রসূত সৃষ্টি যে কত হেয় ও কদর্য্য তাহা বাঙ্গালার বহু উপন্যাসে বিদ্যমান যুক্তিসহায়ে প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই।

উপসংহারে আমাদের এইটুকু নিবেদন। অনেক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকই ভুলিয়া যান যে, যাহা ঘটিতেছে তাহা অবিকল অঙ্কিত করাই শিল্পীর চরম নৈপুণ্য নহে, তাহার মধ্যে যাহা ঘটা উচিৎ তাহার একটা আভাষ দিতে পারিলেই সৃষ্টি সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। এবং ইহা তাঁহারা অনায়াসেই করিতে পারেন, কেননা তাঁহারা ইতিহাস বা জীবন চরিত লেখেন না, উপন্যাস রচনা করেন।

সংজীবন

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

তুমি ত নও সুর খালি,
আকুলতার সেই মমতা,
নিবিড় করে দাও ঢালি।
জাগিয়ে দাও সুপ্ত যা,
মূকের মুখে দাও কথা,
প্রণয় নীরে পূর্ণ কর
শুষ্ক তরুর আলবালই।

২

ঠিক রাখনা আর তাকে,
দাও ভিজিয়ে দাও গলিয়ে
অতীত দুখের লাক্ষাকে।
সার লও সব বস্তুরি
চূর্ণ কর কস্তূরী,
লও নিঙাড়ি টাট্‌কা পাড়ি'
সুদূর দ্রাক্ষাকে।

৩

আঁধার ঘরে দীপ জ্বালো
শুষ্ক পতিত 'বেনার মূলে'
অশ্রু ছিটাও জল ঢালো।
দাও বল কি সুখ তাকে
বাহির কর মুক্তাকে
সুখের মধু চক্র থেকে
মধুর সুধাধার ঢালো।

৪

জমাও কাঁটা, ফুল গড়ো,
কাতরতার দোলনা করে'
আনন্দেতে দোল করো।
আগুন পিষে জল আনো,
ব্যথায় ভিয়েন সব জানো,
প্রাণ জাগিয়ে পাষাণ মাঝে
রোদন তুলে গোল করো।

প্রেততত্ত্ব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

| শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত |

বিশ্বাসে বাধা

জীবাত্মা যে দেহ ধ্বংসান্তে সজ্ঞানে বিদ্যমান থাকে তাহা তাঁহাদের এতত্ত্ব বিশ্বাসে বড়ই বাধা বোধ করেন অবশ্য বিজ্ঞান তার অনুমোদিত পন্থায় একরূপ স্থির ভাবে আচার্য্য জেমস্ যাকে knock 'down প্রমাণ বলেন তাহা প্রমাণ করিয়াছে তথাপি এখন এমন অনেকেই আছেন যে পাওয়া যায় নাই ; এবং শতকরা ৯০টা ব্যাপারের সে রূপ

হয়ও না। তবে যাকে বলে circumstantial evidence (পরোক্ষ প্রমাণ) তাহা যথেষ্ট মাত্রাতেই পাওয়া গিয়াছে। এই পরোক্ষ প্রমাণ আইন গ্রাহ্য। কি রূপ ধরণের পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে আসা যায় তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। রাম শ্যামকে খুন করিয়াছে। রাম এই অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত। রামকে এই কাজ করিতে প্রত্যক্ষভাবে কেহ দেখে নাই। তবে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে রামের সহিত শ্যামের গুরুতর মনোমালিন্য ছিল! শ্যামকে পৃথিবী হইতে সরাইতে পারিলে রামের খুব লাভ হয়; রাম পূর্ব্বদিনে একটা রিভলভার কেনে; শ্যামের দেহস্থ গুলিটা ঐ বন্দুকের উপযোগী. রামের কাছে ঐ ধরণের আরো কয়টা গুলি পাওয়া যায়। রামকে দ্রুতবেগে পলাইয়া যাইতে একজন দেখে। রাম ও শ্যামকে ঘটনার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঐস্থানে একত্র থাকিতে দেখা যায়। এই গুলি হইল পরোক্ষ প্রমাণ। ইহার উপর নির্ভর করিয়া রামকে অপরাধী সিদ্ধান্ত করা যায়। এই সিদ্ধান্ত কি আইন সঙ্গত নয়? আর কেহ যদি বলে রামকে এই কাজ করিতে দেখিয়াছি তাহা যে নিশ্চিত প্রমাণ তাহারই বা স্থিরতা কই? দ্রষ্টা মিথ্যা বলিতে পারে তো? হয়তো দ্রষ্টার সহিত রামের শত্রুতা আছে। রামকে ফাঁসিতে মরিতে দেখিলে দ্রষ্টার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কাজেই এই অপরাধ প্রমাণও অনেক সময় নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মিডিয়ম দেহে স্মরণীল চৈতন্য যে কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা ইহার অপরোক্ষ প্রমাণ নাই; অর্থাৎ চোখে কেহ উহাকে স্বতন্ত্র ভাবে বিদ্যমান দেখে না; কিন্তু পরোক্ষপ্রমাণে তাহার বিদ্যমানতা খুবই স্পষ্ট; আত্মস্ব প্রমাণকর উক্তি; ব্যক্তির হাব ভাব ধরণ ধারণ; হাতের লেখা, গলার স্বর; জীবিত কালীন ঘটনার স্মৃতি; ভাববার্ত্তার প্রেরণ—প্রভৃতি এই ধরণের পরোক্ষ প্রমাণ। ইহার যদি মূল্য থাকে তবে এই প্রমাণে মৃতের আত্মার অস্তিত্ব ও সজ্ঞান ক্রিয়া একরূপ বৈজ্ঞানিক সত্যে দাঁড়াইয়াছে বলিতেই হইবে।

তথাপি অনেক লোক এখনও ইহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। তাহার কারণ পূর্ব্ব মতের উপর অন্ধ আসক্তি। ধর্ম্মের ন্যায় বিজ্ঞানও গোঁড়ামীর জিনিস।' কিন্তু বৈজ্ঞানিকের গোঁড়ামি জ্ঞানের শত্রু। থিওরি ও ঘটনার মধ্যে গরমিল হইলে সত্যের খাতিরে থিওরিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ঘটনা প্রত্যক্ষের বস্তু, থিওরি শুধু আন্দাজের জিনিস। এই যে থিওরির প্রতি অন্ধ আসক্তি ইহার অনেক মজার দৃষ্টান্ত আছে। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ক্যামিল ফ্লামারিয়ন তাঁহার 'The unknown' নামক গ্রন্থে এই ধরণের একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন—"প্যারী নগরীর বিজ্ঞান মহাসভার এক অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিন ডুমন্ সেল এডিসনের ফনোগ্রাফ বার্ত্তা সমবেত পণ্ডিত সমাজে প্রচার করেন। যন্ত্রব্যাখ্যা কালে একজন মধ্য বয়স্ক পণ্ডিত উঠিয়া আসিয়া ভয়ানক রাগের সহিত এডিসনের প্রেরিত representativeএর গলার কলারটা ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া বলিয়া ওঠেন "বদমাইস। তুমি কি ভেবেছ একটা ventriloquist এর জুয়োচুরীতে আমরা ভুলবো।" এই পণ্ডিত আর কেহ নহেন মুঁসে বুইল্যাও! ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ্চ এই ঘটনা ঘটে। ছয় মাস পরে স্বাধীন ভাবে এই যন্ত্রটী পরীক্ষা ও প্রেক্ষণ করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন ভেন্ট্রিলোকিসম্ ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু দেখছি না। একটা অচেতন ধাতু থেকে মানুষের গলার স্বর ও কথা বাহির করা সম্ভব নয়! এটা একটা শ্রুতিভ্রমের ব্যাপার nothing but an accoustic illusion!!!—(২) গ্যাসের আলোতে সহরের রাস্তাঘাট আলোকিত করা যায় এই প্রস্তাবটাকে বিখ্যাত রাসায়নিক Humphrey Davy পাগলের পাগলামি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন! (৩) রাসায়নিক লাভোসিয়ে সদর্পে বলেন আকাশ থেকে উল্কা পড়তেই পারে না। (৪) বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ এলি ছু বোমণ্ট জোর করিয়া বলেন ভূস্তরে জীবাশ্ম (fossil) থাকিতেই পারে না। (৫) রেলগাড়ী প্রথম তৈয়ারী হইলে ব্যাভেরিয়ার Royal college of doctors বলেন গাড়ী রেলের উপর দিয়া চলিলে আরোহীর মাথা খারাপ হইয়া যাইবে, সাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে, শিরোরোগে সব অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি

জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদের মনও কুসংস্কার হইতে মুক্ত নয়! কোন একটা ব্যাপার বুদ্ধির অগম্য হইলে এ সব

পণ্ডিত নিজ বুদ্ধির অভাব স্বীকার না করিয়া ব্যাপারটা অস্বীকার করিবেন। গণ্যমান্য অপর পণ্ডিতেরা যদি এ সম্বন্ধে হাতে কলমে করিয়া নিজ অভিজ্ঞতা প্রচার করেন আত্মম্ভরী অবিশ্বাসীরা অনায়াসে বলিবেন উঁহারা পাগল বা উঁহাদের মাথার ঠিক নাই বা উঁহারা প্রবঞ্চকের পাল্লায় পড়িয়া বুদ্ধি হারাইয়াছে—তবু স্বীকার করিবেন না নিজেদের বুদ্ধির হীনতা বা দৌর্ব্বল্য আছে। আচার্য্য ক্রুক্‌স্ যখন radiant matter (পরাস্পন্দ জড়) বা Thallium নামক মূল পদার্থ আবিষ্কার করেন তখন সকলে সসম্ভ্রমে বিশ্বাস করিলেন; আর যখন তিনি প্রেত কেটী কিং-এর ফটো লইয়াছেন ও অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছেন বলেন তখন তার মাথা খারাপ হয় সিদ্ধান্ত করেন, তারপর বিজ্ঞানের অন্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার সময় তাঁহার মাথা আবার সাফ্ হইয়া যায়।

আসল কথা নিজ নিজ চিরপোষিত আদরের মতটা অজ্ঞাত তত্ত্বের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে ইহা অনেকে ভালবাসেন না, কাজেই এই 'অজ্ঞাত'কে আমলে আনিতে ইঁহাদের আপত্তি; আমার পাঁচটী সসীম ও সদোষ ইন্দ্রিয় অসীমের যে ধারণা করিয়া রাখিয়াছে ইহাই অভ্রান্ত ইহাই চরম ও পরম—এ ধারণা অজ্ঞতার নামান্তর মাত্র।

আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনেক ক্ষেত্রে একটা সহজ, সরল ও সংগত অনুমানকে কিছুতেই বিশ্বাস করিব না অথচ তার পরিবর্ত্তে একটা উদ্ভট, অসম্ভব অসংগত অনুমানকে আমল দিব কেন? না এই সহজ ও সরল মতটার উপর আমার জাতক্রোধ আছে। উপবোধে মোণ্ডা খাইতে গররাজী অথচ দায়ে পড়িয়া ঢেঁকি গিলিতে রাজী এমন অনেক আছেন। সূক্ষ্মশরীরী মুক্তাত্মার ও সহজ মীমাংসা হয়, কিন্তু তা না মানিয়া টেলিপ্যাথির সাহায্যে সমস্তই হইতেছে ইহাই মানিব;—অথচ এই টেলিপ্যাথির দ্বারা যে কি করিয়া এই সব সম্ভবপর হয় তাহা ইঁহারা বুঝাইতে পারেন।

প্রকৃতির যে অজ্ঞাত রাজ্য হইতে এই সব ঘটনা আসিতেছে তাহা যে জ্ঞাত রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র ভিন্নধর্ম্মী ইহা মানিয়া লইতেই যত গোল হয়। আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের বাহিরে বলিয়া সেই অজ্ঞাত জগৎ যে অস্তিত্বের দাবী করিতে পারিবে না ইহা নিতান্ত ছেলেমো আবদার নয় কি? আর এই জ্ঞাত অংশটুকুর সীমানা কি চিরকাল একই? এবং সকলের কাছে একই? তা যদি হইত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দীয় জগৎ মধ্যযুগীর জগৎ আর আধুনিক জগত স্বতন্ত্র হইত না কি? মাছের বা কুকুরের বা নিরক্ষর এক অসভ্যের বা সাধারণ সভ্যমানুষের বা ইশামুশার বাহ্য জগত গুলায় স্বতন্ত্র হইত না কি? কিন্তু বস্তুতঃ তাতো নয়। ইন্দ্রিয়গুলা যতটুকু মানায় ও যেমন ভাবে অসীমের আভাষ দিতেছে ততটুকু মাত্রায় ও তেমনি ভাবে আমরা এই বাহ্য জগত গড়িয়া তুলিতেছি। জ্ঞানের পরিমাণের ও জ্ঞাতার শক্তি অনুসারে বাহ্যজগতের মূর্ত্তি বদলাইতেছে। মূর্ত্তি যেমনি হউক না উহা মিথ্যা মূর্ত্তি; আমাদের এই সসীম ইন্দ্রিয়গুলা জগতের সত্যমূর্ত্তি দেখাইতে পারিবে না, পারিবে শুধু আমাদের তৃতীয় নেত্র জ্ঞান নেত্র আমরা যখন ক্রমোন্নতিগুণে শিবত্ব পাইব তখন আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় খুলিবে জগতের সত্যমূর্ত্তি দেখিব। যতদিন তা না হয় অসীমের ভগ্নাংশ মাত্র দেখিব তাও তার মিথ্যামূর্ত্তিতে দেখিব। ঈথার তরঙ্গ ক্ষেপে আলো, উত্তাপ, তড়িৎ আমরা ঈথার তরঙ্গ দেখিনা, আলো তড়িৎ উত্তাপই দেখি, কার্য্য দেখি, কারণ দেখি না। কারণরূপী জগতই সত্য, কার্য্যরূপী জগতই মিথ্যা। অসংখ্য কারণের অসংখ্য কার্য্য! আমরা তথাপি এই অসংখ্য কার্য্যের দু চারিটা দেখিতেছি মাত্র তাহাতেই এত আমাদের অহঙ্কার। সদর্পে বলি সমগ্র জগৎটা বুঝি আমরা করতল ধৃত আমলকির মত বুঝিয়া লইয়াছি। তবু পদে পদে ঠকিয়াও আমাদের চৈতন্য খুলিতেছে না।

মতকে মতের খাতিরে লইবার প্রবৃত্তি হইলেই মতের প্রতি অবিচার করিতে হয়। গন্তব্য স্থান সত্যমন্দির যান-বাহন 'মত' বা Theory, পথ যেখানে যেমন বাহন' যান সেই স্থানে তেমনি হওয়া উচিৎ—স্থলপথ গাড়ীতে আসিয়া জলপথে নৌকা না চাপিয়া গাড়ীতে নদী পার হইবার আবদার বা বোধ করিলে, গন্তব্যে পৌছানো ঘটে-না যান-প্রেমিকতার পরিচয় দিতে পারে বটে। অলৌকিকের জ্ঞানমন্দিরে পৌছিতে হইলে তেমনি অবস্থা বিশেষে মতের সহায় দরকার, টেলিপ্যাথীর স্কন্ধে চাপিয়া যতটা দূর সম্ভব

আসিলাম ; তারপর এমন পথের মোড়ে আসিলাম যেখানে বেচারী টেলিপ্যাথী অক্ষম! এখানে প্রেতবাদের ঘাড়ে চাপিতে হইবেই অবশ্য গন্তটা হয়তো বড়ই অপ্রিয় কিন্তু যদি সত্য মন্দিরে যাওয়াটাই মতলব হয় তাহা হইলে যান অপ্রিয় হইলেও অবলম্বনীয়, নাসা কুঞ্চনে কোনো ফল নাই।

হইয়াছে তাহাই। এ পর্য্যন্ত যত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া আসিয়াছে এবং ঘটিতেছে সবগুলির ব্যাখ্যা এই প্রেতবাদ দিয়া সুন্দর ভাবে সমাধা হয়। এবং যত রকম প্রমাণ দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে তা হইয়াছে। সুতরাং এখন দেখা যাউক এই প্রেতবাদ অর্থাৎ মরণান্তে জীবাত্মার স্বতন্ত্র ও সজ্ঞান অস্তিত্ব বাদ আমাদের এই অজ্ঞাত রাজ্যে কতটুকু আগাইয়া দিয়াছে :—

Sir Oliver Lodge বলেন—"The first thing we learn perhaps the only thing we clearly learn in the first instaute is continuity—there is no such sudden break in the condition of existence as may have been anticipated ; and no break at all in the continuous & conscious identity of genuine character and personality. Essential belongings such as memory, culture education, habits, charecter and affection all these and to a certain extent tastes and interests, for better for worse are retained. Terrestrial accretions such as worldly possessions bodily pain and disabilities these for the most part naturally drop away.

Meanwhile it would appear that knowledge is not suddenly advanced—It would be unnatural if it were, we are not suddenly flooded.

মাসিক কাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

সন্দেশ। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।—হিংসুটিদের গান—বেশ সুন্দর রচনা—

আমরা ভাল লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারি বিশ্রী
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন আমরা খাব মিশ্রী।

মেঘের খেয়াল। এটিও সুন্দর। কল্পনায় মধুর—

"জটাধারা বুনো মেঘ ফোঁস ফোঁস ফোলে
গুরু গুরু ডাক ছেড়ে কত ঝড় তোলে।
ঝিলীকের ঝিকিমিকি চোখ্ করে কাণা
হুড় হুড়্ কড় কড়্ দশদিকে হানা।
ঝুলকালো চারিধার, আলো যায় ঘুচে,
আকাশের ন ীরা সব দেয় মুছে।

সাধে কি বলে   —ছেলেদের জন্য ব্যঙ্গ কবিতা। রচনার ভঙ্গী সুন্দর   েয়ালী বেশ কৌতুক প্রদ—

সাহেব ডাকেন "ড্যাডি ড্যাডি" গাধাও ডাকে ঘ্যাঁকো
অর্থাৎ কিনা কোলে চড়েছি, এখন তা য় দ্যাখো।

জালা কুঁজো সংবাদ নাচের বাতিক—সরস রচনা—এই তিনটী কবিতা বোধ হয় একজন কবিরই লেখা। শিশু সাহিত্যের সরস সুন্দর রচনায় ইহার যথেষ্ট কবিত্ব আছে। তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হোক।

মোসলেম ভারত। মাঘ।—বিরহ বিধুরা। কাজী নজরুল ইসলাম। 'কাবুলী কবি' খোশহালের হিন্দুস্থানে নির্বাসন কালীন তাঁহার সহধর্ম্মিণীর লিখিত একটী কবিতার ভাব অবলম্বনে এই কবিতাটী লিখিত। কাজী কবির নূতন পরিচয় অনাবশ্যক—ছন্দোবন্ধে অনবদ্য—ভাবটীও মধুর। "সুর্মা রেখার কাজল হরফ নয়নাতে আর লেখ্‌বো না" "জুলফ তুমি কাঁদবে গো কেশ চিরুণ-চুমার আফসোসে।" সুন্দর আবেগ। সাজেদা খাতুন। কবিতাটী একেবারে অচল। 'নিয়ে'র সঙ্গে 'হৃদয়ে'র, 'মুছে'র সঙ্গে 'আছে'র মিল একেবারে অসহ্য। তারপর "মিটাবে কি আশা সখা চাহিবে কি নাহি জানি ?"—"?" চিহ্নের সার্থকতা কি ?

দীওয়ান-ই হাফিজ। কাজী নজরুল ইস্‌লাম। গজল ৫ ও ৬। গজলের এইরূপ সুন্দর অনুবাদ আর কেহ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পড়িয়া মুগ্ধ হইলে কতকগুলি অপরিচিত শব্দের জন্য অর্থ বোধে গোলমাল বাধে। একথা বুঝিয়াই বোধ হয় কবি আজকাল বাঙ্গালায় টীকা প্রয়োগ করিতেছেন। এই কবিতা দুইটীর মধ্যে যথেষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচয় আছে। পড়িতে পড়িতে যত ভাল লাগে তত অর্থবোধ বিরক্তির জন্য কবির উপর রাগ হয়।

"সমরকন্দ আর বোখারার দিই বদল তার
লাল গালের তিল্‌টের।"

"না হক কসরৎ গ্রাহ্য খুনরার রহস্যের এত বলির
য সত্য।"

"গাল' তো নয় ও নিটি শরবৎ ঢালচে পান্নার
শিরীন ঠোঁটটা!"

—খুবই সুন্দর।

সেণ্ট হেলেনা। ফজলল হক সেলবর্সী। কবিতাটীর মধ্যে স্থানে স্থানে ছন্দের দোষ ও ভাষা প্রয়োগের দোষ থাকিলেও—বিষয় গৌরবে কবিতাটী উপভোগ্য হইয়াছে।

কবিপ্রিয়া। কোনও কবি-বন্ধুর উদ্দেশে—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার রচিত। দীর্ঘ কবিতার কোনও বিশেষত্ব নাই। শুধু আমাদের ভাল লাগিয়াছে—

নিজ নাভি গন্ধ পায়   মৃগ দিশে দিশে ধায়
আপনারে পেতে চায় আপনা বাহিরে
অন্নপূর্ণা গৃহে যার   কিসের অভাব তার ?
ভবেশের ভিক্ষা সার ঘরে ঘরে ফিরে।

প্রবাসজ্যোতিঃ। চৈত্র।—প্রবীণ। শ্রীদেবেশ প্রণীত। কবিতাটীতে প্রবাসজ্যোতির জ্যোতিঃহীন

পত্রে প্রকাশিত হইলেও সুন্দর। আপন জ্যোতিতে উজ্জ্বল। রক্ত আলোর মদে ভোর হইয়া যাহারা মত্ততাকেই শক্তি বলিয়া ভুল করিতেছে সেই নবীনকে প্রমত্ততা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রবীণকে আহ্বান করিয়াছেন। বোঁটার ডগায় যে ঝুড়ি ঝুড়ি কচি কচি কুঁড়ি দুলিতেছে ঝড়ো হাওয়ায় যেগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে সেগুলিকে বাঁচাইবার জন্য ঝড় ঝঞ্ঝায় যাঁহারা অটল সেই প্রবীণকে আহ্বান করিয়াছেন।

ঘরের পানে তাকায়না যে কেউ
বাইরে কোথায় বান ডেকেছে
সেই জোয়ারে লাগাতে চায় ঢেউ।
ঘুর ঘুরিয়ে হাওয়ার তালে ওড়ে
ঘর ভেসে যায় উতল বানের তোড়ে
কচি ডানার ক্ষণিক কাঁচা জোরে
তুচ্ছ ভাবে আপন ঘরের মাচা
আয়রে গরুড়, চড় ইদলে বাঁচা।

কবি বলেন "যাহারা বাহিরের চটকে ঘরকে ভুলিয়া ছুটিয়াছে, হে প্রবীণ, তুমি তাহাদের আবার ঘরে ফিরাইয়া আন।

'আনরে টেনে বদ্ধ ঘরের মাঝে
রুদ্ধ করে' ঘরের ছেলে
লাগা ওদের আপন ঘরের কাজে।"

কবিতার বিষয়টী সুন্দর কিন্তু ভাষা স্থলে স্থলে গদ্যাত্মক হওয়ার জন্য রসভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

সতর্কতা। শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পদী কবিতা, কবি বলিতেছেন,—

আশা কহে হে নিরাশা তুমি ডুবে মর
নিরাশা ডুবিয়া বলে হাত কেন ধর।

কবি কাব্যামৃত সরোবরে ডুবিয়া মরিতে গেলে সমালোচক অবশ্যই হাত ধরিয়া বাঁচাইতে যাইবে, ইহা স্বাভাবিক।

ভুলে যাই। কবি কুমুদরঞ্জন। ছন্দটী বেশ মিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের "ছিলাম নিশিদিন গৃহহীন উদাসী" ইত্যাদি ছন্দের সফল অনুকরণ, কবিতায় কবির বক্তব্য বিশেষ কিছু নাই।

"এত যে ফুলদল দিয়ে গেল ফাগুনে
হলো তা' ছায়েখার বিশাখার আগুনে।"

এই পংক্তি দুটী সুন্দর। কিন্তু ১ম পংক্তি বিশাখার আগুন অপেক্ষাও অসহ্য।

"ধরিয়া মধুমাস ডাকি পিক থেমেছে"

সমস্ত বসন্তকাল ধরে' কোকিল ডেকে ডেকে এখন থেমেছে—এই কথাটীকে প্রকাশ করিবার জন্য কবি যাহা ছন্দিত করিয়াছেন তাহা বাংলাই নয়।

পরিচারিকা। ফাল্গুন।—'তুমি ও আমি'—বেণুকাদাসীর কবিতাটী মোটের উপর মন্দ হয় নাই। ... বেণুকাদাসীর "ধূলিকায়" একটু বিশেষত্ব আছে। "নারে নয়ন লোর"—বেশ—"বিষাদ নয়ন"ও কোনরূপে চালান পাবে—কিন্তু "করুণ কপোলের" কি উপায় হইবে? "বিরহীবধুর মলিন অশ্রুপাত" সমাসের হেঁয়ালী।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের—"হেমন্তে বঙ্গ"। সঙ্গীত। সঙ্গে স্বরলিপি না থাকিলেও মাধুর্য্যে সঙ্গীত বলিয়া বুঝা যাইত।

"গিলে দিয়ে চুনট করা ওড়নার" সঙ্গে কবি হেম যুব নদীর উপমা দিয়াছেন। উপমাটী মন্দ হয় নাই। কিন্তু "মোহভরা নীলাম্বরী শাড়ী" কি প্রকার? সব চেয়ে বিপদ হয়েছে আমাদের—"তোমার স্তুতি কণ্ঠে ছাঁকে, প্রভাতী আজ গাহবে পাখী" এই দুটী পংক্তি লইয়া। পাখী কিরূপে কণ্ঠে স্তুতি ছাঁকিবে আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কবি কালিদাস রায় "হতাশ শিল্পী" কবিতায় বলিতেছেন—

"আজিকে তুলিকা হাতে ভাবি হায়
তাহার রূপটী ঠিক কোথা পাই।
যখন খুবিত মোর আঁখি ছায়
তখন প্রতিমা কেন আঁকি নাই।"

কাহার রূপটী? বালিকা বধূর?—না কিশোরী প্রিয়ার?

ধন্য। শ্রীআশুতোষ মহলানবিশ। ইহা যদি কবিতা

হয় তবে গদ্য কি প্রকার? প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মতে ইহা গদ্যও নহে।

"যে তোমারে আছে করিয়া ধারণ
সেই শুধু ভাই তোমার ধর্ম্ম
তিত্তি সে সব; তুচ্ছি তাহারে
নারিবে সাধিতে কোনও কর্ম্ম।"

এর উপর আবার পুচ্ছের মত "তুচ্ছি" আছে।

কমলের ব্যথা। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

"উচ্চ গিরি মূর্দ্ধন ভেদি
অসীম মহা আকাশ ছেদি
রচিত তব জ্যোতির বেদী"

শুধু ব্যর্থ শব্দাড়ম্বর।

তার পর—

"কেহ না যেখানে
পৌছে কভু কেমনে আমি যাইব সেখানে"

বহ্বারম্ভে বা বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া।

'বল্লীআশা' কি 'আশাবল্লীর' পূর্ব্ব নিপাত?

"তুমি তো নভ অসীম শিরে
নিম্নে আমি নিশান নীবে।"

নভঃ অসীম? না শির অসীম? নভের শিরই বা কেমন?

"চাহিতে" ও "ফিরিতে" মিল কি বসন্ত বাবুর উপযুক্ত হইয়াছে?

"ভুবন ভরা তোমার আলো
তোমার ছায়া, তাহারে ভালো
বাসিয়া কত বহিব ওগো
আকুল তৃষাতে।"

এ কি—রবীন্দ্রনাথের

শ্রাবণে ডেপুটীপনা
এত কভু নহে সনা
ভন প্রণা—ইত্যাদির অনুকরণ?

"বাসনা মম মৃণাল হয়ে পঙ্ক পাতালে
ডুবিতে চাহে গভীর দুখে হানিয়া কপালে।"

অর্থাৎ—

বাসনা গভীর দুঃখে কপালে হানিয়া মৃণাল হইয়া পঙ্ক পাতালে ডুবিতে চাহে। খেয়ালী কবির হেঁয়ালী ছাড়া ইহাকে আর কি বলিব? তারপর চূড়ান্ত হল যখন কবি লিখলেন—

"হতাশা ক্ষীণ কণ্টকিত
জীবন মধু বিলুণ্ঠিত
অন্ধ আঁখি মুদিয়া আসে তোমার বিহনে।"

আমাদিগকেও কবির সম্বন্ধে হতাশায় কণ্টকিত হইয়া উঠিতে হলো—কণ্টকের আঁচড় কবির গায়ে লাগিলে আর উপায় কি?

চৈত্র।—বসন্তবরণ।—শ্রীমতী কিরণবালা দেবী। ছন্দে কোনো শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। ভাষায় মাধুর্য্য আছে।

'জ্যোৎস্না তরঙ্গে আজি হলো বিশ্ব ভাসমান।'

এখানে 'জ্যোৎস্নার' 'জ্যোছনা' হইবার দাবি আছে। ভাসমান,—কি দীপ্যমান? না প্লবমান? 'নীলিম আকাশ' বৈষ্ণব কবির 'মধুরিমহাসে'র অনুসরণ বলিয়া মনে হয়—'বাসন্তি-নিশায়' কি ব্যাকরণদ্বেষিগণের অনুসরণ? শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষের চিররহস্ত সন্ধানের পর মিলিল—'কাজের তুমি' (Mysterious Thou?) কবি বলিতেছেন,—'কাজের তুমি'র সন্ধান পাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনুকরণে দেশের ক্ষুদ্র কবিরা 'কাজের তুমি'র সন্ধান করিতে গিয়া 'মোহের দুয়ারে আত্মহত্যা করিতেছে' তাই ক্ষুদ্র কবিদের তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন,—

তাই বলি ভাই উড়োনা আকাশে
সঙ্কর মর মর্ত্তে
সাবধানে চলো দেখো পড়না ক
আধ্যাত্মিক গর্ত্তে।

পরে কবি বলিয়াছেন—শুধু তিন জন কবি 'কাজের তুমি'র মায়াজালে বন্দী হন নাই'।

১ম সত্যেন্দ্রনাথ,—যিনি ভিন্ন দেশের তীর্থ সলিল আনিয়া বঙ্গবাসীর অঙ্গ শীতল করিয়াছেন—যাঁর হাতে সুবিচিত্র বর্ণবিলাস ফুটিয়াছে—যিনি চটুল মধুর নৃত্যদোদুল

ছন্দে মধুর মধুর শব্দচিত্র দান করিয়াছেন—যিনি খঞ্জ-লঙ্কারের চম্ম ব্যঞ্জনায়কে বিঁধেছেন—তিনি Mysterious Thou এর সন্ধানে ঘোরেন নাই।

'তুমির' গন্ধ পাবেনা খুঁজিয়া
ইহার কবিতা অঙ্গে
শুধু লাল নীল জরদা পরীরা
ফরদা ওড়ায় রঙ্গে।

২য় কবি কালিদাস রায়,—ইনি প্রথম বয়সে 'তুমি'র চোরা গর্ত্তে পা দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন রকমে বেঁচে গেছেন। 'মনের বনের উর্ব্বশী'র মোহ ইহার কাটিয়া গিয়াছে—

'মনেও নয় সে বনেও নয় সে
বিরাজে সে গৃহ কর্ম্মে'
সংস্কৃতের পন্থা ধরিয়া
ললিত মধুর ছন্দে
করিছে যে গান বঙ্গবাসীরা
শুনিছে পরমানন্দে।
কৃষকের দুখে কাষবের সুখে
সাড়া দেয় তার চিত্ত
'ভগ্নী-ভ্রাতার সম্প্রীতি' সে যে
তার কাছে মহা বিত্ত।'

'কাব্যের তুমি'র বালাই এ কবির কাব্যে আজকাল একেবারেই নাই। মাসিক পত্রে দু একটা সনেটে মাঝে মাঝে 'ফস্‌কে' পুরাতন স্মৃতিটা জেগে উঠে।

৩য় কুমুদরঞ্জন—

অজয়ের কূলে বসিয়া বিরলে
ক্ষুদ্র বীণাটী অঙ্কে
সরল রাগিণী বাজাইল কবি
পদ্ম ফোটাল পঙ্কে।
ছোট সুখ দুঃখ হাসি ও অশ্রু
দেখাল রঙীন বর্ণে
পল্লীগ্রামের নগ্ন ছবিটি
আঁকিল মানস পর্ণে
ক্ষুদ্রের মাঝে রুদ্রের লীলা
দেখানো ইহার লক্ষ্য
ছোট কথাটিরে বলিবারে তাই
উপমা লক্ষ লক্ষ।
যাহোক তাহোক এঁর কবিতাও
'তুমি'র বালাই-শূন্য
কবিতাই পড়ি দর্শন নয়
বুঝিও যে বড় পুণ্য।

লেখক শেষের কথাটি বড় ঠিক লিখিয়াছেন—কবি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় আধ্যাত্মিকতার ভাণ নাই, আর প্রায় সকল কবিতাই বুঝা যায়।

শেষে লেখক নবীন কবিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

'আধ্যাত্মিক মুখোস পরিয়া
কেন আর সাজ ভণ্ড?
আকাশ কুসুম গড়িয়া কেবল
জীবনেরে ... পণ্ড।'

আমরা বলি কবিতায় আধ্যাত্মিকতা ও mystic... প্রয়োজন আছে। তবে যাঁহারা অধ্যাত্মের সং... ... নাই অথচ গোটাকতক 'অচেনা' 'অজানা' 'অচিন' 'অসীম' 'অরূপ' 'অতীন্দ্রিয়' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে আধ্যাত্মিকতার ভাণ করেন তাঁহাদের নকল জটা ও দাড়ি সুবিধা পাইলেই আমরা উপড়াইয়া লইব। আর যে সকল কবিযশঃপ্রার্থী নবীন যুবকেরা 'কেবলি স্বপন করিছে বপন আকাশে' যাহারা জ্যোৎস্নার গন্ধে, চকোরের তানের স্পর্শে, নভোনালিমার স্বাদে, অরুণিমার শব্দে বিভোর, সুরের আগুনে উত্তপ্ত, পরীর পাখার হাওয়ার নেশায় উৎক্ষিপ্ত তাঁহাদের গাঁজার কল্‌কেও সুবিধা পাইলে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিব।

কাব্যের তুমি—কবিতাটির রচনা তেমন বসনিবিড় হয় নাই, ভাষা এলো মেলো—গদ্যাত্মক। সংযমের অভাবে কবিতাটি অযথা দীর্ঘ হইয়াছে।

দুঃখ। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতার ভাবটি মন্দ নয়। তবে 'বর্ষা আঁধার ঘনরাজ' না বাংলা না সংস্কৃত। এরূপ সমাস পরিহর্ত্তব্য।

'হাসি গানের আল্পনাটি
মুছিয়ে সে দেয় তিলক তার'

এ পংক্তির অর্থ দুর্বোধগম্য। ঠুকঠাক চলিতেছিল, শেষে এক ঘায়ে কবি কবিতার দফা নিকেশ করেছেন। কবির করাঘাতে "দুঃখ" দুখ অনেক বেড়ে গেছে।

"কোরক আমার ফুটিয়ে দে'ছ
মরণ মোহন করাঘাতি।"

যেমন সমাস তেমনি সন্ধি। "মরণ মোহন কর তদ্দারা আঘাত করিয়া" কবির ছন্দিত ও সন্ধি সমাসে নিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল "মরণ মোহন করাঘাতি" ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কবি বসন্তকুমারের এই সকল কবিতায় তাঁহার প্রবন্ধ রচনায় যথেষ্ট উপাদান পাইবেন।

পাপিয়া। শ্রীক্ষেত্রমোহন সাহা। কবিতাটিতে "ওরে মত্ত; ওরে অন্ধ ওরের চঞ্চল" ইত্যাদি সম্বোধন আছে। 'অজানা' 'অচেনা'ও আছে, তবু দুর্ব্বোধ হয় নাই। সুবোধ্য হইলেও কবিতা সুপাঠ্য হয় নাই। বিশেষতঃ শেষের দুই পংক্তিতে পাপিয়ার মাথাটি ঢুলিয়া পড়িয়াছে।

বাসন্তিকা। শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু—ছন্দে লালিত্য আছে। কিন্তু রচনার বিশেষত্ব নাই।

পল্লীবাণী। পৌষ।—যাত্রাপথে,—৺অমূল্যরতন দত্ত, এম এস সি। সুপাঠ্য রচনা। পদচিহ্ন। শ্রীঅশোক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রচনা ভঙ্গি অপরিপক্ক—ভাবটি মন্দ নয়।

অসীমপানে। শ্রীসরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। সুমধুর; ছন্দে লীলা আছে।

বিকাশ। মাঘ।—কবিগুণাকর মহাশয়ের "আর কি?" এতে বেশী আর কি থাকবে? একটু ছন্দ, গোটাকয়েক মিল আর ২।১ টা মিঠে শব্দ।

বীণাপাণি। শ্রীযাদবেন্দু বসু মল্লিক। "দীপ্ত আলোকে হরিত রাত্রি" অস্যার্থঃ? 'জ্যোতি উছল উজল নয়না' সংস্কৃত না বাংলা? সমাসের বৈশিষ্ট্য আছে। "অজ্ঞান ঘন আঁধার কালিমা তাপকলুষ নাশিনী"ও তদ্রূপ।

শ্রীমতী বেলা গুহের "মলের শব্দ" সুমধুর—

'কবির কল্পনা কুঞ্জে সুষমার খনি
ভূতলে অতুলনীয় রুনু রুনু ধ্বনি।'

শ্রী—বিশ্বাস মহাশয় 'মলের শব্দের' নীচেই ধ্রুবসত্যের সন্নিবেশ করিয়াছেন। বিশ্বাস মহাশয়ের 'ধ্রুবসত্য' বহু গবেষণার ফল। 'ধ্রুবসত্য' মন্ত্রের মত সংক্ষিপ্ত ও সংহত তাই দুই পংক্তিতে সমাপ্ত। শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—ধ্রুবসত্য কি—

"উন্নতি ও অবনতি ভবিষ্যে বিলীন।
মরণ এ জগতের ধ্রুব চিরদিন॥"

'কি করলাম হায় পাশ করে'এও একটী কবিতা—রচয়িতা শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ। ভারতী। পণ্ডিত মহাশয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ডিগ্রীধারী'দের স্বাস্থ্যহীনতা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এতই সহজ যে তাহা পাশ করিতে স্বাস্থ্যহানি হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মনে হয় ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানির কারণ অন্যবিধ। কবি বলিয়াছেন—

"হরশে মুচির স্বাস্থ্যেতে হায়
হিংসেতে বুক ফাটতে যে চায়"

হরশে মুচির স্বাস্থ্য দেখিয়া হিংসা হইলেও তাহার মূর্খতা নিশ্চয়ই হিংসার বস্তু নহে।

পণ্ডিত মহাশয়ের উপাধিগুলি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি অথবা Bird of Paradiseএর পুচ্ছের মত সুদীর্ঘ। এগুলি অর্জ্জন করিতেও বোধ হয় স্বাস্থ্যের মূল্য দিতে হইয়াছে নতুবা এগুলির প্রতি এত মমতা কেন?

সূচীপত্র

আষাঢ়—১৩২৮